॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৩ বর্ষ ১৩৭৩ ।

(৪০ সংখ্যা থেকে ৫১ সংখ্যা পর্যন্ত)

—অ—

—আ—

—উ—

—এ—

—ক—

—খ—

—গ—

—ঘ—

—চ—

—ছ—

—জ—

—ট—

তার কারণঃ কেবল পেপ্সোডেণ্টেই থাকে 'ইরিয়াম প্লাস'—বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী এই উপাদানে আশ্চর্য রকমের ফেনা হয়। আর সেই অফুরন্ত আশ্চর্য ফেনা আপনার মুখগহ্বরের প্রত্যেকটি অংশে পৌঁছে ময়লা তুলে দেয়। মুখ পারিষ্কার করার এই অসামান্য গুণ থাকায় পেপ্সোডেণ্টে মাজলে আপনার দাঁত হবে পেপ্সোডেণ্ট-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে সাদা···আর মুখের ভেতরটা সর্বদা স্নিগ্ধ ও তাজা মনে হবে।

Pepsodent
TOOTHPASTE WITH IRIUM PLUS
Pepsodent

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ-এর তৈরী
একটি সেরা টুথপেস্ট

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

এই!
ওটা যে
আমার ভাগের
প্যারীর
মিঠাই
সবাই মিলে
খান,
খেতে
ভারি মজা,
প্যারীর মিঠাইতে
বাড়বে
জীবনের
মাধুর্য
Parry's
প্যারীজ — উৎকৃষ্ট মিঠাই প্রস্তুতকারক
খেয়ে দেখেছেন কি?
প্যারীজ কনফেকশনারি লিমিটেড, মাদ্রাজ
JWTPRS 3629

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীকৃষ্ণা রায়

অদ্যাবধি
৫২,৫০০ কপি
মুদ্রিত

সুবোধ ঘোষের

ভারত প্রেমকথা

দাম ৬·০০

*

ত্রয়োদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

একটি অসামান্য রেকর্ড

প্রথম মুদ্রণ		
বৈশাখ	১৩৬২	২২০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ		
ভাদ্র	১৩৬২	৩২০০
তৃতীয় মুদ্রণ		
বৈশাখ	১৩৬৩	[illegible]০০
চতুর্থ মুদ্রণ		
পৌষ	১৩৬৩	৫২০০
পঞ্চম মুদ্রণ		
মাঘ	১৩৬৪	৩২০০
ষষ্ঠ মুদ্রণ		
মাঘ	[illegible]	৩৩০০
সপ্তম মুদ্রণ		
মাঘ	১৩৬৬	৩৩০০
অষ্টম মুদ্রণ		
মাঘ	১৩৬৭	৩৩০০
নবম মুদ্রণ		
মাঘ	১৩৬৮	৩২০০
দশম মুদ্রণ		
আষাঢ়	১৩৬৯	৫২০০
একাদশ মুদ্রণ		
মাঘ	১৩৭০	৫২০০
দ্বাদশ মুদ্রণ		
বৈশাখ	১৩৭২	৫৫০০
ত্রয়োদশ মুদ্রণ		
শ্রাবণ	১৩৭৩	৫৫০০

সুবোধ ঘোষের অন্যান্য উপন্যাস

বসন্ততিলক ৫·০০ **জিয়া ভরলি ৬·০০**

বন উপবন ৪·০০ **শতকিয়া ৮·০০**

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৩ বর্ষ ॥ ৪০ সংখ্যা
শনিবার ২১ শ্রাবণ ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক „ ১৪.০০
ত্রৈমাসিক „ ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষাণ্মাসিক „ ১৪.০০
ত্রৈমাসিক „ ৭.০০

অন্যান্য দেশে
(জাহাজ-ডাকে)
বার্ষিক সডাক [illegible]
ষাণ্মাসিক „ ২৩.০০
ত্রৈমাসিক „ ১১.৫০

আকাশ-ডাকে
(বিমান-ডাকে)
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক ১৬.০০
ত্রৈমাসিক ৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
[illegible]

DESH
Saturday 6 August 1966

রেলযাত্রীদের বিক্ষোভ

আজকাল এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, চার পাশেই, যে পান থেকে চুন খসলেই 'মার মার' ধ্বনি ওঠে। পরীক্ষার হলে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন পেল ছেলেরা, সংগে সংগে চেয়ার টেবিল ভেঙে খাতাপত্র ছিঁড়ে একাকার করল; কোথায় কোন পানঅলা কাকে সিগারেট বেচে দেশলাই দিতে আপত্তি করল অমনি সদল বলে দোকানপত্রের ওপর হামলা শুরু হয়ে গেল; সিনেমা হলে মেয়েদের সিটে ছেলেদের বসতে দেবে না—লাগাও মারপিট; স্টেশনে ট্রেন আসতে দেরী হল দু দণ্ড—লাইন আটকে দাও, ট্রেনের দরজা জানলা ভাঙ। বলতে কি, যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই দেখি কত অসংখ্য কারণে বিক্ষোভ, আর বিশৃঙ্খলা।

আমরা এমন কথা কখনোই বলব না, এই বিক্ষোভের সবই অকারণ বা নিতান্ত হুজুগে। আবার আমরা একথাও স্বীকার করব না, যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে বিক্ষোভ জানানো উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্ষোভ প্রকাশটা তো দেখি নিতান্তই খেয়াল খুশির ব্যাপার।

হালে কলকাতার চারপাশে—সে হাওড়া লাইনেই হোক, কি শিয়ালদা লাইনেই হোক যাত্রী বনাম রেল কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে উঠেছে। একথা কাউকে বলে দিতে হবে না, কলকাতা নগরীকে ঘিরে চতুর্দিকে যে উপনগরী গড়ে উঠেছে তার জনসংখ্যা গত দশ পনেরো বছরে অবিশ্বাস্য ভেবে বেড়ে গেছে। কোনো একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, কোথাও কোথাও এই জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় তিন চতুর্থাংশ বেড়েছে। মোটামুটিভাবে এই জন-সংখ্যা যে গড়পড়তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছে তা হয়ত বলা যায়। অথচ জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে পাল্লা দিয়ে রেলে যাতায়াতের সুযোগ এমন কিছু বাড়ে নি বা রেল কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা করতে পারেন নি যাতে উপনগরী থেকে লোকজন কাজে কর্মে শহর কলকাতায় বিনা অসুবিধায় আসতে যেতে পারেন। একথাটা আগেই ধরে নিতে হবে, রেলের এখন পর্যন্ত যে ব্যবস্থা—প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ তার পক্ষে এই সীমিত ব্যবস্থায় সামলানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগ থাকবেই। আমরা বলি না যে, এ দুর্ভোগ থাক; থাকা নিশ্চয় উচিত নয়। রেল যথেষ্ট লাভ করে, গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করলে তার লাভ বই লোকসান হবে না। কিন্তু আপাতত রেলপথ যা আছে এবং তার ওপর নানান পাল্লার গাড়ি ও মালগাড়ির যাতায়াতের চাপ এতই বেশী যে বলা মাত্র তারা দুটো চারটে ট্রেন বাড়াতে পারে না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রেল দপ্তরের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ করুণা পাওয়া যায়। এই অবস্থায় যাত্রীদের পক্ষে (অভিযোগ ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও) ট্রেন আটক ও স্টেশনের ওপর হামলা করে স্থায়ী কোন সুবিধা আদায় হবে তা আমাদের পক্ষে অনুমান করা মুশকিল। বরং এই ধরনের বিক্ষোভ যখন বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রেল সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে তখন যাত্রীদের অসুবিধা বই সুবিধা হয় না। গত হাঙ্গামার সময় কয়েকটি ইলেকট্রিক ট্রেন নষ্ট করে দেবার ফলে সংশ্লিষ্ট লাইনের যাত্রীদের অসুবিধাই বেড়েছে, সুবিধা কিছু হয় নি।

রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, যাত্রীসাধারণ সম্পর্কে তাদের উদাসীন মনোভাব, হচ্ছে-হবে করে সব কিছু ফেলে রাখা, টালবাহানা করা—এ সবই হয়ত সত্য। কিন্তু যেহেতু ট্রেন আসতে দশ মিনিট দেরী করল সেহেতু রাগের মাথায় একটা হামলা করলুম—এটা কোনো কাজের কথা নয়। সিগনালের তার কাটা, লাইনের নাট বল্টু খুলে ফেলা, ইটপাটকেল ছোঁড়া—ইত্যাদি বাস্তবিকই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ভাল পথ নয়। তাছাড়া, আমাদের কলকাতা আর তার উপ-নগরীকে ঘিরে কিছু করতে চাওয়াই তো বিড়ম্বনা। সাধারণ একটা সারকুলার রেল বসানোর কথায় কত রকম টালবাহানা আজ বছরের পর বছর চলছে। রাজ্য সরকার তো অবিলম্বে এই রেলপথের কাজ শুরু করতে চান, কিন্তু দিল্লি তা হতে দিচ্ছে কই! হবে, হচ্ছে, দেখি করে দিন কাটাচ্ছে।

আমরা যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁদের অসুবিধার কথা জানি, কিন্তু ট্রেন আটক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে তাঁদের দাবি আদায়ের উৎকৃষ্ট পথ বলে মনে করি না। আশা করি, যাত্রীসাধারণ এমন একটি পথ বেছে নেবেন যাতে আপাতত যা আছে তার ক্ষতি না হয়, অথচ রেল কর্তৃপক্ষ ক্রমশই চাপে পড়ে যাত্রী দুর্ভোগের সুরাহা করতে বাধ্য হন। নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভংগ করা বোকামি; নিজের নাক গোটা রাখাই মঙ্গল।

বন্দী মার্কিন পাইলটদের বিচার

উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবর্ষণকারী কয়েকজন মার্কিন বিমানচালক উত্তর ভিয়েৎনামে বন্দী হয়েছে। এদের "যুদ্ধ-অপরাধী" (ওয়ার ক্রিমিনাল) হিসাবে বিচার হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে বলে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন। মার্কিন সরকার এর প্রতিবাদ করে ঘোষণা করেছেন যে, হ্যানয় যদি এ কার্য করে তবে তার ফল ভালো হবে না, অর্থাৎ এর জন্যে উত্তর ভিয়েৎনামকে শাস্তি পেতে হবে। প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েৎনাম পলিসি পছন্দ করেন না এবং শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহশীল এমন কিছু সংখ্যক মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যও মার্কিন পাইলটদের বিচারের আয়োজন বন্ধ করার জন্যে প্রেসিডেন্ট হো চি মিন এর নিকট আবেদন জানিয়েছেন। এঁদের আশঙ্কা এই যে, মার্কিন পাইলটদের বিচার এবং তার ফলে যদি তাদের কারোর প্রাণদণ্ড হয় তবে তাই নিয়ে মার্কিন জনমতকে উত্তেজিত করার এবং যুদ্ধ আরো বাড়িয়ে দেবার সুযোগ জনসন গবর্নমেন্ট পাবেন।

মার্কিন সরকারের প্রতিবাদের আন্তরিকতায় অনেকেই বিশ্বাসী নন। এঁদের ধারণা যে, মার্কিন সরকার মুখে প্রতিবাদ করছেন বটে কিন্তু [illegible] যদি সেটা [illegible] করে তবে ওয়াশিংটন খুশীই হবে; কারণ, উত্তর ভিয়েৎনাম যদি মার্কিন পাইলটদের বিচার করে কাউকে প্রাণদণ্ড দেয় তবে "উত্তর ভিয়েৎনামের শাস্তি চাই" বলে আমেরিকায় একদল লোক চিৎকার শুরু করবে, আর সুযোগ নিয়ে মার্কিন সরকার যুদ্ধ বৃদ্ধির পথে আর এক পা এগোতে পারবেন। যুদ্ধের প্রত্যেকটি [illegible] প্রতি ধাপেই মার্কিন সরকার কোনো একটা না কোনো অজুহাত আবিষ্কার করেছেন। এটাও সেইরকম একটা অজুহাত হবে।

উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের [illegible] খবর থেকে মনে হয়েছিল, বিচার অবিলম্বে আরম্ভ হবে। [illegible] হয়নি। মার্কিন সরকারের প্রতিবাদের ফলে বা মার্কিন সরকারের হুমকিতে ভয় পেয়ে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার মার্কিন পাইলটদের বিচার করার সংকল্প ত্যাগ করেছেন এরূপ কিন্তু মনে হয় না। বেসরকারী অনুরোধকারীদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাতে হয়তো প্রেসিডেন্ট হো চি মিন চান না কিন্তু তার জন্যেও বিচার করার সংকল্প ত্যাগ করা আবশ্যক নয়। বেসরকারী অনুরোধকারীদের ভয় পাছে কাউকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়; তা হলে আমেরিকায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে তাতে যারা উগ্রতর যুদ্ধের পক্ষে তাদের সুবিধা হবে। কিন্তু বিচার হলেই প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে বা প্রাণদণ্ডের আদেশ হলেই তদনুসারে তৎক্ষণাৎ অপরাধীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে বা গুলি করে বধ করা হবে তার কোনো মানে নেই। দু-চারজন বন্দীর প্রাণহরণ বিচারের উদ্দেশ্য নয়, আর বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হলেও সরকার সে আদেশ রহিত করে দিতে পারেন। কয়েকজন বন্দী মার্কিন বোমারু পাইলটের প্রাণ হরণ করলে অন্য পাইলটরা ভয় পাবে এবং বোমাবাজি বন্ধ হবে বা কমবে তাও নয়। বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকাকে বিশ্বের জনমতের সামনে বেকায়দায় ফেলা। আমেরিকায় যে উত্তেজনা সৃষ্টির ভয় আছে সেটা প্রাণদণ্ডের আদেশ পালিত হলে হবে। সুতরাং বিচার না করার জন্যে বেসরকারী অনুরোধকারীদের আসল ভয়কে উপেক্ষা না করেও বিচার আরম্ভ করা যায়। বিচার আরম্ভ হতে না হতেই তো অভিযুক্তদের প্রাণ বধ করা হবে না। বরঞ্চ বিচার যত দীর্ঘদিন ধরে চলবে, প্রচারের দিক থেকে ততই লাভ এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নানা দেশ থেকে দর্শক আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের সামনে যদি বিচার অনুষ্ঠিত হয় তবে মার্কিন সরকারের বিশ্বের জনমতের সামনে ঘোরতর বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবনা।

বিচার যদি হয় তবে হ্যানয় সরকার যে কেবল উত্তর ভিয়েৎনামের উপর অনুষ্ঠিত মার্কিন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করবেন তা নয় [illegible] অনেক বছর ধরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভাগ্যে যে দুর্গতি ঘটেছে [illegible] অনেক কথা এদিক ওদিক দিয়ে বিচারকদের সামনে নিশ্চয়ই এসে পড়বে। যুদ্ধে আঘাতের বৈধ এবং অবৈধ লক্ষ্যের বিচারের সঙ্গে যদি ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ঘটনাবলী আলোচিত হয় তবে পৃথিবীর প্রবলতম সামরিক শক্তির লজ্জা [illegible] থাকবে না। ভিয়েৎনামীরা কী করেছে না করেছে সে কথাটা পৃথিবীর চোখে বড় হয়ে দেখা দেবে না, পৃথিবীর চোখে পড়বে তার অনেক বেশী [illegible] হয়ে আমেরিকানরা ভিয়েৎনামে এসে যা করেছে এবং যা করাতে দিয়েছে তার উপর।

উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবর্ষণকারী কয়েকজন মার্কিন পাইলটকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন বলেই তাদের বিচার করার কথা উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার তুলতে পেরেছেন, কিন্তু অবৈধ যুদ্ধের অপরাধের কথা ধরলে এই পাইলট ক'জন যা করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধ অনেক বেশী দিন ধরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে চলে আসছে। কেবল অসামরিক মানুষের নিগ্রহ নয়, আততায়ীকে জব্দ করার জন্যে আগুন এবং বিষ দিয়ে জলস্থলকে রন্ধন, বিষাক্ত এবং নিষ্প্রাণ করে দেবার চেষ্টা সেখানে চলেছে। এসব কাজ আমেরিকানরা স্বহস্তে যা করেছে তার চেয়ে ঢের বেশী ভিয়েৎনামীদের দিয়ে করিয়েছে অথবা ভিয়েৎনামী যখন করেছে তখন তাদের বাধা দেয়নি।

"বে-আইনী", "বে-আইনী" বলে চেঁচিয়ে এই বিচার বন্ধ করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জার্মান এবং জাপানী যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার এবং শাস্তিদানের পর "বে-আইনী"র আপত্তি টিঁকবে না। এখন আর ঊর্ধ্বতন অফিসারের আদেশমতো কাজ করেছি বলে দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই। প্রত্যেক সৈন্য প্রত্যেক আদেশ বিচার করে সেটা নীতিসংগত কিনা দেখে তারপর সেটা পালন করবে এরূপে নিয়মের নিরঙ্কুশ প্রয়োগ অসম্ভব, করতে গেলে সেনাবাহিনী অচল হয়ে যাবে। প্রত্যেক আদেশের খুঁটিনাটি বিচারের দাবি গ্রাহ্য হতে পারে না, কিন্তু যেখানে আদেশ স্পষ্টতই মানবতা-বিরোধী অথবা বৈধ যুদ্ধের কোনো সুবিদিত নিয়মের বিরোধী সেখানে সৈনিকের সে আদেশ পালন না করবার অধিকার আছে। শুধু তাই নয়, এরূপ অবৈধ আদেশ পালন করলে তার জন্য তাকে দণ্ডার্হ হতে হবে। রাজনৈতিক অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ অসামরিক [illegible]দের ভিটেছাড়া করা, তাদের ঘরবাড়ি [illegible] পুড়িয়ে দেওয়া, জমি গাছপালার উপর বিষ ছড়িয়ে দেওয়া এসব বৈধ যুদ্ধের অঙ্গ হতে পারে না এবং এগুলো যারা করবে অথবা করাবে তারা কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করেছি বলে পার পাবে না। আগেই বলেছি যে, এগুলো কেবল এক পক্ষই করেছে তা নয় কিন্তু কথা যখন উঠবে তখন দোষটা প্রধানত তাদেরই লাগবে যারা প্রবল। যেমন বিচার যদি হয় তবে আমেরিকানদেরই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, কেবল ঐ পাইলট ক'জন অভিযুক্ত হবে না। তাদের ভূমিকা হবে প্রতিনিধির ভূমিকা, তাদের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অনুপস্থিত মার্কিন সরকারেরও বিচার চলবে। হ্যানয় এ সুযোগ হারাবে বলে বিশ্বাস হয় না। ব্যাপারটা যাতে বেশ জমকালো রকমের হয়, সম্ভবত তারই আয়োজনের জন্যে সময় নেওয়া হচ্ছে।

৩০-৭-৬৬

আমার মিনার

বুদ্ধদেব বসু

কেউ-কেউ বলে, আমার মিনার গজদন্তে তৈরি। ভুল
বলে।

আমার মিনার বেহালার বস্তিতে খোলার ঘর,
সান ফ্রান্সিস্কোর চল্লিশ-তলা হোটেল. আটলান্টিকের
গরীয়ান জাহাজ, বা কলকাতার বর্ষায় স্যাঁৎসেঁতে
একটি বাথরুম—যার টবের জলে কাপড়-কাচা
সর ভেসে থাকে, আর ফাটা দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়
আরশোলা।

আসলে আমার মিনার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে
নেই; তা চলমান. সপ্রাণ. বহুরূপী।

কেউ-কেউ বলে. আমার মিনারে আমি একলাই
বাসিন্দা। ভুল বলে।

এখানে আমার সঙ্গী আছে অনেক সুন্দরী.
অনেক পণ্ডিত. অনেক হরিণ আর নর্দমার ইঁদুর.
ভিখিরি আর দুর্গন্ধি গলির বেশ্যারা। কখনো
কোনো বাজিকরের ভেল্কিতে একই ডালে লাল
আর নীল পদ্ম ফোটে। কখনো কোনো বৃদ্ধ
শকুন জানলা দিয়ে গলা বাড়ায়।

আসলে আমার মিনারে কোনো আগল নেই.
পাঁচিল নেই. পাহারা নেই। এখানে যারা ভিড়
করে তাদের অনেকের নাম পর্যন্ত আমি
জানি না। আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে নিজেদের
মধ্যে গল্প করে তারা. আমার খাবার খেয়ে
চ'লে যায়।

কেউ-কেউ বলে, আমার মিনারে আমি কফিনের
মধ্যে শবের মতো নিরাপদ। ভুল বলে।

মাঝে-মাঝে মারাত্মক বীজাণু উড়ে এসে পড়ে.
মড়ক লাগে। তখন আমার মিনার হয় হাসপাতাল.
আমি রাত্রি ভ'রে রোগীদের গোঙানি শুনি। বোমা
পড়ে মাঝে-মাঝে. আমার মিনার দখল ক'রে
নেয় বন্দুকধারী সৈনিকেরা; আমি ভৃত্যের মতো
তাদের সেবা করি।

আসলে আমি অতি সহজে আক্রমণীয়,
অতি সহজে পরাস্ত। এক অপরিসীম দুর্বলতা
দিয়ে তৈরি আমার মিনার।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে মিনার কিছুতেই ধ্বংস
হয় না—না বোমায়. না বীজাণুতে, না
ভূমিকম্পে। কখনো খুব উঁচু হ'য়ে ওঠে.
কখনো মিশে থাকে মাটিতে, কখনো ছদ্মবেশে
শত্রুর দলে ভিড়ে যায়। গুপ্তচরের মতো
চতুর ও প্রতারক. ফাটা দেয়ালে আরশোলার
মতো দুর্ধর্ষ. বরফের তলায় ঘাসের মতো
অমর: এই মিনার।

অতুল্য ঘোষ লোকসভায় বলেছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি মুদ্রামূল্য হ্রাসে অমত করে নি।
সেতুবন্ধের চেষ্টা।
এ-সপ্তাহে কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হচ্ছে।
ও ভয়ে কম্পিত নহে আমার হৃদয়।
অনাস্থা প্রস্তাব
আরো দুজন কংগ্রেসী এম এল এ বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।
খলসে-পুঁটিতে সন্তুষ্ট নন, এবার রুই-কাতলা চাই।
অজয়বাবু

'থার্ড ডিভিজন'

আমাদের কালটাই আলাদা ছিল। থার্ড ক্লাস এম-এ দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রিন্সিপ্যালকে দেখেছি বাংলা দেশ জুড়ে নাম ছিল তাঁর; তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ-করা দর্শনের অধ্যাপকের কাছে পড়েছি—অমন অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং শিক্ষকতার

সিনেমার ভরসা থার্ড ক্লাস জনতা

সান্নিধ্য পাওয়া এক দুর্লভতম অভিজ্ঞতা; থার্ড ক্লাস এম এস-সির মেধা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ভারতবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু হাওয়া-ই বদলে যাচ্ছে এখন। এখন থার্ড ক্লাস এম-একে ডিগ্রী লুকিয়ে ভদ্রসমাজে বিদ্যার পরিচয় দিতে হয় এবং থার্ড ডিভিজন—

হ্যাঁ থার্ড ডিভিজন। সেই কথাই ভাবছি। থার্ড ক্লাস এম-এ, এম এস-সিরা নিজেদের ভার নিজেরাই নিতে পারবেন, আর প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই তো করুণা-বিগলিত হয়ে থার্ড ক্লাস তুলেই দিচ্ছেন। কিন্তু থার্ড ডিভিজনের ভবিষ্যৎ আরো কদাকার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে. গর্ত থেকে এইবারে গহ্বরের দিকে পা বাড়াচ্ছে তারা। এবং, সেই গহ্বর যে কত হাজার ফুট গভীর—পণ্ডিতেরা এখনো তার হিসেব কষে বার করেননি।

শিক্ষার মান উর্ধ্বায়িত করবার যুগপৎ পরিকল্পনা ইউ-জি-সি'র। তার অন্যতম অঙ্গ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-নিয়ন্ত্রণ। সাধু সংকল্প—কারণ, ক্লাস নামধেয় ম্যাস-মিটিঙের প্রহসন বন্ধ না করলে শিক্ষার অপঘাত অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু এই যে অগণিত থার্ড ডিভিজন—বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী এই অভাগা ছাত্রসমূহ, তাদের গতি কী হবে, এবং কোথায় হবে?

ঠিক জানি না, হয়তো মফস্বলের ছোটখাটো কলেজে তৃতীয় বিভাগের ছাত্রও বিজ্ঞান শাখায় প্রবেশের অধিকার পায়। কিন্তু সেখানেও সরকারী এবং স্পনসড কলেজে? আর কলকাতায়? সরকারী এবং অভিজাত কলেজগুলোর কথা ছেড়েই দিচ্ছি, সে-সব জায়গায় তো শতকরা সত্তর ভাগ নম্বর পেয়েও মাথা ঠুকে মরতে হয়। কিন্তু যে-সব বেসরকারী অতিকায় কলেজ একদা স্বদেশীর অনুপ্রেরণায় এবং অতীতের মনস্বী বাঙালীর মহিমায় ছাত্রভর্তির সদাব্রত খুলে দিত, সেখানেও আজ রুদ্ধ দুয়ার। থার্ড ডিভিজন? সায়েন্স? মাথা খারাপ?'

কলকাতার বড়ো কলেজগুলোর সামনে এই মুহূর্তে বীভৎস-বিসদৃশ ভিড়—হতাশ ছাত্রছাত্রী আর শূন্যদৃষ্টি অভিভাবকের এক দুঃসহ সমাবেশ। 'হ্যাঁ, আর্টসে কিছু থার্ড ডিভিজন নিতে পারি আমরা, তবে অনার্স চলবে না।'

আর্টস—অনার্সহীন। অ ভি ভা ব ক জানেন, ছাত্রছাত্রীও জানে—সে-ও অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনোমতেও সায়েন্সটা পড়তে পেতো, তা হলে আজকের এই টেকনিক্যাল যুগে—

আমি জানি, অতীতে থার্ড ডিভিজনে

নির্বাচনী প্রচারে ভরসা থার্ড ক্লাস জনতা

স্কুল ফাইন্যাল পাশ-করা ছাত্র আই এস-সিতে স্কলারশিপ পেয়েছে। কিন্তু আজ আর সে সুযোগ কেউ তাকে দেবে না। তার ভাগ্যের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয় বিভাগে চিহ্নিত হওয়া মাত্র সে আজ অপচয়ের দলে।

মেধাবী ছাত্ররাই বৈজ্ঞানিক, এনজিনীয়ার

মৃত্যুর পরেও ভরসা থার্ড ক্লাস জনতা

কিংবা ডাক্তার হওয়ার অধিকার রয়েছে, সে কথা মানি। নির্বিচারে সকলকেই বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি করতে হবে, এমন অন্যায় দাবিও কেউ জানাবেন না; একটা গুণগত নির্বাচনেরও নিশ্চয়ই দরকার আছে। প্রশ্নটা সেখানেও নয়। আমার শুধু একটিমাত্র জ্ঞাতব্য: এই থার্ড ডিভিজনের ছাত্রছাত্রীদের কী হবে? শুধু বিজ্ঞানে নয়, হিউম্যানিটিজেও যারা অনার্স নিতে

পারবে না—কোন্ ভবিষ্যতের দিকে তারা চলেছে ?

পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই দুটি বস্তুর অগ্রাধিকার: খাদ্য এবং শিক্ষা। খাদ্যতত্ত্ব এখন থাকুক, ও নিয়ে ভাবতেও মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি বৎসর, হায়ার-সেকেণ্ডারী এবং স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই বিকট কৌতুক-নাট্যটা এখন যে-কোনো উপায়ে বন্ধ করবার সময় হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা সবাই চায় না—তার ব্যয় এখন উচ্চ মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে। তবু উচ্চশিক্ষাই পেতে হবে—নইলে দাঁড়াবার কোনো জায়গা নেই। দু-চারটি টেকনিক্যাল স্কুলের মুষ্টিভিক্ষার কথাও না তোলাই ভালো, সেখানে পঞ্চাশটি সীটের জন্য দেড় হাজার দরখাস্ত পড়ে।

অতঃপর ? অতঃপর আশাহীন, ভবিষ্যৎহীনদের জন্য সব পথ বন্ধ করে দিয়ে আমরা কথামৃত বর্ষণ করতে পারি। বলতে পারি: 'তোমরা দেশকে ভালোবাসো, জাতির মুখোজ্জ্বল করো, আদর্শ

বিমান ডাকে

বিদেশে চাঁদার নূতন হার

মুদ্রামূল্য হ্রাস হেতু ১ জুলাই হইতে বিদেশে বিমান ডাকে দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার—

এশিয়া :	
বার্ষিক	১৮৬·০০
ষান্মাসিক	৯৩·০০
ত্রৈমাসিক	৪৬·৫০
ইওরোপ :	
বার্ষিক	২৮০·০০
ষান্মাসিক	১৪০·০০
ত্রৈমাসিক	৭০·০০
আমেরিকা ও কানাডা :	
বার্ষিক	৪১০·০০
ষান্মাসিক	২০৫·০০
ত্রৈমাসিক	১০২·৫০
অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, ফিজি প্রভৃতি :	
বার্ষিক	৩২৬·০০
ষান্মাসিক	১৬৩·০০
ত্রৈমাসিক	৮১·৫০
লণ্ডন অফিস মারফত :	
বার্ষিক	১১৭·০০
ষান্মাসিক	৫৮·৫০
ত্রৈমাসিক	২৯·৫০

—সার্কুলেশন ম্যানেজার, দেশ

নাগরিকে পরিণত হও, সুখী-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের জন্য—'

তিন কোটির ব্যর্থতা, বঞ্চনা আর বিদ্বেষের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জাতির মুখোজ্জ্বল করবে তিন হাজার কৃতী ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান, বুদ্ধিজীবী ? এতগুলো শূন্যোতার ক্রোধ, আত্মসম্পাত এবং যন্ত্রণার ওপর সুখী-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে ? কার মন্ত্রবলে ? এবং এরও পরে দোষ দেব তরুণ

শুধু ফার্স্ট ডিভিসন চলবে না,
সুপার ফার্স্ট ডিভিসন চাই

সমাজের উচ্ছৃংখলতার, আদর্শহীনতার, রুচিবিকারের ? আত্মবিকাশের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি থাকলেই আদর্শ বাঁচতে পারে, নইলে আত্মবিনাশ রোধ করবে কে ?

অধ্যাপক এসে বললে, 'তোমাকে দেখছি প্রবন্ধ লেখার রোগে ধরেছে, সুনন্দ। এই-বার মানে মানে জার্নালের পাতা বন্ধ করো, নইলে তোমার লেখা আর কেউ পড়বে না।'

আজ সকালে একমুঠো কৌতুক বিতরণ করব বলেই তো লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু হল না। পর পর চারজন অভিভাবক এসেছিলেন আমার মতো অব্যবসায়ীর কাছে। 'আপনি তো অনেককে চেনেন, যদি কোথাও আমার ছেলেটাকে—'! কিন্তু আমি কী করতে পারি।

অধ্যাপক আবার বললে, 'আয়ার্লাণ্ডের স্টার্ভিং মিলিয়নের ওপর কৃপা করে ফরাসীরা তাদের মরক্কো লিজিয়নে পাঠা চেয়েছিল। তাতে জ্বলে গিয়েছিলেন জোনাথান সুইফ্‌ট। লিখেছিলেন শিশু-মাংস ভোজনের সেই বিখ্যাত প্যামফ্লেট। কিন্তু দ্যাট সুইফ্‌ট ওয়াজ এ ফুল। আমি তোমাকে বলছি সুনন্দ—মরক্কো লিজিয়ন না-ই থাক, পৃথিবীতে এখনো গান-ফডারের চাহিদা আছে। এক্সপোর্ট করো সব থার্ড ডিভিজন—আর্ন ফরেন এক্সচেঞ্জ—'

চিৎকার করে বললুম, 'থামো—থামো—স্যাডিস্ট কোথাকার। হিংস্রতারও একটা সীমা আছে।'

আমি আশা ছাড়িনি। আমি জানি, ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়ায় ট্রেন চলে না—থার্ড ডিভিজনকে পেছনে ফেলে দেশও চলতে পারবে না। ভরাডুবির আগেই আমাদের আত্মতুষ্টির সুখনিদ্রা নিশ্চয় ভেঙে যাবে; যদি না ভাঙে, ঈশ্বরও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না॥

আজ আমি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আজ আমার সারা দিনই সূর্যাস্ত, লাল টিলা—তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে
আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ

গড়িয়ে পড়ছে যেন উস্কোখুস্কো ভেড়ার পাল, পিছনে পাঁচন
জলও বা হঠাৎ-ফাটা পাহাড়তলির
কিংবা বৃষ্টি-শেষের রাতে যেমন আসে কবিতার আলুথালু স্বপ্ন, সোনালী চুল

আজ আমি কিছুতেই আর দেহ ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—
ফুল দেখলে মায়া জাগে না, কাদা দেখলে বুক আমার ফুটন্ত কেতলির মতন
বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে

গতকাল পর্যন্ত দিনগুলোর কোনো স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ ছিলো না
আয়নার আসল ছায়ার মতন সে ছিলো নাছোড়বান্দা আর ধুরন্ধর
এমন করে ভোগের পাড় থেকে ঠেলতে-ঠেলতে আমায় নিয়ে চলেছিলো
যেখানে ক্রমাগত ঝাঁপ হচ্ছে
নিচে জ্বলন্ত কামানের মতন ঢেউ, মাছচিংড়ি আর সারবন্দী
পালিয়ে যাবার পথ—
ভাগ্যিস, আমি ঘুষি মেরে আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলুম!

বহুকাল বাদে আজ আমার লাগছে ভালো—সারাটা দিনই সূর্যাস্ত, লাল টিলা—
তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ
আমি আমার চশমাটা পুলিসের চোখে-কানে রেখে বলেছি—
পথটুকু পরিষ্কার রাখো হে
কাজে-কর্মে ভুলচুক আমার আবার তেমন পছন্দ হয় না

আজ আমি কিছুতেই আর খাট ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—

এখনো ভোলা গেলো না

তারাপদ রায়

ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন।

কয়েক দিন মাত্র তবু এখনো সেই স্বাধীনতার স্বাদ
এখনো ভোলা গেলো না।

সেই যে ফাঁকা আকাশ ধু ধু ময়দানে নীল নিশান
জীবনপণ ভালোবাসার দাবি
অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অগ্নিযুগে দামাল
কয়েক স্কয়ার মাইল মাত্র কয়েক দিন অসম্ভব স্বরাজ ঘোষণায়
টেলিগ্রাফের লাইন কেটে ট্রেজারি লুট থানা চড়াও—

সেই আমার ভালোবাসার স্বাধীনতার নীল নিশানা
সেই আমার স্বাধীনতার ভালোবাসার নীল নিশানা
কয়েক দিন মাত্র তবু এখনো সেই স্বাধীনতার স্বাদ
কয়েক দিন মাত্র তবু এখনো সেই ভালোবাসার স্বাদ
এখনো ভোলা গেলো না।

অন্যদেশের কবিতা

[স্প্যানিশ কবিতা প্রসঙ্গে আমরা মূল স্পেন ভূখণ্ড ছাড়াও স্প্যানিশ-ভাষী কিউবা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশের কবিদের কথা আলোচনা করেছি। এবারে আমরা খুব ছোট দুটি দ্বীপ-দেশের কবিকে উপস্থিত করছি, যেখানকার ভাষাও স্প্যানিশ। এই কবিদ্বয় তাঁদের স্ব স্ব দেশের বাইরে তেমন পরিচিত নন, কিন্তু এঁদের রচনার সরলতা ও আবেগের তীব্রতা সর্বজনীন।

অগাস্টান মিলারেসের জন্ম ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে, ১৯১৭ সালে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ঠিক কোথায়, পাঠকের যদি এই মুহূর্তে মনে না পড়ে তবে জানাই, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপ-সমষ্টি ক্যানারি, জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ।

সলোমন দে লা সিলভার জন্ম ১৮৯৩ সালে নিকারাগুয়ায়। নিকারাগুয়া মধ্য আমেরিকায় ক্যারিবিয়ান আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে ছোট্ট দেশ, লোকসংখ্যা এগারো লক্ষ। সলোমন দে লা সিলভা জীবনে অনেক কাজ করেছেন, উপন্যাস কবিতা ও সাংবাদিকতা ছাড়াও যুদ্ধ করেছেন, শ্রমিক আন্দোলন গড়েছেন ও রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্যারিসে নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন, ঐখানেই ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যু।]

অগাস্টান মিলারেস

শুভেচ্ছা

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে কবিতা
শুধু মানুষের সত্য অস্তিত্বের প্রকাশ,
কবিতা শুধু সত্যের গান, তাকে জাগিয়ে তোলা
যে দৈত্য দিবা রাত্রি পাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে।

কবির কণ্ঠই একমাত্র পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে
সেই ঊষাকে ভেদ করে জেগে ওঠা প্রথম শিখর
সেই পাহাড়েই ধ্বনিত হয় সময়ের সঙ্গীত
তার হৃদয়ই প্রথম ছিন্নভিন্ন হয় যে-কোনো যুদ্ধে

প্রথম সারিতে তার স্থান কখনই অস্বীকার করা যাবে না
স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে তার আত্মীয়তা তাকে সেই স্থান দিয়েছে
একজন কবি সব সময়েই সেই মানুষদের সঙ্গী
যারা যুদ্ধের সময় নির্ভীকভাবে ঝাঁপ দেয়।

কবিই মৃত্যুরোধকারী জনতার প্রতিনিধি—
আকস্মিক রাত্রে যখন সব কিছুই বিস্মৃত
যখন কোথাও কোনো স্বাধীনতা নেই, কোনো জীবিত কবি নেই
তখন বাতাস না থাকায় পাখিরা ওড়ে না।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আমার ক্রোধ
যখন শাসানি আসে স্বাধীনতার প্রতি,
আমাদের উষ্ণকারী সূর্যের প্রতি।
পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে এলে কবিও উত্তাপহীন হয়ে যায়
পৃথিবীতে তখন হৃদয় নেই, সুবিচার নেই।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আজকের দিনের
কর্কশ পথে একজন কবিকেই মানুষ তার ভাই বলে চিনবে।
আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে একজন কবিই
সত্যিকারের মানুষ
যদিও কখনো কখনো সে আমাদের বোঝাতে যায় যে সে দেবতা।

সালোমন দে লা সিলভা

বুলেট

যে বুলেট আমাকে হত্যা করবে
সেই বুলেটেরও প্রাণ থাকবে

এই বুলেটের আত্মা হবে একটি গোলাপের মতো
যদি ফুলে গান গাইতে পারে
অথবা সে হবে হলদে মুক্তার সৌরভ
যদি রক্তেরও সৌরভ থাকে;
অথবা সে হবে সঙ্গীতের শরীরের ত্বক
যদি আমাদের হাত দিয়ে
নগ্ন সঙ্গীতকে স্পর্শ করা সম্ভব হতো।

যদি সেই বুলেটটি এসে আমার মাথায় আঘাত করে
তবে সে বলবে, "আমি দেখছিলাম তোমার ভাবনা কত গভীর।"

যদি সে ঢোকে যায় আমার হৃৎপিণ্ডে
তবে সে বলবে, "আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাই,
আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি।"

অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এখনও চালের বাতা দিয়ে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। বাইরে আকাশে ভাঙা মেঘের ফাঁকে চাঁদ এক-একবার উঁকি মারছে, অল্প একটু আলোর হাসি ছড়িয়ে আবার লুকিয়ে পড়ছে, খোঁয়াড়ে মুরগিগুলো একবার ডানা ঝটপট করে তারস্বরে ডেকে উঠল। নিশ্চয়ই শেয়াল কাঞ্চির বেড়া পা দিয়ে সরাতে শুরু করেছে।

পুটি আজ দুপুরে বেলা বাপের বাড়ি গেছে। ওর বাবার ভীষণ অসুখ, যায়-যায় অবস্থা। নবীনঠাকুরপো ওকে রেখে আসতে গিয়েছে। স্বামী বললেন, তুমি একটু সামলে-সুমলে থাক বড়বউ, আমি এই এলাম বলে।

আমি জানি, আসি বললেই আসা যায় না। পাকা ধানের ক্ষেতে চোর পড়ছে আজকাল। জন-মজুর নিয়ে স্বামী যাচ্ছেন পাহারা দিতে। হয়ত চৌপর রাতই কেটে যাবে। এ রকম কত দিনই হচ্ছে। তুমি যে কাজে যাচ্ছ যাও, আমার জন্য অত চিন্তা করতে হবে না—আমি বললুম।

স্বামী একবার চোখ তুলে তাকালেন। তারপর চোখ নামিয়ে নিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল যেন।—চোর না আসুক, ছ্যাঁচড় আসতে পারে।

এলেই বা। আমার ভয় কিসের।

সর্বনাশের।

সর্বনাশের আর বাকি কি আছে? আমার পোড়া কপালে ধান দিলে কি খই ফুটবে?

স্বামী উঠে পড়লেন। অস্থিরভাবে ঘাড়টা নাড়লেন বারকয়েক। তাঁকে আরও বুড়ো-বুড়ো দেখাল। —ভাল করে হুড়কো লাগিয়ে শুয়ো, বুঝলে।

উঠোনে ওদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। মাথায় ছাতা, হাতে লাঠি। ছাতার বাঁটে ঝোলান লণ্ঠনের আলো এঁকে-বেঁকে একটু বাদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কেউ যেন আলোর টুকরোটুকু ময়লা একখানা ন্যাতা দিয়ে নিঃশেষে মুছে নিল।

হুলো। হুলো। আমি ডাকলুম। দূরে কোথায় ম্যাও-ম্যাও আওয়াজ হল যেন। —আয়। আয় বলছি।

আবার বোধ হয় বৃষ্টি হবে। ঝিঁঝি ডাকছে। মশা উড়ছে। গায়ে বসছে। মাথায় বসছে। আঃ। জ্বালিয়ে খেলে। ব্যাঙ ডাকল। তেলের কুপিটা হাতে নিয়ে নিয়ে ঘরে এলাম।

আমার নাম পুতুল। আজ রাত্তিরে আমি গলায় দড়ি দেব। ভগবান যে এত শিগগির আমায় এমন সুযোগ দেবেন, এ কথা ভাবতেই পারিনি। কেউ কোথাও নেই, ফাঁকা বাড়ি। বাইরে বৃষ্টি। নিষুতি রাত। এমন সুযোগ ক'জনার ভাগ্যে মেলে! শুধু আমার হুলো বেড়ালটা সাক্ষী থাকবে। আমি যখন দড়িতে ঝুলব, সে দৃশ্য দেখে হুলোটা আঁতকে উঠে কাঁদবে হয়ত। হয়ত ভয় পেয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে পালাবে।

শুনেছি অপঘাত মৃত্যুর কথা ভাবলে অশরীরী আত্মারা এসে ডাকে—আয়, আসবি না! গত তিন দিন তিন রাত্তির ধরে আমি গলায় দড়ি দেবার কথা চিন্তা করছি। ঘরে লুকোন সেঁকো বিষ আছে। সেঁকো বিষ খেলে নাকি বড় কষ্ট হয়। অত কষ্টে আমি মরতে চাই না। রেললাইনে মাথা দেওয়া যায়।—কত লোক ত দেয়। কিন্তু আমাদের এখান থেকে রেললাইন অনেক দূরে। তা ছাড়া আমার মত সোমত্ত বউ রাত-বিরেতে এক-একা রেললাইনের দিকে গেলে দুষ্টু লোকের

পুতুলের মৃত্যু

শিশির লাহিড়ী

টকটকে। জ্বলছে যেন। আমি বুঝতে পারি শিয়রে-শমন। বাবা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেললেও আমি বলতে পারব না, যতীন আমার গায়ে হাত দিয়েছে. কেবিনে নিয়ে গিয়ে চপ-কাটলেট খাইয়েছে। —আর সে-গুলো খেতে আমার খুব ভাল লেগেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে আমি মিথ্যে বলি, না কিছু করেনি!

হারামজাদী! বাবার সে আর্তনাদ বলির ছাগলের মত করুণ শোনাল।

তারপর মাস খানেকের মধ্যেই বিয়ের ঠিক হয়ে গেল আমার। নিশ্চিন্দিপুরের ছেলে। ভাল বংশ। খেত-খামার চাষ-বাস আছে; নগদ টাকাকড়িও। খুঁতের মধ্যে শুধু দোজবরে। প্রথম পক্ষের বউটা নাকি খারাপ ছিল। পাড়ার একটা লোকের সংগে পালিয়ে গিয়েছে। বাবা বললেন, পালাবে না, ছোট বংশের মেয়ে যে।

মন্থর বলে যে—ভীরুর মত মরতে হবে এমন কোন কথা নেই। বেঁচে আমার সুখ নেই তাই মরে জ্বালা জুড়োব। লম্ফর পোড়া সলতে দিয়ে ভূষ-কালি বের হচ্ছে। আঙুলের ডগে পোড়া টুকরোটুকু ফেলে দিতেই আবার উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে উঠল। আয়নাটা পেড়ে আনলুম। আয়নার দিকে তাকিয়ে আমার নিজের ভয়-ভয় করতে লাগল। —এই আমি কি সেই আমি? আমি ভাবলাম। এলো-খোঁপাটা আঙুলে দিয়ে খুলে দিই। এক রাশ কাল কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল পিঠ ছাড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল।

পারুল বলত, ইস! কি চুল মাইরি। মনে হয় তোর চুলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি। হাতের গুছিতে বাগিয়ে ধরত। —আর কি নরম!

টগরের মা বলতেন, মেয়েমানুষের অত চুল ভাল নয়। লক্ষ্মণ-অলক্ষ্মণ বলে কথা।

আমার মনে হত টগরের মা আমায় হিংসে করেন। টগরের চুল এই এতটুকু, টিকটিকির ল্যাজের মত। বাজারের চুলের ঝারি আর চ্যাপলা খোঁপা কিনে টগর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চুল বাঁধত।

পারুল বলত, নকলি। আর হিহি করে হাসত। তোর সবই কি খোঁপার মত নকলি নাকি! পারুল ওকে রাগাত।

টগর রাগত না। ক'জন আর পুতুলের মত সুন্দর হয়! টগর বলত, সবাই সেজেই বিবি।

আয়নার দিকে চেয়ে আমি থমকে গেলাম। আমি যেন নতুন করে ঝাড়া দিয়ে উঠেছি। আমার শরীরে ঢলঢল যৌবনের বান ডেকেছে। দু কূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছি আমি। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমি যদি পুরুষ হতাম! আমি ভাবলাম।

চিরুনি আলতা, সিঁদুরের কৌটো নামিয়ে আনি। আমি সাজবো। সুন্দর করে সেজে আমি মরব। লোকে দেখলে বলবে, আহা? বিবি মরেছে। পটের বিবি। মরণের কথা যতই ভাবছি তত যেন পুরানো সব কথা মনের মধ্যে উথলে-উথলে উঠছে। আমি যেন কাক-চোখের মত পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের একটা পুকুর। চোখ মেললেই তল অবধি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমি শ্বশুর-বাড়ি চলে এলাম। এ বাড়িতে ভিড় নেই। আমার স্বামী, আমি। দূর সম্পর্কের পিসশ্বশুরের ছেলে নবীনঠাকুরপো আর তার বউ পুঁটি। পুঁটি আমাকে বরণ করে ঘরে তুলল। আমারই সমবয়সী। ছোট্টখাট্ট গোলগাল হাসিখুশী মানুষটি। কেমন যেন একটু আদুরী-আদুরী সুখী-সুখী। পানের পিচে লাল টসটসে ঠোঁট। ছোট-ছোট গোল-গোল চোখ। ঠোঁটের কোণে হাসিটি লেগেই আছে। আর হাসলে গালের মাংসের চাপে চোখ দুটো বুজে আসে।

তোর জন্যে দুঃখু হয় রে পুতুল। পুঁটি বলল।

কেন দিদি?

দিদি কিসের লা? পুঁটি বলবি। সে অনেক কথা। মহাভারত। জান, চেন। নিজেই বুঝতে পারবি। এ কথা কি আর মেয়েমানুষকে বলে দিতে হয় পুতুল!

এ যেন পাঁচিল-ঘেরা ঘুপচি একটা বাগান, আগাছা আর জংগলে ভরা, আর আমার চোখ বাঁধা। আমাকে কানামাছির মত ঘুরে ঘুরে খুঁজে নিতে হবে, জানতে হবে, কোথায় সে রহস্যের চাবিকাঠি। মনটা শংকিত হয়ে ওঠে। ভয়ে কাটা হয়ে যাই, নিজের ওপর রাগ হয়। রাগ হয় সরলা, পারুল, টগরের ওপর। কেন মরতে ওদের কথা শুনে যতীনের সংগে সিনেমা গিয়েছিলাম। যতীনটা আমার কাল।

নবীন ঠাকুরপো হা-হা করে হেসে উঠল। —কি? কেমন বউঠান? কেমন [illegible]ছে?

ভালই।

মুখে চুকচুক শব্দ করল নবীন। ইয়া ষণ্ডামার্কা চেহারা, মোষ-কাল রং। মাথায় বাবরি। লাল টকটকে গাঁজা খাওয়া দুটো চোখ। দেখলে কেমন ভয়-ভয় করে।—মুখ দেখে ত মনে হচ্ছে না!

আমি বললাম, কেন?

বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করতে না। সাতটা বাঘে খেতে পারে না এমন চেহারা। কিন্তু এমন লোকের হাতে পড়লে, চেটে খাওয়া ছাড়া যার খাবার উপায় নেই। নবীন আবার হাসল।

রাগে ও লজ্জায় আমার সর্বাংগ জ্বালা করে উঠল। —ইস। বেড়াল কাঁদে মাছের শোকে। আমার জন্যে শোক করতে হবে না। নিজের জন্যে দুঃখ করুন, ঠাকুরপো।

হাত দিয়ে গোঁফে তা দিল নবীন। সে কথা বলতে। নিজের জন্যই দুঃখ বউঠান। যদি সে দুঃখ কোনদিন বোঝ, কাকের মুখে খবর দিও। ছুটে আসব।

ভয়ে আমার অঙ্গ হিম হল। বলতে লজ্জা করে না আপনার।

নবীন বলল, লজ্জা নারীর ভূষণ।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে পুঁটি এগিয়ে আসে! তখন ও কি বলছিল রে পুতুল?

আমি হেসে রাগাই। কেন, সন্দ হয় নাকি?

পুঁটি চোখ ছোট-ছোট করে। ওর মুখে ভাঁজ পড়ে। কাছে এসে চুপিচুপি বলে, খুব সাবধান পুতুল। ও মানুষটা ভাল নয়।

ভাল নয় ত ওকে অত ভালবাসিস কেন?

কি যে বলিস। আমি কি বাসি, ওই ভালবাসিয়ে নেয় যে। মানুষ নয়, ডাকাত। একটু রেগেছ, মুখ গোমড়া করেছ, তার কি জো আছে না! বানের মত ভাসিয়ে নে যাবে না। তোর কাছে লজ্জা কিসের। একবার যদি পাঁজাকোলা করে জাপটে ধরে, মাইরি বলছি, শিরদাঁড়া পর্যন্ত শিরশির করে ওঠে।

আমার গায়ের মধ্যে রি-রি করে উঠল। একটা অসাড় চেতনার বিন্দুতে কে যেন হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। নবীনের দু হাতের বেড়াজালে ঘেরা পুঁটির আদর খাওয়া শরীরটা মেনি-বেড়ালের মত ফুলে ফুলে উঠছে। মুখ দিয়ে শুধু গর-র-র আওয়াজ হচ্ছে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কানে।

পুঁটি বলল, তোর কি ভয় হল না! অমন ভাম মেরে তাকিয়ে আছিস কেন? মাইরি বলছি, ওর হাতে মরেও সুখ আছে।

আমার মরেও সুখ নেই। বেঁচেও না। এ এক অসহ্য জীবনমৃত অবস্থা। কি জন্য মরব আমি? কি জন্যে বাঁচব? দু বেলা রাঁধা ভাত, সোম বচ্ছরে দু-চারখানা কাপড় আর আঁচলের খুঁটে চাবির রিং বেঁধে বাক্স-প্যাটরা সামলাবার জন্যে কি আমার জন্ম? আহা! পুঁটির কি বরাত। পুঁটিকে আমার হিংসে হয়।

মাসখানেক বাদে আমি বাপের বাড়ি চলে এলাম। অষ্টমঙ্গলায় আসা হয় নি। এবারও আসা হত না। একরকম জোর করেই এলাম। নিশ্চিন্দিপুরের আকাশটা কালি-লেপা, বাতাসে বিষ। স্বামী, শ্বশুরবাড়ি আমার যেন প্রাণের ওপর উঠছিল।

ওরা তিনজনে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। এ ওর চোখে দেখল।

টগর বলল, দাঁড়া দেখি। দু দণ্ড চক্ষু সার্থক করি। থুতনিতে আঙুল রাখল।

মুখ তোল। ও মা! কি হাল হয়েছে পুতুল। চোখের কোলে কালি। মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। বলি, ক' রাত্তির ঘুমোসনি লা।

ওরা হাসল। পারুল জড়িয়ে ধরল।
—এ কি রে পুতুল, অমন শক্ত বাঁধুনি আর এরই মধ্যে এই। এ যে যজ্ঞি বাড়ির ময়দা, ময়ান দিয়ে ঠাসা।

আমার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।
—কি হচ্ছে কি? ইয়ার্কি?

না, ইয়ার্কি করবে না। পুজো করবে। সরলা বলল।

ঢং! এখন বল দেখি।

কি বলব?

আহা-হা! ন্যাকা!

বলার কিছু নেই।

টগর চোখ মটকায়। হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বলার না থাকে, বানিয়ে বল। ঠোঁটে আঙুল রাখে।

নিতান্ত চোর-চোর চাহনি, আমার স্বামীর বোকা-বোকা সেই মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সেই জ'লো, বাসী পান্তাভাতের মত নরম আর ভ্যাদ্-ভেদে অনুভূতিটার স্মৃতি মনে হতেই বিতৃষ্ণায় আমার সারা শরীর ঘুলিয়ে উঠে। মনে হল, বমি হবে। চোখে অন্ধকার। আমার মাথাটা ঘুরছে। অকস্মাৎ আমি ওকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলাম। আমার দুঃখ, আমার দৈন্য, আমার লজ্জা আমার কান্না ঢাকল।

টগর বললে—মরণ!

সত্যি আমার মরণ হয় না কেন? আমি ভাবলুম।

বাবা বললেন, অনেক দিন হয়ে গেল মা। চল, এবার দিয়ে আসি।

আমি বললুম—না।

তা কি হয়? নতুন শ্বশুরবাড়ি।

না! না! না! আমি বলি। হয়েছে।

খানিক চুপ করে রইলেন বাবা। মেয়ে-মানুষকে অনেক সইতে হয়। অত অল্পে উতলা হলে চলে। বাবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল বাবার অনেক বয়েস হয়েছে।

পারুল, টগর, সরলা কাঁদল। বলল, ওষুধ কর। সেরে যাবে।

সংসারে যখন কাজ করি, হাসি, গল্প করি তখন কিছু মনে পড়ে না। আজকাল আমার হাতে অখণ্ড অবসর। হাতে হাতে কাজগুলো সেরে নিতে এক প্রহরও বেলা যায় না। চারটে মানুষের রান্না তাতে কি ই বা সময় যায়। তার ওপর পুঁটি আছে। সারা দুপুর শুয়ে গড়িয়ে বিন্তি খেলে কাটতে চায় না। সন্ধ্যেবেলা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই সন্ধ্যে কাবার। স্বামী যান জন-মজুর নিয়ে ক্ষেত পাহারা দিতে, সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া কোন কাজ থাকে না। পাশের ঘরে ওদের খুন-সুঁটি শুনি। [illegible] বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ে। নবীন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসে। সে হাসিতে কানে তালা ধরে। মাথার তলায় হাত মুড়ে আড়কাঠের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকি। চোখ জ্বালা করে। চোখে গরম মোমের ফোঁটা পড়ে যেমন রগরগে জ্বলে, ঠিক তেমন। শুয়ে শুয়ে হৃৎকম্প শুরু হয়। দোরে ভাল করে হুড়কো এঁটে দিই, তবু গা ছমছম করে। মনে হয় আমার আশপাশে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। বড়ো বড়ো দুটো গোঁফ আর দাড়ি আমার বুকে-পাঁজরে ছোঁয়া দেয়। তারপর আর ঘুম হয় না। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। জেগে উঠে পিদিমের সলতে উসকে দিই। [illegible] শব্দ পেয়ে হুলো বেড়ালটা লাফ মেরে পালিয়ে যায়। আর আমি জেগে বসে থাকি। আর আমার সব মনে পড়ে। পুঁটি অসাড়ে ঘুমোয়। ঘুমোলে ওর নাক [illegible]।

স্বামী বললেন, শোবে না?

আচ্ছা, গণ্ডারের শিং কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?

গণ্ডারের শিং! স্বামী আশ্চর্য হলেন, কেন?

গণ্ডারের শিং রোজ একটু একটু শিলে ঘষে মধু মেড়ে খেলে এ অসুখ সেরে যায়।

সে কোথায় পাব। স্বামী বিমর্ষ হলেন।

তবে আফিম ত খেতে পার? আমি রাগি।

বেশ! তাই হবে। স্বামী পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন। নাকের ডগের কাঁচাপাকা চুলটা নিশ্বাসে নিশ্বাসে উড়তে থাকে। নিস্তরঙ্গ বুকটা ওঠাপড়া করে। কি শান্ত। কি নিরুদ্বিগ্ন। আর আমি? আমার বুকটা হাপরের মত ফোঁসে। সারা শরীরে একটা দুরন্ত ইচ্ছা বারবার সাপের কুণ্ডলীর মত পাকিয়ে ওঠে। আমার চোখ ভিজে আসে। আচ্ছা, আমি কি? আমি সধবা? কুমারী? না বিধবা? আমি ভাবি।
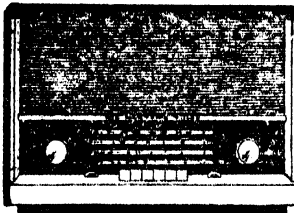
পুঁটি ঘুমোয়। ওর স্বচ্ছন্দ নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। কি সুখে! কি তৃপ্তি। জানালা ধরে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরের অন্ধকারে চেয়ে থাকি; যদি কোথাও কোনও আলোর রেখা চোখে পড়ে। ঘুমন্ত স্বামীর দিকে চেয়ে আমারা গা ঘিনঘিন করে। বিছানায় শুতে ঘেন্না করে। শুলে বোধ হয় আবার নাইতে হবে। মেঝেয় পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখি। গুণ্ডরা আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে যেন। ইয়া দশাসই চেহারা। মোষ-কাল রং। মাথায় বাবরি। পাকান গোঁফ, গুণ্ডার সর্দার। গাঁজা খাওয়া লাল দুটো চোখ। ঠিক যেন নবীনঠাকুরপো। হাতে রক্তমাখা তলোয়ার। সেই তলোয়ারখানা ফণা-ধরা সাপের মত হিলু হিলু করে আমার চোখের সামনে দুলছে। আমার অঙ্গ হিম। নিশ্বাস আটকে আসছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আর আমি যেন পাগলের মত বলছি, আমায় কেটে ফেল। শেষ করে দাও। একেবারে শেষ করে দাও।

পুঁটি হাসে। —বমি করছিস। যাক বাঁচলুম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তোর দেওর বলে—

কি বলে।

সে কথা শুনে আর দরকার নেই।

নবীনঠাকুরপো গোঁফে তা দিল। —বাঃ। বেশ। সুখবর পেলাম। বলি খবরটা সত্যি?

আপনি কি একাই কাজের কাজী নাকি?

হা-হা করে হেসে উঠল নবীন। আর সে হাসিটা চোখে মুখে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে গ্রীষ্মের দিনে ধান-কাটা ক্ষেতে রোদ্দুরের হলকার মত নেচে নেচে বেড়াল। —বুঝলে বউঠান, মুখের স্বাদে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া আর ক্ষিধের ঝোঁকে ছাই-পাঁশ গিলে পেটে ভরানোয় অনেক তফাত।

তাই নাকি।

মুখে চুকচুক শব্দ করল নবীন।

ছোটলোক। আমি বলি।

তা যাই-ই বল। নবীন হাসল।

ইতর কোথাকার। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বলি। আমার নিজের কানেই বেসুরো ঠেকল কথাটা। এ যেন একান্ত উত্তাপবিহীন, নিতান্ত কথার কথা।

আমার বাচ্চা হল। এই এতটুকু এক চিলতে সলতের মত বাচ্চা। ফ্যাকফেকে সাদা, বমি-তোলা দুধের মত রং। ঠিক যেন ওর বাবা, বিবর্ণ কৃশ।

সুতো-বাঁধা নাইকুণ্ডলে তেল দিয়ে রোদ্দুরে দিতে দিতে মোক্ষদা ধাই বলত মেয়ে যা একখানা হবে না! মাথা ঘুরিয়ে ছাড়বে।

তুই থাম। মস্করা করিস নে। আগে বাঁচুক।

কিন্তু আমার অত সাধের মেয়ে বাঁচল না। একদিন সকালে ককিয়ে নীল হয়ে গেল। তারপর সব শেষ। আমি আছড়ে পড়লুম।

প্রথম কয়েকটা দিন খুব খারাপ কাটে। তারপর গরম দুধ যেমন ধীরে ধীরে জুড়োয়, মন তেমন জুড়িয়ে গেল। শোকের ওপর একটা পাতলা সর পড়ছে যেন। কেবল যখন বুকেটা টনটন করত, বুকের দুধটা গেলে গেলে ফেলে দিতে হত, তখন আমার চোখের জল বাধ মানত না। পাতলা-পাতলা নরম দুটো ঠোঁটে এই দুধ-টইটম্বুর মাইয়ের বোঁটা ধরে মেয়েটা আপ্রাণ টানত আর হাঁফাত। আহা! বাছা রে আমার! আমার কিছু ভাল লাগত না তখন। মনে হত, কোথাও চলে যাই। দু চোখ যেদিকে চায়।

তুই যে একেবারে গুম খেয়ে গেলি পুতুল, পুঁটি বলে, অমন করলে ঘর-সংসার চলে।

কি করব বলতে পারিস?

কেন? সহজ হবি। হাসবি। খেলবি। আবার সব হবে।

ছিঃ! তা হয় না রে পুঁটি। সে লজ্জা, সে ঘেন্না তুই বুঝবি না।

পুঁটির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

ধরা গলায় সে বলল, তুই মর পুতুল, মর। সেটা পালিয়ে বেঁচেছে, তুই মরে জ্বালা জুড়ো।

রাত কত! বোধ হয় এক প্রহর। খুব নির্জন লাগছে। আর নয়, আর দেরি নয়। শেয়াল ডাকছে। বৃষ্টির ধরন হয়েছে। আঃ ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস জানালা দিয়ে গলগল করে ঢুকছে। আকাশে ছাড়া-ছাড়া কাল-কাল মেঘ। চাঁদের আলোটা খ্যাপলা জালের মত এক একবার ছড়িয়ে দিচ্ছে আবার গুটিয়ে নিচ্ছে কেউ। বাইরের দিকে তাকালুম। একবার চোখ ভরে প্রাণ ভরে দেখে নিই। —আর কোনদিনও দেখতে পাব না। —আজ এখুনি আমি গলায় দড়ি দেব। আজ নিয়ে তিন-দিন তিন-রাত্তির আমি গলায় দড়ির কথা ভাবছি। শুনেছি অপঘাত মৃত্যুর কথা ভাবলে অশরীরী আত্মারা এসে ডাকে,—আয়! আসবি না! —ওঁয়া! ওঁয়া! ওই বুঝি খুকি ডাকছে। অনেকক্ষণ খেতে না পেয়ে নেতিয়ে পড়া খুব মৃদু একটা করুণ সুর। আসছি রে, আসছি! আমি ভাবি। জলে ভেজা হুলো বেড়ালটা কাঁদছে। ম্যাঁও! ম্যাঁও পোড়ো মন্দিরটার কোটরে বসে লক্ষ্মীপেঁচাটা ডাকছে। একটা ছুঁচো। কিচকিচ করতে করতে ছুটে পালাল। ছুঁচো দেখলেই হাসি পায় আমার। ছেলে-বেলায় পাজী লোককে ছুঁচো বলতাম আমরা। খুব টেনে টেনে সরু সরু করে ছুঁ-চো-ও-ও। আমি হাসলাম। আয়নায় মুখ দেখলাম একবার, আর একবার। আর একটুখানি। তারপরই দু' একবার হাত পা ছুঁড়ে নিস্পন্দ হয়ে যাব। আমার এমন সুন্দর শরীর, বড় বড় চোখ, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, ঢল ঢল যৌবন কিছুই থাকবে না। আমি মরে যাব।

পুঁটি তুই আমায় ক্ষমা করিস। আমি চললাম। পরনের শাড়িটা খুলে পাকাই, বাতার ওপর টাঙিয়ে দি। দরজাটা নড়ে উঠল। বাতাস বোধ হয়। খুব জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে। ঝড় উঠবে নাকি। ও মা। আবার বৃষ্টি নেমেছে। জানলা দিয়ে ছিট্-পিট্ করে জলের ফোঁটা ঢুকছে। লম্ফর শিখাটা ফরফর করে কাঁপছে। এই বুঝি নিবে যাবে।

দরজাটা আবার নড়ে উঠল। ভয়ে বুকটা ধড়াস ধড়াস করল। নিশ্বাস থমকে দাঁড়াল। —কে? আমি বললুম। আমার গলার স্বর কাঁপা-কাঁপা ভীতু-ভীতু শোনাল।

আমি। খুব চাপা গলায় কে যেন ফিস-ফিস করল। —দরজা খোল।

আসছি, দাঁড়াও।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

শাড়িটায় গিঁট দিলাম আমি। ওরা এসেছে। আমাকে নিতে এসেছে। আর ভয় করছে না। এখন আমি স্থির। নিশ্চল, নির্ভয়, নির্ভীক।

দরজাটা আবার নড়ে উঠল। —কে?

আমি।

আমি চমকে উঠি। না, না। আমি খুলব না। আমার গলা ধরে যাচ্ছে। আমার হাত কাঁপছে। পায়ে সাড় নেই। সমস্ত শরীর অজানা একটা ভয়ে ও রহস্যে অবশ হয়ে আসছে।

দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ হয় যেন। —খোল, খোল বলছি।

না, না। আমি চিৎকার করে উঠি। বাজ পড়ল। কড়-কড়-কড়াৎ। দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। হাওয়ার ঝাপটা লেগে তেলের কুপিটা নিবল। অন্ধকারে আমরা মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

আমার চেতনা লোপ পাচ্ছে। কি অসহ্য সুখ! কি দারুণ ক্লান্তি! শিথিল আমার সর্বাঙ্গ অসহ্য পুলকে মাছের পাখনার মত তিরতির করে কাঁপছে। মেনী বেড়ালটার মত ফুলে ফুলে উঠছি আমি, গলায় গর-গর আওয়াজ হচ্ছে। আমার বুকে ঘাড়ে, হাতেপায়ের খাঁজে ঘামের ফুঁড়ি ঘামাচির মত পুটপুটে করে ফুটেছে। আমার চোখ মুদে আসছে। অনেক আলোর অন্ধকারে আমি সুখে কাঁদছি।

বাইরে দূরে কোথাও কেনেস্তরা বাজানর শব্দ হল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। —আমি যাই।

না, না' তুমি যাবে না। আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমার গলার সুর কান্নায় ভাঙা শোনাল।

না, আমায় যেতেই হবে। ও বলল।

পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল, আমি শুয়ে শুয়ে শুনলাম। আমি রিক্ত, আমি পূর্ণ। আমি হৃতসর্বস্ব, আমি সুখী। আমি ভাবলাম। —আমি কেন মরব? কেন? কেন? আমি বাঁচতে চাই। আমি চিৎকার করলাম। আমার সে চিৎকার ভিজে দেওয়াল, ভিজে মাটি, ভিজে বাতাসে মিশে একটা অন্তবিহীন শব্দতরঙ্গের অস্ফুট ধ্বনির মত মিলিয়ে গেল। এত সুখ! এত আনন্দ! এত আলো! এত হাসি জীবনে! আমি মরব না। আমি মরতে চাই না আমি বাঁচব। আমি বাঁচব। আমি বাঁচলেম।

বাইরে [illegible] ভোর, ফিনকি দিয়ে আলোর ফোয়ারা ফুটেছে। আঃ! কি শীতল বাতাস! আমার গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। হাই উঠছে। চোখের পাতা জুড়ে আসছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। ঘুম পাচ্ছে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার। কতকাল আমি ঘুমোইনি। অশরীরী আত্মারা, তোমরা যদি এসে থাক, একটু দাঁড়াও। আজ আমাকে একটু ঘুমোতে দাও। শুধু একটিবার।

কলকাতার ডায়েরি

রেণু দেখেই চিনতে হয় কোন্‌টি মৃগেল, কোন্‌টি রুই, চিনতে হয় মাল জলংগী, না ভাগলপুরের।

ওরা আসে লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে। আসে জলংগী, লালগোলা ভাগলপুর, মুঙ্গের, মেদিনীপুর থেকে। ভিড় জমায় হাওড়ার হাটে, বৈঠকখানা বাজারে। সেখান থেকে পাড়ি দেয় ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ। কিছু যায় শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুরের নারসারিতে। সেখানে এক ইঞ্চির পোনা হয়ে আবার যায় অন্য হাটে।

মাছের আগে পোনা, পোনার আগে রেণু, রেণুর আগে ডিম। এই ডিমের হাট এক আজব জায়গা। ইতালির মুদ্রা লীর পেনিসিলিন ইনজেকশনের মত লাখ-কোটি সেখানে কিছুই না। কত বিচিত্র রকমের খদ্দের, কত বিচিত্র দোকানদার। কারবার মোটে তিন মাসের—জুন, জুলাই, আগস্ট, কিন্তু এরই মধ্যে লেনদেন হয়ে যায় এক কোটি টাকার। বর্ষা গেলে আবার হাট ফাঁকা। হাঁকডাক, চেঁচামেচিতে 'গমগমাট' গোটা এলাকায় কেবল পড়ে থাকে সার সার খুপরি ঘর আর ভাঙা হাঁড়ি।

কথা বলছিলাম, ত্রিপুরার ফিশারি ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার শ্রীক্ষিতীশবর সাহার সঙ্গে। প্রতি বছর এই সময়েই তিনি আগরতলা থেকে কলকাতা আসেন মাছের রেণু কিনতে। ফিশারিজ করপো-রেশনের এজেণ্ট ফিশ সীড সিন্ডিকেটের অফিস আছে হাওড়ায়। তারই মারফত রুই-কাৎলা-মৃগেলের তিন কোটি রেণু প্রতি বছর কিনে নিয়ে মাছের জোগান দেন সারা ত্রিপুরায়।

সাহা-ই বললেন,—"ত্রিপুরাতে পাহাড়ী নদী, মাছেরা ডিম ছাড়ে খানিক সমতলে, পাকিস্তানে। আগে পাকিস্তান থেকেই মিটত সব চাহিদা, এখন পাকিস্তানের সঙ্গে কারবার বন্ধ, তাই ছুটতে হয় কলকাতায়। আমাদের দরকার ছ' কোটি ডিমের, আমরা নিজেরা বানাই তিন কোটি, বাকি তিন কোটি নিতেই বছর বছর আসতে হয় হাওড়ার হাটে, বৈঠকখানার বাজারে। তিন কোটি নিজেরা বানাই কী করে? মাছের পেটে ইনজেকশন দিয়ে। জানেন বোধহয়, কাৎলা মাছের উপর এই ইন-ডিউসড ব্রিডিংয়ের আবিষ্কর্তা একজন বাঙালী—নাম ডক্টর হীরালাল চৌধুরী, দিকপাল মৎস্যবিজ্ঞানী।

বিশেষ ধরনের হাঁড়িতে মাছের ডিম হাটে আসে নানা রকমের। তবে কাৎলাই বেশী। ভেজাল ছাঁটাই করে আসল পোনা বের করে নিতে হয়। সরেস ডিম জলংগী আর ভাগলপুরের। মাল বুঝে দাম। সত্তর টাকা থেকে হাজার টাকা কুনকে। হাওড়ার আট বাটিতে এক কুনকে, বৈঠকখানায় চার বাটিতে। এক এক কুনকেতে মাছের রেণু থাকে কমসে কম দু লাখ। আমরা রেণুই নিই। অন্য স্টেট নেয় পোনা। রেণুগুলো নিয়ে ছাড়ি নিজেদের নারসারিতে। সেখানে পোনা বানিয়ে বিক্রি করি, এক হাজারের দাম বার টাকা। নিই কেমন করে? প্লাসটিকের ব্যাগে জল আর অক্সিজেন দিয়ে রেণু পুরি। ব্যাগ থাকে টিনে। টিনে থাকে কলের জল আর এক গ্লাস পানিওয়ালা গংগাজল। তাতে মাছের রেণু বাঁচে চব্বিশ ঘণ্টা। ভাড়াটাড়া নিয়ে সব মিলিয়ে এক কুনকে মাছের দর আমাদের পড়ে পড়ে তিন শ' পঞ্চাশ টাকা। গত

যায় নিয়ে গিয়েছি পঁচাত্তর কুনকে, এবার নিতে এসেছি একশ'। এক কুনকের জায়গা হয় আটটি টিনে। যা নিয়ে যাই, বাঁচে তার অর্ধেক।"

রোজ মাছ না হলে আমার চলে না! আমার দৌড় বড়জোর মাছের বাজার পর্যন্ত। তাও কদাচিৎ। বড় মাছের গোড়ায় আরও যে কত রকমের ছোট ঝকমারি, জানা ছিল না। রাহা-র মুখে মৎস্য-পুরাণ শুনে ফের জানতে চাইলাম ত্রিপুরায় মাছের দাম কত, পাওয়া যায়ই বা কেমন?

রাহা বললেন, আপনার প্রশ্নের ভিতরের প্রশ্নটা বুঝেছি। আমরা যদি এত আয়োজন না করতাম, তাহলে মাছের দাম হত আরও বেশী, মাছও পাওয়া যেত আরও কম।

*

বাংলা থিয়েটারের দৌলতে বিদেশীর মুখে যে-বাংলা এতদিন শুনে এসেছি, তারই কৃপায় আমরা ধরে নিই বিদেশী-মাত্রেই ওই উচ্চারণে এদেশী কথা 'বলেন'। ত-কে, ট, দ-কে, ড এবং যত্রতত্র ওঙ্কার সংযোগ করে স্টানডার্ড একটি ইউরোপীয় বাংলা চালু হয়ে আছে। তাই যখন কোন বিদেশীর মুখে বাংলা শুনি, তৎক্ষণাৎ ধরে নিই ও'রা প্রত্যেকেই এক একজন মূর্তিমান কারভালো, লালী, রডা লরেন্স ফসটর।

ধারণাটা মিথ্যেও নয়। বাংলা দেশেরই এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু দিন আমি বিদেশীদের বাংলা শিখিয়েছি। দেখেছি ত-বর্গের প্রথম চারটি বর্ণ ওদের মুখে হিন্দুর কাছে গোমাংসের মতন, কিছুতেই জিভে লাগে না। জার্মান হলে কথা নেই, গ-কে ক, চ-কে খ করার দিকে ও'দের আবার বাড়তি ঝোঁক। ইংরেজরা আরও এক কাঠি বাড়া। অন্ত্য-র উচ্চারণের সঙ্গে ও'দের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। 'আমার বাড়ির পাশের পুকুর' ওদের উচ্চারণে সংক্ষেপিত 'আমা বাড়ি পাশে পুকু।'

এত ভনিতার কারণ একজন রুশী ভদ্রলোক। বহু বিদেশীর মুখে বাংলা শুনেছি, কিন্তু কমরেড গুরেগেনভের মত কেউ নন। চমৎকার তাঁর উচ্চারণ। শব্দের অন্ত্য-র পরিষ্কার, ত-য়ে ট-য়ে, দ-য়ে ড-য়ে মেশামেশি নেই। বাংলা শিখেছেন কোথায়? না কলকাতায় নয়, স্বদেশে, খাস রুশ মুলুকে।

গুরেগেনভ কলকাতার রুশ দূতাবাসের বার্তা-প্রধান, অমায়িক, বন্ধুবৎসল। সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশী হই শুধু এই কারণে নয় যে আমার স্বভাষাপ্রীতি অত্যধিক। আসলে অ-ইংরেজ কোন বিদেশীর সঙ্গে তৃতীয় ভাষা ইংরেজীতে কথা বলা আমার কাছে কেমন যেন ঠেকে। যেহেতু আমি রুশী জানিনা, তাই গুরেগেনভের সঙ্গে অবাধে অনর্গল বাংলা বলতে পেরে স্বস্তি পাই, ভাল লাগে।

সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্রে গুরেগেনভের আগ্রহের কথা জানা ছিল, জানতাম না ফুটবল খেলায়ও তাঁর সমান আগ্রহ। সেদিন আমাদের অফিসে এসে হাজির, এসেই প্রথম প্রশ্ন : খেলার কী খবর, রেজাল্ট কখন আসে?

সেদিন ছিল চিলির সঙ্গে রাশিয়ার খেলা। গুরেগেনভের প্রশ্নে উৎকণ্ঠা ছিল। বললাম,—কী, রাশিয়া জিততে পারবে তো?

গুরেগেনভ দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে কাঁধটা খানিক তুলে জবাব দিলেন,—"জানিনা কী হবে, কেবল ভগবানই বলতে পারেন।"

ঈশ্বর পদে সমর্পিত এই মার্কসবাদীর ডাক কমরেড ভগবান শুনেছিলেন। সে খেলায় রাশিয়া জিতেছিল।

*

এই প্রথম বিদেশ যাত্রা, তাই উত্তেজনা বেশী। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে আগস্ট মাসে হচ্ছে পূর্ব-পশ্চিম আন্তর্জাতিক গার্ল গাইড সম্মেলন। তাতে এবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিন তরুণী—কলকাতার সুনন্দা ঘোষ, এলাহাবাদের সুধা সিং এবং মহীশূরের গীতা মীরজাংকর। সেদিন এক অনুষ্ঠানে ওদের সম্বর্ধনা জানানো হল।

কুমারী সুনন্দা লরেটোর ছাত্রী, দু বছর গার্ল গাইড হয়েছেন। গত ডিসেম্বরে সিনিয়র কামব্রিজ পাশ করেছেন। নাচতে জানেন, গাইতে জানেন, বাজাতেও পারেন। নাচ-গানে স্বদেশী—শাস্ত্রীয় নৃত্য ও রবীন্দ্র সংগীত। বাজনায় বিদেশী। পিয়ানোয় তাঁর হাত চমৎকার। তাছাড়া ছবি আঁকা ও সাঁতার কাটায়ও শখ।

কুমারী ঘোষ আমেরিকা অর্থাৎ হনলুলু যাচ্ছেন। সেখানেই সম্মেলন। জানতে চেয়েছিলাম সেখান থেকে খাস আমেরিকায় যাবেন কি না। না, যাবেন না।

অর্থাৎ নামেই আমেরিকা, তাঁর এই সফর শুধু আন্দামানে গিয়ে ভারত দেখার মত। তা হোক, হাজার দূর হলেও হাওয়াই তো মারকিন যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি অংগ রাজ্য।

—চাণক্য

জাতিভেদ প্রথা : বাংলার গ্রাম সমাজে

তারাশিস মুখোপাধ্যায়

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল অঞ্চলে বসবাস করেন ৩৪,৯২৬,২৭৯ জন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে তফসিল-ভুক্তদের সংখ্যা হইল ৬,৮৯০,৩১৪ ও আদিবাসী ২,০৫৪,০৮১ জন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই হইল গ্রামবাসী। বর্ণহিন্দু, তফসিল বা অবনত হিন্দুজাতি, আদিবাসী ও মুসলমানেরাই জনসমষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশ।

জাতিগুলির শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে জাতি-তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। 'বাঙ্গালার কুলজী সাহিত্য অনুসারে জাতি শব্দের অর্থ বৃত্তি—ব্যবসায়—জীবিকা।' জাতি-বিভাগের প্রকৃত তাৎপর্যই হইল বৃত্তিগত শ্রেণী-বিভাগ। এখানে কর্মের ভিন্নতাই বর্ণের বিভিন্নতা প্রকাশ করে। সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ, তাহার মূলে আছে অপরের নিকট নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও জাত্যভিমানকে প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা। ফলে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, জলচলনীয়, অচলনীয় ইত্যাদি নানা সংস্কারের প্রাধান্য। আর ইহার ফলে মধ্যযুগে বাংলা দেশের একাধিক নিম্নবর্ণের লোকেরা যে সমাজ ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য।

১৯০১ সালে রিজলে ও গেট সাহেব বাংলা দেশের জাতিগুলির পদ-মর্যাদা ও শ্রেণী-বিভাগ লইয়া বিবাদ দূর করিবার উদ্দেশে সরকারের পক্ষ হইতে সচেষ্ট হন। ফলে বিভিন্ন জাতির লোকেরা সভা-সমিতি ও পুস্তক প্রকাশনের মাধ্যমে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেন। পরে ১৯২১ সালের আদমসুমারী গ্রহণকালে অনেকেই নিজেদের 'ক্ষত্রিয়', 'বৈদ্য ব্রাহ্মণ', 'সাবিত্রী ব্রাহ্মণ', 'মাহিষ্য', 'সভাসুন্দর' প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। এমন কি অনেকে উপবীত গ্রহণ করিয়াও নিজেদের আভিজাত্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এখনও 'মাহিষ্য-সমাজ', 'তিলি-সমাজ' প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সভা-সমিতি ও পত্রিকা প্রকাশনের মাধ্যমে আপন আপন মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রেণী-বিভাগের বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু সমাজে শ্রেণী-বিভাগের মূলে রহিয়াছে বিশেষ একটি জাতির জাতীয় পেশা বা জীবিকা। বর্তমানে প্রাচীন নীতি অনুসারে পুরুষানুক্রমিক বৃত্তির উপরে নির্ভর করিয়া অনেক স্থলেই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয় না। তাই আজ মানুষের জীবিকা নির্বাচনের প্রশ্নে বর্ণাশ্রমের কঠোরতা শিথিল হইয়াছে। কিন্তু কর্ম নির্বাচনের এই উদারতা বর্ণ-বিভাগের দৃঢ়তাকে দুর্বল করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা বিচারসাপেক্ষ। এখনও পর্যন্ত বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে জাতি-গত শ্রেণী-বিভাগ প্রাধান্য পাইয়া আসিতেছে। কুলীন-মৌলিক, রাঢ়ী বারেন্দ্র, মেল, গোত্র ইত্যাদির বিচার উচ্চ বর্ণের বিবাহের ক্ষেত্রে মুখ্য স্থান লাভ করে। শুধু তাহাই নহে, আহার্য গ্রহণের মধ্যেও কাঁচা, পাকা, এঁটো ইত্যাদি খাদ্যাখাদ্যের স্পর্শদোষ বিচার, পানীয় জল, ধূমপানের জন্য হুঁকো-কলকে ইত্যাদি ব্যবহারেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোকেরা আজও যথেষ্ট সতর্কতার সহিত সমাজে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে।

শ্রেণী-বিভাগের যে রূপটি পাই তাহার পুরোভাগে আছেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতর অপর জাতিই ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে শূদ্রপদবাচ্য। তবে শূদ্র হইলেও সকলকে তাঁহারা সমদৃষ্টিতে বিচার করেন না।

ব্রাহ্মণের নিম্নেই বৈদ্য ও ক্ষত্রিয়দের স্থান। চিত্রগুপ্তের সন্তান ব্রহ্ম-কায়স্থদের কেহ কেহ নিজেদের ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা নিজেদের দশ সংস্কার সম্পন্ন, উপবীত-ধারণে ও বেদাধ্যয়নে অধিকারী বলিয়া মনে করেন। তবে সামাজিক আচার ও নিষ্ঠায় ইঁহারা ব্রাহ্মণেরই অনুগামী। সাধারণভাবে তাঁহারা উচ্চবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হন।

ইহাদের পরেই সংশূদ্র বা নবশায়ক নামে পরিচিত নয়টি বিশেষ বিশেষ জাতির স্থান। নবশায়ক গোষ্ঠীর পরেই আসে কতকগুলি জলচল শূদ্র। নবশায়কদের নিম্নে স্থান হইলেও উচ্চবর্ণযাজী ব্রাহ্মণেরা স্থানে স্থানে ইহাদের নিকট জল গ্রহণে আপত্তি করেন না। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ইহাদের ব্যবহার নবশায়কেরই অনুরূপ।

জলচলনীয় শূদ্রের পরে আমরা পরিচয় পাই কতকগুলি অ-জলচলনীয় বা মধ্যবর্তী শূদ্রের। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার নিজেদের বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন। উচ্চ শ্রেণী-যাজী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের নিকট হইতে জল গ্রহণ করেন না। পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে তাহাদের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র।

মধ্যবর্তী শূদ্র জাতির পরেই নীচ-শূদ্র জাতির স্থান। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান লক্ষণীয়। নীচ-শূদ্র জাতির মধ্যে অনেকেই আবার তাহাদের সমগোত্রীয় অপর জাতির কূপ হইতে জল ব্যবহার করেন না। পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রেও পরস্পরের ব্রাহ্মণ পৃথক।

জাতিগুলির শ্রেণী-বিভাগের সর্বনিম্নে আসে কয়েকটি অস্পৃশ্য শূদ্র—যাহারা মূলত বনাজাতিদেরই বংশধর। সামাজিক মর্যাদায় অপরাপর হিন্দুদের নিকট তাহারা পতিত। তথাপি উচ্চবর্ণের অনুকরণে তাহাদের সমশ্রেণিভুক্তদের সহিত পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলে।

ইতিপূর্বে শ্রেণী-বিভাগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছি, এক্ষণে সেই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্র যে সীমায়িত, তাহা স্মরণ রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব।

উচ্চবর্ণ

পশ্চিমবঙ্গের সকল স্থানেই ব্রাহ্মণদের উচ্চবর্ণ বলিয়া সম্মান করা হয়। তবে ব্রাহ্মণ এই এক নামে অভিহিত হইলেও ইহাদের মধ্যে অনেক শাখা-প্রশাখা বর্তমান এবং তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদাও স্বতন্ত্র। মহারাজ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদের গুণানুসারে তাঁহাদের কুলীন, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃঃ দেবীবর নানান সংস্রবদোষদুষ্ট ব্রাহ্মণদের ৩৬টি দলে (মেল) বিভক্ত করিয়া দেন।

বর্তমানে ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ীয় শ্রেণী, বারেন্দ্র শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, উৎকল শ্রেণী, (দাক্ষিণাত্য বৈদিক), ব্যাসোক্ত শ্রেণী (গৌড়াদ্য বৈদিক), কনৌজিয়া, ভূঞিহার, গ্রহাচার্য (গণক বা লায়েক), অগ্রদানী, দেবশর্মা, নাগার-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত।

ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইলেও ইঁহারা নিজ নিজ শ্রেণী ছাড়া অন্য কাহারও সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণ সাধারণত সংশূদ্র ও নবশায়কদের পৌরোহিত্য করেন। কিন্তু ব্যাসোক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র মাহিষ্যদেরই পৌরোহিত্য করেন। ইঁহাদের সহিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা একসঙ্গে আহার করেন না। ভূঞিহার ব্রাহ্মণ অন্য কোন বর্ণের পূজা করেন না। ইঁহাদের পূজক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ। ভূঞিহার ও কনৌজিয়া ব্রাহ্মণেরা বাংলা দেশের অপরাপর ব্রাহ্মণ হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র ও উন্নততর বলিয়া মনে করেন; যদিও ভূঞিহার ব্রাহ্মণেরা কৃষি ও ব্যবসার মাধ্যমেই অবস্থাপন্ন। মেদিনীপুর জেলায় বসবাসকারী উৎকল শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা ওড়িয়া সৃষ্টিকরণ ও স্থানে স্থানে নবশায়কদের পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাচকের কাজ ও ভিক্ষার দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করেন। অবশ্য যাঁহারা শিক্ষিত বা অবস্থাপন্ন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এই জেলার নাগার-ব্রাহ্মণেরা বেশীর ভাগই ভাগ্যগণনা, হস্তরেখা বিচার ও তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা কবিরাজী ঔষধের ফেরি করেন। এই ধরনের পেশায় নিযুক্ত থাকিবার জন্য ইঁহাদের সামাজিক মর্যাদা অনেক নিম্নে। ইঁহারা অন্য কোন বর্ণের পৌরোহিত্যে অধিকারী নন। অনিমন্ত্রিত হইয়া ইঁহাদের অনেকেই ভোজনে যোগদান করেন। মেদিনীপুরের জেলার আচার্য ব্রাহ্মণ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করেন। মেদিনীপুর জেলায় আচার্য ব্রাহ্মণকে ঠিকুজি প্রস্তুত, বিবাহের দিন স্থির, প্রথম ঋতুদর্শনের অব্যবহিত পরে গ্রহশান্তির ব্যবস্থা ও নতুন গৃহ নির্মাণের পূর্বে সেই স্থানটিকে সংস্কার করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আচার্যদের পৌরোহিত্য করেন না; সামাজিকভাবে ইঁহারা পতিত। ফলে, শূদ্র জাতির লোকেরাও তাঁহাদের নিকট হইতে পানীয় জল বা রন্ধন করা কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। মেদিনীপুরের দুলে-বেহারারাও আচার্য ব্রাহ্মণদের পাল্কীতে বহন করে না। পশ্চিম দিনাজপুরের দেশী বা বর্তমানে দেবশর্মা বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। আচার-আচরণে তাঁহারা ব্রাহ্মণকে অনুকরণ করিয়া থাকেন মাত্র। ইঁহাদের অধিকাংশই এখনও কৃষিকর্মে নিযুক্ত।

বর্তমানে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূজা-অর্চনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন না। ইঁহারা চাকুরি, ব্যবসায় প্রভৃতি অন্যান্য কার্যে লিপ্ত। জীবিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইলেও স্বগোত্রে বিবাহ, ভূমি-কর্ষণ, কনে-পণ গ্রহণ ও বিধবা-বিবাহ সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ সমাজে এখনও অগৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। পৌরোহিত্যের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধ থাকিলেও স্থানীয়ভাবে কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিধিবহির্ভূত অন্যান্য জাতিগুলিরও পূজা-অর্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন না। এইসকল ক্ষেত্রে আপন আপন শ্রেণীর নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণই পৌরোহিত্যে অধিকারী। এইসকল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াও ব্রাহ্মণদের শ্রেণীগত বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়।

বৈদ্য

প্রাচীনকাল হইতেই বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে যাঁহারা চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাই 'বৈদ্য', 'ভিষক', 'চিকিৎসক' নামে পরিচিত হইতেন। এখনও পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্য জাতির লোকেরা চিকিৎসা বৃত্তিকেই তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ এবং পঞ্চকোটী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। সমাজগত, কুল-মর্যাদাগত ও আচার-ব্যবহারগত কারণে বৈদ্যদের মধ্যে অনেকে উপবীত ধারণ করেন ও নিজেদের বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। শিক্ষা ও ব্যবহারে ইঁহারা উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ হইলেও অন্যান্য

বর্ণের লোকেরা ইঁহাদের সামাজিক মর্যাদা ব্রাহ্মণের পরেই নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন। সামাজিকভাবে ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের সহিত একই পঙক্তিতে আহার করেন না। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরাই ইঁহাদের পৌরোহিত্য করেন।

রাজপুত বা রাজপুত ক্ষত্রিয়

মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে অবস্থাপন্ন রাজপুত-জাতির বসবাস আছে। ইঁহারা সকলেই উপবীত গ্রহণ করেন ও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। সামাজিক আচার-ব্যবহারে ও বিবাহে বাংলা দেশের অপরাপর বর্ণগুলি হইতে ইঁহারা নিজেদের পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলেন। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পৌরোহিত্য করেন। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে তাঁহারা অন্ন গ্রহণ বা এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করেন না। ইঁহাদের জীবিকা কৃষিনির্ভর হইলেও কেহই নিজ হাতে জমিতে লাঙ্গল করেন না। অনেকে আবার ছোটখাট ব্যবসা করেন।

কায়স্থ

পশ্চিমবঙ্গে কায়স্থ জাতি উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহারা নিজেদের ক্ষত্রিয়দের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। কুলীন কেহ উপবীতও ধারণ করেন। কুলীন কায়স্থগণই সমাজে অধিক সম্মানিত হন। শিক্ষা ও সামাজিকতায় কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদের নিকট-অনুগামী। ইঁহাদের মধ্যেও ভূমিকর্ষণ, স্বগোত্রে বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের পৌরোহিত্য করিলেও তাঁহাদের নিকটে ইঁহারা সৎশূদ্রের পর্যায়ভুক্ত। সামাজিক পঙ্‌ক্তিভোজনে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের সহিত কায়স্থদেরও পরিবেশন করা হয়। অবশ্য প্রত্যেকের জন্যই পৃথক-পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকে। যেসকল স্থানে কায়স্থদের বসতি অল্প, সেই স্থানে নবশায়ক ও অপরাপর সৎশূদ্রদের সহিত তাঁহারা একত্রে ভোজন করেন। তথাপি, কেহই তাঁহাদের মর্যাদা অস্বীকার করেন না। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে কায়স্থদের বসবাস উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের বসতি বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা চলে।

নবশায়ক

নবশায়ক শব্দটি কেবলমাত্র বাংলা দেশেই প্রচলিত। নয়টি বিশেষ সৎশূদ্র জাতিকেই নবশায়কের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইঁহারা হইলেন গোপ (সদ্গোপ), মালাকার তিলি তন্তুবায়, মোদক, বারুজীবি, কুম্ভকার, কর্মকার ও নাপিত। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই জাতীয় বৃত্তি স্বতন্ত্র ও সকলেই সমমর্যাদা সম্পন্ন। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের পূজক। কোন কোন অঞ্চলে গোয়ালা, তিলি ও তাম্বুলীগণও নবশায়ক বলিয়া পরিচিত হন। নবশায়ক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পৌরোহিত্যে আপত্তি করেন না। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই পানীয়-জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। গলায় তুলসী-মালা গ্রহণ করা নবশায়কদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

নবশায়কভুক্ত জাতিগুলির মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ বর্তমান। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষিত হয়। মালাকার জাতি দুইটি ভাগে বিভক্ত—ফুলকাটা মালাকার ও দোকানী মালাকার। ফুলকাটা মালাকার শোলার কাজ ও দোকানি মালাকার মুদীখানার ব্যবসা করেন।

মোদকেরা পেশাগতভাবে মিষ্টান্ন-শিল্পী—কিন্তু নাপিত জাতি হইতে উদ্ভূত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মধুনাপিতও নিজেদের ময়রা বা মোদক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। নাপিতের কাজ বা জমিতে নিজেরা লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ না করিবার জন্য ইঁহারা নাপিত অপেক্ষা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দাবি করেন। তবে মোদক বা মুর্শিদাবাদে যাহারা কুরী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা মধুনাপিতকে সমশ্রেণিভুক্ত বলিয়া মনে করেন না।

নদীয়াতে কুম্ভকার জাতির মধ্যে কেহ কেহ শাঁখের কাজে লিপ্ত। ইঁহারা 'লাল শাঁখা' তৈয়ারী করেন। শঙ্খবণিকের কাজ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা শাঁখারি বলিয়া বিবেচিত হন। মৃৎশিল্পী কুম্ভকারেরা তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সচরাচর ইচ্ছা প্রকাশ করেন না।

সদ্গোপেরা প্রধানত কৃষিকার্যে নিযুক্ত। কিন্তু স্থানে স্থানে গোয়ালা জাতির লোকেরা নবশায়কের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইলেও সামাজিক অনুষ্ঠান 'ভারবহন-কার্যে' নিযুক্ত হইবার জন্য তাঁহাদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় না। হুগলী, নদীয়া ও বর্ধমানে ইঁহারা নিজেদের 'যাদব' বলিয়া পরিচয় দেন।

তন্তুবায়দিগের মধ্যে যাঁহারা খই-এর মণ্ড ব্যবহার করেন (খৈয়া তাঁতী বা অশ্বিনা তাঁতী) তাঁহারা ভাত-এর মণ্ড ব্যবহারকারী (ভাতুয়া তাঁতী) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক সম্মানিত। অপর পক্ষে, তিলিজাতি সাধারণত পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী। কিন্তু তৌলিজাতি ঘানিগাছে দুইটি বলদের সাহায্যে তৈল নিষ্কাশন করিবার জন্য সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা পান না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নবশায়ক শ্রেণিভুক্ত সকলেই পরস্পরের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন। হুঁকোতে ধূমপানের যেখানে প্রচলন আছে, সেই স্থানে একমাত্র গোয়ালা ছাড়া অন্য নবশায়ক জাতিগুলির নিকট হইতে হুঁকো গ্রহণ করা চলে। মাহিষ্য, আগুরি, ওড়িয়াসৃষ্টি-করণ প্রভৃতি জলচলনীয় শূদ্রজাতির নিকট হইতেও হুঁকো-কলকে গ্রহণ করা চলে। নবশায়ক ও অন্যান্য জলচলনীয় শূদ্রজাতির আচার-আচরণে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পূর্বে মাসাশৌচ পালন করিলেও বর্তমানে ইঁহাদের অনেকেই পক্ষাশৌচবিধি অবলম্বন করিয়াছেন।

জলচলনীয় শূদ্র

জলচলনীয় শূদ্র জাতির মধ্যে বর্তমানে আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়: মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা ও নদীয়ার মাহিষ্য, পুরুলিয়ার কুর্মীক্ষত্রিয়, মেদিনীপুর অঞ্চলে রাজু, করণ বা ওড়িয়াসৃষ্টিকরণ, কাস্থ বা ল্যাঙ্গলা কায়েত ও বিহার ও ছোটনাগপুর হইতে আগত কোইরিদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রধান উপজীবিকাই হইল কৃষি। নবশায়ক জাতিগুলির প্রত্যেকেরই বৃত্তি স্বতন্ত্র। কিন্তু কৃষিনির্ভর জলচলনীয় শূদ্রদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৃত্তিকে গ্রহণ না করাই একটি বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে শিক্ষার অগ্রগতি হেতু ইঁহাদের অনেকে অকৃষিমূলক জীবিকাতেও নিযুক্ত আছেন।

নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আগুরি, মাহিষ্য ও কুর্মিজাতির লোকেরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। অনুরূপভাবে, মেদিনীপুরের করণ বা ওড়িয়াসৃষ্টিকরণেরা তাঁহাদের নিজেদের কায়স্থ জাতির সমকক্ষ বলিয়া মনে করেন ও জমিতে লাঙ্গল করেন না। করণ কায়স্থদের অনুকরণে ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপবীতও গ্রহণ করেন। ল্যাঙ্গলা কায়েত জাতি প্রকৃতপক্ষে কৃষিজীবী ও জমিতে লাঙ্গল করিয়া থাকেন। কায়স্থদের সহিত ইঁহাদের নামের সাদৃশ্য থাকিবার ফলে তাহারা নবশায়ক অপেক্ষা নিজেদের উচ্চ বলিয়া মনে করেন। বাংলা দেশে বোষ্টম বা বৈরাগী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা আবার আচার-আচরণে নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করিলেও—জলচলনীয় শূদ্রেরই অন্তর্গত। কারণ, অসামাজিক মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মলাভ করে, তাহারা আসলে শূদ্র, যদিও তাহাদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। তবে ইঁহারা লাঙ্গল করেন না। হরিসংকীর্তন ও সৎ আচার-ব্যবহারের জন্য ইঁহাদের সম্মান করা হয়। ইহা ছাড়াও, সৎশূদ্র ও জলচলনীয় শূদ্রদের মধ্যে কেহ কেহ পঞ্চম সংস্কার ও দশম সংস্কারের নিয়মগুলি পালন করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। ইঁহাদের বলা হয় অধিকারী বৈষ্ণব। ইঁহারা অজলচল

শূদ্রদের সত্যনারায়ণ পূজা ও গুরুমন্ত্র দিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদের সমাধি বা সমাজপূজায় ইঁহারাই পৌরোহিত্য করেন। সামাজিক নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈষ্ণবদের ভোজন করানো একটি পুণ্য কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণভাবে বৈষ্ণব বা বোষ্টমেরা অপরাপর জলচল শূদ্র অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে জলচলনীয় শূদ্রদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিয়োগের বিধান আছে। যেরূপ, মাহিষ্যদের ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ, করণ বা ওড়িয়া-সৃষ্টিকরণদের উৎকল ব্রাহ্মণ ও আগুরিদের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন। স্থানবিশেষে তাঁহারা নবশায়কদের ন্যায় মর্যাদা পাইয়া থাকিলেও কুর্মি ও কোইরিদের সম্বন্ধে বেশীর ভাগ অজলচল শ্রেণীর লোকেরাই বিরূপ ধারণা পোষণ করেন।

অজলচলনীয় শূদ্র বা মধ্যবর্তী শূদ্র

জলচলনীয়দের পরেই অজলচলনীয় শূদ্রের স্থান। ইঁহাদের মধ্যে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক, মণিকার ও সুবর্ণবণিকেরাই প্রধান। বংশানুক্রমে ইঁহারা ব্যবসায়ী। ইঁহারা নিজেদের বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন। নবশায়ক জাতি হইতে ইঁহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পূজার্চনার সময়ে পতিত ব্রাহ্মণ বা যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের যজমান বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই পৌরোহিত্য করেন। সামাজিকভাবে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ইঁহাদের নিকট হইতে পানীয় জল গ্রহণ করেন না। মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে গন্ধবণিক জলচলনীয় শূদ্রের মর্যাদা পাইয়া থাকেন ও মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণ (নবশায়ক জাতির পুরোহিত) তাহাদের যজমান বলিয়া গ্রহণ করেন।

ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বৈশ্য সাহা জাতির লোকেরাও নিজেদের বৈশ্য বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রধান পেশাই হইল ব্যবসা। বৈশ্য সাহাদের অনেকেই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। যাঁহারা কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা জমিতে লাঙ্গল করেন না। ইঁহাদের ব্রাহ্মণও স্বতন্ত্র। সামাজিক অনুষ্ঠানে নবশায়ক বা জলচল শূদ্রজাতির লোকেরা সকল জল-অচলনীয়দেরই পৃথক পঙ্‌ক্তির ব্যবস্থা করেন। ইঁহাদের নিকট হইতে পানীয় জল বা কোনরূপ এঁটো খাদ্য গ্রহণ করা জলচলনীয়দের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। তবে স্থানবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।

নীচ শূদ্র জাতি

অজলচলনীয়দের পরেই নীচ শূদ্র জাতির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। জীবিকাভেদে ইহাদের সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য বিবেচিত হইতে দেখা যায়। শিক্ষা ও সামাজিক আচার-আচরণে ইহাদের সহিত অপরাপর জলচল বা জল-অচল শূদ্রদের ব্যবধান লক্ষণীয়। ১৯৬০ সালের গেজেট অব ইণ্ডিয়াতে নীচ শূদ্রজাতির মধ্য হইতে কয়েকটি জাতিকে তফসিলভুক্ত বা অবনত হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। জীবিকাভেদে এই জাতিগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

ইহাদের মধ্যে জেলে, জালিয়া কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, তিয়র, কাঁদরা, বাগ্‌দী (ব্যগ্র ক্ষত্রিয়) ও মালোগণ প্রধানতই মৎস্যজীবী। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী, পালিয়া, কেওট, রাজভর; হুগলী জেলায় খয়রা; ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরে পোদ (পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়) ও মালজাতি কৃষিজীবী। মেদিনীপুর ও হুগলীতে হাড়ী, দুলে; বর্ধমান ও বাঁকুড়ার বাউরি ও পশ্চিম দিনাজপুরে মুসাহারদিগের বেশীর ভাগই পালকীবাহক ও ভূমিহীন কৃষক। ইহা ছাড়াও পাটনী খেয়া পারাপারের কাজ; ধোপা কাপড় পরিষ্কার; শুঁড়ি মদ্য বিক্রয়; করঙ্গা বলদ, ছাগল প্রভৃতিকে খাসি করা ও মুচি চামড়ার কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। তবে জাতীয় বৃত্তি ছাড়া অনেকে অর্থকরী স্বতন্ত্র বৃত্তিতেও নির্ভরশীল। যেমন, মেদিনীপুরে হাড়ী ও ক্যাওরা জাতির স্ত্রীলোকেরা দাইমার কাজ করে। ইহা ছাড়াও হাড়ী ক্যাওরা ও ডোমেরা উৎসব-অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাইয়া অর্থ উপার্জন করে। বিভিন্ন জেলাতে ডোমেরা বাঁশের তৈয়ারী নানাবিধ জিনিস বিক্রয় করে। পশ্চিম দিনাজপুরের ডোমেরা বাঁশমালি ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে হাড়ী জাতির লোকেরা ভুঁইমালি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় নুনিয়া ও বেলদারগণ প্রধানত মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত আছে। উপর্যুক্ত সকল জাতির লোকেরাই স্থায়ীভাবে একটি গ্রামে বাস করে। ফলে স্থানীয়ভাবে তাহাদের শ্রেণিগত সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন মত-পার্থক্যের অবকাশ নাই। ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায় বেদিয়া বা বেদে জাতীয় লোকেরা বেশী দিন একই স্থানে বসবাস করে না। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। পুরুষেরা দাঁতের পোকা বাহির করে। ইহাদের সামাজিক স্থান অতি নিম্নে।

অপর যে জাতিগুলি তফসিলভুক্ত বলিয়া গণ্য হয় নাই, তাহাদেরও শিক্ষা, বৃত্তি, সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি পর্যায়

বিচার করিয়া অজলচল নীচ শূদ্র জাতি বলিয়া গণ্য করা চলে। ইহাদের মধ্যে ধীবরগণ জালিক কৈবর্তেরই সমশ্রেণিভুক্ত। মুর্শিদাবাদে গাঁড়ার জাতি প্রধানত চিঁড়া প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। তবে, কেহ কেহ মাছ ধরা, খেয়া পারাপার ও করাতীর কাজও করে। ঘাটোয়ালদের বৃত্তি পাটুনীরই অনুরূপ। মেদিনীপুরের কলু জাতির সহিত পশ্চিম দিনাজপুরের পলিয়া তৈল প্রস্তুতকারীদের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা চলে। ইহারা উভয়েই একটি বলদের সাহায্যে তৈল নিষ্কাশন করিয়া থাকে। ফলে, ঘানিতে দুইটি বলদ ব্যবহারকারী তেলি জাতি অপেক্ষা কলু ও পলিয়াদের স্থান যথেষ্ট নিচু বলিয়া গণ্য করা হয়। মেদিনীপুর জেলায় বসবাসকারী মাহালিরা পেশার দিক হইতে ডোম ও বাউরি জাতিকেই অনুসরণ করে। অপর পক্ষে, মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন শ্মশানঘাটে গঙ্গাপুত্র নামক জাতির লোকেরা বাস করে। ইহারা ডোমের মত বাঁশের জিনিস তৈয়ারি করে। ইহা ছাড়া, মৃতদেহ সংকারের জন্য চিতা প্রস্তুতে সাহায্য করে। ইহারা মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত বিছানাপত্রের দাবিদার। মুর্শিদাবাদে চাষাট্টি, ২৪ পরগণার চাষাধোপা, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে কোটাল ও মেদিনীপুরের শুকেলি তাঁতীর প্রধান জীবিকাই হইল কৃষি। এজন্য সামাজিকভাবে তাহারা নিজেদের ডোম, বাগদী, কলু, হাড়ী প্রভৃতি জাতিগুলি হইতে উন্নত বলিয়া মনে করে।

যুগী জাতি পূর্বে তন্তুবায়ের বৃত্তি অনুসরণ করিলেও বর্তমানে তাঁহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন। উচ্চবর্ণের ন্যায় তাঁহারা উপবীত ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদা ইহাতে বর্ধিত হয় নাই। যুগীদিগের নিজস্ব কোন পুরোহিত নাই। ইঁহারাও বৈষ্ণবদের মত মৃতদেহকে সমাধিস্থ করেন। পশ্চিম দিনাজপুরে আবদাল বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের পুরুষেরা করঙ্গাদের ন্যায় পশুকে খাসি করেন ও স্ত্রীলোকেরা দাইমার কাজ করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদা হাড়ী ও করঙ্গাদেরই সমতুল।

মেদিনীপুর জেলার দরজী জাতি কাপড়-জামা সেলাই করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। বর্তমানে ইঁহারা ব্যবসা ও চাকুরিতে নিযুক্ত হইলেও মর্যাদায় জল-অচল শ্রেণিভুক্ত। এই জেলার পটিদার বা চিত্রকরদের প্রধান জীবিকাই হইল পট-অংকন ও লোকসংগীতের সুরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পট প্রদর্শন করা। মাটির পুতুল নির্মাণেও ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইঁহাদের আচার-ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কৃষ্টির এক অপূর্ব সমন্বয় বর্তমান।

মুর্শিদাবাদে পশ্চিমা তিলিগণ পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ী। ইঁহাদের মধ্যে গুরু নানকের প্রভাব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাজপুত ক্ষত্রিয় ও ভূমিগ্রহার ব্রাহ্মণদের ন্যায় ইঁহাদের আচার-আচরণেও কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। তথাপি পশ্চিমা তিলি জাতি স্থানীয়ভাবে বর্ণহিন্দুদের নিকটে অজলচলনীয়রূপে পরিগণিত হয়।

অস্পৃশ্য শূদ্র জাতি

বাংলা দেশে অস্পৃশ্য কথাটির তাৎপর্য দক্ষিণ ভারতের দৃষ্টিভংগী হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, সামগ্রিকভাবে যাহারা আদিবাসী সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের নীচ শূদ্র জাতির পরে স্থান দেওয়া হয়। মেদিনীপুরে কাকমারা, শবর; ২৪ পরগনার বুনো, মুণ্ডা উপজাতি হইতে উদ্ভূত কোড়া; মালদহ ও জলপাইগুড়িতে তুরি অস্পৃশ্য শূদ্রের অন্তর্গত। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, জল-চল শ্রেণী-ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতি সাধারণভাবে অ-জলচল নীচ শূদ্র বা অস্পৃশ্য শূদ্রদের সহিত হাটে-বাজারে যে তথাকথিত স্পর্শদোষ ঘটে, তাহাকে সহজভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কারাচ্ছন্ন, তাঁহারা এখনও বাহিরের পোশাকে রান্নাঘর বা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন না। রেশমের কাপড় স্পর্শ-দোষ নিবারক বিবেচনায় শুভ-অনুষ্ঠানে এখনও সুতীর কাপড় ব্যবহৃত হয় না। তবে এই সকল আচরণগুলি অস্পৃশ্যতা দোষ নিবারণের জন্য বিহিত হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তার বিষয়।

নীচ শূদ্র জাতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা নিজেদের স্বজাতীয় ছাড়া নিম্নশ্রেণীভুক্ত অন্য কাহারও নিকট হইতে পানীয় জল বা অন্ন গ্রহণ করেন না। উচ্চবর্ণের অনুকরণে তাঁহারাও সামাজিকভাবে খাওয়ার সময়ে নিম্নবর্ণের লোককে স্পর্শ না করা ইত্যাদি সামাজিক আচরণে নিজেদের বর্ণবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এ বিষয়ে আরও বেশী কঠোরতা রক্ষা করেন। জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একমাত্র কৃষি, ব্যবসা বা দিনমজুরি ছাড়া একে অপরের বৃত্তি সচরাচর গ্রহণ করেন না। কিন্তু স্থানবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও সামাজিকভাবে সকলেই পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ বোধ, ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বর্ণহিন্দুদের অনুকরণে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলেন। বর্ণহিন্দু ও নীচ শূদ্রদের আচার-আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তাহা হইতেছে যে, উচ্চবর্ণেরা কনে-পণ গ্রহণ, স্বগোত্রে বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন না; খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিয়া চলেন। নিম্নবর্ণের শূদ্রেরা মূলত এই সকল বিধিনিষেধ গ্রাহ্য করেন না। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলেও যাঁহারা যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ বা পতিত ব্রাহ্মণকেই তাঁহাদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও সাধারণ উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ জাতির মধ্য হইতে কোন একজনকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত লৌকিক দেবদেবী ও ভূত প্রেতের উপরেই তাঁহারা অধিক বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল। আবার জাতিভেদে দেবদেবীরও পার্থক্য লক্ষণীয়। তবে, ডোমেদের ধর্মপূজা; মৎস্যজীবীদের গঙ্গাপূজা, হরিপূজা; কৃষিজীবীদের ইন্দ্রপূজা ইত্যাদি ছাড়াও কালী, শীতলা, মনসা, ওলাবিবি, সত্যপীর প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ও লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব শ্রেণীভেদে সকল জাতির ক্ষেত্রেই সমন্বয় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। নীচ শূদ্র জাতির মধ্যে অধিকাংশই শাক্ত, ফলে পশুবলির প্রভাবও অধিক।

পরিশেষে, এই বর্ণগত শ্রেণী-বিভাগগুলি বর্তমান হিন্দুসমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে কিনা, তাহা একটি স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের বিষয়।

গ্রন্থসূচি

১। Risley, H. H., Tribes and castes of Bengal, Vol. I & II, 1891.

২। Bhattacharya, J. N., Hindu castes and sects, 1896.

৩। শ্রীরামমোহন বিদ্যানিধি—সম্বন্ধ নির্ণয়, মূল ঐতিহাসিক ভাগ—১ম খণ্ড। ১৮৯৬।

৪। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১৩১৮—১৩৩৪)।

৫। শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য-বিদ্যাভূষণ—জল-চল ও স্পর্শদোষ বিচার। ১৩৩১।

৬। শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য-বিদ্যাভূষণ—জাতিভেদ। ১৩৩১।

৭। শ্রীনির্মলকুমার বসু—হিন্দুসমাজের গড়ন। ১৩৫৬।

৮। সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ১৩৫৭।

স্বপ্ন অস্বপ্ন

বিমল কর

ছয়

ললিতার স্বপ্ন দেখছিল অবনী। দেখছিল : ওরা বিছানায় শুয়ে আছে; ললিতা ছাদের দিকে মুখ তুলে সোজা হয়ে শুয়ে; ললিতার দিকে পাশ ফিরে তার বালিশে কনুই রেখে সামান্য উঁচু হয়ে অবনী। ললিতার চোখ খোলা, ঠোঁট ফাঁক, দুটি সাদা চকচকে দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, গলায় তুলসী-মঞ্জরীর মতন হার। অবনী ডান হাত আস্তে করে ললিতার মুখের কাছে আনল, গালে ঠোঁটে আঙুলের ডগা বুলোলো, তারপর চোখের পাতা—; শেষে ডান হাতের পাঁচটি আঙুল ও তালু দিয়ে ললিতার মুখ ঢেকে দিয়ে অবনী ললিতার বুকের ওপর মুখ নামাল। ললিতার হাত অবনীর মাথার চুলে এসে পড়েছে। নিরাচ্ছাদিত বুকে ললিতার; অবনী পরিপূর্ণ যুবতীদেহে চুম্বন ও দংশন করল। ললিতা তাকে উৎফুল্ল করছিল, পীড়ন করছিল। তারপর সহসা সে অবনীর আলিঙ্গন থেকে মুক্তির জন্যে উঠে বসল। পরমুহূর্তে ললিতাকে আর বিছানায় দেখা গেল না; অবনী অতি দ্রুত তাকে অন্বেষণ করতে ঘরের বাইরে এল। ঘর থেকে অন্য ঘর, বাদুড়বাগানের বাড়ির শোবার ঘরে, ললিতা যেন এইমাত্র এই ঘর থেকে চলে গেছে—তার খোলা জামা কাপড় বিছানায় ও মেঝেতে লুটোচ্ছিল; অবনী চকিতে অন্য ঘরে চলে গেল। স্নানের ঘরে অবিরল জল পড়ছে, পড়ছে...; জানলায় জালের পরদা, দরজায় জালের পরদা, দেওয়ালে কোথাও একটু আলো। ললিতা মাথার ওপর শাওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে, নগ্ন, পালকের মতন বঙ্কিম নরম পিঠ, কোমর সামান্য ভারী, সদাসিক্ত কুম্ভের মতন পিছন, জলের ধারায় জঙ্ঘা, পায়ের ডিম অস্পষ্ট হয়ে আছে। অবনী এগিয়ে গেল, ললিতার পিছনে; কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে নিজের মুখোমুখি করল। এবং সহসা অনুভব করল সেও নগ্ন। মাথার ওপর কলঘরের ফোয়ারা; জলধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল, জলজ প্রাণীর মতন তাদের গায়ে শ্যাওলা ধরে যাচ্ছে, পানা জমে গিয়ে সবুজ কালো হয়ে গেল সব। ললিতা ধাক্কা মেরে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে গেল, পারল না; অবনী হাত বাড়িয়ে ললিতাকে সরিয়ে দিতে গেল, পারল না। অবশেষে মাথার ওপরকার ফোয়ারার জলের ধারা হঠাৎ কেমন সুতোর মতন হয়ে মস্ত একটা জাল বোনা হয়ে গেল। শক্ত কালো জাল। কোনো জেলে বিশাল এক জাল ফেলে তাদের যেন ধরে ফেলেছে; সেই জালের মধ্যে শ্যাওলাধরা পানামাখা দুই জলজ প্রাণীর মতন তারা বন্দী। অবনী পাগলের মতন এই জাল কেটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, ললিতাও দাঁত দিয়ে জাল কাটার চেষ্টা করছে। তারপর দুজনের আপ্রাণ জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা...

ঘুম ভেঙে গেল অবনীর। ভেঙে যাবার পরই তার মনে হল সে জাল ছিঁড়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চোখের পাতা খুলল, পাতা খুলতেই বিছানার মশারির জাল দেখল, বাতাসে কাঁপছিল সামান্য; অবনী ভীত ও ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাবার জন্যে উঠে বসে টান মেরে মুখের সামনে থেকে মশারি সরিয়ে ফেলল। এত জোরে সে হাত দিয়ে মশারি টেনে সরাল যে মশারির খানিকটা ছিঁড়ে গেল। ততক্ষণে তার ঘুমের আচ্ছন্ন ভাব এবং ভ্রম ভেঙে গেছে। তবু একবার অবনী বিছানার মধ্যে তাকাল, না—কেউ নেই।

মুখের সামনে থেকে মশারি সরিয়ে অবনী কিছুক্ষণ বসে থাকল, তার শরীরের খানিকটা মশারির মধ্যে, বাকিটা বাইরে। গলায় মুখে ঘাম জমে গেছে। দুঃস্বপ্ন দেখার পর যেভাবে মানুষ তার ভীত, বিমর্ষ ভাবটা ক্রমশ সইয়ে নেয়, অবনী সেই ভাবে তার আতঙ্ক ও বিহ্বলতা কাটিয়ে নিচ্ছিল।

শেষে উঠল, বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে

বাতি জ্বালল। তৃষ্ণায় ঠোঁট গলা শুকিয়ে আছে। অবনী জল খেল, খেয়ে বাথরুমে গেল। ফিরে এসে ঘড়ি দেখল, শেষ রাত, চারটে বেজে গেছে। সিগারেট ধরাল। কি মনে করে বাতি নিবিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এখন সমস্তই নিঃসাড়। বাইরে অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে দমকে দমকে। অন্ধকারে বাগানের গাছপালা ঘন ছায়ার মতন দেখায়, আকাশ কালো, কয়েকটি তারা এখনও চোখে পড়ে।

সিগারেটের ধোঁয়া অবনীর স্নায়ুকে শান্ত ও স্বাভাবিক করছিল। স্বপ্নের উত্তেজনা অবসিত। অথচ তার অন্যমনস্কতা ও বিমর্ষতা বাড়ছিল।

কিছুক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল অবনী, সিগারেট শেষ করল, তারপর বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

এই রকম স্বপ্ন সে আর দেখে নি। ললিতাকে কখনও কখনও সে এখনও স্বপ্ন দেখে, কিন্তু কোনোদিন এভাবে দেখি নি। এই স্বপ্ন, অবনীর মনে হল, অদ্ভুত, ভীতি-কর। স্বপ্নে ললিতার সাহচর্য সুখ অথবা রমণক্রিয়া হেতু যে হর্ষোৎফুল্লভাব তা সে

অনুভব করেছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। নির্দিষ্ট ও স্থায়ী ছবির মতন অবনী শুধু সেই বীভৎস জালটি দেখতে পাচ্ছিল : কালো, শক্ত, কঠিন; সেই জালের মধ্যে আদিম কোনো জলজ জীবের মতন নগ্ন দুটি নরনারীর সর্বাঙ্গে শ্যাওলা ও পানা। কেন যেন এই স্বপ্নের কোথাও অবনী তার অতীতকে খুঁজছিল।

ললিতার বিষয়ে অবনী আজকাল সাধারণত কিছু ভাবতে চায় না, ভাল লাগে না ভাবতে। তার মনে হয় না, এখন আর ও-বিষয়ে কিছু ভাবার থাকতে পারে। অকারণ মনে মনে পুরোনো বিরক্তিকর একটি স্মৃতিকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে দেখে লাভ কি! এখনও যে অবনী ললিতার কথা ভাবতে চাইছিল তা নয়, অথচ এই অদ্ভুত স্বপ্নটির রহস্যে ও বিচিত্রতায় সে এতই বিহ্বল ও তন্ময় হয়েছিল যে ললিতার কথা না ভেবে পারছিল না।

ললিতার সঙ্গে আলাপ সাধারণ ভাবেই। কমলেশ আলাপ করিয়ে দিয়েছিল রাস্তায়। একসময় কমলেশ অবনীর সহপাঠী বন্ধু ছিল। মাঝে মাঝে অবনীর কাছে আড্ডা মারতে গল্পসল্প করতে আসত। কমলেশ হাসিখুশী মেজাজের ছেলে, চাকরি করত মোটামুটি ভাল জায়গায়, চৌরঙ্গি পাড়ায় কোনো কোনোদিন বিয়ার-টিয়ার খেতে আসত। একদিন অবনীর সঙ্গে লিন্ডসে স্ট্রীটের কাছে দেখা কমলেশের, সঙ্গে ললিতা। পরিচয় করিয়ে দিল কমলেশ।

অবনী প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ললিতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা যে-কোনো পুরুষের পক্ষেই স্বাভাবিক ছিল। দেহজ সৌন্দর্য—যা প্রথমেই পুরুষের চোখকে নিষ্পলক ও কাতর করে—ললিতার শরীরে সে সৌন্দর্য অতিমাত্রায় ছিল। প্রখর ও প্রলুব্ধক সেই রূপে অবনী আকৃষ্ট হল। ললিতার মুখ ছিল ডাসন্ত, সামান্য ছোট; কপাল চওড়া, গালের চামড়া পাতলা, ফোলা, নাক একটু মোটা ঠোঁট পুরু। ঠোঁটের ডগায় ডিমের কুসুমের মতন টলটলে, আঠালো ভাব ছিল। ললিতার চোখ ছিল বড় বড়; ঘন, মোটা ভুরু, পাতা মোটা। দৃষ্টিতে কটাক্ষ ও কামভাব ছিল। ওর মুখ চোখের মধ্যে কোথাও এক ধরনের মাদকতা থাকায় ললিতা চোখ জড়িয়ে বিলোল করে কথাবার্তা বলত, বাদামের দানার মতন দাঁত দেখিয়ে হাসত। ওর কাঁধ গলা সুন্দর ছিল; পিঠ ভরা; স্তন পরিপূর্ণ ও দৃঢ়; গুরু নিতম্ব, সুডৌল জঙ্ঘা।

অবনী প্রথম দর্শনেই ললিতাকে তার চিত্ত চঞ্চলতা বুঝতে দিয়েছিল। ললিতাও বুঝেছিল।

পরিচয় খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াল। অবনী সে-সময় যেরকম ব্যবহার করেছিল তাতে মনে হবে, তার মন ও দৃষ্টিকে সে একই জায়গায় নিবদ্ধ রেখেছিল। একটি মাত্র বস্তু কামনা করলে যেভাবে মানুষ অন্য আর সব কিছু ভুলে যায়—অবনী সেই ভাবে অন্য কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করে একমাত্র ললিতাতেই তার মনোসংযোগ করেছিল।

কমলেশ একদিন বলল : 'কিরে, তুই যে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিস।'

জ্ঞান হারাবার মতনই দেখাচ্ছিল তখন। অবনীকে একমাত্র অফিসে ছাড়া কোথাও কখনও বড় একা দেখা যেত না। সে সর্বদাই ললিতাকে সঙ্গে রাখত, বা ললিতাকে সঙ্গদান করত। কমলেশ ঠাট্টা করে যাই বলুক, অবনী দিশেহারা অথবা উন্মাদ হয় নি, সে ললিতাকে একটি বলয়ের মতন চতুর্দিক থেকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলছিল। চতুরের মতন সে এ-কাজ করে নি, আবেগ ও বাসনার দ্বারা করেছিল। ললিতার প্রতি তার আকর্ষণ অতি তীব্র ও আন্তরিক হওয়ায় সে সতর্ক, সংযত হয় নি, হবার চেষ্টাও করে নি। প্রয়োজন ছিল না।

কমলেশ পরে আবার একদিন বলল :

"'একটু সাবধান হ'।'

'কেন?'

'আমি যতদূর জানি, ওর আরও কিছু বন্ধুবান্ধব আছে।'

'তাতে আমার কি?'

'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।'

'এক সন্ন্যাসীর গাজনটাই তুই দেখ, বাদবাকির কথা ভাবিস না।'

'তুই ভীষণ সিরিআস। প্রেমে পড়েছিস নাকি!'

'ওসব প্রেমটেম বুঝি না, ভাই; ভালো লাগে,—দ্যাটস অল।'

'বিয়ে করবি?'

'লোকে তো তাই করে।'"

ললিতার সঙ্গে পরিচয়ের বছর দেড়েকের মধ্যেই অবনী তাকে বিয়ে করে ফেলল। ললিতা ভাল করে কিছু হুঁশ করতে পেরেছিল কি না কে জানে। অবনী সে সুযোগ সম্ভবত দেয় নি। যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে, ললিতা অবনীর মৃগয়ার বস্তু ছিল

তবে অবনী তার শিকারকে দ্বিধা করতে, সরে যেতে অথবা পালিয়ে যেতে দেয় নি; নিশানার বিন্দুমাত্র ভুলচুক না করে স্থির দৃষ্টি রেখে সে লক্ষ্যভেদ করেছিল। অবনীর এই সাফল্যের মূলে তার বাসনার তীব্রতা ছিল সবচেয়ে বেশী, তার অনমনীয় দৃঢ় পৌরুষ, তার দ্বিধাহীন আকাঙ্ক্ষা এবং স্পর্ধিত আক্রমণের সামনে ললিতা অসহায় হয়ে পড়েছিল।

ললিতা বোকা বা অনভিজ্ঞ ছিল এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। নিজের দাম সে জানত। সাংসারিক লাভ লোকসানের হিসেবটা সে মনে মনে ভাল ভাবেই কষে রেখেছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তার মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। কিন্তু ললিতা কোনো কোনো জায়গায় তার হিসেবের ভুল করে ফেলেছিল। অবনীকে সে যথার্থ ভাবে বোঝে নি। ভেবেছিল তার লাভ বই লোকসান হবে না। অবশ্য অবনীকে আপাতদৃষ্টিতে অপছন্দ করার কিছু ছিল না—এমন কোনো স্থূল কারণ ললিতা খুঁজে পায় নি যাতে অবনীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। অন্য কোনোদিকে, যা স্থূল নয়—যা সূক্ষ্ম এবং ভিতরের দিক —সেদিকে তাকাবে এমন সুযোগ ললিতা পায় নি, অবনী তাকে সে অবসর দেয় নি। সম্ভবত, ললিতা তার শারীরিক লক্ষণ-গুলির জন্যে মনে মনে যে দাম স্থির করে রেখেছিল অবনী প্রথম থেকেই তার বেশি ললিতাকে দিয়েছে; অন্যে এতটা দেবে কি দেবে না ললিতা জানত না; প্রাপ্তির আধিক্যে সে সন্তুষ্ট ও লোভী হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, ললিতা অবনীর প্রবল আকাঙ্ক্ষার কাছে আত্মরক্ষা করতে পারে নি, তার প্রয়োজনও সে অনুভব করে নি তখন। এসব সত্ত্বেও ললিতা অবনীকে সঙ্গী হিসেবে, পুরুষ হিসেবে পছন্দই করেছিল।

বিয়ের পর বাদুড়বাগানের বাড়িতে ওরা কয়েক মাস যেন হাওয়ায় ভেসে ছিল। চার পাশে তখন খুশী ঠিকরে উঠছে: সুখ, সুখ আর সুখ। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে মনে হত ওদের হাতে কেউ যেন সুখের একটা বড়সড় নোট ধরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে বলেছে: 'যাও, খরচ করো।' ওরা দু'জনে সারা দিন ভরে সেই নোটের ভাঙানি খরচ করে করে রাত্রে বিছানায় শুয়ে দেখেছে তখনও অনেক অবশিষ্ট থেকে গেছে। অবশিষ্ট যা থেকে যেত তা খরচ করার জন্যে ওরা কৃপণতা করে নি; কারণ সকালে ঘুম থেকে চোখ মেলেই আবার একটি 'সুখের নোট' পাওয়া যাবে। এত সুখ—শুতে, বসতে, কথা বলতে, বেড়াতে কোথায় যে ছিল তা যেন তারা জানত না। অবনীরও মনে হত, সে আশাতীত তৃপ্তির মধ্যে রয়েছে; হয়ত এতটা সে প্রত্যাশাও করে নি।

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের প্রথম কয়েকটা মাস তারা যেন এক ঘূর্ণির মধ্যে ছিল, কোথাও স্থিরতা বা শান্তভাব ছিল না। কিছু বিচার করে নি, ধীরে-সুস্থে পরস্পরকে দেখে নি। ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে পাক খেয়েছে। হয়ত এটা স্বাভাবিক। সদ্য-প্রাপ্ত নতুন খেলনা হাতে পেয়ে ছেলে-মানুষে যেমন সব কিছু ভুলে গিয়ে খেলায় মন দেয়—এও অনেকটা সেই রকম। এমন কি, নতুন খেলনা পেলে শিশুরাও যেমন অনেক সময় মনে মনে বোঝাপড়া করে পরস্পরকে খেলনাটা নিয়ে খেলতে সুযোগ দেয়, অবনী ও ললিতাও সেই রকম পরস্পরকে সুযোগ দিত।

বছর খানেক পরেই দেখা গেল সুখের স্বাদ ফিকে হয়ে আসছে। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে বসলেই আর হাতের মুঠোয়

'সুখের নোট' কেউ গ'ুজে দিয়ে যায় না। দুঃখেরও নয় অবশ্য।

কুমকুম তখনও হয় নি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে হচ্ছে। কুমকুমের ভারে ললিতা ভারাক্রান্ত। ওর ইচ্ছে ছিল না—এত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ে হোক। অবনীর মনে হয়েছিল, যদি হয়ে থাকে তবে তা নিয়ে ললিতার এই অশান্তি মনে মনে পুষে রাখা অনুচিত। প্রথম সন্তানের জন্যে অবনীর কেমন ঔৎসুক্য ও কৌতূহল ছিল। ললিতার তেমন কিছু ছিল না। তবে এ নিয়ে সামান্য কথাকাটাকাটি হলেও বড় রকমের কোনো ঝগড়াঝাটি হয় নি। যেটুকু অশান্তি তা ভুলে যাওয়া যায়।

কুমকুম হল। কুমকুমের জন্মের পর ললিতার সেই ক্ষুব্ধভাবটা কমল। কেমন করে যেন সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল। বরং অবনী ও ললিতার মধ্যে সম্পর্কের যেটুকু চিড় ধরেছিল তা সাময়িকভাবে মেরামত হয়ে গেল।

তারপর ক্রমশ, বাদুড়বাগানের বাড়িতে অশান্তি দেখা দিতে লাগল। স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যেত না প্রথমে, ধরা পড়ত না; —কিন্তু ধোঁয়া ধুলো নোঙরা উড়ে এসে এসে যেভাবে ঘরের কোণে, দেওয়ালে ময়লা জড় হয়, ঝুল জমে—সেই ভাবে সংসারে মালিন্য জমতে লাগল। হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়তে।

অবনী চেষ্টা করত ওই সব মালিন্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার। চোখ ফিরিয়ে সে ললিতার দিকে তাকাত। ললিতার দেহের প্রতি তার তখনও প্রবল আসক্তি। কুমকুম হওয়ার পর ললিতার শরীর ভেঙে যায় নি, যৎসামান্য যা পরিবর্তন তাতে ললিতার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগার কোনো কারণ ছিল না। বরং অবনীর চোখে এই পরিবর্তন ভালই লাগত।

স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে সে আর কোথাও যখন তেমন করে ধরে রাখতে পারছিল না, তখনও শয্যায় সে এই সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করছিল। ললিতা এক্ষেত্রে কেমন উৎসাহহীন, নিশ্চেষ্ট হয়ে আসতে লাগল। তারপর এক সময় সে অবনীর কাছ থেকে যেন সরে গেল।

এক সময় যে-বাড়িতে দিবারাত্র দুরন্ত শিশুর সাড়ার মতন সুখকে অনুভব করা যেত এখন সেখানে সুখ মৃত, তার সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না, সে চলে গেছে এটা বোঝা যায়, বোঝা যায় বলেই মনে হয় সব যেন ফাঁকা। দুঃখ, এখন দুঃখকেই শুধু অনুভব করা যায়।

চোখ সরিয়ে রেখে রেখে অবনী যা দেখে নি, দেখতে চায় নি— এখন তা দেখতে সে বাধ্য হতে লাগল। দেওয়ালে, কোণে, ছাদে, ফাঁকে ফোকরে এত মালিন্য জমে গেছে যে এখন সব অস্বাভাবিক বিবর্ণ দেখায়। পুরু ধুলো, ময়লা ন্যাকড়ার মতন ঝুল, মরা কীটপতঙ্গ জমে গিয়ে যেমন দেখায় অনেকটা সেই রকম। ললিতাও এই নোঙরামি দেখতে পাচ্ছিল।

সাংসারিক কলহ, অশান্তি, বিতৃষ্ণা তখন থেকেই ওদের চারপাশে ফেটে পড়ল।

ললিতার শরীরের মতন তার চরিত্রেরও কিছু স্থূলতা ছিল। অবনী যথার্থভাবে সেই স্থূলতার সঙ্গে আগে পরিচিত হতে পারে নি; এখন হচ্ছিল। নিজের চরিত্রেও অবনীর যে রুক্ষতা ও অসহিষ্ণুতা ছিল তাও প্রকাশ পেতে লাগল।

ললিতা বলত : অবনী তাকে মাংসের দরে কিনেছে।

অবনী জবাব দিত : ফুলের বাজারে বিকোবার মতন ললিতার কিছুই নেই।

ওরা পরস্পরকে বিরক্তি বিতৃষ্ণার মধ্যে নতুন করে চিনতে লাগল। অবনী বুঝতে পারল, ললিতার স্বভাব অত্যন্ত নোঙরা, সে হীন, স্বার্থপর, হিসেবী, দায়িত্বহীন, বিলাসী। ললিতাও বুঝতে পারল অবনী হৃদয়হীন, অহংকারী, রুক্ষ, কামুক, উদ্ধত। উভয়ে উভয়ের সহস্র রকম ত্রুটি

আবিষ্কার করতে পেরে যেন সুখী হচ্ছিল; অথবা নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পারছিল।

পরস্পরকে নোখ দিয়ে আঁচড়াবার প্রবৃত্তি এবং হিংসা তাদের বেড়েই যাচ্ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই কোনো-না-কোনো তুচ্ছতম বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হত। তারপর সেই ধোঁয়া আস্তে আস্তে আগুন হয়ে দেখা দিত।

হয়ত সকালে ঘুম থেকে উঠে অবনী চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে দেখল, চায়ের স্বাদ অত্যন্ত তেঁতো জুড়িয়ে জলের মতন হয়ে গেছে। বিরক্ত মুখে অবনী বলল, "কি হয়েছে এটা? চা না চেরতার জল?"

ললিতা জবাব দিল, 'যা হয়েছে তাই—ওর বেশী হবে না।'

'হবে না মানে—' এক পেয়ালা চা দিয়ে আমার মাথা কিনছ নাকি?'

'তুমি কি আমায় দু বেলা দুটো ভাত দিয়ে কিনে রেখেছ নাকি?'

'দু বেলা দু মুঠো ভাত দিয়ে যাদের কেনা যায়—তুমি তাদের দলে নও। তাদের মতন হলে তবু লজ্জা থাকত।'

'তোমারই কত লজ্জা!...গলা ভাত মদ খেয়ে রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে কুকুরের মতন গা চাটতে আস, আর ভোর বেলায় ঘুম ভাঙলে মেজাজ দেখিয়ে চোখ রাঙাও।'"

অবনী রাগের মাথায় চায়ের পেয়ালাটি প্রাণপণে ছুঁড়ে মারল দরজার দিকে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কাপ। কুমকুম পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে বাবা এবং মাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

অকারণে, অল্প কারণে, কখনও বা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ঝগড়া করত ললিতা। অবনী অন্তত তাই ভাবত। আবার ললিতা ভাবত অবনীই সব দোষে দোষী। অবনী ললিতার মধ্যে শিক্ষা রুচি শালীনতা কর্তব্যজ্ঞান সংসারের প্রতি টান খুঁজে পেত না। মেয়েটাকে ও ছেলেবেলা থেকেই নষ্ট করছে, তার স্বভাব খারাপ করে দিচ্ছে।

ললিতা ভাবত অবনী তাকে ঠকিয়েছে—চাতুরী করে—কৌশলে ললিতাকে তার সংসারে এনে আটকে ফেলেছে। তার স্বাধীনতা, পছন্দ বলে এখন আর কিছু নেই।

ললিতার স্থির ধারণা হয়ে গিয়েছিল, অবনী তাকে প্রবঞ্চনা করেছে। কি ধরনের প্রবঞ্চনা তা সে তেমন বুঝত না; তবে মনে হত—এ-রকম জীবন সে চায় নি, আর পাঁচজন মেয়ের মতন ঘরদোর, স্বামী, মেয়ে এইসব নিয়ে তাকে দিন কাটাতে হবে ভাবতেই তার বিশ্রী লাগত ঘৃণা হত। অবনী তাকে সেই একঘেয়েমির মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে। তাছাড়া অবনী, ললিতার মনে হত, তাকে ভালবাসে না, তার প্রতি মমতা নেই, মর্যাদাও দেয় না। শুধুমাত্র বিছানায় নিয়ে শোবার জন্যে তাকে বিয়ে করেছিল। লোকটা, চতুর এবং কামুক।

"তোমার টান তো শুধু এক জায়গাতেই। ফুর্তির জন্যে যখন দরকার, যেটুকু দরকার।' ললিতা বলত।

'তোমার কত জায়গায় টান'—অবনী বিদ্রূপ করে জবাব দিত।

"নেই। কেন থাকবে। আমি কি এতসব চেয়েছিলাম?'

'চাও নি। তুমি কি চেয়েছিলে আমি এখন তা বুঝতে পারি।'

'কি শুনি?'

'এখানে দু দিন, সেখানে দু দিন করে কাটাতে; মজা লুঠতে। যার কাছে যতদিন লোটা যায়।

'কত মজাই তোমার কাছে পেলাম।'" ললিতা উপহাস করে বলত।

আসলে অবনী ও ললিতার মধ্যে

স্বভাবের পার্থক্য ছিল প্রচুর। তারা নিজেদের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা করে একে অন্যের কতটা নিকট হতে পারবে তা ভাবে নি। একমাত্র শয্যাই তাদের মিলনক্ষেত্র ছিল. অন্যত্র তারা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকত। যে অনুভব, বোঝাপড়া, সহিষ্ণুতা এবং স্বার্থত্যাগ থাকলে তারা পরস্পরের বিপরীত স্বভাবকেও সহ্য করে নিতে পারত, সহ্য করে পরস্পরকে ক্রমশ পরিবর্তিত ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং একাত্ম করতে পারত—তেমন বোঝাপাড়া, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি তাদের কিছুই ছিল না।

অবনী অবসাদ বোধ করতে লাগল। ললিতাও যেন পালাতে পারলে বাঁচে। অবনী লক্ষ করত, ললিতা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, তার পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা সেরে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে, অবনীর দিকে চোখ ফেরায় না। সংসারখরচের টাকা মুড়িমিছরির মতন খরচ করে, নষ্ট করে, আবার চায়। কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই।

অবনীর একটিমাত্র দুর্বলতা ছিল। কুমকুম। কুমকুমকে তার মার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা অবনী করেছিল। ললিতা তা দিল না। বরং সে কুমকুমকে অবনীর বিপক্ষে দাঁড় করাল। বাবাকে ঘৃণা করতে, অপছন্দ করতে, অবজ্ঞা করতে কেমন করে শেখাল ললিতা কে জানে, কিন্তু কুমকুম তার মার দলে চলে গেল। ওইটুকু মেয়ের চোখে অবনী যে বিযাক্ত দৃষ্টি দেখেছে তাতে মনে হয়েছে, সংসারে তার মতন পাকা শয়তান যেন আর নেই।

ললিতা মেয়েটাকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছিল। তাকে শত রকমের ইতরতা শেখাচ্ছিল। অবনীর মনে হয়েছিল, ললিতা তাকে দুর্বল স্থানে আঘাত করে আনন্দ পেতে চাইছে।

একদিন ললিতা বলল, 'এভাবে আমি থাকব না।'

'কি ভাবে?'

'তোমার সঙ্গে কোনো মেয়ে থাকতে পারে না।'

'আর কেউ তোমায় পুষতে চাইছে নাকি?'

'ভদ্রলোক হবার শিক্ষা যে পাও নি তা তো আমার জানা আছে।'

'তোমার পরিবারের লোকজন কি ভদ্র?'

'তোমার চেয়ে ভদ্র।'

'দেখতেই পাচ্ছি। .. বাপ কুকুর-ব্রিড করিয়ে পয়সা নেয়, ছেলে নাচের দলে মেয়ে সাপ্লাই করে, এক বোন তো...'

'তোমার মা বাবাও দেবতার অংশ নয়। ওসব কথা থাক, নিজের গায়ের গন্ধ যখন লুকোতে পারবে না তখন অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কি! ...আমি ঠিক করেছি— তোমার এখানে আমি থাকব না।'

'কার সঙ্গে থাকবে?'

'দরকার হলে কারুর সঙ্গে থাকব।'

'আজকাল মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকছ নাকি?'

'আমি ডিভোর্স চাইব।'

'চাও।'

'তুমি রাজী?'

'আপত্তি নেই। ...পরে ভেবে দেখব।'

'মেয়ে আমার কাছে থাকবে।'

'না।'

'মেয়ে আমার। তোমার কাছে আমি তাকে থাকতে দেব না।' "

পারিবারিক জীবনে যেমন, বাইরেও অবনী সেই রকম অসুখী অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। অফিসে তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধব সহকর্মীর মনোমালিন্য ঘটছিল। ওপর-অলার সঙ্গে বিরোধ। তার আর কিছু ভাল লাগত না, সহ্য হত না। সব বিষয়েই তার অসীম ক্লান্তি জমছিল, অনাগ্রহ বাড়ছিল। মনে হত সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অবসন্ন ও ক্লান্ত বোধ করছে। কেমন যেন এক একঘেয়েমি, অর্থহীনতার মধ্যে সে বেঁচে আছে, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন, কোথাও কোনো স্বাদ নেই সুখ নেই।

একদিন বার-এ বসে মদ খেতে খেতে কমলেশ বলল," 'তুই খুব সিক হয়ে পড়েছিস।'

'শরীর দেখে বলছিস?'

'না তোর চোখ মুখ দেখে, কথাবার্তা শুনে—।'

'কিছুই ভাল লাগে না...'

'সাফারিং ফ্রম বোরডোম!'

'জানি না:...আমি মাঝে মাঝে ভাবি : আগুনটা এবার নিবে আসছে।'

'আগুন? কিসের আগুন?'

'উনুনের।...চল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, বুঝলি। আজকের দিনে চল্লিশ বছর বেঁচে থাকা খুব ডিফিকাল্ট।... আমার মতন ব্যাসটার্ডের ধুনি আর কতকাল জ্বলবে!'

"বুঝতে পারছি এই বেলা কেটে পড়।"

শেষ পর্যন্ত অবনী সত্যিই চলে এল। ললিতাকেও ছেড়ে দিল, মেয়েকেও। কিন্তু, অবনী বুঝতে পারছিল না, সে জালের বাইরে এসেও এ-স্বপ্ন কেন দেখল?

(ক্রমশ)

দিল্লির ডায়েরি

শাড়ির নাম টাঙ্গাইল, ধনেখালি, শান্তিপুরী। আরো অনেক আছে বইকি, যাদের নামে বাঙালী মেয়েদের মন আনচান করে। বাঙলার বাইরের অবাঙালী মেয়েদের ভিতরেও তা আজ যেন সংক্রামিত হচ্ছে। তারই খেই টেনে আজ কথা পাড়ছি এখানকার বঙ্গ বিপণি 'বেঙ্গল এম্পোরিয়ম' সম্বন্ধে।

কয়েকদিন আগে আমাদের পাড়ার ধোপানী, স্থানীয় লোক, কাজ-করা লালপেড়ে একটা শাড়ি ইস্ত্রি করে ফেরত দিতে এল বাসায় এবং বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে মাইজীকে বলল, 'ওটা যদি আমাকে বেচে দাও তো খুব আনন্দ পাই, তোমাকে পুরো কেনা দামই দেব।' মাইজী স্বভাবতই সম্মত হন নি, তা' ধনেখালির সুবাদেই হোক, কি নিজের শাড়ির উপর মায়ার জন্যেই হোক।

কোরা শাড়ি, ধনেখালি, টুকটুকে লাল পাড়। নিচে দাঁতের কাজ। সাধারণ লাল-ডুরে আঁচল। ঐ ধনেখালি। তার লাবণ্য, রুচির সারল্যে, রুচিময় সারল্যে এবং যাদের রুচি আছে, বাঙালী হোক কি অবাঙালী, তারা যে অমনি একটি জিনিসের জন্য আইঢাই করবে, আশ্চর্যের নয়। এখানকার বঙ্গ বিপণির ম্যানেজার শ্রীসরিৎ দত্ত মশায়ের সঙ্গে দোকানের কাজকর্ম নিয়ে আলাপ করতে করতেও ঐ কথার সমর্থন পেলাম।

বাঙলা দেশের হস্তশিল্প ও চারু-শিল্পমানের নিদর্শন নিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত বঙ্গবিপণি। কনট প্লেসে, আছে অনেক প্রদেশের নিজ নিজ এম্পোরিয়ম। মাদ্রাজ, কেরল, মহীশুর, রাজস্থান ইত্যাদি। সরকারী অথবা আধা-সরকারী দোকান, যেখানে গেলে দেখতে পওয়া যায় সেই সেই প্রদেশের নাম-করা ও বৈশিষ্ট্যময় জিনিস। বঙ্গ বিপণিতে সুতরাং বাঙলার গন্ধ পাবেন। ভালো-না-লাগার কোনো সংগত কারণ নেই, তা আপনি মেমসাহেবই হোন, গিন্নীমাই হোন, কি খাজুরাহো-কোনারকের কেশ-কৃষ্টিকে শিরোধার্য করে মিস্ আধুনিকা হোন।

দেখার জন্যে সেদিন দোকানটায় গেলাম, বিকেলে। খদ্দেররা আসছেন। মেয়েরাই বেশী এবং দেখলাম তাঁরা অধিকাংশই অবাঙালী। ম্যানেজার মশায়ও তাই বল্লেন। 'অবাঙালীই বেশী খদ্দের। আর জানেন, তাঁরা দামের পরোয়া করেন না। লাল পাড় অমুক শাড়ি চাই, তা যে দামই হোক।' সুতরাং, চিক্‌নাই টাঙ্গাইল শাড়ি বিক্রি হচ্ছে সত্তর, এক শো কি আরো বেশী টাকায়। মুর্শিদাবাদের রেশমও খুব চলে, খুব নাম। আসতে না আসতেই শেষ।

একজন বিলিতী মেমসাহেব এলেন, মধ্য-বয়সী। কী যেন চাইলেন। তা নেই। কিন্তু রামধনুর রঙ-খেলানো ঝিনুকের একটা নেকলেস্ দেখে তাঁর চোখ চকচক্। কিনলেন ওটা এবং এবং আরো দু' একটা কাটুমকুটুম। দুজন অবাঙালী যুবক কিনলেন কয়েকটা কাঠের পুতুল ইত্যাদি, ঘর সাজাবার জিনিস। এক ঘণ্টার ভিতর এল গেল প্রায় ৪০ জন লোক। অর্দ্ধেক লোক শুধু নাড়াচাড়া করে দেখেই সন্তুষ্ট, হয়তো কেনার ইচ্ছা পরে।

শাড়ির চাহিদা তো আছেই; আরো আছে সিল্কের উপর আঁকা পট, স্কুল, বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ (যেমন মেয়েদের ব্যাগ), পেতলের পুতুল, ঢোকরা কামারদের কাজ, কাঠের কাজ, এগুলোর চাহিদাও বেশ। বাঁকুড়ার ঘোড়া অবশ্য এত নাম-করা যে, সে আজ ভারতের হস্তশিল্পের প্রতীক। কিন্তু মাটির বলে একটু অসুবিধে আছে। আনবার রাস্তায় ভাঙে অনেক। বিদেশী পর্যটকরা দেশে নিয়ে যেতে পারে না। আবার ধাতুর তৈরী হলে অত্যন্ত ভারী হয়ে যায়। আমার মনে হয়, মাটির ঘোড়া

খরিদ্দারদের শাড়ি দেখাচ্ছেন মহিলা বিক্রয়-কর্মী দুজন

ছাড়াও কিছু ধাতব ঘোড়াও চলতে পারে দেশের ভিতরে বড় বড় হলঘর সাজাতে অথবা প্রদর্শনীমূলক উদ্দেশ্যে। ভাল ভাল কাঠের ঘোড়া কেন চলবে না, তার কারণ নেই। এবং তারই নকলে অন্যান্য জন্তুও চলতে পারে, যেমন সাম্প্রতিক চলছে ঐ কায়দায় একটি হরিণ। অর্থাৎ, অনেকটা মোদিলিয়ানির আঁকা ছবি যেন মনে করাতে চায়—লম্বা গলা অতিলম্বিত।

বঙ্গবিপণি খোলা হয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে। বিক্রির হার বেড়েছে, কিন্তু স্থানাভাব। এবং মজুতের পরিমাণ কম। আরো বেশী করে জিনিসপত্র রাখতে হবে। এবং দরকার হলে গুদোম ভাড়া নিয়ে কাজ চালাতে হবে। এটার মালিক সদাশয় পশ্চিম বঙ্গ সরকার নন—পরিচালনা করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইনডাসট্রিজ করপোরেশন। স্থানীয় একটি পরিচালক কমিটি আছে যার সভাপতি হলেন শ্রী এন এন চ্যাটার্জি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রণালয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরীর স্ত্রী শ্রীমতী অরুণা চৌধুরী গোড়ায় এই বঙ্গ বিপণির সাজসজ্জা ইত্যাদিতে অনেক সহায়তা করেছেন। তাঁরই প্রস্তাবমতে এরা খুব শিগ্গিরই বাঙলা দেশের গয়নাগাটি রাখার চেষ্টা করছেন। বিক্রি হবে, কারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

কিন্তু একটা ব্যাপার যেন কেমন-কেমন লাগছে। বাটিকের কাজ বেশী বিক্রি নেই। দামের জন্যে নয়, হয়তো নক্শা, রঙ ইত্যাদি বদলাতে হবে। কিছু প্রচার-কাজও দরকার। আরো দরকার হালফিল বাজারকে স্টাডি করার। রুচি, ফ্যাশন, প্রয়োজন, স্থানীয় পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি। শুধু বাটিক নিয়ে নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও। বঙ্গ বিপণির যে দুজন মহিলা, শ্রীমতী প্রমীলা ও শান্তি ভট্টাচার্য, বিক্রয় কর্মে সহায়তা করেন, তাঁদেরও অভিমত এই যে, দোকানে আরো জিনিসের দরকার, এবং রুচি অনুযায়ী জিনিসপত্রের অদলবদল প্রয়োজন।

দোকান খুলে আজ রাজধানীতে বসে আছে প্রায় সবগুলো রাজ্যই। কিন্তু জিনিসপত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন মন (ও সঙ্গে সঙ্গে মনিব্যাগ) আকর্ষণ করে, তেমনি থাকা উচিত প্রদেশের কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনও। বঙ্গ বিপণিই এক পাশে রাখতে পারে ছোট্ট একটি ফুলের দোকান, বিশেষ করে রজনীগন্ধার। এখানে আমি নিজে কিনেছি ছ'টাকা ডজন, যখন কলকাতায় বিকি আট আনা কি বারো আনা। মরসুমে অন্যান্য ফুলও আসতে পারে। ম্যানেজার মশায় জানলাম এ ধরনের একটা প্রস্তাবও নাকি দিয়েছিলেন, কিন্তু কলকাতার কর্মকর্তারা রাজধানীর এই ছোট্ট দোকানটার যে খুব একটা গুরুত্ব দেন, মনে হয় না। আরো একটা দিক। সংগীত। বাঙলার গান, রবীন্দ্রসংগীত। দোকানে বিকেল বেলায় কাজকর্ম চলার সময়ে যদি নম্রস্বরে বাঙলার গান বাজানোর বন্দোবস্ত হয়, তা হলে ভালো লাগবে না কি? খুব একটা খরচ হবে, তাও নয়। ফিলিপস্-এর মতো কাউকে ভার দিলেই চমৎকারভাবে গুপ্ত-সংগীত-আবেশের সৃষ্টি করে দিতে পারে, যেমন থাকে আন্তর্জাতিক এয়ার-লাইন্সে-এ।

বাঙলা দেশ ও তার হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে সচিত্র পুস্তিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই এম্পোরিয়মে রাখলে প্রচার-কাজে সহায়তা হবে। অনেক খদ্দের জানতেও চান, বিশেষত হস্তশিল্প সম্বন্ধে।

শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (বিপণির মালিক 'করপোরেশন' সরকার স্থাপিত) ভরসা করে আছেন কবে খোলা হবে 'ভারত ভবন'। আরউইন রোডে যেখানে এখন আছে ফল ও শাকসবজির কয়েকটি দোকান, সেগুলো একদা উঠে যাবে। সেই জায়গা ও তার পিছনের জমি নিয়ে নাকি মাথা তুলে দাঁড়াবে মস্ত বড় এক ভবন। সেখানে সমস্ত প্রদেশের এম্পোরিয়মগুলো স্থান পাবে, আর পাবে প্রদেশগুলোর তথ্য-প্রচার কেন্দ্র। সে এক এলাহি কারবার। সুতরাং, এখন আর খরচ করি কেন? 'ভারত ভবন' আসুক, তখন দেখা যাবে দোকানপাট কী করে সাজানো-বসানো যায়।

জানি না, হয়তো আশী মন তেলের যোগাড় একদিন হবে, এবং 'ভারত ভবন'-ও একদিন মাথা তুলে উঠবে মন্ত্রী শ্রীখান্না সাহেবের দয়ায়। তবে কিনা দেশে তৈলাক্তকরণ কারবার এতো বেড়ে গেছে যে, আশী মন তেলের একসঙ্গে আবির্ভাব না হওয়া অবধি বিশ্বাস নেই।

খগেন দে সরকার

"ভবানীঠাকুরের শাণিত অস্ত্র"

॥ ২ ॥

আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী ও সীতারাম, এই তিনখানি উপন্যাস "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী" নামে পরিজ্ঞাত। এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ প্রথম দু'খানি সম্বন্ধে প্রকাশকাল থেকে বাঙালী মনীষিগণ নানা রকম মন্তব্য করেছেন; উল্লেখযোগ্য এমন কোন মনীষী নাই যিনি কোন উপলক্ষ্যে মন্তব্য করেন নি। চন্দ্রনাথ বসুর যে পত্রখানি আনন্দমঠ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি তা থেকে জানা যায় যে, দেবীচৌধুরানী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা জানতে পারা যায় নি। এই সব মন্তব্য পাঠ ও বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে মন্তব্যগুলির একপেশে অবস্থা: নৌকাখানা যেন একদিকে কাত হয়ে চলছে, সেটা তত্ত্বের দিক। উপন্যাসগুলিতে মানবীয় সুখ দুঃখের যে বিচিত্রলীলা আছে, বিরুদ্ধ ভাবের যে দ্বন্দ্ব আছে, সর্বোপরি এসব প্রকাশে যে কবিত্ব ও নাটকীয় সংঘাত আছে—সেদিকে লক্ষ করবার অবকাশ হয় নি সমালোচকগণের। গ্রন্থগুলিতে তত্ত্ব আছে, কিছু স্পষ্ট ও অধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু তত্ত্বাকারে প্রকাশিত না হয়ে শিল্পসংগত নিয়ম মেনে উপন্যাস হয়ে উঠেছে; তার রস ও রূপ প্রকাশটাই সাহিত্য সমালোচকের প্রধান কর্তব্য। সে কর্তব্য অবহেলিতপ্রায়। আমরা দেবীচৌধুরানী গ্রন্থের সেই রস ও রূপ দেখতে চেষ্টা করবো; অবশ্য তত্ত্বকেও অবহেলা করবো না।

তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বাহুল্যে দেবীচৌধুরানীর কাব্য রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে সত্য, তবে তত্ত্বও সব সময়ে যুক্তিসহ নয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী প্রবন্ধটি সুপরিজ্ঞাত। এ বিষয়ে নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনেকে এই প্রবন্ধটির উপরে নির্ভর করেন। কাজেই এটিকে উপলক্ষ্য করে আমাদের বক্তব্য নিবেদন অসংগত হবে না। তিনি লিখছেন—"এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরানীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা state বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্যায় দেখাইয়াছেন।" আগে এই অংশটুকু বিশ্লেষণ করা যাক; দেখা যাক তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে সংগতি আছে কি না।

আনন্দমঠে সমষ্টি ও সমাজ বলে কিছু আছে কি? সন্তানব্রত সামাজিক ক্রিয়া নয় বিশেষ উদ্দেশ্যে ও বিশেষ অবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ একটি সংঘ মাত্র। উদ্দেশ্য সাধিত হলে, অবস্থান্তর ঘটলে আবার সন্তানগণ স্ব স্ব গৃহে ফিরে যাবে সংঘরূপ কাটিয়ে আবার ব্যক্তিরূপ লাভ করবে। বাংলা দেশে একটা সমাজ অবশ্যই ছিল আনন্দমঠে তার কোন চিহ্ন নাই, না থাকবার কারণ মন্বন্তরে সে সমাজ মৃত বা মৃতপ্রায়। তাদেরই একজনকে দেখতে পাই—মহেন্দ্র সিংহের মধ্যে। সমাজে অবশ্যই তার পড়ার প্রতিপত্তি ও ক্রিয়া ছিল কিন্তু এখন মন্বন্তরের দিনে সে "শাপেনান্তং গমিতঃ মহিমা" তাই তাকে স্ত্রী কন্যা নিয়ে পথে বের হয়ে পড়তে হয়েছে। যদিবা তখনো সমাজের অস্তিত্ব থাকে তবে সে সমাজ এমন মুমূর্ষু যে তাকে দিয়ে কোন কাজ হওয়ার নয়;—তাই সত্যানন্দকে সঙ্ঘ সৃষ্টি করতে হয়েছে। সমাজ ও সংঘ এক নয়, যেমন সামরিক বাহিনী ও সমাজ এক নয়। এ হল তথ্য। এ তথ্যের মিল পাই না তত্ত্বের সঙ্গে। কাজেই সমালোচক সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া বলতে ঠিক কী বুঝেছেন বোঝা গেল না। তিনি এক সঙ্গে "সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়ার" উল্লেখ করেছেন। এখানেও গোল। সমষ্টি ও সমাজ এক নয়। সমষ্টি একটা কৃত্রিম সংস্থা সাময়িক উদ্দেশ্যসাধন তার লক্ষ্য যেমন সন্তান দল বা সৈন্য দল। সমাজ একটি সজীব সংস্থা, কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন তার লক্ষ্য নয়; প্রয়োজন কালে তার মধ্যে নানা সংস্থার উদ্ভব হতে পারে, তবু দুই এক নয়, যেমন ঢেউ ও নদী। আমি যতদূর বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীত। তিনি বোধকরি বলতে চান যে কোন আন্দোলন বা ব্রতকে ধারণ করবার যোগ্য শক্তিশালী সমাজ না থাকলে তার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। সে সমাজ নাই বলেই সন্তানব্রতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র, জীবানন্দ ও শান্তি হিমালয়ে চলে গিয়েছে তপস্যা করতে; আর মহাপুরুষ এসে সত্যানন্দকে নিয়ে চলে গিয়েছেন হিমালয় শিখরে যেখানে মাতৃমন্দির আছে। দেশের ভার? যে দেশ সন্তানগণের উদ্যমে অরাজকতা মুক্ত হল সে দেশের ভার ইংরাজের উপরে পড়লো আর তা মহাপুরুষের অভিপ্রেত। আমরা সমাজ বলতে তত্ত্বত যাই বুঝি না কেন আসলে মনের মধ্যে থাকে মধ্যবিত্ত সমাজের মূর্তি। যদুনাথ সরকার বলেন বাদশাহী আমলে মধ্যবিত্ত সমাজ বলে কিছু ছিল না; এ সমাজ ইংরাজ শাসনের সৃষ্টি। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রও একথা মানতেন তাই আনন্দমঠে এত উদ্যম করবার পরেও অনায়াসে ইংরাজের উপরে দেশের ভার ছেড়ে দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ইংরাজ শাসনে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলে, যে মধ্যবিত্ত সমাজ

আনন্দমঠের বহুকাল পরে সন্তানব্রতের সমাজ পরশাসনের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছে: উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তৎকালে সমাজ বা সামাজিক ক্রিয়া ছিল না—এটাই খুব সম্ভব আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, শিল্পে প্রতিপাদ্য বিষয় বলে যদি কিছু থাকে।

তারপরে "দেবীচৌধুরানীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন" বঙ্কিমচন্দ্র। কঠোর সাধনার কঠিন নেহাই-এর উপরে রেখে অনুশীলনের তপ্ত হাতুড়ি পিটিয়ে পাঁচ বছর ধরে প্রফুল্লকে গড়ে তুলেছেন বা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন ভবানী পাঠক। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি? অবশ্য শাস্ত্র ও দর্শন তার অধিগত হয়েছে; ধর্ম শিক্ষার শেষে পাঁচ বছর কর্মশিক্ষা করেছে, তাতেও তার উন্নতি ঘটেছে; কিন্তু ততঃ কিম্? ভিতরকার চিরন্তনী নারীর কি এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? বরঞ্চ সেই চিরন্তনী নারীসত্তা আরও মজবুত হয়ে উঠেছে। সে একাদশীতে মাছ খেয়েছে, মাথার সিঁদুর ও হাতের লোহার কথাটা বঙ্কিমচন্দ্র বেমালুম চেপে গিয়েছেন; ছিল কি না ভবানী পাঠকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে এবং প্রথম সুযোগেই "আ ছি ছি" কাকে বলবো? ব্রজেশ্বর তো গৃহী, তবে দেবীকেই বলি, কিন্তু সে কি সত্যই দেবী? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে ষোল আনা গৃহিণী, গৃহে ফিরবার জন্য দুই পা বাড়িয়ে রেখেছে। ভবানী পাঠকের দশ বৎসরের শ্রম ও শিক্ষার মূর্তিমতী ব্যর্থতা দেবীচৌধুরানী। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা যাবে; এখন এই পর্যন্ত।

"সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা state বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে"—বঙ্কিমচন্দ্র তাই নাকি দেখিয়েছেন। রাজনীতির বিচারে সীতারামকে সাধক বলতে আপত্তি নাই, কেননা, সামান্য অবস্থা থেকে একটা রাজ্য, তা যতই ছোটখাটো হোক না কেন, গড়ে তোলা সামান্য শক্তির কাজ নয়। কিন্তু সমাজ ও সাধকের সম্মিলন হল কোথায়? রাজ্যপত্তনে সীতারামের প্রধান সহায় চন্দ্রচূড় ঠাকুর আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সীতারামের সুগঠিত সৈন্য দলকে সমাজ বলা যায় না। সীতারামের রাজ্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টার ফল। কিন্তু সমাজ কোথায়? সমাজ ও সাধকে সম্মিলন কোথায়? সামাজিকগণ তো রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ, আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর সম্বন্ধে যারা উদাসীন। তাদের জীবনের ধুয়া, "আপনার, আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।" সীতারামের রাজ্যের সামাজিক ভিত্তি ছিল না, তাই এত সহজে ভেঙে পড়লো; আর সমাজ ছিল না বলেই সমাজে ও সাধকে সম্মিলন ঘটে নি, ঘটলে এমন দুর্দশা হত না। শক্তি বা সমাজ না থাকলে রাজার অভাবে বা পরাজয়ে রাজত্ব ভেঙে পড়ে, এ দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এ ধ্রুব ধারণা তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। কেবল দুটি ব্যতিক্রম তিনি লক্ষ করেছেন, একটি মহারাষ্ট্রে, অন্যটি মেবারে। শিবাজীর সাধনায় একটি শক্তিশালী সমাজ গঠিত হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুকাল তাঁর রাজ্য অটুট ছিল। মেবারে সুসংহত শক্তিশালী সমাজ ছিল, বারে বারে সেখানে সাধকে ও সমাজে সমন্বয় ঘটে মোগল বাদশাহের হস্তপ্রসারণে বাধা সৃষ্টি করেছে।

তার মধ্যে একবারের কথা তিনি বিবৃত করেছেন রাজসিংহ উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ীতে মৌলিক অভাব তার সম্ভাব রাজসিংহে। এই তিনখানার পরে রাজসিংহ উপন্যাস লিখবার এ একটা প্রধান কারণ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে আরও দুটি অংশ উদ্ধার করছি, দেখা যাবে দুয়ে ঠিক সঙ্গতি নাই।

"বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী এবং সীতারাম লিখিয়া বাঙালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বন্দেমাতরম বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানি উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিত মাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙালিত্বের পরিচায়ক, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বাঙালী, দেবীচৌধুরানী বাঙালীর কুলাঙ্গনা, সীতারাম বাঙালী ভৌমিক, চন্দ্রচূড় বাঙালী ব্রাহ্মণ। এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। বন্দেমাতরম গানই বাঙালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে।"

আবার অন্যত্র আছে—

"এতটা শিক্ষার পরেও প্রফুল্ল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তান্ত্রিক মতে শাক্ত ভৈরবী হইতেও পারেন নাই। ...কিন্তু প্রফুল্ল চরিত্র অপূর্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙালীয়ানা মাখান। উহা বাঙালীর ঘরে কখনো ছিল না, বাঙালীর ঘরে কখনো হইবে না।"

অংশ দুটির অসংগতি অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমাংশে দেবীচৌধুরানী উপন্যাস ও মানুষটি একান্তভাবে বাঙালী; দ্বিতীয়াংশে আদৌ বাঙালী ঘরের নয়। এই অসঙ্গতির কারণ কি? প্রত্যেক বাঙালীর মধ্যে পাশাপাশি দুটি মানুষ বিরাজমান, একজন বাঙালী, একজন ভারতীয়; আমরা যখন অনুভব করি তখন বাঙালী, যখন চিন্তা করি তখন ভারতীয়। এরূপ মিলন অন্য প্রদেশের লোকের মধ্যেও সম্ভব, তবে এখানে বাংলা ও বাঙালীর কথাই হচ্ছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধটি এই মিশ্রসত্তার ক্রিয়ার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত।

প্রথমাংশের প্রতিপাদ্য কেন মানা যায় না তার বিস্তারিত আলোচনা আনন্দমঠ প্রসঙ্গে করেছি, এখানে পুনর্বিন্যাস অনাবশ্যক। "তবে বন্দেমাতরম গানই বাঙালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে।" স্বীকার করতে আপত্তি নাই, তবে সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতকে মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করতে যদি না শিখিয়ে থাকে তবে বলতে হবে বন্দেমাতরম সংগীত রচনার মূলে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কিন্তু "বন্দেমাতরম বাঙ্গালার গান সমগ্র ভারতবর্ষের নহে"—এ কথা কিছুতেই স্বীকার্য নয়। তার চেয়েও বেশি, এরূপ উক্তি অশেষ ক্ষতির কারণ। গত একশ বছরের মধ্যে এদেশে তিনটি মহামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে: বন্দেমাতরম, জনগণমন অধিনায়ক ও জয় হিন্দ্; তিনটিরই উদ্গাতা বাঙালী, তবে লক্ষ্য বঙ্গদেশ নয়, ভারতবর্ষ।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে লেখককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, প্রফুল্ল বাংলার নয়। উদ্দীপনাময় অনুভূতি ও চিন্তার পার্থক্য এখানে জাজ্বল্যমান।

আমি নিজে বাঙালী হলেও যত্রতত্র বাঙালীপনা নিয়ে আস্ফালন করাকে হীনম্মন্যতা জ্ঞান করি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিরাট পুরুষের মহিমা বিচার করতে গেলে ভারতীয় প্রতিষ্ঠাভূমি বা সর্বমানবীয় প্রতিষ্ঠা ভূমির আবশ্যক, কেবল বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা ভূমি যথেষ্ট নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেবীচৌধুরানী উপন্যাস ও প্রফুল্লকে বাঙালী বলে গ্রহণ করতে বাধা নাই। ভারতবোধ ও বঙ্গবোধ পরস্পর পরিপূরক পরস্পর বিরুদ্ধ নয়।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, আনন্দমঠকে যখন "বাঙালীর বিষয়" বলে স্বীকার করি না, অথচ দেবীচৌধুরানীকে বাঙ্গালার বলে স্বীকার করি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে নিবেদন করি যে সীতারামকে আরও অধিক পরিমাণে একেবারে হাড়ে মাসে বাঙালীর বিষয় বলে মনে করি। আমার এই মনোভাবে কোথাও অসংগতি আছে বলে মনে হয় না। আনন্দমঠে যার সাধারণ প্রকাশ, দেবীচৌধুরানী ও সীতারামে তারই স্থানগত ও কালগত প্রকাশ; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে দেবীতে কাল্পনিক, সীতারামে ঐতিহাসিক। আনন্দমঠ থেকে সীতারাম পৌঁছনো আর কিছুই নয়, আসলে নির্বিশেষ থেকে বিশেষ
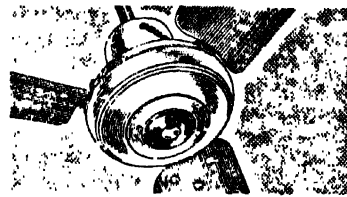
বিবর্তন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তত্ত্ব থেকে উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্ম্মুদ্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্ম্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কেননা, "অনুশীলন ধর্ম" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণ চরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণ চরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপরে উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণ চরিত্র সেই উদাহরণ।"

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সব কথা বলেন নি, অন্যত্র বলেছেন: অনুশীলন ও কৃষ্ণচরিত্রের মাঝখানে দেবীচৌধুরানী। অনুশীলনে তত্ত্ব, দেবীতে কাল্পনিক দেহ এবং কৃষ্ণচরিত্রে ঐতিহাসিক দেহ। এক ধারায় আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী ও সীতারাম; অন্য ধারায় অনুশীলন, দেবীচৌধুরানী ও কৃষ্ণচরিত্র, দুই ধারা পরস্পরকে একবার সন্ধিস্থানে অতিক্রম করেছে দেবীচৌধুরানীতে। এই জন্যে দেবীর একটু বিশেষ গুরুত্ব।

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে,

প্রকৃত অনুশীলন ছাড়া মহৎ কার্যসিদ্ধ হয় না। সন্তানগণ কেহই অনুশীলিত নয়: প্রফুল্লকে যেভাবে পাঁচ পাঁচ দশ বৎসর অনুশীলন ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়েছে, সন্তানগণকে সে রকম কিছুই করতে হয় নি; কাহিনীর মধ্যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া দেখাবার সুযোগ না থাকলে অন্তত মন্তব্য রূপেও জানাতে পারতেন, তা-ও নাই; শুভ গ্রহণেচ্ছুগণ আসছে এবং শপথ গ্রহণ করে দীক্ষিত হচ্ছে, যেমন মহেন্দ্র ও শান্তি দীক্ষিত হয়েছে; কাজেই সন্তানগণ যে অনুশীলিত নয় স্বীকার করতে হয়। আর অনুশীলিত নয় বলেই তাদের দেশাত্মবোধ স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ভূমি পায় নি। মহেন্দ্র সংসারে ফিরে গিয়েছে, জীবানন্দ ও শান্তি তপস্যা করতে গিয়েছে, ভবানন্দ মারা গিয়েছে, অন্যান্য সন্তানগণ কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না, খুব সম্ভব সংসারে ফিরে গিয়েছে, আর সন্তানের শ্রেষ্ঠ সত্যানন্দ মহাপুরুষের সঙ্গে হিমালয়ে চলে গিয়েছে, আনন্দহীন আনন্দমঠ শূন্যতায় মিলিয়ে গিয়েছে। মহাপুরুষ অবশ্য দেশের ভার ইংরাজের উপরে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু সন্তানগণের মনে দেশের প্রতি টান আভাসে ইংগিতেও আর প্রকাশ পায় নি। একি অনুশীলনের ফল?

অপরপক্ষে প্রফুল্ল যথারীতি অনুশীলিত হয়েছে পাঁচ বৎসর ধর্মশিক্ষায়, পাঁচ বৎসর কর্ম শিক্ষায়; তারপরে আরও কিছু কাল রাণীগিরি করেছে, অবশেষে তাকেও দেখতে পাওয়া গেল পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে। কাজেই দেবীরানীর রাজত্বেরও পরিণামে আনন্দমঠের অনুরূপ, দেশে শান্তি ও শৃংখলার ভার পড়েছে ওয়ারেন হেস্টিংসের উপরে। এ দুই মহৎ ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কী বলতে চান?

মনুষ্য সভ্যতার দুটি শক্তি সক্রিয়, সমাজ ও রাষ্ট্র। ব্যক্তি বা ইনডিভিডুয়াল ঐ দুটির কোন একটিকে অবলম্বন করে সক্রিয় হয়ে ওঠে, নিজের শক্তি প্রকাশের সুযোগ পায়। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথক ছিল; হিন্দু যুগে এ দুয়ের মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ ছিল, কাজেই কখনো সংকট উপস্থিত হয় নি। তারপরে দীর্ঘকাল চলেছে বিদেশীর শাসন, তাদের ধর্ম আলাদা, পরধর্ম ও পরমত সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা তাদের মধ্যে প্রবল। সমাজ ও রাষ্ট্র তখন থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে আরম্ভ করলো আর ক্রমে দেখা দিতে লাগলো উভয়ের মধ্যে বিরোধ; অসহযোগিতা নয় রেষারেষি। তৎসত্ত্বেও কোন রকমে সমাজ তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হল। ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধের জাতীয়ভাব এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ, সেই সঙ্গে দেশনায়ক ও সমাজপতি বরণের আইডিয়ার মূলে এই ঐতিহাসিক সত্য। রাষ্ট্রশক্তি দীর্ঘকাল হস্তচ্যুত হওয়ায় অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রশক্তির অসহযোগিতা ও বিরোধ সত্ত্বেও সমাজকে প্রবল করে তোলা অসম্ভব নয়, আর সেই পথেই দেশের মুক্তি আসবে।

"স্বদেশী আন্দোলনের" তত্ত্বে এখানে দুর্বলতা। এ যুগে যখন কালের হাওয়া সবটা লেগেছে রাষ্ট্রশক্তির পালে; অর্থনীতি যখন কৃষি সম্পদ থেকে যন্ত্র সম্পদে পা বদলাচ্ছে, আর বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি যখন সমাজ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন তখন রাষ্ট্র নিরপেক্ষ সামাজিক শাসন সম্পূর্ণ অচল। সেই জন্যই আনন্দমঠ ও দেবীরানীর রাজগীর মতো স্বদেশী আন্দোলনও মহৎ ব্যর্থতার তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে কালের হাওয়ার দিক পরিবর্তন বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই আনন্দমঠের যুদ্ধবিগ্রহের অন্তে এবং দেবীরানীর রাজগীর অন্তে "স্বদেশী সমাজ" স্থাপন না করে সরাসরি দেশের ভার রাষ্ট্রশক্তির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন—যদিচ সে রাষ্ট্রশক্তি বৈদেশিক। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন নূতন যুগে রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া সমাজ শক্তি নাই; তিনি বুঝেছিলেন রাষ্ট্রশক্তির বিচিত্র শক্তির সমবায়ে, শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা, উৎপাদন ও জীবিকার যুগোচিত ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে নূতন সমাজ গড়ে উঠবে। তখন সেই নবগঠিত সমাজ যথোচিত শক্তি সঞ্চয়ের পরে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তিকে বাধা দান করতে সমর্থ হবে, কুকুরের রাজনীতি তখন বৃক্ষের রাজনীতিতে পরিণত হবে।

হ'য়েওছে তাই। ইংরাজ শাসনের ফলে নানা কার্যকারণের সমবায়ে এদেশে প্রবল মধ্যবিত্ত সমাজ গঠিত হ'য়ে উঠেছে। অন্য দেশে যাকে ইনটেলিজেন্সিয়া বলে আমাদের দেশে বস্তু মধ্যবিত্ত সমাজ। এ সমাজ শিক্ষায় অগ্রসর, অর্থশক্তিতে এমন সম্পূর্ণ নয় যে বিলাসপরায়ণ ও অলস হ'য়ে পড়বে, এবং অনেকাংশে সরকার নিরপেক্ষ। সহজেই এদের হাতে সামাজিক নেতৃত্ব এসে পড়েছে এবং সেই সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্ব কালক্রমে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হ'য়েছে। গান্ধী আন্দোলনের ভিত্তি ব্যাপকতর হলেও তারও নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত সমাজ।

আগে আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীকে ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত বলেছি, বলা বোধ হয় উচিত হয়নি। আর যদি বা ব্যর্থতা হয় তার দায়িত্ব লেখকের নয়। তিনি এমন এক সংকট স্থানে এসে থেমেছেন যার পরে আর পথের নিশানা নেই। পথ তৈরি না হ'য়ে ওঠা অবধি যেমন সৈন্যদল অপেক্ষা করে, সেইভাবে অপেক্ষা করেছে আনন্দমঠের সন্তানগণ এবং দেবীরানীর বরকন্দাজগণ; পথ তৈরি হ'য়ে উঠলে আবার তারা চলতে শুরু করবে; করেছে, মধ্যবিত্ত সামাজিক অস্তিত্বের নবগঠিত পথ দিয়ে দেড়শ বছর পরে। দক্ষ সেনাপতি যে অবস্থায় সৈন্য-দলকে নামিয়ে রাখেন বঙ্কিমচন্দ্রও সেই অবস্থায় সেইভাবে দেশব্রতীদের থামিয়ে রাখতে বাধ্য হ'য়েছেন। তাতে দক্ষতাই প্রমাণ হ'য়েছে, নিপুণতার বা চিন্তাশীলতার অভাব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এই যে, ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহৎ কার্যকে ধারণ করে রাখতে গেলে শক্তিশালী সমাজ থাকা আবশ্যক; নতুবা সে কার্যের ফল অবিলম্বে নষ্ট হ'য়ে যায়, কারো ভোগে লাগে না। আবার সেই শক্তিশালী সমাজ রাষ্ট্রের বাহন; সমাজ ও রাষ্ট্র দুয়ে এক, একে দুই; এক অথচ এক নয়, দুই অথচ আলাদা নয়। এ রকম যেখানে ঘটেছে সেখানে দুয়ের যোগাযোগের ফলে দেশ অজয়। বঙ্কিম-চন্দ্রের মতে আমাদের দেশে এমন কখনো হয়নি, না হিন্দু যুগে, না মুসলমান যুগে; ব্যতিক্রম কেবল মেবার ও মহারাষ্ট্র। তাই আমাদের দেশে, "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?" তাই "এদেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়।" আর তাই আমাদের পূর্ব পরিচিত, রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ভুল রাজ্যের পতন সংবাদ শুনে তামাকটা , সাজে, তার বেশী তাদের আর কর্তব্য আছে মনে করে না। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন ব্যক্তি বিশেষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, হোক না সে সত্যানন্দ বা সীতারাম, রাষ্ট্রশক্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তার নাই। সেজন্য আবশ্যক সংহত, সুগঠিত, শক্তিশালী সমাজ। এ বস্তু আমাদের দেশে কখনো ছিল না। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের ব্যর্থতায় এই অভাবটাই চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সে অবস্থার উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত দেশের সে রাষ্ট্রশক্তি বৈদেশিক। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই ইংরাজ শাসনের অবসান কামনা করতেন তবে এ কার্য সাধিত হওয়ার আগে নয়। তাঁর মতে নেতৃত্ব ও শুভবুদ্ধিহীন জনসমষ্টি সমাজ নামের অযোগ্য তাই "সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন-মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।" যতদূর বুঝি এই হ'ল গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "ত্রয়ী"র রাজনৈতিক তত্ত্বগত মর্মকথা।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিজ্ঞান

মরুভূমি উদ্ধার গবেষণা

রাজস্থানে হালে এক মরুভূমি উদ্ধার গবেষণা স্থাপিত হয়েছে। খাদ্যোৎপাদনের দিক থেকে ব্যাপারটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পৃথিবীর মোট ৪ কোটি বর্গ কিলোমিটার মরুভূমির মধ্যে ৪৭৭৬৪৫ বর্গ কিলোমিটার ভারতের ভাগে পড়েছে। সেই মরুভূমি যাতে আরো ভূমি গ্রাস করতে না পারে তার এবং যে মরুভূমি আছে তা চাষের জন্য উদ্ধার করার ব্যবস্থা করা দরকার।

উত্তর গোলার্ধে আজ যেসব অঞ্চল মরুভূমি হয়ে গিয়েছে সুদূর অতীতে সেখানেই ছিল পৃথিবীর অর্ধেক লোকের বসবাস। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশে ছড়িয়ে আছে সেই মরুভূমি। আর সেই সঙ্গে যদি সেই সব অঞ্চল ধরা যায় যেগুলি পুরোপুরি মরুভূমি হলেও ঊষর ও পতিত, তাহলে মানুষের ব্যবহারের জন্য যে জমি বাকি থাকে তা পৃথিবীর মোটে দুই তৃতীয়াংশ। তার উপর বছরের পর বছর নতুন নতুন এলাকা মরুভূমির গর্ভে চলে যাচ্ছে।

মরুভূমির চরিত্র কী? মরুভূমি মানে কি সবক্ষেত্রে সাহারা বা গোবির মত উত্তাল বালুকা সাগর? না তা নয়। অন্য ধরনের মরুও আছে—যেমন রাজস্থানের ঊষর থর-মরু বা সাইবিরিয়ার স্টেপ্ ভূমি। সেই নগ্ন, বন্ধ্যা পার্বত্য তেপান্তরের মাঠগুলির সবটুকুই বালি নয়। মরুভূমি বলতে মোটামুটি বোঝায় এমন একটা অহল্যা অঞ্চল যেখানে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা ছাড়া কোন কিছু চাষবাস করা অসম্ভব। প্রতিটি মহাদেশেই ঐ ধরনের অহল্যা ভূমি আছে—আফ্রিকায় আছে ভেল্ডেট্, আমেরিকায় আছে সাভানা। এই সব মরু বা অহল্যা ভূমিতে দিনে রাত্রে তাপমাত্রার দারুণ পার্থক্য হয় বলে ঝড়ের মত বেগে গরম হাওয়া চলে—যেমন রাজস্থানের লু, আফ্রিকার সিরক্কো। বৃষ্টি প্রায় হয় না বললেই চলে, কদাচিৎ এক পসলা। ভারতে মরুভূমি পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। সেখানে যা কয়েকটি নদী আছে সেগুলি অধিকাংশ সময় শুকনো থাকে। মান্ধাতার আমল থেকে সেখানকার লোকে নালা কেটে বৃষ্টির জল জমা করে আর কুয়া খুঁড়ে সামান্য কিছু খণ্ডবিক্ষিপ্ত জমিতে ফসল ফলিয়ে আসছে। কিন্তু হিন্দু রাজত্বের যুগে, বিশেষ করে ভোজ রাজার আমলে রাজস্থান মানুষের হাতে গড়া বাঁধ ও পুষ্করিণীর জন্য বিখ্যাত ছিল। ছোট ছোট গিরি নির্ঝরিণীর জল বাঁধ দিয়ে আটকে সরোবর তৈরি করা হতো। শক বংশীয় রাজা রুদ্রদমন কাথিয়াবাড়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন গির্নার হ্রদ, যার চারদিকের বাঁধ ছিল ১০০ ফুট চওড়া। গির্নার আজ বিলুপ্ত কিন্তু আজমীরের আনাসাগর ও উদয়পুরের পিচোলা আজও রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে, যদিও চাষবাসে সেগুলি বিশেষ কোন কাজে আসে বলে মনে হয় না। হিন্দু আমলের কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থাগুলি আমরা বাঁচিয়ে রাখবার বা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করিনি অথচ সিংহল সরকার সেখানকার প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থা ও বিশাল জলাশয়গুলি পুনরুদ্ধার করে কাজে লাগাচ্ছেন।

এখন কথা হচ্ছে আজকের বিজ্ঞানের যুগে মরুভূমির বিস্তার রোধ করার এবং ঊষর অঞ্চল উদ্ধার করে চাষবাস করার কি

উত্তর আফ্রিকার মরুতে তেল ছড়িয়ে গাছ লাগানো হচ্ছে

ধরনের উপায় উপকরণ বার হয়েছে যা হচ্ছে যেগুলি আমরা কাজে লাগাতে পারি?

বিজ্ঞানীরা এমন সব রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করছেন যা বালির উপর ছড়িয়ে দিলে সেই বালি কিছুদিন আর উড়ে বা এগিয়ে গিয়ে নতুন এলাকা গ্রাস করতে পারে না। সেই ফাঁকে সেই জায়গায় এমন সব গাছ লাগিয়ে দেওয়া যায় যা মরু অঞ্চলের বাসিন্দা—যেমন লুসার্ন। গাছগুলির শিকড় গজালেই জমিটা শক্ত হয়ে যাবে, আর বালি উড়বে না। অবশ্য গাছগুলির জন্য কৃত্রিম জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজস্থানে কয়েকটি নদী আছে—যেমন নর্মদা, চম্বল, তাপ্তী। সেগুলি গ্রীষ্মে ও শীতে একেবারে শুকিয়ে যায়। তাই সেগুলিতে বাঁধ দিয়ে বর্ষার জল কৃত্রিম হ্রদে জমা করতে হবে এবং রাজস্থান

লীবিয়ার মরুতে 'এসো' কর্মিদল

চারা লাগিয়ে তৈল [illegible]
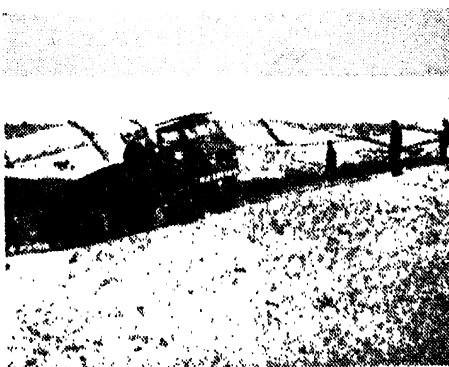
এক বছর পরে গাছগুলি বড় হয়ে উঠে নিজেরাই ঝোড়ো হাওয়া আটকে দেয়

খালের মত বহু প্রণালী-উপপ্রণালী দিয়ে সেগুলি মরু অঞ্চলে প্রবাহিত করতে হবে। ৯ম শতাব্দীতে রাজা অবন্তীবর্মণ যদি সিন্ধু ও ঝিলমের জলধারাকে যেদিকে খুশি বইয়ে দিতে পেরে থাকেন তাহলে বিংশ শতাব্দীতে রাজস্থানের নদীগুলিকে আয়ত্তে আনতে না পারার কোন যুক্তিসংগত কারণই থাকতে পারে না।

পেট্রোলিয়াম থেকে এক রকম ওষুধ তৈরি করা হয় যা বালির উপর ছিটিয়ে দিলে বালি আর উড়তে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘণ্টায় মাত্র ১৭ মাইল বেগে হাওয়া চললে বালি-আড়িগুলির বালি উড়তে থাকে। কিন্তু তৈলজাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দিলে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে হাওয়া দিলেও বালি ওড়ে না। তারপর বালি বা শুকনো মাটির উপর তেল ছড়িয়ে দিলে মাটির ভিতরের জলও আর বাষ্প হয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। সেই জল গাছ গাছড়া গজাতে সাহায্য করে। ট্রিপলিটানিয়ায় এই ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সেখানে এমন সব বালিআড়ির উপর ইউক্যালিপ্টাস ও অন্যান্য গাছের চারা লাগানো হয় যেগুলির তলায় জল আছে। চারা লাগিয়ে বালির উপর তৈল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এক বছর বাদে চারাগুলি ৫।৬ ফুট লম্বা হয়ে যায় এবং ঝড় ঝাপটায় সেগুলি উপড়ে নষ্ট হয়ে যায়নি। দেখা গিয়েছে যে ৭½ বিঘা জায়গার জন্য মাত্র ১ টনের মত তৈল লাগে। ব্রিটিশ "এসো রিসার্চ" কোম্পানী এইভাবে লীবিয়ায় ২০০০ একর মরু এলাকা উদ্ধার করার জন্য কণ্ট্রাক্ট নিয়ে এরই মধ্যে ১০০০ একর এলাকায় তৈল সিঞ্চনের কাজ শেষ করে ফেলেছে। টিউনিসিয়া, ইসরাইল, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা প্রভৃতি দেশেও মরু উদ্ধারের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভারতেও শুরু হয়েছে গবেষণা।

সমস্ত মরুভূমির ক্ষেত্রে উদ্ধার বিধি যে একই রকম হবে তা নয়। স্থানীয় জলবায়ু, ভূমির গঠন ইত্যাদির বিশেষত্বের উপর ব্যাপারটা নির্ভর করে। ধরুন যেসব বালুকাময় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০ মিলিমিটার সেখানে বালি ঢিবিগুলির কিছু নিচে আর্দ্রতা থাকে। উপরে তেল ছিটিয়ে দিলে সেই জল আর বেরিয়ে যেতে পারে না। আবার সমুদ্রের বেলাভূমিতে যেখানে সদা সর্বদা হাওয়া বয়—সেখানে বালি বসাতে তেল কিছু বেশি লাগে—প্রতি ৭½ বিঘায় ১½ টনের মত।

মরুভূমি ছাড়াও যেসব এলাকায় বৃষ্টি কম এবং তাপমাত্রা বেশি সেখানে মাটির নিচের জল যাতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে না পারে তার বন্দোবস্ত করতে পারলে সেখানে ফসল ফলানোর সুবিধা হতে পারে। এই কাজে এক রকমের কালো রঙের পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার হয় যা জল আটকায় এবং কালো রঙের জন্য সূর্যের তাপের বেশ কিছুটা টেনে নিতে পারে। সেই জেলি ব্যবহার করে শুকনো জমিতে গাজর, পেঁয়াজ, লেটুস, শালগম, মুলো ইত্যাদির ফলন আগেকার তুলনায় শতকরা ২২ থেকে ৬৭ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ঊষর অঞ্চলে ভূগর্ভের জল পাম্প করে বার করে সেচের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। সেই জল যদি লবণাক্ত হয় তাহলে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জল লবণমুক্ত করে ব্যবহার করা সম্ভব। রাজস্থানের ঊষর বেলাভূমিতে এই কাজে ট্রম্বের পারমাণবিক সংস্থা সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া সমুদ্রের জলও লবণমুক্ত করে প্রণালী ও পাইপের সাহায্যে মরুবক্ষে প্রবাহিত করা সম্ভব।

রাজস্থানের ঊষর মরু পেট্রোলিয়ামের সাহায্যে উদ্ধার করে নিতে পারলে তাকে চমৎকার গোচারণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে। একটি জন্তুর চরে খাবার জন্য ৫ থেকে ১০ হেক্টার (১ হেঃ=২½ একর) জমির প্রয়োজন। উদ্ধার করা জমিতে লুসার্ন বা ঐ জাতীয় গাছের চাষ করলে বছরে ৬।৭ বার ফসল পাওয়া যাবে এবং প্রতি হেক্টার অন্তত ১০টি পালিত পশুর পেট ভরাতে পারবে। অস্ট্রেলিয়া ও মঙ্গোলিয়ার ঊষর ভূমি এইভাবে চারণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার ফলে মাথাপিছু গবাদি পশুর সংখ্যার দিক থেকে এই দুটি দেশ পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় মুদ্রায় বিদেশী প্রভাব

দেশ পত্রিকায় ৩৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ীর লেখা "ভারতীয় মুদ্রায় বিদেশী প্রভাব" নামক প্রবন্ধটিতে বহু তথ্যগত ভুল ও পরস্পর বিরোধী উক্তি চোখে পড়ল। প্রবন্ধটির সম্যক সমালোচনা করতে হলে দীর্ঘতর প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়; সে চেষ্টা না করে কতকগুলি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের উল্লেখ করব।

১। গ্রীকরাজ Demetrius-এর নাম লেখক বিকৃতভাবে 'ডিমেস্ট্রিয়াস' লিখেছেন। মুদ্রালেখে এ নামটি প্রাকৃত ভাষায় 'দিমেত্রিয়' গ্রীক ভাষায় 'দেমেত্রিয়ুস' বলে লেখা হয়। এই রাজার দ্বিভাষিক মুদ্রায় নাকি গ্রীক ভাষায় এবং ভারতীয় (?) ভাষায় খরোষ্ঠী অক্ষরে নানা 'কাহিনী' সংবদ্ধ ছিল! বলা বাহুল্য, এখানে 'কাহিনী' কথাটি ইংরাজী legend-এর অক্ষম ও হাস্যকর অনুবাদ। মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখায় legend কথাটি মুদ্রালেখ বা inscription on coins হিসাবে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য রাজা Enthydemus I-এর পুত্র (শুধুমাত্র গ্রীক ভাষায় মুদ্রানির্মাণকারী প্রথম দিমেত্রিয় নন—পরবর্তীকালের (সম্ভবত তৃতীয়) দিমেত্রিয়। এঁর মুদ্রার মুখ্য দিকের গ্রীক লেখনের হুবহু অনুবাদ হিসাবে গৌণ দিকে প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী অক্ষরে "[এটি*] মহারাজ অপরাজিত দিমেত্রিয়ের "[মুদ্রা*]" এই লেখন (legend) থাকে। তাছাড়া যে গ্রীক রাজা এ দেশে প্রথম দ্বিভাষিক মুদ্রাঙ্কন করান, তিনি এবুক্রাতিদ (Encratides I) দিমেত্রিয় নন। (cf. A. N. Lahiri, Corpus of Indo- Greek coins, p. 39).

২। প্রবন্ধকার বলছেন, "আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের (৩২৭ খৃঃ পূঃ) পরোক্ষ ফল হিসেবে গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে ভারতে মুদ্রা প্রচলিত হয়। এবং তৎকালীন মুদ্রাগুলি হুবহু গ্রীক মুদ্রার মতই বিভিন্ন ধাতুতে তৈরি হয়েছিল। আকৃতি, ওজন ও গঠনের দিক থেকেও খুব একটা পার্থক্য ছিল না।" লেখক এই সব বিচিত্র তথ্য কোন গবেষণার ফলে লাভ করেছেন জানি না। তবে বলতে পারি, ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রার ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল হিসেবে গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে ভারতে মুদ্রা প্রচলিত হয় নি। আকৃতি, ওজন ও গঠনের দিক দিয়ে সমসাময়িক ভারতীয় মুদ্রার সঙ্গে গ্রীক মুদ্রার বিন্দুমাত্র মিল নেই। আকৃতিতে গ্রীক মুদ্রার প্রত্যেকটি ছিল 'গোল'; ভারতীয় মুদ্রার অধিকাংশই হ'ত চারকোণা ধরনের। তৌল রীতির দিক থেকে গ্রীক স্বর্ণমুদ্রা স্তাতারের (Stater) ওজন ছিল প্রায় ১৩৪ গ্রেন, রৌপ্যমুদ্রা দ্রাখ্মার (drachma) ওজন ছিল প্রায় ৬৭ গ্রেন। এই সময়কার কোন ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত না হলেও প্রাচীন গ্রন্থে সুবর্ণ নামক যে স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে, তার ওজন ছিল প্রায় ১৪৬ গ্রেন। আলেকজান্ডারের সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত যে-সব রৌপ্য ও অতিবিরল তাম্র 'বক্রদণ্ড' (bent-bar) নামক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সঙ্গে গ্রীক মুদ্রার পার্থক্য শুধু আকারেই নয়, ওজনেও: কারণ, এই মুদ্রাগুলির ওজন ছিল শত-রতি বা বর্তমান টাকার মতই প্রায় ১৮০ গ্রেন। বক্রদণ্ডাকৃতী মুদ্রার প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী যে অসংখ্য অংকচিহ্নযুক্ত (punch-marked) রৌপ্য মুদ্রা ভারতের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশের আকৃতি চারকোণা ধরনের এবং তাদের ওজন ৩২ রতি বা প্রায় ৫৬ গ্রেন। প্রবন্ধকার পুরু ও আলেকজান্ডারের প্রতিকৃতি দেখাবার জন্য যে মুদ্রার ছবি ছেপেছেন, সেটি একটি অতি-বিকৃত নকল মুদ্রা। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ২।৩টি মাত্র আসল Porus-medal সংরক্ষিত আছে। বলা বাহুল্য, এগুলি ভারতীয়দের দ্বারা নির্মিত হয়নি। (cf. C. Selfman, 'Greek coins', 2nd Edn., p. 213, pl. 213, 6, 7).

৩। লেখক বলছেন, মিনান্দারের মুদ্রা নাকি "পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে।" এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। প্রচুর পরিমাণে কেন, মিনান্দারের দু-একটি মুদ্রাও ঐসব জায়গায় বর্তমান কালে পাওয়া গেছে বলে জানা নেই। আসলে Periplus Maris Erythraei নামক গ্রন্থে অজ্ঞাত লেখক ব'লে গেছেন যে, তাঁর সময় (আনুমানিক ৮০ খৃষ্টাব্দে) বারুগাজার (ভৃগুকচ্ছে বা বর্তমান বরোচে) মিনান্দার ও অপলদতের (Apollodotus) মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

এ ছাড়াও মিনান্দার ও তাঁর পরবর্তী-কালের গ্রীকমুদ্রাগুলি সুন্দর হ'ত ব'লে প্রবন্ধকার যে উক্তি করেছেন, সে-কথাও বহু ক্ষেত্রে খাটে না। মিনান্দারের পরবর্তী পূর্বপাঞ্জাবের গ্রীক রাজাদের মুদ্রা প্রায়ই নিকৃষ্ট ধরনের হ'ত। (cf. A. N. Lahiri, 'Corpus of Indo-Greek coins', pp. 12-3, and specially coins of Apollodotus II, Apollophanes, Dionysius, Strato II and Zoilus II).

৪। প্রবন্ধকার বলছেন, "এখনকার (অর্থাৎ ইন্দোগ্রীক) মুদ্রাগুলি সাধারণত
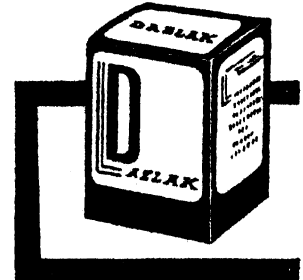
প্রস্তুত হ'ত সোনা, রূপো ও তামায় এবং (তাদের?) আকৃতি ছিল গ্রীক মুদ্রানুসারে চতুষ্কোণ ও গোল।" কিন্তু তখনকার মুদ্রা 'সাধারণত' কখনই সোনা দিয়ে তৈরি হ'ত না, হ'ত শুধু রূপো ও তামা দিয়ে। আর 'গ্রীক' মুদ্রা কোন সময়েই 'চতুষ্কোণ' হ'ত না' চতুষ্কোণ ইন্দোগ্রীক মুদ্রাগুলি তৈরী করা হয়েছে ভারতীয় চতুষ্কোণ মুদ্রারই 'অনুকরণে'।

৫। লেখক বলছেন, "খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া থেকে শক নামে এক বিদেশী জাতি ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে ভারতে প্রবেশ করে।" এ কথা ঠিক নয়: Bactria বা বাহ্লীক দেশ অধিকার করলেও শকরা তখন ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি, সেখানে তখন গ্রীকরা রাজত্ব করছিলেন। শকরা ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বা তার কিছু পরে।

(see 'Cambridge History of India', vol. I, p. 570).

৬। লেখক বলছেন, 'ময়েসের' (গ্রীক Maues, প্রাকৃত মোঅ) পরবর্তী রাজা 'অজেস', প্রাকৃত অয়) যে মুদ্রাগুলি প্রস্তুত করেছিলেন, তার এক দিকে গ্রীক অক্ষরে তাঁর নাম ও অপর দিকে 'আজিলাইসিসে'র (প্রাকৃত অয়িলিশ) নাম খরোষ্ঠী লিপিতে মুদ্রিত ছিল; আবার কতকগুলি মুদ্রায় অজেসের নাম খরোষ্ঠীতে ও আজিলাই-সিসের নাম গ্রীক অক্ষরে লেখা হয়েছিল। এ উক্তি বিভ্রান্তিকর এবং শকদের মুদ্রা সম্বন্ধে সম্যক ধারণার অভাবের ফল। আসলে মাউয়েস বা 'মোঅ'র' পরে আসেন প্রথম অজেস বা অয়। তাঁর পরে আসেন আজিলিসেস বা 'অয়িলিশ' এবং সব শেষে আসেন দ্বিতীয় অয়। প্রথম অয় তাঁর মুদ্রার মুখ্য দিকে গ্রীক ভাষায় ও গৌণ দিকে প্রাকৃতে নিজেরই নাম লিখেছিলেন; তাঁর শেষের দিকের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার মুখ্য দিকে গ্রীক ভাষায় নিজের নাম ও গৌণ দিকে প্রকৃতে যুবরাজ (?) অয়িলিশের নাম লিখিয়েছিলেন। সেই রকমই অয়িলিশ প্রধানত মুদ্রার উভয় দিকে নিজের নাম লেখালেও শেষের দিকে কতকগুলি বিরল মুদ্রায় গ্রীক ভাষায় নিজের নাম ও প্রাকৃত ভাষায় যুবরাজ (?) দ্বিতীয় অয়ের নাম লেখান।

৭। প্রবন্ধকারের মতে, "এই সময়ের (শকদের সময়ের) ভারতীয় মুদ্রাগুলি প্রায় সর্বতোক্ষেত্রেই ওজনে আকৃতিতে ও নকশায় হুবহু গ্রীক মুদ্রার মতই প্রস্তুত হয়েছিল।" ঠিক 'ভারতীয়' বলতে যা বোঝায়, ভারতীয়-দের দ্বারা মুদ্রিত সাময়িক সেই মুদ্রা-গুলি ওজনে ও নকশায় গ্রীক মুদ্রা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আর 'ভারতীয়' বলতে যদি শকদের মুদ্রা বোঝান হয়ে থাকে তবে 'নকশায়' অন্তত সেগুলি হুবহু গ্রীক মুদ্রার মত হ'ত না; কোন শক মুদ্রায় গ্রীক মুদ্রার মত রাজা বা কোন দেবদেবীর 'আবক্ষ' মূর্তি মুদ্রিত হয়নি।

৮। ৮৩৮ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধকার মুদ্রাগুলির যে ছবি দিয়েছেন তাদের প্রতিটিতে নাকি 'বিদেশী হরফ লক্ষণীয়'। শেষ মুদ্রাটিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় যে হরফ আছে, তা বিদেশী নয়—বিশুদ্ধ ভারতীয় ব্রাহ্মী হরফ (এবং তার অলঙ্করণে অ-ভারতীয় কোন মুদ্রার প্রভাব নেই)।

৯। লেখকের মতে কুষাণরা ভারতে

প্রবেশের পূর্বে নাকি 'বেশ কিছুকাল গ্রীক রাজগণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল'। এ কথা ঠিক নয় ঃ কুষাণরা যখন ভারতে আসার পূর্বে বহ্লীক দেশে প্রবেশ করে, তার অনেক আগে শকদের দ্বারা গ্রীকরা বিতাড়িত হয়েছিল, তাই কুষাণদের সঙ্গে গ্রীকদের সংঘর্ষ সম্ভব ছিল না।

১০। 'ভারতের সাথে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত' হওয়ায় 'কুষাণ যুগে ভারতে রোমের লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা' কী করে 'এসেছে', তা বোঝা গেল না! রোম পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত নয়। লেখক 'কোয়েম্বাটুর' ও 'মাদুরা'কে দক্ষিণ ভারতের 'বন্দর' আখ্যা দিলেন কী হিসাবে, তা-ও বুঝতে পারছি না! এইসব জায়গায় রোমান রাজাদের 'অজস্র সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে' ব'লে লেখক বলছেন; সে-কথা ঠিক নয়। দক্ষিণ ভারতে রোমানদের বহুসংখ্যক রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেলেও সেখানে তাদের যে-সব তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে, তাদের সংখ্যা খুবই কম—মোটেই 'অজস্র' নয়। দক্ষিণ ভারতে বহুসংখ্যক রোমক মুদ্রা পাওয়া গেলেও সেখানকার সমসাময়িক মুদ্রায় রোমানদের মুদ্রার কোন প্রভাব পড়েনি।

১১। তৌলরীতির দিক থেকে কুষাণদের বা আসলে রোমানদের স্বর্ণমুদ্রার ওজনে গুপ্ত রাজারা তাঁদের স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করালেও "রোমান মুদ্রার অনুকরণে তাঁরা সমস্ত মুদ্রা প্রস্তুত করেন", লেখকের এ ধারণা ভ্রান্ত। গুপ্তদের স্বর্ণমুদ্রাগুলি ভারতীয় রীতির সুন্দরতম নিদর্শন; তাঁদের রৌপ্য মুদ্রা পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপদের রৌপ্য মুদ্রার অনুকরণে তৈরি হয়েছিল; তাঁদের তাম্র মুদ্রায় রোমান প্রভাব বিন্দুমাত্র ছিল না!

১২। লেখক ফিরোজশাহ্ তুঘ্লককে "খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি" কোথায় ও কীভাবে পেলেন, জানি না; তাঁর আবির্ভাব হয়েছে প্রায় হাজার বছর পরে—১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে।

লেখাটি পড়ে মনে হ'ল, মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ ও অস্পষ্ট; ফলে তিনি ভারতীয় মুদ্রায় বিদেশী প্রভাবের কথা যা বলতে চেয়েছেন, তা মোটেই সার্থক হয়নি। লেখাটির প্রতিটি ছত্রই প্রায় অপ্রাসঙ্গিক—'ভাসা-ভাসা' কথার অসংলগ্ন সমাবেশ। আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছিঃ "গ্রীক মুদ্রার মতই এগুলির দুই দিকে অনেক কিছুই অঙ্কিত থাকত।" আসলে 'অনেক কিছুটা' কী, তা তিনি বলতে পারেননি, যদিও সেইটাই বলবার জন্য তিনি লিখতে বসেছিলেন।

(ডক্টর) অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন

শ্রীশিশির সিংহ গত ২রা জুলাই তারিখে 'অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন' শিরোনামায় রচিত লেখার যে অংশের আলোচনা করে-ছিলেন তার জবানিতে আমার নিবেদন এই যে—

১। মঙ্গলের চাঁদ দুটি পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে কয়েকশো গুণ 'ছোট' লিখতে গিয়ে ফসকে 'বড়' লেখা হয়েছে। এটি যে 'স্লিপ' সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। পৃথিবী মঙ্গল ও চাঁদের স্ব স্ব ব্যাসগুলি এই লেখার মধ্যেই উল্লেখ করা আছে। এর থেকে পৃথিবী ও মঙ্গলের উপগ্রহদের মাঝে আয়তন বৈষম্যটা যে কোনদিকে কতটা তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিলে অন্য কথা।

২। ফোবস উপগ্রহটির নাম সম্বন্ধে যে 'মারাত্মক ভুলটি' আবিষ্কার করা হয়েছে সেটি লক্ষ করলে দেখা যায় ছাপায় 'ব' এর মাথায় মাত্র একটি বাড়তি ইকার এবং ইংরাজিতে 'o' এর জায়গায় 'i' হয়ে যাওয়ায় এই খেসারত। এ রচনার প্রুফ দেখার ইচ্ছা থাকলেও সময় থাকে না। প্রুফ দেখতে পেলে এই ইকার বিসর্জন দিয়ে বিকার ঘোচান যেত। কবিরা বলেন—Whats in a name! কিন্তু শুদ্ধকল্প বিজ্ঞানীদের কাছে Everything in the name, তা না হলেই বলবেন—shame shame!

৩। সিংহমশাই ডাইমসের ব্যাস পাঁচ থেকে দশ মাইলের মধ্যে এবং ফোবসের ব্যাস তার দ্বিগুণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া এই দুটি উপগ্রহের ব্যাস সুবিখ্যাত বিজ্ঞান সাহিত্যিক অধ্যাপক গ্যামো বিরচিত 'Matter, Earth, Sky' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ৫০০ পাতায় যা দেওয়া আছে তাদের সঙ্গে ঠিক-মত মিলছে না। গ্যামো লিখেছেন। "Mars has two satellites Phobos and Deimos (fear and horror), the diameters of which are about 10 and 5 miles, respectively." নেতিবাচক মনোভাব নিলে দুই তথ্যের মধ্যে এই সামান্য ইতর বিশেষকে ভুলের নজির হিসাবে ঠাওরান যায়। কিন্তু যিনিই নিত্য বিজ্ঞানের তথ্য নাড়াচাড়া করেন তাঁকে আরও অনেক সহনশীল হতে হয়। ঠিক এই কথা ভেবে বুঝতে হবে যখন বৃহস্পতির ৯টি উপগ্রহ বলা হয়েছিল (Harold Whaeler সম্পাদিত Book of Facts, pp 36) সেটি পাঠভেদের একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। ৯টি নয় এখন ১১টি উপগ্রহ জানা গেছে—এটি গ্রহণ করতে কী আপত্তি থাকতে পারে? অবশ্য সাধারণ পাঠকের কাছে এই তিনটি অধিক চন্দ্র প্রাপ্তি 'যোগ' বা 'বিয়োগে' খুব তফাত সৃষ্টি করে বলে মনে হয় না। তিনি বৃহস্পতিকে চিনতে পারলেই যথেষ্ট কাজ উদ্ধার হয়েছে বুঝতে হবে।

৪। অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পত্রলেখক একমত হয়েছেন এবং রচয়িতাকে অভিনন্দনযোগ্য বলেছেন, এ

তাঁর সহৃদয়তার প্রমাণ। লণ্ঠনের কাঁচ পরিষ্কার রাখার দয়া শুধু তাঁর নির্দেশ নয়, আমারও বিবেকের আদেশ। কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড—সেখানকার অগণিত ছায়াপথ, তারা, পৃথিবী—সব-কিছুর অজস্র তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করলে, শত সচেষ্ট থাকলেও, হাত থেকে কখনও তার একটিও টুপ করে পড়বে না, তা কে বলতে পারে? তাছাড়া এই লণ্ঠনের আলোর গরিমাই বা কতটুকু? ভরসা শুধু সহস্র পাঠকের চোখের তারার আলো যদি এদিকে পড়ে তাহলে সব অন্ধকার সরে যাবে। অতএব প্রয়োজনবোধে তাঁরা আলোক-দান থেকে যেন বঞ্চিত করবেন না। আবার ভয়ও আছে বেশি আলোয় না চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতার ডায়েরি

॥ ১ ॥

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় (২রা জুলাই, ৬৬) প্রকাশিত 'কলকাতার ডায়েরি' শীর্ষক আলোচনাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। আলোচনাটি উপভোগ্য হলেও নিরপেক্ষ নয়।

লেখক চার্ণক্য একটু সীরিয়াস হলে ভাল করতেন। 'মাইকে কলকল নিনাদ-করালীর কণ্ঠস্বর', কাউণ্টারে একজন ধোপদুরস্ত বাবু কী যেন লিখছেন, অন্যজন পেনসিলে কান চুলকাচ্ছেন।' 'কানে পেনসিল বাবুটির আবার......' 'পুরানো দিনের জামাই-খাওয়ার বাড়ির মত.....' ইত্যাদি কথাগুলো আপত্তিকর।

কতগুলো যুক্তি নিতান্তই অকেজো। আসাম সেকটারে বর্ষাকালীন আবহাওয়ায় বিমান নিয়ে দৈনিক যাতয়াত করা যে কত ভয়াবহ তা ভুক্তভোগী বৈমানিক এবং পৃথিবীর সব বিমান সংস্থাই কিছু কিছু অবগত আছেন।

দ্বিতীয়ত গোনাগুনতি বিমান নিয়ে সিডিউল মেইনটেন করা কষ্টসাধ্য নিশ্চয়ই। বলা বাহুল্য অপারেটর মাত্রই ওয়াকিবহাল আছেন যে, টেক অফের পাঁচ মিনিট আগেও যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়া বিচিত্র নয়।

আবার বলি, "আমরা আপনার বক্তব্যে একমত নই। আবহাওয়া খারাপ থাকে, যান্ত্রিক গোলযোগও হয়।" যারা (ধোপ-দুরস্ত বাবুরা) দমদমে আমাদের মুখোমুখি রোজ দাঁড়ায়, তারা আমাদেরই ভাই-বেরাদর। তাদেরকে নিয়ে রসিকতা করলে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না।

তুষার সেনগুপ্ত
ভুবনেশ্বর।

॥ ২ ॥

গত ২রা জুলাইর "কলকাতার ডায়েরি" শীর্ষক লেখার মাধ্যমে কলকাতা-আগরতলা-শিলচর-ইম্ফল রুটের প্লেনের যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা "চার্ণক্য" যেভাবে বলেছেন তার জন্যে লেখককে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে লেখক চার্ণক্যের জ্ঞাতার্থে দুয়েকটি কথা বলতে চাই।

কলকাতায় হয়ত "...আট দিন অপেক্ষান্তে আই এ সি'র কোন অফিসারকে চেনা লোক মারফত ধরাধরির পর..." ত্রিপুরা-আসাম-মণিপুরের প্লেনের টিকেট পাওয়া যায়। কিন্তু এ অঞ্চল থেকে কলকাতায় যাওয়ার আই এ সি'র টিকেট পেতে হলে আট সপ্তাহ আগে থেকে সিটি অফিসে ঘোরাঘুরি করতে হয়। নতুবা, কী করতে হয় জানেন? কোন ব্যবসায়ীকে ধরতে হবে। গদি থেকে তাঁর ফোনটি তুলে ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক গৌহাটি, আগরতলা, শিলচরে আই এ সি'র টিকেট কাউণ্টারে কী যেন ফুসমন্তর দিয়ে দেন এবং তারপরেই টিকেট পেতে ভাবনা নেই। আট সপ্তাহ পরে যে টিকেট পাওয়ার কথা কাউণ্টারের কর্মচারীটি মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে আপনাকে বলেছিলেন তিনিই পুনরায় আপনার দর্শনে একটিমাত্র স্বগতোক্তি (অমুকে গদির লোক, আগে বললেন না কেন) করেই অম্লানবদনে আপনার ইচ্ছেমত যে কোনদিনের কলকাতার টিকেট কেটে দিতে দ্বিধা করবেন না!

বছরের পর বছর শুধু ভাড়া বৃদ্ধি নয়, আই এ সি'র নানাবিধ অব্যবস্থার দরুণ এ অঞ্চলের বিমানযাত্রীদের আজ হয়রানির অন্ত নেই। এই-ত মাত্র কিছুদিন আগে গৌহাটি, শিলচর, ইম্ফল, আগরতলা প্রভৃতি জায়গা থেকে বিমানে কলকাতায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর। নিরপেক্ষভাবে খোঁজ নিলেই জানা যাবে সেদিনের বিমানযাত্রীরা অনেক আরামে এবং নিশ্চিন্তমনে কলকাতায় যাতায়াতের সুযোগ পেতেন। এদিককার বিমান যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা স্মরণ করেই যেন সেদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত শচীন্দ্রলাল সিংহ বলেছিলেন যে, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আই এ সি অপেক্ষা কম ভাড়ায় অথচ যাত্রীদের কোন-প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি না করে কলকাতা থেকে ত্রিপুরায় বিমান চালাতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছেন।

বেণু রায়
গৌহাটি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৩১শে আষাঢ়ের দেশে আলোচনা বিভাগে (পৃঃ ১২৫৯) অরুণকুমার মিত্র তাঁর সংগ্রহ থেকে অমৃতলাল বসুকে লেখা পাঁচকড়িবাবুর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। পাঁচকড়িবাবু পন্ডিত ও কৃতবিদ্য ছিলেন এবং যথেষ্ট ইংরেজী জানতেন ও ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলন তিনি করেছিলেন। (শংকরীপ্রসাদ বসুর লিখিত জীবনী, দেশ, ১০ই আষাঢ়, পৃঃ ৯০৯) আমরাও তাই জানি। কিন্তু HUMBUGGISM কথাটার মত ভুল কথা তিনি ব্যবহার করবেন কি? HUMBUGGISM বলে কোন কথা ইংরেজী ভাষাতে নেই; HUMBUGGERY আছে। কথাটা অতি সাধারণ। অরুণবাবুর কাছে যে চিঠিটা আছে সেটা কি নকল চিঠি?

অমূল্যকৃষ্ণ রায়
মোশাকচক, ভাগলপুর।

আলো, আমার আলো

প্রতিভা বসু তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাসে ("আলো, আমার আলো"—দেশ ৩৮ সংখ্যা) যে সাম্প্রদায়িক দাংগার বর্ণনা দিয়েছেন সেই সম্পর্কে শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ চন্দের সমালোচনা পড়ে ঠিক একমত হতে পারলুম না। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা সব কিছুই যখন কল্পনার আশ্রয়ে গড়ে উঠছে সেখানে এক বিশেষ ঘটনার বিবৃতিতে কতটা ঐতিহাসিক সত্যের মিল আছে তার হিসেব নিকেশ করতে যাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়। তাছাড়া স্বাধীনতা লাভের কিছু আগেই পশ্চিম ও পূর্ব বাংলায় এবং ভারতের আরও বিভিন্ন জায়গায় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাংগা হয় সে কথা তো কারুর মন থেকে এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি; তবে সেই হাংগামা স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগেই বা কিছু পরে প্রশমিত হল তা নিয়ে আজ বিশ বছর পরে কোন পাঠকের মনে দ্বন্দ্ব উঠতে পারে বলে বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশেষ করে তার উল্লেখ যখন এক সুন্দর উপন্যাসের ঘটনাচক্রের মধ্যে করা হয়েছে।

রতন মুখোপাধ্যায়
মিডিলসেক্স, ইংল্যান্ড

ইংলন্ডে ভারতীয় ডাক্তার

গত ৯ই জুলাই 'দেশে' প্রকাশিত আলোচনা স্তম্ভে শ্রী এস এন রায়ের "ইংলন্ডে ভারতীয় ডাক্তার" নামে লেখাটি পড়লাম। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "রয়েল কলেজের ডিগ্রী চিকিৎসা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী—যদি ভারতের ডাক্তাররা অধিক সংখ্যায় এই ডিগ্রী পান তবে গৌরবের কথা!" রয়েল কলেজের ডিগ্রীর দুর্নিবার আকর্ষণ বাংলা তথা ভারতের ডাক্তারদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। সাধারণ ছাত্রও দেখে ঐ অমূল্য নিধি লাভের স্বপ্ন। এ কথা অস্বীকার করি না যে, গৌরবের ছটায় সমুজ্জ্বল এই ডিগ্রী। কিন্তু এই সম্মান অর্জনের পথে যে আছে দুরূহ অন্তরায়! শুধু ধীশক্তির পূঁজি নিয়ে এ দুস্তর সাগর পাড়ি দেওয়া যায় না—এ কথা নিশ্চয়ই রায়মশায় জানেন। তবে কি তার সমাধান!

দ্বিতীয়ত, তিনি লিখেছেন কূপ-মন্ডূপতাকে বিসর্জন দিয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে! কিন্তু যে দেশের গ্রামে এখনও "হাতুড়ে বৈদ্য" অপ্রতিহত প্রতাপে ডাক্তারী অপারেশন করে যাচ্ছে, কর্মখালির বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে, ইঞ্জিনীয়ার টেকনিক্যাল কর্মচারীর ভিড়, কূপমন্ডূপতা ছেড়ে যদি তাঁরা দলে দলে গিয়ে পড়েন অথৈ সাগরে তবে সে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াবে? টলমল করতে করতে এগিয়ে যাওয়ার পথে মুখ থুবড়ে পড়বেন নাকি?

শ্রী রায় শেষাংশে বলেছেন, "যোগ্য ভারতীয় ডাক্তারদের ছাড়িয়ে ইংলন্ডে চাকুরি ক্ষেত্রে অযোগ্য ইংরেজ ডাক্তারদের উপরে স্থান দেওয়া হচ্ছে—সেই ত্রুটি দূরে করার দায়িত্ব যাঁদের তাঁদেরই এগিয়ে আসা উচিত!"

কাকে ইংগিত করেছেন স্পষ্ট বোঝা গেল না। যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে করে থাকেন, তা হলে এই কথাই বলতে হয়, Beggars are not choosers.

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
পাঠানকোট, পাঞ্জাব

পরীক্ষায়
প্রায়
ফেল হতে
বসেছিল!
পড়াশুনোয় দিব্যি ভাল মেয়ে।
কিন্তু পরীক্ষা শুরু হতে যখন আর
মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি,
পড়াশুনোয় যেন ওর
কোনো উৎসাহই
আর রইল না।
ডাক্তারের কাছে নিয়ে
গেলাম।
হচ্ছে না।
তাঁর কথামত
ওকে হরলিকস
খাওয়াতে লাগলাম।
ও আবার দেখতে দেখতে
নতুন উৎসাহে পড়া শুরু
করল। আর হরলিকস-এর
গুণেই সগৌরবে পাশ
ক'রে বেরুল।
ছোটদের শরীরের শক্তি
বেজায় তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে
যায়। সেই ক্ষয় পূরণ
না হলে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে,
পড়াশুনোয় মন বসাতে
পারে না। ডাক্তাররা জানেন,
ননীপূর্ণ দুধ, পেষাই-করা গম
আর মল্টেড বার্লির সারাংশ
থেকে হরলিকস অতিরিক্ত
পুষ্টি যোগায়। দেহমনের
ওপর যখন বেজায় চাপ
পড়ে, হরলিকস খেলে
আশ্চর্য ফল হয়।
হরলিকস
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়
Horlicks
THE IDEAL FOOD DRINK FOR ALL AGES
JWT/HL 3497A

চিত্রগত কাহিনী

ফোটোগ্রাফে নিজের চেহারা দেখতে পাবে এইটুকু প্রত্যাশায় যদি দীর্ঘ দশটি বৎসর অপেক্ষা করেও সে আশা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে বোধ করি ব্যাপারটি প্রবঞ্চনার আওতায় পড়ে এবং এই অপরাধের জন্য নিঃসন্দেহে ফোটোগ্রাফারই দায়ী। তবে, অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নয় একথা প্রমাণ করতে পারলে বিচারে হয়ত অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হতে পারে। তাতে অপরাধ পুরোপুরি খণ্ডাবে কি?

এই ছবি সম্পর্কিত একটি ব্যাপারে আমি অপরাধী। আজও অনুভব করি একটি মারাত্মক ত্রুটির কথা। রাজস্থানের গ্রাম্য কিষাণ পরিবারের এক রমণী নিজের ফোটোগ্রাফ দেখতে পাবার আশা নিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়েছে। এখানে দোষ-ত্রুটি-অপরাধ যা-কিছু সব আমারই। কারণ এদের কাছে ছবি পৌঁছে দেবার কথা না ভেবেই সেদিন আমি চলে এসেছি।

ফোটোগ্রাফাররা ছবি তোলে বিস্তর পথে-ঘাটে নানাজনের তাই বলে সকলকে ছবির কপি পাঠিয়ে দেয় কি? তেমন প্রয়োজন বা স্বার্থ না থাকালে পাঠায় না। ভ্রমণে কোথাও গিয়ে চলাতে-ফিরাতে যেসব ছবি তোলা হয় সে সবের প্রয়োজন ফোটোগ্রাফারেরই। তাই অজানা-অচেনাজন ছবি পাবার প্রত্যাশা করে না কোনদিনই। কিন্তু আমার এ ব্যাপারটি তো তা নয়! এখানে ছবি পাঠানো হবে এ রকম একটা কথা দেওয়া ছিল।

আজমীঢ় শহর থেকে একটি রাজপথ দক্ষিণমুখো গিয়েছে। সেই পথ ধরে প্রায় মাইল দু-এক যাবার পর ডানদিকে একটা বিরল জনবসতির গ্রাম দেখতে পেয়েছিলমা। মাঠে এক কিষাণের সংগে প্রথমে আলাপ, পরে হাজির হয়েছিলাম তারই বাড়ির আঙিনায়। কিষাণের বুড়িমার সংগে কথাবার্তা বলতে বলতে দু-একটা মামুলী ধরনের ছবি তোলা হলে পর আমি বাড়ির বউদের ছবি তুলবার অভিপ্রায় জানালাম। সংগে সংগেই 'নেহি-নেহি' বলে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিল কিষাণের বুড়িমা জাঁদরেল শাশুড়ীর রূপ ধারণ করে। আমি তখন প্রশ্ন করেছিলাম—কেন বুড়িমা আপত্তি কিসের।

—তুমি আমার 'বহুদের' মুখ দেখে ফেলবে যে! চোখ বড় বড় করে বলেছিল বুড়িমা।

—আমি দেখবো না। আমার বউ দেখবে তোমার বহুদের ছবি।

একবার বুড়িমা চোখ-মুখে আনন্দ ফুটিয়ে আমাকে প্রশ্ন করল—ঘরে তোমার বউ আছে?

—হাঁ, তোমার বহুদের মতই দেখতে।

আর বুড়িমার মুখে কথা নেই। সারা মুখময় তার যেন ছড়িয়ে পড়ল স্নেহ-মমতার প্রলেপ। শেষ পর্যন্ত বহুদের ছবি

তুলবার সম্মতি দিল বুড়িমা। এই কথা জানাজানি হওয়া মাত্রই টের পেলাম অন্দর-মহলের ভেতর দিয়ে যেন আনন্দের একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। পাছে শাশুড়ীর সামনে ছবি তুলতে বউরা সংকোচ বোধ করে সেজন্য বুড়িমা ওখান থেকে নিজেই সরে গেল। শাশুড়ীর অনুমোদিত দুর্লভ এক সুযোগ পেয়ে বউরা সেদিন প্রায় অস্থির হয়েই পড়েছিল। আশ্চর্য হয়ে আমি তখন দেখছিলাম ঐ লজ্জাশীলা কিষাণ বধূরা কত সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছে, অনায়াসে ওরা আপন করে নিয়েছে পরদেশী এক অজ্ঞ তকলশীলাকে। এই সময় একটি বউ আমার কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল—বাবুজী, আমি সব গয়নাগাটি পরে ছবি তুলবো। আমার খুব শখ। কেউ তো আমাদের ছবি তোলেনি, তা তুমি যদি একটা তুলে দাও—নিজের চেহারাটা দেখবো।

অতি খুশী মনে আমার সম্মতি জানানো মাত্রই বউটি ছুটে ঘরে চলে গিয়েছিল।

*

বউটির আকাঙ্ক্ষিত ছবি তোলা হল। আরও তোলা হল কয়েকটা ছবি এদিক-ওদিক। বহু ভাল ছবি তোলার আত্মতৃপ্তি নিয়ে সেদিন যখন ঐ পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, তখনো আমি ভাবিনি এদের ছবি পৌঁছে দেব কীভাবে! এই গাফিলতির জন্য আমার সেদিনকার আত্মতৃপ্তিতে আজ যেন বিষাদ জাগে। বিশেষ করে অনুশোচনা আসে, ঐ সরল কৃষাণ রমণীকে একটি আশা থেকে বঞ্চিত করেছি বলে।

নীরোদ রায়

চতুর্থ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

যখন উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থব্যয় প্রস্তাব করা হয় তখন কি (দ্রব্য) মূল্যের ভিত্তিতে ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করা হবে তা জানা বিশেষ দরকার। ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং মূল্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আশঙ্কার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বৈষয়িক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যস্থিতি বজায় রাখা সমান জরুরী। টাকাকড়ি ও প্রকৃত সম্পদের যেখানে অনটন আছে, সেখানে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগে বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনার আকার ছোট করতে গেলে সেই সব অংশ ছেঁটে ফেলতে হবে যেগুলির আগামী চার বছরে আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত ক্ষমতা আছে বা তৈরি হচ্ছে। এরকম অংশের মধ্যে রাস্তা ও রেল পরিবহণ, শক্তি এবং সাধারণ শিক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

চতুর্থ যোজনায় প্রস্তাবিত ব্যয়

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনায় সরকারী অংশে ১৬.০০০ কোটি টাকা নিয়োগ করা হবে, স্থির হয়েছে। বেসরকারী অংশের জন্য ৭,০০০ কোটি টাকা ব্যয় অপরিবর্তিত রাখলে, টাকার নতুন মূল্যে পরিকল্পনায় মোট অর্থনিয়োগ ২৩,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। গত বছর অগাস্ট মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল তাতে চতুর্থ যোজনার জন্য মোট মূলধন নিয়োগ ২১,৫০০ কোটি টাকা ধরা হয়—তার ভেতর ১৪,৫০০ কোটি টাকা সরকারী অংশের জন্য এবং ৭,০০০ কোটি টাকা বেসরকারী অংশের জন্য নির্ধারিত ছিল।

সরকারী অংশের পরিকল্পনাটি প্রকৃত অর্থে শতকরা ৫ ভাগ ছোট করা হয়েছে। দেশের ভিতরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের এটা অনিবার্য ফল। বাড়তি বেসরকারী সঞ্চয় অর্জন কর কঠিন হতে পারে বলে বেসরকারী অংশের জন্য নির্দিষ্ট ব্যয় (৭,০০০ কোটি টাকা)-এর পরিমাণ বদলানো হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সরকারী অংশের জন্য বরাদ্দ অধিকতর অর্থের বেশ কিছুটা উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে বেসরকারী অংশের অতিপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হবে।

তৃতীয় যোজনাকালে আমাদের জাতীয় আয় সব সুদ্ধ শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ বেড়েছে; এর প্রায় সবটাই লেগেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা খাতে অধিকতর ব্যয়ের প্রয়োজন মেটাতে। ফলে বাড়তি জাতীয় আয়ের অল্প অংশ সঞ্চয় করা হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, কি পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে তা পরিকল্পনার আকার অংশত নির্ধারণ করবে। তৃতীয় যোজনায় যে সব প্রকল্প অসম্পূর্ণ থেকে গেছে সেগুলির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। শিল্পের বর্তমান উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ নিয়োগ এবং কৃষির আমূল পরিবর্তন না করলে সম্পদ সংগ্রহের কাজ বেশী এগোবে না। কৃষির উন্নয়ন মনে হয় অধিক মূলধনের চাইতে সংগঠনের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় পরিকল্পনার শতকরা ৪ বা তার কমের তুলনায় চতুর্থ যোজনায় অগ্রগতির হার শতকরা ৬-এর কাছাকাছি ধরা হয়েছে। পুরোনো টাকার হিসাবে চতুর্থ পরিকল্পনায় (আগে প্রত্যাশিত ৪.৮০০ কোটি টাকার জায়গায়) ৪,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য আশা করা হয়েছে। এর মধ্যে (পুরোনো টাকার ভিত্তিতে) বেসরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য ৩০০ কোটি টাকা, ঋণের সুদদান বাবত প্রায় ১.৩০০ কোটি টাকা আছে।

অর্থ সম্পদ সংগ্রহের সমস্যা

সরকারী অংশে ১৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রাগুক্ত পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করতে হলে কেবল কর সংগ্রহ নয়, চলতি খরচ থেকে বাঁচিয়ে সঞ্চয়, জলসেচ ও শক্তি উৎপাদনের মতো সরকারী প্রকল্প থেকে বেশী অর্থাগম (বর্তমানে জলসেচ থেকে বছরে ৪০ কোটি টাকা ঘাটতি হচ্ছে)-এর চেষ্টা করা দরকার।

আর্থিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের ফলে যদি বাড়তি অর্থসম্পদ সংগ্রহ সম্ভবপর হয় তাহলে পরিকল্পনায় মূলধন নিয়োগের মোট পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। (অথবা ভোগের উপর চলতি ব্যয় কমিয়ে অর্থাৎ প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খরচ বাঁচিয়ে যদি সঞ্চয় করা যায় তাহলে পরিকল্পনায় অর্থব্যয়ের বহর বৃদ্ধি করা যেতে পারে।) নির্বাচনমূলকভাবে আমদানি উদার করে দেওয়া হয়েছে বলে উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশা করা যেতে পারে।

আর্থিক উদ্যোগের সাফল্য পরিকল্পনার প্রয়োগ অথবা উপাদানরাশির সুষ্ঠু সংগঠনের উপর নির্ভর করে। বস্তুত, মূলধন নিয়োগের বহর এবং অগ্রগতির হার এই দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যায়নি। মূলধন সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে না পারার জন্য তার থেকে ফল বা আগম এত কম হারে হয়েছে।

নতুন উৎপাদন-ক্ষমতা নির্মাণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ব্যাপারে রপ্তানি শিল্প এবং আমদানির পরিবর্ত উৎপাদন শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাহলেই টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে যে সুবিধা পাওয়া গেছে তার সদ্ব্যবহার করা যাবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

চিত্রপ্রদর্শনী

তিনজন শিল্পীর ছবির প্রদর্শনী

আমরা প্রত্যেকেই এমন এক সময়ের মধ্যে এসেছি যখন জন্মগত স্বাভাবিক ক্ষমতার কোন কদর নেই—ভগবানদত্ত বলে খুব সাদামাটাভাবে যে সংস্কার চলে আসছিল সেটা ইনটালেকচুয়াল কর্ম জগতের সামনে খুব বাজে; শুধু আজকে নয়, বহু প্রাচীনেও তার একই হাল। সে ক্ষমতা থাকা আর না থাকা প্রায় দুই সমান; তা নিয়ে বেশী দূর এগোন যায় না।

কেন না তার থেকে আর একটি বড় ক্ষমতা মানুষের আছে, তা হচ্ছে সন্দেহ; এই সন্দেহ শিল্পসত্তা নির্ধারণে অনেকখানি সাহায্য করে আসছে, সন্দেহের জন্যই প্রতি মুহূর্তে অনবরত একজন শিল্পীকে বিচার করতে হয়েছে, বিশেষরূপে জানার চেষ্টা করতে হয়েছে।

ইদানীং আমাদের এখানে যে ধারা অনুসরণে শিল্প জগত চলছে, প্রত্যেক শিল্পীই যেসব আঙ্গিক নিয়ে কাজ করে চলেছেন সেই সেই বিষয়ে সম্যকভাবে জানার কোনই উপায় নেই—অবশ্য য়ুরোপে যারা অধিক দিন অতিবাহিত করেছেন তাঁদের কথা আমরা বলছি না। আমাদের এখানে খুব সহজেই সার্থক কোন ফরাসী নিদর্শন দেখার কোনই সুযোগ নেই; শুধু তাই নয় শিল্প তত্ত্ব সম্পর্কে যথার্থ কোন বইও দুষ্প্রাপ্য।

যদি সত্যই নিদর্শন দেখার সুযোগ থাকত তাহলে সবাই কি সেগুলি স্বাধ্যায় করতে যেত? যেমন একজন শিল্পীর প্রদর্শনীতে দেখা যায় অন্য শিল্পী বা ছাত্র-ছাত্রী পদার্পণ করে না। বই কোন শিল্পীই পড়তেই প্রায় চায় না—তাদের ভাবটাও এই—আমি আঁকছি, আবার খামখা পড়তে যাব কেন? ফলে আমাদের সমস্ত সাধনাটা কানা হয়েই ঘুরছে। অনেকেরই অভিমান আছে যে আমাদের সাধনা অনেকটা একলব্যের জাতীয়।

কিন্তু সত্যই আমাদের সে নিষ্ঠা নেই। আদতে আমাদের কোন সন্দেহই নেই, কোন জিজ্ঞাসাই নেই—কি নিজস্ব ক্ষমতা সম্বন্ধে অথবা খানিক-আয়ত্তগত পদ্ধতি ব্যাপারে। আশ্চর্য, এরূপরও আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা যে, আমরা হয়ত এই মেয়ে-ন্যাকা-ভাবে এ'কে একটি চমকপ্রদ 'ইসমের' প্রবর্তনা করতে পারব—অথচ এক ধারার সঙ্গে আর এক ধারার কি পার্থক্য আমরা এটাই কেউ ভালভাবে জানি না। এমন কি প্রিণ্ট-সাক্ষাতে তাদের কাপ করে বুঝবার চেষ্টা পর্যন্ত করি না—তরুণ শিল্পীরা অদ্যকার গুরুস্থানীয়দের ছবির গুণ যে কি তাও ভাল করে প্রণিধান করে না—ইত্যাকারে সন্দেহ আমরা কিছুতেই গড়ে তুলিনি।

এবং তারাই ভাগ্যবান যাদের মধ্যে কোন সূত্রে আপাতভাবে সন্দেহ এসেছে, নিখিল দাশ তেমন তেমন একজন। ইতিপূর্বে তাঁর ছবি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল—সে-সকল ছবি ক্রমাগতই অ্যাবসট্রাক্ট (অ্যাবসট্রাকট যদি বলা যায়) ইদানীং সেই মানসিকতা ছেড়ে তিনি অবয়ব ধর্মী—তাঁর ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই অবয়ব ধর্ম! ভাল। তবে একথা ঠিক অ্যাবসট্রাকট বিষয় পরিত্যাগ করলেও তাঁর কিছু গুণের কথা তাঁর অবশ্যই মনে রাখা উচিত ছিল—সেটা হচ্ছে সাজ-সাট অর্থাৎ অ্যারেঞ্জমেন্ট। সংস্থান বাক্যের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক তাই লিখলাম না। এই সাজ-সাট তাঁর অবয়ব-ধর্মী প্রচেষ্টায় খুবই কাজে লাগত।

যেহেতু করে নি, তাই তাঁর ছবি সব ক্ষেত্রেই একটি প্রতিক্রিয়াহীন ভারটিকাল-অভিধা। একই ভাবে অনেকগুলি তাঁর ভাল কাজের উদ্দেশ্য সংক্রমিত হয়েছে। ভাল-কাজের-উদ্দেশ্য এই জন্যেই বলা—ক্যানভাসে আরোপের আগে থেকেই ছবিটা তাঁর চোখে ছিল, আর সে-কথা তাঁর আরোপ করার ঝটিতি-তৎপরতার দিক থেকে বিলক্ষণ বুঝা যায়। ছবিকে খাড়া করার

তিন প্রেয়সী   নিখিলেশ দাশ

ব্যাপারে তার পূর্বস্মৃতি নিশ্চয়ই এখানে কাজে দিত। এখানে এটাও উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর রঙ ও তাঁর বিন্যাস কারো কাছ থেকে ধার করা নয়, সমগ্র সংবেদনই আলবৎ তাঁর নিজস্ব, তবু বলতে কষ্ট হয় যে, বাক্যের নেহাত-ছবি হয়ে তাঁর কাজগুলি দেখা দিয়েছে। একথা আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, অবনীবাবু বলেছেন, 'শব্দহীনতাই ছবি।'

ছবিতে ছোটখাট কেয়ারি (ওরনামেন-টেশন) যোজনা করে আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে যে, বাক্যের বন্ধন থেকে খুব সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। এবং তাতে করে সমস্ত ছবিই একটি শিল্প কর্ম হয়ে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কেয়ারির কার্যকারিতা বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞান থাকা দরকার। ছন্দিত নকশা অর্থাৎ কেয়ারি বস্তুত্বকে অর্থাৎ অটুট বাস্তবতাকে যদি ওতপ্রোত করতে কাজে না লাগে তাহলে তা বৃথা, আবার আর এক দিক দিয়ে প্রায়ই নকশায় নিশ্চিন্ত প্রয়োগে বস্তুত্বকে—যদি বস্তু থাকে—নষ্ট করে। আবার জানা যায় বস্তুকে গঠনের পর কেয়ারি।

মনে হয় এই হুকুম জেনেও অমিতাভ সেনগুপ্ত কোন ক্রমেই সতর্ক হবার কথা ভাবেনইনি, প্রতিটি ছবিতে অবহেলা, তাঁর ছবিগুলি খুব জোরাল ক্ষমতার একটা অদ্ভুত নযাচয: তাঁর রঙ আরোপ দারুণ, তাঁর অত্যন্ত-আধুনিক রেখাও আমাদের ভাবিত করে। যদিও বলা বাহুল্য যে, এই আরোপ ও রেখার সঙ্গে নীরোদ মজুমদারের উইং অফ লো এণ্ড সিবিজ সূত্রে বিশেষই পরিচিত—যদি সেখান থেকে অমিতাভ সেনের পদ্ধতি এসে থাকে তাহলে হারবার কিছু নেই। যেহেতু অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর ব্যক্তিত্ব আছে, বলতে খারাপ লাগে যে সে ব্যক্তিত্ব রীতিমত ভেলে-মানুষিতে খোয়া গিয়েছে।

ছবির পর ছবিতে ফ্যানটাসই না করে তাঁর বস্তু গঠনের দিকে মনোযোগ দেওয় উচিত ছিল। কোথাও কোথাও ছবির মধ্যে আজেবাজে গদ্য দিয়ে কলগ্রাফি করে নিজেই নিজের কর্ম কুশলতাকে হেয় করেছেন তিনি যে রঙ খুব ভাল ভাবেই খেলাতে পারেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে—এমন কি ক্ষেত্রের কোথাও কোথাও লাবণ্যও পরিস্ফুট—হয়েও কিছুই গড়ে উঠেনি, রঙ সম্প্রসারিত হতে গিয়ে একই স্থানে আবর্তিত হচ্ছে। বস্তুর কথা তাঁর সর্বাগে মনে থাকা উচিত ছিল। এর থেকে যদি তিনি স্টিল লাইফ বা ল্যান্ডস্কেপ করতেন তাহলে তাঁর শ্রম সার্থক হত। সকলেই বুঝত যে তিনি ক্ষমতাশালী।

প্রশান্ত সেনের কাজ উক্ত দুজনের দিক থেকে একেবারে অন্য, তিনি ধ্যান ও ধরনে জ্যামিতিক। তাঁর কাছে পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুই সুদৃঢ় কৌণিক রেখার সমন্বয়। ঠিক এমন ধারা বিশ্বাস কিন্তু এক ধরনের কারিগরী বিদ্যায়, বাধ্যতাবশত, বহু দিন থেকে আছেই—বয়ন শিল্পে। তারা সুতো গুনে গুনে গোলাপকে জ্যামিতিক কনুয়ে জাগ্রত করে, আর সেই গোলাপ যখন কিউবিক-মানসে শিল্পীর হাত থেকে বিরাজমান—সেটি আর এক। এ পার্থক্য আমরা সবাই মানি। তাই আলোর খেলার দিক থেকে প্রশান্তবাবুর অর্থাৎ টোনাল ব্যাপারে তাঁর অতিমাত্রায় বাস্তবধর্মী না হওয়াই উচিত ছিল।

এই সূত্রে যদি টোনাল ব্যাপারটা এইভাবে ধরা যায় তাহলে খানিক সুরাহা হয়—আমরা রাস্তার সাইন বোর্ডে দেখেছি অক্ষরকে ডাইমেনসন দেবার জন্যে যে কোনো অক্ষরের এক-রঙা একটি লাইনের গায়েই—সম্পৃক্ত অবস্থায় আর এক-রঙা একটা লাইন থাকে—যাকে আমরা সাধারণত শেড বলি—আদতে কিন্তু সেটা টোনের নামান্তর। কেননা তা প্রথম লাইনের সঙ্গে জুড়ে ডাইমেনসন আনে—এবং ডাইমেনসন-কারী লাইন তখনই শেড বা টোন যখন প্রথমটির তুলনায়—দুটি রঙ-লাইন—সমান উচ্চতার হয় না, মাপের তারতম্য থাকে—অর্থাৎ সামনেরটির থেকে পাশেরটি এক কোণ ধরে নেমে গেছে। এই সূত্রে বলা যায় একটি রেখা কৌণিক রেখা খুব চোরা ভাবে থেকেই যায়—অথচ কিউবিজমের বিধির দিক থেকে যা রঙের প্রাধান্যকে নষ্টই করে না।

এ সত্য মনে রাখতেই হবে যে, কিউবিজম হচ্ছে রঙের দাপটের খেলা। এবং রেখাকেও সৌন্দর্য বলে আঁগ্রের মত ভালবাসতে হয়। —আঁগ্রে বলেন, "ল্যাব্যতে, সে স্যা দে লীন দ্রোয়াত আভেক দ্য ম্যাদেলে রোঁদ"—সৌন্দর্য তাই বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার সমন্বয়।

[বারো]

২৩

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তারা নাগালের বাইরে এসে পড়লেন। সমানে পা চালিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় যেখানে এসে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হ'লো, কাছেই দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা পোড়ো-বাড়ির ভিতরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। বাড়িটা একেবারে গঙ্গার উপরে, পোড়ো হ'লেও বসবাসের অযোগ্য নয়। চারদিকের ভাঙা দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার দিকে একটা বিশাল ফটক। ফটকের মাথায় দু'দিকে দুই শ্বেতপাথরের সিংহমূর্তি থাবা পেতে বসে আছে। ফটকটি উন্মুক্ত, কোনো দরজা নেই।

সেই খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে এক পলক তাকিয়েই গগনবাবু বুঝতে পারলেন ভিড়ের উৎসটা কী। আবার সেই নির্মূলে নিরুদ্দেশ একদল উদ্বাস্তু। অসহায়ভাবে তিনি চারদিকে তাকালেন। অতসী বললো, 'চলো বাবা, ভিতরে ঢুকি।'

'এখানে! এর ভিতরে?'

লক্ষ্মী বললে, 'দোষ কী? অন্ধকার হ'য়ে গেল, আর কোথায় যাবো?'

'অন্ধকার কী। কেমন চাঁদ উঠছে, চলো না আর একটু দেখি—'

'রাত ক'রে তুমি কী দেখবে।'

'ভাবছিলাম একটু খোঁজাখুঁজি করলে যদি—'

'খোঁজাখুঁজি ক'রে লাভ নেই, আমাদের কি কোনো নির্দিষ্ট জায়গা আছে যে খুঁজলে পাবে?'

'নাইবা থাকলো। ঈশ্বর পথে বার করেছেন, নয়তো গঙ্গার ধারেই শুয়ে থাকবো, তা বলে এই হাটের মধ্যে? এতোগুলো অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গে? লক্ষ্মী, আমি দম বন্ধ হ'য়ে মরে যাবো।'

অতসী তার বাবার মনের কথা জানে। জানে তিনি এদের কিছুতেই নিজের সগোত্র ভাবতে পারেন না। এই চিন্তাটাই তার বাবাকে বিকর্ষণ করে বেশী, বেশী কষ্ট দেয়। বেদনার্দ্র গলায় বললো, 'কিন্তু বাবা, আমরা তো লোকজনই চাইছিলাম, নির্জনতার ভয়েই তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

এ কথায় গগনবাবুর পা থামলো। জানা কথাটাও কানে শুনে তিনি চমকালেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নিচু করলেন।

'একটা রাত বরং থাকি তারপর কাল সকালে নিশ্চয়ই চলে যেতে পারবো কোথাও।' অতসী সান্ত্বনা দিল বাবাকে।

'কোথায় আর যাবো' হতাশায় ডুব দিলেন তিনি।

অতসী উৎসাহ প্রকাশ করলো, 'মনে হচ্ছে একটা কিছু ভালো হবে আমাদের, নিশ্চয়ই একটা ভালো জায়গা পাবো এর পর।'

'আর ভালো।' শিথিলভাবে গগনবাবু ফটকের দিকে পা বাড়ালেন।

'শুনুন মশাই—'একটি আধবুড়ো লোককে বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত মুখ নাড়তে দেখা যাচ্ছিলো, 'রিফিউজি মানে কী? অর্থাৎ যা বাতিল, যা ফেলে দেবার, যার কোনো মূল্য নেই। মানে যাকে রিফিউজ করা হয়েছে। কে আমাদের রিফিউজ করলো? পাকিস্তান না ভারতবর্ষ? বলুন দেখি আমরা কার বলি হ'লাম?'

কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন গগনবাবু, অনধিকার প্রবেশের হাতে খড়ি হাওড়াতেই হয়ে এসেছে, তবু একটা অপরিচিত বাড়ির মধ্যে, আরো কতকগুলো অপরিচিত মানুষের মধ্যে এরকম বেপরোয়াভাবে ঢুকে এসে জায়গার জন্য লাইন দেওয়া—এর চেয়ে লজ্জার আর তিনি কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। অতি-সংকোচের সঙ্গে দালানের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, বক্তৃতা দেওয়া লোকটি হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো তাদের। সঙ্গে সঙ্গে গলাভরা কৌতুক নিয়ে বলে উঠলো, 'দেখুন, দেখুন, আরো একদল। যেন ছাপ্পর ফুঁড়ে এলো। বাঃ চমৎকার। ও মশাই, অপনাদের আবার কোন মাটি থেকে উপড়োনো হ'লো?'

লোকটির কথায় একটু মজা পেলেন গগনবাবু, মৃদু হেসে বললেন, 'ঢাকা।'

'ঢাকা! আমরা হ'লাম খুলনা অর্থাৎ খুলো না। হাসালেন মশাই হাসালেন।

একেবারে উল্টো? টাগ অব ওয়ার, এ্যাঁ? তা কবে আসা হ'লো?'

'দেড় বছর আগে।'

'ও, তা হ'লে পুরনো পাপী? আমরা একেবারে নতুন বলি। ঐ যে দেখছেন বসে আছে সব গঙ্গাজল হ'য়ে' সমস্ত দলটার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, 'সব এক গোয়ালের গরু, ঐ খুলনা। এখন এক গোঠেই চরে বেড়াতে এসেছি। পুরো পঞ্চাশ জন আছি দলে, হে', হে', হে'—' এর মধ্যে হাসির কী আছে ঠিক বোঝা গেলো না, 'বলতে পারেন সেই তো বাপু এলে, কিছু আগে এলে না কেন? সহজে কি কেউ বাস্তু ছাড়ে? বলুন? তাই রইলুম মাটি কামড়ে পড়ে, ভাবলুম রোষ কি আর চিরকাল ধ'রে থাকবে? এ দেখছি থামেই না। মাঝখান থেকে সব গেল। আর এখন? মহাশ্মশান।' কী একটা নাম ধ'রে ডেকে উঠলেন, জোরে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেলেন বাইরের দিকে।"

সবাই বললো 'মাথাটা একটু খারাপ হ'য়ে গেছে, আবোল তাবোল বকে।

যতোদূর বোঝা গেল, কেউ অন্ধ আতুর ভিক্ষুক নয়, নেহাতই মধ্যবিত্ত
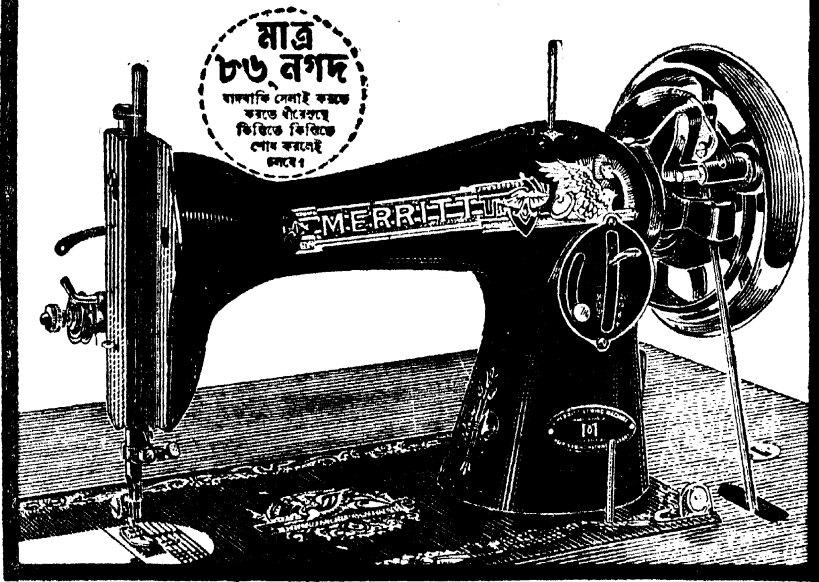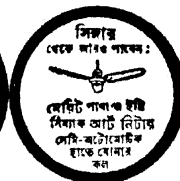
গৃহস্থ। শেষ পর্যন্তও ভিটে মাটি আঁকড়ে পড়েছিলো কিন্তু টি'কতে পারলো না। ভয়ে ভয়ে চোর হ'য়ে থেকেও থাকতে পারলো না। স্বজন সর্বস্বহারা হ'য়ে প্রাণের মায়ায় দৌড়তেই হ'লো। দৌড় দৌড় দৌড়। তার মধ্যে কতো পড়ে রইলো পেছনে, কতো মৃতের দেহে হোঁচট খেতে হ'লো, দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাজপথে সভা বসে গেল শকুন শিবার, তারপর সীমানা পেরিয়ে একটু নিঃশ্বাস। তারপর? তারপর পড়েছিলো এক আমবাগানের মধ্যে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে, ভূমিহীন আশ্রয় আচ্ছাদনহীন দেহ-মনে আর অবশিষ্ট ছিলো না কিছু। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক খবর পেয়ে সমস্ত দলটাকে নিয়ে এলেন এখানে, এই বাড়িতে আশ্রয় দিলেন, এখন তিনিই রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

কথার মাঝখানে গগনবাবুরা উঠে এসেছেন দালানে, বসেছেন একটি কোণ ঘেঁষে, বাচ্চারা মা আর দিদিকে ঘেঁষে তন্দ্রায় ঢুলছে। একজন প্রৌঢ়া মহিলা, দেখতে সুন্দরী, দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন, বললেন, 'ভালোমন্দ সবই পাশাপাশি। যেমন রাত্রি আর দিন, সুখ আর দুঃখ, জীবন আর মরণ। দেখবেন, যিনি আমাদের আশ্রয়দাতা, কেমন মানুষ তিনি। এতো বিপদ আপদ মন্দের পরেও আবার কেমন বিশ্বাস হয়, জীবনে। আবার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।'

খানিক বাদে একটি লোক এসে একটি হ্যাজাক জেলে দিয়ে গেল। আরো খানিক বাদে রাত আটটা নাগাদ, খাওয়া এলো। খিচুরি আর তরকারি। আশ্রয়দাতাকে কিন্তু দেখা গেলো না তখনো।

সেই রাত্রে, কী জানি কেন সেই প্রথম নিজেকে আর এদের সমগোত্র ভাবতে বেদনাবোধ করলেন না গগনবাবু, ঘা লাগলো না পথের ধুলোয় পিষ্ট হ'য়ে যাওয়া গল্পকথার পচা আভিজাত্যে। বরং স্বীকৃতির মধ্যে সান্ত্বনা পেলেন, শান্তি পেলেন, আশ্বস্ত হ'লেন। মনে হ'লো ভগবানই তাঁকে নিয়ে এসেছেন এখানে, তাঁর সমস্ত অহংকার ধুয়ে দিতে।

সবাই ঘুমুলে নিঘুর্ম চোখে জেগে রইলেন তিনি। চাঁদের আলোয় ভরে গেছে বারান্দাটা, গঙ্গা থেকে উত্থিত হাওয়ার দাক্ষিণ্য সমস্ত তাপ মুছে দিয়েছে জগতের, আর তারই মধ্যে এখানে ওখানে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত এতোগুলো ঘুমন্ত দুঃখী মানুষের সংস্রব তার পায়ের তলায় যেন মাটির স্পর্শ এনে দিল। ঠিক তারই মতো এতোগুলো পরিবারকে একসঙ্গে এরকম পথে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে যেন বল পেলেন ভিতরে। এরা তো সবাই একদিন গৃহস্থ ছিলো, ভদ্রস্থ ছিলো, তাঁর মতো সম্পন্ন না হোক, এমন নিঃস্বও তো কেউ ছিলো না?

না, সেদিন তাঁর হৃদয় অনেক শান্ত হ'য়ে গিয়েছিলো, জগতে যে তাঁর দুঃখই একমাত্র দুঃখ নয়, এ কথা ভেবে তিনি লাঘব হ'য়েছিলেন।

পরের দিন বুঝেছিলেন পায়ের তলায় শুধু মাটিই নয়, আবার যেন শেকড়ের গন্ধও পাচ্ছেন সেই মাটিতে।

•

শিশুরা নমনীয়। ভোর হতেই অপরিচয়ের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে তারা যে যার আপন সঙ্গী বেছে নিল। শুরু হ'য়ে গেল খেলা। দেখা গেল পঞ্চাশটি পরিবারে শিশুর সংখ্যা বড়ো মন্দ নেই। কাল এতোটা বোঝা যায়নি। লক্ষ্মীকেও আলাপ করতে দেখা গেল দু'একজন মহিলার সঙ্গে, কোণে, হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসে থাকা মেয়েটিও অতসীর কাছে এগিয়ে এলো। আর আশ্রয়দাতা মানুষটিকে দেখা গেল দুপুরের পরে। তাকিয়ে চোখ নামালেন গগনবাবু।

ঢাকার প্রধান বিপ্লবী, অনুশীলন সংঘের একচ্ছত্র নেতা মানব মিত্র। ঢাকার ছেলেরা কে না চেনে এ'র চেহারা? কে না এ'র বক্তৃতা শুনে ঘর ছেড়েছে তখন? গগনবাবুর বুকের ভিতরটা মেঘের মতো ডেকে উঠলো।

এখন বয়েস হ'য়েছে মানব মিত্রের, চুলগুলো সব ধবধবে সাদা, তবু সেই কালো চিক্কন কৃষ্ণের মতো চেহারা তেমনি অটুট। এ'র না দ্বীপান্তর হ'য়েছিলো? ভাবতে ভাবতে গগনবাবু আত্মগোপন করতে আস্তে উঠে সকলের অলক্ষ্যে গঙ্গার দিকে চলে গেলেন।

কিন্তু সেখানে এসে মানব মিত্র ধরলেন তাঁকে, কোনো লজ্জা দ্বিধার সময় না দিয়ে বললেন, 'শুনুন, আমার একটা স্কুল আছে, স্কুলটা এখন ছুটি, বাড়িটা খালি, আপনার পরিবার নিয়ে আপনি সেখানে চলুন, মনে হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে ভালো একটা বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে, ততোদিন আপনারা সেখানেই থাকবেন।'

কথার মধ্যে কোনো ভনিতা নেই, করুণা নেই, ভদ্রতার মুখোশ নেই, শুধু একটি পরিচিত বিপন্ন মানুষের জন্য উন্মুখ সাহায্যের সহজ প্রকাশ মাত্র।

অভিভূত গগনবাবু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। মানব মিত্রই আবার বললেন, 'কুণ্ঠার কারণ নেই কোনো, বয়সে আমি আপনার অনেকটা বড়ো, অবস্থায় আপনার চেয়ে উৎকৃষ্ট নই, অতীতে যতোদূর মনে পড়ে আমার দলে আমি আপনাকে

অনেকবার দেখেছি। নাম লিখিয়ে সভ্য না থাকলেও এবং সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যোগ না দিলেও, আপনি আমাদের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন। চলুন, এখুনি চলুন।'

এলালতার কথা মনে পড়লো গগনবাবুর। । এ'র বোন। ঢাকার ফ্লেইম। বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদয়হারিণী। আর সেই সুব্রত সেন? এলার জন্য যে তোলপাড় ক'রে ফেলতে পারতো সারাজগৎ? সে কোথায়?

না. অন্ধকার নিরবচ্ছিন্ন নয়। মানব মিত্রর ইসকুল বাড়িতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মনে হয়েছিলো কথাটা। কতোকাল পরে একটা ভদ্র আশ্রয়ে ভদ্র সংশ্রবে এসে মনে হচ্ছিলো যেন কোনো চেনাফুলের বিস্মৃত মদির গন্ধের মোহ।

শুধু মাত্র মানব মিত্রই নয়, এলালতার সঙ্গেও দেখা হ'লো একদিন। একটু দূরে একটা ছোটো বাড়িতে থাকেন এ'রা ভাই-বোন। কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, 'দেশকে স্বাধীন করবার জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে আহুতি দিয়েছিলাম। তারপর তো সবই হলো, আমরা এখানে এলাম, আপনারা এখানে এলেন, সর্বস্তরে নুনভাতটুকুও জুটলো না। না. এই চেহারা তখন ভাবিনি। স্বাধীনতার পরে ছাড়া পেয়ে যখন ফিরে এলুম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করতে করতে এসেছিলুম। তারপর দেখলুম একে বাঙাল, তায় বাঙালী তার উপর আবার ঠেলে এগুতে শিখিনি, পড়ে গেলুম গর্তে। তারপর এই, ভাইবোনে ইশকুল করেছি একটি, পেট কতোটুকু চলে জানি না, সেটা গৌণ. কিন্তু শিশুদের চলতে শেখাই প্রাণ দিয়ে!'

একদা তাঁর জগতের সব চাইতে আদর্শ পুরুষটির কথা মন দিয়ে শুনছিলেন গগনবাবু।

'তা দেখুন. সারা জীবনের অভ্যাস কি আর বদলানো যায়? এখন এই সব করি। প্রতিষ্ঠান বলে তো কিছু নেই, সামান্যই ফান্ড, ছেলেরা মাঝে মাঝে কিছু চাঁদা তোলে, তাই দিয়ে সর্বহারা বিতাড়িত মানুষগুলোকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। আমার বোন আমার চেয়ে বছর কয়েকের ছোটো, আমিই তাকে রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়েছিলাম, এই দুঃখের পথে আমিই টেনে এনেছিলাম তাকে। তার জীবনেও আমি কোনো নিজস্ব সুখ দুঃখ থাকতে দিইনি। এখন অনুতাপ হয়। তাকে বুঝিয়েছি, বিয়ে তো মানুষের স্বার্থপরতা। বিয়ে করলে মানুষের মন আপন সংসারের দিকেই ধাবিত হয় বেশী। দেশমাতৃকার সেবা তবে কখন করবে? চাই একাগ্রতা। চাই নিষ্ঠা। তবে তো? আমার বোন একটা আগুনের শিখার মতো মেয়ে ছিলো, মা-বাবার মনে কতো দুঃখ দিয়ে ঘরছাড়া করলুম তাকে। আর এখন? মাস্টারি করছে আর রোগে ধুঁকছে। মনে হচ্ছে জীবনের তেলে পলতে বুঝি আর বেশীদিন ভেজা থাকবে না।'

চুপ করে উদাসভাবে কোথায় তাকিয়ে রইলেন তিনি। গগনবাবুরই বা আর বলবার কী ছিলো।

২৪

তারপর সেই মানব মিত্রের দয়াতেই এই একখণ্ড জমি। কলকাতার এই দক্ষিণতম প্রান্তে। অব্যবহারে জঙ্গল হয়ে পড়েছিলো। মাটির সমুদ্র, মাত্র ষোলো টাকা জমা দিয়ে প্রত্যেকটি পরিবার পাঁচ কাঠা করে জমির মালিক হলো। কোথায় গেল বাঘ ডাকা অন্ধকার আর জঙ্গল, মাথায় টালি দিয়ে দিয়ে সব ঘর উঠে গেল রাতারাতি. এই বাড়ি গগনবাবু বলতে গেলে প্রায় নিজে হাতে তুলেছেন। সাঁওতাল দিয়ে মাটি কাটিয়ে সারাদিন নিজে মাটি লেপেছেন দেয়ালের গায়ে। ঘরামিদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে বেড়া বেঁধেছেন. মাথার উপর বাঁশের খাঁজে একটা একটা করে টালি বসিয়েছেন। এই ধরনের কাজে বরাবরই তাঁর উৎসাহ ছিলো, দক্ষতা ছিলো, সুখী শরীরে পরিশ্রমটাই শুধু করতে পারতেন না। অবস্থার বিপর্যয়ে সেটাও সইলো।

মাত্র ষোলোদিনে বাড়িটি তৈরি করে ফেলেছিলেন তিনি। জমির জন্য জমা দেয়ার ষোলো টাকাও যেমন মানব মিত্রই ধার দিয়েছিলেন, বাড়ি তোলার টাকাটাও তিনি দিলেন। আরো দিলেন। একটি চাকরি দিলেন নিজের ইসকুলে। কৃতজ্ঞতার সীমা ছিলো না গগনবাবুর।

হলো, সবই হলো, বাড়ি হলো, চাকরি হলো, তবু অভাব মিটলো কোথায়? সত্তর টাকা মাইনে থেকে ধার শোধ বাবদ পনেরো টাকা কেটে, যা থাকে তা তো ফুৎকার। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে, খোরাকও বাড়ছে সেই সঙ্গে। আর সেই খোরাক চোখে পড়ে গগনবাবুর। তেষ্টা পেলে জল আর খিদে পেলে ভাত এই যাদের বরাদ্দ তাদের খোরাকির পরিমাণ চোখে পড়ার মতো হলেও ভেবে দেখতে গেলে জীবন ধারণের পক্ষে ততোটাই তো তাদের দরকার। গগনবাবু বোঝেন তবু ওদের চেটেপুটে খেয়ে উঠেও কাঙালের মতো বসে থাকার ধরন দেখে বেদনা এবং বিরক্তি দুই-ই অতিষ্ঠ করে তাকে। ওরা নেমে যাচ্ছে. এক পুরুষের অভাবেই সমস্ত আভিজাত্য মুছে যাচ্ছে চরিত্র থেকে। ভিতরটা যেন ছটফট করতে থাকে।

সব সত্ত্বেও নতুন বাড়িতে এসে নতুন চাকরিতে ঢুকে কয়েকটা দিন কিন্তু শান্তিতে ভরে উঠেছিলো। ছেলেমেয়েরা তো খুশিই, তাদের মার মুখেও হাসি ফুটতে দেখা গেল। সবাই মিলে খড়কুটো যা আছে তাই দিয়ে সাজিয়ে নিল বাড়ি. গগনবাবু আশা করতে লাগলেন, শীগ্গিরই উপার্জনের আরো কোনো রাস্তা তিনি পেয়ে যাবেন।

একজন বুদ্ধি দিলেন, 'বাণিজ্য করুন। বাণিজ্যই লক্ষ্মীর আসন।' 'শুধু হাতে কী বাণিজ্য করবো?' 'কেন? মাইনেটি পেয়েই বড়োবাজারে ছুটুন. সস্তায় নিয়ে আসুন তৈজসপত্র, বেশী দামে বিক্রি করুন ঘরে ঘরে। দেখবেন লাভের অঙ্ক লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠছে।'

ঠিক। মাসের পয়লা তারিখকে আর দোসরা হতে দিলেন না গগনবাবু, মুদি দোকানের ধার শোধ করলে না, ইসকুল থেকে মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন না। সোজা বড়োবাজারে গিয়ে হলুদ, লঙ্কা ধনে, জিরে, তেজপাতা, পোস্ত, মুসুরির ডাল, পাঁপর যা দুই চোখে পড়লো কিনে নিয়ে ভারবাহী হয়ে ফিরে এলেন বাড়ি। লক্ষ্মী বললেন. 'একি!'

গগনবাবু বললেন, 'দ্যাখো না কী করি।'

তা করলেন। অঙ্ক কষে দেখলেন যা মাল তিনি যে দামে এনেছেন. এখানকার দামে বিক্রি করলে পঁচিশ টাকায় তিনি সাড়ে সাত টাকা লাভ করছেন। সে কি কম। তার মানে একশো টাকায় তিরিশ টাকা। এরপরে কোনো রকমে ধারকীটাকি করে সত্যি যদি একশো টাকার মাল তিনি কিনে আনতে পারেন একলাফে তিরিশ টাকা বেশী আয় হয়ে যাবে। গগনবাবুর কাছে তিরিশ টাকা কি সোজা টাকা?

বিক্রির জন্য তাঁকে পরিশ্রমও করতে হলো না। গন্ধে গন্ধে প্রতিবেশীরাই ছুটে

এলো কিনতে। লক্ষ্মীকে দিদি দিদি করে, পাঁচ টাকার মালে এক টাকা দিয়ে বাকীটা বাকীতে নিয়ে চলে গেল। তারপর ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে পাঠিয়ে হাজার তাগাদায়ও সেই বাকী আর তারা পরিশোধ করলো না। মাল এনেছিলেন তিরিশ টাকার, বাকী পঁয়ত্রিশ টাকায় সে মাসে শুধু দুটি ভাতের খিদেও মিটলো না কারো।

এরপরে তিনি আয় বাড়াবার জন্য আরো কী করেছিলেন না করেছিলেন তার প্রাত্যহিক ইতিহাস জেনে লাভ নেই। মোট কথা হাজার চেষ্টা করেও দারিদ্র্যের সেই ভীষণ আবর্ত থেকে আর উদ্ধার পেলেন না তিনি। একটা পাঁকে যাওয়া বিরাট জন্তুর মতো ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগলেন আরো, আরো, আরো গভীরতম অন্ধকার অতলে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে স্ত্রী শয্যা নিলেন, ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠতে পারলো না, কারো লিভারের দোষ হলো, কারো রক্ত কমলো, পার্থ আমাশয় ভুগে ভুগে মৃত্যুর দরজায় এসে পৌঁছোলো, মালতী পা ভাঙলো, চম্পা বখা হলো, তারও উপরে ভগ্নির মৃত্যুতে ইসকুল তুলে দিয়ে কোথায় চলে গেলেন মানব মিত্র। এইটিই শেষ প্রহসন। তার পরেই মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে গগনবাবু একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হলেন।

কিন্তু আশার আলোও কি উঁকি দিচ্ছে না একটু? আশা? এর নাম আশা? গগন, একে তুমি আশা ভাবছো? তুমি শেষে এইখানে এসে পৌঁছোলে? এইখানে? ছছিঃ!

কিন্তু আমি কী করি। কী করি! আমাকে আজ কে বাঁচাবে? কে বুদ্ধি দেবে, শক্তি দেবে—না, না, না।

'বাবা', চা নিয়ে এসে শিয়রে দাঁড়ালো অতসী, 'আর কতো ঘুমুবে?' মেয়ের ডাকে চমকে গিয়ে নড়ে চড়ে শুলেন গগন-বাবু, মুখ তুললেন না। মুখ তিনি কী করে তুলবেন? সারা মুখ চোখের জলে ধোয়া। উঠলেন চা রেখে অতসী চলে গেলে। এই সকালবেলায় অতসীর কাজের অন্ত থাকে না, কোনোদিকে বিশেষভাবে মন দেবার অবসর থাকে না, নইলে বাবাকে ঘুমন্ত ভাবতো না সে। অস্বাভাবিক ভাবতো।

গগনবাবু মুখ ধুতে চলে গেলেন। হাতে পায়ে মাথায় কানের পিঠে ভালো করে জলে দিয়ে শান্ত করতে চাইলেন নিজেকে। এসে দেখলেন চায়ের পাশে তেলনুন মেখে ছোটো এক বাটি মুড়িও রেখে গেছে মেয়ে। খাবার বদলেছে, আটা রুটির বদলে মুড়ি। গগনবাবুর মনে পড়লো কদিন আগে কথা প্রসঙ্গে বলে-ছিলেন, হিন্দুস্থানীদের মতো দিনেরাতে আর আটা ঢুকতে চায়না গলা দিয়ে এর চেয়ে তেলমুড়ি ঢের ভালো। অন্তত সকালে বিকেলে চায়ের সঙ্গে। বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। অদ্ভুত! ভালোমন্দ কতো ধরনের অভিজ্ঞতাই যে হলো এই ক'বছরে। কে জানতো জীবনের পথ এতো দুর্গম। কে জানতো মানুষের মতো বিষধর সর্প প্রাণীকুলে আর কিছু নেই। জীবিকার জন্য মুটেগিরি থেকে মাটি কোপানো কোন স্তরই তো বাদি দিলেন না, সর্বত্রই এক চেহারা।

'কিন্তু মানে—' ঘুরে ফিরে কেবল একটা কথাই উঁকি মারছে গগনবাবুর মনে, একটা চিন্তাই পাক খাচ্ছে, একা একাই দুজন মানুষ সেজে একে অপরের সঙ্গে যুক্তি তর্কের অবতারণা করছে। আত্মাটা দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। গীতার শ্রীকৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরেছে হৃদয়। অর্জুনকে তিনি মুখব্যাদান করে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। আত্মজনের সঙ্গে যুদ্ধবিমুখ অর্জুন দেখে-ছিলেন কালের কবলে আত্মপর বলে কিছু নেই। বন্ধু শত্রু কেউ নেই। সকলেই ধেয়ে ধেয়ে ঐ একদিকেই ছুটেছে। আগুনে পতঙ্গের মতো সব মানুষ সেখানে একাকার। আলাদা মত পথ, দুঃখ বেদনা, ভালো মন্দ সবই জীবনের বিকার মাত্র। কে কার অনিষ্ট করতে পারে? কেউ না। সবই কর্ম।

অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ফলাফলের আশা করো না। কর্ম করে যাও।' কর্মটা কী? যুদ্ধ। ফলাফলটা কী? যুদ্ধে জয় করা। অর্থাৎ যুদ্ধটা যুদ্ধের জন্যই করবে, জয়ী হবে বলে নয়।

না, কৃষ্ণ এখানে সত্য কথা বলেন নি। মুখে একথা বলেছেন বটে, আচরণে দেখিয়েছেন অন্য। অর্জুনকে জয়ী হবার জন্য ছল বল কৌশল সমস্তরকম গর্হিত কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হে আমার হৃদিস্থিত হৃষিকেশ, তা হলে আমার কী কর্ম বলে দাও আমাকে। বল, তোমার অর্জুন যদি আজ আমার অবস্থায় পড়তো তাকে তুমি কী বুদ্ধি দিতে? দ্যাখো, তাকিয়ে দ্যাখো, কতো-গুলো প্রাণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অকালে। সংসার ভেঙে তচনচ হয়ে গেছে আমার। আমার স্ত্রী মৃতকল্প, পুত্র মৃতকল্প, কন্যা পঙ্গু, আমার পেটে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই, মাথায় আচ্ছাদন নেই, এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত? যদি কেউ বলে মাত্র একজনের বিনিময়ে বাকী নয়জন আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির স্পর্শে শস্য তার উদ্গমে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাহলে—তাহলে আমি—'

'বাবা' আবার অতসী এসে দাঁড়ালো। থর থর করে কেঁপে উঠলেন গগনবাবু। জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন। মস্ত মস্ত নিঃশ্বাস নিলেন।

'আমি বলছিলাম কি, পার্থকে যদি কোনো হাসপাতালে দেয়া যায়—'

'হাসপাতালে?'

'ফ্রি ওয়ার্ডে। বাড়িতে তো ওর যত্নপথ্য কিছুই হচ্ছে না।'

'যত্নপথ্য?'

'আর মার কথাও ভাবছিলাম—'

'তাঁকেও হাসপাতালে?'

'যদি সম্ভব হয়—'

'তাঁকেও ফ্রি ওয়ার্ডে?'

'ঠিক মতো অন্তত খেতে দেবে ওরা।'

'হুঁ।'

'আমি কি তুমি না হয় পালা করে করে থাকবো গিয়ে সেখানে। কোন অসুবিধে হলেই জানতে পারবো।'

'শুনুন।'

'বল।'

'ওদের বাড়িতেই মরতে দে।'

অতসীর চোখে জল এসে গেল। সামলে নিয়ে চলে গেল সে। গগনবাবুর চিন্তার জোঁকগুলো আবার রক্ত শুষে নিতে লাগলো তাঁর।

তিনি জানেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন, দুদিন থেকে পার্থ এবং তার মা দুজনের অবস্থাই বেশ বিপদজনক ভাবে খারাপের দিকে এগিয়ে এসেছে। ওরা এবার যাবে। তার বুকের পাঁজর খসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে সব বাতি নিববে। পঙ্গু মালতীকে শেয়ালে শকুনে ছিঁড়বে, চম্পাকে ছিঁড়বে তার কামনার আগুন, ছেলেগুলো কে কোথায় ভাসবে কেউ জানে না। তখন অতসী কী করবে?

কী করবে? কী করবে? কী করবে? গ্রামোফনের ভাঙা রেকর্ডের মতো ঐ একটা লাইন আটকে থাকলো মাথার মধ্যে।

ক্রমশ

ন‍ূতন দিল্লির ন‍ূতন 'স‍ুপার বাজার' গ‍ৃহ

কেনাকাটার ন‍ূতন অধ্যায়

মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্যে বড় বড় বিভাগীয় বিপণি স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে। দেশের দিকে দিকে সমবায়ভিত্তিক বেচাকেনার ব্যবস্থায় ম‍ূল্যমান কিছ‍ুটা স্থিতিশীল হতে পারে এই ভরসা। সমবায় আমাদের দেশে যতটা কৃতকার্য হবে আশা ছিল, ঠিক ততটা কোনও ক্ষেত্রেই হয়নি। তব‍ু বিরাট ম‍ূলধনে বিভাগীয় বিপণির দায়িত্ব গ্রহণ আমাদের দেশে সম্ভব নয় বলে সমবায়কে সরকারী প্রেরণা দিয়ে বিভিন্ন একক কেন্দ্র মাধ্যমে ন‍ূতন পথে পরিচালনা করা হবে। তার ফলে যেখানে বিভাগীয় বিপণির স‍ুযোগ স‍ুবিধা থাকবে না, সেখানেও দ্রব্যম‍ূল্যে তার প্রভাব কিছ‍ু বিস্তার হতে পারে। কেনাবেচার আয়োজনে উৎপাদন থেকে নিয়ে ব্যবহারকারী বা consumer পর্যন্ত যে লম্বা সীমারেখা টানা থাকে তাতে মধ্যস্থদের মারফত জিনিসের দাম বেড়ে যায় সবচেয়ে সহজে। যেমন পোশাকের পরিধানকারী, খাদ্যের ভোক্তা সোজা তাদের ব্যবহার্য উৎপাদনের স‍ূত্র থেকে পায় না। এই মাঝের মহাজনরাই জিনিসের মহার্ঘ্যতার জন্য বিশেষ দায়ী। কারবারে অন্যায় যা কিছ‍ু তারও অনেকটাই ঘটে এই মধ্যস্থ কয়েকটি পর্যায়ে। মধ্যস্থকে কমিয়ে ফেলে ক্রেতা স‍ুখ-স‍ুবিধা পেতে পারেন এই প্রথম পরীক্ষার ফলেই সমবায়ের জন্ম। সে সম্বন্ধে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। এবার এই সংকটে সমবায়ের ন‍ূতন পরীক্ষায় দেশে ব্যাপকভাবে যদি এতট‍ুকু সাহায্যও হয় তবে বড় শহর বাদ দিয়েও সমবায় দ্বারা ছোটখাটো প্রচেষ্টা চালাতে মেয়েরাও হয়তো উৎসাহ পাবেন।

সমবায়ের কথা বাদ দিলেও বড় বড় 'স‍ুপার মারকেট' আধ‍ুনিক শহরম‍ুখী সভ্যতার অংগ হয়ে উঠছে—বিশেষত উন্নত দেশগ‍ুলিতে। সোজা উৎপত্তিস্থলে অনেক পরিমাণে কেনাকাটার ফলে দামের পরতা কম হয় এবং একই মালিকানায় শত শত, এমনকি হাজার হাজার বড় দোকানে লক্ষ লক্ষ ক্রেতা সেই স‍ুযোগ পান বলে দোকানের লোকসানের প্রশ্ন ওঠে না। যে দেশে যে ভাবে স‍ুবিধা সেইভাবে মালিকানা চলে কিন্তু ফলের লক্ষ্য একই—ম‍ূল্যব‍ৃদ্ধি না হয়ে দ‍ূর দ‍ূরান্তরের উৎপন্ন জিনিস সাধারণের সামনে তুলে ধরা।

মার্কিন দেশে তো একাধিক পণ্য ভাণ্ডার ঘরনীদের মনোরঞ্জনে পরস্পরের সংগে পাল্লা দিয়ে চলে। সকাল বেলার খবরের কাগজ খ‍ুলে হয়তো মার্কিন মেয়ে দেখে এক বিশেষ পণ্য বিপণির বিজ্ঞাপন। সেখানে ব্রেজিলের কফি, আলাস্কার মাছ

তাঁত বিভাগে দেখনে বাংলার তাঁতের শাড়ীর কি আদর! দামে সস্তা, গরমে আরাম, সহজে ধোওয়া যায়

আর প্রশান্তসাগরে ধরা কাঁকড়া সস্তা দরে মিলছে। কফি আর কাঁকড়া কেনার অভিযান চালাবার আগেই পাতা উলটিয়ে পাওয়া যায় আর এক সেরা সঞ্চয়ের খবর। অস্ট্রেলিয়ার মাংস সেখানে জলের দরে বিকোচ্ছে! এক এক দোকানের গুদামঘরই কত, প্যাক করে ঠাণ্ডা ঘরে রাখার ব্যবস্থা, টিনে ভরার আয়োজন, রুটি কেক বানাবার ফ্যাক্টরি সবই নিজস্ব। এদিকে নিজেদের যানবাহন, ট্রাক, কুলি আনছে, দিচ্ছে, পৌঁছে দিচ্ছে।

এরকম একটি বিভাগীয় বিপণির কথাই ধরা যাক। শাখা প্রশাখায় তার ৪,৫০০টি স্টোর। কেনাবেচার হিসাব বৎসরান্তে ৩ থেকে ৪ হাজার কোটি টাকা। সারা মার্কিন দেশের খাদ্যের প্রায় দশ ভাগ এদের হাতে যাওয়া আসা করে। কোম্পানীর নাম গ্রেট আটলাণ্টিক ও প্যাসিফিক টী কোম্পানী। সংক্ষেপে এ অ্যানড্ পি। সে দেশে এখন টাটকা স্ট্রবেরি, তাজা ডিম, ঘরে তোলা মাখন পেতে হলেও এসব শাখাবহুল বিভাগীয় বিপণির কাছে যেতে হয়।

শাখাগুলি আবার অনেক সময় ভাগ ভাগ করা। ব্যবস্থাপনা হয়তো কতকগুলি শাখার একত্র করে করা হয়, আবার অন্য শাখায় আর এক ব্যবস্থাপনার দল থাকে। কোথাও ফল পাকলো তো A & P-র ডজন ডজন লোক উজাড় করে ফল কিনে আনে। ফসল তৈরি? A & P-র দল চাষীর ঘরে হাজির। তারা সৎ এবং বিশ্বাসী, কাজেই ফল ফসল বিক্রি করতে চাষীও চিন্তা করে না। সেরা জিনিসটি এদিকে গৃহিণীরা অল্প দামে ঘরে তুললেন। মাঝের সব মহাজন সেখানে একেবারে অবান্তর। এ অ্যানড্ পির মত—আর একটি বিপণিগুচ্ছ আছে তারা হ'লো Safeway। মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে Safeway-র বেচাকেনা। তবে তাদের বাৎসরিক বিক্রি এ অ্যানড্ পির অর্ধেক! এ অ্যানড্ পি বা Safeway-র মত বড় বিভাগীয় বিপণি বাদ দিলে, সমবায় সমিতিবদ্ধ স্টোরও মার্কিন দেশে অনেক আছে। দুটি তিনটি শাখা নিয়ে যে বিভাগীয় বিপণি অথবা এক মালিকের বড় দোকান যদি বিশাল আয়তনে কেনাকাটার সুযোগ নিতে চান এবং অধিক সমৃদ্ধ বড় স্টোরসমূহের সঙ্গে দামেদরে পাল্লা দিতে চান তবে এই সমবায় ব্যবস্থা তাদের আয়োজনকে সহজ করে দিতে পারে। ছোট-খাটো মালিকানার দোকানের যে গুণ তাও

বই-এর স্টল

বজায় থাকে আবার সমবায়ের আওতায় বড় স্টোরের মত সুযোগ-সুবিধা করে নেন। দোকানের কর্তা নিজে দেখাশুনো করেন, ক্লান্ত গৃহিণীর হাতের বোঝা হাল্কা করে বয়ে দিয়ে হেসে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন, ঘরের মেঝে ঝকঝক করছে কি না খেয়াল করেন আবার শাকসবজি ধুয়ে মুছে সাজানো কি না তাও একবার ঘুরে দেখেন। কাজেই আমাদের দেশে খুব বড় 'Chain' Stores না হ'লেও ছোট দোকান দু' চারটি একত্র হ'য়েও সমবায় সমিতিবদ্ধ হ'তে পারেন। এতদিন যে হয়নি তার মূলে এক নির্লিপ্ত উদাসীনতা ও ক্রেতার সুখ-সুবিধার প্রতি অনাসক্ত অনাদর বর্তমান। পাড়ার মেয়েরা নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সমবায় বিপণি যদি করেন তবে অন্য পাড়ার বিপণির সংগে সমবায় যোগ-স্থাপন করে অনেক সহজে কেনাকাটা ইত্যাদি করতে পারেন।

সমবায় মাধ্যমে বিশাল ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর নিত্যব্যবহার্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারে কি না দেখার পরীক্ষা হিসাবে গত ১৫ই জুলাই বিকেলে নতুন দিল্লিতে একটি অতিকায় বিপণির পত্তন হ'য়েছে। আমাদের দেশে এ ধরনের স্টোর এই প্রথম এবং কর্তৃপক্ষ আশা করেন এর কৃতকার্যতার সংগে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ও স্থানে স্টোর খোলার প্রেরণা যুক্ত থাকবে। আপাতত দর্শক ও ক্রেতা কারোই উৎসাহের অভাব নেই। নূতনত্ব তো বটে! দামও দু-চার পয়সা বেশীর ভাগ জিনিসেই কম। সব চেয়ে আকর্ষণ ফল আর শাকসবজি। এত বড় স্টোরে ঝকঝকে সব আধারে সাজানো তাজা টাটকা ফল থরে থরে রাখা দেখলে বিদেশের সব পণ্য বিপণির ছবি মনে আসে। তবে নূতন সব কর্মীরা দেখলাম হিসেব করতে হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছেন। কিউর নামে হাতাহাতি, ঠেলা-ঠেলি, মায় গালমন্দ পর্যন্ত চলছে। এ ত্রুটিটুকু সেরে নিয়ে দোকান খুললে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই কাজ সহজ হ'তো।

তাঁতের কাপড়ের ঠাসাঠাসি করা তাক-গুলিতে দেখলাম বাংলা দেশের তাঁতের কাপড়ের আদর সব চেয়ে বেশী। ফিতে পাড়, হাতীপাড়, গংগাযমুনা, কস্তাপাড়, ডুরে, চৌখুপি রঙগীন, সাদা, নীলাম্বরী কত যে সব বাংলার তাঁতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে লোফালুফি করছে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব রকমের মেয়ে। বাংলা-শাড়ি চাই-ই-চাই। সেখানে ছোট বড় সব এক। মেয়েরা যারা বিক্রির ভার নিয়েছে তারা বলে বাংলার তাঁতবস্ত্র চিরকালই আদরের ছিল, এতদিনে অবাঙালী মেয়ের কাছে প্রায় পাগলামীর পর্যায়ে পৌঁছেছে। 'ফ্যাশন' বলে যদি কিছু থাকে তবে আজকের মূল্য-স্ফীতির বাজারে সব চেয়ে আদরিণী ফ্যাশন একখানা বাংলার তাঁতের শাড়ি।

ফল ও সবজির বিভাগ

ওষুধের ডিপার্টমেণ্টটি বড়। তার পাশেই বাসনপত্র, গৃহস্থালির সামগ্রী। তেতলায় উঠলে কাফেটেরিয়া, বই-এর দোকান ইত্যাদি। দোকানটি আরও বাড়ানো হবে। আপাতত শ' দুই কর্মচারী ও জন পঞ্চাশেক 'পার্ট টাইম' কর্মী নিয়ে কাজ হ'চ্ছে।

স্কুলপাঠ্য বইগুলি শতকরা ১০ টাকা হারে দাম কমিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। সোজা উৎপাদনস্থল থেকে জিনিস কেনাই উদ্দেশ্য, আপাতত কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাইকারী বাজারের ব্যবহার হ'চ্ছে।

সুপার বাজারের সাইকেল স্ট্যাণ্ডের ভার নিয়েছে মূক-বধির অ্যাসোসিয়েশন। পালা করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দেখাশুনোর ভার নেবে এই ব্যবস্থা।

সুপার মার্কেট বা বড় বিভাগীয় বিপণি সমবায় মাধ্যমে এই প্রথম হ'য়েছে আমাদের দেশে। হয়তো দোষ-ত্রুটিও প্রচুর থাকবে অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু দ্রব্য-মূল্যের উপর অল্পাধিক ছায়াপাত করেছে এ কথা অনস্বীকার্য। ফল সবজির বাজারে সেটি সব চেয়ে বেশী লক্ষণীয়। এই দৃষ্টান্তে যদি বড় শহরেও কিছু পরিবর্তন হয় তবে বিপর্যস্ত গৃহিণীর কিছু সুবিধা হবে। বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন বড় শহরে স্টোর খোলার সময় হয়তো প্রথম স্টোরের ভুল ত্রুটি থেকে সাহায্যও হবে কিছু।

* * *

জ্ঞানের চেয়েও কল্পনার প্রয়োজন বেশী বলেছেন আইনস্টাইন।

—শ্রীমতী

আরামের জন্যে তৈরী...
শৌখীনতার জন্যে সৃষ্টি
শ্রীনিবাস আর শ্রী মধুসূদন
"ড্রলন" দিয়ে তৈরী
শ্রীনিবাসের শাড়িগুলি চাইবেন।
শ্রী

গানের আসর

ভজন

কয়েক বছর আগে গঙ্গাতীরবাসী এক বৃদ্ধ স্নানরত এক পশ্চিমী ব্রাহ্মণের নিতান্ত স্বগত গাওয়া ভজনের প্রতি আমার শ্রুতি আকর্ষণ করে বলেছিলেন—"গান বাজনা তো অনেক শোনো—ওই বুড়ো যে ভজন গাইছে তা কি কান পেতে শুনেছ?" উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন—"ও কিন্তু ওতেই তৃপ্ত—ওই ভজনেই ও ওইটুকুর জন্যে ভগবানের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়।" কথাটা আবার মনে পড়ল দিন কয়েক আগে ঋষিকেশের এক ধর্মশালায় কয়েকটি বৃদ্ধ-যাত্রীর ভজন শুনে। সারাদিন অসহ্য গরম। তার ওপর অধিকাংশ সময় কেটেছে রাস্তার ওপরে। সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় বিছানা পেতে বসেছি। অদূরে একটি শয্যায় বসে আছে গুটি তিনেক বৃদ্ধ—উত্তর প্রদেশের লোক। আপনার মনে এই আনন্দ ভ্রমণের কয়েকটি দিনের কথা ভাবছিলাম, এমন সময় কানে এল বার্ধক্যের ভগ্নকণ্ঠে ভজনের সুর। একটি বৃদ্ধ ধরেছে তুলসীদাসের পদ। এ সুরটা কানে যে পথ দিয়ে প্রবেশ করল সে বিচারের পথ নয়। এতে সমালোচকসত্তা জাগ্রত হয় না, জাগ্রত হয় এক মহামানবিক অনুভূতি যা অন্তর থেকে উত্থিত একটি শাশ্বত ধ্বনিকে মর্মে গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন পদকর্তার ভজন সেই বৃদ্ধ গেয়ে যেতে লাগল একটির পর একটি। তার সহযোগীরা কখনো তার সঙ্গে গাইল কখনো হাতে তালি দিতে লাগল। একজন আর একজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল গানের পদ—ভুল হলে শুধরে দিতে লাগল। বুঝতে পারা গেল এরা বাল্যকাল থেকে অতি যত্নে কণ্ঠস্থ করেছে এই সব নানা শ্রেণীর ভজন। এ হচ্ছে এদের ট্র্যাডিশন। এইভাবেই এদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, ধর্মবোধ জাগ্রত করা হয়েছে, পাপ-পুণ্যে সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করা হয়েছে। এদের যুগ চলে গেছে—বর্তমানে এই উত্তর প্রদেশেই যারা মানুষ হচ্ছে তারা আর এই ট্র্যাডিশন পাচ্ছে না, সরু প্যান্ট আর খাটো জামা পরে তারা যেভাবে মানুষ হচ্ছে তাতে আর যাই থাক আগের যুগের সাত্ত্বিকভাবের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ভজন শব্দটি আমাদের অপরিচিত নয়। গানের আসরে, রেডিওতে অনবরতই আমরা ভজন শুনছি, কিন্তু আসলে সেগুলি কোনটিই ভজন নয়, খেয়াল। খেয়ালের ঢঙেই আজকাল প্রধানত ভজন গাওয়া হয় তান বিস্তার দিয়ে। ভজন এই হিসাবে জাতে উঠেছে কিন্তু তার মূল রূপটি হারিয়েছে। আসল ভজন যদিও সুরে তালে সম্পাদিত হয় তবু তার মধ্যে আছে একটি পাঠের ভঙ্গী, খুব সরল সুরেলা কণ্ঠে স্বতোৎসারিত একটি বাণীকে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা। বিভিন্ন পদকর্তা বিভিন্নভাবে এই বাণীরূপকে প্রকাশ করতেন। সেই ট্র্যাডিশনটিই ভজনের মধ্যে রয়ে গেছে' অনেক সময় দেখা যায় একটি দু লাইনের ছোট্ট ভজনের মধ্যে আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আবার অনেক সময় অনুরূপ আর একটি ভজনেই যেন বৈরাগ্যের একটি উদাসভাব মনকে বিবাগী করে তুলেছে। ওই সুরেলা পঠনভঙ্গীতেই এই বিভিন্নভাব ফুটে উঠছে। ক্লাসিকাল প্যাটার্নে নানা তানবিস্তার ছাড়াও এটি সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছে খুব আনসফিস্টিকেটেড রীতিতে। এই হচ্ছে আসল ভজন। এরই সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার। গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠে যদি সুর থাকে এবং সেই সঙ্গে থাকে সাধারণ তাল বোধ তাহলে এই নিরাভরণ সংগীতও পরম উপভোগ্য হতে পারে। যদি সেইভাবে খুঁজে পেতে কেউ টেপরেকর্ডে এসব ভজন ধরে আনতে পারেন তাহলে তিনি একটি দুর্লভ বস্তুর অধিকারী হবেন।

বলা বাহুল্য প্রথমে এই সরল মাধুর্যের জন্যই ভজন সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলায় ভজনের চলন ছিলনা কিন্তু গিরিশ ঘোষের অনেক গানে ভজনের ধরণে সুরারোপ করা হয়েছে দেখতে পাই। তাঁর "কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কানন চারী" একটি উৎকৃষ্ট ভজন। দ্বিজেন্দ্রলাল ভজনের ঢঙে গান বেঁধেছেন। তাঁর গঙ্গাস্তোত্র "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে"—তো ভজনের মতই গাওয়া হয়। কাশী বৃন্দাবনে বহু বাঙালী ভক্ত এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিন্দী ভজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ক্রমে বাংলায় হিন্দী ভজন পরম সমাদরের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালী যদুভট্ট একটি ভজন রচনা করেছিলেন—"রাধারমণ মদন-মোহন মাধব মুকুন্দ মুরারি।" জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠে যিনি এই গান শুনেছেন তিনি কোনদিন এর মাধুর্য ভুলতে পারবেন না। যদিচ তিনি ঠিক ভজনের ঢঙে এই গানটি গাইতেন না, তথাপি তাতে ভজনের পুণ্য স্পর্শ বহুল-ভাবে পাওয়া যেত।

ওস্তাদদের মধ্যে অনেকেই ভজন গাইতে ভালবাসেন। কিন্তু এই ভালবাসার একটা মারাত্মক দিকও আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁদের কৃপায় সব গানেই তাঁদের নিজস্ব ওস্তাদী এসে যায়। এমন কি "বন্দে মাতরম্"-এর মত গানও যে কশ্চিৎ পূজ্য পণ্ডিত ওস্তাদপ্রবরের ওস্তাদী স্টীম রোলারের চাপে পড়ে কী বস্তু হয়েছে তা অনেকেই জানেন। এই ভাবে মীরার ভজন

থেকে কবীর, তুলসীদাস—সবাইকার ভজনই টোল খেয়েছে, চোট খেয়েছে বিস্তর। তাঁদের ভজন বলতেই ধাঁধা লাগে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন পালুসকর। কী মধুর করেই না তিনি ভজন গাইতেন। তাঁর গানে কাব্যসংগীত, রাগসংগীত এবং ভক্তিসংগীত অনায়াসে একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্ত যে সাধারণভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে এমন নয়—বেশীরভাগ গানের আসরে দেখি ভজনের নামে ওস্তাদিয়ানাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত ভজনের সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন। তাঁদের অনেকের ধারণা ভজন বস্তুটি অনেকটা আমাদের রাগপ্রধান গানের মত যার কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, তাই এঁদের অনেকে ভজনকে অনায়াসে খেয়াল বা ঠুংরীতে পরিবর্তিত করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না।

ভজনের প্রকৃত সরল রূপটি যখন শনৈঃ শনৈঃ বিলুপ্তির পথে চলেছে তখন শিল্পীমাত্রেরই উচিত কোথায় সেই অকৃত্রিম ভজন শোনা যায় তার খোঁজ খবর রাখা। একান্ত গ্রাম্য রীতিতেই ভজন পরিবেশন করা হোক এমন কথা আমি বলিনা, কারণ ভজন যখন আর্ট সংগীতে উন্নীত হয়েছে তখন তার একটা নিজস্ব গুণ ছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা ভজনকে এই পর্যায়ে যদি রাখেন তাহলে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আসলে ভজন যে কী জিনিস তার পরিচয় নেওয়াটা শিল্পীমাত্রেরই কর্তব্য। বেতার প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন। নানা প্রদেশ থেকে অবিকৃত ভজন সংগ্রহ করে তাঁরা শ্রোতাদের কাছে সেগুলি পেশ করতে পারেন এবং আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিশেষত্বও মর্মগোচর করতে পারেন।

ভজন সঙ্গীত একটি বিরাট গবেষণার বস্তু। আমাদের হিন্দীভাষী বন্ধুরা এ সম্বন্ধে কি কাজ করছেন [illegible] জানিনা কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে, কাজ আশানুরূপ হয়নি।

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন

সুরদাস সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ থেকে ২২ আগস্ট। পাঁচ দিনের এই অধিবেশনে হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে একাধিক বিখ্যাত প্রবীণ ও নবীন গুণী শিল্পী যোগদান করছেন, যাঁদের মধ্যে কন্ঠসঙ্গীতে আছেন—তারাপদ চক্রবর্তী, সুনন্দা পট্টনায়ক, মুনওয়ার আলী খাঁ, এ কানন, কালিদাস সান্যাল, কুমার মুখার্জি, রবি ও বিজয় কিচলু, প্রসূন বর্মণ, শিপ্রা বসু, আরতি বাগচী, গৌতম রায় প্রভৃতি। যন্ত্র সংগীতে যোগ দিচ্ছেন—নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমজাদ আলী খাঁ, বাহাদুর খাঁ, কল্যাণী রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

এছাড়া আধুনিক গানে ও নৃত্যে একাধিক স্থানীয় ও বোম্বাইয়ের শিল্পী যোগ দিচ্ছেন।

এইচ-এম-ভি

নজরুল-রচনা

কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীর কন্ঠে "বিদ্রোহী" কবিতার আবৃত্তি ভালো লাগল। তবে কয়েকটি স্থানে আর একটু আবেগের সঞ্চার হলে ভালো হত। ছন্দের দিকেও একটু যেন কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। কন্ঠস্বর মনোরম।

নজরুলের রচিত দুটি গান "নিশিভোর হল জাগিয়া" এবং "আসল যখন ফুলের ফাগুন" গেয়েছেন প্রথিতযশা শিল্পী তালাত মামুদ। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল যে গান দুটির সুর দিয়েছেন শ্রীকমল দাশগুপ্ত। এ খবর বোধ করি অনেকেরই জানা নেই। প্রথমোক্ত গানটির স্বরলিপি যখন বেরোয় তখন এ সংবাদ পাইনি। আশা করি কবির অনুমোদনলাভ করেছিল। দুটি গানই সুগীত।

এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ডে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দুটি গান—"মিছে এ ধরণী" এবং "অন্তর দ্বার খোল গো খোল" সুন্দর হয়েছে। গান দুটি [illegible] করেছেন এবং সুর দিয়েছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। তবলাসংগত মনোরম। অপর পৃষ্ঠে গীতশ্রী শেফালী ঘোষের গাওয়া "বন পথে কে গো চলে যায়" এবং "ছন্দে দোলে দুজনায়"—এই দুটি রাগসংগীত উপভোগ্য। শিল্পীর কণ্ঠ সাবলীল এবং সুরেলা। এই গান দুটিও শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের রচনা।

কলাম্বিয়া

প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর পরলোকগত অনুজ পান্নালালের স্মরণে দুটি গান নিবেদন করেছেন। গান দুটি তাঁরই লেখা। সুর দিয়েছেন শ্রীপ্রফুল্ল ভট্টাচার্য। গান দুটিতে তাঁর মর্মবেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীদীপঙ্কর সেনগুপ্ত "গুমনাম" এবং "সুরজ" ফিল্মের দুটি গান অবলম্বন করে ইলেকট্রিক গীটার বাজিয়েছেন। বাজানো ভালো কিন্তু নির্বাচনের প্রশংসা করা গেল না।

শার্ঙ্গদেব
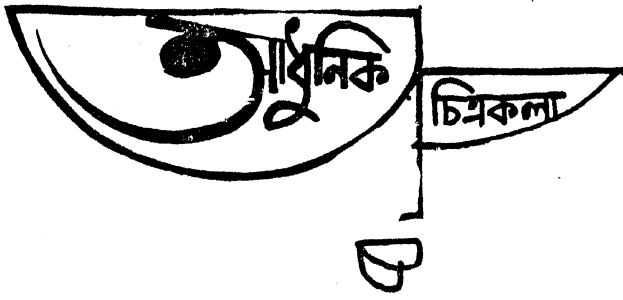
এল্ গ্রেকো (২)

আগের সপ্তাহের আলোচনার জের টেনে "ক্রাইস্ট ড্রাইভিং আউট দি টেডার্স" ছবির তৃতীয় সংস্করণটি লক্ষ করুন। বিশ বছর পরে টলেডোতে এসে এই ছবি যখন এল্ গ্রেকো আঁকেন তখন তিনি তাঁর শিল্পীজীবনের শীর্ষে। তিনি এখন আর পূর্বসূরিদের প্রভাবে আচ্ছন্ন নেই, নিজের "ফর্ম" খুঁজে পেয়েছেন, এক নতুন চিত্রাদর্শ তাঁর চিত্রে। এই ছবিটিতে ছবি (ক) ও ছবি (খ)-এর অনেক "বিষয়" ছেঁটে ফেলা হয়েছে, যেগুলো প্রধানত ছিল রেনেসাঁস চিত্রকরদের মার্কা। ক্যানভাসের ডান দিকের অংশটা পুরো বাদ, সম্মুখভাগে উপবিষ্ট নারীটিও এ-ছবি থেকে অন্তর্হিত, সামনের চার মূর্তি অনুপস্থিত, পশ্চাৎপট নিতান্ত সরল, আগের ছবি দুটির মতো কারুকার্য-মণ্ডিত নয়। —ছবির ব্যক্তিদের অঙ্কন ভঙ্গি একেবারেই বাস্তবধর্মী নয়, তারা যেন কিছুটা প্রলম্বিত ও শূন্যে ঝোলা; দেহগুলো তাদের শরীরী সত্তা বর্জন করে বায়বীয় বা মরমী সত্তা ধারণ করেছে। সমসময়ে বিশ্বাস ছিল মানুষের দেহ গঠিত হয় চারটি উপাদানে—সেগুলি যথাক্রম আগুন, বাতাস, জল ও মাটি। যারা ধার্মিক তারা পরিত্যাগ করতে চায় ঐহিক দুই উপাদান জল ও মাটিকে, কারণ এরাই মানুষকে বেঁধে রেখেছে পার্থিব জীবনের সঙ্গে, এবং এদের থেকে মুক্তিই নিয়ে যাবে উচ্চমার্গের সন্ধানে, কারণ বাতাস ও আগুন ঊর্ধ্বমুখী। এল্ গ্রেকোর সব টলেডিয়ান ছবিতেই আমরা শূন্যে ঝোলা প্রলম্বিত শরীর লক্ষ করি, কেননা এল্ গ্রেকো যে-জগতের লোকেদের আঁকতেন তারা ঐহিক জগৎ থেকে মুক্তির অভিলাষী।—ছবি (গ)-তে আলোকবিন্যাস নিতান্ত যুক্তিহীন, সত্যি বলতে আলোর কোনো ভূমিকাই নেই এই চিত্রে। ছবিটি উজ্জ্বল কোনো এক দিব্যালোকে, যা হৃদয়ের গহন থেকে আসছে। আলোচনা শেষ করবার পূর্বে এ কথাটা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এল্ গ্রেকো খৃষ্টান সমাজে জন্মেছিলেন বলে খৃষ্টান ছবি এঁকেছিলেন তা নয়, সমস্ত জীবন নানা অন্বেষণের পর এই ধর্ম তাকে আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশী, এবং অন্তর দিয়ে তা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এল্ গ্রেকোর "টলেডোর দৃশ্য" ছবিটি অদ্যাবধি যত ল্যান্ডস্কেপ আঁকা হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। এল গ্রেকোর মুখ থেকেই ছবিটি বিষয়ে শুনতে হয়তো ভালো লাগবে। আলোচনাটি তথ্যনির্ভর কিন্তু তথ্যপ্রধান নয়।

*

আমাকে ওরা রোম থেকে তাড়িয়ে দিল। মিকালেঞ্জেলোর ছবি আমার বড় বেশী স্থূল মনে হত, আমি সে-কথা বলেছিলাম, তাই জন্য। তাছাড়া রেনেসাঁস কায়দায় ঐহিক ছবি আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, তিনতোরেত্তো-টিৎসিয়ানের অনুসরণ অনেক দিন করেছি, আমার তুলিতে এখন জাদু, বুঝতে পারছিলাম ভারশূন্য মরজীবন-অতিক্রমকারী চিরন্তন আমার আত্মা ক্যানভাসে প্রকাশ করবার সময় এসেছে। কিন্তু কোথায় আমি শান্তিতে ছবি আঁকতে পারব এ-অবস্থায়? এখন সমগ্র ইউরোপে রেনেসাঁসের হাওয়া—যুক্তিহীন, বিলাসিতাহীন, মানবজীবনকে নাকচ করে পরলোকের প্রতি আকর্ষণ, এমন সব ছবি কোন দেশ বুঝতে চাইবে—উড়িয়ে দেবে না মধ্যযুগীয় বলে? গ্রীসে আমি আর ফিরব না, ইটালীকে আমিও যেমন বর্জন করেছি তারাও—আমাকে, শুনেছি হিস্পানে ধর্মপ্রধান এখনো অনেক শহর আছে, তাহলে সে-রকমই কোনো শহরে আমি চলে যাই। হিস্পান অনেক দূর, যানবাহন নেই; পায়ে হেঁটেই পেরুতে হবে পুরোটা পথ। পায়ে হেঁটেই পেরুবে আমি পুরোটা পথ, ইটালী আজ অসহ্য।

মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই মনে হল কেউ ডাকছে আমাকে, আমি নিঃশব্দে আমার জামা-কাপড়, দু-একটা বই, আর রঙ-তুলি বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। হিস্পান অনেক দূরের পথ, কিন্তু ইটালী অসহ্য।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি অবিরাম হেঁটেছি; রাতে সরাইখানায় বিশ্রাম করতে-করতে ভেবেছি ফিরে যাই রোমে, কিন্তু আকাশের দিকে তাকালেই ভুলে গেছি সব। ক্রমাগত ভারশূন্য মেঘ মনে হয় যেন পাকিয়ে-পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে, আর সেই সঙ্গে আমারও মনে হয়েছে কেউ ঠেলছে আমাকে ওপর দিকে, কিন্তু পৃথিবীর টান,

ক্রাইস্ট ড্রাইভিং আউট দি ট্রেডার্স (গ)
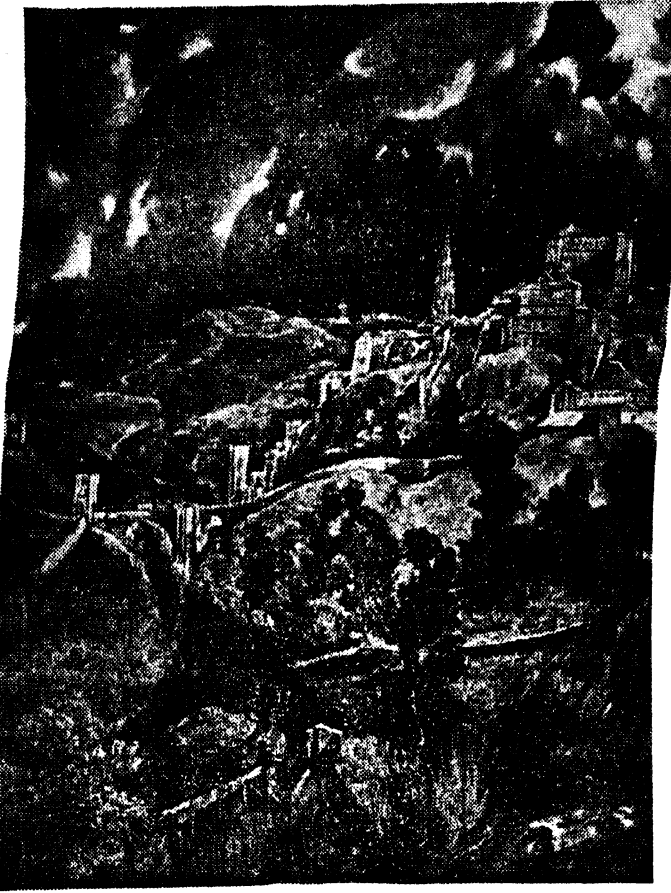
টলেডোর দৃশ্য

মানুষের জীবন আমাকে বেঁধে রেখেছে মাটির সঙ্গে—মনে হয়েছে আমার শরীরটা ক্রমশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে ওপরের দিকে উঠে যাবার বাসনায়, বোধ হয়েছে আমি হাউই, সলতেতে আগুন পড়ায় উৎক্ষেপণমুখী, কিন্তু কেউ বেঁধে রেখেছে পৃথিবীর সঙ্গে, তাই পাগলের মত ছটফট করছি উপরে যাবার জন্য।—আমার মনের অবস্থা যখন এই রকম, একবার পথমধ্যে এক সরাইখানায় তুলি নিয়ে বসেছিলাম কিছু আঁকব বলে, কয়েকটা মনুষ্যশরীর এঁকে নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে নিজেই চমকে উঠলাম; আমি যা আঁকছি তা কেমন অস্বাভাবিক লম্বাটে, মুখগুলো বিধুর আর ফ্যাকাশে, শরীর থেকে মুক্তি পাবার জন্য যেন তারা বদ্ধ-পরিকর, আকুল। আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম এক গভীর পরিবর্তন আসছে আমার মধ্যে, রঙ-তুলি গুছিয়ে নিয়ে অশান্তভাবে বেরিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়; এখনো হিস্পান অনেক দূরে, কিন্তু ইটালীতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু পথ শেষ হল। হিস্পানের মাটিতে পা দিয়েই এক ভবঘুরে কিশোর-সঙ্গী জুটল, নাম শুনে সে চিনল আমাকে, জানালে সে আমার ছবির ভক্ত। সেঁকা রুটি আর মদ খেতে খেতে বলল সে টলেডোর পথে যাচ্ছে। টলেডো এক গোঁড়া কাথলিক শহর, যেখানে রেনেসাঁসের হাওয়া প্রবেশ করে নি এখনো, সান্তা দোমিঙ্গো গির্জে সেখানকার বিখ্যাত, তাঁরা এমন একজন চিত্রকর খুঁজছেন যিনি সত্যিকারের খৃষ্টান ছবি আঁকতে সক্ষম। আমি দ্বিরুক্তি না করে এই কিশোরের সঙ্গে টলেডোর পথ বেছে নিলুম। টলেডো পাহাড়ের ধাপে-ধাপে উঠে যাওয়া এক শহর শুনেছি, নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হল আমাদের।

পাহাড়ে উঠতে-উঠতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। সন্ধ্যা নেমেছে, হুহু করে শীতল বাতাস বইছিল, পাহাড়ের পাথরে-পাথরে ধাক্কা খেয়ে অন্ধকার নেমে আসছে। আমি বসে পড়লুম টিলার ওপর। আমার শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন, আর চড়াই-উৎরাই করতে পারছি না। আমার নতুন বন্ধু আমাকে বসে পড়তে দেখে বললে "এগিয়ে ওই সামনের টিলাটাতে উঠে বসি চলুন, সেখান থেকে টলেডো দেখা যায়।" ছেলেটির কথায় কোনোক্রমে অবসন্ন দেহটাকে মাটি থেকে তুললাম—আমি এখন আর উৎক্ষিপ্ত হাউই নেই, বরঞ্চ ভূগর্ভের গভীর আঁধারে তলিয়ে যাবার আরাম আমার শরীর দাবি জানাচ্ছে। ছেলেটির কাঁধে ভর দিয়ে সেই টিলার উপরে উঠলাম, দেখলাম পাহাড়ের গায়ে ধাপে-ধাপে টলেডো।

কত সহজে বলে ফেললাম কথাটা। যেন কিছুই না। আমার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠেছিল এই দৃশ্য দেখে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল, হৃদয়, যা কখনো অনুভব করিনি এমনভাবে, বাজনার মতো বেজে উঠেছিল হঠাৎ, আমার শিরা-উপশিরা গরম হয়ে উঠল রক্তের উত্তাল নৃত্যে, গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুলো না আর, নেশার আমেজের মতো সমস্ত দেহে এক অবর্ণনীয় আনন্দ উপলব্ধি করলাম। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না; এই সৌন্দর্য-দর্শন অভিজ্ঞতার ভার অসহ্য হল, টিলার ওপর অর্ধমূর্ছিত অবস্থায় বসে পড়লাম। ঈশ্বরের মত, বহু বছর পরে দেখা প্রেমিকার মত এই নীল-সবুজ শহরের দৃশ্য পাগল করে দিল আমায়।—আমি এ শহরের আকাশের মত আকাশ কোথাও দেখিনি আগে, মেঘ এমন অর্থপূর্ণ, সপ্রাণ এবং ভয়াবহ হতে পারে জানতাম না। এই দৃশ্য আমার জীবনের অর্থ পরিষ্কার করে দিল,

উপলব্ধি করলাম নিজের সংজ্ঞা। সমস্ত শহরে আমি অনুভব করলাম যীশুর আত্মা যেন মূর্ত, তাঁর যন্ত্রণায় যেন প্রতিটি গৃহ, প্রতিটি গাছ, আকাশ, মেঘরাশি, নদী ব্যথাতুর, কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও যেন এক অস্ফুট ঐশ্বরিক আনন্দ আর সৌন্দর্য বর্তমান, কেননা টলেডো শরীরী পৃথিবী অতিক্রম করে ঐশ্বরিক এক রাজ্য। ব্যর্থ মনে হল মানব জীবন।

আমার মন অশান্ত-বিক্ষুব্ধ ছিল গত তিনচার মাস। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কেন এই অস্থিরতা, নিজেকে বোঝবার জন্যই হিস্পান দেশের ভিন্ন পরিবেশে আমার আগমন। দূরে থেকে টলেডো যেন আমার সামনে আয়নার মত জ্বলে উঠল; এই শহরের আবহাওয়ায়, পরিবেশে, দৃশ্যে, আমার মন যা চায়, যা আকাঙ্ক্ষা করে, তা যেন ফুটে উঠল—দেখতে পেলাম এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নিজেকেই। পাহাড়টা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উপরে উঠছে টলেডো, সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে বাড়িগুলো, গির্জে গাছ, নদী সব আকাশ ফুটো করে নিঃশব্দে এক অসম্ভব গতিতে যেন মাটি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে; আকাশ ভয়ানক চঞ্চল, অশান্ত, ব্যর্থ এবং রহস্যময়ভাবে ছড়িয়ে আছে শহরের উপরে, কিন্তু এই গতি, এই চঞ্চলতা অবিশ্রাম এক নিঃশব্দ অন্বেষণের মত দৃঢ় এবং বিধুর।—আমার মন আজ ঠিক এই রকম, সব শিল্পীর সর্বাগ্র ছবি আঁকার বিষয় তার মন, কিন্তু ফর্ম যার নেই তা ছবি হয় না, এই শহরের দৃশ্য যেন আমার মনের অবস্থাকে কাঠামো দিল। আমি ঠিক করলাম টলেডোর এই দৃশ্য আমি তুলিতে ধরব, চিরন্তন করব আমার এই দিব্য মুহূর্ত।

তরুণ বন্ধুটি আমার পাশে বসে ছিল। সে বুঝতে পারেনি কেন এত অভিভূত হয়ে পড়লাম হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে, কিন্তু উপলব্ধি করেছিল কিছু একটা ঘটেছে যেজন্য একবারও কিছু বলার চেষ্টা করেনি আমার ঐশ্বরিক মুহূর্তগুলোর মধ্যে। আমি যে-মুহূর্তে ঠিক করলাম ছবি আঁকব, তক্ষুণি বেরিয়ে এলাম সমস্ত ব্যাপারটা থেকে, স্বাভাবিকত্বে ফিরে শহরের দিকে রওনা হবার তোড়জোড় করলুম। টিলা বেয়ে নিচে যখন নামছি হঠাৎ আমার শরীর হিম হয়ে গেল এই কথা ভেবে যে এই দৃশ্য আমার মন থেকে হারিয়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে দেখবার চেষ্টা করলাম দৃশ্যটা। হ্যাঁ, সেই দৃশ্যই আছে আমার মনে—হুবহু। নীল আকাশ, রহস্যময় মেঘরাশি, কয়েকটি বাড়ি আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চাইছে; সমস্ত জগৎ যেন ঈশ্বরের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষায় উল্টে-পাল্টে, দূর-কাছের নিয়ম ভেঙে, এ ওর গায়ে উঠে, পেঁচিয়ে-দুমড়ে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের দিকে—নীল আর সবুজ রঙ পাকিয়ে-পাকিয়ে ধোঁয়ার মত সমস্ত দৃশ্যকে ভয়ংকর ও রহস্যময় করে তুলছে; আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম যীশুখৃষ্টের বেদনা, যীশুখৃষ্টের আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। কিন্তু না, যদি হারিয়ে যায় এই দৃশ্য পথমধ্যে অন্য কোনো অভিজ্ঞতার ছায়ায়; ঝুঁকি নেবার দরকার নেই। একফালি কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ফেললাম আর কিছুই আমি দেখব না এই ছবি যতদিন না আঁকা শেষ হচ্ছে। আমার কিশোর বন্ধু আমাকে দেখে অবাক, সেই হাতে ধরে আমাকে নিয়ে এল শহরে। আমি সেই রাত্রেই শুরু করলাম "টলেডোর দৃশ্য" আঁকতে।

ছবিটি আঁকতে গিয়ে আমায় এক সমস্যায় পড়তে হল। আমি রোমে কীভাবে ক্যানভাসে দূরে-কাছের ব্যবধান দেখাতে হয় শিখেছিলাম, শিখেছিলাম পরিপ্রেক্ষিতের বাধানিষেধ, বাস্তবে যেমন হয় ছবিতে সে-রকম ভাব আনতে গেলে আরো যা সব আইন-কানুন আছে, কিন্তু সে-সব মেনে এ-ছবি আঁকতে গেলে মানসপটের টলেডো হুবহু ক্যানভাসে তুলে ধরা যাবে না। আমি টলেডোর একটি বাস্তব ছবি আঁকার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘরে ফিরে আসিনি, আমার মনে বহু দিনের অনেক কথা জমেছিল, আমি অস্থির ছিলুম, এবং সেই সময় সূর্যাস্তের শেষ আভায় এই শহর আমার অস্থির মনের চোখে যে রূপ নিয়েছিল, সেই রূপ আমি ক্যানভাসে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। আমার মানসিক অবস্থা এবং মুহূর্তের উচ্ছ্বাস উপলব্ধি কী করে প্রকাশ করা সম্ভব যদি পূর্বস্বীকৃত আইন-কানুন পুরোপুরি মেনে নিয়ে এই ছবি আঁকতে হয়। টলেডোর যে-দৃশ্য আমার মনে দানা বেঁধে রয়েছে তাতে কোনো দূর-কাছের, পরিপ্রেক্ষিতের, বর্ণবিন্যাসের সামঞ্জস্য নেই—সে তো এক মাতাল দৃশ্য, তা আঁকতে গেলে জাগতিক যুক্তি ভুলে যেতে হবে। তুলি হাতে নিয়ে তাই ভুলে গেলাম আমার রোমে শেখা সব বাধানিষেধ, ভেঙে দিলাম পরিপ্রেক্ষিতের সামঞ্জস্য, কাছে-দূরের আর প্রভেদ রাখলাম না। দূরে ভেসে-থাকা মেঘ উত্তাল রূপ নিয়ে বিরাট ভবিষ্যৎবাণীর মত ঝুলে রইল শহরের উপর, আর সমস্ত শহরটা পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠতে লাগল ঊর্ধ্বে। আমার তুলিতে উঠতে লাগল শুধু গভীর নীল আর সবুজ রঙ, যেন পৃথিবীর শেষ সন্ধ্যা আজ, রহস্যময় তাই সমস্ত জগৎ।

ছবিটা যখন শেষ হল আমি ফিরে গেলাম সেই টিলার কাছে, কৌতূহলবশত সেই অভিজ্ঞতা ফিরে আসে কিনা দেখতে। সেই বিকেল-সন্ধ্যার মাঝে পুনর্বার দেখলাম টলেডো। কিন্তু না, এবার এ দৃশ্য মমতাময়ী এক সুন্দর দৃশ্য মাত্র—পাহাড়ের কোলে একটি ছোট্ট শহর, আর কিছুই মনে হল না।

শুদ্ধশীল বসু

সংবাদে প্রকাশ, ব্যয়সংকোচ নীতি পালনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা এখন হইতে ছোট অ্যামবেসেডার গাড়ীই ব্যবহার করিবেন। অন্যান্য সরকারী বড় বড় কর্মচারীদের বড় বড় গাড়ী ব্যবহার

না করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিশু-খুড়ো কান্ত কবির গানটি স্মরণ করাইয়া দিলেন—"বলব কী আর পরিত্যাগ, একে-বারে ছিড়ে দই, মুখে কিছু রোচে নাকো পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।"

সাম্প্রতিক সংবাদে পড়িলাম, লাল-দীঘিতে ব্যাপক হারে মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।—"মৎস্য নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে মৎস্যকুল ব্যাপকভাবে আত্মহত্যা করেছে কি না বলা শক্ত"—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

এই প্রসঙ্গে অন্য এক সংবাদে শুনিলাম কোন এক পুকুরে মৎস্যের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের জলে বিচরণের স্থান সংকুলান হইতেছে না বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে মৎস্যের পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সহ-যাত্রী বলিলেন : "সেই ভালো। লুপ-টা মাছের ওপর দিয়ে গেলেই কারো আর কিছু বলবার থাকে না!!"

প্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীমোরারজী দেশাই নাকি বলিয়াছেন যে, কমিশন যে-সব প্রধান প্রধান সমস্যা লইয়া বিবেচনা করিতেছেন তার মধ্যে একটি হইল মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্নীতি। সহযাত্রী বলিলেন—"বাঁচা গেল। অথচ সবাই গুজব রটাচ্ছেন, প্রধান সমস্যাই না কি মদ্যপান বর্জন!!"

সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ঘোষণা করিয়াছেন, গ্রহদেহ হইতে ছিটকাইয়া-পড়া একটি টুকরো নাকি প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে আগাইয়া আসিতেছে; উহার সঙ্গে সংঘর্ষ হইলে '৬৮ সালেই পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।—"সেই ভালো। নির্বাচন নেই, পি এল-৪৮০ নেই, মানতে হবে-দিতে হবে মিছিল নেই, পাক-চীনী দুঃস্বপ্ন নেই, পৃথিবীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ভবনদী পার হয়ে যাওয়া। সিডনীর অধ্যাপকের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীকামরাজ বর্তমানে মস্কো সফর করিতেছেন এবং সংবাদে প্রকাশ তিনি সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু মনে রাখার মত কোন আলাপ-আলোচনা কাহারও

সঙ্গেই করিতেছেন না।—"ভালোই করছেন; পশ্চিম জারমানির সঙ্গে বিশ্ব ফুটবল কাপে হেরে যাওয়ায় কাহারও মন-মেজাজ ভালো থাকার কথা নয়, এই অবস্থায় রাজনীতির কচকচি না তোলাই ভালো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সম্প্রতি কলিকাতার রাস্তায় একটি চলন্ত লরি হইতে পড়িয়া যাওয়া বাদাম জাতীয় কয়েকটি বীচি খাইয়া অনেকে নাকি গুরুতর রূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। গবেষণাগারে বিশ্লেষণের ফলে জানা গেল, ইহা তুং নামের একটি বিষময় ফল, জন্মস্থান পশ্চিম চীন। খুড়ো বলিলেন—"এই বিশেষ জাতীয় তুং ফলের সঙ্গে মাও-সে তুং-এর কোন সম্পর্ক আছে কি না তা অবশ্য গবেষণায় ধরা পড়েনি!!"

এক সংবাদে প্রকাশ পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় কলার চাহিদা এবং কদর ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।—"কথাটা হয়ত চাটিম-কাটালি কলা সম্পর্কেই খাটে। পৃথিবীতে যে-হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব সম্পর্কিত বিবৃতি যে-হারে বাড়ছে তাতে তো মনে হয় কাঁচকলা রপ্তানি করলে তা লুফে নেবার বাজারের অভাব হবে না।
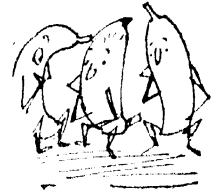
রপ্তানিকারকগণ কাঁচকলার কথাটা ভেবে দেখবেন"—মন্তব্য করেন অনেক কলারসিক সহযাত্রী।

কলিকাতা যাদুঘরে ভারতীয় বাদ্য-যন্ত্রাদি সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি গ্যালারি প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু সমস্ত যন্ত্র সংগ্রহ করা কি সম্ভব হবে। আমরা তো শুনেছি "মন্ত্র-[illegible]" নামক একটি থামলে-ভালো যন্ত্র আ[illegible], তা নাকি মন্ত্রীরা সহজে হাতছাড়া ক[illegible] না!!"

সংবাদে প্রকাশ, এয়ার ইন্ডিয়ার হোস্টেসরা নাকি সুতীর বদলে নাইলনের বস্ত্র দাবি করিয়াছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। শ্যামলাল গান ধরিল—"চলে নাইলন হেলিয়া দুলিয়া পরান সহিত মোর"; তার গান শুনিয়া অনেক সহযাত্রী বলিলেন—"ঘাটের মড়ার শখ দেখে বাঁচিনে!!"

এই কয়দিন বিশ্বকাপ ফুটবলের সংবাদ ছাড়া আর কোন সংবাদ নাই। এই পর্যন্ত আটজন খেলোয়াড়কে মাঠ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, খেলা পরিচালনায় রেফারীদের ত্রুটি বিচ্যুতিতে হারিয়া-যাওয়া দেশগুলির কাগজে কাগজে বিরূপ সমালোচনা হইতেছে এবং আরও হইবে। কিন্তু এই পর্যন্ত থান ইট নিক্ষেপ এবং গ্যালারিতে অগ্নিসংযোগের সংবাদ চোখে পড়ে নাই। স্বর্গত ডি এল রায় ঠিক বলিয়াছেন—বিলাত দেশটা মাটির!!

তেজস্ক্রিয় কলকাতা

এণাক্ষী ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

সিধুদা বিদেশে আছেন প্রায় বছর কুড়ি, কিন্তু এখনো তিনি সুবিধে পেলেই স্বদেশে ফেরার চেষ্টা করেন। কয়েকবার সব ঠিকঠাক করেও শেষ মুহূর্তে কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁর আসা পণ্ড হয়ে যায়। এই নিয়ে সিধুদার মনঃকষ্টের অবধি নেই। কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হতে পারে কিন্তু আমরা জানি হাজার হাজার ডলার উপার্জন করেও তিনি সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এখনো কারো পদানত হন নি। পদানত হবার পাত্রই নন তিনি। দেশ থেকে তাঁর কাছে সুপুরী, সিনেমাপত্রিকা ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড নিয়মিত যায়। প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারে দ্বারে আজ যে চিত্রাঙ্গদার টেপ বেজে চলেছে তার মূলে আছে সিধুদারই অক্লান্ত উদ্যম। আমরা যারা নেহাত কপালের দোষে এখানে পড়ে আছি এবং সকাল সন্ধে ভারতবর্ষের গাল-মন্দ করি তাদের চেয়ে সিধুদার দেশভক্তি যে কতগুণে বেশী তার বহু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেকথা এখানে অবান্তর।

জানা গিয়েছিল ১৯৫৪ সালে একবার ও ১৯৬৬ সালে আর একবার সিধুদা বাক্সপেট্রা গুছিয়ে কলকাতা আসার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন। এমন কি প্লেনের টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল। কী এমন সেই অনিবার্য কারণ যার জন্য তাঁর আসা অসম্ভব হল সেটা আমরা এতদূরে থেকে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হয়ত শেষ মুহূর্তে ইউরোপে কোন সভায় প্রবন্ধ পাঠের আমন্ত্রণ—ব্যস্ত লোকেদের বাধা পড়ার কত কারণ! আর বোধ হয় ইহলোকে সিধুদার দেখা পেলাম না, এই সম্বন্ধে আমরা বলাবলি করছি এমন সময় সিধুদার কাছ থেকে এক চিঠি।

সিধুদা লিখেছেন: ভাই তোরা নিশ্চয় জানিস, দেশে ফেরার জন্য আমার মন কি-রকম উচাটন এবং তোরা এও জানিস, ফরিদপুরে জন্ম হলে কি হবে কলকাতা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন জায়গা আমার ঠিক জন্মভূমি বলে মনে হয় না। সেই কলকাতার এই বিপদের সময় কাছে থাকতে পারছি না এজন্য আমি অনুক্ষণ যে কি আত্মগ্লানিতে ভুগছি তা তোরা না দেখলে বুঝতে পারবি না। আমরা এই পর্যন্ত পড়ে ভাবলাম বোধ হয় কোন পুরোনো খবরের কাগজে সন্দেশ রসগোল্লা অন্তর্ধানের কথা পড়েছেন। কিন্তু না, তা নয়।

সিধুদা লিখেছেন, সেই যেবার ১৯৫৪ সালে ল্যাংড়া আম খাবার জন্য মনটা ভয়ানক ছটফট করে উঠল—দেশে ফেরার টিকিট করলাম। খরচের কথা ভেবে তোদের বউদি আপত্তি করেছিল, কিন্তু থাক সে পারিবারিক অশান্তির কথা তোরা আর দেশে থেকে কি বুঝবি। আমি টিকিট করেছি, এমন সময় সর্বনাশ। কাগজে দেখি কলকাতায় তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত; ফলে ঘাস, গরু, ল্যাংড়া আম সব তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে। টেলিভিশনের কল্যাণে তোদের বউদির আর তেজস্ক্রিয়তার কুফল সম্বন্ধে জানতে কিছু বাকি নেই। আমার যাওয়ায় গোড়া থেকেই তার সমর্থন ছিল না, এর পরে সে এমন বেঁকে বসল যে যাওয়া বন্ধ করা ছাড়া অন্য পথ দেখলাম না। খেয়েদেয়ে কাজ না পেলে লোকে সময় কাটাবার জন্য অনেক রকম অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে শুনেছি, কিন্তু ভাই তোরাই বল—যাঁরা অকারণে দমদমে গিয়ে প্লেনের গা থেকে তেজস্ক্রিয়তা মাপতে বসলেন তাঁদের কি ল্যাবরেটরীতে স্থানাভাব ঘটেছিল? আর বাড়ির ছাদে ঘটি বসিয়ে বৃষ্টির জল মাপা! এটা না কোনদেশী রসিকতা? প্রশান্ত মহাসাগরে কোন বিজন দ্বীপে কে বোমা ফাটাল তার জন্য তাঁদের এত মাথাব্যথা কেন? আর এদিকে আজকাল নাকের সামনে কেউ বোমা ফাটালেও তো তাঁদের চেয়ার থেকে তোলা যাচ্ছে না। কই এখন তো কেউ প্লেনের ডানা পরীক্ষা করবার জন্য দমদমে ছুটছেন না! শুনেছি তো ভাল বন্দুক তৈরি হচ্ছে। যাই হোক ১৯৫৪ সালে যাঁরা বৃষ্টির জলে তেজস্ক্রিয়তা মেপেছিলেন তাঁদের কারো সঙ্গে তোদের আলাপ থাকলে জিগেস করিস আমি কি কখনো তাঁদের কাউকে টাকা ধার দিয়েছিলাম? আমার তো মনে পড়ে না।

পরে আমার সঙ্গে কয়েকটি ভারতীয় ছেলের দেখা হয়েছিল, যারা সদ্য বম্বে থেকে এসে নামছে। আমি তাদের জিগেস করে জানলাম, দেশের বিজ্ঞানীরা বৃষ্টির জল মেপেই চলেছেন। আশা করি তাঁরা ঘর বাড়ি ছেড়ে এখন চেরাপুঞ্জীতেই বসবাস করছেন।

তারপর এক যুগ কেটে গেল। ভাবলাম এতদিনে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টি নিশ্চয় বন্ধ হয়েছে। তাই আবার যাওয়ার তোড়জোড় করলাম। কিন্তু হায়, ভগবান বিরূপ। কলকাতা আবার তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে। ধাপার মাঠে পাওয়া গেছে সেই তেজস্ক্রিয়তার উৎস যার থেকে সমস্ত শহরবাসীর সমূহ বিপদ উপস্থিত। তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের আয়ু ১৬২০ বছর একথা কে না জানে। এই দেড় হাজার বছরের মধ্যে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে মারা পড়ার বাসনা আমার নেই। আজকালকার ডাক্তারেরা বলছেন মেরেকেটে মানুষের আয়ু দুশো বছর পর্যন্ত টানা যেতে পারে কিন্তু ১৬২০ বছরের বেশী বাঁচতে হলে সেই দেশে ফিরে মুনি-ঋষিদের শ্বারস্থ হতে হবে। এদিকে তোরা তো জানিস, সেণ্ট্রাল হীটিং-এ অভ্যস্ত হয়ে এমনই অবস্থা যে, হিমালয়ের ঠাণ্ডা ফাণ্ডা ধাতে সইবে না। মাঝখান থেকে সাধের প্রাণটি নিয়ে টানা-টানি।

ভাই তোদের সঙ্গে আমার আর এ জীবনে দেখা হল না। মাঝে মাঝে সময় পেলে চিঠি দিস আর সম্ভব হলে গিরিডি বা মধুপুরে কোথাও চলে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে আত্মরক্ষা কর।

সিধুদার চিঠি পড়ে আমাদের মনে কি-রকম একটু খটকা লাগল। আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলাম। তাঁরা যা বললেন, তা হল সংক্ষেপে এই—

১৯৫৪ সালে বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে যে হাইড্রোজেন বোমা ফাটান হয়, তার তেজস্ক্রিয় ভস্ম বাতাসে বাহিত হয়ে কতদূরে এসেছে জানবার জন্য তাঁরা ঐদিক থেকে আগত প্লেনের ডানায় মাখন তেল পরীক্ষা করেন এবং তাতে তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া যায়। তখন যুক্তিসঙ্গত কারণেই তাঁদের মনে হল আকাশে যদি তেজস্ক্রিয় ভস্ম ভেসে বেড়ায় তবে তা কালক্রমে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে পড়বেই, তাঁদের ধারণা সত্য প্রমাণ করে সেই বৃষ্টিপাতও হল, তবে কিছুদিন কাটবার পর। এই সময়টার মধ্যে ঐ তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি সারা পৃথিবী বার দুই পর্যটন করে এসেছে। বিকিনি থেকে সরাসরি ঐ ভস্ম ভারতবর্ষে উড়ে এল না কেন? তার কারণ বাতাসের গতি পূর্বমুখী। ১৯৬৫ সালে সিংকিয়াঙে চীনেরা যে বিস্ফোরণ ঘটায় তার ভস্ম সে বছরের ২২শে অক্টোবর নাগাদ উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে এসে পৌঁছেছিল; বিশ্বস্তসূত্রে এই খবর পাওয়া যায়। চীনের বিস্ফোরণের এলাকা দিল্লী থেকে মাত্র ১৩০০ কিলোমিটার দূরে হলেও প্রকৃতি দেবী আমাদের প্রতি সদয়—তাই পূব দিকে ভেসে গিয়ে পৃথিবী একবার পরিক্রমা না করে সেই ভস্ম আমাদের মাথায় পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই এবং বলাই বাহুল্য ততদিনে সেই ভস্ম অনেক লঘূকৃত হয়েছে ও তার

তেজস্ক্রিয়তার মাত্রাও গেছে কমে। নিধুদার আশঙ্কা অমূলক। বিজ্ঞানীরা চেয়ারে বসে নেই—পরমাণু শক্তি সংস্থা সারা ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে তেজস্ক্রিয়তা মাপার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন। এগুলি আছে কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, বাঙ্গালোর, গুলমার্গ, নাগপুর, নৈনিতাল উটকামণ্ড, শ্রীনগর ও সিকিমের গ্যাংটকে। তবে ১৯৫৪ সালে কলকাতায় যখন বিজ্ঞানীরা বৃষ্টির জল মাপতে আরম্ভ করেন তখন এটা অবশ্যই নতুন ব্যাপার ছিল। তাঁরা ১৯৫৪ সালে বৃষ্টির জল জমা করে তাতে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার পরিমাণ এমন নয় যে সেই বৃষ্টির জল গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মূর্ছা অবধারিত হবে। তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাতে তবে কি ভয় পাবার কিছু নেই—বরং ফসলের উৎপাদন ভাল হওয়ার সম্ভাবনা? এমন আশ্চর্য ধারণা কে আপনাদের মাথায় ঢোকালে? পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হয় তার অধিকাংশ আইসোটোপই স্বল্পায়ু—কয়েক সেকেণ্ড, কয়েক মিনিট বা কয়েক দিন তাদের জীবনের মেয়াদ। তবে এর মধ্যে অল্প পরিমাণে থাকে স্ট্রনশিয়াম ৯০ নামে একটি আইসোটোপ। এর অর্ধায়ু তেত্রিশ বছর। রাসায়নিক ধর্মে স্ট্রনশিয়াম ক্যালশিয়ামের সমগোত্রীয়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে এই স্ট্রনশিয়াম মাটিতে পড়ে ঘাস ও শাকসবজির মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। সেই ঘাস খাবে গরু এবং সেই গরুর দুধ খাবে ছেলেমেয়েরা, এইভাবে ঐ স্ট্রনশিয়াম ক্যালশিয়মের সঙ্গে তাদের হাড়ের মধ্যে গিয়ে জমা হবে। ছাগল ঐ ঘাস খেলে এবং ঐ ছাগলের মাংস আমরা খেলেও একই অবস্থা হবে। বেশি পরিমাণে জমা হলে স্ট্রনশিয়াম ৯০ ক্ষতিকর। ভয় সেইখানে। তবে যদি নিয়মিত পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করা হতে থাকে তবেই এটা সম্ভব। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় যে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত হয়েছিল তাতে লোকজন আর তেজস্ক্রিয় হওয়া তো দূরের কথা, সামান্য [illegible] তেমনভাবে তেজস্ক্রিয় হয়নি।

দ্বিতীয়বার যে ঘটনা ঘটল সেটা অত্যন্ত আকস্মিক। ঘটনাটি যদিও অসাবধানতা প্রসূত, তবে দৈবাৎ এরকম একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু এর জন্য খাপার মাঠকে সীসের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই। আজকাল পারমাণবিক শক্তির সহচর তেজস্ক্রিয়তা নিয়েই আমাদের বাস করতে হবে, তাই তার স্বভাব চরিত্র নিয়ে বিশদ গবেষণাও চলেছে। তেজস্ক্রিয়তা আছে দুরকম—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। আমাদের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার প্রসঙ্গ থাক। ইউরেনিয়ম, থোরিয়ম ইত্যাদি কিছু কিছু মৌল স্বাভাবিকভাবেই তেজস্ক্রিয়। তেজস্ক্রিয়তা হল ঐ সব পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম। তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকগুলি ক্রমাগত নিজের দেহ থেকে তেজকণা বিচ্ছুরণ করে অন্য মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যেতে থাকে—অথবা অস্থির কেন্দ্রক গামা রশ্মি বিকিরণ করে সুস্থির অবস্থায় ফিরে আসে। সংক্ষেপে এই হল তেজস্ক্রিয়তা। মধ্যযুগে ইউরোপে যে সব ধাপ্পাবাজেরা লোহাকে সোনা করার ফন্দীতে লোক ঠকিয়ে বেড়াত, তেজস্ক্রিয়তা যেন তাদের সেই মন্ত্র। তবে এর মধ্যে ধাপ্পাবাজি কিছু নেই। নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকের ভেতরের প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার গণ্ডগোল বেধে গেলে নিউক্লিয়াসের নিটোল গড়ন হয়ে ওঠে টলমলায়মান। সেই তোলপাড়ের ফলে নিউক্লিয়াসটি এক বা একাধিক তেজকণা বার করে দিয়ে একটি নতুন নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই নতুন নিউক্লিয়াসটিও টলমলে হতে পারে। তখন আবার সে আর একটি বা একাধিক তেজকণা বার করে দেবে। এইরকম চলতে থাকবে যতক্ষণ না একটি স্থায়ী বা সুস্থির নিউক্লিয়াসে এসে থামে যায়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইউরেনিয়ম বংশের আদিপুরুষ প্রপিতামহের নাম ইউ-২৩৮। এই ইউ-২৩৮ থেকে যখন একটি আলফা-কণা বেরিয়ে যায় তখন ইনি হন থোরিয়ম-২৩৪। তার থেকে আবার নির্গত হবে তেজকণা। এইভাবে ক্রমাগত আলফা বা বিটা কণা বার হতে হতে পৌঁছন যাবে [illegible] ও সর্বশেষে সীসের নিউক্লিয়াসে।

> **বিজ্ঞাপনের উপর সারচার্জ**
>
> আমদানী-করা নিউজ প্রিন্ট ও প্রিন্টিং-এর যাবতীয় মাল মসলার বর্ধিত মূল্য হেতু সংবাদপত্রসমূহ যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে তার জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ-পেপার সোসাইটি ১লা আগস্ট, ১৯৬৬ তারিখ হইতে প্রকাশিতব্য সমস্ত বিজ্ঞাপনের উপর ১০% সারচার্জ প্রয়োগের জন্য সদস্যগণকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুরোধ জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন।
>
> সুতরাং "দেশ" তাহার সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাইতেছে যে, ১লা আগস্ট, ১৯৬৬ তারিখ হইতে প্রকাশিতব্য সমস্ত বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সারচার্জ প্রযুক্ত হইবে।

এই যে প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে তেজস্ক্রিয়তার জন্ম হচ্ছে এটা ঘটছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিউক্লিয়াসগুলির ভেতর থেকে। বাইরের আবহাওয়ার তারতম্য বা রাসায়নিক বিক্রিয়া এর রূপান্তর প্রক্রিয়াতে কিছু প্রভেদ ঘটাতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে তেজ[illegible] নির্গমনের হারও ভিন্ন ভিন্ন। কোন বিশেষ তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস [illegible] তেজকণা নির্গমনের হার যে সময়ে অর্ধেক হয় সেই সময়টাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় তার অর্ধায়ু বা হাফলাইফ। অর্ধেকও আবার অর্ধেক হচ্ছে ঠিক অতটা সময় পার হলে—এইভাবে চলতে [illegible] কমার অনুপাত। হিসেব করে দেখা [illegible] ইউরেনিয়ম ২৩৮-এর অর্ধায়ু প্রায় [illegible] কোটি বছর, কিন্তু রেডিয়মের [illegible] ১৬২০ বছর। রেডন নামে গ্যাসের [illegible] ক্লিয়াসের অর্ধায়ু মাত্র ৩.৮ দিন। [illegible] মিলিগ্রাম রেডনের একমাস পরে যা থাকবে তা হল প্রায় ০.০২ মিলিগ্রাম।

রেডিয়ম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল তিন রকমের তেজকণা বা রশ্মি বার [illegible] তাদের মধ্যে আলফা ও বিটাকণা বেশি যেতে পারে না। কয়েক সেন্টিমিটার যাওয়ার মধ্যেই তাদের শক্তি শোষিত হয়ে তেজহীন হয়ে পড়ে। গামা রশ্মি দূরে যেতে পারে বটে, কিন্তু এক [illegible] মাটি চাপা পড়লে তার শক্তির [illegible] কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। [illegible] জন্য যে স্টেনলেস স্টীলের সরু [illegible] রাখা রেডিয়ম ব্যবহার করা হয় [illegible] রেডিয়ম নিডল। চিকিৎসার কাজে রেডি[illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] মোটেই [illegible] নয়। ব্যাপারটা [illegible] কুরির [illegible] আগে অনেকদিন [illegible]। রেডিয়ম [illegible] নিয়ে তাঁর হাতে ক্ষত হয়ে গিয়ে[illegible] তিনি বলেছেন রেডিয়াম থেকে [illegible] তেজকণা ও রশ্মি শরীরের সুস্থ [illegible] গুলিকে মেরে ফেলছে। যাঁরা রেডি[illegible] নিয়ে কাজ করেন একটু অসাবধান [illegible] তাঁদের হাতেও অনুরূপ ক্ষত সৃষ্টি [illegible] দেখা গেছে। মাদাম কুরি জানলেন এ[illegible] তেজকণা ও রশ্মি তবে শরীরের [illegible] সেল মেরে ফেলার পক্ষেও কার্যকরী। কুরির নাম অনুসারে তেজস্ক্রিয়তার হিসাব করার একক হল 'কুরি'। এক [illegible] রেডিয়ম থেকে যতগুলি আলফা-কণা বে[illegible] (প্রতি সেকেণ্ডে ৩.৭ × ১০) তাকে এক [illegible] বলে। তার হাজার ভাগের একভাগ [illegible] কুরি। রেডিয়ম নিডলগুলিতে ২০ [illegible] ৫০ মিলিকুরি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা থ[illegible] ৫০ মিলিকুরি রেডিয়ম নিডল-এর [illegible] আচ্ছাদন আলফা ও বিটা কণার প্রায় স[illegible] প্রতিহত করে, কিন্তু গামা রশ্মির গতি অপ্রতিহত। দূষিত টিউমারের গায়ে লা[illegible]

রাখলে রশ্মির আঘাতে টিউমারের সেলগুলি ভেঙে যায়। দূষিত সেল বিনাশের ব্যাপারে রঞ্জন রশ্মি ও রেডিয়ম গামা রশ্মি প্রায় একইভাবে কাজ করে। রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করা হয় শরীরের বাইরে থেকে। শরীরের বেশী ভিতরে কোন টিউমার-জাতীয় দূষিত অংশ থাকলে সেখানে রঞ্জন রশ্মি পেঁছয় না। সেই সব ক্ষেত্রে রেডিয়ম নিডলের প্রয়োগে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গামা রশ্মির প্রভাব দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে কমে যায়। তাই এক সেন্টিমিটার দূরে এর যা প্রভাব দশ মিটার দূরে সেই প্রভাব দশ লক্ষ ভাগ কমে যায়। সুতরাং যে রেডিয়াম নিডল ধাপার মাঠে পড়েছিল তার খুব কাছে না গেলে ক্ষতির কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সেই অবস্থায় যদি তা পড়েও থাকত তবে তাতে টালিগঞ্জ বা লেক গার্ডেনসের লোকেদের কথা বাদ দিন, মানিকতলা বা বেলেঘাটার লোকেদেরও নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ার কোন কারণ হত না। একটা আশংকা হয়েছিল নিডল ভেঙে রেডিয়ম যদি ছড়িয়ে পড়ে। সে আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। এখন একমাত্র ভয় যদি ঐ পড়ে থাকা রেডিয়ম কেউ হাতে করে তুলে নিয়ে দেখতেন এবং পরে বাড়ি গিয়ে সেই হাতে খাবার খেয়ে ঐ রেডিয়ম তাঁর শরীরে প্রবেশ করত। জমিতে পড়ে থাকলে ভবিষ্যতে ঐ জমিতে বাড়ি তৈরী করার সময় সেখানে কর্মরত লোকেদের ঐ তেজস্ক্রিয়তা থেকে দূষিত হবার সম্ভাবনা থেকে যেত।

বৈজ্ঞানিকরা আমাদের বললেন যে, তেজস্ক্রিয়তা এই শতাব্দীর আবিষ্কার হলেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পৃথিবীতে কিছু নতুন জিনিস নয়। মহাকাশ থেকে কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি অহরহ আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, তার জন্য আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। এছাড়া আমাদের বাড়ির আরো কাছে, কেরালার সমুদ্র উপকূলে তেজস্ক্রিয় মোনোজাইট বালির মধ্যে জেলেরা বহুকাল ধরে বাস করে আসছে। ক্রমশ পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ অনেক বেশী বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের বংশধরদের তার মধ্যেই বিচরণ করতে হবে। ধাপার মাঠের সেই সামান্য কয়েক নিডল রেডিয়ম থেকে যে সমস্ত শহরবাসীর সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়নি সেটা আশা করি আপনারা এতক্ষণে বুঝেছেন। কিন্তু এত কথার প্রয়োজন কি? সে রেডিয়ম আর সেখানে পড়ে নেই। কোথায় ফেলা হল? সেজন্য উপযুক্ত লোক আছেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে—আপনারা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে মাথা না ঘামিয়ে নিজের নিজের কাজে যান।

আমরা সিপাহীকে কি উত্তর দেব ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এলাম।

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

ক্রমশ (১৮)

কয়েকটি উপন্যাস

তোমার হলো জয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাত টাকা।

বিত্তশালী, খামখেয়ালী জমিদার জয়নারায়ণবাবু তাঁর একমাত্র কন্যা সরমার বিয়ে দিয়েছিলেন কৈশোরে। একটি পুত্রের জননী সরমার অকালবৈধব্য জয়নারায়ণবাবুকে মুহ্যমান করে ফেলল। মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন বলে জমিদারি বিক্রি করে সরমা আর তার ছেলেকে নিয়ে কাশী চলে এলেন জয়নারায়ণবাবু। সরমার আগের বিয়ের কথা গোপন করে বিয়েও দিলেন। ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার এক অনাথ আশ্রমে। সেখান থেকে ছেলেটি একদিন হারিয়ে গেল। তারপর অনেক নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে একদিন আবার তাকে পাওয়া গেল। কিন্তু যাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সরমার বিয়ে হয়েছিল, সেই প্রকাশের কাছে তখন সরমার পূর্ব-বিবাহের কাহিনী আর গোপন রইল না। প্রকাশ কিন্তু সবকিছু সহজভাবেই গ্রহণ করেছে।

আড়ম্বরবর্জিত এই কাহিনীটি সহজভাবে বিবৃত। ঘটনার টানাপোড়েন কৌতূহলী পাঠককে অনায়াসেই শেষের পাতায় পৌঁছে দেবে। (২০৫।৬৬)

মৌনমন। সুবোধকুমার চক্রবর্তী। এস সি সরকার অ্যান্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড। ১-সি কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। সাড়ে সাত টাকা।

কাঠের কারবারে কৃতী পুরুষ ফটিক চৌধুরী, লোকে তাকে কাঠুরে চৌধুরী বলে সম্বোধন করে। কিন্তু কাঠের ব্যবসায় থেকে তার সবটাই কি কাঠ হয়ে গেছে? না, তা সে হয়নি—তাই এই আড়াই শো পাতা উপন্যাসের শেষে প্রমাণিত। পাঠককে টেনে রাখার জন্য যা যা দরকার—আত্মহত্যা, খুন, ব্যভিচার, শয়তানের দেবত্ব, দেবতার মুখোশ ইত্যাদি সবই আছে। তবু শেষ করার পর কেমন কষ্ট হয়। উপন্যাসের কোনো চরিত্রের জন্য নয়, বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যতের জন্য ... সময়ের মূল্য ভেবে। ৩৪৪।৬৫

মহানগর বাদশানগর। সম্রাট সেন। মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দামঃ আট টাকা।

আকস্মিকভাবে ট্রেনে আলাপ নির্মলসুধার সঙ্গে গীতাঞ্জলির। লক্ষ্ণৌতে বাজনার দোকান নির্মলসুধার, গীতাঞ্জলির নাচের স্কুল। ফলে পরিচয় প্রগাঢ় হতে অসুবিধে ছিল না। গীতাঞ্জলির ছোট বোন রূপাঞ্জলির সঙ্গে বিয়ে হল নির্মলসুধার দাদা অমলসুধার সঙ্গে। কিন্তু গীতাঞ্জলির যৌবনের ভুল তাকে সহজে নিষ্কৃতি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয়ী হয়েছে নির্মলসুধা। উপন্যাসেরও মধুর সমাপ্তি ঘটেছে।

সম্রাট সেন গল্প ভাবতে পারেন, সন্দেহ নেই। এবং উপন্যাসে যাঁরা শুধুই গল্প খোঁজেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এ বই পড়ে অখুশী হবেন না। কিন্তু উপন্যাসের কলেবর (সঙ্গে সঙ্গে মূল্য) বৃদ্ধি নিয়ে সংশয় থেকে যায়। আলিবাবা নাটক থেকে, রবীন্দ্রনাথের গান থেকে, তুর্কী-আরব-বাংলা-উর্দু ইত্যাদি কবিতা থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্ধৃতি সহজেই বর্জন করা যেত নাকি? ৫৮১।৬৫

জীববিজ্ঞান

সাপ। অবনীভূষণ ঘোষ। শিক্ষাভারতী। ১।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম আট টাকা।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা তর্কাতীত, এবং সাদর সংবর্ধনার যোগ্য কাজ; কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, কী দুরূহ এই প্রয়াস। শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ ঘোষ মহাশয় ইতিপূর্বে আরো দু-চারখানি বিজ্ঞানধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। সদ্য সাক্ষরদের জন্য রচিত তাঁর দুটি গ্রন্থ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছে; তাঁর ক্লান্তিহীন প্রয়াসের সর্বশেষ উদাহরণ বর্তমান গ্রন্থটি, যেটিকে সর্প-বিষয়ক অভিধান বলা যেতে পারে।

বস্তুতই এটি একটি অভিধান। সাপের আকৃতি-প্রকৃতি, বৈজ্ঞানিক নামকরণ ও গোত্র-বিভাগ, ভারতবর্ষের সাপ, সাপ ধরা, সাপুড়ে, ওঝা, সর্পদংশনের চিকিৎসা, সাপ চেনার উপায়, সাপ সংক্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে বিশদ ও সর্বতোমুখী আলোচনার অবতারণা করেছেন শ্রীঘোষ। সর্প বিষয়ে সাধারণ লোকের কৌতূহল তো মিটবেই, ভবিষ্যতে বাংলায় গবেষণার কাজেও এই বইটি নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। শ্রীঘোষের আলোচনার ভাষাও অত্যন্ত সহজ। বলা বাহুল্য, সহজ ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার জন্য পথটি সহজ ছিল না। বহু ক্ষেত্রেই তাঁকে শব্দ নির্মাণ করতে হয়েছে। এ ছাড়া আর একটি বিষয়েও শ্রীঘোষ পথ দেখিয়েছেন; গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাতেই সাধারণত জীবজন্তু ও প্রাণিবিজ্ঞানে নামকরণ করা হয়। কিন্তু এই নাম বিদেশীদের পক্ষে মনে রাখা যত সহজ, আমাদের পক্ষে ততটা নয়। কেননা, গ্রীক-ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে না। শ্রীযুত ঘোষ এ কথা উপলব্ধি করে সংস্কৃত ভাষার শব্দ চয়ন করে কিছু নামকরণ করেছেন। ভবিষ্যতে যদি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পঠন-পাঠন কার্যকর করা যায় তা হলে এই ধরনের প্রয়াস পথ দেখাবে।

গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ৩২৭।৬৫

কিশোর সাহিত্য

হনোলুলুর মাকুদা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সংযোগ। ১৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলাদেশের ছোটোদের জন্যে উৎসর্গীকৃত এই বইতে ছটি কিশোর পাঠ্য হাসির গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ধরনের গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে জমে ভালো। এ-বিভাগে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র পটলডাঙ্গার টেনিদা তো যথেষ্ট খ্যাতিমান।

এ-বইয়ের ছটি গল্প ছেলেবুড়ো সকলেরই ভালো লাগবে (নিজের ঘরেই সেটা মালুম হলো।) এর মধ্যে সবচেয়ে জমাটি গল্প হরিশপুরের রসিকতা যা কিছুদিন আগে 'সন্দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। হাসি-কৌতুক, ভয় রোমাঞ্চ, ঘটনা ও চরিত্র—সব জড়িয়ে লেখাটি ভারি ভালো। সময় পেলেই ওটা মাঝে মাঝে পড়ে ফেলা যায়।

বাংলাদেশের ছোটোদের জীবন হাসি-খুশিতে ভরিয়ে তোলবার জন্যে এ-ধরনের গল্প নারায়ণবাবু আরো অনেক, অনেক লিখুন।

(৪২১।৬৫)

ধর্ম

ভক্ত ভগবান নিমাই। শ্রীমন্দাকিনী ভাদুড়ী প্রণীত। শ্রীওংকার গোস্বামী কর্তৃক ৭৫-বি, শ্যামবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০ পয়সা।

লেখিকা অত্যন্ত সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকের ভূমিকায় পুস্তকখানি তরুণদের জন্য লিখিত হইয়াছে, বলা হইয়াছে। কিন্তু শুধু তরুণেরা কেন, পুস্তকখানি পাঠে পরিণত-বয়স্কগণও প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন। লেখিকার বাচনভংগী মনোরম। বলিবার ধারাটি পুস্তকখানির আদ্যন্ত অনাবিল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। ভাষার আড়ষ্টতা কোথায়ও নাই এবং ভাবের অস্পষ্টতাও কোথায়ও অনুভব হয় না। এজন্য পড়িতে বসিলে বইখানা আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীল রূপ, সনাতন এবং রায় রামানন্দের প্রতি প্রভুর উপদেশসমূহের বিস্তার এবং বিশ্লেষণে অনেক দুরূহ তত্ত্ব লেখিকার অনুভূতির আলোকে উজ্জ্বল এবং সর্বসাধারণের অনুভবযোগ্যভাবে মধুর হইয়াছে। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

১৩৭।৬৬

'আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন'—শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র প্রণীত। শ্রীলীলা সরকার কর্তৃক ১০৯বি, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকারের রচিত পুস্তক এবং নাটিকা ইতি-পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine বা দিব্যজীবন নামক মহাগ্রন্থের অনুবাদ ক্রমিকভাবে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানা তাঁহার সেই শুভ প্রচেষ্টার পরিচয়স্বরূপ প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদ। শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ-নিবন্ধরাজী ভাবের গাম্ভীর্যে এবং গূঢ়ার্থ-মূলক তাৎপর্যে পূর্ণ। এমন গ্রন্থের অনুবাদ করা সহজ নহে। অনুবাদের ক্ষেত্রে বাচন-রীতি ইংরেজীগান্ধী হইয়া পড়িবে, ইহা আদৌ আশ্চর্য নয়। সে ক্ষেত্রে অনু-বাদের ভাষায় আড়ষ্টতা আসিয়া পড়ে। গ্রন্থকারের অনুবাদের এইখানেই বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত সরল এবং প্রাঞ্জল। অথচ মূল গ্রন্থানুযায়ী ভাবের গভীর সংবেদন এবং গূঢ়ার্থগ্রহণ মননশীলতার উদ্দীপন-তাৎপর্য তাঁহার অনুবাদে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বলা চলে। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-দর্শন সম্বন্ধে অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলির অনুবাদ পাঠ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন।

৪৫৮।৬৫

পত্রিকা

বিজ্ঞান। সম্পাদক রেখা নন্দী ও নবকুমার সরকার। পি-৩, মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য ০০·৬০।

সম্ভাবনাযুক্ত অপরিচিতদের রচনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব। আকৃতি-প্রকৃতিতে পত্রিকাখানির অভিনবত্ব কোন বিষয়ে নেই। ছোট্ট পত্রিকা-খানির মধ্যে যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা। এই মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে 'বিজ্ঞান' দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারবে।

সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা। সম্পাদক শান্তি চট্টোপাধ্যায়। ১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য প্রতি সংখ্যা ০০·২৫।

জনসাধারণের মধ্যে কাব্য-প্রীতি জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবারের কবিপক্ষে কবিতা নিয়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক কতকগুলি পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে একটা 'স্টান্ট' দেখানো লক্ষ ছিল যে পত্র-পত্রিকার, সেগুলি কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই লুপ্ত। বেঁচে আছে সেই পত্রিকাগুলি, যাদের প্রকাশের পিছনে রয়েছে আটুট কাব্য-নিষ্ঠা এবং সম্পাদকের পরিশ্রম। আলোচ্য পত্রিকাখানি এমনই একটি প্রকাশন, যার প্রয়োজন দীর্ঘদিন অনুভূত হয়ে আসছিল। পরিচিত, অল্প-পরিচিত ও অপরিচিত কবিদের রচনা-সম্বলিত পত্রিকাখানি বাঙলা কবিতার বর্তমান ধারা ও প্রগতির একটা সম্যক পরিচয় পাঠকের সামনে এনে দিয়েছে। কবিতাকে জনপ্রিয় করে তোলার একটি সুন্দর প্রচেষ্টা।

কবিতা সাপ্তাহিকী। সম্পাদক নিতাই ঘোষ ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১-বি, অভয় সাহা লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ০০·৭৫।

আলোচ্য সংখ্যাখানি একটি বিশেষ সংকলন। বিষ্ণু দে, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখের মৌলিক রচনা ছাড়া আছে জগন্নাথ চক্রবর্তী-কৃত রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার অনুবাদ। এছাড়া গ্রেগরি করসো-র একটি একাংক প্রহসনের ভাবাবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি কাব্য-নাটক 'পদশব্দ' এবং বীরেন্দ্র দত্তর 'লেখা লেখক পাঠক' প্রবন্ধ মিলে সংখ্যাখানি কাব্য ও সাহিত্য-রসিকদের প্রশংসা অর্জন করবে।

Contemporary crafts in West Bengal.

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পর্ষৎ—নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলিকাতা-১।

বিভিন্ন সামগ্রীকে মাধ্যম করে হাতের কাজে যে অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, সেই সব সামগ্রীর প্রতি মুখ্যত বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই পুস্তিকার প্রকাশ। শিং, হাতির দাঁত, তামা, পিতল, সোলা, মাটি, বেত, বাঁশ প্রভৃতি দিয়ে বাঙলার শিল্পী কারিগর শিল্পকুশলতায় অনুপম যে-সব জিনিস তৈরি করেন, তার সচিত্র পরিচয় এই পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত। সুমুদ্রিত পুস্তিকা-খানি সংগ্রহ করে রাখার উপযোগী।

প্রাপ্তি সংবাদ

গল্পে নীতিকথা। বিজ্ঞান স্বামী শিবানন্দ যোগাশ্রম সংঘ—পোঃ দুড়িয়া, মেদিনীপুর।

মহানগরী। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ—৯৩।১এ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

শেকসপীয়রের সনেট। অনিল বিশ্বাস। পুরোগামী প্রকাশন—৩২, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

মহাবিশ্বের সন্ধানে। জে আলেন হাইনেক ও নরমান ডি এন্ডারসন। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং—৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·৫০।

পথের ডাক। অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশ ভবন—১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·০০।

খনিক বিজ্ঞান। ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স—২০৩।১।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·৫০।

রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েকটি দিক। নরেশ-নাথ মৈত্র। বসু বুক স্টল—১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৫০।

স্থান কাল পাত্র। রণজিৎ সিংহ। কথা-শিল্প—১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

ফুটবল খেলার প্রসার ও প্রচারে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশী—যাঁরা ফুটবলের আইন-কানুন রচনা করেছেন—ফুটবলের মধ্যে রূপ-রস-বর্ণ-ছন্দ এনে যাঁরা ফুটবলকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন—সেই ইংলণ্ডের মাটিতে সর্বপ্রথম বিশ্ব ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এবং ফাইন্যাল খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে সেই ইংলণ্ডের সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ লাভ শতাব্দীর ফুটবল খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা।

জুলে রিমে' কাপ বা বিশ্ব ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার তিন সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক-ভাবেই ফুটবল রসিকদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়বে। কিন্তু এবারকার বিশ্ব কাপের আয়োজনের জাঁকজমক এবং খেলার উন্মাদনা এত বেশী ছিল যে, এ স্মৃতি সহজে মন থেকে মুছবার নয়। বস্তুত, বিশ্ব কাপের খেলার স্মৃতি সহজে মন থেকে মুছেও যায় না। কারণ, অলিম্পিক খেলাধুলোর আসরের মত চার বছরের ব্যবধানে এক-একটি বিশ্ব প্রতি-যোগিতার আয়োজন। একটি প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আরম্ভ হয় আর-একটি প্রতিযোগিতার উদ্যোগ, আয়োজন ও প্রস্তুতি।

প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং প্রচারের ফলে বিশ্ব কাপের খেলাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল, এক-মাত্র অলিম্পিক খেলাধুলো ছাড়া কোন একক ক্রীড়ায় কোন দিন এমন আগ্রহ দেখা যায়নি। বিধি-ব্যবস্থা, দর্শক-সমাগম এবং দর্শনী থেকে অর্থাগমের দিক দিয়েও এবারকার বিশ্ব কাপে নানা রেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছে। খেলা দেখবার জন্য নানা দেশ থেকে প্রায় এক লক্ষ মানুষ ইংলণ্ডে সমবেত হয়েছেন, প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ
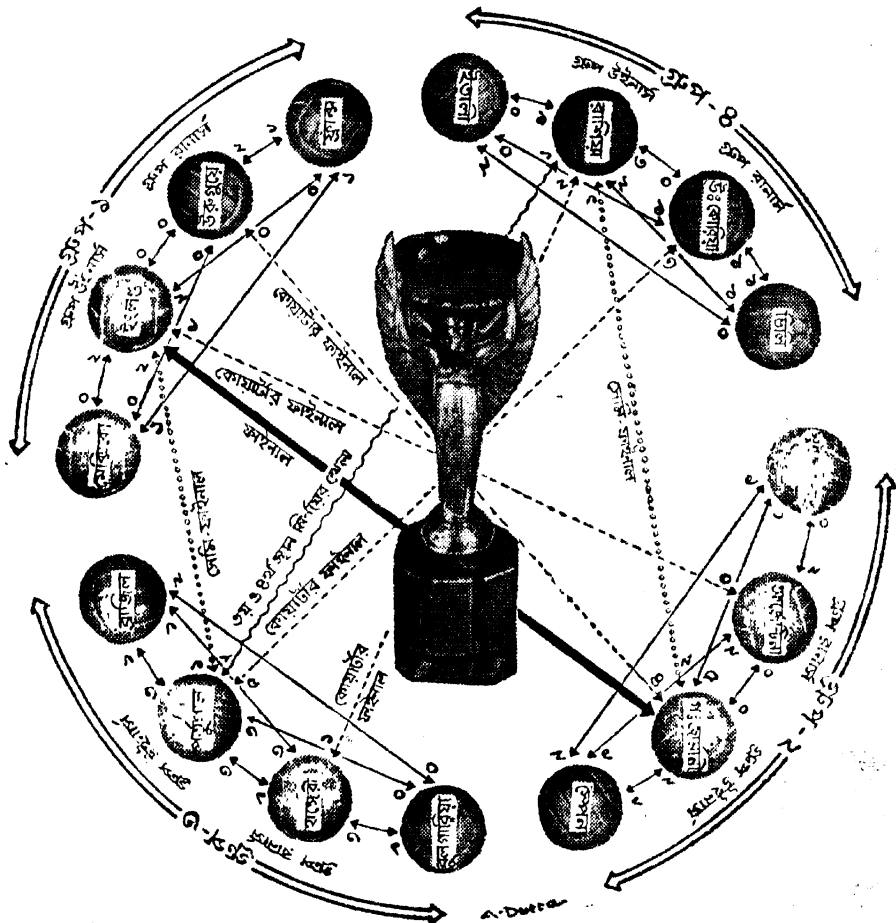
চিত্রে বিশ্ব কাপের মূল প্রতিযোগিতার ফলাফল। শুধু ফাইন্যালের মোটা রেখার দুই পাশে ইংলণ্ডের ঘরে ৪ এবং জার্মানীর ঘরে ২ বসিয়ে নিতে হবে।

মাঠে বসে খেলা দেখেছেন, আর ২৯টি দেশের প্রায় ৪০ কোটি মানুষ খেলা দেখেছেন ও ধারাবিবরণী শুনেছেন টেলি-ভিশনের পর্দায় চোখ এ'টে রেখে এবং রেডিওর সেটে কান খাড়া রেখে।

১৯৬৬-র জুলাই-এর ৩০ তারিখটি ইংলন্ডের ক্রীড়া, কৃষ্টি এবং গৌরবের

বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইংলন্ডের অধিনায়ক ববি মুর

ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ঐদিন ফাইন্যাল খেলার উত্তেজনায় সারা ইংলন্ডের নাগরিক জীবন যেন ঐতিহাসিক ক্রীড়াঙ্গন ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। 'জুলে রিমে' কাপ জয়ের পর ইংলন্ড আনন্দের বন্যায় ভেসে গিয়েছে। খেলা যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ লন্ডনের রাস্তাঘাট-পার্কে বেশী মানুষ দেখা যায়নি। দোকানপাট, হাট-বাজার সবই যেন ফাঁকা। শুধু টেলিভিশন ও রেডিওর সামনে রঙীন আশার স্বপ্নে বিভোর মানুষের ভিড়।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পশ্চিম জার্মানীকে ৪—২ গোলে হারিয়ে ইংলন্ড যখন সত্যি-সত্যিই নীরেট সোনায় গড়া ফুটবলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'জুলে রিমে' কাপ সর্ব-প্রথম লাভ করল, তখন বাঁধন-হারা আনন্দপ্রবাহে সারা ইংলন্ডের মানুষ গা ভাসিয়ে দিল। জনবিরল পথে মানুষের মিছিল, লক্ষ কণ্ঠে জাতীয় সাফল্যের জয়োল্লাস। কানে কানে বিজয়বার্তার কানাকানি। মুহূর্তের মধ্যে সারা ইংলন্ডের পানশালা, ভোজনশালা মানুষের ভিড়ে জমজমাট। অনেকের হাতে উড্ডীয়মান ইউনিয়ন জ্যাক, বাহুতে 'জুলে রিমে' কাপের স্মারকচিহ্ন, স্মারক-চিহ্নের কেক, বিস্কুট, চকোলেট নিয়ে ছেলেবুড়োর হুড়োহুড়ি, স্মারকচিহ্নের উপহার দ্রব্যসম্ভার কেনাকাটার জন্য কাড়াকাড়ি। ফুটবল খেলায় বিশ্বজয়ের ঐ শুভলগ্নে অন্তত কিছু সময়ের জন্য ইংলন্ডের নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটের জরুরী ব্যবস্থার কথা ভুলতে পেরেছে।

অতীত দিনের খ্যাতনামা ফুটবল রেফারী এবং বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীডেনিস হাওয়েলের কণ্ঠেও খুশির সুর প্রতিধ্বনিত। শ্রীহাওয়েল বলেছেন: মূল প্রতিযোগিতার উদ্যোগ-

ইংলন্ড দল

বিশ্ব কাপ বিজয়ী হতে ইংলন্ড গ্রুপ লীগে উরুগয়ের সঙ্গে ০—০ গোলে খেলা ড্র করার পর পরাজিত করেছে মেক্সিকোকে ২—০ গোলে, ফ্রান্সকে ২—০ গোলে, আর্জেন্টিনাকে ১—০ গোলে, পর্তুগালকে ২—০ গোলে এবং পশ্চিম জার্মানীকে ৪—২ গোলে।

যে ২২ জন খেলোয়াড় ইংলন্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের নাম উপর থেকে এবং বাঁ দিক থেকে পাশাপাশি পড়তে হবে। মোটা অক্ষর ফাইন্যালে খেলার পরিচয়সূচক।

ববি মুর (অধিনায়ক), **র‍্যামন উইলসন**, **জন চার্লটন**, জেমস আর্মফিল্ড, টেরেন্স পেন, ও **জিওফ্রে হার্স্ট**; ইয়ান ক্যালাঘান ও **মার্টিন পিটার্স**; জন কনেলী ও জিরাল্ড বার্ন; নর্মান হান্টার ও রোনাল্ড স্প্রিংগেট; **জর্জ কোহেন** ও **ববি চার্লটন**; **এলান বল** ও পিটার বোনেটি, **রজার হান্ট**, জর্জ ইস্টহ্যাম, জিমি গ্রীভস, **নবি স্টিলেস**, **গর্ডন ব্যাঙ্কস** ও রোনাল্ড ফ্লাওয়ার্স।

আয়োজনে ব্রিটেনের রাজকোষ থেকে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হয়েছে। এর আগে সরকারী অর্থ এমন ভাল কাজে আর খেটেছে কিনা সন্দেহ। শ্রীহাওয়েল আরও বলেছেন—অতিরিক্ত সময়ের খেলার উত্তেজনা সারা মাঠেই ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু রাজকীয় আসনের উত্তেজনা বোধ হয় খেলোয়াড় ও দর্শকদের মনের উত্তেজনাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। ব্রিটেনের ভাগ্যবিধাতারা এবং ব্রিটেনের অধিবাসিবৃন্দ খেলাকে কি চোখে দেখে থাকেন এবং জাতীয় জীবনের কোন্ স্তরে খেলাকে স্থান দেন, এইসব ঘটনা ও উক্তি তারই নিদর্শন।

✻

শুধু ইংলণ্ড দল সারা ব্রিটেনের দল নয়। শুধু ইংলণ্ডের দল। ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ড পৃথক পৃথকভাবে বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতায় এবং কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে হেরে গিয়েছে। সেইজন্য ছোট্ট দেশগুলির অধিবাসীর পক্ষে আরও গৌরবের কথা। যদিও স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস এবং আয়ারল্যাণ্ডের কোন খেলোয়াড়কে ইংলণ্ড দলে নেওয়া হয়নি, নেবার সুযোগও ছিল না, তবু ইংলণ্ডের জয়ে সারা গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় জয় এবং সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বন্যা।

ইংলণ্ড যেমন গ্রেট ব্রিটেন নয়, তেমনি ফাইনালে পরাজিত জার্মানীও নয় গোটা জার্মান দল। পশ্চিম জার্মানীই শুধু প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পেয়েছে। পূর্ব জার্মানী প্রাথমিক প্রতিযোগিতার খেলায় ৬ নম্বর গ্রুপ থেকে বিদায় নিয়েছে। (প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মানীর খেলার ফল—পূর্ব জার্মানী ১: হাঙ্গেরী ১; হাঙ্গেরী ৩ : পূর্ব জার্মানী ২; পূর্ব জার্মানী ১: অস্ট্রিয়া ১; পূর্ব জার্মানী ১ : অস্ট্রিয়া ০)

সুতরাং আধখানা জার্মানীর পক্ষেও বিশ্ব কাপের রানার্স হওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়. যদিও পশ্চিম জার্মানীই ১৯৫৪র বিশ্ব কাপের বিজয়ী দেশ। রানার্সের সম্মানেও পশ্চিম জার্মানীতে আনন্দের ঘাটতি নেই। ফাইনাল খেলার পরের দিন পশ্চিম জার্মানী দল বিমানে করে লণ্ডন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছিলে পশ্চিম জার্মানীর সহকারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি দলটিকে অভিনন্দন জানায়। জার্মানীর প্রথা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ সম্মানের আয়োজন হিসাবে রূপোর পাত্রে করে ফুলের মালা উপহার দেওয়া হয়। খোলা গাড়িতে চড়ে খেলোয়াড়রা শহরবাসীর বিপুল অভিনন্দন কুড়ান। জার্মানবাসীর একটু দুঃখ, পশ্চিম জার্মানী এবার ফাইনালে বিজয়ী হতে পারলে উরুগুয়ে, ইটালী ও ব্রাজিলের মত দুইবার জয়ের সুবাদে তৃতীয়বার জুলে রিমে কাপ চিরতরে লাভের দাবিদার হতে পারত। সে সুযোগ আপাততঃ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।

✻

সন্দেহ নেই, বিশ্ব কাপের জমজমাট আসরের জাঁকজমক এবং বিপুল আয়োজনে এক দিকে যেমন পরিচালকদের সাফল্যের

পশ্চিম জার্মানী দল

বিশ্ব কাপের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা থেকে পশ্চিম জার্মানীর ১০টি খেলার ফল : সুইডেনের সঙ্গে ১—১ গোল ও ২—১ গোলে সুইডেনের পরাজয়; সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে ৫—০ ও ৬—০ গোলে জয়লাভ; গ্রুপ লীগে সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৫—০ ও স্পেনের বিরুদ্ধে ২—১ গোলে জয় এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে ০—০ গোলে খেলা অমীমাংসিত; কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ৪—০ গোলে এবং সেমি ফাইনালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ২—১ গোলে জয়; ফাইনালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৪—২ গোলে পরাজয়।

যে ২২ জন খেলোয়াড় পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের নাম উপর থেকে এবং বাঁদিক থেকে পাশাপাশি পড়তে হবে। মোটা অক্ষর ফাইনাল খেলার চিহ্নসূচক।

উইলি স্কুলজ, উলফগ্যাং ওভারাথ, ম্যাক্স লোরেঞ্জ, জারগেন গ্রাবওয়াস্কি, হাউচ-ডিটার সিয়েলফ ও **লোথার এমারিচ;** বার্নার্ড প্যাজকে ও **উলফগ্যাং ওয়েবার;** হেনজ্ হার্নিগ ও কার্ল-হেনজ শেলিঙ্গার; উলফগ্যাং পল ও আলবার্ট ব্রুলস; **ফ্রানজ্ বেকেনবেয়ার ও হেলমুট হ্যালার; হর্স্ট হত্তেস** ও গান্টার বার্নার্ড; **জোসেফ মেইয়ার, ফ্রিডেল লুজ, হ্যানস টিলকোয়াস্কি, ওয়েনার ক্র্যামার, উয়ে সিলার (অধিনায়ক) ও সিগি হেল্ড**

পশ্চিম জার্মানী এবং রাশিয়ার মধ্যে বিশ্ব কাপের সেমি ফাইন্যাল খেলায় জার্মানীর অধিনায়ক উয়ে সিলারকে রাশিয়ার গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিনের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ফুটে উঠেছে, অপর দিকে তেমন বার্থতারও পরিচয় মিলেছে। এবং কতগুলি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্ষেত্রে চিড় ধরেছে। সাদা কালোর বিদ্বেষে আবহাওয়া পুরোপুরি বিষাক্ত। ফুটবল-সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ, বিশেষ করে আর্জেণ্টিনা এবং উরুগুয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছে—দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও জার্মানীর সুসংবদ্ধ যোগসাজসে এবারকার বিশ্ব কাপের বিধিব্যবস্থা এবং পরিচালনা পুরোপুরি কলুষিত। রেফারীর নিয়োগ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তাঁদের পরিচালনা গোড়া থেকেই পক্ষপাতদুষ্ট এবং ইংলন্ডকে সুযোগ দেবার জন্য ক্রীড়াঙ্গনের অদলবদল স্বেচ্ছাচারিতা এবং অন্যায়ের উদাহরণ।

মারাত্মকভাবে ফাউল করে খেলার জন্য 'ফিফা' অর্থাৎ ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ডিসিপ্লিনারী কমিটি ৮ জন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এঁরা হচ্ছেন উরুগুয়ের জুলিও কোর্টেস, হোরাসিও ট্রচে ও হেক্টর সিলভা, আর্জেণ্টিনার অধিনায়ক এন্টোনিও র‍্যাটিন, রবার্টো ফেরেরিও, আর্মাণ্ডো ওনেগা ও জোরগে আলবেরক্ট এবং সোভিয়েট রাশিয়ার ইগর চিসলঙ্কো। এঁরা কেউ পরবর্তী তিনটি, কেউ পরবর্তী ছয়টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পারবেন না। ডিসিপ্লিনারী কমিটি আর্জেণ্টিনাকেও সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, সদাচারের প্রতিশ্রুতি দিতে না পারলে ১৯৭২ সালের বিশ্ব কাপে আর্জেণ্টিনাকে খেলার অধিকার দেওয়া হবে না। অপর দিকে, কয়েকটি দক্ষিণ আমেরিকার দেশের সঙ্গে আর্জেণ্টিনা ফিফা থেকে বেরিয়ে যাবার কথা চিন্তা করছে। স্পেন এবং ফ্রান্সও নাকি এদের সমর্থক।

বিভিন্ন খেলায় রেফারীদের নিয়োগে দূরদর্শিতার অভাব, রেফারীদের পরিচালনায় ত্রুটিবিচ্যুতি, ক্রীড়াঙ্গনের অদলবদল প্রভৃতি ঘটনায় অবশ্যই অভিযোগের কারণ ঘটেছে। সংগঠনেরও মর্যাদা হানি না হয়েছে, এমন নয়। এ সবই দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখের কথা, শান্তিময় খেলায় কতিপয় 'ফুটবল-দস্যু'র প্রতিপক্ষের কুশলী ও সুনিপুণ খেলোয়াড়দের মাঠের মধ্যে শুইয়ে দেবার অপচেষ্টা। ব্রাজিলের 'ব্ল্যাক পার্ল' ফুটবল জগতের বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী পেলের মত খেলোয়াড়কেও খোঁড়া করে দিতে এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। প্রথম দিনের খেলাতেই জখম হয়ে পেলেকে মাঠ ছেড়ে বাইরে গিয়ে বসে থাকতে হয়েছে, পরেরটিতে তিনি খেলতে পারেননি, তার পরের খেলায় একটি পা-ই তাঁর প্রায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। খেলাধূলাতে মহান আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে যারা ফুটবলের শিল্পকর্মকে হত্যা করলেন তাঁরা আর যাই করুন খেলোয়াড়ী মনের অন্তে পরিচয় দেননি। দুবারের বিশ্ব কাপ বিজয়ী ব্রাজিল, তৃতীয়বার জয়ী হয়ে যাদের 'জুলে রিমে' কাপ চিরতরে লাভ করবার ছিল স্বর্ণ-সম্ভাবনা, তারা অবশ্যই আশানুরূপ খেলতে পারেনি, গ্রুপ লীগ থেকেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ব্রাজিলের মূলে পেলের আঘাত যে অনেকখানি দায়ী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও ফুটবল একজনের খেলা নয়—জয়ের মূলে দলীয় সংহতিই বড় কথা, তবু পেলের মত খেলোয়াড়ের আঘাতে দলের মনোবলের মূলে কুঠারাঘাত। সখেদে পেলে বলেছেন—'যথেষ্ট হয়েছে, আর বিশ্ব কাপে খেলা নয়। যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম তাতে বিশ্ব কাপের খেলায় আমার এখানেই ইতি।'

*

বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতার ৩২টি খেলা সম্পর্কে 'নম নম' করে কিছু লেখাও এ সপ্তাহে সম্ভব হচ্ছে না। শুধু ফলাফল দেওয়া হচ্ছে। তবু উত্তর কোরিয়া এবং পর্তুগালের ফুটবল 'যাদুকর' ইউসেবিও সম্পর্কে দু-একটি কথা না লিখে পারছি না। আর ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর ফাইন্যাল খেলা সম্পর্কেও দু'চার কথা বলতে হচ্ছে।

এশিয়া ও আফ্রিকার কতকগুলি দেশ প্রাথমিক প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় উত্তর কোরিয়াকে শুধু শক্তিহীন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে খেলতে হয়। অস্ট্রেলিয়াকে ৬-১ এবং ৩-১ গোলে পরাজিত করে উত্তর কোরিয়া মূল প্রতিযোগিতার খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা অর্জন করলেও ইংলণ্ডের বহু ফুটবল পণ্ডিতের ধারণা ছিল কোরিয়া একটি পয়েণ্টও পাবে না। কিন্তু গ্রুপ লীগে রাশিয়ার কাছে ৩-০ গোলে পরাজয় স্বীকারের পর চিলির সঙ্গে ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে, আর ইটালীর মত পরম শক্তিশালী দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে উত্তর কোরিয়ার কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওঠার ঘটনা এশিয়ার ফুটবলের পক্ষে আশার কথা। তার চেয়ে উত্তর কোরিয়ার আরও বড় কৃতিত্ব কোয়ার্টার

চোখে বেদনার অশ্রু, কাঁধে সান্ত্বনার হাত—বিশ্ব কাপের সেমিফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে পরাজয়ের পর মাঠের মধ্যে ক্রন্দনরত পর্তুগালের বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় ইউসেবিও

ফাইনালে দুর্ধর্ষ পর্তুগালের বিরুদ্ধে ২৬ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে এগিয়ে যাবার ঘটনা। পর্তুগালের কাছে শেষ পর্যন্ত অবশ্য উত্তর কোরিয়াকে ৫-৩ গোলে হার স্বীকার করে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু কোরিয়ার খর্বকায় খেলোয়াড়দের ক্রীড়াশৈলী ফুটবল রসিকদের চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়েছে। পর প্রশংসায় পরাঙ্মুখ সমালোচকরাও প্রাচ্য ফুটবলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ছিল, ইটালী এবং পর্তুগালের ফুটবল শক্তি কতখানি। বলা বাহুল্য, অনেক ফুটবল পণ্ডিত তিনটি দলকেই সম্ভাবিত বিজয়ী বলে ধরে রেখেছিলেন। পর্তুগালের তো কথাই নেই, পৃথিবীর মধ্যে ইটালীতেই ফুটবলের জন্য সবচেয়ে বেশী অর্থ খরচ করা হয়। এবং সেখানেই সব চেয়ে বেশী বিদেশী ফুটবল শিল্পীর সমাগম। দক্ষিণ আমেরিকার চিলিও ফুটবল সমৃদ্ধ দেশ। সুতরাং বিশ্বের ফুটবল মেলায় এদের সঙ্গে খেলায় উত্তর কোরিয়ার ক্রীড়া চাতুর্য অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

বিশ্বকাপের ফুটবল খেলায় আজ পৃথিবীর প্রথম পুরুষ পর্তুগালের রাইট ইন ইউসেবিও। পেলের পরে তাঁর মাথাতেই আজ বিশ্ব ফুটবলের রাজার মুকুট। ইউসেবিও মূল প্রতিযোগিতার ৬টি খেলায় মোট ৮টি গোল করেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধেই করেছেন দুটি পেনালটি সমেত ৪টি গোল। কিন্তু শুধু গোলের জন্যই নয়—ফুটবলের কলা নৈপুণ্য, ক্রীড়াশৈলী, প্রথা প্রকরণের জন্যই ইউসেবিও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড। তাঁর খেলায় একদিকে গতির কাব্য, আর একদিকে নীতির মহিমা—সব মিলিয়ে ফুটবলের শান্ত সৌন্দর্য। কিন্তু শুটিং যেন কামানের গোলা। এই প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে ইউসেবিও যে এক হাজার পাউন্ড পুরস্কারের অধিকারী হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইউসেবিওর শ্রেষ্ঠত্বের আর বড় পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর অন্তরের মধ্যে, ফুটবল এবং দেশকে ভালবাসার মধ্যে। সেমি-ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে পরাজয়ের পর ইউসেবিওর সে কি কান্না! ছোট্ট শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কেঁদেছেন। সান্ত্বনার প্রলেপে অশ্রু বাধ মানেনি। অঝোর ঝোরে চোখের জল পড়েছে আর গায়ের জার্সি দিয়ে চোখের জল মুছছেন। সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। ইউসেবিওর কান্নার মধ্যে তাঁর ফুটবল-প্রীতি ও দেশপ্রীতির পরিচয় মিলেছে।

পর্তুগাল বিশ্ব কাপ বিজয়ী হলে প্রতি খেলোয়াড় প্রচুর অর্থ পুরস্কার হিসাবে পাবেন—পর্তুগালের একটি ব্যাঙ্কের এমন প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু অর্থের জন্যই কি ইউসেবিওর কান্না? ফুটবলের দৌলতে যিনি স্বর্ণখনির উপর বসে আছেন সামান্য অর্থ তাঁর কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। ইউসেবিওর ক্রন্দন বিশ্বের কাছে তাঁর বুক-ভরা বেদনার আবেদন।

*

ইউসেবিও ছাড়া বিশ্ব কাপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক দেশের অনেক খেলোয়াড়ের ভূমিকাই উল্লেখের দাবি রাখে, যদিও বেশীর ভাগ দলেরই লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষামূলক ফুটবল। রক্ষাব্যূহকে দুর্ভেদ্য করে সুযোগ বুঝে আক্রমণ। তবু নিজ ক্রীড়াশৈলীতে যাঁরা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইটালীর ফেসেটি ও মাজোলা, স্পেনের লুই সুয়ারেজ, উত্তর কোরিয়ার সিউং জং ইয়াং ও সিউং জিন, হাঙ্গেরীর বেনে, আর্জেন্টিনার ওনেগা, রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন, ইংলণ্ডের ববি চার্লটন, নবি-স্টাইলস, জিওফ হার্স্ট, গর্ডন ব্যাঙ্কস ও ববি মুর, পশ্চিম জার্মানীর বেকেনবোয়ার, হেলমুট হালার, উয়ে সিলার প্রভৃতি খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করবার মত।

ফাইনাল খেলা

ইংলণ্ড—(৪) পশ্চিম জার্মানী—(২)

(হার্স্ট ৩ ও পিটার্স) (হালার ও ওয়েবার)

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ খেলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন ফাইনাল খেলার নাটকীয় পরিণতি। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলায় দুই দলের দুটি করে গোল। প্রথমে পশ্চিম জার্মানী অগ্রগামী, ইংলণ্ডের গোল পরিশোধ। পরে ইংলণ্ড অগ্রগামী, পশ্চিম জার্মানীর গোল পরিশোধ। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলায় ইংলণ্ডের দুটি গোল, শেষ গোলটি খেলার শেষ বাঁশির ফল। অর্থাৎ গোলের সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তির বাঁশী। হয়তো অতিরিক্ত সময়ের খেলার প্রয়োজন হত না এবং এমন নাটকীয় পরিণতিও দেখা যেত না, যদি নির্ধারিত ৯০ মিনিটের শেষ মুহূর্তে জার্মানী আরও নাটকীয়ভাবে গোল শোধ করতে না পারত। যেখানে পৃথিবীর

পেশাদার ফুটবলের প্রথম সারির সুনিপুণ খেলোয়াড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানে নাটক এবং ঘটনা-সংঘাত থাকবেই। কিন্তু সত্যিই যেভাবে আবেগ-অধীর মুহূর্তের মধ্যে ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে এবং খেলার মধ্যে চরম উত্তেজনা জমে থেকেছে, তাতে খেলাটিকে অনায়াসেই শতাব্দীর ফুটবল ইতিহাসের স্মরণীয় এবং উপভোগ্য খেলা বলে অভিহিত করা যায়।

দলগত সংহতি এবং প্রাণপণ সংগ্রামই ইংলণ্ডের বিশ্ব কাপ জয়ের মূল কথা। তবু ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়ের মূলে হার্স্টের অবদান অনস্বীকার্য। চারটি গোলের মধ্যে হার্স্ট একাই করেছেন তিনটি গোল।

বৃষ্টি-ভেজা ওয়েমব্লী মাঠে পুরো দু ঘণ্টার খেলার শেষ দিকে জার্মান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কিছুটা শ্রান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। ইংলণ্ডের তৃতীয় গোল, অর্থাৎ অতিরিক্ত সময়ের প্রথম গোল ক্রস-বারে লাগার পর জালের মধ্যে ঢোকেনি বলেও তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবু জার্মান দলের কোচ এবং খেলোয়াড়রা অকপটে স্বীকার করেছেন যোগ্য দল হিসাবেই ইংলণ্ডের মাথায় আজ বিশ্ব ফুটবলের বিজয় মুকুট।

✻

বিশ্ব কাপের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ কোয়ালিফাইং খেলার ফলাফল এবং লীগ টেবল এর আগে 'দেশ'-এর পাতায় প্রকাশ করা হয়েছে। এখন ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত মূল প্রতিযোগিতার ৩২টি খেলার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে।

বিশ্ব কাপ উপলক্ষে এফ এ আয়োজিত পান ও ভোজন উৎসবে বিচিত্র কেক। চকোলেট, ক্রিম প্রভৃতি উপাদানে কেকটিকে ফুটবলের আকারে তৈরী করা হয়েছে। কেকের পাশে রয়েছে কোয়ার্টার ফাইন্যালের চারটি দেশের জাতীয় পতাকা, আর বলের ক্ষুদ্রাকৃতি বিশ্ব কাপের প্রতিমূর্তি

(গ্রুপ লীগ)

গ্রুপ—১

ইংলণ্ড	০	উরুগুয়ে	০
ইংলণ্ড	২	ফ্রান্স	০
ইংলণ্ড	২	মেক্সিকো	০
উরুগুয়ে	২	ফ্রান্স	১
উরুগুয়ে	০	মেক্সিকো	০
মেক্সিকো	১	ফ্রান্স	১

	খেঃ	জঃ	ড্র	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইংলণ্ড	৩	২	১	০	৪	০	৫
উরুগুয়ে	৩	১	২	০	২	১	৪
মেক্সিকো	৩	০	২	১	১	৩	২
ফ্রান্স	৩	০	১	২	২	৫	১

গ্রুপ—২

পঃ জার্মানী	৫	সুইজারল্যাণ্ড	০
পঃ জার্মানী	০	আরজেনটিনা	০
পঃ জার্মানী	২	স্পেন	১
আরজেনটিনা	২	স্পেন	১
আরজেনটিনা	২	সুইজারল্যাণ্ড	০
স্পেন	২	সুইজারল্যাণ্ড	১

	খেঃ	জঃ	ড্র	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পঃ জার্মানী	৩	২	১	০	৭	১	৫
আরজেনটিনা	৩	২	১	০	৪	১	৫
স্পেন	৩	১	০	২	৪	৫	২
সুইজারল্যাণ্ড	৩	০	০	০	১	১	০

গ্রুপ—৩

পর্তুগাল	৩	হাঙ্গেরী	১
পর্তুগাল	৩	বুলগেরিয়া	০
পর্তুগাল	৩	ব্রাজিল	১
হাঙ্গেরী	৩	ব্রাজিল	১
হাঙ্গেরী	৩	বুলগেরিয়া	১
ব্রাজিল	২	বুলগেরিয়া	০

	খেঃ	জঃ	ড্র	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পর্তুগাল	৩	৩	০	০	৯	২	৮
হাঙ্গেরী	৩	২	০	১	৭	৫	৪
ব্রাজিল	৩	১	০	২	৪	৬	২
বুলগেরিয়া	৩	০	০	৩	১	৮	০

গ্রুপ—৪

রাশিয়া	৩	উঃ কোরিয়া	[illegible]
রাশিয়া	১	ইটালী	০
রাশিয়া	২	চিলি	১
উঃ কোরিয়া	১	ইটালী	০
উঃ কোরিয়া	১	চিলি	১
ইটালী	২	চিলি	০

	খেঃ	জঃ	ড্র	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
রাশিয়া	৩	৩	০	০	৬	১	৬
উঃ কোরিয়া	৩	১	১	১	২	৪	৩
ইটালী	৩	১	০	২	২	২	২
চিলি	৩	০	১	২	২	৫	১

(নক আউট)

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইংলণ্ড	১	আরজেনটিনা	০
রাশিয়া	২	হাঙ্গেরী	১
পর্তুগাল	৫	উত্তর কোরিয়া	৩
পশ্চিম জার্মানী	৪	উরুগুয়ে	০

সেমি-ফাইন্যাল

পশ্চিম জার্মানী	২	রাশিয়া	১
ইংলণ্ড	২	পর্তুগাল	১

পরাজিত সেমি-ফাইন্যালিস্টদের খেলা

পর্তুগাল	২	রাশিয়া	১

ফাইন্যাল

ইংলণ্ড	৪	পশ্চিম জার্মানী	২

জিম রায়ান

কত দিনে মানুষ ৩ মিনিট ৫২ সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়তে পারবে, এই তথ্য জানবার জন্য লণ্ডনের 'ডেলী মেল' পত্রিকা কিছুদিন আগে 'কম্পিউটার মেশিন' নিয়োগ করে।

ফ্রান্সের মিচেল জাজির বিশ্ব রেকর্ড ৩ মিনিট ৫৩·৬ সেকেণ্ড সময় সমেত এই শতকের গোড়া থেকে অনুষ্ঠিত এক মাইল দৌড় সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য যন্ত্রটিকে দেওয়া হয় এবং 'ডেলী মেল' পত্রিকার ক্রীড়া বিভাগের কর্মীরা যন্ত্রটির ভবিষ্যৎবাণী আদায় করে নেন।

'কম্পিউটারে'র ভবিষ্যৎবাণী হচ্ছেঃ ১৯৭০ সালের মধ্যে এক মাইল দৌড়ে সময় লাগবে ৩ মিনিট ৫২ সেকেণ্ড। ১৯৮০ সালের মধ্যে সময় আরও কমে গিয়ে দাঁড়াবে ৩ মিনিট ৪৯·৯ সেকেণ্ড।

কিন্তু 'কম্পিউটারে'র গণনা ও ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে দিয়ে আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ বছর বয়সী ছাত্র জিম রায়ান গত ১৭ জুলাই বার্কলেতে অল আমেরিকা দৌড় প্রতিযোগিতায় ৩ মিনিট ৫১·৩ সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

১৯৫৪ সালের মে'র ৬ তারিখটি মাইল দৌড়ের ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন অক্সফোর্ডের ইফ্লে রোডে ইংলণ্ডের ২৫ বছর বয়সী ডাক্তারী ছাত্র রজার ব্যানিস্টার ৩ মিনিট ৫৯·৪ সেকেণ্ডে এক মাইল পথ দৌড়ে মাইল দৌড়ে ৪ মিনিটের বেড়া ভেঙেছিলেন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসাবে ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ অতিক্রম করায় বহু ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'ব্যানার লাইনে'র শিরোনামায় লিখেছিলঃ 'ব্যানিস্টার ব্রিংগস গ্লোরি টু ইংল্যাণ্ড'। ব্যানিস্টারের পর কম করে ৭৯ জন দৌড়বীর ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং দ্রুততম জিম রায়ান।

কে এই জিম রায়ান? না, যে ছেলেটি শিশুকাল থেকে দৌড়কে ভালবেসে ফেলেছে। খুব ছোটবেলায় গ্রামের মাঠে, গ্রামের পথে পথে দৌড়ের মধ্যেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছে। চলমান দুধের ট্রাকের সংগে যে দৌড়ের পাল্লা দিয়েছে—ঘেউ ঘেউ শব্দ করে কুকুর যার সংগে ছুটেছে। এখনো যে সপ্তাহে ৮০ থেকে ১০০ মাইল দৌড়ের অনুশীলন করে। খুব ভোরে

বিছানা থেকে ৫টা সে দৌড়ের জন্য রাস্তায় বের হয়। রোজ ৬ মাইল করে দুবার দৌড়ের প্রথম কিস্তি যার ভোর ৫টার মধ্যেই শেষ হয়। শীতে, গ্রীষ্মে, জিরো ডিগ্রী তাপমাত্রা থেকে ১০০ ডিগ্রী তাপের মধ্যে সে সমানভাবে অনুশীলন করে। ভারোত্তোলন এবং নিয়মিত ব্যায়াম তার দৈনন্দিন ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

তার ফলেই পৃথিবীর প্রথম স্কুল ছাত্র হিসাবে দু' বছর আগে জিম রায়ানের ৪ মিনিটে মাইল অতিক্রম এবং আজ 'মারভেল অব দি মিডল ডিসট্যান্ট', 'ফ্যান-টাস্টিক রানার' প্রভৃতি খেতাব।

কম্পিউটারের গণনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে অবিশ্বাস্য সময়ে শুধু কি মাইল দৌড়েই রায়ানের বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব? দুই মাইল দৌড়ে মার্কিন রেকর্ড এবং আধ মাইলে বিশ্ব রেকর্ডে'র পাশেও জিম রায়ানের নাম। আরও বলবার কথা, জুন-জুলাইয়ের মাত্র ২৯ দিনের মধ্যে তিনটি রেকর্ড হয়েছে। ২ মাইলে ৮ মিনিট ২৫·২ সেকেণ্ড (আমেরিকার রেকর্ড), ১ মাইলে ৩ মিনিট ৫৩·৭ সেকেণ্ড (আমেরিকার রেকর্ড), আধ মাইলে ১ মিনিট ৪৪·৯ সেকেণ্ড (বিশ্ব রেকর্ড)। এক মাইলে আমেরিকান রেকর্ড প্রতিষ্ঠার সময় মিচেল জাজির বিশ্ব রেকর্ডে'র চেয়ে রায়ানের সময় মাত্র ·১ সেকেণ্ড বেশী ছিল, এখন জাজির সময়ের চেয়ে ২·৩ সেকেণ্ড কম। মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে কতখানি উন্নতি!

৬ ফুট দেড় ইঞ্চি মাথায় উঁচু, দীর্ঘপদ রায়ান সম্পর্কে মিচেল জাজির ভবিষ্যৎবাণীঃ রায়ানই প্রথম মানুষ হিসাবে মাইল দৌড়ে ৩ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডের বাধা ভাঙবেন। আর ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ উত্তরণের প্রথম পুরুষ রজার ব্যানি-স্টারের মন্তব্যঃ জীবনযাত্রার মান বাড়ার ফলে মানুষের পক্ষে একদিন ৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে মাইল পথ অতিক্রম হয়তো সম্ভব হবে। কিন্তু তার কম সময়ে কিছুতেই নয়। এখন লণ্ডন সেণ্ট মেরীস হাসপাতালের ডাক্তার রজার ব্যানিস্টার দেহযন্ত্র নিয়ে অনেক গবেষণার পর উক্ত মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু কে জানে মানুষের শক্তি, গতি ও সহনশীলতার শেষ কোথায়। মাইল দৌড়ের নীচের তালিকা এবং জিম রায়ান এর আংশিক উত্তর।

টমাস কনেক (১৮৯৫) ৪ মিঃ ১৫·৬ সেঃ
পাভো নুর্মি (১৯২৩) ৪ মিঃ ১০·৪ সেঃ
গ্লেন কানিংহাম (১৯৩৪) ৪ মিঃ ০৬·৮ সেঃ
গুণ্ডার হেগ (১৯৪৫) ৪ মিঃ ০১·৪ সেঃ
রজার ব্যানিস্টার (১৯৫৪) ৩ মিঃ ৫৯·৪ সেঃ
জন ল্যাণ্ডি (১৯৫৪) ৩ মিঃ ৫৭·৯ সেঃ
হার্ব এলিয়ট (১৯৫৮) ৩ মিঃ ৫৪·৫ সেঃ
পিটার স্নেল (১৯৬৩) ৩ মিঃ ৫৪·১ সেঃ
মিচেল জাজি (১৯৬৫) ৩ মিঃ ৫৩·৬ সেঃ
জিম রায়ান (১৯৬৬) ৩ মিঃ ৫১·৩ সেঃ

মৃদুল

রঙ্গজগৎ

আবেদন, নিবেদন

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরীর কাছ থেকে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরা বিশেষ কোন ভরসা পাননি। দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে চলচ্চিত্রসেবীদের উদ্দেশে পনেরো মিনিটব্যাপী ভাষণে তিনি বর্তমান জটিল আর্থিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে চলচ্চিত্রসেবীদের সাক্ষাতের একটি শুভফল এই : আমোদ-কর পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে তিনি অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী হয়েছেন।

এস এম ফিল্মস-এর "বাঘিনী" (পরিচালনা : বিজয় বসু) চিত্রে দুর্গার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের পরিচয় করিয়ে দেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুর। এবং বলেন, আপনারা ওঁর কাছে প্রস্তাব পেশ করুন। প্রতিনিধিরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্থমন্ত্রী বিজ্ঞান ভবন ত্যাগ করার পর শ্রীরাজ বাহাদুর প্রতিনিধিদের বলেন, এখনই কিছু সুরাহা হয়নি বলে আপনারা নিরাশ হবেন না।

চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার যে ব্যবস্থা হয়েছে তার জন্য প্রতিনিধিরা শ্রীরাজ বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ। দিল্লিতে দুইদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুর। চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রীদের এই আলোচনা সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রী এস এস ভাসান আমোদ-করের পুনর্বিন্যাস, অধিক সংখ্যক চিত্রগৃহ নির্মাণ, প্রযোজক-তহবিল গঠন এবং শিল্পীদের জন্য অ্যানুইটি ফাণ্ড তৈরির আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীরাজকাপুর প্রযোজকের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, যে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের পর সরকার ১৯৬৪-৬৫ সনে আমোদ-কর হিসাবে নিয়েছেন ১·১৭ কোটি টাকা, আয়কর ও আবগারী শুল্ক বাবদ নিয়েছেন যথাক্রমে ৩২ লক্ষ ও ৫·৯২ লক্ষ টাকা। এখন নতুন ছবি শুরু করার মত টাকা তাঁর নেই—শ্রীকাপুর এই তথ্য ব্যক্ত করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রীছোটুভাই দেশাই, শ্রীরাজ কাপুর, শ্রী এস এস ভাসান, শ্রীঅজিত বসু, শ্রী ভি পি সিপ্পি প্রভৃতি। তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সমস্যার কথা আলোচনা করেন।

সরকার প্রোডাকশন্স-এর "অজানা শপথ"-এর (পরিচালনা : সলিল সেন) নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

বাংলা ছবির প্রথম যুগ

বাংলা ছবির অতীত যেন সেদিন কথা বলেছিল। পুরনো দিনের চলচ্চিত্রকার ও শিল্পীদের মুখ দিয়ে। তাঁরা এসেছিলেন নির্বাচিত্রতাব আহ্বানে (উত্তর কলকাতার ২৪-এ রায় বাগান স্ট্রীটের প্রাসাদোপম বাড়ির অঙ্গনে)। আলোচনার বস্তু ছিল : "বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ"। প্রথম যুগের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সে-যুগ ও এ-যুগের মধ্যে যাঁরা সেতু রচনা করেছেন তাঁরাও। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জর একের পর এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী ও চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন। নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। এবং এ-কালের সঙ্গে সে-কালের তুলনা করলেন।

বাঙালীর তৈরি প্রথম নির্বাক ছবি 'বিলাত-ফেরত"-এর পরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডি-জি) বক্তব্য দিয়ে আলোচনা শুরু। তারপর মাইকের সামনে এলেন শ্রীচারু রায়, শ্রীপ্রফুল্ল রায়, শ্রীদেবকীকুমার বসু, শ্রীশশাঙ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তুলসীবাবু), শ্রীহীরেন বসু,

নিউ ইণ্ডিয়া পিকচার্স-এর "প্যাড়" ছবিতে (পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) প্রণতি ভট্টাচার্য ধর্মেন্দ্র ও দিলীপকুমার—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

শ্রীমতী নিভাননী দেবী, শ্রীমতী উমাশশী দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা রায়, শ্রীযতীন দাস, শ্রীজহর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শ্রীমধু শীল, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীরামনারায়ণ দাস ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

সেকাল ও একালের মধ্যে আপনি কী পার্থক্য অনুভব করেন?—এই ছিল প্রশ্নকর্তার প্রধান জিজ্ঞাসা। সবাই যা বললেন তার সারমর্ম হল : পেশাটাই সেদিন বড় ছিল না। কাজের আনন্দই ছিল প্রধান কাম্য। শ্রীপাহাড়ী সান্যাল ছায়াছবির ক্রমবিকাশের কথা বললেন। বললেন, আজ চলচ্চিত্র যে উন্নতি করেছে তা সত্যিই সেদিন ভাবতে পারিনি। কিন্তু সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন, আজকের দিনে শৃঙ্খলার অভাব। উমাশশী দেবী দুই যুগের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিরত থাকলেন, জানালেন। এখন আমার সিনেমা দেখা হয়ে ওঠে না। নিউ থিয়েটার্স-এর প্রথম বাংলা ছবি "দেনা-পাওনা"-র নায়িকা শ্রীমতী নিভাননী জানালেন, এ-পর্যন্ত তিনি মোট ৩৭৫ খানি ছবি দেখেছেন। অভিনয়-কলার প্রতি শ্রীমতী রেণুকা রায় শিশুকাল থেকেই অনুরক্ত ছিলেন। "কবে বড় হব, পার্ট পাব", এই ছিল আমার দিন-রাত্রির ভাবনা।

তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই মনোজ্ঞ। শিক্ষামূলকও বটে। অতীতকে জানার দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন শ্রোতারা। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র (ছোটাইবাবু) ছিলেন আলোচনা-সভার উদ্যোক্তা।

চিত্র-সমালোচনা

লাডলা

বাংলা ছবির মেলোড্রামা নিয়েও এবার বাড়াবাড়ি হল না। "লাডলা" (এ ভি এম) হিন্দীচিত্রের কথা বলছি, "মায়ামৃগ"-র কাহিনী (ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত) যার ভিত্তি। কারণ বোধ হয়, পরিচালক কৃষ্ণানপানজু শুধু "মায়ামৃগ"-র উপর আস্থা রাখতে পারেননি। বক্স-অফিস নামক মায়ামৃগটি ধরবার জন্য রঙের উপর রঙ চড়িয়েছেন, অবাস্তবতার এক অদ্ভুত এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন। এ-ছবির নায়িকা সাবিত্রী তার ছোট বোন সীতার প্রতিজ্ঞার উপর আস্থা রাখতে পারেনি। বিশ বছর পর দুঃস্থ সীতা না আবার নিজের ছেলেকে ফেরত চায় এই আশংকায় সাবিত্রী মরিয়া। মরিয়া বললে ভুল হবে, নিজের ছোট বোনের প্রতি তার আচরণ প্রায় ভিলেনের মত। এদিকে দেখানো হয়েছে দুর্গতের প্রতি সাবিত্রীর দয়ামায়ার শেষ নেই। পাগলোপম কিছু সংখ্যক দুঃস্থকে সে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। তার মধ্যে একটি শিক্ষিতা মেয়ে অবশ্য আছে, যে লাডলা অর্থাৎ দর্শনের (যাকে কেন্দ্র করে দুই বোনের এই নাটক) প্রেমে পড়েছে। যথাবিহিত পরে ওদের বিয়ে হয়েছে। লাডলা শেষে দুজনেরই রইল, মা ও মাসীর, সীতা ও সাবিত্রীর। সীতা ও সাবিত্রী নাম কেন তাও সাবিত্রীর স্বামীর ব্যাখ্যায় বোঝা গেছে। ছবির কৃত্রিমতার আদ্যোপান্ত ফিরিস্তি দিয়ে লাভ নেই। ছবির কিছু নাটকীয় মুহূর্তে যে আবেগ-পিপাসু দর্শকের মন নাড়া দেয়নি সে-কথা বলব না। কিন্তু লোকরঞ্জনের যে সাফল্য এই ছবি পেতে পারত তা প্রায় অনর্জিত।

চিত্রনাট্যের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে শেষাংশে—যেখানে সাবিত্রী প্রায় অপ্রকৃতিস্থ। তার দর্শককে বারে বারে যন্ত্রণা দিয়েছে সাবিত্রী-আশ্রিত এক অস্থিরচিত্ত যুবক। প্রায় পাগলের মতই তার আচরণ। এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জগদীপ (আসলে ইনিই বুঝি পরিচালকের 'লাডলা'—তার সবকিছু যন্ত্রণাদায়ক অভিনয়-পদ্ধতি পরিচালক পরম স্নেহে সহ্য করেছেন মনে হল)। প্রধান চরিত্রে বলরাজ সাহনী, নিরুপা রায় ও পাণ্ডারী বাঈয়ের অভিনয় নাটকোচিত। (নিরুপা রায় অবশ্য

এমন কৃত্রিম চিত্রনাট্য ও চরিত্র সত্ত্বেও অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।) লাডলা সেজেছেন সুধীরকুমার, তার প্রণয়িনী হয়েছেন কুমুদ চুগানি। মনোমোহন কৃষ্ণর (সীতার স্বামী, লাডলা'র পিতা) অভিনয় বেশী নাটকীয়। গান, যদিও সুপ্রযুক্ত নয়, ছবির বিশেষ আকর্ষণ। গানের সুন্দর সুরের জন্য সংগীত পরিচালকদ্বয় লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল দর্শকের সাধুবাদ পাবেন।

নেপথ্যে

অজানা শপথ-এর সেটে ছিলাম কিছুক্ষণ। পাশাপাশি দুটি বাড়ি। জানালা দিয়ে এ-বাড়ির ছেলে ও-বাড়ির মেয়ের সংগে কথা বলছে। ব্যাপারটা রোমান্টিক। মেয়ের ভূমিকায় রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। ছেলেটির চরিত্রে দেখলাম নবাগত সোমেন চক্রবর্তীকে। সুদর্শন, সুঠাম দেহ। কণ্ঠস্বরটিও ভাল। শৌখিন মঞ্চে অভিনয় করেছেন আগে। পরিচালক-কাহিনীকার সলিল সেন বললেন, ভাল কাজ করছে সোমেন। "আকাশ ছোঁয়া" ছবিতে সোমেনের ছোট ভূমিকা আছে। সোমেনের আসল নাম রতন চক্রবর্তী। সিনেমার নাম সোমেন।

"অজানা শপথ"-এর একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে ছবির প্রযোজক দিলীপ সরকার, আলোকচিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়, পরিচালক সলিল সেন ও নবাগত শিল্পী সোমেন চক্রবর্তী ফটো—অমল

পি এ ফিল্মস-এর 'দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা" (পরিচালক : মানু সেন) ছবিতে বেবী গুপ্তা ফটো—দেশ

"অজানা শপথ"-এর নায়ক হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বাকী দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন সোমেন ও দিলীপ রায়। ও'রা তিন বন্ধু। নায়িকা মাধবীকে ছবিতে অনেক সাজে সাজতে হবে। রোমান্টিক নায়িকা, গৃহিণী ইত্যাদি। মাধবীর মেয়ের রূপসজ্জায় কে অভিনয় করবে, এখন ঠিক হয়নি।

ওই চরিত্রের জন্য পনেরো-ষোল বছরের শিল্পী চাই। ক্যামেরার কাজে রয়েছেন বিমল মুখোপাধ্যায়। মাধবীকে নিয়ে বিমলবাবুর এই প্রথম ছবি। সেটে সেদিন প্রযোজক দিলীপ সরকার ছিলেন। পরিচালক সলিল সেনকে (যাঁর "মণিহার" প্ল্যাটিনাম জুবিলী-খ্যাত) বললেন তিনি, আমার প্ল্যাটিনাম কিংবা ডায়মণ্ড জুবিলী চাই না। সিলভার পেরিয়ে গোল্ডেনের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দেবেন তা-হলেই যথেষ্ট।

বাঘিনী-র সেটে দুর্গাকে (সন্ধ্যা রায়) দেখে "গংগা"র পার্মলি পাঁচির কথা মনে পড়ল। "সে ছিল আট বছর আগে। এখন তো বড় হয়েছি। এই বেশে সকলের সামনে এসে দাঁড়াতে একটু অস্বস্তি লাগে বইকি"—বললেন সন্ধ্যা রায়। অন্য যে-কোন শিল্পী হয়ত সেটে বাইরের লোকেও উপস্থিতি সহ্য করতেন না। কিন্তু অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সন্ধ্যা শিষ্টাচার বিসর্জন দেননি। অন্তত প্রথম দুদিনের শুটিংয়ের সময় তো নয়ই। কারণ, সন্ধ্যা জানতেন নিমন্ত্রিত অনেক ব্যক্তি প্রযোজককে শুভেচ্ছা জানাতে আসবেন। অন্যতম প্রযোজক গিরীন্দ্র সিংহ অবশ্য বলেছেন, সন্ধ্যার কাজ যখন থাকবে, তখন বাইরের লোককে সেটে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

আমি যেদিন সেটে গিয়েছিলাম, সেদিন সন্ধ্যা রায় ছাড়া আর ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, মনি শ্রীমানী ও বুবু গংগোপাধ্যায়।

কয়েকটি শট নিলেন পরিচালক বিজয় বসু। ক্যামেরায় ছিলেন দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দুর্গার চরিত্রটি পেয়ে সন্ধ্যা রায় খুশী। এবং নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনও বটে। "এ-ধরনের রোল-এ বেশ কিছু করবার আছে। দেখি কী হয়," বললেন সন্ধ্যা রায়।

রমা গুহঠাকুরতা, বিকাশ রায়, রবি ঘোষ প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন।

গল্প হলেও সত্যি-র হিন্দী চিত্ররূপ তৈরি করছেন হৃষীকেশ মুখার্জি। এই সংবাদ হয়ত অনেকেই জানেন। এই হিন্দী চিত্রে সুস্মিতা সান্যাল একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন জানা গেল।

হিন্দী **সপ্তপদী**-র শুটিং, শোনা যাচ্ছে, অক্টোবরে আরম্ভ হবে। অজয় কর ছবিটি পরিচালনা করবেন। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনয় করবেন। পরিচালক শ্রীকর বললেন, একটি বিশেষ ভূমিকায় মেহমুদকে সম্ভবত নেওয়া হবে। অবশ্য বাংলা ছবির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই হিন্দী "সপ্তপদী" তৈরি হবে। বাংলার রুচি ও শিল্পবোধই সারা ভারতের দর্শককে উপহার দেওয়া হবে—বললেন পরিচালক। নায়ক কৃষ্ণেন্দুর পিতার চরিত্রে (বাংলা ছবিতে যে-ভূমিকায় স্বর্গত ছবি বিশ্বাস অভিনয় করেছিলেন) শিল্পী কে হবেন, তা অবশ্য পরিচালক এখনই বলতে পারছেন না।

সুভাষচন্দ্র-র পর প্রযোজক অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি "ঋষি অরবিন্দ।" পরিচালনা করবেন পীযূষ গুপ্ত।

পরলোকে মণ্টি ক্লিফট

মণ্টগোমেরি ক্লিফট

হলিউডের বিশিষ্ট অভিনেতা মণ্টগোমেরি ক্লিফট কয়েকদিন হল পরলোকগমন করেছেন। নিউ ইয়র্কে নিজের বাসভবনে শিল্পী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

"ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি" ছবিতে অভিনয়ের জন্য মণ্টগোমেরি ক্লিফট অস্কার পেয়েছিলেন। "জাজমেণ্ট অ্যাট নুরেমবার্গ", "সাডেনলি লাস্ট সামার", "দি মিসফিটস্", "ফ্রয়েড" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে অভিনেতার খ্যাতি ছিল। "এ প্লেস ইন দি সান" ছবিতে তিনি এলিজাবেথ টেলরের সহশিল্পী ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "নায়িকা সংবাদ"-এর (পরিচালনা : অগ্রদূত) নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক ফটো—দেশ

বিদেশী ছবি

কুব্রিক ও ত্রুফোর ফিকশ্যান

সিনেমায় "সায়ান্স ফিকশ্যান" আর উপেক্ষিত থাকবে না। এই দশকের শেষের দিকেই এর অভ্যুত্থান শুরু হবে বলে সমালোচকরা মনে করেন। তাঁদের যুক্তিঃ স্টেনলি কুব্রিক ও ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর মত পরিচালকরা এখন "সায়ান্স ফিকশ্যান"-এর প্রতি অনুরক্ত। দুজনেই বর্তমানে ব্রিটিশ স্টুডিওতে তাঁদের "সায়ান্স ফিকশ্যান" তৈরি করছেন।

"সায়ান্স ফিকশ্যান"-এর শ্রেণীবিভাগ আছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটির যে-কোন একটি কাল নিয়ে "সায়ান্স ফিকশ্যান" হতে পারে। মানুষ, দৈত্য ও যন্ত্র—সায়ান্স ফিকশ্যান-এর তিন প্রধান অবলম্বন। আবার টেকনোলজি, সাইকোলজি ও সোসিওলজি—এর যে-কোন একটি বিষয়বস্তু হতে পারে। অবশ্য সংজ্ঞা হিসাবে এই শ্রেণীভেদ যে যথেষ্ট নয় তা কুব্রিক ও ত্রুফোর ছবিতেই প্রতীয়মান।

কুব্রিকের "টু জিরো জিরো ওয়ানঃ এ স্পেস ওডিসে" ছবির ভিত্তি একটি বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী। ছবিটি সম্পর্কে

…কের বক্তব্য : আমার লক্ষ্য, দর্শককে … বিরাট দৃষ্টিবাহিত অভিজ্ঞতার …দার করে তোলা। ক্যুব্রিক ও আর্থার …ক (যিনি চিত্রনাট্য রচনায় সহায়তা …রছিলেন) ছাড়া এই ছবির গল্প আর …ট জানেন না।

ত্রুফোর "ফারেনহাইট ফোর ফিফটি …ান"। ত্রুফো তাঁর ছবি সম্বন্ধে বলেন, …ত্তবয়স্কদের কাছে সব সায়ান্স …কশ্যানই রূপকথার মত। এদিক থেকে …মার ছবি "ইলেকট্রনিক এজ"-এর …টভূমিতে বিন্যস্ত একটি "ফ্যাবল" মনে …বে। দুরকমের সায়ান্স ফিকশ্যান আছে। …কটি পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে, …পরটিতে দেখা যায় অন্য কোন জগতের …যেমন চন্দ্রলোকের। প্রাণী, "রবট" অথবা …মনস্টার"। আমার ছবিটি প্রথম শ্রেণীর। …ই পৃথিবীকে আমরা চিনি, তাতেই সব …কিছু ঘটছে। শুধু সময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কল্পনা বা অনুমানের অবকাশ রয়েছে।

"যে ছবির সেটিং চেনা যায় না, কিংবা চরিত্রদের ওপরেপাবিচয় নির্ণয় করা কঠিন, সেটাই ফ্যান্টাসি। কিন্তু ফ্যান্টাসির মধ্যেও "রিয়ালিটি"-র উপকরণ থাকতে পারে।……বই পোড়ানোর ঘটনা ইতিহাসে আছে। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বই পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই সত্য ঘটনা থেকেই "ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান"-এ বাস্তবের উপাদান এসে গিয়েছে।"

"শীলা" (প রি চা ল না : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সুমন মুখোপাধ্যায়

"বাংলা ছবির প্রথম যুগ" আলোচনা-চক্রে উমাশশী দেবী ও নিভাননী ফটো—দেশ

যে গল্প ত্রুফোর ছবির ভিত্তি তার মূল বক্তব্য একটি উদ্ধৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে : লোককে যদি 'রুলড' কাগজ দেওয়া হয়, তবে অন্যভাবে লেখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "নন-কনফরমিস্ট" ভাবধারা বিনাশের জন্য বই পোড়ানোর রীতি কাগজের মতই পুরানো।

"ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান"-এর নায়ক একজন ফায়ারম্যান। খেয়ালের বশে কিছু বই সে চুরি করেছিল। সে সব পড়ে এবং নন-কনফরমিস্ট এক তরুণীর সাহচর্যে তার মনে নানা চিন্তাধারার সংক্রমণ হয়। তারপর স্ত্রীর কাছে প্রতারিত হয়ে সে পালিয়ে যায় এক অদ্ভুত দেশে। সেখানে সে এমন এক শ্রেণীর মানুষ দেখতে পায় যারা বই মুখস্থ করে এবং স্মৃতির সাহায্যে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে পুরনো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট।

ত্রুফো মূল গল্পটি অনেক সরলভাবে ছবিতে দেখাবেন। ছবিতে নায়কের উপর প্রভাব বিস্তার করবে তরুণী ক্লারিসে, জুলি ক্রিস্টি, বৃদ্ধ অধ্যাপক নয়। কাহিনীকার ক্লারিসেকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পর গল্পে আর থাকতে দেন নি। ত্রুফো চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। ছবির পরিণতিও খুব ভয়াল হবে না, অর্থাৎ আণবিক ধ্বংসলীলা থাকবে না। নায়ক মনটাগের ভূমিকায় অভিনয় করছেন অস্ট্রিয়ার শিল্পী অস্কার ওয়েরনার। ভবিষ্যতের টেলিভিশন কর্মসূচী নিয়ে ছবিতে কিছু কৌতুক-উপকরণ থাকবে। ক্যুব্রিকের ছবি যতটা আড়ম্বরপূর্ণ, ত্রুফোর ছবি ততটা অনাড়ম্বর। একটি ছোট সেটে (মনটাগের ফ্ল্যাট) ছবির ইনডোর শুটিং হচ্ছে। ছবিটি সম্পর্কে ত্রুফোর শেষ কথা :

"If I err, it will be on the side of too great realism".

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

এডিনবরা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে ২১ আগস্ট। "সিলেকশন" কমিটি ছবি দেখছেন গত ১৪ জুলাই থেকে। ভারতের দুটি ছবি এবারকার উৎসবে দেখানো হবে —"একই অঙ্গে এত রূপ" ও "আকাশ কুসুম"। সুইডেন থেকে পাঠানো হয়েছে "ওয়েডিং—সুইডিশ স্টাইল"। পোল্যাণ্ডের ছবি "সিন অব ব্যাটল"।

কার্লোভি ভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন পৃথ্বীরাজ কাপুর। "আসমান মহল"-এ অভিনয়ের জন্য তিনি এই সম্মান পেলেন। গত ১৯ জুলাই কার্লোভি ভ্যারি উৎসব শেষ হয়। প্রাগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উৎসবের সভাপতি এবং চেকোস্লোভাক অ্যাকাডেমি অব আর্টস-এর রেক্টর শ্রী এ এম ব্রোসিলের হাত থেকে পৃথ্বীরাজ কাপুর পুরস্কার গ্রহণ করেন।

যুগোস্লাভিয়ার ছবি "৩ী" কার্লোভি ভ্যারি উৎসবের গ্রাঁ প্রি লাভ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্র গণ্য হয়েছে হাঙ্গেরির "কোল্ড ডেইজ"।

হাঙ্গেরির চলচ্চিত্র

হাওড়া সিনে ক্লাব আগস্ট মাসে হাঙ্গেরির চলচ্চিত্রের এক উৎসবের আয়োজন করেছেন। ১২ আগস্ট থেকে কল্পনা সিনেমায় সাত দিনব্যাপী প্রদর্শনী শুরু হবে। দেখানো হবে : এ গ্লাস অব বিয়ার, হোয়াট এ নাইট, এ সানডে রোমান্স, ফিডলার ডলার-ড্যাডি, মিলিটারি ব্যাণ্ড ও কারেন্ট।

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁহার দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

পথের পাঁচালী ৬·৫০

ও

অপরাজিত

৯৲

যাঁহারা একত্রে এক সেট লইতে-ছেন তাঁহাদের ঐ দুটি গ্রন্থ অনতিরিক্ত মূল্যে একটি সুদৃশ্য বাক্সে দেওয়া হইতেছে

*

ইছামতী ৮৲

অথৈ জল ৫॥

অনুবর্তন ৬৲

বিভূতিবিচিত্রা ১২॥

আরণ্যক ৬৲

দেবযান ৬৲

আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥

অভিযাত্রিক ৫॥

॥ আগামী শারদীয়ার নূতন বই ॥

মহাশ্বেতা দেবীর
সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি

আঁধার মানিক ১২॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ক্লান্ত বিহঙ্গী ১১৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

উপচ্ছায়া ৫৲

বিমল করের

সীমারেখা ৪॥

প্রশান্ত চৌধুরীর

আলোকের বন্দরে ৪॥

প্রফুল্ল রায়ের

মুক্তো ৫৲

প্রভাতদেব সরকারের

মথুরা নগরে ৫॥

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

যতীন্দ্র কাব্যসম্ভার ১২॥

॥ একটি বিচিত্র রচনা ॥

চিত্রগুপ্তের

যদিদং হৃদয়ং মম ৪॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
সর্বশ্রেষ্ঠ হিমালয় ভ্রমণ

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

শঙ্কু মহারাজের

গহন গিরি কন্দরে ৬৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩১৯২ ৩৫ ৮৭৯১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কোন্ মায়া লাগল চোখে?

☑ সমুদ্রসৈকতে বরবর্ণিনীর উত্তোলিত বাহুলতা?

☑ না, অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার?

দুটোই: কারণ, যে মেয়েরা অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করেন, সমুদ্রের ধারে তাঁরা সব সময়ই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন। আজকের দিনে প্রকৃত সুন্দরী হতে গেলে মুখ, হাত, পা, বাহুমূল অবশ্যই হবে লোমকেশহীন-এ তাঁরা জানেন। তাঁদের পছন্দ মৃদু সুরভিত অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার ক্রীম, যার কমনীয় রমণীয় ছোঁয়ায় সমস্ত অবাঞ্ছিত লোম নির্মূল হয়। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই···পোড়া-জলো খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকার ভয় নেই। শুধু একটু ক্রীম বুলিয়ে নেওয়া—ব্যস, দেখতে দেখতে আপনার চামড়ায় আসবে রেশমী চেকনাই। অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করুন। সমুদ্রসৈকতে আপনাকেও তাহলে লোকে চেয়ে চেয়ে দেখবে।

রমণীয় রূপে লোম

নির্মূল করবার ক্রীম

Registered User: Geoffrey Manner & Co. Ltd.

CMGM-9AF BN

প্রচ্ছদ : শ্রীমতী শেফালী দে

শ্রীনিবাস
ও
শ্রী
মধুসূদন
দুটিতে
অভিন্নহৃদয়
... আপনাকে
অভিনন্দন জানাচ্ছে
"ওরলন" থেকে তৈরী শ্রীনিবা...
শাড়ীগুলি চাইবেন।
শ্রী

যুক্তবাঙলার শেষঅধ্যায়

কালীপদ বিশ্বাস । দাম ১৫ টাকা । দাম সচিত্র ২০ টাকা

১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশও মুক্ত হল কিন্তু গোটা বাঙলা নয়—ভাঙ্গা বাঙলা। বাঙলা দেশটা ছিল গঙ্গা আর পদ্মা মিলিয়ে যুক্ত বাঙলা। এখন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত বাঙলা দ্বিখণ্ডিত আর সীমান্ত গান্ধীর পশ্চিম সীমান্তেও পাঠানভূমি নিশ্চিহ্ন। এ-বই সেই নির্মম দ্বিখণ্ডীকরণের ঐতিহাসিক দলিল। যুক্তবাঙলার শেষ অধ্যায়ে কী ঘটেছিল, কারা নেতৃত্ব করেছিলেন, কী তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও লোভ ছিল, কী রূপায়ণে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন এবং পরিণামে কী স্থাপনা করে গেলেন—তারই আদ্যন্ত ইতিহাস। কেনই বা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী চিরকালের জন্য তাঁর মর্মকথা ইতিহাসের পাতায় জুড়ে গেলেন We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of Independence gained at this price is going to be dark. I pray that god may not keep me alive. ভাবীকালের গবেষকের কাজে লাগবে এমন সব অজানা তথ্য, অজ্ঞাত-রহস্য, অমানুষিক চক্রান্ত, অমার্জনীয় অপরাধ কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা যা অপ্রিয়, নিষ্ঠুর কিন্তু সত্য, অত্যন্ত অকপটাহীন ভাষায় এই বইএর পাতায় ছত্রে ছত্রে উদ্ঘাটিত।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা ও জীবনদর্শন

প্রমদারঞ্জন ঘোষ । দাম ১৫ টাকা

১৫ই আগস্ট এই স্মরণীয় দিনটিতে ভারতবর্ষ মুক্তি পেয়েছিল। বিদেশী শাসনের লোহার খাঁচা থেকে। আর এই বিশেষ দিনটিতেই **জন্মেছিলেন এক** মহান পুরুষ, যিনি সমগ্র জাতিকে শক্তি-মন্ত্রে জাগিয়েছিলেন যৌবনে, —চাই-**স্বাধীনতা**; পরবর্তী জীবনে যিনি সমগ্র জাতির আত্মিক জাগরণে করে গেছেন নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান—চাই **'পূর্ণ-মানবতার বিকাশ'**, তিনিই শ্রীঅরবিন্দ,—বহুমুখী তাঁর জীবন। বিপ্লবী কিংবা ঋষি, দার্শনিক কিংবা কবি, দেশপ্রেমিক কিংবা বিশ্বপ্রেমিক, এর কোনটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়,—তিনি যোগী এই তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই যুগমানবের কর্মবহুল ও চিন্তাবহুল জীবনের অন্তরঙ্গ আলেখ্য এই গ্রন্থ — যা বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ।

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ [পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ]

প্রমথনাথ বিশী । দাম ২০ টাকা

১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। ভারত ও বাঙলা দুভাগও হল। বিশ্বের কবি, যুক্তবাঙলার কবি, বাঙালী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল' উপেক্ষিত হল, কিন্তু তাঁর 'জনগণমন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হল। সেই বিশ্বের কবির প্রিয় ছাত্রের রবীন্দ্রনাটকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিসম্পাদিত শ্রেষ্ঠ সমালোচনার বই প্রকাশিত হল। কবি স্বয়ং প্রথমা নাটক প্রসঙ্গে ভূমিকায় লিখেছেন, "আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর রচনা হইতে এই নাট্যকৌতুক ভাবটি আমার মনে অংকুরিত হল।"

শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ও শ্রীমতী সাধনা কর । দাম ১৫ টাকা

ভূমিকা শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, উপাচার্য, বিশ্বভারতী

ডিমাই সাইজের ৫৫৬ পৃষ্ঠায় এই পুস্তকে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত দৈনন্দিন ইতিহাস। ছাতিমতলা হইতে আচার্য নন্দলাল পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়।

রবীন্দ্র কাব্য-পরিক্রমা [চতুর্থ সংস্করণ]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । দাম ২৫ টাকা

গ্রন্থের অনেক অংশ পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে। নানা বিষয়টি লইয়া নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। ডিমাই সাইজ। ৪২৮ পৃষ্ঠা।

প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি

জোড়াদীঘির উদ্বাস্তু

কবি, সমালোচক, নাট্যকার কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক বাক্‌কুশলী, বাংলার খ্যাতি শা'—প্র. না. বি বা প্রমথনাথ বিশী কথাশিল্পী হিসাবে প্রথম সাহিত্য-পাঠকদের চমকে দিয়েছিলেন তাঁর **"জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"** উপন্যাসে। এই উপন্যাসের অসামান্য জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে এবং থাকবেও—তার প্রমাণ সম্প্রতি এই বইটি চলচ্চিত্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে এর চিত্ররূপ আরোপ শুরু হয়ে গিয়েছে। **"চলনবিল"** ও **"অশ্বত্থের অভিশাপ"** এই গ্রন্থেরই পরবর্তী কাহিনী — এই দুটি উপন্যাসও অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্প্রতি বহু পাঠকের অনুরোধে এই তিনটি গ্রন্থ সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে একত্রে প্রকাশ করা হল—**"জোড়াদীঘির উদ্বাস্তু"** নাম দিয়ে। প্রায় একশত বৎসরের পৃষ্ঠপটে, উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত **"চলনবিলের"** পটভূমিকায় এক আশ্চর্য পরিবারে, আশ্চর্য কাহিনী এই গ্রন্থ। দাম্ভিক, বিলাসী, নিষ্ঠুর, প্রেমিক — এই জমিদার বংশের মানুষগুলি আবেগে, মনুষ্যত্বে, দয়ায়, প্রতিহিংসায়, প্রেমে, ঘৃণায়, স্বার্থপরতায় ও আত্মত্যাগে সাধারণ মানুষ থেকে একেবারে পৃথক ও স্বতন্ত্র; তাদের এই কাহিনীও তাই। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠা। ডিমাই সাইজ। **দাম কুড়ি টাকা।** দ্বিতীয় মুদ্রণ।

ডক্টর সুশীল রায়ের সম্পাদিত।

বঙ্গপ্রসঙ্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক **ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত** বলেছেন: ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মনীষা আমাদের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি নূতন দৃষ্টি ও চিন্তা আনয়ন করিয়াছিল মোটামুটিভাবে তাহার একটি সামগ্রিক পরিচয় জানিতে হইলে রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদের মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় লাভ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়াই শ্রীসুশীল রায় মহাশয় "**বঙ্গ প্রসঙ্গ** গ্রন্থখানি সুসম্পাদিতভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। নির্বাচন ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয়ের এই একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল, যাহাতে লেখাগুলির ভিতর দিয়া আমাদের বাঙালী জীবনের সামগ্রিক পরিচয়টি ফুটিয়া ওঠে। তাই রামমোহনের আদিবংশ লেখার পরেই রাসসুন্দরী দেবীর সেকালের গৃহবধূর রেখাচিত্রটি পাইয়া মন খুশী হইয়া ওঠে, সেকালের সেই গৃহবধূটির চিত্রের মধ্যেও ত আমাদের সমাজজীবনের একটি কমনীয় পরিচয় রহিয়াছে। লেখাগুলির মধ্যে যেমন বাংলার ধর্ম শিক্ষা, সমাজ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে, তেমনই আবার বাংলার ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, বাংলার গৌরব, বাংলার দুর্বলতা, বাংলার শিল্প, লিপি, বর্ণমালা—সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোচনা রহিয়াছে। ডিমাই সাইজ। ৩১০+১০ পৃষ্ঠা। **উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্য।** **দাম দশ টাকা মাত্র।**

অশোক প্রকাশন	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি	নিউ বান্ধব পুস্তকালয়
এ-৭, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা ১২	সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা ১২	তমলুক :: মেদিনীপুর

তপস্বী ও তরঙ্গিণী ॥ বুদ্ধদেব বসুর নাটক

একখানি অসামান্য নাট্যগ্রন্থের প্রকাশ

"তপস্বী ও তরঙ্গিণী" একটি চার অঙ্কের দৃশ্যকাব্য। এক অপাপবিদ্ধ তরুণ ঋষি-কুমার এবং স্বর্বধূপ্রতিমা পরম কলাবতী এক বারাঙ্গনার পুরাণোক্ত একটি প্রণয়-কাহিনীকে স্বনামধন্য কবি বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে এক অসামান্য শিল্পরূপ দান করেছেন; সঞ্চার করেছেন এতে আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। এ নাটকের চরিত্রেরা যেন পুরাকালের হয়েও, সমকালের — সর্বকালের।

লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ, দুটি নরনারী, কেমন করে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল — নাটকটির মূল বিষয় হল এই। এক পরম মুহূর্তে একই সঙ্গে জেগে উঠেছিল বহুবল্লভা নায়িকার হৃদয় এবং তপস্বী নায়কের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হয়েছিল পতন আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করেছিল রোমাণ্টিক প্রেম। তারপর বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেমন করে ঘটে-ছিল নায়ক-নায়িকার উদ্বর্তন, কেমন করে তাদের উপলব্ধ হয়েছিল কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা, এ নাটকে এ যুগের অগ্রণী কবি তাই শিল্পিত করেছেন।

কিছুদিন আগে এ নাটকটি "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় পাঠকমহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। এখন পরিবর্তিত ও পরি-বর্ধিত আকারে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হল।

দাম ৩·০০

● সদ্য প্রকাশিত ●

শিবরাম চক্রবর্তীর

ঘরণীর বিকল্প

শিবরাম চক্রবর্তীর নতুন বই "ঘরণীর বিকল্প" সতেরোটি গল্পের অমূল্য এক সংকলন। বলাই বাহুল্য, গল্পগুলি সবই হাসির। নির্মল নিরাবিল প্রাণ-খোলা হাসির এক অবাধ স্রোত যেন মুক্তধারার মত প্রবাহিত প্রত্যেকটি গল্পের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। এর সঙ্গে লেখকের অতুলনীয় নৈপুণ্য মাঝে মাঝে যুক্ত করেছে অপূর্ব 'পান'-এর, যা সোনায় মেশানো সোহাগার মত উজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়েছে গল্পগুলির, কৌতুকরসকে আরও জারিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগের দুর্লভ এক সুযোগ এনে দিয়েছে।

দাম ৩·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রেমের চেয়ে বড়

বাংলা কথাসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অবদান সংখ্যায় অল্প হলেও গুণে তুচ্ছ নয়, বরঞ্চ অবিস্মরণীয়। এই পরিমিত সৃষ্টির জন্যে তাই যথার্থ সাহিত্যানু-রাগীদের কাছে শ্রদ্ধার আসনে অভি-ষিক্ত; এবং তাঁর রচনাগুলিও যথোচিত সমাদৃত। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বিরাট উপন্যাস "প্রেমের চেয়ে বড়" সুদীর্ঘ একটি কাহিনীই শুধু নয়, উপরন্তু তারও অতিরিক্ত এমন কিছু যা পাঠকের চিন্তাধারাকে নতুন পথের সন্ধান দেবে এবং নতুন খোরাক যোগাবে পাঠকের মননশীলতার।

দাম ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

দেশ

৩৩ বর্ষ ॥ ৪৪ সংখ্যা

শনিবার ১৭ ভাদ্র ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৪৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক "	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক "	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক "	২৩.০০
ত্রৈমাসিক "	১১.৫০

[illegible]
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
[illegible] বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH
Saturday, Sept. 3, 1966

শিক্ষার অবস্থা

ইদানীং আমাদের শিক্ষাজগতের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, বিদ্যার্জন জিনিসটা নেহাতই ফালতু, ওটা হলেও চলে না হলেও বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। দিব্য দৃষ্টিতে অন্যে কি দেখছেন জানি না, কিন্তু আমরা তো দেখছি ওটা শিকেয় ঝুলিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেই পরম নিশ্চিন্তে বসে আছেন। কী আসে যায় স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলে! থাকুক বন্ধ।

চলতি বছরের আট মাসের হিসেব করে দেখছি, ছুটিছাটা, ধর্মঘট, আন্দোলন, প্রতিবাদ-দিবস ইত্যাদি করে সাকুল্যে তিনটি মাসও ছেলেদের স্কুল-কলেজে যেতে হয়নি। এই হিসেবটা হয়ত কারও কারও পছন্দ হবে না। উনিশ-বিশ হলেও হতে পারে, তবে হিসেবে খুব একটা ভুল নেই। বছরের আর চারটি মাস মাত্র বাকি, তার মধ্যে রয়েছে পুজোর ছুটি, ডিসেম্বর মাসটা স্কুলের বেলায় বাদ দিলেও ক্ষতি নেই। অর্থাৎ গড়পড়তা সারা বছরে পাঁচ ছ মাস স্কুল-কলেজ বসে, পড়াশোনা কী হয় তা ঈশ্বরই জানেন। শুনি ছাত্রদের পড়াশোনা না হওয়ায় তাদের পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্যে সহানুভূতির দৃষ্টিতে খাতা দেখা এবং গ্রেস মার্কস দেওয়া নাকি রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো সময়ে দশ পনেরো নম্বর পর্যন্ত 'গ্রেস' দেওয়া হয়। সব চেয়ে ভাল হত, যদি স্কুল কলেজ বন্ধ রেখে গ্রেস দিয়েই এদের সমস্ত পরীক্ষাতেই পাশ করিয়ে দেওয়া হত। ঝঞ্ঝাট চুকত।

আপাতত স্কুলের ছাত্রদের 'ভিয়েতনাম দিবস' করা শেষ হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের জন্যে তারা হাঁ করে বসে আছে; কলেজ এখন বন্ধ—কলেজ কর্মচারীদের ধর্মঘট চলছে, প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি দিবস চলছিল, আপাতত তা মোড় ঘুরেছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষকদেরই কোনো না কোনো রকম আন্দোলনে নামবার কথা, সমবেত ভাবেও তাঁরা নামতে পারেন, নামলে আশ্চর্য হব না।

কলেজ কর্মচারীদের অবস্থান ধর্মঘটের কথা ধরা যাক। সকলেই জানেন এই সময়টি কলেজের ছাত্রদের পক্ষে শুয়ে বসে কাটাবার সময় নয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষভাবে পড়ার চাপ থাকে এখন, বিশেষত অনার্সের ছাত্রদের, কলেজ বন্ধ থাকায় তাদের ক্ষতি কিছু কম হচ্ছে না। প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সের ছাত্রদের এখন পর্যন্ত একটিও ক্লাস হল না, অথচ জানুয়ারির মধ্যে তালিকাভুক্ত গন্ধমাদন পাঠ্য শেষ করে টেস্ট পরীক্ষায় বসতে হবে। এদের পাঠ্য বিষয়, কিছু কম নয়, মোটামুটি আশি নব্বইটি দিন তাদের হাতে, অথচ এ যাবৎ একটি দিনও কলেজ হয় নি। সামনে পুজোর ছুটি। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদেরও অবস্থা সমান, তারাও এখন পর্যন্ত হাঁ করে বসে আছে। এই তো অবস্থা। এর সঙ্গে রয়েছে বিবিধ আশংকা, আগামী সেপ্টেম্বরে আন্দোলনের হুমকি, তার সঙ্গে সম্প্রতি যোগ হয়েছে অধ্যাপকদের আন্দোলনের সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ নিতান্ত যদি ভাগ্য প্রসন্ন না হয় তবে আগামী দুটি মাসে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা হবে বলেও মনে হয় না।

শিক্ষাজগতের এই অরাজকতা এখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। অকারণ আমরা ভাবি, বস্তুত কোনো পক্ষেরই গা নেই। সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টাও তেমন দেখি না। ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন সারা বছর ধরে লেগেই আছে। বোধ করি লেগেও থাকবে। আপাতদৃষ্টিতে যা সরল তার মধ্যে যে কোনো জটিলতা নেই এমন কথাই বা বলি কি করে?

এর চেয়ে, মাঝে মাঝে মনে হয়, যা হবার শেষ-বেশ একটা কিছু হয়ে যাক, শিক্ষার নামে এই প্রহসনে লাভ কি। যেখানে সরকারের গরজ নেই, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও তেমন কোনো দায়দায়িত্ব বোধ নেই সেখানে দফায় দফায় একটা সাময়িক মিটমাট করে চলার চেয়ে শিক্ষার পাট বন্ধ থাকাই ভাল। এখন যা চলছে তাতে কোনো পক্ষেরই লাভ হচ্ছে না। বরং এই ডামাডোলে সবদিক দিয়েই ক্ষতি হচ্ছে ছাত্রদের।

অভিভাবকদের পক্ষ থেকে এখন একটা বিরক্তির ভাব এসেছে। তাঁরা মনে করেন, স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়ে পাঠানো মানে খাতায় শুধু নামটা লিখিয়ে রাখা, আর মাসে মাসে মাইনে গোনা; শেষাবধি সেই পরীক্ষার আগে ভাগে টিউটোরিয়ালে পাঠানো। টিউটোরিয়ালে আর যাই হোক ধর্মঘট আন্দোলন অন্তত হয় না। ওটা স্কুল-কলেজেই হয়।

কথা দিয়ে কথা কাটার খেলা

ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির বর্তমান স্বরূপ কী অথবা আদৌ কোনো সুপরিকল্পিত নীতি আছে কিনা, যদি থাকে তবে সেটা সুপরিচালিত হচ্ছে কিনা, তার গতি কোনদিকে, সেই গতির নিয়ন্ত্রণ কতখানি পরিচালকদের আয়ত্তাধীন, কতখানি বাহ্য অবস্থার চাপে তাঁরা ভেসে চলেছেন—এ সব প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর আজ কে দেবে? সাধারণ মানুষের পক্ষে কিছু বোঝাই কঠিন। সাধারণ মানুষকে বছরের পর বছর ধরে কেবল কতকগুলো কথাই শোনানো হয়েছে, যেন বাক্যের মনোহারিত্বের দ্বারা তাদের মুগ্ধ করে রাখাই ছিল তাদের পলিটিক্যাল শিক্ষাদানের চরম লক্ষ্য। বাক্যের পশ্চাতে কী বস্তু আছে, তার বিচার করার আগ্রহ বা শক্তি জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত করার চেষ্টা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকা হয়েছে। কালিদাস পার্বতী এবং পরমেশ্বরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের তুলনা করেছেন বাক্ এবং অর্থের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ তার সঙ্গে। আজকাল বড় পলিটিশিয়ানদের বাক্য শুনলে মহাকবি নিশ্চয়ই এরূপ তুলনা করতে ভরসা পেতেন না, কারণ অনেকক্ষেত্রেই পলিটিশিয়ানদের বাক্য এবং তার অর্থের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যায় তাতে পার্বতী যদি "বাক্" এবং পরমেশ্বর "অর্থ" হন তবে বুঝতে হবে যে, তাঁরা একজন উত্তর মেরুতে বাস করেন এবং অন্য জন দক্ষিণ মেরুতে।

বাক্যারণ্যে পথহারা সাধারণ মানুষ তাই যখন কোনো বুলি মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হতে শোনে তখন তাকে আশ্রয় করতে চায়, বুঝুক না বুঝুক ভাবে তার মধ্যে কোনো বস্তু আছে। "নন্-অ্যালাইন্মেন্ট" "পঞ্চশীল" এই রকমের মন্ত্র। "তাসখন্দ"কেও একটা মন্ত্র বানাবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সেটা আঁতুড়েই মারা গেল মনে হচ্ছে। "পঞ্চশীল" বছর কয়েক বেঁচে ছিল—যতদিন তার ফাঁকিটা চীনাদের কাজে লেগেছিল। "নন্-অ্যালাইন্মেন্ট" এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত হয় নি, কিন্তু বিশেষ ঠেকায় না পড়লে বড় একটা তার খোঁজ পড়ে না। আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়া যখন উভয়কেই পীতাতঙ্ক রোগে ধরেছে এবং পাক্-চৈনিক অ্যাগ্রেশন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ভারত সরকার যখন উত্তরোত্তর রুশ-মার্কিন সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছেন তখন "নন্-অ্যালাইন্মেন্টকে" সভায় বার করতে হলে তার খোল-নলচে বদলে বার করতে হয়। তাও পূর্বপুরুষদের সম্মানার্থে কখনো কখনো করতে হয়, যেমন প্রধানমন্ত্রী মহাশয়াকে কয়েকদিন আগে করতে হল। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতিতে "নন্-অ্যালাইন্মেন্ট" তত্ত্ব এখন কতখানি আছে—জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী ইন্দিরা বলেন যে, ভারত সরকারের "নন্-অ্যালাইন্মেন্ট"-এর ভিত্ এখনো বহাল আছে, শুধু তাই নয় আমাদের আরো গৌরবের কথা পৃথিবীতে "নন্-অ্যালাইন্ড্" দেশের সংখ্যা আগে যা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে। কেনো কোনো আধুনিক ব্রাহ্মকে এই বলে সন্তোষ (বা সান্ত্বনা) লাভ করতে শুনেছি যে, ব্রাহ্ম সমাজের পরিধি না বাড়ার জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ, ব্রাহ্মসমাজ যা চেয়েছিলেন হিন্দুসমাজ সেইভাবে সংস্কৃত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মসমাজের সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্বন্ধে কোনো প্রকার সংশয় প্রকাশ না করেও কিন্তু এ প্রশ্ন করা যেতে পারে—সেকালের ব্রাহ্মনায়কগণ যদি বর্তমান ভারতবর্ষে ফিরে আসেন তবে দেশের সামাজিক পরিস্থিতি দেখে কি তাঁরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাববেন তাঁরা যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে? ("গোরা"র পানুবাবুর কথা ছেড়ে দি।) তেমনি "নন্-অ্যালাইন্মেন্ট" মন্ত্রের উদ্গাতা স্বয়ং নেহরুজী যদি আজ ফিরে আসেন তা হলে কি তিনি বলতে পারবেন, "আহা, বেশ! দেখছি যেমনটি চেয়েছিলাম হয়েছে কেবল ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে এশিয়ায় এবং আফ্রিকায়?"

দোষ "নন্-অ্যালাইনমেন্ট"-এর নয়, শব্দটা অভাবাত্মক, নেতিবাচক। গলদ যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এর পরিপূরক ভাবাত্মক কোনো দৃঢ়মূল সৃষ্টিকর্মের প্রোগ্রাম আমরা অনুসরণ করতে পারি নি। সুতরাং বিপরীত ফল ফলেছে, যাদের সঙ্গে "অ্যালাইন্ড্" হব না বলেছি ক্রমশ তাদের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। কোনো লোক যদি বলে যে, গ্রামের সুদখোর মহাজন বা কাবুলিওয়ালা কারো সঙ্গেই আমি "অ্যালাইন্ড্" নই, আর দুজনের কাছ থেকেই ধার করে তবে তার যে দশা হয় আমাদেরও হয়েছে তাই।

শ্রীমতী ইন্দিরার হয়েছে বিপদ। তিনি যদি বলেন যে, দেশের অবস্থা বা প্রয়োজন অনুসারে তিনি নূতন পলিসি নিতে দ্বিধা করবেন না বা করছেন না তখন একদল তাঁর সাহসের এবং "রিয়ালিজম্"-এর বাহবা দেন আর একদল রেগে ওঠে, বলে, নেহরু-নীতি থেকে ভারত সরকার ভ্রষ্ট হচ্ছেন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কখনো কখনো তিনি বলেন যে, নেহরুজীর প্রধান গুণ ছিল "ডাইনামিজ্ম্", চলবার এবং দরকার হলে নূতন পথে চলার শক্তি, তাঁর "ডগ্‌মাটিজ্ম্" ছিল না। কিন্তু এ সব কেবল কথা দিয়ে কথা কাটার খেলা, এর সঙ্গে বস্তুগত বিচারের কোনো সম্পর্ক নেই।

আরো বিপদ এবং এটাই হচ্ছে দেশের আসল বিপদ যে, যাঁরা খুশী বা অখুশী হন তাঁদেরও রাগ বা বিরাগ বিদেশীর মনোভাবের প্রতিবিম্ব। শ্রীমতী ইন্দিরার কোনো কথায় বা কাজে যদি আমেরিকা আনন্দ প্রকাশ করে তবে তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিরক্ত হবে ধরে নিয়ে এখানকার সোভিয়েটদরদীরা ক্ষেপে ওঠেন। আমেরিকা নেহরু নীতি পছন্দ করত না সুতরাং আমেরিকা যাতে খুশী হচ্ছে সেটাই নেহরু নীতি থেকে ভ্রষ্টাচার। বলা বাহুল্য, নেহরু নীতি এখানে একটা "সিম্বল্" মাত্র, তার ভিতরের পদার্থ কী ছিল, কী ছিল না তার বিচার অবান্তর। অন্যদিকে মার্কিন-দরদী-

দেরও অনরূপ ভাব—অর্থাৎ উল্টোদিকে অনরূপ ভাব তবে তার প্রকাশটা কিঞ্চিৎ চাপা। মোটের উপর কি সরকার, কি তাদের বেসরকারী সমর্থক বা সমালোচক সকলেই বিদেশের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভর হতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হবার শক্তি তার আছে, এ বিশ্বাস কারুরই নেই, এটা বিশ্বাস করার এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার আস্থাই কারো নেই।

হয়তো "নন্-অ্যালাইনমেন্ট"ই ঠিক নীতি ছিল, কিন্তু গোড়া থেকেই একটা মেকি রূপে আমরা তার ভজনা করেছি। তার ফলে দেশ আত্মাভিমুখী হয়নি, দেশ বাইরের দিকে দোমুখী হয়েছে, আত্মশক্তিও জাগ্রত বা সংহত হবার অবকাশ পায় নি। আমরা যেভাবে নন্-অ্যালাইনমেন্ট নীতির ভজনা করেছি, আমাদের বর্তমান অবস্থা তাকে উপহাস করছে। যে চীনকে আমরা চির বন্ধু বলে ধরে নিয়েছিলাম, সেই চীন এবং যে পাকিস্তান মার্কিন সামরিক সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে সেই পাকিস্তান আজ একজোট হয়ে ভারতকে আঘাত করার জন্যে উদ্যত আর সেজন্যে আমেরিকা যে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের প্রতি বিন্দুমাত্র অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার, সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে নিকটে টানবার চেষ্টা করছে। আর কতকাল আমরা বিদেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকব?

২১।৮।৬৬

জ্যোতি বসু সেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনছেন

হুমায়ুন কবির কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না।

'কে নিবি গো
কিনে আমায়-'

নিলাম
হইবে-

লোকসভার বিতর্কে সুব্রহ্মণ্যম এবার কলঙ্কমুক্ত হলেন।

তবে ধোলাইটা ভালোই
হয়েছে।'

'পঞ্চম অশ্বারোহী'

হিরোশিমায় বোমা পড়বার কুড়ি বৎসর পূর্ণ হল। নাগাসাকিরও একই স্মৃতি। এর মধ্যে আমরা অনেক বিবরণ পড়েছি, ফিল্ম দেখেছি, আতঙ্কে শিউরে উঠেছি, পৃথিবীর দেশে দেশে এই অমানুষিক অপরাধের বিরুদ্ধে কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিবাদ তুলেছি, আকাশে মুঠো তুলে বলেছি, জীবনের কাছে এক বিন্দু দাম্ও যদি আমাদের থাকে, তা হলে এই বর্বর অপরাধের পুনরাবৃত্তি আর ঘটতে দেব না।

আমরা বলেছি, আমরা প্রতিবাদ করেছি, আর তারই পাশাপাশি চলেছে পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। একটির পর একটি বিস্ফোরণে সমুদ্রের জল বিষাক্ত হয়ে গেছে, আকাশের মেঘ বৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়েছে মৃত্যুর বীজ, প্রশান্ত সাগরের দ্বীপে দ্বীপে নিশ্চিন্ত মানুষগুলি জানতেও পারেনি তার জলে-ফসলে-বাতাসে তেজস্ক্রিয়ার গুপ্ত হত্যা তিলে তিলে ঘনিয়ে আসছে।

শান্তিকামনা? অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরোধ? আতঙ্কের শেষ চূড়োয় দাঁড়িয়ে শান্তির পরম সঙ্গীত? আমি জানি না। রব শুনতে পাচ্ছি, আত্মরক্ষার জন্যে ভারতবর্ষকেও পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে হবে। হতে পারে—আমি রাজনৈতিক নই। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের শেষ স্তরে—হিস্টিরিয়ার উৎক্ষেপে, যদি কখনো দু-এক কোটি মানুষকে পরমাণু বোমার শিকার হতে হয়—তা হলে আমি জানি—আমার ইতিহাসও সেই মুহূর্তেই লেখা হয়ে যাবে।

আমি ভাবছি সেই ইতিহাসের পরিশিষ্টের কথা।

খ্রীষ্টধর্মের ভৈরব সন্ন্যাসী সেণ্ট জন চার অশ্বারোহীর কথা ভেবেছিলেন। "দা ফোর অ্যাপোক্যালিপটিক হর্সমেন!" কিন্তু পঞ্চম অশ্বারোহীকে তিনি দেখতে পাননি। দেখতে পায়নি 'চার অশ্বারোহী'র অন্যতম ঐতিহাসিক নেতা আত্তিলা পর্যন্ত—দেখলে যুদ্ধ-দেবতার রক্তমাখা তলোয়ার
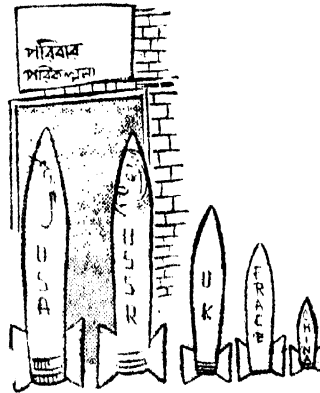
তারও হাত থেকে খসে পড়ুক।

কাগজে আবার হিরোশিমার টুকরো টুকরো খবর পড়তে এই 'পঞ্চম অশ্বারোহী'কে চোখে পড়ল।

মানুষটির হাতে একটা ক্ষতচিহ্ন। কিসের দাগ? নিরীহ প্রশ্নটা শোনবার

শত বর্ষ পরে

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ শাদা হয়ে উঠল। ফিসফিস করে বললে, 'কিছু না—কিছু না—একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট।' মিথ্যে কথা বলল সে। যদি হোটেলের মানুষগুলো জানতে পারে যে, ওটা হিরোশিমার স্মারক, তাহলে অস্পৃশ্যের মতো বর্জন করবে তাকে। সে মূর্তিমান প্লেগ—'টাইফয়েড-মেরী'র চাইতেও হাজারগুণে মারাত্মক।

কুড়ি বছর ধরে পলে পলে মৃত্যু তো আছেই। কিন্তু সেই তারা? আজ যাদের কুড়ি বৎসর বয়েস? যে বয়েসে পৃথিবীকে সব চাইতে ভালোবাসবার সময়, যখন শিরা-ধমনীতে উতরোল প্রথম যৌবন, যখন সব দুঃখকে জয় করবার—সব কালের বল্‌গাকে লোহার মুঠোয় আঁকড়ে ধরবার দিন, যখন প্রেম তার সোনার চাবিটি প্রথম হাতে তুলে দেয়, সেই বয়েসের তরুণ তরুর মতো নরনারী?

তাদের একমাত্র অপরাধ—হিরোশিমা-নাগাসাকির সেই বিস্ফোরণের সময় তারা ছিল মায়ের গর্ভে। সেই মায়েরা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুতে মুক্তি পায়নি—মারণ-বিষে জর্জরিত হয়ে আরো কিছুকাল বেঁচে থেকেছে—হয়তো আজও

বেঁচে আছে অপচয়ের মতো। এই তরুণ-তরুণীরা সেই সব মায়েদের সন্তান। পৃথিবীর সব চেয়ে নিবিড় মমতার নিভৃত কেন্দ্রে—পরমতম আত্মত্যাগের লগ্নে—সূর্যোদয়ের দেশটিতে যারা অরুণালোকে চোখ মেলবার অপেক্ষায় ছিল, তারা জন্ম নিয়েছে বিষপুত্তলী হয়ে।

আজ কুড়ি বছর বয়সে—ভালোবাসবার এবং জয় করবার দিনে, জন্মপূর্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে তারা; কাবুকি নাচের আসর তাদের কাছে বর্ণহীন, দিকে দিকে যখন চেরীফুলের পাগল করা ডাক—তখন তাদের চোখ অন্ধকার, শিন্টো উৎসবের রঙিন ফানুসগুলো তাদের কাছে কোনো অর্থই বহন করে না। আধিব্যাধিহীন সুস্থ সবল মা-বাপের তারা সন্তান—কিন্তু শরীরের কোষে কোষে, রক্তের কণায় কণায় তাদের বিষ ছাড়া আর কিছুই নেই।

'পঞ্চম অশ্বারোহী'কে দেখতে পাচ্ছি। ভাবছি, কোন্ শয়তানের কামারশালায় তৈরি হয়েছিল তার তলোয়ার। দেখা দিক হিস্টিরিয়ার উৎক্ষেপ, বিদীর্ণ হোক আরো দু একটা পরমাণু বোমা, তারপর অভিশপ্ত বাপ-মায়ের বীজে-ডিম্বে অসঞ্চিত তার পরিণামের জন্যে প্রস্তুত হোক, অজাত-ভ্রূণ মৃত্যুর তীরে বিদ্ধ হোক. নবজাতক নরকের অন্ধকারে চোখ মেলুক। বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়, কাব্য নয়, শেষে 'তন্ত্র' না, এই পঞ্চম অশ্বারোহীই ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর সম্রাট হয়ে বসুক!

লিখতে লিখতে নিজেরই খারাপ লাগছিল। কলম বন্ধ করে খানিকটা আত্মস্থ হওয়ার জন্যে যা-খুশি একটা পুরোনো পত্রিকা টেনে নেওয়া গেল।

এই ব্যাপারটা আগেও পড়েছি—আজ যেন নতুন করে চোখে পড়ল। একটি মিশরীয় মমির গাত্রাচ্ছাদন পরীক্ষা করছিলেন একজন ঈজিপ্টোলজিস্ট। কোনো ফারাও-পুরোহিত-সামন্তের মমি নয়—নিতান্তই একটি সাধারণ মানুষের। সত্তর দিনের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় নয়, মধু-মশলা-সুগন্ধির সমারোহে নয়, নিছক লবণ দিয়ে শুকিয়ে বিটুমেনের সাহায্যে মমি করা হয়েছে। দামি কাপড়ের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে কিছু কাগজ—অর্থাৎ যা হাতের কাছে পাওয়া গেছে, তাই।

কিন্তু কী এ কাগজ? এক আধটু লেখা যেন পড়া যায়? এ যে গ্রীক অক্ষর! কিছুই অসম্ভব নয়, একদা প্রাচীন মিশরে গ্রীক ভাষা এবং সাহিত্যের প্রসার ঘটেছিল।

কাগজগুলো পরিষ্কার করতে করতে দেখা দিল এক পরম বিস্ময়। এতো কতগুলো এলোপাথাড়ি বাজে কাগজের ব্যাণ্ডেজ নয়। এ যে একখানা সম্পূর্ণ বই—পরিচিত গ্রীক কবির এক অপরিচিত কাব্য! প্রেমে, বীরত্বে বেদনায় এক মনোরম কাহিনী—শুধু শেষের সামান্য একটু অংশ মাত্র নেই—বোধ হয় শবাচ্ছাদনের জন্যে সে পাতাগুলোর আর দরকার হয়নি।

কে জানে, কতকাল আগেকার কোনো দরিদ্র বুদ্ধিজীবীর ওইটিই সব চাইতে প্রিয় গ্রন্থ ছিল হয়তো! তাই মৃত্যুতে ওই তার অঙ্গাবরণ। ওইটিই তার শেষের সহযাত্রী।

মিশরীয় বিদ্যাবিশারদ আশা ছাড়েন নি। তিনি এখনো বাকীটুকু খুঁজছেন। পত্রিকাটা পুরোনো, জানি না, শেষটুকু তিনি এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন কিনা।

তবু হিরোশিমা-বিষাদ মনের ভেতর একটা আলো জ্বলে উঠল আমার। শুধু মৃত্যুকেই আমরা সব মিটিয়ে দিই না, তার কাছ থেকে ফিরিয়েও আনতে পারি। আনতে পারি হারানো কাব্যকে, প্রেমকে, চিরকালের জীবনকে। মৃত্যুরও একটা দক্ষিণ হস্ত আছে—নিশ্চয় আছে।

রূপকের মতো শোনাচ্ছে? মনে হচ্ছে সেন্টিমেণ্টাল? তা হবে। কিন্তু আমার চেতনার মধ্য থেকে সাড়া জাগছে—'পঞ্চম অশ্বারোহী'ই শেষ কথা নয়।

না।

(২১১৬এ)

তাও কি হয়

বিষ্ণু দে

রাতের ভোর নেই, তাও কি হয়?
রাহুর গ্রাস কবে আমরণ?
অথচ তাই শুনি জীবনময়,
অসহ তাই দেখি প্রতিটি দিন।
মরণ যদি সাজে অন্তহীন,
নানান্ ভোলে নানা আভরণ
নিলাজ পরে রোজ বিশ্বময়,

তা হলে, আর কবে, কবি, তোমার
বিভাসে ভ'রে দেবে পূরবীকে,
গাইবে রাঙা আলো পাহাড়পার
সাগরে রং হেনে দশ দিকে
ঘুম ও জাগা এ'কে প্রতিটি দিন?
বাংলা শ্রাবণের শূন্যে তন্ময়
উদয় অস্তের একই সে কবিকে

একই সে জিজ্ঞাসা বারংবার,
প্রভাতে সন্ধ্যায় বিশ্বময়
একই সে জিজ্ঞাসা—বা হাহাকার ॥

পজিটিভ নেগেটিভ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

একদিন আমার ভয়ংকর সব ভবিষ্যদ্বাণী
পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি,
পৃথিবী ভয়ে ঠকঠক করে কেঁপেছে।

আমার অভিসম্পাতে
নারীর গর্ভ কুঁকড়ে শুকিয়ে গেছে,
উঠোনের জলপাই গাছ বিনা বজ্রপাতে পুড়ে ছাই হয়েছে,
বিনা ভূকম্পে তিন পুরুষের খিলান কোমরের ধনেসির মতো
খুলে পড়ে গেছে।

আমার ভয়ংকর দিব্য দৃষ্টিতে
আগামী শবগুলি মানুষের ঘুমের মধ্যে উঠে এসেছে,
আলিঙ্গনের জোড়গুলি কড়কড় শব্দে ফেটে ছিটকে পড়েছে
এবং মা দুধে ভাতের সন্তানকে না দেখে না দেখে অন্ধ হয়ে
গেছেন।

সেইসব ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী এখন
পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে।
আমি সন্ত্রস্ত।
এখন ভয়গুলি নারীর গর্ভকে রেহাই দিয়ে, জলপাই গাছের
ডালপালা থেকে নেমে,
আলিঙ্গনের জোড়গুলি আবার স্ক্রু দিয়ে আটকিয়ে
অমোঘ, আমার দিকে।

যেন বিদ্যুতের নীচে এক আর্ত জলপাই গাছ আমি
নিজের শাখাগুলিই খুঁজে পাচ্ছি না,
ভয়ে কাঁপছি।

সার্গেই এসেনিন

আমার মা-কে লেখা চিঠি

বুড়ি, তুমি কি এখনো বেঁচে রয়েছো?
আমিও বেঁচে আছি। আমি তোমায় ভালোবাসি।
আমি তোমায় আশীর্বাদ করি তোমার ছোট্ট ঐ বাড়িতে
বাণীর অতীত সায়াহ্নের আলোক ঝরে পড়ুক।
লোকে আমায় চিঠি লিখেছে, তোমার চোখে মুখে
—যদিও খুব লুকোতে চাও,—উৎকণ্ঠা, ভয়
আমার জন্য, আমার জন্য, অধীর প্রতীক্ষায়
তোমার নাকি জীবন কাটে? বেরিয়ে এসে পথে
পুরোনো কাঁথা শরীরে মুড়ে আমার জন্য
তাকিয়ে থাকো দূরে?
কখনো বুঝি সন্দেবেলা নীল অন্ধকারে
হৃদয় কাঁপে আশঙ্কায়, প্রতিদিনের একই আশঙ্কায়
সরাইখানার মারামারিতে এই বুঝি কেউ আমার
বুকের মধ্যে ধারালো একটা ছুরি বসিয়ে দিল।
বুড়ি, আমার মামনি, তুমি ভয় করো না, এসব
কিছু না, এ তো শুধুই ঘূর্ণী, মায়ার খেলা।
আমি কি এমন পাঁড় মাতাল হয়ে গিয়েছি, ভাবো?
তোমায় শেষ দেখার আগেই হঠাৎ মরে যাবো?
আমি তোমার আগের মতই ভালোবাসায় আছি
এবং আমার দিবস জুড়ে একটি মাত্র স্বপ্ন
কখন আমি অস্থিরতা, দুঃখ ছিঁড়ে বেরিয়ে
তোমার কাছে গ্রামের সেই বাড়িতে ফিরে যাবো।
ফিরবো আমি, যেদিন তোমার ছোট্ট সাদা বাগান
বসন্তের অনুকরণে ছড়াবে বহু শাখা
তখন যেন খুব সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দিওনা তুমি আমার
যেমন তোমার স্বভাব ছিল আট বছর আগে।
যে সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে তাদের জাগিয়ো না
যে সব সাধ সত্য হয়নি, তাদের ছুঁয়ে কি লাভ!
আমার এই নিয়তি ছিল, এমন দুঃখ পাওয়া
জীবন আমার শুরুই হলো যন্ত্রণার দিনে।
আমাকে তুমি বলো না আর প্রার্থনার মন্ত্র,
অতীত কালে ফেরা অসম্ভব। আর বলো না,
তুমিই শুধু একা আমার সাহায্য ও শান্তি
তুমিই শুধু আমার কাছে বাণীর অতীত আলো।
আমার জন্য অমন আর ভাবনা করবে না তো?
অমন করে থেকো না আর আমার প্রতীক্ষায়
দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে পথের দিকে চেয়ে
পুরোনো কাঁথা শরীরে মুড়ে দাঁড়িয়োনা আর তুমি।

শেষ কবিতা

হে বন্ধু, বিদায়
প্রিয় বন্ধু, তুমি আছো আমার হৃদয়ে......
আমাদের পূর্বনির্ধারিত এই বিদায় মুহূর্তে
ধরে আছে ভবিষ্যতে দেখার শপথ।
বিদায়, হে বন্ধু, কোনো কথা নেই, হাতে নেই হাত
দুঃখিত হয়োনা, শোকে বাঁকিয়ো না ভুরু
এ জীবনে মৃত্যুর ভিতরে কোনো নতুনত্ব নেই
অবশ্য একথা ঠিক, বেঁচে থাকা খানিকটা অভিনব বটে।

[যদিও মা-কে লেখা চিঠিতে এসেনিন বলেছিলেন, আমি সে-রকম বদ্ধ মাতাল হইনি যে তোমার সঙ্গে দেখা না করে হঠাৎ মরে যাবো—কিন্তু তিনি কথা রাখেন নি। এলোমেলো দুর্দান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন এসেনিন, হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বিয়ে করলেন ইসাডোরা ডানকানকে। কিন্তু শিল্পের সৃষ্টি ও মানুষের জীবনকে ধ্বংস করার জন্যই তো ওসব নারীর জন্ম। সারা পৃথিবীকে তখন অকপট সৌন্দর্যের স্পন্দনে কাঁপিয়ে দিয়েছিল যে নারী, তাকে বিয়ে করলো এক সাতাশ বছরের কবি। ইসাডোরার বয়েস তখন ৪০ পার এবং অন্তত ৪০ জন পুরুষকে নিভৃতে দেখেছেন। সেই বিবাহ বন্ধন টিঁকে ছিল মাত্র দেড় বছর। এর পর থেকে এসেনিন, অবিরাম মদ্যপান শুরু করেন, জীবন যাত্রার সমস্ত নিয়ম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারপর একদিন লেনিনগ্রাডের এক হোটেলে হাতের শিরা কেটে ফেললেন। নিজের হাত থেকে বেরিয়ে আসা ফোয়ারার মতন রক্তধারায় কলম ডুবিয়ে লিখলেন শেষ কবিতা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। তখন কবির বয়েস মাত্র ৩০, তখন ১৯২৫ সাল।

এসেনিনের জন্ম ১৮৯৫-তে, বয়েসের হিসেবে তিনি যদিও পাস্টারনেক বা মায়াকভস্কির পরে, কিন্তু আমি তাঁকে আগেই বেছে নিয়েছি, কারণ, এসেনিন যেন রাশিয়ান কবি... একটি হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়। তখন মায়াকভস্কির ... প্রতাপ, এসেনিন তাঁর নেতৃত্ব বা প্রভাব মানতে চাননি, তিনি এজরা পাউন্ড প্রভৃতি ইমেজিস্টদের ধরনের আন্দোলন আনতে চাইলেন রাশিয়ায়। কিন্তু তাঁর মানসিকতা ছিল অন্যরকম, ফলে এই দ্বিধার মধ্যে তাঁর কবিতা যথার্থ মর্যাদা পরবর্তীকালে পায়নি। এসেনিন বর্তমান অনুবাদকের প্রিয় কবি।

এসেনিন ছিলেন চাষার ছেলে, নাগরিকতার সবগুলো বিষ গ্রহণ করেও তিনি গ্রামের শ্যামলতার জন্য চিরদিন উন্মুখ ছিলেন। রুশ বিপ্লবের সময় তিনি সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন এবং শ্রেণীহীন সমাজ ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু দেশের অগ্রগতির জন্য গ্রাম ভেঙে আধুনিক কলকারখানা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি তৈরী শুরু হয়, তখন তিনি অযৌক্তিক ভাবে কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য অরণ্য বিনাশ করে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা দরকার, কিন্তু তবুও দু'একজন কবি থেকে যাবেই যারা ইস্পাতের সমস্ত উপকারিতা ভোগ করেও সেই লুপ্ত অরণ্যের জন্য শোক করবে। বন্যা বন্ধ করার জন্য নদীতে বাঁধ দিতেই হবে, তবু দু'একজন কবি নদীর সেই উগ্র, ভয়ংকর রূপ আর দেখতে পাওয়া যাবেনা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেই, তা বলে, এদের প্রগতি বা সভ্যতার শত্রু বলা যাবে না, এরাই 'ধনুকের ছিলা রাখে টান'।]

(অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ তার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন—যা মনের সঙ্গে বিশ্বের 'সাহিত্য' অর্থাৎ সম্মিলন ঘটায়। যোগাযোগ অবশ্য দুটি প্রকারের হতে পারে। মানুষকে [illegible] পালন করতে হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষ বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত, আবার [illegible] হয় তাকে [illegible] সূর্যের আলো ও উত্তাপ থেকে। [illegible]

[illegible] হচ্ছে যে সাহিত্য, বিশেষতঃ কবিতা আর মিলনের সেতু নয়, বিচ্ছেদের প্রাচীর হয়ে উঠেছে ইদানীং। কবিতার বাহন অবশ্য ভাষা, কিন্তু ভাষার দ্বারা যোগ এবং বিয়োগ দুইই সাধ্য। ভাষা যদি হয় স্বচ্ছ, কাচের মতো দৃষ্টিভেদ্য, তবেই ওপারের আলো নিয়ে আসতে পারে, মনকে প্রসারিত করতে পারে বিশ্বের প্রাঙ্গণে। [illegible] তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ [illegible] ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অধিকারভুক্ত করতে।" এই ইচ্ছার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিকর্মকে যুক্ত করেছিলেন। আধুনিক কাব্যস্রষ্টা ও কাব্যতাত্ত্বিকদের চোখে কবিকর্মের লক্ষ্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় আশী বছর আগে মালার্মে দেগাসকে যে-উপদেশ দিয়েছিলেন—"one makes poetry with words, not with ideas" (শব্দ দিয়ে কাব্য রচনা করতে হয়, ভাব দিয়ে নয়)—তারই মধ্যে এই লক্ষ্যান্তরের পথনির্দেশ ছিল বোধ করি। শব্দকেই কবিতার মূল উপাদান এবং ভাবকে ভেজাল মনে করার ফল হল এই যে, কাব্যসৃষ্টিতে শব্দযোজনা কেবল ধ্বনির দিকেই লক্ষ্য রেখে হতে লাগল, কবিতার ভাষারও যে-একটা বোধগম্য, অন্তত হৃদয়গ্রাহ্য, অর্থ থাকা আবশ্যক এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে কবিদের বিদ্রোহ ক্রমাগত প্রবলতর হয়ে উঠল।

আলংকারিকদের ভাষায় কাব্যের অর্থ দুই প্রকার—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ। বাচ্যার্থ সাধারণভাবে অর্থ বলতে যা বোঝায় তাই। ব্যঙ্গ্যার্থ বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা স্পষ্ট করে বলা খুব সহজ নয়, তবে এই ব্যঙ্গ্যার্থেই কাব্যের প্রাণ। সেকেলে অর্থাৎ মালার্মে-পূর্ববর্তী কাব্যে বাচ্যার্থ তো থাকতই, তদুপরি থাকত ব্যঙ্গ্যার্থ; গদ্যের চেয়ে অর্থসম্পদে বেশি বই কম ছিল না কবিতার। আজ শব্দোত্থ অর্থের বোঝা পারাপার করতে আছে গদ্যরূপী গাধাবোট; কবিতার ময়ূরপংখী-নায়ে যে-শৌখিন ভাষা ভেসে বেড়ায় তার সঙ্গে অর্থের আসবাবপত্র থাকলে নৌকাসুদ্ধ ভরাডুবি হবার আশংকা। এলিয়ট বলেছিলেন, কাব্যের বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ ছেঁটে ফেললে ক্ষতি নেই কারণ তার কাজ সামান্যই, পাঠকের প্রহরীচিত্তের সামনে ফেলে দেওয়া এক টুকরো মাংসের চেয়ে বেশি নয়। ঐ প্রহরীটিকে একটা কিছু দিয়ে ভুলিয়ে তবেই কবিতা ঢুকতে পারে অন্তঃপুরে। এটা চল্লিশ বছর আগের কথা। পনেরো বছর আগে আধুনিক সাহিত্যের আর-একজন কর্ণধার, জাঁ পোল সার্ত্র, ঘোষণা করলেন যে কাব্যের পক্ষে অর্থমাত্রই অনর্থকারী। গদ্যের ভাষা স্বচ্ছ কাচের মতো, নিজেকে দৃষ্টিগোচর না করে আমাদের দৃষ্টিকে এগিয়ে দেয় ওপারের বস্তুগুলির দিকে। কবিতার ভাষা কিন্তু নিজেকেই চোখের সামনে তুলে ধরে, দৃষ্টিকে আটকে রাখে ঐ কাচের মধ্যে, কাচোত্তর কিছু দেখতে দেওয়া তার পক্ষে আত্মাবমাননার সামিল। আমরা কখনও কখনও ফুলকেও তো ভাষার মতো ব্যবহার করি, গোলাপকে প্রেমের সংকেত বানিয়ে তুলি, পদ্মকে পুজোর, ইত্যাদি। কিন্তু তখন ফুলের গন্ধ বর্ণ কোমলতা মসৃণতাকে আর গ্রাহ্য করি না, আমাদের লক্ষ্য ফুলের বাস্তবিকতাকে স্বচ্ছন্দে ভেদ করে (অর্থাৎ তাকে সংকেত-

রূপে গণ্য—না নগণ্য—ক'রে) চলে যায় সংকেতিত বস্তুর দিকে। সেটা কিন্তু ফুলের পক্ষে স্বধর্মচ্যুতি, ফুলের দ্রষ্টার দিক থেকে তার প্রতি অবিচার। তেমনি কবিতার ভাষাকে যদি অর্থবাহী করে তোল, অন্য কোনো বিষয় বা বস্তুর সংকেতরূপে ব্যবহার করি, তবে তারও ধর্মহানি হয়, পাঠকের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় তার একান্ত স্বকীয়, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ সত্তা। কাব্যপদসমূহের ধ্বনিময়তা ও চিত্রলতাই সার্ত্র-এর মতে তার সবটুকু, তার প্রথম ও শেষ সার্থকতা।* গদ্যলেখকদের মতো কবি ভাষাকে কোনো কাজে লাগান না; তিনি শব্দগুচ্ছ পাঠকের চোখের সামনে বা কানের কাছে একটি মহামূল্য উপহার স্বরূপ তুলে ধরেন। কবিতা কান দিয়ে শোনবার জিনিষ, শোনো, চোখ দিয়ে, কল্পনার চোখ দিয়ে, দেখবার জিনিস দেখো; বুঝতে চেষ্টা কোরো না। এলিয়ট যাঁকে বলেছেন বর্তমান কালের কাব্য-সাহিত্যের অবিসংবাদিত প্রতীক, সেই ভালেরী স্বয়ং বিশ্বাস করতেন যে কবিতায় অর্থ কেন, শব্দও তেমন গুরুত্বের নয়। তিনি তাঁর শিষ্যদের বারণ করেছেন শব্দ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে—"যখন কবিতা লিখতে বসেছ তখন তোমার সামনে শব্দ নেই, আছে সিলেবল্ আর ছন্দের বৈচিত্র্য।" এর পরে পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন না যে ফরাসী দেশে এমন কবিও রয়েছেন যাঁরা বাক্য বা শব্দের ধার ধারেন না, কেবলমাত্র স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের অপূর্ব সমাবেশে বাক্যরচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এমন কবিতা লিখেছেন—"খট্‌খট্ মসমস / খড়্‌খড়্ / খড়্‌ফড় খড়্‌ফড় / হো হো হাহা হাহা— / ট ঠ ড ঢ ড ঢ হঃ— /হেৎফলো হেতিস্ বিস্কো।" পড়ে আমরা আমোদ পেয়েছি, কবিতার এক অভিনব ফর্ম আবিষ্কৃত হল বলে ধন্য হইনি, করিনি।

* ভালেরীর মতটি একটু খতিয়ে দেখা দরকার। তিনি শুধু বিংশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় ফরাসী কবি বলে স্বীকৃতই নন, বর্তমান কালের কবি ও সমালোচকদের উপর তাঁর প্রভাব অপরিমেয়। তা ছাড়া কাব্যের তত্ত্ব ও আঙ্গিক বিষয়ক তাঁর ফরাসী প্রবন্ধগুলির ইংরেজি অনুবাদ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হওয়াতে আলোচনার সুবিধে হয়ে গেছে।

তরুণ বয়সে ভালেরী এবং তাঁর কবি-বন্ধুরা ছিলেন ভীষণ সংগীতপ্রিয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতেন কনসার্ট শুনে, ফিরে আসতেন উচ্ছ্বাসিত আনন্দ ও ঈর্ষান্বিত অভিমান বুকে নিয়ে। শিল্পকলার যে-তুষার-শুভ্র শিখরে সংগীত বিরাজমান, সেখানে কি তাঁরা কখনও তাঁদের একান্ত প্রিয় শিল্পকর্ম কবিতাকে নিয়ে যেতে পারবেন? তাঁদের কাব্যসাধনায় একটি সংকল্প দানা বেঁধে উঠল: কবিতাকেও সংগীতের মতো অত্যন্ত নির্মল করে তুলতে হবে। যা কিছু কবিতা নয় অথচ কবিতার মধ্যে নানা দিক থেকে ঢুকে পড়ে বিশুদ্ধ রসসৃষ্টি ও
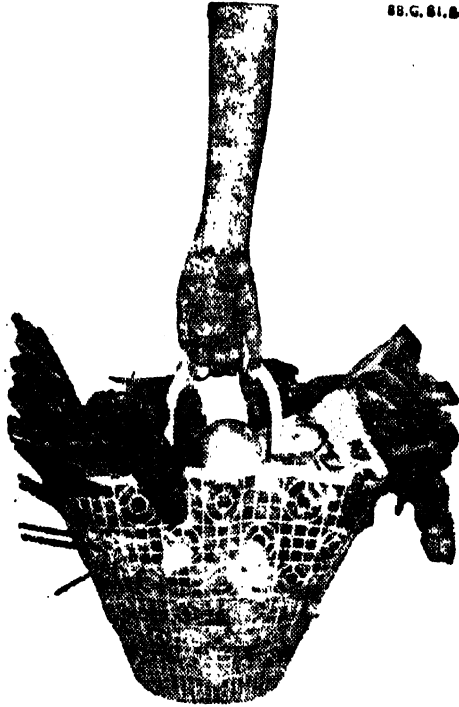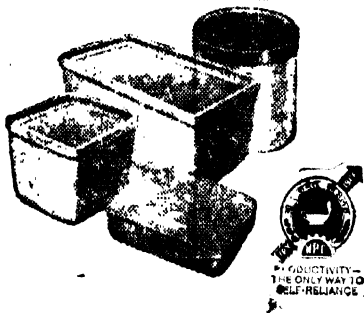
* Jean-Paul Sartre—What is Literature, pp. 4-5
* Paul Valery—The Art of Poetry (Routledge & Kegan Paul, 1958).

রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তার কলুষ স্পর্শ থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে হবে। সুতরাং কাঁকর বেছে ফেলার মতন করে কবিতার থালা থেকে চুনে চুনে ফেলে দেওয়া হল তত্ত্বকথা, ধর্মকথা, নীতিকথা, সমাজচেতনা, বাস্তব ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনা, ইত্যাদি। সংগীত তো এ সমস্ত বাদ দিয়েও, বা দিয়েই, শিল্পসৃষ্টির চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছতে পেরেছে, কবিতাই বা পারবে না কেন? ভালেরী বলেছেন প্রতীকী আন্দোলনের গোড়ার কথা এই। সিম্বলিস্ট কবিগোষ্ঠীর শব্দচয়নের খেয়ালপনা, ব্যাকরণের স্বৈরাচার, ছন্দের অনিয়ম, ভাষার অনধিগম্যতা—এ-সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ঐ সংগীতের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায়।

এই উচ্চাভিলাষী অসমসাহসিক সংকল্প নিয়ে তো তাঁরা নামলেন কাজে; কিন্তু মুশকিল বাধল গোড়াতেই। প্রথম পদক্ষেপটা ছিল নেতিবাচক, তাতে অবশ্য কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয়নি। ভাষার গৌরব তার অর্থ-ব্যঞ্জনায়, সেদিকটা নির্মমভাবে ছেঁটেছুঁটে ভাষাকে প্রায় সা রে গা মা-র মতো রিক্ত করে ফেলা গেল সহজেই। কিন্তু তারপর রইল কী? সংগীতে আছে সাতটি সুর, একাধিক সপ্তগ্রাম, ধ্বনির তারতম্য এবং গুণগত বিস্তার, মীড়, মূর্ছনা, গমক, তাল-মান-লয়ের বিচিত্র খেলা, আর পাশ্চাত্ত্য সংগীতের পলিফনি, সিম্ফনি, কাউন্টার-পয়েন্ট—সবসুদ্ধ এলাহি ব্যাপার। শুধু ছন্দ আর মিল আর অনুপ্রাসের তহবিল নিয়ে সংগীতের বিপুল ধ্বনিভাণ্ডারের সঙ্গে টেক্কা দেবে কবিতা কোন্ ভরসায়?

অবশ্য কবিতার মাধ্যম কথা। সেই কথার বারো আনা ভাগ, যেটাকে আমরা বলতে পারি তার গদ্যভাগ, ছাঁটাই করে ফেললেও কিছু অর্থ তো তার অবশিষ্ট থাকে, তার বিশুদ্ধ কাব্যিক অর্থ। কবিতার ধ্বনির দিকটা যদিও সংগীতের তুলনায় দীনদরিদ্র এবং অর্থের দিকটা গদ্যের তুলনায় সাদামাটা, তবু দুটোতে মিলে সে মোটেই নিঃসম্বল নয়, কারও কাছে মাথা হেঁট করবার দরকার নেই তার।

কিন্তু দুটোকে কি সহজে মেলানো যায়? শব্দসমূহের অর্থ ও ধ্বনির মধ্যে কোনো স্বভাবজ, সার্বজনীন সম্বন্ধ না থাকার দরুণ কবিকে বড়ো অসুবিধায় পড়তে হয়। ভালেরী উদাহরণস্বরূপ পেশ করেছেন ইংরেজি হর্স, গ্রীক্ হিপ্পস, লাতিন একুয়স, ফরাসী শেভাল্—আমরা আরো যোগ করতে পারি বাংলা ঘোড়া, সংস্কৃত অশ্ব, পার্সী অস্প্—এ সবের তো অর্থ একই, অথচ ধ্বনি কতো বিচিত্র। সংগীতকারকে এই দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েন বিধ্বস্ত করে না, অর্থের ঝামেলা পোহাতে হয় না তাঁকে। অন্য কিছুর দিকে মন না দিয়ে কেবল ধ্বনির একটি রূপকল্প তৈরী করেন তিনি। সেই বিশেষ ধ্বনিরূপটি তাঁর তৎসাময়িক সৃজনী-প্রেরণার রূপায়ণে চরিতার্থ হলেই তাঁর শিল্পকর্ম সমাপ্ত হল। কিন্তু কবি যদি ধ্বনির কথা ভেবে কতকগুলো শব্দ চয়ন করেন, তবে অর্থের দিক দিয়েও সেই শব্দপরম্পরা কি তাঁর রূপকারী অভীষ্টসিদ্ধির সবচেয়ে সহায়ক হবে? অথবা উল্টো করে দেখলে,—যে-শব্দবিন্যাস অর্থপ্রকাশের দিক দিয়ে তাঁর উপলব্ধির অনুগামী হল, ঠিক সেই শব্দগুলির ধ্বনি-সংগঠনও কি তাঁর রূপকল্পনার অনুকূল হবে? কাজেই কাব্য রচনা মানে একই সঙ্গে কুল আর শ্যাম রাখার দুঃসাধ্য অঙ্গীকার। শেষপর্যন্ত কুলের মায়া ত্যাগ করতে হয়েছিল রাধিকাকে, শ্যামের বাঁশী তাকে এমনি

উতলা করেছিল। তেমনি শব্দের স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির মোহিনী মায়ার টানে আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই শব্দার্থের দিকে পিঠ ফেরাতে উদ্যত হয়েছেন।

ভালেরীর তীক্ষ্ন বুদ্ধি তাঁকে বোঝালো যে কবি সিদ্ধকাম হবেন তখনই যখন তিনি অর্থ ও ধ্বনিকে মেলাতে পারবেন, একেবারে হরিহরাত্মা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন দুটোর মধ্যে। কিন্তু এটাতো একরকম অসম্ভব ব্যাপার! কারণ প্রায় যে-কোনো শব্দের বেলাতেই দেখা যায় তার অর্থ ও ধ্বনি একত্রিত হয়েছে নিতান্ত বাহ্য কারণে, পরস্পরের স্বাভাবিক টানে নয়। যাদের স্বভাবে মিল নেই, কবি তাদের মেলাবেন কেমন ক'রে? এ সমস্যার সমাধান করেছেন ভালেরী একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকথা বলে। কবিতার সার্থকতা নির্ভর করে ভাষা ব্যবহারের রীতি, নীতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর উপর। সাধারণ ভাষার, অর্থাৎ গদ্যভাষার, নিয়মই এই যে যখন আমি তাতে কিছু প্রকাশ করি তখন আমার বক্তব্য শ্রোতা বা পাঠক বুঝে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাষা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার অর্থ রয়ে গেল শ্রোতা বা পাঠকের মনে, উদ্দিষ্ট কর্ম বা ভাবনার পথে তাদের চালিত করল; কিন্তু সেই অর্থের বাহন ছিল যে-ধ্বনিপুঞ্জ তা এখন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং তা একেবারে অন্তর্হিত। যেন বক্তার তীর থেকে নদীর ওপারে শ্রোতার তীরে একটি রেলগাড়িকে পার করে দেওয়ার দরকার পড়েছিল বলে আলাদিনের জিন মুহূর্তের মধ্যে ঠিক মাপের একটা সাঁকো তৈরী করে ফেলল; তারপর রেলগাড়িটি যেই ওপারে নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল, অমনি সাঁকোটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ভালেরী এই উপমা প্রয়োগ করেননি, কিন্তু অনায়াসে করতে পারতেন।

পক্ষান্তরে, কবিতার ভাষা পাঠককে যা বলতে চায় তা বলে ফেলার শেষে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। যে-পরিমাণে তা অর্থব্যঞ্জনার মাধ্যম সে-পরিমাণে তার স্বকীয় সত্তা নেই। কিন্তু অর্থ বোঝানোর পরও সে যেন আর একবার নতুন জন্ম লাভ করে শ্রোতা বা পাঠকের চৈতন্যে, অর্থ থেকে আবার শ্রোতার মনোযোগ ফিরে আসে ভাষার ধ্বনিরূপের দিকে। গদ্যভাষার বক্তব্য বিষয়টাই সবকিছু, বলার ভঙ্গিটা কিছুই না। কবিতার ভাষার বিষয় এবং ভঙ্গি, অর্থ এবং ধ্বনি, উভয়ই সমমর্যাদাসম্পন্ন; সমান মূল্যের দাবী রাখে তারা। ফলে পাঠকের মন পেণ্ডুলামের দোলকের মতো একবার ফর্ম থেকে কণ্টেণ্টের দিকে দুলে যায়, আবার সেখান থেকে ফর্মের দিকে ফিরে আসে। কাব্যপাঠের রসানুভব যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এ খেলা থামে না ততক্ষণ।

এমনি এক দোটানার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন রোজার ফ্রাই চিত্রকলা প্রসঙ্গে। প্রকৃত সমঝদার যখন তন্ময় হয়ে কোনো রূপদক্ষ চিত্রকরের আঁকা ছবি দেখেন তখন সে ছবির বর্ণসংস্থানের সুষমা আর রেখার সৌষ্ঠব এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি জাগায় তাঁর মনে, যেজন্য ফ্রাই এবং ক্লাইভ্ বেল যার নাম দিয়েছেন নান্দনিক অনুভূতি (aesthetic emotion)। এই অনুভূতিটি নিশ্চয়ই শিল্পজগতেরই অনুভূতি; প্রকৃত বস্তু (কোনো ল্যাণ্ডস্কেপ্ বা একটি ফল, ফুল কিম্বা নরদেহ) থেকেও পাওয়া যেতে পারে সে অনুভূতি, যদি আমরা ঐ বস্তুকে শিল্পীর শুদ্ধ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু অধিকাংশ চিত্র—রেনেসাঁস থেকে সেজান পর্যন্ত প্রায় যাবতীয় য়ুরোপীয় চিত্র—জীবনের প্রতিবিম্বও বটে। মনে করুন ছবিটি একটি শোকার্ত মাতার কিম্বা কুষ্ঠ রোগীর সেবারত কোনো সাধু পুরুষের। ছবির এই প্রতিবিম্বিত বিষয়টি আমাদের মনে আর এক ধরনের অনুভূতি জাগাবে। সে অনুভূতিকে উক্ত চিত্র সমালোচকদ্বয় জীবন-সংক্রান্ত বা দৈনিক অনুভূতি (life emotion) বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বাস্তব জীবনে কোনো শোকার্ত মাতাকে দেখলে আমরা যা অনুভব করি তার সঙ্গে এই চিত্র-দর্শন-সঞ্জাত অনুভূতির পার্থক্য আছে—যে-পার্থক্য বোঝাবার জন্য এদেশের আলংকারিকেরা দুটি ভিন্ন শব্দ, 'ভাব' ও 'রস', ব্যবহার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ভাবকে রসে রূপান্তরিত করাই শিল্পীর কাজ। তবু এই অনুভূতিটি জীবন-সংক্রান্তই এবং বাস্তব জীবনের অনুভূতির খুব কাছাকাছি। পক্ষান্তরে, আমরা যদি চিত্রের বিষয়টি থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে একাগ্র হয়ে নিজেকে নিবিষ্ট করি তার রঙ ও রেখার সূক্ষ্ম কারুকর্মে, তাহলে যে-শুদ্ধ—বলতে গেলে পারলৌকিক অনুভূতি লাভ করব তার জাতই আলাদা।

এ দুই অনুভূতি যে ভিন্ন জাতের শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সহযোগিতা নেই, বরঞ্চ তারা অনেক ক্ষেত্রেই অসমঞ্জস। ফ্রাই কয়েকটি বিখ্যাত য়ুরোপীয় চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কোথায় এবং ঠিক কীভাবে

এই অসামঞ্জস্য ঘটেছে। অন্য অসংগতি যদি নাও থাকে, তবু দুই ভিন্ন জাতের অনুভূতিকে আমরা কেমন করে একই সময়ে যথাযথভাবে মনে স্থান দিতে পারি? একদিকে গভীর মনোযোগ ঘটলে অন্য দিক থেকে মন আপনিই আলগা হয়ে যাবে না কি? ফ্রাই বলছেন, চিত্র যদি একাধারে জীবনের প্রতিবিম্বরূপে কৃতকার্য হয় এবং রঙ ও রেখার সুদক্ষ বিন্যাসে অর্থাৎ ফর্মের দিক থেকেও চরিতার্থ, তাহলে এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমরা এড়াতে পারি না।

এই মানসিক দ্বন্দ্ব বা দোদুল্যমানতা যেহেতু শিল্পানুভূতির অখণ্ড একাগ্রতা নষ্ট করে, তাই ফ্রাই এবং বেল চেয়েছিলেন চিত্রকলা থেকে প্রতিবিম্বকারিতার নির্বাসন, চিত্রকে করতে চেয়েছিলেন বিশুদ্ধ ও বিষয়-বস্তুনিরপেক্ষ। বোঝাই যাচ্ছে যে এঁদের পক্ষপাত ছিল নির্বস্তুক চিত্রকলার, অ্যাবস্ট্রাক্ট পেণ্টিং-এর দিকে। সংগীততত্ত্ব ভালেরীও ছিলেন বস্তুবর্জিত বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষপাতী। পরে তাঁর শিষ্য সার্ত্র এই মতটাকেই সংসাহসসপূর্বক দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করলেন। তার পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি।

স্বীকার করছি বিশুদ্ধ ধ্বনির শক্তি কম নয়, তা দিয়েও মহৎ শিল্পরচনা সম্ভব। কিন্তু সে শিল্প কবিতা নয়, সংগীত। সংগীতেই ধ্বনি আপন পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। প্রতিতুলনায়, ধ্বনির প্রকাশ-শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র ব্যবহৃত হয় কবিতায়। বিশেষজ্ঞ মহলে শোনা যায়, ধ্বনির অত্যাশ্চর্য রূপায়ণে সবচেয়ে সার্থক কবি মালার্মে আর ভালেরী। মালার্মের একটি বিখ্যাত কবিতা 'ফনের দিবাস্বপ্ন' অবলম্বন করে প্রেলিউড্ রচনা করেছেন দেবুসী। একান্ত ধ্বনিরই বিচারে কি দেবুসীর সংগীতের সঙ্গে মালার্মের কবিতার কোনো তুলনা সম্ভব? ছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের অভিনবত্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সুচতুর বিন্যাস, ইত্যাদি, অর্থ-ব্যঞ্জনায় যতই সহায়তা করুক (সেদিক থেকে এসবের মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য), কবিতার ধ্বনিরূপকে স্বতন্ত্র করে, স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ওটাকেই বড়ো ক'রে দেখানোর যে-পরিশ্রমী দক্ষতা পাওয়া যায় অতি আধুনিক সমালোচনায়, তার একমাত্র ফল কবিতাকেই ছোটো করা। সমালোচকেরা যখন ভাবেন যে এ যুগের কাব্যসমালোচনার প্রধান কাজ হচ্ছে খুঁটে খুঁটে দেখানো তাঁদের আলোচ্য কবিতার কোন্ পংক্তিতে তিনটে 'শ' ধ্বনি পাওয়া যায় আর কোনটাতে দুটো বা চারটে 'ক' ধ্বনি, কোথায় কটা হ্রস্ব স্বরের পর একটি দীর্ঘ স্বর পড়ছে আর কোথায় তার বিপরীত (বাংলা ভাষায় আবার হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের ভেদ প্রায় লুপ্ত, অতি কষ্টে বাঙালী কবিরা তার অল্পস্বল্প সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন), তখন তাঁরা একটি মহৎ শিল্প-রচনাকে প্রশংসনীয় কারুকার্যে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই করছেন না।

এ তো গেল কবিতার ধ্বনির দিক, তার সাংগীতিক মূল্যের দিক। কবিতার চিত্রের দিকটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সক্ষম। কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বা মনুষ্যদেহের এমন সার্থক বর্ণনা কবির ভাষায় সম্ভব যা শিল্পীর আঁকা চিত্রের তুলনায় নগণ্য নয়। কিন্তু ঠিক তুলনীয়ও কখনো হয় না। আমরা বলি ছবির মতো উজ্জ্বল ইমেজারি; কিন্তু ইমেজারির মতো উজ্জ্বল কিম্বা প্রাণবন্ত ছবি বলার কি কোনো মানে হয়? তুলির আঁকা ছবির পাশে কলমে আঁকা ছবি রাখলেই দেখা যাবে (পরীক্ষাটা অবশ্য কল্পনা-নির্ভর) দ্বিতীয় ছবিটি কতো ফিকে এবং দুর্বলরেখ। আঁকার তারতম্য তো আছেই, তদুপরি দেখার প্রভেদও অপরিমেয়। প্রথমটি আমরা চোখে দেখি, দ্বিতীয়টি দেখি মনশ্চক্ষে। মনশ্চক্ষে আমরা ক'টি রঙ দেখতে পারি? অনেকে সাদা, কালো ও ধূসর ছাড়া আর কোনো বর্ণই কল্পনা করতে পারেন না। এবং কতক্ষণ ধরে একটি রেখাকে স্থির রাখতে পারি মানসপটে? সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র।

দ্বিতীয়ত, এবং স্বভাবতই, কাব্যের চিত্র উপেয় নয়, ভাবপ্রকাশের উপায় মাত্র; তার সার্থকতা বাহন বা মাধ্যম রূপেই। চিত্র-কল্পের সাহায্যে কবি তাঁর উপলব্ধিকে মূর্ত ও সুস্পষ্ট করে তোলেন, মানব-জীবনের বা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো অন্তর্গূঢ় স্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়—রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় 'সাহিত্য'—ঘটান। ক্যান্‌ভাসে আঁকা প্রতিবিম্বকারী চিত্রও তাই করে অবশ্য। তবে সে চিত্রের আর একটা দিক থাকে, তার বিশুদ্ধ ফর্মের দিক, বর্ণ-সংস্থান ও রেখাসন্নিপাতের দিক। আগেই

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

"শিলা জলে ভাসি যায়
বানরে সঙ্গীত গায়"

স্বাধীনতা বলুন, উচ্ছৃঙ্খলতা নাম দিন প্যারিস একটি সংগুণের জন্য নিখ্যাত। সে চিরকালই স্বাধীন চিন্তা, তথা পীড়িত বিদ্রোহী জনকে আপন নগরে আশ্রয় দিয়েছে। জর্মন কবি হাইনের প্রগতিশীল মতবাদ কাইজার সহ্য করতে পারেননি বলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় প্যারিসে—এবং জীবনের বেশীর ভাগই তিনি কাটান সেখানে। আর এই বছর পঞ্চাশ পূর্বে বীর সাবরকরকে ফ্রান্সভূমি থেকে ইংরেজ ধরে নিয়ে যায় বলে ফরাসী সরকার তারস্বরে প্রতিবাদ জানায়। (১)

এ শতকে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় আরামদায়ক তত্ত্ব কথা ছিল এই যে, যেসব কূপমণ্ডূক দেশ কোনো বিশেষ ধরনের বই ছাপাতে দিত না, সেগুলো ছাপা হত প্যারিসে। তার কিছুটা পাচার হত—যেমন ধরুন লেডি চ্যাটার্লি—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারত ইত্যাদিতে, আর বাদ-বাকিটা ফ্রান্সাগত ইংরিজী পড়নেওয়ালা টুরিস্ট দিগের গোগ্রাসে। তখনকার দিনে বোকা একটি টাকাতে উত্তম উত্তম গন্ধ পাওয়া যেত। এদেশে যারা বিলিতী বই বিকি করে, তারা চিরকালই ছিল শাইলকের বাবার দাদা। অশা করি শাইলক জীবিত থাকলে অপরাধ নেবেন না। তবে নিন্দার্থে নয়ৌক্তি এ স্থানে—'এক পাপীকে দেখে একশ' জন পাপ পথে যায়'—আমিও তাই, তাদেরই অনুকরণে, যত পারি এসব বই পাচার করে দেশে নিয়ে আসতুম। আমার পক্ষে প্রক্রিয়াটি কঠিন ছিল না। আমি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কস্টম কর্মচারী সে যুগে সচরাচর হত গোয়ানীজ ক্যাথলিক। আমি ট্রাঙ্কের সর্বোচ্চ স্তরে রাখতুম একখানা ক্যাথলিক প্রেয়ার বুক এবং একটি মনোহর রোজারি—অর্থাৎ ক্যাথলিক জপমালা। ম্লেচ্ছ মুসলমানের খৃষ্টপ্রীতি দেখে ক্যাথলিক কর্মচারী বে-এক্তেয়ার!

সেই প্যারিস মহানগরীতে শত বৎসর পূর্বে ডাক উঠলেন ফ্লোবের—মাদাম বোভারি বগনামে'। অভিযোগ। তিনি "ইমরাল" দুর্নীতি প্রচারকারী, অশ্লীল কেতাব লিখেছেন। সরকার পক্ষের উকীল গাঁটের ছ পান খেয়ে যে বক্তৃতা ঝাড়লেন, সেটা শুনে সকলেরই মনে হল, গাঁয়ের পাদ্রিকে বউবাচ্চাসহ খুন করে ঐ গাঁয়ের যে একটি মাত্র কুঁয়ো আছে, তাতে সে কুশাগুলো ফেলে দিয়ে জল বিষিয়ে দিলেও ফ্লোবেরের অপরাধ এর তুলনায় সোনার পাথর বাটিতে আকাশকুসুম সাজানোর মত হত।

মোপাসাঁ লিখলেন, "ধন্য ধন্য এডভোকেট জেনরেল পিনার! (শুঁড়িমশাই—অবশ্য তিনি মীন করেছেন "শুঁড়ির শালা চাকর!") ফ্রান্সের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রইলেন!"

ফ্লোবের খালাস পেয়েছিলেন। আদালতের উপর জনমত হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ শুধু ফ্রান্স নয়, ফ্রান্সের বাইরেও তখন ঐ বই এমনই চাঞ্চল্য জাগিয়েছে যে, তার পূর্বে বা পরে এমনতরো কখনো হয়েছে সেটা আঙুলে গুণে বলা চলে। গুণীরা বললেন, "যা বলো, যা কও বইখানা নিঃসন্দেহে পীস অব আর্ট, শেফ দ্যভ্র্, মাস্টার পীস।"

মোপাসাঁ অতিশয় সবিনয় লিখলেন, "সাহিত্যে নীতি? সে আবার কী চীজ! বেরুলেন সেই চীজের সন্ধানে যাঁরা মহামানব, যাঁরা সাহিত্যাচার্য, তাঁদের কাছে। আরিস্তোফানেস, তেরেন্‌স, প্লাউটুস, আপুলেয়ুস, ওভিড, ভের্গিল, শেকসপীয়র, রাবলে, বক্কাচ্চো, লা ফঁতেন, স্যাঁতামাঁ, ভলতের, জ্যাঁ জ্যাক রুসো, দিদেরো, মিরাবো, গোতিয়ে, মুসে (২)

(১) সাবরকরকে যখন বন্দী করে ইংরেজ ভারতে পাঠাচ্ছে, তখন তিনি ফরাসী বন্দরে পালিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠেন। ইংরেজ সেনার তাড়া করলে সাবরকর ফরাসী পুলিসম্যানকে বোঝাতে পারলেন না যে, তিনি রাজনৈতিক বন্দী—ফরাসী ভাষা জানতেন না বলে। সাধারণ খুনী আসামী ভেবে পুলিস তাকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে। পরে ইংরেজ বলে, ফরাসী পুলিস ফরাসী সরকারের প্রতিভূরূপে সাবরকরকে ইংরেজের হাতে যখন সমর্পণ করেছে, তখন পরে ফরাসী সরকারের আপত্তি করার কোনো হেতু নেই। ...এ-সব কিন্তু আমার শোনা কথা।

2 Aristophane, Terence, Plaute, Apulee, Ovide, Virgile, Shakespeare, Rabelais, Boccace, La Fontaine, Saint-Amant, Voltaire, J.-J. Rousseau, Diderot, Mirabeau, Gautier, Musset etc., etc.

ফরাসি জাতটা বিদেশী নাম বিকৃত করতে ওস্তাদ—অনেকটা বাঙালীর মত কিংবা বলতে পারেন, পরকে "আপনাতে" জানে॥

ইত্যাদি ইত্যাদি—একটিমাত্র উদাহরণও পেলুম না এঁদের কাছে।"

ফিরিস্তিটি উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নেই। গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ইংরেজ এবং সর্বোপরি ফরাসী—কারণ মোপাসাঁ স্বয়ং খাঁটি ফরাসিস—মহারথীরা এতে রয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, চীনা কোনো মহারথীর নাম তিনি করেননি। আরব্য রজনী পর্যন্ত না। কিন্তু আমার আশ্চর্য বোধ হয়, ওল্ড টেস্টামেন্টটির কথা মোপাসাঁর স্মরণে এলো না কেন? যদিও আশ্চর্য হবার বোধ হয় কোনো কারণ নেই। অধুনা আমি আঁদ্রে জিদ-এর "জুর্নাল" বা রোজনামচা খানা ফের উল্টে পাল্টে দেখছিলুম: ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত। (৩) পুস্তকাস্তের নির্ঘণ্টতে দেখি, জিদ প্রায় ছ'শ জন লোকের নাম করেছেন। শতকরা আশিজন সাহিত্যস্রষ্টা। প্রাচ্যদেশীয় একজন লেখকের নামও তাঁর আত্মচিন্তায়, বন্ধুমিলনে, সাহিত্য পাঠে উল্লিখিত হয়নি। অথচ গুণগ্রাহী এই জিদই "গীতাঞ্জলি" অনুবাদ করেন। ইয়োরোপের প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণবদের কথা হচ্ছে না: মাক্সম্যুলার, লেভি, উইন্টারনিৎস, মাঁসাও (অল-বীরূনীর অনুবাদক) এঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যাঁরা সাহিত্যরস, কলাসৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের অল্পজনই সে-সব বস্তুর জন্য অস্তাচলে বসে পূর্বাচলের পানে তাকান—গ্যেটে রোলাঁ (তিনিও সুন্দরের চেয়ে সত্যের সন্ধান করেছেন অধিকতর) বড়ই বিরল। প্রতিদিন বিরলতর হচ্ছে। কিছুদিন পরে অবশ্য এঁদের সম্বন্ধে আমরা আর কোনো খবরই পাবো না। বিদেশী বই আসবে না। বিজলি বন্ধ হয়ে গেলে রেডিয়ো সেটের মত অবস্থা হবে আমাদের।

(৩) অধুনা এদেশে নাকি 'তুলনাত্মক সাহিত্যচর্চা' পড়ানো হয়। এ চর্চাতে যাদের হাতেখড়ি হচ্ছে, তাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক লোকই রোজনামচা লেখেন। এদের ভিতর একজন ফরাসী—জিদ, দ্বিতীয়জন জর্মন—য়্যুঙার (স্ট্রাল্‌ঙেন) এবং তৃতীয়জন সুইস—ক্রিশ টোগেবুখ—যদিও যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তবু তার মূলে Weltanschauung যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ধ্বংসকে কেন্দ্র করে। এঁরা তিন-দেশের সর্বোত্তম না হলেও তারই কাছাকাছি লেখক।...পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ করবেন, ফরাসী জিদ কী মৈত্রীর চোখে জর্মনদের, এবং জর্মন য়্যুঙার ফরাসীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখছেন! এর সঙ্গে পাঠক আইজেনহাওয়ারের ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ মিলিয়ে পড়লে উপকৃত হবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি, শেষের ইংরিজী বই ভিন্ন বাদ বাকি তিনখানা বই আমি এদেশের বিদেশী-পুস্তক-বিক্রেতাদের 'কেরপায়' পাইনি। ঈশ্বরাদেশে যারা পাপলাল গাছ পোঁতে, তাদেরই একজনের বদান্যতায়। তা সে যাকগে। কিন্তু এই সুবাদে আমি আমার বিশেষজ্ঞ পাঠকদের শুধোই—আমার বাস মফস্বলে—আচ্ছা, অজ্ঞ যদি কোনো কণ্টু বা হুটেনটট বিদেশী বই কিনতে চায়, তবে তাকেও কি একসচেঞ্জের জন্য পণ্ডিতদের পায়ে তেল দিতে হয়? বোধ হয় না। কারণ তারা তো বর্বর! আর আমরা সভ্য। "মহামানবের তীরে" বাস করি।

মূল কথায় ফিরে যাইঃ মোপাসাঁ লিখছেন, "রীতিমত চটে যেতেন ফ্লোবের, যখন আর্ট সমালোচকরা সাহিত্যে "নীতি" "সাধুতার" দোহাই পাড়তেন। তিনি (ফ্লবের) নিজেই বলেছেন, 'যবে থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে, সর্ব মহান লেখকই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে এই সব ক্লীবদের 'সদুপদেশের' (উদ্ধৃতি চিহ্ন অনুবাদকের) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।'

("Depuis qu 'existe 1 'humanite, disait-il, tous les grands ecrivains ont proteste par leurs oeuvres contre ces conseils d'impuissants.") ৪

গুরুদেও এই আপ্তবচনটি সসম্মান উদ্ধৃত করে মোপাসাঁ বলছেন, "সুষ্ঠু, প্রতিষ্ঠিত সমাজজীবনের জন্য সুনীতি তথা সাধু আচরণ অপরিহার্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের তো কোনো সম্পর্ক নেই। ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো বর্ণনা করা—তা তার প্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তিই হোক আর কুপ্রবৃত্তিই হোক। নীতিগর্ভ উপদেশ বিতরণ করা কিংবা অভিসম্পাত দেওয়া, অথবা তত্ত্বতথ্যের প্রচার করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা তো তার কর্ম নয় (অর্থাৎ এসব প্রচার কর্মের 'মিশনারি' সে নয়)। এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক কোনো গ্রন্থই আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে না।

তৎসত্ত্বেও কোনো সার্থক গ্রন্থ যদি সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়, তবে সেটা লেখক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে নয় (সেটা 'malgre l'auteur' 'inspite of the author', সেটা লেখকের ইচ্ছা —এমন কি অনিচ্ছাবশত নয়), তিনি যে-ভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সে সেটা সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়েছে।"

অর্থাৎ "আনকেল টমস ক্যাবিন" যদি দাসত্ব প্রথাকে নির্মম আঘাত দিয়ে থাকে যদি এমিল জোলার 'জা ক্যুজ' ('আই একুজ'='আমি ফরিয়াদ জানাই') ৫ মিলিটারি স্বৈরতন্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকে, তবে তার কারণ, পুস্তকদ্বয় অনুভূতি সঞ্চারণে এমনই কৃতকার্য হয়েছিল যে, এগুলি তখন আর্টের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছে।

মোপাসাঁ বিশুদ্ধ আর্ট, আর্টে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে আরো অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো উপস্থিত থাক।

*

ছুৎবাই রোগে আক্রান্ত 'পাদি পিসি' সব দেশেই আছেন—তবে ফ্লবের-মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে ফ্রান্সের পাদি পিসিরা বড্ডই মুষড়ে যান। বস্তুত ফ্লবের-শতাব্দীর শেষের দিকে পেণ্ডুলাম অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের যে মিনিসট্রি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন একদা ফ্লবেরের

---

(৪) Dumesnil, Correspondance, পৃ, ১০৯।

(৫) বইখানা অবশ্য মোপাসার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়ে শুধু ফ্রান্সে নয়, সর্ব সভ্য বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি বিশেষ করে এ-বইখানা যে উল্লেখ করলুম, তার কারণ, প্রবাদে আছে "পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সর্ড" "লেখনী তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী" —এবং এই বইখানি তৎকালীন ফরাসী সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী মদমত্ততাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে প্রবাদবাক্যটি সপ্রমাণ করে। আমার জানামতে এটি লেখনী তরবারিতে একমাত্র সরাসরি যুদ্ধ।

বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিলেন, তাঁরাই তখন আইন করেছেন, যে-সব পুস্তকে ভগবানের উল্লেখ থাকবে, মিনিসট্রি সেগুলো তাঁদের পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কিনবেন না। সে খবর শুনতে পেয়ে কট্টর জাত নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "এ আবার কি রকমের লিবার্টি—যে লিবার্টি মানুষকে ভগবানের নাম প্রচার করতে দেয় না?"

বোভারি মোকদ্দমার একশ' বছর পর আবার পেণ্ডুলাম অন্য প্রান্তে গেছে। টপলেস ডাইনি পোড়াবার জন্য ফ্রানসেই এখন সবচেয়ে পুলিসের দাপট, নাইট-ক্লাব টাইট দেওয়াতে এদের উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই। আমাদের অবশ্য তাতে কিচ্ছুটি বলবার নেই।

কিন্তু একশ' বছর পূর্বে যে বোভারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে মার খেল ফ্রানস, সেই ফ্রানসই চেষ্টা করছে এখন, আবার মাদাম বোভারির সর্বাঙ্গে বোরকা চাপিয়ে তুর্কীপাশার হারেমবন্ধ করতে! হিটলার যখন 'পবিত্র' জর্মন ন্যাশনালিজমের দোহাই কেড়ে ইহুদি বই পোড়াতে আরম্ভ করেন তখন এক মার্কিন গুণী বলেছিলেন, "জর্মনী পুটস দি ক্লক ব্যাক!" ফ্রানসে যে তারই পুনরাবৃত্তি! এ-ও এক নয়া নাৎসিবাদ।

দ্য গল লোকটিকে আমার খুব পছন্দ নয়। যদ্যপি গত যুদ্ধের সময় তাঁর আদর্শ এবং চার্চিলের আদর্শে কোনো পার্থক্য ছিল না, তবু চার্চিল পদে পদে দ্য গলের দম্ভ দেখে অতিষ্ঠ হতেন। প্রধান অভিনেত্রী বা প্রিমা দন্নার মত তিনি এমনই অতি অল্পেতে ঠোঁট ফোলাতেন, গোসাঘরে আশ্রয় নিতেন৬ যে, আইজেনহাওয়ারের মত মাথা ঠাণ্ডা মানুষ পর্যন্ত—যিনি কি না মন্ট্রীর মত দেমাকি লোককেও সামলাতে পেরেছিলেন—তাঁর এদিকটা লক্ষ করে লেখেন

"We felt that his qualities were marred by hypersensitiveness and on extraordinary stubbornness in matters which appeared inconsequential to us. My own wartime contacts with him never developed the heat that seemed to be generated frequently in his meetings with many others." ৭

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সী পড়ে তাঁতী। চিতে বাঘের চিত্তির মুছতে লেগে গেছেন মঁসিয়ো দ্য জেনেরাল শার্ল দ্য গল। তা হলেই তো 'চিত্তির'! তবে শুনেছি, এ রবির পিছনেও নাকি একটি বিরাট ছায়া আছে। তিনি নাকি মাদাম। তিনিই নাকি ফ্রানসের নব জোয়ান অব আর্ক পদি পিসি।

এ-সংবাদে আমার মনে পড়লো, এমিল জোলারও নাকি কয়েকটি পদি পিসি দোস্ত ছিলেন। তাঁরা নাকি একাধিকবার বায়না ধরে তাঁকে বলেন, "ভাই, তুমি লেখো ভালো; কিন্তু তোমার কোনো বই-ই নিঃসংকোচে পুত্রকন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায় না। একখানা 'ক্লীন' বই লেখো না কেন?"

জোলা ঢোঁক গিললেন।

সে-বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, মসিয়ো জোলা যখন শুয়োরটার মত কাদাতে গড়াগড়ি দেন তখন তিনি সেটি করেন বড়ই গ্রেস-ফুলি (অর্থাৎ প্রকৃত সমঝদার আর্টিস্টের মত), কিন্তু তিনি যখন বন্ধুজনের অনুরোধে প্যাখনা গজিয়ে দেবশিশুপারা স্বর্গোপানে ওড়বার চেষ্টা করেন তখন সেই "এলোপাতাড়ি ড্যানার বাড়ি" দেখে হাসি সামলানো রীতিমত মুশকিল হয়—হি ডাজ ইট্ মোস্ট গ্রেসলেসলি। তারপর তিনি বলেন, আই প্রেফার মসিয়ো জোলা ওয়ালোইং ইন মাড্—মসিয়ো জোলার নর্দমাতে হুটোপুটি করাটাই আমি পছন্দ করি বেশী।৮

*

প্যারিস ড্যানা গজিয়ে ফেরেশতার মত বেহেশৎ পানে ওড়বার চেষ্টা করছে—ইয়াল্লা!!

---

৬ আজকের দিনের সম্মানিত মহিলারা যে খাস কামরায় অতিথি-অভ্যাগতকে "আপ্যায়িত" করেন তার নাম 'বুদোআর'। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে। অনেকেই মনে করেন এটি "বুদের"= "to sulk"="অভিমান করা" থেকে এসেছে।

৭ ক্রুসেড ইন্ ইয়োরোপ, পৃ ৪৫৬।

৮ কাতরকণ্ঠে নিবেদন, দুনিয়ার কুল্লে বই—তা আমার জরুর মত কমই হোক—আমি যোগাড় করি কি প্রকারে? তাই অনেক স্থলেই স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরস্বতী সাক্ষী, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কারো প্রতি অধম অবিচার করে না। এসব মহাজনদের বচন খাঁটি সোনার মোহর। উদ্ধৃতির চাপে ব্যাঁকাট্যাড়া হয়ে গেলেও সোনা সোনাই থাকে।

কলকাতার ডায়েরি

লকাতারডায়েরিকলকাতারডায়েরি

পাড়ার নতুন ডাক্তারখানা খোলাতে আমরা সবাই খুশী।—যাক, ওষুধের জন্যে আর দূরে এ-দোকান ও-দোকান ছুটতে হবে না। মালিকও একদিন এসে সবিনয়ে বললেন, হে' হে', মানে আপনাদের ভরসাতেই দোকান খোলা, হে' হে' মানে বাঙালীর ব্যবসা, বুঝতেই পারছেন তো, আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা মানে হে' হে'—

হে' হে'-বাবুকে অভয় দিলাম। সত্যিই তো, বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে, বিশেষ করে ব্যবসা জগতে সে যখন এতই কোণঠাসা।

দিন যায়, হে'-হে' বাবুর সংগে মাঝে মাঝে দেখা হয়, প্রতিবারই তিনি তাঁর দোকানের বাঙালীত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, সেই মুহূর্তে আমার শিরায়ও 'বাঙালী বাঁচাও' আওয়াজ অনুরণিত হয় এবং বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ লাগার অপেক্ষায় চেয়ে থাকি।

বলা বাহুল্য, বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। এই একটা জিনিস, যার জন্যে কাঠখড় পোড়াতে হয় না, মানত করার প্রয়োজন পড়ে না, সাধাসাধিরও দরকার নেই।

আমার এক বয়স্কা আত্মীয়াকে নিয়ে গেলাম ওই বাঙালী পাঁঠা, থুড়ি বাঙালী ওষুধের দোকানে। সেই হে'-হে' ডাক্তারকে জানালাম বৃত্তান্ত। ভীষণ মাথা ঘুরছে, এখনই ব্লাডপ্রেশার কেমন দেখা দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'বসুন' বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। আমরা বসলাম। মিনিট দশ পর ফিরে এলেন। না, প্রেশার মাপা যন্ত্র নয়, মুরগির মাংসের এক প্যাকেট হাতে নিয়ে। সংগে অন্য একজন ভদ্রলোক। মুহূর্তে দুজনে গভীর আলোচনা। বিষয়, মুরগি কোথায় সস্তা পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে আরও দু-চারজন পরোপ-চিকীর্ষু বাঙালী খদ্দের প্রেসক্রিপশন হাতে দোকানে ঢুকেছেন। হে'-হে' ডাক্তারের সেদিকে লক্ষ্য নেই, তিনি তখন বঙ্গ মার্গ ছেড়ে কুক্কুটমার্গে। দোকানের অন্য যাঁরা কর্মচারী, তাঁদেরও দেখলাম খদ্দেরের চেয়ে মুরগির দিকেই বেশী আগ্রহ। হওয়াই স্বাভাবিক।

মিনিট কুড়ি আরও গেল। আমি চোখে দেখছি প্রেশার মাপা যন্ত্রের নল, দোকান-মালিক দেখছেন মুরগির ঠ্যাঙ। মাঝে মাঝে আক্ষেপ : "খাওয়ার সুখ আর নেই।"

আর সহ্য হল না, উঠে পড়লাম। দোকান-মালিক আবার "একটু বসুন", বলতেই বসে পড়লুম না, বললুম, "আশ্চর্য আপনাদের ব্যবহার, রোগী নিয়ে এসেছি অথচ বসে আছি তো আছিই. চললাম।"

রেগেমেগে বেরিয়েও এলাম। পেছন

থেকে মন্তব্য শুনতে গেলাম, বাঃ রে দোকান খুলেছি বলে খাওয়ার জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে পারব না! যান চলে, বয়েই গেল আমার।'

আর একদিনের ঘটনা। ডেকরেটরের দোকানে যাওয়া দরকার। কাছেই একটি পেয়ে গেলাম। সাইনবোর্ড উজ্জ্বল, কিন্তু সকাল বিকাল দুপুর যখনই যাই, দোকানে তালা মারা। ভাবলাম বোধ হয় পটল তুলেছে। না, আমার ধারণা ভুল। একদিন সকালে দোকান খোলা পেয়ে গেলাম। কিন্তু ও হরি, দোকানী নেই। সব সাজানো—শামিয়ানা, লাল শালু, কাপ গেলাস, হাতা বেড়ি; কেবল চেয়ার খালি।

হয়ত কাছেপিঠেই কোথাও আছেন ভেবে বেনচিতে বসে পড়লাম, দু চারবার গলা খাঁকারি দিলাম, 'কে আছেন' বলে ডাকও পাড়লাম। আশ্চর্য, তবু সাড়া নেই। পাশের দোকানীকে জিগগেস করলাম। হদিস মিলল না।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, অবস্থা যথাপূর্ব। বসে আছি তো বসে আছিই। চল্লিশ মিনিটের মাথায় দেখলাম, সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে গোলগাল চেহারার এক গুঁফো ভদ্রলোক দোকানে এলেন। এসেই হুংকার—'কী চাই।' গলার দাপটে মালুম হল, ইনিই এই সজ্জা-বিপণির হর্তাকর্তাবিধাতা। বললাম, অনেকক্ষণ বসে আছি, কোথায় ছিলেন?

মনে হল আমার প্রশ্নটি তাঁর পছন্দ হয়নি। চিরতা-গেলা গলায় বললেন, "তাতে আপনার কী দরকার। রোজ এই সময় আমি হরিশের দোকানে চা খেতে যাই। এ-সময় এলে বসতে হবে-ই। বলুন, ফাংশন হবে, কী চাই।"

কথাবার্তার ধরনে চাওয়ার প্রবৃত্তি আর নেই, বললাম, নমস্কার।

আমার চলে আসাতে ভদ্রলোকের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে প্রভাতী সংবাদপত্রে মন দিলেন। আমি ছুটলাম দূরে অন্য ডেকরেটারের সন্ধানে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই তৃতীয় অভিজ্ঞতা এক খাবার দোকানে। বেলা দুপুরে বন্ধুকে নিয়ে ঢুকেছি। ঢুকে দেখি, ক্যাশিয়ারবাবু ঢুলছেন, পাশের টেবিলে পা তুলে বিড়ি ফুঁকছে একটি ছোকরা এবং দু কাপ চা নিয়ে দুই খদ্দেরে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধেছে দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। স্থানটা ওদের বৈঠকখানা না চায়ের দোকানে খেয়াল নেই।

কোণের টেবিল দখল করে বসলাম। টেবিলে নানা প্রকার তরল পদার্থ, চেয়ারের পায়া অসমান। নোংরা ছেঁড়া মেনু-কার্ড নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর সেই বিড়িখেকো, ছোকরাটি ঘেমো শরীর নিয়ে দু গ্লাস জল রেখে দিয়ে গেল। জল চাইনি, কাটলেটের অরডার দেব, কিন্তু নোংরা গেঞ্জি আর ছেঁড়া খাকি হাফপ্যান্ট পরা ছোকরাটি জল দিয়েই কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ক্ষুৎবোধক নুনদানি দিয়ে টেবিল চাপড়ালাম, 'ওহে কে আছে' বলে দুবার চেঁচালাম, তবু ক্যাশিয়ারবাবুর নিদ্রা নির্বিঘ্ন, অন্য ক্রেতাযুগলের রাজনৈতিক আলোচনা অবিরাম এবং সেই কিশোর-কুমারটি নিরুদ্দেশ।

অগত্যা জলই সই, কিন্তু গ্লাসে হাত দিতেই আঙুল পিছলে গেল, গ্লাস তো নয়, ঠিকমত না মাজার ফলে মাগুর মাছ, হাতে নিলেই ফসকে যেতে চায়। আবার ডাক পাড়লাম, ছোকরাটি চোখ কচলাতে কচলাতে এল কাঁধের লাল গামছা দিয়ে টেবিল মোছার চেষ্টা করে টেবিলটিকে আরও নোংরা করল, এবং অত্যন্ত নির্লিপ্ত গলায় অবশেষে জানতে চাইল আমরা কিছু খাব কিনা। কাটলেট আছে?—নেই। ডিমের ডেভিল? নেই।—মাংসের চপ?—নেই। তবে? তবে কী আছে? চা টোস্ট--বেশ, তাই নিয়ে এস।

অনেকক্ষণ পর বহু কাঙ্ক্ষিত চা টোস্ট এল। খেলামও। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, দাম নেবার কোন চাড় নেই। তবে কি এরা বিনি পয়সায় খাওয়ায়। হতেও পারে, খদ্দেরদের প্রতি যে-রকম এদের 'আদর-যত্ন', তাতে এই অনুমান অস্বাভাবিক নয়।

তবু যাচাই করা ভাল। পাঁচ টাকার একখানা নোট নিয়ে ক্যাশ বাকসের কাছে গেলাম। 'ও মশাই' ও মশাই' বলে গলা ফাটানোর পর ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙিয়ে পুরো ব্যাপারটা জানালাম। ঘুমে জড়ানো গলায় তিনি দয়া করে বললেন, ভাঙানি নেই।

দেখুন না আছে কিনা; এখন কোথায় আবার যাব টাকা ভাঙাতে।

ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, বলছি ভাঙানি নেই, তবু চেঁচামেচি করছেন?

হামলার ভয়ে বেরিয়ে এসে পানের দোকান থেকে টাকা ভাঙিয়ে এনে দাম চুকিয়ে দিলাম। এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, আর এ দোকানে নয়।

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবু তিনটি ঘটনা একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়ার কারণ আছে। যতদিন যাচ্ছে, কলকাতা শহর থেকে ছোটখাট বাঙালী দোকান কমছে। বাড়ছে অবাঙালীদের অজস্র দোকান। ভিড় সেখানেই। দেখবেন বাঙালী খাবার দোকান টিমটিম করে চলছে, অবাঙালীর হাতে গেলেই ভোল পালটায়, খদ্দেরের মহোৎসব লাগে।

তার মূলে কী। শুধুই কি টাকার অভাব আর অন্য রাজ্যের "চক্রান্ত?" নাকি এইভাবেই বাঙালী বাঙালীকে দেখে নিচ্ছে?

চাণক্য

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া ১২॥

(স্বনামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইতেছে)

শিলাপটে লেখা ৭॥

('প্রস্তর স্বাক্ষর'রূপে চলচ্চিত্র উঠিতেছে)

বাপ্পির ডাক ৪৲

(ইহারই একটি কাহিনী — 'সন্দেশ' চলচ্চিত্র)

সাত পাকে বাঁধা ৫,

(প্রখ্যাত চলচ্চিত্রের কাহিনী)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

দুটি ২॥ ("নূতন জীবন" চলচ্চিত্রের কাহিনী)

উপকণ্ঠে ৯,

দহন ও দীপ্তি ৬,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

দোলগোবিন্দের কড়চা ৬,

জরাসন্ধের

লৌহকপাট (৪র্থ) ৭॥

ছায়াতীর ৫, ছবি ৪,

আশাপূর্ণা দেবীর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪,

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩০,

একক দশক শতক ১৪,

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥

লালকেল্লা ১৪,

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫॥

শচীন্দ্রলাল রায়ের

বাবরের আত্মকথা ৫॥

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কঙ্কাবতী ৫॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

বড়বাবু ৭,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

তালপাতার পুঁথি ১৫,

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

স্বপ্নতনু ৪॥

মনোজ বসুর

সাজবদল ৫॥

বন কেটে বসত ১০,

আশাপূর্ণা দেবীর

রঙের তাস ৭,

উড়োপাখী ৫॥

ডাঃ সুকুমার সেনের

নট নাট্য নাটক ৪॥

ডাঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর

রাজস্থান কথা ৮,

মহাশ্বেতা দেবীর

বায়স্কোপের বাক্স ৬,

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলধ্বনি ৪॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মৈনাক ৪॥

সুমথনাথ ঘোষের

বনরাজীনীলা ৭,

নীলাঞ্জনা ৭॥ রোশনাই ৪,

তরুণকুমার ভাদুড়ীর

সন্ধ্যাদীপের শিখা ৪,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে ৭,

নির্মলকুমারী মহলানবিশের

বাইশে শ্রাবণ ৬,

নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হইল॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গাদপি গরীয়সী

১ম—৫, : ২য়—৫॥০ : ৩য়—৬,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ॥ ৩৪-৮৭৯১

চতুর্থ যোজনার প্রারম্ভে

দেশ যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা এখন জরুরী। ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ও স্বয়ং-নির্ভর করে তোলা হল আমাদের বৈষয়িক উদ্যোগের অভীষ্ট। কথাটার তাৎপর্য হচ্ছে, খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দান, জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার সংহতিসাধন, ব্যয়সাধ্য নয় এরকম উপায় বা পন্থায় সম্পদ নির্মাণ ও স্থিতিরক্ষা, জনগণের সক্রিয় সমর্থন বা সহযোগিতা অর্জন এবং ভারতের নিজের কারিগরী দক্ষতা ও উপকরণের পূর্ণতম ব্যবহার—এ সবই হবে বৈষয়িক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বছরের পর বছর আমরা শুধু চোখ-ধাঁধানো ব্যয়-বহুল প্রকল্পগুলির উপর জোর দিয়ে এসেছি; তাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা খুব বেশি বেড়ে গেছে। প্রশাসনিক অক্ষমতা, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি এবং বিলম্ব ঘটার ফলে ভারী মূলধন নিয়োগ থেকে আশানুরূপ কাজ পাওয়া যায়নি। ভারত আজ তাই বৈদেশিক সাহায্যের এতটা মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। অন্য দেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে আমরা যদি নিজেদের সম্পদ ও উপাদানরাশিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে সম্ভবত আর্থিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

বৈদেশিক সাহায্য ও আমদানির বহর বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। ১৯৩৭-৩৮ সালে যে সাত বছর শেষ হয়েছে সেই সময়ের ভেতর গড়ে দৈনিক মাথা পিছু ১৪·২ আউন্স প্রধান খাদ্যশস্য পাওয়া গিয়েছিল; ১৯৬৪-৬৫ সালে যে সাত বছর শেষ হয়েছে তার মধ্যে গড়ে মাথা পিছু যা প্রধান খাদ্যশস্য পাওয়া গেছে তার পরিমাণ হল দৈনিক ১৩·৯ আউন্স। ঐ দুই সময়ের ভেতর খাদ্যশস্য আমদানি (৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন) খুব বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণ প্রাক-যুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি বলে মনে হয়।

উন্নয়ন ও স্থিতি রক্ষা

স্পষ্টত, আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য প্রকৃত ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে জনসাধারণের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে তা দেখতে হবে; কেননা, জনগণ অংশগ্রহণ না করলে ছোট আকারের পরিকল্পনাও বাস্তবে অনুদিত করা যায় না। পরিকল্পনা প্রয়োগের উপর এখন সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। দ্রব্যমূল্য ও আর্থিক স্থিতি বজায় রেখে বৈষয়িক উন্নয়ন হচ্ছে এখন আমাদের লক্ষ্য।

চতুর্থ যোজনার খসড়া-লিপিতে ২৩,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে। যে পরিমাণের আভ্যন্তরিক অর্থসম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা করা হয়েছে বাস্তবে তা সম্ভবপর হবে কিনা সেটা ভাববার বিষয়। ভরসার কথা, সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ভারতকে ১৫ কোটি ডলার নতুন ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে। এই ঋণ কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না; তার উপর সুদ লাগবে না এবং ৫০ বছরের ভেতর কর্জ শোধ করতে হবে। ভারতীয় শিল্পের বর্তমান উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগাবার জন্য যে সব কলকব্জা, কাঁচামাল আমদানি করার দরকার তা ঐ ঋণের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে সম্ভবপর হবে।

সরকারী অংশে যে একটা বড়ো পরিমাণের মূলধন স্পষ্টত উৎপাদনশীল নয় এমন ক্ষেত্রে নিয়োগ করার কথা হয়েছে তা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করা হবে অথবা জিনিসপত্র বণ্টনে রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করবে এ ধরনের সদিচ্ছা প্রকাশই যথেষ্ট নয়, বাস্তবক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।

আয় বণ্টনের অসমতা

গত পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পে যে বিপুল অর্থব্যয় করা হয়েছে তার ফলে জাতীয় আয়ের বণ্টন উচ্চ-আয় শ্রেণীর অনুকূলে হয়েছে। প্রথম, ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বাঁধা-আয়ের লোক, শ্রমিক ও জনসাধারণের প্রকৃত আয়ের অবক্ষয় ঘটিয়েছে; অন্য দিকে, কারবারী ও ব্যবসায়ীদের আয় সেই অনুপাতে বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত আমদানি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকায় ব্যবসায়ী, মধ্যবর্তী ব্যক্তি ও অসাধু সরকারী কর্মচারীরা একচেটিয়া লাভ করতে পেরেছে। তৃতীয়, সরকারী অংশের সম্প্রসারণ থেকে ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রভূত লাভ করার সুযোগ পেয়েছে।

পরিকল্পনার আকার ছোট হলেও তার প্রয়োগ এবং উন্নয়নমূলক অর্থব্যয়ের যে দিকগুলি অনভিপ্রেত সেগুলি সম্বন্ধে সতর্ক হবার সময় এসেছে। একথা একবার স্বীকার করে নিলে চতুর্থ যোজনার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদের কোন কারণ থাকে না। বর্তমানে দেশে যে ৪০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে, স্বাবলম্বনের ভিত্তি হিসাবে চতুর্থ পরিকল্পনায় ঐ উৎপাদন যে চারগুণ বাড়াবার সংকল্প নেওয়া হয়েছে তা অনুমোদনযোগ্য। সেইরকম, শিল্পের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার ভেতর সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কৃষির প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যবস্থা থাকবে এই সিদ্ধান্ত সংগত হয়েছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

[ষোল]

৩০
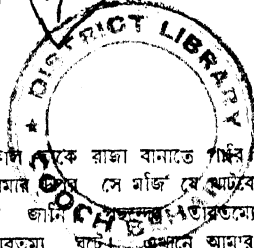
মহিমও ছুটে পিছনে এলো, 'শোনো শুধু আর একটা কথা শুনে যাও—' এখন আর মহিমের তত্তো ভয় করছে না, এখন সে গন্ধ শুঁকে বুঝেছে জালে আটকা পড়েছে শিকার। সবটুকু না হোক, একটুখানি টোপ কোথায় যেন বিঁধেছে গলায়। হয়তো উগরে ফেলবে, কিন্তু সাবধানে এগুতে পারলে উগরোবার আগেই আর একটু সিঁধিয়ে দেওয়াও অসম্ভব না। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে ছুঁড়ে মারতে লাগলো কথার বাণ, 'কোটি কোটি টাকার মালিক আমার মনিব। চেহারা কন্দর্পের মতো। শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ। তাঁর কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা। একটা ইচ্ছের দাম জীবনের মতো মূল্যবান। সেজন্য সে সর্বস্ব পণ করতে পারে। এখানে তার সেই ইচ্ছেই প্রবল হয়েছে, এখন এটাই তার একমাত্র কামনা বাসনা জেদ অহংকার সব। আমি বলছি, এই সুযোগ তুমি ছেড়ো না, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না, বরং মোচড় দিয়ে আরো বেশী টাকা তুমি চেয়ে নাও, আমি আদায় করে দেব।'

গগনবাবুর পা তাঁর অজান্তেই আবার থামলো। তিনি হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম নামলো, কেমন ক'রে উঠলো মাথার ভিতরটা, ভয়ানক দুর্বল বোধ করলেন, কোণের দিকে এসে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিলেন।

মহিম আরো একটু এগিয়ে এলো, 'এই আমি, এই মহিম সরকারই তাঁর ডান হাত বাঁ হাত। তাঁর প্রতাপে এই শহরে আমি একখানা বাড়ির মালিক, ভাড়া খাটিয়ে মাসে দেড় শো টাকা পাই। নিজে কোয়ার্টারে থাকি, পয়সা লাগে না, খাই মাগন। এই যে গাড়িখানা এও আমার কাজেই খাটে। আমি ইচ্ছে করলে আজ যে ফকির, প্রভুর মর্জিতে কাল তাকে রাজা বানাতে পারি। অন্তত তোমার উপর সে মর্জি যে খাটবে তা আমি জানি। প্রয়োজনের তারতম্যে দামেরও তারতম্য ঘটে। এখানে আমার মনিব দু' হাতকে দশ হাত বানাতেও গররাজী হবেন না। শুধু তোমাকে একটু স্থির হতে হবে, মন বাঁধতে হবে, পূর্বাপর বিবেচনা করে বলতে হবে বিনিময়ে কী চাও, কতো চাও। দু' অংককে তিন বানাতে পারো, তিনকে চার করাও হয়তো কঠিন হবে না। সাধারণ রেটের দ্বিগুণ টাকা আমি পাইয়ে দেব তোমাকে। বলো তুমি কতো চাও।

গগনবাবু চুপ।

'ঘটনাটা শোনো তবে, দিন পনেরো আগে তোমাদের পাড়াতেই এসেছিলেন সভাপতিত্ব করতে। নাম বলবো না। নাম শুনলে চিনতে পারবে। তোমাদের এখানকার ছেলেরা তাঁর কাছে ডোনেশন চেয়েছে, টিউবওয়েল করবে, লাইব্রেরী করবে, কাঁচা নর্দমা পাকা করবে—লোকটার দানের হাতেও মুঠো নেই; শুধু মনে লাগলেই হলো। ঐ মনে লাগাবার জন্যই প্যাড়া ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলো ছেলেরা নিজেদের দুঃখকষ্টের ছবিটা তুলে ধরেছিলো চোখের সামনে। কিন্তু কী ছবি যে আটকে গেল চোখে! সব কিছুর সংগে তোমার মেয়েকেও দেখলেন তিনি। তারপরেই কাজ গেল কর্ম গেল, জেদ্ চাপল, ঝোঁক চাপল, এখন এই মেয়ে তাঁর চাই-ই চাই। তার জন্যে যা লাগে, যতো লাগে। খুঁজে খুঁজে বার করেছি এতোদিনে। এখন তুমি বলো, কতো টাকা চাও তুমি।'

'কিছু না। কিছু না। তুমি যাও। তুমি জাহান্নমে যাও।'

মহিম সরকারের মুখ বিগলিত হাস্যে আকর্ণ বিস্তৃত হলো। 'যা বলেছো' মাথা নাড়লো সে, 'জাহান্নমেই যাচ্ছি। আর যে দিকেই আমাকে আটকাও, ও রাস্তা থেকে কেউ ফেরাতে পরবে না। তা দেখ সেসব তো হ'লো গিয়ে পরজন্মের কথা। আমার বউও আমাকে বলে, 'তুমি কী করো আর না করো কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। আমি স্ত্রী হ'য়েও তোমার স্বরূপটি চিনতে পারলাম না। মিথ্যে কথা তো ঠোঁটের আগে। নরকেও ঠাঁই হবে না তোমার। তপ্ত কড়াইতে ভাজবে তোমাকে। আমি তাকেও বলি, সে তো সব পরজন্মের কথা। তপ্ত কড়াইতে যদি ভাজেই ভাজুক না, কী ভাজবে বলো তো? নরকেই যাই আর স্বর্গেই যাই, আগেই তো দেহটা পুড়ে ছাই করে দেবে তোমরা। ভাজা-পোড়ার আর বাকী থাকবে কী? হাঁ হাঁ হাঁ'—পিশাচের মতো হাসলো মহিম, 'বুঝলে গগন, এ জন্মে যাকে তোমরা পাপ বলো, তাতে আমার কোনো আস্থা নেই। তোমাদের ধারণামতো

পাপের যতগুলো পথ আছে, তার প্রায় অনেকগুলোতেই আমি ঢুকেছি, নিষিদ্ধ কর্ম অনেক করেছি, কর্মসিদ্ধির জন্য কোথাও পিছপা হইনি, কিন্তু অপকার তো কখনো হয়নি সেজন্য। খেয়ে-পরে ভালোই তো আছি। দেশ গেছে গ্রাম গেছে, আত্মীয়-পরিজন কে কোথায় ভেসে গেছে, একটি পয়সা সম্বল না নিয়ে এসেও কলকাতার পথে পথে ঘুরিনি। আর যাকে তোমার পুণ্য বলো সততা অথবা বিবেক বলো তার পরিণতিও তো দেখছি চোখের সামনে। স্বীকার করতে তো লজ্জা নেই, বলতে গেলে আমি তোমাদের সংসারে এক ধরনের চাকরই ছিলাম। কিন্তু এখন? পুণ্যবলে তোমার বা কী হলো, আমার বা কী হলো। পাপের ফলে আমিই বা কেমন আছি আর তুমিই বা কেমন আছো দেখ তুলনা করে।'

গগনবাবু চুপ।

'এখন কথাটা হচ্ছে এই যে, আমার মনিবের যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন সে ইচ্ছে তার কেউ রোধ করতে পারবে না। ইচ্ছে দমন করতে শেখেনি ওরা। ওরা বিধাতার বরপুত্র। চাইলেই পেয়ে অভ্যাস। সেই থেকে এই কলোনী চষে ফেলছি আমি, কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না কে। উঃ, ক'টা দিন যেন নাওয়া খাওয়া ছিলো না। সন্ধান পেলুম মাত্র কাল। দেখলুম লক্ষ্মী-প্রতিমা ঘাট আলো করে বাসন মাজছে বসে।'

হঠাৎ গগনবাবু হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন পথের মধ্যে।

৩১

লম্বা চওড়া পিচঢালা রাস্তাটা থমথম করছিলো। শনশন করে বাতাসের শব্দ হচ্ছিলো। পাখিদের প্রথম প্রহরের ডানা ঝাপটাবার আওয়াজ হ'লো একবার, তারপর আবার চুপ। নির্জনতার চাপে মনে হচ্ছিলো এখুনি দম বন্ধ হয়ে যাবে। এ পথে লোক চলে না, একটি গাড়ি যায় না। কেবল রাস্তার এপাশে-ওপাশের পোড়ো সৈন্যা-বাসের অন্ধকার জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলে আর নেবে। এখন যেখানে সব সর-কারী নিবাস অনেক জায়গা জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে নতুন একটি লাল সুরকির রাস্তা চলে গিয়ে-ছিলো ভিতরে, সাজিয়ে লাগানো বড়ো বড়ো গাছের ডালগুলো দু' পাশ থেকে এ ওকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কেমন শোভা বাড়িয়েছিলো খুব। সেই রাস্তায় অনেক বড়লোকের বসবাস ছিলো। সিনেমার তারকারা নিভৃত হতে স্টুডিওপাড়ার কাছা-কাছি এই অঞ্চলটাতে এসে বাসা বেঁধে-ছিলো। তখন তারা জানতো না তাদের এই নিরালা নিকুঞ্জের অজস্র বৃক্ষ সংবলিত প্রশস্ত সবুজ পাড়াটিকে সমস্ত সৌন্দর্য, শীতলতা, সভ্যতা, আভিজাত্য একদিন মত্ত হাতির মতো তচনচ করে দেবে যতো সব নোংরা রিফিউজিরা এসে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা দিগন্তবিস্তৃত মাটির প্রান্তর, যা হয়তো কখনোই কোন কাজে ব্যবহৃত হবে না, অমনিই পড়ে থাকবে সেইসব ভূ-সমুদ্রে খুদে খুদে কুটির উঠে যাবে। তবু, এ দিকটা, এখনো বড়ো বড়ো ঘাসের জঙ্গলে আকীর্ণ আছে। গোল গোল গড়ানো চালের অ্যালিউমিনিয়মের তৈরী সৈন্যাবাসের জানালায় রিফিউজিদের জবর দখল করা মুখের ছায়া নেই, লণ্ঠনের আলো নেই, ভাঙা সংসার জোড়া লাগাবার ব্যর্থ হাহাকার

নেই। শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার ফিকে ক'রে আস্তে আস্তে চাঁদ উঠে আসছিলো আকাশে।

মহিম সরকার একটু চুপ ক'রে থেকে নিচু হ'য়ে গগনবাবুর পিঠে হাত রাখলো, নরম গলায় বললো, 'কাঁদছো কেন? আমি তো এখুনি কিছু বলছি না, আমি জোরও করছি না, আমি বলছি তুমি একেবারে উড়িয়ে দিও না, ভেবে দেখো। এ কথাও ভেবো, এ অবস্থায় চললে শীগগিরই তুমি সমূলে ধ্বংস হবে। একটিকে সামান্য একটু ক্ষতি অথবা খুঁত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সব ক'টিকেই আরো অনেকে বড়ো ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেবে। যে নৈতিক চরিত্রের এতো মূল্য তোমার কাছে, তুমি ভাবো সেই নীতি থেকে একটি মেয়েকেও রক্ষা করতে পারবে তুমি? মা তো মরতেই চলেছেন, তোমার শরীর ভেঙে পড়তেই বা কতোক্ষণ? কে কখন চোখ বুজবে এ কি বলতে পারে কেউ? তারপর? তারপর কে রক্ষা করবে তাদের? ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে।'

'না, না, না—'

'মাত্রই কয়েকটা দিন।'

'না, না—'

'আমি নিজে এসে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো, তুমি আমার ঠিকানা রেখে দিয়ো।'

'না।'

'এক হাজার—'

'না—'

'দু' হাজার—'

'না—'

'তিন, চার, পাঁচ—'

প্রত্যেকটা অঙ্কের সংগে সংগে কাঁপুনি বাড়তে লাগলো গগনবাবুর। মহিম সরকার শেয়ালের চোখে তাঁর সমস্ত অঙ্গভঙ্গী লক্ষ করতে লাগলো। মুখে তার উল্লাস ফুটে উঠলো।

মনিবের ইচ্ছা। মনিবের ইচ্ছা আর কে এমনভাবে পূরণ করতে পারে তার মতো। এই মেয়ের উপর মনিব একটা অসংগত দাম ধরেছে। একা তো সে-ই খুঁজতে বেরোয়নি, আরো দালাল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। খুঁজে খুঁজে তারা যতোবার ব্যর্থ হ'য়ে ঘরে ফিরছে ততোবার বেড়ে যাচ্ছে টাকার অঙ্ক। জেদ। মর্জি। মতলব। এইসব প্রবৃত্তির তাড়নাতেই এরা গেল। নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কী না করতে পারে? নইলে মাত্রই তো একটা মেয়ে, তার জন্য এমন মরণ-কামড়? অবিশ্যি এইই তার চরিত্র। এমনিই তার জেদ। অহংকার। যা চাই তা চাই-ই। না পেলেই সব গেল।

এই ভয়ঙ্কর তৃষ্ণায় এই পানীয়টি নিয়ে যখন হাজির হবে মহিম, কী বলবেন তিনি? মহিম জানে সে কথা। আগেকার দিনের রাজ-রাজড়াদের মতো কণ্ঠের মণিহারও খুলে দিতে পারেন। হুকুম হয়েছে এনে দাও, তার বিনিময়ে যা লাগে, যতো লাগে। ধূর্ত মহিম রোজই খুঁজে খুঁজে ফিরে গিয়ে বলে, 'হলো না কর্তা, বাপ ব্যাটা ভয়ানক সেয়ানা, অনেক টাকা চায়।'

লাল লাল চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন মনিব, অনেক পরে বলেন, 'কতো?'

'তাও বলছে না—' মহিম এরপর টিপে দেখে—'যদ্দুর মনে হয় হাজারের নিচে ভাবছে না।'

'ঠিক আছে।' পিছন ফেরেন তিনি। বেশী কথা বলা তাঁর অভ্যাস নয়।

আর এতো সহজেই যখন হাজারে রাজী তখন কতো হাজার পর্যন্ত উঠতে পারেন জানতে দোষ কী? পরের দিন সে আবার হাত ঘষতে ঘষতে গিয়ে দাঁড়ায় সন্ধ্যাবেলা 'স্যর, কতো খোশামোদ করছি, কিছুতেই রাজী নয়।'

'কী চায়?'

'ওর লোভ বেড়ে যাচ্ছে। শনে স্যর আমার মাথা ঘোরে।'

'নিয়ে এসো।'

'বলছে বাপ হ'য়ে মেয়েকে এমন বিনাশের পথে ঠেলে দেব, তার ক্ষতিপূরণ কি অল্পে হয়?'

'বলছি তো নিয়ে এসো।'

'স্যর—'

'কথা বাড়িয়ো না।'

'বলছিলাম—'

'হ্যাঁ. জানিয়ে দিও, ক্ষতিপূরণ সে যা চায় তাই পাবে।'

'তার চেয়ে স্যর, লোক লাগিয়ে হরণ ক'রে আনলে হয় না?'

'চুপ বেয়াদব। আমি কি জোচ্চোর? ডাকাত? উৎকৃষ্ট জিনিস উৎকৃষ্ট দাম দিয়েই কিনবো আমি, জবরদস্তি ক'রে নয়। যাও।'

মহিম সরকার তবু নড়ে না, তবু মাথা চুলকোয়।

'কী?'

'লোকটা স্যর এক মাসের জন্য দশ হাজার টাকা চায়।'

'পাবে। যাবাও।'

প্রভু শেষ ক'রে দিলেন কথা। ভিতরে ভিতরে ফুর্তিতে আনন্দে টগবগ করতে করতে বেরিয়ে আসে মহিম। তারপর আবার পূর্ণোদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ভাবে, কতো রকমের বোঝা নিয়েই না এই সংসার। শালা। বলে যে, আমি কি জোচ্চোর? আমি কি ডাকাত? হাসতে হাসতে মরে যাবে নাকি সে? তোর চেয়ে বড়ো ডাকাত আর আছে কে রে জগতে? টাকা দিয়ে এমন মর্মবিদারক ডাকাতি আর কে করতে পারে রে তোর মতো? লম্পট। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছিস। টাকা দিয়ে পাপ ঢাকছিস।

দশ হাজার টাকা! গগন কি কল্পনাও করতে পারছে? তিন চার পাঁচ বলতেই যা কাঁপুনি।

'শোন।'

গগনবাবুর উত্তেজনাকে সে প্রশমিত হ'তে দিয়ে বললো, 'আরো উপরে তুলে দেব আমি। আমি তোমাকে হাতে হাতে গুনে ছটি হাজার টাকা দিয়ে যাবো, ভেবে দেখ, একসঙ্গে ছ' হাজার টাকা। তা দিয়ে তুমি কী না করতে পারো? সব, সব পার। রাতারাতি সব দুঃখ মুছে ফেলতে পার। মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে পারো স্ত্রীকে, সন্তানকে, ডুবে যাওয়া নৌকো আবার টেনে তুলতে পারো তীরে। তারপর ফিরে আসবে মেয়ে, বিয়ে দেবে তাকে, সে সুখী হবে, ভুলে যাবে সব।

গগনবাবু পাথর।

আমি সময় দিচ্ছি তোমাকে, তুমি শুধু ভালো করে ভেবে দেখ। হ্যাঁ, আরো একটি কথা জানিয়ে যাই, এসব হচ্ছে রাজা-মহারাজার মেজাজ। আমার সাহেবটির নজর বড়ো ভীষণ নজর। তা থেকে নিস্তার পাওয়া সমুদ্র সাঁতরে পার হবার মতোই দুরূহ। একবার যখন কামনার আগুন জ্বলেছে দেহে, আর উপায় নেই চরিতার্থ না করা পর্যন্ত। হ্যাঁ, খোলাখুলিই বলছি তোমাকে। সেই অনল থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না তোমার মেয়ে। কে বলতে পারে একদিন এসে যে কেউ তাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে না মুখে কাপড় দিয়ে? লোক লস্করের তো আর অভাব নেই? ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব, বল? পাড়ার ছেলেরাই হয়তো পাঁচটা টাকার লোভে একদিন ঘর ভাঙবে তোমার। সর্বনাশ করবে। একটা মানুষকে তো আর তুমি সিন্দুকে তালা বন্ধ ক'রে রাখতে পারবে না বারো মাস? কতো সময় কতো কাজে বেরতে হবে তাকে। এই তো ধরো, কাল যখন সন্ধেবেলা বসে বসে বাসন মাজছিলো ঘাটে, কে ছিলো আশেপাশে? কেউ না। মতলবে থাকলে নির্জন জায়গায় পাওয়াই যাবে কোনো না কোনো সময়ে। সাহেব যে সেদিন মেয়েকে দেখলেন, তখন কি সে বাইরে ছিলো? সে কি মিটিং-এ গিয়েছিলো? মোটেও না। এই বেড়ার গেট ধ'রে ডাকছিলো 'চম্পা চম্পা' বলে। কে চম্পা তাও আমি জানি না। সাহেব যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন। দেখেই বিগড়েছেন। উপায় নেই এখন তাঁর হাত থেকে ছাড়ান পাবার।'

'আমি পুলিসে খবর দেব। আমি ধরিয়ে দেব তোমাদের।'

কান্না ভুলে হঠাৎ হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, গগনবাবু। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন আর কি। পাঁকাল মাছের মতো বগলের তলা দিয়ে পিছলে দৌড় দিল সে, একেবারে রাস্তার এ পারে এসে গাড়ির হাতল ধ'রে দাঁড়ালো। গগনবাবুও মরিয়া হয়ে ছুটে এলেন, 'তোমার টুঁটি ছিঁড়ে দেব। যেন আর কখনো এসব পাপ প্রস্তাব নিয়ে ঘরে ঘরে না ঘুরতে পার।'

তাঁর উদাত্ত রোষ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মহিম ফট ক'রে গাড়ির ভিতরে উঠে বসলো। মুখ বার ক'রে বললো, 'টুঁটিই ছেঁড়ো আর পুলিসেই খবর দাও, জেনো লাভের মধ্যে এ-কুল ও-কুল দু-কুলই যাবে। মেয়েও ঘরে থাকবে না, টাকাটাও পাবে না।' আবার ওদিকে পুলিসের হাতকড়াটাও তোমার হাতেই পড়বে। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিলে দংশন সইতেই হবে। আচ্ছা, চলি। শোনো, যাবার আগে শেষ কথা বলে যাই, পুরো এক সপ্তাহ সময় দিলাম তোমাকে ভালো ক'রে ভেবে দেখো, হাতে হাতে ছয়ের পিঠে তিনটে শূন্য, একেবারে নগদ কড়কড়ে। স্ত্রী বাঁচবেন, ছেলেমেয়েরা বাঁচবে, ভাঙা ঘর নতুন হবে, বাচ্চাদের জামা-কাপড় লেখাপড়া—আর এই মেয়ের বিয়ের সময় আরো কিছু হাতে পাবে নগদে. এই আমিই আদায় ক'রে দেব। বড়োজোর তিন সপ্তাহ—গাড়িতে স্টার্ট দিল রাখাল, শরীর এতোখানি ঝুঁকিয়ে মহিম গলা চড়ালো 'মনে রেখো সাতদিন পরে, মঙ্গলবার রাত ন'টায় টাকা নিয়ে আমি ঠিক এইখানে এসে অপেক্ষা করবো—' কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল, হতভম্ব মূর্ছাহত গগনবাবুকে দাঁড় করিয়ে রেখে, কোথায় চলে গেল গাড়িটা। শুধু অনেক দূর পর্যন্ত পিছনের আলো দুটো অনেকক্ষণ দপদপ করলো। তারপর মিলিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

ভারতের সংসদ ভবন
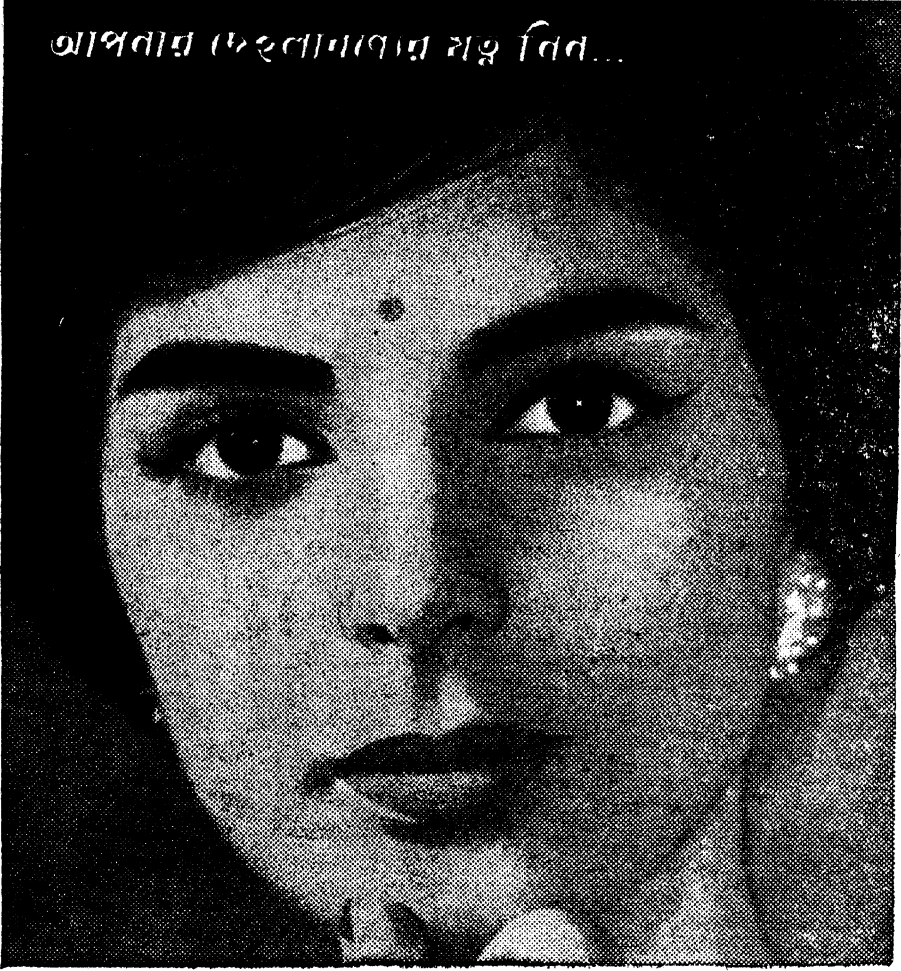
দিল্লির ডায়েরি

ভারতের সংসদ ভবন। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের রূপক ভবন, যেখানে আজ কেন্দ্রীভূত জাতির রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মাদি, যেখানে স্থির হয় দেশের ও জাতির সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। শতকরা একশো ভাগ না হলেও, অনেকটা তো বটে।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হাজারো বক্তৃতা, শত শত আইন, লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন ও উত্তর, অন্তহীন তর্ক-বিতর্ক, কোলাহল, ঝগড়া, দুয়েকবার প্রায়-হাতাহাতি, বড় কথা ছোট কথা, এমনকি অসংসদীয় কথাবার্তা। যাঁরা খবরের কাগজ পড়েন, তাঁরা অল্পবিস্তর সবকিছুর খোঁজ রাখেন। কিন্তু তারও বাইরে জানবার আছে আমাদের সংসদের ও সংসদ ভবনের। পৃথিবীর ভিতর নামকরা ভবনগুলোর এটিও একটি।

ভারতীয় সংসদ ভবনের আছে এক বিশাল জনপ্রিয়তা। দেশের নানা প্রদেশের লোকেরা আসেন দর্শকের গ্যালারিতে যখন অধিবেশন চলে। আসেন অনেক বিদেশী টুরিস্ট দলে দলে, বুড়ো বুড়ি, যুবক-যুবতী সকলেই। বলতে কি, রাজধানীতে মাঝে মাঝে লোকসভায় অথবা রাজ্যসভায় গিয়ে নেতাদের বক্তৃতা ও কোলাহল শোনা আজকাল প্রায় একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। আমি তো রোজকার সাক্ষী। ঝলমলে জামা-কাপড়, ফ্যাশনের কাট্-দরুস্ত, বাহারে শাড়ি, সালোয়ার-পাজামা , আর কোট-প্যান্টের কী প্রদর্শনী! এবং তারাও আজ সংসদ ভবনের একটা বাহ্যিক কিন্তু গণতান্ত্রিক অঙ্গ।

নিরাপত্তা বিভাগের বড় কর্তা শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। জানালেন যে, প্রায় শ'তিনেক লোক নিযুক্ত থাকে নিরাপত্তা নিয়ে। লোকসভা ও রাজ্যসভাকে সারা বছর রাখা হয় প্রহরায়। এটার প্রবর্তন হয় ভগৎ সিং-এর বোমা ফেলার পর, ১৯৩১-এ।

চৌধুরীমশায়কে প্রশ্ন করলাম, আমাদের কালে তো ইংরেজ আমলের মতো কেউ বোমা ফেলেনি, তবুও কি অত কড়াকড়ি প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে বইকি। অকালিদের পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলনের সময় (১৯৬২) দর্শকের গ্যালারি থেকে স্লোগান তুলেছে, আবার হ্যান্ডবিল বৃষ্টি হয়েছে। ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের লোকেরা তাদের ধরে নিয়ে গেছে। একবার কয়েকটি পানজাবী মেয়ের পাজামার খোলের ভিতরে লুকোনো পাওয়া গিয়েছিল অনেকগুলি রাজনৈতিক হ্যান্ডবিল। দুবার দুটি লোকের কাছে পাওয়া গিয়েছিল ছোরা।

সমস্ত মিলিয়ে মস্ত একটি ভবন—ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য, গ্রীক স্থাপত্য ও খানিকটা সেদিনকার আধুনিক স্থাপত্যের একটি চমৎকার নিদর্শন এই সংসদ ভবন। দোতালার গোল বারান্দা ঘেরা বিরাট বিরাট গ্রীক পিলারগুলো পিলে-কাঁপানো

সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় হলঘর। যেসব স্থানে জাতীয় পতাকা দেখা যাচ্ছে, এখন সেখানে আছে জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতি

পালোয়ানদের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। নৈর্ব্যক্তিক পাথরের গম্ভীরতা। সমস্ত জাতির প্রতীক কিন্তু সে যেন সমষ্টির বাইরে, সারা গায়ে বৃহত্ত্বের একাকিত্ব ছাপ।

ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন ডিয়ুক অব কনট্, ১৯২১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি। ছ' বছর লাগল তৈরি করতে, এবং তদানীন্তন বড়লাটবাহাদুর লর্ড আরউইন দ্বারোদ্ঘাটন করলেন ১৯২৭ সনের ১৮ই জানুয়ারী।

(অনেক কিছুর বার্ষিকী হয়, আমাদের সংসদ ভবনের হলে মন্দ কি?) স্থাপত্যের নক্শা করেছিলেন নামকরা ইংরেজ স্থপতি এডউইন লিউটিয়েন্স এবং হারবার্ট বেকার। গোটা নয়াদিল্লির নক্শাই এঁরা করেছিলেন। তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল ৮৩ লক্ষ টাকা, এবং এখন অট্টালিকার মূল্যায়ন পাঁচ কোটি টাকা।

সংসদের কেন্দ্রীয় হলকে কেন্দ্র করে গড়া এই প্রাসাদটি। তিনদিকে তিনটি আরো হলঘর—লোকসভা, রা জ্য স ভা আর লাইব্রেরি। এদের মাঝে মাঝে সবুজ লন। আর এদের ঘিরে তিনতলা অট্টালিকা গোল হয়ে উঠে গেছে। এক তলায় কয়েকটি ঘর মন্ত্রী ও কর্মচারীদের। হ্যাঁ, দুয়েকটি স্থানে পর্দা দিয়ে ঢাকা জায়গা আছে, দেওয়ালের সংগে লাগানো। ওদিকে নজর দেবেন না। কৌতূহলবশত একদিন পর্দা সরিয়ে চোখ চড়কগাছ। একটি লোক স্বয়ংক্রিয় বন্দুক নিয়ে ঠায় বসা। স্থানটি প্রধানমন্ত্রীর ঘরের কাছে।

লোকসভাটি অর্ধগোলাকৃতি : মেঝের আয়তন ৪,৮০০ বর্গফুট। বসার জায়গা ৫৩০ জন সদস্যের (বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫১০ : আছেন ৫০২)। খাড়া খাড়া মাইক্রোফোন, যে কোনো স্থান থেকে কথা বললেও তারা আওয়াজ লুফে নেয়, আর জোরদার করে আমাদের কানে ঢেলে দেয় (অনেক সময় একেবারে মরমে পশিয়া যায়!!)। গত বছর থেকে ব্যবস্থা হয়েছে হিন্দী-ইংরাজী অনুবাদের। হিন্দী শুনতে চান, বোতাম ঘুরিয়ে বসান; ইংরেজী? তাই সই, বোতামটা অন্য একটা অংকে বসিয়ে দিন। অর্ধবৃত্তরেখার মাঝ স্থানে অধ্যক্ষ মহাশয়ের আসন। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক আলোর লেখা একটি বাণী, "ধর্মচক্র প্রবর্তনায়"। আর সকলেই জানেন এখনকার অধ্যক্ষ হলেন, সর্দার হুকম সিং, যাঁকে বলা যায় ধৈর্যের অবতার। দোতলায় প্রেস গ্যালারি, দর্শকদের গ্যালারি ইত্যাদি।

রাজ্যসভাও অবিকল লোকসভার মতই, কিন্তু আসন আছে ২৫০ জনের। উপরে অনেক গ্যালারি : প্রেস, সাধারণ দর্শক, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, কূটনৈতিক প্রতিনিধি-দের ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক হলঘর ভবনের কেন্দ্রীয় হল। ভারতের সংবিধান রচিত হয় এই হলঘরে, যার গম্বুজটি ৯৮ ফিট ডায়মেটারের। এই
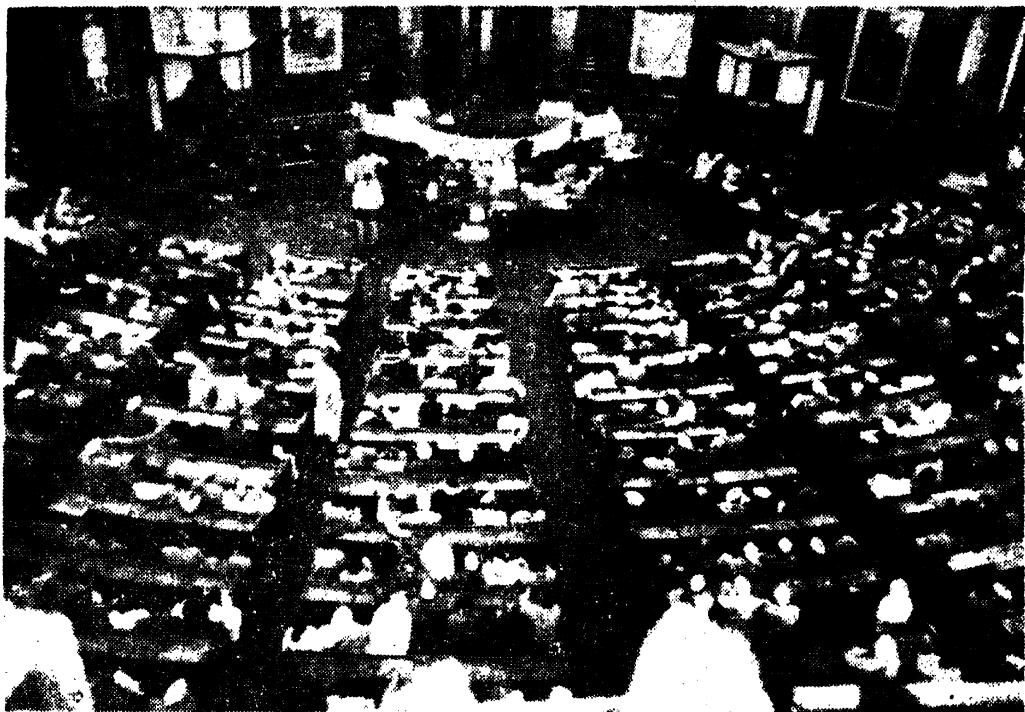
লোকসভার কেন্দ্রীয় হল। ১৯৬৬-র জানুয়ারীতে লোকসভা ও রাজ্যসভার কংগ্রেসী সদস্যগণ কর্তৃক শ্রীমতী গান্ধীকে দলনেতা নির্বাচনের দৃশ্য

হলঘরেই বড়লাট মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন জওহরলাল নেহরুর হাতে ১৪-১৫ আগস্টের মধ্যরাত্রির পরেই।

প্রতি বৎসর অধিবেশনের প্রথম দিনে, আর সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত সংসদের অধিবেশনের প্রথম দিন দুই সভার সদস্যরা একত্রে সম্মিলিত হন এই কেন্দ্রীয় হলে, এবং রাষ্ট্রপতি করেন উদ্বোধন। বাকি সময় সদস্যরা হলটিকে ব্যবহার করেন আলাপ-আলোচনার জন্য। চা জলখাবারের ঘর আছে, উর্দিপরা বেয়ারারা আছে। সুশীতল হলঘর। চারদিকে চেয়ে আছেন দেশনেতারা। তাঁদের বিরাট তৈলচিত্র দেওয়ালে : জওহরলাল, মদনমোহন মালব্য, দাদাভাই নৌরজী, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, তিলক, লাজপৎ রায়, বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আজাদ ও ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। একুনে বারোটি প্যানেল এবং এখন সবগুলোই ভরা। মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রতিকৃতি উপরে রাখা। এটি এঁকেছেন স্যর ওস্ওয়াল্ড বারলে, এবং ওটি দান করেছেন শ্রী এ পি পাত্তানি, সংবিধান রচক পরিষদের একজন সভ্য। কেন্দ্রীয় হল-ঘরেরও আছে ছটি গ্যালারি দোতলায়।

লাইব্রেরি হলটিও বিরাট। একদা ওটি ছিল প্রিন্সেস চেম্বার, রাজামহারাজাদের পরিষদ কক্ষ, অবিভক্ত ভারতে। স্বাধীনতার পর কিছু দিন ব্যবহৃত হয় সুপ্রীম কোর্টের ন্যায়ালয় হিসাবে। হলটি ছাড়াও এক তলায় ও দোতলায় কয়েকটি কক্ষও লাইব্রেরির অন্তর্গত। নীরবে পড়াশোনা করার চমৎকার ব্যবস্থা আছে, এবং সংসদের কয়েকজন সদস্য (বিশেষতঃ লোকসভার) বেশ পড়াশোনা করেন (আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই)।

কিন্তু হয়তো অবাক হবেন যে, সংসদ ভবনে রেলের টিকিট কেনা, চেক ভাঙানো কি টাকা জমা দেওয়া, ভাল ঘি ও চা কেনার দোকান, পোস্টঅফিস, তারঘর, এমনকি প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্তও আছে। (থাকা উচিতও। কে জানে কবে কী হয়। যা গোলমাল এক একদিন! রাজ্যসভা থেকে দু মণ ওজনের সংযুক্ত সোস্যালিস্ট দলের সদস্য শ্রীরাজনারায়ণকে পাঁজাকোলা করে আনতে হয়েছিল নিরাপত্তা বিভাগের লোকদের।)

ভবনের দেওয়াল ধরে আছে অনেকগুলো চিত্র, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি থেকে। বেশ ভাল ভাল ও নামকরা শিল্পীদের আঁকা। আর ভবনের স্থানে স্থানে আছে উৎকীর্ণ আদর্শ-বাণী। এক নম্বর গেটের উপরে খোদিত সংস্কৃত বাণী, যার অর্থ : তোমার জনগণের জন্যে খুলে দাও তোমার দরওয়াজা, আর আমাদের দেখতে দাও তোমাকে তোমার সার্বভৌমত্ব প্রাপ্তিতে (সম্ভবত ছান্দোগ্যোপনিষদ থেকে)।

আরেকটি খোদিত বাণী তুলে আজকের মত ইতি। এটি গম্বুজে উৎকীর্ণ, ভিতরের দিকে, এক নম্বর লিফ্‌টের কাছে, মহাভারত থেকে একটি উধৃতি : "ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা, বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্। ধর্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি, সত্যং ন তদ্যচ্ছলমভ্যুপৈতি॥" অর্থাৎ : যে সভায় প্রবীণরা নেই তা সভাই নয়; যাঁরা ন্যায়পরায়ণের ভিত্তিতে কথা বলেন না, তাঁরা প্রবীণ মোটেই নন; এবং যা সত্য নয় তা ন্যায়পরায়ণতা নহে; যে সত্য প্রবঞ্চনার পথে নিয়ে যায়, তা সত্য নহে।

—খগেন দে সরকার
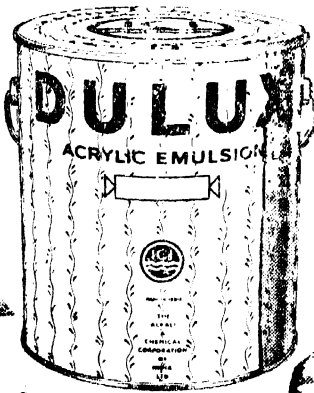
॥ ২৬ ॥

"বাজিয়ে যাবো মল"

ইন্দিরার হাসি কিছুতেই ঘুচতে চায় না, ওই তার রোগ, আমি বলি স্বভাব। কারণে অকারণে তুচ্ছ কারণে সে হাসে; আর শুধু সে নয়, সুভাষিণী হাসে, হারানি ঝি হাসে, ইন্দিরার বোন কামিনী হাসে। এতগুলি মধুর অধরের হাসিতে বইখানা ঝলমল করে। বসন্ত বায়ু বিনিক্ষিপ্ত মল্লিকা দামের মতো শুভ্র হাসি সমস্ত কাহিনীটির উপরে বিন্যস্ত: হাসি না মাড়িয়ে পদক্ষেপ কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হসন্তী নারীর অভাব নাই। আসমানি আছে, গিরিজায়া আছে, আছে কমলমণি, সাগরবউ, লবঙ্গলতা ও নির্মল-কুমারী। সে-সব হাসি দুঃখের লবণাম্বুর মধ্যে কমলে কামিনী। ইন্দিরায় কিছু প্রভেদ। এ কাহিনীর নারীরা শুধু হাসছে না, সমস্ত কাহিনীটাই হাসছে। এ পারাবারেও লবণের মাত্রা কিছু কম নয়, কিন্তু এতগুলি হাসির সূর্যকিরণে প্রতি-ফলিত হয়ে লক্ষ লক্ষ হীরকখণ্ডে সে পারাবার ঝলমল করে উঠেছে। সাহিত্যিক জীবনের উপান্তে রূপার তবকে মুড়ে তাম্বুলোপহার দিয়েছেন পাঠককে বঙ্কিম-চন্দ্র। "প্রকৃতপক্ষে, পুরাতন নামে এ এক-খানা নূতন গ্রন্থ। নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রন্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই।"

যথেষ্ট অথচ যথেষ্ট নয়। ছোট ইন্দিরায় এক কারণ, বড় ইন্দিরায় অন্য কারণ, যদিচ দুই-ই খুব দুস্তর নয়। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে এক ঝাঁক ক্ষুদ্রায়ত কাহিনী লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র: ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, লোক রহস্য, রাধারানী ও কমলাকান্তের দপ্তর; কোন কারণে খণ্ডীভূত অজ্ঞাত গ্রহরাজের টুকরা। এক্ষেত্রে কারণটা অনুমানের অসাধ্য নয়। কয়েক বছরের মধ্যে বৃহদাকার চারখানি উপন্যাস প্রণয়ন, মাসিকপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব, সর্বোপরি সরকারী চাকুরি। বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছুটির জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিল। সরকারী চাকুরিতে দরখাস্ত করলে ছুটি মেলা অসম্ভব নয়, মাসিকের সম্পাদকের ছুটি কোথায়? পৃথিবীর আবর্তনে দিন যায়, ত্রিশ দিনে মাস যায়, মাস গেলে কাগজ বের করতে হয়। পেয়াদারও ছুটি মেলে, মাসিকের সম্পাদক পেয়াদার অধম। কাজেই নিজের ছুটির ব্যবস্থা করতে হল বঙ্কিমচন্দ্রকে। এ কয়খানা বই বঙ্কিম-চন্দ্রের ছুটির লেখা। তাদের চাল লঘু, রূপ ক্ষুদ্র, রস হাসির; এ যেন চোগা-চাপকানে অভ্যস্ত হাকিমের পূজার ছুটিতে সাঁওতাল পরগনার প্রান্তরে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে বেড়ানো, সরস্বতীর আটপৌরে বেশ। এইটি যথেষ্ট কারণ নয়?

কিন্তু ছুটি ফুরোয়, মনের সাঁওতাল পরগনার মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন করে আবার রীতিমত চোগাচাপকান চাপাতে হয় হাকিমকে; মাঝখানে তাল ভঙ্গ হওয়ায় বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়েছিল, এক বৎসর বিশ্রাম করে আবার বের হয় মাসিক, এবারে আর নামে সম্পাদক না হলেও কার্যত তাই বটে; বঙ্গদর্শন বন্ধ হতেই প্রচার; ওদিকে কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী, কৃষ্ণচরিত্র, সীতারাম, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি; হাকিমির দায়িত্ব তো আছেই; উপরির মতো খ্যাতির দণ্ডস্বরূপ নানারকম অকাজের শত কাজ। আবার হাঁপিয়ে ওঠে মন। তখন মনে পড়ে ছোট ইন্দিরাকে; ছোট ইন্দিরা বড় হয়। এবারে আর সাঁওতাল পরগনায় যাওয়ার দরকার না। ইন্দিরার হাসি কৌতুক প্রাণোচ্ছল রঙ্গরহস্য কলকাতার বন্ধ ঘরের মধ্যে খোলা মাঠের হাওয়া, দূর আকাশের চাওয়া, শ্যামল অরণ্যের ছোঁওয়া ছড়িয়ে দেয়। এবারে ঘরে বসেই ছুটি, ক্লান্ত পিতামহের যেমন দুটি বালিকা পৌত্রীর সঙ্গ লাভে।

দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি চারখানি উপন্যাস রচনায় মানসিক শক্তির যে ব্যয় হয়েছিল, আনন্দমঠ প্রভৃতি রচনায় ব্যয় হয় তার চেয়ে অনেক বেশি; বয়সও বেড়েছে; সংসারে নাতি নাতনি দেখা দিয়েছে, সে এক আনন্দ

বটে, তবে দেখতে দেখতে তাদেরও বয়স বাড়ে, তখন স্বার্থের ছায়াপাতে অনাবিল আনন্দ ম্লান হয়; নিরবচ্ছিন্ন নাতি-নাতনি যোগান পাওয়া কঠিন। কিন্তু মন যা তাই চায়। তাই মনের সমস্যা মনকে সমাধান করতে হয়, এমন একজনকে সৃষ্টি করতে হয় বয়সে যে বাড়বে না, স্বার্থের ছায়া যে আনবে না, কৈশোরের চৌকাঠে চিরন্তনী হ'য়ে যে বিরাজ করতে থাকবে। যে নাকি বিশুদ্ধ নন্দিনী, Spirit of delight। ইন্দিরা মূর্তিমতী নন্দিনী, কবিদের Spirit of delight। প্রথম সংস্করণে শেলীর কবিতাটি উদ্ধৃত ছিল কি না জানি না, না থাকাই সম্ভব, কেননা, প্রথম সংস্করণে শুধু গল্পটা ছিল 'পঞ্চম সংস্করণে এসেছে হাসিটা। বড় ইন্দিরার এটি বিশেষ গুণ। "যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়ে পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে।" দোষ কিছুই নয়, ইন্দিরা তখন এমন ক'রে হাসতে শেখেনি। এখন তবে শিখলো কি ক'রে? কতক বয়সের গুণে, কতক অবস্থাগুণে: ইন্দিরা এখন বিবাহের অনেক কাল পরে দাম্পত্য জীবন যাপন করবার আশায় পতি-গৃহে যাত্রা করতে উদ্যত। ইন্দিরা পরিপূর্ণ দাম্পত্য রসের কাব্য; বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য রসের কবি।

বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলি দাম্পত্য রসের কাব্য; মনসামঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল সমস্তই। ওদের কেন্দ্রে একটি ক'রে দাম্পত্যচিত্র, অবস্থাভেদে সাদা-কালো পোঁচ, সবসুদ্ধ মিলে বাঙালীর গৃহজীবন বেশ ফুটে উঠেছে। আর গৃহ-জীবনের বাইরে যে জীবনটা আছে, দাম্পত্য রসের বাইরে যে রস আছে, তার চিত্র মহাজন পদাবলিতে। মঙ্গলকাব্য ও মহাজন পদাবলি মিলিয়ে নিলে প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র পাওয়া যায়।

নব্য বাংলার জীবনচিত্র এমন সহজলভ্য নয়, কেননা, যুগের বিচিত্র দাবিতে জীবনের পরিধি গিয়েছে বেড়ে, এমন সুঠাম সুষম-ভাবে সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে তার প্রকাশ নয়। প্রাচীনকালে জীবনের রূপটি সংকীর্ণ ছিল সত্য, আবার সেই সংকীর্ণতাই তাকে একটি পূর্ণতা দিয়েছিল। সাহিত্য তাকে আগাগোড়া ক্ষুদ্র মুকুরটির মধ্যে প্রতিবিম্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন সাহিত্য ও জীবন বেশ খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল। এখন তেমনটি হওয়ার উপায় নাই, কারণ, এখন বিভিন্ন এবং অনেকাংশে বিপরীতমুখী ভাবের টানে জীবনের পরিধি অনিয়ন্ত্রিতভাবে নিত্য প্রবর্ধমান, অনেকটা যেন এলোমেলো গোছের, সাহিত্যের মধ্যে জীবনের এই ধর্ম প্রতি-ফলিত, কিন্তু তেমন ক'রে আর খাপে খাপে মিলছে না। এখন আর কিছুতেই বলা চলে না যে, উপন্যাস ও লিরিক কবিতা মিলিয়ে নিলে বাঙালীর জীবনের পূর্ণ রূপটি পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের সহজ ধারণার যুগ চিরকালের জন্য গত। নব্য বাংলা সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চেয়ে অনেক গুণে সমৃদ্ধতর নিঃসন্দেহ, কিন্তু আগের মতো আর আজকার সাহিত্য বাঙালীর জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়, এখানেই তার ন্যূনতা। আজকার দিনের উপন্যাস তখনকার দিনের মঙ্গলকাব্যের উত্তরাধিকারী সত্য: মঙ্গলকাব্যের অনেক গুণ উপন্যাসে বর্তেছে: উপন্যাসে এমন অনেক নূতন গুণ দেখা দিয়েছে, যার সন্ধান মঙ্গলকাব্য জানতো না। কিন্তু

উপন্যাস মঙ্গলকাব্যের পূর্ণতা পেয়েছে কি না সন্দেহ। মঙ্গলকাব্যের পরিধি সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু পূর্ণ ছিল; উপন্যাস বৃহৎ পরিধি বিশিষ্ট, কিন্তু অপূর্ণ। মঙ্গলকাব্যের বৃত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলেই পূর্ণ; উপন্যাসকে বৃত্তাকার বলা যায় না, কেননা, বৃত্তের একটি পূর্ণতা আছে, উপন্যাস বৃহৎ আর বৃহৎ বলেই অপূর্ণ। এমন হওয়ার কারণ, দুই ভিন্ন যুগের বাঙালী সমাজের প্রকৃতির মধ্যে আছে, একটি ক্ষুদ্র অথচ পূর্ণ; একটি বৃহৎ ও অপূর্ণ।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ণতা কোনো উপন্যাসে আছে কি? রায়-গুণাকরের অন্নদামঙ্গলের পূর্ণতা কোন্ উপন্যাসে আছে? বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল, গোরা, শ্রীকান্ত বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, এগুলির কোন একখানা কি তৎকালীন বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র? এর বাইরে জীবনের অনেকখানি রয়ে গেল যে। অন্নদামঙ্গলের পূর্ণতা কোন্ উপন্যাসে? এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসগুলি জড়িয়ে নিলেও অন্নদামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ণতা পাওয়া যায় না। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, মঙ্গলকাব্য-গুলিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চেয়ে মহত্তর সাহিত্য বলে মনে করছি বা মঙ্গল-কাব্যের প্রত্যাবর্তন কামনা করছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-অর্থে ও যে-ভাবে মঙ্গলকাব্য যুগের প্রতিনিধি, সে-অর্থে ও সে-ভাবে উপন্যাস এ-যুগের প্রতিনিধি নয়, এ দেশেও নয়, কোন দেশেই নয়; নব্য সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের মতো কখনোই আর যুগ-প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না; সমস্ত রচনাই এখন আংশিকতা লক্ষণগ্রস্ত। ক্ষুদ্র জীবনের পূর্ণতা মানুষের আর আদর্শ নয়।

তবে এক অর্থে ও এক ভাবে বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে বাঙালীর জীবনের একটি অংশের চিত্র প্রতিফলিত, সে তার দাম্পত্য জীবন। আর কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় দাম্পত্য জীবনের এমন বিচিত্র ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র আছে কি না সন্দেহ। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে দাম্পত্য রসের কবি বলেছি। রবীন্দ্রনাথে দু'টি নরনারীর জীবন-পথ বাসরঘরের দরজায় এসে থেমে যায়, তারপরে আর তাদের দেখতে পাই না। গোরা ও সুচরিতার যুগ্ম জীবনযাত্রার সূচনাতেই গল্পের শেষ; বিনয় ও ললিতার যুগ্ম-জীবনের কতটুকুই বা জানি। নৌকাডুবির এক দিগন্তে অর্ধাবগুণ্ঠনবতী কমলা নলিনাক্ষের অন্তঃপুরে অদৃশ্য হ'ল, অন্য দিগন্তের অশ্রু-বাষ্পের মধ্যে হেমনলিনীর অন্তর্ধান। চোখের বালির আখ্যান ভাগ অবশ্য মহীন্দ্রের অন্তঃপুরে। তবে সেখানে তো পূর্ণতেজে বিনোদিনী দেদীপ্যমতী, তার প্রভায় সবাই অদৃশ্যপ্রায়, সবচেয়ে বেশি আশা। চোখের বালি বিনোদিনী ও বিহারীর পূর্বরাগের কাহিনী; দাম্পত্য রস ওতে স্থায়ী রস নয়, নিতান্তই অন্তরা। রবীন্দ্রনাথ পূর্বরাগের ঔপন্যাসিক। আর শরৎচন্দ্রের বিশেষ অধিকার অন্যত্র ও অন্য রসে। বাসরঘরে যাদের মিলন হ'লে হ'তে পারতো সামাজিক বা অন্য কারণে হয়নি বা হ'য়েও অদৃষ্টবৈগুণ্যে নিষ্ফল হয়েছে, তাদেরই ব্যর্থ বাসর বা বিবাহোত্তর জীবনলীলা অঙ্কণে শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্য। রমা ও রমেশ জীবানন্দ ও অলকা, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী, এমন অনেক নাম করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রে দাম্পত্য জীবন-রস। দাম্পত্য জীবনের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে অতলস্পর্শ রস আছে, উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখিয়েছেন তিনি। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে প্রভেদটা সহজেই চোখে পড়ে। কতকগুলি অমোঘ সংস্কার ও সুনির্দিষ্ট আকারের চার কূলে আবদ্ধ ছিলেন কবিরা, তার বাইরে যাওয়ার সাধ্য ছিল না তাঁদের। তাই স্বামী-স্ত্রীতে সাময়িক কলহ, কিংবা দারিদ্র্য দুঃখের ক্লেশ বা গোধিকার রমণী-রূপ ধারণে ফুল্লরার ঈর্ষা কিংবা সপত্নী-বিদ্বেষ প্রভৃতির ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাঝে মাঝে দেখা দিলেও, কাহিনী কখনো কূল ছাপিয়ে যায়নি। সামাজিক শাসন লঙ্ঘন করবার অধিকার ছিল না কবিদের। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন, তাঁর একমাত্র অনুশাসন ছিল ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শ। কাজেই তাঁর সীমা ও অধিকার ছিল অনেক বিস্তৃত। ফলে বৃহৎ আসরে বিচিত্র লীলা দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও বৈচিত্র্য, দুঃখ ও সুখ, মসৃণ প্রবাহ ও তরঙ্গ ভঙ্গ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সীমা সবসুদ্ধ মিলিয়ে বিশ্ব-বৈচিত্র্য ও রসের অতলতা, কিছুই তাঁর অজানা ছিল না, কিছুই তিনি অচিত্রিত রাখেননি।

পরিপূর্ণ একটি দাম্পত্য জীবনের চিত্র আঁকবার ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়া থেকেই ছিল, নানা কারণে ঘটে ওঠেনি। দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীর কথা-প্রকৃতি তার অনুকূল নয়। বিষবৃক্ষে প্রথম সুযোগ মিলল। সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবন সুখময় ছিল, হয়তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই অবসিত হ'ত, এমন সময়ে তার মধ্যে উল্কার মতো নিক্ষিপ্ত হ'ল কুন্দনন্দিনী; রসান্তর ঘটে

সব জ্বলে পুড়ে গেল। তবু ওর মধ্যে কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের দাম্পত্য জীবন অন্তরায় মতো দেখা দিয়েছে। বিষবৃক্ষের মূল রস দাম্পত্য-রস হ'য়ে উঠতে পারেনি। কৃষ্ণকান্তের উইলে আর-একবার সুযোগ এসেছিল। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের জীবন সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের জীবনের মতোই একটি সুখ-প্রভাত। এমন সময়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজে রোহিনীর রূপের উদয় ঘটলো, আবার সব জ্বলে পুড়ে গেল। চন্দ্রশেখর ও রজনীতে ভিন্ন কারণে দাম্পত্য জীবন অঙ্কিত করা সম্ভব হয়নি। তারপরে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম। আনন্দমঠ সন্তানব্রতের কাব্য, দাম্পত্য রসের স্থান এখানে নাই। দেবী চৌধুরানী হ'লে হ'তে পারতো দাম্পত্য জীবনের চিত্র; প্রফুল্লের ওই ছিল লক্ষ ও আদর্শ, কিন্তু এখানেও কথান্তর অন্তরায়। শ্রী ও সীতারাম যদি জ্যোতিষ বচনের উপরে নির্ভর না করতো, তবে দাম্পত্য চিত্র অঙ্কন এখানে অসম্ভব ছিল না, তবু সম্ভব হ'ত কি না সন্দেহ। সীতারাম শুধু শ্রীর স্বামী নয়, রাজাধিরাজ; শ্রী অনুকূল হ'লে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আরও

বেশি মনোযোগী হ'তো সীতারাম, হয়তো সে সমস্ত বাংলার অধিপতি হ'য়ে উঠতো, দাম্পত্য জীবনের জন্য কতটুকু সময় সে দিতে পারতো। প্রথম সুযোগ এলো ইন্দিরায়।

ইন্দিরার স্বামী বীরপুরুষ নয়, সন্তান-ব্রতধারী, রাজ্য স্থাপনেচ্ছু অ্যাডভেঞ্চারার নয়, সে নিতান্তই মধ্যবিত্ত নিরীহ জীব। ধনের অভাব ছিল; কমিসেরিয়াটে চাকুরির কল্যাণে সে অভাব তার দূরীভূত। ইন্দিরার পিতা ধনী ব্যক্তি। স্বয়ং ইন্দিরা চরিত্রে, প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিতে, এবং সর্বোপরি হাসি ও কৌতুকের উৎসরূপে আদর্শ গৃহিণী হওয়ার যোগ্য। শান্তি, কল্যাণী ও শ্রীর মতো বৃহৎ কোন আইডিয়ার ভূত তার ঘাড়ে চাপেনি; স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ বিরহের অবকাশে পরিপূর্ণ একটি দাম্পত্য জীবন যাপন করবার জন্য সে প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছিল, এমন সময়ে এলো সেই বহুপ্রতীক্ষিত সুযোগ। ইন্দিরা স্বামী সম্ভাষণে চলল।

শুভকার্যে বিঘ্ন, বৃহৎ কার্যে ব্যাঘাত, এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম; বোধ করি, বিঘ্ন-ব্যাঘাতের প্রয়োজন আছে, নইলে মহত্ত্বের পরীক্ষা হয় না। তাই বারে বারে কখনো কুন্দনন্দিনীরূপে (সে বেচারা নিরপরাধ), কখনো রোহিনীরূপে (অনেকে তাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন) বিঘ্ন-ব্যাঘাত এসে পড়েছে। আবার কখনো বা সন্তানব্রত, অনুশীলন-ধর্ম ও স্বামীর কল্যাণাকাঙ্ক্ষা শুভ হ'য়েও অশুভের কাজ করেছে। তাই এবারে ইন্দিরা-কাহিনীর আটঘাট এমন ক'রে সুরক্ষিত করা হয়েছে যে, কোন দিক থেকে বাধা না আসে। তবু বাধা এসেছে। কালাদীঘির ডাকাতি এক বাধা; ইন্দিরার ভিখারিণী বেশ এক বাধা; আর এক বাধা সুভাষিণীর গৃহে অজ্ঞাত-পরিচয়ে ইন্দিরার অবস্থান। তবে এসব বাধা বাইরের। কুন্দনন্দিনী ও রোহিনীর রূপের মতো এ-বাধা শিকড় চালিয়ে দিতে পারেনি উপেন্দ্রর মনে; কিংবা সন্তানব্রত ও অনুশীলনের মতো এ-বাধা শিকড় চালিয়ে দিতে পারেনি ইন্দিরার মস্তিষ্কে; আর ইন্দিরার মতো প্রত্যুৎপন্নমতী নারীর কাছে এসব বাধা আদৌ বাধা নয়; কিংবা ঝরনা যেমন পাথরের বাধা ডিঙিয়ে উঠবার উপলক্ষে আরও উচ্ছল, উজ্জ্বল, চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তেমনি হ'য়ে উঠেছে ইন্দিরা।

সেকালের নিয়মমতো বাল্যকালে ইন্দিরার বিবাহ হয়েছিল, তবে তার স্বামী দরিদ্র, শ্বশুরের গঞ্জনায় সে অর্থোপার্জনের নিমিত্ত পশ্চিমে গেল। এইভাবে "সাত-আট বৎসর" গেল। এখন ইন্দিরার বয়স উনিশ, কাজেই সাত-আট বছর আগে এগার বারো ছিল; আর বিবাহের সময়ে উপেন্দ্রর বয়স ছিল কুড়ি, এখন সাতাশ-আটাশ। পরিপূর্ণ দাম্পত্য চিত্র আঁকবার পক্ষে সময়ের এই ব্যবধানের বিশেষ আবশ্যক ছিল। এগার বারো বছরের বধূ কুড়ি বছরের স্বামীর ঘর করতে গেলে দাম্পত্য জীবন হয়তো নির্বিঘ্নে গ'ড়ে উঠতো, কিন্তু তার পুরো রস তারা কেউ কি আস্বাদন করতে সক্ষম হ'তো? প্রথমে অনায়াসপ্রাপ্তি, পরে পুরাতন অভ্যাস, দুয়ে মিলে রসের মাত্রা আচ্ছন্ন ক'রে দিত না কি? তার বদলে সাত-আট বছরের বিরহে দুই পক্ষের মন যখন পূর্ণ জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে, দীর্ঘ বিরহের অবকাশে মন যখন কল্পনার রঙীন তুলি চালাবার সুযোগ পেয়েছে, রসের একটি বিন্দুও যখন আর অনবধানে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই, তখন শ্বশুর ঘর থেকে ইন্দিরার আহ্বান এলো।

"আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড় মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।

মনে মনে বাবার কথার উত্তর দিলাম। বলিলাম, আমার প্রাণটা বুঝি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল; তুমি যেন বুঝিতে পারিয়া হাসিও না।

আমার ছোট বহিন কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল, বলিল, দিদি, আবার আসিবে কবে?

আমি তাহার গাল টিপিয়া ধরিলাম।

কামিনী বলিল, দিদি, শ্বশুরবাড়ি কেমন, তাহা কিছু জানিস?

আমি বলিলাম, জানি। সে নন্দন বন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণ চন্দ্র উঠে।

কামিনী হাসিয়া বলিল, মরণ আর কি!"

বাপ ও মেয়েরা কথায় কথায় হাসে, হাসিটা এ বংশের রোগ। কাহিনীটারও কি না দেখা যাবে। তা তারা হাসে হাসুক। ইতিমধ্যে পালকি চেপে ইন্দিরা প্রথম স্বামী সম্ভাষণে চলেছে।

কালাদীঘিতে ডাকাতি হ'য়ে সর্বরিক্ত ইন্দিরা দীন বেশ ধারণ করতে বাধ্য হ'ল। তারপরে ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণদাস বসুর পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় এসে সুভাষিণীদের গৃহে স্থান পেলো। দুটি কারণে ইন্দিরাকে এই পরীক্ষায় ফেলতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ কারণ, গল্পের অনুরোধ; সে কথা পরে হবে। পরোক্ষ কারণটা আগে সেরে নেওয়া যেতে পারে। অভ্যস্ত জীবন-চক্রের বাইরে না এসে দাঁড়ালে চরিত্রের গুপ্ত ঐশ্বর্য ধরা পড়ে না। ইন্দিরা রাজার দুলালী ছিল, জীবনের সঙ্গে তার কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না; ডাকঘর কাকে বলে, গাঁয়ে ডাকঘর আছে কি না, জানতো না, মহেশপুরে (স্বগ্রাম) এবং মনোহরপুরে (শ্বশুরবাড়ির গ্রাম) কোন্ জেলায়, মনোহরপুরে ডাকঘর আছে কি না জানতো না। এই তো তার সংসার সম্বন্ধে পরিচয়। এহেন যুবতী যখন বিপদে পড়লো, দাসীরূপে পরগৃহে অজ্ঞাতবাস শুরু করলো, তখন ধীরে ধীরে তার চরিত্রবল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। আর কোন উপায়ে এসব দেখানো সম্ভব ছিল? পদচিহ্ন গ্রামে স্বামীগৃহবাসিনী কল্যাণীর মধ্যে যে এত শ্রমসহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা ছিল কে জানতো? পথে বের হ'লে জানতে পারা গেল। শান্তির কিছু পরিচয় আগেই জানতে পারা গিয়েছিল, যখন সে গৃহত্যাগ ক'রে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পথে বের হয়েছিল। সে-ও তো পথ। পরে আরও জানতে পারা গেল, যখন সন্তানব্রত গ্রহণ ক'রে আবার অভ্যস্ত জীবনচক্রের বাইরে এসে দাঁড়ালো। শৈবলিনী মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় পাশ করলো গঙ্গাবক্ষের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারে। শ্রীর পথিক জীবনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয়েছে। ইন্দিরাও এই নিয়মের মধ্যে পড়ে। তার পরীক্ষাকাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী হলেও তার মূল্য কম নয়। নিজের শক্তিতে বোধ

(২২১ড)

করি সব চেয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল সে নিজে। পথ মনুষ্যত্বের উদ্বোধক।

গল্পটি জমে উঠেছে সুভাষিণীদের সংসারে ইন্দিরার আশ্রয়প্রাপ্তির পরে। এই সংসারটি হাসিতে ঝলমল করছে। হাসি এ বাড়ির সকলের রোগ। সুভাষিণী হাসে, তার মেয়ে হাসে আর হারাণী ঝি হাসির ঝরণা। তার "মুখে হাসি ধরে না।" সে মাঝে মাঝে বলে "বউঠাকুরাণী আমাকে জবাব দাও, আমি এমন হাসির বাড়িতে থাকিতে পারিব না, কোন্ দিন দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব।" এ হাসির ছোঁয়াচ থেকে কারো রক্ষা নাই। সুভাষিণীর স্বামী রমণবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তিনিও "একটু হাসিলেন।" এমন কি যে কালির বোতলটার গলায় গলায় কালি, তিনিও কলাপের প্রভাবে নিজের কালো চুল দেখে অবশেষে এক গাল হেসেছেন। ইন্দিরার স্বভাব কথায় কথায় হাসা, দুঃখের মধ্যেও হাসা, সে-ও হাসির প্রবাহে আপনার মধুর হাসিটির ধারা যোগ করে দিয়েছে।

তারপরে সুভাষিণী ও রমণবাবুর ষড়যন্ত্র এবং ইন্দিরার উপেন্দ্রবাবুকে চিনতে পারবার পরে আরম্ভ হল বৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ প্রেমের ছলাকলা। উপেন্দ্রকে রূপমুগ্ধ করে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নিয়ে তবে আত্মপরিচয় দানের বিশেষ আবশ্যক ছিল, কেন ছিল ইন্দিরা বিস্তারিত বলেছে, তার চেয়ে ভালো করে আমরা বলতে পারবোনা তাই নিরস্ত হলাম।

প্রথমে সুভাষিণীদের গৃহে, পরে উপেন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে ইন্দিরা কর্তৃক বৈধপ্রেমে যে অবৈধ প্রেমের ছলাকলার অভিনয় হয়েছে ইন্দিরার ভাষায় তা "বাজিয়ে যাবো মল।" কৃষ্ণদাস বসুর সঙ্গে নৌকাপথে কলকাতা আসবার সময়ে অমলা ও নির্মলা নামে দুটি ছোট মেয়ের মুখে গান শুনেছিল, গানটির ধুয়া "বাজিয়ে যাবো মল।" সেই সরলা বালিকাদের সতেজ গানের মধ্যে এই কুটিল পথের ইঙ্গিত পেয়েছিল ইন্দিরা, তখন বুঝতে পারেনি, এখন কাজে লেগে গেল। সে স্থির করলো স্বামীকে বশ করবার উদ্দেশ্যে "বাজিয়ে যাবো মল" নীতি গ্রহণ অন্যায় নয়। তখন নূতন অর্থে গানগুলির পদ তার মনে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে।

"বিনোদ বেশে
মুচকে হেসে
খুলবো হাসির কল।
কলসী ধরে
গরব করে
বাজিয়ে যাবো মল।
গহনা গায়ে
আলতা পায়ে
কল্কাদার আঁচল।
চিমে চালে
তালে তালে
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা মুচকে হেসে
বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাবো মল।"

ইন্দিরা বিনোদ বেশে মুচকে হেসে মল বাজিয়ে গিয়েছে আর হতভাগ্য উপেন্দ্রের মনটা লুব্ধ মৌমাছির মতো ইন্দিরার ঝঙ্কৃত মল রাঙা পায়ের চার দিকে ঘুরে মরতে মরতে এক সময়ে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তখনই, তার আগে নয়, ইন্দিরা আত্মপরিচয় দান করেছে। এ ছাড়া তার আর কি উপায় ছিল? সমাজ, স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী সকলেরই যেখানে বিরূপ হওয়ার আশঙ্কা সেখানে নিজে এগিয়ে এসে হাল ধরা ছাড়া আর কি উপায় ছিল ইন্দিরার। ছোট ইন্দিরার একটুখানি বেনোগিরি ছিল, সেই দানপত্র লিখিয়ে নেওয়াটা, বড় ইন্দিরার, বড় হয়ে এখন তার বুদ্ধি হয়েছে, দানপত্র লিখিয়ে নেওয়াটা বাদ পড়েছে, ইন্দিরার গৌরব তাতে বেড়েছে বই কমে নি। এমন করে মল বাজিয়ে যেতে যে পারে তার পক্ষে দানপত্র লিখিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ছোট ইন্দিরার মল বাজানো নাই; অমলা ও নির্মলা নাই, তাদের গানটিও নাই; এসব বড় ইন্দিরার। ইন্দিরা সে গানের ইঙ্গিত গ্রহণ করেছে; খামোকা স্বামীর স্ট্যাম্প ফিস খরচ করে দানপত্র লেখাতে যাবে কেন?

গোড়ায় বলে দি যে, ইন্দিরা পরিপূর্ণ দাম্পত্য রসের কাব্য। দাম্পত্য রসের একটি চিত্র সুভাষিণীদের পরিবার; আর একটি দাম্পত্য রসের মাধুর্য, অপরটিতে দাম্পত্য রসের রোমান্স। বাঙালীর ... কারজীর্ণ গৃহকোণে যে এই রোমান্সটুকু ছিল তাকে আবিষ্কার করে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জীবনের সীমানা ও মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। কবিরা শুধু স্রষ্টা নন আবিষ্কারকও, একদেহে বিশ্বামিত্র ও কলম্বাস।

ইন্দিরা স্বমুখে কাহিনীটি বিবৃত করেছে। তার হাতে হাসির চকমকি পাথর, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আলো ঠিকরে পড়েছে, সেই আলোর পথ দেখে দেখে, বড় দুঃখেও হাসতে হাসতে ইন্দিরা চলেছে, আমাদের সঙ্গী করে নিয়েছে, এমন কি ছলাকলার রঙ্গমঞ্চেও আমাদের দ্বার অবারিত। কাহিনীর অন্য পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আর কাকে দিয়ে এমন সম্ভব হতো! ইন্দিরার উপরে কোন পাঠকের পক্ষে মুহূর্তের জন্যও রাগ করা সম্ভব নয়, তার হাসিটি সমস্ত বিরূপতার বিশল্যকরণী। ঐ হাসিটির সংসারে বড় প্রয়োজন, সবচেয়ে প্রয়োজন লেখকের। সংসারের ও নিজ মনের সমস্ত হাসি কুড়িয়ে ইন্দিরার সৃষ্টি হয়েছে। সে হাসির তিলোত্তমা।

(ক্রমশ)

দ্বীপের কাছে একটা জাহাজ

বিশ্ববিজ্ঞান
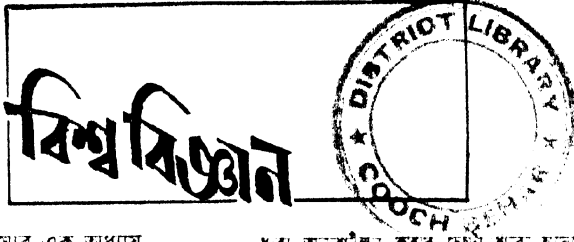
সৃষ্টি রহস্যের এক অধ্যায়

বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, জন্মলাভের পর পৃথিবীকে এক অগ্নিযুগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। সেই যুগে নবগঠিত কোমল ভূত্বকের অসংখ্য ফাটল ফুঁড়ে ঘটেছিল অগ্ন্যুৎপাত। সেই সব আগ্নেয় ক্রিয়াজাত গলিত ধাতুস্রোত কঠিন হয়ে ভূমণ্ডলের বাহ্যিক আকৃতি ও প্রকৃতিকে রূপদান করে।

আমাদের এ যুগেও আমরা এখানে ওখানে নতুন আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় হতে দেখেছি, দেখেছি প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতে কত শহর নষ্ট হয়ে যেতে। সেগুলি আগ্নেয় ক্রিয়ার ধ্বংসাত্মক দিক। কিন্তু দুনিয়ায় এমন কিছু নেই, যার শুধু একটিমাত্র দিক আছে। প্রতিটি বিষয়ের চরিত্র দ্বৈত যার মধ্যে সমাবেশ হয়েছে ভাল ও মন্দের, ধ্বংসের ও সৃষ্টির। ভূগর্ভের আগ্নেয়-ক্রিয়াও কিছু ব্যতিক্রম নয়। সংহার-মূর্তি ছাড়াও তার একটি সৃজনাত্মক চেহারা আছে, যার মধ্যে প্রতিফলিত হয় সৃষ্টির আদি রহস্যের একটা দিক। মানুষের চোখের সামনে বহুবার পৃথিবীর আগ্নেয়-ক্রিয়ার সেই রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু সেই সব ঘটনার মধ্যে পৃথিবীর বিবর্তন-ধারা অনুশীলন করার চেষ্টা শুরু হয়েছে হালে। সেই রকম একটি ঘটনার কথা এখানে বলব, যা ঘটেছিল বেশীদিন আগে নয়, ১৯৬৩ সালের ১৪ নভেম্বর, আইসল্যাণ্ডের উপকূল থেকে মাত্র ১৭ মাইল দূরে। সেই দিন অকস্মাৎ সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে এক বিরাট ধূম্রকুণ্ডলী আকাশের ২৭০০০ ফুট উপরে উঠে যায় যা মাকালু গিরিশৃঙ্গের উচ্চতার সমান। সেই ধোঁয়ার মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে ছোট্ট একটি নতুন দ্বীপ—পৃথিবীর নূতনতম দ্বীপ, যার আয়তন মাত্র ১ বর্গ-মাইল। তার আগে এক হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীতে অন্য কোন স্থায়ী দ্বীপের জন্ম হয়নি। সেদিনকার সেই সমুদ্রের মর্মভেদী ধূম্রকুণ্ডলী ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রিকজাভিকের নাগরিকরা শহরে বসে দেখতে পেয়েছিলেন!

তখন ভোর সাড়ে ছটার মত। আইস-ল্যাণ্ডের একটি জেলেডিঙি সেই সময় জায়গাটির কাছাকাছি গিয়ে পড়ে। নৌকার মাঝিরা হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের গন্ধ পায়। সাড়ে সাতটা নাগাদ তারা দেখে জলের ভিতর থেকে কি যেন একটা ভেসে উঠছে। তারা প্রথমে সেটাকে একটা সামুদ্রিক শিলা বলে মনে করে, কিন্তু পরে বুঝতে পারে যে, সেটা শিলা নয় ধোঁয়া। তখন তারা ভাবল, বোধ হয় কোন জাহাজে আগুন লেগেছে। তাই ভেবে উপকূলের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করে দেখল যে, সেখানে জাহাজ অফিসে কোন 'এস ও এস' আসেনি। বেলা তিনটার সময় এরে পেলেনে

দ্বীপের আবির্ভাবের মুখে...

করে জনকতক বৈজ্ঞানিক সেখানে গিয়ে যখন ধোঁয়ার আশে পাশে চক্কর কাটছেন, তখন সাদা বাষ্প, কালো ধোঁয়া ও উৎক্ষিপ্ত পাথর ও ছাই-এর ফাঁক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই নতুন দ্বীপ গলিত উত্তপ্ত ধাতুস্রোতে ও বাষ্পে পরিবেষ্টিত হয়ে। দ্বীপটি এক সুউচ্চ আগ্নেয়-গিরির সামিল, যার আগ্নেয়-গহ্বরে পৌঁছবার ক্ষমতা সমুদ্রের নেই। অতীতে সমুদ্রগর্ভ থেকে এই ধরনের দ্বীপের আবির্ভাব যে এর আগে হয়নি, তা নয়, কিন্তু সেগুলির জীবনের মেয়াদ ছিল অল্প। সেগুলি ভেসে উঠে আবার তলিয়ে গিয়েছে। ১৯৬৩ সালের নতুন দ্বীপটি হচ্ছে ব্যতিক্রমের এক দৃষ্টান্ত। সেই রকম অতলান্তিকের গর্ভে এক বিশাল পর্বতমালা আছে, যার নাম আটলান্টিক রীজ্। তার উচ্চতা ১৫০০ থেকে ৩০০০ মিটার পর্যন্ত। তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মাথাটুকু দেখতে পাওয়া যায় আজোর্স দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে। শৃঙ্গের উচ্চতা

গোড়ার দিকে গলিত ধাতু স্রোতের হ্রদ

৯০০০ মিটার, অর্থাৎ ৯ কিলোমিটার। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, অতীতে কোন এক সময়ে সমুদ্রতলের ভূগর্ভে অগ্ন্যুৎপাতের ধাক্কায় অতলান্তিকের এই ব্যবচ্ছেদক পর্বতপ্রাচীর সমুদ্রের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পললের চাপে নিচের দিক ধসে পড়ার ফলে গোটা প্রাচীরটি আবার ডুবে যায়। ৯০০০ বছর পূর্বে সেইখানেই নাকি অধুনা নিমজ্জিত আটলান্টিস মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল (দার্শনিক প্লেটোর উক্তি অনুসারে) কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা সে কথা স্বীকার করেন না। আগ্নেয়ক্রিয়াজাত ঐ ধরনের পর্বতমালা ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেও আছে। হাওয়াই ও অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সেই পর্বত-মালারই পরিদৃশ্যমান কতকগুলি চূড়া-বিশেষ।

১৮৩০ সালে ভূমধ্যসাগরের বুকে সিসিলি দ্বীপ ও আফ্রিকার উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে হঠাৎ এক দ্বীপের আবির্ভাব হয়, যেটি কয়েক বছরের ঢেউ-এর ধাক্কায় ক্ষইতে ক্ষইতে জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সেইটেই 'আজকের গ্রাহাম রীফ।' অস্ট্রেলিয়া থেকে ২০০০ মাইল দূরে 'ফকন' নামে যে দ্বীপ রয়েছে সেইটি ১৯১৫ সালে সাগরের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৬ সালে। অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এলাকায় ছোট ছোট দ্বীপের নিমজ্জন ও আবির্ভাব প্রায়ই ঘটে। সমুদ্র বক্ষে এইভাবে দ্বীপের জন্ম ও লয়ের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় আমাদের গ্রহের হৃৎস্পন্দন।

আইসল্যাণ্ডের কাছে যে নতুন দ্বীপের জন্ম হলো তার নামকরণ হয়েছে সুর্ৎসি। নর্ড জাতির অগ্নিদেবতা সুর্তুরের নাম অনুসারে এই নামকরণ। দ্বীপের জন্মের পর প্রচণ্ড অগ্নিলীলার জন্য বৈজ্ঞানিক বা সাংবাদিক কারো পক্ষে সেখানে পদার্পণ করা সম্ভব ছিল না। দ্বীপের আবির্ভাবের দেড় বছর পরে এক সাংবাদিক দ্বীপের ভূমিস্পর্শ করেন। তিনি দেখেন দ্বীপের মাথার উপর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে গাংচিল আর দ্বীপের কিছু দূরে জলে মাছেদের আনাগোনা। মাছেরা গরম জলের দিকে আকৃষ্ট হয় কিনা। এছাড়া কিছু সামুদ্রিক উদ্ভিদ দ্বীপের কাছ বরাবর ভেসে যাচ্ছিল। এছাড়া সে তল্লাটে জৈব জগতের কোন অস্তিত্বই ছিল না। দ্বীপের মাঝখানে আগ্নেয়গহ্বর থেকে উদ্গীর্ণ গলিত ধাতু-স্রোত সমুদ্রে বয়ে গিয়ে পড়ছিল সেকেন্ডে ৪০ ফুট বেগে। গহ্বরটি দেড়শো গজ চওড়া। দ্বীপের এক পাশে ছোট একটি হ্রদ।

বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, একশো বছরের মধ্যে দ্বীপে ঘাস ও গাছপালা গজাবে, পাখীরা বাঁধবে বাসা। তাঁরা এই-ভাবে পৃথিবীতে উদ্ভিদ জগতের ক্রম-বিকাশের চিত্র চোখের সামনে দেখতে পাবেন।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দশ

কলকাতার গাড়ি এইমাত্র ছেড়ে গেল। হৈমন্তীকে উঠিয়ে দিতে এসেছিল সুরেশ্বর, ট্রেন ছেড়ে গেলে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ফিরতে লাগল। পাশে বিজলীবাবু।

বিজলীবাবুর সঙ্গে বাস-স্ট্যাণ্ডে দেখা হয়েছিল, গাড়ির আর সময় নেই তখন, সুরেশ্বরদের মালপত্র সমেত স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে বিজলীবাবু বুকিং অফিসে ঢুকে টিকিট কেটে একেবারে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই প্ল্যাটফর্মে হাজির হলেন।

ফেরার পথে রেলের দু-একজন বাবু-টাবু—প্ল্যাটফর্মে যারা ছিল—তাদের সঙ্গে সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলল; সকলেই তার চেনা-জানা, দেখা হলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলতেই হয়, খোঁজখবরও করত হয় এর ওর। সুরেশ্বর সম্পর্কে এদের সকলেরই কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে, কৌতূহলও আছে হয়ত। বিশেষত, আজ হৈমন্তীকে তুলে দিতে এসে সুরেশ্বর সেটা অনুভব করতে পারল।

ওভারব্রিজ দিয়ে না উঠে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্ত দিয়ে নামল, লাইন পেরিয়ে ঢালু মতন জায়গাটা দিয়ে রাস্তায় উঠল সুরেশ্বর। গোড়ালির ব্যথাটা এখনও পুরোপুরি সারে নি। আসার সময় ওভারব্রিজের সিঁড়ি উঠে ব্যথাটা আবার বোঝা যাচ্ছিল; ফেরার সময় তাই আর সিঁড়ি ভাঙল না।

রাস্তায় উঠে বিজলীবাবু বললেন, "দুর্গাবাড়ির দিকটা একবার ঘুরে যাবেন নাকি?"

দুর্গাবাড়ি খানিকটা দূর, জোরে জোরে হাঁটলেও মিনিট কুড়ির রাস্তা। যেতে আসতে খানিকটা সময় যাবে, এতটা হাঁটা-হাঁটিতে আবার গোড়ালিটা ব্যথা করবে কিনা তা-ও সুরেশ্বর বুঝত পারল না। পোস্ট অফিসেও একবার যাবার দরকার। সুরেশ্বর বলল, "আমার যে একবার পোস্ট অফিস যেতে হবে। টাকা তুলব।"

"ফেরার পথে যাবেন—", বিজলীবাবু বললেন, "এখনও ন'টা বাজে নি। দশটার মধ্যে গেলেই চলে।" বিজলীবাবু সময়ের ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

সুরেশ্বর বলল, "এতটা হাঁটব কি না ভাবছি!"

"বেশ ব্যথা?"

"না, খুব একটা নয়। ব্যথা তো ছিলই না প্রায়, সিঁড়ি উঠতে গিয়ে হয়ত ঠিক মতন পা পড়ে নি কোথাও, খচখচ করছে।"

"হাড়-টাড় ভেঙেছেন নাকি?"

"না—", সুরেশ্বর হাসল, "হাড় ভাঙলে কি এত অল্পে রেহাই দিত।......হেম তো বলল, স্প্রেইন।"

বিজলীবাবু সুরেশ্বরের মুখের দিকে তাকালেন, "উনি কি এসবও বোঝেন?"

সুরেশ্বর হাসল, "তা অল্পস্বল্প বোঝে বইকি! ডাক্তারীটা তো পাশ করতে হয়েছে।"

বিজলীবাবু সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলেন না, পরে বললেন, "তবে থাক, দুর্গাবাড়ি আর না গেলেন, পোস্ট অফিসেই যাওয়া যাক। ওখান থেকে যদি বৈজুর রিকশাটা পাওয়া যায় তবে না-হয় দুর্গাবাড়ি যাওয়া যাবে।"

বেলা এমন কিছু নয়, তবু শরতের রোদ এত ঝকঝকে যে চোখে লাগছিল, ভাত ফুটে উঠেছে। গাছের ছায়া ধরে

হাটতে হাটতে বিজলীবাবু সিগারেট ধরালেন।

সুরেশ্বর শুধলো, "এবারে লোকজন কেমন আসছে, বিজলীবাবু?"

"আজ বিকেল থেকে বোঝা যাবে। কাল কিছু এসেছে। তা মন্দ না।"

"উমেশবাবু এসেছেন?"

"না; কাল আসবেন বোধ হয়।"

"আপনাদের পুজো কেমন হচ্ছে?"

"নতুন আর কি হবে—যেমন হয় াবর" বলে বিজলীবাবু একটু থেমে ্রেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে কিছু খলেন, বললেন, "আপনি তো জানেন াই, আমি লোকটা মদ্যটদ্য খাই. উপসর্গ কটু-আধটু আছে, তবে ড্যাং ড্যাং করে জনা বাজিয়ে, কলকাতার বড়লোক বুদের বাড়িতে এক থালা করে প্রসাদ, ' কাঁসি করে সরু চালের চুড়ি ভোগ পাঠিয়ে অর্থ অপ- র করতে রাজী না।" বিজলী- বু ঠোঁট চেপে সিগারেটে টান দিলেন র কয়েক, আবার বললেন, "নবমীর দিন ঁথিরি-টিঁখিরি খাওয়ানো হয় এখানে— জেই দেখেছেন—সেটা হাক, বরাবর হয়ে াসছে, আমি তাতে কথা তুলছি না। কিন্তু বড়লোক বাবুদের বাড়ি-বাড়ি একরাশ করে ফল-মিষ্টি আর ভোগ পাঠানোর দরকারটা কি? ......এই নিয়ে সেদিন ঝগড়া, হরিহরের সংগে। বলে, কলকাতার ওই বড়লোক মশাইদের কাছ থেকে পঁচিশ. পঞ্চাশ, এক শো করে চাঁদা পাই, খাতির না করলে হবে কেন? ...চুলোয় যাক তোর খাতির......"

বিজলীবাবু যে কোনো কারণে অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজিত সুরেশ্বর বুঝতে পারল। বলল, "ওঁরা অবশ্য মোটা চাঁদা দেন। না এলেও বছরের চাঁদা ঠিক পাঠিয়ে দেন বলে শুনেছি।"

"তাতে কার কি, টাকা দেও বলে ঠাকুরের ভোগ তুমি শালা তোমার কুকুরকেও খাওয়াবে।...বিশ্বাস করুন মহারাজ, স্বচক্ষে দেখেছি। কলকাতার এক ইংলিশবাবু, চারবেলা ডিম, মুর্গির ঠ্যাঙ, মাছ কলা ফল। খাচ্ছে, ভোগ গেল ঠাকুরের. মেয়েরা একটু আধটু ঠোঁটে ছোঁয়াল কি ছোঁয়াল না, বাড়ির কুকুরকে খাইয়ে দিল।..." রাগের চোটে বিজলীবাবু সুরেশ্বরকে সামনাসামনি 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করে ফেললেন। এটা তিনি সাধারণত করেন না। সুরেশ্বর অবশ্য জানে বিজলীবাবু তাকে মহারাজ-টহারাজ বলেন।

কি বলবে সুরেশ্বর, চুপচাপ থাকল।

বিজলীবাবু শার্টের পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করলেন। "ঠাকুরফাকুর কাঁধে করে নাচানাচি আমার নেই। হিঁদুর ঘরে জন্মেছি দুর্গা কালী লক্ষ্মী দেখলে বড়জোর একটা পেন্নাম ঠুকি, ব্যস। কথা হল, আজ সতেরো আঠারো বছর ধরে এখানে বাঙালীরা দুর্গাপুজো করছে সেটা তো আর আমরা তুলে দেব না। আমি না হয় অষ্টমীর দিন পাঁঠার মাংস চিবিয়ে বোতলঠাকুর সামনে বসিয়ে অষ্টমী করলাম, কিন্তু আমার বউ দুটো তো অষ্টমীর উপোস করবে, অঞ্জলি দেবে. সন্ধিপুজো দেখবে...। বলুন আপনি, আমাদের বাড়ির বউটউ, ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বাপ-মা—এদের কাছে তো পুজোর একটা মূল্য আছে। ভক্তিটক্তি তারাই করে; তাদেরও আনন্দ। তাছাড়া আমি না হয় ঠাকুরফাকুর না মানলুম, অন্য লোকে তো মানে।...আমার ভাই সাফ কথা, পুজো আলবাৎ করব. তবে বড়লোককে তোয়াজ করার জন্যে পুজো নয়।"

সুরেশ্বর বলল, "হরিবাবুদের সঙ্গে আপনার ঝগড়াঝাটি হল।"

"হল। ওই হরি আর বেঁটে কার্তিক—ওই দুটোই হচ্ছে হারামজাদা। দল গড়েছে,
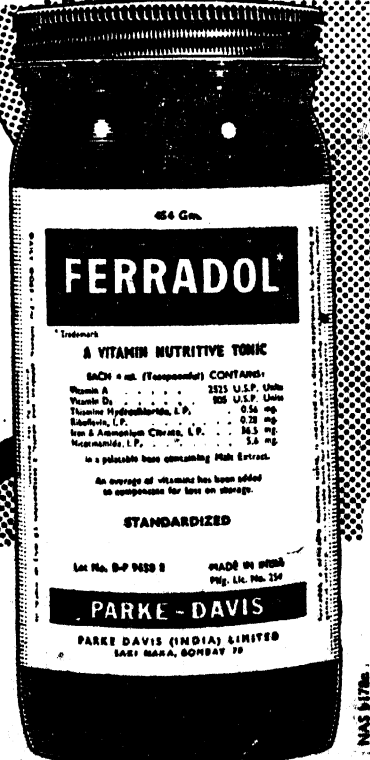
। গড়ে কলকাতার কেষ্টবিষ্টুদের জয়ে এখানে একটা আখড়া করার মতলব দেছে, বোস্টমদের আখড়া। খোল করতাল জাবে. বাতাসা খাবে। আমি বলেছি জো কমিটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওসব রো।...আমার নাম বিজলীবরণ চক্রবর্তী, য়াত্রিশ বচ্ছর এখানে আছি. তোমরা ভেব , দু দিনের যোগী এসে আমার ওপর ক্কা মারবে।'"

"ঝগড়াঝাটি করতে গেলেন কেন।" রেশ্বর একটু হেসেই যেন বলল।

"কেন করব না ঝগড়া! ওরা পুজোর কা চুরি করে. পাবলিক মানি নিয়ে জনেস করে...। হরি-বেটা বাজারে একটা পড়ের দোকান দিয়েছে। কোথ থেকে ?"

সুরেশ্বর এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা চাপা দিতে ইল। বলল, "যেতে দিন। এসব কথা ক।"

বিজলীবাবু সিগারেট ধরিয়ে আবার নতে শুরু করলেন। ডান দিকে রেললাইন. কটা ট্রলি চলে যাচ্ছে, সাদা ছাতার নায় হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরে চিন্তাবাবু বসে আছেন. কুলি দুটো য়ের কাছে. মোটরের ফটফট শব্দ হচ্ছে। খতে দেখতে ট্রলিটা কেবিন ছাড়িয়ে চলে ল।

বাঁ দিকের পথ ধরল সুরেশ্বর. পোস্ট ফিস যেতে হলে এই পথটাই সুবিধের। সামান্য এগিয়ে বিজলীবাবু বললেন. কটা কথা তাহলে স্পষ্ট করে বলেই লি। মতলব ছিল, এবারে পুজো থেকে ছু টাকা বাঁচিয়ে আপনার হাতে তুলে ব।"

সুরেশ্বর যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে জলীবাবুর দিকে তাকাল। "আমার তে?"

বিজলীবাবু এমন করে চশমার আড়ালে খ উজ্জ্বল-করে হাসলেন, মনে হবে যেন ই বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্যটি পূর্ব পরি-ল্পিত। হাঁটতে হাঁটতে বললেন. "সৎ কর্মে পয়সা গেলে গায়ে লাগে না।...তাছাড়া রা দু একশো টাকা দেবে নাই বা কেন। খান থেকে চোখ দেখাতে তো কম লোক য় না।"

সুরেশ্বর কেমন অস্বস্তি বোধ করল. থম প্রথম এখানের সকলেই যার যা সাধ্য মায় সাহায্য করেছে, বিজলীবাবু।'"

"জানি," বিজলীবাবু মাথাটা কাত করে ললেন, "সবই জানি। দু একটা টাকা সবাই য়েছে, সে আপনার মন রাখতে মান চাতে।...যা দিয়েছে তার পাঁচ গুণ দায়ও করে নিয়েছে।"

"তা হলেও · "

"আপনার টাকার আর দরকার নেই. রোজ?"

সুরেশ্বর বিজলীবাবুর মুখের দিকে তাকাল. তাকিয়ে চুপ করে থাকল। শেষে বলল "আছে। কত কি করার আছে অর্থাভাবে পারছি না।"

ঠিক এই মুহূর্তে সুরেশ্বর যেসব অভাব বোধ করছে যা করতে পারলে লোকের সুবিধে হয় তার কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন চশমা দেবার একটা ব্যবস্থা করা। সেই শহর ছাড়া এই অঞ্চলের কোথাও চশমার দোকান নেই. শহরেও মাত্র একটি দোকান. অত্যধিক দাম নেয়. গরীব মানুষের পক্ষে শহরে আসা যাওয়া করা. চশমা কেনার টাকা জোটানো খুবই কষ্টকর। যদি সুরেশ্বররা চশমাও দিতে পারত সুবিধে হত। অল্প খরচে. তেমন ক্ষেত্রে বিনা খরচেই অনেকে চশমা পেতে পারত।...অন্ধদের থাকার ঘরবাড়িও বাড়ানো দরকার. আরও কিছু অন্ধজনকে

রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। ওদের হাতে জিনিস দিলে আরও কত কাজ করতে পারে, অর্থাভাবে মালপত্র দেওয়া যায় না তেমন।

কথা বলতে বলতে পোস্ট অফিসের কাছাকাছি পেণছে গেল সুরেশ্বর।

বিজলীবাবু বললেন "ময়দা বেশী মাখবেন না।—শেষকালে লুচি বেলারও লোক পাবেন না, ভেজে উঠতেও পারবেন না। যা করবেন—এসব জায়গায় অল্প করেই করবেন।"

সুরেশ্বর হাসল। "একে একে সবই হবে। আপনারা পাঁচজন তো রয়েছেন।"

বিজলীবাবু মাথা নাড়লেন, মজা করে করে বললেন, "আপনার মতন বিজ্ঞ লোক কি করে এই কথাটা বললেন? পাঁচজনে একসংগে বসে তাসপাশা খেলতে পারে, আফিং মদ গাঁজা পঞ্চরঙ্ চড়াতে পারে; কিন্তু পাঁচজনে কোনো সৎ কর্ম হয় না।"

"অসৎ কর্ম হয়...?" সুরেশ্বর লঘু স্বরে, হাসিমুখে বলল।

"তা তো হয়ই।...বিদ্যেটা আপনার ঠিক জানা নেই কি না, জানা থাকলে বুঝতেন কথাটা যা বলেছি খাঁটি কথা।"

সুরেশ্বর কেমন পরিহাস করেই শুধলো, "বিদ্যেটা আপনারই কি জানা আছে?"

"তা খানিকটা আছে", বিজলীবাবুও হাসিমুখে জবাব দিলেন; তারপর বললেন, "দেখুন মহারাজ, আপনি আমার চেয়ে বয়েস ছোট—বেশ ছোট, তবে বিদ্যে বুদ্ধিতে অনেক বড়, মানুষও বড়। কিন্তু এই জগতের হালচাল আমি যত জানি, আপনি জানেন না।"

"কি রকম হালচাল?"

বিজলীবাবু সুরেশ্বরের হাসিহাসি মুখের দিকে তাকালেন। যেন ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই বলতে পারেন। অবশ্য কিছু বললেন না তেমন, শুধু বললেন, "জগতে যখন রয়েছেন, এর হালচাল কিছুটা আপনিও বোঝেন, পরে আরও বুঝবেন।"

পোস্ট অফিসের সামনে পেণছে গেল ওরা। সিণড়িতে ডাক পিওন।

বিজলীবাবু দাঁড়ালেন, "কিছু আছে নাকি, রামেশ্বর?"

রামেশ্বর মাথা নেড়ে না বলে চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল, হাতে কিছু চিঠি, বাকি থলিতে। হাতের চিঠি থেকে একটা খাম বের করে নিয়ে বলল, "ইয়ে দেখিয়ে তো থোড়া।"

বিজলীবাবু খামটা হাতে নিয়ে দেখলেন। জল পড়ে খামের ওপরে লেখা কাঁচা হাতের ঠিকানা ধুয়ে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, বোঝা যায় না। লক্ষ করে দেখে বিজলীবাবু বললেন, "বিজলী অফিসের সাহেবের বলেই তো মনে হচ্ছে—মিত্তিরসাহেবের।"

"মিত্তির সাহাব!...হামরা ভি ওইসি মালুম হোথা থা।...সাহেব কো এক রসিদ ভি হ্যায়।"

"কিসের রসিদ?"

"মানিঅর্ডারকা।"

বিজলীবাবু রামেশ্বর-পিয়নের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। চিঠিটা তার হাতে ফেরতও দিলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "দেখি তো, হাতের লেখা যদি মেলে...।"

রামেশ্বর কিছু বুঝল না, রসিদ বের করে এগিয়ে দিল। মনিঅর্ডার পেণছে তার রসিদটা ফিরে এসেছে। বিজলীবাবু নামসইটা দেখলেন। ললিতা মিত্র। কলকাতার স্ট্যাম্প তো বটেই। টাকার অংকটাও দেখে নিলেন।

রসিদটা ফেরত দিয়ে বিজলীবাবু বললেন, "না, আলাদা লেখা। ও চিঠি মিত্তিরসাহেবেরই হবে। তবে সাহেবকে এখন অফিসে পাবে না, ভোর বেলায় কাজে বেরিয়ে গেছেন, বাড়িতে দিয়ে দিও চিঠি।"

রামেশ্বর চলে গেল। সুরেশ্বর পোস্ট অফিসের মধ্যে ঢুকে গেছে।

বিজলীবাবু ডাকঘরের বারান্দায় সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। বেশ যেন চিন্তায় পড়েছেন। ললিতা মিত্র! ললিতা মিত্র কে? মিত্তিরসাহেবের মা নেই, বোন নেই; বউ আছে বলেও তো তিনি শোনেন নি। বিয়ের কথায় মিত্তিরসাহেব বরাবর প্রসংগটা এড়িয়ে গিয়ে হেসে বলেছেন: 'চেষ্টা করেছিলাম; কপাল মন্দ!' এ ধরনের কথা থেকে কিছু বোঝা যায় না, যাও বা যায়—তাতে মনে হয়, বিয়ে করব ভেবেছিলেন হয়ত, কিন্তু বিয়ে করেন নি।

পাকানো সিগারেট, বারে বারে নিবে যায়; বিজলীবাবু আবার সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। খামের চিঠিটা যে মিত্তির সাহেবের তাতে খুব বেশী সন্দেহ হচ্ছে না। অফিসের নামটা (ভুল নাম এবং বানান সত্ত্বেও) মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। এই অফিসে এ এন মিত্র (মিত্র যদিও পড়া যায় নি; এ এন গিয়েছিল) আর কেউ নেই। কাঁচা হাতের ঠিকানা, একেবারে বাচ্চা ছেলে-মেয়ের যেমন হয়। ললিতা মিত্রর নাম সই আর এই খামের ঠিকানা একই হাতের লেখা নয়। চিঠিটাই বা কে লিখল? মিত্তিরসাহেব তো কখনও বলেন নি তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে সংসারে। বন্ধুবান্ধবের কথা অবশ্য বলেছেন। ওই চিঠি কি তবে বন্ধুদের কারও বাড়ির কেউ লিখেছে? কিন্তু টাকাটা?

মিত্তিরসাহেব বেশ রহস্যময় পুরুষ। বিজলীবাবু আপন মনেই মাথা নাড়লেন,

াচ্ছা, আজ রাত্রে দেখা যাবে।

সুরেশ্বর টাকা তোলার ফর্ম লিখে দিয়ে সে বসে শর্মাজীর সঙ্গে গল্প করছিল। বজলীবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন।

পোস্ট অফিসের কাজ সেরে সুরেশ্বর গল বাজারে। কাছেই বাজার। বাজারে হুদিলালের দোকানে টাকা পয়সা মেটাল। ারপর বিজলীবাবুর সঙ্গে বাস অফিস। াস অফিসে বিজলীবাবুর ঘরে বসে জল খল, চা খেল। বাস ছাড়তে এখনও কিছু রী, মিনিট কুড়ি। দশটা বেজে গেছে।

বিজলীবাবু বললেন, "পুজোর মধ্যে কদিন আসুন। কবে আসবেন?"

সুরেশ্বর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে খছিল। ওপাশে—রাস্তার ওদিকটায়—াছের ছায়ায় বাজার বসে গেছে, শাক-বজি, মাছ, ডিম। এ সময় এখানে বাজার কটু বড় হয়েই বসে, পুজোর মাঝে লকাতা পাটনা থেকে লোকজন আসে, বাদের জন্যে গাঁ গ্রামে থেকে ব্যাপারীরা যারা সওদা নিয়ে ছুটে আসে ভোর নায়, দুপুরে নাগাদ ফিরে যায়। আজকের জার তেমন বড় নয়, কাল থেকে আরও সবে অনেকে, সকালের দিকটা বেশ ভিড় বে। কিছু ছেলেমেয়ে, প্রবীণপ্রবীণাকে রেশ্বর দেখতে পেল, বাজার করছে ঘুরে রে। কারও কারও মাথায় ছাতা।

বিজলীবাবু পান চিবোতে চিবোতে লেন, "কবে আসছেন তাহলে?"

সুরেশ্বর বিজলীবাবুর দিকে তাকাল, লল, "নেমন্তন্ন করছেন?"

"গরীবের ঘরে দু মুঠো খাবেন এতে র কথা কি।"

"আসব একদিন।"

"কবে?"

সুরেশ্বর আবার জানলা দিয়ে বাইরে কাল। "আসব।"

"অষ্টমীর দিন এসো—সকালে; বিকেলে জলীবরণ সন্ধিপুজোয় বসবে।" বলে জলীবাবু আপন রসিকতায় জোরে জোরে াসলেন।

সুরেশ্বর বলল, "অভ্যেসটা এবার ছাড়ার া করুন না। বয়স হয়ে যাচ্ছে তো।"

বিজলীবাবু কৃত্রিম বিস্ময়ে সুরেশ্বরের দেখতে দেখতে বললেন, "এটা ানি কি বলছেন, মহারাজ? কাকে ব?..." বিজলীবাবু এমন ভাবে 'কাকে ব' বললেন যে সুরেশ্বর হেসে ফেলল। বজলীবাবু সামান্য পরেই বললেন, মরা কি ছাড়ার লোক, মহারাজ! সে ন আপনারা—ছাড়ার লোক। সবই ছেন। সংসার ছাড়লেন, সুখ আহ্লাদ লেন, ফুর্তিটুর্তি তাও ছাড়লেন। ও কত কি ছাড়ছেন—ছাড়বেন—কে ত পারে।"

সুরেশ্বর বিজলীবাবুর চোখে এমন এক ধরনের হাসি দেখল যা কেমন ধূর্তের মতন। বিজলীবাবু যে ঠিক কি বলতে চাইলেন সুরেশ্বর বুঝল না।

"আপনারা সব ছাড়েন, আমরা ধরি। ছাড়ার মজা কি জানেন, একবার ছাড়তে শুরু করলে ছাড়ার মজা ধরে যায়, নেশা ধরে যায়। আজ মদ ছাড়ব, কাল চাকরি ছাড়ব, পরশু বউ ছাড়ব...। ছাড়তে ছাড়তে একেবারে বুদ্ধদেব হয়ে যাব।...ওই জন্যেই তো ওপথে যাই নি।"

সুরেশ্বর হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল, বলল, "যাই, আর বোধ হয় সময় নেই।"

বিজলীবাবু তাঁর টেবিল থেকে কিছু কাগজপত্র উঠিয়ে ড্রয়ারে রাখলেন, বললেন, "চলুন, আপনাকে তুলে দিয়ে আমি একবার দুর্গাবাড়ি যাব।"

বাইরে এসে বিজলীবাবু তাঁর সাইকেল নিলেন, হ্যান্ডেলে একটা সোলার হ্যাট ঝুলছে। বর্ষায় ছাতা ঝোলে, রোদে তিনি সোলার হ্যাট চাপিয়ে নেন মাথায়।

রাস্তায় নেমে বিজলিবাবু বললেন "মিত্তিরসাহেবের একটা বড় প্রমোশন হচ্ছে শুনেছেন?"

"না।"

"মিত্তিরসাহেবের ওপরঅলা চলে যাচ্ছে পাটনা, সেই জায়গায় মিত্তিরসাহেবকে কাজ করতে হবে।"

"এ তো সুখবর।"

"আমাদের কাছে সুখবর, তবে যাঁর খবর তিনি তো খাপ্পা হয়ে উঠেছেন।"

"কেন?"

"তা জানি না। তবে, মিত্তিরসাহেব এ জায়গা ছেড়ে যেতে রাজী না। ওপরঅলার জায়গায় কাজ করতে হলে অন্য জায়গায় যেতে হবে।"

সুরেশ্বর কোনো কথা বলল না। হাঁটতে লাগল, সামনেই বাস।

বিজলীবাবুই কথা বললেন। "মিত্তির-সাহেব মানুষটি, বুঝলেন মহারাজ, অদ্ভুত! কি বলে যে, মিস্টিরিআস— তাই। জীবনে উন্নতি করার সুযোগ এলে মানুষ খাপ্পা হয় এমন আর দেখেছেন?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়ল অন্যমনস্ক ভাবে।

বাসের কাছে এসে বিজলীবাবু ড্রাইভারকে কি যেন বললেন। তারপর সুরেশ্বরকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠিয়ে দিলেন। "আপনি রোদে মাঠটা থেকে হাঁটবেন না, বাস আপনাকে গুরুডিয়ায় পৌঁছে দেবে।"

সুরেশ্বর আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার সেই আপত্তি গায়ে না মেখে বিজলী-বাবু সাইকেলে উঠে চলে গেলেন। সাইকেলে উঠার আগে সোলার হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে নিয়েছেন।

বাস ছাড়ল। সুরেশ্বরের পাশে জনা তিনেক শহরের প্যাসেঞ্জার। তার মধ্যে জানলার ধার ঘেঁষে বিবাহিতা একটি মেয়ে বসে আছে। অবাঙালী। স্বামী-স্ত্রীতে কথা বলছিল, তৃতীয় ব্যক্তিটি ওদেরই আত্মীয়, সেও কথা বলছে।

যেতে যেতে সুরেশ্বরের কেন যেন অবনীর কথাই মনে পড়ছিল। ভদ্রলোক যে কিছুটা অন্য ধরনের এই ধারণা সুরেশ্বরের পূর্বেই হয়েছিল। ইদানীং অবনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং তার আচরণ দেখেও সুরেশ্বরের সে-ধারণা ভাঙে নি, বরং তার মনে হচ্ছিল : অবনী ঠিক যতটা তিক্ততা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে ততটা তিক্ত ও বিতৃষ্ণ মানুষ সে নয়। ওর অনেক আচরণ এখনও অপরিণতের মতন, কথাবার্তায় অনেক সময় আবেগের তাপ থাকে। সেদিন অতটা রাতে সে নিতান্ত তুচ্ছ কারণে গুরুডিয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। কারণটা যে তুচ্ছ সে নিজেও জানত, এবং তা গোপন করার চেষ্টাও তেমন করে নি। বড় একটা দুর্যোগ—ঝড়বৃষ্টি গেল মাথার ওপর দিয়ে তাই নাকি খবর নিতে গিয়েছিল : "খোঁজ নিতে এলাম কেমন আছেন?...আমি তো ভেবেছিলাম আপনাদের আশ্রমের চালাফালা উড়ে গেছে। কিছুই তো হয় নি দেখছি।"

অবনী চতুর নয়, ঠিক যতটা বুদ্ধিমান হলে তার উদ্দেশ্য ধরা মুশকিল হয়ে পড়বে—ততটা বুদ্ধিমানও নয়। সুরেশ্বর অন্তত বেশ বুঝতে পারছে, অবনীর আকর্ষণের পাত্র হেম।

বাস থানা পেরিয়ে গেল। সুরেশ্বর অন্যমনস্ক।

চাকরিতে উন্নতি চায় না এমন মানুষ বড় চোখে পড়ে না—সুরেশ্বর ভাবছিল—অবনী সেই উন্নতি উপেক্ষা করতে চাইছে। কেন? এ জায়গা ছেড়ে সে যেতে চায় না, বিজলীবাবু বললেন। কিন্তু কেন?

হেম! হেমের জন্যেই কি অবনী এ-জায়গা ছেড়ে যেতে রাজী না?

কিন্তু আজ হেম কলকাতায় যাচ্ছে বলে সে তো স্টেশনে এল না। বিজলীবাবুর কথা মতন, দরকারী কাজে ভোর বেলাতেই বেরিয়ে গেছে অবনী। যে মানুষ এতটা কাজ বোঝে, দায়িত্ব বোঝে সে আরও বড় দায়িত্ব নিতে অরাজী কেন?

সুরেশ্বর রোদভরা মাঠের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে যেন মৃদু হাসল।

(ক্রমশ)

ফ্রাংক ব্রুইনজর স্কালানের এচিঙ—অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস

এত দিন বাদে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের কাছে এমন একটি চিত্র সংগ্রহ এল, যার সংগে ভারতীয় জীবন, প্রধানত বাঙালী জীবন বিশেষভাবে জড়িত। বলতে গেলে—ছোট হাতের বা বড় হাতের 'এ বি সি ডি' রপ্ত করার অহং জ্ঞানের সংগেই এইসব ছবির চিত্রকারের স্মৃতিও আমাদের মনে রয়ে গেছে।

চিত্রকর ফ্রাংক ব্রুইনজর স্কালানের করা ছবি এচিঙ গ্রন্থ চিত্রণ ইত্যাদির প্রদর্শনী আমরা কিছুদিন আগে ফাইন আর্টস ভবনে দেখেছিলাম; স্কালান একজন দারুণ জাগ্রত-শিল্পী, তাঁর কাজের পদ্ধতি, নানারূপে পরীক্ষা—ভারতীয় ভাবুকতা থেকে পাশ্চাত্য ধারা আমাদের বিস্মিত করে।

সব থেকে যেটা দর্শককে অবাক করে সেটা হচ্ছে তাঁর ভারতের লোকজন, গ্রাম প্রান্তর, ইতিহাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সাধারণত, শোনা যায়, একজন অ্যাংলো ভারতীয়র জন্মভূমির প্রতি যে ঘৃণা থাকে, আদৌ তাঁর মধ্যে তা—সেরূপ মনোভাব এতটুকু ছিল না। তাঁর ছবি দেখলেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, ভারতের ব্যাপারে তাঁর অহঙ্কার ছিল।

তাই তাঁর ছবিগুলি, স্বভাবত এচিঙগুলিতে কোন সংবাদ সরবরাহ করার ভাব নেই; যেটা বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায়, এখানে এসবে তাদের মত নির্মম মজা করাও নেই। মনে হয় দৈনন্দিন জীবনের যেসব দৃশ্যাবলী উনি চিত্রিত করছেন সেই সব পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর বড় সুখ হয়েছে। অন্য কোন চিত্রগত তত্ত্বের জন্য ফরাসী পেইসাজিসংদের মত সংবেদনের অর্থাৎ প্যাতিত সাঁসাসিয়ঁর হেতুতে স্কালান তাঁর বিষয়ের মধ্যে কালক্ষয় করেন নি—নিছক ভালবেসেই ভালবাসায় তাঁকে ধরে রেখেছিল।

তার মধ্যে কোথাও কোন ছবিতে হোগারথীয় নাটকীয়তা নেই—সব সময় স্কালানে একটা আবহাওয়া, একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন—এতে বেউইক জাতীয় সরলতাই বেশী। আবহাওয়া বা পরিবেশ বললেই টোনালইটি—বর্ণাভতার কথা, স্বতই এসে পড়ে এবং প্রত্যেক ছবিতে বর্ণাভ ব্যাপারে তিনি সচেতন। অনেকটা গ্যস্তভ দোরের মত।

তিনি অন্যান্য ছবির ব্যাপারে খুব অ্যাকাডেমিক এবং সেই সংগে দেখা যাবে, বিশেষত তার গ্রন্থ চিত্রণে, তিনি খুব আমোদপ্রিয়। এই সূত্রে একটি ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—ভারতীয় রাজা ইতালীতে, সম্ভবত ভিনিসে; ছবিতে দেখান হয়েছে রাজা বিদেশী পোশাকে পদব্রজে চলেছেন—উপরে মেঘের মধ্যে রাজার নিজের দেশেতে নিজের রাজসিকতা, হাতীর পিঠে তিনি ভ্রমণে বার হয়েছেন।

ফ্রাংক ব্রুইনজর স্কালান ভারতে জন্মেছিলেন এবং ক্যালকাটা বয়েস স্কুলেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয়—পরে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া অফিসে একাদিক্রমে চল্লিশ বছর কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। স্কালান প্যারিসে আকাদেমই জুলিয়াঁতে জ্যাঁ পউল ল্যরাঁসের কাছে কাজ শেখেন। তাঁর কাজ প্যারিসের সালোঁতে, রয়াল স্কটইস অ্যাকাডেমী সোসিয়েতে দেজা কোয়াফোরাতিসত ফ্রাঁসে ইত্যাদিতে স্থান লাভ করে। ইনি পরে সোসিয়েতে দেজাকোয়াফোরাতিসত ফ্রাঁসের সদস্য হন। বহু গ্রন্থও তিনি চিত্রিত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নাম পঞ্চানন কর্মকার, পি ব্যানার্জি এনগ্রেভারদের সংগে করা যেতে পারে। স্কালানের করা ২৬টি এচিঙ মিঃ এ ফিলিপস অ্যাকাডেমীকে দান করেছেন।

কিশোর চিত্র প্রদর্শনী
—সেণ্ট জেমস স্কোয়র

জাতীয় সাহিত্য সংঘের কর্তৃপক্ষ এই ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করে সত্যই আমাদের কাছে ধন্যবাদার্হ। এখানে যেসব ছেলে-মেয়ে যোগ দিয়েছে—তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত খালি গায় থাকে, ছেঁড়া জামা পরে, বিভিন্নজাতীয় ইতর শ্রেণীদের সংগে অম্লান বদনে লাইন দেয়। এরপর বাড়ির ফাইফরমাশ আছে, ইস্কুল পাঠশালা আছে, দু-বেলার পড়াশুনোও আছে।

এরা কেউ বালীগঞ্জের ছটাকী-সভ্য কালোবাজারী পরিবারের নয়, মা যেখানে ডাঙরী-পরে কালো চশমা চোখে প্রচণ্ড-গাড়ি চালিয়ে ছেলেকে বা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেয়—স্কুলে তারা পেটকাটা জামা পরা আণ্টির শিথিল ভুঁড়ি দেখতে দেখতে আর্ট শেখে। এরা সকলেই গৃহস্থ পরিবারের—যারা ছবি এঁকেছে।

এদের রঙ তুলি কাগজের—সব কিছুর অভাব। এমন কি বসে মনস্থির করে বেচারীদের আঁকার সুযোগও নেই। তবু এদের উৎসাহ মরে না, তবু এরা আঁকে।

জাতীয় সাহিত্য সংঘ আঁকা প্রতিযোগিতা প্রতি বারই করেন। এবার প্রায় ১০০ জন ছেলে মেয়ে, বয়সের দিক থেকে ৫ থেকে শুরু করে ১৭ পর্যন্ত, এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল।

৫ থেকে ১০ বছর—প্রথম হয়েছে বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়, ২য়—মিনু চক্রবর্তী, ৩য়—আশীষ মুখোপাধ্যায়। ১১/১৫ বছর—১ম—অমিতাভ সেন, ২য়—সুবিমলকান্তি ভট্টাচার্য, ৩য়—তুষার রায়। ১৬/১৮ বছর—১ম দীপক চক্রবর্তী, ২য়—অরুণ ভৌমিক, ৩য়—পংকজভূষণ মজুমদার।

আমাদের কিন্তু, একেবারে শিশু, যেমন দেবমালা বসু বা শংকর ভদ্রর ছবি খুব ভাল লেগেছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতা

"কবিতা পরিচয়ে" প্রকাশিত আমার দুটি লেখাকে ঘিরে আবু সয়ীদ আইয়ুব যে তর্ক তুলেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করি। আমাদের এই অভাগা দেশে যখন মতান্তর মানেই মনান্তর অথবা গূঢ় অভিসন্ধির সন্ধান, তখন এ-ধরনের সুস্থ প্রত্যালোচনার প্রসারে খুশি লাগে। আইয়ুব সাহেব বয়ীয়ান এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যপ্রেমী, ছাত্রবয়সে অনেক সময়ে দীক্ষার্থে গিয়েছি তাঁর কাছে; তবে এ তো হতেই পারে যে কোনো কোনো বিষয়ে আজ আমাদের মিলছে না।

সব সময়ে যে মিলছে না তাও হয়তো নয়। হয়তো-বা পরস্পরকে বুঝতে ভুল করি অনেক সময়ে। অবশ্য তাঁর মতো পাঠকও যদি লেখা থেকে ভুল বোঝেন তবে সে নিশ্চয় তাঁর দোষ নয়, ধরে নিতে হবে আমারই রচনার কোথাও জটিল অপরাধ ছিল।

নইলে এ-কথা তাঁর কেন মনে হবে যে 'রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতাকে' আমি 'জাতিচ্যুত বলে বিচার' দিয়েছি? আলোচনা থেকে এই সামান্য-সিদ্ধান্ত কি অনিবার্য হয়? কোনো অগ্রিম অভিমান থেকে এ-রকম বলছেন না তো তিনি? তরুণেরা নির্মমভাবে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করছে তাদের হৃদয় থেকে, এ-কথাটা অত্যন্ত জানাজানি হয়ে গেছে বলেই কি? সন্দেহ নেই যে এমনও ঘটছে, কদিন আগেই সুনীল যেমন আক্ষেপ করেছেন : রবীন্দ্রনাথ নিজেই কখন্ তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিলেন এক সময়ে! তাঁর বেদনা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু আমারও হাত যদি ছেড়ে দেন রবীন্দ্রনাথ তবে সেই মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যাবে আমার সমস্ত অস্তিত্ব বোধ। তাই বলে কি সঙ্গে সঙ্গে এও মানব না যে অতিবাচনের ভার রবীন্দ্ররচনাকে থেকে থেকে কেমন শ্লথিত করে দেয়? লক্ষ করব না যে শেষ বয়সে এই পল্লবিত ভাষণ বেড়ে গিয়েছিল আরো বেশি? অন্তিম দশ বছরে লেখা একুশটি কবিতা-বইয়ের প্রায় সাড়ে আটশো কবিতার সর্বত্র কি সত্যি কোনো অনিবার্যতা অনুভব করি? ভালোবাসার ক্ষোভ জাগে না কি মনে মনে, আরো একটু কম বললেন না কেন কবি? বিশেষ এক প্রেক্ষিতে এইটুকুই মাত্র জানিয়েছিলুম আমি : 'শেষ দশ বছরের কবিতায় খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কতো বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইলেন তিনি!' এর মানে নয় ঐ কালবর্তী সমগ্র কাব্যকেই 'জাতিচ্যুত' বলে 'বিচার দেওয়া'। দুটি কবিতার মধ্যে অন্তত 'প্রথম দিনের সূর্যের' প্রতি আমার অসীম আসক্তিই কি প্রকাশ পায় নি?

আইয়ুব সাহেব কখনো কখনো বাক্যের এইরকম দ্রুত নিষ্পত্তি করে নিয়েছেন মনে হয়, কখনো-বা নিয়েছেন তাকে খণ্ড ক'রে, আংশিক অর্থে। যেমন : 'রায় দিয়েছেন ওটা কবিতাই নয়, শেষ লেখার ১৩ নম্বর কবিতার প্রাক্‌রচিত পদ্যভাষ্য'। তাই কি? আমি তো এই লিখেছিলুম : 'প্রথমে মনে হয় এটি ঐ কবিতারই ভাষ্যমাত্র, প্রাক্‌রচিত পদ্যভাষ্য—কিন্তু ক্রমে দেখা যায় দুটি রচনায় মিলও যেমন, ভিন্নতাও তার চেয়ে কম নয়'। এই ভিন্নতা বিষয়ে তিনটি সূত্রের আলোচনা ছিল লেখায়, যার অন্যতম একটি হচ্ছে বিস্তারিত বিশ্লেষপ্রবণতা। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে আমার দ্বিতীয় রচনাটিতে পূর্বাপর একটি আপেক্ষিক বিচার প্রচ্ছন্ন ছিল—প্রচ্ছন্নই বা কেন বলি, যথেষ্ট প্রকাশ্যেই ছিল—দুটি কবিতার রচনাভঙ্গির, উপস্থাপনার, ফলশ্রুতির তুলনা। সমীপবর্তী হয়েও কবিতা দুটি অভিঘাতে কতো স্বতন্ত্র, এবং কেন স্বতন্ত্র, এইটেই দেখানোই ছিল আমার বিনীত উদ্দেশ্য।

'এরা সব উপাদান' থেকে শুরু করে পাঁচ-ছটি লাইন যে আমার কাছে কবিতার পক্ষে আর অনিবার্য লাগে না, সে কি এজন্য যে ওখানে গদ্যের ব্যবহার আছে? গদ্যপদ্যের সনাতন তর্ক এখানে না উঠলেও পারে। এ কথা আজ আর ঘোষণা করে বলবার দরকার নেই যে কোনো শব্দ বা কোনো বাক্যবন্ধই কবিতার পক্ষে 'বাধা' নয়, কিন্তু তার মানে কি এই যে যে-কোনো শব্দ বা যে-কোনো বাক্যবন্ধই কবিতা? বিচার্য হচ্ছে এইটে যে, রচনা সর্বাত্মক ভাবে কবিতার কোনো আভ্যন্তরীণ আলোড়নের দিকে আমাকে টেনে নিচ্ছে কি না, অথবা সেই টানে বাধা তৈরি করছে কি না কোনো আংশিক উপাদান। 'আমাকে' কথাটি অগত্যা বসাচ্ছি, কেননা সত্যি সত্যি এসব বিষয়ে 'সর্বকালের মতো, সর্বাবস্থার জন্য, সর্বসম্মতিক্রমে' কিছুই বলা হয় না, বলা যায় না।

গদ্যপদ্যের তর্ক অন্য কারণেও নিষ্ফল। যে-অংশটি তর্কস্থল, সে তো গদ্য নয়, সে তো বিশেষরূপেই পদ্য। অভিযোগ তো এমন নয় যে কেন ঐ গদ্য অংশটি এলো কবিতায়, অভিযোগ ছিল এই যে ওটা কেন পদ্য মাত্র হয়ে থাকছে, হয়ে উঠছে না কবিতা। 'ছন্দ আর মিল ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে যা কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য, অনিবার্য' প্রশ্নটা এইভাবে ছিল বলেই বোঝা যায় যে এর গদ্য রূপে নয় কিন্তু পদ্য পরিণামেই পাঠক হিসেবে আমার অস্বস্তি।

হতে পারে যে এর মধ্যেও কেউ কবিতার কিছু পাচ্ছেন। সেটা বিশেষের তর্ক, সামান্যের নয়। অন্তত সেজন্যে এলিয়টের

উদাহরণ খুব সাহায্য করবে কিনা, সংশয় থেকে যায়। তির্যক ও জটিল বাচনের সপক্ষে কবিতার বাচ্যার্থকে এলিয়ট যে সারমেয়মুখে মাংস খণ্ডের মতো ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে-কথা না হয় তুলব না। কিন্তু 'ড্রাই স্যালভেজেস'এর উদ্ধৃত অংশ যে কবিতা সে কি কেবল তার দার্শনিক গদ্য ভাষণের মহিমায়? অন্যত্র দেখা দিলে যে ওর 'কাব্যিক তাৎপর্য' ধরা পড়ত না, এ তো লেখক নিজেই বলছেন। তাহলে সমগ্র কবিতায় যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে এর 'কাব্যিক তাৎপর্য' আসছে কোথা থেকে, তা কি ভাবতে হবে না? আমরা লক্ষ করি যে ওই বাক্যকটির সঙ্গে অব্যবহিত রূপে ছিল গীতিধ্বনিত ছন্দে মিলে গাঁথা ছত্রিশটি লাইন তার পরে এক স্তরান্তর সৃষ্টির জন্য অতিকৌশলে এলিয়ট তাঁর পাঠককে কখন সরিয়ে নেন ঐ গদ্যবাচনের দিকে, নবীন অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতার এই পারম্পর্য, স্বরাবন্ধনের এই টানাপোড়েন কবিতার অনুভবে কী ছন্দে সাহায্য করে, কবি তা দেখিয়েছিলেন 'কবিতার সংগীত' প্রবন্ধে: '....there are possibilities of transitions in a poem comparable to the different movements of a symphony or a quartet'! যে-সব সমালোচক দান্তের ধরনে এক চতুঃস্তর অর্থপর্যায় পর্যন্ত দেখতে পান এলিয়টের এই রচনায়, তাঁদের কথা গণ্য না করলেও বলা যায়, এই স্বরান্তর সৃষ্টির 'মুভমেণ্ট'ই নিছক গদ্য লাইনকে তার গদ্যময়তা বা গুরুভার দার্শনিকতাকে কবিতার দিকে তীব্র চাপে টেনে নিতে পারে।

সেই নিরিখে কি বিচার চলে রবীন্দ্রনাথের এই রচনার? যেমন ধরা যাক, বিষ্ণু দে'র দীর্ঘ কবিতার ভঙ্গ ব্যবহার কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই মানে বিচার্য হবে? সে-ধরনের মুভমেণ্ট কোথায় পাব এখানে? 'মননজাত অভিজ্ঞতার ফসল' যে দেখতে চাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায়, এসব ক্ষেত্রে তা সফল হতে পারছে কি? বহিরবয়বগত অলঙ্করণ নতুন প্রকরণের কথা ছেড়ে দিলে অন্তর্গঠনের কোনো নবীন বিন্যাস কি সেভাবে রচিত হতে পারছে এই কবিতায়, যেমন আছে 'প্রথম দিনের সূর্য'? এইটে ছিল তর্ক। এ-তর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গ তুলবার সময়ে মনে রাখতে হবে যে এই শেষ পর্বে কবির অভিপ্রায় এবং রচনার মধ্যে, শিল্প বিষয়ে তাঁর ধারণা এবং প্রয়োগের মধ্যে, বহির্গঠন এবং অন্তর্বিন্যাসের মধ্যে সর্বত্র সামঞ্জস্য ঘটছিল না, এক বিরোধ সঞ্চিত হচ্ছিল মুহুর্মুহু—যার ফলে একই সঙ্গে আমরা পেয়েছি অনেক স্খলিত রচনা এবং প্রতিভাবলে বিরোধ-উত্তীর্ণ অনেক দ্যুতিময় হীরকখণ্ড।

'প্রশ্ন' কবিতার তর্কসাপেক্ষ লাইন কটি গদ্যে বুঝিয়ে বলতে নাকি শতাধিক পৃষ্ঠার প্রয়োজন। শতাধিক কেন, সহস্রাধিক হওয়াও সম্ভব। আবার অল্প কয়েক লাইনেও এক-রকম চলে যায়, যেমন সমালোচক নিজেই বুঝিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু 'এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধ গদ্য নয়' (নয়ই তো, এ তো পদ্য)—'কারণ বিশুদ্ধ গদ্যে বক্তব্য বিষয় একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত করা যায় না'—একে কি মুদ্রণপ্রমাদ ভাবব? দৈনন্দিনের কথা না-হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু পাস্কাল কী করেছিলেন, গদ্য-দার্শনিক পাস্কাল?

'বোঝানো' প্রসঙ্গে আমার নূতন কোনো তর্ক নেই, কেননা কম্যুনিকেশন বন্ধ করে দিতে হবে এমন কোনো দূরতম অভিপ্রায় আমার রচনাটিতে অভাসিত ছিল বলে মনে করতে পারছি না। অভিযোগ ছিল হেতুহীন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রবণতার প্রতি, আইয়ুব তো আরোহী-অবরোহী যুক্তিসোপান পর্যন্ত কবির পক্ষে অগ্রাহ্য ভাবছেন।

উপরন্তু, তাঁর প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি কেন 'বলেছেন শঙ্খ ঘোষ'? ওরকম লিখলে আমাকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কেননা আমি মাত্র বলেছিলুম: 'ভাবাই শক্ত যে **এই কবি** এক সময়ে জানিয়েছিলেন, বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার, কবিতা কেবল প্রাণিত করতে জানে'।

২

কবিতা দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাক্য বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। উনি যে-ভাবে পড়েছেন আমি তেমন ভাবছি না, আমি কী ভাবে দেখেছি কবিতা পরিচয়ের পাঠকেরা তা জানেন। 'যে যেমন বোঝে অর্থ তাহার, কেহ বোঝে এক কেহ বোঝে আর'। যেমন 'অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া' ইত্যাদি কথায় এমন অপরিহার্য জটিলতা আছে বলে এখনো আমার বিশ্বাস নয়। দুঃখ সুখময় এই অস্তিত্বের সত্য মানে কী (পরিণামও সেই অর্থের অন্তর্গত) বোঝা যায় না, তাকে কেউ বলেন মায়া, কিন্তু মায়াই বলি আর যাই বলি সে-সবই শব্দমাত্র, তাতে ধরা

পড়ে না এর অবাচ্য তাৎপর্য : 'যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া'। এ-রকম 'অর্থঘন পঙক্তি ফোর কোয়ার্টেটসের মতো কবিতায়ও দুর্লভ' কি না, যোগ্য দার্শনিকেরা তার বিচার করবেন ভরসা করি; আমার অক্ষম বোধে এখনো সে-রকম প্রত্যয় জাগে না।

'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটি বিষয়ে আমার ভাবনাকে আইয়ুবের মনে হয়েছে 'চর্বিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা', এতে তাঁর মন সায় দেয় না বলে অন্য একটি অর্থ এর ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার এবং সমগ্রের জীবনসত্তা কী এক রহস্যময় অপরিচয়ে আবৃত আছে, এই উপলব্ধি যদি হয় 'চর্বিত তত্ত্ব', তবে বলা প্রয়োজন যে উত্তীর্ণ কবিতার অনেকটাই রচিত হয়ে আছে ঐ সব বহুজ্ঞাত সহজ ধারণাগুলিরই নবীন ব্যক্তিগত উপলব্ধির স্পন্দে।' তুচ্ছ ও সনাতন বিষয়েও যে আপন দেখার ভঙ্গিতে সুন্দর কবিতার উপাদান হয়ে ওঠে, এ তথ্য তো নতুন নয়।

কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। একদা যে ছিল বালক, দীর্ঘ জীবনের সাধনায় সে নিজেকে 'চিনিয়ে দেওয়ার' মতো কিছু করেছে, 'কিন্তু কোন্ ভরসায় এ-কথা নিজের মুখে উচ্চারণ করবে সে'—এ-রকম একটা লাজুক ব্যাপার আছে নাকি ঐ 'স্ফটিকতুল্য' কবিতার? আমি তা ধরতে পারছি না। উদ্গ্রীব প্রত্যাশা, স্পন্দিত ব্যাকুলতা এবং নিষ্ফল হতাশ্বাসের আবেগে ছোটো এই রচনাটি এমন মথিত হয়ে আছে যে নূতন এই ব্যাখ্যাটিকে পর্যাপ্ত বলে ভাবতে কেমন বাধা লাগে।

আইয়ুব লক্ষ করতে বলছেন, প্রশ্নটি ছিল কী তুমি বা কেন তুমি নয়, কে তুমি। কিন্তু এটা বিশেষভাবে লক্ষই বা করব কেন? 'তুমি' কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, মানবস্বভাবী এই নিকটব্যক্তিত্বের আরোপের সঙ্গে সঙ্গে 'কে তুমি'ই তো অনায়াস-সংগত প্রশ্ন। প্রণয়িনীগণ মাঝে মাঝে রাগ করে বলেন বটে 'তুমি একটা কী!' কিন্তু তা-নইলে 'কী তুমি' প্রশ্নটা কি কবিতায় খুব মানবিক রূপে স্বাভাবিক ছিল? মানবীয়তা আরোপের পর কি আর এই রহস্যজিজ্ঞাসাকে এভাবে অনুবাদ করা যায়: এসো 'তোমার যাবতীয় গুণ ও ধর্ম, হেতু ও নিমিত্ত, আকার আয়তন, গঠনের উপাদান ও প্রণালী' জেনে নিই? 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' এইটেই তো তখন একমাত্র প্রত্যাশিত প্রশ্ন।

পরিশেষে একটি সুজ্ঞাত তথ্যের উল্লেখ করি। কোনো প্রমাণ হিসেবে নয়, তবে কবিতাটি বিচারের পক্ষে আরো একটি অনুমান হিসেবে এর ব্যবহারযোগ্যতা ভেবে দেখা যায়। 'প্রথম দিনের সূর্য' রচনার অল্প দিন আগে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন কবি: 'আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী কো বেদঃ অর্থাৎ কে জানে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন? কিংবা জানেন না? এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় জগতে আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয় নি যে যাঁর সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না।... আসল কথা চরম প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।'

অবশ্য এসব তর্কেরও কোনো শেষ মীমাংসা নেই। কথা চলতে থাকে—এই পর্যন্ত।

শঙ্খ ঘোষ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম দিনের সূর্য

আপনাদের পত্রিকার ১১ আগস্টের সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের আলোচনাটির জন্য ধন্যবাদ। 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটি সম্পর্কে আমার একটা বিবেচনা আছে।

১৯৫১ সালের ১৩ মে রাত্রিবেলা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'রূপনারায়ণের কূলে'। এর প্রায় সত্তর দিন পরে অর্থাৎ ২৭ জুলাই সকালে লিখেছিলেন 'প্রথম দিনের সূর্য'। এর পর ২৯ জুলাই বিকেলে 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' এবং ৩০ জুলাই সকাল সাড়ে নটায় কবি তাঁর জীবনের শেষ কবিতাটি 'তোমার সৃষ্টির পথ' লিখেছেন যাকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কোনো এক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কঠিনতম কবিতা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলিতে এমন একটা অন্ধকার আশ্রয় আছে—যেখানে আমরা, কবিতা পাঠকেরা যেতে পারি মাত্র এবং গিয়ে এমন কয়েকটি রুগ্ণ রশ্মির সাক্ষাৎ পাই যাদের সাহায্যে এই লেখাগুলোর উপর আমাদের বিস্ময়ের অফুরন্ত অবকাশ। কিন্তু এই অন্ধকার অন্তরালেই যে এই কবিতাগুলির মহত্ত্ব সে বিষয়ে আমার ধারণা কোন তর্ক নেই। এই অন্ধকার অন্তরাল—ঈশ্বর তথা ঐতিহ্য-নিয়ন্ত্রিত পথের ঐকান্তিক যাত্রী, ক্লাসিক আনন্দ-চেতনার কবি এবং মৃত্যুর করতলগত কাঙাল—এই দুইজন রবীন্দ্রনাথের মারাত্মক সহাবস্থানের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, কবিতাটির প্রশ্নটি হলো 'কে তুমি।' প্রশ্নটি সনাক্তের, আইডেনটিটির—এতোগুলো লোকের মধ্যে কোন বিশেষ লোকটি তুমি, এমন কী পরিচয় আছে তোমার যাতে অন্য-দশজনের মধ্যে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই চেনা যায়? এ প্রশ্ন সমগ্র বিশ্বসত্তাকে করার কোনো মানে হয় না। করা যায় ব্যক্তিবিশেষকে, ব্যক্তিবিশেষকেই করা হয়েছে কবিতাটিতে। সে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উক্তিটি সম্যক প্রণিধানযোগ্য। 'প্রথম দিনের সূর্য' এবং 'দিবসের শেষ সূর্য' রবীন্দ্রনাথের যে চেতনায় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে সে চেতনা আসলে মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুর করস্পর্শে উদ্দীপিত রবীন্দ্রনাথ প্রাতিস্বিক শিকড়-চেতনার কবি। জীবনের অবসান-বোধই তাঁর বাল্যকালেয় একটা অবরুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে জাগিয়ে তুলেছে (পাঁচ ছয় বছরের বালক খুব ভোরে উঠে জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাগানে গিয়ে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় বসে থাকত)। এই স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণে একটা বিহ্বলতা আছে তার 'পেল না উত্তর' এবং 'মেলেনি উত্তর' প্রামাণ্য প্রতিপাদ্যে। এই বিস্ময়-বিহ্বলতা জীবনের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ-নিরপেক্ষ আসা এবং অনিবার্য অবসানকে কেন্দ্র করে। এই বিস্ময়কে গভীর উপলব্ধি করা যায় মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে—বিশেষত এই কবিতায় এই উপলব্ধি ঘটেছিল মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে। এই উপলব্ধি একজন প্রকৃত আধুনিক কবির উপলব্ধি। জীবন বিষয়ে এই উপলব্ধি ঘটে যে পটভূমিতে সেই পটভূমি নির্মিত হয় নির্বান্ধব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের একাকিত্ব বোধ থেকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কবিতা নিয়ে বিশ্বসত্তা, প্রকৃতি, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি নানারকম সন্দেহ তোলা কবিতাটা বোঝার জন্য অনিবার্য নয়। শেষ কথা, কবিতা যে আমরা একরকমভাবে বুঝিই এবং সেই বোঝার মধ্য দিয়েই যে একটি কবিতা আমাদের মধ্যে চিরদিন থেকে যায় এ বিষয়ে আমি আইয়ুব সাহেবের সংগে সম্পূর্ণ একমত।

কালীকৃষ্ণ গুহ
কলি-২৭

"জাতিভেদ প্রথা, বাংলার গ্রাম সমাজে''

দেশ পত্রিকায় (৩৩ বর্ষ) ৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীতারাশিষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "জাতিভেদ প্রথা, বাঙলার গ্রাম সমাজে" প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

যে সমস্ত প্রাচীনপন্থী সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এখনও সেই পুরানো বাঙলা-সমাজের সবাপেক্ষা ক্ষতিকর প্রচলিত প্রথাকে অকড়ে ধরে থাকতে চান, তাঁদের কাছে প্রবন্ধটি হয়তো উপভোগ্য হতেও পারে। বর্তমান যুগে এমন একটা প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার মধ্যে কতটা যুক্তিযুক্ততা বর্তমান, তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি।

এ কথা আজ আর কারো উপলব্ধি করতে বাকি নেই যে সমগ্র হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-দের পথ-প্রদর্শক হয়ে চলতে চলতে আজ এতটা পশ্চাদপসরণের অন্যান্য সমস্ত কারণের মধ্যে এই জাতিভেদ-প্রথা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। স্বামিজীর কথায় এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে প্রতিভাত হয়—"জাতিভেদের সবচেয়ে মন্দ দিক হল এই যে, এতে প্রতিযোগিতা দমিত থাকে এবং প্রতি-যোগিতার অভাবই বাস্তবিকপক্ষে ভারতের রাজনীতিক অধঃপতন ও বিদেশী জাতি কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কারণ।" তবে তিনি সেই সংগে জাতিভেদ-প্রথার ভাল দিকের অস্তিত্ব স্বীকার করে গেছেন। এই ভাল দিকটা ততদিনই কার্যকরী ছিল যতদিন পর্যন্ত এই জাতিভেদ-প্রথার মহতী উদ্দেশ্যকে বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য ছিল। সামাজিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই যারা যে কাজ করতে সক্ষম, তারা সাধারণত সেই কাজে পুরুষানুক্রমিক যাতে সুপটু হয়ে ওঠে তারই উদ্দেশ্যে হয়েছিল এই জাতিভেদ-প্রথা। এই প্রথার পিছনে ছিল মূলত কার্য বিভাগ। কিন্তু এই প্রথা ক্রমে বিভক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ অধিকার এনে দিল এবং কালে তা চারিদিকে শিকড় ছড়িয়ে দৃঢ় হয়ে বসল। এইখান থেকেই আরম্ভ হল জাতিভেদ-প্রথার কুফল ফলতে। তাই এইখানেই স্বামিজীর সতর্কবাণী—"জাতি বিভাগ ভাল জিনিস। জীবন সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়।... যেখানেই যাও জাতি বিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে।"

অন্ন সংস্থানের জন্যই হোক, আর প্রগতিশীল কিছু মানুষের চেষ্টায় হোক, বর্তমানে জীবিকা নির্বাচনের প্রশ্নে বর্ণাশ্রমের কঠোরতা বেশ শিথিল হয়ে গিয়েছে—এ খুবই আনন্দের বিষয়। কারণ সর্বনাশা জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছেদের এই হল প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত লেখক এই স্বাভাবিক পরি-বর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারলেন না। তাই মন্তব্য করলেন—"কিন্তু কর্ম-নির্বাচনের এই উদারতা বর্ণ-বিভাগের দৃঢ়তাকে দুর্বল করিতে পারিয়াছে, কিনা তাহা বিচার সাপেক্ষ।" পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত মানুষ বিরল। তাই বর্তমান প্রগতিশীল যুগেও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অভাব নেই। লেখকের এই উক্তি কি বহু চেষ্টায় মানুষের মনে চাপা দেওয়া সংস্কারগুলিকে আর একবার নাড়াচাড়া দেয় না? তিনি যেন সংস্কারমুক্ত হওয়ার মন্ত্রোদ্যত মানুষগুলোকে তাদের পূর্বে প্রচলিত শ্রেণীগত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে দিতেই কলম নিয়ে বসেছেন।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেন এই জাতিভেদ-প্রথার সৃষ্টি করেছিলেন, কি ছিল তার উদ্দেশ্য, কি এর প্রকৃত ব্যাখ্যা তা আমাদের জানার কিছুটা প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিক, কিন্তু তার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে গিয়ে তার বিকৃত ব্যাখ্যা ও তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের সৃষ্ট শ্রেণীগত অধিকারকে এভাবে ফলাও করে লেখা সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের দুর্বল স্থানে আঘাত করার একটা অপপ্রচেষ্টা নয় কি? উক্ত প্রবন্ধে তিনি যে জাতিভেদ-প্রথা দেখিয়েছেন তা একদিন বাঙলার গ্রাম সমাজে দুর্গ্রহের মতো থাকলেও বর্তমানে তার কঠোরতা চোখে খুবই কম পড়ে। বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে জাতিগত শ্রেণী বিভাগের প্রাধান্য এখনও দেখা যায় ঠিক, কিন্তু "খাদ্যাখাদ্যের স্পর্শদোষ বিচার, পানীয় জল ব্যবহারেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোকেরা আজও যথেষ্ট সতর্কতার সহিত সমাজে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে,"—এই উক্তিটি লেখকের বর্তমান বাঙলার গ্রাম-সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুশীলনের অভাবের পরিচয় দেয়। তাই তাঁর উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ "জাতিভেদ-প্রথা, তৎকালীন বাঙলার গ্রাম সমাজে" না হয়ে "জাতিভেদ-প্রথা, বাঙলার গ্রাম সমাজে" হওয়ায় উক্ত প্রবন্ধের নামকরণের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এ ছাড়া লেখক তাঁর প্রবন্ধে এমন কতক-গুলি মন্তব্য করেছেন যেগুলো তাঁর নিরপেক্ষ মনের পরিচায়ক নয়। একটি স্থানে তিনি লিখেছেন—"বাঙলা দেশে বোষ্টম বা বৈরাগী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা আবার আচার-আচরণে নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করিলেও—জলচলনীয় শূদ্ররই অন্তর্গত। কারণ, অসামাজিক মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মলাভ করে, তাহারা আসলে শূদ্র, যদিও তাহাদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।" লেখকের এই উক্তি কি সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কটাক্ষ-পাতের ইঙ্গিত নয়? আরও এক স্থানে তাঁর মন্তব্য—"এই সকল বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলেও যাঁহারা যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইবার কোনোও সম্ভাবনা নাই।" লেখকের এই উক্তি জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত ব্যাখ্যা থেকে লেখক যে কত দূরে তা বিশেষ করে প্রমাণ করে। কারণ স্বামিজীর মতে—"জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে

লিখিত আছে ঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত-প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন।" সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই যে, বাঙলার গ্রাম সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার ইতিহাস জানানোই যদি লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, তবে তাঁর অন্যান্য কতকগুলো মন্তব্যের সঙ্গে উপরোক্ত দুইটি মন্তব্যের কি অপ্রাসঙ্গিক অবতারণা ঘটেনি?

এর পরেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল উক্ত প্রবন্ধে তাঁর কতকগুলো আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার। একটি ক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন—"তফশীল বা অবনত হিন্দু-জাতি।" এখানে কি তিনি 'তফশীলভুক্ত হিন্দুজাতি' লিখলে তাঁর তফশীলভুক্ত হিন্দু জাতিদের প্রতি কটাক্ষপাতের পরিমাণে কমতি পড়ত? তারপর তিনি লিখেছেন—"জাতিগুলির শ্রেণী বিভাগের সর্বনিম্নে আসে কয়েকটি অস্পৃশ্য শূদ্র—যাহারা মূলত বন্য জাতিদেরই বংশধর।" জাতিভেদ প্রথার বিবরণ লিখতে বসে 'অস্পৃশ্য শূদ্র' কথাটিই কি যথেষ্ট ছিল না? "তারা মূলত বনজাতিদেরই বংশধর" কথাটি ব্যবহার করা কি লেখকের অপরিমার্জিত রুচির পরিচয় দেয় না?

পরিশেষে আমি এইটুকুই বলতে চাই, যখন আমরা সংস্কারমুক্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি, যখন ঘুম ভেঙে চমকে উঠে হিসেব করতে বসেছি প্রচলিত প্রথার কুফল; তখন এইরকম প্রবন্ধ কি আমাদের সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না? স্বামিজী থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত প্রত্যেক মহাপুরুষ বাংলার তথা সমগ্র ভারতের সামাজিক জীবনে এমন একটা ক্ষত স্থান সারানোর জন্য সমস্ত জীবন ধরে যেখানে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, যেখানে সংবিধানে জাতিভেদ-প্রথা এবং শ্রেণীগত অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, সেখানে শ্রেণীগত অধিকারগুলোকে জানানোর উদ্দেশ্যেই রচিত এমন এক ভেদাভেদমূলক প্রবন্ধের অবতারণা আধুনিক প্রগতিশীল বাঙলা-সমাজের পক্ষে সমূহ অকল্যাণ-কর কিনা সুধী-পাঠকগণ বিচার করুন।

শ্রীদিলীপকুমার মণ্ডল
যাদবপুর।

ষষ্ঠ রিপু

দেশ পত্রিকায় (১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭৩) অমূল্যকৃষ্ণ রায়ের 'ষষ্ঠ রিপু' পড়ে যুগপৎ পুলকিত ও বিস্মিত হয়েছি। পরশ্রীকাতরতার জাজ্জ্বল্য প্রমাণস্বরূপ ষষ্ঠ রিপু সম্পর্কে এরকম প্রবন্ধ এর আগে চোখে পড়ে নি।

প্রবন্ধকারের বক্তব্য, '...কিন্তু সংসর্গে বাঙালী অভিভূত। কেউ বড় হলে দু' ভাবে তার সমান হতে পারা যায় ঃ তার মত বড় হয়ে, কিংবা তাকে ছোট করে সাধারণ স্তরে নামিয়ে এনে। বঙ্গসন্তান চিরদিন শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করে এসেছে।' অমূল্যবাবুও তাই বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের মত বড় হতে না পেরে 'তাঁকে ছোট করে সাধারণ স্তরে নামিয়ে' আনার অক্ষম চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। প্রবন্ধের মাল-মসলা প্রধানত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে সংগ্রহ করে বিপিনবিহারীকে ছোট করার প্রয়াসে বলেছেন, 'বইখানা আগাগোড়াই উদ্ধৃতি-চিহ্নে ভরা—অর্থাৎ কৃষ্ণকমলেরই কথা, বিপিনবিহারীর নয়।' অদ্ভুত আবিষ্কার। কোন পুস্তকের মধ্যে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে ব্যক্ত অংশগুলি যে সেই পুস্তকের লেখকের নয় তা ইস্কুলের সাধারণ বালকও জানে, কিন্তু ষষ্ঠ রিপুর প্রকোপে অমূল্যবাবুকে তাও ঘোষণা করতে হয়েছে। সামান্য বুদ্ধি থাকলে যে-কোন ব্যক্তি বুঝতে পারবেন যে, সে যুগে Tape recording-এর ব্যবস্থা ছিল না বা বিপিনবাবু shorthand জানতেন না। এ রকম ক্ষেত্রে কৃষ্ণকমলের বক্তব্য যা তিনি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বিপিনবাবুকে বলেছিলেন—তা ভাষা মাধ্যমে প্রকাশ করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণই লেখকের।

আর একটি কথা। মনে হয়, অমূল্যবাবু তাঁর প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে লিখে নিয়ে (যা তিনি তাঁর প্রবন্ধে এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যাতে পাঠকের মনে হবে বুঝি বা এ-সমস্তই অমূল্যবাবুর গবেষণালব্ধ ফল!) বইটি আর ভালভাবে না দেখে সরিয়ে রেখেছেন। ভালভাবে বইটি দেখলে তিনি আর বিজ্ঞের মত লিখতে পারতেন না যে, পুরাতন প্রসঙ্গ 'বইখানা......কৃষ্ণকমলেরই কথা।' তাঁর অবগতির জন্য জানাই যে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর দু'টি পর্যায় প্রথমে পৃথকভাবে দু' খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল (১৩২০ ও ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বইখানিতে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ছাড়া মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১ম পর্যায়), উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজমোহন মল্লিক, অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২য় পর্যায়) ও পুনরায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (৩য় পর্যায়)-এর স্মৃতি-কথা বিপিনবাবু লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সাতজন ব্যক্তির কথাকে 'গবেষক' অমূল্যবাবু একা 'কৃষ্ণকমলেরই কথা' বলে 'আবিষ্কার' করেছেন।

এই প্রবন্ধে অনেক তথ্য তিনি 'পুরাতন

প্রসঙ্গ' থেকে না স্বীকার করে ব্যবহার করেছেন, ফলে অনাবশ্যক লজ্জাজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র কথকরা তাঁদের স্মৃতি থেকে অতীতের কথা বলতে গিয়ে দু-এক জায়গায় তথ্যের ও তারিখের গণ্ডগোল করে ফেলেছেন, যা পরের যুগে ব্রজেনবাবু প্রমুখ সাহিত্যকারের গবেষকরা তাঁদের গ্রন্থে দেখিয়ে দিয়েছেন। অমূল্যবাবু এসব রচনা খুঁটিয়ে দেখলে ভুল করতেন। অমূল্যবাবু ১৪৪৯ পৃষ্ঠার ২য় কলমের পাদটীকায় আচার্য কৃষ্ণকমলের যে 'সামান্যতম দুটি পরিচিতি' দিয়েছেন তা তিনি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর লেখা পড়লে মনে হবে যেন তিনিই পুরানো 'সুপ্রভাত' পত্রিকা ঘেঁটে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিটি ব্যবহার করেছেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ কৃষ্ণকমল সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি এই-রকম আছে: কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক; he can write and he can fight and he can slight all things divine! কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরানো 'সুপ্রভাত' ঘেঁটে সঠিক উক্তিটি তাঁর 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য' পুস্তিকায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত) দিয়েছেন: 'কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.' বর্তমান প্রবন্ধকার 'সুপ্রভাত' পত্রিকার নামোল্লেখ না করে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর নাম দিলে এই ভুল উদ্ধৃতির জন্য দায়ী হতেন না—দায়ী হতেন কৃষ্ণকমল স্বয়ং।

আর একটি এই ধরনের ব্যাপার আছে। ১৪৫৩ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের প্রথম দুটি স্তবকে যা 'গবেষক' অমূল্যবাবু লিখেছেন তা তিনি 'পুরাতন প্রসঙ্গ থেকে' নিয়েছেন [দ্রঃ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (নতুন সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৩০ এবং ৩১ ও ৭৭-৭৮]—শুধু তথ্য নয়, কিছু কিছু ভাষাও ব্যবহার করেছেন। সেও তুচ্ছ! প্রথম স্তবকের শেষে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অমূল্যবাবু লিখেছেন, 'তাঁর এই রাজ সিংহাসনের কাছে কাউকেও ঘেঁষতে দিতেন না (হি কুড নট বেয়ার এ ব্রাদার নিয়ার দ্য থ্রোন)।' হঠাৎ এই ইংরেজী মর্মার্থ দেওয়ার কারণ কি? পাছে বাঙ্গালীরা তাঁর বক্তব্য ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে! অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ৩য় পর্যায় (পৃষ্ঠা ৩০৪) বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণকমল একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'cannot bear a brother near the throne'। এই উদ্ধৃতি কৃষ্ণকমল আলেকজাণ্ডার পোপের 'Epistle to Dr Arbuthnot' থেকে নিয়ে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন! পোপের লেখায় আছে:

"Should such a man, too fond to rule alone,
Bear, like the Turk, no brother near the throne.
View him with scornful, yet jealous eyes.
And hate for arts that caused himself to rise."

আরো বহু তথ্য যা তিনি নিজের প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন তা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এগুলি তিনি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে পেয়েছেন। যেমন ম্যাক্সমূলার ঋগ্বেদ সম্পাদনার সময় পাণিনির সূত্র ঘরের দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছিলেন। এ তথ্য শুধু তিনি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে পান নি—ভাষাটাও ধার করেছেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (নতুন সংস্করণের)-এর ৬৪ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণকমল বলছেন, 'শুনিয়াছি ম্যাক্সমূলার যখন ঋগ্বেদের মুদ্রাঙ্কন সংস্করণরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তখন পাণিনির প্রায় চারি হাজার সূত্র সর্বদাই চক্ষুর সম্মুখে রাখিবার জন্য, সূত্রগুলি আগাগোড়া ঘরের দেওয়ালে এমন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, যখনই যে সূত্রের আবশ্যক হয় তখনই তাহা দেখিবার সম্ভাবনা থাকে।' 'গবেষক' অমূল্যবাবু 'নিজের' ভাষায় তা লিখেছেন, 'অনেকেই জানেন যে, ম্যাক্সমূলার যখন ঋগ্বেদের মুদ্রাঙ্কণ (sic) সংস্করণরূপ বিরাট কাজে লেগেছিলেন তখন পাণিনির প্রায় চারি হাজার সূত্র সর্বদাই চোখের সামনে রাখবার জন্য সূত্রগুলি আগাগোড়া তাঁর ঘরের দেওয়ালে এমন করে লিখেছিলেন যে, যখনই যে সূত্রের দরকার হবে তখনই যেন তা দেখতে পান।' অপূর্ব!

আরো আছে। প্যারীচরণ সরকারের গাঁজা খাওয়ার অপবাদ ও তৎসম্পর্কীয় গান (ধীরাজের) 'মধুপান আর কোরো না' অমূল্যবাবু 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে নিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য)। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে যে দুষ্ট লোকেরা 'মদ্যোৎসাহিনী সভা' বলত তাও 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ আছে (পৃঃ ৪৯ দ্রষ্টব্য)।

মোদ্দা কথা, এই প্রবন্ধ লেখার সময় অমূল্যবাবুর 'ষষ্ঠ রিপু'কে অন্তত সেই সময়ের জন্য ত্যাগ করে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে যে যে স্থানে তথ্য নিয়েছেন তা স্বীকার করলে ভাল করতেন।

—অশোক দাস
কলিকাতা ১২

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১এ আষাঢ়ের 'দেশে'র আলোচনা বিভাগে আমি অমৃতলাল বসুকে লেখা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে-পত্রটি প্রকাশ করেছিলাম তাতে অভিধান—বহির্ভূত 'HUMBAGGISM' শব্দটি ছিল। এতে অমূল্যকৃষ্ণ রায় মশাইয়ের খটকা লেগেছে যে ইংরেজীতে সুপণ্ডিত পাঁচকড়ি 'ভুল কথা ব্যবহার করলেন কি?' এবং তিনি জানতে চেয়েছেন, আমার কাছে যে চিঠিটা আছে সেটা কি মূল চিঠি?' (দ্রঃ 'দেশ' ২১ শ্রাবণ ১৩৭৩)।

এ বিষয়ে রায় মশাইয়ের কাছে আমার রায় এই—(ক) HUMBAGGISM শব্দটি পাঁচকড়ি একবার নয়, দুবার ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমে স্ব-সম্পাদিত 'রঙ্গালয়' কাগজে (১৫ই মার্চ ১৯০৩), পরে অমৃতলালের কাছে লিখিত চিঠিতে। পাঁচকড়ি 'ভুল কথা ব্যবহার' করতে পারতেন কিনা তা মূল প্রবন্ধ-লেখক শংকরীপ্রসাদ বসু মশাই-ই বলতে পারেন (খ) আমার কাছে যে-চিঠি আছে সেটি "মূল" চিঠিই বটে। কারণ গবেষকরা যেমন ভিটেয় গিয়ে উপকরণ সংগ্রহ করেন আমিও তেমনি স্বয়ং অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রীতিভূষণ বসুর কাছ থেকে এ চিঠি নিয়ে আসি। এটি একটি এক পয়সা দামের (QUARTER ANNA) পোস্ট কার্ড। লম্বা-চওড়ায় বর্তমান পোস্ট কার্ডের চাইতে আধ ইঞ্চি করে ছোট। রানী ভিক্টোরিয়ার মুখের ওপর শিমলা (উত্তর কলকাতায়) ডাক ঘরের মোহর এখনও জ্বলজ্বল করছে। যে কালিতে চিঠিটি লেখা তার কালিমাও এখনকার যে কোনো কালির মুখে কালি দেবে। স্টার থিয়েটারের ঠিকানায় অমৃতলালকে লেখা। চিঠির অক্ষর এবং লেখকের স্বাক্ষরের ছাঁদ হুবহু এক।*

অরুণকুমার মিত্র
কলিকাতা-৬

* পত্রলেখক মূল চিঠি আমাদের দেখিয়েছেন, তাতে 'Humbaggism' কথাটি স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

—সম্পাদক

মিউজিয়ামের বাদ্যযন্ত্র

বহু বৎসর পরে কলকাতার ভারতীয় মিউজিয়ামে আবার বাদ্যযন্ত্রের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। মোটামুটি যে সব বাজনা ভারতে প্রচলিত সেগুলি উত্তম ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। অবশ্য এর চেয়ে অনেক ব্যাপক ব্যবস্থা করা সম্ভব কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিক অগ্রসর হওয়া হয়ত নানা কারণে কার্যকর হয়ে ওঠেনি। অনেক আগে মিউজিয়ামে নানারকম বাদ্য-যন্ত্রের একটি প্রদর্শনী ছিল। বছর চৌদ্দ পনেরো বোধ হয় সেটি বন্ধ ছিল। বর্তমান প্রদর্শনীতে সেই সব পুরাতন বাদ্যের কতক-গুলি মেরামত করে আবার রাখা হয়েছে বলে মনে হল। তবে যে সব বাদ্য অপ্রচলিত সেগুলি কোথা থেকে পাওয়া গেল তার একটা নির্দেশ থাকা উচিত ছিল। পূর্বে এই উল্লেখ দেখেছি বলে মনে পড়ে। এছাড়া দু-একটা বাদ্য দেখা গেল যার কোনও প্রচলন আছে বলে জানিনে। সুরসংগ নামক একটি যন্ত্র দেখা গেল যা বেহালা এবং এসরাজের সম্মিলিত রূপ। এটি কি কোথাও বাজানো হয়? না যদি হয়ে থাকে তাহলে এটি কার আবিষ্কার? এই যন্ত্র কি বাজিয়ে ট্রায়েল দেওয়া হয়েছে? এই রকম যন্ত্র বাজানো আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। এই সব প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে—অতএব এমন একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, এই ধরণের বাদ্যের সংগে থাকা উচিত যাতে কৌতূহলী দর্শকের প্রশ্নের উত্তর মেলে।

প্রদর্শনীতে যে সব বীণা দেখানো হয়েছে তার কয়েকটির সংগে শাস্ত্রীয় বর্ণনার মিল নেই। জানতে ইচ্ছে করে, এই বীণাগুলি কি এই অবস্থাতেই ভারতের কোথাও প্রচলিত আছে? নতুবা এইগুলি কার নির্দেশে নির্মিত হয়েছে এবং কোন ভিত্তি বা "স্পেসিফিকেশন" অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমেই কচ্ছপী বীণার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। যে বৃহৎ তথাকথিত কচ্ছপী বীণাটি মেজের ওপর শোয়ানো আছে তাকে এক ধরণের সেতার বলা যায়, কিন্তু শাস্ত্রীয় কচ্ছপী বীণা এই ধরণের নয়। কচ্ছপী বীণায় পাঁচটি তন্ত্রী থাকত—এখানে দেখা যাচ্ছে দুটি। তাছাড়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এর শিরোদেশ —"কচ্ছপস্যেব তৎপৃষ্ঠং ক্রমতশ্চোন্নতানতম্" —সেই আকৃতি কই? এর কানগুলিও এইভাবে সংস্থিত ছিল না। তিনটি কান থাকত ওপরে এবং দুধারে দুটি। সারিকার বিন্যাসও ছিল অন্যরকম। এই বীণার শিরোদেশের উপরিভাগ কোমল চর্মে আবৃত হত। এক্ষেত্রে সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই কচ্ছপীর উৎপত্তি কোথায় সে প্রশ্ন আমাদের রইল। কিন্নরী বীণার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় লঘ্বী কিন্নরীকে অনুসরণ করবার কিছুটা চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তথাপি অনেক স্থানেই শাস্ত্রীয় বর্ণনার সংগে প্রভেদ দেখা যায়। এত ছোট আকৃতি এবং এত কম সারিকা এই বীণায় ছিল না। এইটিই মধ্য-যুগে প্রচলিত "কিঙ্গরা" যা আমীর খুস্রোর গানের সঙ্গে বাজানো হত। ত্রিতন্ত্রীবীণার শাস্ত্রীয় লক্ষণও ভিন্ন এবং এতে একটি তুম্ব অন্তত অবশ্যই থাকত। এক্ষেত্রে কোন তুম্বই যোজিত নেই এবং এইরকম বীণা থেকে শোনবার মত আওয়াজ হতে পারে কিনা সন্দেহ। অন্তত নকুলাবীণা—যা ত্রিতন্ত্রী বলেও খ্যাত ছিল তার সংগে এর মিল নেই। নারদীয় বীণার কোনও বর্ণনা কোথাও পাইনি—জানিনা এটি কিভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। প্রসারিণী বীণা সম্বন্ধেও একই কথা বলব। এই পরি-কল্পনাটি হাল আমলের বলে মনে হয়। না বাজালে এদের ব্যবহারবিধি কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। কাত্যায়ণ বীণার নাম শুনেছি বটে কিন্তু বর্ণনা কোথাও পাইনি, এঁরা যে কোথায় পেলেন তাও জানা অসাধ্য। এই বীণার সংগে স্বরমন্ডলের তফাৎ বোঝা যায়না। বিপঞ্চী নামক যে বীণাটি প্রদর্শন করা হয়েছে আসল বিপঞ্চীর সংগে তার কোন মিল নেই। বিপঞ্চীর দুটি তুম্ব ছিল এবং সেদুটি দণ্ডের নিচে থাকত। এতে পর্দা ছিল। বিপঞ্চীর তন্ত্রী ছিল নটি। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিপঞ্চীর দুটি তার এবং কোন পর্দা নেই। শাস্ত্রীয় বিপঞ্চীর আকৃতিই এরকম ছিল না। শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুসারে রুদ্রবীণার সাধারণত চারটি তার, দুটি তুম্ব, আঠারোটি সারিকা বা পর্দা এবং ত্রিশিরা ককুভ যুক্ত থাকত। এখানে রুদ্র-বীণার আকৃতি ভিন্নরকম। তাছাড়া এতে তার ছটি এবং কোনো পর্দা নেই।

প্রত্যেকটি বীণার নির্দিষ্ট মাপ ছিল এবং বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রে লক্ষণগুলিও মোটা-মুটি দেওয়া আছে। কোন কোনটির লক্ষণ
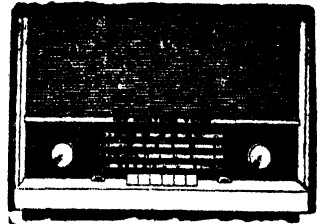
তো খুবে স্পষ্টই পাওয়া যায়। মিউজিয়ামে দশম, একাদশ শতাব্দীর যে সব সরস্বতীর বীণা দেখা যায় সেগুলি শাস্ত্রীয় বর্ণনার সংগে সম্পূর্ণ মেলে। বর্তমানে যে সব বীণা নামের দিক থেকে প্রাচীন বীণার সংগে মিলিয়ে স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি আকৃতিতে তৎকালীন বর্ণনার সংগে মিলছে না। এই সব বীণা যে বর্তমানে বাজানো হয় সে খবর আমাদের জানা নেই, অন্তত উত্তর ভারতে বাজানো হয়না। অতএব এই সন্দেহই দৃঢ় হচ্ছে যে কেউ শখ করে এইগুলি তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু আসলের সংগে মেলে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেননি। হয়তো তাঁর সময় ঐসব শাস্ত্রীয় বর্ণনার সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলকাতা মিউজিয়ামের সুবিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের মনে এই চিন্তাটি উদিত হওয়া উচিত ছিল যে, তাঁরা যে নমুনাগুলি স্থাপন করেছেন তা শাস্ত্রানুমোদিত কিনা অথবা তার ব্যবহারিক কোনও প্রমাণ আছে কিনা। যদি তা না থেকে থাকে তাহলে এই প্রদর্শনী দায়িত্ববোধের পরিচয় প্রদান করে না। দূর দূরান্তর থেকে বহু ইণ্ডলজিষ্ট কলকাতা মিউজিয়াম দেখতে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো এসব বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা যদি প্রদর্শিত যন্ত্রাদি নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তা বাইরের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহলে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ হেয় প্রতিপন্ন হবেন।

মিউজিয়ামের সংগে ইতিহাস এবং বিজ্ঞান অতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এখানে অসত্য, অর্ধসত্য বা কল্পনার কোনও স্থান নেই। মিউজিয়ামে প্রদর্শিত প্রত্যেকটি বস্তু বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। কলকাতায় সংগীতের ছাত্র-ছাত্রী বড় কম নেই, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। তারা মিউজিয়ামে এইসব বাদ্যযন্ত্র দেখে এগুলিকেই সত্য বলে মেনে নেবে এবং বলা বাহুল্য শিক্ষার দিক থেকে এটি মারাত্মক ত্রুটি। অতএব আশা করি মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁদের আশু কর্তব্য স্থির করবেন।

সংশোধন

গতবারের সংগীতালোচনা সম্পর্কে শ্রীসুধীন দাসগুপ্ত জানিয়েছেন যে 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন' গানটি তাঁর লেখা নয়, তিনি গানটিতে সুর সংযোগ করেছেন। লিরিক রচনা করেছেন শ্রীভাস্কর বসু।

শার্ঙ্গ দেব

একটি চিঠি

রিহার্সালরুম
৩এ, নলিন সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

সবিনয় নিবেদন,

গত ৬ই আগস্ট-এর "দেশ" পত্রিকায় এইচ এম ভি রেকর্ডে তালাত মামুদ গীত কাজী নজরুল ইসলামের "নিশি ভোর হল জাগিয়া" এবং "আসল যখন ফুলের ফাগুন" গান দুটি সম্পর্কে আপনার আলোচনা পড়েছি। দুখানা গানেরই সুর-সংযোজনা কবির নিজেরই। রেকর্ডখানিতে ছাপাখানার ভুলবশত সুর কমল দাশগুপ্তের লেখা হয়েছে। কমলবাবু গান দুটি তালাত মামুদকে রেকর্ডের জন্য শিখিয়েছেন মাত্র। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই রকম ভুল কদাচিৎ কখনো হয়ে যায়। আমরা এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত। রেকর্ডখানার পরবর্তী সব মুদ্রণে এই ভুল সংশোধন করা হবে।

প্রসংগত বলা যেতে পারে, কমলবাবু এবং আরো ২।৩ জন সুরকার কাজী সাহেবের বহুসংখ্যক গানের সুর সংযোজনা করেছেন এবং তা রেকর্ডও হয়েছে।

সন্তোষ সেনগুপ্ত
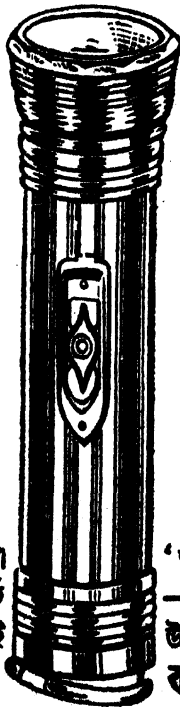
'ভারত-শিল্পী' রবিশঙ্কর

[বিশেষ প্রতিনিধি]

শ্রাবণ-শেষে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কয়েকটি ছোট-বড় পালা হয়ে গেল মহাজাতি সদনে ও নিউ এম্পায়ারে। এবারের আসরের প্রধান শিল্পী ছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, তাঁর কথা দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।

গত কয়েক বছর ধরে পাশ্চাত্ত্য দেশে সেতারের আসর বসিয়ে সে দেশের সংগীত-প্রেমী শ্রোতাদের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে আসছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর. এ বছরে তাঁর সফর-সাফল্যের সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাশ্চাত্ত্য দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গুণী বেহালা-বাদক ইহুদি মেনুহিন রবিশঙ্করের সেতারের সঙ্গে তিলঙ্গ রাগে যুগলবন্দী বাজিয়েছেন ইংলণ্ডের সেরা সংগীত-উৎসব বাথ্ ফেস্টিভেল-এ। বীটল্‌স্টারদের অন্যতম শিল্পী জর্জ হ্যারিসন সেতার শিক্ষার জন্য নাড়া বেঁধেছেন পণ্ডিত রবিশঙ্করের কাছে।

ও দেশের শ্রোতাদের কাছে রবিশঙ্কর একটি পরম বিস্ময়। একক শিল্পীর একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র থেকে এত শব্দ-বৈচিত্র্য অঙ্গুলি-স্পর্শে কীভাবে নির্গত হয়। শিল্পীর সম্বল তাঁর হাতের কয়েকটি আঙুল আর যন্ত্রের কয়েকটি তার। ওদের 'লাগিছে বিস্ময়, এত ক্ষুদ্র যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়!' একটি অর্কেস্ট্রার যাবতীয় ধ্বনিসম্ভার একটি তারের যন্ত্র থেকে সুরের ঐকতানে কীভাবে বেরিয়ে আসছে।

সেতার-শিল্পী রবিশঙ্করের বৈশিষ্ট্য এইখানেই, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তার একটা কারণ আছে। রবিশঙ্কর যদিও মূলত সেতারী কিন্তু তাঁর আঙুলে ধরা আছে রামপুর ঘরানার বীণের বাজ, আলাপে সুরবাহারের মেজাজ. লয়কারীতে সরোদের কাজ, গৎ তোড়া আর ঝালায় সেনী ঘরানার সেতারের সহবত—যা তিনি পেয়েছেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে. তাঁরই কৃপায়। রাগরূপ প্রকাশে রবিশঙ্করের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ইনিই একমাত্র শিল্পী যাঁকে 'ভারত-শিল্পী' আখ্যা দেওয়া যায়। রাগসংগীতে যিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে একাসনে বসিয়ে এক পরমাশ্চর্য রূপ দান করে থাকেন, মূল রাগিণীর কাঠামোটি সম্পূর্ণ বজায় রেখে সর্বভারতীয় সুরের যাদুস্পর্শে সালঙ্কারা দেবী-প্রতিমার মতো রাগিণীর রূপ শ্রোতার মানসচক্ষে যিনি সমুদ্ভাসিত করে তোলেন, তাঁকে কোনো একটি বিশেষ ঘরানার রেওয়াজী 'সেতারিয়া' বলে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সৃষ্টির প্রেরণায় যে শিল্পীর চিত্ত সর্বদা আকুল, ঘরানার চিরাচরিত বাঁধা পথে সাধা গত বাজিয়ে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন না। মহৎ শিল্পীর লক্ষণই হচ্ছে নতুন পথের সন্ধানে সে চির-আগ্রহী। রবিশঙ্করের মধ্যে সেই আগ্রহের পরিচয় পাই বলেই তাঁকে মহৎ শিল্পী বলতে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আলাপের পর যখন রবিশঙ্কর জোড়ের কাজের লয়কারীতে আসেন তখন একটু সচেতন হয়ে কান পেতে শুনুন—দক্ষিণ ভারতের সুরের গমক, কীর্তনের মন্দ-মধুর স্পর্শ, রবীন্দ্রনাথের গানের কোনো একটা চেনা লাইন বেজে উঠল। কোথাও আবার বাউল-ভাটিয়ালির উদাস-করা সুরের রণন চমক দিয়ে যায়। এ সবই আসে আপনা থেকে সহজ সরলভাবে—ধ্যানমগ্ন শিল্পীর অবচেতন মনের গভীর উৎস থেকে এই সুর-লহরী স্বতোৎসারিত।

এ বছর সারা ইউরোপের বিভিন্ন আসরে বিপুল জনসমাবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেতার বাজিয়ে তাঁদের চিত্ত জয় করে তিনি যখন স্বদেশে ফিরলেন, স্বাভাবিক কারণেই এ দেশের শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, তাঁর কাছে নতুন কিছু পাবার আশায়। সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে। এবারে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় একাধিক আসরে তিনি বাজিয়েছেন, তার মধ্যে নিউ এম্পায়ারের গত ১৪ ও ১৫ আগস্ট ছিল তাঁর একক প্রদর্শনী। পরে সুরদাস সংগীত সম্মেলনের শেষ দিনের আসরে তাঁর বাজনা ছিল। সুখের বিষয়, শ্রোতাদের তিনি নিরাশ করেন নি।

নিউ এম্পায়ারে ১৪ তারিখের আসরে রবিশঙ্করের মারোয়া রাগের আলাপ, জোড়, ঝালা এবং রূপক তালে গত-তোড়া শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। ঘরানার আভিজাত্য অনুযায়ী রবিশঙ্করের লয় ও ছন্দের মাধুর্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। মারোয়া, সোহিনী ইত্যাদি
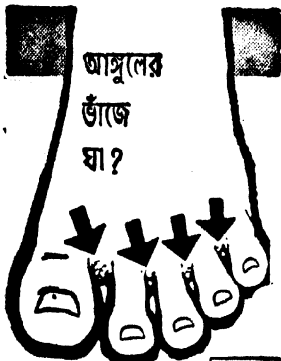
জাতের রাগ সাধারণত উত্তরাঙ্গ প্রধান। কিন্তু তাঁর হাতের গুণে এই রাগের বিস্তার ও চলন পূর্বাঙ্গপ্রধান রাগের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রবিশংকরের সৃজনী প্রতিভার এ-ও একটি নিদর্শন।

সেদিনের আসরে তাঁর দ্বিতীয় পরিবেশন ছিল রাগ মালগুঞ্জ। কাফি ঠাটের ক্ষুদ্র-পরিসর এই মালগুঞ্জ রাগের বৈশিষ্ট্য রে গা মা ধা কোমল নি পা মা কোমল গা-এর যথাযথ শাস্ত্রীয় প্রয়োগে ব্যতিক্রম করেও এই রাগরূপকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন। তৃতীয় পরিবেশনে তিনি পাহাড়ী রাগের ছায়া অবলম্বনে একটি সুললিত ধুন বাজান। লয় ও ছন্দে তাঁর অনবদ্য সৃজনী প্রতিভা এই বাজনায় তিনি নির্বিশেষে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীকানাই দত্তর তবলায় সংগত ও সওয়াল-জবাবের সহযোগিতায় আসর জমজমাট হয়ে ওঠে। সেদিনের আসরে গমকের কাজে রবিশঙ্করের দক্ষতা যতখানি ফুটে উঠেছিল, মীড়ের কাজে ততটা নয়। তা ছাড়া সেতারের প্রাণশক্তি হচ্ছে ঝালার কাজে ডা-রা-রা-রা-র প্রকাশ। সেদিনের বাজনায় রবিশঙ্কর এ কাজ খানিকটা যেন উপেক্ষা করে গিয়েছেন।

সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমতী লক্ষ্মীশঙ্কর মধুবন্তী রাগের খেয়াল শ্রোতাদের ভালই লাগে। সুমিষ্ট কণ্ঠে লয়ের উপর তিনি দক্ষতার সংগে রাগ পরিবেশন করলেন। তবে খেয়ালের বিস্তারে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো অনেক।

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

গত ১৭ আগস্ট মহাজাতি সদনে সুরদাস সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রথম দিনের সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীতে, যন্ত্রসংগীতে এবং নৃত্যে শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আনুষঙ্গিক আয়োজনের চিরাচরিত ধারা রক্ষা করা হয়েছে বটে, কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যের বিচারে ত্রুটিহীন সার্থক বলা চলে না।

সেদিনের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। সর্বশেষ শিল্পী হিসাবে সময়ের অল্পতা হেতু তিনি মিঁয়া কী টোড়ি রাগে অল্প আলাপ করে গত ধরেন। সংগতে শ্রীকানাই দত্ত সুনামের সংগে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রী এ কানন রামকেলী রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। তাঁর সংগীত পরিবেশন শ্রোতৃবৃন্দকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। এ'দের পরেই যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন সেতার-শিল্পী শ্রীমতী কল্যাণী রায় ও কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক। শ্রীমতী রায় সেতারে জলধারিণী রাগ পরিবেশন করেন। এঁর মধুর ও বলিষ্ঠ বাদনভঙ্গিকে তবলায় সহযোগিতা করে আরও সুন্দর করে তোলেন দিল্লির তরুণ শিল্পী লতিফ্ আহমদ্ খান। কলিকাতায় এই প্রথম সাধারণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ইনি উপস্থিত শ্রোতাদের যথেষ্ট প্রশংসার্হ হয়েছেন। শ্রীমতী পট্টনায়ক জৌনপুরী রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। সাধারণত ইনি উঁচু পর্দাতেই গেয়ে থাকেন এবং তাঁর গানে ভক্তি-রসের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বিলম্বিত স্থায়ী-র শুরু ছিল 'মীরা' শব্দটি দিয়ে, এবং সেটি পঞ্চম থেকে আবার 'স' ছুঁয়ে ধৈবতে সম্ রেখেছে। গানের দ্রুত-লয়, ত্রিতাল ও তারানা শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। সময়াভাবে তাঁর কণ্ঠের ভজন শ্রোতারা শুনতে পাননি।

তরুণ কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে ঐদিন যাঁর সংগীত পরিবেশন শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে, তিনি হলেন প্রগতি বর্মণ। শ্রীমতী বর্মণ আনন্দিকল্যাণ রাগে খেয়াল শুরু করেন। বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে তাঁর বিস্তারের নৈপুণ্য, সুরের মাধুর্য, উদারা, মুদারা, তারা ও অতি-তারার সপ্তকে সাবলীল বিচরণ, ছন্দের নিখুঁত বিন্যাস নিঃসন্দেহে মনে রেখাপাত করার মতন। শ্রীমতী মঞ্জু মুখোপাধ্যায় পরিবেশন করেন মিঁয়া কী মল্লার—বিলম্বিত একতাল, মধ্য লয় আড়াচৌতাল এবং দ্রুত ত্রিতাল। নতুন শিল্পী হিসাবে তিনি রাগটি ভালই গেয়েছেন। শ্রীমতী শিপ্রা বসু গাইলেন রামদাসী মল্লার ও পরে ঠুংরি। তান ও অলংকার-প্রয়োগ এবং চড়া পর্দার কাজে তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক এবং সাবলীল ভঙ্গির জন্য তাঁর সংগীত পরিবেশন সুন্দর হয়ে ওঠে।

শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত অনুষ্ঠানের প্রথম যন্ত্রশিল্পী হিসেবে সরোদে নায়কী-কানাড়া রাগটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। বাহাদুর খাঁর সরোদ বাদনে তবলা-সংগতের অত্যধিক শব্দ উপযুক্ত রস পরিবেশনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

নৃত্যে লিপিকা গুপ্তের ভরত-নাটাম্ ও বন্দনা সেনের কথক-নৃত্য দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

সুরদাস সংগীত সম্মেলনের উচ্চাঙ্গ সংগীতের ২য় দিনে শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারে রাগ পুরিয়া-কল্যাণ পরিবেশন করেন। তিনি ভালোই বাজিয়েছেন। ঐদিন মধুবন্তী রাগে খেয়াল এবং তিলং-ঠুংরী কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী আরতি বাগচি পরিবেশন করেন। তাঁর গান শুনে মনে হল ভালো তালিম পেয়েছেন, রেওয়াজী কণ্ঠ, রাগের উপর অনায়াস দখল। কণ্ঠস্বরে আর একটু মাধুর্যরস দিতে পারলে এঁ'র

সংগীত পরিবেশনার মর্যাদা আরও বাড়বে। চোবে মহারাজের কথক-নৃত্যে লয়ের কাজ ভালোই। তাঁর সঙ্গে সংগতে দিল্লির লতিফ আহমদ খান যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। ঐদিন দ্বৈত সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরবি কিচলু। এ'রা আগ্রার রঙিলা ঘরানার ঢঙয়ে মিঁয়া কি মল্লারে আলাপ এবং মধ্যলয়ে ত্রিতাল খেয়াল গান। পরে ত্রিতালে গৌড়মল্লার গান। শেষ করেন দ্রুত একতালে নিবদ্ধ দেশ-রাগে। এ'দের রাগ-পরিবেশনে মুন্সীয়ানা দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের তানে একটা সাবলীল স্বাভাবিকতা আছে, এবং শ্রীকিচলুর গায়কীতে একটা দৃঢ় প্রত্যয় আছে। যতীন ভট্টাচার্যের সরোদ-বাদনে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা গেছে, কিন্তু সংগতের অসংগতিতে অনেক সময় বাজনার রসহানি ঘটেছে, এই অনুযোগ শ্রোতাদের করতে শোনা গেছে।

ওই দিনকার শেষ শিল্পী স্বনামধন্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। ইনি আভোগী-রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান—বিলম্বিত ও দ্রুত। এ'র সঙ্গে কণ্ঠে সহযোগিতা করেন এ'র পুত্র শ্রীমানস চক্রবর্তী। সংগতে শ্রীশ্যামল বসু ও সারেংগীতে সাগিরুদ্দিন সহযোগিতা করেন। শ্রীচক্রবর্তী সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, তবে এ'দের মত কৃতী শিল্পীর আসরে উপযুক্ত রসিক শ্রোতার অভাব লক্ষ করা গেছে।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে শ্রীগৌতম রায় পুরিয়াকল্যাণ রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। তরুণ শিল্পী হিসেবে তিনি ভালই গেয়েছেন। বেঞ্জামিন গোমেস-এর সেতার-বাদন মাধুর্যবিহীন শব্দাধিক্য হেতু শ্রোতৃবৃন্দের কাছে রস-পরিবেশন করতে সক্ষম হয়নি। কুমারী মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক-নৃত্য দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। কণ্ঠশিল্পী শ্রীকালিদাস সান্যাল মালকোষ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল গাইলেন। পরে একটি ঠুংরী গেয়ে শোনালেন। শিল্পীর কণ্ঠস্বর গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি সাবলীল ভঙ্গিতেই গেয়েছেন, তবে বিলম্বিত লয়ে ঝুমরা-তালের ঠেকাটিতে মাত্রার বাঁধন খুঁজে পাওয়া যায় নি। কুমুদ চুঘানীর কথক-নৃত্যে কিছু লয়ের কাজ ভালোই লেগেছে।

এই সংগীত সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তিনি শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করলেন সংগীতরসিকদের অতি পরিচিত রাগ বেহাগ। আলাপ, জোড় এবং ঝালার মধ্য দিয়ে তিনি রাগের রূপটিকে আবার নতুন করে তুলে ধরলেন শ্রোতাদের সামনে। কখন যে ক্লান্তিহীন একটি পুরো ঘণ্টা পার হয়ে গেল, কেউ জানতেই পারল না। এটা সম্ভব হয় তখনই, যখন অতি-প্রিয়জনের মনের অবস্থা মুখ দেখেই বোঝার মত কোন পরিচিত রাগের সঙ্গে, শিল্পীর আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। যেমন তিনি বেহাগে গান্ধার, ষড়জ, নিষাদ, পঞ্চম এর যে-কোন পর্দাতেই বিস্তার করে ন্যাস করেছেন নানাভাবে, অথচ বেহাগ রাগের রূপটি যেন সম্পূর্ণ উপস্থিত রয়েছে শ্রোতাদের সামনে। যখন গত ধরলেন মারু বেহাগে, তখন সংগতে শ্রীকানাই দত্তের নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। তাঁর সংগতের শব্দের গুঞ্জন নিঃসন্দেহে আকর্ষণ করেছে শ্রোতাদের। ভৈরবী ঠুংরি বাজিয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

প্রয়োজনের দিনে সেরা বন্ধু

যে কোনো ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা আমাদের সমস্যা বলে মনে করি... কি করে আমরা আপনার সাহায্য করতে পারি দেখুন!

রিসার্চ: আমি 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একজন। আমাদের কাজই হচ্ছে ব্যথা বা অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই রিসার্চে নিয়োজিত আছে আমরা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমরা স্থির জানি যে ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার সর্বাধুনিক উপায় 'অ্যাসপ্রো' ফর্মুলাতেই পাওয়া যায়। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন হাসপাতালেও ডাক্তাররা 'অ্যাসপ্রো' ব্যবহার করে থাকেন।

শারীরিক বেদনার কি কারণ? আমাদের দেহতন্ত্রে মেটাবলিক বস্তু জমা হ'য়ে নানা জায়গায় ফুলে ওঠে। নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আমরা ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে: 'অ্যাসপ্রো' মুহূর্তের মধ্যে দেহের রক্ত চলাচলের সংগে মিশে যায়—ফোলা কমিয়ে—নার্ভের ওপর চাপ দূর করতে সাহায্য করে—শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

কখন 'অ্যাসপ্রো' গ্রহণ করবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁত ব্যথা • গাঁটে ব্যথা • গা—জ্বর জ্বর • ফ্লু • ডেঙ্গু জ্বরে 'অ্যাসপ্রো' গ্রহণ করতে পারেন।

মাত্রা: বয়স্ক: দুইটি বড়ি। আবশ্যক হলে আবার গ্রহণ করা উচিত।
শিশু: একটি বড়ি অথবা ডাক্তার অনুমোদিত মাত্রা।

'অ্যাসপ্রো'
ব্যথা-বেদনা বার করে নেয়

A.G.32.66. BEN

ক্যামেরা মিথ্যা বলে না। এই বাক্যটি ক্যারেকটার-সার্টিফিকেটের মতই সংশয়-যুক্ত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমি নিঃসংশয়ে বলছি যে, আমার ক্যামেরায় তোলা এই দুটি ছবি কিছুমাত্র মিথ্যা নয়। অভিজ্ঞতায় আরও বলছি, প্রকৃতিও অনেক সময় ক্যামেরা দেখলে মানুষের মত বিচলিত হয়। ছবি তোলার আগ্রহে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টা করে। প্রকৃতি-চরিত্রের এই রূপটি যেভাবে আমার ক্যামেরার সম্মুখে বিকশিত হয়েছিল তা স্মরণ করলে আজও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

বছর কয়েক আগে, শ্রাবণ-বর্ষার এক বিকেলে আমি গিয়েছিলাম বারুইপুর এলাকার গ্রাম্য পরিবেশে। কলকাতার বাইরে দক্ষিণের এই অঞ্চলে আমার একটু ব্যক্তিগত কাজ ছিল। ছবি তোলার কোন প্রয়োজন না থাকলেও ক্যামেরাটি ছিল সঙ্গে। আমার পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ির বিস্তৃত এলাকায় ঘুরে-ফিরে ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম কলকাতার দমবন্ধ আব-হাওয়ার কথা। ওখানে কত রকমের গাছ-গাছড়া, আর কী সুন্দর একটি বড় পুকুর! তার চারপাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছ। পুকুরের পাকা ঘাটে বাড়ির একজন ছিপ ফেলে বসে আছে ফাতনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ভাবলাম একটু বসি ওখানে। মাছধরা দেখি।

কিছুক্ষণ বসে নিরাশ হলাম। ফাতনাও স্থির, ভদ্রলোকও অচঞ্চল। একটিবারও নড়তে দেখলাম না। পুকুরে মাছ কি রকম ছিল জানি না, তবে কাঁকড়া যে ছিল না তা বুঝতে পারছিলাম অনড় ফাতনাকে দেখে। কাঁকড়া থাকলে ছিপ ফেলে ওভাবে আর বসে থাকতে হত না। সঙ্গে সঙ্গেই ফাতনা নাচিয়ে-নাচিয়ে টেনে নিয়ে যেত জলের তলায়। যাই হোক, বিরক্ত বোধ হল আমার। ভাবলাম এবার উঠি। উঠে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হল, সারিবাঁধা নারকেল গাছগুলোর একটা ছবি তুলি। গাছগুলো দেখতে মন্দ লাগছিল না। ছবি তুলে ক্যামেরা বন্ধ করলাম। শেষবারের মত ফাতনার দিকে আবার দৃষ্টি দিলাম। বুঝলাম হবে না।

দৃষ্টি ফিরিয়ে উত্তর দিকে তাকিয়েই আমি থমকে গেলাম। জমাটবাঁধা একটা ঘন কালো মেঘ উত্তর দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে এই আকাশের দিকে। দেখতে দেখতে বিস্তৃতি লাভ করছে আকাশময়। চোখের নিমেষেই আমার মাথার উপর আকাশটাকে কালো প্রলেপ দিয়ে চলে গেল দক্ষিণমুখী। সহসা অন্ধকার হল। মনে হল আলো সব নিবে গেছে। সঙ্গেই সঙ্গেই ছুটে এল এক দুরন্ত ঝড়। কী তীব্র গতি তার! সে যেন গাছ-

পাতা সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চেষ্টা চলছে আমাকেও উড়িয়ে নেবার। আশু দুর্যোগের আশংকায় সেই ভদ্রলোক তো ঘাটে ছিপটিপ ফেলে রেখে ছুটে পালালেন। যাবার সময় চেঁচিয়ে আমাকে বলে গেলেন—শীগ্‌গির চলে যান—ঘরে চলে যান।

কিন্তু আমি গেলাম না। শ্রাবণ-বর্ষার এমন একটি রূপসৌন্দর্য—নয়ন, মন আর দেহ দিয়ে উপভোগ করবার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি ঐ পরিবেশে। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি—কী অপরূপ প্রকৃতির সাজ! কী সুন্দর তার আচরণ! ঝড়ের গতিছন্দে সেই নারকেল গাছগুলো পর্যন্ত হেলে-দুলে বর্ষার নৃত্য রচনা করছে। প্রকৃতির নবরূপ আমার সম্মুখে। এই তো ভরা-শ্রাবণের প্রকৃত রূপ! পূর্বের ছবিতে তো প্রাণের এই সাড়া ছিল না! এতখানি মুগ্ধ থেকেও আমি কালবিলম্ব না করে আ— ছবি তুলে নিলাম—ঋতু-রূপের এই রচনার।

ছবি তুলবার সময়ই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝাঁক বেঁধে এসে গিয়েছিল। ওরা যেন নেমে আসছিল ঘনকালো আকাশের বুক চিরে। আমি তার শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম সারা দেহে। প্রকৃতির তখন আর এক নতুন রূপ। সেদিন পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে থেকে প্রকৃতির এই রূপমাধুর্যে এতই মুগ্ধ হয়ে ছিলাম যে, আমি খেয়ালই করিনি আমা দেহের সর্বাঙ্গ কখন ভিজে গেছে। সঙ্গে ক্যামেরাটিও।

এই ছবি দুটি পাশাপাশি রেখে আ যখনই একটু মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি তখনই আমি যেন চলে যাই বারুইপুরে শ্রাবণ-বর্ষার সেই পরিবেশে। দেহে যে অনুভব করি সেই বারিধারার শীতল স্পর্শ কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমার মন এতখা মিলিয়েও আমি বুঝে উঠতে পারি না প্রকৃতির সেদিন কেন এমন খেয়াল হয়ে ছিল! ছবি তুলবার জন্যে কি?

নীরোদ রায়

নটবর মামা একদিন এসে বললেন, 'কুকুর পুষেছিস কখনো?' তখন আমার একটা কাজের খুব দরকার। আত্মীয়-বন্ধু, জানা-চেনা সবাইকে অনুরোধ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি। চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির কম্পাউন্ডার থেকে রেলের টিকেট কালেক্টর—প্রত্যেক দিন ইণ্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি।

এমন সময় নটবর মামাই আনলেন এই কাজের খবরটা। একটা কুকুরের দেখা-শোনা করতে হবে, পকুরপাঁতিয়ার মহারাজকুমারী বিরাজেশ্বরী দেবী নাকি এমন একজন লোকের অনুসন্ধান করছেন, যে কুকুরের তত্ত্বাবধান, পরিচর্যা ইত্যাদিতে মোটামুটি অভ্যস্ত।

অল্প বয়সে দু-একটা নেড়ি কুকুরকে পাতের ভাত খাইয়েছি, একবার, সপ্তাহ দুয়েক রাস্তা থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা কুড়িয়ে এনে ইজের বাঁধবার দড়ি গলায় বেঁধে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে নেড়ি কুকুর হলে কথা ছিলো, এইসব রাজা-মহারাজাদের কুকুর, দশাসই বুলডগ কিংবা অ্যালসেসিয়ান-ই হয়তো হবে। চাকরির আমার খুবই দরকার, কিন্তু। আমার দোনামনা ভাব দেখে নটবর মামা বললেন, 'তুই একটা সামান্য কাজও যদি না করতে পারিস, এই দুর্দিনে কাজ দেবে কে তোকে? তোদের বয়েসে রঙ-মিস্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করেছি, মনুমেণ্ট-হাওড়া ব্রিজের মাথায় উঠে রঙ মাখিয়েছি।'

আমি বললাম, 'রাজা-মহারাজার কুকুর। কি জাতের কে জানে, শেষে কামড়ে-টামড়ে মেরে ফেলবে নাকি।'

নটবর মামা বললেন, 'তবু চল, দেখাই যাক না।' তাঁর কথায় কি যেন এক আশ্বাসের আভাস রয়েছে।

পরের রবিবার সকালে নটবর মাম আমাকে নিয়ে গেলেন পুকুরপাঁতিয়ার মহারাজকুমারীর কাছে। পুকুরপাঁতিয়ার ম্যানেজারের এক শালা নটবর মামার কি করে যেন পরিচিত সেই সূত্রে। বরা-নগরে এক বিরাট বাড়ি; পুকুরপাঁতিয়ার মহারাজার ঐ হলো কলকাতার বাসা। মহারাজা দীর্ঘদিন পরলোকগত, একমাত্র সন্তান মহারাজকুমারী, এখন প্রায় চল্লিশ বছর বয়েস হলো, নটবর মামা যত দূর জানেন, বোধ হয় অবিবাহিতা।

রাজবাড়িতে গিয়ে প্রথম ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, 'আপনি এ কাজ আগে কখনো করেছেন?' আমার হয়ে নটবর মামা বললেন, 'না, এর আগে এরকম সুযোগ পায় নি।'

আমি উশখুশ করছিলাম, ম্যানে-জারকে আর বিশেষ কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, আপনাদের কুকুরটা কি জাতের বলতে পারেন?'

ম্যানেজার আমার দিকে একটু বক্র-দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর বললেন, 'পুলিস ডগ', গোয়েন্দা পুলিসেরা যে কুকুর পোষে এ হলো গিয়ে সেই কুকুর।'

ইতিমধ্যে মহারাজকুমারীর তলব এলো। ম্যানেজার আমাকে আর নটবর মামাকে নিয়ে উপস্থিত করলেন। আমার তখন কাজ করার ইচ্ছা একেবারে চলে গেছে। পুলিসের কুকুর মানে বিরাট জাতের কোনো অ্যালসেসিয়ানই হবে, তার আদর যত্ন, তদ্বির করা আমার সাধ্য নয়।

মহারাজকুমারী ভিতরের বারান্দায় গলা উঁচু গেঞ্জির কাপড়ের কামিজ আর থ্রি-কোয়ার্টার খাকি কাপড়ের প্যাণ্ট পরে একটা রিভলভারের নল পায়রার পালক দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। সামনে কয়েকটা গুলি একটা চিনেমাটির প্লেটে সাজানো, দেখে মনে হয় যেন আচার রৌদ্রে দেওয়া হয়েছে।

আমার বুকের মধ্যে ঢিব্‌ঢিব্‌ করছিলো। মহারাজকুমারী কিন্তু কোনো প্রশ্নই করলেন না, শুধু আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'বয়েস?'

বয়েস বললাম, সামনে একটা স্লেট পেন্সিল ছিলো। সেটা হাতে নিয়ে আমার বয়েসটা লিখে দশমিক তেরো দিয়ে ভাগ দিলেন, ম্যানেজারবাবুকে বললেন, 'দেখুন তো ভাগটা।' ম্যানেজার-বাবু দেখে-শুনে বললেন, 'ঠিক আছে।' এবার মহারাজকুমারী আমাকে বললেন, 'না, তুমি বিশেষ অপয়া নও, তোমাকে দিয়ে চলবে।'

এর আগে কখনো কুকুর পুষেছি কিনা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো প্রশ্নই

হলো না, আমার চাকরি হয়ে গেলো। ষাট টাকা মাইনে, খাওয়াদাওয়া। পরের দিনই যোগ দিতে হবে। বিহারের এক স্বাস্থ্যকর শহরে মহারাজকুমারী দু মাসের জন্য যাচ্ছেন, তার সংগে কুকুর নিয়ে আমাকে যেতে হবে।

যৌবনের প্রথম চাকরি কিন্তু কুকুরের ভয়ে প্রাণে এক বিন্দু আনন্দ বা উত্তেজনার সঞ্চার হলো না। মহারাজকুমারীর কথা শুনছি আর পরে পরে নটবর মামার মুখের দিকে তাকাচ্ছি। এতটা দূরে হওয়ার পর চাকরিটা আমার পক্ষে না নেওয়া চলে না তবু এই এক মারাত্মক সংশয়।

অচিরেই অবশ্য সংশয় ভঞ্জন হলো। মহারাজকুমারীর কথা শেষ হলে ম্যানেজার বললেন, 'তা হলে সব ঠিক হলো, এবারে আপনার ডিউটি বুঝে যান, কুকুরটাকে একবার...'

ম্যানেজার বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। মহারাজকুমারী একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কুকুরটা কুকুরটা করছেন কেন ওর একটা নাম নেই নাকি?' ম্যানেজার একটু অপদস্থ এবং বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। যা হোক মহারাজকুমারীর সামনে থেকে গুটি গুটি আমরা তিনজন সরে বেরিয়ে এলাম।

ম্যানেজার বারান্দায় বেরিয়ে বললেন, 'কুকুরটার নাম হলো জানলা।'

'জানলা?' আমি বিস্মিত বোধ করলাম।

'হ্যাঁ', ম্যানেজার জানালেন, 'মনে করুন এমন একজন কেউ মহারাজকুমারীর কাছে এসেছে, যাকে মহারাজকুমারী সহ্য করতে পারেন না আবার বলতেও পারেন না চলে যান। সে ক্ষেত্রে তিনি কি করবেন?' নিজের প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন ম্যানেজারবাবু, মহারাজকুমারী কাউকে চেঁচিয়ে বলবেন—এই জানলা খুলে দে— অতিথি কিছু বুঝতে পারবেন না কিন্তু এদিকে কুকুরটা শেকল থেকে ছাড়া পেয়ে মহারাজকুমারীর কাছে ছুটে আসবে। আর ঐ রকম একটা বিশ্রী নেড়ি কুকরকে সহ্য করবে এমন অতিথি রাজবাড়িতে আসে না।'

আমি বিচলিতভাবে বললাম, 'নেড়ি কুকুর বলছেন কি মশায়? এই বললেন পুলিস ডগ, গোয়েন্দা কুকুর?'

ম্যানেজারবাবু বললেন, আমিতো দেখছি স্পষ্ট নেড়ি কুকুর। আপনার মামা এই নটবরবাবু আর আমার শালা দুজনে মহারাজকুমারীর কাছে গোয়েন্দা কুকুর বলে বেচে গেছেন দেড় হাজার টাকায়।'

ইতিমধ্যে একটা মেটে রঙের বিশ্রী নেড়ি কুকুর আমাদের সামনে এসে লেজ নাড়তে শুরু করেছে। ম্যানেজারবাবু বললেন, 'এই হলো আপনার জানলা।'

'এটা পুলিস ডগ?' আমি অবাক হয়ে নটবর মামার মুখের দিকে তাকালাম। নটবর মামা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ, বলছি না গোয়েন্দা কুকুর। এটাকে দেখলে যদি বোঝ যায় পুলিস ডগ তা হলে কাজ হবে নাকি। প্লেন ড্রেসে মানে সাদা পোশাকে ছদ্মবেশ, গোয়েন্দাদের কিছুই জানিস না নাকি?'

যা হোক আমার কি আসে যায়। আমার বরং নেড়ি কুকুর না হলেই অসুবিধে ছিলো।

পরের দিন মহারাজকুমারী আর জানলার সংগে হাওড়া স্টেশন থেকে রাতের গাড়িতে রওনা হলে গেলাম মহারাজকুমারীর স্বাস্থ্যনিবাসে। সাঁওতাল পরগনা আর কয়লাখনির মধ্যবর্তী অঞ্চলের ছোটোখাটো জেলা শহর। বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা মহারাজকুমারীর নিজের বাড়ি 'পুরুল-পাতিয়া নিবাস'।

এক দিনেই জানলার সংগে আমার বেশ ভাব হয়ে গেলো। এমনি কোনো অসুবিধা ছিলো না, শুধু নেড়ি কুকুর বলেই বোধ হয় ডগ সোপের গন্ধটা মোটেই সহ্য করতে পারে না। আর একটা চার্টে ছয় ঘণ্টা অন্তর ওর টেম্পারেচার রিপোর্ট করতে হয় মহারাজ-কুমারীকে, এই থার্মোমিটার লাগানোটা ভীষণ কঠিন। নাড়ির গতিও রিপোর্টে থাকার কথা, কিন্তু কুকুরের নাড়ি শরীরের ঠিক কোথায় বুঝতে না পেরে ঘড়ি দেখে মিলিয়ে আমার নিজের নাড়ির গতি যা হতো সেটা রিপোর্ট করতাম।

দু-চার দিন গেলো। সপ্তাহে এক দিন জানলার নখ কাটাবার কথা। কিন্তু সারা বেলা খুঁজেও পুরো জেলা শহরে একটাও নাপিত কুকুরের নখ কাটতে রাজী হলো না। আমি আর মহারাজকুমারী দুজনে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু না, অসম্ভব। জানলা ভীষণ লাফাতে লাগলো। শেষে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে নখ কাটলাম।

বিপর্যয়টা ঘটলো এর পরেই। বিকেলে জ্ঞান ফেরার পর জানলা পা উল্টিয়ে ঘাড় চুলকোতে গিয়ে ভীষণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলো। নখ কাটা গেছে, লোমের নিচের চামড়ায় কিছুতেই ধার লাগছে না কি যে হলো, ঘর বারান্দাময় ছুটোছুটি করতে লাগলো। মহারাজকুমারী সব দেখে শুনে আদেশ দিলেন, 'ওকে আজ রাতে আর বেঁধো না।'

এবং ঐ রাত্রিতেই জানলা নিরুদ্দেশ হলো। পরদিন সকালে যখন আবিষ্কার করলাম জানলা পলাতক, মহারাজকুমারী
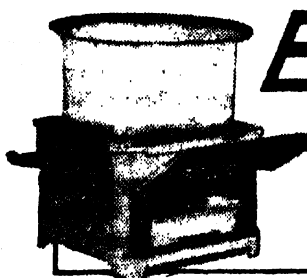
ভীষণ হইচই বাধিয়ে দিলেন যেন সমস্ত দোষটা আমার। আমি সকাল থেকে সারা বেলা ধরে সমস্ত তল্লাট চষে ফেললাম কিন্তু কোথাও জানলার কোনো পাত্তা পেলাম না।

ম্লান মুখে পুকুরপাতিয়া নিবাসে ফিরে দেখি সেই প্রথম দিনের মত মহারাজকুমারী চিনেমাটির প্লেটে রিভলভারের গুলি কয়টা রোদে দিচ্ছেন। মহারাজকুমারী আমাকে দেখে একবার চোখ না তুলে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যেভাবে হোক জানলাকে আমার ফিরে চাই।' তারপর এক চোখ বুজে আর এক চোখে রিভলভারের নলটা লাগিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আরো ঠাণ্ডা গলায় আদেশ করলেন, 'যাও, থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে এসো, কুকুর ফিরে পেলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, আর এখানে একটা 'পরগনা বার্তা' না কি কাগজ বের হয় সেখানেও একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে এসো।'

আবার বেরিয়ে গেলাম। সারা দিন স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি। তবু চাকরি করতে গেলে কত কি করতে হয়।

'থানায় কিছুতেই কুকুর হারানোর ডায়েরি

মশাই একটা মেটে রঙের নেড়ি কুকুর দেখেছেন কোথাও

নেবে না, তারপর যখন বললাম পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার, জমাদার কেমন অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগলো, তারপর তিন গেলাস জল খেলো, কুকুরের বর্ণনা শুনে আরো তিন গেলাস। ডায়েরি লিখে নিয়ে বললো, 'ঠিক হ্যায়, কাল সুবাহমে মিল যায়গা।'

জমাদার সাহেবের কথায় যে খুব ভরসা পেলাম তা নয়, খুঁজে খুঁজে এর পরে 'সাপ্তাহিক পরগনা বার্তা'র অফিসে গেলাম। 'পরগনা বার্তা' তখন ছাপা হচ্ছে, পরের দিন রবিবার সকালে বেরোবে। বিজ্ঞাপন আছে শুনে তাড়াতাড়ি ম্যানেজার প্রেস থেকে ম্যাটার নামিয়ে সম্পাদককে ডেকে আনলেন। সম্পাদক একটা বিজ্ঞাপন এসেছে শুনে তিন গেলাস জল খেলেন, তাপর বিজ্ঞাপনটা পড়ে আরো তিন গেলাস জল খেলেন। অনেকক্ষণ পরে দম নিয়ে আমাকে ভালো করে দেখলেন, বললেন, 'অ্যাঁ, পাঁচ হাজার?'

যা হোক আমি ফিরে এলাম। ডায়েরি করে এসেছি আর বিজ্ঞাপন দিয়েছি মহারাজকুমারীকে জানালাম। মহারাজকুমারীর কোনো ভাবান্তর নেই।

একটা ক্ষীণ আশা ছিলো যে, রাতের মধ্যে জানলা ফিরে আসতে পারে। কিন্তু ফিরলো না।

পরদিন সকালে উঠে প্রথমেই গেলাম 'পরগনা বার্তা'র কার্যালয়ে। ভাবলাম বিজ্ঞাপনটা এনে মহারাজকুমারীকে দেখালে যদি একটু কাজ হয়। আর জানলা যখন নেই আমার চাকরিও শেষ। আমি মানে মানে কেটে পড়বো।

'পরগনা বার্তা'র অফিসের পথে একটা পত্রিকার স্টল। সেখানে খোঁজ করলাম, না, 'পরগনা বার্তা' বেরোয় নি। পরগনা বার্তা অফিসে গিয়ে দেখি দরজা হাট খোলা, মেশিনে আধ-ছাপা পত্রিকা, আশেপাশে ঘরে-বাইরে কেউ কোথাও নেই।

অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করে তারপরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তাজ্জব কান্ড, লোকগুলো সব উধাও হয়ে গেলো কোথায়? হঠাৎ পাশের একটা ছোট টিলার নিচে ঝোপের ভিতর থেকে সম্পাদক বেরিয়ে এলেন, উস্কোখুস্কো চুল, চোখ লাল দেখে মনে হয় সারা রাত ঘুমোন নি, সম্পাদক আমাকে চিনতেই পারলেন না, আমি কিছু বলার আগেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'মশায়, একটা মেটে রঙের নেড়ি কুকুর দেখেছেন কোথাও? জানলা বলে ডাকলে সাড়া দেয়।'

আমি আর কিছু না বলে এগিয়ে গেলাম। বাজারের পথে প্রেসের ম্যানেজারকে দেখলাম একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গোটা কয়েক নেড়ি কুকুরকে জিলিপি খাইয়ে নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করছে। পথে এদিকে ওদিকে আরো দু-একজনকে দেখলুম, কেউ একটা কুকুর কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছে, কেউ চেন বকলস নিয়ে ঘুরছে, মনে হলো এদের কাউকে কাউকে যেন কাল ঐ প্রেসে দেখেছি।

থানায় গেলাম। লক্-আপ্ মালখানা পর্যন্ত হাটখোলা, সেপাই জমাদার দারোগা কয়েদি বা আসামী পর্যন্ত নেই। বারান্দায় একটা বেল, ঘন্টা পেটা হয় তাতে। একটা বাচ্চা ছেলে একটা টুলের ওপর উঠে ছুটির ঘন্টা ইস্কুলে যেভাবে পেটায় সেইভাবে ঢং ঢং করে বাজাচ্ছে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?' সে বললো, 'ছুটি। আজ কুকুর হারানোর ছুটি হয়ে গেছে। বাবা কুকুর খুঁজতে গেছে।' বলে আরো ঢং ঢং করে ঘন্টা পেটাতে লাগলো।

আমি ক্লান্ত অবস্থায় 'পুকুরপাতিয়া নিবাসে'র দিকে ফিরলাম। একটা মোড় ঘুরলে প্রায় শ তিনেক গজ দূরে বাড়িটা। সেই মোড় পর্যন্ত পৌঁছে ভীষণ হট্টগোল, হইচই, শ দেড়েক কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পেলাম। এগিয়ে দেখি, সাংঘাতিক ব্যাপার, সেপাই, জমাদার, দারোগা, কম্পোজিটার, মেসিনম্যান, প্রেস ম্যানেজার, কারোর কোলে, কারোর কাঁধে, কারোর হাতে নারকেলের দড়িতে বাঁধা, চেন বকলসে লটকানো অসংখ্য নেড়ি কুকুরের একটা হাট জমে গেছে
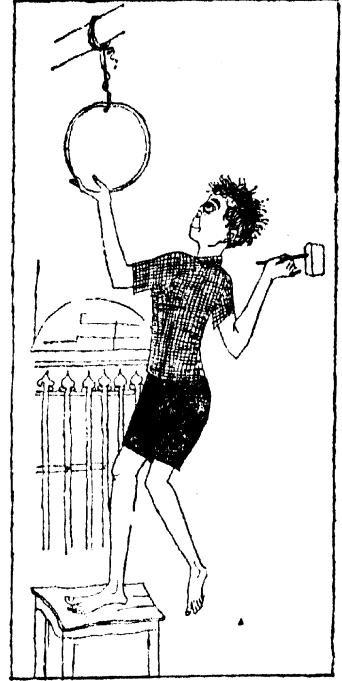
ঢং ঢং করে ঘণ্টা পেটাতে লাগলো

নিবাসের সামনে। আর সমস্ত কুকুর পরস্পরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, কোথাও বা রীতিমত মারামারি চলছে।

দূর থেকে পুকুরপাতিয়া নিবাসের ভিতরের দিকে তাকালাম। দেখলাম চিনে-মাটির প্লেট থেকে রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া কার্টিজগুলো মহারাজকুমারী স্থির হাতে একটা একটা করে রিভলভারের মধ্যে ভরছেন।

আমার আর পুকুরপাতিয়া নিবাসে ফেরা সম্ভব হয়নি। প্রায় দিন তিনেক পরে কলকাতায় খবরের কাগজে একটা সংবাদ পড়েছিলাম, মফস্বল বার্তায় 'কুকুরের উৎপাত' এই হেড লাইনের নিচে।

'...কি এক অজ্ঞাত কারণে শতাধিক কুকুর অদ্য মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে পুকুরপাতিয়া নিবাস সমবেতভাবে আক্রমণ করে। এইরূপ ঘটনা এখানে আর কখনো ঘটে নাই। ফলে এতদঞ্চলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পুকুরপাতিয়ার মহারাজকুমারী বিরাজেশ্বরী দেবীকে অবশেষে আত্মরক্ষার্থে রিভলবার পর্যন্ত চালাইতে হয়। সৌভাগ্যবশত ঘটনার সময়ে সেপাই-জমাদার সহ স্থানীয় থানার দারোগা অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই অবস্থা আয়ত্তে আনেন। সংবাদপত্র পরগনা-বার্তার প্রতিনিধিরাও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে থানার দারোগাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।...'

এনারকার ম্যাগসাইসাই পুরস্কার

একগাদা ঢাল তরোয়াল মুখোশ ইত্যাদির মাঝখানে বসে কমলাদেবী সেগুলি সাজাচ্ছিলেন বাক্সে, ঝুড়িতে আর বড় বড় বাঁশ এবং বেতের চাঙারিতে। রাশি রাশি সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাজসজ্জা মেক-আপ যাবে নানা স্কুলে। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা অভিনয় করবে, তাদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হবে শৈশবে, তবেই তো উত্তরকালের নাগরিক সৃজন করবে নূতন দুনিয়া। আর্ট মানুষের জীবনে কত বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তার জীবন্ত আদর্শ। আজ নূতন নয়, বহু দিন আগে চিলড্রেনস্ লিটল থিয়েটার-এর কাজ নিয়ে শ্রীযুক্ত সমর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেদিন কমলাদেবীর কাছে প্রথম গিয়েছিলাম সেদিনও কমলাদেবী ঠিক এই কথা বলেছিলেন। কর্মময় জীবনে থিয়েটারই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সখ। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য করেছেন, কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্যা ছিলেন, মহিলা সেবাদল-এর অধিনায়কত্ব করেছেন বহু দিন, কারারুদ্ধ ছিলেন পাঁচ বছর, জাতীয় সংসদের নির্বাচনপ্রার্থী মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম, তবু শিল্পই এখনও তাঁর মন পূর্ণ করে রেখেছে।

১৯০৩ সালে ম্যাংগালোরে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে কনভেণ্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে লণ্ডনে বেডফোর্ড কলেজে ভর্তি হন। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন কমলাদেবী। দেশে ফিরে সরোজিনী নাইডুর ভাই শিল্পরসিক কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি বিবাহ করেছিলেন। বিবাহিত জীবনের ছন্দপতন এই দুটি শিল্পী-মনকে ভিন্ন পথে নিয়ে আসে। কমলাদেবী শিল্পের সঙ্গে সমাজ সংস্কার আর রাজনীতি এক সূত্রে গেঁথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের সেবায়। অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স যাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় মহিলাদের সকল সুখদুঃখের মুখ-পত্র হয়েছে, কমলাদেবী তাঁদের অগ্রণীদের বিশিষ্ট একজন। প্রথম সংগঠনকালে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ভারতবর্ষের মেয়েরা চিরকাল স্মরণ রাখবে। অনেক দিন অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের সভা-নেতৃত্বও করেছিলেন তিনি। আজ তিনি তার পৃষ্ঠপোষকদের একজন।

সে যুগে জাতীয় জীবনে নেত্রীর ভূমিকা বড় সহজসাধ্য কাজ ছিল না। যে সাহস দিয়ে সমাজ সংস্কারে, স্বাধীনতা সংগ্রামে সমান অংশ নিতে পেরেছিলেন সেই সাহস দিয়ে একটি মস্ত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

করেছিলেন তিনি। রঙ্গমঞ্চে সাধারণ দর্শকের সামনে অভিজাত কুলের কন্যা অভিনয় করবে এ কথা পরম বিপ্লবীও ভাবতে পারতেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কমলাদেবী কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চেই অবতীর্ণ হননি, অভিনেতা অভিনেত্রী দল নিয়ে রক্ষণশীল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অভিনয় পেশ করেছেন। নাটক থিয়েটারকে জনপ্রিয় করাই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, অভিনেতা ও শিল্পীর সাহায্যে কমলাদেবী শত কষ্ট স্বীকার করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। দেশের সাংস্কৃতিক নবজন্মলাভ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিশেষ অংশ এই দৃঢ় বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করুক কমলাদেবী তাই চেয়েছিলেন।

ভারতীয় নাট্যসংঘের তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রেসিডেণ্ট। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে ভারতীয় নাট্যসংঘ যুক্ত।

আর একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কমলাদেবীর অসামান্য দান বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের সার্থক পথপ্রদর্শক ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সভানেত্রী হিসাবে কমলাদেবীর আদর্শ সমবায় ব্যবস্থার প্রসার এই মূল্যস্ফীতির দিনে কত নূতনতর আয়োজনের সাহায্য করছে তার সীমা নেই। সমবায় সম্বন্ধে আলোচনা, গবেষণা, পরীক্ষা এই সমবায় ইউনিয়নের বিশেষ কাজ। শহরেই হোক বা গ্রামাঞ্চলেই হোক, সমবায় দরিদ্র ভারতবাসীর জীবনে আশার আলো। তবে সেই সমবায়কে সম্যক সমৃদ্ধ ও সুস্থ জীবন দিতে হবে। এই তাঁর সাধনা।

প্রথম উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কমলাদেবীর সাহায্য থেকেই সরকারের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের সূত্রপাত। অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ বোর্ডের তিনি চেয়ারম্যান। হস্ত-শিল্প সম্বন্ধে কিন্তু কমলাদেবী বলছিলেন, মেয়েরা উত্তরোত্তর হস্তশিল্পে নৈপুণ্য অর্জন করুক, তাঁর একান্ত ইচ্ছা। হস্ত-শিল্পও সৃজনী প্রেরণার উৎস। যে যুগে তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন সেদিন ঘরের মেয়ে তার প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ কমই পেত। আজ তার কাছে সকল দুয়ার খোলা। মেয়েরা উন্নতিও করেছে অনেক। তবু আরও পথ আছে, আরও অনেক দূরে যেতে হবে

কমলাদেবীর সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে অনেকেই জানেন না, তিনি কিন্তু সুলেখিকা। ভারতের নারী জাগরণ সম্বন্ধে তাঁর বই **'Awakening of Indian Womanhood'** দেশের মেয়েদের যে চিত্র তুলে ধরেছে, সত্যই তা চমৎকার। কমলাদেবী প্রগতি সম্বন্ধে বলেন, আশানুরূপ তো নিশ্চয়ই মনে হয়, মেয়েরা আমাদের আশাতীতভাবে এগিয়ে এসেছে। যে অন্ধকারময় জীবন তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে অবলীলাক্রমে পিছনে ফেলে এতটা আসা কি কম কথা! স্বদেশ বিদেশে ঘুরেছেন কমলাদেবী কিন্তু ভারতীয় মেয়েদের প্রগতি যেন শান্ত, সুন্দর, সরল ও অনাড়ম্বর।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় নিজেও সেই প্রগতির মত সুন্দর ও অনাড়ম্বর। একবার বলেছিলাম, "আপনি বড় সুন্দর সাজ করেন। এত রুচিসংগত যে, চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।"

কমলাদেবী খুশী হলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন যে, সাজ সম্বন্ধে সৌন্দর্যজ্ঞান তাঁর

থাকতে পারে কিন্তু অনেক অর্থব্যয় করে কাপড় গয়না কেনা তিনি পছন্দ করেন না। কখনও মূল্যবান সাজপোশাক তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তাকিয়ে দেখলাম, সত্যই সাজের সমন্বয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু হীরে, মুক্তো, এমন কি একটুকু সোনাও নেই কোথাও। কানে পরেছেন নেহাত পল্লী-শিল্পের রূপোর দুটি ফুল, হাতে গালার চুড়ি। শাড়িখানাও সাধারণ আটপৌরে অথচ রুচিসংগত তার রং আর নকশার বাহার। কমলাদেবীর সাজানো ঘরের পটভূমিকাও ঠিক ঐরকম রুচি দিয়ে ঘেরা। উদয়ভিলার তৈরী নূতনস্বপ্নে বেতের টেবিল, বাঁকুড়ার ঘোড়া, চিত্রিত হাঁড়ি কলসী গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে।

অনেক কথাবার্তার পর সম্প্রতি পাওয়া ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের আলোচনা উঠতেই কমলাদেবী বিব্রত বোধ করলেন। পুরস্কার যাঁদের প্রাপ্য তাঁরা বোধ হয় এমনই হন। কমলাদেবী পদ্মভূষণ পেয়েছেন ভারত সরকারের কাছে। ওয়াটুমল পুরস্কার পেয়েছেন। তবু আশা করেছিলাম, ম্যাগসাইসাই নিয়ে তাঁকে কিছু উচ্ছ্বসিত দেখবো। মোটেই না। বরং বললেন, বড় অল্প সময় হাতে। এর মধ্যে আবার ম্যানিলা যেতে হবে পুরস্কার আনতে! কিছুই জানতেন না। দু'-চার দিন আগে জানলে হয়তো বা কাজকর্ম আর একটু গুছিয়ে নিতেন। জিজ্ঞাসা করলাম "যাবেন তো?" কমলাদেবী হাসলেন, "না হলে যে প্রাইজ পাবো না! এ যে অনেক টাকা।" টাকা একটা ভাল কাজে দান করবেন ঠিক করেছেন; তবে কি সে কাজ, ভাববারও সময় পাচ্ছেন না। ৩১শে আগস্ট প্রেসিডেন্ট ম্যাগসাইসাই-এর জন্মদিন। সেদিন হবে পারিতোষিক বিতরণ উৎসব। ২৯শে তাঁকে ম্যানিলা পৌঁছোতে হবে। তারপরে ভাববেন টাকা কোন কাজে দেওয়া যায়।

বিদেশযাত্রা নিয়ে বিচলিত হননি অবশ্য কমলাদেবী। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা সব ঘরে ঘরে বিদেশ যাওয়া তাঁর ঘরোয়া ব্যাপার। ম্যানিলাতেও আগে গিয়েছেন। আয়োজন আড়ম্বরের ভাবনা নেই।

ভারতীয়দের মধ্যে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার অল্পদিন আগে জয়প্রকাশ নারায়ণ পেয়েছেন। ১৯৫৮ সালে পেয়েছিলেন আচার্য বিনোবা ভাবে। ১৯৫৯ সালে চিন্তামন দেশমুখ, ১৯৬১ সালে অমিতাভ চৌধুরী। ভারতীয় মহিলা আর একজন পেয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। তিনি আমাদের পরম আপনজন মাদার টেরিসা। মাদার টেরিসার জন্ম যুগো-স্লাভিয়াতে কিন্তু আজ তিনি ভারত-বাসিনী। মাদার টেরিসার মানবহিতব্রত সম্বন্ধে নূতন করে বলবার কিছু নেই। তাঁর 'নির্মলহৃদয়' সেবাব্রতীদের পরিচয় ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশের ঘিঞ্জি নোংরা পল্লী থেকে নিয়ে দারুণ কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত রোগীর কাছে প্রলেপের মত, করুণা-ধারার মত।

ম্যাগসাইসাই পুরস্কার এশিয়াবাসীর জন্য। মানবকল্যাণব্রতে সার্থক সাধনার স্বীকৃতি এই পুরস্কার। র‍্যামন ম্যাগসাই-সাই, যাঁর নামে এই পুরস্কার, তিনি ফিলি-পিনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ম্যাগসাইসাই-এর জীবন বড় অদ্ভুত। অত্যন্ত দরিদ্র সংসারে আটটি সন্তানের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতেও ম্যাগসাইসাই-এর মা বাবা এক দিনের জন্যও আদর্শচ্যুত হননি। র‍্যামন যখন ছোট্ট, তাঁর বাপ ছিলেন এক স্কুলের শিক্ষক—কাঠের কাজ শেখাতেন। কাঠের কাজের পরীক্ষায় কর্তৃপক্ষের কোনও লোকের একটি ছেলে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সেই অপরাধে র‍্যামনের বাবার চাকরি গেল। বন্ধুবান্ধব উপদেশ দিল ছেলেটিকে পাস করিয়ে দিতে। ম্যাগসাই-সাই কিছুতেই রাজী হবেন না। গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। সেখানে র‍্যামনের মা একটি দোকান খুললেন। খুচরো দোকান। যারা গরীব, যারা একসংগে দু চামচ ভিনিগার বা এক চামচ গুঁড়ো মসলা বা অতি সামান্য আচার চাটনির বেশী কিনতে পারে না, তাদের জন্য এইসব দোকান। ফিলি-পিনো ভাষায় বলে "সারি সারি" দোকান। মায়ের 'সারি সারি' দোকানের যা লাভ হতো তার উপর অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতো বাপকে, এমন কি নেহাত শিশু র‍্যামনকে। রাস্তা তৈরির কাজ করেছে র‍্যামন আট বছর বয়সে। এমন দিন গেছে যে, গৃহপালিত ফিলিপিনো মহিষের দুধ আর সামান্য ভাত এই খেয়ে পুরো পরিবার দিনের পর দিন কাটিয়েছে। সেই র‍্যামন স্বীয় প্রতিভায় কেবলমাত্র ফিলিপিনস-এর প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তা নয়, সমস্ত দেশ তাঁকে ভালবাসতো। রাজনৈতিক জীবনে এই ভালবাসার উপরই ছিল তাঁর জয়ের ভিত্তি। ম্যাগসাইসাই সম্বন্ধে অনর্গল বলে যাচ্ছি। কমলাদেবী কিছুক্ষণ শুনে বললেন, "তুমি তো দেখি আমার চেয়ে অনেক বেশী ম্যাগসাইসাই সম্বন্ধে জান।" লজ্জা পেয়ে গেলাম। তবু বললাম, "আপনি পুরস্কার পেলেন বলেই তো আগ্রহ হলো জানতে, কে এই ম্যাগসাইসাই, যাঁর নামের পুরস্কার বার-বার ভারতবর্ষের গুণীর সমাদর করে যাচ্ছে।"

—শ্রীমতী

ক্লোদ মোনে (১৮৪০—১৯২৬)

এই সেই চিত্রকর যাঁর একটি ছবির নাম থেকে একটি নতুন চিত্রাংকন ধারার নামকরণ হ'ল। ১৮৭৪এ প্যারিসে এক প্রদর্শনীতে ক্লোদ্ মোনের "ইম্প্রেশন: সূর্যোদয়" ছবিটি দেখে লি-রয় নামক এক সাংবাদিক ঠাট্টা ক'রে তাঁকে (এবং তাঁর ধরনের অন্যান্য চিত্রকরদের) ইম্প্রেশনিস্ট বলে অভিহিত করেছিলেন, এবং এ নাম শিরোধার্য করতে মোনে ও তাঁর সহ-শিল্পিবৃন্দ দ্বিধা করেননি একেবারেই। ছবিটির নাম সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ, নামটি থেকেই বোধগম্য এ'দের শিল্পাদর্শ। শিল্পী স্পষ্টতই বলে দিচ্ছেন, ক্যানভাসে সূর্যোদয়ের বস্তুভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপনা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর মনে এই দৃশ্যদর্শনের যে ছাপ পড়েছে, যা হয়তো বাস্তব থেকে অনেক দূরে, যে দৃশ্য হয়তো আর কখনো কেউ দেখবে না, তার চিত্রানুবাদ করছেন তিনি। অর্থাৎ এ'দের উদ্দেশ্য দৃশ্যটি আঁকা নয়, দৃশ্যকে কেন্দ্র করে শিল্পীর মনকে আঁকবার। এইখানেই হয়তো আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য।

লো হাভ্রের এক মুদীর ছেলে ক্লোদের ইস্কুলের অংক-খাতায় মাস্টার মশাইদের ব্যঙ্গচিত্র এ'কে শিল্পী-জীবন আরম্ভ। মাত্র যখন পনেরো বছর বয়স, সারা শহরে তাঁর নাম ছড়াল অসাধারণ "ক্যারিকেচার পোর্ট্রেটিস্ট" হিসেবে। তাঁর ছবি লো হাভ্রেতে একমাত্র ছবির দোকানের জানলায় স্থান পেল, কিন্তু এই উদ্ধত বালক তাতে সম্মানিত হবার চেয়ে অসম্মানিতই হ'ল বেশী, কারণ সেই একই প্রদর্শনী-জানলায় তাঁর ছবির ওপরে বুদ্যাঁ নামক এক চিত্রকরের কিছু স্টুডিওর বাইরে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ রাখা হয়েছিল। বুদ্যাঁ ছিলেন ওই দোকানের মালিক এবং সমকালের একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। সমুদ্রতীরের এই শহরে ফ্রান্সের সব শিল্পীই ছুটি কাটাতে আসতেন, এবং যেহেতু বুদ্যাঁর দোকানই শহরের একমাত্র ছবির দোকান তাই সব চিত্রকরদের সঙ্গেই তাঁর খাতির ছল। অন্যপক্ষে চিত্রকররাও তাঁর ছবির বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, কেননা প্যারিসের চিত্রকরদের কাছে বুদ্যাঁর ল্যান্ডস্কেপের প্রাদেশিক শ্যামলতা এক নতুন স্বাদ।

যদিও মোনে বুদ্যাঁর ছবির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তবু সত্যি বলতে বুদ্যাঁই তাঁকে আবিষ্কার করেন ভবিষ্যতের একজন মহৎ শিল্পী হিসেবে। কিন্তু অল্প বয়সে অধিক প্রশংসা পাবার ফলে মোনে একটু দাম্ভিক হয়ে পড়েছিলেন, তাই বুদ্যাঁর উৎসাহের প্রত্যুত্তরে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু বয়সে মোনের এতই বড় বুদ্যাঁ যে, কৈশোরের দম্ভে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বার বার তাঁকে ডেকে বলেছেন স্টুডিওর বাইরে রঙ-তুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু মোনে তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতি দেখতে দেখতে প্রকৃতি আঁকা নিতান্তই নকল করা ছাড়া কিছু নয়, এবং চার দেয়ালে বন্ধ স্টুডিওই হচ্ছে ছবি আঁকার পক্ষে প্রকৃষ্ট জায়গা। প্রথমে বুদ্যাঁর কথা মেনে নেননি ক্লোদ, কিন্তু কোনো-এক মেঘলা দুপুরে বুদ্যাঁর অনুরোধে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি বাইরে বসে ছবি আঁকবেন বলে, এবং সেই দুপুরেই আবিষ্কার করলেন যে, ল্যান্ডস্কেপ ঘরে বসে আঁকার মতো মূঢ়তা আর কিছু নেই। মোনের ডায়রির দুটো লাইন এ প্রসঙ্গে তুলে দিচ্ছি—"আমি বুদ্যাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার কোনো ছুতো খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হলাম ও'র নির্দেশ মেনে নিতে। স্টুডিওর বাইরে রঙ-তুলি নিয়ে বেরিয়ে আমার চোখ খুলে গেল—প্রকৃতিকে জানলাম, এবং আজ পর্যন্ত তার প্রেমেই আমি আচ্ছন্ন।"

১৮৫৯ সালে ক্লোদ প্যারিসে চলে আসেন। কিন্তু প্যারিসে শিকড় গাড়ার আগেই আবশ্যিক মিলিটারী ট্রেনিঙে আলজিয়ার্সে চলে যেতে হল। দ্যলাক্রোয়ার মতো আলজিয়ার্স ভ্রমণ তাঁর শিল্পী-জীবনের এক রোমাঞ্চকর ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আফ্রিকার উজ্জ্বল আকাশে উত্তাল আলো তাঁর মনে এক গভীর রেখাপাত করে। মোনে লিখেছেন, "যদিও আলজিয়ার্স থাকাকালে বুঝিনি এই ভ্রমণ আমার মনে আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করবে কিনা, তবু সেখান থেকে ফিরে লক্ষ করেছি, বারেবারেই আমার ছবিতে আফ্রিকার আকাশের রঙ, সেখানকার দৃশ্যপটের ধাঁচ ছবির মধ্যে চলে আসছে। আমি হয়তো সেন্ নদীর ধারে বসে ছবি আঁকছি হঠাৎ খেয়াল হল, যে সূর্যটা আঁকলাম সেটা তো যেটা দেখছি সেটা নয়, আলজিয়ার্সের সূর্য অজান্তেই কখন এসে পড়েছে ক্যানভাসে।" লক্ষ করলে সত্যিই দেখা যায়, আলজিয়ার্স থেকে ফেরবার পরে মোনের ছবিতে রঙের ও

ক্লোদ মোনে নৌকার স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকছেন। শিল্পী মানে কর্তৃক অঙ্কিত

আলোর প্রভাব মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

১৮৬১ সালে মোনে অসুস্থ অবস্থায় আফ্রিকা থেকে দেশে ফেরেন এবং এক বছর সম্পূর্ণ গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে ফিরে আসেন প্যারিসে পরের বছর। প্যারিসে এসে কাজ শুরু করেন মার্ক-গাব্রিয়েল গ্লেইরের স্টুডিওতে ছাত্র হিসেবে কিন্তু আকাদমির বাধানিষেধ মেনে নিতে না পারার ফলে ক্রমশই গাব্রিয়েলের অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। মার্ক-গাব্রিয়েল তাঁর বক্তৃতার সময় উদাহরণ হিসেবে ধ্রুপদী ভাস্কর্য ব্যবহার করতেন, কিন্তু ছাত্রদের জ্যান্ত মডেল দিতেন ছবি আঁকবার জন্য এবং ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন যে, জ্যান্ত মডেল থেকে ছবি আঁকলেও যেখানে-যেখানে দেখবে প্রকৃতি অসুন্দর বা খুঁতে সেখানে আদর্শ অনুযায়ী যাথার্থ্য ভুলে গিয়ে তুলি চালাবে। মার্ক গাব্রিয়েলের সঙ্গে মোনের প্রথম ঝগড়া বাধে একটা মোটা, বেঁটে, ধেড়ে পা-ওয়ালা মডেলকে নিয়ে—এই মডেলটিকে সামনে রেখে মোনে যে ছবি এঁকেছিলেন তা হুবহু বাস্তবধর্মী ছবি, ছবিটির ব্যক্তিটি বাস্তব ব্যক্তিটির মতোই হতকুচ্ছিত। মার্ক গাব্রিয়েল এ ছবি দেখে রেগে কাঁই—"এ ছবি কী হয়েছে, এ তো ভীষণ কুৎসিত"। মোনে উত্তরে বললেন, "ছবিটা কুৎসিত নয়, ছবিতে যে ব্যক্তিটিকে আঁকা হয়েছে সে কুৎসিত"। গাব্রিয়েল এ কথা শুনে মাথায় হাত দিলেন, কারণ তিনি পইপই করে তাঁর ছাত্রদের বলেছেন যে, যখন কোনো মনুষ্যশরীর আঁকবে সে কেমন দেখতে তার চেয়েও, তার কেমন দেখতে হওয়া উচিত ছিল সেই কথা মনে রাখা আবশ্যক।—এসব শুনে মোনে দেখলেন এঁর কাছে তাঁর চলবে না, এদিকে এঁর স্টুডিও দুম্ করে ছাড়তেও পারেন না, বাবা বলেছেন যদি মার্ক-গাব্রিয়েলের ইস্কুল ছেড়ে প্যারিসের চাওড়াদের দলে মেশো গিয়ে (রিয়েলিস্টরা আর কি) তা হলে মাসোহারা বন্ধ করে দেব। মোনের এ স্টুডিওতে তখনকার মত থেকে যাওয়া ভালোই হয়েছিল অবশ্য একদিক থেকে কেননা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাজিল, পিসারো, সিসলে, রেনোয়ার প্রভৃতির সঙ্গে, যাঁদের নিয়ে ইম্প্রেশনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে পরে।

রোমান্টিকদের থেকে আরম্ভ হয়েছে তরুণ শিল্পীদের আকাদমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এবং অবিরাম বিদ্রোহের ফলে আকাদমিও উনিশ শতকের শেষের দিকে কিছুটা ঢিলে করেছিল তাদের বাধানিষেধ। তার প্রমাণ, মোনের মতো চরম ইম্প্রেশনিস্টের ছবিও গৃহীত হয়েছিল ১৮৬৫-র সালঁ প্রদর্শনীতে এবং আশ্চর্যের বিষয় শুধু তরুণদের দ্বারাই নয়, [illegible] ছবিটি অনেক গোঁড়া সমালোচকের দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছিল। তারপরেও দু'চারবার সালঁতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। মোনে ল্যাণ্ডস্কেপ ছাড়া বিশেষ কিছু আর আঁকেননি পরিণত বয়সে, তবে কিছু ল্যাণ্ডস্কেপে মনুষ্যশরীর পাওয়া যায়, তাও সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। মোনে মানের মতো একটি "dejeuner Sur L' herbe" (চড়ুইভাতি) এঁকেছিলেন যার স্কেচটা ফ্রাংকফুর্ট মাজিয়ামে আছে—কিন্তু আসল ছবিটি তিনি ছিঁড়ে ফেলেন, কেননা গুস্তাভ কুর্বের সে ছবি পছন্দ হয়নি। স্কেচটা দেখলে বোঝা যায় কী অসাধারণ এঁকেছিলেন ছবিটা।—১৮৬৬-র সালঁতে মোনের আরেকটি সাড়া-জাগানো চিত্রের নাম "ভদ্রমহিলা : ঘাসের ওপর বসে আছেন।"

মোনে কী কারণে মনুষ্যশরীর অঙ্কন একেবারে বন্ধ করেছিলেন প্রশ্ন উঠতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি মানুষের মুখের ভাবে জটিল মানব-মন ধরবার দায় এড়িয়ে গেছেন জড় প্রকৃতিকে ছবির বিষয় হিসেবে নিয়ে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় গভীর তাৎপর্য আছে

তাঁর ছবির বিষয় হিসেবে মানুষকে মা-নেবার মধ্যে। তিনি শুধু তাই প্রকাশ করেছেন তাঁর ক্যানভাসে, যা অন্য কোনো শিল্প-মাধ্যমের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এবং সেই জন্যই নিজেকে সীমিত রেখেছেন শুধুমাত্র চিত্রগত সমস্যায়, এবং যেহেতু দেখেছিলেন পোর্ট্রেট আঁকতে গেলে মানবিক-সমস্যা চিত্রগত-সমস্যার চেয়েও গুরুতর হয়ে ওঠে, এবং সেজন্য সাহিত্য রয়েছে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রকাশ-মাধ্যম, তাই জড় প্রকৃতিই তিনি ছবির বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন শুধু। চিত্রগত সমস্যাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল, অন্যান্য চাহিদা এনে তাই সমস্যা বাড়ানো অর্থহীন মনে হয়েছিল তাঁর।

ভিরিশের ওপিঠে এসে মোনে ল্যান্ডস্কেপ ছাড়া আর কিছুই আঁকেননি বলতে গেলে, এবং সেইসব দৃশ্যই এঁকেছেন যেখানে জল দেখা যাচ্ছে। জল আর স্থল একই সঙ্গে দেখা যায় মোনের ল্যান্ডস্কেপে, কারণ গতি ও স্থিরতা এই দুই উপাদানের বৈপরীত্য পাশাপাশি রেখে তিনি ক্যানভাসে সজীবতা আনতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া যেহেতু ইম্প্রেশনিস্টরা আসলে আলোর শিল্পী, সেই হেতু জল তাদের অসম্ভব প্রিয় কারণ আর কিছুই পুরোপুরি নিজের সত্তা ত্যাগ করে আলোর কাছে এতটা আত্মসমর্পণে সক্ষম নয়, যেমন জল। রঙহীন এই তরল পদার্থের ওপর সমস্ত দিন অজস্র রঙের খেলা চলে— সত্যি বলতে জলে ছাড়া আর কোথায় আমরা নিরেট আলো দেখতে পাই?—তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে কী কারণে সব ইম্প্রেশনিস্টরা। তাহলে জলের ছবি আঁকেননি, কারণ যে-আলো তাঁরা ধরতে চাইছেন তা সবচেয়ে প্রস্ফুটিতভাবে প্রকাশ্য তো জলেই। আলোর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বোধ হয় দুটো ভাগ করা যেতে পারে ইম্প্রেশনিস্টদের মধ্যে। সেজান, রেনোয়ার বা দেগা চেয়েছিলেন **বস্তুর ওপর** আলোর প্রভাব ক্যানভাসে তুলে ধরতে, অর্থাৎ এঁদের ছবিতে আলো এবং বস্তু দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু মোনে, সিসলে বা পিসারো শুধু আলোকেই আঁকতে চেয়েছিলেন এবং তাই বস্তু তাঁদের ছবিতে নিতান্ত আলোর আধার হিসেবে এসেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় উদাহরণস্বরূপ লণ্ডনের পার্লামেন্ট হাউস ছবিটি নিরীক্ষণ করা যেতে পারে। ছবিটিতে তিনটি "বিষয়" রয়েছে—বাড়ি, জল, সূর্য। এ ছবিতে আকাশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই, কারণ জল, স্থল ও আকাশের মধ্যে কোন সীমারেখা কিংবা বিচ্ছেদ দেখানোই হচ্ছে না। দেখামাত্র প্রথম চোখে
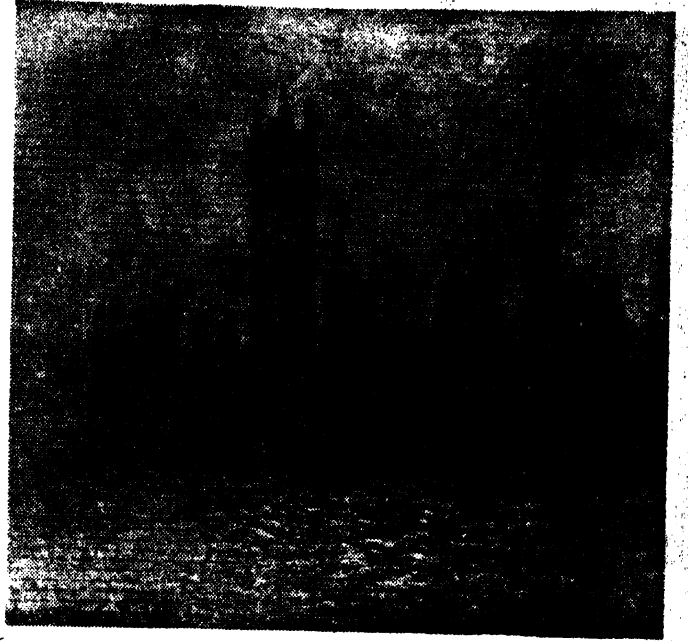
মোনে অঙ্কিত 'লণ্ডনের পার্লামেণ্ট হাউস'

পড়ে জলের উজ্জ্বল অংশটিতে যেখানে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে। অদ্ভুত দেখবেন চোখ কেমন ক্রমশ বাঁদিকে চলে আসে এই আলোর অংশ থেকে, এবং ছবি অর্ধবৃত্তাকারে (তুলি ক্যানভাসের ডানদিক থেকে স্পষ্টত ঘড়ির কাঁটার মতো বৃত্তাকারে চালানো হয়েছে) ঘুরে সূর্যের ওপর গিয়ে পড়ে। ইম্প্রেশনিস্টদের একদিক থেকে রিয়ালিস্ট বলা যায়, তাই লক্ষ করবেন এদের সবার ছবিতেই একটা অন্তর্নিহিত লজিক বা অন্যভাবে বলতে গেলে দর্শকের সঙ্গে এক ধরনের প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপার রয়েছে। প্রথম আমাদের চোখ তো জলের ওপরে আলোক-উজ্জ্বল অংশটিতে পড়ল, এবং স্বাভাবিক তাই মনে প্রশ্ন আসা কোথা থেকে এই আলো আসছে, তার উৎস কোনখানে। আমাদের মনে এই প্রশ্ন বা কৌতূহল জাগবে শিল্পী যেন জানতেন তা, এবং তাই তুলির এক প্যাঁচে নাগরদোলার মতো আমাদের চোখকে নিয়ে ফেললেন সূর্যের ওপর। আমরা জানলুম উজ্জ্বল সূর্য মাথার উপরে, জলে তারই ছায়া পড়ে এত রঙ ধরেছে। সূর্য থেকে এবার চোখ ডানপাশে সরে আসে বাড়ির ওপর—একেবারে বিপরীত ব্যাপার, গম্ভীর, শান্ত, স্থবির এবং নিরেট একটি শক্ত কাঠামো, যাতে সূর্যের চঞ্চলতা নেই, তেজ নেই, তাপ নেই, আলো নেই।

খুব কম ছবিতেই আমি এমন জীবন্ত সূর্য দেখেছি। সূর্য যে একটা জ্বলন্ত **গ্যাসের পিণ্ড, চাঁদের মতো শরীরী কোনো** নিটোল থালার মতো যে তার অস্তিত্ব নয়, তা স্পষ্ট এ-ছবিতে। ছবিটির এতটা অংশ জল এবং ঘননীলের প্রভাবে যদিও ক্যানভাসটি আচ্ছন্ন, তথাপি এই সূর্যের দিকে তাকালে তাপের অনুভূতি হয়। এ-ছবির সূর্য লণ্ডনের সূর্য নয়, কোনো গরম দেশে, হয়তো আলজিয়ার্সে এমন সূর্য দেখা যায়—শীতের দেশে কি সূর্য এত উদ্দাম যে কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে সে এত তাপের অনুভূতি দেবে? আলজিয়ার্সের আকাশের কথা কি মোনে টেমস নদীর ধারে বসে ভাবছিলেন? জানি না।

ছবিটিতে একটা আচ্ছন্ন ভাব সৃষ্টি করা হয়েছে—কারণ সব-কিছু কুয়াশার ঘসা কাচের ভিতর দিয়ে দেখছি আমরা। মনে করুন টার্নারের "তুষার ঝড়ে স্টিমার"—সেখানে যেমন তুষার-ঝড় সব সীমারেখা লুপ্ত করে এক ঝাপসা পর্দার মতো ছড়িয়েছিল ছবির ওপর; এখানেও ঠিক তেমনি কুয়াশায় আকাশ, জল, মাটি, সব মিশে এক হয়ে গেছে। সূর্য তীব্র টর্চের মতো ঝাপসা কুয়াশার পর্দা টুকরো করে বেরিয়ে আসছে বন্য বরাহের মতো আর বাড়িটা একটা বিশাল জিনিস বলে কুয়াশার মধ্য দিয়ে তার সৃষ্টির কাঠামোটাই শুধু দৃশ্যমান। ছবিটিতে গতি আনছে জল কারণ ছোট-ছোট তুলির আঁচড়ের সাহায্যে বহু রঙ ছিটিয়ে দেবার ফলে এই অংশটি কম্পমান ও গতিশীল।

শুদ্ধশীল বসু

সম্প্রতি রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজার সরকারী কর্মচারী অবস্থান ধর্মঘট করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচালিত মিছিলের ধ্বনি ছিল : সরকারী কর্মচারীরা দেশের

সেবক, গোলাম নয়। বিশুখুড়ো বলিলেন —"নিঃসন্দেহে তাঁরাও সেবক। তবে মিছিলে জিন্দাবাদী জিগীরের ধরন দেখে মনে হলো, সেবক বটে কিন্তু সংশোধিত ভারশন।!"

আখের সঙ্গে বাঁশের জোড় মিলাইয়া নূতন জাতের আখ উৎপাদনের গবেষণা করিতেছেন কোয়েমবেটুরের ইক্ষু গবেষণা পরিষদ। আমাদের অন্য এক

সহযাত্রী বলিলেন—"আদ্দিনে ইক্ষুর একটা হিল্লে হলো, আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে, ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে কথাটাই শুনে আস-ছিলাম। তবে ভাবছি, মৃদু লাঠি চার্জের জন্য 'বাঁশাখ' না পুলিসের হাতেই যায়।"

সংবাদে শুনিলাম, পশ্চিমবঙ্গের সব মন্ত্রীই মনোনয়ন চাহিয়াছেন। —"চাইতেই হবে। এই স্বয়ম্বরে হরধনু ভাঙার বীরত্ব নেই, মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করারও দায়িত্ব নেই; বরমালা পেয়ে গেলে তুক, না পেলে তাক, সুতরাং ক্ষতি কী"—বলে শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, সিটিজেনস ক্লাব কলিকাতায় আরো শ্যামলিমার দাবি জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, লবণ হ্রদ এলাকায় যে ১৬ মিটার চওড়া শ্যাম-বলয় রচনার পরিকল্পনা রহিয়াছে উহাকে অন্তত ১০০ মিটার চওড়া করা হউক।—"হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। শ্যামলিমার প্রথম প্রয়াস বনমহোৎসবের সবুজ শাড়ি"—বলে শ্যামলাল।

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত অপ্রত্যাশিতভাবে সিঙ্গাপুরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। "তার মানে

ভারত হয়ত শুধু মারডেকাই ভেবেছিল, মার দেগা কথাটা ভাবতে পারেনি"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম কলিকাতা জি পি ও-র নবসজ্জার ব্যবস্থা হইতেছে; রোটানডার কাউনটার এবং গম্বুজ নাকি হইবে শ্বেত পাথরের। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"তাজমহল সম্পর্কে হাক্সলির কথাটা মনে পড়ছে,—অ্যান্ড মারবেল কাভারস মালটিটিউডস অব সিনস !!"

কেন্দ্রীয় খাদ্য মান নির্ধারক কমিটির এক সাব-কমিটি নাকি উটের দুধ-পানের পরামর্শ দিয়েছেন।—"খুব ভালো কথা। শুনেছি উটের দুধে নাকি ভালো জিলিপি হয়, সরকার জিলিপি তৈরির পারমিট দিলেই হয়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ক্রেতা প্রতিরোধ কমিটির কার্য-কলাপের পর শুনিলাম, আবার মাছের দর বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে।—"এবং ফসকে গেরোর তোড়জোড়ের কথাটাও আমরা কানাঘুষোয় শুনেছি"—বলেন সহযাত্রী।

লালদীঘির মৎস্য পালনের দায়িত্ব সরকারী কোন দফতরের তা নাকি এখনো স্থির করা হয় নাই।—"তাড়ার কী আছে। সব কটা মাছ মরে গেলে তখন ভেবে দেখা যাবে"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীরা নাকি বলিয়া-ছেন, মেয়েদের শিক্ষা এবং পরিবার পরি-কল্পনা প্রভৃতি কেন্দ্রের হাতে না রাখিয়া রাজ্যসমূহের হাতে দিয়া দেওয়া উচিত। শ্যামলাল বলিল—"এবং মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সামান্য কটি স্বর্ণালংকারের ব্যবস্থাটাও রাজ্য সরকারদের হাতেই দেওয়া উচিত; অনেক ত হলো, আর কেন?"

লোকসভার সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কচ্ছের ভারতভুক্তি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র লোপাট হইয়া গিয়াছে। অবশ্য পরে সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কথাটা সত্য নয়, কাগজপত্র সমস্তই সুরক্ষিত অবস্থায় আছে।—"যা হোক, ভারত তবে মুক্ত কচ্ছ হয় নি"—সংক্ষেপে মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

দিল্লি হইতে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ প্রায় সোয়া কোটি টাকা বকেয়া আয়কর মকুব করা হইয়াছে। শ্যাম-লাল নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—"সম্রাট মহানুভব !!"

অন্য সংবাদে শুনিলাম, দিল্লিতে আন্তর্জাতিক থিয়েটার সেমিনারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—"দিল্লিতে আন্ত-র্জাতিক থিয়েটারের মহড়া অনেকদিন থেকেই চলছে, এবারে নাটক মঞ্চস্থ করার পালা"—বলেন সহযাত্রী।

২৭ আগস্ট হইতে কলিকাতায় সমস্ত সিনেমা হাউসগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ার কথা শুনিতেছি।—"হাউস ফুল-এর এবার হাউস Fool হওয়ার আশংকা"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।
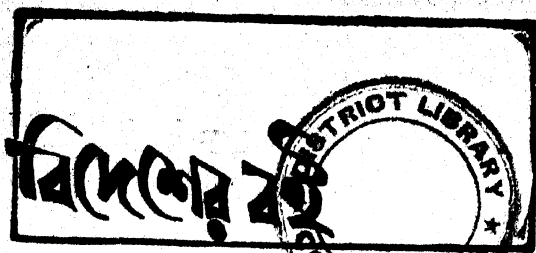
PREFACE TO THE FUTURE: Culture in a Consumer Society by Jean Amery, translated by Palmer Hilty.

বেলজীয় সাংবাদিক ও লেখক জাঁ আমেরি ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী কালে ব্রুসেলস, ভিয়েনা ও বার্লিন শহরে সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং জার্মান বন্দী-শিবিরে আটক হন। বর্তমানে বিভিন্ন সুইস পত্র-পত্রিকা ও জার্মান বেতার স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত।

আলোচ্য বইটি দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কতকগুলি দিকের একটি বিবরণ। লেখকের নিজের ভাষায়, "একটি সংস্কৃতির অবস্থার উপর রিপোর্টারকৃত রিপোর্ট।" তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন (১) যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক রূপ, সে চিত্রে জাঁ পল সার্ত্রের একাধিপত্য, (২) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আওতায় মার্কিন সংস্কৃতি, সে চিত্রে হলিউডের স্থান, প্যাকার্ড-প্রমুখ মার্কিন সমাজতাত্ত্বিকদের উন্মেষ, (৩) নাৎসীবাদের প্রেতের অপচ্ছায়ায় জার্মান মানস, জার্মানীর চমকপ্রদ অর্থনৈতিক অভ্যুত্থান, (৪) ইংলণ্ডের "রাগী ছোকরা"দের বিদ্রোহ ও তার তাৎপর্য। সব শেষে তিনি আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপের বর্তমান যৌথ সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয়ের কিছু চেষ্টা করেছেন।

আটলাণ্টিকের দুই তীরে এই সভ্যতা এখন মূলত এক। এর জন্ম এ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শেষে। আমেরির মতে এ সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ কোনো সাধারণ সর্বজনগ্রাহ্য myth খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বরং দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব-জাত প্রাচুর্যধর্মী ভোগকেন্দ্রিক অর্থনীতিই এর সাধারণ ভিত্তি এবং NATO চুক্তি এর রাজনৈতিক ও সামরিক নির্ভরের মেরুদণ্ডস্বরূপ। পশ্চিম ইয়োরোপের মিলিত অর্থনৈতিক প্রতীক কমন মার্কেট।

ইয়োরোপের বিগত "খ্রীষ্টীয় ঐক্যের সঙ্গে বর্তমান ইউরো-মার্কিন ঐক্যের বিরাট পার্থক্য। আগে ছিলো চিন্তা মতবাদ, বিশ্বাসের দৃঢ় ঐক্য। আমরা যাকে বলি 'খবর', 'তথ্য' বা 'জ্ঞাতব্য' তার পরিমাণ ছিলো ন্যূনতম। একটি প্রধান আধ্যাত্মিক ধারণা মানুষের জীবনের গভীরতম স্তর থেকে সামাজিক আচারের বাহ্য দিকগুলি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু বর্তমানে খবর ও তথ্যের রাজত্ব। অনেক জ্ঞাতব্য জড়ো হয়েছে, কিন্তু লোকমানসে তাদের সুসমন্বয় হয় নি। কোনো আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক আইডিয়া সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করছে না। জনজীবনকে একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করছে এবং একত্র করছে ভোগ। ভোগকেন্দ্রিক অর্থনীতির চাহিদা অনুসারে এ সভ্যতা বিশৃঙ্খলভাবে এক বিশাল জটিল অর্থহীন কলেবর ধারণ করছে। এ জগতে সংস্কৃতি উৎপাদন ও ভোগের ব্যবসায়-নিয়মে নিয়ন্ত্রিত; ভোগই সংস্কৃতির মোটর-স্বরূপ, শিল্পীরা জনার্দন।

আমেরি এ সভ্যতার কোনো মূল্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন নি—বলেন নি এ অবস্থা শুভ কি অশুভ। তিনি শুধু রিপোর্ট দাখিল করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্তমান ইউরো-মার্কিন সভ্যতার ধর্ম গুণীরতা নয়, ব্যাপ্তি, এবং এই সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ দেশগুলির মধ্যে যার যত বেশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সাংস্কৃতিক জগতে তার তত বেশি প্রাধান্য। কারণ সংস্কৃতির উৎপাদন কঠোর প্রতিযোগিতার নিয়মে আবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইতালীর প্রাথমিক ছায়াবৃত স্বল্পখ্যাত অবস্থা, পরে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জগতে তার গুণ্ঠনমোচন।

এ সভ্যতায় গুণ অপেক্ষা পরিমাণের প্রাধান্য বেশি। কোনো বই, নাটক, ছবি ফিল্ম কোনোগতিকে যদি একবার নাম করতে পারে—তা সে স্বকীয় গুণের প্রভাবেই হোক অথবা আপতিক ঘটনাচক্রেই হোক—তাহলেই তার কপাল খুলে যায়। তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ ভোগের সামগ্রী। ছবি হলে বিকোবে চড়া দরে, অনেক প্রদর্শনীতে দেখানো হবে। নাটক-ফিল্ম হলে লক্ষ লক্ষ লোক দেখবে। বই হলে বিক্রি হবে লক্ষে লক্ষে—বছর ঘুরতে না ঘুরতে অনুবাদ বেরোবে। 'best-seller'-গুলি নিজেদের ফাঁপায়, অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত বইদের টুঁটি টিপে ধরে। তা ছাড়া একবার আন্তর্জাতিক খ্যাতির লেবেল বা কোনো নাম-করা পুরস্কার পেলে বইমাত্রে সোনার খনি। প্রকাশকেরা জানেন সে বই বিকোবে, পাঠকেরা তাকে অন্যান্য সামগ্রীর মত ভোগ করে সরিয়ে রাখবে। ইউরো-মার্কিন সভ্যতায় গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা

প্রকাশক: Constable and Company Ltd., London, দাম ৪২ শিলিং।

ঐক্যবদ্ধ এবং অত্যন্ত সীমায়িত অর্থে আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিকতাটা নিজে-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কম্যুনিস্ট ইয়োরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার প্রকাশিত গ্রন্থ এ সভ্যতার গড়পড়তা (আর তাই বা কেন, অতি উচ্চশিক্ষিত) নাগরিকের দিগন্তের মধ্যে আসে না।

টেলিভিশন, সিনেমা, সংবাদপত্র ও ভ্রমণের মাধ্যমে এই দুনিয়ার দৃষ্টিগত অভিজ্ঞতা এক সূত্রে গ্রথিত : তার চৈতন্য এক এবং ক্রমশ আরও একত্রে ঘনীভূত হচ্ছে। এখানে কোনো বৈচিত্র্যের ব্যতিক্রমের বা মতান্তরের অবকাশ নেই। প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে এই মাধ্যমগুলি দ্বারা পরিবেশিত তথ্যরাশির গলাধঃকরণই এক-মাত্র পন্থা। আমেরির মতে এর ফলে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে জনমানসের বিচ্ছেদ ঘটেছে।

বিভিন্ন প্রচারযন্ত্রগুলি সংস্কৃতিকে সাধারণের কাছে পেশ করে এবং সাধারণ তা অন্যান্য দ্রব্যের মত ভোগ করে। প্রতি বছরে অসংখ্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক উৎসবের বৃদ্ধি তার একটি দৃষ্টান্ত। আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রতিটি সাংস্কৃতিক ঘটনাকে একটি 'দল' বা 'আন্দোলনে'র অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা; এতে সাধারণের সুবিধা হয়, নাম-গুলি সংকেতের মত কাজ করে। বলা বাহুল্য এ জাতীয় উত্তেজনা বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী। কোনো দলের খামখেয়ালীপনাই বেশি দিন নতুন থাকে না, (যেমন কোনো 'গ্যাজেট' বেশি দিন অভিনব থাকতে পারে না)। প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে জনতা সর্বদাই 'আপ-টু-ডেট', সর্বশেষ উৎকেন্দ্রিকতাকেও নামধাম দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে রসটুকু নিংড়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেয়। আমেরি লক্ষ করেছেন যে মার্কিন বীটনিক আন্দোলন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম নয় (সম্প্রতি বীটলদেরও খানিকটা সে অবস্থা)।

আমেরির বিশ্লেষণের চাতুর্য অনস্বীকার্য, কিন্তু সন্দেহ নেই তাঁর চিন্তাভাবনাও এই প্রসারধর্মী পরিমাণভিত্তিক সংস্কৃতির অন্তর্গত। নতুবা বিভিন্ন শিল্পকর্মের নিজস্ব মূল্যের বিচারকে পাশে সরিয়ে রেখে (যা তিনি বারবার করেছেন এবং নিজেই স্বীকার করেছেন যে শিল্পকর্মের মূল্যবিচার তাঁর উদ্দেশ্য নয়), শুধু শিল্প-কর্ম বা শিল্পীদের প্রভাব বা ইমপ্যাক্টকেই সাংস্কৃতিক অবস্থার নির্দেশক হিসাবে ধরে নিয়েছেন কেন? আসলে তিনি নিজেই নিজের তৈরী গর্তে পা ঢুকিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলতে চান, "লোকে এই ভাবে", কিন্তু তাঁর দিক থেকেও শিল্পের মূল্যবিচারকে তিনি মোটের উপর পরিহার করেছেন বলে মনে হয় যে, সংস্কৃতির যে-সংজ্ঞা ভোগ-কেন্দ্রিক সমাজে মান্য তিনিও সেটাকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসারেই একটি সাংস্কৃতিক দৃশ্যকে সার্ভে করতে চেষ্টা করেছেন, আলোচ্য সংস্কৃতির কোনো ইতিহাস রচনা করতে চেষ্টা করেন নি। হয়তো এখানেই বইটির দুর্বলতা। "লোকে এই ভাবে" এটুকু বলেই লেখক খালাস নন। তাঁর কাছে আমাদের প্রশ্ন "আপনি কি ভাবেন?"

লক্ষণীয় এই যে, আমেরির এ বইটিও তাঁর বর্ণিত পন্থা ধরে নাম করেছে, বিকোচ্ছে, ঝটিতি অনূদিত হয়েছে, গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে, অর্থাৎ ভোগ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

—কেতকী কুশারী ডাইসন

স্মৃতিকার রঘুনন্দন

সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন। বাণী চক্রবর্তী। ডি এম লাইব্রেরি, ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ (প্রাপ্তিস্থান)। মূল্য ৭·৫০।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল উনিশ শতকে। রামমোহন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন গবেষক। যে-কোন কারণেই হোক সাহিত্য-দর্শন ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা আমাদের দেশে সাধারণত টোলেই আশ্রয় পেয়েছিল। এই টোল-গুলিকে আশ্রয় করেই ব্যাকরণ-স্মৃতি-ন্যায় চর্চা কোনরকমে বেঁচে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় উৎসাহ দিয়ে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এসবের চর্চার প্রতি মনোযোগী করলেন। আশার কথা বর্তমানে গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়াতে স্মৃতি চর্চা যথাযোগ্য স্থান পাচ্ছে। তরুণ গবেষকরাও এগিয়ে এসেছেন স্মৃতি-ন্যায় আলোচনায়। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান কেবল নব্যন্যায় চর্চাতেই নয়, স্মৃতিচর্চাতেও তার ভূমিকা যে অসামান্য ছিল সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন গ্রন্থখানিই তার প্রমাণ।

রঘুনন্দন ষোড়শ শতকের স্মৃতিকার। গ্রন্থকর্ত্রী রঘুনন্দনকে সমাজ সংস্কারক বলেছেন। গ্রন্থনামেই গ্রন্থকর্ত্রীর অভিপ্রায় স্পষ্ট। রঘুনন্দনের স্মৃতিকর্মের কেবল পরিচয় দেওয়াই লেখিকার উদ্দেশ্য নয়, তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি রঘুনন্দনের মনীষার মৌলিক দিকটিও পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। পূর্বাচার্যগণের মতামত পরীক্ষা করে রঘুনন্দন যে বিধি-বিধান রচনা করেছেন তার মূল্য নিরূপিত হবে উপযোগিতার দ্বারা। সমাজের পক্ষে উপযোগিতা থাকলেই সেই বিধিবিধানের মূল্য, সমাজরক্ষণ, সমাজপালন এবং সমাজ-গতি নিরূপণ করাই স্মৃতিকারদের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু এই ব্যাপক দৃষ্টি, লেখিকা প্রমাণ করেছেন, সকল স্মৃতিকারের ছিল না। বিশেষ করে তিনি শ্রীনাথের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্মৃতি শাস্ত্র আলোচনায় সঙ্কীর্ণ এবং উদার মতবাদের কথা বলেছেন। আমাদের মনে হয় লেখিকার দীর্ঘ আলোচনা এদিক থেকে যথেষ্ট সারবান এবং সমৃদ্ধ।

রঘুনন্দনের আবির্ভাবকাল সঠিক জানা না থাকলেও ষোড়শ শতকে তিনি যে জীবিত ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে ষোড়শ শতক স্বর্ণযুগ। নানা দিক দিয়ে জাতির চিন্তার দ্রুত আরোহণ লক্ষ করা যায় এই সময়ে। একদিকে তন্ত্রচর্চার প্রসার অন্যদিকে বৈষ্ণবভাবনার বিস্তৃতি অপরদিকে স্মৃতি-ন্যায় চর্চার অদম্য উৎসাহ। এই তিনটি ধারা মিলেমিশে ত্রিবেণী সঙ্গম না ঘটলেও এই তিনটির প্রেরণা বোধ করি একই। মুসলমান ধর্মের অভিঘাতে হিন্দু সমাজ যখন চঞ্চল হয়ে উঠল তখন প্রতিরোধ, সংরক্ষণ, এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এইটিই ইতিহাসের ইঙ্গিত। সমাজ-চিন্তানায়কদের পক্ষে একদিকে কঠোর মনোভাব যেমন প্রত্যাশিত তেমনি উদারতাও কাঙ্ক্ষিত। রঘুনন্দন বিচার-বিতর্কে, বিধিবিধান রচনায় কখনও কঠোর কখনও উদার। কখনও প্রয়োজন হলে তন্ত্রকে গ্রাহ্য করেছেন, কখনও পূর্বাচার্য-গণের সরণি অবলম্বন করেছেন। আবার মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে পূর্বমত খণ্ডন করে নিজমত স্থাপন করেছেন। লেখিকা রঘু-নন্দনের সেই ক্ষুরধারবুদ্ধির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। রঘুনন্দনের পূর্বে দু' একজন স্মৃতিকার ছাড়া তন্ত্রকে প্রমাণ বলে গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু রঘুনন্দনের উপর তন্ত্রের প্রভাব গুরুতর। এখানেও রঘুনন্দনের উদারতা এবং যুগোপযোগী চিন্তাকর্মের পরিচয়। লেখিকা অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে সেইসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। প্রধানত সমাজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে রঘুনন্দন উদারনীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কঠোর বিধি-ব্যবস্থা অনেক সময় মানুষকে নিয়ম-বিমুখ করে তোলে। এমন কি এর ফলে ব্যভিচার ইত্যাদির প্রশ্রয় পায়। রঘু-নন্দন তাঁর দূরদৃষ্টির বলে বুঝেছিলেন বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে গেলে প্রাচীন মতের পরিবর্তন প্রয়োজন। বাণী চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে রঘুনন্দনের সেই বিচার, সেই মতামত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন।

ভারতবাসী হলেও বাঙ্গালীর ভৌগোলিক

পরিবেশ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক সম্পদও ভিন্ন জাতীয়, খাদ্যদ্রব্যও ভিন্ন ধরনের। ফলে লোকবিশ্বাসও স্বতন্ত্র ধরনের। সুতরাং রঘুনন্দন সবক্ষেত্রে ভারতীয় মতগুলিকেই গ্রাহ্য করেন নি। দায়ভাগের সার্থকতা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। খাদ্যাখাদ্য বিচারে ব্রাহ্মণের কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন। লঘু পাপে গুরুতর শাস্তি বিধানের তিনি বিরোধী ছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে রঘুনন্দনের বিধানের কঠোরতা যেমন লক্ষণীয় তেমনি বিচার্য প্রায়শ্চিত্তের লঘু-গুরু ভেদে। যেখানে গুরুতর দণ্ড বিধানের প্রয়োজন কেবল সেখানেই রঘুনন্দন কঠোর।

স্মৃতিশাস্ত্র সমাজেতিহাস। বাংলা মধ্য যুগের সামাজিক ইতিহাস আজও অলিখিত। শ্রীযুক্তা চক্রবর্তী গুরুতর পরিশ্রম করে মোট আটটি পরিচ্ছেদে সেই ইতিহাসের অংশ বিশেষ আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য বহু পঠন এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম ও আন্তরিকতা ভিন্ন এরকম গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মধ্য যুগের ইতিহাস রচনায় গ্রন্থটির অপরিহার্যতা সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

১১৫।৬৬

গান্ধীদর্শন

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পন্থাত। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। গান্ধী স্মারক-নিধি, বাংলা। ১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্যঃ ৩·০০।

গান্ধী স্মারকনিধি বাংলা ভাষায় গান্ধীদর্শন ও কর্মপন্থতি সম্পর্কিত অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি পুস্তক সুলিখিত। প্রাঞ্জল ভাষায় দীর্ঘদিন পরে আবার আমরা গান্ধীজীর মত ও পথ সম্বন্ধে নতুন করে পড়ার সুযোগ পাচ্ছি। গান্ধীদর্শনে যাঁদের অনীহা, তাঁরাও গান্ধীজীর গঠনগকর্মের প্রশংসা না করে পারেন না। ভারতবর্ষের মতো বিশাল, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে গান্ধীজীর গঠনকর্ম যে কতোখানি কার্যকর তার পরিচয় দেশে-বিদেশে অনেকেই পেয়েছেন। আজকের বৃহৎ প্ল্যান, এবং প্রায়-টেক-অফ স্টেজেও তার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র কমেনি; বরং আজকেই মনে হয় গান্ধীজীর গঠনকর্ম ভারতবর্ষে বেশী করে চালু করা দরকার। ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রী সরকার গঠিত হলে তাকে গান্ধীজীর গঠনকর্ম পন্থতির বৃহৎ অংশ গ্রহণ করতে হবেই। আলোচ্য পুস্তকপাঠে এ সত্যে আস্থা জন্মায়।

(৪৭১।৬৫)

কবিতা আলোচনা

কবিতা-পরিচয় [কবিতা-সমালোচনার মাসিক সংকলন]

তৃতীয় সংখ্যা। বিস্কুট রঙের মলাট। ভিতরে রুচি-স্নিগ্ধ আয়োজন। দামী কাগজ। সুন্দর ছাপা। পাঠক-মহাশয়ের যাতে চোখের একটুও কষ্ট না হয় তার জন্য সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রুফ-সংশোধক সকলেই সজাগ। সংখ্যাটির আকার বৃহৎ। অবশ্য পৃষ্ঠা-সংখ্যা মাত্র সতেরো।

বাংলা ভাষায় কবিতা বিষয়ে উৎসাহী প্রচুর। কবিতা নিয়ে প্রচেষ্টা নানামুখী। ফসল নানাবিধ। চাহিদা নিত্য ক্রমবর্ধমান। কবিতা-পরিচয়-এর কর্মকর্তারা একটি অভিনব পরিকল্পনা করেছেন। একালের বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের এক-একটি বিশিষ্ট কবিতার দরজা তাঁরা একালের বয়োকনিষ্ঠ কবিদের হাতের মায়াবী চাবি দিয়ে খুলতে চান। কবিতার কবিকৃতির নক্ষত্র-গণনা শরীর বিশ্লেষণ এবং কুয়াশা-মোচনই আলোচকদের অভিরুচি এবং উদ্দেশ্য। এই সংখ্যায় কবিতা ও তার রচয়িতা ও আলোচকদের নাম পর পর তুলে দিচ্ছি। তোমার সৃষ্টির পথ (রবীন্দ্রনাথ)—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও ত্রিদিব ঘোষ, হোর্টেনসীয়ার নৃত্য (জীবনানন্দ)—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বৃষ্টি (অমিয় চক্রবর্তী)—নরেশ গুহ, বউ (সঞ্জয় ভট্টাচার্য)—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, ময়ূরভঞ্জের প্রার্থনা (সমর সেন)—অরুণ সেন, ফুল ফুটুক না ফুটুক (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)—শঙ্খ ঘোষ।

এ ছাড়া আলোচনা বিভাগে—কাব্য আলোচনার পাল্টা আলোচনা, মত-ঐক্য পার্থক্য অটুট ছাপা হয়েছে। সব দিক দিয়ে পত্রিকাটির গুরুত্ব যথেষ্ট। অনুসন্ধিৎসুরা যথেষ্ট লাভবান হবেন এমন একটি সৎ ও সময়োপযোগী প্রচেষ্টায়।

চরিত্রচিত্র

চেনা মুখের মিছিল। চিত্রগুপ্ত। পুস্তকম—১৪এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৩·০০।

ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জার, রাস্তার গণৎকার, ট্যাক্সি ডেকে দেওয়া বয় প্রভৃতি চরিত্র এবং সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের দৈনন্দিন জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনার ছোট ছোট নকশা লেখক পরিবেশন করেছেন। সবাইয়েরই চোখে পড়ে এমন কতকগুলি চরিত্রের বিচিত্র পেশার পিছনকার ইতিহাসও কতক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। লেখক চেনা এবং নিত্যই দেখা যায় এমন বহু চরিত্রকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন। (৫৪৫।৬৫)

প্রাপ্তি স্বীকার

জাজগানের রাজা—লুই আর্মস্ট্রং। জেনেইটন। অনুবাদ : সুধীর চক্রবর্তী। হোমশিখা প্রকাশনী. কৃষ্ণনগর। মূল্য : ১·০০।

কানুনের উপমা। সুধাংশু ঘোষ। চতুরঙ্গ। ৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৩·০০।

যুগে যুগে কালে কালে—নিমাইকুমার ঘোষ। দে বুক স্টোর—১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৩·০০।

অনুভূতির-পরশ ও আলেখ্য। শ্রীবীরেন্দ্র-নাথ রায়। শ্রীভাস্কর রায়—১৮০, বেচারাম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৩৪। মূল্য—২·৫০।

ভক্তরোমন্থন। সচ্চিদানন্দ। শ্রীসুবলচন্দ্র ঘোষ—৭, ব্রজেন মুখার্জী রোড, বেহালা, কলিকাতা। মূল্য—১·০০।

চতুর্দশ কবিতা। শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম—পণ্ডিচেরী। মূল্য—২·৫০।

মহত্তর নাটকের একটি মুহূর্ত। কার্ল জ্যান জোয়েন। অনুবাদ : অসীম চৌধুরী। পরিচয় পাবলিশার্স—৩।১ মফর কোলে রোড, কলিকাতা-১৫। মূল্য—২·৫০।

মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে কুয়ালালামপুরে আয়োজিত মারডেকা ফুটবলের উপর যবনিকা পড়েছে। এবার ফাইন্যালে বর্মাকে ১—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর পুরস্কার টুংকু আবদুল রহমান স্বর্ণ ট্রফি পেয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দল। ফাইন্যালে পরাজিত বর্মার অবশ্যই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় ভারত ১—০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান দখল করেছে। চতুর্থ স্থানের অধিকারী হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া।

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার এবার ছিল নবম অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী দেশ মালয়েশিয়া সমেত এবার ১০টি দেশ খেলায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে তাইওয়ান চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়া গতবারের যুগ্ম বিজয়ী। দশটি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করবার জন্য প্রথমে ৪টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ৫টি করে দেশের গ্রুপ লীগের খেলায় যারা প্রতি গ্রুপে লীগ টেবলে শীর্ষস্থান অধিকার করে তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলা। গ্রুপ লীগের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুই দেশের খেলায় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয় করা হয়। সাধারণত প্রতিদিন দুটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় রাত্রিকালীন আলোকমালার মধ্যে। প্রতি অর্ধে ৪০ মিনিট করে খেলার স্থায়িত্বকাল ছিল ৮০ মিনিট।

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফুটবল খেলার শ্রেষ্ঠ বার্ষিক উৎসব এবং এই প্রতিযোগিতাটি 'ফিফা' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার অনুমোদিত। সুতরাং মারডেকা জয়ের গুরুত্বও কম নয়।

যদিও পেশাদার খেলোয়াড়দের নিয়ে বিশ্ব কাপ ফুটবল তবু এশিয়ার একটি দেশ ফুটবলে কতখানি উন্নতি করেছে, বিশ্ব কাপের সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতায় উত্তর কোরিয়ার উন্নত ক্রীড়াশৈলীই তার প্রমাণ। অ্যামেচার ফুটবলেও প্রাচ্যভূমিতে আজ উন্নতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, বর্মা প্রভৃতি ফুটবলের শক্তিশালী দেশ। সুতরাং এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জনও গৌরবের বিষয়।

মারডেকা ফুটবলের জন্য ভারত থেকে বাছাই করে যে দলটিকে পাঠান হয়েছিল সে দলে গোড়ায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, সে কথা এর আগে বলেছি। তার উপর চোট খাওয়া ভারতের অধিনায়ক জারনেল সিং মারডেকার প্রথম খেলাতেই আবার পায়ে চোট খাওয়ায় ভারতকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে খেলতে হয়েছে। রাত্রি-কালীন ফুটবল খেলায় ভারত অভ্যস্ত নয় এ কথাটাও স্মরণ রাখা দরকার। তার উপরে ভারতে খেলার স্থায়িত্বকাল ৭০ মিনিট। সেখানে ৮০ মিনিট খেলতে শ্রমকাতরতার চিহ্ন ফুটে ওঠাও স্বাভাবিক। এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের তৃতীয় স্থান লাভ কৃতিত্বের পরিচায়ক। আরও বড় কথা, টুংকু আব্দুল রহমান ট্রফি বিজয়ী দক্ষিণ ভিয়েৎনামকেই গ্রুপ লীগে ভারতের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আর গ্রুপ লীগে ভারত যে সিংগাপুরের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ১—০ গোলে হার স্বীকার করেছে সে খেলায় ভাগ্যদেবী ছিলেন ভারতের প্রতি বিমুখ। শুধু ভাগ্যদেবীই নন, যে খবর আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মাঠের ভাগ্যবিধাতা অর্থাৎ খেলার পরিচালকও ভারতের প্রতি বিমুখ ছিলেন। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ভারতের একটি ন্যায়-সংগত গোল তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন এবং ৪ মিনিট সময় কম খেলিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ভারতের অধিনায়ক মারডেকা কমিটির কাছে প্রতিবাদ করেও কোন সুফল পাননি। কারণ, খেলা সম্পর্কীয় ব্যাপারে রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলে না।

ভারতের দুর্ভাগ্যের আর একটি লক্ষণও সুস্পষ্ট। গ্রুপ লীগের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে, বি গ্রুপে ভিয়েৎনাম ও ভারতের সংগৃহীত পয়েন্টের সংখ্যা সমান সমান। ভিয়েৎনামের ৯টি গোলের বিরুদ্ধে ২টি গোল, ভারতের ৫টির বিরুদ্ধে ১টি। যদি গোল অ্যাভারেজে গ্রুপ লীগের মীমাংসা হত, অবশ্যই ভারত পেত শীর্ষস্থান। কিন্তু যেহেতু স্বপক্ষ ও বিপক্ষ গোলের বিয়োগের ফলাফলে শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ের নতুন বিধান সেহেতু ভিয়েৎনামের শীর্ষস্থান। এও একরকমের অদৃষ্টের পরিহাস। গতবারের যুগ্ম বিজয়ী তাইওয়ান এবং এবারকার বিজয়ী ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেও ভারতের তৃতীয় স্থান। যে অবস্থার মধ্যে ভারতকে খেলতে হয়েছে তাতে এই ফলাফলের জন্য অবশ্যই ভারতীয় খেলোয়াড়রা প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

মারডেকা প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে পরাজয় স্বীকার করলেও বর্মার উন্নত ক্রীড়াধারাও প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ-ভাবেই বলা দরকার, ফাইন্যাল খেলায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জয়সূচক গোলটিই বর্মার বিরুদ্ধে এই প্রতিযোগিতার একমাত্র গোল। অবশ্যই মূল প্রতিযোগিতার ফলাফলে।

ভারতের গোলদাতাদের নাম সমেত মারডেকা ফুটবলের বিভিন্ন খেলার ফলাফল ও লীগ টেবল নীচে দেওয়া হল।

প্রাথমিক খেলার ফলাফল

মালয়েশিয়া ৫ : দঃ ভিয়েৎনাম ২
ভারত ২ : হংকং ১
(অশোক চাটার্জী ও রাজেন্দ্রমোহন)
তাইওয়ান ২ : থাইল্যাণ্ড ০
বর্মা ২ : সিংগাপুর ২

'এ' গ্রুপের খেলার ফলাফল ও লীগ টেবল

বর্মা ৩ : থাইল্যান্ড ০
বর্মা ২ : হংকং ০
বর্মা ২ : দঃ কোরিয়া ০
বর্মা ০ : মালয়েশিয়া ০
দঃ কোরিয়া ১ : হংকং ০
দঃ কোরিয়া ২ : থাইল্যান্ড ১
দঃ কোরিয়া ২ : মালয়েশিয়া ১
মালয়েশিয়া ১ : হংকং ০
মালয়েশিয়া ০ : থাইল্যান্ড ০
থাইল্যান্ড ২ : হংকং ২

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
বর্মা	৪	৩	১	০	৬	০	৭
দঃ কোরিয়া	৪	৩	০	১	৫	৩	৬
মালয়েশিয়া	৪	১	২	১	২	২	৪
থাইল্যান্ড	৪	০	২	২	৩	৬	২
হংকং	৪	০	১	৩	২	৭	১

'বি' গ্রুপের ফলাফল ও লীগ টেবল

দঃ ভিয়েৎনাম ৪ : জাপান ০
দঃ ভিয়েৎনাম ২ : সিঙ্গাপুর ১
দঃ ভিয়েৎনাম ৩ : তাইওয়ান ০
ভারত ১ : দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ০
(অরুময়)
ভারত ৩ : জাপান ০
(অশোক চ্যাটার্জি ২ ও অরুময়)
ভারত ১ : তাইওয়ান ০
(অরুময়)
সিঙ্গাপুর ১ : ভারত ০
সিঙ্গাপুর ৪ : তাইওয়ান ১
জাপান ১ : সিঙ্গাপুর ০
জাপান ৫ : তাইওয়ান ২

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
দঃ ভিয়েৎনাম	৪	৩	০	১	৯	২	৬
ভারত	৪	৩	০	১	৫	১	৬
সিঙ্গাপুর	৪	২	০	২	৬	৪	৪
জাপান	৪	২	০	২	৫	৯	৪
তাইওয়ান	৪	০	০	৪	৩	১৩	০

ফাইনাল খেলা

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ১ : বর্মা ০

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলা

ভারত ১ : দক্ষিণ কোরিয়া ০
(পরিমল দে)

*

কলকাতার ফুটবল লীগ, বিশ্ব কাপের খেলা, কমনওয়েলথ গেমস প্রভৃতি খেলাধুলোর ডামাডোলের মধ্যে ইংলন্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ দুটি টেস্ট খেলার কথা কিছু লেখা হয়নি। আজ ঐ দুটি টেস্ট খেলা সম্পর্কে দু'-চার কথা বলে দুই দেশের খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরীর খতিয়ান এবং টেস্ট অ্যাভারেজ ছেপে দিচ্ছি।

আমরা জানি, এই সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে তিনটি খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী হয়েছে, একটি খেলায় ইংলন্ড, একটি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ঠিক যেন ১৯৬৩-র সফরের পুনরাবৃত্তি। ১৯৬৩-তেও ফ্রাঙ্ক ওরেলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংলন্ডে খেলতে এসে একইভাবে 'রাবার' নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিল। ওরেলের উত্তরসূরী গারফিল্ড সোবার্সও একই কীর্তি অর্জন করলেন। এক দিক দিয়ে সোবার্সের কাছে ওরেলের কীর্তিও ম্লান। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে এক সিরিজে ওরেল ৫৩৯ রানের বেশী করতে পারেননি। কিন্তু সোবার্স এবার করেছেন ৭২২ রান। সোবার্সের উইকেটের সংখ্যাও কুড়ি। ব্যাটিং-এ শীর্ষস্থান। বোলিং-এ দ্বিতীয়। সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত চৌকস অধিনায়ক।

যাই হোক, টেস্ট খেলাগুলির ফলাফল আগে লেখা যাক।

*

ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৪০ রানে ইংলন্ডকে পরাজিত করে। খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ২ দিন বাকি থাকতে খেলা শেষ হয়ে যায়।

ক্রিকেটের পীঠভূমি লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয় না।

ট্রেন্ট ব্রিজের তৃতীয় টেস্ট শেষ হয় শেষ দিনের চায়-বিরতির কিছু আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৩৯ রানে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

লীডস মাঠের চতুর্থ টেস্টে আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলন্ডকে পরাজিত করে এক ইনিংস ও ৫৫ রানে। চতুর্থ দিন ৩ ঘণ্টা খেলা চলার পর খেলার উপর যবনিকা পড়ে। অর্থাৎ দেড় দিন সময় বাকি থাকতে খেলা শেষ হয়।

ওভাল মাঠের শেষ টেস্টে ইংলন্ডের একমাত্র জয় এবং এক ইনিংস ও ৩৪ রানে জয় খেলার দেড় দিন বাকি থাকতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একমাত্র লর্ডসের অমীমাংসিত দ্বিতীয় টেস্ট ছাড়া কোন টেস্টই পুরো সময় খেলা হয়নি, তিনটি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পর্যাপ্ত প্রাধান্য, একটি টেস্টে ইংলন্ডের আধিপত্য, একটি টেস্টে দুই দলের সমান অবস্থা। এই সিরিজ নিয়ে ইংলন্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এপর্যন্ত ৫০টি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হল। এর মধ্যে ইংলন্ডের জয়ের সংখ্যা ১৭, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৬। অমীমাংসিত খেলা ১৭টি।

ফুটবলে ইংলন্ডের বিশ্ব কাপ জয়ের পর অনেকে আশা করেছিলেন, লীডস মাঠের চতুর্থ টেস্টে ইংলন্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাতে পারবে। সূচনাও ছিল ইংলন্ডের অনুকূল। কারণ, টসে জয়লাভ করেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৫৪ রান তুলতে চারটি উইকেট হারিয়েছিল। কিন্তু তার-পরে সোবার্স ও নার্সের সংহারমূর্তি এবং দুজনের সেঞ্চুরী। ৯ উইকেটে ৫০০ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড। প্রত্যুত্তরে দুই ইনিংস মিলিয়ে ইংলন্ডের ৪৪৫ রান। এবং প্রথম ইনিংসের শেষের দিকে মাত্র ৮৩ রানের মধ্যে ৬টি উইকেটের পতন।

ওভাল মাঠের পঞ্চম টেস্টে ঠিক এরই বিপরীত চিত্র। ইংলন্ডের লেজের দাপটে পরম শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পতন। পঞ্চম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২৬৮ রানের উত্তরে ১৬৬ রান তুলতেই ইংলন্ডের ৭টি উইকেট পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু টম গ্রেভনি এবং জন মারের চমকপ্রদ ব্যাটিং, দুজনের দুটি সেঞ্চুরী এবং শেষ ৩ উইকেটে ইংলন্ডের ৩৬১ রান যোগ টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসের বিরল ঘটনা। শেষ টেস্টের শেষ দিকে এমন খেলা কচিৎ দেখা যায়। যাকে বলে লেজের দাপট। সামগ্রিক ব্যর্থতার এমন সাহসী সৌন্দর্যের বোধ করি দ্বিতীয় তুলনা নেই।

১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে যেমন আমরা অধিনায়ক বদলের রেকর্ড করেছিলাম। পাঁচটি টেস্টে করেছিলাম ৪ জন অধিনায়ক ঠিক তেমন অবস্থাই দেখা দিয়েছিল এবার ইংলন্ড দলে। প্রথমে অধিনায়ক মাইক স্মিথ, পরে কলিন কাউড্রে! শেষ পর্যন্ত ব্রায়ান ক্লোজ। ব্রায়ান ক্লোজ অধিনায়কোচিত প্রজ্ঞার ইংলন্ডকে ভরাডুবির হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। নতুন আলোর পথ দেখিয়েছেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোরবোর্ড :—

চতুর্থ টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—(৯ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ৫০০ রান (গারফিল্ড সোবার্স ১৭৪, সেমুর নার্স ১৩৭, কনরাড হাণ্ট ৪৯, রোহন কানহাই ৪৫, বেসিল বুচার ৩৮; কেন হিগস ৯৪ রানে ৪ উইকেট, স্নো ১৪৬ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৪০ (বেসিল ডিওলিভারা ৮৮, কেন হিগস ৪৯, কলিন মিলবার্ণ ২৯; সোবার্স ৪১ রানে ৫ উইকেট, ওয়েসলী হল ৪৭ রানে ৩ উইকেট, চার্লি গ্রিফিথ ৩৭ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২০৫ (বব্ বারবার ৫৫, কলিন মিলবার্ণ ৪২; ল্যান্স গিবস ৩০ রানে ৬ উইকেট, গারফিল্ড সোবার্স ৩৯ রানে ৩ উইকেট)।

(ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৫৫ রানে বিজয়ী)।

পঞ্চম টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—২৬৮ (রোহন কানহাই ১০৪, গারফিল্ড সোবার্স ৮১ ওয়েসলী হল নট আউট ৩০. বব্ বারবার ৪৯ রানে ৩ উইকেট, স্নো ৬ রানে ২ উইকেট, ইলিংওয়ার্থ ৪০ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৫২৭ (টম গ্রেভনি ১৬৫, জন মারে ১১২, কেন হিগস ৬৩, জন স্নো নট আউট ৫৯, বব্ বারবার ৩৬, জন এডরিচ ৩৫; ওয়েসলী হল ৮৫ রানে ৩ উইকেট, সোবার্স ১০৪ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—২২৫ (সেমুর নার্স ৭০, বেসিল বুচার ৬০, চার্লি গ্রিফিথ নট আউট ২৯; জন স্নো ৪০ রানে ৩ উইকেট, ইলিংওয়ার্থ ২২ রানে ২ উইকেট)।

(ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৩৪ রানে বিজয়ী)।

দুই দেশের যারা সেঞ্চুরী করেছেন :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

১৭৪—সোবার্স—লীডস—৪র্থ টেস্ট
২০৯—বুচার—ট্রেন্ট ব্রিজ—৩য় টেস্ট
১৬৩*—সোবার্স—লর্ডস—২য় টেস্ট
১৬১—সোবার্স—ম্যাঞ্চেস্টার—১ম টেস্ট
১৩৭—সেমুর নার্স—লীডস—৪র্থ টেস্ট
১৩৬—হাণ্ট—ম্যাঞ্চেস্টার—১ম টেস্ট
১০৫—হলফোর্ড—লর্ডস—২য় টেস্ট
১০৪—কানহাই—ওভাল—৫ম টেস্ট

ইংলণ্ডের পক্ষে

১৬৫—টম গ্রেভনি—
১২৬*—মিলবার্ণ—লর্ডস—২য় টেস্ট
৩১২—জন মারে
১০৯—টম গ্রেভনি—ট্রেন্ট ব্রিজ—৩য় টেস্ট
(* তারকা চিহ্ন নট আউটের সংকেত)

—একলব্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—ব্যাটিং

	খেলা	ইনিংস	অপরাজিত	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	অ্যাভারেজ
সোবার্স	৫	৮	১	৭২২	১৭৪	১০৩·১৪
নার্স	৫	৮	০	৫০১	১৩৭	৬২·৬২
বুচার	৫	৮	১	৪২০	২০৯	৬০·০০
কানহাই	৫	৮	০	৩২৪	১০৪	৪০·৫০
হলফোর্ড	৫	৮	২	২২৭	১০৫	৩৭·৮৩
হাণ্ট	৫	৮	০	২৪৩	১৩৬	৩০·৩৭
ল্যাসলী	২	৩	০	৮১	৪৯	২৭·০০
গ্রিফিথ	৫	৬	১	৮২	৩০	১৬·৪০
ম্যাকমরিস	২	৩	০	২৬	১৯	৮·৬৬
গিবস	৫	৬	৩	২২	১২	৭·৩৩
অ্যালান	২	২	০	১৪	১৩	৭·০০
হেণ্ড্রিকস	৩	৪	১	১১	৯	৩·৬৬

ক্যারু একটি ম্যাচ খেলেছেন। রান ২ ঃ ০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	অ্যাভারেজ
গিবস	২৭৩·৪	১০৩	৫২০	২১	২৪·৭৬
সোবার্স	২৬৯·৪	৭৮	৫৪৫	২০	২৭·২৫
হল	১৭৫·০	৩৫	৫৫৫	১৭	৩০·৮৩
গ্রিফিথ	১৪৪·৪	২৭	৪৩৮	১৪	৩১·২৮
হলফোর্ড	৯০·৫	৩	৩০২	৫	৬০·৪০

(এ'রাও বল করেছেন ঃ ল্যাসলী ৩-২-১-১ ; ক্যারু ৩-০-১১-১; হাণ্ট ১৩-২-১৪-০)

ইংলণ্ড—ব্যাটিং

	খেলা	ইনিংস	অপরাজিত	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	অ্যাভারেজ
গ্রেভনী	৪	৭	১	৪৫৯	১৬৫	৭৬·৫০
মিলবার্ন	৪	৮	২	৩১৬	১২৬	৫২·৬৬
ডি'ওলিভেরা	৪	৬	০	২৫৬	৮৮	৪২·৬৬
বারবার	২	৩	০	৯৭	৫৫	৩২·৩৩
কাউড্রে	৪	৮	০	২৫২	৯৬	৩১·৫০
বয়কট	৪	৭	০	১৮৬	৭১	২৬·৫৭
পার্কস	৪	৮	০	১৮১	৯১	২২·৬২
স্নো	৩	৫	২	৬২	৫৯	২০·৬৬
হিগস	৫	৮	০	১৪৭	৬৩	১৮·৩৭
রাসেল	২	৪	০	৬১	২৬	১৫·২৫
ব্যারিংটন	২	৪	০	৫৯	৩০	১৪·৭৫
টিটমাস	৩	৫	০	৬১	২২	১২·২০
আণ্ডারউড	২	৪	২	২২	১২	১১·০০
ইলিংওয়ার্থ	২	৩	০	৭	৪	২·৩৩
জোন্স	২	৩	৩	০	০	—

এ'রাও ব্যাট করেছেন ঃ জন মারে ১২২; জি অ্যালেন ৩৭; এডরিচ ৩৫; ডি ব্রাউন ১৪ ও ১০; ডি অ্যামিস ১৭; মাইক স্মিথ ৫ ও ৬; ব্যারী নাইট ৬; ডি বি ক্লোজ ৪

ইংলণ্ড—বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	অ্যাভারেজ
হিগস	২৩৬·৪	৪৯	৬১১	২৪	২৫·৪৫
বারবার	৫১·১	৭	১৮২	৬	৩০·৩৩
স্নো	১৩৮·৫	২৯	৪৫১	১২	৩৭·৫৮
টিটমাস	৮৯	২০	১৯০	৫	৩৮·০০
ডি'ওলিভেরা	১৬০	৪৮	৩২৯	৮	৪১·১২
ইলিংওয়ার্থ	৬৩	২৪	১৬৫	৪	৪১·২৫
বি নাইট	৫১	৩	১৬৯	৪	৪২·২৫
আণ্ডারউড	৬৯	২৫	১৭২	১	১৭২·০০
জোন্স	৭৪	১১	২৫১	১	২৫১·০০
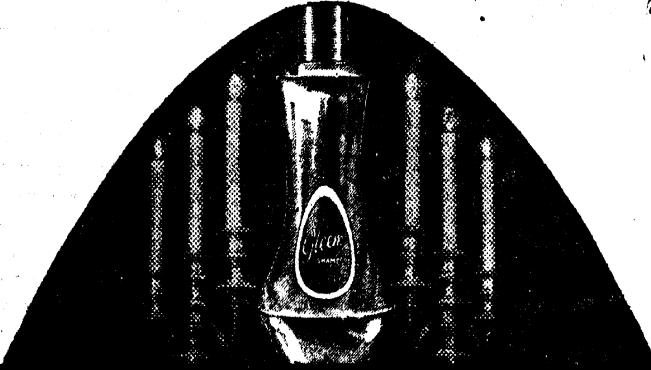
কলকাতার মার্গারেট ওয়াকারের বিখ্যাত হেয়ার-স্টাইলিস্ট ডোরীন নাইট গ্লীম শ্যাম্পু সম্বন্ধে কি বলেন দেখুন ঃ

"গ্লীম শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুল রেশমের মতন নরম থাকে ও যে কোনো ফ্যাশানেই সহজে বাঁধা যায়। যে চুল বাঁধা সাধারণতঃ কষ্টকর, সে চুলকেও গ্লীম আশ্চর্য্য নরম ও সুন্দর করে তোলে। আমার খরিদ্দাররা এর ফ্রেশ সুগন্ধ অত্যন্ত পছন্দ করেন।"

কেশসজ্জার অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য গ্লীম শ্যাম্পু

জেফ্রী ম্যানার্স এণ্ড কোং লিমিটেড

ববি মুর

পেলে, ইউসেবিও, ববি চার্লটন, উয়ে সিলার, বেকেন বেয়ার প্রভৃতি বিশ্ব ফুটবলের কত নাম আমাদের মুখে মুখে। বিশ্ব ফুটবল আসরে কতজনের কত কীর্তি। কিন্তু কেউই বোধ করি আজ ববি মুরের মত সুখী নয়। ওয়েমবলীর ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে লক্ষ মানুষের সমবেত করতালি-ধ্বনির মধ্যে ববি মুর এর আগে এফ এ কাপ গ্রহণ করেছেন, ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স' কাপ গ্রহণ করেছেন, এবার গ্রহণ করেছেন ফুটবলে বিশ্ব জয়ের পুরস্কার 'জুলে রিমে' কাপ। বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইংলণ্ডের গর্ব ও গৌরব ববি মুর। ১০৩ বছরের ফুটবল ইতিহাসে ফুটবল স্রষ্টা ইংলণ্ড কোনদিন যে সম্মান অর্জন করতে পারে নি, আজ ববি মুরের অধিনায়কত্বে সেই সম্মান অর্জন করেছে।

অথচ বয়স মাত্র ২৬ বছর। এই ছাব্বিশ বছরের মধ্যে মুর অনেক কীর্তির অধিকারী। স্কুল ফুটবল থেকে আরম্ভ করে ইংলণ্ডের সব দলের অধিনায়কের মুকুট তাঁর মাথায় উঠেছে। স্কুল দলের অধিনায়ক হয়েছেন, ইংলণ্ডের যুব দলের অধিনায়ক হয়েছেন, ১৯৬৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে ইংলণ্ডের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। আর ফুটবলের দৌলতে পশ্চিম জগতের কোন দেশই সফর করতে বাকি রাখেন নি। সদ্য-সমাপ্ত বিশ্ব কাপের খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মানে ভূষিত একমাত্র ববি চার্লটনই মুরের চেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন।

ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে মুর কিন্তু সহজাত প্রতিভার অধিকারী নন। যা ক্রীড়াশৈলীর দিক দিয়ে বিলি রাইট, জিমি গ্রীভস, ডেনিস ল কিংবা ববি চার্লটনের মত অচিরেই সুনামের সোপানে আরোহণ করেন নি। অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং অনলস সাধনার বলে তাঁর ফুটবলে সিদ্ধি।

১৯৫০ সালের কথা। পূর্ব লণ্ডনকে ফুটবল-সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে 'ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড' ক্লাব বাচ্চা ছেলেদের বাছাই করে এক শিক্ষা পরিকল্পনা চালু করল। সাধারণত ১৫ বছরের বাচ্চা ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সব বাচ্চাদের এই পরিকল্পনায় শিক্ষা গ্রহণের

সুযোগ ছিল না। যার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, দীর্ঘ দেহ, বিস্তৃত বক্ষ, প্রশস্ত ললাট এবং কিছুটা ফুটবল জ্ঞান আছে সেই ছেলেই ম্যানেজার টেড ফেন্টনের নজরে পড়ত। শিক্ষার্থীর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং নিয়মানুবর্তিতাও পরীক্ষা করে দেখা হত। প্রত্যুত্তরে শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষা এবং প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা তো পেতেই, তদতিরিক্ত বিনা পয়সায় থাকা খাওয়া, ফুটবল খেলা শিক্ষা ছাড়া, অন্য শিক্ষার সুযোগও দেওয়া হত। দু বছর শিক্ষার পর অর্থাৎ ১৭ বছর বয়সে লীগের ফুলটাইম প্রফেসনাল খেলোয়াড় হিসাবে বছরে এক হাজার পাউণ্ড আয়েরও সুযোগ ছিল।

এই পরিকল্পনায় কত ছেলের বরাত খুলে গেল। দু' বছরের মধ্যে কত ছেলে ফুটবলকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে বেছে নিল। কিন্তু রবার্ট মুর নামে বার্কিং স্কুলের দীর্ঘদেহী ছেলেটি সংগীত এবং ফরাসী ভাষা শেখার দিকে বেশী নজর দেওয়ায় ফুটবলে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারল না। তবে ফুটবলের মাঝারিয়ানায় দক্ষতার পরিচয়ের মাঝেও অ্যাথলেটিকস এবং ক্রিকেট খেলায় বেশ কিছুটা পটু হয়ে উঠল। এক সময়ে মুরের মাথায় সাদার্ন ইংলণ্ড স্কুল, ক্রিকেট দলের অধিনায়কের মুকুটও উঠেছিল। এবং এসেক্স কাউন্টির ক্রিকেট অধিনায়ক ডগ ইনসোল, যিনি আজ ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান, তিনি মুরকে এসেক্স দলে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড দলে ফুটবল খেলার সুযোগ মেলায় ববি মুর ফুটবলকেই আঁকড়ে ধরে এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় এবং সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণের সহজাত ক্ষমতায় দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। আজ সারা পৃথিবীর না হলেও ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ লেফট হাফ এবং সবচেয়ে প্রিয়দর্শন খেলোয়াড় ববি মুর। ফুটবল থেকে সপ্তাহে আয় এক শ' পাউণ্ড—ছয় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি-র অধিকারী।

ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের যুব দলে মুরের প্রথম খ্যাতি সেণ্টার হাফ হিসাবে। কিন্তু পরে টেড ফেন্টন মুরকে এক্সট্রা ব্যাক হিসাবে ব্যবহার করেন। ওয়েস্ট হ্যাম দলে গ্রীনউডের আগমনের পর '৪+২+৪' প্রথায় খেলায় মুর লয়েকোমর লেফট হাফ। প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে যেমন পটু ও পোক্ত, তেমনি নিজেদের আক্রমণ রচনায় তৎপর ও শিল্পপটু। প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ডের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে মুর কত যে গোল করেছেন তা ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক খেলার বিবরণেই লেখা আছে।

বৃত্তি এবং ব্রত-র মত ফুটবল রবার্ট মুরের ব্যবসাও বটে। প্রতি বছরই দরাদরির পর শেষ খেলোয়াড় হিসাবে ওয়েস্ট হ্যামের সঙ্গে উনি নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ওঁর কথা : সবাই একই হারে অর্থ পাবে কেন? আমি যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, পায়ের ক্ষমতার পরিচয় দিই তবে বেশী পেতে বাধা। আমার আয় আমার নিজের হাতে অর্থাৎ নিজের পায়ের ক্ষমতায়।

"ছায়াপথ" (পরিচালনা : ভূপেন্দু সান্যাল) ছবিতে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] সান্যাল

সেক্রেটারি শ্রীতরুণ দত্ত অন্যতম সভ্য। সভার কর্মসচিব থাকবেন শ্রী পি এস মাথুর।

রঙ্গজগৎ

মুখ্যমন্ত্রী সকাশে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের একদল প্রতিনিধি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলা ছবির বিবিধ সমস্যা নিয়েই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন চিত্র-প্রযোজক। তাঁরা শ্রী সেনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তাতে অন্যান্য বিশেষ প্রস্তাবের সঙ্গে ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন গঠনের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ ছিল। তা ছাড়া "ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট সেস্" গড়ে তুলে নতুন সিনেমাগৃহ নির্মাণ, চিত্রপ্রযোজনা এবং স্টুডিও ও ল্যাবরেটরির উন্নতির কাজে সহায়তার জন্য সরকারকে প্রতিনিধিবৃন্দ অনুরোধ জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি 'অ্যাড-হক' কমিটি গঠন করেছেন। তাঁরা এই প্রস্তাব-গুলি বিবেচনা করবেন। এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন শ্রী আর গুপ্ত। কমিটিতে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিত্ব করবেন শ্রীঅজিত বসু, শ্রীঅসিত চৌধুরী ও শ্রীসত্যজিৎ রায়। অর্থ মন্ত্রকের ডেপুটি

চিত্র-সমালোচনা

শেষ তিন দিন

বাস্তবকে সুবিধামত এড়িয়ে চলার একটা মৌলিক অধিকার বুঝি এমনিতেই সিনেমার আছে। তার উপর যদি ঘোষণা করা হয় যে, কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এবং শেষে যদি এমন দেখানো হয়, যা কিছু ঘটেছে তার সবটাই স্বপ্ন তবে তো আর বিচারের বালাই থাকে না। "শেষ তিন দিন"-এর (এম বি প্রোডাকশন্স) "অবাস্তব" বিষয়বস্তু সেদিক থেকে সহজেই দর্শকের দায় অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। তবে মুশকিল এই, কাহিনীর (মিহির সেন রচিত) সাংবাদিক নায়ক উড়োজাহাজে বসে এমন একটি স্বপ্ন দেখছে যা আসলে স্বপ্ন-রাজ্যের বিষয় নয়। অ্যাটম বোমার চেয়েও

সদ্যোমুক্ত 'সম্রাট' হিন্দী চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা

বহুগুণ শক্তিশালী বোমা দিয়ে মাত্র তিন দিন পরে পৃথিবী ধ্বংস করার যে হুমকি পাইলটরা দিয়েছে তা অবশ্য এক স্বপ্নেই সম্ভব। পাইলটদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টার ব্যাপারটিও না-হয় ধরে নিলাম সমপরিমাণে উদ্ভট।

কিন্তু এ ছাড়া আর যা আছে? সবই তো দেখছি বক্তব্যপ্রধান স্বপ্নাংশ। বরঞ্চ বলতে পারি, স্বপ্নপ্রচার। ছবি শুরু হবার আগে একটি মেয়ের হাতে শ্বেত কপোত দেখেই তা মালুম হয়েছিল। বুঝেছিলাম, কিছু শুনতে হবে। কোন্ তরফের বক্তব্য তাও বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তারপর হিরোসিমা-নাগাসাকির ট্র্যাজেডির পৌনঃপুনিক উল্লেখের মধ্য দিয়ে যুদ্ধবাজদের প্রতি কটূক্তিবর্ষণ, আধুনিক নির্বাচন-রঙ্গ, বিক্ষোভকারীদের স্লোগান, বুভুক্ষু জনতার অভিযান ও খাবার দোকান লুঠ; পুঁজিপতিদের নিয়ে ব্যঙ্গ, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী তথা আদর্শবাদীর 'ফ্রাস্ট্রেশন', সর্বত্র অবক্ষয় (নায়কের সহোদরাও বাদ যায় নি), আসন্ন আণবিক ধ্বংসের আতঙ্কে (স্বপ্নের মতই অলীক আতঙ্ক) ম্রিয়মাণ এক যুবকের আত্মহত্যা এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার হরেক রকম ত্রুটিবিচ্যুতি (তাও বিশেষ মতসাপেক্ষে) প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি সবই নায়কের স্বপ্নদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

সব ঘটনাই অসংলগ্ন, অবিন্যস্ত। ক্লান্তিকর পরিস্থিতিরও অভাব নেই। এর জন্য অবশ্য পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে দোষ দেওয়া যায় না। এখানেও এই একই যুক্তি: স্বপ্নঘটনা সুবিন্যস্ত হবে এমন কী কথা আছে। তবে অনেকাংশে যেটা বাস্তবের স্বপ্ন সেখানে বাস্তবের চিত্র আর একটু নিখুঁত হতে পারত। তথাপি কবুল, নায়কের প্রেম এবং এই প্রণয়ী-যুগলের মাঝখানে অন্য নারীর আগমনের স্বপ্নগাথা পরিচালক অল্প অবকাশে বেশ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। বিশেষ এক রাজনীতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির (এ নিয়ে ভাল ছবি হতে পারে না বা হওয়াটা দোষের বলছি না। প্রচারধর্মিতা শিল্পের অন্তরায়, এটাই বক্তব্য।) প্রচার-দামামার মাঝখানে, মরুভূমিতে ওয়েসিস-এর মত, প্রণয়ের উপাখ্যান দর্শকের মন আকর্ষণ করে।

এবং ছবিতে প্রধান দুই নারীচরিত্রের শিল্পীকেই বেশ ভাল লেগেছে। কারণ, অন্যদের তুলনায় এই দুটি চরিত্রও অনেক বেশী বাস্তব। যদিও একটি মুহূর্তে নায়কের বাড়িতে আশ্রিত যুবতীর (সুমিতা সান্যাল) সহসা নিজের যৌবনক্ষুধা মেটানোর জন্য চঞ্চল হওয়ার ঘটনাটা অস্বাভাবিক। স্বপন, এই কাহিনীতে বাস্তব দর্শনের একটা উপলক্ষ বলেই কথাটা উল্লেখ করলাম। অল্প অবকাশে সুমিতা সান্যালের অভিনয়ই সব চাইতে বেশী প্রশংসনীয়। রোমান্টিক ভূমিকায় গীতালি রায়ের (নায়কের প্রেমিকা) চরিত্র চিত্রণও চমৎকার। অনুপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন। তরুণকুমার ও প্রেমাংশু বসু দুটি অস্বাভাবিক চরিত্রে উপস্থিত। তাঁরা তাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্য দেখালেও তা মনে দাগ কাটে না। অপর্ণা দেবী ও জহর গাঙ্গুলী সিনেমার সেই গতানুগতিক মা-বাবা। নায়কের সহোদরা সেজেছেন সুব্রতা

"লাভ ইন টোকিও" চিত্রে আশা পারেখ ও জয় মুখার্জি

"লাভ ইন টোকিও"-র অপর একটি দৃশ্যে [illegible] ও আশা পারেখ

চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রটি সুঅভিনীত। ইলেকশন-রঙ্গে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যান্যদের মধ্যে দ্বিজু ভাওয়াল, মন্মথ রায়, গীতা দে, বিপিন গুপ্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংগীতের দান (অতীন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত) এ ছবিতে সামান্য। একটি গানের সুর মন্দ নয়। কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজ নিম্নমানের। দীনেন গুপ্তর কাছে আরও ভাল ফটোগ্রাফি আশা করেছিলাম।

উঁচে লোগ

"উঁচে লোগ" (চিত্রকলা—মাদ্রাজ) নাম শুনেই ভাববেন না, যথাবিহিত (সিনেমার ফরমুলা অনুযায়ী) সমাজের উপরের মহলের লোকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বরঞ্চ বাস্তবের অপর একটি চিত্র ছবিটিতে দেখানো হয়েছে—যা অনেকেই, বিশেষত এ-কালে, দেখাতে সাহস করেন না। বড়লোকের মধ্যেও যে মমতা, সততা ও কর্তব্যবোধ থাকতে পারে তা-ই, এক কথায়, এই ছবির বক্তব্য।

অবসরপ্রাপ্ত এক মেজর (অশোককুমার) এবং তাঁর দুই পুত্রকে (রাজকুমার ও ফিরোজ খান) কেন্দ্র করেই চিত্রকাহিনীর বিস্তার। কনিষ্ঠের প্রণয়ের কাহিনী ছবিতে আছে। কিন্তু তার প্রণয়িনীকে খুব অল্পই ছবিতে দেখা গেছে। পরিচালক ফণী মজুমদার সর্বাংশে গতানুগতিকতা বর্জন করতে না পারলেও এই ছবিকে অনেক দিক থেকেই [illegible] ও [illegible] করে তুলেছেন। রোমান্টিক উপাখ্যানকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি নাট্যবস্তু পিতা ও পুত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কাহিনীর পরিণতি ট্র্যাজেডি, যদিও তা মহৎ আদর্শের দ্যোতক। পিতা জেনেছেন তাঁর নিহত পুত্র ছিল অপরাধী। এটা জেনেও তিনি হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পেরেছেন, পুলিশের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চেয়েছেন। যদিও খুনীর নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া ও হত্যাকাণ্ড তিনি সমর্থন করেন নি। এই কারণে কর্তব্যনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্রের (পুলিশ কর্মচারী) কাছে তিনি রেহাই পান নি।

করুণ মেলোড্রামা এবং অনুজ্জ্বল কৌতুকের কিছু উপকরণ ছবিতে আছে। কিন্তু পরিচালকের কৃতিত্ব এই, পিতা-পুত্রের গল্প, মাতৃহীন পুত্রদের মান-অভিমান, গভীর বাৎসল্যের ছোটখাটো ঘটনা প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শকের মনকে তিনি সর্বক্ষণ আকৃষ্ট করে রেখেছেন। উঁচু লোকের উঁচু ভাবধারার এই ছবিটি (যে কারণে—সম্ভবত, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) আগাগোড়াই উপভোগ্য।

অশোককুমার নতুন ধরনের চরিত্রাঙ্কনে দর্শকের মন অতি সহজেই জয় করবেন। কর্তব্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগী ভ্রাতৃবৎসল বড় ভাইয়ের চরিত্রে রাজকুমারের অভিনয়ও চমৎকার। ফিরোজ খান চিত্রনাট্যের শর্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। সহোদরার অপমান ও আত্মহত্যার (যাকে মেজরের ছোট ছেলে বঞ্চনা করেছে) প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরিয়া এবং পরে খুনীর চরিত্রে তরুণ বসুর অভিনয় অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

চিত্রগ্রহণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এজেন্ট ০০৭ মিশন ব্লাডি মেরি

জেমস বণ্ডের সমগোত্রীয় সর্বশক্তিমান এক গোয়েন্দার দুঃসাহসিক ও অবিশ্বাস্য কার্যকলাপ দর্শনে যাদের আগ্রহ, "এজেন্ট ০০৭ মিশন ব্লাডি মেরি" (লাইটহাউস) তাদের অবশ্যদ্রষ্টব্য। ছবিটি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য হলেও, তা অবোধ বালকের মতই বসে দেখতে হয়। দৃশ্যমান কোন কিছুর ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধি খাটাতে গেলেই বিপদ। দুষ্টদলন ও রমণীরঞ্জনে সিদ্ধহস্ত এই ছবির গোয়েন্দা আমেরিকার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এ জে ন্সি র গুপ্তচর। আন্তর্জাতিক কুচক্রী দলের হাত থেকে 'ব্লাডি মেরি' (অ্যাটম বোমার বাক্স) সে উদ্ধার করে আনে। ছবির যৌন উপকরণ অঢেল। রুচিবান ও শিল্পানুরাগী দর্শকের কাছে অবশ্য ছবিটি সিনেমার দুরারোগ্য দুষ্ট ক্ষত বলেই মনে হবে।

পরলোকে সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেত্রী ও চিত্রপ্রযোজিকা শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় গত রবিবার (২৮ আগস্ট) লণ্ডনে এডিনবরা হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে লণ্ডন নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু এর পর তাঁর অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে।

সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ সনে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর প্রথম ছবি "নিদ্রিত ভগবান" (নির্বাক)। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাত। ১৯৪২ সনে তিনি আবার চিত্রজগতে ফিরে আসেন। এর পর "কাশীনাথ" (বাংলা ও হিন্দী), "দম্পতি", "দুই পুরুষ", "দত্তা", "নার্স সিসি", "পণ্ডিত মশাই", "বিরাজ বৌ", "সমাপিকা", "অঞ্জনগড়" (বাংলা ও হিন্দী), "পল্লী সমাজ", "শুভদা" (বাংলা ও হিন্দী), প্রভৃতি বহু ছবিতে অভিনয় করে তিনি প্রচুর যশ অর্জন করেন। তাঁর প্রযোজিত চিত্রের মধ্যে দৃষ্টিদান, সিংহদ্বার, দত্তা, পল্লীসমাজ, শুভদা, রাত ভোর, পথের শেষে, উল্কা ছবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
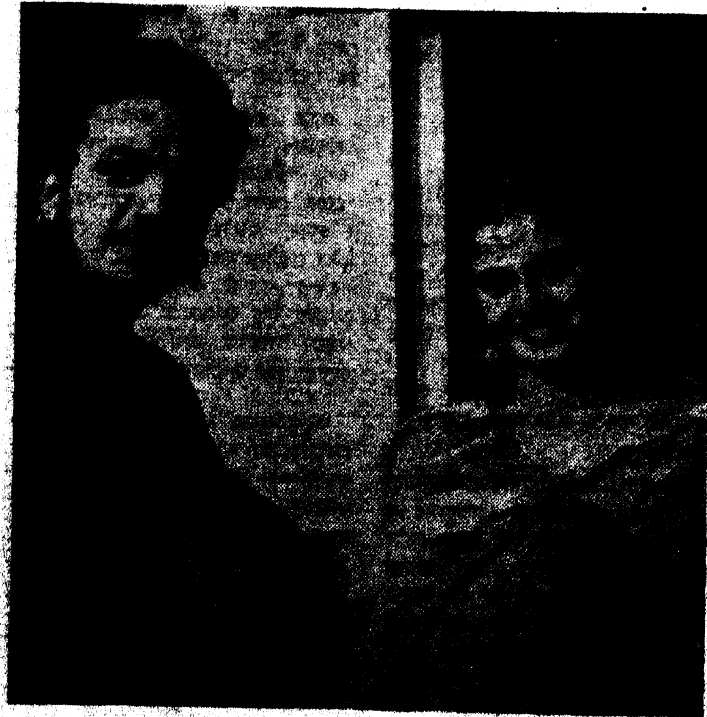
বহু সমাজহিতকর কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি অভিনেতৃ সঙ্ঘের সভানেত্রী ছিলেন। মহিলা শিল্পী মহলের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এ-সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত "অশ্রু দিয়ে লেখা" ছবিতে সম্ভবত তাঁর শেষ চিত্রাভিনয়।

মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্বামী চিত্রপ্রযোজক শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান।

"এন্টনি ফিরিঙ্গি" (পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবির দুই প্রধান শিল্পী উত্তমকুমার ও তনুজা

ফটো—দেশ

নেপথ্যে

"ছুটি"র পরেই নন্দিনীর ছুটি। এর পর আর কোন ছবিতে সে অভিনয় করবে না। বিমল করের "খড়কুটো"-র ভ্রমর চরিত্রের শিল্পী নন্দিনী নিজেই আমাকে জানাল।

"অফার আসছে না ?"

"আসছে, কিন্তু সিনেমায় অভিনয় আর করব না", বলল নন্দিনী।

"কেন ?"

"আর ভাল লাগে না। যে রোল-এ কাজ করছি তা খুব ভাল। কিন্তু ফিল্ম লাইন আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

বি-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে নন্দিনী, ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে। "ছুটি"-র শুটিং এখনও বাকি আছে। অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত ছবিটি এই ইংরেজী বছরের শেষেই মুক্তি পাবে।

"বালিকা বধূ" এখন মুক্তির প্রতীক্ষায়। ইতিমধ্যে 'প্রোজেকশন' যাঁরা দেখেছেন তাদের নাকি ছবিটা খুব ভাল লেগেছে। বাংলার অগ্নিযুগের (১৯০৫-১৯১১) পট-ভূমি ছবিতে রেখেছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় বালিকা বধূর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সুর রচনা ও গান গাওয়া ছাড়াও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির শুরুতে নেপথ্যে নায়কের (তখন আর বয়স বেশী) কথাগুলি বলেছেন।

দুরন্ত চড়াই-এর আউটডোর শুটিং শেষ করে পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ফিরে এসেছেন। আউটডোরের শিল্পীদের মধ্যে নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। সবিতা চট্টোপাধ্যায় ছবির অপর এক অভিনেত্রী। নবাগত সোমেন চক্রবর্তীকেও ছবিতে নেওয়া হয়েছে। শ্যামল মিত্র সংগীত পরিচালক। সমরেশ বসুর কাহিনীর
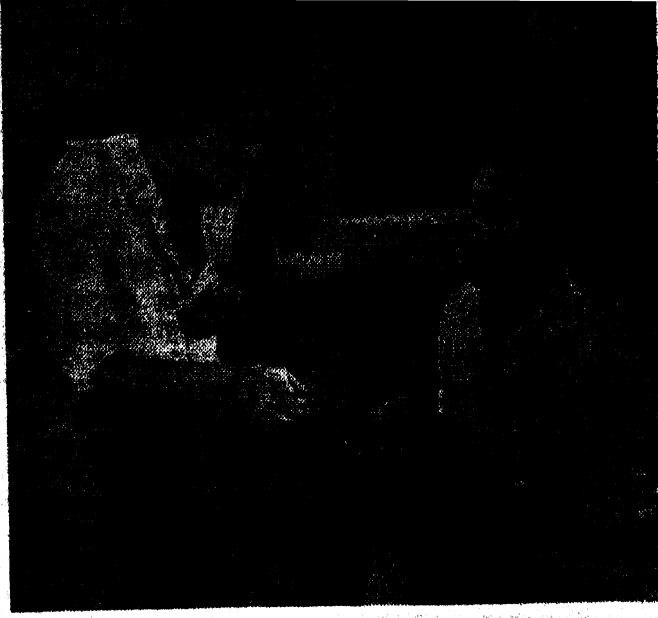
এম কে জি'র "উত্তরপুরুষ" (পরিচালনাঃ চিত্রকর) ছবিতে বিকাশ রায় ও অনুপকুমার

ভিত্তিতে পরিচালক জগন্নাথ চক্রবর্তীর এই দ্বিতীয় ছবি। এর আগে "অয়নান্ত"-র পরিচালক সন্ধানী-গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ছিলেন।

খেয়া-র নায়িকা হবেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। প্রযোজক শ্যামল মিত্রর এই ছবির কাজ সেপ্টেম্বরেই আরম্ভ হবে। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ছবির পরিচালক। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব শ্যামল মিত্র নিজেই সম্পাদন করবেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনীর এই ছবিতে তরুণকুমার, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি অভিনয় করবেন।

অগ্রদূত ছদ্মনামের আড়ালে বিভূতি লাহার নামটি এতকাল গোপন থাকেনি। চিত্রপরিচালক ও ক্যামেরাম্যান হিসাবে তিনি সুপরিচিত। বিভূতিবাবু সেদিন বলছিলেন, এখন আমি রজত-জয়ন্তী উৎসব করতে পারি। আমার ছবির সংখ্যা পঁচিশ হয়ে গেছে। যাই হোক, এবার বিভূতি লাহা নিজের নামেই চিত্রপরিচালনা করবেন। চিত্রপ্রযোজকও হবেন তিনি। নতুন 'ব্যানার'-এ তাঁর প্রথম ছবিতে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি "কেদার রাজা"-র শুটিং শেষ। বেশ কিছুকাল পর সারা ছবি জুড়ে বিশিষ্ট চরিত্রে অর্থাৎ নাম-ভূমিকায় দেখা যাবে পাহাড়ী সান্যালকে। তপন সিংহর তত্ত্বাবধানে ছবির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছেন। বলাই সেন ছবি পরিচালনা করেছেন। "সুরের আগুন"-এর পর এই তাঁর দ্বিতীয় ছবি।

লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরন প্রভৃতি ছবির অন্যান্য প্রধান শিল্পী। কালীপদ সেন সুরকার।

এর আর বুঝি কোন প্রতিকার নেই। বাংলা ছবির ক্রেডিট-টাইটেলের বানান ভুলের কথা বলছি। একটি ছবিতে আবার দেখলাম "আরতী", "বেনু", "অতিন", "দেবব্রম" ইত্যাদি।

রজত-জয়ন্তী সপ্তাহে "মমতা"

বোম্বাইয়ের অপেরা হাউসে চারুচিত্রর হিন্দী ইস্টম্যান কালার চিত্র "মমতা" সপ্তাহ অতিক্রম করেছে। ছবিটির জনপ্রিয়তা এখনও অব্যাহত।

প্রতিযোগিতার জন্য জাপানের যে কয়টি ছবি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হয়েছিল, তার সব কয়টিই অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। তিনটি ছবির একটি অবশ্য প্রতিযোগিতা-বহির্ভূত শাখায় দেখানো হবে।

সুইডেনের "নাইট গেমস" ছবিটি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ কোন স্বীকৃতি পাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। একটি কিশোরের উপর তার জননীর যৌনজীবনের প্রভাব নিয়ে তৈরি এই দুঃসাহসিক চিত্রটি জনসাধারণ দেখতে পাবেন না। শুধু সাংবাদিকদের দেখানো হবে।

ফরাসী চিত্রপরিচালক ত্রুফোর সায়েন্স ফিকশ্যান ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ব্রিটিশ প্রতিযোগী চিত্র হিসাবে দেখানো হবে। জুলি ক্রিস্টি (যিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন) এই ছবির নায়িকা।

টোকিও ও ওসাকায় আর্ট থিয়েটারে আগামী নবেম্বর মাসে "পথের পাঁচালী" ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তি পাবে। জাপানে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনী এই প্রথম।

দিনো দি লরেন্তিস জানিয়েছেন, তাঁর হয়ে ফেদারিকো ফেলিনি যে দ্বিতীয় ছবিটি পরিচালনা করবেন তার নাম : "এল ওরল্যান্ডো ফুরিওসো"। ইটালির এক ক্লাসিক সাহিত্যরচনা হবে এই ছবির বিষয়বস্তু।

শ্রীলোকনাথ চিত্রের 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিতে [illegible] ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

"মধুবরণ" (পরিচালনা : দিলীপ নাগ) ছবিতে গীতা রায় ও রাখী বিশ্বাস

নাটক ও সিনেমা প্রসঙ্গ

নাটক ও সিনেমার পত্রিকা আজকাল অনেক বেরুচ্ছে। এর সব কয়টিই উল্লেখ্য নয়। সম্প্রতি থিয়েটার (পাক্ষিক পত্রিকা : পবিত্র সরকার ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : ৫৯।১বি পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯) আমাদের হাতে এল। প্রথম সংখ্যা পাওয়ার পরই পরবর্তী সংখ্যার জন্য উৎসুক ছিলাম। পর পর পাঁচটি সংখ্যা দেখলাম। নাট্যামোদীদের কাছে এই পত্রিকার মূল্য অনেক। এদেশের ও বিদেশের নাট্য-চর্চার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে থিয়েটার। আন্তর্জাতিক নাট্যসংবাদ পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ। নাট্যসমালোচনার বিভাগটিও কম মূল্যবান নয়।

একটি নতুন চলচ্চিত্র-পত্রিকার নাম সিনেমা সমালোচনা (বিজয়কুমার বসু সম্পাদিত : ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯)। এতে চিত্রামোদীরা পাবেন এদেশের এবং সাগরপারের সিনেমা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বাংলা চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রব্যবসায় সম্পর্কেও অনেক কিছু জ্ঞাতব্য প্রথম সংকলনটিতে দেখা গেল।

কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু

সুন্দরম্ নাট্যগোষ্ঠীর নতুন নাট্যনিবেদন 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু'। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর এই নাটকটি [illegible] প্রেম ও তার সমস্যার চিত্র। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ২॥টায় [illegible] মঞ্চস্থ হবে বিশ্বরূপায়। অভিনয়ে থাকবেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী, প্রদীপ সেন, তাপস চন্দ, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, দুলাল ঘোষ, বেলা সরকার ও মমতা চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনা ও সংগীত পরিচালনা স্বয়ং নাট্যকারের।

রবিরূপ-এর নাট্যাভিনয়

আগামী মঙ্গলবার ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে রবিরূপের সভ্যবৃন্দ অমর গঙ্গোপাধ্যায় "জীবন যৌবন" ও মনোজ মিত্রের "বেকার বিদ্যালঙ্কার" নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তমাল লাহিড়ী।

পাঠকের চোখে

মণ্টগোমেরি ক্লিফট

অভিনেতা 'মণ্টি ক্লিফট' সম্পর্কে যে ছোট্ট সংবাদটি ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ভুল থেকে গেছে। "'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য মণ্টগোমেরি ক্লিফট অস্কার পেয়েছিলেন"—এ কথা ঠিক নয়। আমার মত অনেকেই সে ছবি দেখেছিলেন এবং প্রাইভেট প্রিউইটের ভূমিকায় মণ্টির অভিনয়ের তুলনা কেউ খুঁজে পান নি। তাঁর নামও অস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছিল। কিন্তু পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে তাঁর বদলে অসকার পেয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা, 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি' ছবিতেই অভিনয় করে। অধিকাংশ সময় তাঁকে মণ্টিরই সঙ্গে অভিনয় করতে হয়েছিল। এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য আর একটি অস্কার পেয়েছিলেন ডোনা রীড। তাঁরও ছিল পার্শ্বচরিত্র।

আর এক কথা। ঐ সংবাদেরই শেষে আছে—"'এ প্লেস ইন দি সান' ছবিতে তিনি এলিজাবেথ টেলরের সহশিল্পী ছিলেন"। এলিজাবেথ টেলরের সহশিল্পী হওয়া যদি সম্মানের দ্যোতক হয় তা হলেও বলব এ তথ্য আংশিক। মণ্টগোমেরি ক্লিফট এলিজাবেথ টেলরের সঙ্গে আরও দুটি ছবি—'রেনট্রি কাউণ্টি' ও 'সাডেনলি লাস্ট সামার'-এ অভিনয় করেছিলেন। মণ্টি তাঁর সর্বাধুনিক ছবিতে এলিজাবেথ টেলরেরই সঙ্গে নামবেন স্থির করেছিলেন—যে ছবির নাম 'রিফ্লেকশনস ইন এ গোলডেন আই'। কিন্তু তার আগেই শিল্পীর মৃত্যু ঘটল।

এ কথাও বলা দরকার যে, এলিজাবেথ টেলরের চাইতে অনেক বেশী জনপ্রিয় অভিনেত্রী (যেমন ক্যাথারিন হেপবার্ন, অলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যাণ্ড ও জেনিফার জোনস)-এর সঙ্গেও অভিনয় করেছিলেন মণ্টগোমারি ক্লিফট।

তরুণকুমার মিত্র
কলিকাতা-৬।

"বালিকা বধূ" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়
ফটো—বরুণ

অরণ্যদেব ✱ লী ফক

নদীস্রোতে ভাসতে ভাসতে এখান থেকে বেরিয়ে যাব? কী করে তা সম্ভব? যা গরম জলে গায়ের চামড়া ঝলসে যাবে।
একটা ভেলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে কী দিয়ে ভেলা বানাই।

আসুন, একটা উপায় বের করেছি।

আবার মাটি কাঁপছে।... ও কী করছেন আপনি?
এই হেলিকপ্টারকেই ভেলা বানাব। দেরি করা চলবে না। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে যেতে পারে।

ইঞ্জিনটা খুলে ভেলায় লাগাতে হয়েছে। এই ছুরি দিয়ে দৈত্যের কাজ চলছে।
মানুষটির শরীরে যেন শত হাতির বল!

মাটি ভীষণ কাঁপছে। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না।
অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে। কীটপতঙ্গ আর পাখিরা তাই পালাচ্ছে।
3/27

বোমারু-বিমানের মত ভোমরা!
গোঁ-ও-ও-ও
!

মাটি কাঁপছে! কীটপতঙ্গের দল অস্থির হয়ে উঠেছে!
কিছু একটা ঘটতে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই!
আশাকরি তার আগেই আমরা বেরিয়ে যেতে পারব!

গুহার গর্ত দিয়ে যাওয়া যাবে তো?
যাবে, কিন্তু তার আগেই না বিপর্যয় ঘটে।
অগ্ন্যুৎপাত যদি শুরু হয়, লাভাস্রোতের নীচে সহজে চাপা পড়ব আমরা।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা-শ্রমিক ধর্মঘট এই সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়ঃ "বাগিচা-শ্রমিকদের আইন", মালিকদের পালন করাতে সরকারের ব্যর্থতাই নাকি এই ধর্মঘটের কারণ। চা-বাগান-শ্রমিক সমিতির কো-অরডিনেশন কমিটির আহ্বানে ২২ আগস্ট উত্তর-বঙ্গের অধিকাংশ চা-বাগানেই শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘটের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন নিরুপদ্রব ছিল। প্রকাশঃ আই এন টি ইউ সি পরিচালিত বাগিচা-শ্রমিক-দের জাতীয় ইউনিয়নও ইতিমধ্যে শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। মাঝে মাঝে দু' একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর এ কয়দিনে পাওয়া যায় নি। কিন্তু ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে দারজিলিং-এর কাছে তুসুং চা-বাগানে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিস তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ে। তার ফলে একজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। ২৬ আগস্ট তরাই অঞ্চলের এক চা-বাগানে দুই দল শ্রমিকের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৪০জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। বর্তমানে ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ধর্মঘট মীমাংসার আলোচনা শুরু হয়েছে। তুং সুং চা-বাগানে পুলিসের গুলি চালনার প্রতিবাদে সম্মিলিত বামফ্রন্ট দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশী সংবাদ

২২শে আগস্ট—পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটি ১ কোটি টাকার ইস্পাতঘটিত ব্যাপারে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি দিয়ে তদন্ত করানোর সুপারিশ করেন। আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই সুপারিশ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটির রিপোরটের বিষয়বস্তু আমিনচাঁদ পিয়ারে-লাল কোমপানি ও তার অন্য সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইস্পাতঘটিত লেনদেন।

মারকিন প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীম্যাকনামারার সাম্প্রতিক এক বিবৃতি সম্পর্কে আজ লোকসভায় সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পায়। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ মূলত হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই তার অবসান ঘটে।

২৩ আগস্ট—কেন্দ্রীয় তদন্ত বুরো হায়দরা-বাদের একটি সরকারী শিল্প সংস্থার সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের বাড়িতে হানা দিয়ে মোট আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করেছে। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে টেনিস কোর্ট সহ একটি বাড়ি রয়েছে। সরকারীভাবে এই সংবাদ সমর্থিত।

সরকারী হিসাব কমিটি জানিয়েছেন যে, লৌহ ও ইস্পাত মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব এস ভূত-লিঙ্গম সম্বন্ধে তাঁরা আগে যে মন্তব্য করে-ছিলেন তা সংশোধন করার কোনও কারণ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। শ্রীভূতলিঙ্গম সম্বন্ধে তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি মেসার্স রামকৃষ্ণ কুলবন্ত রায়কে নিয়মবহির্ভূতভাবে এক কোটিরও বেশী টাকার আমদানী লাইসেনস দেওয়ার "ভুলটা নীরবে মেনে নিয়েছেন" এবং এই ত্রুটি সম্বন্ধে তদন্ত করার ব্যাপারে লৌহ ও ইস্পাত দপ্তরের "সুস্পষ্ট গাফিলতি" পরিলক্ষিত হয়েছে।

২৪ আগস্ট—লাঠি, গুলিচালনা, পুলিসী অত্যাচার, নির্যাতন ও রক্তপাতের জবাব চেয়ে বিরোধী সদস্যরা আজ রাজ্য বিধান সভায় সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। ঘাটাল, মেদিনীপুর ও দুর্গাপুরে সম্প্রতিক পুলিসী অত্যাচার সম্পর্কে সরকারকে ধিক্কার দিয়ে বিরোধী সদস্যরা একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

এস এস পি সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে কর্তৃক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দের বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন নিয়ে লোকসভায় তুমুল উত্তেজনা, তীব্র বাদানুবাদ, প্রচণ্ড হট্টগোল কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যের সভাকক্ষ ত্যাগ, স্পীকার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য—অদ্যকার লোক-সভার মোটামুটি চিত্র।

২৫ আগস্ট—উত্তরবঙ্গে একটি চা-বাগিচায় পুলিসের গুলিচালনা প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহারের একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তুমুল হট্টগোল বেধে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে কংগ্রেস ও বিরোধী দলের কিছু সদস্যের মধ্যে প্রবল বাক-বিতণ্ডা ও কটূক্তি বিনিময়ের পর শ্রী নাহার তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করে নেন এবং এর পর সভা-কক্ষের আবহাওয়া শান্ত হয়।

আজ বোমবাইয়ে ও শহরতলিতে বন্ধ শান্তিপূর্ণ থাকলেও বোমবাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে পৌর পিতারা বন্ধ প্রসঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়, এমন কি হাতাহাতিতেও পৌঁছেছিলেন।

২৬ আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ উত্থাপিত একটি বেসরকারী প্রস্তাবে রাজ্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক এবং স্কুল-কলেজের অশিক্ষক কর্মীদের প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন ও ভাতা দেওয়ার দাবি ওঠে। আড়াই ঘণ্টা উত্তপ্ত আলোচনার পর প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়।

আনুগত্যে আস্থা রাখা যায় না এমন লোকের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্তের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার জন্য আজ লোকসভায় উভয় পক্ষের সদস্যরাই দাবি জানান। তাঁরা বলেন, ভারতের পরমাণু বোমা তৈরি করা উচিত। কয়েকজন সদস্য ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেন।

২৭ আগস্ট—বোমবাই প্রদেশ কংগ্রে[illegible] সভাপতি শ্রী পি জি খের, দুজন মন্ত্রী শ্রীশা[illegible] লাল শাহ এবং শ্রীহোমি জে এইচ তলোয়ার সহ মহারাষ্ট্র বিধানসভার ষোলজন সদস্য এ[illegible] বিধান পরিষদের দুজন সদস্য আজ পদত্[illegible] করেন। ২৫ আগস্ট 'বোমবাই বন্ধ' দিবসে জ[illegible] সাধারণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীদের নিরাপত্ত[illegible] ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবা[illegible] এঁরা পদত্যাগ করেন।

সরকারী হিসাব কমিটির ৫০তম রিপোর[illegible] ইস্পাতঘটিত সর্বপ্রকার লেনদেন তদন্তের জ[illegible] যে কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছিলেন, প্রধান[illegible] মন্ত্রী এই সুপারিশ মেনে নিয়ে আজ রাজ্যসভা[illegible] তদন্ত কমিটির কথা ঘোষণা করেছেন।

২৮ আগস্ট—আজ বিকালে ময়দানে এ[illegible] বিরাট জনসভায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীজম্বুবন্ত রাও ধোটে বলেন, কংগ্রেসকে শিক্ষা দেওয়ার জন[illegible] তাঁদের শেষ পর্যন্ত 'ভারত বন্ধে'র আহ্বা[illegible] জানাতে হবে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস সারা ভারত[illegible] এই আহ্বানে সাড়া দেবে এবং আন্দোলনের চাপেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি খাদ্য ও[illegible] অন্যান্য বিষয়ে জনবিরোধী নীতি পরিবর্তনে[illegible] বাধ্য হবে।

বিদেশী সংবাদ

২২ আগস্ট—ইনদোনেশিয়ার সামরিক নেতারা আজ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, মালয়ে-শিয়ার সঙ্গে বুঝাপড়ায় উপনীত হবার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রেসিডেনট সোকারনোর বাধাতে তার কোন নড়চড় হবে না।

২৩ আগস্ট—ভিয়েতকংরা আজ সায়গন নদীতে একটা মার্কিন মালবাহী জাহাজ মাইনের সাহায্যে ডুবিয়ে দিলে এই ৭০ মাইল দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ পথে একমাত্র জরুরী প্রয়োজনের পরিবহণ ছাড়া আর কিছু চলাচল করতে পারছে না।

২৪ আগস্ট—জাপানের সানকেই শিমবুন পত্রিকায় আজ বলা হয় যে, চীনের তরুণ সংগঠন 'রেড গার্ডস' সেখানকার সব অ-কমিউনিসট দলকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে স্বেচ্ছায় বিল[illegible] হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। লাল চীনে ক[illegible]নিসট দল ছাড়াও নাকি আটটি ছোট রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এখনও আছে।

২৫ আগস্ট—সীমান্তের অপরদিক থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে যে, কুমিল্লা জেলার ময়নামতী সেনাশিবিরে কয়েকজন চীনা অফিসার পূর্ব পাকিস্তানের মুজাহিদ ও আনসারদের গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষা দিচ্ছেন।

২৬ আগস্ট—পিকিং-এ রুশ দূতাবাসের সামনে চীনা রেড গারডরা রুশ কূটনীতিক-দিগকে বার-কয়েক তাঁদের গাড়ি থেকে নামতে ও মাও সে-তুং-এর এক বিরাট প্রতিকৃতির সামনে হেঁটে যেতে বাধ্য করে। আজ প্রাগ বেতারে এই খবর জানান হয়।

২৭ আগস্ট—দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে বলি-দ্বীপের পূর্বদিকে ইনদোনেশিয়ার লম্বক দ্বীপে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতে প্রায় অর্ধলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে—ক্যাথলিক পত্রিকা সম্পাস আজ এই সংবাদ প্রকাশ করে। যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষুধার তাড়নায় সমুদ্রের ঘাস খাচ্ছে।

২৮ আগস্ট—এক সংবাদে প্রকাশঃ স্বাস্থ্যের কারণে ময়মনসিংহ জেল হতে 'মহারাজ' নামে সুপরিচিত বর্ষীয়ান বিপ্লবী নেতা শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিয়েছেন। এই অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা বৃটিশ শাসনের আমলে ৩০ বছর জেলে কাটিয়েছেন।

সূচীপত্র

পণ্ডস
ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার
POND'S
আপনাকে দেবে
ফুলের
মতো
রমণীয় মুখশ্রী
পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার সারা মুখে ফোটায় সুষম লাবণ্য ··ছোটখাট খুঁতগুলো আড়াল করে···এবং কোথাও দেবড়ে থাকে না! আপনার স্বাভাবিক মুখের রঙ আরো মনোরম করে তুলতে চমৎকার রকমারি রঙে পাবেন।
চীজ্ব্রো-পণ্ড্স ইন্ক
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

প্রচ্ছদ : শ্রীবলেন মুখার্জী

একখানি অসামান্য নাট্যগ্রন্থের প্রকাশ

"তপস্বী ও তরঙ্গিণী" একটি চার অঙ্কের দৃশ্যকাব্য। এক অপাপবিদ্ধ তরুণ ঋষিকুমার এবং স্বর্ণপ্রতিমা পরম কলাবতী এক বারাঙ্গনার পুরাণোক্ত একটি প্রণয়-কাহিনীকে স্বনামধন্য কবি বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে এক অসামান্য শিল্পরূপ দান করেছেন; সঞ্চার করেছেন এতে আধুনিক মানুষের মানসত্তা ও মর্মবেদনা। এ নাটকের চরিত্রেরা যেন পুরাকালের হয়েও, সমকালের—সর্বকালের।

লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ, দুটি নরনারী, কেমন করে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল—নাটকটির মূল বিষয় হল এই। এক পরম মুহূর্তে একই সংগে জেগে উঠেছিল বহুবল্লভা নায়িকার হৃদয় এবং তপস্বী নায়কের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হয়েছিল পতন আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করেছিল রোমান্টিক প্রেম। তারপর বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেমন করে ঘটেছিল নায়ক-নায়িকার উদ্বর্তন, কেমন করে তাদের উপলব্ধ হয়েছিল কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা, এ নাটকে এ যুগের অগ্রণী কবি তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিছুদিন আগে এ নাটকটি "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় পাঠকমহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। এখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। দাম ৩·০০

তপস্বী ও তরঙ্গিণী ॥ বুদ্ধদেব বসু

প্রথম প্রকাশের অনতিকাল মধ্যেই দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত

রমাপদ চৌধুরীর অধুনাতম উপন্যাস

পরাজিত সম্রাট ৪·০০

এই লেখকের আর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস

বনপলাশির পদাবলী ৮·৫০

দু'হারা ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী

গত পূজায় সৈয়দ মুজতবা আলী অনেকগুলি নাতিদীর্ঘ গল্প ও রম্যরচনা লেখেন। "দু'হারা" নামে বড়গল্পটি সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গ্রন্থটিতে সেই "দু'হারা" গল্পটি এবং আরও বারটি সুনির্বাচিত গল্প ও রম্যরচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল: হিটলারের শেষ দশ দিবস; প্রেমের প্রথম ভাগ (a la Paris); মদ্যপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা; শ্রীচরণেষু; পুচ্ছ (প্র)দর্শন; নটরাজনের একলব্য; বুড়োবুড়ী; কোষ্ঠী বিচার; একটি অনমিত নাম; বনবিহারী মুখোপাধ্যায়; অদৃষ্টের রঙ্গরস; দ্বিজ; আধুনিকের আত্মহত্যা। সৈয়দ মুজতবা আলীর আর কোনও সংকলন-গ্রন্থে এতাবৎ এতগুলি বাছা বাছা রচনার সমাবেশ হয়নি। সম্প্রতি প্রকাশিত। দাম ৫·০০

প্রেম ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী

একটি বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ "প্রেম" একটি পূর্ণযৌবনবতী বিবাহিতা মেয়ের উদ্দাম অবৈধ প্রেমের কাহিনী। এটির অনুবাদ করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। সতরোটি পূর্ণপৃষ্ঠা ইলাস্ট্রেশন-শোভিত। তৃতীয় মুদ্রণ। দাম ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

দেশ
৩৩ বর্ষ ॥ ৪৫ সংখ্যা
শনিবার ২৪ ভাদ্র ১৩৭৩

সোনার হাসি

আগের মতন গিনি সোনার গহনা আবার পরা যাবে শুনে মেয়েদের মুখে নাকি হাসি ফুটেছে। এই হাসি এতদিন চাপা ছিল, চোদ্দ ক্যারেটের মতন মেড়মেড়ে, এবার তাতে বাইশ ক্যারেটের জ্যোতি ঠিকরোবে। আসলে এসব ওপর ওপর: সোনার চটককে আমরা যতই কেননা কমাবার চেষ্টা করে থাকি, সোনা সোনাই ছিল, সাধারণে তা জানেন। শত বিধিনিষেধ সত্ত্বেও মনে হয় না কোনো বাঙালীবাড়ির মেয়ের বিয়ে চোদ্দ ক্যারেটে সারা হয়েছে। যা হয়েছে তা গোপনে, লুকিয়ে চুরিয়ে, ক্ষমতা যাদের ছিল তারা স্ত্রীকন্যাকে গিনি সোনাতেই সাজাতে পেরেছে। লাভের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় পঁচিশজন এবং সারা ভারতে দুশ জন স্বর্ণশিল্পী আত্মঘাতী হয়েছে। হয়ত আরও কিছু বেশী মারা গেছে, যা আমরা জানি না। আর এই তেতাল্লিশ মাসের ডামাডোলে সোনার দর ভরি প্রতি তলায় তলায় প্রায় দুশো টাকায় গিয়ে ঠেকেছিল। লাভ-লোকসানের হিসেব কষলে কোথায় যে আমরা লাভবান হয়েছি তা বুঝে ওঠা মুশকিল।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, শ্রীমোরারজী দেশাই যখন স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে যুক্তি তুলেছিলেন (তিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হয়) তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। অন্যান্য, বিশেষ করে ইয়োরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে দেশের সোনার বেশির ভাগটাই থাকে রাষ্ট্রের হাতে, সরকার তাতে উপকৃত হন। আমাদের দেশে সোনার বেশীর ভাগই জনসাধারণের হাতে, এই সোনা সরকার কাজে লাগাতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সোনার মূল্য যা, আমাদের এখানে তার তিন গুণ; ফলে সোনার চোরাই চালান এখানে ক্রমশই ফেঁপে উঠেছিল, সরকারী হিসেবে এই চোরাই চালানের পরিমাণ ছিল বছরে চল্লিশ কোটি টাকার মতন। বৈদেশিক মুদ্রার এই অপচয় যে কোনো সরকারের পক্ষেই উদ্বেগের বিষয়। তৃতীয়ত, এদেশে যারা কালোবাজারী করে স্ফীত হয়ে উঠছিল তারা কালো টাকা লুকোতে সোনায় লগ্নী করত, সোনার বাট, সোনার তাল কিনে রাখত; সোনার চোরাই চালানেও উদাম জোগাত। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির উদ্দেশ্য ছিল, বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ির ফলে যাতে বাধ্য হয়ে মানুষে সোনার দিক থেকে মুখ ফেরায়। কার্যক্ষেত্রে যা হয়েছে তাতে আমাদের মুখ বিন্দুমাত্র সোনা থেকে ফেরেনি। উপরন্ত তার প্রতি মোহ যেন আরও বেড়ে গেছে, মর্যাদাও বোধ হয়। দাম বাড়লেই কিছুটা মর্যাদা বাড়ে।

আপাতত ভারত সরকার যা সিদ্ধান্ত করেছেন তাতে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল হয়ে যায়নি, সংশোধন হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ স্বর্ণালঙ্কার তৈরির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা বাতিল হয়েছে, চোদ্দর বদলে গিনি সোনায় (২২ ক্যারেটে) স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করা যাবে এই মাত্র। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি সংশ্লিষ্ট সংশোধন থাকবে, যা এক্ষেত্রে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

যেসব স্বর্ণকার এতদিন বিরস মুখে ও অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ছিলেন, বারে বারে আন্দোলন করছিলেন তাঁদের রুজি রোজগারের পথ আবার উন্মুক্ত হল, এটা সুখের কথা। কিন্তু সরকারী ঘোষণা এমন জটিল যে এঁরা বুঝতে পারছেন না—গহনা তৈরির সোনাটা কোথা থেকে আসবে? কে দেবে সোনা?

সোনা কোথা থেকে আসবে সে সম্পর্কে এখনও সবাই অন্ধকারে আছেন। সরকারী ঘোষণায় এক জায়গায় অবশ্য বলা হয়েছে যে, যাদের কাছে সোনার বাট, পিন্ড ও পাত ইত্যাদি আছে তা সরকার নিষিদ্ধ করতে চান, কাজেই হয় সেই সোনা স্বর্ণালঙ্কার নির্মাতাদের কাছে বিক্রী করতে হবে, না হয় গহনা গড়িয়ে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা স্বর্ণকারদের হাতে সোনা বিশেষ আসবে বলে মনে হয় না।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে নেতাদের মধ্যে যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় আলোচ্য বিধিটির সমর্থক বিশেষ আর কেউ নেই। কেউ বলছেন, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, আদেশটি তুলে নেওয়া হোক; কারও অভিমত এই যে, উক্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশের ফলে সরকারের তিরিশ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে, এই টাকা স্বর্ণশিল্পীদের কাছ থেকে আয়কর বাবদ আসত। কেউ কেউ চান, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশটি একেবারে যদি বাতিল করা নাও হয় তবু যেন আরও শিথিল করা হয়।

সোনার ভবিষ্যৎ এদেশে কি তা বলা সম্ভব নয়, তবে এইমাত্র বলা যায়, গত তেতাল্লিশ মাস যাদের লুকিয়ে চুরিয়ে সোনার গহনা গড়াতে হয়েছে, তারা এবার নিশ্চিন্ত।

Saturday 10 Sept. 1966

শান্তির প্রশ্নে গভীরে যেতে হবে

কেন্দ্রীয় সরকার নাকি রাজ্য সরকারগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে পাকিস্তান ও চীনের একযোগে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে। কিছু দিন ধরে কাশ্মীর ঘেঁষে পাকিস্তানী সৈন্য-সমাবেশের খবর মাঝে মাঝে কাগজে বেরচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানেও পাকিস্তানী সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির কথা শোনা যাচ্ছে। তার সংগে চৈনিক সহযোগিতার পরিমাণ কতখানি সে সম্বন্ধে নানা রকম আন্দাজী খবরও মাঝে মাঝে প্রচারিত হচ্ছে। ঠিক এই সময়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান একটি "পাকিস্তান প্রতিরক্ষা দিবস" প্রতিপালনের ব্যবস্থাও করেছেন। সব মিলে একটা সংকট আসন্ন এই ধরনের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে সত্যিকারের বিপদ আছে, সেখানে "সব ঝুটা হ্যায়" বলে নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা মরণ ডেকে আনার সামিল। কিন্তু বিপদ যদি থাকে তবে তার প্রকৃত রূপটা না জানলে তার প্রতিবিধানের সফল চেষ্টা সম্ভব নয়।

ছোটো-বড়ো সকল দেশের পক্ষেই যুদ্ধ একটা বিপদ। সেই বিপদ আরো বেশি হয় যদি যুদ্ধে নামতে বাধ্য হবার পরেও যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো স্থির ধারণা না থাকে বা কোনো ভুল এবং অদূরদর্শী ধারণা থাকে। আবার যুদ্ধের বিপদের প্রায় সমতুল্য আর-একটা বিপদ আছে, সেটা হলো, যুদ্ধের আগেই যুদ্ধের ভয়ে মনোবল ভঙ্গ। মনোবল ভঙ্গ করতে পারলে যুদ্ধ না করেও প্রতিপক্ষ তার অভীষ্ট লাভ করতে পারবে। যুদ্ধের ভঙ্গী দেখেই যদি কোনো দেশ ভড়কে যায় তবে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না।

গত বছর পাকিস্তান যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল কিন্তু জিততে পারেনি, তার অভীষ্ট লাভ হয়নি। তবে কোনো কিছুই লাভ হয়নি তা নয়। প্রথমত, পাকিস্তান প্রমাণ করেছে যে, সে বে-পরোয়া। দ্বিতীয়ত, ভারতের চোখে যেটা জাজ্বল্য অন্যায় আক্রমণ, সেই অপরাধ করা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে কূটনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তানের কিছু ক্ষতি হয়নি। অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কার্যত ভারতবর্ষ কারো বিশেষ কোনো সহানুভূতি পায়নি। যারা পাক-ভারত যুদ্ধকে অবাঞ্ছনীয় বলে ঘোষণা করেছে এবং যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করেছে তারাও পাকিস্তানকে দোষী বলে ঘোষণা করেনি। যুদ্ধে পাকিস্তানের আক্রমণকে ভারত প্রতিহত করেছে কিন্তু যুদ্ধ এমন জায়গায় এসে এবং এমনিভাবে বন্ধ হয়েছিল যাতে পাকিস্তানের পরাজয়ের অনুভূতি আসেনি, যদিও তার কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবার আশা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু সেই আশা ভারতবর্ষ নাকি করতে পারেনি। সেই জন্যে বলা যায় না যে, যুদ্ধে ভারতবর্ষ জিতেছে। যদি ভারতবর্ষ জিতত, তবে এক বছর যেতে না যেতেই পাকিস্তানের আবার যুদ্ধ করার তোড়জোড় এমনভাবে প্রকট হতে পারত না। যেটা আরো লক্ষ করার বিষয়—গত বছর যাঁরা যুদ্ধ থামাবার জন্য ব্যবস্থা দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউই এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের এই নূতন সামরিক তোড়জোড়ের প্রতিবাদে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি—না আমেরিকা, না ব্রিটেন, না সোভিয়েট ইউনিয়ন। হয়ত অবস্থাটা যুদ্ধের দিকে আর একটু এগোলে কিছু শোনা যাবে কিন্তু তখনও পাকিস্তানের প্রতি তিরস্কারবাক্য উচ্চারিত হবে বলে মনে হচ্ছে না, উভয় পক্ষকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হবার জন্য বলা হবে এবং সেই বলা এমন পরিপ্রেক্ষিতে হবে, যাতে পাকিস্তানের দাবির পক্ষে ভারতের উপর চাপ দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো মানে হবে না।

আর যুদ্ধের ভঙ্গী দেখিয়েই কাজ হাসিল যদি না হয় তবে পাকিস্তান যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। বাধিয়ে দেবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ, পাকিস্তান মনে করতে পারে যুদ্ধে তার কয়েকটি "মিত্র" আছে, ভারতবর্ষের কেউ নেই। চীন তার পক্ষে। বর্তমান অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার মিত্রতার বিশেষ কোনো মানে নেই কিন্তু আমেরিকা, ব্রিটেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি "নিরপেক্ষ" থাকে তবে তুর্কী ও ইরানের খিড়কির দরজা দিয়ে অনেক সাহায্য আসতে পারে, আসবে। সমস্ত পৃথিবীর মৌখিক "না, না" সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগালের অত্যাচারী নীতির সামরিক এবং অর্থনৈতিক শিরদাঁড়া এখনো ভাঙেনি। আরব রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে ভারতবর্ষ বড়জোর নিরপেক্ষতা আশা করতে পারে। ভারতবর্ষের কাছাকাছি অন্য রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধেও ওই একই কথা। ভিয়েৎনাম যুদ্ধও এক দিক দিয়ে পাকিস্তানের সুবিধা করে দিচ্ছে। আমেরিকা বা অন্য কোনো বৃহৎ রাষ্ট্র এই সময়ে অগ্রণী হয়ে পাক-ভারত বিবাদে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী হবে না। পাকিস্তান ভাবছে, সামরিক দিক থেকে ভারত যখন মিত্রহীন এবং অধিকাংশ দেশই নিরপেক্ষ থাকতে চায় এবং চীন ও আর

দু-একটি রাষ্ট্র তার সঙ্গে আছে যারা "পশ্চিমা" মালও খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকাতে পারবে তখন ভারতবর্ষকে কাবু করা কঠিন হবে না। অতএব পাকিস্তান ভাবছে এমন সুযোগ আর হবে না।

কোন্ কোন্ ভুলভ্রান্তির জন্য ভারতবর্ষ নিজেকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছে তার আলোচনায় এখন শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। কিসে এই পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় এখন সেইটাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। চরম দুর্দিনে সাহস মানেই দুঃসাহস। পাকিস্তান এবং চীনের এক-জোড় ভাঙার জন্য কারো কারো পরামর্শ হবে—এক পক্ষের খাঁই মিটিয়ে দেওয়া যাক্। আবার এর সঙ্গে ইডিওলজির যোগ হয়ে অবস্থাটা আরো জটিল করেছে। ভারতবর্ষে এমন দলও আছে, যারা চীনের কাছে হারাটাকে হার বলেই মনে করে না। আবার অন্য দিকে এমন উপদেষ্টাও আছেন, যাঁরা যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তানের কাছ থেকে "শান্তি" ক্রয় করতে প্রস্তুত; এঁদের কারো কারো মনের অন্তস্তলে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের ন্যায্যপক্ষের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ লুকিয়ে আছে।

আসলে এর কোনো পক্ষের উপদেশই দূরদর্শীর উপদেশ নয়, তাতে শান্তিও আসবে না, ভারত-বিরোধী পাক-চীন জোড়ও ভাঙবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের ক্ষুধা মিটলেই এই উপ-মহাদেশে শান্তি চিরস্থায়ী হবে এবং চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের গাটছড়া ছিঁড়ে যাবে, এরূপ আশার কোনো মূল্য নেই। অথচ এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি এবং চীনের সঙ্গে বিরোধের অবসান এ দুটোই ভারতের নীতির লক্ষ্য না হয়ে পারে না। কিন্তু কোনো গোঁজামিলের দ্বারা এর একটাও লাভ করা সম্ভব নয়। এই উপ-মহাদেশে দুটি রাষ্ট্র থাকতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এদের প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতির ভিন্ন ধারায় চলার সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকবে, যতদিন পর্যন্ত একে অপরের বিরুদ্ধে বাইরের কোনো শক্তির সঙ্গে যোগসাজস এবং ষড়যন্ত্র করার অবসর পাবে ততদিন পর্যন্ত এই উপ-মহাদেশে শান্তি আসবে না। কাশ্মীরের উপর শান্তি নির্ভর করছে না, শান্তির প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আরো গভীরে যেতে হবে।

চীনের সঙ্গে বিবাদের মূল উৎপাটন করার প্রশ্নও "সীমানার বিবাদ" মেটানোর প্রশ্ন নয়। এই উপমহাদেশ যদি প্রকৃত পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে, ভারতবর্ষ যদি কোনো বিদেশী প্রভাবের "অঞ্চল" নয়, এটা যদি সুস্পষ্ট এবং সন্দেহের অতীত সত্য রূপে দেখা দেয় তবে চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বতার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা সহজ হবে। আত্মনির্ভরতা অর্জন করার আগে "সীমানা বিবাদ মিটিয়ে ফেলে" চীনের বন্ধুত্ব অর্জন করার চেষ্টার কোনো মানে নেই, তাতে চীনের গ্রাস করার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে মাত্র, চীনের শ্রদ্ধাও পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষ চীনা বিরোধী-শক্তির ক্রীড়নক হতে পারে, চীনের যদি এ রকম সন্দেহ থাকে তবে তারও নিরসন হবে না। আত্মনির্ভরশীল স্বাধীনতাই চীনের স্থায়ী সম্ভাব স্থাপনের একমাত্র পথ। তেমনি এই উপমহাদেশে যদি শান্তি আনতে হয় তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, এখানে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রতিরক্ষা বা বৈদেশিক নীতির স্থান থাকতে পারে না। কেবল পাকিস্তানকে নয়, অন্য সকলকেও বুঝিয়ে দিতে হবে, ভারতবর্ষকে যদি যুদ্ধে নামতে হয় তবে এই লক্ষ্যলাভ না হওয়া পর্যন্ত সে থামবে না। সাবধানীরা একে দুঃসাহস বলবেন। আগেই বলা হয়েছে দুর্দিনে সত্যিকারের সাহস মানেই দুঃসাহস।

নৌকাডুবি।
জয়ন্তী শিপিং কোং
রেড্ডী
শ্রীচ্যবন
বলেছেন ভারত
সীমান্তে পাকিস্তান
ক্রমাগত সৈন্য
সমাবেশ করে
চলেছে।
অর্ডর থোড়া আগে
বাড়ো।
উত্তর প্রদেশের রাজনীতিক ঘটনাপ্রবাহ
কুটিল আবর্ত্ত সৃষ্টি করে চলেছে।
সবাই বুঝে গেছে তারের খেলায়
সুচেত্রা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন।

'প্রতিরোধ'

অধ্যাপক এসে বিনা ভূমিকাতেই বললে, 'ত্রিশটা টাকা দাও, রেশন আনতে হবে, বাজার—'

'সেকি হে! তোমাদের স্কেল বাড়ল, তায় মাসের প্রথম—'

লোকটা চটে গেল : 'তুমি আজকাল থাকো কোথায়? ম্যাডাগাস্‌কারে, না মঙ্গলগ্রহে? নাকি খবরের কাগজ পড়াও ছেড়ে দিয়েছ? কলেজে কলেজে নন-টীচিং স্টাফ অবস্থান-ধর্মঘট করে বসে আছে—সেটাও জানা নেই বুঝি?'

'ওহো, তা-ও তো বটে। সেটা মিটবেনা?'

'মিটবে নিশ্চয়, কিন্তু আপাতত আমরা তো মারা যাচ্ছি। মাইনে পাওয়া গেলনা। ওদেরই বা কী দোষ দেব, যা জিনিসপত্রের দাম, সংসার চালাতে আমাদেরই দম আটকে আসছে। অগত্যা কলেজ-গেট অবরোধ—'

'অভাবের প্রতিরোধ?'

'যা ইচ্ছে ব্যাখ্যা করতে পারো। এখন চট করে টাকাটা দাও দেখি। কবে ফেরত দিতে পারব তা জানিনা, সেকথা আগেই কিন্তু জানিয়ে রাখছি।'

টাকা নিয়ে চলে গেল এবং আমি ব্যাজার হয়ে বসে রইলুম। অনিচ্ছায় ধার দিতে হলে কারোই মন-মেজাজ খুশী হয়ে ওঠেনা।

তখন মনে পড়ল, আমারও বাজারে যাওয়া দরকার। এর মধ্যেই গৃহিণীর কাছ থেকে বার তিনেক তাগাদা এসে গেছে। থলে হাতে নিয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়া গেল।

বাজারের মুখেই পরিচিত প্রতিবেশী। আমাকে দেখেই প্রীতিস্নিগ্ধ হাসিতে অভ্যর্থনা জানালেন।

'যাচ্ছেন—যান। কিন্তু মাছ পাবেন না।'

'কেন, মাছ আসেনি কিছু?'

'এসেছে মশাই। ইলিশ আছে, ভেট্‌কি আছে, আরো কী সব চুনো-চানাও আছে। কিন্তু দর মশাই ছ' টাকা থেকে আট টাকা। কিছুতেই নামাবেনা। আর পাড়ার ছেলেরাও গাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কাউকে কিনতে দেবে না। একজন কিনেছিল একটা ভেট্‌কি, তার থলে-টলে কেড়ে নিয়ে—'

'থাক, থাক, আর বলতে হবে না।'

অতএব মাছের ভাবনা মিটল। কিছু মসলা-পাতির দরকার ছিল সেই উদ্দেশ্যে পা বাড়ানো গেল।

'শুকনো লঙ্কা?'

'আট টাকা কিলো।'

উদাস চিত্তে বাড়ি ফিরে এলুম। কো-অপারেটিভ্‌ স্যানের কিঞ্চিৎ আলু-কুমড়ো পেঁয়াজ সঞ্চিত আছে— আজকের দিনযাত্রা তাতেই না হয় নির্বাহিত হবে।

অফিস ছুটি আছে, সুতরাং পরম নিশ্চিন্তে ইজি-চেয়ারটায় লম্বিত হওয়া গেল। এই সময় একটা ধর্মমূলক বই কাছে থাকলে ভালো হত, কিন্তু তার বদলে হাতে উঠে এল মোপাসাঁর এমন একটি সংগ্রহ—যার লেখাগুলোকে ফ্লোবেয়ারের বেয়াড়া শিষ্যও নিজের কোনো সংকলনে ঠাঁই দিতে সাহস পাননি। অতীব অস্বস্তিকর বই—অন্তত আমার এই মানসিক অবস্থার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়।

কিন্তু মোপাসাঁ থেকেই আমার চিন্তা আর এক খাতে ধাবিত হল। ইনি, জোলা এবং গঁকুরেরা এবং আরো অনেক শর্মা একদা নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নেমে পড়েছিলেন। এঁদের যিনি আদি

কলেজ বন্ধের
নির্ঘণ্ট
সোমবার
ভিয়েৎনাম দিবস
মঙ্গলবার
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-
-বিরোধী দিবস
বুধবার
বৃহ: মূল্যবৃদ্ধি রোধ দিবস
অধ্যাপক ধর্মঘট সমর্থনে
জনসভা
শুক্র
বিধান সভা অভিযান
শনি
শিক্ষা-সঙ্কোচন নীতির
প্রতিবাদে বিক্ষোভ

অফিসে ফাইল প্রতিরোধ

নাটের গুরু—মাদমোয়াজ্যাল মোপাঁসার সেই বিখ্যাত লেখকটি—তাঁর লাল কোট আর লম্বা দাড়ি নিয়ে রক্ষণশীলদের পিলে চমকে দিয়েছিলেন। প্রতিরোধ।

প্রতিরোধ ভালো—দরকার হলে সবাইকেই করতে হয়। শিল্পের অঙ্কন থেকে কলেজের গেট, কলেজের গেট থেকে মাছের বাজার (রীতিনীতির কথা বাদই দিচ্ছি)—কোথায় না প্রতিরোধের দরকার? কিন্তু আমি ভাবছি, ক'টা প্রতিরোধ চালিয়ে যাব?

মাছের বাজার থেকে মসলার দোকানে? ঝিঙে ঢ্যাঁড়শের দাম বাড়লে—সেখানে? দশ আনার সাবান নিঃশব্দে চৌদ্দ আনায় উঠতে থাকলে তার বিরুদ্ধে? সর্ষের তেল আবার ঊর্ধ্বায়মান—সেই দিকে? রেশন থেকে যে আশ্চর্য চাল পাওয়া গেছে এ-সপ্তাহে, তার প্রতিবাদে? দুর্বোধ্য টেলিফোন-বিলের দুঃসহ স্ফীতির মোকাবেলা করতে? অদ্বিতীয় কর্মনিপুণ কর্পোরেশনের ট্যাক্স-বৃদ্ধির বার্তাপ্রাপ্তির উত্তেজনায়? 'এ'-মার্কা ছবির প্রবেশার্থী অজাতগুম্ফদের রক্ষা করবার শুভ-প্রেরণায়? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

চেনা দোকান থেকে ধারে বই কিনি। এই সব ভাবনার অবসরে সেখান থেকে একটি চিঠি এল। গত মাস যে বিদেশী বইটি সেখান থেকে আহরণ করা গিয়েছিল, দেখলুম তার দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। ডি-ভ্যালুয়েশনের অঙ্ক কষে সে দামের হিসেব মেলে না।

প্রতিরোধ এ-সব জায়গাতেও করা উচিত—একেবারে 'হা-রে-রে-রে' ডাক ছেড়ে গিয়ে হানা দেওয়া দরকার। কিন্তু কত প্রতিরোধ আমি চালাতে পারি? আঠারো-উনিশ টাকায় যে জুতো বরাবর কিনে এসেছি, এই সেদিনও চব্বিশ টাকা মূল্যে তারই এক জোড়া কিনে কি আমার মনে হয়নি—যে এবার থেকে হয় হাওয়াই চটি নয় জন্মলব্ধ শূন্য শ্রীচরণই ভরসা?

চকিতে জ্ঞানের একটি দীপ্ত শিখা আমার মোহাচ্ছন্ন চিত্তলোক উদ্ভাসিত হল। সংসারে মানুষের এত দুঃখ-দুর্গতি ঝঞ্ঝাট কেন? 'এগো', অর্থাৎ 'অহং' হচ্ছে যত লাঞ্ছনার মূল। এই 'আমিত্বে' বোধটার জন্যেই আমরা 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হতে পারি না, শান্তি পাই না, পৃথিবীতে য গণ্ডগোল আর ঝামেলা পাকিয়ে তুলি। ইংরেজীতে ওই ক্যাপিটাল 'আই' হরফটা যত নষ্টের গোড়া।

মাছ খেতে কে চায়? আমার জিভ। সর্ষের তেল কার ভোজন এবং অঙ্গমর্দনে জন্যে? মদীয়। সাবান মেখে অমলি এবং সুরভিত হতে চায় কে? আমার এ কায়া। শুকনো লঙ্কার প্রয়োজনীয়ত কিসে? আমার ঝি বাট্না বাট্বে এ আমার স্ত্রী তা রান্নায় ব্যবহার করবেন। রেশনের কঙ্করিত পিণ্ডান্নে কে ক্রুদ্ধ কেন, আমি। বাজারে কিছু না পে কে গর্জন করেন? আমার স্ত্রী। চব্বি টাকার জুতো কার পাদপদ্মের জন্যে আর কার? বিদেশী বই পড়ে কো মূঢ়—

আর দরকার নেই, এতেই যথেষ্ট। 'অহমিতি অহমিতি জপতি সকামং' (জয়দে মার্জনা করবেন)—এই-ই হচ্ছে আম ট্র্যাজিডী। অতএব—সব প্রতিরোধে স কথা : নিজেকে প্রতিরোধ। যদি রুখ হয়, নিজেকেই রোখা দরকার। একেবা গোড়া ঘেঁষে কোপ পড়বে।

আমাদের যোগী-ঋষিরা অবশ্য তার জ নানা জটিল পন্থা বাত্লে দিয়েছেন। সে সব আমার পোষাবে না। আমাদের বাঙাল 'পঞ্চানন্দ' অন্ন সমস্যা তথা যাবতীয় বিশ্ব সমস্যা সমাধানের আর একটি সহজ রাস্ বলে দিয়েছিলেন—আপনাদের মনে থাক পারে।

কিন্তু বাইরের আকাশে শরতের মে ছিঁড়ে নীল আকাশ উঁকি দিয়েছে। আশ্চর্য এখনো সেটাকে ভালো লাগল!
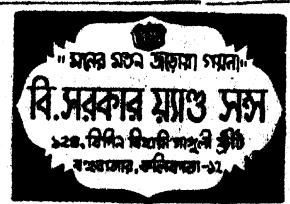
জুলাই-এ শরৎ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

জুলাই-এ নাচে শরৎ—
তিরোহিত বর্ষণ
ভেঙচি কাটে আকাশ।

ধানে শুভ মহরৎ
দেখল না এই সন,
আগামী সর্বনাশ।

পুঁতেছি অমল তাস,
তথাপি মেঘ যে নেই,
যদিও বর্ষাকাল।

হৃদয়ের নির্যাস
করুণা মুছে যেতেই-
নেমে কি আসে আকাল?

প্রবীণ নাড়েন মাথা,
নবীন বলেন : ধ্যুৎ—
সময়ের গালে হাত।

দেহলি ও ক'লকাতা
দোলান কে দেবদূত :
'আমি দোব খয়রাৎ।'

দূরে দূরে তল্লাটে
বাংলা কাঁদছে মাঠে,
শূন্যে বয় বাতাস।

ছায়ার মিছিল হাঁটে,
কালো ছায়া চৌকাঠে—
একটি ক্রোটোন কাশ।

মাধবীর জন্যে

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

আয়নার পাশে একটু অন্ধকার ছায়া এঁকে দাও।
ব্যথিত দৃশ্যের পট জুড়ে থাক চিত্রিত আঁধার।
দেয়ালের ছবিটাকে একটু সরাতে হবে ভাই।
ওটা নয়, এই ছবিটাকে।
জুলিয়েট জ্যোৎস্নার ভিতরে
রক্তের উদ্গ্রীব তৃষ্ণা রোমিও-র উষ্ণ ওষ্ঠাধরে।
ব্যাস, ব্যাস।
লাইটস্ বার্নিং।
মাধবী, আসুন।
একটা ক্লোজ-আপ নেব।
এখানে দাঁড়ান, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে প্লীজ।
মনিটার...
মাধবী বলুন—
'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?'
আরেকটু নির্জন স্বরে
যেন মনে হয়
ওষ্ঠ হতে উচ্চারিত কয়েকটি শীতল-বাক্য নয়,
মনে হবে সন্ধ্যাবেলা সারা ধরাতলে
অবসন্ন কুসুমেরা ঝরিতেছে বনবীথিতলে নীরব রোদনে।
মনে হবে নীরব রোদনে

যেন আপনি বলতে চান
মনে রেখো, মনে রেখো সখা
যেন কেহ কোনদিন মনে রাখে নাই
মনে আর রাখিবে না
কেহ আর ডাকিবে না কোনদিন জ্যোৎস্নার ভিতরে
রক্তের উদ্গ্রীব তৃষ্ণা কেহ আর মেলিবে না
উষ্ণ ওষ্ঠাধরে।

দৃষ্টি আরও নত হবে...
সম্মুখে কোথাও কোন দেখিবার মত দৃশ্য নাই।
সব দৃশ্য ঝরে গেছে বনবীথিতলে নীরব রোদনে
নিবন্ত ধূপের সাদা ছাই
রজনী-পোহানো কিছু মৃত গোলাপের দীর্ঘশ্বাস
হাঁ-করা নেকড়ের মুখে দগ্ধ সিগারেট
এইটুকু দৃশ্য শুধু পড়ে আছে কাঠের টেবিলে।
লাইটস্ বার্নিং।
মাধবী—মেক-আপ—আলো
এবার টেকিং।
মাধবী, নিশ্চয়ই মনে আছে সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকু
'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?'

কবিতার ভাষা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

॥ ২ ॥

কিন্তু কেন মালার্মে আর ভালেরীর মতো শক্তিমান কবিরা কাব্যের অর্থ-ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে কবিতার ভাষাকে অর্থের বাহন জ্ঞান না ক'রে রূপের আধার বলেই গণ্য করলেন? ভালেরী ঘোষণা করলেন যে, বিশ্বজগৎ বা পরম সত্তা বিষয়ে তাঁর এমন কোনো উপলব্ধি বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মায়নি, যা তিনি কবিতায় অভিব্যক্ত করতে চান: "আমি একজন শব্দের কারিগর মাত্র" ("I am nothing but an engineer manufacturing an artefact of words *")

কবিতা সম্বন্ধে এই অভিনব মনোভাবের উদ্ভব এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার উৎখাতের মধ্যে যে পারম্পর্য দেখা যায়, সেটা কাকতালীয় নয়, অন্তত অংশত কার্যকারণিক।

রেনেসাঁসের সময়ে, সবাই না হলেও বিদগ্ধজনেরা প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ে গভীর কৌতূহল, উৎসাহ ও অনুরাগ বোধ করতে আরম্ভ করেন। বলা উচিত পুনরায় আরম্ভ করেন, তাই ঐ যুগের নাম "রেনেসাঁস" বা পুনরুজ্জীবনের যুগ। দু' হাজার বছর আগে পেরিক্লিয়ান এথেন্সেও এমনি বা আরও প্রবল চিত্তের উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। তারপর, গ্রেকো-রোমান সভ্যতার পতনের পর, য়ুরোপীয় মানস রইল তমসাচ্ছন্ন, বিমূঢ়, নিঃঝুম হয়ে কয়েক শতাব্দী। দশম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ নামে অভিহিত। তখনও একপ্রকার চিত্তজাগরণ অবশ্যই ঘটেছিল, কিন্তু যাঁরা জাগলেন, তাঁরা মানুষ বা প্রকৃতির পানে চোখ মেলে চাইলেন না, মনকে একান্তভাবে নিবিষ্ট করলেন পারলৌকিক ঈশ্বরের চিন্তায় ও ধর্মশাস্ত্রালোচনায়। রেনেসাঁসের পর থেকে ঈশ্বরের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করল মানুষ এবং প্রকৃতি। অষ্টাদশ শতকের জোয়ার-ভাটা সত্ত্বেও এই মানবমুখিনতা ও প্রকৃতিপ্রিয়তা হয়ে দাঁড়াল য়ুরোপীয় চিত্তের স্থায়ী অলংকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই মনোভঙ্গীই রোমান্টিক রিভাইভালের নামে নতুন ক'রে এবং বলিষ্ঠতর হ'য়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তবে রোমান্টিকদের মনে মানুষ সম্বন্ধে যতই উচ্ছ্বাস থাক, তাঁরা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, স্বার্থপরতা, পরস্পর বিদ্বেষ বিষয়ে অনবহিত মোটেই ছিলেন না। কিন্তু এই সর্বব্যাপী দুঃখ ও পাপের চেতনা তাঁদের মানববিমুখ ক'রে তোলেনি। কীটসের মতো কেউ ভাবতেন জীবনের নিষ্করুণ পরীক্ষায় মানবাত্মা শুদ্ধ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; শেলীর মতো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মৃত্যু কল্পনা[illegible] করেছেন। কিন্তু মানুষকে, দুঃখী ও পাপী মানুষকে ভালবাসতেন তাঁরা সবাই; আর মানবীকৃত প্রকৃতিকে।

বাইরের জগৎ সম্বন্ধে যেখানে মনোভাব এতখানি ইতিবাচক ও রসগ্রাহী, তাঁরা স্বভাবতই কবিতার ভাষাকে স্বচ্ছ রাখতে চাইবেন, সেই ভাষার কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখাতে চাইবেন মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের অশেষ রূপবৈচিত্র্যের কেন্দ্রে অন্তর্গূঢ় সত্য, যা প্রাণধারণে ব্যস্ত, বিরূপ মানবের চোখে পড়ে না। কবিতার ভাষা একাধারে প্রকাশ করবে শিল্পী মনের অনন্য ভঙ্গিকে, এবং সেই মনোভঙ্গির বিশিষ্ট দর্পণে বিশ্বজগতের স্বরূপটি যেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তাকে। কবির মন এবং কবির দেখা জগৎ মিলিত হ'য়ে একটি অখণ্ড রূপ লাভ করবে তাঁর কাব্য-রচনায়। সে রচনা সবকিছুকে আড়াল ক'রে কেবল নিজের অতিরিক্ত চাকচি-

---

* প্রথম অংশের জন্য ওরা [illegible] 'দেশ' দ্রষ্টব্য।

কর্মকেই মূল্যমান ও মূল্যবান ক'রে দর্শকের দৃষ্টিকে ঐখানে আটকে রাখবে—এমন কথা তাঁরা কখনো ভাবতেই পারতেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং তার অনুকূল শিল্প-ভাবনায় বেশ বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিল। সেই পরিবর্তনের কারণ বহু-বিস্তৃত। একটি কারণ, একজন প্রতিভাদীপ্ত কিন্তু জীবন ও জগৎ-বিমুখ কবি—বোদলেয়ার। তাঁকে কাউন্টার-রোমান্টিক বলা হয়; কাউন্টার-রেনেসাঁস বললেও কিছু ভুল বলা হবে না। অন্যান্য কারণের কথা খুব সংক্ষেপে বলতে গেলেও নাম করতে হয় ডারুইন এবং মার্ক্সের। বহু কষ্টসাধ্য গবেষণার পর ডারুইন প্রতিপন্ন করলেন যে, মানুষ পতিত এনজেল নয়, দেবতার প্রতিচ্ছবি নয়, বৃহৎকায় বানর-জাতীয় কোনো জন্তুরই বংশধর। এর ফলে স্বভাবতই মানুষের দিব্য-গুণাবলির অপেক্ষা তার জান্তব বৃত্তিগুলিই অধিকতর প্রকট ও গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠল জ্ঞানী এবং শিল্পীর চেতনায়। অন্য দিকে, শিল্প-বিপ্লবের প্রথম ধাক্কা লেগে এবং ধনিক-তন্ত্র গ'ড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে (যেমন যেতে পারে তার প্রমাণ-[illegible]) সমস্ত সমাজজীবনে যে-চারিত্রনৈতিক দুর্নীতি এবং শ্রমিক শ্রেণীর যে-অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা দিয়েছিল, তার মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকলেন ঐতিহাসিক কার্ল মার্ক্স। দার্শনিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী মার্ক্স বোঝালেন যে, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, চারিত্র্য—সবেরই মূলে রয়েছে আর এসব কিছুকে চালিত করছে সত্যশিব-সুন্দরের কোনো মহান আদর্শ বা দৈবী প্রেরণা নয়, স্থূল অর্থনৈতিক স্বার্থ ও তজ্জনিত শ্রেণী-সংঘর্ষ। মানুষের এই উভয়বিধ জান্তব কদর্য রূপ দেখে অনেক কবির স্পর্শকাতর চিত্ত মানববিমুখ হ'য়ে উঠল।

প্রকৃতি সম্বন্ধে উৎসাহেও ভাটা পড়ল ভিন্ন কারণে, প্রাকৃত বিজ্ঞানের যুগান্তকারী উন্নতির ফলে। প্রকৃতির রহস্যের আবরণ একে একে ছিন্ন হ'তে লাগল। যে-সব প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনা বুদ্ধিকে প্রতিহত করত ব'লে বিস্ময়ের পুলক জাগিয়ে তুলত, এক প্রকার অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বা মরমিয়াভাবে কবি-চিত্ত ভরে দিত, সে-সব যাবতীয় ব্যাপার দেখা দিল জড় ও বৈদ্যুতিক শক্তির গোটাকতক গাণিতিক সূত্ররূপে। এই সূত্রগুলিকে হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে যার সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে চলেছে, সেই প্রকৃতিকে নিয়ে কি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মতো মিস্টিকভাবে বিভোর হওয়া যায়? কোলরিজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, যেহেতু কবির দেখা জগৎ বিজ্ঞানীর মাপ-জোখ-করা জগতের সঙ্গে আদৌ মিলছে না, তাই কবির জগৎ তার মনেরই ব্যাপার, বিজ্ঞানীর জগতের তুলনায় নিতান্ত অলীক:

> We in ourselves rejoice;
> And thence flow all that charms or ear or sight,
> All melodies the echoes of that voice
> All colours a suffusion from that light.

যে-প্রকৃতি বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় এবং যে-প্রকৃতি কবির আনন্দ ও বিস্ময়ের উৎস, এ দুই প্রকৃতিই যে একাধারে সত্য হতে পারে—এ কথাটা উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়নি। আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন ক'রে এই কথাটা বুঝেছিলেন তাঁর পরিণত বয়সের কবিতায়, আর কেনো কবি তেমন ক'রে বোঝেননি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, বিজ্ঞানের [illegible] লাগাক, তাই ব'লে বিজ্ঞানের সত্যের কাছে কবিতার সত্য [illegible] স্বীকার ক'রে [illegible] [illegible] বিজ্ঞানবাদের একচেটিয়া অধিকার [illegible]।

নিয়ে কবিতা রিচার্ডসের উপদেশ-অনুযায়ী নিজেকে অলীক কল্পনায় জাল-বোনায় বা সার্ত-এর পূর্বোক্ত কথামত অর্থহীন শব্দের ভোজবাজিতে পরিণত ক'রে সন্তুষ্ট থাকবে, এটা কবিতার পক্ষে অসহনীয় আত্মাবমাননা।

যাই হোক, মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে যখন কবিদের উদ্দীপনা নিভু নিভু, এমন সময়ে দেখা দিলেন বোদলেয়র। বললেন, মানুষের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—জীবনকে আর জগৎকে ভালবাসলে আমরা যাব শয়তানের দিকে; ঘৃণায় সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে হয়তো বা ভগবানের ঠিকানা খুঁজে পাব। তাঁর কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি; এখানে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, তাঁর শিষ্য—অনুশিষ্যরা—র‍্যাবো, মালার্মে, ভালেরীরা—উত্তরাধিকারসূত্রে পেলেন ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের মনোভঙ্গি। অথচ তাঁদের মনে বোদলেয়রের ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল না। বিশ্ব-জগৎকে, প্রকৃতিকে, মানুষকে যদি ঘৃণা-ভ'রে প্রত্যাখ্যান করা হয়, অথচ ভগবানের দিকে মনের জানালা বন্ধই থাকে, তা হ'লে কী নিয়ে মানুষ বাঁচবে? কবিতা নিয়ে। মালার্মে থেকে (প্রকৃতপক্ষে বোদলেয়র থেকে) য়েটস পর্যন্ত প্রায় সব প্রতিভাবান কবির মুখে এই একই বার্তা ঘোষিত হল—কবিতাই একমাত্র সত্য, আর-সব কিছু মিথ্যা, তুচ্ছ, পরিত্যাজ্য।১ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন, মনন, হৃদয়ানুভূতি ও কাব্যসৃষ্টি এ-বার্তার তীব্রতম প্রতিবাদ।

কবি যদি জগতের সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেনও, তবু তাঁর অন্তরের গোপন রহস্য তো রইলই, সেখানেই তাঁর কাব্য-সৃষ্টির উৎসের সন্ধান করবেন তিনি, সেখান থেকেই পাবেন সঞ্জীবনী শক্তি। কিন্তু অন্তর তো সত্তা নয় সত্তার আধার মাত্র—"The poet remains empty to himself if he does not fill himself with the universe, the poet knows himself only on the condition that things resound in him, and that in him, at a single awakening, they and he come forth together out of sleep." কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের মতো শোনায়,২ কিন্তু বলেছিলেন আধুনিক কালের কবিকে-মধ্য দার্শনিক-সমালোচক জাক মারিত্যাঁ। কবি ও কবিতা বিষয়ে এমন খাঁটি কথা খুব কমই শোনা গেছে, কিন্তু আধুনিক কবিরা এতে কান দিলেন না। প্রকৃতি ও মানুষকে যখন তাঁরা বহিষ্কৃত করলেন এবং ভগবানের ঐশীতম ছায়া খুঁজে পেলেন না অন্তস্তলে, তখন তাঁরা

১ Exclude, if you begin,
The real which is cheap
Its too sharp sense rubs thin
Your vague literature.
(Stephane Mallarme)

And therefore I have sailed
the seas and come
To the holy city of
Byzantium
. . . .
Once out of nature I shall
never take
My bodily form from any
natural thing.
(W. B. Yeats—Sailing to
Byzantium)

(২) "জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে-পরিমাণে আমার অতীত সেই পরিমাণে আমিই ছোটো।" —(সাহিত্য, পৃ ৭৫)

একেবারেই শূন্যবাদী হ'তে পারতেন, এবং শূন্যের মহিমা-কীর্তন করতে পারতেন মালার্মের মতো সাদা কাগজের শুচিতা কালি দিয়ে কলঙ্কিত না ক'রে। কিন্তু ভালেরী তাঁদের বাঁচালেন; দিগ্‌ব্যাপী শূন্যতায় তিনি দেখতে পেলেন একটি জ্যোতির্ময় রূপ। সে রূপ শব্দের। ঐ শব্দ স্বভাবতই হবে অমচ্ছ, এবং ঐ অনচ্ছ শব্দযোজনায় কবি রচনা করবেন একটি সুরম্য নিরালম্ব হর্ম্য। কবিতাই যখন একমাত্র সত্য, কবিতার ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ, তখন কবিতার ভাষা নিজেকে ছাড়া আর কাকে প্রকাশ করবে, কার রহস্য উন্মোচন করবে, কার ইঙ্গিত বহন করবে? পরমকে তো আর অপরমের, উত্তমকে তো আর অধমের সংকেত বা বাহন করা যায় না। কাজেই কবিতা আর সব কিছুকে আড়াল ক'রে নিজেই নিজের শব্দচ্ছটায় জ্যোতির্ময় হবে, আক্ষরিক অর্থে হবে স্বপ্রকাশ। সেকালের তান্ত্রিকদের যেমন ছিল শব-সাধনা, আজকের কবিদের তেমনি আছে শব্দ-সাধনা, এটাই তাঁদের আদি, অকৃত্রিম এবং অন্তিম সাধনা। কবিতার ঐন্দ্রজালিক শব্দ সম্বন্ধে সার্ত্র বলছেন: "its sonority, its masculine endings, its visual aspect compose for him a face of flesh." ঐ সুন্দর মুখের প্রেমে পড়েছেন আধুনিক কবিরা, আর কিছুই ভালবাসতে পারছেন না তাঁরা। এ বিশ্বজগতে ভালবাসার যোগ্য আর কিছুও হ'তে পারে, এমন কথা তাঁদের ধারণার মধ্যেই আসে না; "প্রথম দ্রষ্টা কবিদের রাজা, সত্য দেবতা" যিনি তিনি স্বয়ং ঘোষণা ক'রে গেছেন, প্রকৃতি নারী, সবই ঘৃণ্য। এই শব্দপ্রেমিক সম্প্রত্যাভিমানী কবিদের পক্ষে বিশ্বপ্রেমিক শাশ্বত কালের কবি রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা সহজ নয়।

বলা বাহুল্য, উপরের মন্তব্যগুলি যাবতীয় আধুনিক কবি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আধুনিক কবিতার দুটি প্রধান ধারার আলোচনাই আমার অভিপ্রেত ছিল। প্রথমটির মূলভাব—জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা; দ্বিতীয়টির মূলকথা—কবিতাকে ভাব ও অনুভবের বাহন জ্ঞান না ক'রে শব্দের রূপকল্প মনে করা। কোনো একজন কবির মধ্যে এ-দুটি লক্ষণ যোল কলায় ভাস্বর না হবারই কথা, তবু বোধ করি, ভালেরীই আধুনিক কাব্যরীতি ও মেজাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। বর্তমান শতাব্দীর অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য কবিদের উপর এই লক্ষণদ্বয়ের অল্পবিস্তর ছায়া পড়েছে, যেমন পড়েছে ১৯৩০-এর পর থেকে অধিকাংশ বাঙালী কবিদের উপর। হালের শক্তিমান কবিদের মধ্যে, ব্যতিক্রম অবশ্যই পাওয়া যাবে, পাশ্চাত্ত্যে এবং বাংলা দেশেও। আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা দিতে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ; এক হিসেবে যাঁরাই আধুনিক কালে নিজেদেরকে কবি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রতিভা ও সাধনার ন্যায্য-অধিকারে, তাঁরাই আধুনিক কবি—যুগলক্ষণবিশিষ্ট না হলেও। তবু কবিতার ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর যুগ-লক্ষণ বলতে আমি যা বুঝি, তারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি এ-বইয়ের প্রথম ও বর্তমান অধ্যায়ে।

মনে রাখা দরকার যে, বাংলা দেশে তিরিশের দশকে যাঁদের কবি-জন্ম, তাঁদের মধ্যে আধুনিকতার প্রকাশ ছিল সংযত ও সুষম, কারণ, তাঁদের লেখায় পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার ভারসাম্য রক্ষা করেছিল রবীন্দ্র-কাব্যধারার সুধী আত্মীকরণ। যে-কবিরা শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যেই আধুনিকতার লক্ষণ উগ্র। আমার বিবাদ তাঁদের সঙ্গেই। কারণ, তাঁদের কাব্যাদর্শ মৌলিকভাবে রবীন্দ্রবিরোধী। তাঁদের সমালোচনার একাগ্র লক্ষ রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে উৎখাত করা, অর্থাৎ আমার মতে, কবিতার শাশ্বত ধারাকে রুদ্ধ করা। এঁদের এক বৃহৎ অংশ অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কার্পণ্য করেন না, যেহেতু সে স্বীকৃতি ঐতিহাসিক, তাতে কালিদাস, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কন, মধুসূদন, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সকলেরই স্থান আছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর, বিশেষত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা গণ্য করেন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিবন্ধক।

'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়'

অতিজ্ঞাজনিত বিজ্ঞতা আসে ল্যাটে। তখন ওটা আর কোনো কাজে লাগে না। বিলকুল বেকার। কিরকম? প্রকৃতির নিয়ম : মাথায় বিপর্যয় টাক পড়ে যাওয়ার পর চিরুনি-প্রাপ্তি। ইরানী কবি একটু ঘুরিয়ে বলছেন : বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনায় দাঁত কিড়মিড় করছি? কিড়মিড় করার জন্য, হায়, দাঁতও যে আর নেই।

ল্যাটে বুঝলুম, মাতৃভাষা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর নিতান্তই যদি আরেকটি ভাষা শিখতে হয় তবে সেটি হবে, তোমার মাতৃভাষা যার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী সেইটি শেখা : বাঙলার বেলা সংস্কৃত, ফার্সীর বেলা আরবী, ফরাসীর বেলা লাতিন। তার বেশী ভাষার পিছনে ছুটোছুটি করা নিছক আহাম্মুখি। মাসান্তে যে দু'একখানা বিদেশী বই কিনবে, তার আর উপায় রইল না। কেন? —কলকাতাতে কি বিদেশী বই পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় বই কি, এন্তের অঢেল। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োও তো দিবারাত্রির গান গাইছে। মুশকিল শুধু, আপনার পছন্দের গান গায় না।

ইতিমধ্যে আমি দু'খানি চিঠি পেয়েছি। দুটি তরুণ আমার সদুপদেশ পাওয়ার পূর্বেই ফরাসী জর্মনে সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে। তাদের সামনে সমস্যা, এখন এগোয় কি প্রকারে? তারা থাকে মফস্বলে —কি করে বলি, কলকাতার কোনো কোনো লাইব্রেরির লেনডিং সেকশন আছে, তাদের

> **'পঞ্চতন্ত্র' লেখক বিশেষ কারণে দু-সপ্তাহের জন্য লেখা থেকে অবসর নিয়েছেন। পরবর্তী কিস্তি ৪৭ সংখ্যা থেকে আবার প্রকাশিত হবে।**

শরণাপন্ন হও, যখন জানি, কলকাতার খাস বাসিন্দার পক্ষেও কর্মটি সুকঠিন।

তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, এরা মফস্বলে বাস করে। তার একটা মস্ত সুবিধে, ইলেকট্রিকের উৎপাত সেখানে নেই, কিংবা নগণ্য। বেতার যন্ত্রটির পুরো ফায়দা সেখানে ওঠানো যায়। কলকাতাবাসীও অবশ্য খানিকটে পারবে।

উপস্থিত বেতার খুললেই শর্টওয়েভে পাবেন, ঝাঁক ঝাঁক করে আপন পরিচিতি জানাচ্ছেন চীন (চীন আমাদের অতি কাছে বলেই তাকে পাওয়া যায় হরবকৎ, কিন্তু আমাদের কাজে লাগে অত্যল্পই), রুশ, আমেরিকা (VOA—Voice of America), ব্রিটেন (BBC), এবং অস্ট্রেলিয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যেগুলো দরকার, যেমন ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালি সেগুলো জোরদার নয় এবং আমাদের উপকারার্থে তারা ব্রডকাস্ট করে অল্প সময়।

এই বেতারের সাহায্যে পুস্তকের অভাব খানিকটা পুষিয়ে নেওয়া যায়।

এর পূর্বে দু' একটি কথা অবতরণিকা হিসেবে বলে নেওয়া ভালো।

ভারতবর্ষে যে নিরক্ষরতা দ্রুত গতিতে লোপ পাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ এ নয় যে, গ্রামে গ্রামে আমরা পাঠশালা খুলতে পারছিনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার আসল কারণ, যারা পাঠশালা পাস করে বেরয় তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়—পড়বার জন্য বই খবরের কাগজের অভাবে। যে গ্রামে পঞ্চাশ বছর ধরে পাঠশালা আছে, সেখানে যে-কোনো সময়ে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, মাত্র যারা দু-এক বছর হল পাস করে বেরিয়েছে তারাই এখনো লিখতে পড়তে আঁক কষতে পারে ('থ্রী আর')= (রীডিং রাইটিং, রেকনিং)। বাদবাকিরা কিংবা তাদের অধিকাংশ পুনরায় নিরক্ষর হয়ে গিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বছর কুড়ি পূর্বে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ জোর প্রোপাগানডা-ক্যামপেন চালিয়েছিলুম; সুযোগ পেলে মৃত্যুর পূর্বে আরেকবার চালাবো—মা ফলেষু কদাচন মন্ত্র স্মরণ করে।

তাই বৎস, তুমি যে ফরাসী, জর্মন বা রুশ ভাষায় সার্টিফিকেট পেয়েছ, সেটা

উত্তম কর্ম', কিন্তু যেটুকু শিখেছ সেও ভুলে যাবে, ঐ গ্রামের পাড়ুয়ার মত, শুভঙ্করভাবে। তাই বলছিলেম, বেতার তোমাকে খানিকটে বাঁচাতে পারে।

তার পূর্বে কিন্তু একটি ভেরি ভেরি ইম্পরট্যেন্ট তত্ত্বকথা বলে নিই। এটা আমার নিজের উপদেশ নয়—পৃথিবীর যে-কোনো বেতার কেন্দ্র তোমাকে এই উপদেশ দেবে।

রুমে অ্যারিয়েল শর্টওয়েভের জন্য সম্পূর্ণ বেকার না হলেও ছাতের উপর বাঁধা দীর্ঘ, দীর্ঘতম বাঁশের অ্যারিয়েলের তুলনায় নগণ্য। আমার উপদেশে যারাই কান পাতছো, তাদেরই বলি, যারা মফস্বলে থাকো তারা নেবে দীর্ঘতম বাঁশ (শহরে বোধ হয় এর একটা সীমা আছে, কিন্তু যেহেতু তুমি চোদ্দতলা বাড়িতে বাস করো না, সেটা তোমার উপরে প্রযুজ্য নয়) এবং নির্মাণ করবে সর্বোত্তম অ্যারিয়েল। এ স্থলে বলে রাখা ভালো, তিন চার শ' টাকা সেট+আউটসাইড ব্যাম্বু অ্যারিয়েলে যে রিসেপশন পাবে, হাজার টাকা সেট+রুমে অ্যারিয়েলে পাবে তার চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট রিসেপশন। অবশ্য দামী সেটে' যেরকম ধ্বনিকে—বিশেষ করে সঙ্গীতের বেলায় ইচ্ছে মত কড়া মোটা করা যায়, সস্তা সেটে সেটা করা যায় না। কিন্তু ভাষার বেলা—যাকে বলে স্পোকেন ওয়ার্ড—সস্তা সেটও+দীর্ঘতম আউটসাইড অ্যারিয়েল ১০০% কাজ দেবে। "আমার সেট আরো দামী হলে আরো ভালো রিসেপশন হত"—এটা ভুল ধারণা। যে-কোনো দিন সকাল সাড়ে আটটা [illegible] ১৩ মিটার ব্যাণ্ডে অস্ট্রেলিয়া শুনে নিয়ে (ঐ সময় ১৩ মিটার মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট) অন্য বাড়িতে দামী সেট শুনে এসো—দেখবে তফাত নেই। পুনরায় সন্ধে ৬-৩০-এ ১৩ মিটারে প্যারিসের ইংরেজীর প্রোগ্রাম খানিকটা শুনে (প্রোগ্রাম মাত্র আধ ঘণ্টার ৭টা থেকে ফরাসী ভাষাতে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যায়) দামী সেটের রিসেপশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। প্যারিস দুর্বলা স্টেশন, তদুপরি ঐ সময় ১৩ মিটারে বিস্তর স্টেশন ঝামেলা লাগায়—গোটা তিনেক বি বি সি, একটা VOA, ভাটিকান, সুইজারল্যাণ্ড, পাকিস্তান, রুশ, হল্যাণ্ড, আরো কে কে আছেন—কাজেই তুমি যদি তখন প্যারিসের ইংরিজী প্রোগ্রাম পরিষ্কার বুঝতে পারো তবে আর চিন্তা ক'রো না, তোমার সেট এবং অ্যারিয়েল দুই-ই ঠিক। অবশ্য বর্ষার অতি নিকৃষ্ট আবহাওয়া হলে দামী, সস্তা, কোনো সেটেই, শহর মফস্বল কোনো জায়গাতেই হয়তো প্যারিস ধরতে পারবে না।

আপন দেশের ভাষা শেখাবার জন্য সবচেয়ে উৎসাহী ইংরেজ। কিছু দিন থেকে বাংলার মাধ্যমে পর্যন্ত ইংরিজী শেখাতে আরম্ভ করেছে। যারা ইংরেজীটা মোটা-মুটি জানো, তারা অ্যাডভানস কোর্সটি শুনলে উপকৃত হবে।

প্যারিস একদা, বোধ হয়, ইংরিজীর মাধ্যমে ফরাসী শেখাতো। এখন সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত যে ইংরিজী প্রোগ্রাম দেয় তাতে তো সে আইটেম শুনিনি। তবু নিরাশ হবার কারণ নেই। প্রথম ১৮·৩০ থেকে ১৯·০০ অবধি (আমি সর্বত্রই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম দিচ্ছি) মনোযোগ সহকারে ইংরিজী প্রোগ্রামটি বিশেষ করে সংবাদ—শুনে নেবে। তারপর সেই সংবাদই ফরাসীতে শুনতে পাবে ১৯·০০ থেকে ১৯·৩০-এর ভিতর কোনো এক সময়। ইংরিজীতে খবরটা বুঝে নিয়েছ বলে ফরাসীতে সেটি ধরতে সুবিধে হবে। মাসখানেক প্র্যাকটিসের পরেও যদি না বুঝতে পারো তবে মেনে নিয়ো, যে ফরাসী জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছিলে সেটা যথেষ্ট নয়। দুপুরেও প্যারিস ফরাসী প্রোগ্রাম দেয়—প্রধানত ইন্দোচায়নার জন্য। তাই রিসেপশন সব সময় ভালো হয় না।

সুইটজারল্যাণ্ডও ফরাসীতে প্রোগ্রাম দেয়। ইংরেজীতেও। আমাদের জন্য (অর্থাৎ নিয়ার ঈস্ট অ্যাণ্ড সাউথ ঈস্ট এশিয়া) ওদের স্টেশন খোলে ১৬·৩০ ঐ ১৩ মিটার ব্যাণ্ডেই। ওরা কিন্তু রকমারি করে (১) জর্মন, (২) সুইস জর্মন, (৩) ফরাসী,

(৪) ইতালীয়, (৫) হিন্দী অথবা কোনো কোনো দিন এস্পেরান্তোতেও। প্যারিসের খেলা যে প্রতিবার সম্প্রচারিত করেছি এ পাড়েও সেটি প্রয়োজন। তোমাকে শুধু অল্প অল্প জানতে হবে, কখন কোন্ ভাষায় প্রোগ্রাম দেয়।* এ ছাড়া রুশ, চীন, জাপান এরাও ফরাসীতে ব্রডকাস্ট করে (বি বি সি-ও করে, কিন্তু এ দেশে শীত-কালে রাত ঘনিয়ে এলে কখনো কখনো পাওয়া যায়—আসলে ওটা আমাদের উদ্দেশে বেতারিত হয় না—ওটা পূর্ব ইয়োরোপের জন্য, জর্মনের বেলাও তাই)।

কিন্তু সর্বোত্তম ব্যবস্থা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ফরাসী প্রোগ্রাম শোনা। রাত ঘনিয়ে এলেও বোধ হয় সন্ধ্যার দিকেও ইটি বেতারিত হয়। এটা শোনার সুবিধা *এই রিসেপশন মোটামুটি ভালো, কি কি* খবর মোটামুটি দেবে সেটা আগের থেকে জানা আছে বলে বুঝতে সুবিধে হয়, এবং যে দু-চারটে কণিকা দেয়—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ভারত ইতিহাসের কিছু একটা—আমাদের কিছুটা জানা বলে ঐ একই সুবিধে। এদের উচ্চারণ সব সময় ১০০% খাঁটি হয় না—তবে আপনার আমার কাজের জন্য "যথেষ্টর চেয়েও প্রচুর।" এ স্থলে উল্লেখ করি, যাঁরা কনভারসেশনাল আরবী এবং ফার্সী বুঝতে নিজকে অভ্যস্ত করাতে চান তাঁরা যেন আকাশবাণীর আরবী ফার্সী প্রোগ্রাম শোনেন। এঁদের উচ্চারণ অত্যুৎকৃষ্ট। কিছু দিন আগেও মক্কার-এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও মদিনাগতা তাঁর স্ত্রী অ্যানাউন্সার ছিলেন।...

ধার্মিকজন মিশরে গৃহীত রেকর্ডে *অত্যুত্তম কুরান পাঠও শুনতে পাবেন।...*

রাজনৈতিক তথা প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভালো থাকলে ফরাসী ইকোয়েটরিয়াল আফ্রিকার ব্রাজাভিল শহরের উত্তম ফরাসী ব্রডকাস্ট এ দেশে পাওয়া যায়। শীতকলে রাত ঘনিয়ে এলে ত্যুনিস আলজেরস থেকেও মিডিয়াম ওয়েভে ফরাসী প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। এবং রাত দশটা/এগারোটা থেকে ভোর বেলা পর্যন্ত মন্তে কার্লো—ফরাসীতে। শীতকালে মিডিয়াম ওয়েভে ২০৫ মিটার (=১৪৬৬ কি.সা.) ব্যাণ্ডে। আমার জানা মতে এটিই ইয়োরোপের সব-চেয়ে জোরদার মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন; এর জোর ৪০০ কি.ও.। ফরাসীটা সড়গড় হয়ে গেলে [illegible] এই প্রোগ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা [illegible] শোনা যায়। তবে [illegible] আছে। ...ওয়েভে [illegible] ৫০০ কি.ও. স্টেশন, কিন্তু কে জানি সে [illegible] বড় জ্বালা করে।

জর্মানির যে বেতার স্টেশন বিদেশের জন্য বেতার ছাড়ে তার নাম ডয়েচে ভেলে (Deutsche Welle) এবং তিনি কলোনে (Koeln=Cologne সেখান থেকে ওডি-কলোন আসে)। ভারতের জন্য এদের প্রোগ্রাম ১৮·২০ থেকে ২১·৫ পর্যন্ত, ১৯ এবং ১৬ মিটারে কিন্তু নিরেট জর্মন ভাষায়। তবে ইংরিজী, হিন্দী, উর্দু এবং ফের ইংরিজীতে ব্রডকাস্ট করে একবার সকালে ৮·৩০ থেকে ৯·১০ পর্যন্ত এবং দুপুরে একটা থেকে মাঝে মাঝে ক্ষান্ত দিয়ে রাত্রি *প্রায় দশটা অবধি ওই সব ভাষায়। এরই যে-কোনো একটা শুনে নিয়ে জর্মন প্রোগ্রাম শুনে নিলে ভালো হয়। কিছু দিন পূর্বে* একটি তাজ্জব খবর পেলুম। জর্মনি মাসে দুই বৃহস্পতিবার দুপুর একটা থেকে ১·৩৫ পর্যন্ত সংস্কৃত ব্রডকাস্ট করবে। তবে ওয়েভ লেনথটা জানি নে। আশা করছি, খুঁজেপেতে পেয়ে যাবো।... বর্ষা-কালে এ দেশে জর্মনি ভালো পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ১২·১৫ থেকে ১৫·০০ অবধি জর্মনি যে বেতার অস্ট্রেলিয়ার জন্য ২৫, ১৯, ১৬ মিটারে ছাড়ে তার ১৬টা ভালো পাওয়া যায়। জর্মনি একদা ইংরেজীর মাধ্যমে জর্মন শেখাতো—এখনও শেখায় কি না, অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়া পূর্বোক্ত সুইটজারল্যাণ্ড অনেকক্ষণ ধরে জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এক-কালে পূর্ব জর্মনিও (DDR) শুনতে পেতুম। দুপুর বেলা জাপানও উত্তম জর্মনে (১৯ মি) এবং রাত ঘনিয়ে এলে মস্কো, বুখারেস্ট, প্রাগ, সোফিয়া ইত্যাদি শহরও ফরাসী জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এদের সক্কলেরই প্রায় এক সুর, কিন্তু আমাদের তাতে কিছুটি যায় আসে না। আমাদের ভাষা শেখা নিয়ে কথা।

দুঃখের বিষয়, ভিয়েনা—জর্মন ভাষার মক্কা কেন্দ্র—এখনো একসপেরিমেন্টাল স্টেজে, এবং ফরাসী কৃষ্টির বৃহৎ কেন্দ্র ব্রাসেলস আমি কখনো পাইনি।

মস্কো একদা অতি সরলে রুশ ভাষা শেখাতো। আরবী ফার্সীতে যাঁদের দিলচস্পী তারা অনায়াসে বগদাদ, কাইরো এবং তেহরান ধরতে পারেন। কাবুল ফরাসী ও ইংরেজীতে অল্পক্ষণের জন্য ব্রডকাস্ট করে। ফার্সী এবং পশতু প্রচুর।

আমি শুধু সেসব স্টেশনের কথাই উল্লেখ করেছি, যেগুলো এ দেশে মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায়, এবং বিদেশী ভাষা জ্ঞান সড়গড় রাখতে সাহায্য করবে।

** সব স্টেশনই কোনো না কোনো সময় আপন ঠিকানা দেয়। সে ঠিকানায়* চিঠি লিখলে তারা প্রোগ্রাম ফ্রী পাঠায়। যারা ভাষা শেখায় তারা কেউ কেউ ফ্রী বইটি পাঠায়ও পাঠায়, কোনো কোনো স্থলে পয়সা দিতে হয়। কখন কোন্ মিটারে কে ব্রডকাস্ট করে তার সবিস্তর বর্ণন পাওয়া যায় World Radio Handbook, Lindorffs Allee 1, Hellerup, Denmark. দাম পাঁচ টাকার মত। এবং সকরুণ নিবেদন, আমাকে দয়া করে চিঠি লিখবেন না। আমি অসুস্থ। সেক্রেটারি নেই।

অন্য কোনোখানে

তা [illegible] শাশুড়ী তো [illegible] হাত দিয়ে [illegible] বললেন, ওমা সে কি কথা। এখনই রাত করে, আর ভোরের গাড়িতে চলে যাবে। না বাবা তা হয় না।'

তারপর ওঁর বলার ভঙ্গিতেই খানিকটা দমে গিয়েছিল। বার দুই বোঝাবার চেষ্টা করেও পারল না। দরজার আড়ালে শাশুড়ী দাঁড়িয়ে। নাকের নোলকটাই দুলছিল। এক গলা ঘোমটা। লজ্জায় তারাপদও সোজাসুজি তাকাতে পারছিল না। শাশুড়ী শেষ দিকে জোর দিয়েই বলে গেলেন, 'খাওয়া-দাওয়া করে কালকে বিকালের গাড়িতেই যেও। কাল রোববার, তোমারও তো ছুটি।'

তারাপদ বোবার মত কথাগুলো শুনে গেল। ভেবেছিল এক, হয়ে গেল তার উলটো। মনে মনে শ্যামলীর ওপরই রাগ হচ্ছিল ওর। কোন বুদ্ধি নেই। একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারে না। এখন কি করবে তারাপদ। বউকে নিয়ে যাবার জন্যেই তো আর আসে নি ও।
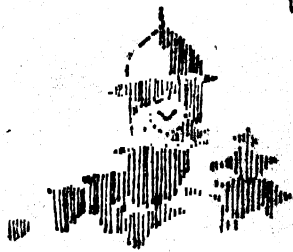
নিশীথ দে

তা হলে তো কাকাই এসে শ্যামলীকে নিয়ে যেতে পারত। তারাপদ প্রায় নিজেই আসতে চেয়েছিল। নইলে শ্বশুর-বাড়ি যাবার জন্যে অত মাথা ব্যথা নেই। নেহাতই শ্যামলীর জন্যে। শ্বশুর-বাড়িতে জামাইআদরের ঘটায় তারা-পদর তো হাঁপিয়ে ওঠার উপক্রম।

বিয়ের পর এই নিয়ে তিনবার এলো তারাপদ। প্রথমবার শ্বশুরে নিজেই আনতে গিয়েছিল। শ্বশুর লোকটা খারাপ নয়। চেহারাটাই যেন কেমন। কালো, তেলচুকচুকে। মাথা ভর্তি টাক। বেঁটে, ছোটখাটো। নিজের বাড়িতে তো কোনদিন গায়ে জামা দেখেনি তারাপদ। সেবার মেয়ে জামাইকে এগিয়ে দিতে এসেছিল কাপড়ের খুঁটটা গলায় দিয়ে।

শাশুড়ী বোধ হয় শ্বশুরমশাইয়ের সামনে খুব রাশভারি মেয়েমানুষ। নিরীহ স্বামীকে ইশারায় ধমক দিতেও দেখেছে তারাপদ।

শ্বশুর লোকটা আসলে শাশুড়ীর হুকুমে চলে। প্রথম দিনেই তা বুঝে

মেতে উঠেছিল। তার ওপর শাশুড়ীর ফরমায়েশ, অমুক আমার সই, অমুককে শ্যামলী মাসী বলে। নমস্কার করতে করতেই ঘাড় পিঠ ব্যথা হয়ে ওঠার উপক্রম। ওদের মধ্যে সরস্বতী বলে মেয়েটাকেই ভাল মনে হল তারাপদর।

[illegible] শ্যামলীকে [illegible] হয় ওর।

মেয়ে এগিয়ে দিয়ে শ্যামলী নিজের রান্না ঘরে ঢুকেছে। [illegible] দিলে সব জেনেছে। এখন ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে থাকতে হবে ওকে। একটু পরে ভাবল, চোরের মত বসে থাকা। বিয়ের পর কি কম একদম সইতে হয়েছে তারাপদকে। পাড়া-পড়শী একে-বারে ঝেঁটিয়ে এসেছিল নতুন জামাই দেখতে। আইবুড়ো মেয়ে থেকে ফোকলা দাঁতের বুড়িরা পর্যন্ত। যেমনি ছড়া কাটার ধুম, তেমনি ঠাট্টা। তারাপদ

সরস্বতীই এগিয়ে এসে পাখার বাতাস করল। পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে তারাপদকে যেন বাঁচালো।

বাড়ি গিয়ে শ্যামলীকে বলতে হেসে বলেছিল, 'আহা, রাগ করার কি আছে। শ্বশুরবাড়িতে সব জামাইকেই লোকে দেখতে আসে।

তারাপদ একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'নতুন জামাই বলে কি সঙ না ঠাকুর-দেবতা যে পাড়া সুদ্ধ লোক দেখতে আসবে?'

'যাক গে এরপর গেলে আর কেউ আসবে না। আমি বারণ করে দোব।'

'আর আমি ও রাস্তা মাড়ালে তো!'

'ওমা, সে কি গো। আমাকে তাহলে আনতে যাবে কে?'

যেন খুব ভাবনায় পড়ল শ্যামলী।

তারাপদ যেন ওকে হাতে পেয়েছে। বলল, 'কেন, কাকা নিয়ে আসবে তোমাকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি অন্য কারুর সঙ্গে আসবোই না।'

তারাপদ কোন জবাব দিল না। অন্য দিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল। শ্যামলী উসখুস করছিল। মৃদু স্বরে নিজের মনেই বলল, 'পাড়ার লোককে তো আমি শিখিয়ে দিই নি। না আনবে না আনবে। কি আর হবে। নিজেই বললে এবার আসার সময় কলকাতায় খুরে কত কি দেখিয়ে আনব।'

ওর গলার স্বরটা খুব কাঁপছিল। মায়া হল তারাপদর।

শ্যামলী ভেবেছিল, সত্যিই হয়ত কাকাই নিতে আসবে। মনটা খুব দমে গিয়েছিল। সারাটা রাস্তা এক গলা ঘোমটা দিয়ে কাকার পিছনে পিছনে যেতে হবে। তার ওপর কাকা আবার হাঁপানি রুগী। রেল গাড়িতে উঠেই হাঁপানি বেড়ে যায়। খক্-খক্ কাশীর ঘটায় শ্যামলীরই ভয় লেগে যায়। এই বুঝি দম আটকে গেল। কাকার মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। সেবার শ্বশুর-বাড়ি যাবার সময় কাকার হাঁপানি দেখে কি ভয় করছিল।

ও ধরেই নিয়েছিল, কাকা আসবে আর ওকে নিয়ে চলে যাবে। বিকালের আগেই গা ধোয়া, আলতা পরা, চুল বাঁধা সেরে মনমরা হয়ে বসেছিল। বিকেলের গাড়িটাও যখন চলে গেল, তখন ভেবেছিল আজ আর কেউ এলো না বোধ হয়। যাক বাঁচা গেল! কাকা হয়ত দোকান ফেলে আসতে পারল না। তাই হবে হয়ত।

সন্ধ্যের গাড়িতে তারাপদ এল। ওকে দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারাপদকে যে শাশুড়ী পাঠাবে, ভাবতেই পারে নি ও। শ্যামলী প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমাকে নিতে এলে? মা পাঠালো তোমাকে?'

তারাপদ ওর বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারে নি। পরে আড়ালে ডেকে সব কথা বলল। শ্যামলী ভাল করে বুঝতেও পারে নি। তবুও সায় দিয়ে গেল। তারাপদকে কাছে পাওয়ার আনন্দে ও তখন বিভোর।

তারাপদ ওর ঘাড় নাড়া দেখে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন কি করা যায়! সকালের গাড়িতে না বেরুতে পারলে আর লাভ কি? তার চেয়ে তো কারখানায় ক' ঘণ্টা ওভার টাইম করতে পারত! এখন উপায়! ভেবে কুল কিনারা করতে পারছিল না। অথচ, মতলব একটা বার করতেই হবে।

ঘণ্টাখানেক একা একাই বসে রইল ও। শ্বশুর মশাই ফিরলো রাত করে। ঘর থেকেই কানে এলো শাশুড়ীর গলা। দেরি করে ফেরার জন্য শ্বশুরের ওপর ঝড় বয়ে গেল। জামাই আসার খবর না জানার জন্যেই বেশি আক্রোশ। তারাপদ আরও অপ্রস্তুতে পড়ল শ্বশুর বেচারাকে সামনে দেখে। ওর কাছেই যেন ক্ষমাপ্রার্থী। তারাপদ প্রণাম করল। শ্বশুর মশাই সারা-

দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়েছিলেন। অপরাধীর মত বললেন, একেবারে একলা বসে আছো, বাবা। আমার বড় দেরি হয়ে গেল...তা বাড়ির সবাই ভাল আছে তো।

তারাপদ কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছিল। শ্বশুরমশাই চলে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘাম মোছবার জন্যে পকেট থেকে রুমালটা বার করতে গিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে ঠেকল। সিগারেট খেতে ইচ্ছা হল ওর। কিন্তু, ভাবল, যদি কেউ এসে পড়ে। এমনিতে খুব সিগারেট খায় না তারাপদ। আসবার সময় হাওড়া স্টেশনে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিল। রাস্তায় মাত্র দুটো খেয়েছে! শ্বশুরবাড়ির স্টেশনে নেমে আর খায় নি। যদি কেউ মুখে গন্ধ পায়।

শ্যামলীও বোধ হয় জানে না যে তারাপদ মাঝে মাঝে সিগারেট খায়। প্যাকেটটা কেনার সময় ভেবেছিল, সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, সিগারেট না খেলে যেন মানাচ্ছে না ওকে।

সাত-পাঁচ ভেবে প্যাকেটটা আবার পকেটেই রেখে দিল তারাপদ। একটু পরেই শ্যামলী এল। মাথার কাপড়টা ফেলে আলতো করে দরজাটা বন্ধ করল ও। তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তারাপদ। শ্যামলী ওর দিকেই এগিয়ে এল, 'ওমা এখনও জামা খোল নি। কী গরম! দাঁড়াও একটু হাওয়া করি।'

বাধা দিল তারাপদ, 'না, না, গরম হচ্ছে না। হাওয়া করতে হবে না?'

ওর কথায় কি ভাবল শ্যামলী। 'রাগ করেছ?'

হাসল তারাপদ—'সকালের গাড়িতে যাওয়া হবে না।'

'সেই ভাল। খেয়ে-দেয়ে বিকালের গাড়িতেই যাওয়া হবে।'

শ্যামলীর বলার ভঙ্গি দেখে তারাপদর আর সন্দেহই রইল না যে শাশুড়ীও ওকে তাই বুঝিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শ্যামলী যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। বলল, বিকালের গাড়িতে গেলে সন্ধ্যার সন্ধ্যের পৌঁছে যাব।'

'তাহলে কলকাতায় আর যাওয়া হবে না।'

কলকাতার নামে ভাবনায় পড়ল শ্যামলী। সত্যিই তো এবার না হলে আর কি কোনদিন কলকাতায় যাওয়া হবে! অথচ, মা তো কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। এমনিতে তো মা কিছুতেই ছাড়বে না।

তাহলে কি বলা যায় এখন।

শেষ পর্যন্ত শ্যামলীই মতলব দিল তারাপদকে। মা'র সামনে মিথ্যে কথা বলতেও ইতস্তত করছিল ও। ঠিক হল, শ্যামলীই বলবে। তারাপদ আর ওর মার সামনে দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে বলেও গেল ও —'মার শরীর খারাপ, কাকার শরীর খারাপ।

আসবার সময় পই পই করে মা বলে দিয়েছে। সকালের গাড়িতেই যেতে হবে। নইলে সবাই ভাববে......'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে তারাপদও যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। না, শ্যামলীকে যতটা বোকা ভেবেছিল, ততটা নয়। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলে কি হবে, বেশ বুদ্ধি আছে।

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময় শাশুড়ীর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল। শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে তারাপদরও মনটা খুঁত খুঁত করছিল। ও নিজে থেকেই বলল, 'খেয়ে-দেয়ে বারটার গাড়িতে গেলেই হবে।'

শাশুড়ী আর আপত্তি করল না। তারাপদর চেয়ে শ্যামলী যেন বেশি খুশি হল।

জামাইকে তেমন আদর-যত্ন করা হল না ভেবে শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনেই যেন সঙ্কোচে পড়েছিলেন।

শ্যামলীকে নিয়ে বেরুবার সময় শ্বশুর মশাই আগের মতই কাপড়ের খুঁটটা গলায় দিয়ে ওদের এগিয়ে দিতে চাইল।

শাশুড়ীর ইশারায় শ্যামলীর টিনের

সুটকেসটা তুলে নিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল তারাপদ, 'মা, না ওটা আমিই নিচ্ছি।'

খুব অপ্রস্তুতে পড়েছিল তারাপদ। সুটকেসটা নিয়ে ও আগে আগে যাচ্ছিল। পিছনে শ্যামলী ওর বাবার কথায় ঘাড় নাড়ছিল। বার দুই পিছন ফিরে দেখল।

খানিক দূরে যেতেই ডাক শুনলো ও 'তারাপদ, একটু দাঁড়াও বাবা।' শ্যামলী টপ করে একবার হরিগোপালদাকে গড় করে আয়। আবার কবে দেখা হবে।'

ওর সংগে তারাপদও প্রণাম করল। বুড়ো বোধ হয় চোখে ভাল দেখতে পায় না। বিড় বিড় করে কি যেন বলল। আবার চলতে শুরু করল ওরা। লক্ষ করছিল ও, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে বাপের চোখ দুটোও ছল ছল করছে। এতক্ষণ বেশ ছিল শ্যামলী। ওর চোখ দুটোও জলে ভরে উঠেছে। সঙ্কোচ থেকে রেহাই পেলে যেন বাঁচে। না, বউকে আনতে আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার নামও করবে না।

ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত শ্বশুরমশাই ঠায় স্টেশনেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেন ছাড়ার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, কান্না শুরু করল। কামরায় বেশি লোক ছিল না তাই রক্ষে। তাই এক সময়ে যখন বলে বলেও কান্না থামাতে পারছিল না, তারাপদর ইচ্ছে করছিল শ্যামলীকে আবার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে।

সারাটা রাস্তা গুম মেরে বসে রইল তারাপদ। আর নয়, এই শেষ। শ্বশুর বাড়ির নেশা কেটে গিয়েছে ওর। শ্যামলীর কান্না থামলে গম্ভীর স্বরে বললে, 'আর কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে কাজ নেই। দুটোর গাড়িতেই বাড়ি চলে যাই।'

গা ঘেঁষে বসল শ্যামলী। 'তুমি অমন একটুতেই রাগ কর কেন?'

'তুমি কচি মেয়ের মত কাঁদবে, না যাবে? আমি কি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি নাকি?'

হাসল শ্যামলী। ওর বুকের ওপর হাতটা রেখে বলল, 'মা-বাবার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল। দেখো আর কাঁদব না।'

ওর দিকে তাকিয়ে তারাপদরও কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল। ওকে খুব দুঃখী মনে হল ওর।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে খুব ভাবনা হল শ্যামলীর। সঙ্গের সুটকেস আর মিষ্টির ছোট হাঁড়িটা কোথায় রাখবে। তারাপদ সুটকেসটা কাঁধে করে শ্যামলীর হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে স্টেশনের বাইরে এল। ভিড় ঠেলে আসতে, বিশেষ করে শ্যামলীকে সামলে আনতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সুটকেসটা নামিয়ে বউয়ের দিকে তাকাল ও। আজ ভাবছো কেন? তুমি কি মনে করেছ আগে থেকে ঠিক করে না রেখেই এসেছি?'

লোকগুলো যাবার সময় বার বার শ্যামলীর দিকে তাকাচ্ছিল। ও হকারদের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। তারাপদ ঠিক বুঝতে পারল না। ও নিজের কথাতেই ব্যস্ত। বলল, 'শঙ্কর, আমার বন্ধু শঙ্কর, সেই যে আমাদের গিয়েছিল......'

শ্যামলী মনে করতে পারল না। তবু সায় দিতে ও খুশি হল, 'এই হাওড়া ইস্টিশনের কাছেই একটা দোকানে কাজ করে। সুটকেস আর মিষ্টির হাঁড়িটা ওদের দোকানেই রেখে যাব।'

শ্যামলী কোন কথা বলল না। তারাপদ যেন উৎসাহ পেল। জোর হেসে বলল, 'তুমি ভেবেছিলে আমি অতই বোকা। আগে থেকে না ঠিক করে এই সুটকেস কাঁধে করেই ঘুরে ঘুরব, হুঁ।'

শ্যামলী বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। বিশেষ করে ও এত জোরে জোরে কথা বলছিল যে পথ চলতি লোকগুলো শুনে যাচ্ছিল। শ্যামলী কথা বাড়াল না।

মিষ্টির হাঁড়িটা ওর হাতে দিয়ে সুটকেসটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল তারাপদ। ওর জামার খুঁটটা ধরে পিছন পিছন চলতে লাগল শ্যামলী। ভাবছিল, সত্যিই তারাপদকে দেখলে ওর খুব বোকা বোকা মনে হত। কিন্তু তারাপদ সত্যিই বেশ চালাক-চতুর। ওর মার কথাটাই মনে মনে আওড়াল। বিয়ের আগে বাবার কাছে বলতে শুনেছিল ও। 'জামাই আমার বয়সে চব্বিশ বছর হলে কি হবে, বুদ্ধিতে বেয়াল্লিশ। দেখে নিয়ো তুমি।'

বাবাও সায় দিল, 'বোকা হলে কি আর সংসার চালাতে পারতো। কাকারাই ঠকিয়ে দিত।'

বাবা-মার মত শ্যামলীর অবশ্য অতটা ভরসা ছিল না। বাপের সম্পত্তি বলতে তো একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই। বোকা না হলে বিনা পয়সার স্কুল ছেড়ে দেয়। আবার মনে হল, লেখাপড়া ছেড়ে কারখানায় না ঢুকলে সংসারের বোঝাই বা কে বইত। সংসারটাও তো ছোটখাটো নয়। বিধবা পিসি, মা, ছোট দু ভাই-বোন। তার ওপর শ্যামলী। সব দায় তো একটি লোকের ওপরই। অবশ্য আয়ে বলতে হবে। স্বামীর কথা ভেবে মনে মনে গর্ব অনুভব করলো ও।

খানিকটা এসে তারাপদ দাঁড়াল। বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি একটু দাঁড়াও এখানে। আমি সুটকেস আর হাঁড়িটা রেখে আসি।'

শ্যামলী ঘাড় নেড়ে বলল, 'বেশি দেরি করো না যেন।'

সুটকেস তুলে নিল ও। 'এই তো যাব আর আসব।'

কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এল তারাপদ।

'এদিকে মুখ করে দাঁড়াও। আর.....'

একটু থেমে বলল, 'কেউ ডাকলে তাকিও না যেন।'

'আচ্ছা'—মাথার ঘোমটাটা আরও টেনে নিয়ে জবাব দিল শ্যামলী। লক্ষ করছিল যেতে যেতে বার দুই পিছন ফিরে তাকাল তারাপদ। ইশারা করল শ্যামলীকে।

ফিরে এলো প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে 'দোকানে কি ভিড়। কোন রকমে শঙ্করের হাতে দিয়েই চলে এলাম। দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

'কিছু বলল না?'

'সময় কোথায়। শঙ্করের তো হাঁফ ছাড়ার সময় নেই?' রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছল তারাপদ।

শ্যামলী নিচু গলায় বলল, 'তোমার বন্ধুকে বলে দিয়েছ তো যেন মার কাছে না বলে আবার।'

ও একটু অস্বস্তি প্রকাশ করল। 'তুমি অত ভয় ভয় কর কেন? শঙ্কর আমার ছোটবেলার বন্ধু। অমনি মাকে বলে দেবে! ও সে রকম ছেলেই নয়।

শ্যামলী চুপ করে গেল। তারাপদ তাকাল ওর দিকে।

'কিসে যাবে? ট্রামে না বাসে?'

হাসল ও, 'আমি কি করে জানব?'

তারাপদ কি ভেবে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আগে কি দেখবে বল তো?'

ও যেন ভেবে পেল না। জড়তার মধ্যে বলল 'কোথায় যেন জন্তু-জানোয়ার থাকে—'

'ধুৎ। সে তো চিড়িয়াখানা, অনেক দূর।'

দমে গেল শ্যামলী, 'আমি তো কিছু চিনি না।' একটু থেমে বলল, 'যেখানে হোক চল না।'

তারাপদ ইতস্তত করছিল, বলল 'কলকাতা কি একটু-আধটু জায়গা। একি তোমাদের বসন্তপুর।'

পকেট থেকে কম দামী সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে কি ভেবে আবার পকেটে রেখে দিল।

'সিগারেট খাবে না?' প্রশ্ন করল ও।

ওর কথায় তারাপদ যেন আরও লজ্জা পেল। সতের বছরের কিশোরী বউকে আরও অল্প বয়সী মনে হচ্ছিল ওর। বলল, 'থাক পরে খাবো। খাবার দুটো আছে আর।' একটু থেমে বলল, 'তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না?'

শ্যামলী যেন স্বামীর কথায় অবাক হয়ে গেল। গালে হাত রেখে বলল, 'ওমা খিদে পাবে কেন? আসবার সময় মা যে খাইয়ে দিলে।'

তারাপদ ভেতরের বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখল, পাঁচ টাকার নোটটা ঠিক আছে। স্টেশনের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাল ও। 'চল, তোমাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাব।' ও ঠিক বুঝতে পারল না। ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানাল।

দুখানা বাস ছেড়ে দিয়ে খালি বাসে পাশাপাশি সিটে বসল ওরা। একটু পরেই লেডিজ সিট বলে তারাপদকে উঠে পড়তে হল। ভিড় ঠেলে নামতে গিয়ে শ্যামলীর তো প্রায় হিমসিম অবস্থা। রাস্তায় নেমে ও বলল, 'বাব্বা, ওই ভিড়ে মানুষ যেতে পারে নাকি। আচ্ছা, বাসগুলো উলটে যায় না?' তারাপদ তখন ওর কথায় কোন উত্তর দিল না, রাস্তা পার হয়ে ময়দানে উঠে মুখ খুলল ও 'এ আর কি ভিড় দেখছো। অফিস টাইমে তো উঠতেই পারতে না।'

ও ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'যাবার সময় আমি কিন্তু আর বাসে করে যেতে পারব না। রক্ষে কর, তার চেয়ে হেঁটে যাব।'

'হেঁটে কেন', আশপাশে কেউ নেই দেখে তারাপদ ওর হাতটা ধরল 'যাবার সময় তোমাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যাব।'

খুশি হল ও। একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাছে অত টাকা আছে?'

এবার সিগারেটের প্যাকেটটা বার করল তারাপদ।

'গাড়ি ভাড়া ছাড়াও পাঁ......চ টাকা নিয়ে এসেছি।'

খুব কায়দা করে ধোঁয়া ছেড়ে শ্যামলীর দিকে তাকাল ও, 'তুমি কোনদিন কলকাতায় এসেছিলে?'

'সেই কবে, মনেই নেই। ঠাকুমার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়েছিলাম; ঠাকুমার এক সই ছিল......' একটু থেমে বলল, 'কালীঘাটে যাবে?'

'ধুৎ......' চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল তারাপদ, 'তুমি একবারে গেঁয়ো। কলকাতায় এসে কেউ কালীঘাটে যায় নাকি?'

স্বামীর কথায় খুব লজ্জা পেল শ্যামলী।

খানিকটা হাঁটবার পর তারাপদ আঙুল দিয়ে দেখালো 'ওই দেখো ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল।' ও যেন আবার উৎসাহ পেল একটু। কাছে গিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল। তারাপদর চোখ অন্যদিকে। শ্যামলী লক্ষ করছিল, একটু দূরে একটা মেয়ে তারাপদর বয়সী কি কিছু বড় হবে আর-একটা ছেলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। হাসি-ঠাট্টার শব্দ কানে এলো ওর। অস্ফুট স্বরে বলল, 'বেহায়া।'

তারাপদ কোন মন্তব্য করল না দেখে প্রশ্ন করল ও 'ওদের বাবা-মা কিছু বলে না?'

'ওরা কি আর বাপ-মাকে কেয়ার করে।'

'মুখে আগুন অমন ছেলেমেয়ের।'—অস্বস্তি প্রকাশ করল শ্যামলী।

তারাপদ বলল, 'চল, ওদিকে যাই।'

ওর মাথার কাপড়টা খসে পড়েছিল। একটু এগিয়ে তারাপদ বলল, 'অনেক হাঁটা হয়েছে। চল একটু বসি কোথাও।'

ঘাস বিছানো মাঠে গিয়ে বসল ওরা। শ্যামলী যেন উসখুস করছিল, 'এবার কোথায় যাবে?'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল তারাপদ। সামনে
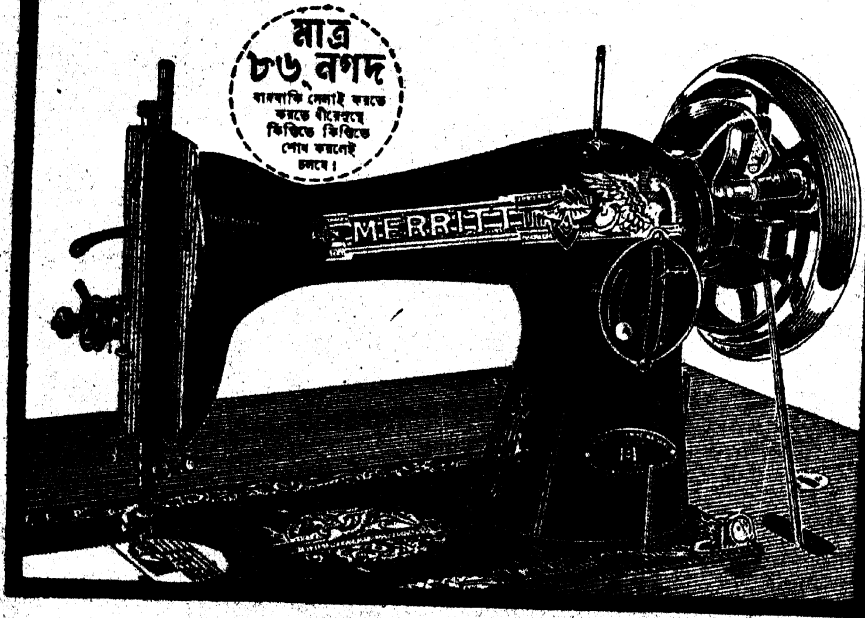
দিয়ে যাবার সময় একটা জুতো পালিশ-ওয়ালা ছেলে দাঁড়ালো, 'বাবু, পালিশ?'
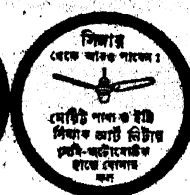
'বাবু' সম্বোধন করতে ওর চেয়ে শ্যামলী যেন বেশি গর্ব বোধ করল। স্বামীর দিকে তাকাল ও, 'তোমার জুতোটা কালি দিয়ে নাও না।'

পায়ের দিকে তাকিয়ে বেশ ভারিক্কি সুরে জিজ্ঞেস করল ও, 'কত নিবি?'

ছেলেটা বাক্স নামালো 'দু আনা বাবু।'

'দু...আনা' শ্যামলী প্রায় বিস্মিত হল। তারাপদও যেন দমে গেল একটু। শ্যামলী না থাকলে হয়ত দরাদরি করতো না ও। ছেলেটা চলে যাবার পর শ্যামলী বলল, 'ডাকাত একেবারে। তার চেয়ে তুমি কালি কিনে দিও আমিই পালিশ করে দেব।'

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্রশ্ন করল তারাপদ, 'তুমি কোনদিন বায়স্কোপ দেখেছো? কলকাতার বায়স্কোপ, টিকিট কেটে, চেয়ারে বসে?'

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও। তারাপদ উঠে দাঁড়াল, 'চল, আজকে তোমাকে বায়স্কোপ দেখাবো। টারজেনের বই, দেখবে কি ফাইট......'

শ্যামলীর কাছে কিছুই স্পষ্ট হল না। তবু বায়স্কোপের নামে উৎসাহিত হল ও। দু-তিনটে সিনেমায় টিকিট পাওয়া গেল না। রাস্তার ধারে দেওয়াল ঘেঁষে শ্যামলী দাঁড়িয়েছিল। আশপাশের লোকগুলো কেমন যেন বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। তারাপদ ফিরে আসতে সাহস পেল ও।

শ্যামলী বলল, 'কাজ নেই তোমার বায়স্কোপ দেখে। দু টাকা চার আনা করে টিকিট! রক্ষে কর।'

তারাপদ যেন সমস্যায় পড়ল, তা হলে কিই বা দেখানো যায় শ্যামলীকে! অথচ, অতগুলো টাকা খরচ করতে সত্যিই মায়া হচ্ছিল।

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। ফুটপাথে ভিড় বাড়ছিল। দু-একটা লোক যেন ইচ্ছে করে শ্যামলীর গায়ে গা লাগিয়ে চলে গেল। একবার ভাবল, ধরবে লোকটাকে। বছর চল্লিশ বয়স হবে লোকটার, কিন্তু কি বিশ্রী স্বভাব। কিন্তু সাহসে কুলালো না। বলা যায় না, গুণ্ডা দলের লোকও হতে পারে। নিজেকে কাপুরুষ মনে হল। ছি ছি বিয়ে করা বউয়ের মান ইজ্জত বাঁচাবার মত ক্ষমতা নেই ওর। ও তো একটা জোয়ান ছেলে। শ্যামলী কিছু ভাবলো না তো! ওর হাত ধরে রাস্তা পার হল। বার বার মাথার কাপড়টা পড়ে যাচ্ছিল ওর। তারাপদ বলল, 'এখানে দেখবার কি আছে!'

'যা শুনেছি বলবে, তুমি জানো না।' অন্যদিকে সরে বলল ও।

তারাপদ চুপ করে গেল। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ মনে হল ওর, বায়স্কোপ না হোক, ইডেন গার্ডেনটাতো দেখানো যায় শ্যামলীকে। অবশ্য ও নিজেও ভাল করে চেনে না। সে না হয় লোককে জিজ্ঞেস করে নেবে। চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামলী। 'ও বাড়িটা কার গো?'

তারাপদ ইতস্তত করছিল। পাশ থেকে একটা বাদামওয়ালা বলল, 'ও রাজভবন হায়, গবর্নর সাহাবকা কোঠি।'

'কত বড় ফটক দেখেছো!' বিস্মিত হয়ে বলল শ্যামলী, 'এখানে কি বড় বড় বাড়ি। আমাদের দেশে দুটো-একটা কোঠা বাড়ি।'

ওরা ইডেন গার্ডেন থেকে বেরিয়ে ঠিক করতে পারছিল না, কোথায় যাবে এবার। ক্লান্ত হয়ে শ্যামলী বলল, 'একটু বসি কোথাও।'

তারাপদও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রায় নির্জন মাঠে বসতে কেমন ভয় ভয় করল ওর। বলল, 'কাছাকাছি কোথাও নেই। তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না?'

সত্যিই খিদে পেয়েছিল ওর। কিন্তু বলল না। আরও কিছুদূর হেঁটে এসে মাঠের গুমটির কাছে একটা দোকানে ঢুকল ওরা। বেশ গম্ভীর গলায় বয়কে ডাকলো তারাপদ।

একটু পর বয় এসে দাঁড়াল, 'কি এনেদেব

মন্দ্রন, মোগলাই, চিংড়ির কাটলেট কাটলেট.....'

ওর মুখস্ত তালিকা শুনে দমে গেল তারাপদ। প্রায় আবেদনের মত বলল, 'আগে দু কাপ চা দিন।'

'স্পেশ্যাল, না অর্ডিনারী?'

'অর্ডিনারী'—তাড়াতাড়িতে বলল তারাপদ। বয়টা সামনে থেকে সরে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও। শ্যামলীর দিকে তাকাল 'কাটলেট খাবে।'

নাক সিটকালো শ্যামলী—'না বাবা, শুধু চা-ই ভাল, কি ছিরি দোকানের।'

দোকানের লোকগুলোর হাবভাব দেখে তারাপদও যেন বেরিয়ে আসতে পারলেই বাঁচে। মনটা খারাপ লাগল ওর। এত আশা দিয়ে শ্যামলীকে নিয়ে এলো ও। কিছুই দেখানো হলো না। নিজের ওপরই রাগ হল ওর। ওভারটাইমের টাকা থেকে কত কষ্ট করে টাকা পাঁচটা বাঁচিয়েছিল। মাকে জানায় নি। আগে মার কাছে কিছু লুকোয়নি ও। মাইনে পেয়ে সমস্ত টাকা মার হাতে দিয়েছে, দরকার মত চেয়ে নেয়। ক'দিন ধরে মার খুব টানাটানি চলছে। তবু বলেনি ও। বললে, শ্যামলীর কাছে কথা রাখতে পারতো না। ভাবলো, মা যদি জানতে পারে কি ভাববে। মাকে প্রবঞ্চনা করেছে ও। নিশ্চয় আগের মত ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারবে না। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। ওরা জানে, মেয়েকে নিয়ে জামাই সোজা বাড়ি চলে যাবে। ভয় হল, যদি কারুর চোখে পড়ে থাকে। বিশ্রী ব্যাপার হবে। অন্যমনস্কতার জন্যে কাপ থেকে চা পড়ল ওর সিল্কের পাঞ্জাবিতে। ওর চেয়ে শ্যামলী যেন বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠল। একরাশ লোকের মধ্যে আরও লজ্জায় পড়েছে। রাস্তা এসে জল দিয়ে চায়ে ভেজা জায়গাটা ধুয়ে দিল শ্যামলী।

ক্লান্ত হয়ে ও বলল, 'আর হাঁটতে পারছি না। তার চেয়ে বাড়ি চল এবার।'

'সেই ভাল',—সায় দিল তারাপদ। 'এখন গেলে সন্ধ্যের ট্রেনটা ধরা যাবে।'

মনে পড়ে গেল, আসবার সময় কথা দিয়েছিল, শ্যামলীকে ট্যাকসি চড়াবে। তবু একটা খেদ তো মিটবে। শহরে তখন বিকেলের মুখ। ও একটা চলন্ত ট্যাকসিকে হাত দেখালো: থামল না ট্যাক্সিটা। পর পর তিনটে ট্যাকসি ওদের ডাক শুনল না।

পাশ থেকে মন্তব্য কানে এলো 'ট্যাকসি পাবেন না দাদা, এখন ওদের উপরি রোজগার। ওরা সওয়ারি চেনে।'

ঘৃণায় মনটা ভরে উঠল তারাপদর। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে ট্রামে করে হাওড়া স্টেশনে পেঁছোল। সুটকেস আর মিষ্টির হাঁড়িটা নিতে ভুলে গিয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে হাওড়া ময়দানের বাসে চেপে বসেছিল। শ্যামলী মনে করিয়ে দিতে আবার নামতে হল।

কোনরকমে পাশাপাশি জায়গা পেল ওরা। শ্যামলীকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। কিছু দূর গিয়ে ট্রেনের কামরাটা একটু খালি হতে জানলার ধারে গিয়ে বসল। তারাপদ বলল, 'মিছিমিছি হাঁটাই সার হল।'

ভেবেছিল কিছু হয়ত বলবে শ্যামলী। কিন্তু ও চুপ করেই রইল। আবার বলল তারাপদ—'বায়স্কোপও দেখা হল না।'

এবার মুখ খুলল শ্যামলী। 'বায়স্কোপ তো আগে দেখেছি।' একটু থেমে বলল 'তোমার সঙ্গে একলা একলা বেড়াতে খুব ইচ্ছে করছিল।' একটু থেমে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল, 'আর একদিন নিয়ে যাবে আমাকে?'

তারাপদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল বউয়ের দিকে। শ্যামলী কি ভেবে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না কলকাতায় নয়, বিচ্ছিরি জায়গা। কলকাতার লোকগুলো কেমন যেন আমাদের ঘেন্না করে।'

'তবে?'

'অন্য কোথাও। এই ধর......'

তারাপদ চুপ করে রইল। শ্যামলী সহানুভূতির সুরে বলল, 'কাল আবার তুমি সকালে উঠে কারখানায় যাবে? খুব কষ্ট হয় তোমার, না?'

ওর কথার জবাব দিল না তারাপদ। গা ঘেঁষে বসল। পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বার করে দেখল। আবার পকেটে রেখে দিল। শ্যামলী ঠিক বুঝতে পারল না। মনে মনে ভাবল তারাপদ, কাল কিছু একটা বলে টাকা পাঁচটা মাকেই দিয়ে দেবে। আরও খুব দরকার।

এগারো

বিজলীবাবুর বাড়ির সামনে এসে হর্ন দিল অবনী। আজ হাটবার, বিজলীবাবুর বাড়ির পেছন দিকে মস্ত মাঠ, ওই মাঠে হাট বসে; মাঠের পশ্চিম দিয়ে রেল-লাইন চলে গেছে। দশায়া গেছে পরশু, তবু হাটের কাছাকাছি বলে দশারার মেলাটা হাটের ওপর এখনও ছড়ানো-ছিটোনো রয়েছে, পেট্রম্যাক্স আর কার্বাইডের আলো চোখে পড়ে, নাকে ভেসে আসে শুকনো শালপাতার আর রেঁড়ি কিংবা তিল তেলের গন্ধ, কলরব এখনও কানে আসে।

অবনী আরও একবার হর্ন দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। বিজলীবাবুর বাড়ির দুয়ারতলার কাছে বাগান দিয়ে একটি বউ অন্দরে চলে গেল। অবনী তাকে দেখতে পেল, চিনতেও পারল; বিজলীবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী, ছোট বউ।

বিজলীবাবুর প্রথম স্ত্রী অন্তঃপুর-বাসিনী, কদাচিৎ তাঁকে বাইরে দেখা যায়; দ্বিতীয় অতটা নয়, অবনী তাঁকে অনেক-বার দেখেছে। বড় থাকেন সংসার আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে, ছোট থাকেন সংসার আর স্বামী নিয়ে। বাইরে থেকে মনে হয় বিজলীবাবুর সংসার ছোট—তিনজন মাত্র লোক, আসলে সংসার আরও বড়; বাস-অফিসের জনা দুই এই সংসারেরই অন্ন খায়, একটি ছেলেকে বিজলীবাবু নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, বাঙালীর ছেলে, স্কুলে পড়ে; এর ওপরেও প্রায়ই শহর থেকে বিজলীবাবুর চেনাজানা কেউ না কেউ কাজে কর্মে এসে তাঁর বাড়িতে ওঠে। বাস-অফিসের ম্যানেজারীতে এত বড় সংসার চলে না, বাবা বেঁচে থাকতেই কিছু জমি জায়গা করেছিলেন, সেই জমি জায়গা বিজলীবাবু বেশ কিছু বাড়িয়েছেন, বাজারের দিকে জোড়া দুই পাকা বাড়ি আছে, সব মিলিয়ে মিশিয়ে সচ্ছল ভাবেই চলে যায়।

কাঠের ফটক, সামান্য ক'টা গাছপালা, সিঁড়ি কয়েক ধাপ—তারপরই ঢাকা বারান্দা। খোলা দরজা দিয়ে বিজলীবাবু বাইরে এলেন, হাত তুলে বললেন, "আসছি—দু মিনিট।" বিজলীবাবু আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

অবনী সামনেটায় পায়চারি করতে করতে সিগারেট ধরাল। সন্ধ্যে হয়ে এল, হাটের দিক থেকে গুঞ্জন ভেসে আসছে, কোথাও কে যেন ঢোল পিটছে, বোধ হয় ধোপা-পট্টিতে। রেল লাইনের দিক থেকে গুরু-গুরু শব্দ উঠেছে, মাল গাড়ি আসছে হয়ত। অবনী বারান্দার দিকে তাকাল, পুবের ঘরে বাতি জ্বলল, শাঁখ বাজছে, জানলায় বিজলীবাবুর ছোট বউ।

বিজলীবাবুর মুখেই অবনী শুনেছে, তাঁর দুই স্ত্রী সহোদরা ভগিনী। বড় এবং ছোটর মধ্যে বয়সের তফাত বছর পাঁচেকের। দুজনেরই মুখের আদল গড়নটড়ন একই রকমের প্রায়, তবে ছোট যেন বড়োর চেয়ে সুশ্রী, গায়ের রঙও মাজা। অবনী নিজে যেটুকু দেখেছে তাতে তার মনে হয়েছে, ছোটর সমস্ত মুখের মধ্যে চমৎকার একটি প্রসন্ন ভাব আছে, বেশ হাসিখুশী, বিজলী-বাবুর যোগ্য স্ত্রী। বড় একেবারে বর্ষীয়সী গৃহিণী, শান্ত, গম্ভীর। বিজলীবাবু, অবনীর ধারণা, বড়কে খাতির করেন বেশী, ভালবাসেন ছোটকে বেশী। বড়র জীবনে স্বামী এখন সংগী নয়, গৃহকর্তা বা অভিভাবক। বিজলীবাবুর কাছে শোনা, বড় আলাদা ঘরে থাকেন, পুজো-আর্চা করেন, সংসারের দায় বয়ে বেড়ান। ছোটও সংসার নিয়ে থাকেন, তবু তাঁর সংগে স্বামীর ভালবাসা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্কটা আছে। বিজলীবাবু বলেন, 'মিত্তিরসাহেব, আমার দুদিকে দুই কলা-গাছ আমি শালা মহারাজ। আমার বড়টি হল গিয়ে নারায়ণের লক্ষ্মী, আর ছোটটি হল আমার মেনকা-টেনকা।......আমি ভাগ্য-বান পুরুষ।'

অবনী সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে মনে মনে হাসল। ততক্ষণে বিজলীবাবু বেরিয়ে এসেছেন।

বিজলীবাবুর হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার, কাঁধে বড় সাইজের ফ্লাস্ক।

অবনী অবাক হয়ে বলল, "এ-সব কি?"

টিফিন কেরিয়ারটা হাতে করে তুলে দেখিয়ে বিজলীবাবু বললেন, "এটা সুরেশ-মহারাজের। বাড়ি থেকে দিয়ে দিল।" বলে হাতটা নামালেন বিজলীবাবু, "মিষ্টি-ফিষ্টি পায়েস আছে।...আর এইটে—" বিজলীবাবু ফ্লাস্ক দেখিয়ে এক চোখ টিপে হাসলেন, "আমাদের। পথে ঠান্ডাটেন্ডা পাবে তো!"

অবনী জোরে হেসে উঠল। "ওটাও কি বাড়ি থেকে দিয়েছে?"

"তাই কি দেয়, মিত্তিরসাহেব।...এর জন্যেই দেরী হয়ে গেল। কত হাইড অ্যান্ড সিক করে তবে মিশিয়ে-ফিশিয়ে আনলুম।"

"আপনার হাইড অ্যান্ড সিক আছে নাকি?" অবনী হাসছিল।

"না, তা নেই। তবে দেবতা বুঝে প্রণামী। যাচ্ছি সুরেশমহারাজের কাছে—এ-জিনিস তো নিয়ে যাওয়া যায় না, তার ওপর গাড়ি করে রাত্তির বেলায় আসা যাওয়া—মদ্য নিয়ে যাচ্ছি জানলে বড় বউ কি আর আস্ত রাখত!"

গাড়িতে এসে বসল দুজনে। বিজলীবাবু পিছনের সিটে টিফিন কেরিয়ারটা ঠিক করে রাখলেন, সাবধানে; ফ্লাস্কটা তাঁর পাশেই থাকল।

জিপ গাড়িতে স্টার্ট দিল অবনী। ঠাট্টা করে বলল, "একজনকে না-হয় লুকোলেন, অন্যজন? তিনি কি বললেন?"

"তিনিও খুশী নন। বললাম, এক পোয়া জিনিসের সঙ্গে পাঁচ পো জল মিশিয়েছি গো, এই খেয়ে নেশা হবে না; কোনো ভয় নেই—অপথ্যের মতন না।"

অবনী হাসতে লাগল। গাড়ি চলতে শুরু করেছিল।

বিজলীবাবু পান চিবোচ্ছিলেন। অবনীর আজ অন্য পোশাক। ধুতি পাঞ্জাবি। দশমীর দিন ভেঙেছিল। পাঞ্জাবি পাজামা অবশ্য বাড়িতে পরে, ধুতি আর পরা হয়ে ওঠে না। কলকাতায় থাকতে তবু মাঝে মাঝে পরা হত, এখানে এসে একেবারেই হয় না। নিতান্ত বিজয়ার দিন লোকজন আসে বাড়িতে, দু এক জায়গায় তাকেও যেতে হয়—তাই এই ধুতি।

ম্যালেরিয়া কনট্রোলের অফিস পেরিয়ে গাড়ি টাউনের রাস্তা ধরল। বিজলীবাবু সিগারেট বের করলেন, "আসুন মিত্তির-সাহেব।"

"পরে; আপনি নিন।"

বিজলীবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিলেন।

বাড়ি প্রায় শেষ হয়ে এল, মাঠের কোলে সন্ধ্যের আবছা ভাবটা গাঢ় হয়ে এসেছে। তারই গায়ে গায়ে জ্যোৎস্না ধরছে। শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস, দু পাশে গাছের মাথায় এখনও পাখির ঝাঁক উড়ে উড়ে বসছিল, কলরব ভাসছে। বিজলীবাবু পিছনের সিটের দিকে তাকিয়ে টিফিন কেরিয়ারটা ঠিক করতে লাগলেন। গাড়ির ঝাঁকুনিতে নড়ছিল, উলটে যেতে পারে।

অবনী বলল, "আপনার স্ত্রী সুরেশমহারাজের খুব ভক্ত, না বিজলীবাবু?"

"তা খাতিরটাতির করে বই কি! মেয়েদের দুটো রোগ আকচার থাকে, মিত্তিরসাহেব : এক, হিস্টিরিয়া আর দুই হল গিয়ে ওই আইবুড়ো সাধুসন্নেসী মহারাজ-টহারাজের ওপর ভক্তি।"

অবনী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "টিফিন কেরিয়ার দেখে তাই মনে হচ্ছে।"

বিজলীবাবু জবাব দিলেন, "এ যা দেখছেন সমস্তই আমার বড় গিন্নীর। ছোট দলে আছে, তবে অতটা নয়।...বুঝলেন মিত্তিরসাহেব, সুরেশমহারাজ যখন এদিকে থাকতেন তখন মাঝে মধ্যে আমার বাড়িতে আসতেন, এক আধ দিন তুলসী রামায়ণ গেয়ে শুনিয়েছেন অনেকক্ষণ। বড় গিন্নীর তখন থেকেই সুরেশমহারাজের ওপর একটা টান।"

"আপনার নিজেরও বেশ টান—!"

"আমার!...আমার কি টান থাকবে। উনি হলেন নিরামিষ মানুষ, আমরা হলুম

আমির ব্যক্তি। চরিত্রই আলাদা।" বিজলী-বাবু হেসে হেসে বললেন।

অবনী গাড়ি চালাতে চালাতে ঘাড় বেঁকিয়ে বিজলীবাবুকে একবার দেখল। তারপর বলল, "আপনি সুরেশ-মহারাজকে পাঁচ শো টাকা দিয়েছিলেন?"

বিজলীবাবু যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গেলেন, চোখের পাতা পড়ল না, মুখ ফিরিয়ে অবনীকে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখ-ছিলেন।

শেষে বললেন, "কে বলল?"

"আপনার সুরেশ-মহারাজ।"

বিজলীবাবু যেন সামান্য বিব্রত এবং অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন। কথাটা স্বীকার করতে তাঁর অদ্ভুত কুণ্ঠা জাগছিল। সরা-সরি কোনো জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, "কবে বললেন?"

"বলছিলেন একদিন কথায় কথায়।"

"কথাটা ঠিক নয়—" বিজলীবাবু জবাব দিলেন, তারপর সামান্য চুপচাপ থেকে যেন অবনীকে বোঝাচ্ছেন এই ভাবে বললেন, "টাকাটা আমি ঠিক দিই নি, আর পাঁচ শো টাকা আমি পাবই বা কোথায়, গরীব মানুষ। উনি ভুল বলেছেন।"

"ভুল!" অবনী কৌতুক করে বলল।

বিজলীবাবু যেন রীতিমত অকূলে পড়ে গেছেন। বললেন, "ব্যাপারটা কি জানেন মিত্তিরসাহেব, একবার—সুরেশ-মহারাজ যখন আশ্রমের কাজে হাত দিয়েছেন তখন তাঁর হঠাৎ একদিন টাকার খুব দরকার হয়ে পড়ে। দেশের দিকে বোধ হয় ওঁর কিছু সম্পত্তিটম্পত্তি বেচা-কেনার কথা চলছিল, টাকাটা সময় মতন পান নি। এখানে এসে-ছিলেন টাকা হাওলাত করতে। আমার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল, আমাকে বলছিলেন কোনো মাড়োয়ারী মহাজনের কাছে নিয়ে যেতে। তা আমি দেখলাম, মাড়োয়ারী মহাজনের কাছে টাকা হাওলাত করাটা ওঁর পক্ষে ভাল দেখায় না। তাছাড়া আমি থাকব সঙ্গে, মাড়োয়ারীগুলোই বা বলবে কি। ভাববে আমি বাঙালী হয়েও নিজের মুলুকের আদমি'-কে পাঁচশোটা টাকা যোগাড় করে দিতে পারলাম না। ইজ্জতে লাগল...। তাছাড়া এখানকার মাড়োয়ারীদের সঙ্গে আমার এমনি খুব দহরম-মহরম, সে মুখে, ভেতরে ভেতরে রেষারেষি। সে অনেক পুরোনো ব্যাপার মিত্তিরসাহেব, বাসটাস, বাজারের বাড়ি—নানা রকম ব্যাপার আছে। ...তা আমি পড়ে গেলাম প্যাঁচে। কি করি। তখন আমি সুরেশ-মহারাজকে তিনশো টাকা ধার দি। আর বাকি দুশো টাকা দিয়েছিল আমার বড় পরিবার। আমার মুখে শুনেছিল, শুনে দিয়েছিল। ওটা তার ব্যাপার।"

অবনী কোনো কথা বলল না। উলটো দিক থেকে একটা লরি আসছে বোধ হয়, এত জোরালো আলো যে অবনীর চোখে লাগছিল, নিজের গাড়িটাকে রাস্তার এক-পাশে সরিয়ে নিল।

বিজলীবাবু নিজের থেকেই বললেন, "সুরেশ-মহারাজ কিন্তু তার পরই টাকাটা শোধ করে দিতে চেয়েছিলেন, হাতে টাকা এসে গিয়েছিল। তা আমি তখন টাকাটা নিই নি। বলেছিলাম, এখন থাক; পরে দরকার পড়লে নেব।...তারপরও উনি অনেকবার বলেছেন—, আমি নিই নি। এক সময় নিলেই হবে।"

লরিটা একেবারে সামনাসামনি, অবনী সাবধানে পাশ কাটিয়ে নিল। সামনে ফাঁকা রাস্তা, দু পাশে ক্ষেতী, দ্বাদশীর চাঁদের আলো বেশ ফুটতে শুরু করেছে।

অবনী এবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "আপনি যতই বলুন, সুরেশ-মহারাজের ওপর আপনার বেশ টান আছে।" হেসে হেসেই বলল।

বিজলীবাবুও হেসে বললেন, "টান বলবেন না, বলুন খাতির। তা মহারাজ মানুষ, একটু খাতির যত্ন না করলে চলে! ...আমার সঙ্গে ওঁর দেখাসাক্ষাতই বা আজকাল কতটুকু হয় যে মেলামেশা থাকবে।"

"লোকটিকে আপনি পছন্দ করেন।"

"পছন্দ!...তা করি। ...ব্যাপারটা কি জানেন মিত্তিরসাহেব, আমি তো বেশী কিছু বুঝি না, মুখ্যু মানুষ, কিন্তু একটা জিনিস বেশ বুঝি। সংসারে আমরা—আমাদের মতন মানুষ যারা—তারা যে যার নিজের তল্পি নিয়ে আছি। নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই আমাদের চোখ বুজতে হয়। সুরেশ-মহারাজ টহারাজের মতন লোক তবু দুটো কাজ করেন। আমরা কিছুই করি না।"

অবনী শুনল। সামনে একটা ঢাল, গিয়ার বদলে নিল গাড়ির। হেসে বলল, "এ-সব লোক সম্পর্কে আপনার ওমর খৈয়াম কি বলেন?"

বিজলীবাবু সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলেন না, পরে বললেন, "জানি না মিত্তির-সাহেব, তবে আমার মনে হয় ওঁরা আলাদা অন্য ধরনের মানুষ—'কেউ তো তারা ছোঁয় না সুরা, যেমন তেমন লোকের সাথে; সুযোগ পেলেই সব আসরে, পাত্র তাঁরা নেন না হাতে।'"

সামান্য চুপ থেকে অবনী পরিহাস করে বলল, "তা আমাদের সঙ্গে পাত্র না নিন, পাত্র তো হাতে তুলে ধরেন। কোন আসরে ধরেন?"

"সে ওঁদের আলাদা আসর—" বিজলী-বাবুও হেসে বললেন, "তবে পাত্র ওঁরা ধরেন। নেশায় না ডুবলে কেউ কাজ করতে পারে না, মিত্তিরসাহেব। মাতাল হতে হয়, সাধারণ জ্ঞানগম্যি নইলে হারানো যায় না।"

অবনী চুপ। আর অল্প মাত্র পথ, লাঠ্‌টার মোড় এসে গেছে।

লাঠ্‌টার মোড় পৌঁছে গাড়ি ঘুরিয়ে গুরুড়িয়ার কাঁচা পথ ধরল অবনী।

বিজলীবাবু বললেন, "মিত্তিরসাহেব, আমার তেমন কোনো সিকরেট নেই। যা বুঝি বলে ফেললাম।"

অবনী জবাব দিল না। কোথায় যেন তার সামান্য ঈর্ষার মতন লাগছিল, অথচ মনে হচ্ছিল নিজেকে। বিজলীবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা কম নয়, দিনে দিনে সেটা বাড়ছিল, বিজলীবাবু হয়ত এই ঘনিষ্ঠতাকে সাধারণ পর্যায়ের মনে করেন। অবনী সম্পর্কে তাঁর কোনো শ্রদ্ধা নেই, অনুরাগও হয়ত নেই। অবনীর মনে হল, তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিজলী-বাবুর যে ধারণা তা সম্ভবত মদ্য-পানের সঙ্গী হিসেবেই যতটুকু হতে পারে ততটা—তার বেশী কিছু নয়।

সুরেশ্বরের সঙ্গে নিজেকে এভাবে তুলনা করেও তার বিরক্তি লাগছিল। বিজলীবাবু তাকে উত্তম অথবা অধম যাই ভাবুন না কেন কি আসে যায়! চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করল অবনী, এবং ঈষৎ অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করল না। বরং যথাসম্ভব হালকা গলায় বলল, "আপনার সিকরেট নেই বলছেন, কিন্তু একে একে এই সব সিকরেট যে বেরিয়ে পড়ছে, বিজলীবাবু!"

বিজলীবাবু বোধ হয় লজ্জিত হলেন মাথা নেড়ে বললেন, "না—না, এ আর এমন কি সিকরেট।"

গুরুড়িয়ার কাঁচা রাস্তায় গাড়িটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছিল। বিজলীবাবু পিছনের সিটের দিকে তাকিয়ে টিফিন কেরিয়ারটা দেখলেন, কাত হয়ে পড়ে গেছে. জিবের একটা শব্দ করে হাত বাড়িয়ে টিফিন কেরিয়ারটা সামনে নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। সুরেশ-মহারাজ পুজোর মধ্যে আসব বলেও আসেন নি। কি হল কে জানে। হয়ত পায়ের ব্যথা বেড়েছে। পুজোমণ্ডপে মালিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিজলীবাবুর, সে সপ্তমীর দিন সকালে বাড়ি এসেছে, সুরেশ-মহারাজের কথা বলতে পারল না। অপেক্ষায় থেকে থেকে আজ তাঁরা যাচ্ছেন, বিজয়ার দেখা সাক্ষাৎ সেরে আসবেন। বড় বউ কিছু মিষ্টিটিষ্টি দিয়ে দিয়েছে।

গুরুড়িয়ার এই কাঁচা রাস্তায় নেমে দ্বাদশীর জ্যোৎস্না আরও পরিচ্ছন্ন করে দেখা যাচ্ছিল। আদিগন্ত মাঠে নিঃসাড়ে যেন জ্যোৎস্নার স্রোত ভাসছে, হেমন্তের খুব হালকা একটু হিমের অস্পষ্টতা আছে কোথাও, শীতের সামান্য আমেজ লাগছে, চারদিক নিস্তব্ধ; মাঠে— পলাশ আর আমলকি ঝোপে জোনাকি জ্বলছে।

বিজলীবাবু বললেন, "মিত্তিরসাহেব, একটা কথা তাহলে বলি। আমার সিকরেট আর জানলার পরদা একই জিনিস; বাতাস দিলেই উড়ে যায়, দেখতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আপনি হলেন মিস্টিরিআস ম্যান।... ক'দিন ধরেই আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছি, কেমন লজ্জা লজ্জা করছে।...সেদিন আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম না, একটা চিঠি পেয়েছেন কি না—ঠিকানা পড়া যায় না। আপনি বললেন, পেয়েছি।"

অবনী মুখ ফিরিয়ে বিজলীবাবুকে দেখল।

বিজলীবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "ললিতা মিত্র কে?"

অবনী অসতর্ক হয়ে ব্রেক টিপতে যাচ্ছিল, গাড়িটা কেমন ঝাঁকুনি খেল সামান্য, আবার চলতে লাগল।

চুপচাপ। অবনী কোনো জবাব দিচ্ছে না, বিজলীবাবু অপেক্ষা করে আছেন। অত্যন্ত সময় পলে পলে বয়ে যাচ্ছে।

কিছু সময় পরে অবনী বলল, "আপনি জানলেন কি করে?"

"মনি অর্ডারের রসিদ দেখলাম।"

"ও!"

"পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম সুরেশ-মহারাজের সঙ্গে; রামেশ্বর আমার চিঠিটা দেখাচ্ছিল, তখনই রসিদটা দেখলাম।"

অবনী গাড়ি থামিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর হাসবার চেষ্টা করে বলল, "আপনার সুরেশ-মহারাজও কি জানেন নাকি?"

"না, তিনি পোস্ট অফিসের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন।"

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। সামান্য এগিয়ে অবনী বলল, "ললিতা এক-সময়ে আমার স্ত্রী ছিল।"

"এক সময়ে?"

"বছর কয়েক।"

বিজলীবাবু বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বোধ হয় বুঝতে পারছিলেন না, এক সময়ে যে স্ত্রী থাকে পরে সে কি হয়!

বিরত গলায় শুধোলেন, "এখন উনি আপনার স্ত্রী নন?"

"না।"

"কি রকম? তাঁকে টাকা পাঠাচ্ছেন..."

"ওটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট। খোরপোষ দিচ্ছি।"

"ও! আপনি স্ত্রী ত্যাগ করেছেন?"

"দু জনেই দু জনকে করেছি; পরে একটা ডিভোর্স নিয়ে নেব।"

বিজলীবাবু যেন নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকলেন। অবনীর চরিত্রটি যেন তিনি দেখবার বা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আলোর পর অন্ধকার যেমন দৃষ্টিকে দিশেহারা করে তেমনি তিনি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন।

"ব্যাপারটা পুরোনো—, আমার আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই—", অবনী গলা পরিষ্কার করতে করতে বলল। "টাকাটা পাঠাতে হয় পাঠাই।"

"চিঠিটা কার?" বিজলীবাবু শুধোলেন।

অবনী নীরব। তার সামনে, পাশে হেমন্তের সাদাটে জ্যোৎস্না; গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ ছাড়া শব্দ নেই, মাঠঘাট জুড়ে ঝিঁঝি ডাকছে, কানে হঠাৎ এই শব্দটা লাগল। অল্প দূরে অন্ধ আশ্রম, ছায়ার মতন দেখাচ্ছে।

অবনী মৃদু গলায় বলল, "আমার মেয়ের।"

বিজলীবাবু চমকে উঠলেন, স্ত্রীর কথা শুনে এতটা চমকান নি। "আপনার মেয়ে?"

অবনী আর কোনো কথা বলল না।

বিজলীবাবুর হাঁকডাকের আগেই সুরেশ্বর বেরিয়ে এসেছিল। "আরে, আসুন—আসুন। কী সৌভাগ্য!"

"সৌভাগ্য তো আমাদের মশাই, আপনারা হলেন মহম্মদ, আমরা হলাম পর্বত। আপনি নড়লেন না, তাই আমরাই এলাম।" বিজলীবাবু সরল রসিকতা করে বললেন, "আসুন কোলাকুলিটা সেরে নিই আগে।"

কোলাকুলি সারা হল। অবনী হঠাৎ কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে, অন্যমনস্ক; তেমন কোনো কথাবার্তাও বলল না। বিজলীবাবু টিফিন কেরিয়ারটা সুরেশ্বরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আরও পাঁচটা হাসিঠাট্টা করলেন।

সুরেশ্বরের বাড়ির ছোট বারান্দাটুকুতেই বসল ওরা। সুরেশ্বর ভজুকে ডাকতে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে বসল।

পাড়ের রাস্তার জন্যে নয়, অন্য কারণে সুরেশ্বর যেতে পারে নি। মোড়ালির বাসাটা দু-একদিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছিল, কিন্তু অষ্টমীর দিন শেষ রাতে অন্ধকুটিরের এক-পাশের অনেকখানি চাল হঠাৎ কেমন করে যেন বসে গেল। না, জখম-টখম হয় নি কেউ। পরের দিন ওপাশের সমস্ত খাপরা সরিয়ে, নতুন করে চাল বেঁধে খাপরা-টাপরা বসিয়ে তবে স্বস্তি। দুটো দিন এই সব করতেই কাটল। বোধ হয় বর্ষার মধ্যে, এবং সেদিন ওই রকম ঝড় বৃষ্টিতে চালের কাঠকুটোয় কিছু হয়েছিল, ঘুণ ধরেছিল আগেই, ভেঙে পড়ল আচমকা। তাছাড়া আশ্রমে দেখাশোনা করার লোকজনও কেউ ছিল না তেমন। পুজোর মালিনী বাড়ি গিয়েছিল কাল সকালে ফিরেছে, হৈমন্তী কলকাতায় এখনও ফেরে নি, চিঠি দিয়েছে

পূর্ণিমার পরের দিন ফিরবে, মঙ্গলবাবু গিয়েছিলেন গয়া। ফিরেছেন কাল, শিবনন্দনজী নিয়মিত আসতেন, তাঁর চেষ্টাতেই লোকজন মালপত্র যোগাড় করে রাস্তাঘাট সব মেরামত করানো গেল। গতকাল সুরেশ্বর অন্ধ আশ্রমের অন্ধজনদের নিয়ে গিয়েছিল বিশাইকা, দশাবরার মেলায়।

অবনী মনোযোগ দিয়ে কিছু শুনছিল না; কানে আসছিল, কিছু খেয়াল করছিল কিছু করছিল না। তবু চা দিয়ে গেল, বিজলীবাবুর আনা মিষ্টি থেকে কিছু মিষ্টি, কয়েকটা পেঁড়া। বিজলীবাবু প্রতিবাদ করছিলেন—"করছেন কি, আপনার ভাগ আমরা লুটেপুটে খাচ্ছি জানলে বড় বউ খেপে যাবে মশাই..."; সুরেশ্বর শুনেও শুনল না যেন।

কিছুক্ষণ বসে থাকল অবনী। সুরেশ্বর আর বিজলীবাবুর মধ্যেই গল্পগুজব হচ্ছে, দু'-একটা কথা কখনও বলছিল অবনী, পর পর কয়েকটা সিগারেট খেয়ে মুখ বিস্বাদ লাগছে। ভাল লাগছিল না বসে থাকতে। এক সময় সে উঠে পড়ল, বলল, "আপনারা গল্পগুজব করুন, আমি মাঠে একটু পায়চারি করি, মাথাটা ধরা ধরা লাগছে।"

উঠে এসে মাঠে দাঁড়াল অবনী। আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁ করে নিশ্বাস নিল বার কয়েক। দ্বাদশীর চাঁদ অনেকখানি ভরে এসেছে, একপাশে এক টুকরো মেঘ, ছেঁড়াখোঁড়া, নীচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। অবনী আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

বিজলীবাবু ধূর্ত নন, তার পেছনে গোয়েন্দাগিরিও করেন নি, তবু তিনি ললিতা আর কুমকুমের কথা জেনেছেন। ললিতার কথা লুকোবার চেষ্টা অবনী কি সত্যি সত্যিই তেমন কিছু করেছিল? না, করে নি। প্রতি মাসে ললিতার নামে মানি-অর্ডারে টাকা যায়, রসিদ ফিরে আসে। অফিসের চাকর, পোস্টঅফিসের কেরানী, রামেশ্বর পিয়ন এদের কাছে অন্তত মানি-অর্ডারের কথাটা জানা, উৎসাহ প্রকাশ করলে যে কোনো লোকই এটা জানতে পারত। কিন্তু লুকোবার চেষ্টা না করেও অবনী ললিতার প্রসংগটা কখনও কারও কাছে উল্লেখ করে নি। করার ইচ্ছে হত না, কারণও ছিল না। বিজলীবাবু হয়ত ভাবছেন, অবনী চালাকি করে নিজের স্ত্রীর কথা গোপন করেছে। তা কিন্তু নয়, অবনী ভাবছিল, সে ঠিক গোপন করার মন নিয়ে কিছু করে নি, যার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই, থাকবে না, যার প্রসঙ্গ বলা অথবা না-বলায় কিছু আসে যায় না—অবনী সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করবে কেন! কোনো কারণ ছিল না করার। কথাটা আগে জানলেই বা কি লাভ হত বিজলীবাবুর! কৌতূহল নিবৃত্ত হত মাত্র, কিংবা আরও বাড়ত, তার বেশী কিছু নয়। ব্যক্তিগত ব্যাপার, বিশেষ করে যা তিক্ত স্মৃতি, যার সংগে অবনীর জীবনের কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই আর তা বলার উৎসাহ তার হয় নি।

অবনী হাঁটতে হাঁটতে গাছের কাছে চলে এসেছিল। দাঁড়াল।

ললিতার জন্যে নয়, কুমকুমের জন্যেই অবনীর ভাল লাগছিল না। কুমকুম আগে কখনও চিঠি লেখে নি, এই প্রথম। সে, খুব সম্ভব, লুকিয়ে অবনীর ঠিকানা কোথাও দেখেছে। ঠিকানা দেখে চিঠি লিখেছে। ছেলেমানুষ বলেই, টাইফয়েডের পর দুর্বল অবস্থায়, বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে তার বাবার কথা মনে পড়েছে। বোধ হয় ললিতা মেয়ের ওপর তেমন যত্ন নেয় না, এবং পুরো টাকাটা নিজের সুখ-সুবিধের জন্যে ব্যয় করছে। কুমকুমের চিঠি থেকে মনে হয়, মার ওপর ভীষণ অভিমান করে এবং নিজের চার পাশে একান্তভাবে তার নিজের কাউকে না দেখে মেয়েটার মনে খুব লেগেছে। নয়ত কুমকুম চিঠি লিখত না। ললিতা মেয়েকে কখনোই এমন কিছু শেখায় নি যাতে বাবার ওপর তার মন টানে। আগাগোড়া ললিতা মেয়েকে বাবার ওপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে শিখিয়েছিল, ঘৃণার শিক্ষাটা মেয়েকে সে দিয়েছিল, যেন অবনী পাশের বাড়ির বা পাড়ার কোনো একটা শয়তান গোছের মানুষ। কুমকুমের স্বভাব নোঙরা, ইতর হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই মেয়ে আজ বাবাকে ওভাবে চিঠি লিখল কেন?

অবনী অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে কি মনে পড়ায় সিগারেট ধরাল না। হাত বাড়িয়ে গাড়ির সিট থেকে বিজলীবাবুর ফ্লাস্কটা নিল।

কুমকুম সাদা খাতার পাতায় আড়াই তিন পাতা ধরে চিঠি লিখেছে। বড় বড় হাতের লেখা, পেনসিলে লিখেছে, হাতের লেখা কাঁচা, অপরিষ্কার। তাড়াতাড়িতে লেখার জন্যেই হোক, কিংবা লুকিয়ে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে লেখার জন্যেই হোক, লেখা খুব খারাপ হয়েছে, ভুলও হয়েছে অনেক। হয়ত মেয়েটা শরীরেও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে।

"বাবা, আমার টাইফয়েড হয়েছিল। একশো পাঁচ জ্বর হয়েছিল।...বাবা, আমার খুব খিদে পায়, মা দুটো কমলা লেবু দেয়। খুব টক।...পুজোর জামাটা বিচ্ছিরী হয়েছে। আমার ভাল ফ্রক নেই, জুতো নেই।...বাবা, মাসি আমায় বলেছে আমি মরে যাব।...আমায় ভাল ফ্রক, জুতো কিনে পাঠিয়ে দিও। ক্যাডবেরী দিও। বাবা, আমি দুটো ট্রিপ পেয়েছি, অংকে দিয়েছে। তুমি আমায় দেখতে আসবে।..."

অবনী অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল। জ্বরে আমার মতন তার শরীরে কেমন শীত ধরছিল, চোখ জ্বালা করছে, কোনো কিছু দেখছিল না। ক্রমশ তার চোয়ালে চাপ লাগছিল। দাঁত যেন কিছু কামড়ে ধরতে চাইছিল। তিক্তভাবে অবনী কি যেন একটা বলল।

তারপর হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক পলক তার শূন্য দৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল না, পরে চোখ সামান্য পরিষ্কার হলে দেখতে পেল সামনে মালিনী। মালিনী কেমন সকুণ্ঠ এবং বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অবনী হৈমন্তীর ঘরের বারান্দার সামনে।

মালিনী আস্তে করে বলল, "হেমদি কলকাতায় গেছেন, এখনও ফেরেন নি।"

অবনী কথা বলল না, মালিনীকে দেখতে লাগল। বারান্দার নীচে মালিনী দাঁড়িয়ে, নির্মল জ্যোৎস্নায় তার মিলের সাদা শাড়ি, গায়ের ময়লা রঙ, গোলগাল সাধারণ চেহারা, টলটলে মুখ কেমন নতুন দেখাচ্ছিল।

অবনী অস্পষ্টভাবে কিছু বলতে গেল, গলার স্বর ফুটল না।

(ক্রমশ)

প্রাকৃতিক শক্তির অফুরন্ত উৎস

শিল্প প্রসারের হিড়িক যত বেড়ে চলেছে ততই বাড়ছে মানুষের প্রাকৃতিক শক্তির চাহিদা। কয়লা, তেল ও গ্যাসের যুগ পার হয়ে শক্তির সন্ধানে মানুষ পরমাণুর রাজ্যে হানা দিয়েছে। আজ সে নির্মাণ করছে পরমাণু শক্তিচালিত বিজলী ঘর, জাহাজ ইত্যাদি। কিন্তু সেখানেই মানুষের প্রাকৃতিক শক্তিজয়ের অভিযানের পরিসমাপ্তি নয়। আর পরিসমাপ্তি হলে চলবেও না, কারণ যে মূল পদার্থ ভেঙে মানুষ তার পরমাণু শক্তি শিল্পরথের চাকায় জুড়ে দিচ্ছে সেই ইউরেনিয়ামের পরিমাণ ভূগর্ভে খুব বেশি নয়। কয়লা, তেল আর গ্যাস এখনো খনিতে যা বাকি আছে তা সম্ভবত শ'খানেক বছরের ব্যবহারে ফুরিয়ে যাবে। অঙ্গারক যুগের এই যে সব সঞ্চিত শক্তির উৎস এগুলি আর নতুন করে তৈরি হচ্ছে না। তাই ব্যবহার করতে করতে পাত্র শূন্য হলেই সব শেষ হয়ে গেল। তারপর ইউরেনিয়ামের পালা। তারও সঞ্চয় বেশি নয়। সুতরাং আগে থাকতে শক্তির জন্য এমন একটি উৎস আয়ত্তে আনা দরকার যা লক্ষ লক্ষ বছরেও শেষ হবে না। সে রকম একটি অতি সহজলভ্য উৎসের সন্ধান মানুষ পেয়েছে কিন্তু সেটিকে পোষ মানিয়ে শান্তিকালীন কর্মকাণ্ডে লাগানোর উপায় ও কলকৌশল এখনো আয়ত্তে আনতে পারে নি। উৎসটি হচ্ছে হাইড্রোজেন, যার অশেষ অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীর জলভাগে। জল থেকে হাইড্রোজেনের পরমাণুশক্তিকে তাপ পারমাণবিক যন্ত্রপাতির বদলে শান্তিপূর্ণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে যদি ব্যবহার করতে পারা যায়, তা হলে মানুষ এমন বহু লক্ষ বছরের মত তার শিল্পের শক্তি সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে। এখনকার মত প্রতি ২৫ বছরে প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তখন আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।

তাপ-পারমাণবিক শক্তি পার্থিব শক্তি নয়। সে হচ্ছে এক মহাজাগতিক শক্তি যা জ্বালাচ্ছে দীপ্তিমান করছে সূর্যের দেহে বিস্ফোরণ ক্রিয়া থেকে। মানুষ বৈজ্ঞানিক কৌশলে সেই শক্তিকে আয়ত্তে এনেছে সামরিক স্বার্থে। তাপ-পারমাণবিক শক্তি টন দিয়ে মাপা হয় না, মাপা হয় নিযুত বা দশ লক্ষ টন দিয়ে যাকে ইংরাজীতে বলে মেগাটন। হাইড্রোজেন বা তাপ-পারমাণবিক বোমার কাছে সাধারণ অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা হচ্ছে শিশু। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমা ফেলা হয়েছিল সেগুলির বিস্ফোরণ শক্তি ছিল মোটে ২০ হাজার টন (কিলোটন) করে এবং সেগুলির শিকার হয়েছিল লক্ষাধিক মানুষ। সেই জায়গায় একটি ৫ মেগাটনের তাপ-পারমাণবিক বোমার মারণশক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত মোট বারুদের চেয়েও বেশী। একটি ১০০ মেগাটন বোমা ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গাকে এক ধাক্কায় শ্মশানে পরিণত করে দেবে।

কিন্তু অ্যাটম বোমার শক্তিকে আজ যেমন শিল্পের স্বার্থে ব্যবহার করা যাচ্ছে তেমনি হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকেও কাজে লাগাতে যদি পারা যায়, তা হলে কারখানা-শিল্পের সামনে উন্নতির যে সীমাহীন সম্ভাবনা খুলে যাবে তা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তবে কাজটা অত্যন্ত কঠিন এবং গত ১৫।১৬ বছর যাবৎ গবেষণা করেও সর্বাগ্রগামী দেশ-গুলির বৈজ্ঞানিকরা এখনো তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন নি।

তাপ-পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক
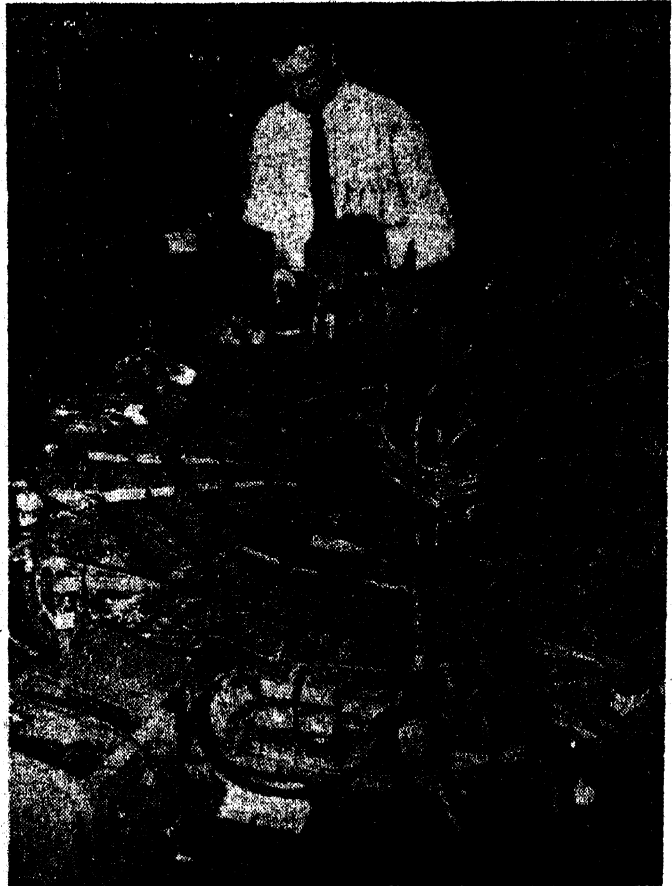
পারমাণবিক গবেষণার একটি আধুনিক মার্কিন অ্যাক্সিলারেটর

দিকটি দাঁড়িয়ে দিয়ে তার কল্যাণাত্মক দিকটি আয়ত্তে এনে কাজে লাগাবার পথে কয়েকটি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে। বাধা তো থাকবেই। সূর্য-নক্ষত্রের মর্ম কেন্দ্রে প্রচণ্ড তাপ ও চাপে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণগুলি পরস্পর মিশে গিয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হবার ফলে যেভাবে প্রচণ্ড তাপ ও বিকিরণ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অহরহ, সেই প্রক্রিয়া পৃথিবীতে অনুকরণ করা কি সহজ কথা? ল্যাবরেটরীর মধ্যে সাফল্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটাতে হলে তার জন্য চাই সমস্ত অসম্ভব-দুর্লভ অবস্থা, চাই ১৫ থেকে ৫০ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। সাধারণ পারমাণবিক ক্রিয়ার জন্য (পরমাণুবিভাজন বা ফিশনের জন্য) অত তাপের প্রয়োজন নেই। কিন্তু পারমাণবিক গলন-মিশ্রণের (ফিউশন) জন্য পরমাণু কেন্দ্রীণগুলিকে প্রচণ্ড গতিবেগ দান করতে হয় বলে অত তাপের প্রয়োজন। হাইড্রোজেনের দুটি ভারি আইসোটোপ-ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের সাহায্যে পৃথিবীতে সেই রকম প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব। মাত্র ১ লিটার জলের ডিউটেরিয়াম কেন্দ্রীণগুলির ফিউশন থেকে যে পরিমাণ শক্তি মুক্তিলাভ করে তা ৩০০ লিটার পেট্রোলের দহন থেকে উৎপন্ন শক্তির সমান। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে কোটি কোটি ডিগ্রী তাপ উৎপাদন করার ব্যাপারে, যা পার্থিব পরিবেশে দেখা যায় না। পৃথিবীতে বস্তুকে আমরা দেখি তিন অবস্থায়—কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় অবস্থায়। কিন্তু ঐ তিনটি অবস্থায় তাপ-পারমাণবিক ক্রিয়া ঘটে না (তার জন্য বস্তুকে তার চতুর্থ দশায় নিয়ে যাওয়া চাই, যাকে বলা হয় প্লাজমা। লক্ষ ডিগ্রী উত্তাপে ডিউটেরিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রীণগুলি ঘণ্টায় লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগ লাভ করে। কিন্তু সে তাপ এত কম যে, তাতে ২০০০ বছরে পারমাণবিক কেন্দ্রীণের মাত্র দুবার রূপান্তর ঘটবে। কিন্তু তাপমাত্রা যদি ধরুন ১০ কোটি ডিগ্রী হয় তা হলে কেন্দ্রীণগুলির গতিবেগ উঠে যাবে ঘণ্টায় ৪০ লক্ষ কিলোমিটারে এবং সেই অবস্থায় এক সেকেন্ডের প্রতি শতাংশে সেগুলির মধ্যে একবার করে ফিউশন হবে। সেই রকম প্লাজমার ১ লিটার থেকে ১০ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হতে পারে। সেই রকম প্লাজমা উৎপাদন করার মত যন্ত্র আজ উদ্ভাবিত হলেও সমস্যার সমাধানের পথে আরো বাধা রয়েছে। প্রথম কথা, অত তাপেও গলে যাবে না এমন মিশ্র ধাতু দিয়ে প্লাজমার আধার তৈরি হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, সেই প্লাজমাকে কৌশলে সেই অবস্থায় ধরে বন্দী করে রাখতে পারে এমন ফাঁদ এখনো তৈরি করা যায় নি বলে জন্ম-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আধারের দেয়ালের যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল সেই ফাঁক দিয়ে প্লাজমা যায় পালিয়ে। প্রকৃতি নক্ষত্রের প্লাজমাকে আটকে রাখে মহাকর্ষক্ষেত্রের জোরে। মানুষ এখনো মহাকর্ষের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি। তাই বৈজ্ঞানিকরা কৃত্রিম তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে প্লাজমাকে বশে এনে স্থায়ী করার চেষ্টা করছেন। প্লাজমা সৃষ্টি করে তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখবার জন্য তাঁরা নানা রকম চৌম্বকক্ষেত্রসম্পন্ন ফাঁদ উদ্ভাবন করছেন এবং এই ব্যাপারে সাফল্যের পথে তাঁরা কিছুটা এগিয়েছেন। ১০ কোটি ডিগ্রী তাপে প্লাজমা উৎপাদন করে ফাঁদের মধ্যে তাকে সেকেন্ডের এক-দশমাংশ পর্যন্ত আটকে রাখতে পেরেছেন তাঁরা। এটা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়, কারণ যে, পারমাণবিক রাজ্যে আলোকের মহাজাগতিক বেগ নিয়ে কাজকারবার, যেখানে সেকেন্ডের নিযুতভাগের একভাগকে বস্তু বা ব্যাপার বিশেষের জীবনের মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়, সেখানে প্লাজমা সৃষ্টি করে তাকে সেকেন্ডের দশাংশ সময় ধরে রাখা কি সহজ কথা? আমেরিকা, ব্রিটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সমান তালে এই ব্যাপারে এগিয়ে চলেছেন। তাদের মধ্যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের ডঃ রোজেনব্লুথ ও ডঃ থনেম্যান এবং সোভিয়েতের আচার্য কুর্চাতভ ও আচার্য তামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক শক্তির নতুন উৎস আবিষ্কার এবং তাপীয়, সৌর, পারমাণবিক ও রা সা য় নি ক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা সমাজের উৎপাদিকা শক্তির অবাধ অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। তাপীয় বিজলী স্টেশনে ব্যবহৃত ইন্ধনের শতকরা ৬৫ ভাগ নষ্ট হয়, কাজে লাগে মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ। টার্বাইনগুলিও খুব বেশী তাপ সইতে পারে না। তাপ-পারমাণবিক শক্তিচালিত বিজলীঘরে এই সব সমস্যা ও অপচয়ের সুরাহা হয়ে যাবে।

মানুষ অদূরভবিষ্যতে তাপ-পারমাণবিক শক্তির সামরিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সেই শক্তিকে জনকল্যাণের স্বার্থে আয়ত্তে এনে ব্যবহার করবে, এ আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। এই ব্যাপারে সাফল্য-লাভের পথে প্রকৃতি আপাতত যত বাধা অসুবিধাই খাড়া করুক, মানুষের কাছে শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতেই হবে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দাঁতের যন্ত্রণা—ইঁস্ আজ সন্ধ্যেটাই মাটি!
কিরে, শীলা! তোর অমন হাঁড়িমুখ কেন?
আর বলিস্‌নে, বিজয়ার সঙ্গে ঠিক ছিল আজ কোথায় সিনেমায় যাব —তা নয়, দাঁতের ব্যথায় মরে যাচ্ছি!
ঘাবড়াসনে—এখুনি তোকে আমি সারিডন দিচ্ছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।
শীলা একটি সারিডন খেল
খানিক পরে.
কী কাণ্ড—দাঁতে আর ব্যথা নেই! সারিডন সত্যিই অদ্ভুত!

নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে

[সতেরো]

৩২

পুরোদমে গাড়ি চালাতে চালাতে রাখাল বিরক্তস্বরে ব'লে উঠলো, 'আপনি বোড়ো বোগ বোগ গরেন মোসাই। দেকচেন স্‌সালা একেবারে রেগে কাঁই—'

'তুমি চুপ করো—' মহিম নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের আওয়াজ বার করলো, 'ঐ ক-কে যারা গ বলে আর শ-কে স, আর যেখানে সেখানে চন্দ্রবিন্দু আর ড়, তাদের ঘটি মাথায় এসব বকবকানির অর্থ বোঝা সাধ্য নয়। কী ক'রে কাকে বশে আনতে হয় সেই মন্ত্র মহিম সরকারের কণ্ঠস্থ, বুঝলে?'

'রাম রাম মোসাই, কেবল ঘটি ঘটি করবেন না। সেই সোন্দা থেকে এক ফোঁটা গলায় পড়েনি। এক ঠাঁয় বোসে বোসে শুধু মোসার কামড়। ওদিকে সারা দিন ঘুরচি তো ঘুরচি। ঘুরচি তো ঘুরচি।'

'না ঘুরলে কি খেতাম?'

'না ঘুরলে কি পেতাম?' মুখে মুখে ভ্যাংচালো রাখাল, 'কী পাওয়াটা পেলেন শুনি? কী দোরগায় এতো খোসামোদে? ঐ যে-কোনো একটা মেয়েছেলেকে ধ'রে নিলেই তো লেঠা ল্যাঠা চুকে যেতো।'

'চুকতো না হে, চুকতো না।'

'রেখে দিন ওসোব বাজে কথা। মেয়ে-মানুষের সরীল, তা এটাও যা ওটাও তা। ঐ সব সেয়ানের এক রা।'

'তোমার মতো গর্দভের কাছে তাই, আমার মনিবের কাছে নয়। তাই যদি হবে তা হলে তোমার সঙ্গে তার আর তফাত হবে কেন? মনে রেখো জ্ঞান থাকা চাই বুঝলে?'

'রেখে দিন, রেখে দিন।'

'রাখাল', গলায় রস ঢাললো মহিম, 'বলো তো দেখি, এই মেয়ে নিয়ে গিয়ে যখন দাঁড়াবো সাহেবের কাছে, কী হবে তখন।'

'আপনার পিণ্ডি হবে।'

'পিণ্ডিই হবে। সখারাম ঘুরে বেড়াচ্ছে না? নৃপতি পোদ্দার ঘুরে বেড়াচ্ছে না? পেয়েছে কেউ। পেলেও পারতো এরকম পটাতে? জান না তো এরা কারা? সিংহের ঘরে শিয়াল ঢুকেছে। আহা, কী থেকে কী?'

'দেখবেন মোসাই, কুমীরের চোখে যেন আবার জল না বেরোয়।'

'মহিম সরকারকে ঠেকা দেবে তেমন মানুষ কেউ নেই এ তল্লাটে। সাহেব অতটা শুনবে নাকি? তার উপরে বকশিশ।' মুখটা রাখালের কানের কাছে আনলো মহিম।

এক ঝটকায় মুখটা সে সরিয়ে নিল, 'উঃ। মুখে কি গন্ধো মাইরি।'

এ কথায় একটুও দুঃখিত হলো না মহিম। হেসে বললো, 'দেব, দেব, তোমাকেও ভাগ দেব। ক'দিন ধরে খোঁজাখুঁজিতে তোমার উপরেও তো কম খাটুনি যাচ্ছে না? কিন্তু একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম।'

'কী?'

'হঠাৎ এমন শিং বাগিয়ে এলো যে—নইলে যা সব উপমা দিতাম মহাভারত থেকে—'

'মহাভারত?'

'তুমি তো একেবারে রামপণ্ডিত। মহাভারতের নামও বোধ হয় জানো না।'

'না, জানি না। সব আপনি জানেন।'

'পড়েছ মহাভারত?'

'বলুন না কী বলবেন।'

'মহাভারতের চাঁই চাঁই সব মেয়েছেলেদের নাম জানো? যেমন ধরো কুন্তী দ্রৌপদী—'

'সব জানি।'

'তা হলে বল দেখি, কুন্তী ক'জনের গর্ভধারিণী হয়েছে?'

হঠাৎ অন্ধকারে দাঁত বার করে হেসে ফেললো রাখাল। গদগদ স্বরে বললো, ক'জনের দরকার গোসাঁই?'

'ভেবে দেখ, যুধিষ্ঠির হলেন ধর্মের পুত্র, ভীম পবনের, অর্জুন ইন্দ্রের।'

'তার মানে তিনজন?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, খুবোব মজা।'

'তারপর কুন্তীর সতীন মাদ্রী?'

'সে ও তাই নাকি।'

'তা ছাড়া কি?'

'ক'জনের সোঙ্গে?'

'দুজন নিজের স্বামী আর স্বর্গের ডাক্তার অশ্বিনী— নকুল সহদেব কার ছেলে?'

'বা, বা—'

'তবে কুন্তীর কাছে কিছু না।'

'তা সোজা। কুন্তী হলো গিয়ে তিনজন—'

'তিনজন কী হে? কুন্তীর তো কুমারী অবস্থা থেকেই এরকম। সূর্যের ঔরসে কর্ণ হলো না?'

'তাই নাকি?'

'আবার কী?'

'কেয়া তোফা—'

'তারপর তোমার গিয়ে শান্তনু রাজার বউ সত্যবতী?'

'সে আবার কী করলো?'

'বিয়ের আগে পরাশরের সঙ্গে?'

'তাই না কি?'

'হ্যাঁ—এ'—এ'—এ'—'

'তাপর, তাপর?'

'তারপর গিয়ে তোমার দ্রৌপদী?'

'ক'জনের সঙ্গে?'

'পাঁচজন! পঞ্চপাণ্ডব! পাঁচজনের পাঁচটা ছেলে হলো।'

রাখাল একেবারে হাসতে হাসতে মরে গেল। মহিমও হাসলো।

'বুঝলে রাখাল, এ সবই বলা হলো যা গগন হালদারকে। উপমা হিসেবে একেবারে থান ইট। বলতাম, অরে বাপু, তোমার মেয়ে তো আর মহাভারতের মেয়েদের চাইতে উৎকৃষ্ট নয়। আর তুমিও কিছু সেইসব মহাপুরুষদের চাইতে মহৎ নও। যেমন কুন্তী বললেন, পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে নাও। ব্যস, অমনি বউ নিয়ে কাড়াকাড়ি। গুরুজনে বললে আবার দোষ কী? আগে গুরুজনরা আদেশ দিলে সব মেয়েকেই সব করতে হতো। মেয়েরা তো গরু। নইলে কি দ্রৌপদী অর্জুনকে ছাড়া আর কারো গলায় মালা দেয়? অর্জুনের বউ হয়েই তো এসেছিলো। কিন্তু কুন্তী বললে—'

'স্বামী করতে হবে পাঁচজনকেই, হ্যাহ্ হ্যাহ্ হ্যা, লেস্‌সালা, কলজের জোর আছে মেয়েছেলেটার। তা যাই বলিস মহিমদাদা—' বোঝা গেল এসব কথায় আবেগ উঠে গেছে রাখালের, 'ছিলো বটে সেসব দিন। এখনকার মেয়েছেলেগুলো যেন সোব পিরিং পিরিং করে। আরে বউটা যে বউটা, সেটা পর্যন্ত মুখ ঝামটা দিয়ে সোয়ে সোয়। মাগীর তেজ কতো, বলে খেতে দিতে পারবে না, পরতে দিতে পারবে না, শুধু শুধু ছেলে বানাবার গোসাঁই। সোন, কথা সোন।'

'তার মানে, গগন আদেশ করলে তার বউ হোক মেয়ে হোক—'

'সুতে বাধ্য, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। আর কুমারী অবস্থায় মা হয়ে কুন্তী সত্যবতীর যদি আবার বিয়ে হতে পারে—মজা দেখ রাখাল, দু'জনেরই দুটো ছেলে আছে আগের।'

'তাইতো।'

'একেবারে কুমারী অবস্থায় ছেলে। অথচ আবার বিয়ে করলো, আবার ছেলেপুলে হলো।'

'আঃ, কী সোব দিনকাল ছিলো। কোথায় গেল সে সোব।' রাখাল দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, 'আর এখোন? বেটীগুলোর পয়সার কী খাকতি রে বাবা।'

'তারপর তোমার গিয়ে শান্তনুর দুই ছেলের বিধবা বউ দুটো? আরে, ঐ যে পাণ্ডু আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মা—কী যেন নাম?'

নামে আর কাম নেই, সোবার কথা বলে দিন—'

'পাণ্ডু পাণ্ডু হলো কেন? পাণ্ডু অর্থ জানো তো? হলদে। ব্যাসদেব যখন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল আর গায়ের দুর্গন্ধ নিয়ে এসে বিছানায় উঠলেন, একটা বউ ভয়ে হলদে হয়ে গেল। ছেলেও অমনি পোঁচা মেরে গেল। আর একটা বৌ ভয়ে চোখ বুজলো অমনি ছেলে অন্ধ হলো। অর্থাৎ ব্যাসদেব রেগে অভিশাপ দিলেন। অর্থাৎ এটাই প্রমাণ

…নো পছন্দ অপছন্দের কথা থাকবে না।
…পুরুষ যখন চাইবে—'
অর্থাৎ পুড়তে চাইবে—' টাগরায় জিব
…রে টক টক শব্দ করলো রাখাল—কাকে
…পা দিতে দিতে ব্রেক কষলো।

৩৩

আজ মঙ্গলবার। সেই মঙ্গলবার। ঠোঁট
…ড়ে নেড়ে বিড়বিড় করছিলেন গগনবাবু।
…দ চড়ে গেছে অনেক, অনেক বেলা হয়ে
…ছে, সেদিকে তাঁর খেয়াল হলো না। কী
…বতে ভাবতে তিনি মোহের মতো কোন
…কে পা বাড়ালেন।

ছ'য়ের পিঠে ক'টা শূন্য? ভুরু কুঁচকে
…ঃশব্দে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন?
একটা? মানে ষাট? ষাট টাকা। না, ষাট
…কাও আমি অনেক দিন একসঙ্গে চোখে
…দেখিনি। কী? একটা শূন্য নয়? দুটো?
…দুটো শূন্য? ছয়ের পিঠে দুটো শূন্য?
…ছ'শো? ছ'শো টাকা। সে যে অনেক। কবে
…দেখেছি অত টাকা? মনে তো পড়ছে না।
কী একটা শুধু স্বপ্নের মতো, ধোঁয়ার
মতো স্মৃতির কুয়াশা ঘন থেকে ঘনতর
হচ্ছে শুধু। অ্যাঁ। তা ও নয়? দুটো শূন্য
নয়? তিনটে? তিনটে? তিনটে? এক শূন্য।
দুই শূন্য। তিন শূন্য। সত্যি। সত্যি।
সত্যি। তার মানে ছ হা-জা-র টাকা? মাত্র
তিন সপ্তাহের রোজগার? তারপর ঘরের
মেয়ে আবার ঘরে ফিরে আসবে? আর তার
বিনিময়ে আবার বেঁচে উঠবে সব? মরা
গঙ্গায় বান ডাকবে; শুকনো ডালে পাতা
গজাবে। ফুল ফুটবে, পাখি বসবে?

আমি ডাক্তার নিয়ে আসবো, আমি ওষুধ
আনবো, পথ্য আনবো। লক্ষ্মী! আমার
প্রিয়তমা! দেখতে দেখতে তুমি সেরে উঠবে?
পার্থ! আমার বুকের পাঁজর! দেখতে
দেখতে তোর ধিকি ধিকি প্রাণের সাত
বছরের মরা কলজেটা, আবার দুলতে থাকবে
সজোরে? সত্যি? সব সত্যি? কী ভীষণ
কথা! কী অবাক করা কথা! কী ভয়ঙ্কর
দাম! সেই যে কবে কোন রাজা স্বপ্ন দেখে-
ছিলেন ছেলে কেটে রক্ত দিলে জল থইথই
করে উঠবে নির্জলা অভিশপ্ত দিঘিতে,
এক প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে যাবে সহস্র প্রাণ.
সেই স্বপ্নই তো আর এক চেহারায় বাস্তব
হয়ে উঠছে তাঁর জীবনে। শুধু কি লক্ষ্মী
আর পার্থ? মালতীই কি বাঁচবে না? তাকে
আমি নিয়ে যাবো বড়ো সার্জেনের কাছে
ভাঙা পা জোড়া লাগবে। ও আবার উঠতে
পারবে, হাঁটতে পারবে, ফিরে পাবে মানুষের
জীবন। উপচে পড়া যৌবনে জোয়ার আসবে
বালিকা হয়ে থাকা শুকনো দেহে। হাসি
ফুটবে মুখে। রূপাকেও ভর্তি করে দেব
স্কুলে, ওর বেলায় মন কাজ পেয়ে ভুলে
যাবে বাইরের কথা। আর চামেলী? আমার
চামেলী। ঠিক যেন তার দিদি। কী দুঃখ,
কী সহানুভূতি, কী মুখোড়! ওকে আমি
অনেক দূর পর্যন্ত পড়াবো। ও একটা
মানুষের মতো মানুষ হবে। তারপর আরো
পাঁচটি সন্তান, অতীতের সেই সব শান্ত
বাধ্য ভদ্র ছেলেরা। তারা আবার আগের
সহবত ফিরে পাবে। শীতে গ্রীষ্মে নিরাবরণ
দেহে আবরণ উঠবে আবার, ফেটে যাওয়া
কচি পায়ে জুতো মচমচ করবে, বই বগলে
আবার পড়তে যাবে, ঠিক মতো ফিরে
আসবে ঘরে, খাবে, খেলবে, বার বার মায়ের
মহিমায় একদিন তেমনি মহিমান্বিত হয়ে
উঠবে।

ওদের সকলের জন্মের কথা মনে পড়ে
যাচ্ছে আজ। একে একে এসে কেমন ভরে
ফেললো বাড়িটা। ভরে ফেললে মন প্রাণ।
পার্থ তো এই সেদিন জন্মালো। মাত্রই সাত
বছর আগের কথা। মানদা দাসী যে শাঁখ
বাজালো গাল ফুলিয়ে সে শব্দও তো কান
পাতলে শুনতে পান গগনবাবু। বউদিরা
এলেন রাজার দেউড়ি থেকে, বাবা সন্দেশ
খেতে টাকা দিলেন সকলকে, ঢাকার সবচেয়ে
বড়ো গাইনোকোলজিস্ট কড়কড়ে তিনখানা
তিনশো টাকার নোট পকেটে নিয়ে উঠলেন
গিয়ে ফিটনে। ঢাকার বড়ো লোকদের
মহাযান। মোটর তো ছিলোই না মোটে।
যাদের ছিলো তাদের হাতের এক আঙুলে
গোনা যায়। যেমন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল
মৈত্র সাহেবের একখানা, ম্যাজিস্ট্রেটের এক-
খানা, ব্যারিস্টার পি কে দাশের একখানা—
পি কে দাশের সুন্দরী সুন্দরী তিনটি
মেয়ে ছিলো। দু'জন সেই মোটরে চড়ে
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। একজন
বি এ, একজন এম এ। ছেলেরা পাগল পাগল
হয়ে উঠতো তাদের দেখলে। শহরের লোক
সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো। পেট কাটা, হাত
কাটা জামা, খাটো চুল, ঠোঁট মুখে রং, আবার
মাঝে মাঝে নাকি গাড়ির ভিতরে বসে
সিগেরেটও খেতে দেখেছে কেউ কেউ। লম্বা
লম্বা আঙুলের লম্বা নখে লাল টুকটুকে
পলিশ, সেই আঙুলে ধরা সিগেরেট। তবে
কেন তাকিয়ে থাকবে না? এর চেয়ে বেশী
রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কী বেশী ঘটতো
সেই শহরে?

ওরা থাকতো নীলক্ষেতের এক মস্ত
একতলা বাড়িতে। বারান্দায় বসে বসে চা
খেতো আড্ডা দিত। কখনো লনেও বসতো
সবাই গোল হয়ে, কুট কুট করে সমুদ্দুরের
হাসতো। ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ভাব করতে
ওদের লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই ছিলো না।
তাই নিয়ে কী টিটি ছেলেগুলো সাইকেল
নিয়ে আশিবার চক্কর দিতো পাড়াটা। ঐ
আভাসে ইঙ্গিতে যতোটুকু দেখা যায়
পাওয়া যায়।

টিকাটুলি থেকে নীলক্ষেত, দোজা দূ…
নয়। গগনবাবু কখনো দেখেন নি সেসব।…
ওরাও যেমন এ পাড়ার জানতো না, ইনি…

…ঘরের
…। ছেলে
…তাদেরকেই
…নিশ্চয়ই
…এখানে
…কান্নার
…হাতে
…ড়া আর
…নে হচ্ছে
…কছু সে
…তেমনি
…আছে
…ব বড়ো
…অদ্ভুত

অপেক্ষায় কাঁপছে থরথর করে, বাঁ পাখানা
তেমনি সামনের দিকে ছড়ানো। চামেলী
মুখ গুঁজে আছে হাঁটুতে, থেকে থেকে
ঝেঁকে উঠছে পিঠটা। অর্জুনও জানালায়
দাঁড়িয়ে কাঁদছে হেঁচকি তুলে তুলে, সবু
ঘুমিয়ে আছে মাটির উপরে গড়িয়ে।
অতসী চামচে দিয়ে পার্থকে কী খাওয়াচ্ছে
নিচু হয়ে।

প্রথমে সে-ই বাবাকে দেখলো, ব্যস্ত
পায়ে ছুটে এলো কাছে, তার ঠোঁট দু'টো
কাঁপতে লাগলো কান্না থামাবার অক্লান্ত
চেষ্টায়। ইশারায় সে মায়ের কাছে যেতে
বললো। গগনবাবু বুঝলেন, সময় হয়ে
এসেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি স্ত্রীর
পড়ে থাকা হাতটা ছুঁলেন, সহসা ভরা-
জীবনের সদ্য প্রেম অনুভব করলেন বুকের

কিন্তু অতসীর মায়া বেঁধো যে কীভাবে কাটলো সে কথা শুধু সেই জানলো। তার মায়া রইলো না, আজ্ঞা রইলো না, শুধু ঘর বার করতে করতেই পায়ের খড়ি ছিঁড়ে গেলো। পার্থর জ্বর উঠেছে একশো চার, তাকে সরিয়ে এনেছে বাবার বিছানায়, বারে বারে ধুয়ে দিচ্ছে মাথা, গা মুছিয়ে দিচ্ছে, তাপ কমাবার যতোটুকু জ্ঞান তার সঞ্চিত আছে পাগলের মতো তাই করে যাচ্ছে। ভাই বোনদের দিক বিদিকে ছুটিয়ে দিয়েছে বাবাকে খুঁজে আনতে। গা মুছে মুছে পার্থর জ্বর যদি বা নিচের দিকে নামলো, বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন লক্ষ্মী। তিনি স্বামীকে খুঁজলেন, ছেলেমেয়েদের খুঁজলেন, মূর্ছা গেলেন দু'বার—মাকে যে কী প্রক্রিয়ায় সারিয়ে তুলবে বুঝতে পারলো না অতসী। ভাইবোনদের মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ আর বাড়ি থেকে এক পা বেরুচ্ছে না, এক পা নড়ছে না মায়ের তক্তপোশের ধার থেকে। এদিকে জ্বর ছেড়ে দিদিকে আঁকড়ে ধরেছে পার্থ, ছাড়তে চাইছে না এক মুহূর্তের জন্য। তার উপরে টেলিফোন-বাবু কৈলাস বিশ্বাসের ঘরে গানবাজনার আসর বসলো। হারমোনিয়মের প্রবল শব্দের সঙ্গে তার নতুন বড়োলোক শালার উদাত্ত কণ্ঠের আধুনিক গান সমস্ত পাড়া প্রকম্পিত করে তুলেছিলো, মা-ও কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন সেই প্রচণ্ড আওয়াজে, মনে হচ্ছিলো এই বুঝি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

এই গায়কটিকে অতসী চেনে। অতসীর প্রতি এক অত্যুৎসাহী যুবক। গানটাও বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই গীত হচ্ছিলো। প্রায়ই আসে, এটা ওর দিদির বাড়ি। ঠিকাদারি করে কিছু কাঁচা পয়সা এসেছে হাতে। এলেই খুব খাওয়াদাওয়ার ধুমধাড়াক্কা হয়, আজ মাংস নিয়ে আসে তো কাল রুই কাতলা, পরের দিন হয়তো হাঁড়ি-ভর্তি দই মিষ্টি। এ পথ দিয়ে ঘুরে যায় বাজার নিয়ে। ক্রীং ক্রীং সাইকেলের বেল বাজিয়ে অবহিত করে গৃহস্থদের। আর সেই সঙ্গে এইসব হইচই। অতসী যে কী করবে, কোন দিকে যাবে, ভেবে পাচ্ছিলো না। শুধু তো মা আর ভাই-ই নয়, বাবার চিন্তাতেও সে পাগলের মতো হয়ে উঠছিলো ভিতরে ভিতরে। অথচ প্রকাশ করার উপায় নেই। সকলের কাছে এমন ভান করতে হচ্ছে যেন বাবার এরকম একটা অনুপস্থিতির কথা আগে থেকেই জানতো সে। ভাইবোনদের ব্যাকুলতা কমাবার জন্যও, আর মার জন্য তো বটেই। মা যদি জানেন বেলা এগারোটায় স্নান করতে গিয়ে, রাত প্রায় ন'টার মধ্যেও ফেরেন নি তাঁর স্বামী তা হলে কি তিনি আর এক মুহূর্তও বাঁচবেন? সেই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর কোথায়?

কিন্তু গগনবাবু এলেন। রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দ পায়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

বাড়িটা [illegible] [illegible]। ঘরের চার দিকে তাকালেন তিনি, বড়ো ছেলে দুজনকে বাদে সব কটি সন্তানকেই দেখলেন বসে আছে মাকে ঘিরে, নিশ্চয়ই তাঁকে খুঁজতে গেছে বলে তারা এখানে অনুপস্থিত। প্রত্যেকের মুখই কান্নায় ভেজা। চম্পা বসেছে শিয়রে, তার হাতে পাখা।

এই মুহূর্তে দুঃসহ বেদনা ছাড়া আর কিছু লেখা নেই তার চেহারায়। মনে হচ্ছে মাকে ফেরত পেলে জীবনের সব কিছু সে পণ রাখতে রাজী। মালতীর তেমনি অভিভূতের ভঙ্গি, তেমনিই তাকিয়ে আছে স্থির হয়ে, শুধু চোখ দুটো খুব বড়ো বড়ো দেখাচ্ছে। যেন একটা অদ্ভুত [illegible] কাঁপছে থরথর করে, বাঁ পাখাটা তেমনি জানালার দিকে ঘুরালো। চামেলী মুখ গুঁজে আছে হাঁটুতে, থেকে থেকে ফোঁপে উঠছে পিঠটা। [illegible] জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে [illegible] মুখ তুলে, সব ঘুমিয়ে আছে খাটের উপরে [illegible]। অতসী চামচে দিয়ে পার্থকে কী খাওয়াচ্ছে নিচু হয়ে।

প্রথমে সে-ই বাবাকে দেখলো, ব্যস্ত পায়ে ছুটে এলো কাছে, তার ঠোঁট দু'টো কাঁপতে লাগলো কান্না আমাবার অক্লান্ত চেষ্টায়। ইশারায় সে মায়ের কাছে যেতে বললো। গগনবাবু বুঝলেন, সময় হয়ে এসেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি স্ত্রীর পড়ে থাকা হাতটা ছুঁলেন, সহসা জরা-জীবনের সদ্য প্রেম অনুভব করলেন বুকের

মধ্যে। মনে হলো, সন্তানরা যদি তাঁর পাঁজর, এই জানুবটা তাঁর হৃৎপিণ্ড। সেই হৃৎপিণ্ডেই টান ধরলো তাঁর। পার্থর দিকে তাকাতেও ভুলে গেলেন। ছটফট করে সরে এলেন এদিকে, এলেন দরজার বাইরে বারান্দার অন্ধকারে। কয়েকটা বড়ো বড়ো মশা একসঙ্গে আক্রমণ করলো মুখের উপর, খেজুর পাতার বাতাস বয়ে গেল শব্দ করে, তিনি দু' হাতে বুকটা চেপে ধরে মোচড়াতে লাগলেন সারা শরীরে।

অতসী এলো। অশান্ত গলায় বললো, 'বাবা, একজন ডাক্তার, একজন ডাক্তার, যে করে হোক একজন ডাক্তার নিয়ে এসো তুমি—' তার গলা বুজে বুজে যাচ্ছিলো কান্নায়।

সারা শরীরে চমকে উঠে গগনবাবু বললেন, 'ডাক্তার? তুই ডাক্তার আনতে বলছিস? ডাক্তার এলে ভালো হবেন তোর মা?'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।'

'আর পার্থ?'

'দু'জনের জন্যই এই মুহূর্তে একজন ডাক্তার দরকার, কত দিন এক কোঁটা ওষুধ পড়েনি, কত দিন—কত দিন—' অতসী কথা বলতে পারছিলো না।

মেয়ের মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন গগনবাবু।

'সারা দিন তুমি কোথায় ছিলে বাবা? কী যে গেছে—'

'তা হলে বলছিস, একজন ডাক্তার আনা উচিত? তা যে করেই হোক?'

'যে করেই হোক। হাতে পায়ে ধরে—'

'তবে চল।'

'আমি!'

'তুই না গেলে ডাক্তার আসবে কেমন করে? কেমন করে ওরা ভালো হবে, বেঁচে উঠবে?'

'কিন্তু—'

'দেরি করিস না, সময় নেই হাতে।'

'ওদের রেখে দু'জনেই বেরিয়ে যাবো?'

'কিছু হবে না।'

বাবার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি, অসংলগ্ন কথা এসব ছাপিয়ে অতসী যেন হঠাৎ বুঝতে পারলো, তিনি কী বলতে চাইছেন। তার মনে হলো, বাবা যা পারবেন না, সে তা পারবে। মায়ের জন্য, ভাইয়ের জন্য, সে যদি গিয়ে কোনো ডাক্তারের পা জড়িয়ে কেঁদে পড়ে তা হলে কি তিনি না এসে পারবেন? হাজার হোক একটা মানুষই তো! তা ছাড়া সে একজন মেয়ে, বাবার চেয়ে তার উপরই হয়তো বেশী দয়া হবে। আর কোনো কথা বললো না, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে খাটের তলা থেকে রবারের স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে বললো, 'চলো।' মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতরে তাকালো একবার, ইশারায় চম্পাকে ডাকলো, ফিসফিস করে বললো, 'শোন, শিবু আর কানাই বাবাকে খুঁজতে গেছে, এলে বলিস, বাবা এসেছেন। পার্থকে দেখিস। মাকে একটু একটু করে জলটা খাইয়ে দিস, গলায় ঠেকে না যেন। আমি এখুনি আসছি ডাক্তার নিয়ে।'

চম্পা মুখ নীচু করে মাথা নাড়লো। অতসী তার গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'ভয় পাস না, কেমন?'

গগনবাবু হনহন করে হাঁটছেন, পিছনে অতসী। কারো মুখে কথা নেই কোনো। লক্ষ্য শুধু গন্তব্য। বড়ো রাস্তা দু' মিনিটের পথ। পৌঁছুতে দেরি হলো না। নির্জন রাস্তা তেমনি ফিতে হয়ে পড়ে আছে আলোর তলায় প্রশস্ত অজগরের মতো। গগনবাবু এদিক ওদিক তাকালেন। গাছের আড়ালে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা, পা-দানিতে পা রেখে বিড়ি টানছে মহিম।

গগনবাবুকে দেখেই দৌড়ে এলো, পকেট থেকে একতাড়া নোটের বাণ্ডিলটা এগিয়ে ধরলো, ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, 'গুনে নাও, ছ' হাজার! ফিরে আসবে এক মাসের মধ্যে।'

গগনবাবুর হাত কাঁপছিলো, জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিলো, পিছন থেকে যখন অতসী এগিয়ে এলো সামনের দিকে, তখন তিনি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলেন। একটা গর্জন তুলে এক মোচড়ে গাড়িটা রাস্তার ও পিঠ থেকে এ পিঠে ঘুরিয়ে আনলো রাখাল একেবারে অতসীর শরীরের কাছে। মহিম সরকার আর এক পলক দেরি করার অবকাশ দিলো না, গগনবাবু না, না, না. বলে চিৎকার করে উঠলেন তক্ষণে অতসীকে মহিম এক ঝটকায় তুলে নিলো গাড়িতে। নিঃশব্দ রঙিন ঘরের থাবার মধ্যে উল্টে পড়ে গেল নিচের উপরে। কারা যেন ঝাপটে ধরলো তাকে। (ক্রমশ)

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শংকর

জন্ম ছিল, অর্থাৎ কেরলের মান্দ্রাজে। লেখাপড়া শেষ করে এলেন বোম্বাই শহরে, আর হলেন সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানির মালিক কোটিপতি নরোত্তম মোরারজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি। একই সঙ্গে আইন অধ্যয়ন করতেন। ১৯২৭-২৮ হবে। "বোম্বে ক্রনিক্যাল" খবরের কাগজের সম্পাদক হর্নিম্যান আর পোথান জোসেফ শংকরকে উৎসাহ দিতেন: "আঁকো, আরো ব্যঙ্গচিত্র আঁকো।" ঐ কাগজেই প্রথম বেরুতে আরম্ভ করল তাঁর ব্যঙ্গচিত্র। ঐ দুজন সম্পাদকই ঠিক চিনেছিলেন শংকরের অসাধারণ পরিহাস করার ক্ষমতাকে।

একটি ঘটনা ঘটল। ভারতের ইতিহাসে যার স্থান নেই বললেই চলে। কিন্তু পোথান জোসেফ নামক একটি মহীশূরের লোক নিযুক্ত হলেন দিল্লির "হিন্দুস্থান টাইমস" নামক খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই সূত্রে শংকর এলেন দিল্লিতে আর আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাসে প্রথম নিযুক্ত হল খবরের কাগজের ব্যঙ্গকার: শংকর। তখন ইংরেজের রাজত্ব। অথচ ওয়াভেল, লিনলিথগো (বড়লাট) আর মেকসওয়েল কাউকে বাদ দিতেন না শংকর। চাবুক আর চাবুক সেদিনকার সংগ্রামী "হিন্দুস্থান টাইমস"-এ। ঐ-সমস্ত রাজ-পুরুষরাই লোক পাঠিয়ে শংকরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যেতেন তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রের আসল ছবিগুলো। ইংরাজরা রসিকতা বোঝে, মূল্য দিতেও জানে।

শংকর জেলে যাননি। কিন্তু বরাবর ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার। তাঁর অনেক বন্ধুরা জেলে গেল, আর ঐ দুর্বার স্রোতের টানে শংকর হলেন পরিচিত গান্ধীজী, জওহরলাল আর বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে। নেহরু তাঁকে বন্ধুভাবে নিয়েছিলেন, শ্রদ্ধাও জানাতেন। তদানীন্তন জাতীয় নেতারা শংকরকে, অর্থাৎ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রণকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের অংশ-ভাবেই নিতেন। ১৯৪৫-৪৬এ শংকর দিল্লির জগতে ছিলেন যেন একটা প্রবাদ।

গেল ১৯৪২। গেল যুদ্ধ। তলোয়ারের মতো ঝকমকানো শংকরের ব্যঙ্গ হাতিয়ার। জীবনে ঠেকে শিখলেন যে, নিজের কাগজ না হলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন না। জন্ম হল শংকরের সাপ্তাহিকের, বোধ হয় ১৯৪৮-এ। ভারতের অদ্বিতীয় ব্যঙ্গ সাপ্তাহিক। জুড়ি নেই তার। সেই বছরের ১৪ই নভেম্বর ঘোষিত হল শিশু-দিবস হিসাবে; ১৪ই নভেম্বর নেহরুর জন্মদিন কিনা। কথায় কথায় একজন বলেছিলেন, শংকরের সাপ্তাহিক কাগজের একটা শিশু-সংখ্যা বের করলে বেশ হয়। ব্যস্, লেগে গেল ভাবনাটা শংকরের মাথায়। শংকর তাঁর কাগজের মাধ্যমে

প্রথম করলেন শিশু-কিশোরদের একটা প্রতিযোগিতা—ছবি ও লেখা নিয়ে।

দেশজোড়া বিরাট সমর্থনে শংকরের চোখ খুলে গেল। শিশু-কিশোরের জগৎ, নতুন জগৎ যার খোঁজ কেউ রাখতো না। তারা কী চোখে, কী রঙে দেখে বাইরের জগৎকে, আত্মীয়দের, আর বড়োদের পৃথিবীকে? শংকরের প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল মূশামর উত্তর, শিশু-কিশোরদের হাত আর মন থেকে। ঐ থেকেই জন্ম শংকরের চিত্র প্রদর্শনী, শিশু-কিশোরদের, সম্ভবত ১৯৫০ থেকে। এবং ঐ সূত্র থেকেই জন্ম শংকরের আন্তর্জাতিক শিশু-কিশোরদের চিত্র প্রতিযোগিতা। গত বছর এক লক্ষ দশ হাজার ছবি এসেছিল ঐ প্রতিযোগিতায়। নানা দেশের অনুরোধে আজ শংকরের ঐ চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রায় ১০।১২টি দেশে। এবং দুনিয়াতে শিশু-কিশোরদের চিত্রজগতে শংকর যা করেছেন, অন্য কেউ তা করতে পারেন নি। আমাদের চেতনময় জগতের এক নতুন ভাবময় জিনিস, নতুন যেন মানবতার ছোঁয়া, যা বয়স্কদের পাপে হয় নি দূষিত। নতুন জগৎ, নতুন মানুষ।

নেহরু তাঁকে অনেক সাহায্য করেছেন। শংকর লেগে গেলেন আরো নতুন কাজে। ভারত সরকারের ঋণ নিয়ে (২৫ লক্ষ টাকা) তৈরি করলেন মথুরা রোডে চারতলা বাড়ি। আজ সেখানে 'শিশু পুস্তক ট্রাস্ট'। বাচ্চাদের জন্য লেখা হচ্ছে, সুন্দর সুন্দর

ছোটদের পেন্টিং প্রদর্শনীতে শংকর লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে ছবি দেখাচ্ছেন

ছবি দিয়ে, গল্প ও কাহিনীর বই। ছাপা হচ্ছে নিজেদের ছাপাখানায়। একটা এলাহি ব্যাপার: নিজেদের শিল্পী, দামী ছাপাখানা, অনেক সম্পাদক আর প্যানেল্। এখন হচ্ছে ইংরিজী আর হিন্দী। মাস দুয়েকের ভিতর বাঙলা, গুজরাতী ও তামিল ভাষাতেও বেরুবে ছোটদের বই: গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি।

সংগঠক ও ম্যানেজার শ্রীশম্ভু বললেন আমাকে: "আমরা ছোটদের বই লেখার লোক চাই। যাঁরা শিশু-কিশোরদের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন পৃথিবীকে। কথা আর ছবি দিয়ে তৈরী নতুন জগৎ, নতুন মানুষদের জন্যে।"

শংকর আজ সৃষ্টি করেছেন বিরাট এক শিশু-কিশোর-কিশোরীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। কোনো একবার কারা যেন সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, যে-সমস্ত ছবি বাচ্চারা পাঠাচ্ছে, তার কোনোটা হয়তো বড়দের আঁকা। শংকর ও তাঁর সহকর্মীগণ বললেন, আমরা বাচ্চাদের খুব ভাল জানি; তারাই এঁকেছে সব। আমরা প্রমাণ দিচ্ছি।

১৯৫১-৫২ থেকে আরম্ভ হল খোলা মাঠে বসে পেন্টিং প্রতিযোগিতা। বয়সের গ্রুপে ভাগ হয়ে তারা বসে মডার্ন স্কুলের মাঠে। সে এক মস্ত কারবার প্রতি বছর। গড়ে ১০।১৫ হাজার ছেলেমেয়ে আসে। সব চাইতে ভালগুলি নিয়ে, বিদেশীদের চিত্রাদি নিয়ে হয় প্রতি বছর প্রদর্শনী। শংকরের এই প্রয়াস পৃথিবীর বৃহত্তম, এবং উনিই এনেছেন গোটা দুনিয়ায় এক নতুন আর্ট আন্দোলন: শিশু-কিশোর-কিশোরীদের নির্ভেজাল দৃষ্টিরূপ।

চারতলা ঐ বাড়িটার নামকরণ হয়েছে গত বছর 'নেহরু ভবন'। বাইরে আছে সুন্দর ফ্রেস্কো: ছোটদের আঁকা ছবির প্রতিফলন, শিল্পী কুলকার্নি মহাশয়ের। উনি তৈরি করছেন শিল্পীদের যাতে তারা ছোটদের মনোমতো ছবি আঁকতে পারেন ছোটদের বইয়ে।

শংকর আরো করেছেন সেই বাড়িতে একটা পুতুলের মিউজিয়ম। নানা দেশের পুতুলেরা। অভিনব নতুন জগৎ, তারা যেন নতুন মানুষ, শিশু আর কিশোরদের মতই নতুন। পুরোনো মানুষ শংকরের নতুনত্ব, আমার-আপনার-শংকরের জগৎ।

—খগেন দে সরকার
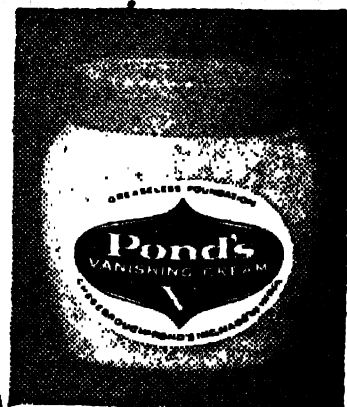
শ্রীনীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

শ্রদ্ধেয় শ্রীনীরদ চৌধুরীর পোশাক সম্বন্ধে প্রবন্ধটির বিষয়ে কিছু লিখতে চাই। পোশাক কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ এসব সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। নিজের পছন্দ অপছন্দ নিশ্চয়ই আছে, প্রত্যেক মানুষেরই যেমন থাকে। সে পছন্দ অপছন্দ কখনোই গুরুত্ব সহ যুক্তি দিয়ে পরীক্ষা করিনি। করতে গেলে সব সময়ই ভয় হয়, নিজের সংস্কার, বায়াস ও প্রেজুডিস, হয়তো সে-সব কথার উৎস, যুক্তি নয়। তা ছাড়া নিজে যে পরিবেশে বড় হয়েছি তার সাজসজ্জায় শিরওয়ানী পায়জামাও ছিল আর ধুতি লুঙ্গিও ছিল। যুদ্ধের পূর্বে নিজের জীবনের অধিকাংশটা কেটেছে। পোশাক বিষয়ে নিজের পছন্দ অপছন্দটা তখনও থাকেনি এখনও নাই। এসব কারণে দৃঢ় আস্থা রেখে পোশাকের পছন্দ অপছন্দ বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন।

সরকারী দপ্তরে দেশের সাধারণের ব্যবহৃত ধুতিবিশিষ্ট পোশাকের অমর্যাদার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার সম্বন্ধে তাঁর যা প্রতিবাদ সে প্রতিবাদ দেশের সাধারণের সকলেরই সমর্থন পাবে। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ নির্বিশেষে আমার বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক সব মানুষই এ প্রতিবাদে যোগ দেবেন। এমন কি, সালওয়ার পায়জামা পরা পাঞ্জাবীরাও থাকবেন। আমার মত ধুতি পরিহিতেরা তো থাকবেনই। কিন্তু শ্রীনীরদ চৌধুরীকে একটা কথা নিবেদন করতে চাই। অমর্যাদাটা কি শুধু পোশাকের জন্য? ধরুন একই সাহেবী পোশাকে শ্রীনীরদ চৌধুরী ও একজন বিলাতী সাহেব সম্পূর্ণ অপরিচিত-ভাবে কোনও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরার সামনে একই সময়ে দর্শনপ্রার্থী হয়ে হাজির হলেন। বিলাতী সাহেব যে অগ্রাধিকার পাবেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে কি? 'স্বাধীনতা' যখন দান বলে প্রচারিত, তখন দাতার অগ্রাধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। এটা কি মনে হয় না যে, ধুতির অমর্যাদাটার গভীরতর অন্য কিছুর সঙ্গে সংগতি আছে, যা আরও বেদনা-দায়ক! আর্কিমিনিড রাজত্বকালে পারস্যের মহারাজাধিরাজের কাছে নজরানা নিয়ে ভারতীয় নীত হয়েছিলেন তাঁর দেশী পোশাকে। সেদেশ উপস্থাপ অনাবৃত আর [illegible] এক বস্ত্র। ('১'—পৃষ্ঠা ১৬৮)* দিল্লীর সিভিলিয়ান কি আর্কিমিনিড রাজাধিরাজের চেয়ে বড়? যুগের ওজন (ওয়েটেজ) অনুযায়ী তুলনা করতে গেলে কুলপ্রদীপ কত্র দিল্লীর সিভিলিয়ান উচ্চ হয়ে যান।

প্রবন্ধটিতে পোশাকের বিষয় অতিক্রম করে অনেক কিছুর অবতারণা করা হয়েছে যা অনেক কিছু বলা হয়েছে। ঐসব সম্বন্ধে প্রবন্ধে আলোচনার অবসর থেকে গেছে। তাই উত্থাপিত (সব বিষয় না হোক) কিছু বিষয় সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে। লিখতে সংকোচও হয়। খ্যাতিমান পণ্ডিত মানুষের লেখা উপলক্ষে লিখতে গেলে আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীনীরদ চৌধুরীর লেখা যেমন পড়ে থাকি তেমনই অন্যান্য বিদগ্ধজনের লেখাও পড়ি; সেসব থেকে শিক্ষক ও সুধীজনের কথাবার্তাতেও অনেক জিনিস জেনেছি। সবে মিলে যা জানাশুনা আছে তাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান কেউ বলবে না। কিন্তু তার সঙ্গে তফাত হলে বা তার বিরোধী হলে সেটা মুখ ফুটে বলতে হয়।

ধরুন, তিনি শূন্য পুরাণের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেনঃ "আমার শূন্য পুরাণে আছে যে ব্রাহ্মণদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্রহ্মা আদি দেবগণ যবনে হইয়া হৃষ্টমন আনন্দেতে পরিল ইজার..."। শূন্য পুরাণের উদ্ধৃত লেখায় প্রতিশোধটা বৌদ্ধদের উপর নয়, ব্রাহ্মণদের উপর। অভিযোগটা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সম্বন্ধে এবং অভিযোগটা বৌদ্ধদের।

"এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার।
অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুণ্ঠ ত্যাজি ধর্ম
মায়ারূপী হইল খোন্দকার
হইয়া যবনরূপী শিরে পরে কালটুপী
....
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।" (২)

অবশ্য এতে তাঁর বক্তব্য বিষয়ে কিছু আসে যায় না।

সব চেয়ে গোল লাগে তাঁর প্রবন্ধে পরস্পরবিরোধী দুইটি বক্তব্য নিয়ে। প্রবন্ধের শিরোনামায় একটি 'পোশাক'কে তিনি মুসলমানী পোশাক বলছেন। প্রবন্ধের ভিতরেও বলেছেন। যথাঃ—"...মুসলমানী রীতি বর্জিত, অর্থাৎ তাহাদের ভাষা হইত উর্দু, পোশাক হইত আচকান আদি আদবকায়দাও হইত মুসল-মান সম্মত।..." "...তাহাদের দেশী পোশাকও ছিল মুসলমানী..." "...তিনি এই পোশাক ছাড়িয়া তাঁহার পরিবারের ধারার মত মুসলমানী পোশাকে ফিরিয়া গেলেন।..." "...উত্তর মুসলমানী পোশাক পরা ভিন্ন উপায় নাই..." "...যবনী বারাঙ্গনার ধর্ম আনিতে হইলে মুসলমানী পোশাক আনিতে হইবে..."

মূল শিরোনামায়, বক্তব্যের মূল স্রোতে

---

* উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির শেষে সংখ্যা দিয়ে প্রবন্ধের শেষে সেই সংখ্যায় উদ্ধৃত পুস্তকের বিবরণ দেওয়া আছে। সংখ্যার পাশে পৃষ্ঠা উক্ত পুস্তকের পৃষ্ঠা।

এবং এক্তগ্নলি ক্ষেত্রে 'মুসলমানী পোশাক' বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার বলছেন ঃ—

"আমাদের শাসক সম্প্রদায় যে মুসলমানী পোশাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা মুসলমানী পোশাক নয়।" ..."এইবার চুড়িদার পায়জামার কথা। এই বস্তুটি মুসলমানের নয় বলিয়া আমার অনুমান। আমি যতদূর জানি ইহা মুসলমান আসার আগে আমাদের দেশে আসিয়াছিল ও (নিশ্চয়ই) আমার মতে শক হুন গুর্জর প্রভৃতি অশ্বারোহী যাযাবর জাতিরা ইহাকে আনিয়াছিল।" ..."এখন মেয়েদের মুসলমানী পোশাকের কথা বাকী। ইহা পুরাতন মুসলমানী পোশাক নয়। এমন কি হিন্দুস্থানের সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদের পোশাক নয়।..." "...সালওয়ার" কামিজ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন ইহা আদিতে নিশ্চয়ই হুন, তুরুস্ক, তাতার প্রভৃতি যাযাবর বা আর্য যাযাবার জাতির পোশাক ছিল..."

এইরকম বিরোধী উক্তি (বা এইরূপ উক্তি যা বিরোধী মনে হয়) পাশাপাশি থাকলে বক্তব্য সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হতে সাহায্য করে না।

নিজে চেষ্টা করে দেখা যাক বিষয়টা আলোচনা করলে বা অন্যত্র অর্জিত ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কি রকম দাঁড়ায়।

মুসলমানী পোশাক

প্রথমে একটা প্রশ্ন আসে : মুসলমানী পোশাকটা কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন : আচকান পায়জামা (চুড়িদার ও সালওয়ার) এর বিবর্তনের সবিশেষ ইতিহাসটা কি? তৃতীয় প্রশ্ন : আমাদের দেশী পোশাক কি?

মুসলমানী পোশাক বলতে প্রধানত তিন রকম অর্থ হতে পারে, যথা—এক, মুসলমান ধর্মের অনুশাসনে নির্দেশিত পোশাক; দ্বিতীয়, হজরত মোহম্মদ পরিহিত পোশাক এবং পয়গম্বরের আচরণ হিসাবে মুসলমানদের অনুকরণীয় পোশাক: তিন, পৃথিবীর বেশীর ভাগ মুসলমানের পরিহিত পোশাক। এর যে কোনও একটা অর্থে বা একাধিক অর্থের মিশ্রণে 'মুসলমানী পোশাক' হতে পারে।

মুসলমান ধর্মের নির্দেশ সম্বন্ধে বলতে হবে এই নির্দেশ প্রথমত দেহের আচ্ছাদন সম্বন্ধে। দেহের কতটা আচ্ছাদন বাধ্যতামূলক তারই নির্দেশ।(৩) এ ছাড়া ইসলাম ধর্মে বাধ্যতা করে কোনও সুনির্দিষ্ট পোশাকের নির্দেশ নেই। কাজেই এই অর্থে বিশেষ কোনও পোশাকই 'মুসলমানী পোশাক' বলে আখ্যায়িত হতে পারে না।

এখন হজরত মোহম্মদের পরিহিত পোশাক সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। হজরত মোহম্মদ ও তৎকালীন আরব ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দেশের একজন বড় অথরিটি মরহুম মৌলনা শিবলী নোমানী। তাঁর উর্দুতে লেখা হজরত মোহম্মদের জীবনী "সীরাতুন নবী" থেকে উদ্ধৃত করছি :

"...আম লেবাস চাদর,
কামীজ আওর তাহবন্দ্ থী।
পাজামা কভী ইস্তেমাল
নহীঁ ফারমায়া।...-

অর্থ : "তাঁর সাধারণ পোশাক চাদর, কামীজ এবং তহবন্দ্ ছিল। পাজামা তিনি কখনও ব্যবহার করেন নি।"(৪) কোমরে জড়ানো একখণ্ড কাপড় অর্থাৎ সেলাই না করা লুঙ্গিকে বলে তহবন্দ্। সুতরাং হজরত মোহম্মদের পরিহিত বস্ত্র এই অর্থেও আচকান পাজামা মুসলমানী পোশাক হয় না।

এখন তৃতীয় অর্থ। দুনিয়ার বেশীর ভাগ মুসলমান কিরূপ পোশাক পরিধান করেন? হজরত মহম্মদের আগেই আরবে পাজামা প্রবেশ করেছিল, তারপর আরও প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু তহবন্দ্ এখনও আছে। আর তা ছাড়া আরব পোশাককে ঠিক আচকান্ পাজামা বলা যায় না। বরং রবীন্দ্রনাথের উপরকার পোশাক আরব পোশাকের মত। পারস্য, আফগানিস্তান ও উত্তর ভারত এখানেই মুসলমানদের মধ্যে পাজামার বা আচকানজাতীয় কিছুর এবং পাজামার বা প্যাণ্টলুনের চলন বেশী। সোভিয়েত এশিয়াতেও তাই। চীনেও পাজামার চলন। এইসব দেশ ছাড়া বাকী ভারত উপমহাদেশে উত্তর বাংলা ও মালাবার অঞ্চলে মুসলমানদের পরিধেয় হচ্ছে ধুতি, লুঙ্গি বা তহবন্দ্। ব্রহ্মদেশ, মলয়, জাভা প্রভৃতি দেশেও লুঙ্গি বা তহবন্দ্। দেখা যাচ্ছে, আচকান পাজামার স্থান খুবই সঙ্কীর্ণ। খোদ আরব থেকে শুরু করে লুঙ্গি বা তহবন্দের স্থান কম নয়। জনসংখ্যা হিসাব করে কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। বিশেষত মালাবার, বাংলা দেশ ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত পোশাক হচ্ছে ধুতি বা লুঙ্গি। অন্ততপক্ষে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের পরিধেয় হিসাবে বিচার করলেও আচকান পাজামা মুসলমানী পোশাক হিসাবে নির্দিষ্টভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না।

সুতরাং দেখা গেল, প্রধানত তিনটি অর্থেই আচকান পাজামা বা শিরওয়ানী পাজামা 'মুসলমানী পোশাক' বলে নির্দিষ্ট হয় না।

আচকান প্যাজামার বিবর্তন

এখন আচকান পাজামার বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে দেখা যাক।

প্রথমে পাজামা সম্বন্ধে ধরা যাক। শ্রীনীরদ চৌধুরী চুড়িদার পাজামা সম্বন্ধে বলেছেন, "আমি যতদূর জানি ইহা মুসলমান আসিবার আগে আমাদের দেশে আসিয়াছিল ও নিশ্চয়ই (আমার মতে) শক হূন গুর্জর প্রভৃতি অশ্বারোহী যাযাবর জাতিরা ইহা আনিয়াছিল।" আমি শুধু যোগ করব বোধহয় আরও পূর্বে এসেছে। কালক্রমে এইভাবেই বিদেশ থেকে মুসলমান আসার আগেই সালওয়ার পাজামাও এসে থাকতে পারে তা আমি পরে দেখাব। ঐতিহাসিক বলছেন : "......পাজামাবিশিষ্ট পোশাকের আদি নিবাস মনে হয় মধ্য এশিয়া। সেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে অশ্বারোহী জাতিসমূহ আঁটসাঁট ফিট্ করা চামড়ার পোশাক পরত। এই এলাকার পূর্বদিকে আমরা দেখতে পাই পাজামা পরিধান প্রসারিত হয়ে চীন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পশ্চিমদিকে ইরান জাতিসমূহের মাধ্যমে দক্ষিণ রাশিয়ায় ও সেখান থেকে ধীরে ধীরে আতলান্তিক সমুদ্রতট পর্যন্ত এসেছে। সেখানে আমরা প্রাচীন গল জাতির পোশাকের মধ্যে একে দেখতে পাই।" ('১'—পৃষ্ঠা ১৬১) পারস্যে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আকিমিনিড রাজত্বকালেই পাজামা চালু দেখা গেছে। হিরোডোটাস তাঁর ইতিহাসে বলছেন

লিডিয়ার রাজা ক্রেসাস (Croesus) যখন পারস্যসম্রাট কাইরাসের (Cyrus) সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি করছেন তখন একজন লিডীয় তাঁকে সাবধান করছেন, "হে রাজা, তুমি এমন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ যারা চামড়ার পাজামা পরে ইত্যাদি ইত্যাদি।" ('৫'; এবং '৬'—পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯) "পারসীয়রা প্যান্টালুনকে অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে নিয়ে এসেছিল।"(৭) "......প্রাচীন পারস্য পোশাক কোট আর পাজামা..."। ('৯'—পৃষ্ঠা ১৬২) খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ পর্যন্ত আকিমিনীড রাজত্বকালে আঁটসাঁট পাজামা প্রচলিত ছিল। আলেকজাণ্ডারের পারস্য-বিজয়ের পর প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেলুকিড বংশ। এ'রা এবং এ'দের পর আরসাকিড রাজবংশ খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ'দের রাজত্বকালে পোশাক পরিচ্ছদে গ্রীক প্রভাব পড়ে। কিন্তু খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানিড রাজত্বকালে পুনরায় পারস্যের আদি পোশাক ফিরে আসে। (সাসানীয় রাজত্ব সপ্তম শতাব্দীতে শেষ হয়)। কিন্তু এ সময় যে পাজামার ছবি পাওয়া গেছে তা ঢিলেঢালা, সালওয়ারেরই সংস্করণ। ঐতিহাসিক বলছেন, "......সাসানিড রাজত্বকালে গ্রীক প্রভাব অবলুপ্ত হচ্ছে এবং পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ইরানের পুরাতন কোট (আচকান জাতীয়) ও পাজামায় ফিরে যাচ্ছে। একটা পার্থক্য কিন্তু ঘটছে। আকিমিনিডদের টেলার্‌ড্ সুট এবং সাসানীয় সুটের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, প্রাচীনতর কালের আঁটসাঁট লাইনওয়ালা পোশাকের বদলে সাসানীয় যুগের পোশাক মনে হচ্ছে পাতলা সিল্কের এমনভাবে তৈরী যে (প্রতিকৃতিতে) বাতাসে সঞ্চালিতভাবে দেখানো হচ্ছে।" ('১'—পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যেমন আঁটসাঁট পাজামা (আকিমিনিড কালের) তেমনই সালওয়ার পাজামা (সাসানীয় কালের) উভয়ই ইসলাম আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতে প্রচলিত। ডঃ কালিদাস নাগ তাঁর 'স্বদেশ ও সভ্যতা : ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে' লিখেছেন: "খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্য-সম্রাট কুরুস বা কাইরাস ভারত আক্রমণ করেন। ইহার পর দারায়বোষ বা দারায়স গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করেন।..... ভারতে পারসিক অধিকারের ফলে স্বভাবতই পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ভারতবাসীর পক্ষে পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ায় গমনাগমনের পথও নিরাপদ ও সুগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে ......উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক অধিকার কতদিন স্থায়ী ছিল বলা কঠিন, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের পারস্য আক্রমণের সময় (খৃষ্টপূর্ব ৩৩০) পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসর যে এদেশের সঙ্গে পারস্যের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।......" (পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮) সুতরাং ইসলাম আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই ইরানের প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছদ ভারতের একাংশে প্রবেশ করেছে ও প্রচলিত হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নাই। ('৮')

এবার আচকানের ইতিহাস। এও ঐ একমতই। ২৫০০ বৎসর পূর্বে আকিমিনিড রাজত্বকালেই পারস্যে আঁটসাঁট রকমের আচকান শিরওয়ানী লম্বা কোট-জাতীয় পোশাক প্রচলিত দেখা যায়। "প্রাচীন পারস্যের টিপিক্যাল পোশাক হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে ব্যবহৃত পাজামা...... আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জামা হচ্ছে লম্বা কোট......" ('৯'—পৃষ্ঠা ১১)

"......প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের পোশাক অন্যান্য যেসব সভ্যতা আমরা জানি তাদের পোশাক হতে মূলতঃ পৃথক। প্রাচীন মিশর, সুমের ব্যাবিলন আসিরিয়ায় পোশাক ছিল, ঢিলাঢালাভাবে উপর থেকে ঝুলিয়ে

দেওয়া পোশাক। এ পোশাকের সঙ্গে পারস্যের পোশাকের কোনই মিল নেই। এক কথায় বলতে গেলে দুটোতে কনট্রাস্ট (তুলনা) একটা আদর্শভাবে ঝুলাইয়া, দেওয়া কাপড়ের সঙ্গে ফিট করা কোট ও পাজামার কনট্রাস্ট (তুলনা)"। ('৯'—পৃষ্ঠা ১৬১) সুতরাং পাজামার ক্ষেত্রে যা সত্য আচকানের ক্ষেত্রেও তাই। প্রধানত প্রাচীন পারস্য হতে এর প্রচলন।

এখানে শ্রীনীরদ চৌধুরীর বক্তব্য ঠিক পরিষ্কার বুঝছি না। 'ঢিলাঢালা সুপরিসর' বলতে কি তিনি চোগা কাবা বা জুব্বার কথা উল্লেখ করছেন? ঢিলাঢালা পোশাক (রবীন্দ্রনাথ যেমন পরতেন) উপরকার ওভারকোটের মত জামা, এও এসেছে পারস্যের মাধ্যমে প্রাচীনতর মীডদের কাছ থেকে। ('৯'—পৃষ্ঠা ১৬২) তিনি বলেছেন বর্তমান আচকান শিরওয়ানী বিলাতী ফ্রক কোট ও ইউনিফর্মের অনুকরণ। সাহেবী পোশাকের অনুকরণের প্রবণতা আশ্চর্য কিছু নয়, এখন যেমন মার্কিন ড্রেন পাইপ অনুকরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিন্তু বিলাতী ফ্রক কোটের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নীরদবাবুর এই উক্তি হাস্যোদ্দীপক হয়ে গেছে। বিলাতী ফ্রক কোট বস্তুটিই পারস্য থেকে নেওয়া এবং তার তারিখ আছে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে দ্বিতীয় চার্লস পারস্যের পোশাকের অনুকরণে এই ফ্রক কোট প্রবর্তন করেন। ('৯'—পৃষ্ঠা ১৪৫; এবং স্যামুয়েল পেপিসের ডায়রী)। ঐতিহাসিক লিখছেন, "ইভেলিন রাজাকে 'টিরেনাস অর দি মোড' নামক পুস্তিকাটি দেন। রাজা পুস্তিকাটি পড়লেন এবং পারস্যের কোটের প্রস্তাবটায় চমৎকৃত হলেন। পাঠক ভেবে দেখুন আপনার কোটের প্রাচীন সংস্করণ প্রাচ্যের কোন্ দার্শনিকের দেহে ছিল... ...১৩ই অক্টোবর ঐ পোশাক তৈরী হ'ল। রাজা এবং ডিউক অব ইয়র্ক ট্রাই করলেন, '১৫ই অক্টোবর রাজা প্রকাশ্যে এই পোশাক পরলেন ও বললেন, জীবনে তিনি অন্য আর কিছু ফ্যাশান করবেন না।" ('১০'—পৃষ্ঠা ৩৭৩—৭৬) এই পোশাকই সারা ইউরোপে চালু হয়। ('৯'—পৃষ্ঠা ১৪৫) সুতরাং যে দিক দিয়েই যান, আর্য অগ্নি-পূজক প্রাক্-ইসলাম পারস্যকে এড়াবার উপায় নেই। ইংরাজরা তথা ইউরোপীয়েরা যখন ১৭শ শতাব্দীতে পারস্যের নিকট হতে ফ্রক কোট নিলেন তখন ইরানীরা মুসলমান। তা হ'লে আবার ফ্রক কোটও নীরদবাবুর যুক্তিতে ও ভাষায় 'মুসলমানী' দাঁড়িয়ে গেল। আন্তর্জাতিক আর থাকল কই? ফার্সী ভাষা ভারতে শাসক (তুর্কী) ও শাসিত (ভারতবাসী) কারও ভাষা ছিল না। মুসলমান শাসকের ধর্মগ্রন্থের ভাষাও ফার্সী নয়। অথচ কয়েক শতাব্দী ধরে সেই ভাষা ভারতে এবং পারস্যের প্রতিবেশী অন্যান্য দেশে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। অন্যান্য সভ্যতার মত পারস্য সভ্যতা ও সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের আচার ব্যবহার, সংস্কৃতির উপর কিছু ছাপ রেখে গেছে। আচকান, চাপকান, জুব্বা, কাবা, পাজামা, চুড়িদার, সালওয়ার বিলাতী কোট, প্যান্ট, ওভারকোট সবই ঐ একেরই ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন।

দেশী পোশাক

এখন দেশী পোশাক কি?

বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "...যবন বাঙ্গালীর উপরার্ধের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন......" (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৭৯)।

বলা বাহুল্য, তিনি ধুতির উপর পিরেন, পাঞ্জাবি কুর্তা জাতীয় জামার কথাই বলছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তিটি এখানে প্রাসঙ্গিক (যদিও তাঁর 'চিরদিন' শব্দটা আমি ঠিক গ্রহণ করতে পারছি না), "পাজামা ও তৎসংশ্লিষ্ট পরিচ্ছদ চিরদিন সাধারণ বাঙালী হিন্দুর কাছে 'মুসলমানী' বলিয়া অবজ্ঞাত; অথচ প্রতিদিন সে যে পোশাক পরিয়া থাকে, তাহার বিশ্লেষণ করিলে সে দেখিতে পাইবে

জামার আস্তেতে করার দিকে ঝোঁক বেড়েই গেছে। এখন শহরে বাজারে শুধু মধ্যবিত্ত নয়, শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় সকল অংশেই জামা ব্যবহার করছেন। মধ্যবিত্তের মধ্যে যাঁরা শুধু চাদর ব্যবহার করেন তাঁদের সংখ্যাও কমে গেছে। এঁদের স্বল্পসংখ্যাকে বাদ দিলে বহু দিন থেকে সমাজের উপরের থাকের মানুষ ঘরের বাইরে পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনক্ষেত্রে সেলাই-করা সাজ-সজ্জার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলছেন, "যদিও রাজা সমাজে পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও ধুতি চাদর পরিয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময় পোশাক পরিয়া যাইতেন। ...আমার পিতা এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া গমন করিতেন। রাজা ইহা পছন্দ করিতেন না।......" (মহর্ষির আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭৮)

কিন্তু দ্বারকানাথেরও দরবারী বা অফিস-কাছারির পোশাক হালকা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বাংলার মনীষিগণের প্রতিকৃতিতে দেখা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ ব্যারিস্টার সাহেবদের বাদ দিলে বাকী সকলে কাজকর্ম আপিস-কাছারির পোশাক হিসাবে আচকান বা চাপকান ও পায়জামা বা প্যান্টলুন ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম-ভূদেবের পোশাক তাই। তাঁরাও উপরার্ধ অনাবৃত করার কথা ভাবেন নি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উদ্ধৃতি করা যেতে পারে : "......বাহিরের সংস্কারটা ইতিপূর্বে আমরা অস্বীকার করে চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছি, নয় ইংরেজের কাছ থেকে নিচ্ছি; ওটাতে আমাদের আরাম নাই। সেইজন্য ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না। বাঙালী ভদ্রসভার সাজসজ্জায় যে এমন বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ।......" (জাপানযাত্রী, ২৪শে বৈশাখ, ১৩২৩-এর ডায়েরী)

'মুসলমানী পোশাক' আখ্যা

ইসলাম আবির্ভাবের এক হাজার বৎসর আগেকার, এখন হতে ২৫০০ বৎসরেরও আগেকার, ইরানী পোশাকের 'মুসলমানী পোশাক' আখ্যা হচ্ছে কেন? সম্রাট কনিষ্ক (অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে) ৭৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মথুরায় প্রাপ্ত তাঁর আংশিক ভগ্ন সুপরিচিত প্রতিমূর্তিতে তাঁর পরিহিত পোশাকের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আমরা দেখতে পাই। মাথা নাই বলে শিরস্ত্রাণ দেখা যায় না। অন্ততঃ বাদ দিলে এর অনুরূপ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নেহরু পরিহিত অর্বাচীন শিরওয়ানীর তফাতই বা কতটুকু? তবু এরূপ আখ্যা হল কেন? তৎকালীন 'আন্তর্জাতিক' পোশাক হিসাবে পশ্চিম এশিয়ার সর্বত্র এই পোশাক প্রচলিত হয়েছিল এবং বহুদিন পর্যন্ত তা চলেছে। এ কথা সত্য, মোগল পাঠান যুগে এই পোশাকের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আর্যদের কথা বাদ দিলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সর্বপ্রথম বাংলায় পশ্চিম এশিয়ার বিদেশীর হাতে রাজক্ষমতা এল। তার পূর্বে বাংলাদেশের মানুষের পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগটা যদি নাও অগ্রাহ্য করা যায় তবু এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে ও দক্ষিণে তথা ব্যাপকতর ভারতে মোগল পাঠান রাজত্বকালেই এই পোশাকের প্রচার ও ব্যবহার ছড়িয়েছে। এবং ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইরূপ অর্থে কি মুসলমানী পোশাক আখ্যা দেওয়া যায়: কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তো তা হয় নি।

উপরে প্রদত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-জীবনী [illegible] [illegible] (চাপকান) [illegible] [illegible] হয়েছে। "[illegible] যাইতেন না, সমাজে [illegible] পোশাক পরিয়া যাইতেন"। [illegible] পোশাক এবং [illegible] মুসলমানী পোশাক বলা হয় নি। আমার [illegible] আছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পোশাকের সঙ্গে [illegible] (চাপকান) আচকান পাজামা বা আচকান প্যান্টলুনকে 'ভারতীয় পোশাক' বলা হত। আত্মজীবনী লেখার সময়ও (১৯২৩?) সুরেন্দ্রনাথ নিজের পোশাককে (চোগা, চাপকান, প্যান্টলুনকে) 'ভারতীয় কসটিউম' বলেছেন। (আত্মজীবনীতে ফরাসী দেশে ভ্রমণকালে জার্মানভ্রমে গ্রেপ্তারে ঘটনার বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে সিপাহী যুদ্ধের পর অনেক ব্যাপারে নূতন করে হিন্দু-মুসলমান ব্যবধান রচিত হতে লাগল, দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বহীন নগণ্য ছোটখাটো আনুষ্ঠানিক পার্থক্য অনেক সময় 'হেড লাইনে' উঠতে লাগল। ভাষার মধ্যেও তার ছাপ কিছু কিছু দেখা

ছিল। আমার মনে হয়, আবার অন্যে মুসলমানী পোশাক নামকরণের আবির্ভাবও এইভাবে। শুধু হিন্দুর ব্যবহৃত জামার এই নামকরণ সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়। আমরা দেখেছি হজরত মহম্মদের পোশাক ছিল চাদর, কামিজ ও জুব্বা। অথচ ভারতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলমান ও তাঁদের আচার-আচরণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত তাঁদের কাছেও 'আচকান পাজামা' মুসলমানী পোশাক বলে পরিচিত। বহু দিনের আগে পর্যন্ত মুসলমান সমাজের উৎসবাদির কোনও সামাজিক মজলিসে এইরূপ পোশাক না পরে গেলে মুসলমানকে হিন্দু 'খাটো' মনে করা হত। দেখা যাচ্ছে— পোশাকটা যাই হোক, 'মুসলমানী পোশাক' এই নামকরণটা বেশী দিনের নয়; ইংরাজ আমলের শেষ তৃতীয়াংশে বা চতুর্থাংশে এর সৃষ্টি।

পোশাকের বিবর্তন

পোশাকের বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় নানা ভাবেই এক দেশের পোশাক আর এক দেশের পোশাককে প্রভাবান্বিত করেছে যা আর এক দেশে চালু হয়েছে। শুধু যে বিজেতারাই তাদের প্রভাব চালু করেছে এমন নয়। কেবল পছন্দের জন্য বা কোনও সুবিধার জন্য অনুকরণ করা হয়েছে এমনও হয়েছে। মধ্য এশিয়ার অশ্বারোহী জাতিদের নিকট হতে ইরানে পাজামা চালু হওয়ার ইতিহাস ঐরূপ। বিজিতদের নিকট হতেও অনুরূপ কোনও কারণে পোশাক গৃহীত হয়েছে। জুব্বা বা কাবা জাতীয় ঢিলা ঢালা ওভার কোটের মত পোশাক কোন সুদূর অতীতে বিজিত মীডসদের নিকট হতে বিজেতা ইরানীরা নিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের রবীন্দ্রনাথের গায়ে ঐ ধরনের পোশাক শোভা পেত। ('১'—পৃষ্ঠা ১৬২)। বিজেতা রোমান সৈন্যরা বিজিত গলদের নিকট হতে রোমে পাজামা নিয়ে এসেছিল। ('৬'—পৃষ্ঠা ১১৮—১১৯)। আবার শিল্পের ও পণ্য আমদানি রপ্তানির বিবর্তনের ফলেও রুচি ও পোশাক পরিচ্ছদ প্রভাবান্বিত হয়েছে। ইরানে আঁটসাঁট পাজামা থেকে বাতাসে সঞ্চালিত হয় এমন সালওয়ারের বিবর্তনে চীন সিল্কের বা ভারতের তাঁতে প্রস্তুত উপযোগী বস্ত্রের দান অনেকখানি আছে কিনা কে বলবে? (ধুতির প্রভাবও এর মধ্যে থাকতে পারে) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের তুলার কাপড় ইউরোপে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কয়েকটি ফ্যাশানের প্রবর্তন করেছিল, এমন কি, অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। এমন আরামের কাপড় ইউরোপীয়েরা পূর্বে ব্যবহার করে নি। ফরাসী দেশে পশমের তৈরী বস্ত্রের ব্যবসাকে এমনই বিপন্ন করেছিল যে ১৬৮১ থেকে শুরু করে আমদানি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে যদিচ সম্ভব হয় নি। ('১২'—১ম কলম পৃষ্ঠা ৫০০) বর্তমান কালে মানুষের তৈরী আঁশে প্রস্তুত টেরিলিন প্রভৃতি অনুরূপভাবে পোশাক ও রুচিকে প্রভাবান্বিত করছে। শ্রীনীরদ চৌধুরী 'আন্তর্জাতিক পোশাকে'র কথা বলেছেন। এ পোশাক দেশে দেশে ব্যবহৃত হওয়ার নানারূপ কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের সবেগ প্রসার এর অন্যতম তা অস্বীকার করা যায় না। "চীনের প্রাচীরের মতন সকল বাধা ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, বুর্জোয়াদের পণ্যের সস্তা দাম এমনই শক্তিশালী অস্ত্র। বিদেশীদের প্রতি অনুন্নত জাতিদের এমন বদ্ধমূল যে ঘৃণার ভাব, এই অস্ত্রের সাহায্যে বুর্জোয়া তাহাকেও হার মানায়। উৎপাদনের বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় লইতে সকল জাতিকে ইহারা বাধ্য করে, অন্যথায় ভয় থাকে ধ্বংস হইয়া যাইবার। যাহাকে সভ্যতা বলা হয়, জোর করিয়া তাহাই চালু করিতে ইহারা অপর জাতিকে বাধ্য করে অর্থাৎ তাহাদেরও বুর্জোয়া বনিয়া যাইতে হয়। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে নূতন জগৎ গড়িয়া তোলে।" (কেমিউনিস্ট ইশতাহার— কার্ল মার্কস)। পশ্চিমী রাজশক্তি ইতিহাসে প্রথম বুর্জোয়া রাজশক্তি। বাকী আলোচনা বাহুল্য।
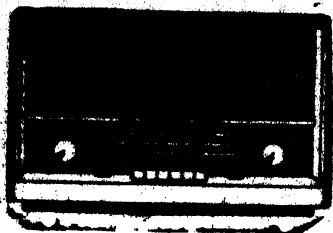
ভারতে পোশাকের বৈচিত্র্য

নানান বৈচিত্র্যের দেশ আমাদের এই মাতৃভূমি। পোশাক পরিচ্ছদে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। এর মধ্যে আচকান পাজামা জাতীয় পোশাক ইংরাজ আসবার আগে ভারতের শেষ রাজশক্তির দরবারী পোশাক ছিল (যেমন কনিষ্কের আমলেও ছিল)। সে রাষ্ট্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এ-কালেও দেশের সামন্ত জমিদার, দেশীয় নৃপতিবর্গ ও আমিরগণের সাজসজ্জায় এই পোশাক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী বাল্যকালে প্রথম প্রয়াসে ক্লাসে ধনীর ছেলে সহপাঠীর উপর কবিতা লিখেছিলেন:

> "ইজার চাপকান গায়
> ইস্কুলে আসে যায়
> নাম তার গঙ্গাধর ঘাঁটি
> বড় তার অহঙ্কার
> ধরা দেখে সরাকার
> চলে যেন নবাবের নাতি" (১৩)

আমি মনে করি, এখানে এই 'নবাবের নাতি' কথাটা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমেরী পোশাকের মর্যাদা আমেরী রাজশক্তির অঙ্গ

বাড়াচ্ছিল। পুরাতন রাজশক্তির দরবারী পোশাকের মর্যাদা কমছিল। উপরন্তু মঞ্চে নবাগত পিউরিটান মধ্যবিত্তের নিকট ঐ পোশাক চক্ষে পীড়াদায়ক সামন্ত শ্রেণীর জাঁকজমকের অংশ বিবেচিত হইচ্ছল। অবশ্য পোশাকের ঐ পরিচয় সব পরিচয় নয়। অনেক মধ্যবিত্ত খেটে-খাওয়া মানুষ সব রাজ্যেই এই পোশাকে অভ্যস্ত। পূর্বে তো ছিলই। এখনও আছে। আবার কোনও কোনও রাজ্যে এই পোশাক সব শ্রেণীর মধ্যেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং নানান বৈচিত্র্যের মধ্যে এরও স্থান থেকে গেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে যা গৃহীত হচ্ছে তাও থাকছে। যুদ্ধের সময় হতে নানান কারণে প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং ক্রমোত্তর এর পরিধান সকল শ্রেণীর মধ্যে বেড়ে চলেছে। ধুতি শাড়ি দেশের নিজস্ব আদি প্রাচীনতম পোশাক, সাধারণের ব্যাপকতম পরিহিত পোশাক। এ পোশাক 'সব বয়সের প্রতি সদয়।' সুতরাং ধুতি শাড়ীর জনপ্রিয়তা এ দেশে কখনওই কমবে বলে মনে হয় না। তা হলেও ভারতের সমাজব্যবস্থায় সব বৈচিত্র্যেরই স্থান থাকা উচিত। নানান জাতি উপজাতি অধ্যুষিত রুশ দেশে বলশেভিকরা প্রচার করেছিলেন তাঁদের রাষ্ট্র হবে সারবস্তুতে সমাজতন্ত্র কিন্তু আকৃতি ও চেহারায় হবে জাতীয় ছাঁচের। অনুরূপ কোনও আদর্শ (বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আদর্শ) ভারতের স্বাভাবিক আদর্শ। তা যদি হয়, কোনও এক নির্দিষ্ট চেহারার পোশাক রাষ্ট্রের অনুমোদনে অপর পোশাককে বাদ দিয়ে জাতির রাষ্ট্রীয় দপ্তরের পোশাক বলে বিবেচিত হবে বা আভাসে ইঙ্গিতে সেইরূপ কদর পাবে এ বাঞ্ছনীয় নয়।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও দেখা উচিত যে, পোশাক পরিচ্ছদ রুচি আদির পার্থক্যের তর্কাতর্কিকে 'গালাগালিতে' পর্যবসিত করা মোটেই কাম্য নয়। দুঃখের বিষয়, শ্রীনীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধে তার কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। "যারা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলে" বলে তিনি মনে করেন, তাদের বলছেন, "দেখিয়া মনে হইবে যেন তারা চিতাবাঘ, শিকারের সন্ধানে যাইতেছে।" এখন, যাদের জন্য তিনি এই ভাষা বলছেন, তারা যদি বলে আমরা যদি আপনার বাঞ্ছিত মত্তে ধীরে চলি তখন তো অন্য কেউ বলতে পারেন "এ চলন, (মূল সংস্কৃত অর্থে) কুটিলিকা" (আপ্তের অভিধানে অর্থ—সন্তর্পণে আসা যেমন শিকারী তার শিকারের দিকে এগোয়) "তা হলে কেমন করে চলব বলুন!"

তাদের খেউড়ে আবহাওয়ার বিভ্রান্তি বাড়িয়ে লাভ নাই।

---

(১) এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান মেসো-পোটেমিয়ান অ্যাণ্ড পারসিয়ান কসটিউম। লেঃ মেরী জি হাউসটন, দ্বিতীয় সংস্করণ; (২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। লেঃ ডঃ সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৯৬-৪৯৯; (৩) কোরান আয়েত (সূরা) ৩০ এবং ৩১ সূরা (পরিচ্ছেদ) ২৪; (৪) মরহুম মৌলানা শিবলী নোমানী লিখিত সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২০১; (৫) হিরোডোটাসের ইতিহাস বুক ১. অনুচ্ছেদ ৭১; (৬) কসটিউম ক্যাভাল-কেড। লেঃ হেনরী হেরাল্ড হ্যানসেন; (৭) এ হিস্ট্রী অব ওয়ারল্ড্ কসটিউম। লেঃ ক্যারোলিন জি ব্র্যাডলে; (৮) স্বদেশ ও সভ্যতা ঃ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লেঃ ডঃ কালিদাস নাগ, বিংশ সংস্করণ; (৯) কসটিউম থ্রু আউট দি এজেস। লেঃ মেরী ইভান্স; (১০) ইংলিশ কসটিউম ফ্রম উইলিয়াম দি কনকারার টু দি প্রেজেন্ট ডে। লেঃ ডি ক্লেটন ক্যালথ্রপ; (১১) রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৬৭ পৌষ; (১২) দি বুক অব কসটিউম। লেঃ মিলিয়া ড্যাভেনপোর্ট; (১৩) শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী, সিগনেট সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৫।

জয় দিয়ে প্রতিবার স্নানের পর…।

আপনার ত্বক আরও কোমল, মসৃণ ও কমনীয় হয়ে ওঠে।
চামেলীর সুগন্ধযুক্ত জয় !

জয় সৌন্দর্য্য সাবান আপনার শরীরের প্রতি রোমকূপ পরিষ্কার ক'রে আপনার ত্বকে অপরূপ কমনীয়তা এনে দেয়। জয় দিয়ে প্রতিবার স্নানের পর আপনার ত্বক আরও কোমল, মসৃণ ও কমনীয় হয়ে ওঠে। চামেলীর অপরূপ সুগন্ধ জয় সাবানে শেষ পর্য্যন্ত ঘিরে থাকে…বিশেষ ফয়েল মোড়কে প্যাক করা ব'লে।

টাটার তৈরী

কোমল লাবণ্যের জন্য —

ব্রডস্টেয়ারস

(১)

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ব্রডস্টেয়ারস-এ এসে পড়লুম। প্রথম দর্শনেই জায়গাটি ভালো লেগে গেল। খাড়া খড়ির পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোট্ট একটু শহর, নীচেয় সমুদ্র। ভাটার সময় গৈরিক বালির চর জেগে ওঠে, জোয়ারে জল বেড়ে সমুদ্র পাহাড়ের পাদ-বন্দনা করে। ছোট্ট জেটিতে দশ-বারোটা পালের ডিঙ্গী। যেখানে জেটি সে জায়গায় পাহাড় নীচু হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে এসে মিশেছে। সেই সঙ্গমস্থলে গোটা কয়েক ছোট ছোট প্রাচীন বাড়ি। এই একটিমাত্র জায়গায় জল-স্থলের মেশামেশি হয়েছে। এর পরই ডাইনে-বাঁয়ে পাহাড় উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে এবং সমুদ্র নীচেয় নেমে গিয়েছে। শহর বলতে যেটুকু তা জল-স্থলের সঙ্গমে। এদিকে ওদিকে মাঠের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি। তার রূপ অন্য। ব্রডস্টেয়ারসকে ভালো লাগল তার কারণ, জায়গাটি ছোট, নির্জন এবং পুরনো। ইংল্যাণ্ডে উপকূলে শহরের বৈশিষ্ট্যই এখানে নেই। ব্রডস্টেয়ারস-এর ডাইনে Ramsgate বাঁয়ে Mergate। সেখানে যান, বুঝবেন সী-সাইড টাউন কাকে বলে। চীৎকার-হট্টগোলে, তেলেভাজার গন্ধে, জুয়ার, মদে, লোকের ভিড়ে, আলোর মালায়, নাগরদোলায়—সে এক রসাতল। গরম দেশ নয় এবং পাশে সমুদ্র আছে তাই রক্ষে নতুবা এতদিন মহামারীতে ইংল্যাণ্ডের সী-সাইড টাউন জনশূন্য হয়ে যেত। সে তুলনায় সৌন্দর্যে এবং নির্জনতায় ব্রডস্টেয়ারস ভূস্বর্গ। ভাবলুম এমন নির্জন মনোরম জায়গা ইংল্যাণ্ডের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলে মিলবে না। এখন 'সামার হলিডে'-র হিড়িক। ইংরেজের গায় সারা বছর যে ময়লা জমেছে এখন সমুদ্র জলে তা ধৌত করবার সময়। সর্বত্রই রথের মেলার ভিড়। ভাগ্যক্রমে এমন একটি জায়গা যখন পাওয়া গেছে তখন এখানে কয়েক দিন কাটিয়ে যাওয়া যাক। মাতামাতি করবার ইচ্ছা হলে Ramsgate-Mergate তো দু-তিন মাইলের মধ্যে। পুণ্য করবার বাসনা জাগলে ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রেল আছে ১৬ মাইলের মধ্যে। ইতিহাসের জিজ্ঞাসা জাগলে ১৮ মাইলের মধ্যে Deal—রোমানদের ইংল্যাণ্ডে প্রথম অবতরণক্ষেত্র। সন্তরনেচ্ছু হলে ১০ মাইলের মধ্যে স্যাণ্ডউইচ—বিরাট বীচ্। আর যদি তপোবনের নির্জনতা এবং সৌন্দর্য অভিলাষী হই তা হলে ক্যান্টারবেরি থেকে পিলগ্রিমস ওয়ে ধরে হাঁটা যাবে। [হেঁটে ছিলামও একদিন। সরু রাস্তার দুপাশে ঘন অরণ্য, গাড়ি-ঘোড়া নেই, লোকজন নেই। আশেপাশে লোকের বসতিও নেই। এমন স্তব্ধ নির্জন জায়গা দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে বোধ করি আর নেই।] এতেও যদি মন না ভরে তা হলে ওদিকে ডোভার, ফোকস্টোন, হাইথ তো পনের ষোল মাইলের মধ্যেই আছে। কেন্ট-এ থাকার এই সুবিধে। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর জায়গা স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে। এখানে হট্টগোল তো আর এক জায়গায় চললে, সেখানে সুবিধে হল না তো অন্যত্র। এমনি করে এক জায়গার বাসিন্দা হয়েও রোজ মুখ বদলান যায়। তা ছাড়া, কেন্ট-এ আছে সমুদ্র-পর্বত-

ব্লীক হাউসে ডিকেন্সের স্নানাগার

ছবি : মিমি মুখোপাধ্যায়

ব্লীক হাউসের উত্তরদ্বার

ছবি : মিমি মুখোপাধ্যায়

অরণ্য। প্রকৃতির এই ত্রিমূর্তির এমন অপরূপ সমন্বয় অন্যত্র দুর্লভ।

স্থির করলাম ব্রডস্টেয়ারস-এ থাকব। মনস্থির করে 'হোটেল অব দি জেটি'তে ঢুকতেই চোখে পড়ল এক ঝুড়ি পরিপুষ্ট সোনালী পীচ্ তার পাশে বড় এক ডালা গলদা চিংড়ি। দেখেই মনে হল ন্যাশন্যাল গ্যালারির কোন ছবির কপি। কাছে গিয়ে বুঝলুম ছবি নয়। তা হলে বোধ হয় 'ডামি'। জিজ্ঞাসা করে জানলুম 'ডামি'ও নয়। গলদাগুলি আজ অপরাহ্নে এখানেই ধরা হয়েছে, পীচগুলি স্থানীয় গাছে উৎপন্ন। শুনে ব্রডস্টেয়ারস আরও ভালো লাগল। জলের গলদা আর ডাঙ্গার পীচ্, কিন্তু রং-এর কি সমন্বয়। আমি পেটুক নই। ওখানে যতদিন ছিলাম প্রতিদিনই পীচ্ আর গলদার নৈবেদ্যের থালির পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি। একদিনও পীচও খাই নি, গলদাও খাই নি। তথাপি ব্রডস্টেয়ারস-এর সব কিছুর চেয়ে—সমুদ্র-জেটি—পালের নৌকো—গৈরিক বালুর চর—খাড়া খড়ির পাহাড়—সোনালী পীচের ঝুড়ি এবং রক্তিম গলদার ডালিকে সেদিন অপরূপ মনে হয়েছিল। 'দেশ'-এ রঙীন ছবি ছাপা গেলে বুঝতে পারতেন বাড়িয়ে বলছি না।

ছোট্ট হোটেল। পশ্চাদ্ভাগ উঁচুতে পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন, সম্মুখভাগ ঝুঁকে হয়ে রাস্তায় এসে মিশেছে। পুরনো রাস্তা,

মন্দ কিডের মত। পেভমেন্ট নেই। রাস্তার ওপারে সমুদ্র। সমুদ্রের এত কাছে বাড়ি আর কোথাও দেখি নি। ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে জল ছোঁয়া যায়। ভাবছিলুম রান্নাঘরের ওপাশটিতে একখানি তক্তপোশ পেলে বেশ হত। রাস্তায় মানুষ, ওপারে প্রকৃতি। মানুষ আর প্রকৃতিকে দুই হাতের নাগালের মধ্যে একসঙ্গে পাওয়া শক্ত। বীচের উপরও মানুষ আর প্রকৃতিকে একসঙ্গে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সেখানে আমিও অন্য মানুষের মত একজন। আমার, অন্য মানুষের এবং প্রকৃতির মধ্যে কোন তফাৎ নেই, সব মিলেমিশে একাকার। কিন্তু ঘরের কোণে তক্তপোশে অর্ধশায়িত অবস্থায় আমি যেন মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে উঁকি দিচ্ছি। তার স্বাদ আলাদা, বীচে সে স্বাদ কোথায়। দোতলার শোবার ঘরের জানলাতে বসেও সে স্বাদ পাওয়া যায় না। কারণ, দোতলা উঁচুতে, মানুষের নিকট সান্নিধ্য সেখানে নেই। তাই ভাবছিলুম রান্নাঘরের ঐ রাস্তার ধারের জানলাটির পাশে একখানি তক্তপোশ পেলে কি চমৎকার হত।

'হোটেল অফ্ দি জেটি'-র স্বত্বাধিকারিণী

ডিকেন্সের বাড়ি ছবি : বিল ইভান্স

বৃদ্ধা এবং স্বল্পভাষী। দেশ অস্ট্রিয়ায়। তিনি নিজেই পাচিকা সুতরাং রান্না উপাদেয়। রান্নাঘরেই আহারের পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটী ব্যবস্থা। বাড়িটি পুরনো; কিন্তু নিপুণ হাতে সাজানো এবং সযত্নে রক্ষিত। নীচু ছাদ, মোটা কালো কালো কাঠের কড়ি-বরগা, ছোট দরজা, ছোট ছোট ঘর। পুরাতনের অবশেষকে পুরনো দলিলের মত নিয়মিত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। হোটেলের পাশে একটি শুঁড়িখানা, সেখানে ডিকেন্সের যাতায়াত ছিল। আর একটু ওদিকে যেখানে পাহাড় খাড়া অকস্মাৎ উঁচু হয়ে উপরে উঠে গিয়েছে, সেখানে ব্রডস্টেয়ারস-এর সবচেয়ে সুপরিচিত বাড়িটি—Bleak House, চার্লস্ ডিকেন্সের বাড়ি।

'হোটেল অফ্ দি জেটি'-র স্বত্বাধিকারিণীর বদান্যতায় ব্রডস্টেয়ারস্-এ থাকতে পেলুম। যদি আপনারা কেউ ব্রডস্টেয়ারস্-এ আসেন, এই বৃদ্ধার আতিথ্য নেবেন। এলে দেখবেন, ঐতিহাসিক বাড়ি ব্লীক-হাউস-এর চেয়ে, বৃদ্ধার বাড়ি মনোরম। উনবিংশ শতাব্দী হোটেল অফ্ দি জেটি'-র মধ্যে এখনও স্তব্ধ হয়ে আছে, ব্লীক হাউস-এ তা নেই।

(২)

ব্রডস্টেয়ারস্-এর আশেপাশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গাছপালা কাটা হয়েছে, নতুন আলমারি-বাড়ি দিগন্তকে ডিঙিয়ে উঠেছে। যেখানে রাস্তা ছিল না, সেখানে রাস্তা হয়েছে; অনেক সরু রাস্তা চওড়া হয়েছে। কিন্তু 'হোটেল অফ্ দি জেটি' এলাকায় এখনও উনবিংশ শতাব্দী। রাস্তা তেমনি সরু, আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু। বাড়িগুলি তেমনি বেঁটে বেঁটে। ব্রডস্টেয়ারস্-এর এই অঞ্চলে প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে এক সপ্তাহের জন্য ঘড়ির কাঁটা এক শতাব্দী পিছিয়ে যায় ডিকেন্সের যুগে। তখন রাস্তায় জনতার পরনে ভিক্টোরিয়ান যুগের পরিচ্ছদ। সে-জনতার মধ্যে অনেকগুলির চেনামুখ আপনার চোখে পড়বে। আপনার পাশ দিয়েই হয়ত হেঁটে যাবেন Martin Chuzzlewit-এর Mr Chuffy, পিকউইক পেপারস-এর টনি ওয়েলার, দেখবেন সব বিপদ আপদের কথা ভুলে গিয়ে সিডনি কার্টন নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মিসেস নিকেলবির সঙ্গে হাসি-তামাশা করছেন। সে-গ্রীষ্মে সূর্যের তাপ যদি প্রবল হয় তাহলে হয়ত দেখবেন ডোরা আর অ্যাগনেস লোকলজ্জার বাধা কাটিয়ে [illegible] লম্বা পোশাক উঁচু করে ধরে সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে নিচ্ছেন। এই দৃশ্যটি দেখে আমার মনে হল ভিক্টোরিয়ান যুগটি ঠিক নিখুঁত হল না। তখন ডোরা আর অ্যাগনেস ঠিক অমনভাবে কাপড় উঁচু করে সমুদ্রের জলে পা ডোবাতে পারতেন না। বেদিং মেশিন-এর অভাব বোধ করলুম। বেদিং মেশিন কি বস্তু জানেন? ডিকেন্সের চিঠিতে বহু জায়গায় উল্লেখ আছে ব্রডস্টেয়ারস্-এর বেদিং মেশিনগুলির চমৎকার। কিন্তু বেদিং মেশিন কি? আমার জানা ছিল না। ব্রডস্টেয়ারস্-এ গিয়ে

ডিকেন্স ফেস্টিভ্যালের দৃশ্য—ডোরা অ্যাগ নেস সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে নিচ্ছেন
ছবি : বিল ইভান্স

এ-সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হল। অধুনা এদেশে মেয়েদের স্কার্ট জানুর ঊর্ধ্বে (হাল আমলের স্কার্টের বহর আমাদের গামছার বহরের মত, কিংবা তার চেয়ে একটু ছোট), বিকিনি—অর্থাৎ কটি দেশে এবং বক্ষদেশে দুটুকরো রঙিন কাপড়—পরে অর্ধ উলঙ্গ নয়, তিন-চতুর্থাংশ উলঙ্গ হয়ে যুবতীরা বীচে রৌদ্র সেবন করেন, সমুদ্রে স্নান করেন। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও স্নানের পোশাক পরে—কি যুবক-যুবতী, কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—বীচের উপর দিয়ে লোকচক্ষুর সামনে হেঁটে গিয়ে সমুদ্রাবগাহন করা চলত না। তাই গোড়ালি থেকে স্কন্ধ পর্যন্ত সুইমিং কস্টুম্ তদুপরি কানঢাকা টুপি পরে স্নানার্থী বেদিং মেশিন অর্থাৎ ওয়াগনের মত ঘেরা ঘোড়ার গাড়িতে আসীন হতেন। পর্দানশীন এই স্নানার্থীদের নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি গলা জল পর্যন্ত টেনে নিয়ে ছেড়ে দিত। আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হওয়ার পর স্নানার্থীরা হস্তপদ চালনা করে সাঁতার কাটতেন। আমাদের দেশে পালকি শুদ্ধ গঙ্গাস্নান করার রীতি ছিল, বেদিং মেশিনও অনেকটা সেই জাতের জিনিস। পঞ্চাশ বছর আগেও ব্রডস্টেয়ারস্-এ বেদিং মেশিন বেশ চালু ছিল বলে শুনলাম। স্থানীয় এক বৃদ্ধা বললেন তাঁর নিজেরই বেদিং মেশিন-এর ব্যবসা ছিল।

তাই বলছিলুম ডোরা-অ্যাগনেস-এর ঠিক ওভাবে কাপড় উঁচু করা সঙ্গত হয় নি। ভিক্টোরিয়ান্ যুগ নিখুঁত হত কয়েকটি বেদিং মেশিন আমদানি করলে। হয়ত সংগ্রহ করে উঠতে পারা যায় নি।

(৩)

স্ট্র্যাটফোর্ড যেমন সেক্সপীয়রের, গ্রাসমেয়ার যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের, ব্রডস্টেয়ারস্ তেমনি ডিকেন্সের। ১৮৩৭ সালে ডিকেন্স ব্রডস্টেয়ারস্-এ প্রথম সস্ত্রীক একবার এসেছিলেন। জায়গাটি তাঁর ভালো লেগেছিল। তারপর প্রতি বছরই আসতেন। ব্রডস্টেয়ারস্-এর প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কিছুদিন করে থেকেছেন। জন্মস্থান বেশী দূর নয়, কুড়ি মাইলের মধ্যে ক্যান্টারবেরি পেরিয়ে Chatam-এ। সেই কারণে স্বভাবতই এ অঞ্চলের উপর ডিকেন্সের মমতা ছিল। লণ্ডনের অন্ধকূপ থেকে প্রায়ই তিনি পালিয়ে আসতেন ব্রডস্টেয়ারস-এ। ডিকেন্সের টানে আরও অনেকে আসতেন, যেমন হান্স অ্যাণ্ডারসন, উইল্‌কি কলিনস, জন লীচ এবং সুবিখ্যাত Phiz, ডিকেন্সের উপন্যাসের চিত্রকর। ব্রডস্টেয়ারস-এর প্রতি ডিকেন্সের মমতার নিদর্শন আছে তাঁর English Watering Place নামক প্রবন্ধে। ১৮৩৭ সালে ডিকেন্স যখন প্রথম ব্রডস্টেয়ারস-এ আসেন তখন তিনি পিকউইক পেপারস লিখছেন। তখন এসে উঠেছিলেন ৩১ নম্বর হাই স্ট্রীটে। ১৮৩৯ সালে এসেছিলেন ৪০ অ্যালবিয়ান স্ট্রীটে, বর্তমানে অ্যালবিয়ান্ হোটেল। তখন 'নিকোলাস নিকলবি' একটু একটু করে লেখা হচ্ছে। এই সময় অ্যালবিয়ান্ স্ট্রীট থেকে ব্রডস্টেয়ারস-এর যে-দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন তা লিখেছিলেন এক বন্ধুকে—

"The tide is in, and the fishing boats are dancing like mad. Upon the green-topped cliffs the corn is cut and piled in shocks; and thousands of butterflies are fluttering about, taking the bright little red flags at the mast

ম্যাকলীন্‌স্‌

টুথপেস্টের তাজা কড়া স্বাদে আপনার মুখ পরিষ্কার স্নিগ্ধতায় ভরে তুলুন

ম্যাকলীন্‌স্‌
৩ ভাবে কাজ করে

দাঁতের অপূর্ব শুভ্রতার জন্য —

ম্যাকলীন্‌স্‌

এই ছবিটি তুলবার সময় আমার হাত কেঁপেছিল কিনা খেয়াল ছিল না। কিন্তু মনে আছে, ছবি তুলবার সময়ই মনে বিষাদের গভীর ছায়া পড়েছিল, এবং তার-পরেও নানা সময়ে সেই দৃশ্য স্মরণ করে ব্যথা অনুভব করেছি। মনে মনে অনেক সময় প্রশ্ন করেছি নিজেকেই বহু কথার। আমি উত্তর দিতে পারিনি।

স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রক্ষাকল্পে বীর সেনানীরা কিছুদিন পূর্বে শৌর্য-বীর্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। আমরা তাঁদের জন্য গর্ব অনুভব করি। কিন্তু যাঁরা একদিন পরাধীন ভারতের গ্লানি মোছাতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য আমরা কতটুকু অনুভব করি? আমরা পারি শুধু তাঁদের কিছু-কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে, এবং একটি স্মরণ-দিবসে 'দোজ্ হু হ্যাভ ডাইড' বলে কিছু লোকের জমায়েতে দু-এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু পারি কি তাঁদের আত্মবলিদানের মর্মকথা লিখতে, কিম্বা উপলব্ধি করতে তাঁদের কঠোর সাধনার ধারা? বোধ হয় পারি না। কারণ এঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্পৃহা ছিল 'জয়হিন্দ' মন্ত্রের সুরে বাঁধা। এঁদেরই দেহের ধমনীতে ছিল স্বাধীনতা-চেতনার ঘন লাল রক্ত। তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন সেই রক্ত মাতৃভূমিকেই। তাই সংগ্রামের চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ লুটিয়ে পড়ল ভারতমাতৃবক্ষে। মুখে শেষ মন্ত্র উচ্চারিত হল—জয় হিন্দ। তারপর সব শেষ। তাঁরা দেখে গেলেন না, জেনে গেলেন না—তাঁদেরই রক্তের বিনিময়ে ভারতভূমি পবিত্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীন ভারতের জমিতে সাক্ষী হয়ে পড়ে রইল শুধু তাঁদেরই কঙ্কাল।

এই অস্থি-কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল ইম্ফাল থেকে কিছু দূরে, বিষেণপুরের পথে পাহাড়-টিলার উপরে। এইখানেই আজাদ-হিন্দ বাহিনী আর ইংরেজ দলের চরম সংগ্রামের রণক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। তখন মণিপুর-কোহিমার দুর্গম গিরি-প্রান্তর 'জয় হিন্দ' মন্ত্রে মুখরিত।

১৯৪৭ সালে, সম্ভবত শারদীয় মহাষ্টমীর দিন, ইম্ফাল থেকে আজাদ-হিন্দ সংঘের যুবক সম্প্রদায় সেখানে গিয়ে-ছিল সেইসব অস্থি সংগ্রহ করে ইম্ফালে

দিয়ে আসতে। আমি তখন তিন বন্ধুসহ মণিপুর ভ্রমণে বের হয়ে ইম্ফলে আছি। সুযোগ পেয়ে আমরাও সেখানে গেলাম। পাহাড়-পর্বত পরিবেশে এক স্থানে যুবক সম্প্রদায় নামল এবং তারা ছড়িয়ে পড়ল অস্থি সংগ্রহ করে আনতে। তখনো দেখলাম চতুর্দিকে অতীত রণক্ষেত্রের বহু নিদর্শন। জাপানী সৈনিকদের নিদর্শনও ছিল কিছু। সংঘের ছেলেরা কিছু সময়ের ভিতরই যথাসম্ভব অস্থি সংগ্রহ করে একস্থানে জড়ো করল। মধ্যস্থলে স্থাপিত জাতীয় পতাকার তলে অস্থিগুলো রেখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল যুবক দল। 'জয়হিন্দ' মন্ত্র উচ্চারণ করে সৈনিকের প্রথায় শ্রদ্ধা জানাল। আমি ছবি তুলে নতমস্তকে দাঁড়ালাম। মন বিষন্ন।

দিন কয়েক মণিপুরে কাটিয়ে আমরা ফিরে চলেছি মণিপুর রোড রেল স্টেশন অভিমুখে। পথের দু'ধারে দেখে যাচ্ছি যুদ্ধের পরিত্যক্ত প্রচুর যানবাহন এবং সরঞ্জাম। কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছি বিগত যুদ্ধের গুরুত্ব। কখনো বা যাচ্ছি সর্পিল পার্বত্যপথে ধূসর-সবুজ বনরাজির ভিতর দিয়ে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি নীল আকাশের ছাউনি। মাও পেরিয়ে কোহিমার এলাকা অতিক্রম করবার সময় ড্রাইভার একস্থানে গাড়ি থামিয়ে বলল—হিয়ামে মিলিটারী সাহাব লোককা কবর হ্যায়। দেখিয়ে গা?

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু কমল চৌধুরী বলল—ওটা খুব ইণ্টারেস্টিং। দেখবার মতো। চলতো দেখি।

আমরা দেখতে গেলাম।

প্রথম দর্শনেই মনে একটা ব্যথার অনুভূতি হলো। বিস্তৃত এলাকায় বহু কবরের নিদর্শন। সারি সারি, মনে হয় শেষ নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে কোহিমা অঞ্চলের লড়াইয়ে এঁরা প্রাণ দিয়েছেন বলে জানলাম। নজরে পড়ল একস্থানে একটি মর্মর-প্রস্তরে লেখা আছে—

When you go home tell them
of us and say,
For their tomorrow we gave
our today.

*

কোহিমা থেকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত পথটুকু এই ইংরেজী কবিতার কথাগুলোই শুধু আমাকে আঘাত করেছে বারে বারে। এর মর্মার্থ খুঁজতে গিয়ে কেবলি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংগৃহীত অস্থির সেই ছবি। কিন্তু কোথায়! ওরা তো বলেনি—তোমাদের বর্তমানের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছি।

—নীরোদ রায়

চতুর্থ পরিকল্পনা

চতুর্থ যোজনার খসড়া-লিপিতে মোট ২৩,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। আশা করা হয়েছে যে, পাঁচ বছরে জাতীয় আয় বার্ষিক শতকরা ৫·৫ যৌগিক হারে এবং মাথা পিছু আয় শতকরা ৩ হারে বাড়বে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জনপ্রতি আয় নির্ধারিত হারে বাড়বে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ আছে। তৃতীয় যোজনায় জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ শতকরা প্রায় ১২ ভাগ হয়ে থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথা পিছু আয় এক রকম অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। আশঙ্কার কথা, ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি ভারতের লোকসংখ্যা ৪৯·৮৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

অগ্রাধিকারের ক্রম

পরিকল্পনায় কৃষির উপর যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সরকারী ব্যবস্থায় অর্থ-নিয়োগের মোট পরিমাণের যেখানে প্রায় একের পাঁচ ভাগ কৃষির জন্য ধার্য হয়েছে, শিল্প, শক্তি ও পরিবহণ খাতে নির্ধারিত ব্যয় সেখানে শতকরা ৬১·৮ থেকে ৫৮·৪ ভাগে কমে এসেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে, স্থির হয়েছে, সার, বীজানুনাশক রাসায়নিক দ্রব্য, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি (যেমন পাম্প, ডিজেল ইঞ্জিন, ট্রাক্টর) তৈরির শিল্পগুলির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কৃষির পরেই পরিবার পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়ার কথা হয়েছে। এখানে চতুর্থ যোজনায় লক্ষ হবে জন্মের হার প্রতি-হাজারে ৪০ থেকে ২৫-এ কমিয়ে আনা। অন্যান্য অভীষ্টের মধ্যে, শক্তি উৎপাদন ক্ষমতার দ্বিগুণ বৃদ্ধি, জলসেচ ব্যবস্থায় একের তিন ভাগ সম্প্রসারণ, রেলপথ ব্যবস্থায় মাল বহিবার ক্ষমতার একের দুই ভাগ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

খসড়া-লিপিতে, সমাজের সেবামূলক কাজের জন্য বরাদ্দ অর্থের অনুপাত শতকরা ১৬ থেকে বেড়ে গিয়ে ২০ ভাগ হয়েছে। তার ভেতর, পশ্চাৎপদ ও উপজাতি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ পরিকল্পনার আছে।

[illegible] ও [illegible] [illegible] কথা যায় দিলে, সরকারী শিল্পসঞ্জাত লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং উন্নয়ন ছাড়া অন্যান্য খাতের ব্যয় কমিয়ে সরকারী অংশের প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ সংগ্রহ করার সংকল্প নেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে ঘাটতি যত শীঘ্র সম্ভব দূর করা এখন আমাদের পক্ষে জরুরী। ১৯৫১-৬০ দশকে ভারতের রপ্তানি এক রকম নিস্তেজ ছিল বলা চলে। তৃতীয় যোজনার প্রথম তিন বছর রপ্তানি বাড়বার একটা লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। সে সময় খনিজ লোহা, চিনি, ইস্পাত, তাঁতের কাপড় ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের মতো নতুন সামগ্রী রপ্তানির সম্প্রসারণ সম্ভব হয় এবং মোট রপ্তানির ভেতর চিরাচরিত তিনটি প্রধান দ্রব্য—চা, কার্পাস বস্ত্র ও পাট শিল্প দ্রব্যের শতকরা অনুপাত ৪৮ (১৯৬০-৬১) থেকে ৪৩ ভাগে (১৯৬৫-৬৬) কমে আসে। স্পষ্টত, রপ্তানির আরো বৈচিত্র্যকরণ এবং আমদানির পরিবর্ত উৎপাদন না করতে পারলে আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে। বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভারতের নির্ভরশীলতার অবসান যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।

স্বাবলম্বন নীতি

নীতি হিসাবে স্বাবলম্বনের তাৎপর্য হচ্ছে যে, দেশের প্রয়োজনের সবচেয়ে বেশি অংশ দেশের ভিতর থেকে মেটানো যাবে এবং যা আমরা দেশে উৎপাদন করতে পারি না অথবা তুলনামূলক সুবিধার দিক থেকে যে সব দ্রব্যের উৎপাদন আমাদের পোষায় না কেবল সেগুলি বাইরে থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং, তার চেয়ে বেশি, আমাদের রপ্তানির আয় থেকে আমদানির যাবতীয় খরচ মেটানো সম্ভব হবে।

মূল্যস্থিতি বজায় রেখে বৈষয়িক অগ্রগতি হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল সূত্র। সে দিকে দৃষ্টি রেখে চতুর্থ যোজনার খসড়া-লিপিতে বলা হয়েছে যে, খাদ্যশস্য, বস্ত্র, খাবার তেলের মতো নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে পাইকারী ও খুচরো ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ নিতে হবে। যাতে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় না বেড়ে যায় সেজন্য কাঁচা মালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। তার চেয়ে বেশি, যার উপর বাড়তি আয় খরচ করা হবে সেই সব জনগণের ব্যবহার্য আবশ্যক দ্রব্যের (যেমন, কাপড়-চোপড়, চিনি, ওষুধপত্র, কেরোসিন, কাগজ) যোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প-সমূহের উৎপাদনের সম্প্রসারণ বাঞ্ছনীয়।

বেকারদের কর্ম সংস্থান

শহর ও গ্রাম অঞ্চলে যে অনেক আংশিক বেকার ব্যক্তি আছে (একটি হিসাব অনুসারে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৬০ লক্ষ), চতুর্থ যোজনাকালে তাদের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। প্রথম তিনটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি নতুন কর্মপ্রার্থী-দের কাজের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয় নি। চতুর্থ যোজনার প্রারম্ভে দেশে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে, বেকারদের সংখ্যা (এ সময়ের ভেতর যারা উপার্জন করার বয়সে প্রথম পৌঁছাবে তাদের না ধরে) ১ কোটি ৪০ লক্ষে দাঁড়াবে। সমস্যার প্রাপ্ত বছরের তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রাম দেশে কর্ম সংস্থানের জন্য যে ৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়।

খসড়া-লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, পরিকল্পনায় নিহিত অভিপ্রায় এবং পরি-কল্পনা প্রয়োগের মধ্যে একটা বড়ো বৈষম্য থেকে যাচ্ছে। প্রকল্পগুলির ভার যে সব লোকের হাতে, তাদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিলে সম্ভবত ভালো ফল পাওয়া যাবে। বার্ষিক ভিত্তিতে আর্থিক উদ্যোগ নিয়ামিত হলে পরিকল্পনাকে বাস্তবে অনুদিত করা সহজসাধ্য হবে।

দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক যোজনার খসড়া-লিপি কোনো অভিনবত্বের দাবি করতে পারে না। আর পরিকল্পনামূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করবে মুদ্রাস্ফীতি ছাড়া অন্য উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারা যাবে কিনা, রপ্তানির যথেষ্ট সম্প্রসারণ ও স্বয়ং নির্ভরতা অর্জন করার সম্ভাবনা এবং পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর।

শান্তিকুমার ঘোষ

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

চুল পাতলা হওয়া

তরুণ ও সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও হয়ত দেখবেন যে চুল ক্রমে উঠে যাচ্ছে আর আপনার মাথায় অকালে টাক পড়ছে। এর কারণ হ'ল আপনার চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব।

মাথায় খুস্কি হওয়া

প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়। চামড়া কুঁচকিয়ে যায় ও শুকনো চামড়া উঠে যায়; ফলে চুলের গোড়ায় সাদা ভাব দেখা যায়। খুস্কি থেকে স্বাভাবিক বিপদের এই সঙ্কেত পাওয়া যায় যে টাক পড়তে আর দেরী নেই।

চুল সম্পর্কে অবহেলা আর অজ্ঞতা কি ভাবে চুল ওঠার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, এই তিনজনকে তার যথাযথ নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়। এরা বিপদের সঙ্কেত পাওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিবিধান করছেন না এবং এরা চুলের যত্ন নিতে অবহেলা করেই চলবেন। আর ফলে অবশেষে একদিন এর জন্য এদের আক্ষেপ করতে হবে। চুলের গোড়া একবার নষ্ট হয়ে গেলে কোন চিকিৎসাতেই তার জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না। আপনিও কি বিপদের সঙ্কেতের লক্ষণ দেখে তাকে অবহেলা করেছেন? তাহলে এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে জানেন? এই সমস্যার একমাত্র উত্তর হ'ল—পিওর সিলভিক্রিন।

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। এটি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিতভাবে মালিশ করলে পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবন দান করে।

আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এর চেয়ে সঠিক উপায় কিছু নেই।

চুলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হলে আপনি আজই 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' নামক বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য এই ঠিকানায় লিখুন: ডিপার্টমেন্ট D-7 সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরী সার্ভিস, পোষ্ট বক্স ১২৭, বোম্বাই-১।

পিওর সিলভিক্রিন

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, এতে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস আছে। একমাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং

সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখবার জন্য একটি সুন্দর ড্রেসিং। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এতে পিওর সিলভিক্রিন আছে।

Silvikrin

সিলভিক্রিন—সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

কলকাতার ডায়েরি
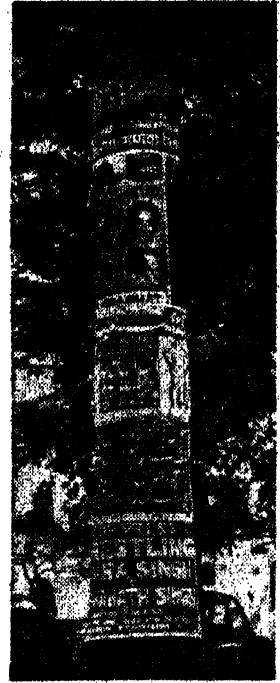
শহরকে সুন্দর করার নানা পরিকল্পনা প্রায়ই শুনি। কেউ বলেন, আলো জ্বালাও, কেউ বলেন, ফুল লাগাও। আমি বলি, ও-সবের কোন দরকার নেই। শহর কলকাতাকে অ-সুন্দর করে রেখেছে দু'টি জিনিস—দোকানের সাইনবোর্ড আর দেওয়ালের পোস্টার। ওইগুলো সব সরিয়ে নিলেই দেখা যাবে, চারদিক অনেকটা ঝকঝকে।

সত্যি, এত পোস্টার বোধ হয় কোন শহরের দেওয়ালে নেই। বাড়ি, ল্যাম্প-পোস্ট, গাছ, ট্রাম-বাস সব কিছুই হরেক রকমের বিজ্ঞাপনের পোশাক-পরা। অমুক সিনেমা, অমুক থিয়েটার, অমুক মিছিল,

অমুক ওষুধ। লিথোর দৌলতে লাল-কালো সরু-মোটা হরফে এলোমেলো সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাস-কয় পরে আসছে ইলেকশন, দেওয়ালের গায়ে তখন আবার পড়বে বাড়তি চাপ। অন্য বিজ্ঞাপনকে কনুই মেরে পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে আরও হাজার হাজার লাখ লাখ নয়া পোস্টার।

এই পোস্টারগুলো অবশ্য শহরের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট দোকানের সাইনবোর্ড। চৌরঙ্গী আর ডালহৌসি পাড়ার কিছু দোকান বাদ দিলে শ্যামবাজার বা ভবানীপুর-শেয়ালদা বা গড়িয়াহাটা যেখানেই যান না কেন, দেখবেন, ওই সব জায়গার সাইনবোর্ডে বাঙালী-চাঁর ও বাংলা ভাষার চাঁর কী চমৎকার ফুটে রয়েছে। কাপড়কাচা, চুলকাটা বা জুতো-জামার দোকানের নামে বাঙালী-সুলভ বাহার আছে, কাব্যও আছে, কিন্তু কম কথায় কোন দোকানীই নিজের পসরার কথা গুছিয়ে জানাতে পারেন না। কথা বলার সময় আমরা যেমন 'চোপড়' ছাড়া 'কাপড়' পরতে পারি না; 'পরীক্ষা'-র সঙ্গে 'নিরীক্ষা'-ও করি এবং 'বাসন'-এর সঙ্গে লেজুড় জুড়ি 'কোসন' এনে, ঠিক তেমনই 'অধিকন্তু ন দোষায়' এই প্রবাদবাক্যটিকে আপ্তবাক্য করে দোকান খোলার সময় দোকানের নাম, দোকানীর নাম, প্রাপ্তব্য সব জিনিসের নাম, তার গুণাগুণ ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য বিশদভাবে সাইন-বোর্ডের গায়ে নানা রকম কায়দায় ঝুলিয়ে না রাখলে আমাদের চলে না। কোন সাইন-বোর্ড চৌকো, কোনটি তেরচা, কোনটি চ্যাঙা, কোনটি আবার হাওয়ার গোত্তা খেয়ে ঝুলে-পড়া। দোকানগুলো যেমন একে অন্যের গায়ে জড়াজড়ি, সাইনবোর্ডও তেমনি পর পর সার সার গাদাগাদি।

আবার বাংলা ভাষায় নোটিস ঝুলিয়ে দোকানী সন্তুষ্ট নন, কাছাকাছি ইংরেজী অনুবাদ না রাখলে দোকানের জাত যায়, দোকানীরও ইজ্জত থাকে না। অতএব 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়' যথেষ্ট নয়, ইংরেজী হরফে 'ট্রায়াল সলিসিটেড' কথাটাও জঞ্জাল বাড়াতে অনিবার্য।

আর বানান ভুলের কথা নাই বললাম,
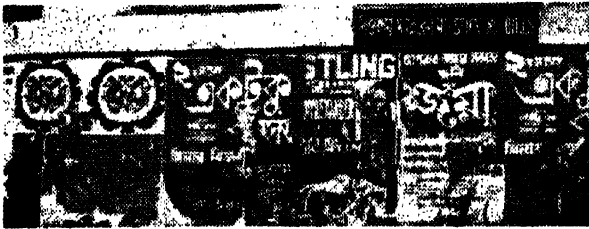
সাইনবোর্ডগুলোর যে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই, সে কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। কলকাতা শহরে কিছু 'ঘড়' 'ভাড়া' দেওয়া হয়, 'পরিক্ষা' 'প্রার্থণিয়' হয় অনেক দোকানে এবং 'জড়ী-পার' শাড়িও মেলে খোঁজ করলে। তবে এ ব্যাপারে ওদের শুধু দোষ দিয়ে ল্যাভ নেই, দক্ষিণ কলকাতার একটি সিনেমা হলের নাম দীর্ঘকাল ভুল বানানে নিয়ন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমার বক্তব্য, ফুল লাগানো বা আলো জ্বালানোর আগে দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার মারা বন্ধ করতে হবে, দোকানে-দোকানে সাইনবোর্ডের শব্দ সংযম করতে হবে, নইলে গোটা কলকাতার হতশ্রী রূপ

কোনদিন ঘুচবে না। এমনিতে পথে-ঘাটে অজস্র জঞ্জাল, তদুপরি পোস্টার-সাইন-বোর্ডের কথায় জঞ্জাল যেন শুরু না হয়। এবং শহরকে সুন্দর করার বাসনা যদি সত্যি সত্যি থাকে তাহলে অজস্র কথায় লেখা বিজ্ঞাপনে ভরা ওই বেঢপ সাইনবোর্ডগুলো নামিয়ে ফেলে দোকানের মাথায় বা উপরে, বিদেশে যেমন থাকে, শুধু দোকানের নামটি স্পষ্টাক্ষরে লিখে রাখতে হবে।

দোকানী যদি মনে করেন, পসরার বিস্তৃত বিবরণ এবং কুল-গোত্র বংশ-পরিচয় ইত্যাদি না থাকলে ব্যবসায় ক্ষতি হবে, তাহলে সাইনবোর্ডের হিজিবিজির বদলে গো-কেলে খদ্দেরের চোখ-ভোলানোর ও টাকা-গলানোর নানা ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন। সাইন-বোর্ডের হিজিবিজির বদলে শুধু দোকানের নাম বড় হরফে লিখে রাখলেই যে কাজ হাসিল হয়, তার প্রমাণ নামকরা একটি জুতো তৈরির প্রতিষ্ঠান।

※

গান তো নয়, পাখির ডাক। সুর, মিষ্টি, হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। শ্রীমতী সংমিত

শ্রীমতী সংমিত আদিয়ান

আদিয়ান লেপচা যখন একের পর এক গান গেয়ে চলেছে, আমার বারবার মনে হচ্ছিল, এ গলা মানুষের নয়, পাখির, পাহাড়ী পাখির: ঘন সবুজের বন থেকে বেরিয়ে এসে নীল পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে আসছে।

আশ্চর্য কণ্ঠ এই মেয়েটির। আরও আশ্চর্য, দার্জিলিঙের লেপচা মেয়ে হয়েও নেপালী বা লেপচা লোকসংগীত শুধু নয়, বিদগ্ধজনের রবীন্দ্রসংগীতও তার গলায় অসাধারণ খোলে। যেমন উচ্চারণ, তেমনই গায়নভঙ্গী। কিছু দিন আগে রবীন্দ্র সদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে শ্রীমতী সংমিত যখন মঞ্চ থেকে গলা খুলে, প্রাণ ঢেলে গাইছিল—'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়', গোটা প্রেক্ষাগৃহ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

মেয়েটি লোকরঞ্জন শাখারই একজন কর্মী। সামান্য মাইনে পায়, থাকে দার্জিলিঙে। বয়স কুড়ির নিচে। গান শিখতে শুরু করেছে গত এগার বছর, রবীন্দ্রসংগীতে শিক্ষা নিচ্ছে ১৯৬৩ সাল থেকে। এরই মধ্যে শিখেছে অনেক গান।

কয়েকজনের মুখে মেয়েটির গলার প্রশংসা শুনে সেদিন তাকে ডেকে আনি বাড়িতে, শুনি একের পর এক অনেকগুলো গান—'আপন মনে ছাড়বে তোরে', 'নাই নাই ভয়', 'আমরা নূতন যৌবনেরি দূত', 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'।

সত্যি বিস্মিত হবার মত গলা। সাধারণ একটি পাহাড়ী মেয়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান এত সুন্দর ফুটে উঠবে, ভাবতে পারিনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের কাছে অনুরোধ, মেয়েটির গলার দিকে তাঁরা যেন নজর রাখেন, তার সংগীত-প্রতিভা স্ফুরণের সব ব্যবস্থা যেন করেন।

চাণক্য

অ্যারিস্টটলের লন্ঠন

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

স্থলে জলে-

গ্রীক পুরাণের সেই গল্পটির কথা একবার এখানে স্মরণ করলে খুব কাজ দেবে। অনেকের ধারণা স্বয়ং প্লেটো নাকি এই কাহিনীর প্রবক্তা। এই গল্পে আছে যে বহু পুরাকালে জিব্রালটার প্রণালীর আরও পশ্চিম দিকে একদা "অ্যাটলান্টিকা" নামে একটি মহাদেশ ছিল। ও দেশের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। তার কারণ সেখানকার অধিবাসীরা জিউসের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবমাননা দেখানর দায়ে ভগবান তাদের সবাইকে যারপরনাস্তি শাস্তি দেন। পাপের ভারে সেই মহাদেশটি জলের নীচে বিলীন হয়ে যায়। তাই আজ আর এ মহাদেশটির চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—সেখানে এখন পরিব্যাপ্ত রয়েছে অ্যাটলানটিক মহাসাগরের বিশাল জলরাশি। ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই রকম মহাদেশের মত বিরাট জায়গা সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যাওয়ার মত অঘটন শুধুই গল্পকথা, না এর মধ্যেও কিছু বাস্তব সত্যের রেশ থাকতে পারে? সব গল্পকারের মত প্লেটোও কী গল্প মেরেছিলেন, না এই সলিল সমাধির কাহিনীতে তিনি ছিটেফোঁটা সত্যের অনুপান মিশিয়ে ছিলেন? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হলে কোন মূল কারণের দরুন মহাদেশ ও মহাসাগরের উদ্ভব হয় এবং কী কারণে ভূগর্ভস্থ পরিবর্তন ঘটে যায় সে কথাই তলিয়ে দেখতে হবে।

চোখের সামনে আজ যে সব মহাদেশ ও মহাসমুদ্রের রূপরেখা দেখতে পাই তারা চিরকাল এমনি অবস্থাতেই পৃথিবীর ভূ-আলেখ্য রচনা করে রেখেছিল কি না সে নিয়ে নানা ভৌগোলিক মুনির নানা মত রয়েছে। অনেকে বলেন, প্রশান্ত মহাসাগর অন্যান্য সাগরদের তুলনায় বয়সে অনেক প্রবীণ—তা বহু কাল ধরে পৃথিবীর সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় অ্যাটলান্টিক ও ভারতমহাসাগর বয়সে অনেক "কাঁচা"। অনেক পণ্ডিতের মত হল পৃথিবীর চেহারা আজন্মকাল মোটামুটি একই রকম রয়েছে, এখানে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। সৃষ্টির পর থেকে ভূ-সংস্থান এক রকম স্থিতিশীল হয়ে আছে। যেখানে যে সাগরের যে মহাদেশের অবস্থান এখন দেখছি সেদিনও তারা তেমনি ভাবে সেখানে তেমনি করে জুড়ে বসে ছিল। এই মতের সমর্থকদের ধারণা যে পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর ক্রমে তা তাপ হারিয়ে সংকুচিত হয়ে তার স্থায়ী আকৃতিটি লাভ করে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা আজ কিন্তু উপরোক্ত মতকে সমর্থন করেন না। তাঁরা অনুমান করেন সৃষ্টির পর থেকে ভূত্বকের নানা ওঠাপড়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই রকম নানা পরিবর্তনের হাত থেকে পৃথিবীর রেহাই নেই। এঁদের মতে ভূগোলকটি আজও সম্পূর্ণে তাপহীন অবস্থায় এসে পৌঁছয় নি। আধুনিক স্থূলচর্চার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় বিচার করে জানা যায় পৃথিবীর বয়স আগে যত মনে করা হতো এখন তারচেয়েও আরও বেশী বলে প্রমাণিত হয়েছে—সাড়ে চারশো কোটি বছর। ভূগোলকটি ইতিমধ্যেই সমস্ত তাপ হারিয়ে একদম নিরুত্তাপ হয়ে যায় নি। পৃথিবীর ভিতরকার তাপ একটি পরিচলন স্রোত (Convection Current) হিসাবে অহরহ পৃথিবীর ভিতরে এদিকে-ওদিকে চলে যাচ্ছে। শুধু মহাদেশগুলি নয় পৃথিবীর সমস্ত বহিরাবরণ অনবরত আবর্তন করছে। পৃথিবীর ভিতরকার এই তাপ পরিচলন স্রোত বহুদেশে অর্থাৎ মহাদেশগুলির উপর কার্যকরী এবং তাদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

মানসচক্ষে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান বর্তমানে যে পাঁচটি মহাদেশ যেখানে যে অবস্থায় সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে রয়েছে তারা ২০০,০০০,০০০ বছর আগে ঠিক এমনতর অবস্থায় ছিল না। আলফ্রেড ওয়েগনার একটি অভিনব মত উত্থাপন করেন। যার সার কথা হয় এই যে, সেদিন মহাদেশগুলি আজকের মত এমন স্বতন্ত্র ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ন্যস্ত ছিল না। এই বিশেষজ্ঞের অনুমান যে একদা পৃথিবীর তাবৎ মহাদেশগুলি জড়সড় হয়ে মাত্র দুটি বিরাট বিরাট মহাদেশ সৃষ্টি করে রেখে ছিল। তখন উত্তরে ছিল লরেশিয়া (Laurasia) ও দক্ষিণে গনডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwanaland)। ভাবতে হবে কালক্রমে এই দুইটি বিস্তৃত মহাদেশের বিশেষ বিশেষ অংশ জলমগ্ন হয়ে যায় এবং সেই জায়গায় অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের জন্ম হয়। এ হেন অবস্থায় কানাডা ও রাশিয়া একত্রিত ভাবে গঠিত হয়ে তখন এক মহাদেশের অংশ ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য মিলে একটি সুদূর বিস্তৃত মহাদেশ রচনা করেছিল।

কারো ইচ্ছা হলে (এবং তার ধৈর্য থাকলে) সে স্বচ্ছন্দে হাটা পথে টুকটুক করে রাইয়োডেজিনিরো থেকে কলকাতা পর্যন্ত চলে যেতে পারত। তখন বাংলাদেশ থেকে নিউজিল্যাণ্ড হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সরাসরি ডাঙ্গা পথে যাওয়ার অসুবিধা ছিল না। গেলেও পাসপোর্ট লাগত না—সবাই হতে পারত এক বিরাট দেশের বিশ্ব-

পূর্বে মহাদেশগুলি একত্র জোড় বেঁধে ছিল, ক্রমে ভূগর্ভস্থ তাপীয় পরিচলনের ফলে বিক্ষিপ্ত হয়ে দূরে সরে যায়

সামরিক। তখন গ্রীনল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ডের লাগোয়া অংশ বিশেষ। ইউরোপ ও এশিয়ার সীমা রেখা বিভক্ত করতে যে ইউরাল পর্বতমালা দেখতে পাওয়া যায়, সেদিন সেটি একটি দ্বীপের মত মাত্র ছিল। গ্রেট বৃটেনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—একটি সামান্য দ্বীপের মত সে ভাসছে।

মহাদেশের জোড় অবস্থা থেকে কী ভাবে কালক্রমে তা খান খান হয়ে গেল সেই প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর্থার হোমস (Arther Holmes), ডি টি গ্রীগস (D. T. Griggs), টুজো উইলসন (Tuzo Wilson) প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে মহাদেশগুলি জোড় অবস্থা থেকে বেজোড় অবস্থা পেয়েছে মুখ্যত পৃথিবীর নিচে যে মন্থর তাপীয় পরিচলন স্রোত (sluggish thermall convection current) আছে তারই আবর্তনের ফলে। ভূত্বক (crust) ও অন্তঃ (Core)-র মধ্যে যে জায়গাটি আছে তার নাম ম্যানটেল (mantle)। এই ম্যানটেল নামক অংশটি থেকেই এই তাপ পরিচলন স্রোতটি প্রবাহিত হয়। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এই তাপীয় পরিচলন স্রোতটি ভূত্বকের বিভিন্ন

পিসারো অঙ্কিত ল্যান্ডসকেপ—'বাগিচায় নারী'

কামিল্ পিসারো (১৮৩০-১৯০৬)

হয়তো এক মহৎ শিল্পী নন, কিন্তু নিঃসন্দেহে, পিসারোর ছবি বর্তমান আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কে না বলবে সমগ্র ইম্প্রেশনিস্ট ইস্কুলে তাঁর সঙ্গেই প্রকৃতির যোগাযোগ সবচেয়ে নিকট ও গভীর। কার না মনে হবে তাঁর ছবি খাঁটি প্রতিভার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, যা আসছে অন্তর থেকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মতো সাবলীলভাবে, সহজে। এ-কথা বলব না, তাঁর মতো প্রকৃতি আর কেউ আঁকেন নি, অত্যুক্তি হবে যদি বলি যে, পিসারোর এক-একটা ছবি অমোঘ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন কম্পমান উজ্জ্বল ল্যান্ডস্কেপ খুব কম চিত্রকরই আঁকতে পেরেছেন আজ পর্যন্ত।—তাছাড়া এ'র মতো এমন সৎ ইম্প্রেশনিস্ট কেউই যা ছিলেন দলে মোনে ছাড়া। [সৎ ইম্প্রেশনিস্ট বলতে অবশ্য এই বুঝিনি যে, তিনিই একমাত্র সাধুপুরুষ ছিলেন দলে। মোনে এবং পিসারো সমস্ত জীবন একই চিত্রাদর্শ মেনে চলেন, যাকে ইম্প্রেশানিজম্ বলা হয়, উলটো দিকে সেজান, রেনোয়ার, দেগা এই আন্দোলনে থাকলেও ক্রমশ স'রে এসে-ছিলেন খাঁটি ইম্প্রেশনিস্ট-চিত্রাদর্শ থেকে।—এই অর্থেই তিনি সৎ ইম্প্রেশনিস্ট।]

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেইন্ট টমাস-এ ১৮৩০-এ পিসারোর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ফরাসী এবং মা ক্রিওল। পিতামাতার প্রবল অনিচ্ছা ছিল কামিল্ চিত্রকর হয়, তাই প্রায় জোর করেই ছেলেকে ফ্রান্সে আসতে দেননি তরুণ বয়সে, কিন্তু পঁচিশ বছরের ছেলেকে কে আটকাবে? ১৮৫৫তে তিনি প্যারিসে এসে কোরোর স্টুডিওতে ছাত্র হিসেবে কাজ আরম্ভ করলেন। এই সময়কার ছবিতে তার ওপর কোরোর প্রভাব লক্ষণীয়।

১৮৬৫তে পিসারোর সঙ্গে মোনে, রেনোয়ার, মানে, সেজান প্রভৃতির আলাপ হয় এবং ঘনিষ্ঠতা হতেও দেরি হয়না একটুও, কারণ প্রত্যেকেরই চিত্রকলা বিষয়ে মতামত মূলত এক। বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র দ্যাবিনি আর কুর্বেই এ'দের পছন্দ করতেন, কিন্তু পিসারোর গুরু কোরোর কাছে এই তরুণ শিল্পীরা বখাটে ছোকরা বই কিছু না। কোরোর সঙ্গে পিসারোর সম্পর্কে চিড় এখানেই শুরু।—১৮৭০এ প্রাশান দখলের সময় পালিয়ে তিনি লণ্ডনে চলে যান মোনের সঙ্গে। সেখানে এ'দের দ্যাবিনির সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তিনিই পিসারো আর মোনেকে আলাপ করিয়ে দেন তরুণ ফরাসী চিত্রব্যবসায়ী দুরাঁদ-রুয়েলের সঙ্গে। দুরাঁদ-রুয়ে অবিলম্বে পিসারোর কিছু ছবি কেনেন এবং পরে প্যারিসে এসে এই দলের মুখ্য প্রচারক এবং নিয়মিত বিক্রেতা হয়ে দাঁড়ান। ইংলণ্ডে পিসারো টার্নার ও কন্স্টেবল দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ফ্রান্সে ফিরে এসে দেখেন তাঁর বাড়ি লুঠ হ'য়ে গেছে—জিনিসপত্র তো গেছেই, তার ওপর প্রায় এক হাজার ছবি নিখোঁজ। কিন্তু দেশে ফেরার আনন্দের কাছে এই দুঃখ তখন কিছুই না পিসারোর; তিনি পাঁতোয়াতে গিয়ে নতুন বাসা নিলেন। এই পাঁতোয়াতেই সেজান তাঁর সঙ্গে প্রায় দু বছর কাটান।

যদিও পিসারো প্যারিসে থাকতেন না, তবু অন্তত সপ্তাহে তিন চারবার এই শহরে তাঁর আসা চাই। পিসারো ছিলেন এই দলে সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ, স্থিতধী, দায়িত্ব-পূর্ণ এবং বন্ধুবৎসল মানুষ। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৬-এর মধ্যে যে আটটি স্বাধীন

ইম্প্রেশনিস্ট ছবির প্রদর্শনী হয় তার প্রধান উদ্যোক্তাই ছিলেন কামিল্ পিসারো।

পিসারোর তরুণ বয়সের ছবিতে আমরা কুর্বে ও কোরোর প্রভাব লক্ষ করি। প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর কাব্যিক, কিছুটা রোমাণ্টিক ধারণা প্রস্ফুটিত হয় এই সময়ের ল্যান্ডস্কেপগুলোতে। রেখাঙ্কনের গভীরতা, রঙের নাটকীয় বিন্যাস এ-সব ছবিতে দেখা যায়, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধরনটা একদম বদলে গেল; ক্রমশ তিনি হাল্কা, অপ্রচলিত রঙ ব্যাবহার করতে লাগলেন এবং সেই সব বিষয় নিলেন যেগুলো ক্যানভাসকে অহেতুক ভারি করে তুলবে না। ১৮৬৫-র পর থেকে পিসারোর ছবিতে গভীর ব্রাউন, মেটে রঙ, গাঢ় নীল, বোতল-সবুজ প্রভৃতি বর্ণের ব্যবহার আর দেখা যায় না। ১৮৭০-এর ইংলণ্ড ভ্রমণে টার্নারের ছবি দেখে মুগ্ধ হবার পর হাল্কা অস্বচ্ছ রঙের দিকে ঝোঁক তাঁর আরো বেড়ে গেল। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ এই পর্যায়ে, যখন তিনি তাঁর প্রতিভার তুঙ্গে, পিসারোর সব ছবিই লিরিকধর্মী, সজীব এবং হাল্কা। এরকম একটি ছবি নিয়েই আলোচনা করা যাক্ আজ।

"Femme dans un clos (বাগিচায় নারী") ছবিটি যেন কাঁপছে—হাওয়ায় পাতার মধ্যে যেমন আলো কেঁপে ওঠে, ঝিক্‌মিক্ করে, একটু যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম সমস্ত ছবিটিতে এক ধরনের কম্পমান উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়। পিসারোর পরিণত বয়সে আঁকা সব ছবিতেই এই আলোর নাচ দেখতে পাবেন। এই কম্পমান ভাব কী করে আনলেন ছবিতে? পিসারো উজ্জ্বল হাল্কা রঙ ছোট-ছোট কমার মতো আঁচড়ের সাহায্যে ক্যানভাসে ব্যবহার করেছেন; এক রঙের ওপর আরেক রঙ, জায়গায়-জায়গায় তিন-চারটে রঙ এক সঙ্গে মিশেছে ছবিটিতে লক্ষণীয়। এবং লক্ষ করবেন রঙগুলি বেশীর ভাগ সময়ই বিপরীতধর্মী নয়, একই রঙ হয়তো বিভিন্ন শেডে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত ছবিটিতে গভীর রঙ একেবারে নেই বললেই চলে, শুধু সেই-সেই অংশ ছাড়া, যেখানে গাছ এবং গাছের ছায়া রয়েছে।
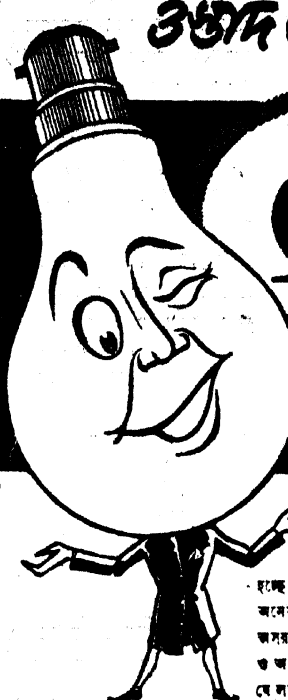
ছবিটির সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল এর কবিতার অংশটা। একটি রঙিন মেয়ে গোলাপী বাগানে মিশে গিয়ে প্রকৃতির অংশ হয়ে গিয়েছে—মঞ্জুরা, হলুদ, গোলাপী, সবুজ (হাল্কা) অন্তহীন রঙের খেলা চলেছে যেন এই বাগানে। পাতার কম্পনে, ঝলমলে রোদ্দুরে এই আলোকিত বাগিচা ছেলেবেলার সুখস্মৃতির মতো মধুর।

শঙ্করলাল বসু

নারী সংগঠনের নূতন ভূমিকা

নারী সংগঠনের প্রথম অধ্যায়ে সংগঠিত-ভাবে অন্দোলন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অধিকার নিয়েই তখন ছিল সবচেয়ে বেশী মাথাব্যথা। কি তাদের অভাব, কোথায় তাদের অভিযোগ জানিয়ে বুঝিয়ে সরকার আর সমাজের সামনে তাদের প্রতিষ্ঠা করার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এবার এসেছে তার সামনে অধিকারের সঙ্গে দায়িত্ব। আজ দেশে মহিলা সংস্থা অনেক। তাদের সমগ্রভাবে তুলে নিতে হবে আর্থিক, সামাজিক ও খাদ্যসংকটের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয়ের ভার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মহিলা কর্মীদল আবার একত্র হবার চেষ্টা করছেন। নারী প্রগতি আন্দোলনের যাঁরা সেই প্রথম অধ্যায় রচনা করেছিলেন, তাঁদেরই অনেকে মিলিত হয়েছেন সর্ব-ভারতীয়ভাবে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের কর্তব্যধারার সূচনা করতে। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাবাঈ দেশমুখ, রেণুকা রায়, লক্ষ্মী মজুমদার প্রমুখ কর্মীদল এই নূতন পরিকল্পনার আলোচনা করতে দু'তিনবার বৈঠকেও মিলিত হয়েছেন। বাংলা দেশে আপাতত কিভাবে কাজ হবে তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন শ্রীমতী রেণুকা রায়।

শ্রীমতী রায় আপাতত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ ও অক্ষরজ্ঞান বা লিটারেসি নিয়ে কাজ করার জন্য বাংলা দেশের মহিলা কর্মীদের সংগঠিত করতে চান। এ সংগঠনে যে কেউ যোগ দিতে পারেন। সরকারীভাবে সাহায্য অথবা অন্য কোনও অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর না করে যাতে আন্দোলন স্বয়ংভর হয় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। বার বার সীমান্ত সংকটে মেয়েরা প্রচুর কাজ করেছেন এবং অর্থ সংগ্রহ তাঁরা যতটুকু করেছেন তার অনেকটা প্রতিরক্ষা তহবিলে পাঠিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সংগঠিতভাবে যে কোন কাজ অনেক অর্থ সাহায্য বিনাই সম্ভব। তবে এই পরিকল্পনা-কর্মীরা সকলেই মনে করেন, কিছু উৎসাহী মহিলাকে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলনের সাহায্যকল্পে পাঠাতে হবে। তার ব্যয়ভার কিছুটা আঞ্চলিক সাহায্যে হবে। কর্মীর থাকা-খাওয়া ইত্যাদি সুদূর পল্লীগ্রামেও আঞ্চলিক সহযোগিতায় সম্ভব। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় কি কি অধীতব্য বিষয় থাকবে সে সম্বন্ধে এখনও পাকাপাকি খসড়া কিছু না হলেও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধই যে মুখ্য শিক্ষণীয় বিষয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ঘরে ঘরে প্রত্যেক ঘরনী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাঁরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হন তবে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কিছুটা সহজ হয় এ কথা স্বীকার করতেই হবে। বিলেতে একবার নাকি রুটিওয়ালারা রুটির দাম বাড়ানোতে গৃহিণীরা একত্র হয়ে বলেছিলেন, রুটির বদলে ঘরে ঘরে আলু চলবে। হোক অসুবিধা, হোক কষ্ট তবু চড়া দাম দিয়ে

[ঝাঁ]জা দুটি ধরে নেবেন না। দু'চার দিনের [মধ্যেই] দুটি সে'কা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। রুটিওয়ালারা তখন আবার দাম কমাতে বাধ্য হল।

রাজনৈতিক কারণ, প্রকৃতির খেয়াল, অর্থনৈতিক অদল-বদল, শাসনব্যবস্থার ত্রুটি সম্বন্ধে যাঁদের আলোচনা করবার তাঁরা তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন, কিন্তু সংসারের উদয়াস্ত প্রয়োজনের দায়িত্ব যাদের হাতে সেই মহিলা সমাজকে যে সকল বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে দিনের পর পর চালাতে হবে। কাজেই তার দায়িত্বভার সম্বন্ধে সচেতন তাঁকে হতেই হবে। বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলারা তাঁদের এই সচেতন হবার জন্য সাহায্য করবেন। সমবায় মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়। এমন কি যেখানে সমবায়ও সম্ভব নয়, সাধারণভাবে মহিলারা একত্র হয়ে কেনাকাটা করে Fair price shop বা ন্যায্য মূল্যের দোকান চালাতে পারেন। ক্রয় ক্ষমতা যাঁর বেশী তিনিও সাধারণের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে যদি অস্বীকার করেন, তবে জিনিসপত্রের দাম আপনা হতেই অন্তত কিছুটা কম হবে।

শ্রীমতী রায় বলছিলেন, ক্রমশ নানাভাবে মহিলাদের নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগাতে পারলে আজকের কঠিন সমস্যাগুলিরও অনেক সমাধান হতে পারে। যেমন ধরুন, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, আমদানি, রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বড় বড় কারণ। দেশের মেয়েরা যদি জানবার সুযোগ পায় রপ্তানির পক্ষে মূল্যবান কি কি জিনিস আমরা নিত্যব্যবহার করি, তবে তাঁরা হয়তো চেষ্টা করবেন সে জিনিস কতটা কম ব্যবহার করে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো যায়। আবার আমদানি করা জিনিস অথবা যে জিনিসে আমদানি করা উপাদান ব্যবহার বেশী হয় তাও বর্জন করতে তাঁরা চেষ্টা করতে পারেন।

বর্তমানে যাঁরা সমাজসংস্কারের বিভিন্ন কাজে যুক্ত আছেন, তাঁরাও এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন আবার দূরে দূরান্তের যে মেয়ে নিজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল চিন্তা করছে সেও অনায়াসে যোগ দিতে পারে; কারণ, আন্দোলন প্রধানত সচেতনতার আহ্বান। সমষ্টিগত সচেতনতায় নারীসমাজ যে দুর্নিবার অগ্রগতির পথ পেয়েছিল, তারই এক ভিন্ন পথের সন্ধান মাত্র। আঞ্চলিকভাবে নানা স্থানে মহিলা সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে। কর্মীদের উৎসাহের অভাব নেই। তাঁদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ যেন সীমাবদ্ধ না হয় তাঁদের আহ্বান। যাদের সবাই জানে বা চেনে তাঁদের বাইরেও সচেতনতার অভাব নেই। তারা বাদ পড়ে গেলে উদ্দেশ্যই সফল করা কঠিন হবে।

—শ্রীমতী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যসভায় তাঁর ভাষণে বিরোধী পক্ষদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—আমি কাহারও বক্তৃতার তোড়ে ভাসিয়া যাইব না।—"কথাটা শুনতে ভালো; কিন্তু সব সময় বক্তৃতা শুধু তোরসার

তোড়েই সীমিত থাকে না, অনেক সময় সেটা গঙ্গার ষাঁড়াষাঁড়ির বানে উত্তাল হয়ে ওঠে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, বামপন্থীদল সম্মিলিত ভাবে কংগ্রেসকে হটাইয়া একটি বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন। খুড়ো বলিলেন—"এটা কি মধুভাবে গুড় হবে, না গুড়ভাবে মধু হবে তা বলতে হলে ইংরেজী নজীর টেনে বলতে হয়,—টেস্ট অব পুডিং ইজ ইন দি ইটিং।"

সংবাদে প্রকাশ, রেল যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের আগে জীবনবীমা ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা হইতেছে।—"ভালো কথা। তবে শুধু যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের ব্যবস্থার সঙ্গে পিন্ডদানের কোন-একটা ব্যবস্থাও যেন সেই বীমার অন্তর্ভুক্ত হয়, নইলে প্রেতলোকের উৎপাতে গোটা রেল পরিচালনাই বানচাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

চীন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, সমস্ত ফুলের বাগান তুলিয়া দিয়া তরিতরকারির বাগান করার সরকারী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—"শত শত ফুল ফুটুক-এর বদলে এখন শত শত ভেরেন্ডা"—সংক্ষেপে মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

চীনের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ সেক্সপীয়ারের কোন বই বিক্রয় বা রাখা চলিবে না বলিয়াও চীন সরকার ফারমান জারি করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তাতে অবশ্যি আমাদের কিছু আসবে যাবে না, কিন্তু ভাবছি, আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি আমরা যেমন সচেতন হয়ে উঠেছি, তাতে কলকাতার সেক্সপীয়ার সরণীর নাম পালটাবার জন্য না হামলা-হামলি শুরু হয়ে যায়!!

এক্সপ্রেস ডেলিভারি খামের রঙ নাকি পরিবর্তন করিয়া লালচে করা হইয়াছে—"লালটা চলার সংকেত নয়, (সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম অবশ্য চীনে হয়েছে) সুতরাং এক্সপ্রেস না এবার ডেড স্টপে দাঁড়ায়" বলেন সহযাত্রী।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি অভিনব মিছিলের সংবাদ পাঠ করিলাম। শুনিলাম, সরকার-বিরোধী দল কর্তৃক পরিচালিত না হইয়া, সেই মিছিল পরি-

চালিত হইয়াছে সরকার-সমর্থক দল কর্তৃক। সহযাত্রী বলিলেন—"নিশ্চয়ই মন্ত্রিপর্যায় থেকে—'ছাঁটাই করা চলবে না, চলবে না' ধ্বনি তোলা হয়েছিল!!"

চীনের পিপলস ডেইলি কাগজের সম্পাদকীয়তে নাকি বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন সাহায্য লইয়া চীনের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া রাখিতে চাহিতেছে।—"মন্দই বা কী; পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য প্রাচীর তো চীনেই ছিল"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

মিশর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে শুনিলাম, অতঃপর তিনবার তালাক তালাক বলিয়া বেগমকে তালাক দেওয়া চলিবে না, উহার জন্য কোর্টের অনুমতি লইতে হইবে। শ্যামলাল বলিল—"মিশরের সঙ্গে পাকিস্তানী আঁতাতের খোয়াবের এখানেই কবর হয়ে গেল!!"

বিলাতে শ্রমজীবিরা কী কী খাদ্য পছন্দ করেন, তাহা খোঁজ লইবার জন্য অফিস আর কারখানা পাড়ার রেস্তোরাগুলিতে নাকি ভোট লওয়া হয় এবং সেই ভোটের ফলাফল ভারতীয় ঝোলের পক্ষে হয় আশাপ্রদ, সেই ঝোল

তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"সংবাদ শুনে আমরা খুব আশান্বিত হই নি। দেশের অবস্থা বিবেচনা করে আমরা বড় জোর গাঁদালপাতার ঝোল রান্নাটাই শেখাতে পারি, কাঁচকলার ঝোলকে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখতেই হবে!!"

বামপন্থী দল ঘোষণা করিয়াছেন, সরকার তাঁহাদের দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণ না মিটাইলে ২২ এবং ২৩ সেপটেমবর তাঁহারা ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতালের আহ্বান জানাইবেন। খুড়ো বলিলেন—"এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবার নেই এবং বললেই বা কে তা শুনছে। তবে আমাদের একটি অনুরোধ ছিল (দাবি নয়), ৪৮ ঘণ্টার বদলে হরতালটা এক মাসব্যাপী করলে বারোয়ারি পুজোর চাঁদা দেওয়া থেকে রেহাই পেতে পারি!!"

সংবাদে শুনিলাম, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী দিল্লী আগমন করিয়াছেন।—"ভারত অপ্রত্যাশিত ভাবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় সিঙ্গাপুরের নিকট পরাজয় বরণ করেছে। সে সম্বন্ধে কোন সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে যদি প্রধানমন্ত্রী দিল্লী এসে থাকেন, তবে সে আগমন ব্যর্থ হতে বাধ্য, এই পরাজয়ের সান্ত্বনা নেই"—বলেন জনৈক ক্রীড়া-রসিক সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে।—"এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মারকিন সাহায্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না"—মন্তব্য করেন অন্য এক ক্রীড়া-রসিক।

অনুবাদ : বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য সংকলন (প্রথম খণ্ড) গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমান। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত বৈদিক সাহিত্য সংকলন নামক গ্রন্থখানির পরিচিতিতে বলা আছে যে বাংলাদেশে সংস্কৃতের আদর যাতে প্রসার লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যে 'সংস্কৃত প্রসার গ্রন্থমালা' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন তারই প্রথম প্রচেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থটিতে ঋক, শুক্ল যজু, কৃষ্ণ যজু, সাম ও অথর্ব-বেদের নির্বাচিত সূক্তগুলি স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা কিঞ্চিদধিক দু' শ'। এই স্বল্পপরিসরে বেদগ্রন্থের যে সূক্ত সংগৃহীত হয়েছে তা মূল গ্রন্থগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র বহন করে। সেগুলির বিশালত্বকে সূচীত করে না।

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে অনুবাদ যথা-সম্ভব মূলানুগ রাখার প্রচেষ্টা করা গেছে। সম্ভবত এইভাবে বৈদিক সাহিত্যের আঙ্গিক ও সাংকেতিকতা পাঠককে বোঝাবার ও জানাবার চেষ্টা উদ্যোক্তারা করেছেন। কিন্তু এর ফলে অতি সাধারণ পাঠকের কাছে অনুবাদগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় অস্পষ্ট ও কঠিন হয়ে পড়েছে। তৎসম শব্দের প্রয়োগ, এবং বাংলা বাক্যগঠনরীতিকে অনেকাংশে উপেক্ষা করার ফলেই এটা ঘটেছে। যেমন, করা নশিচন্দ্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ইত্যাদির অনুবাদ, কাহার দ্বারা আমাদের (প্রীত) বিচিত্র (ইন্দ্র) অভিমুখ হইবেন রক্ষণের জন্য, (যিনি) সদা বর্ধনশীল বন্ধু? কোন বলিষ্ঠ বর্তন বা কর্ম দ্বারা (অভিমুখ হইবেন)? এ রকম বা এর চেয়েও দুরূহ বাংলা সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এ রকম অনুবাদের দ্বারা মূলের প্রতি হয়ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু যে ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে সে ভাষাটির মর্যাদা স্বীকার করা হয় নি। শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় সুখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি, এ রকম অনুবাদ-কর্মের যথেষ্ট যৌক্তিকতা হয়ত তিনি উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু পাঠকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা যে এই অনুবাদ-কর্মে নেই তা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। বিশেষত এর দ্বারা সংস্কৃত ভাষার প্রতি সর্ব-সাধারণের আদর কি ভাবে প্রসার লাভ করবে তা দুর্বোধ্য। তবে মূলানুগ অনুবাদগুলির সঙ্গে একটি সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত টীকা থাকলে, গ্রন্থের আকার সামান্য বৃদ্ধি পেলেও তা জনসমাদর হয়ত লাভ করত। অনুবাদ যদি মূলের মতোই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তবে জনসাধারণ বরং কষ্ট করে মূল গ্রন্থই পড়ার চেষ্টা করবেন, অনুবাদ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ৪০৫।৬৫

প্রবন্ধ : শিশু মনোবিজ্ঞান

শিশুমন। রমেশ দাশ। ভোলানাথ প্রকাশনী। ৩৭।১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য : পাঁচ টাকা।

ছোটদের যৌন সমস্যা। প্রভাত মুখো-পাধ্যায়। কুইন্স বুক কোম্পানী। ৬২এ, আহিরিটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। দাম : চার টাকা।

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে...। মানুষের মন কী বিচিত্র, কী অদ্ভুত, কী দুর্জ্ঞের! এর পরিমাপ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু মানুষের অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা সে দুর্জ্ঞেয় অঞ্চলেও অনুসন্ধান চালিয়েছে। ফ্রয়েড, হ্যাভেলক এলিস, পাবলভ থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক সাইকিয়াট্রিস্ট নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন মানব-মন ও তার বিভিন্ন প্রদেশে। অন্যান্য আর পাঁচটা ব্যাপারের মতো এ বিষয়েও আমরা পশ্চিম দেশগুলো থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। বাংলা ভাষায় তবু দু-চারখানা বই অন্তত লেখা হয়েছে মনোবিদ্যার উপরে। তবে, সে আর কতোটুকু!

মানব-মন যদি জটিল, শিশু-মন জটিলতর। শিশুকে নিশ্চয়ই আর কেউ সারল্যের প্রতিমূর্তি মনে করেন না। শিশুর মনের পরিপুষ্টি ঘটে অক্রান্ত দ্রুত আর

শৈশব তার মন যেভাবে গঠিত হয়, পরবর্তী জীবনে সেই মনই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। তার বয়স্ক জীবনের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যানধারণার মূলে উৎস তার শৈশবের মনোবিকাশের ধারা। শিশু-মন তাই একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যা পিতামাতা এবং সমাজ ও সরকারের নেতাদের প্রাথমিক দায়িত্বের বিষয়।

সন্তান কামনা সকল পিতামাতাই করেন, সন্তান লাভও করে থাকেন প্রায় সকল পিতামাতাই। কিন্তু ক'জন পিতামাতা জানেন সন্তান প্রতিপালন, সন্তান শিক্ষা? সন্তানকে মানুষ করে তোলার মতো অতি দুরূহ কাজটি করতে গেলে প্রাথমিক প্রয়োজন শিশুমন সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞানের। রমেশ দাশ বিরচিত শিশু-মন পুস্তকখানি সে বিষয়ে বড়ো সহায়ক। কেবল মাতাপিতা নয়, আত্মীয়-পরিজন শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজ ও সরকারী নেতাদের এই বই অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। সহজ ভাষায় এই জটিল বস্তুটির মনোজ্ঞ আলোচনা ইতিপূর্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত ছোটদের যৌন সমস্যা শিশুমনের এক বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা। ছোটদের যৌন সমস্যা নিয়ে ঠিক এই ধরনের আলোচনা ইতিপূর্বে আর চোখে পড়েনি। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনের প্রশ্ন এলেম আমি কোথা থেকে এবং তার ধোঁয়াটে জবাব সকল যৌন সমস্যার মূলে। জন্মরহস্য, নিজের দেহ ইত্যাদি সম্পর্কিত কৌতূহল একেবারে গোড়া থেকে মিটিয়ে দিলে চৌদ্দ আনা সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন থেকে যায়। কোন বয়েসে শিশুকে ঠিক কতোটুকু জানাতে হবে—কতোটুকু তার মানসিকতায় গ্রহণীয় হবে। সেখানে গোলমাল করে ফেললে খুব মুশকিল। বিদেশে এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা-বিতর্ক চলছে আজও কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলোয় এ বিষয়টি স্কুলপাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। স্কুলে নয়, গৃহে, মাতাপিতার দায়িত্ব শিশুকে ধাপে ধাপে এ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ানো। নান্য পন্থা।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় এ বিষয়টি যে ভাষায় এবং যে-সমস্ত ছোটো ছোটো সুন্দর বাস্তব উদাহরণযোগে বিবৃত করেছেন, তুলে ধরেছেন, তার জন্যে তিনি আমাদের সাধুবাদ পাবেন। বাংলা দেশের সকল শিক্ষিত পিতামাতা এ বই পড়লে উপকৃত হবেন, উপকৃত হবে তাঁদের বংশধরগণ।

(১৬৪।৬৬) (২০৬।৬৬)

ধর্ম : বুদ্ধ জীবনী

মহাশান্তি মহাপ্রেম। শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী। বড়ুয়া চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানী। ২৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

ভগবান বুদ্ধের পুণ্যজীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। দুই সহস্র বৎসর ধরে এই-সব কাহিনী তথাগতের মহিমা ঘোষণা করছে। বুদ্ধের পথ শান্তির পথ এবং প্রেমের পথ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বিদগ্ধ গ্রন্থকার বুদ্ধজীবনের এই কাহিনী-গুলি চয়ন করে উপভোগ্য আখ্যায়িকার নিবন্ধ করেছেন। এই আখ্যায়িকাগুলি থেকে বুদ্ধের মানবতাবোধ, অন্তর্দৃষ্টি, ধার্মিকতা এবং জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয় সমসাময়িক সমাজের পরিচয়ও এই আখ্যায়িকাগুলিতে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটি

সুখপাঠ্য এবং মর্মস্পর্শী চিত্তাকর্ষক। বুদ্ধের জীবনকথা নিয়ে বাংলায় প্রামাণিক অথচ সহজপাঠ্য গ্রন্থের বিশেষ অভাব রয়েছে। গ্রন্থকারের এই সুগ্রথিত কাহিনী-গুলি সেই অভাব বহুল পরিমাণে পূর্ণ করেছে। বুদ্ধজীবন সম্পর্কিত ঘটনাবলী পালি ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থে অর্থকথায়, টীকায় ও পারিভাষিক গ্রন্থসমূহে বিক্ষিপ্ত-ভাবে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এই মূল গ্রন্থাদি থেকে ঘটনাগুলি আহরণ করেছেন এবং তাকে পালি সাহিত্যের গহন অরণ্য পরিভ্রমণ করে এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়েছে। পরিকল্পিত সঙ্কলনের প্রথম অংশ মাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যাঁরা এই গ্রন্থটি পাঠ করবেন তাঁরা পরবর্তী খণ্ডের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করবেন।

১৩৩।৬৬

ভ্রম সংশোধন

৪৩ সংখ্যা 'দেশে'র আলোচনী বিভাগে প্রকাশিত আমার চিঠিটিতে সামান্য একটা ভুলে তথ্যগত গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে।

গোবিন্দচন্দ্র রায় আনন্দচন্দ্র রায়ের বড় ভাই ছিলেন। চিঠির শেষ অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে 'ছোট ভাই'-র জায়গায় 'বড় ভাই' হবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

Militant Nationalism in India by Bimanbehari Mazumdar. General Printers Publishers—119 Dharamtala Street, Calcutta-13.

মস্তক বিনিময়। টমাস মান। অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়। মনীষা। ৪।৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৪·০০।

হলুদপাতার সবুজ শির। শচীন্দ্রনাথ মিত্র। বাক্ সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৫·৫০।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা। মন্মথ রায়। গ্রন্থন—২২।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য—৩·৫০।

প্রিয়ভাজনেষু। ডঃ নবগোপাল দাস। গ্রন্থন —২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬। মূল্য—৩·৫০।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ: নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়ন্ত পাবলিশিং এজেন্সী —২৬৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য—২·৫০।

অরণ্য বহ্নি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থম—২২।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য—৫·৫০।

কল্যাণী কাশ্মীর। প্রভাত মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা পুস্তকালয়—৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১০·০০।

জাপানের ঘণ্টা। জন হারসি। অনুবাদ: মণি গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যায়ন—৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য—৪·০০।

The Uttering of The One Word. By The Hon'ble Justice P. B. Mukherjee. Technical & General Press—17, Crooked Lane, Calcutta-1.

An Introductory Sketch on The Life & Work of Avatar Meher Baba. By A. C. S. Chari, Komala Vilas—73, Rashbehari Avenue, Calcutta-26.

সংগীতচিন্তা। অরুণ ভট্টাচার্য। সংগীত পরিষদ—৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য—৫·০০।

A Trilingual Dictionary. Compiled by Gobindagopal Mukhopadhya & Gopikamohan Bhattacharjee, Sanskrit College—1, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Price 10.00.

মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের আমন্ত্রণ পেয়ে গঙ্গাবক্ষে দূর-পাল্লার দুটি সাঁতার প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য বহরমপুর যেতে হয়েছিল। অনেকবার অনুরোধ এড়িয়ে গিয়েছি। কিন্তু এবার আমন্ত্রণ না রেখে পারি নি।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, একাধিক কারণে আমন্ত্রণ রক্ষায় নিজেরও কিছুটা আগ্রহ ছিল। প্রথম কারণ, গঙ্গার সাঁতারে এখন ভাটার টান। কলকাতার পুকুরে মৌসুমি সাঁতার প্রবর্তনের আগে গঙ্গার বুকে ১৩ মাইল, ২২ মাইল, ২৩ মাইল, ৩০ মাইল প্রভৃতি যে সব সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল একে একে সবই প্রায় উঠে গিয়ে এখন আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব পরিচালিত ১০ মাইল এবং শ্রীরামপুরের চিত্তরঞ্জন ক্লাব পরিচালিত আর একটি সাঁতার প্রতিযোগিতার অস্তিত্বই টিকে রয়েছে। কলকাতার গঙ্গার জোয়ার-ভাটার মতই এই সব প্রতিযোগিতার অবস্থা। কিন্তু মুর্শিদাবাদের গঙ্গায় যেমন জোয়ার নেই, তেমন ভাটাও নেই। এক তরফা টানে যেমন ভাগীরথীর জলপ্রবাহ সাগর সংগমে ধেয়ে চলেছে, তেমন সেখানকার সাঁতারও চলেছে অবিচ্ছিন্ন গতিতে বছরের পর বছর সাঁতার ক্ষেত্রে বাংলার ছেলেমেয়েদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেবার অংগীকার নিয়ে।

দ্বিতীয় কারণ, জেলা অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনই একমাত্র সংস্থা শুধু সাঁতারের উন্নতির জন্যই যাঁদের কর্ম-তৎপরতা।

তৃতীয় কারণ, গঙ্গাবক্ষে ১৩ মাইল ও ৪৫ মাইল দুটি সাঁতারই এখন বাংলার দূর-পাল্লার সাঁতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা এবং সম্ভবত ৪৫ মাইল পৃথিবীতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত সাঁতার প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে দূর-পাল্লার প্রতিযোগিতা। ইংলিশ চ্যানেলের প্রস্থ কুড়ি-একুশ মাইল, পাক প্রণালীর দূরত্ব ২২ মাইল, ক্যাপ্রি-নেপলস সাঁতারের দূরত্ব আর একটু বেশী। কিন্তু ৪৫ মাইল দূরত্বের সাঁতার কোন যায়গায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় বলে আমার জানা নেই।

অবশ্য আঁকা বাঁকা পথে, জোয়ার ভাটার টানে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে হলে অনেক বেশী পথ অতিক্রম করতে হয়। বিপদ-সংকুল সমুদ্রে সাঁতার কাটা আর গঙ্গা বক্ষে সাঁতার কাটার মধ্যে পার্থক্যও অনেক। তবু গঙ্গার জটিল স্রোত ও ঘূর্ণিবহুল আবর্তে ৪৫ মাইল সাঁতার কাটার কৃতিত্ব কম নয়। বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার। তাছাড়া ভাগীরথীর বুকে ৪৫ মাইল সাঁতার কাটতে যে গোটা তিরিশেক বাঁক পারাপার করতে হয় তাতে দূরত্ব নিশ্চয়ই আরও পাঁচ-সাত মাইল বেড়ে যায়। সুতরাং ৫০।৫২ মাইলের এই সাঁতার দেখার আকর্ষণও স্বাভাবিক।

বহরমপুরে যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণের চতুর্থ কারণও ছিল। দুটি প্রতিযোগিতা পরিচালনায় মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশ-

মুর্শিদাবাদ গঙ্গাবক্ষে ৪৫ মাইল-সাঁতারের শেষ সীমা বহরমপুর গোরাবাজার ঘাটের দৃশ্য। বাঁ দিক থেকে [illegible] তিনজন সাঁতারু—প্রথম—[illegible], দ্বিতীয়—দেবী বসু, তৃতীয়—[illegible] —[illegible] চিত্র : [illegible]
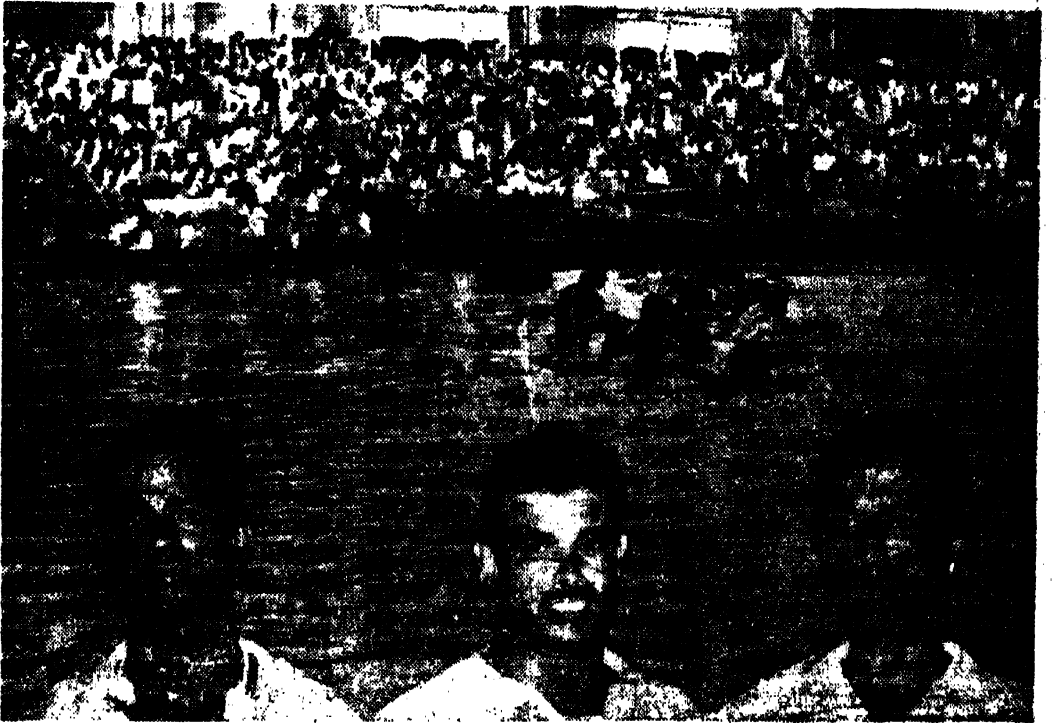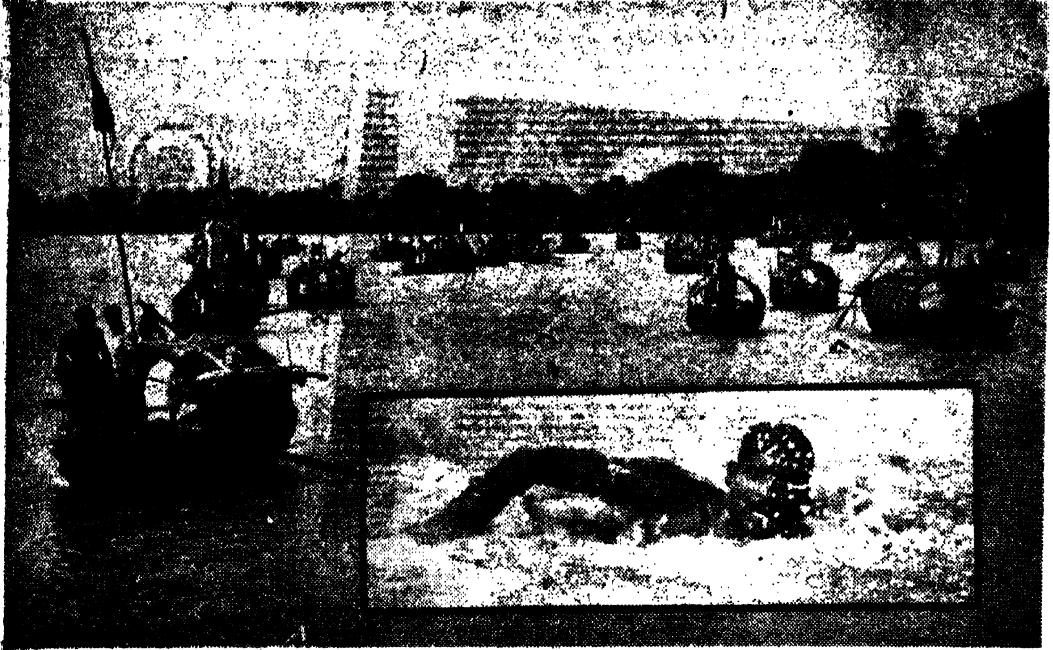
মুর্শিদাবাদ গঙ্গাবক্ষে ১৩ মাইল সাঁতারের দৃশ্য। 'ইনসেট' : প্রথমস্থান দখল করছেন কালীকিঙ্কর মণ্ডল
—নিজস্ব চিত্র : হীরেন সিং

জনের সুচারু পরিচালনা এবং সংগঠনী শক্তির কিছু কিছু প্রশংসা-বাণী আগেই কানে এসেছিল। বহরমপুরে যেয়ে দেখলাম এ প্রশংসা সত্যিই পরিচালকদের প্রাপ্য। শুধু আমি একা নই—সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমেত কলকাতার বিভিন্ন দৈনিকের প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার-পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম ডিভিসনের প্রতিনিধি, প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা, আকাশবাণীর প্রতিনিধি, যাঁরা এই সাঁতারের জন্য মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন সবার মুখেই পরিচালকদের প্রশংসাবাণী।

*

জিয়াগঞ্জ থেকে বহরমপুরের গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত এবং জঙ্গীপুর ঘাট থেকে গোরাবাজার পর্যন্ত ১৩ মাইল ও ৪৫ মাইল দূর-পাল্লার দুটি সাঁতার প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা শুধু ব্যয়সাধ্যই নয় একই দিনে দুটি প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য অসাধারণ সংগঠনী শক্তি এবং যান্ত্রিক দক্ষতার প্রয়োজন।

৪০জন প্রতিযোগী, যার মধ্যে বেশীর ভাগই বহিরাগত তাদের এবং তাদের জীবন রক্ষকদের থাকবার খাবার ব্যবস্থা। প্রতি সাঁতারুর জন্য একখানি করে লাইফ সেভিং বোটের ব্যবস্থা করা ছাড়াও মোটর লঞ্চ ও নৌকা মিলিয়ে আরও আট দশখানি বোটের ব্যবস্থা রাখা, প্রতি বোটে একজন করে অবজারভার দেওয়া, সাঁতারের সময় সাঁতারুদের অবস্থা ও অবস্থান জানার জন্য বেতার-যন্ত্র মারফত খবরাখবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা, স্টার্টিং ও ফিনিশিং পয়েন্টে বিচারকদের আয়োজন, নিমন্ত্রিত অতিথি, দর্শক ও সাংবাদিকদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে এক বিরাট পরিকল্পনা এবং আয়োজন অত্যাবশ্যক।

আগের চেয়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনার ব্যয়ও বেড়ে গিয়েছে বহু পরিমাণে। কর্তৃপক্ষের কাছেই শুনেছি, জঙ্গীপুর থেকে গোরাবাজার পর্যন্ত একখানি নৌকা ভাড়া করতে গতবার যেখানে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা লেগেছে এবার সেখানে লেগেছে পঞ্চাশ-বাহান্ন টাকা। অন্যান্য খরচের বৃদ্ধিও আনুপাতিক হারে। বিজয়ীদের পুরস্কার, বহরমপুর শিল্পের বৈশিষ্ট্য হাতীর দাঁতে তৈরী ময়ূরপঙ্খী নৌকো দু-তিন বছর আগে যে দামে পাওয়া যেত এখন তার দাম দ্বিগুণ। তবু মুর্শিদাবাদ সুইমিং সংস্থা কোন ব্যবস্থার কাটছাঁট করেন নি, কোন আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নি, অন্যের সুক্ষ্মতার সব কিছু সমাধা করেছেন। সম্ভবত এই কারণেই সাঁতারকে কেন্দ্র করে এখানে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং জনগণের আগ্রহাতিশয্য ও নিয়মনিষ্ঠা। সাঁতারের জন্য শহরের নানাস্থানে পোস্টার পত্রাদি, কবিতা ছাপা হয়েছে।

*

সাঁতারের দিন গত ২৮শে আগস্ট মুর্শিদাবাদে এক অভূতপূর্ব আনন্দ পরিবেশ গড়ে ওঠে। জঙ্গীপুর থেকে গোরাবাজার পর্যন্ত গঙ্গার দুই কূলে সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত সারি সারি দর্শনার্থীর ভিড়, জলের বুকে সাঁতারুদের প্রতিযোগিতার পাল্লার সঙ্গে চলমান লাইফ-বোটের অগ্রগতি, স্থানে স্থানে বাদ্যসম্ভার, রঙীন বেলুন ও পতাকার সমারোহ—সব মিলিয়ে ঐ দিনের মুর্শিদাবাদে মহা উৎসবের আমেজ এনে দেয়। সাঁতারুরা যখন লালবাগের ঐতিহাসিক হাজারদুয়ারীর সামনে দিয়ে সাঁতার কাটেন, যখন বাধা ঘাটের সেতু অতিক্রম করেন এবং গোরাবাজার ঘাটের সমাপ্তি সীমানায় উপনীত হন তখনকার দৃশ্যের আনন্দমুখর পরিবেশ সত্যিই অবর্ণনীয়। অথচ কোথাও নিয়মনিষ্ঠা বা শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায় নি। তাই পুরস্কার বিতরণী সভার প্রধান অতিথি আমাদের এই 'আনন্দবাজার' সংস্থার চীফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যেও এমন নিয়মনিষ্ঠা দেখার সুযোগ তাঁর জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা। এবং সাঁতার সম্পর্কে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য শ্রী কে কে সেনের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথা দূর-পাল্লার এই যে কষ্টসাধ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতা মানুষকে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রস্তুতির পথে অনুপ্রেরণা দেয়, জীবন-যুদ্ধের পাথেয় যোগায়, আর মনে এনে দেয় সংগ্রামী-শক্তি ও অভিজ্ঞতার স্পৃহা।

—একলব্য

টম গ্রেভনি

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে টেস্ট অঙ্গন থেকে হারিয়ে যাওয়া টেস্ট খেলোয়াড় টম গ্রেভনি ইংলণ্ডের ব্যাটিং অ্যাভারেজে শীর্ষস্থান দখল করবার পর প্রশ্ন উঠেছে : বয়সের বাধাই কি টেস্ট খেলার পক্ষে বড় বাধা? ক্রিকেটের বিজ্ঞ সমালোচকরাই আবার নজির তুলে এবং যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে বয়সটা নৈপুণ্য প্রকাশের প্রতিবন্ধক নয়। বরং একটু বেশী বয়সী খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতা কাজে আসে। অনুভূতি শক্তি বাড়ে এবং খেলার মাঝে আসে আরও বেশী পরিমার্জন।

উপমার অভাব হয়নি সমালোচকরা দেখিয়েছেন হবসের বয়স যখন ৪০ বছর—তখনও তাঁর কোন সমকক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন না এবং চল্লিশের পরে তাঁর ব্যাট থেকে সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী বেরিয়েছে। জর্জ গান্ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন ৫০ বছর বয়সে। গানের সঙ্গে তাল রেখেই ৫০ বছর বয়সী চিরতরুণ বোলার উইলফ্রেড রোডস রৌদ্রতপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সারাদিন ধরে বল করে গেছেন। ফ্রাঙ্ক উলী, ফিল মিড, বিল অ্যাসডাউন, পার্সি হোমস, অ্যাণ্ডি স্যাণ্ডহাম, জর্জ গিয়ারী, জ্যাক হার্ন, আর্থার মিচেল, রেগ পার্কস প্রভৃতি অন্যান্যরা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা চল্লিশের পরেও সমান দীপ্তিতে ক্রিকেট খেলেছেন। হার্বার্ট সাটক্লিফ এবং প্যাটসী হেনড্রেন সম্বন্ধেও একই কথা। বহু প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়ের খেলার মধ্যে তখনই বেশী পরিমার্জন এসেছে যখন মাথায় কাঁচা চুলের চেয়ে পাকা চুলের সংখ্যা বেশী। ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের রাজকীয় মহিমাও চল্লিশের পর একটুকু ক্ষুন্ন হয় নি। আর টম গ্রেভনির তো সবে উনচল্লিশ।

কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। যাঁদের নাম করেছি, টেস্ট জীবনে এঁদের বেশী ছেদ পড়েনি। টম গ্রেভনি উনিশশো বাষট্টি থেকে টেস্টের বাতিল খেলোয়াড়। বাতিল খেলোয়াড়ের পক্ষে আবার টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়ে এমন ব্যাটের বিক্রম দেখাবার নজির কমই আছে যেমন নজির দেখিয়েছেন এবার টমাস উইলিয়াম গ্রেভনি।

শুধু টেস্ট অ্যাভারেজে শীর্ষস্থানই নয়, দুটি টেস্ট সেঞ্চুরী সমেত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের একমাত্র জয়ের প্রধান যোদ্ধা। এবং কি অবস্থায় জয়? ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২৬৮ রানের

উত্তরে ১৬৬ রান তুলতেই যখন ইংলণ্ডের ৭টি উইকেট পড়ে যায় তখন গ্রেভনির ব্যাট হয়ে ওঠে অর্জুনের 'গাণ্ডীব'। এবং প্রধানত তার ফলেই ওভাল টেস্ট-যুদ্ধে ইংলণ্ডের জয়ের গৌরব।

সমালোচকদের অভিমত, গ্রেভনির গৌরবোজ্জ্বল ক্রিকেট জীবনে এখনই মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কীর্তিখ্যাত বোলারদের বিরুদ্ধে তিনি যে সাবলীল নৈপুণ্যে ব্যাট করেছেন, যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর চেয়ে অনেক কম বয়সী খেলোয়াড়রা সে নৈপুণ্য ও দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। যেমন তাঁর চটুল পদক্ষেপ, তেমন তাঁর হাতের চোস্ত মার। মারের মধ্যে ললিত লাবণ্য।

কিন্তু কথা হচ্ছে, কবে গ্রেভনির খেলায় মধ্যে লালিত্যের অভাব ছিল? রানেরই বা ঘাটতি ছিল কোনদিন? ১৯৫৩ সালে ক্রিকেট-বাইবেল 'উইসডেন' গ্রেভনিকে পঞ্চ ক্রিকেটারের অন্যতম হিসাবে নির্বাচিত করে লিখেছিল : হ্যামণ্ডের পর গ্লস্টার কাউণ্টিতে এমন উজ্জ্বল তারকা দেখা যায় নি। একদিন হয়তো হ্যামণ্ডের উজ্জ্বল কীর্তিও ম্লান করে দিতে পারবেন টম গ্রেভনি।

১৯৬৪তে গ্রেভনির ২৩৮০ রান এবং জীবনের শততম সেঞ্চুরী পূর্ণ হলো। বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট লিখিয়ে নেভিল কার্ডাস লেখেন : 'কালক্রমে ক্রিকেট খেলার ডেক্সটার এবং রয় মার্শাল গ্রেভনিকে অতিক্রান্ত করতে পারেন।' কিন্তু সহজাত সৌন্দর্যের স্বকীয়তায় এবং লাবণ্যলীলতায় গ্রেভনির সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। বয়কটের মত খেলোয়াড়রা ইটের পরে ইট সাজিয়ে যখন ইনিংসের প্রাচীর গড়তে গলদঘর্ম, গ্রেভনির ব্যাটে তখন বিলাসের বীণা বাজে। ব্যাটের কার্নিকে গড়া প্রাচীরে ফুল-লতা এঁকে যান।

এ হেন গ্রেভনি কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতি টেস্ট সিরিজে অপরিহার্য বিবেচিত হয়েও ধারাবাহিকভাবে টেস্ট খেলার সুযোগ পান নি। সিরিজের মাঝে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার গোটা সিরিজে বাদও পড়েছেন। এই বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলবার জন্য তাঁর ডাক পড়বার আগে পর্যন্ত ৫৫টি টেস্টে ৬টি সেঞ্চুরী সমেত গ্রেভনি ৩১০৭ রান করেছিলেন, যার মধ্যে সর্বোচ্চ রান ছিল ২৫৮, অ্যাভারেজ ৪১·৯৮।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৪টি টেস্টের ৪৫৯ রান নিয়ে এখন তাঁর টেস্ট অ্যাভারেজ—খেলা ৫৯, ইনিংস ৯২, নট আউট ১২, মোট রান ৩৫৬৬, সর্বোচ্চ রান ২৫৮, সেঞ্চুরী [illegible] অ্যাভারেজ ৪৪·৫৭। আর সমস্ত [illegible] হিসাবে গ্রেভনির রান ৪২ হাজারের উপরে।

কাউণ্টি ক্রিকেটে ১৭ বার গ্রেভনির নামে হাজারের উপরে রান, মরসুমে দু হাজারের উপরে রান ৭ বার, ১৯৬৪তে সবার উপরে স্থান। একই ম্যাচের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন গ্রেভনি ৪ বার। যার মধ্যে বোম্বাইতে ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেণ্টের দলের বিরুদ্ধে সি জি হাওয়ার্ডের দলের পক্ষে ১৫৩ ও ১২০ এবং লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে ১৬৪ ও ১০৭ নট আউট উল্লেখযোগ্য।

দলের সামগ্রিক ব্যর্থতার মুখে গ্রেভনির সাফল্যের কথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। গ্লস্টার ও গ্ল্যামোরগানের খেলায় মোট ২৯৮ রানের ইনিংসে গ্রেভনির ২০০ রান কম সংখ্যার রানে ডাবল সেঞ্চুরী করার রেকর্ড। গ্লস্টার থেকে উরস্টার কাউণ্টিতে আসার পর উপর্যুপরি তিন বছর উরস্টারের কাউণ্টি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভেও গ্রেভনির মুখ্য ভূমিকা।

টম গ্রেভনি আবার টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে এসেছেন। সুতরাং আজ আবার ওর কাছে ইংলণ্ডের অনেক প্রত্যাশা।

মুকুল

গত সপ্তাহে 'হাটে বাজারে' ছবির নিয়মিত শ্যুটিং আরম্ভ হয়েছে—এই ছবিতে (বাঁয়ে) পরিচালক তপন সিংহ ও নায়িকা বৈজয়ন্তীমালাকে দেখা যাচ্ছে

ফটো-দেশ

ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের নীতি

ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের নীতি এইবার পরিষ্কার বোঝা গেল। যে ছবি ব্যবসায় দিক দিয়ে উৎরাবে না, করপোরেশনের ঋণ সে ছবির ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর। রাজ্যসভায় সম্প্রতি জনৈক সভ্য একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পরলোকগত অভিনেতা-পরিচালক-প্রযোজক মতিলালের কথা। "ছোটি ছোটি বাতে" চিত্রটির জন্য মতিলাল করপোরেশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দরজায় মাথা খুঁড়ে নিঃস্ব অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ছবিটি পরে অবশ্য সম্পূর্ণ হয়। এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও [illegible]

রাজ্যসভায় সদস্যের প্রশ্ন : যে ছবি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছে সেই ছবিকে অর্থ-সাহায্য না দেবার কারণ কী? কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এই প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তা নৈরাশ্যজনক। শ্রীরাজবাহাদুর বলেছেন, করপোরেশন ব্যবসায়ের ভিত্তিতেই কাজ করে। টাকা ফেরত পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা তা তাকে ভেবে দেখতে হয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, চিত্রপরিবেশক সংস্থা এবং ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের মধ্যে কোন তফাত নেই। চিত্রপরিবেশকরা একটি ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য দেখেই টাকা খাটাতে রাজী হন। "এক্সপেরিমেন্টাল" ও ভিন্নধর্মী ছবি সম্পর্কে বেশীর ভাগ চিত্রপরিবেশকদের সংশয়ের কথা আমরা জানি। সাধারণত এ ধরনের ছবি তাঁদের অনেকেই এড়িয়ে চলেন। ফলে, ফিল্ম আ
বা অভিনব চলচ্চিত্র তৈরির প্রচে
উপেক্ষিতই থাকে। ফিল্ম ফিনান্স করপো
রেশন গঠনের পর প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকা
দের মনে স্বভাবতই আশার সঞ্চ
হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, এবারে
সরকার এবার সত্যিই তাঁদের সাহায্য কর
জন্য আগ্রহান্বিত। অবশ্য নিরাশ হ
তাঁদের বিলম্ব হয়নি। এখন তো করপো
রেশনের নীতি স্পষ্টই জানা গেল। শিল্প
বা ভিন্নধর্মিতার প্রতি যাঁরা অনুগা
করপোরেশনের নিকট বুঝি তাঁদের কিছু
প্রাপ্য নেই। প্রশ্ন এই, করপোরেশন
জোর করে বলতে পারেন, কোন্ ছবি পর
দেবে, কোন্‌টা দেবে না? কেউ কি
পারেন? অন্তত করপোরেশন একটি

তপন সিংহ পরিচালিত "গল্প হলেও সত্যি" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—
ছবির একটি দৃশ্যে ভারতী দেবী, রবি ঘোষ ও বঙ্কিম ঘোষ

[illegible] ক্ষেত্রে তাঁদের অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। করপোরেশনের কৃপাপ্রাপ্ত একটি বাংলা ছবির শোচনীয় ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কথা আমরা জানি। তা ছাড়া, সম্প্রতি [illegible] দানকার্দে শ্রীরাজবাহাদুর বলেছেন, শিল্পগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনাও আছে কী না তা দেখেই সাহায্য দেওয়া হয়। তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর জানা উচিত, শিক্ষিত দর্শকদের রুচির পালাবদল হয়েছে। শিল্পোৎকৃষ্ট ছবিই আজকের দিনে জনসমাদর পায়। ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা বলতে যে-সব আমোদ-উপকরণ বোঝায় সেগুলি রুচিবান দর্শকরা বর্জন করে চলেছেন। নতুন ধরনের শিল্পানুগ আঙ্গিকের ছবিই তাঁদের কাম্য। শুধু মোটা দাগের নাটক দিয়ে দর্শকের মন ভোলানোর দিনও চলে গিয়েছে। অবশ্য পাপ-উপকরণ ও যৌন-আবেদন সংবলিত হিন্দী ছবির খদ্দের অনেক। করপোরেশন যদি সে সব ছবির জন্য ঋণ মঞ্জুর যুক্তিযুক্ত মনে করেন তবে আমরা আর কোন মন্তব্য করতে চাই না।

চিত্র-সমালোচনা

অশ্রু দিয়ে লেখা

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চিহ্নিত "অশ্রু দিয়ে লেখা" (কল্পনা চিত্রম) ছবিটির নাম 'রক্ত দিয়ে লেখা'-ও হতে পারত। কারণ, যাদের জীবনের ট্র্যাজেডি এই ছবির উপজীব্য তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্ররা নানা পাপাচারে লিপ্ত। অতএব তাদের জীবন অশ্রুসিক্ত নয়, রক্তসিক্ত। চিত্রকাহিনীর বক্তব্য অবশ্য এই যে, তাদের জীবন কয়লার মতই কালো হয়ে গেছে। এবং ক্রিমিনাল হয়ে কেউ জন্মায় না, পরিবেশ বা অবস্থার বিপাকে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

এই তত্ত্বের ভিত্তিতে অবাধ পাপলীলা ছবিতে সংঘটিত। দুর্বৃত্ত বা ভিলেন সর্বসাকুল্যে পাঁচজন। দুজন কোলিয়ারির ম্যানেজার, দুজন বস্তিবাসী শ্রমিকগোষ্ঠীর লোক। একজন সম্ভবত নিম্নমধ্যবিত্ত। এদের সম্মিলিত অথবা একক পাপকর্ম— যথা হত্যা, হত্যার চেষ্টা, শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়ার পরিকল্পনা,—দর্শকের স্নায়ুকে আঘাত করে। তার উপর হীন ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি তো আছেই। পাপাত্মা-[illegible] একে অপরকে প্রতারণা করতে গিয়েই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। এদের একজনের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। নায়কের (কোলিয়ারির তরুণ মালিক) অবৈধ শিশু-সন্তানকে কেন্দ্র করে। [illegible]দের কারসাজির ফলেই নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ প্রণয়ী-যুগলের বিচ্ছেদ ঘটে। অপরিণীতা জননী (নায়িকা) তার সন্তানকে হারায়, প্রায়-অপ্রকৃতিস্থা হয়ে পথে পথে সন্তানকে খুঁজে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত সেই বিবেক-দংশনে জর্জরিত একদা-পাপিষ্ঠের চেষ্টাতেই নায়িকা তার প্রেমাস্পদের কাছে ফিরে আসে। তাদের সন্তান ইতিপূর্বেই জলে ডুবে মরেছে। নায়িকা তার প্রেমিকের বিবাহিত জীবনের সন্তানকে (অতি আধুনিকা স্ত্রী নায়ককে ছেড়ে চলে গিয়েছে) কোলে তুলে নেয়। অতএব নায়িকার জন্যই ছবির নাম "অশ্রু দিয়ে লেখা" মনে করার কারণ নেই। এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডি অনেকের জীবনেই ঘটে। তা-ছাড়া, সে শেষে শান্তি পেয়েছে। নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটাবার আগে অবশ্য ভূতপূর্ব 'ভিলেন তার বস'-এর বিশ্বাসঘাতকতার বদলা নিয়েছে। তাকে খুন করে। আইনের হাত থেকে সে প[illegible] রেহাই পেয়েছে কিনা ছবির শেষের মন্তা[illegible] তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। নায়ক ব[illegible] তাকে বাঁচাতেই হবে।

ছবিতে ভয়ানক রসের আধিক্য [illegible]নী। নতুবা দর্শকের উত্তেজনা, শিহরণ বা কৌতূহল উদ্রেক করার মত উপকরণ ছবিতে অনেক কিছু আছে। সেটা সম্ভব হয়েছে তরুণ চিত্রপরিচালক অমল দত্তের নিপুণ ঘটনা-বিন্যাসের গুণে। প্রথম অর্ধাংশ

"হংসমিথুন" (পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ছবিতে অপর্ণা দাশগুপ্তা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বেগমপ্লার। লোকটিও তাই। 'অ্যাকশন' দৃশ্য গঠনের মধ্যে পরিচালকের প্রয়োগ-কর্মের কৃতিত্ব আছে। আলপ কাট' খুবই প্রশংসনীয়। এ-ক্ষেত্রে চিত্রসম্পাদক রমেশ যোশীকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়। বিজয় দে'র সুন্দর ক্যামেরার কাজ রোমাঞ্চকর পরিবেশ বা ফ্রেম তৈরির ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়েছে। এক কথায়, ছবিটিকে অপরিণত কাহিনীর সুষ্ঠু প্রয়োগ বা চলচ্চিত্রায়ণ বলা যেতে পারে।

ভিলেনদের চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, জহর রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায় ও অরুণ রায় নিখুঁত অভিনয় করেছেন। বিশেষ দক্ষতা এঁদের মধ্যে দেখিয়েছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। চরিত্রটির অন্তরজ্বালা ও বিবেকদংশনও তিনি চমৎকার ফুটিয়েছেন। মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের টাইপ চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা লক্ষণীয়। নিরঞ্জন রায় ক্রূরতার রূপে সাফল্যের সঙ্গে দেখাতে পেরেছেন। অরুণ রায়ও বেশ কুটিল। কৌতুক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে খলতা প্রকাশ করেছেন জহর রায়। চিত্রনাট্য এই শিল্পীদের যথাযথ অভিনয়ের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

দুর্বল চিত্রনাট্যের শিকার হয়েছেন নায়ক-নায়িকা অনিল চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস। প্রথমার্ধে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের স্বভাবসিদ্ধ 'স্মার্টনেস' দেখা গেলেও শেষের দিকে তাঁর বিশেষ কিছুই করবার ছিল না। রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে শ্রীমতী বিশ্বাসকে কিছুক্ষণের জন্য ভাল লাগে। শেষের দিকে অবিশ্বাস্য চরিত্রের বোঝা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পরলোকগতা শিল্পী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়াছবিতে তাঁর এই শেষ অভিনয়ে (নায়কের বিধবা জননী) ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গিয়েছেন। চরিত্রোচিত সুঅভিনয়ের জন্য আর প্রশংসা পাবেন অসিতবরণ, নীলিমা দাস, গীতালি রায়, সুমিতা সান্যাল ও সুখেন দাস।

সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহ-সুর বিশেষ মুহূর্তে দৃশ্যঘটনার মর্মানুসারী। গানের সুর ভাল। তবে এ-ছবিতে অনধিকার প্রবেশের ফলে গানগুলি মনে দাগ কাটে না।

লাভ ইন টোকিও

বোম্বাই ফিল্মের প্রেমের কী অদ্ভুত মৌলিকত্ব। টোকিও কিংবা রোম যেখানেই নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, এই প্রেমের ঐতিহ্য বুঝি তারা কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। এমন কী ছবির ভিলেন এবং 'ক্লাউন'ও (অর্থাৎ কৌতুকের জন্য যাকে রাখা হয়) তাদের যথাবিহিত করণীয় সম্পর্কে সচেতন। নতুন পরিবেশেও তাদের কার্যকলাপের কোন পরিবর্তন নেই। তবে "লাভ ইন টোকিও" (যা বোম্বাইয়ে হলেই সুন্দর মানাত) দেখে জাপানীদের প্রতি স্বভাবতই কৃতজ্ঞ বোধ করার কথা, তাদের ধৈর্য ও আতিথেয়তা দেখে। নায়ক-নায়িকার এবং অন্যান্যদের মত উদ্ভট কাণ্ড আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র শহরের বুকে বিনা প্রতিবাদে ঘটতে দিয়েছেন। যেমন, নায়িকাকে কোলে নিয়ে নায়কের রাস্তা পার হওয়া এবং পথের উপর গানের সঙ্গে নায়িকার খুঁড়িয়ে চলা ও নায়কের হামাগুড়ি, এবং আরও অনেক কিছু। লাভ ইন টোকিওর প্রয়োজনে জাপানী পুলিসকেও যথাসম্ভব বুদ্ধু সাজতে হয়েছে। তা না-হলে খলনায়কের অবাধ পাপাচার এবং প্রকাশ্য দিবালোকে চলন্ত মোটরের ধাক্কায় নায়ককে মেরে ফেলার চেষ্টা কী করে সম্ভব?

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "নায়িকা সংবাদ" (পরিচালনা : অগ্রদূত) সমাপ্তপ্রায়—ছবির একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক
ফটো-দেশ

[illegible]

[illegible] প্রযোজক পরিচালক [illegible] অ-ভারতীয় মত [illegible] কেন, [illegible] কাযকৃতি তিনি [illegible] মুগ্ধ করার মত প্রয়োগ-[illegible] রোমাঞ্চকর দৃশ্য অদ্ভুত [illegible] দেখিয়েছেন। হেলিকপ্টারের [illegible] নায়ক, এবং পরে [illegible] উদ্ধারের জন্য খলনায়কদের [illegible] হাতাহাতি ও দুশমনকে নিচে ফেলে [illegible] (ওরা উভয়েই দক্ষ পাইলট [illegible] হবে) ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যটি এক্ষেত্রে [illegible] "অ্যাবসেন্ট মাইনডেড প্রোফেসর" ছবির [illegible] মানুষের শূন্য বিচরণের ঘটনাও [illegible] হয়েছে। সারা ছবিটি গতিসম্পন্ন, [illegible] সর্বাঙ্গীণ টেকনিক্যাল কাজ উঁচুমানের। বিশেষ প্রশংসা চিত্রসম্পাদকের ("কাটার"-এর) প্রাপ্য। ইস্টম্যান কালার সুন্দর। এবং দুচোখ ভরে টোকিওর অনেক কিছু দেখবার মত ছবিতে আছে।

আসল কথা, নানা রঙে ও নানা ঘটনায় সাজিয়ে সেই কষ্টকর, চর্বিতচর্বণ কাহিনীই (নায়ক-নায়িকার হঠাৎ দেখা, প্রেম; খলনায়কের শত্রুতা ও পতন) টোকিওর পটভূমিতে উপস্থিত করা হয়েছে। অবোধের আনন্দ প্রমোদ চক্রবর্তী প্রচুর পরিমাণে-ই জুগিয়েছেন। এ-জাতীয় উপভোগ্য চিত্রনির্মাণে তিনি যে সিদ্ধহস্ত সে প্রমাণ আবার পাওয়া গেল। বিচারশীল দর্শকের জন্য টোকিও দেখা ছাড়া আর কিছুই নেই ছবিতে।

জয় মুখার্জি কখনও প্রেমে পড়ে বোকা এবং দুষ্টদলনে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছেন। আশা পারেখের নাচ ও সুঠাম দেহ বিশেষভাবেই দেখানো হয়েছে। কখনও পাঞ্জাবী যুবক, কখনও বা জাপানী মেয়ে সেজেছেন। দুঃখের মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই কেঁদেছেন।

মেহমুদ ও শুভা খোটের কৌতুক সত্যিই আনন্দ দিয়েছে। এবং শঙ্কর-জয়কিষণ সুরারোপিত কিছু গান।

সন্নাটা

রহস্যচিত্রের যে সব লক্ষণ দর্শককে মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হতে দেয় না, "সন্নাটা"-র (জি সি ফিল্মস) সে সব কিছুই আছে। বরঞ্চ একটু বেশী পরিমাণে। একই রাত্রে দুটি হত্যাকাণ্ডের [illegible]

অভিনেত্রী কল্পনা ও চিত্রকাহিনীকার শচীন ভৌমিক তাঁদের আসন্ন শুভবিবাহের কথা ঘোষণা করেছেন

হয়েছে এক বিত্তবান প্রৌঢ়, এবং মিসেস পদ্মিনী নামে জনৈকা মহিলা।

গোয়েন্দার ভূমিকা নিয়েছে বিত্তশালীর পুত্র নিজেই। এই অতি উৎসাহী ও সাহসী যুবকের সঙ্গে দর্শকও যেন ক্রমশ এক ভয়াল, রহস্যময় জগতে গিয়ে প্রবেশ করে। জানতে পারে, পদ্মিনী ও সরোজিনী নামে যমজ বোনদের সঙ্গে নিহত ব্যক্তির কী সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কে হত্যাকারী? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর মেলে না। নায়ক তথা দর্শকের সন্দেহ অনেকেরই উপর। নায়কের জননীর কথাবার্তা, চলাফেরাও সন্দেহজনক। একজন তো ফেরার। নায়ক তার নাগাল পেয়েও সমস্যার কূল-কিনারা করতে পারল না।

পরিচালক মহেন্দ্র সবেরওয়াল সাসপেন্স ও রোমাঞ্চের পরিস্থিতি সুন্দরভাবেই রচনা করেছেন। 'মুড' রচনায় মার্শাল ব্র্যাগানজার ফটোগ্রাফিও সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এত প্রস্তুতি, এত আয়োজন অর্থহীন মনে হয়েছে শেষ মুহূর্তে—যেখানে রহস্যের উন্মোচন। সন্দেহভাজন যারা ছিল তারা সবাই নির্দোষ প্রতিপন্ন হল। আসল পাপ-কর্মের সঙ্গে তাদের কোন ক্ষীণ যোগসূত্রও নেই। শেষ পর্যন্ত উড়ে এল আর একটি

চরিত্র। অর্থাৎ এ-ধরনের ছবিতে দর্শক ঠকে গিয়েও পরিণামে হতভম্ব হওয়ার যে সুখ পায় তা “সম্রাটা”-র অনুপস্থিত। খুনের ব্যাপারটাও, বিশেষত এর প্রকৃত উদ্দেশ্য, দর্শকের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। এই “অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স”-এর জন্য ছবিটি ব্যর্থ।

অনিল চট্টোপাধ্যায়ের উঁচুদরের অভিনয় ছবির দুর্বলতা অনেকাংশে ঢেকে দিয়েছে। পিতা ও পুত্রের দ্বৈতচরিত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। এবং পিতার যুবা বয়সের রোমান্টিক দৃশ্যেও তাঁকে দেখা যায়। এই গুরুদায়িত্ব শিল্পী যে সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন তা বিস্ময়কর। এই অভিনয়ের গুণে হিন্দীচিত্রে শিল্পীর স্থায়ী ও সম্মানের আসন নির্দিষ্ট থাকবে। অন্যান্য ভূমিকায় বীণা, পূর্ণিমা, তনুজা, রাজ মেহ্‌রা ও প্রতিমা দেবীর অভিনয় যথাযথ।

“সম্রাটা” যে ছবির নাম, সেখানে সংগীতের (হেমন্তকুমার-কৃত) ব্যবহার খুবই পরিমিত হতে পারত। টাইটেল-এর (যেখানে ‘সম্রাটা’ নামটি দেখা গেল) একটি মুহূর্ত অবশ্য নিঃশব্দ। গানের সংখ্যা বেশী। একাধিক সুশ্রাব্য গান যদিও আছে।

কারেণ্ট

হাঙ্গেরীর চিত্র “কারেণ্ট”, ১৯৬৪ সনে কার্লোভি ভ্যারি ফেস্টিভ্যাল-এর প্রধান পুরস্কারে ভূষিত। হয়ত ওই বছরে উৎসবে শ্রেষ্ঠতর চিত্র ছিল না। নতুবা বিচারে কোন ভুল হয়েছে। ছবিটির সুর গম্ভীর, দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত। একদিকে দুর্বার জীবনপ্রবাহ, অপরদিকে তার বিপরীত সত্য, বা মৃত্যু, ছবিতে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। অস্তিত্ব ও অবলুপ্তির এই মেরু-প্রমাণ ব্যবধানের মাঝখানে কয়েকটি তরুণ-তরুণী কখনও বা গভীরতর প্রশ্নের সম্মুখীন, কখনও বা অসহায়, অস্থির। শিল্পবোধের যে সংযম এই অনতিক্রমনীয় সমস্যার স্বরূপটি প্রকাশ করতে পারত, যা দর্শকের বুদ্ধি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে পারত, ছবিতে তা অনুপস্থিত। আর্টের মৃত্যু ঘটেছে ছবির শেষের দিকে, যেখানে নিগূঢ় ভাবনার ইঙ্গিত শোকোচ্ছ্বাস ও অতি নাটকীয়তায় রূপান্তরিত। ছবির প্রথমে মুক্ত প্রাণের প্রবাহও জীবনবাসনা কয়েকটি আঁচড়ে সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কয়েকটি মনে অকালমৃত্যুর প্রতি-ক্রিয়াও সুন্দর বিশ্লেষিত। ক্যামেরার কাজ আগাগোড়া চমৎকার।

সিনে সেণ্ট্রাল গত সপ্তাহে লাইটহাউস মিনিয়েচার-এ “কারেণ্ট”-এর বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ছয়টি হাঙ্গেরীয় চিত্রের উৎসবের উদ্বোধন হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে, গত ২০ আগস্ট। “কারেণ্ট” দেখাবার আগে সাংবাদিকদের সিনে সেণ্ট্রাল-এর অগ্রগতির কথা বলা হয়।

ফিল্ম ক্র্যাফট-এর “পঞ্চশর” (পরিচালনা : অরূপ গুহঠাকুরতা) ছবিতে কণিকা মজুমদার

পাদপ্রদীপের আলোয়

নান্দীকারের “শের আফগান”

বাংলা মঞ্চে কি avant-garde-এর সূচনা হল? এ-ধরনের কোন উক্তি কিছু-কাল আগেও হয়ত বিদ্রূপ বলে মনে হত। নান্দীকার-গোষ্ঠী এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের সাহস জুগিয়েছেন। সমকালীন নাট্য-চিন্তায়, অভিনয়ে বা আঙ্গিকে বিপ্লব এনেছেন এমন সংস্থার সাক্ষাৎ আমরা এর আগে পেয়েছি। তাঁদের এক্সপেরিমেণ্ট অবারিত। নতুন ভাবনার দরজা তাঁরা বার-বারই খুলে দিয়েছেন। শৌখিন জগতের আচার্যপদে এঁরা প্রতিষ্ঠিত। যেমন, ‘বহুরূপী’।

কিন্তু নান্দীকার যেন ‘রিবেল চাইল্ড’। সহস্র দামামা বাজাতে শুরু করলেন। নাটকের “নুভেল ভাগ”-ই বলুন, কিংবা যে-নামেই তাকে অভিহিত করুন, এখনো কিন্তু [illegible] তাঁরা [illegible] তাঁদের [illegible] [illegible] [illegible] চোখের [illegible] মত দূরে সরিয়ে [illegible] ছলনার মধ্য দিয়ে [illegible] ইতিহাসের গহ্বরে পালিয়ে [illegible] না। নাটকের এই অবধারিত বিবর্তন [illegible] তাঁরা সচেতন। তাই পর পর [illegible] থেকে এল “নাট্যকারের সন্ধানে ছটি [illegible]” এবং “মঞ্জরী আমের মঞ্জরী”।

বিস্মিত করেছে [illegible], “শের আফগান”। স্বীকার করি, এই [illegible] কোনটাই মৌলিক নাটক নয়। কিন্তু রূপান্তর যে-ভাবে ঘটেছে তাতে মৌলিকত্বের চেয়েও বড় একটা নিজস্ব সত্তা যেন নাটকে এসে গিয়েছে। “শের আফগান”-এর (রূপান্তর ও নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়) কথাই ধরা যাক। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাকটটি পিরানদেলোর। অর্থাৎ জার্মান নাট্যকারের “আঁরিকো কারত্তো” যা “চতুর্থ হেনরী”র বাংলা রূপ। “শের আফগান”-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে, নাম-রূপ, ইতিহাস-পরিচয় পালটালেও ঘটনার পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি। এমন কি সমাপ্তির মর্মান্তিক দৃশ্যটিও আছে—যেখানে শের আফগান তথা পিরানদেলোর নায়ক একদা-বন্ধুর পেটে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে।

পিরানদেলোর নাটকের মূলে প্রতিপাদ্য যে বস্তুটি—যা ব্যক্তিসত্তার অপ্রতিরোধ্য সংকট বা ‘ক্রাইসিস’—তা ‘শের আফগান’-এ বিন্দুমাত্র উহ্য বা ক্ষুণ্ণ নয়। তদুপরি, মুঘল ইতিহাসের উপকরণে এমন নিখুঁত-ভাবে মূল নাটকটি সাজানো হয়েছে এবং পরিবেশ ও চরিত্রচিন্তাও এত স্বদেশী যে ‘শের আফগান’-কে একটি পৃথক ও সার্থক সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হয় না।

দর্শকের উপরিপাওনা : মগ্ন চৈতন্যের কঠোর আস্বাদ। নাটকে চেতন-অবচেতনের সীমারেখাটি নিশ্চিহ্ন, জীবন ও সাহিত্যের ব্যবধানটিও বিলুপ্ত। ‘শের আফগান’ নাটকের অভিনয় করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে, শিল্পী অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। ওই মুহূর্ত থেকেই সে তার মনের অবচেতনে, এবং ইতিহাসের একটি বিশেষ ক্ষণে বন্দী। এই বন্দিদশা থেকে মুক্তির পরেও অপ্রকৃতিস্থতার মুখোশ পরে থাকা ছাড়া বুঝি শের আফগানের উপায় ছিল না। তারপর একদিন মানসিক রোগের এক চিকিৎসক ও দুজন পূর্ব পরিচিত (তখন তারা দম্পতি) এবং তাদের মেয়ে যখন তার সামনে উপস্থিত, তখনই নাটকের ভাবকল্পের সূত্রপাত। সেখানে অন্তঃপ্রবিষ্ট [illegible]

"মলুয়া" গীতিনাট্যের দুটি দৃশ্য : (ডাইনে) গীতা চৌধুরী ও বলাই চক্রবর্তী
ফটো-দেশ

…জাগ্রত বোধ কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। বাস্তব ও কুহকের দ্বন্দ্বে ব্যক্তিমানস সেখানে ক্লিষ্ট, অবসন্ন: চিরাচরিতের অনুশাসনে চলৎশক্তিহীন (ইতিহাসের একটি মুহূর্তে মানুষের থেমে যাওয়া, শের আফগানের অপ্রকৃতিস্থতায় যার ইঙ্গিত)। যন্ত্রণার এই অলাতচক্রে ব্যক্তির জীবন নিয়ত ঘূর্ণায়মান। তারই এক দৃষ্টিনিমেষ "শের আফগান"-এ লভ্য। তদুপরি একটা বিষাদের সুর ওই জটিল মুহূর্তে ধ্বনিত। সময়কে ধরে রাখা যায় না। মহাকালের রথচক্রতলে মানুষের কামনা-বাসনা যেন নিষ্পিষ্ট। এখানে মানুষ অসহায়। এই চরম ট্র্যাজেডির উপলব্ধি নাটকে বিধৃত।

নান্দীকারের শিল্পীরা এই গভীরের পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছেন। নাটকে ঘটনার বৈচিত্র্য নেই। চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বের জটিলতায় নিমগ্ন। বুদ্ধি দিয়ে তাদের ছুঁতে ও বুঝতে হয়। তিনটি দৃশ্য বা অঙ্কের এই নাটকের প্রথমটি মন্থর, সংলাপপ্রধান, কলরবের শামিল। তবে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। ক্ষিপ্র গতি এসেছে দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে—শেষের সেই ভয়ংকর মুহূর্তে, শের আফগান যেখানে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত, তার পরিণতিতে। এই 'ড্রামাটিক আইরনি'র অতিমাত্রিক ক্রূরতা যুক্তিসংগত কিনা সে প্রশ্ন ওঠে। যদিও এর জবাবদিহির দায় নাট্যকারের, নান্দীকারের নয়।

অন্যান্য অভিনয় ছাড়া শের আফগানকে রূপদান করা সম্ভব নয়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মঞ্চে এমন উঁচুদরের অভিনয়, যা পূর্বাচার্যদের কথাই প্রায় স্মরণ করিয়ে দেয়, অল্পই দেখা যায়। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র বিশ্লেষণেও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। চমৎকার অভিনয় প্রায় সকলেই করেছেন। তবু বিশেষ উল্লেখ্য দীপালি চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, শেলী পাল ও দীপক নন্দী, পশুপতি বসু, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ সেন প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণ। মঞ্চসজ্জা, সংগীতের ব্যবহার ও ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের বেশভূষা সবই প্রশংসনীয়।

মলুয়া গীতিনাট্য

বর্ষপূর্তি উৎসবে লোক-ভারতী "মলুয়া" গানের পালা উপহার দিলেন। ময়মনসিংহ-গীতিকার মলুয়া-উপাখ্যান লোক ভারতীর শিল্পীরা 'অপেরা'-র আঙ্গিকে, গান ও অভিনয়ের ভিতর দিয়ে মঞ্চে পরিবেশন করলেন। সেদিক দিয়ে "মলুয়া" গীতিনাট্য বাংলার বিলুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনের একটি সার্থক প্রয়াস। এর জন্য লোক-ভারতীর অধ্যক্ষ-প্রতিষ্ঠাতা এবং "মলুয়া"-র পরিচালক নির্মলেন্দু চৌধুরী ও সংস্থার অন্যান্য শিল্পীরা ধন্যবাদার্হ।

লোকসংগীতের গানই মূলত ব্যবহৃত হয়েছে। তবে জমিদারের গানগুলি ছিল রাগাশ্রয়ী। ফলে সামন্ত কৌলিন্যের পরিচয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এবং কিছুটা বৈচিত্র্যও এসেছে। আড়াই ঘণ্টার (সময় আর একটু কম হলে ভাল হত না কি?) এই গীতিনাট্য দর্শকদের আকৃষ্ট করে রেখেছে সর্বক্ষণ. এর অন্যতম কারণ সম্ভবত "মলুয়া"-র মৃত্তিকাশ্রয়ী মাধুর্য। শহরবাসীর কাছে যার আস্বাদ ও অভিজ্ঞতা নতুন। তাছাড়া গ্রাম্য প্রেমগাথা, প্রণয়ী যুগলের সহজ সুন্দর অভিলাষ, জমিদারের কোপদৃষ্টি ও রাহুমুক্তি প্রভৃতির আকর্ষণও দুর্বার।

নাটকের প্রধান শিল্পীরা সকলেই সুন্দর গান করেছেন। গানের সঙ্গে অভিব্যক্তিও কম প্রশংসনীয় নয়। এঁদের মধ্যে যাঁদের সর্বাগ্রে সাধুবাদ প্রাপ্য তাঁরা হলেন গীতা চৌধুরী (মলুয়া), বলাই চক্রবর্তী (বিনোদ), অমুভা গঙ্গোপাধ্যায় (বিনোদের মা), মঞ্জু ভট্টাচার্য (পুত্রবধূ), সুপ্রকাশ ভট্টাচার্য (মোড়ল) ও পূরবী চট্টোপাধ্যায় (মোড়লের স্ত্রী)।

সুগায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী যে অভিনয়েও কম যান না তা তিনি মদ্যপ, দুরাচারী জমিদারের চরিত্রে প্রমাণ করেছেন। সব মিলিয়ে "মলুয়া" খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

তবে অল্পপরিসর মঞ্চে গীতিনাট্যটি খুব সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হয় নি। এবং মঞ্চ আর একটু অনাড়ম্বর হলে ভাল হত। এ-ধরনের গীতিনাট্যের আবেদন আঙ্গিকে নয়, প্রাণসম্পদে। যাই হোক, এই অভিনব এক্সপেরিমেন্ট-এর সঙ্গে রসিক জনসাধারণ যাতে পরিচিত হতে পারেন সে ব্যবস্থা হলে ভাল হয়।

"মলুয়া" অভিনয়ের পূর্বে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লোক-ভারতীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

শিক্ষামূলক শিশুচিত্র

ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেনস ফিল্ম রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে দুইদিনে পনেরোটি অল্পদৈর্ঘ্যের শিক্ষামূলক শিশু-চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন দেশের ছবির প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে ৮ সেপ্টেম্বর।

শোক-সভা

সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে মহিলা শিল্পী মহল গত মঙ্গলবার এক শোকসভার আয়োজন করেন। সভায় সঙ্ঘের সভ্যারা পরলোকগতা শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, সমাজ কল্যাণে আত্মনিয়োগের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল মহিলা শিল্পী মহলের সেক্রেটারি ছিলেন। সঙ্ঘ অভিনীত "মিশরকুমারী"-তেও অভিনয় করেছিলেন।

অভিনেতৃ সঙ্ঘও গত শুক্রবার এক শোকসভা আহ্বান করেছিলেন। সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুনন্দা দেবীর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে নবপ্রোথিত বিবৃতি দেন।

অরণ্যদেব

ওই রাকুনে পোকামাকড়গুলো গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে না কেন?
যে-কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হতে পারে! এ হচ্ছে তারই লক্ষণ!
গুহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে ওরা ভয় পায়!

ও কিসের শব্দ?

আগুন-পাহাড়ের মধ্যে -----
বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে! উঃ, কী প্রচণ্ড শব্দ!
ভয় পেয়ো না! ভয় পেলেই মারা পড়বে!

গরম নদীর উপর দিয়ে 'ভেলা' এগোচ্ছে ----
গুহার মধ্যে ঢুকেছি!
ওকী! ওটা কী!
!

বিরাট গিরগিটি! অন্ধকারে সেই আদ্যিকালের ডাইনোসরের মত!
হিস্---হিস্--
পথ জুড়ে রয়েছে!
4/4

বুলেট বিঁধছে না! চামড়া তো নয়, লোহার বর্ম!
চোখে বুলেট চালিয়েও লাভ নেই!

গিরগিটিটা অন্ধ! শুধু শব্দ শুনে আর গন্ধ পেয়েই আক্রমণ চালায়!
বিষাক্ত বর্শাটা ছুঁড়ে মারা যাক!

আঁচড়ও লাগল না! তাহলে উপায়?
ভেলার মুখ ফেরানো যাক! পাহাড়ের মধ্যেই ফিরে যাই!

ফিরে গেলে লাভা-স্রোতের মধ্যে ডুবে মরতে হবে! ফেরবার উপায় নেই!
আমরা ফাঁদে পড়েছি!

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভায় সরকারী খাদ্যনীতি সম্পর্কে আলোচনা এই সপ্তাহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ। ৩১ আগস্ট রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রে কংগ্রেস ও বিরোধী সদস্যদের বাদ-প্রতিবাদ, অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগে বিধানসভা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিরোধী পক্ষ সরকারের বর্তমান খাদ্য নীতিকে স্রেফ ধোঁকাবাজী বলে অভিহিত করে বলেন, রাজ্যের শোচনীয় খাদ্যাবস্থার জন্য সরকারের মজুতদার ও মুনাফাখোর ঘেঁষা খাদ্য নীতিই দায়ী। এদিন তুমুল হট্টগোলের মধ্যে আলোচনা পণ্ড হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন (১ সেপটেম্বর) বিরোধী দলের ক্রমাগত বাধা-দানের ফলে খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে পারেন নি। অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠার ফলে অধ্যক্ষ এই দিনের অধিবেশন মুলতুবী রাখতে বাধ্য হন। ২ সেপটেম্বর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিধান সভায় কংগ্রেস দল একটানা চীৎকার করে, বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসুকে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করতে বাধাদান করার পরিণতিতে স্পীকার বিধান সভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করেন।

স্বদেশী সংবাদ

২৯ আগস্ট—আগরতলা শহরে গতকাল রাত্রে টিকেট কেনা নিয়ে একটি সিনেমা হলের সামনে একটি বালক ও একজন সশস্ত্র পুলিসের মধ্যে যে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়, তাকে কেন্দ্র করে জনতার সঙ্গে পুলিসের একটানা ছ' ঘণ্টা সংঘর্ষ হয়। আজ অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে রাজ্য সরকার সৈন্য তলব করেন। আজ অপরাহ্নে পুলিস কয়েকবার গুলিবর্ষণ করে। হাঙ্গামার ফলে মোট ৭৫ জন আহত হয়েছে। শহরে ১৪৪ ধারা এবং আজ সন্ধ্যা থেকে কাল সকাল পর্যন্ত কারফ্যু জারি করা হয়েছে।

আজ বোমবাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির এক জরুরী বৈঠকে মহীশূর-মহারাষ্ট্র সীমানা বিরোধ এবং পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি নিয়ে বামপন্থী দলসমূহ ২৪ এবং ২৫ আগস্ট যে আন্দোলন করেছিলেন সেই সময় বোমবাই নগরীকে সম্পূর্ণরূপে সমাজবিরোধী-দের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা হয়।

৩০ আগস্ট—রাজ্য বিধান সভায় এস্টিমেট কমিটি প্রাথমিক এবং সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে ওই দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর বিচ্যুতি ও অবহেলার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

উৎপাদনের উদ্বৃত্ত জিনিস বিক্রি করার জন্য হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেড যখন মরিয়া হয়ে বিদেশের বাজার খুঁজছে—এই অবস্থায় ভারতীয় রেল আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ রেলের চাকা আমদানির জন্য একটি চুক্তি করেছে।

৩১ আগস্ট—ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতা-বাসের একজন প্রাক্তন কর্মচারীকে বাৎসরিক ৩ হাজার ডলার বেতনে দূতাবাসের অর্থ-নৈতিক বিভাগে জনসংযোগ পরামর্শদাতা নিযুক্ত করার ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য আজ লোকসভার সদস্যরা দাবি জানান। কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী এই দাবি অগ্রাহ্য করেন। পরামর্শদাতা এই কর্মী শ্রী কে এস পনজ, যখন দূতাবাসে চাকরি করতেন তখন তাঁর বেতন ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা মাত্র।

আজ রাজ্য সভায় কংগ্রেসী সদস্য শ্রীঅর্জুন অরোরা ও বিরোধী সদস্যরা অভিযোগ করেনঃ সরকার লক্ষ্মীরতন কটন মিলস-এর বিরুদ্ধে বৈদেশিক মুদ্রা-আইন ভঙ্গের (দেড় লাখ টাকার) এক মামলা তুলে নিয়ে মিলের অন্যতম পরিচালক শ্রীরামরতন গুপ্তের প্রতি 'উদারতা' দেখিয়েছেন।

১ সেপটেম্বর—জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক-তা'র জন্য ইন্দিরা-সরকারের পদত্যাগ দাবি করে কমিউনিসট পারটি অব ইনডিয়ার (দক্ষিণ) ৬০ হাজারেরও বেশি কর্মী এবং সমর্থক আজ সংসদ ভবনের উদ্দেশে মিছিল করে যাত্রা শুরু করেন। বিভিন্ন মত অনুযায়ী, মিছিলে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোক যোগ দেন। এই বিক্ষোভ মিছিলে সরকারের আর্থিক ও বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

২ সেপটেম্বর—প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদের উভয় সভায় ঘোষণা করেন যে, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী ১৪ ক্যারেটের অধিক বিশুদ্ধ-তার স্বর্ণালংকার তৈরির উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

বৃহত্তর বোমবাই থেকে দু'জন মন্ত্রীসহ ১৮ জন আইনসভা সদস্যের পদত্যাগের ফলে মহারাষ্ট্রে যে গুরুতর রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নেতৃত্বে তিনজনের এক প্রতিনিধি দলের আলোচনার ফলে আজ ওই সংকটের অবসান হয়েছে। পদত্যাগী সদস্যরা তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেছেন।

৩ সেপটেম্বর—প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বর্ণা-লংকার তৈরির ওপর থেকে সর্বপ্রকার বাধা-নিষেধ অপসারণের কথা ঘোষণার ফলে সরকার তিন সপ্তাহব্যাপী আন্দোলন সম্পর্কে শত স্বর্ণশিল্পীদের দুই দিনের মধ্যে মুক্তিদানের আদেশ দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী জি এস পাঠকের আসনের বাইরে আজ পুলিসের সংগে হাজার তিনেক মারমুখী ছাত্রের সংঘর্ষের ফলে ৫০ জন পুলিস সমেত শ' দেড়েক লোক আহত হয়েছেন। পরিস্থিতির অবনতি রোধের জন্য রাজ্যে সরকার কারফ্যু জারি করেছে। বার-কাউন্সিলের দ্বারা দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকালটির পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবিতে এই বিক্ষোভ।

৪ সেপটেম্বর—কয়েক শত কর্মীকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ না করলে আসাম রাজ্য ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের পাঁচ হাজার কর্মী অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করে সমস্ত শিল্প সংস্থাকে অচল করে দেবার এবং সমগ্র আসামকে নিষ্প্রদীপ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

আজ উত্তর চব্বিশ পরগনার তিনটি মহকুমায় বাস চলাচল করেনি। বাস ড্রাইভার ও কনডাকটররা অকস্মাৎ ধর্মঘট করায় বারাসত, বনগাঁ ও বসিরহাট এলাকার ১০টি রুটের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। বাস-কর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে এই ধর্মঘট হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৯ আগস্ট—বর্তমানে মানুষের হাতে গড়া তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ চন্দ্রের আবহাওয়ায় চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। রাশিয়ার লুনা-১১ এবং মারকিন উপগ্রহ অরবিটার—এই উভয় উপগ্রহের উদ্দেশ্য হলো চন্দ্রের জলহীন সমুদ্রে মানুষের অবতরণের স্থান খুঁজে নেওয়া। এ ছাড়া রাশিয়ার লুনা-১০ গত এপ্রিল মাস থেকে চন্দ্রের আকাশে রয়েছে।

৩০ আগস্ট—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে রাজি হয়েছে বলে যে সংবাদ বেরিয়েছে তা আদৌ সত্য নয় বলে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে গতকাল জানিয়ে দিয়েছে।

কায়রোয় মুসলিম ভ্রাতৃত্বের তিনজন নেতার প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্ররা গতকাল করাচীর পথে পথে নীরব বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ব্যানারে প্রেসিডেনট নাসেরকে 'খুনে একনায়ক' বলে অভিহিত করা হয়।

৩১ আগস্ট—প্রবল বর্ষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে (ঢাকায়) বুড়িগঙ্গার জল বিপদ-জ্ঞাপক সীমা অতিক্রম করার দরুন ১৫০০ বর্গমাইল পরিমিত এলাকা প্লাবিত হওয়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ঢাকার রাজপথে নৌকা চলাচল করছে।

১ সেপটেম্বর—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য সরিয়ে আনায় এবং ইন্দোচীনের আন্তর্জাতিক গ্যারানটি সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা মেনে চলার জন্য প্রেসিডেনট দ্য গল আজ মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২ সেপটেম্বর—ওয়াশিংটন ও ক্রেমলিনের মধ্যে নতুন সমঝোতার জন্য প্রেসিডেনট জনসন যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, আজ তা প্রত্যাখ্যান করে 'প্রাভদা' বলেছেন, ভিয়েতনামে যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন এই বোঝাপড়া হবে না।

৩ সেপটেম্বর—মৌলানা ভাসানীর জাতীয় আওয়ামি দল ঘোষণা করেছেন যে, আগামীকাল ৪ সেপটেম্বর তারিখটি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে দাবি দিবসরূপে পালিত হবে। মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত প্রতিরোধ কমিটি জাতীয় আওয়ামি দলের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ভার নিয়েছেন।

৪ সেপটেম্বর—দশ সহস্রাধিক লোককে ঢাকা শহরের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে স্কুল কলেজে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকারী মহল থেকে জানানো হয়েছে, বন্যার ফলে ১২ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

ষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

লেখক		পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাশ

AMRUTANJAN
Pain Balm
AMRUTANJAN
PAIN BALM
AMRUTANJAN LTD

১৫ই আগষ্ট! স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগষ্ট!!

ভারতবর্ষের মুক্তির সংগে সংগে বাঙলাদেশও মুক্ত হল কিন্তু গোটা বাঙলা নয়—ভাঙ্গা বাঙলা। বাঙলা দেশটা ছিল গঙ্গা আর পদ্মা মিলিয়ে যুক্ত বাঙলা। এখন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত বাঙলা দ্বিখণ্ডিত আর সীমান্ত গান্ধীর পশ্চিম সীমান্তেও পাঠানভূমি নিশ্চিহ্ন। এ-বই সেই নির্মম দ্বিখণ্ডীকরণের ঐতিহাসিক দলিল। যুক্তবাঙলার শেষ অধ্যায়ে কী ঘটেছিল, কারা নেতৃত্ব করেছিলেন, কী তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও লোভ ছিল, কী রূপায়ণে তারা ব্যস্ত ছিলেন এবং পরিণামে কী স্থাপনা করে গেলেন—তারই আদ্যন্ত ইতিহাস। কেনই বা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী চিরকালের জন্য তাঁর মর্মকথা ইতিহাসের পাতায় জুড়ে গেলেন We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of Independence gained at this price is going to be dark. I pray that god may not keep me alive. [illegible] অজ্ঞাত-[illegible], অমানুষিক চক্রান্ত, অমার্জনীয় অপরাধ কিংবা [illegible] এই বইএর [illegible] উদ্ঘাটিত। দাম ১৫·০০।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাসের

যুক্তবাঙলার শেষঅধ্যায়

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ মুক্তি পেয়েছিল। বিদেশী শাসনের লোহার খাঁচা থেকে। আর এই ১৫ই আগষ্টে জন্মেছিলেন এক মহান পুরুষ, যিনি সমগ্র জাতিকে শক্তি-মন্ত্রে জাগিয়েছিলেন যৌবনে,—চাই পূর্ণস্বাধীনতা; পরবর্তী জীবনে যিনি সমগ্র জাতির আত্মিক জাগরণে করে গেছেন নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান—চাই 'পূর্ণ-আনবত্তার বিকাশ', তিনিই শ্রীঅরবিন্দ,—বহুমুখী তাঁর জীবন। বিপ্লবী কিংবা ঋষি, দার্শনিক কিংবা কবি, দেশপ্রেমিক কিংবা বিশ্বপ্রেমিক, এর কোনটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়,—তিনি যোগী এই তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই যুগমানবের কর্মবহুল ও চিন্তাবহুল জীবনের অন্তরঙ্গ আলেখ্য এই গ্রন্থ—যা বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। দাম ১৫·০০।

শ্রীপ্রমদারঞ্জন ঘোষের

শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা ও জীবনদর্শন

[illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] নাটক প্রসংগে ভূমিকায় লিখেছেন "আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।" রবীন্দ্র-[illegible] রবীন্দ্রনাট্যের [illegible] দাম ২০ টাকা।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ

শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ও শ্রীমতী সাধনা কর।

ভূমিকা শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, উপাচার্য, বিশ্বভারতী [illegible] শান্তিনিকেতন [illegible] পর্যন্ত দৈনন্দিন ইতিহাস। [illegible] নন্দলাল পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়। দাম ১৫ টাকা।

প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

২রা অক্টোবর! গান্ধীজীর জন্মদিন!! শাস্ত্রীজীরও জন্মদিন!!

জাতীর জনকের শতবর্ষ উদযাপনের সূচনায় পুনরায় জাতিকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত করতে গান্ধী-সাহিত্য পাঠ করুন

[illegible] "আমার [illegible]কর্ম আপনাকেই দেখাশোনা করতে হবে।" [illegible]

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের

আমাদের লালবাহাদুর

২রা অক্টোবর রবিবার। ৩রা অক্টোবর পুনরায় আমাদের ৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের দোকান খোলা হইবে। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় গান্ধী-সাহিত্যের সমাবেশ থাকিবে।

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ১২ । ফোন ৩৪-৩১৫৪ ।

এবারকার শ্রেষ্ঠ শারদীয়া সংখ্যা!!

দীপান্বিতা

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে প্রকাশিত হইবে।

মূল্য : ৪·০০ টাকা রেজেস্ট্রী ডাক খরচসহ ৪·৬৫

সাতটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখছেন :

- বোধহয় এবারকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস • তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
- এক ভিন্ন মেজাজের নতুন উপন্যাস • সমরেশ বসু
- এই প্রথম একমাত্র রহস্য উপন্যাস • জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
- মনস্তত্ত্বমূলক শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস • সুধারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
- এক দুঃসাহসিক কাহিনীর উপন্যাস • স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
- প্রেমের এক আশ্চর্যসুন্দর উপন্যাস • হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
- বেদনায় ভরা এক স্নিগ্ধ মধুর উপন্যাস • মহাশ্বেতা দেবী

বড়গল্প : বিমল কর • শুধু মধুরে মধুর, এমনি এক স্নিগ্ধ কাহিনী •

ছোটগল্প : বিমল মিত্র • নরেন্দ্রনাথ মিত্র • শক্তিপদ রাজগুরু • সুনীলকুমার ঘোষ • অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় •

রম্যরচনা : ডঃ দিলীপ মালাকার • অমিতাভ চৌধুরী • কিরণকুমার রায় • সুনীল গুহ • চিত্রগুপ্ত • সুজাতা •

একাংক নাটক : অসিত গুপ্ত

এছাড়া চলচ্চিত্র জগতের খবর এবং উল্লেখযোগ্য রচনা • অজস্র ছবির ফিচার • খেলাধুলার উপর প্রশ্নোত্তর • কার্টুন •

এজেন্টগণ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন :

দীপান্বিতা পাবলিকেশনস্

২৪৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২ ॥ ফোন ৩৪—৩৭৭০

(সি-৮৩০৬)

সৈয়দ মুজতবা আলীর

দুঃহারা ৭·০০
প্রেম ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

লোকটা ৩·০০

বিমল করের

বালিকা বধূ ৩·০০
গ্রহণ ৪·০০
খড়কুটো ৪·০০

সমরেশ বসুর

বিবর ৫·০০
ফেরাই ৩·০০
দুই অরণ্য ৬·০০

সুবোধ ঘোষের

বন উপবন ৪·০০
জিয়া ভরলি ৬·০০
বসন্ততিলক ৫·০০
শতকিয়া ৮·০০
ভারত প্রেমকথা ৬·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

রাতের পাখি ৪·০০
দোলনা ৪·০০

প্রতিভা বসুর

রাঙা ভাঙা চাঁদ ৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

জনম জনম হম ৪·০০

বুদ্ধদেব বসুর

তপস্বী ও তরঙ্গিণী ৩·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রেমের চেয়ে বড় ১২·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ঘরণীর বিকল্প ৩·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২·৫০

রমাপদ চৌধুরীর

বনপলাশির পদাবলী ৮·৫০
পরাজিত সম্রাট ৪·০০
গল্প-সমগ্র ১০·০০

বিমল মিত্রের

বেগম মেরী বিশ্বাস ২৫·০০
নিবেদন ইতি ৫·০০ রং বদলায় ৩·৫০

শংকরের

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৪·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তুঙ্গভদ্রার তীরে ৬·০০ শঙ্খকঙ্কণ ২·৫০
ধরণী যখন তরুণী ছিল ৪·০০
কহেন কবি কালিদাস ৩·০০
বহু যুগের ওপার হতে ২·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অমাবস্যার গান ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সূর্যসাক্ষী ১৪·০০ সেতুবন্ধন ৫·০০
তিন দিন তিন রাত্রি ৫·০০ ময়ূরী ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

বুদ্ধির দৌড়

কে যেন বলেছিলেন, আজকাল মানুষকে চমকে দিতে পারে এমন জিনিস একটিই আছে, সেটি হল বিজ্ঞান, আবার অকৃত্রিম কৌতুক যদি কেউ দিতে পারে তাও হল বিজ্ঞান। কথাটা কতটা ধোপে টিকবে জানি না, তবে হালে চিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনৈক গবেষক আন্তর্জাতিক প্রজনন সম্মেলনে যে গবেষণাটি পেশ করেছেন তাতে কৌতুক এবং সেই সঙ্গে আশঙ্কা বোধ না করে পারছি না। উক্ত গবেষক দীর্ঘমেয়াদী এক গবেষণার পর ঘোষণা করেছেন, বুদ্ধিমানদের সন্তান বেশী হয়। তাঁর হিসেব মতন ক্ষুরধার বুদ্ধির মানুষ হলে গড়পড়তা তাদের সন্তানের হার হবে ২·৬। মাঝারি বুদ্ধিঅলা মানুষের সন্তানহার গড়পড়তা ২·৫; মোটামুটি বুদ্ধিমানদের ২, আর যারা 'বোকা' বলে সমাজে চলে যাচ্ছে তাদের সন্তান হার ১·৫। গবেষকমশাই আরও একটি কথা এই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, বুদ্ধিকে শিক্ষার ভিত্তিতে হিসেব করলে চলবে না। অর্থাৎ আমরা অনুমান করতে পারি, ধুরন্ধর গাঁটকাটা তার বুদ্ধিবৃত্তির জন্যে অধিক সন্তানের জনক হতে পারে,—কিন্তু মোটামুটি শিক্ষিত অথচ বাজারে যিনি বোকা নামে চলে যাচ্ছেন, সেই নিরীহ মানুষটি এক্ষেত্রে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে নাও পারেন।

সংবাদটি পড়ে কয়েকটি সমস্যার কথা মনে হচ্ছে। যেমন ক্ষুরধার বুদ্ধির কোনো পুরুষ, এবং ক্ষুরধারা (!) বুদ্ধির কোনো নারীর বিবাহের ফলে কি হবে? এ পক্ষের ২·৬, অন্য পক্ষের ২·৬ যোগ করে যোগফল যা হয়, তাই কি? অথবা, একজন যদি ক্ষুরধার হয়, অন্যজন মাঝারি বা সাধারণ তবে কোন মতে হিসেবটা হবে? অথবা এই হিসেবের বেলা পুরুষকেই ধরা হয়েছে, মেয়েদের বাদ দেওয়া হয়েছে? নাকি উলটো? দুই নিরেট বোকার মিলনের ফল কি শূন্য হবে? বা, যদি বিয়ের পর বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে আসে তবে? আরও কিছু সমস্যা আছে: আজকাল প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যা কম বেশী একটা দুশ্চিন্তার কারণ, কাজেই অনুমান করা যেতে পারে অতঃপর যুবক-যুবতীরা বিবাহের পূর্বে, প্রণয়পর্বকালে, পরস্পরের আই কিউ টেস্টের জন্যে উদগ্রীব হবে, এবং প্রচণ্ড রকম প্রণয়ের পরও হয়ত দুই ক্ষুরধারে বিচ্ছেদ ঘটবে, আকাট বোকারা ব্যর্থতার জন্যে গলায় দড়ি দেবে।

অন্যের কথা যাক, নিজেদের কথা বলি। ভারতের জনসংখ্যার হার অত্যধিক। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় বুদ্ধিমানরাই বেশী সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে, তবে ভারতের মতন বুদ্ধিমানে ভরা দেশ আর একটি মাত্র আছে, চীন। চীনের যে প্রখর বুদ্ধি তা তো মালুম হচ্ছে, কিন্ত ভারতের এত বুদ্ধি কোথায়? মাঠেঘাটে যারা চাষ করছে, সবজি ফলাচ্ছে, রেলে কারখানায় দিবারাত্র পরিশ্রম করছে—সেই নিরীহ সাধারণ বোকা-সোকা মানুষগুলির পেটে পেটে কি এত বুদ্ধি আছে?

যাই হোক, গবেষকমশাইয়ের গবেষণাটি আমাদের দেশের মাথাঅলারা ভেবে দেখতে পারেন। শুনি, আমাদের দেশে জনসংখ্যা কমাবার জন্যে সরকার গলদঘর্ম। ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টার অলিতে গলিতে খুলে দেওয়া হচ্ছে, কাগজে 'লুপে'র বিজ্ঞাপন, সিনেমায় প্রচার, তবু এ-ব্যাপারে তেমন একটা সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় সরকার আর কি করতে পারেন? আগামী পাঁচ, দশ, বিশ বছরে (জন্মনিয়ন্ত্রণের সাফল্য যতই হোক) জনসংখ্যা আরও বাড়বে। জনসংখ্যা এখন যে অবস্থায় আছে তাতেই চক্ষে সর্ষে ফুল দেখতে হচ্ছে, পেটের ভাত জোটানো যায় না। খুব সহজে এই সমস্যার খানিকটা সমাধান করতে হলে ভারত সরকারের উচিত আমাদের দেশের লোককে একেবারে নিরেট বোকা করে তোলা। নিরেট বোকাদের সন্তান বোধ করি হবে না। পরিবার পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, সেই অর্থের কিছুটা দিয়ে একবার নিরেট বোকা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এতে সংস্কারপন্থীদের সংস্কারে লাগবে না, অকারণে শরীরকে কষ্ট দিতেও হবে না, হাসপাতালে ছোটার ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে হবে না। 'আবার তোরা বোকা হ'—এই প্রচার এখন থেকেই শুরু করা যেতে পারে, এবং বোকামি যে বন্ধ্যত্বের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা, চমৎকার ফলপ্রদ চিকিৎসা এটাও বলা যেতে পারে।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকটিকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের একটি অশেষ উপকার সাধনের সূত্র দিয়েছেন। এখন আমরা নিজের গরজে সেটি কাজে লাগাতে পারলেই উপকৃত হব।
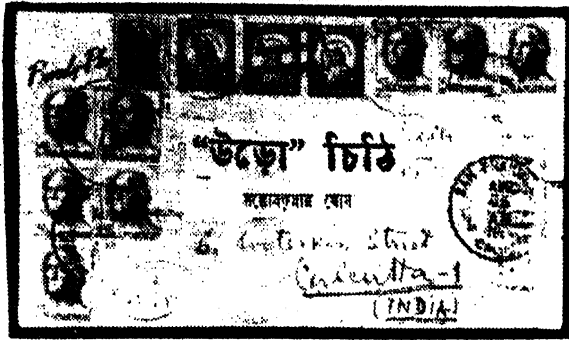
মারকিন ম্লুককে স্থির যৌবনা ললনা দেখিনি বলে যে খেদ করেছি, সেটা মিটেছিল নিউ মেক্সিকোর আলবুকারকিতে এসে। শ্রীমতী এবারলাইন নীল নয়না, এবং নিঃসন্তানা, এবং ইংরাজীতে যাকে বলে "ওয়েলপ্রিজারভড্", সুরক্ষিতা। বিজনেস-ম্যান স্বামী গেছেন শিকাগোতে, ইনি সেই অবসরে অতিথি সৎকার করছেন, অর্থাৎ শীততাপনিয়ন্ত্রিত ক্যাডিলাকে চড়িয়ে এই বাঙালকে হাইকোরট দেখাচ্ছেন। খুব কৌতূহল হয়েছিল বলেই, ভীষণ বেআদপি হবে জেনেও, চোখ বুঁজে বয়সের কথা জানতে চেয়েছিলাম। জবাব যা পেলাম, তাতে বুঝতে বাকী হইল না যে ইনি ইহজন্মে আর চল্লিশ বছরের মুখ দেখবেন না।

শ্রীমতী এবারলাইন বললেন, আপনাকে মেক্সিকান ফুড খাওয়াব, দেখবেন কত রকম স্পাইস, আর কী হট, আপনাদের ভারতীয় পাক-প্রণালীতেও অত ঝাল আর মশলা মিলবে না। আর খাওয়ার রুটির বদলে একটা জিনিস, নাম সোপাইপিও, বাজি রেখে বলতে পারি, কস্মিনকালে আপনি তা দেখেন নি।

সোপাইপিও এল, খেলাম, তিনি বললেন, "ইজ নট ইট ওনডারফুল", আমি বললাম "আলবাত ওনডারফুল"—যদিও দেখামাত্র এবং চাখামাত্র টের পেয়েছিলাম, জিনিসটা আমাদের 'নিমকি' ছাড়া কিছু না।

মেক্সিকান নিমকি খেতে খেতে শ্রীমতী এবারলাইনকে বললাম, "আপনাদের এখানে তো ছিঁচকে চুরিও হয়?"

তিনি শক্ পেয়ে বিষম খেয়ে (এক্সকুজ মি, আমার আবার কদিন ধরে হে-ফিভার চলছে, ক্যানসাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে বড় বড় ধর্মগোলা, গাদা গাদা খড়) বললেন, "ছিঁচকে চুরি? কে বলল?"

—গতকাল আমাকে প্রফেসর গিবন্স নেমন্তন্ন করেছিলেন। কারা নাকি গাড়ি ভেঙে রেডিও, স্টিরিওফোনিক রেকর্ড প্লেয়ার, আরও কী কী, প্রায় সাতশো ডলার দামের জিনিস নিয়ে সটকে পড়েছে।

—গিবন্স্‌রা বলেছে বুঝি? ওরা তো 'কমি', মানে লালে লাল। ওদের লিভিং রুমে দেখেননি কাস্‌ত্রোর ছবি? ওর দ্বিতীয় পক্ষের বউ 'গেইল্', দাঁতও মাজে না—'কমি' যে। দাঁতও লাল না রাখলে ওদের ডাস্ ক্যাপিট্যাল অশুদ্ধ হয়।

শ্রীমতী এবারলাইন খুবই চটেছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, "চুরি যদি হয়েও থাকে, কালারড্ কিংবা রেড্ ইন্ডিয়ান স্মাগ্‌লারদের কাজ। মেক্সিকোয় তো শখের জিনিস এত মেলে না, ওরা বরডার পেরিয়ে চড়া দামে বেচে দেয়। স্মাগলিং—চোরাই চালান কাকে বলে, জানেন না?"

উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করে মুখে অপার্থিব হাস্য বিস্তার করে বসে রইলাম। তস্যার্থ, পাক-ভারত বরডার তল্লাটের মানুষ আমি, আর স্মাগলিং কাকে বলে জানি না?

শ্রীমতী ক্যারল নাম্নী কোন মহিলা আমাকে টি ভি স্টুডিওতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে জ্বলজ্বলে চার-চারটে ক্যামেরার নজরের নিচে চেয়ারে বসিয়ে 'ইন্টারভ্যু' হল। চোখা চোখা সব প্রশ্ন, কুল্‌ কুল্‌ ঘামে শারট্, গেঞ্জি সব সিক্ত।

যেমন একটা প্রশ্ন, "মিস্টার গোস্, ফ্র্যাংকলি বলুন, এদেশ আপনার কেমন লেগেছে, কল্পনার সঙ্গে মিলে গেছে কিনা।"

—মিলেছে বইকি, যা দেখছি ভাল, ভালই তো।

—শকিং কিছু দেখেননি?

জিহ্বাগ্রে দুষ্টা সরস্বতী ভর করল, আড়চোখে প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে ফেললাম, 'মারকিন মেয়েদের পোশাক।'

প্রশ্নকর্ত্রী নিজেই বোধ হয় 'শক্' পেলেন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে বললেন, 'তুমি এক পেয়ালা কফি উপার্জন করেছ।"

জানি না, টি ভি-র ওই প্রোগ্রাম পুনঃ কিংবা আদৌ সম্প্রচারিত হয়েছিল কিনা।

ছিলাম টেক্সাসের হিউস্টনে, এলাম ফ্লোরিডার মায়ামিতে।

বিখ্যাত কোনও ইংরাজনীতিক যেমন বানানে হোম, উচ্চারণে হিউম, হিউসটনও তাই বানানে 'হাউস', উচ্চারণে 'হিউস—'। তবে ছেলেবেলা থেকে পি-য়ু-টি=পুট, কিন্তু বি-য়ু-টি=বাট মুখস্থ করে আসছি,

অনাস্থা প্রস্তাব – বসু
অনাস্থা প্রস্তাব –
কলকাতায় বিমান আক্রম
মহড়া হয়েছিল।
বোমা যদিও কাগ
হুমায়ুন কবির কংগ্রেস ছেড়েছেন যখন, মন্ত্রিত্বের পদ এবার তিনি নিশ্চিত পাবেন। যদিও সেটা ছায়া-মন্ত্রির পদ।
অজয় মুখার্জি
ছায়া-মন্ত্রিসভার তালিকা
এর্নাকুলামে কংগ্রেস প্যাণ্ডেল ভেঙে পড়ার দুঃসংবাদ।
দুঃসময়?

॥ আনকোরা নতুন বই—সদ্য বেরুল ॥

পঞ্চতন্ত্র ২য় পর্ব
সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৬·৫০ ॥

সবার অলক্ষ্যে ১ম পর্ব
ভূপেন্দ্র রক্ষিত-রায় ॥ ৭·০০ ॥

অন্য এক রাধা
শমীক গুপ্ত ॥ ৪·০০ ॥

রহস্যসন্ধানী ফাদার ঘনশ্যাম
অদ্রীশ বর্ধন ॥ ৪·০০ ॥

ভোর
ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্য ॥ ৬·০০ ॥

সায়াহ্ন রাগিণী
বারীন্দ্রনাথ দাশ ॥ ৫·০০ ॥

লিপিকা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৫·৫০ ॥

ব্যাটে বলে ক্রিকেট
অজয় বসু ॥ ৪·৫০ ॥

রঙিন নিমেষ
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪·৫০ ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য
নীললোহিত ॥ ৪·৫০ ॥

চাঁদের ওপিঠ
মনোজ বসু ॥ ৪·৫০ ॥

সুনন্দর জার্নাল
॥ ৪·৫০ ॥

চণ্ডী লাহিড়ীর প্রচ্ছদ ও কার্টুন সহ

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরাপান্না (২য় সং) ৪·৫০, কান্না (৩য় মুঃ) ৭·০০, জংগলগড় (৩য় মুঃ) ৪·০০, বসন্তরাগ (৩য় মুঃ) ৩·০০, হাসুলীবাঁকের উপকথা (৮ম সং) ১০·০০, শ্রেষ্ঠগল্প (৭ম সং) ৫·০০, রসকলি ৩·৫০, চাপাডাঙার বউ (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০, বিস্ফোরণ (২য় সং) ২·০০, শিলাসন (৩য় সং) ২·৫০, সপ্তপদী (২২শ সং) ৩·০০, ডাকহরকরা (৪র্থ সং) ৩·০০, ধাত্রী দেবতা (১১শ সং) ৮·৫০, রচনাসংগ্রহ ১০·০০, দ্বীপান্তর (নাটক—৪র্থ সং) ৩·০০।

বনফুল

জংগম (১ম) ৭·৫০, জংগম (৩য়) ১১·০০, তিন কাহিনী (২য় মুঃ) ৬·০০, ছিটমহল ৪·০০, দ্বৈরথ ৩·০০, ব্যংগ কবিতা ৬·৫০, গল্পসংগ্রহ ৪·০০।

জরাসন্ধ

লৌহকপাট ১ম (১৫শ মুঃ) ৪·০০, লৌহকপাট ২য় (১৩শ মুঃ) ৫·৫০, তামসী (৯ম মুঃ) ৫·৫০, রংচং (২য় মুঃ) ১·০০।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ঊর্মি-আহ্বান ৭·০০, শ্রেষ্ঠগল্প (৪র্থ সং) ৫·০০, দুয়ার হতে অদূরে (৪র্থ সং) ৩·৫০, রূপান্তর (২য় সং) ২·০০, নীলাংগুরীয় (৯ম সং) ৬·০০, উত্তরায়ণ (৩য় সং) ৪·০০, কদম ২·৫০, বাসর ৩·৫০, তোমারই ভরসা ৪·৫০।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কৃষ্ণচূড়া (২য় সং) ৬·৫০, চিত্ররেখা (২য় সং) ৩·৫০, **তিন প্রহর (সদ্য প্রকাশিত ৩য় মুঃ)** ৪·০০, শিলালিপি (৫ম সং) ৬·৫০, স্বর্ণসীতা (৭ম সং), ২·৭৫, অসিধারা (৩য় সং) ৩·৫০।

মনোজ বসু

চাঁদের ওপিঠ ৪·৫০, মানুষ গড়ার কারিগর (৩য় সং) ৫·৫০, রক্তের বদলে রক্ত (২য় সং) ২·৫০, মানুষ নামক জন্তু (২য় সং) ৩·০০, এক বিহংগী (৪র্থ সং) ৪·০০, নিশিকুটুম্ব (৪র্থ সং) ১ম ৭·৫০, ২য় ৮·০০, ছবি আর ছবি (২য় মুঃ) ৮·০০, রাজকন্যার স্বয়ম্বর (২য় মুঃ) ৪·০০, মায়াকন্যা (২য় মুঃ) ৪·০০, জলজংগল (৪র্থ সং) ৫·০০, বকুল (৫ম সং) ২·২৫, বৃষ্টি, বৃষ্টি! (৩য় সং) ৬·০০, শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ সং) ৪·৫০, সবুজ চিঠি (৩য় সং) ৩·০০, গল্পসংগ্রহ ৪·০০, কাচের আকাশ (২য় সং) ২·০০, কুংকুম (৩য় সং) ২·০০, খদ্যোত (২য় সং) ২·০০, দেবী কিশোরী (৩য় সং) ২·৫০, নূতন প্রভাত (৫ম সং) ২·০০, বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং ১·৫০, শেষ লগ্ন (২য় সং) ২·০০, পথ চলি (৩য় সং) ৩·০০, সোভিয়েতের দেশে দেশে (৩য় সং) ৬·০০, নতুন ইউরোপ নতুন মানুষ (২য় সং) ৫·৫০, কিংশুক (২য় সং) ২·০০, ভুলি নাই (৩১ সং) ২·৫০।

॥ চারখানা বই আজ বেরুল ॥

দুই মেরু
আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৩·৫০ ॥

সেকালের শৈলসুতা আর একালের সুষমার বিস্তর তফাৎ—যেন দুই মেরু। রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্তা লেখিকার নবতম সৃষ্টি—অনন্যসাধারণ উপন্যাস।

টুইস্ট
অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৪·০০ ॥

গোটা আমেরিকা চষে বেড়িয়েছেন লেখক—বারে, নাইট-ক্লাবে, হলিউডের পাড়ায় পাড়ায়। এইসব, আরও বিস্তর সরস ও রোমাঞ্চকর কাহিনী।

শংকাশিহর ॥ ১২·০০ ॥
প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জয়ন্তী সেন সম্পাদিত রহস্য-গল্পের সংকলন। প্রাচীন ও আধুনিকতম—সমস্ত বিশিষ্ট লেখা থেকে বাছাই। মূল্যবান সম্পাদকীয় আলোচনা।

পঞ্চসায়ক প্রথম খণ্ড
নারায়ণ গঙ্গো ও আশা দেবী সম্পাদিত প্রেমের গল্পের সংকলন। প্রাচীন ও আধুনিক — সমস্ত বিশিষ্ট লেখা থেকে বাছাই। ॥ ১০.০০ ॥

উপছায়া ॥ ১০·০০ ॥
ভৌতিক গল্প-সংকলন। ডক্টর সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন সম্পাদিত।

এলো অচেনা (২য় মুঃ)
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ৪·০০ ॥

স্তব্ধ প্রহর (২য় মুঃ)
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ৫·০০ ॥

বিবাহ প্রবেশিকা যৌনবিজ্ঞান
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১২·০০ ॥

সমাজ সমীক্ষা অপরাধ ও অনাচার
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৭·০০ ॥

রহস্যভেদী কিরীটী
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ১০·০০ ॥

বৈমানিকের ডায়েরী (৪র্থ সং)
দীপঙ্কর ॥ ৪·৫০ ॥

রাগশর (২য় মুঃ)
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০ ॥

ছবি আর ছবি (২য় মুঃ)
মনোজ বসু ॥ ৮·০০ ॥

ডক্টর জিভাগো (নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত)
বোরিস পাস্তেরনাক ॥ ১২·৫০ ॥

গ্রন্থপ্রকাশ ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড ॥ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

একটি অভিজ্ঞতা

বুদ্ধদেব বসু

লাল আলো, শাদা-ডোরা-কাটা বরাভয়:
তবুও, দ্বিধান্বিত,
পা বাড়িয়ে থামে, ইতি-উতি চায়;–
বিশাল মিছিল এখনো অচঞ্চল।

হিংস্র, বিশাল জন্তুর পাল
স্তম্ভিত জাদুমন্ত্রে,
তীব্র শিরায় তন্দ্রিল মর্ফিয়া,
ক্ষণিক আবেশ, মেঘলামদির দুপুরবেলায়।

সাহসে এগোয়, অস্ফুট শোনে
স্নায়ুর গোঙানি, মোটরের কম্পন
পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গির মোড়ে;
অস্থির ইস্পাতের দাঁতের ঘর্ষণ
বাড়ি-ফেরা পথে, দুপুরবেলায়।

এক মুহূর্ত: হঠাৎ জগৎ
কেঁপে দুলে ওঠে, জন্তুর পাল মুক্ত;
পায়ের তলায় গ'লে যায় মাটি
হিংস্র, বিশাল, উত্তাল বন্যায়।

ট্র্যাফিক, বিরাট, বিলোল, গর্জমান;
তীব্র চাকায় ফোটে হিংসুক ফেনা;
গরম গন্ধে নিশ্বাস ফ্যালে মুখে
অন্ধ দোতলা জন্তু।

আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি,
পা দুটো লুপ্ত অবশ হাটুর তলে;
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো তার অস্তিত্ব
কর্কশ এক ধাতব হুল্লোহুয়া।

এক মুহূর্ত: এই তবে তার মৃত্যু—
চৌরঙ্গিতে, প্রেয়সী কলকাতায়।
বিশাল নগর আকাশে রুমাল নাড়ে,
বিপুল দুপুর বাজায় সুদূর ভেঁপু,
চুমো খায় চোখে মেঘলাসবুজ হাওয়া

এক মুহূর্ত : এই তবে তার বাঁচা—
ট্র্যামের তারের জ্ব'লে-নিবে-যাওয়া ফুলকি।
সম্মত গাছ মন্থর মাথা নাড়ে,
সম্মত পাখি ভিন ডালে উড়ে যায়,
সম্মত নীল উঁকি দেয় অম্লান।

'আসামি তৈরি, তা-ই যদি চাও তোমরা।
আসলে সবাই সাক্ষী, তা মনে রেখো :
শেষ আলো, শেষ নার্সের শুশ্রূষা—
বাতাসের গাল, নরম, রঙিন, গোল—
স্নায়ু তরঙ্গ মানুষিক মস্তিষ্কে।'

শান্ত, বিশাল, একতাল বন্যায়
'আমি' গলমান আদিম নির্বিশেষে;
রাসায়নিকের স্খলিত বস্তা নিয়ে
ট্যাক্সি অসীমে যাত্রী।

ধীরে ভেসে ওঠে, প্লাবিত আলোয় মাথা।
কোন সৈকত, দূরে সমুদ্রপারে,
আনে আগুয়ান বিশাল সম্ভাষণ
কলম্বাসের শতচ্ছিদ্র ভেলায়।
কুমারী কন্যা ভণে অভ্যর্থনা
আলিঙ্গনের বৈভবে, ট্যাক্সিতে।

পিরামিড-খোঁড়া বিপুলে রত্নমণি—
মাথা, ধড়, বাহু ফিরে আসে সম্পূর্ণ;
বাজায় শঙ্খ সজীব জঙ্ঘা, জানু
তরঙ্গময় মানুষিক মস্তিষ্কে।

দু-দিকে নিশান : দোকান, প্ল্যাকার্ড, বাসা,
মহিলা, বৃদ্ধ, কামাহত কুক্কুরী;
বীজাণুমাতাল বিশাল বাতাস বলে:
'আমি বেঁচে আছি, স্বস্থ।'

তারপর ফের সনাতন সংসার,
চেনা গলিঘুঁজি, মানুষ অনাত্মীয়
স্বতঃস্ফূর্ত টুটেনখামেনি সোনা
জ্ব'লে নিবে যায়, ট্র্যামের তারের ফুলকি

সব যথাযথ, এবং প্রাত্যহিক,
জয়োৎসবের চিহ্ন কোথায় নেই;
যেমন মৃত্যু, তেমনি জীবন তার
পিরামিড-খনি, গোপন, ব্যক্তিগত।

'আমিও হাজির, তোমরা আছো তো রাজি?
আখেরে সবাই সাক্ষী—সত্যি, বলো!
সিনেমার ভিড়, বাঁকা রোদ্দুর, কোঁকড়া হাওয়া,
স্তনগৌরবে অলস রেলিং উষ্ণ,
আর এই ক্ষণ—অফুরান দিন—অপরিমাণ—
বলো, সব একই হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি, ও প্রতিধ্বনি!'

সম্মত গাছ নির্বোধ মাথা নাড়ে,
সম্মত রোদ অজান্তে অপসৃত,
সম্মত নীল চেয়ে থাকে নির্বাক,
সম্মত ভিড় বধির চিত্রলেখা।

বিশাল পৃথিবী দিকদিগন্তে ব্যাপ্ত,
বিশাল আকাশ বহির্বিশ্বে লীন;
মাঝখানে ঝরা পালক হয়তো খোলে:
একক আত্মা—অনুদ্দিষ্ট—আপনা।

"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান"

কি করে হঠাৎ একরাশ টাকা আমার হাতে এসে পেশছল, সেটা দফে দফে বুঝিয়ে বলা শক্ত। দরকারও নেই। মোটামুটি বলতে পারি, অনেকটা লটারি জেতার মত।

কিন্তু বিপদ হল, টাকাটা যাঁর মারফত এসেছিল, তাঁকে নিয়ে। তিনি লন্ডনের বিকটতম উন্নাসিক এক দর্জীর "দোকানে" কাজ করেন। সে দোকান নাকি রাজ-পরিবারের বাইরে কারো জন্য অর্ডার নেয় না—মার্কিন লক্ষপতির জন্যেও না। সেই কর্ম-প্রতিষ্ঠানে না আছে সাইনবোর্ড, না আছে টেলিফোন-কেতাবে তাদের নাম, নম্বর। তাদের প্রাইভেট নম্বর শুধু রাজ-পরিবার জানেন। অন্য লোকে সন্ধান পাবেই বা কি করে!

আমি বাস করতুম তাঁরই বাড়িতে। বাড়ির জেল্লাই কিছু কম নয়। বাকিংহাম প্যালেস পেরিয়ে হাইড পার্ক গেটে তাঁর ভবন। সে রাস্তাতেই থাকেন আর্টিস্ট এপসটাইন (না রোটেনসটাইন, ঠিক জানিনে) ও চার্চিল স্যাহেব। আমি সেথায় আশ্রয় পেলুম কি করে? সেই খলিফের খলিফে গিয়েছিলেন হল্যান্ডে। সেথাকার রাজকন্যার বিয়ে হবে। বরের বিয়ের বেশ-ভূষা তৈরি করতে। অতিশয় অনিচ্ছায়। দেশের আপন রাজার আদেশে। সেই বিদেশের রাজধানীতে পথ, হোটেলের নাম সব হারিয়ে যখন গা গা'র মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলুম। ব্যস্‌! হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে পকড়কে আমাকে লন্ডন নিয়ে এলেন। তদবধি তাঁর ভবনে বাস। অবশ্য স্বীকার করবো, লোকটি ভদ্র। আমি অন্যত্র সস্তা জায়গায় থাকলে যে কড়ি গুনতুম, তিনি সেটি সস্তারম্ভে সহাস্যে নিতেন। পাছে আমি লজ্জিত হই, আমি মুফতে আছি।

আমি বললুম, "কি ধরনের কাপড়ে স্যুটটি হবে সে বাবদে আমারও তো কিছু রুচি থাকতে পারে। দেখি, কাপড়ের নমুনা।"

[illegible]মিতে হাতেখড়ি হচ্ছে হেন লোককে যেভাবে উস্তাদ প্রণব রায়ের মত লোক হ্যান্ডেল করেন, সেইভাবে সদানন্দ হাস্য হেসে বললেন, "বৎস, তোমাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন শুধোই। তোমার যখন বিয়ে হয়, তখন গুরুজন তোমার ঐ 'রুচির' কথা শুধিয়েছিলেন?"

সত্যের অনুরোধে আমাকে নিরুত্তর থাকতে হল।

"আর এ তো সামান্য স্যুট। অবশ্য তুমি কুতর্ক করতে পারো, সামান্য জিনিসেই বরঞ্চ আপন রুচিমাফিক জীবনানন্দ অনুভব করা যায়। কিন্তু এ তো সামান্য জিনিস নয়, এ ব্যাপারটি অসামান্য। ভেরি ভেরি ইমপরটেন্ট। নইলে কও, এরই মেহেরবানীতে আমি বাড়ি গাড়ি হাঁকালুম কি প্রকারে? অতএব বুঝিয়ে কই।"

গভীর দম নিয়ে মিঃ সিরিল হজসন-জবসন ফবজ রোবসন বললেন, "উপস্থিত নববসন্ত সমারম্ভ। তুমি এসব স্যুট পরবে নিদাঘের অন্তিম নিশ্বাস থেকে হেমন্তের শেষান্ত পর্যন্ত। এইবারে শোনো বৎস, তত্ত্বকথা। শিশির বসন্ত নিদাঘ হেমন্ত প্রতি ঋতু অনুযায়ী বকিঙহম প্রাসাদ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। কিন্তু প্রতি বসন্তে একই বর্ণনা, প্রতি শিশিরে একই সর্ষপবর্ণ—অর্থাৎ নুন-হলুদে না, একই বর্ণ না, একই বর্ণনা চলবে না।

প্রতি ঋতুর সমারম্ভে আমাদের একটি গুহ্যতম—টপমোসট-সীকরিট সভা বসে, আসছে ঋতুর বর্ণ স্থির করার জন্য। যে বর্ণ স্থির করা হল, সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হয়। নইলে রাস্তার যদো-মেধো সেই

রঙের স্যুট পরে যত্রতত্র ঘোঁত ঘোঁত করে ঘুরে বেড়াবে। তা হলে ডাক্ অব এডেনবরা যখন অ্যাসকটে নামবেন—না, সেখানে হাংগামা কম, প্রশ্ন শুধু ওয়েসকিট্ নিয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়েসকিট কি?"

"চ্যাংড়ারা হাফাফিল যাকে ওয়েস্টকোট বলে।"

আমি চুপ করে ভাবলুম, আমাদের ছোঁড়ারা যখন 'ওয়াসকিট' বলে, তখন মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণই করে, এবং 'লাট্-সাহেবের' 'লাট্' উচ্চারণের মতই প্রাচীন শুদ্ধ উচ্চারণ। বললুম, "তা ওয়েসকিট্ নিয়ে দুর্ভাবনা কিসের?"

তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তোমার ব্লাইনড স্পটগুলো যে খোদায় কোথায় কোথায় রেখেছেন, বলা শক্ত। এদিকে শেকসপীয়র-বাইরন পড়েছ, অন্য দিকে মর্নিং স্যুটের ওয়েসকিটের মহিমা জানো না।"

আমি একগাল হেসে বললুম, "টায় টায় মিলে যাচ্ছে। ফ্রানসের শ্যামপেন প্রভিনসের এক সমঝদার আমায় বলেছিল, 'তাজ্জব লাগে মসিয়ো, এদিকে আপনি মলিয়ের সারৎর পড়েছেন অন্য দিকে আপনি উত্তম মদা বর্দো বুর্গনেনের 'বুকের' (bouquet) তফাত ধরতে পারেন না!' তা সে যাক গে। স্যুটের রঙের কথা কি যেন বলছিলে।"

"হুঁ, আসছে সীজনে সমঝদাররা যেসব রঙের উপর—রঙের উপর ঠিক না, রঙের শেডের উপর ন্যুয়াঁস্-এর উপর কৃপা করবেন সেই অনুযায়ী তোমার স্যুটগুলো তৈরি করা হবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, "গুলো মানে? ক'টা?"

আপন ওয়েসকিটের সর্বনিম্ন বোতামটির উপর—ইটি কখনো খাঁজে ঢোকানো হয় না, যবে থেকে ডাক্ অব উইনজার ফ্যাশানটি প্রবর্তন করেন—হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "তা, তা, গোটা বিশেক। আপাতক। পরে দেখা যাবে।"

এর পর আর শংকার কোনো কথা ওঠে না। আমি বললুম, "যে টাকাটা ফোকটে পেয়েছিলুম সেটা গেল। উপস্থিত লণ্ডনে একটা নাতিভদ্র লাউনজ স্যুটের কেমং নিদেন — £50/-/-, আড্ভালোরেম, আমাদের দিশী টাকায় প্রায় আট শ'—"

বাধা দিয়ে বললেন, 'পাগোল! একটা সুস্থ (সোবার) স্যুটের দাম নিদেন £120/-/-, —"

যখন পুনরায় চৈতন্যময় জগতে ফিরে এলুম তখন মিঃ (পরে তিনি স্যর হন) হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন আমার গলায় সাইফন থেকে সোডা-জলের সঙ্গে কড়া ব্র্যান্ডি মিশিয়ে তাই দিয়ে চোঁ—ও'—ও'—করে চাঁদমারী মারছেন—দমকলের লোক যে-রকম হোজ দিয়ে আগুন মারে।

আমার কোনো কিছু বলার মত অবস্থা নয়। মিঃ হজসন (ইত্যাদি) বললেন, "আকছারই এরকম ধারা হয়। আমরা দমকল ডাকিনে। সাইফন দিয়ে কাজ চালাই। এই পর্শু দিনই ডাক্ অব কে—"

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম "তা হলে আমার এই দিশী কোত-পাৎলুন বন্ধক দিয়ে দেশের টিকিট কাটতে হবে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, প্যাট কেম দি রিপ্লাই, "খোলা বাজারে না, কিন্তু মুর্তি পাবে না। তবে হ্যাঁ, আলবত, ব্রিটিশ মুজিয়াম পুরো সব আরকিওলজিকাল ক্যুরো কিনছে। অশোকের দাস্তানা, অর্জুনের পোর্টেবল অ্যাটম বম, দ্রৌপদীর প্রেশার-কুকার-কম্-ফ্রিজ—। কিন্তু তুমি অত ভয় পাচ্ছো কেন? আচ্ছা বল তো, পর্শু দিন রোদাঁর যে মূর্তিটি বিক্রির হল, তার পাথরের দাম কত? বুঝতে পারলে তো প্রশ্নটা? স্রেফ পাথরের দাম? প্লেন মেটেরেলের দাম?"

আমি মিনমিনিয়ে বললুম, "পাথরের দাম আর কত হবে? মার্বেল বটে। টাকা তিরিশেক।"

ওস্তাদ সোৎসাহে বললেন, "ইয়েহ্! আর মূর্তিটি বিক্রি হল £50,000/-। এইবারে একটু চিন্তা করো। তোমাকে যে ডজন দুই স্যুট বানিয়ে দেব, বাজারে তার দাম হবে, নিদেন, হাজার তিনেক পৌণ্ড। কিন্তু মেটেরেলের দাম? স্রেফ উলের দাম কত হবে? বড়জোর সে বড়জোর? £50/-/-? £100/-/-. অর্থাৎ ১৪০০ টাকা? আমি আরটিসট, আমি রোদাঁ।"

একটুখানি ভর্সা পেয়ে বললুম, "তা,

তা. ডজন দুই, মানে কিনা, অতগুলো স্যুটের কি সত্যই দরকার ?"

❋

এর পর ওস্তাদ অত্যান্ত টেকনিকাল ভাষায় যে-কথা বলেন সে আমি বুঝতে পারিনি, মনেও নেই। অতএব এখন যদি তার ফিরিস্তি ঠিক ঠিক না দিতে পারি, তবে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

তিনি হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলেন—

"মর্নিং স্যুট—স্ট্রাইপট্ ট্রাউজারস্—অরিজিনাল ওয়েস্টকট্—তার টপ্-এন্ডে সাদা সিলকের পাইপিং দেব কি ?—টাইয়ের উপরে ডাইমনড পিন, না পার্ল দেবো ?—কোন্ ভাঙা কলারের জন্য কোন্ কোমপানি উত্তম ? স্প্যাটার ডেশেজ।

"তার পর দোমি। পাতলুন যথা পূর্বং। কিন্তু কোটটা টেল নয়।

"সে না হয় হল। দুপুরের লাউন্জ স্যুটটি কি প্রকারের হবে ?

"সন্ধেয় ? ডিনার জ্যাকেট ? টেলস্ ?

"ইতিমধ্যে যদি গলফ খেলতে লোকটা গিয়ে থাকে ?

"কিংবা সাঁতার কাটতে ?

"কিংবা খেঁকশেয়াল শিকার করতে ঘোড়ায় চড়ে, জোড্‌পুরী ?

"কিংবা সে যদি অসুস্থ হয়ে তাবৎ দিন বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার ড্রেসিং গাউন কি হবে ?"

আমার মুখে বিরক্তি দেখে বললেন, "এই যে তুমি এখন লাউনজ স্যুট পরে আছ, এ তো ইংরেজের ডাল-ভাত। এর উপর তার কি ধরনের ক'টা স্যুট দরকার হয় তার ফিরিস্তি দেওয়া বড়ই শক্ত। সে থাক। উপস্থিত তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাষা বাবদে আলোচনা হোক। আচ্ছা বল তো, স্মকী কাকে বলে ?"

"জানিনে।"

"তাহলে বানান করছি, s m o k i n g"।"

"এ রকম বিৎকুটে উচ্চারণ হতে যাবে কেন ?"

"ফরাসীরা তাই করে। অবশ্য যারা অল্পস্বল্প দুনিয়ার খবর রাখে তারা বলে স্ম কি ন্ ন্! তা সে যাক গে, কিন্তু ফরাসীতে অর্থ হল ডিনার জ্যাকেট, টেলজ না। আবার ইংরিজীতে স্মোকিং-জ্যাকিট অন্য জিনিস। অসকার ওয়াইলডের বড় প্রিয় ছিল, আর ছিল ফিন্সি ওয়েস্কিট—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়াইলডের কথা কও, শুনতে রাজী আছি। কিন্তু তোমার ওই বাহান্ন রকমের স্যুটের নবাবির দেমাক আমার আর বরদাস্ত হচ্ছে না।"

সিরিল বললেন, "বটে ? তুমি যখন পাঁচ রকম 'ঔচে' (উচ্ছে) বর্ণনা দিতে দিতে নবাবির চূড়ান্তে পোঁছে গিয়ে বলো, ইংরেজ রাস্‌টিক, তেতোর কদর বোঝে না, তখন আমি বাধা দিই ? তুমি যখন বারো রকম অ্যামবল (অম্বল)—"

❋

শ্রীযুত নীরদ চৌধুরী যাই বলুন, যাই কন, জামাকাপড় বাবদে আমরা মুক্ত। রাস্তা দিয়ে নাগা সন্ন্যাসী যখন যায়, তখন তো আমরা শুধোই নে, এটা হিন্দু না মুসলমান 'ড্রেস' !!(১)

ভ্রম সংশোধন : ১৭ই ভাদ্রের ৪৪৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে ছাপা হয়েছে "জোলা টোক গিললেন"। হবে "জোলা ঢোঁক গিললেন"।

[illegible] কাহিনী [illegible] ইংরেজীওয়ালারা [illegible] গল্প লিখে থাকেন। [illegible] শান্তিসৃষ্টি করে [illegible] থাকবে আর মন পড়ে [illegible] খ্ঁজবে। ইন্কারিজিবল্। এই [illegible]

'আরো একটি সম্ভাবনা'

কলেজ খ্লেছে, অধ্যাপক মাইনে পেয়েছে, অতএব পাওনা তিরিশটা টাকা আদায় করবার জন্যে যেতে হল তার

জল জায়াজগের উৎস

কাছে। গিয়ে দেখি, অধ্যাপক প্জো সংখ্যার জন্যে গল্প লিখছে।

এই জার্নাল অন্গ্রহ করে যাঁরা নিয়মিত পড়েন, তাঁরা জানেন আমার অধ্যাপক বন্ধ্টি কিছ্ কিছ্ সাহিত্য-চর্চা করে থাকে। গল্পরসিক বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা তাকে ভালো করে চেনেন না, তার কারণ সে সাধারণত ইংরেজীতেই লিখে থাকে—অর্থাৎ আশা রাখে এক লম্ফেই আন্তর্জাতিক লেখক হয়ে উঠবে। সে কেমন লেখে সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু আমি তার এই মনোরম স্বপ্ন-কল্পনায় ব্যাঘাত স্ৃষ্টি করতে চাই না।

অধ্যাপক বসে বসে কলম কামড়াচ্ছিল। আমি বললুম, 'প্লট খ্ঁজছ নিশ্চয়?'

'আর কি!'

'তুমিও যেমন। প্লটের জন্যে কেউ মাথা ঘামায় আজকাল? একটা সিচুয়েশান ভেবে নাও, একজন মান্ষকে ভাঙা তক্তপোশে চিত্ত করে দিয়ে তার চোখ ছড়িয়ে দাও কড়িকাঠে, মাকড়শার ঝ্ল থেকে—'

'বকো না। আমি ও-সবের মধ্যে নেই। গল্পের ব্যাপারে আমি মমের আদর্শে বিশ্বাসী। গল্পত্ব না থাকলে গল্পই হয় না—প্লট বাদ দিয়ে—'

'মম—প্লট।'—আমি ঠাট্টা করে বললুম, 'তুমি আবার সাহিত্যের অধ্যাপক। মমের শিষ্য—প্লট খোঁজা—এসব শ্নলে আজকালকার স্কুলের ছেলেরাও হেসে উঠবে। গত শতাব্দীতে বাস করছ নাকি?'

অধ্যাপক চটে উঠল। আধ্নিক গল্প সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করল তা একমাত্র অধ্যাপকজাতের খ্ঁতখ্ঁতে আর রক্ষণশীল জীবের ম্খেই শোভা পায়। শেষে চোখ পাকিয়ে আমাকে বললে, 'তোমার দৌড় তো ক' পাতা রাসিন আর মলিয়্যার পর্যন্ত—তুমি এ-সবের কী বোঝো? চা খেয়েছ, কেক গিলেছ, টাকা আদায় করেছ—এবার কেটে পড়ো এখান থেকে।'

ব্ঝতে পারলুম, লোকটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভারতবর্ষের ইংরেজী কাগজ-

মনঘন কাহিনীর উৎস

লোক আবার নিজেদের অ্যাভেন্ট্যারাস [illegible] বলে মনে করে।

বাসে চেপে লম্বা পথ পাড়ি দিতে দিতে আমার মনে হল, আধ্নিক সূক্ষ্ম এবং সাংকেতিক গল্প নিয়ে আমরা যতই উৎসাহিত হই, দেশের বারো আনা পাঠক—বিশেষ করে পাঠিকা—এখনো নিটোল প্লটের গল্প ভালোবাসেন। বেশ ঘোরালো আর গোলালো কাহিনী, টান-টান করে বাঁধা

ভাল ডায়ালগের উৎস

কৌতূহল, নানারকম ঘটনার ঘটা, উত্তেজনার বিবিধ উপকরণ—সাধারণ মানুষের এসবই এখনো ভালো লাগে। বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই, যে-কোনো একটা লাইব্রেরিতে পা দিলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যমের ভক্তশিষ্য অধ্যাপক বাংলায় সাহিত্যচর্চা করলে নিঃসন্দেহেই জনপ্রিয় হতে পারত।

তখন আরো মনে পড়ল—একটা জনশ্রুতি মনে পড়ল। বাংলা দেশের কোনো 'পপুলার' লেখক নাকি নিয়মিত প্লট কিনে থাকেন। তাঁর ক'টি বাঁধা এজেন্ট আছে, তারা প্রতি মাসে বা সপ্তাহে নিয়মিত তাঁর কাছে আসে যায়। খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো তারা ঘুরে ঘুরে প্লট যোগাড় করে, যদি বানিয়ে-টানিয়ে দিতে পারে তা হলেও আপত্তি নেই। লেখকের পছন্দ হলে—গুণানুযায়ী 'পার প্লট' তারা পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পায়; আর তেমন-তেমন জাঁদরেল গল্প হলে—অর্থাৎ যা থেকে একটা বাঘা উপন্যাস হতে পারে—এক'শ টাকা পর্যন্ত খরচ করতেও লেখকের আপত্তি নেই।

আপত্তি নেই এইজন্যেই যে, গল্পের খরচটা অন্তত দশ গুণ হয়ে ফিরে আসে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গুণ—তারপর সংস্করণে সংস্করণে (ইম্‌প্রেশান-এর আশ্চর্য বঙ্গানুবাদ) অনন্তব্যাপ্ত সম্ভাবনা তো আছেই। তা ছাড়া একটি বিশেষ মস্তিষ্কের ক্লান্তি আসেই, পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও রয়েছে, কিন্তু নেপথ্যে সংঘশক্তি থাকলে ডিম্যাণ্ড যতই থাক—সাপ্লাইও অফুরন্ত। এও এক ব্যবসা—অত্যন্ত উপাদেয় ব্যবসা—ইংরেজীতে যাকে বলে ল্যুক্রেটিভ।

চট করে আমি উপলব্ধি করলুম—যে বাঙালীর মগজে মনোহারী দোকান আর ইনস্যুরান্সের দালালি ছাড়া আর বিশেষ কোনো ব্যবসা ঢুকতে চায় না, তার পক্ষে এই এক সুবর্ণ-সুযোগ। অধ্যাপকের যাঁরা বাংলা সাহিত্য—প্লটের জন্যে যাঁরা 'ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরেন 'স্বর্গ'-পাতাল-মর্ত্য', তাঁদের কাছে—এই প্লটের ব্যাজারে অন্তত, প্লট-ব্যবসায়ীরা দেবদূতের মতোই আবির্ভূত হবেন। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে পাঁচ'শ টাকা প্রাপ্তি এবং অনেক বিনিদ্র রাতের মস্তিষ্ক নিষ্পেষণ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ—এমন সুযোগ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবেন—এরকম অল্পমতি সংসারে খুব বেশী নেই।

অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'; কিন্তু 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' নয়—বিদেশী লেখার প্লট চুরি করে এনে স্বদেশী লেখককে ফাঁসাবেন না—সততার এই গ্যারান্টিটুকু নিশ্চয় দিতে হবে। ব্যবসাটা 'প্রাইভেট লিমিটেড' হিসেবেই করুন কিংবা আরো দশটি সুবন্ধিকে জুটিয়ে 'অ্যাণ্ড কোং' হিসেবেই চালান—মটো রূপে এই কথাটা ব্যবহার করতে হবে : 'ভুলিবেন না—সাধুতাই আমাদের একমাত্র মূলধন। এখানে বিদেশী বা স্বদেশী কোনো চোরাকারবার নাই—এখানকার প্লট সর্বদাই নতুন, কোনো প্লটই দ্বিতীয়বার বিক্রয় করা হয় না।' আরো বলতে হবে, 'ক্রেতাদের নাম সর্বদা গোপন রাখা হয়—' কারণ এই নিন্দুক বাংলা দেশে প্রেস্টিজ বাঁচিয়ে চলাও এক দুরূহ সমস্যা।

এত প্লট কোথায় পাওয়া যাবে—বাঙালী হয়ে এই বালকোচিত প্রশ্ন আপনি অবশ্যই উত্থাপন করবেন না। কারণ, আপনি নিশ্চিত-ভাবেই জানেন যে, আমরা প্রত্যেকেই গল্প-বিশারদ। অন্তরঙ্গমহলে বসুন, হৃদয়ভেদী প্রেম-কাহিনী একটির পর একটি শুনতে পাবেন—গল্পের নায়কের মুখ থেকেই শুনবেন। দশজন সুধীব্যক্তি একটি প্রীতি-ভোজের আসরে জমায়েত হোন, ভরা পেট এবং পান-সিগারেটের আমেজে আশ্চর্য সব নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী—এমন কি বুক ছম-ছম করা ভূতের গল্প পর্যন্ত আপনার শ্রুতিগোচর হবে। মেয়েদের মজলিসে আড়াল থেকে কর্ণবিস্তার করুন কিংবা নিজের গৃহিণীকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োজিত করুন—শুধু গল্পই পাবেন না, একটির পর একটি 'হটকেক সেলার' আপনি আহরণ করতে পারবেন।

ভাবতে ভাবতে চটকা ভাঙল। বাসের এক সহযাত্রী আর একজনকে বলছেন, 'মাইরি, এবার দানাপুরে গিয়ে যা হল না, তা নিয়ে একখানা নবেল লেখা যায়!'

আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি। এবার পুজোর বাজারে বোধ হয় দেরি হয়ে গেল, কিন্তু আসছে বছর থেকে আমি প্লট বিক্রির ব্যবসাতেই নেমে পড়ব। শুধু ব্যাঙ্কের চাকরিতে আর—

দেখতেই পাচ্ছেন, আমি [illegible] নই। বাঙালী জাতির হিতার্থে, আপনাদেরও

পৌঁছতে বেশ দেরী হয়ে গেল। ওরা বলেছিল, গাড়ি নিয়ে এসে নিয়ে যাবে, ত্রিদিব উত্তর দিয়েছিল, 'দরকার নেই; নিজেই চলে যাব।' সময় মতোই যাবে সে ঠিক করেছিল, তবু দেরী হল। যাব যাব করেও মন কেন যেন বিকেল পড়ে আসতেই অকারণ বাধা দিচ্ছিল। এ বাধা কিসের বা কেন তা ত্রিদিব বুঝতে পারে নি, কিংবা কোনো সম্বর্ধনা নিতে তার দ্বিধার আড়ালও ছিল না; বরং এ এক গৌরব বলেই বিকেলের আগে পর্যন্ত তার মনে হয়েছে, তবু গড়িমসি করে সে যখন প্যান্ডেলের তোরণের কাছে পৌঁছল তখন তার কব্জিতে বাঁধা হাত-ঘড়িতে সময় সাড়ে সাতটা। পাক্কা এক ঘণ্টা লেট।

ট্যাক্সি থেকে নেমে লজ্জায় কি রকম এক বিশ্রী অনুভবের তাড়নায় সে দুলতে লাগল।

ভাড়া পেয়ে হুস করে ট্যাক্সি চলে গেল।

তার চকিত শব্দ হঠাৎ ত্রিদিবের চেতনা আচ্ছন্ন করল। ত্রিদিব সরকার, সংক্ষেপে টাবু—গ্রেট ফুটবলার অব বেঙ্গল—ঠিক করতে পারল না খুব পাস হল কিনা।

সামনে বিরাট প্যান্ডেল, মাইকের ভেতর ভাসমান অবিমিশ্র বহু কণ্ঠের আওয়াজ—ত্রিদিব একবার চতুর্দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল, কেমন অপ্রস্তুত লাগল। এখন কি ফিরে যাওয়াই উচিত নাকি! সর্বাগ্রে সে কথাই তাকে ভাবতে হল।

তার [illegible] থাকা ভারী পা দুখানা মাটিতে গাঁথা [illegible] মতো। না, ত্রিদিব মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে [illegible], তারপর ফিরবে মনস্থ করে [illegible] উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আরে, এই যে আপনি এসে গেছেন—' একজনের চীৎকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল

আসছে। ঘর্মাক্ত শরীরে পাঞ্জাবী ও ধুতি পরিহিত জনৈক ব্যক্তি পেছন থেকে দৌড়ে এল; 'কোথায় যাচ্ছেন স্যার? ওদিকে নয়, তারাদের রাস্তা এদিক দিয়ে।' ত্রিদিবের সামনে বিগলিত হয়ে সে পথ নির্দেশ করল। ভ্রূকুঞ্চিত ত্রিদিব বুঝতে পারল এই ব্যক্তির কথাগুলো তাকে উদ্দেশ করেই হাওয়ায় ভেসে গেল।'

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না স্যার—' ব্যক্তিটি কিছুটা অপ্রতিভ হল, 'সেই যে ঘন্টেদার সঙ্গে গিয়েছিলাম, আমার নাম হাবুল, আপনি আমার খুব ফেবারিট স্যার—যা দুখানা এ বছর ঠুকেছেন না আলাদের—' আকর্ণ হাসল হাবুল।

ত্রিদিব সময় নিল। 'আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। এমন স্তাবক তার অঢেল। সুতরাং এ নিয়ে অপ্রস্তুত হবার কিছু নেই, শুধু বিব্রত হল ধরা পড়ে গিয়ে।

'চলুন—' খানিকটা সহজ গলায় নিজের মনকে স্বাভাবিক করে বলল ত্রিদিব। আবার ঘুরল প্যান্ডেলের দিকে।

'আসুন—' বাচাল হাবুল আনন্দে বকবক করতে করতে চলল, 'খুব বাঁচালেন এ যাত্রা—ঘন্টেদা তো আপসেট মেরে চুপসে তারাসে বসে আছে। সকলে ধরে নিয়েছে আপনি আর আসবেন না। না এলে যা খিস্তি পোয়াতে হত তা কালকের সকালের কাগজেই দেখতে পেতেন. আপনার ফ্যানরা কি আস্ত রাখত মধ্য কলকাতা সম্বর্ধনা আয়োজনীর।'

কথার উত্তর না দিয়ে ত্রিদিব চুপচাপ হাটিতে লাগল।

এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে ত্রিদিব ওরফে ফুটবলের যাদুকর টাবু খুব গর্ববোধ করেছিল। স্বগত ভেবেছিল পুলকিত মুহূর্তে: তাহলে শুধু শিল্পীরাই নয়, আমরা, খেলোয়াড়রাও সম্বর্ধনার যোগ্য।

হ্যাঁ, কি না, তখনো কিছু বলে নি সে; আপন তন্ময়তায় যেমন বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রথম ডিভিসনের খেলার মাঠের গোলপোস্ট দেখেছিল, তেমনিই দেখছিল ফিনফিনে ফিনলের গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি পরিহিত আমন্ত্রণকারীকে। সঙ্গে অবাক চোখ কখন একজন বলে। কৌতুকের সঙ্গে গর্ব; ফাঁকা বল গোলের সামনে, প্রায় বাড়াব কি কিক নেব—ডেসপারেট অ্যাটেম্পট?

'আমরা খুব আশা করে এসেছি—' সবিনয়ে সেই সজ্জিত ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে পড়ল, 'আপনারা হলেন দেশের গৌরব—আপনাদের সম্মানিত করতে পারলে আমরা ধন্য হব—' কণ্ঠে যাবতী কথাটুকু বাড়িয়ে ধরল, 'না করবেন না, স্যার।'

'আপনারা' কথাটা বিশেষ শব্দক্ষেপণ হয়ে হঠাৎ সমস্ত চিন্তাবিষয়কে আলগোছে টপকে ত্রিদিবের কানে কম্পন তুলল; তবে কি আরো কেউ, কে আবার—একজন না অনেক, ফুটবলের চৌহদ্দিরই কেউ নাকি! যাকে আমার সঙ্গে ডাকা হয়েছে? গোপনে অহঙ্কার মাথা তুলল।

'আর কে কে আসছে, ফুটবলার?' ত্রিদিব প্রশ্ন করে খুব ব্যবধান থেকে তাকাল যেন।

'না, না—' ভদ্রলোক দুহাতের মুদ্রা তুলে বিস্তারিত হল, 'খেলোয়াড় শুধু আপনিই, আরেকজন আধুনিক গান করেন, মহিলা কণ্ঠশিল্পী। তারপর জলসা হবে।'

ত্রিদিব খুশী হল। সীমানার বাইরে অন্য বৃত্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। শুধু অমায়িকতার খাতিরে বলল, 'নামটা জানতে পারি কি?'

'স্বচ্ছন্দে।' ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করল, 'আসুন, আপত্তি নেই তো—' সিগারেট কেস খোলবার মৃদু শব্দ হল, 'ভদ্রমহিলার নাম বিনতা চক্রবর্তী।'

আলতো করে সিগারেট নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল ত্রিদিব, হঠাৎ অ[illegible] কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, 'মশায়, সম্বর্ধনা-ঠম্বর্ধনায় আমি যাব না, ওসব আমার ধাতে পোষায় না। সেই সঙ্গে উত্তেজনাবশে ভদ্রলোকটিকে ঠাস করে একটা চড় মারবার প্রবল বাসনা তরতরিয়ে আঙুলের মাথায় এসে থামল; চড় মেরে বলা, আমাকে অপদস্থ করার আয়োজন—কিন্তু কিছুই করল না সে: শুধু মুহূর্তের উত্তেজনা হারিয়ে পেনাল্টি মিস হয়ে যাওয়ার মতো বাড়ানো সিগারেট না নিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল ত্রিদিব।

বোকার মতন তাকিয়ে রইল আগন্তুকদের দিকে।

'কি হল?' চমকে গেল ভদ্রলোক, 'কই সিগারেট নিলেন না?'

'ও হ্যাঁ।' ত্রিদিব তাড়াতাড়ি সিগারেট তুলে নিল।

লাইটার জেবলে মুখের ওপর আলো ফেলে ভদ্রলোক আগুন ধরিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করল, 'পরিচয় আছে বুঝি?'

'কার? বিনতার...বিনতা দেবীর সঙ্গে?' অপ্রাসঙ্গিকতা সামলে নিল ত্রিদিব, হাসল; সহজ হয়ে উত্তর দিল, 'রেডিওতে মাঝে

যাবে তো গান শুনি। জোটামুটি ভালই লাগে আমার।'

ভাল লাগত কথাটা অনেক মানানসই হত, ত্রিদিব খোঁয়া গিলতে গিলতে ভাবল।

'আসছেন তো?' ভদ্রলোক আর তেমন আমল দিল না ত্রিদিবের ক্ষণপর্বের চিন্তবৈকল্যের—আসতেই হবে—' ফড়েটি বলল, 'এটুকু কষ্ট আমাদের জন্যে করতে হবে স্যার।'

দশ বছর আগে একদিন হঠাৎ যেমন কিছু না ভেবে, শুধু অদম্য উত্তেজনাবশে ত্রিদিব 'হ্যাঁ আমি খেলব' বলেছিল, ঠিক তেমনি মনের বল্গা টেনে সহজ হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'চেষ্টা করব আমি।'

'চেষ্টা নয়, আপনি কথা দিচ্ছেন।'

'ভবিষ্যতের সবটা আমাদের হাতে নয়—চেষ্টাই করতে পারি আমরা।' ত্রিদিবও ভুলে গেল নিজের কিছুক্ষণের বিচলিত মনের কথা।

'গাড়ি নিয়ে তাহলে এই হাবুল আসবে—' ভদ্রলোক তার পাশে দাঁড়ানো ফড়েকে দেখাল।

'না, না গাড়ির দরকার নেই—' ত্রিদিব বাধা দিল, 'নিজেই যাব দেখবেন।'

'সে কি কথা—' হাবুল বলে উঠল. 'আমাদের গাড়িতে গেলে...'

'বলছি তো কোনো প্রয়োজন নেই,' ত্রিদিব সরকার সিনসিয়ার জানবেন।'

সত্যি কি! ত্রিদিব নিজের কথাই ভাবল, সে কি সিনসিয়ার—সিনসিয়ারিটি অব পারপাজ যদি মৃত চামড়ার ফুটবল হয়, যাকে লাথি মারলেই মোক্ষ লাভ।

'আমরা তবে আসি।' ভদ্রলোকরা বিদায় নিল।

ত্রিদিব তখনো সিনসিয়ার শব্দটিকে যাচাই করতে লাগল।

অনুচ্চ কণ্ঠে গোপনে নিজের মনকে ত্রিদিব বোঝাল, আমি ভুল করছিলাম। ফুটবলের মাঠে গান ফিরি হয় না। গান শোনা আমি ছেড়ে দিয়েছি; তবু ফ্যাসাদ কেন? আবার কি সেই পুনরাবৃত্তি! নতুন করে বুকের গোপনে দৃষ্টিপাত।

'ওয়াণ্ডারফুল!'

ত্রিদিব ঘামে ভেজা জার্সিতে চেটো ঘষতে ঘষতে হাফ-টাইমে এসে দাঁড়াল।

অন্য সকলে ড্রিঙ্কস নিয়ে ব্যস্ত; তারি একপাশে একটু আড়ালে বিনতার সামনে দম সঞ্চয় করতে লাগল ত্রিদিব। 'কি ওয়াণ্ডারফুল?'

'তোমার গোল, সুপার্ব, সত্যি চমৎকার—তুমি এত সুন্দর গোল করো বা অভাবনীয়।' বিনতা হাসিতে পাপড়ির মতো নিজেকে উজাড় করে ছড়িয়ে দিল।

'তার চেয়েও তুমি কিন্তু সুন্দর গোল্লায় নিয়ে যেতে পারো।' ত্রিদিব চোখ বুজে ঢুইংগামে চিবতে চিবতে পরম নিশ্চিন্তে বলল।

'কি বললে!' বিনতা ভ্রূ কুঁচকে রাগের ভান করল।

'কি আবার—' চোখ এবার খুলে পূর্ণ তাকাল ত্রিদিব। 'ফুটবলের তুমি বোঝ কি!' ত্রিদিব চোখ পাকাল। 'বোঝ না বলেই আমার সবকিছুই ওয়াণ্ডারফুল।'

'বুঝি না তো বেশ, মেয়েরা ফুটবল খেলে না, বোঝে না—কিন্তু তারা অনেকেই ফুটবলারকে বোঝে।' বিনতা হাসিতে পড়ন্ত মৃদু রোদের তাপ ছড়াল। বলল, 'আমার হাতে এটা কি দেখেছ?'

'দেখছি ট্রানজিসটর সেট।'

'এবং এতক্ষণ কমেণ্টারী শুনছিলাম মশায়, কমেনটেটার বললেন, '...ত্রিদিব

সরকার ইজ ম্যাগানিফিশিয়েণ্ট, জাস্ট অল অব হিজ্ ওউন, ডজড্ পাস্ট রাইট হাফ... হি ইজ মুভিং লাইক অ্যাজ নাইফ গোয়িং থ্রু দি বাটার...অ্যান্ড এ ব্রিলিয়ান্ট ফাস্ট টাইমার পুট দি বল ইনটু দি নেট।'...ইটস্ ওয়াণ্ডারফুল! সুপার্ব! তাহলে আমি বললেই বুঝি দোষ।'

'এতখানি মুখস্ত করে ফেলেছ! ধন্য রমণীকুল, তোমরা সব পার।' রেফারীর বাঁশি বেজে উঠল। কথা শেষ করে ত্রিদিব মাঠে নেমে গেল। বিনতা আপ্লুত হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

দর্শকমণ্ডলীর মাঝখান দিয়ে সরু পথ। ত্রিদিব সেই পথেই ডায়াসের দিকে চলল। সামনে হাবুল। ত্রিদিব ওরফে টাবুকে দেখে দর্শকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। কেউ একজন মাইকে কিছু বলছিল। তার কথা মিশে গেল উল্লাসে। জায়গা ছেড়ে অনেকেই উঠে দাঁড়াল ত্রিদিবকে দেখবার জন্য। মাইকে বারংবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল : আপনারা চুপ করুন—সাইলেণ্ট প্লিজ। একটু ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শুনুন।

ঘণ্টেশ্বর রায়—বিখ্যাত ঘণ্টেদা উঠে পড়ল। কিন্তু ত্রিদিব ডায়াসে পা রাখতেই প্রথমে যে স্বাগত জানাল তার নাম বিনতা চক্রবর্তী।

'নমস্কার, আসুন। আপনার জন্য অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে না। এরা তো সব ধরে নিয়েছিল আপনি আর আসবেন না। আমি কিন্তু হাল ছাড়ি নি।'

অস্বস্তির অনুভব অনেকটা কমে গিয়েছিল। খুব স্বাভাবিকতায় ত্রিদিব হাতজোড় করে সকলকে নমস্কার জানাল।

'আপনি এই চেয়ারে বসুন—' ঘণ্টেদা বিগলিত-প্রায়।

কথা না বলে ত্রিদিব বিনতার পাশের শূন্য চেয়ারটিতে বসে পড়ল। সামান্য চুপচাপ থাকবার পর নেহাত খারাপ লাগায় ত্রিদিব কথা বলতে চাইল। অন্তত সে যে খুব সহজ বোধ করছে এই অনুভবটা সঞ্চারিত করবার বাসনা তাকে পেয়ে বসল।

'আপনি কতক্ষণ?' ত্রিদিব সামনের দর্শকদের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল বিনতাকে। কারণ বিনতার চোখে চোখ রাখতে তার মন সায় দিল না।

মাইক বলে উঠল: 'এবার যথারীতি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। যে জন্য বিলম্ব হচ্ছিল, সেই উদীয়মান, বাংলার তথা ভারতের...'

এর ভেতরেই উত্তর শুনল ত্রিদিব, 'সময় মতোই এসেছিলাম, এঁরা অযথা সাত-তাড়াতাড়ি গাড়ি করে নিয়ে এসেছেন, আপনি দেরি করিয়ে দিলেন।' বিনতা খুব স্পষ্ট জবাব দিল।

ত্রিদিব সামান্য আহত বোধ করল। খানিকটা স্বগতর মতো বলল, 'দেরি করিয়ে দিলাম। বাধ্য হয়ে বাঁ দিকে তাকাল সে। তার বাঁ দিকের বুকের ভেতরটাতেও তাকাতে পারলে বোধ হয় ভাল হত। সেখানেও সেই এক কথা; পুরনো বাতিল সাইনবোর্ডের মতো, ক্রমশ দেরি করিয়ে তুমি পিছু হটছ না তো!

বিনতা শুভ্র দাঁতে পবিত্রতা মাখিয়ে হাসল। যেন সে আঘাত করতে চায় নি। স্রেফ উপহাস করছে; 'দেরি হল না?'

'হ্যাঁ, তা একটু হল বটে।' ত্রিদিব আরেকবার নিজেকে সামলাল।

বহুদিন পর আরও এক সন্ধ্যায়।

অনেকদিন আগে এক বিকেলে খেলার মাঠ থেকে অজিতেশের বাড়ি গিয়েছিল আড্ডা মারতে। এখন সেই অজিতেশ কোথায় কে জানে! বসে বসে হাসি ঠাট্টার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ খেলার জীবনের ছক সে শোনাচ্ছিল অজিতেশকে। পাশে কোথাও গান হচ্ছিল। গান শুনে প্রার্থনার মতো লাগছিল। গান বিশেষ তাকে আপ্লুত করে না; তবু সেই সন্ধ্যার রমণীয়তায় হয়তো মন টানল। ত্রিদিব বলল অজিতেশকে, 'হ্যাঁরে কে এমন গান করছে?'

'আমার বোন, বিনতা।' অজিতেশ জানাল।

'বাঃ বেশ গায় তো!' অনেকটা নিজেকেই যেন শোনাল ত্রিদিব। তারপর দশ বছর এই গান তার পেছনে সুরের স্রোত হয়ে ঘুরে ফিরেছে।

'কি অত ভাবছেন?' বিনতা তার পুরো চোখ দুটো ত্রিদিবকে উপহার দিতে চাইল। তার ভেতর কোথায় যেন অদৃশ্য অথচ কিছু উপচে পড়া অভিমান। সেই চোখ টলটলে হয়ে বলতে চায়, আমাকে তুমি নতুন করে আপনি বলছ!

'কই ভাবছি না তো!' ত্রিদিব হাসল। লঘু হতে চাইল। কিছুটা নমনীয়। 'এই সব সভা-টভা বেশ লাগে, কি বলুন?'

বিনতার অভিমান ভাঙল না। বলল, 'আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।'

'কেমন যেন একস্পোজড্ হয়ে যাওয়া—' চাবুকের আওয়াজ সপাং করে দাগ কেটে বসল।

মাইকে বলল, 'এবার আমরা উদীয়মান ফুটবলের প্রতিভা ত্রিদিব সরকারকে সম্বর্ধিত করছি।' ডায়াসের ওপর থেকে একজন বলল, 'ত্রিদিববাবু অনুগ্রহ করে আপনি এখন এখানে এসে বসুন।' ডায়াসের ওপর কতিপয় মহিলা সমেত তখন আরো বেশ কিছু লোক উঠে এসেছে।

'এখানে দেখছি লেডীজ ফাস্ট' নিয়ম টিঁকল না—' ত্রিদিব ডায়াসের মাঝখানে যেতে যেতে লঘু মেজাজটুকু বজায় রেখেই বলল। বিনতার দিকে পেছন ফিরেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'শুনলাম খুব সম্প্রতি

বিয়ে করেছেন। একটা খবর দিলেন না পর্যন্ত।'

শুনেছেন তাহলে!' বিনতা বেশ খানিকটা দূরে থেকেই উত্তর দিল, 'সেখানেও কিন্তু লেডীজ ফার্স্ট নিয়ম খাটে নি। কাগজে পড়লাম আমার বিয়ের ছ' মাস আগেই আপনার ছেলে হয়েছে, ঠিক কিনা; ভেবেছিলাম নিজে থেকেই একবার গিয়ে কনগ্রাচুলেশন জানাতে, তারপর আর তাগিদ পেলাম না।'

মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজাল কেউ। কথা চাপা পড়ে গেল।

চীৎকার করে উঠল ত্রিদিব সরকার। পঞ্চাশ মিনিটের পরিশ্রমে একটাও গোল করতে পারে নি। তার জন্যে দলের একটা পয়েন্ট নষ্ট হল। অধিনায়ক হিসেবে এর চেয়ে আর আক্ষেপের কি আছে।

সেক্রেটারী শুধু বললেন, 'ত্রিদিব, ভেরী ব্যাড, এই মোশনে একটা ইজি পয়েন্ট লস্ট করলে।'

গলা ফাটিয়ে ত্রিদিব উত্তর দিল, 'আপনি কি ভাবছেন আমি ইচ্ছে করে স্কোর করি নি, বাকী আরো দশজন তো দলে ছিল।'

সেক্রেটারী ওর মনের বিক্ষোভ বুঝতে পেরে আর কথা না বলে পিঠ চাপড়ে চলে গেলেন। এতে ত্রিদিবের অক্ষমতার লজ্জা আরো বেড়ে গেল। অপমানে সে যেন বিক্ষত হতে লাগল।

'প্রত্যেক খেলাতেই গোল হয় না।' বিনতা কাঁধে অপরিসীম মমতার হাত রাখল। 'তুমি চেষ্টার ত্রুটি করো নি।'

একটু আগের গলার তেজ ম্লান হয়ে গেল। ত্রিদিব মাথা ঝাঁকিয়ে পরাজিত সেনাপতির ন্যায় কৈফিয়ত দিল, 'তা নয় বিনতা, দেয়ার ইজ নো এক্সকিউজ। আমি বোধ হয় ফুরিয়ে যাচ্ছি। এক্জসটেড। কেউ আমার ভেতরের শক্তি কেড়ে নিচ্ছে। দম পাচ্ছি না। মাঠে নামলে রাগ হয়। আমি বোধ হয় ফুরিয়ে যাচ্ছি। এক্জসটেড।'

'কেন বাজে বকছ, ত্রিদিব।' বিনতা সব শুনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শান্ত ধমকের সুরে বলল, 'স্টীল ইউ আর দি বেস্ট আউট সাইড রাইট অব ইণ্ডিয়া। আরো পাঁচ বছর কেউ তোমাকে এই পজিশন থেকে নড়াতে পারবে না।'

'তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ!' ত্রিদিব নিবে যাওয়া লাউইর মতো হাসল। আর কোনো কথা বলল না।

মাইকের সামনে সম্বর্ধনার উত্তরে

ত্রিদিবকে কিছু বলতে বলা হল। ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। একটা প্রীতিবোধে শরীর মন আচ্ছন্ন। গলাটা ঝেড়ে আরম্ভ করল, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়, প্রধান অতিথি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ...'

বিনতার কাছে ত্রিদিবের গলা খুব যান্ত্রিক শোনাল। যেমন সেদিন মনে হয়েছিল। আলোকোদ্ভাসিত এই মঞ্চে বসেও হঠাৎ বিনতা পুরনো এক ঘন অন্ধকারে চোখ ফেরাল।
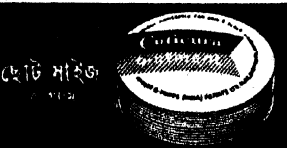
'কি টিকিট এনেছ?' বিনতা হাসিমুখে প্রশ্ন করল।

'না।' ত্রিদিব বহু দূরে থেকে জবাব দিল।

'না—কি!' বিনতা অবাক চোখে তাকাল। 'কাল চ্যারিটি, আর আজও টিকিট আনলে না। আমাকে আবার দৌড় করাবে বুঝি!'

'একটা কথা শুনবে, বিনতা?' করুণ কণ্ঠে ত্রিদিব বলল; আবেদন ঝরাল, 'শুনবে!'

'কি কথা?' আরো অবাক হল বিনতা। তাই বিস্তারিত হতে হতে বলল, 'যাই বলো টিকিট নিয়ে তোমার এ ধরনের ছেলে-মানুষি আমার ভাল লাগে না।'

'কাল তুমি খেলা দেখতে যেও না।' ত্রিদিবের কণ্ঠ কঠিন। কথাটা কানের ভেতর এক ফোঁটা বরফের জলের মতো। বিনতা ভাবল ত্রিদিব ঠাট্টা করছে না তো!

'তুমি কি বলছ ত্রিদিব!' বিনতা ঘনিষ্ঠ হল, 'তোমার খেলা, আর আমি যাব না!'

'না, যাবে না।' ত্রিদিব ভুলে গেল বিনতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। তাই আরো রুক্ষ হয়ে বলল, 'তুমি থাকলে আমি খেলতে পারি না। তোমার উপস্থিতি আজকাল আর আমাকে ফুটবলের মধ্যে অ্যাবজরভড হতে দেয় না। ইদানীং তুমি আমাকে গ্রাস করেছ, কমপ্লিটলি আই অ্যাম গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম ফুটবল।' ত্রিদিব থামল। তার দম হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসছিল, কোনো রকমে কথা শেষ করল, 'আজ ভাইটাল ম্যাচ, না জিততে পারলে লীগ হাতছাড়া হবে, আর মুখ দেখাতে পারব না।'

ত্রিদিব দুহাতে মুখ ঢাকল।

বিনতার চোখ ছলছল করে উঠল; বলল ধরা গলায়, 'বেশ যাব না।' সে দৌড়ে পালিয়ে গেল ত্রিদিবের সামনে থেকে।

অথচ এর আগে, বহুদিন আগে একদিন এই ত্রিদিব সরকারই আবেগভরে বলেছিল, 'তোমার গান আমাকে প্রচণ্ড বেগে বলের দিকে ধাবিত করে বিনতা, আমি গানে প্লাবিত হয়ে হালকা মনে খেলতে পারি।'

মাইকে তখনো গমগম করছে ত্রিদিবের গলা। '...আমার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য মাত্র একটিই—তা হল ফুটবল। যতটুকু ক্ষমতা আছে তা মিশিয়েই আমি আপনাদের খুশি করি, তার পরিবর্তে আপনাদের এই ভাল-বাসাই আমার সবচেয়ে বড় সম্মান...।'

'এবার আপনাদের সামনে যাকে সম্বর্ধিত করা হচ্ছে, তিনি হলেন আপনাদের সকলের প্রিয় গায়িকা বিনতা চক্রবর্তী...'

'যান, এবার আপনার পালা।' চেয়ারে ফিরে এসে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ত্রিদিব বেশ আন্তরিক হয়ে বলল।

বিনতা কোনো কথা বলল না। একবার শুধু গর্বিত, আত্মসন্তুষ্ট একটি পুরুষের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ত্রিদিব পেছন থেকে এতক্ষণে বিনতাকে দেখতে পেল। বিনতাকে দেখে কিন্তু তার মতো গর্বিতা মনে হল না। কেমন ম্লান, শুকনো। যেন বিনতা কিছু হারিয়ে নিঃস্বতায় ভুগছে। এই নিঃস্বতা সত্য না অকারণ এক রোগ ত্রিদিব ভাবতে লাগল বসে বসে। ফলে আত্মসন্তুষ্ট ভাবটুকু নষ্ট হয়ে যেতে থাকল।

অনেক রাত হয়েছিল। ঘরে বসে একখানা স্পোর্টর্স জার্নালের পাতা ওলটাচ্ছিল সে। এমন সময় বিনতা এসে পড়ল। বিনতা এ-ভাবে অতর্কিতে আসতে পারে ত্রিদিব ভাবে নি। তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বিনতার চোখে চোখ রেখে বলল, 'হঠাৎ!'

'তোমার খবর কি, শরীর ভাল আছে তো!' বিনতার অন্তরঙ্গ প্রশ্ন।

'ভালই আছি।' কেমন খুব সাদা-মাটা শোনাল কথাটা। ত্রিদিব দূর হয়ে উঠল।

বিনতা অবাক হয়ে তাকিয়ে খুব কাছের অথচ ঝাপসা কি যেন দেখতে লাগল। 'তুমি যাচ্ছ না কেন, কি ব্যাপার? তাই শরীর খারাপ ভেবে খবর নিতে এলাম।'

'একদম সময় পাচ্ছি না—' ত্রিদিব বলল; তাড়াতাড়ি দূরত্ব কমিয়ে আনল, 'কই তুমি বস।'

'বসবার জন্য এভাবে এতদিন অপেক্ষা করে ছুটে আসিনি। ত্রিদিব আমি ছোট খুকিটি নই—' বিনতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। 'কিসে এমন ভাবে সময় কেড়ে নিল?' বিনতা অভিমানে কিছুটা রূঢ় হল। তার গলায় স্পষ্ট সেই রূঢ়তা ফুটে বেরল।

'বিদেশ থেকে ট্রেনার এসেছে প্রি-অলিম্পিক প্র্যাকটিস হচ্ছে, নতুন ধরনের ডিফেন্সিভ খেলা শিখছি চার-দুই-চারের, প্রচণ্ড দায়িত্ব নিতে হচ্ছে—' ত্রিদিব ঢোক গিলে গিলে কৈফিয়ত দিতে থাকে; 'খুব সম্ভবত ভারতীয় দল পরিচালনার ভার আমার উপরই পড়বে। সারা দিনই টায়ার্ড থাকি।—' ত্রিদিব মুখ নিচু করল।

'এটা তোমার নতুন ধরনের ডিফেন্স তাহলে?' বিনতার ফর্সা মুখ টকটকে লাল। 'আচ্ছা ত্রিদিব, স্পষ্ট করে বলো তো, তুমি কি আমাকে ভুলতে চাইছ? অ্যাভয়েড করছ!' বিনতা সরাসরি ত্রিদিবের অন্তঃস্থল দেখবার জন্য আগ্রহী হল।

'তুমি এত সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ কেন, বিনতা।' ত্রিদিব নিজের ভেতরের অনেক কিছু গোপন করবার জন্য বলল, 'আরো কিছু সময়ের দরকার; শোন বিনতা, আমার জীবনে তুমি চিরস্থায়ী হয়েই আছ কিন্তু ফুটবল থাকবে না, ফুটবলের জন্যই আরো কিছু সময় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর কত, বড় জোর বছর দুয়েক...'

'তাহলে আমাকে এতদিন যা বলে এসেছ তা সব মিথ্যে!' বিনতা আজ নমনীয় কোনো নারী নয়, দৃঢ় সংকল্পে স্থির কোনো মহিলা। 'তোমার ভালবাসা ফুটবলেই

[illegible], বাঃ বেশ। [illegible] জল না, মেয়েদের আশীর্বাদ [illegible] বসে [illegible] অনেক ভালো।'

'আসলে কি হবে বলো—' ত্রিদিব তার চোখ [illegible] সরিয়ে নিয়েছে বিনতার দিক থেকে। কিছুটা সময় সংগ্রহ করবার জন্য একটা সিগারেট ধরাল, বলল তারপর, 'অন্যেও আমার উপায় নেই। তোমাকে ভালবাসি বিনতা, তাই তোমার কাছে আমি আরো কিছু সময় দাবি করছি। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।'

'চলি।—' ঠাণ্ডা উত্তাপহীন গলায় বিনতা বলল।

'সেকি!' ত্রিদিব পুনরায় বিনতার চোখে চোখ রাখল। 'আর কিছুই বলবে না!'

'না—' নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিয়ে বিনতা ঘুরে দাঁড়াল। 'বলবার প্রয়োজন আজ ফুরিয়ে গেছে। তোমাকে ধন্যবাদ এই ভদ্রতাটুকুর জন্য।' উপচে পড়া কান্না চেপে দিয়ে বিনতা ছুটে চলে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে থাকল ত্রিদিব।

ত্রিদিবের বিয়ের পর দু বছর কেটেছে। সে সুখী তার স্ত্রী নিয়ে। দু বছর আগে বিয়ে করার তেমন কোনো পরিকল্পনা তার ছিল না। অসহায় মনের তাগিদে এক রকম বাধ্য হয়েই মনকে বাঁধতে চেয়েছে। বিয়ের পূর্বে প্রতিটি খেলায় এক মর্মান্তিক বিষয় তাকে পীড়া দিয়েছে। এবং শুধু নামের জোরেই সে চান্স পেয়েছে, অন্য কেউ হলে নির্ঘাত টিম থেকে বাদ যেত।

প্রতিবার খেলতে নামার মুহূর্তে পর্যন্ত ত্রিদিব ত্রিদিবই। খেলা শুরু হবার সংগে সংগেই ত্রিদিব বদলে অন্য কেউ হয়ে যেত। নার্ভাস রুগী। তখন তার খেলা দেখে কে বলবে এই ত্রিদিবকেই ইণ্টারন্যাশনাল খেলোয়াড় ভেবে সবাই নাচত।

এক অদ্ভুত কাণ্ড! রাইট আউট বরাবর কর্নারের দিকে বল নিয়ে দৌড় শুরু করলেই মনে হত, বলটা বিনতা হয়ে বলতে বলতে ছুটেত, 'আমি চলি।' কোনো রকম করে তাকে আয়ত্তে আনতে পারত না ত্রিদিব। মিসটাইম আর মিসকিকের ফলে মাঝে মাঝে খেলা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করত।

অথচ খেলার মাঠ বাদে এমনি অন্য সময় কিছু নয়; কোনে শূন্যতা নেই। অপূর্ণতার হাহাকারও নয়। বরং বিনতার গান বর্জন করে মনে হত শরীরটা আগের তুলনায় হালকাই। খেলতে নামলে যখন-তখন একটা হ্যাটট্রিক সে করতে পারে।

মাইকে একজন পরিচয় বলছে; বাংলা দেশের যে ক'জন সুধাকণ্ঠী গায়িকা আছেন বিনতা চক্রবর্তী তাদেরই একজন। আজ এই সভায় তাকেও সম্বর্ধিত করতে পারার জন্য আমরা নিজেরা মনের মধ্যে এক বিশেষ পরিতৃপ্তি অনুভব করছি।

পরিশেষে বিনতাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করল সবাই। অভিনন্দনের উত্তরে গায়িকা যদি তার গান দিয়ে সবাইকে আনন্দিত করে। কিন্তু বিনতা হঠাৎ রাজী হল না। সে বলল, 'আজ আর গান নয়, আমার গান প্রচুর শুনেছেন আপনারা, তাছাড়া একটু বাদেই এখানে গানের জলসা হবে সারারাতব্যাপী। তাই আজ আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অভিনন্দনের জন্য, আমাকে এতবড় সম্মান দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন। পরিশেষে বলি, আমি শিল্পী, খেলোয়াড় নই; খেলোয়াড়রা চান্সে আপনাদের মন মাতাতে পারেন, তাৎক্ষণিক তাদের এই আনন্দদান অলীক কিনা জানি না; তবে আমাদের শিল্পীদের সংগে তাঁদের এক করে দেখা বা দেখানোটা কেমন দৃষ্টিকটু লাগে। তাই আমার অনুরোধ এরপরে আপনারা এ-রকম আয়োজন করবেন না।' কথা শেষ করে বিনতা চেয়ারে এসে বসল।

ত্রিদিব বিমূঢ় হয়ে শুনল। ভাবতে লাগল, বিনতা হঠাৎ শেষের কথাগুলো বলল কেন? সে কি এখনো আমাকে সহ্য করতে পারছে না। মনের অপ্রকাশ জ্বালার আগুনে বিনতা বোকার মতো অমন কথাগুলো বলল। ত্রিদিব ভাবল খুব একটা কড়া উত্তর দেয়, কিন্তু সংযত করল মানসিক অস্থিরতাকে, *নিজেকে ছোট করার কোনো মানেই হয় না। ঠাণ্ডা হতে হতে ত্রিদিব ভাবল; আর সত্যিই জীবনে এখন আমরা বহু দূরের যাত্রী: সেখানে কোনোদিন নতুন করে কোনো সম্পর্কই আমাদের আর হবে না;* নিবে যাওয়া যৌবনে গাম আর বল এক হবে ভাবা গিয়েছিল, কিন্তু গানের কোনো লিমিটেশন নেই, ফুটবলের নিয়ন্ত্রণই আসল, স্পীড কন্ট্রোল করে দৌড়তে হয়—বল ফস্কে গেলে অর্থহীন হয়ে যায় সবকিছু। বিফলে যায় সমস্ত উদ্যম।

ত্রিদিব বলল, 'এখন কোথায় আছেন?'

বিনতা নির্জীব গলায় উত্তর দিল, 'বালীগঞ্জ প্লেসে।—আসবেন না একদিন যদি সময় হয়।'

[illegible] গিয়েছে [illegible] ছিল।' ত্রিদিব হাসল, 'শুধু [illegible] নয়, অন্যেরাও ভুলে যায়।'

'ভোলে কি?' [illegible] চোখে বিনতা তাকাল, 'আমরা [illegible] অনেক দূরে চলে গেছি, তাই না—কিন্তু একই পৃথিবীতেই তো আছি।' নিজের করতল দেখল সে, আসলে চোখ সরিয়ে নিল, 'কিছু কিছু স্মৃতি অন্তর্লীন থেকে যায়, দশজনের সামনে বার করলে তাতে আবার নখের আঁচড় লাগতে পারে।'

'তুমি আমাকে হয়তো ভুল বুঝেছ বিনতা—' ত্রিদিব হাসতে চাইল, এতক্ষণে তাকে খুব করুণ ও অসহায় দেখাল।

'তুমি কেন ত্রিদিববাবু', বিনতা বাধা দিল, 'একজন পরস্ত্রীকে আপনিই ভাল শোনাচ্ছিল।...আর তাছাড়া—'

মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, 'এবার সম্বর্ধনার পর আমাদের অন্য অনুষ্ঠান শুরু করার আগে দশ মিনিটের জন্য বিশ্রাম।

হঠাৎ ত্রিদিব উঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টেশ্বরের কাছে গেল। 'আমাকে যদি ছেড়ে দেন, আমার একটু কাজ ছিল।...'

'নিশ্চয়ই—' বিগলিত ঘণ্টেশ্বর বলল, 'আপনাদের আর আটকাব না, দু মিনিট বসুন, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দুজনকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সে কাউকে ডাকবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ত্রিদিব বাধা দিল। তার মন [illegible]টিও আর দাঁড়াতে চায় না। [illegible] বলল, 'ব্যস্ততার কিছু দরকার নেই, আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব, এর জন্যে মনে কিছু করবেন না।' কথা শেষ করে ত্রিদিব ঘুরে দাঁড়িয়ে বিনতাকে বলল, 'চলি, বিনতা দেবী, আবার দেখা হলে খুশি হব।'

ডায়াস থেকে নেমে দৌড়ল ত্রিদিব। এক রকম পালিয়েই গেল বলতে গেলে। যেন সে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ প্রাণ নিয়ে ছুটল। বিনতাকে গান দিয়ে ভাবা গিয়েছিল, সে তা নয়, তার বাইরেও আরো কিছু।

বিনতা খোলা চোখে প্রায় মাতালের মতো পলায়মান ত্রিদিবকে দেখল। আর সংগে সংগে তার হাসি পেল ফাঁপা প্রেমের স্মৃতির এক বেলুন ফেটে যাওয়া দেখে।

ত্রিদিব সরকার সেদিন রাত্রে ঘুমল ভাল-ভাবেই। অবশ্য সন্ধ্যায় সম্বর্ধনান্তে তাকে কিছু মদ খেতে হয়েছিল। সকালে শরীর বেশ টান-টান। ছেলেটাকে আদর করল। বিকেলে সেদিনও খেলা ছিল। মাঠে নেমে সেই অনবদ্য ফুটবলের কবিতা। বাংলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ আউট সাইড রাইট সেদিনও যথারীতি নির্ভুল গোল করল।

বারো

কুমকুমের চিঠি পাবার পর অবনী বিরক্ত, ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্ন হয়েছিল। মেয়ের ওপর যতটুকু বিরক্ত হয়েছিল তার শতগুণে বেশী ললিতার ওপর। অবনী যা ফেলে এসেছে, যার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই, যার সবটাই তিক্ত, কুমকুমের চিঠি আবার তা জোর করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কুমকুম তাকে পুরোনো তিক্ততার মধ্যে টেনে নিয়ে যাক অবনীর তা পছন্দ হয় নি। মেয়ের ওপর এক চাপা অভিমানও তার ছিল। মার দেখাদেখি এবং মার শিক্ষায় সে বাবাকে অনাত্মীয় ভাবতে শিখেছিল, ললিতার মুখে শুনে শুনে চার বছরের মেয়েও এক সময়ে তাকে 'পাজি' 'বজ্জাত' বলেছে। তার মুখের অর্ধেক কথা তখনও স্পষ্ট হয় নি। আরও কত কি বলত। আজ সেই মেয়ের হঠাৎ বাবার ওপর টান উথলে উঠল কেন?

কুমকুমের ওপর ওই বিরক্তিটা অবশ্য সাময়িক, অবনী যথাসময়ে ভুলে যেতে পারল। ভুলতে পারল না ললিতাকে। চিঠিটা অহরহ তাকে খোঁচা দিচ্ছিল, এবং ললিতার ওপর ঘৃণা ও আক্রোশ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। ললিতার সুখ-সুবিধে ফুর্তির জন্যে সে মাসে মাসে অতগুলো করে টাকা পাঠায় না। মেয়েকে ললিতা উপযুক্তভাবে প্রতিপালন করবে এটা তাদের শর্ত ছিল। ললিতা মেয়েকে অবনীর কাছে দিতে পারত, দেয় নি স্বার্থের জন্যে। তার ভয় ছিল, অবনী মেয়ে পেয়ে গেলে, যে কোনো সময়ে ললিতাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিতে পারে; যা সে ভেবেছিল, অবনী যা পাঠাবে তা এত সামান্য যে ললিতার নামমাত্র ভরণ-পোষণ হতে পারে। মেয়েকে নিজের অধিকারে রেখে ললিতা আর্থিক উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল মাত্র, যেন কুমকুমকে সে জামিন হিসেবে রেখে নিয়েছিল।

অবনী প্রাথমিক [illegible] ললিতাকেই চিঠি লিখতে গিয়েছিল। পরে মনে হল, ললিতাকে চিঠি লেখাটা বোকামি হবে, কুমকুম লুকিয়ে বাবাকে চিঠি লিখেছে এটা জেনে ললিতা মেয়ের ওপর প্রসন্ন হবে না। কুমকুমকে সরাসরি চিঠি লেখা বা কিছু টাকা পাঠানোও উচিত নয়, ললিতা জানতে পারবে, কুমকুম ধরা পড়ে যাবে। ললিতা এখন তার বাবার কাছে থাকে, সেখানে তার বাবা, ভাই, বোন এদের দৃষ্টি এড়িয়ে কুমকুমকে কিছু করা যাবে না—একটা চিঠি লেখাও অসম্ভব। ললিতা মেয়ের ওপর আক্রোশবশে যে কোনো রকম নির্যাতন করতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।

অনেক ভেবে অবনীর মনে হয়েছিল, কমলেশকে একটা চিঠি লেখাই সবচেয়ে ভাল। কিংবা ধ্রুবকে। ধ্রুব কোনো দিনই ললিতাকে পছন্দ করে নি। তার স্বভাবটাও গোঁয়ারের মতন। ললিতাদের বাড়ি গিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধাতে পারে, তাতে লাভ হবে না। তার চেয়ে কমলেশকে লেখাই ভাল। কমলেশের সঙ্গে ললিতার পরিচয় পুরোনো, অবনীর সঙ্গে ললিতার পরিচয় করিয়ে দেবার আগেও ললিতাদের বাড়িতে তার আসা-যাওয়া ছিল। কমলেশের স্বভাব ঠাণ্ডা, ভেবেচিন্তে গুছিয়ে কাজ করতেও পারে। তাছাড়া কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে অবশিষ্ট যেটুকু সম্পর্ক তা এখনও কমলেশের সঙ্গেই আছে। মাঝে মাঝে কমলেশের চিঠি পাওয়া যায়। ধ্রুবর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগও আর নেই।

কমলেশকেই চিঠি লিখেছিল অবনী। লিখেছিল, কমলেশ যেন একবার ললিতাদের বাড়ি যায়, ললিতা এবং কুমকুমের সঙ্গে দেখা করে; দেখা করে আড়ালে কুমকুমকে বলতে বলেছিল যে, অবনী তার চিঠি পেয়েছে, কিন্তু চিঠি লিখলে পাছে তার মা-মাসিরা জানতে পারে তাই লিখল না। কুমকুম যেন তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে, মন খারাপ না করে। কমলেশকে কুমকুমের জন্যে দু-চারটে ভাল জামা কিনে নিয়ে যেতেও লিখেছিল অবনী, জামা, টফি, জুতো। অবনী বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছিল, ললিতা যেন কুমকুমের চিঠি লেখার কথা জানতে না পারে। কমলেশকে এ-কথাও অবনী খোলা-খুলি লিখেছিল যে, ললিতা যদি মেয়ের প্রতি যত্ন না নেয়, তবে সে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়ে ললিতাকে শিক্ষা দেবে। আর কুমকুম? দরকার হলে কুমকুমকে কোনো হোস্টেলে রেখে দেবে অবনী।

চিঠিটা পুজোর মধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছিল অবনী, টাকাও পাঠিয়েছিল। অবশ্য কমলেশকে টাকা না পাঠালেও চলত, বলা যায় না সে হয়ত একটু অসন্তুষ্টই হবে। ললিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সময় কমলেশ

অনেক করে বলেছিল, মেয়ে ছাড়িস না—মেয়েটাকে একেবারে নষ্ট করে দেবে। তোরই মেয়ে তো।

কমলেশের কাছ থেকে চিঠির জবাব আসবার আগেই বিজলীবাবুর কাছে অবনীকে স্বীকার করে নিতে হল কলকাতায় তার মেয়ে আছে, স্ত্রীও আছে—যদিও তাদের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই।

বিজলীবাবু যে কি বুঝেছিলেন কে জানে, স্ত্রী অথবা মেয়ের সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করেন নি। অথচ অবনী বেশ বুঝতে পারছিল, বিজলীবাবু যেন কোথায় একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়-বোধ নিয়ে রয়েছেন, হয়ত নিজে সন্তানহীন বলে অবনীর সন্তানের প্রতি এই উপেক্ষা তাঁর কাছে নির্মম মনে হচ্ছিল। অবনীর এক-সময়ে মনে হয়েছিল, বিজলীবাবু হয়ত অনুমান করছেন, স্ত্রীর চরিত্র এবং সন্তানের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে অবনীর কোনো সন্দেহ আছে, সেই সন্দেহবশে অবনী স্ত্রী কন্যা ত্যাগ করেছে। বিজলীবাবু অন্য আর কি ভাবছেন, ভাবতে পারেন অবনী জানে না। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, বিজলীবাবুর কাছে অবনী ইদানীং কেমন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিল। যেন তিনি অবনীর অত্যন্ত গোপন কিছু জেনে ফেলেছেন যা সে জানাতে চায় নি। ভদ্রলোক তার ভেতরে কোন অবনীকে দেখছে, মাঝে মাঝে এই বিরক্তিকর চিন্তা এসে অবনীকে অন্যমনস্ক ও কুণ্ঠিত করছিল। অন্তত, বিজলীবাবু যদি ভাবেন, কুমকুম জারজ—এই ভয় ও আশংকা অবনীকে কেমন পীড়িত ও লজ্জিত করছিল। আত্মসম্মান ও কুমকুমের মর্যাদার জন্যে অবনীর কি করণীয় সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

নিজের শৈশবের দিকে তাকালে অবনী যাদের দেখতে পায় তাদের কেউই তার কাছে সম্মানীয় নয়। বাবা এবং মার মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক কি ছিল অবনী অনেক দিন তা বুঝতে পারে নি। পরে বুঝেছিল। বুঝে তার ঘৃণা হয়েছিল, মার ওপর, বাবার ওপর, নিজের ওপর। বাবার মতন অপদার্থ মানুষ হয়ত সংসারে কিছু কিছু থাকে, কিন্তু তার বাবা ছিল সমস্ত রকমে অপদার্থ। নিজের মেরুদণ্ডকে কখনো সোজা করে নি, করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল; কখনো স[illegible]নো হয়ত অসহ্য হলে বাবা ভেবেছে এক[illegible] নড়ে চড়ে উঠবে, কিন্তু এ-রকম কিছু হবার উপক্রম হলেই যেন মা জানতে পারত, এবং খুব সহজেই মা বাবার সেই অসাড় রুগ্ন মেরুদণ্ডকে আবার বেঁকিয়ে দিত। মার কাছে বাবার কোনো অস্তিত্ব ছিল না; কখনো সখনো মনে হত, সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে বাবাকে নেশাখোর নির্জীব বাঘের মতন এনে দাঁড় করিয়ে মা চাবুক হাতে খেলা দেখাচ্ছে। মা কখনও সেই চাবুক ছুঁড়ত না, এমন কি তার শব্দও শোনা যেত না, অথচ বাবা মার খেলায় কৌতুহলটুকু যোগান দিত, প্রয়োজনে মার ইঙ্গিতে বাবা হুঙ্কারও করত। দর্শকের কাছে যেন মার কৃতিত্বের জন্যে এই হুঙ্কার প্রয়োজন ছিল। মাকে এসব দিক থেকে অসামান্য মনে হত, মনে হত মার অসাধ্য কিছু নেই। মার স্বভাব যে কত প্রখর ছিল এবং ব্যক্তিত্ব কী উগ্র তা বাবার পাশে মাকে দেখলে বোঝা যেত। অবনী ছেলেবেলায় মাকে ভাল বুঝত না, পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছে মা সমস্ত কিছু গ্রাস করে আছে। মার ব্যক্তিত্বের কাছে বাবা নিষ্প্রভ। সংসারে যে কোনো জিনিস মা নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে দাবিয়ে
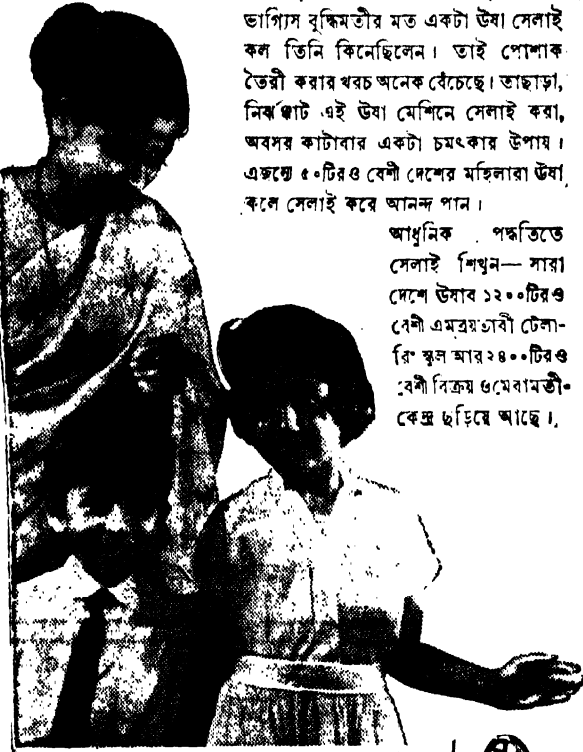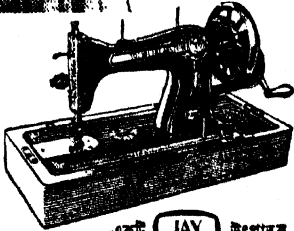
রেখে দিতে পারত। অবনীও ঘাড় তুলতে সাহস করে নি, কোনো সংশয় প্রকাশ করতে ভরসা পায় নি। বাবার নির্জীবতা সম্পর্কে তার ঘৃণা ধরে গিয়েছিল, এবং কখনও নিজের ভাল মন্দে বাবাকে ডাকে নি, সে অভ্যাস তার হয় নি, মা করতে দেয় নি।

বাবার বিকৃত যৌনাচারে আসক্তি ছিল, এবং অবলম্বন ছিল নেশা। বাবা নানারকম নেশা করত। নেশা এবং মোত্তরামির জন্যে মা বাবাকে পয়সা দিত। বাবা হাত পেতে নিত। বাবার নিজস্ব কোনো উপার্জন ছিল না। একদা পৈতৃক ধনে বাবা যত না ধনী ছিল, তত অভিজাত ছিল। মা বাবার এই ধন এবং আভিজাত্য নিজের কুক্ষিগত করে। বাবা থিয়েটারের মেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর মা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎকে বোকামি করে পায়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নি, বুদ্ধিমতীর মত গ্রহণ করেছিল। পরে অবশ্য মা থিয়েটার ছেড়ে দেয়, কিন্তু মা পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট করে নি। তাদের পরামর্শ যে সব সময় মা নিত তা নয়, তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মা অর্থের ও আভিজাত্যের সদ্ব্যবহার করত। এই অর্থে,

তারা প্রতিপালিত হয়েছে। মা চরিত্র-বিলাসী ছিল, অনেক যুবকের প্রতি মার অনুরাগের বাহুল্যও ছিল। মৃত্যুর আগে বাবা মার ওপর অবিশ্বাস ও আক্রোশবশে একবার মাত্র হঠাৎ নিজের সমস্ত নির্জীবত্ব ভুলে মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়েছিল, পারে নি, বরং এমন আঘাত পেয়েছিল যে বাবা সেই আঘাত সামলাতে পারে নি। বাবা মারা গেল। মা তারপরও আপন জ্যোতিতে জ্বলেছে। শেষ পর্যন্ত মার এই জ্যোতির অকস্মাৎ অবসান ঘটল। মামলায় মকদ্দমায় জড়িয়ে, ব্যর্থতায়, দুশ্চিন্তায় মা মারা যায়; মার তখন নিঃস্ব অবস্থা। অবনী ততদিনে বড় হয়ে গেছে, যুবক; এঞ্জিনিয়ারিং পড়াও শেষ করে এনেছে। মার মৃত্যুতে সে দুঃখিত হয় নি, বাবার মৃত্যুর সময় কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিল, কারণ তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, এবং মা সমারোহ করে বাবার সংকার করিয়েছিল। সমারোহের প্রভাবে বাবার মৃত্যু এত বড় দেখিয়েছিল যে অবনী চোখের জল না ফেলে পারে নি। বাবার শেষ অবস্থায় অবনী প্রায় নিঃসন্দেহে জানতে পারে, মার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক থাকলেও বাবার সঙ্গে নেই। অবশ্য মা সেই

সাজানো-বাবার প্রাধান্য অবনীকে দিয়েই পুরোপুরি করিয়েছিল। ওই বয়সে, কথাটা জানা অথবা সন্দেহ করার পরও অবনীর কিছু করার ছিল না। মার চোখের সামনে সে এত তুচ্ছ ছিল যে তার সাধ্য ছিল না চোখ তুলে মার দিকে তাকায়। কাজেই ইতর-বিশেষ কিছু হয় নি, যেভাবে সে বেড়ে উঠছিল, মাকে যে অবস্থায় দেখত তাতে সব কিছুই তার গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

মার স্বভাব, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, অহংকার—এসব যেমনই হোক, একটা বিষয়ে মার কোনো রকম কার্পণ্য ছিল না। শেষ দিন পর্যন্ত মা অবনীকে কোনো রকম আর্থিক অভাব বা দুঃখ কষ্ট সাধ্যমত বুঝতে দেয় নি, ছেলেকে মা সচ্ছলতার মধ্যে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শেখানোতেও ত্রুটি রাখে নি।

মার মৃত্যুর পর অবনী এক অদ্ভুত রকমের মুক্তি পেল। পায়ে শেকল পরানো পাখি দীর্ঘকাল বন্দী থাকলে তার পা যেমন অসাড় হয়ে আসে, অবনীও সেই রকম প্রথম দিকটায় তার মুক্তিকে ভয়ে ভয়ে দেখেছে, সে সাহস পায় নি পা বাড়াবার। তারপর সংশয় দূরে হলে সে পা বাড়িয়েছে, কিন্তু বেশি দূর নয়। কেমন করে যেন মার প্রভাব তার রক্তে মিশে গিয়েছিল, মনের কিছু যেন কুঁকড়ে রেখেছিল, অবনী তা অগ্রাহ্য করতে পারত না। শেষ পর্যন্ত সে বেপরোয়া মরিয়া হয়ে নিজের স্বাধীনতার জন্যে লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু সে যেখানে পা রাখল সেটা খানিকটা তার সাজানো-বাবার জায়গা, খানিকটা মার। একদিকে সে একা, নিঃসঙ্গ, নিগৃহীত, ক্লান্ত, বিরক্ত; অন্য দিকে সে তীব্র, নির্দয়, সুখান্বেষী, ভোগবিলাসী। নিজের মেরুদণ্ডকে সোজা করতে গিয়ে সম্ভবত সে সামঞ্জস্য ভুলে গিয়েছিল, এবং এমন ভাবে তার মেরুদণ্ড সোজা করল যেটা স্বাভাবিক নয়, ফলে সেই কৃত্রিম অনভ্যাস দৃঢ়-মেরুদণ্ড হল তার ঔদ্ধত্য।

নিজের শৈশবের এই স্মৃতি সুখের নয়, কাম্যও নয়। অবনী চায় নি, কুমকুমের শৈশবও তার বাবার মতন সিসের চৌবাচ্চার মধ্যে কাটে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্যে খানিকটা বাতাস সেখানে আসার মতন ব্যবস্থা থাকবে হয়ত, কিন্তু আর কিছু না। নোংরামি, কদর্যতা, গ্লানি, ইতরতা ছাড়া কুমকুম আর কিছু পাবে না। স্নেহ, ভালবাসা, কোমলতা—এসব কিছু নয়। অথচ ললিতা কুমকুমকে ছাড়ল না। অবনীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। যে কোনো মূল্যে সে, বুঝি তখন মুক্তি চায়। ললিতাই শেষ পর্যন্ত জিতে গেল।

কমলেশের জবাব আসতে সামান্য দেরী হল।

কমলেশ লিখেছে, সে কলকাতায় ছিল না, দিন তিনেকের জন্যে পুরী গিয়েছিল, ফিরে এসে অবনীর চিঠি পেয়েছে। পেয়ে ললিতাদের বাড়ি গিয়েছিল। প্রথম দিন ললিতার দেখা পায় নি, পরে আবার গিয়ে দেখা করেছে।

"অনেক দিন পর ললিতাকে দেখলাম", কমলেশ লিখেছে, "পাঁচ ছ' মাস পরে। আগে পথে ঘাটে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হত, আজকাল হয় না, আমি যে বাড়ি বদলেছি তা তো তুই জানিস। কুমকুমের কথা আগে বলি। এখন সে ভাল আছে, তবে শরীর খুব রুগ্ন। তাকে আড়ালে যতটুকু বলার বলেছি, বেশী বলা উচিত হত না। জামাটামা কিনে দিয়েছি, কিন্তু ললিতার কাছে একথা লুকোনো যায় নি যে, তোর কথা মতন আমি কিনে নিয়ে গিয়েছি। কুমকুমের ওপর ললিতা সন্দেহ করে নি, ভেবেছে তোর খেয়াল হওয়ায় তুই কিনে দিতে বলেছিস। ব্যাপারটা এর বেশী কিছু গড়ায় নি।...ললিতার বিষয়ে কয়েকটা কথা

জানাচ্ছি, তোর ইণ্টারেস্ট থাক না থাক কথাটা জেনে রাখা উচিত। ললিতা আজকাল অবাঙালী এক সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় থাকে, সেখানে একটা চাকরিও করে শুনলাম। আমার খুবই সন্দেহ; ললিতা রীতিমত মদটদ খেতে শুরু করেছে; তার চোখ মুখ দেখলে সে-রকম মনে হয়, কথাবার্তা শুনলেও। শরীর ভেতরে ভেতরে নষ্ট হয়ে গেছে, ওপরে তা ঢাকা দিয়ে এ-সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েরা যা করে বেড়ায় তাই করে বেড়াচ্ছে। মেয়ের সম্পর্কে তার তেমন কোনো উৎসাহ নেই, দায়-দায়িত্বও দেখলাম না। মেয়ের ওপর যত্ন নিতে বলায় বলল, এর বেশী যত্ন নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবার কথা আমি বলি নি—আমার পক্ষে সেটা বলা ভাল দেখাত না।...আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে তোর নিজের কিছু লেখাই ভাল। তবে, ললিতার কাছে মেয়ে রাখা যে একেবারেই উচিত নয় তা আমি বলতে পারি।...এ ব্যাপারে যা ভাল হয় করিস।"

কমলেশের চিঠি পড়ে অবনী বুঝতে পারল না, সে কি করবে, কি তার করা উচিত।

ললিতাকে চিঠি লিখতে তার আগ্রহ হল না। কমলেশের কাছে খবর পেয়েই যেন সে লিখছে এভাবে লেখা যেত, (কুমকুম আড়ালেই থাকত) কিন্তু অবনীর তেমন কোনো ইচ্ছাই হল না। ললিতার ওপর তার ঘৃণা আর নতুন করে বাড়ার কিছু নেই, সে মদ খাক, আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে শোয়া-বসা করুক তাতে অবনীর কিছু আসে যায় না। এটা সে আগে করত, পরে করবে। ললিতার স্বভাব বদলাবে এমন প্রত্যাশা সে কখনও করবে না। ললিতার জন্যে তার মাথাব্যথা অনাবশ্যক। কিন্তু কুমকুম? কুমকুমের কি হবে?

হয় কুমকুমকে তার মার হাতে ছেড়ে দিতে হয়, যেভাবে ললিতা তাকে মানুষ করবে সেই ভাবেই সে মানুষ হবে, (অবনী যেমন হয়েছিল। তবে, অবনীর মার সঙ্গে ললিতার তুলনা চলে না, অন্তত সন্তান পালন সম্পর্কে নয়) আর না হয় কুমকুমকে ললিতার কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু কোথায় আনবে? এখানে? এখানে আনা কি সম্ভব? কে দেখবে তাকে? হঠাৎ তার মেয়ে এল কোথা থেকে এই প্রশ্ন এখানের মানুষগুলোকে চঞ্চল ও উত্তেজিত করবে। কুমকুমকে পাঁচ রকম প্রশ্ন করবে লোকে। তা ছাড়া কুমকুম যে তার কাছে আসতে চাইবে এরই বা স্থিরতা কি! ললিতা নিশ্চয় সহজে মেয়েকে ছাড়তে চাইবে না।

অনেক ভেবে অবনী স্থির করল, এখন যেমন আছে কুমকুম তেমনই থাক। কমলেশ ললিতার সঙ্গে দেখা করার পর হয়ত ললিতা কিছু আঁচ করতে পারছে। সে যথেষ্ট চালাক। মেয়ে হারানোর অর্থ ললিতার মাসে মাসে বাঁধা রোজগার হারানো। হয়ত সেটা সে অনুমান করে কুমকুমের ওপর কিছুটা নজর দেবে।

আরও কয়েক মাস দেখা যাক। যদি ললিতা না শুধরোয় তবে কুমকুমকে কোনো ভাল মিশনারী মেয়েদের হোস্টেলে রেখে দিতে হবে।

পরের চিঠিতে, অবনী স্থির করে নিল, কমলেশকে লিখতে হবে কলকাতার কোনো উকিলের কাছে গিয়ে ডিভোর্স সম্পর্কে পরামর্শ নিতে।
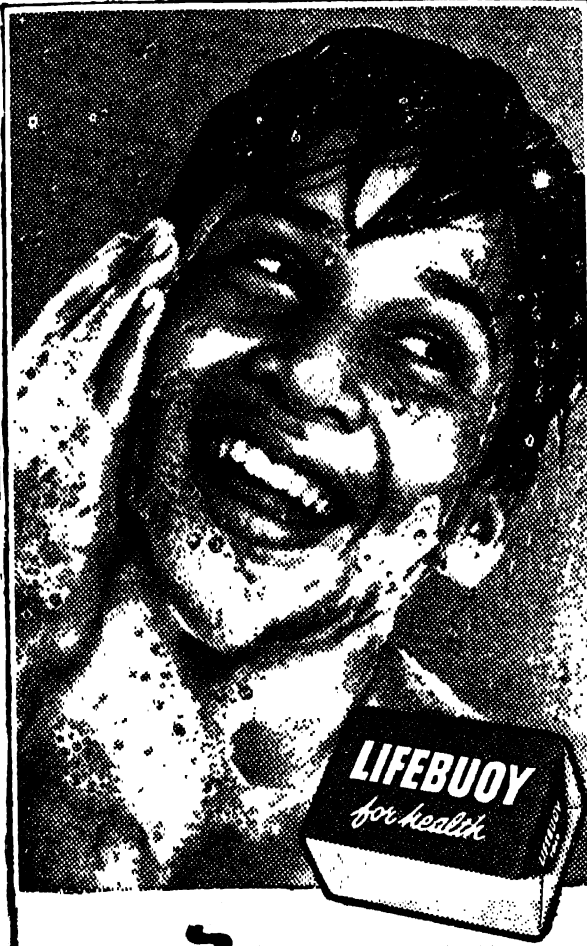
(ক্রমশ)

ঘড়ি-ঘড়ি আরাম
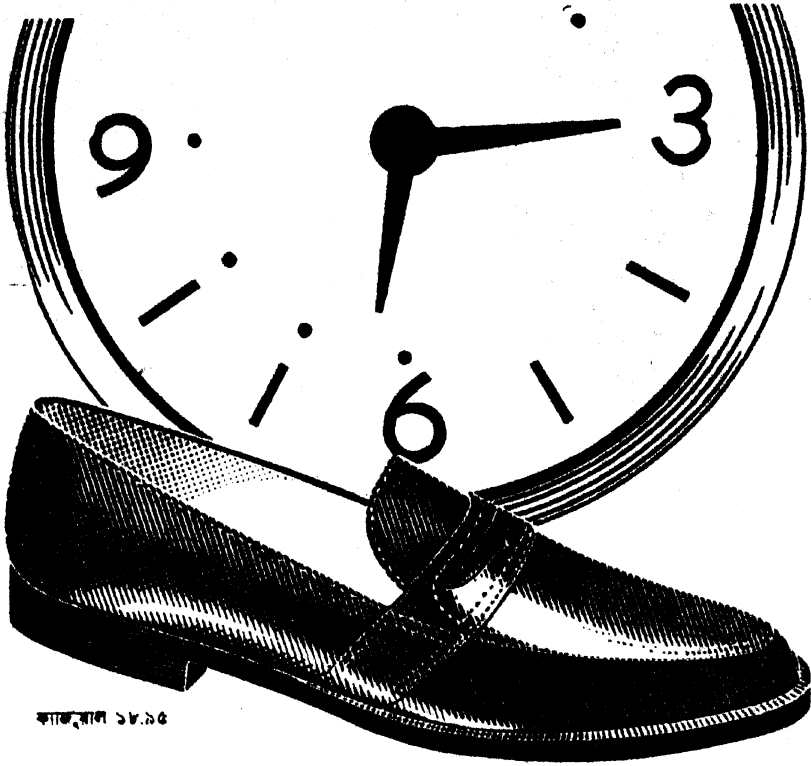
শুধু আরামই নয়, তার সংগে রুচিসম্মত নকশা যে কেতাদুরস্ত পুরুষের কাম্য, তাঁর কাছে বাটার এই জুতো এক অভিনব আবিষ্কার। কারণ, দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে এই জুতোয় : নির্মাণের নতুনতম পদ্ধতি, আর তার সংগে আধুনিক নিয়মনিষ্ঠ নকশা। তার উপর এমন সুঠাম চামড়ায় এর গঠন যে পুরুষের পায়ে টিকে থাকবার ক্ষমতা এর অসীম, অথচ এমনই নমনীয় যে চলাফেরাতে পরম আরাম অনেক ঘড়ি পেরিয়ে। আজই কিনে দেখুন একজোড়া।

বরবর্ণিনী

গয়া

মনোমোহিনী

দীর্ঘাকার
নতুন
আধারে
নতুন
ফর্মুলায়
তৈরী

সুবাসিত ট্যালকম প্রস্তুতকারক
গয়া
প্যারিস
লণ্ডন
নিউইয়র্ক
AGC-4 BEN
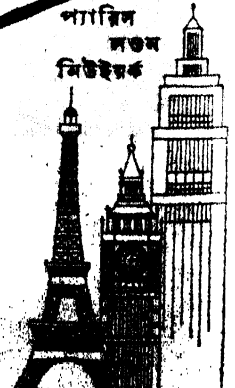
ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একটি জীপ গাড়ি থেকে নেমে আসছেন। এই ছবিটি সেদিন ইচ্ছে করেই তুলে রেখেছিলাম একটা অতি মজার কাহিনী মনে রাখবার উদ্দেশ্যে। ঠিক তাই, আজো দেখছি এই ছবি দেখলে মনে পড়ে সিকিমের সেই জীপ ড্রাইভারের আচরণের কথা। ড্রাইভার ভেবেছিল ডাক্তার রায় একজন 'ফালতু আদমী'—আর তাই নিয়ে বেশ রগড় হয়েছিল।

প্রায় বছর বারো পূর্বে একবার প্রধান-মন্ত্রী নেহরু সিকিম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা এবং দুই নেতা। আর ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়। সেদিন সকালবেলার প্রোগ্রাম ছিল নাথুলা অভিমুখে কিছু দূর যাওয়া। সেই হিসেবে জীপের একটি কনভয় চলেছে তৎকালীন সিকিমের মহারাজকুমারের তদারকিতে। মাইল কয়েক অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় বিরতি ঘটল। শুনলাম এখানেই গাড়িগুলো থাকবে, অবশিষ্ট পথটুকু যেতে হবে ঘোড়ার পিঠে। দেখলাম ঘোড়ার ব্যবস্থাও প্রচুর।

যাই হোক, ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রধানেরা অনেকেই চলে গেলেন। গেলেন না ডাক্তার রায়। কারণ তখন সবেমাত্র তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছেন চোখ অপারেশন করিয়ে। সংকটাবস্থায় চোখে কালো-চশমা রাখতে হচ্ছে সারাক্ষণ, চোখে না ঠান্ডা লাগে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী না যাওয়াতে আমরাও কয়েকজন রয়ে গেলাম। এই জীপ-বিরতির স্থানটি যে প্রায় বারো হাজার ফিট উঁচুতে তা উপলব্ধি করতে পারলাম। দারুণ কনকনে ঠান্ডা—বসে থাকলে আরো বেশী মনে হয়। তাই আমরা বাধ্য হয়েই একটু পায়চারি করে, মুখে ধোঁয়া টেনে চেষ্টা করছি ঠান্ডার অনুভূতিটা লাঘব করতে। ওদিকে কিছু দূরে ডাক্তার রায় জীপে বসে একটা বই পড়ছেন। আমরা এগিয়ে গেলাম। যেতেই তিনি বইটা বন্ধ করে কথা শুরু করলেন। কথা থেকে গল্প এলো। চলল একটার পর একটা। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটিকে সেদিন যে রকম খুশ-মেজাজে দেখেছিলাম, তেমনটি আর কোথাও তাঁকে আমি দেখিনি।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি জীপের পাশেই। তাঁর রসালো কথাগুলো উপভোগ করছি, এমন সময় এক পাহাড়ী ছোকরা-ড্রাইভার এসে ওদিকে সীটে বসল। বসেই স্টার্ট দিল গাড়িতে।

ডাক্তার রায় এই অবস্থায় আপত্তি জানিয়ে বললেন—আরে—আরে দাঁড়াও। আমি নেমে পড়ি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ছোকরা বেশ তাচ্ছিল্যভাবেই অভয় দিল ডাক্তার রায়কে—তুম্ বৈঠে রহো, কুছ ডর্ নেহি।

ডাক্তার রায়ের কথাকে আমল না দিয়েই ড্রাইভার গাড়িটাকে একবার এগিয়ে—একবার পিছিয়ে আবার প্রায় ঐখানেই এনে দাঁড় করাল। স্টার্ট বন্ধ করল। এবার ডাক্তার রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—আভি আরামসে বৈঠো।

ড্রাইভারের ও-ধরনের কথাবার্তা আর আচরণ থেকে আভাস পাচ্ছি একটা রগড় জমাট বেঁধে উঠছে। ডাক্তার রায়ও বুঝতে পেরে একটু একটু হাসছেন। আবার আমরা তাঁর কাছে যেতেই বললেন—এরা বড্ড একরোখা। কথাই শুনতে চায় না।

আমরা হাসছি। ড্রাইভারও দেখি হাসছে।

ও ভেবেছে বেশ একটা মজার ব্যাপার করেছি। তার কৃতিত্ব জাহির করতে তেমনি হেসে হেসে ডাক্তার রায়কে বোঝাতে লাগল—পণ্ডিতজীকা ওয়াপস্ আনেকো আভি টাইম্ হুয়া, ইস্‌লিয়ে গাড়ি লাইনমে রেডী কিয়া। এবার একটু খুশীর মাত্রা বাড়িয়ে বলতে লাগল—তুম্ ডর গিয়া বোলতা থা। আরে—আরে—। বলেই ছোকরা খুব হাসতে লাগল।

এবার হাসি থামিয়ে ড্রাইভার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল। আমি তখন দম্ বন্ধ করে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখছি ওকে। মনে মনে আশঙ্কা করছি, এবার বুঝি ড্রাইভার ভদ্রতা প্রকাশ করবে—এই বুঝি প্যাকেটটা—।

না, একটা সিগারেট ধরিয়েই প্যাকেটটা আবার পকেটেই রেখে দিল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি। ড্রাইভার তারপর নেমে চলে গেল তার সঙ্গীদের কাছে। জানি না, ফালতু আদমী মনে করেই হয়তো ডাক্তার রায়কে সিগারেট অফার্ করেনি। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় ডাক্তার রায় কী মনে করছিলেন বলতে পারি না। তবে তিনি ঐ জীপে আর বসে থাকতে রাজী না হয়ে নেমে এলেন আমাদের কাছে। এই ব্যাপার নিয়ে কিন্তু কোন আলোচনা হল না, অথচ সবাই মজাটুকু উপভোগ করলাম।

*

ড্রাইভার বেচারীর দোষ ছিল না। ওর মনে এই ধারণাই জন্মেছিল যে, ওদের মহারাজকুমার যাঁদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেছেন, তাঁরাই শুধু গণ্যমান্য। এখানে যারা রয়ে গেছে, তারা নিশ্চয়ই তেমন কিছু নয়। নেহাতই ফালতু হিসেবে দলভুক্ত। ড্রাইভারের এই ভ্রম সংশোধন করতে আমরা কেউ চেষ্টা করিনি। কিছু বলিনি ওকে। বলে বোধ করি লাভও হত না। ডাক্তার রায়ের পরিচয় পেলেও ড্রাইভার অনুতপ্ত হত কিনা বলা কঠিন। কারণ ওরা চৌকিদারকে জানে, ম্যাজিস্ট্রেটকে জানে না।

—নীরোদ রায়

মহাশূন্যে ভূপর্যবেক্ষণের মানমন্দির
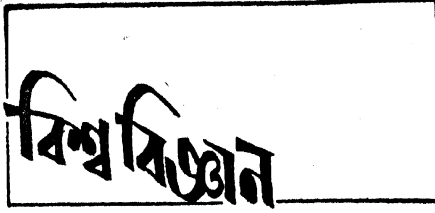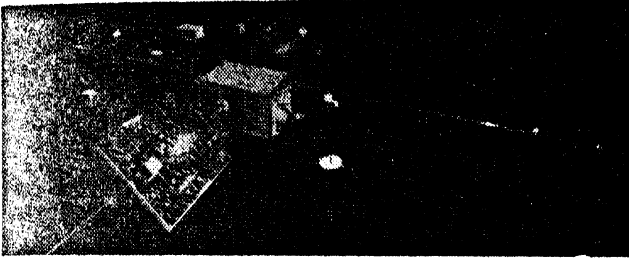
মহাশূন্যে আবর্তনশীল মানমন্দির

গ্যাগারিন ও শেপার্ডের দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম মহাকাশ যাত্রার পর এই সাড়ে পাঁচ বছরে মহাজাগতিক যন্ত্রকৌশলের অগ্রগতি হয়েছে খুব দ্রুত। সেই অগ্রগতি হয়েছে দুইদিকে—গ্রহ গ্রহান্তরে যাত্রার দিকে এবং আমাদের এই পৃথিবীকে নতুন করে চেনার দিকে। প্রথম দিকটির গুরুত্ব অস্বীকার না করেও একথা বলা অন্যায় হবে না যে, দ্বিতীয় দিকটি মানুষের এখনই উপকারে আসবে কেন, আসছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৬১ সালে আমেরিকার একটি 'টাইরস' আবহ পরীক্ষক উপগ্রহ থেকে আসন্ন প্রচন্ড এক ঝড়ের সংকেত পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের একাংশ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ লোক ঝড়ের এলাকা থেকে যথাসময়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। আমেরিকায় এত বিরাট আকারে লোকাপসারণ তার আগে আর কখনো হয়নি। আজ পর্যন্ত টাইরস, নিম্বাস ইত্যাদি উপগ্রহ থেকে বহুবার এইরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুঁশিয়ারী পাওয়া গিয়েছে। মার্কারী মহাকাশযানের যাত্রীরা পার্থিব গগনের গোধূলির আলো ও নৈশ জ্যোতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। জেমিনীর নাবিকেরা বিশ্লেষণ করেছেন মেরুজ্যোতি। হালে চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী মার্কিন উপগ্রহ চাঁদের কাছ থেকে পৃথিবীর ফটো তুলে পাঠিয়ে এক নতুন কীর্তি স্থাপনা করেছে।

পৃথিবীতে বসে আমরা পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখতে পাই? কিন্তু মহাশূন্যের সুদূরে গিয়ে মানুষ এক নজরে গোটা পৃথিবীটা এক সংগে দেখতে পেতে পারে, পরীক্ষা করতে পারে পার্থিব প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যাপার। মহাশূন্যে থেকে ভূমন্ডল পর্যবেক্ষণ করার এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে আজকের শিল্পসমৃদ্ধ উন্নতিশীল মানুষ জাতির পক্ষে, বিশ্ব অর্থনীতির পক্ষে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পার্থিব প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বেড়ে যাবে বহুগুণ। সুতরাং অর্থনীতির উন্নতির জন্য মানুষকে নিত্য নতুন সম্পদের অনুসন্ধান করতে হবে। হাতে যা আছে তা আরো যুক্তিসংগতভাবে ব্যবহার করতে শিখতে হবে। মানুষবাহী উড়ন্ত লেবরেটরী, মানমন্দির বা গ্রহদর্শনাগারের গুরুত্ব হচ্ছে ঠিক সেইখানে। খালি যন্ত্রের দ্বারা সর্বকিছু জানা যাবে না। মানুষকে স্বয়ং মহাশূন্যে গিয়ে চাক্ষুষ দেখে, নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে ও বিচার বিবেচনা করে সর্বকিছুর মূল্যায়ন করতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি থেকে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সাধারণ সূত্র নিবন্ধ করতে হবে।

মহাশূন্যে আবর্তনশীল মানুষবাহী 'মানমন্দিরে'র সাহায্যে কত কি করা যাবে সে সম্পর্কে শেষ কথা বলবার সময় এখনো আসেনি। তবে ভবিষ্যতের একটা আবছা ধারণা যে এখনই করা যায় না তা নয়। সেইসব মানমন্দির বা পৃথিবী পর্যবেক্ষক উপগ্রহে বসে যাত্রীরা পৃথিবীতে চাষবাস, অরণ্য, জল ও খনিজ সম্পদ, আবহাওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন, নগরাঞ্চলের সম্প্রসারণের দরুন জলবায়ু কিভাবে দূষিত হয় তা চাক্ষুস দেখে সুরাহার রাস্তা বাংলাতে পারবেন।

একসংগে অনেকগুলি মানমন্দির মহাশূন্যে ছাড়লে সমস্ত পৃথিবীটা একদিনের মধ্যে এক নজরে দেখে নেওয়া যাবে যা এতদিন সম্ভব ছিল না। আগে পৃথিবীর প্রকৃতির, কোন একটা দিক দেখে শুনে বিচার বিবেচনা করতে হলে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে হতো যা ছিল প্রচুর সময়সাপেক্ষ। এই অসুবিধা উড়ন্ত মানমন্দিরের
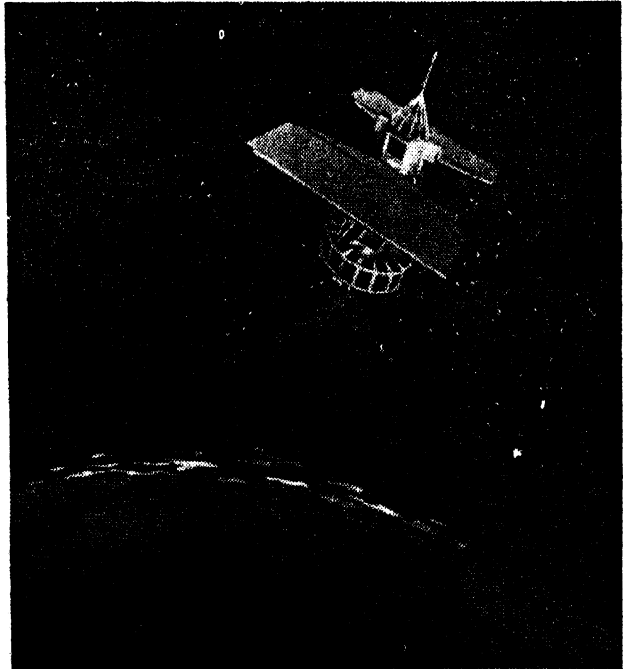
পৃথিবীর আবহচিত্র গ্রহণে নিম্বাস উপগ্রহ

মহাকাশযানের দৃষ্টিতে আরব উপদ্বীপ

দৌলতে দূরে হয়ে যাবে। তাছাড়া যানবাহনে করে, এমনকি এরোপ্লেনে করে পৃথিবী ঘোরার চেয়ে মহাশূন্যে উড়ন্ত লেবরেটরী থেকে ভূ-পর্যবেক্ষণ করায় খরচও হবে অনেক কম।

জলবায়ুর উপর সামুদ্রিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রভাব উড়ন্ত মানমন্দিরের যাত্রীরা চাক্ষুস পরীক্ষা করতে পারবেন, অনুশীলন করতে পারবেন ভূত্বকের সদাপরিবর্তনশীল চরিত্র।

জল সম্পদ সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে জলাভাব ও অনাবৃষ্টির সময়ে কখন সেচ ব্যবস্থা চালু করতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। জলের যখন প্রাচুর্য তখনও জলের পরিমিত ব্যবহারে সাহায্য করার মত নির্দেশও উপগ্রহ থেকে পাওয়া যাবে।

জমির অপব্যবহার অর্থনীতির কম ক্ষতি করে না। এমন সব আরণ্য ভূমিকে আবাদী জমি করা হয় যা চাষের উপযুক্ত নয়। তারপর বনজঙ্গল কেটে ফেলায় জলাভাব এবং বন্যার বিপদ দেখা দেয়। এমনভাবে চাষ করা হয় যাতে জমির গুণ নষ্ট হয়ে যায়, ভূমিক্ষয় হয়। মহাশূন্য থেকে জরীপ করে এইসব অবাঞ্ছিত ব্যাপার বন্ধ করা সম্ভব হবে।

অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি বিপর্যয় থেকে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক সম্পদ রক্ষার ব্যাপারেও উড়ন্ত মানমন্দিরের যাত্রীরা সাহায্য করতে পারবেন। বনে কোথাও আগুন লাগলে সেই খবর সংগে সংগে তাঁরা পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে পারবেন, বন্যা ও অনাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিতে পারবেন। এমন কি শস্য রোগের সংক্রমণ নিবারণেও তাঁদের ভূমিকা থাকবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ ও তৈল সম্পদ ব্যবহারের ফলে ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। উড়ন্ত লেবরেটরীর যাত্রীদের একটি কাজ হবে ফটোগ্রাফির সাহায্যে সেইসব অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি অনুশীলন করে ঐ সব সম্পদের নতুন উৎস খুঁজে বার করা।

মহাশূন্য থেকে সাগর মহাসাগরের তাপীয়-মানচিত্র রচনা করে বৈজ্ঞানিকরা মাছের চাষ করার উপযুক্ত জায়গার হদিস দিতে পারবেন, সমুদ্রে প্লবমান তুষারশৈল সম্পর্কে আগে থাকতে সতর্ক করে, তাদের গতিপথের আবহবার্তা পরিবেশন করে জাহাজগুলিকে নিরাপদে চলা-ফেরা করতে সাহায্য করবেন যাতে টাইটানিক জাহাজের মত দুর্ঘটনা না ঘটে।

পৃথিবীর সমশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলে প্রচণ্ড ঝড়ে প্রতি বছর বহু প্রাণহানি হয়, সম্পদ নষ্ট হয়। উড়ন্ত মানমন্দির থেকে সেই ঝড়ের পূর্বাভাস ধন ও প্রাণ দুইই রক্ষা করবে।

এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে ঐ রকম মানমন্দির তৈরি করার এবং রকেটের সাহায্যে কক্ষপথে সংস্থাপিত করার খরচ অত্যন্ত বেশি। ঠিক কথা। কিন্তু খরচটা তো শুধু একবার। মানমন্দিরটি মহাশূন্যে ঘুরতে আরম্ভ করলে তারপর আর বেশি কিছু খরচ নেই। সেই জায়গায় এরোপ্লেনের সাহায্যে সারা পৃথিবী একবার জরীপ করতে কয়েক সপ্তাহ বা মাস লেগে যাবে এবং খরচ ১৭ কোটি ডলারের কম নয়।

আমেরিকা ১৯৭০ সাল নাগাদ মহাশূন্যে ঐ ধরনের কতকগুলি গ্রহদর্শনাগার ছাড়বার পরিকল্পনা করেছে যেগুলিতে ইঞ্জিনীয়ার, যন্ত্রবিৎ ও বৈজ্ঞানিক নিয়ে ২৪জন যাত্রী থাকবেন।

উপরে যেসব ব্যাপারের কথা বলা হলো সেগুলির কিছু কিছু অবশ্য স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত লেবরেটরীর দ্বারাই করা যাচ্ছে এবং যাবে। মানুষ-যাত্রীর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যত জটিল ও সূক্ষ্ম হবে ততই সেগুলি যখন তখন বিগড়ে যাবার আশংকা থাকবে। যন্ত্রের মধ্যে মানুষ থাকলে সে প্রয়োজনমত যন্ত্র মেরামত করে নেবে। অবস্থা অনুযায়ী সেগুলির কাজ বদলে দিতে পারবে, সেগুলিকে দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করাতে পারবে। সেই দিক থেকে মানুষের সংগে যন্ত্রের কোন তুলনাই হয় না।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

গল্পটা এখানেই শেষ হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিল। একটা প্রকাণ্ড অনড় অভঙ্গুর শক্ত অটুট পাথরকেও ঠুকতে ঠুকতে তার অবস্থার বিপর্যয়ের সুযোগে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করে কেমন নিঃসীম নরকে নিক্ষেপ করা যায়, তার এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হ'তে পারে?

কিন্তু এটা গল্প নয়, জীবন। আমার সুবিধেমতো আমি একে কেটে-ছেঁটে বাদ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিণতিতে এনে সমাপ্তি ঘটাতে পারি না। আর পারি না বলেই তারো পরে আরো কোনো একটি অধ্যায় উদ্ঘাটিত হ'লো আমার চোখের সামনে। আমি দেখলাম কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক, বিশিষ্ট ধনী, যুগপৎ খ্যাতনামা দেশসেবক ও দুর্দান্ত সাহেব নীলেন্দু-নারায়ণ মিত্র তথা মিঃ মিত্র তাঁর এলগিন রোডের এক শো ফুট রাস্তা-জোড়া বিশাল পৈতৃক প্রাসাদের দোতলার মর্মর বারান্দায় এমাথা ওমাথা ক্ষিপ্রপদে পাইচারি করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন।

এতোক্ষণ তাঁকে অতিরিক্ত অসহিষ্ণু, অধীর এবং জ্বলন্ত মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, একটা ভয়ংকর অপেক্ষার চাপে ক্রমশই তাঁর ক্রোধ, জেদ, অহংকার তাঁকে উন্মত্ত করে তুলছে। এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা বারান্দাটা যেন তিনি ফাটিয়ে ফেলতে চাইছিলেন তাঁর প্রচণ্ড পদপাতে।

দেউড়ির পেটা ঘড়িতে রাত সাড়ে ন'টা বাজার সময়-সঙ্কেত হ'লো। বারান্দার জলতরঙ্গ ঘড়িটাও গান গেয়ে উঠলো মুহূর্তের জন্য। তারপরেই দেখা গেল পাথরের নুড়িতে শব্দ তুলে মিঃ মিত্রর তিনখানা গাড়ির কালো মেজ গাড়িখানা ফটকের ভিতরে ঢুকছে। সেই দিকে তাকিয়েই থেমে গেছেন তিনি, তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। তাঁর গায়ের কালো হলুদ লাল সবুজ মেশা ছোপ ছোপ দামী জাপানী সিল্কের কিমোনোর ঝুল বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে পালের মতো। যেন তাঁরই মনের প্রতীক।

এটা তাঁর খাবার সময়। ঠিক সাড়ে ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর বিলিতী প্রথায় সুসজ্জিত খাবার-ঘরে খেতে ঢোকেন। রাত্রিবেলা সাড়ে ন'টায়, দিনের বেলা দেড়টায়। একেবারে কলের নিয়ম। বয়-বেয়ারারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে তখন, হুকুম তামিলের অপেক্ষায় আগে পিছে ছুটে আসে ভৃত্যের দল। পরিবেশনকারী প্রধান রাঁধুনিটি সাদা কোট গায়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে একেবারে ফিটফাট। উঁচু দামের মেট্রন মহিলাটিও আসে তদারক করতে। ধবধবে নরুনপাড় শাড়িতে ব্লাউসে চটিতে তাকে সম্ভ্রান্ত দেখায়। অবশ্য এমনিতেও সে অ-সম্ভ্রান্ত নয়। মহিলাটি মধ্যবয়স্কা এবং সুশ্রী। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে অনেক দুরবস্থার সঙ্গে ঘর করছিলো, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সঙ্গে নিত্য লড়াইতে প্রায় আত্মহত্যার ইচ্ছে দুর্বার হ'য়ে উঠেছিলো এমনি সময়েই বিজ্ঞাপন দেখে এই চাকরিতে এসে যোগ দেয়। তা এমন আজকের কথা কী? বছর ছ'-সাত তো হবেই। এসেছিলো ভয়ে ভয়ে, কিন্তু ভয়ের কারণ ঘটেনি কোনো। মিত্র সাহেবের সংসার-তরণীর হাল ধরে সে সসম্মানেই টিঁকে আছে। বারো মাস চাল-ডাল, আর তেল-নুনের হিসেব করতে করতে পাক্কা গিন্নী হ'য়ে উঠেছে। মনিবটি প্রায়ই উধাও হন, কিন্তু তিনি থাকুন না থাকুন, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের অভাব নেই। আমলা-ফয়লা উজির-নাজির কতো লোক যে পোষ্য, আজও তার হদিস ক'রে উঠতে পারেনি মেট্রন। আঁচলে চাবি বেঁধে ভাঁড়ার আটকায়। নইলে এই রাজার গোলাও ফুরিয়ে যেতো বলে তার বিশ্বাস। নিজের ঘর নেই, পরের ঘরেই টান পড়েছে, এখন এই ঘরই তার ঘর।

মিঃ মিত্র এমনিতে উদার চরিত্রের লোক, টাকাকড়ি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, সেবক-দের প্রতিও দয়ার্দ্র, কিন্তু অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। যেমনটি চান, ঠিক তেমনটি না হলেই সর্বনাশ। হুলস্থূল লেগে যাবে তক্ষুনি। এই রাজকীয় মেজাজটি রক্ষিত হ'লেই আর কোনো গোলমাল নেই। জেদ, মর্জি, মতলব, এগুলো তাঁর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। যা চাই, তা চাই—ইচ্ছের উপর এই প্রচণ্ড আসক্তিও তাঁর পিতৃ-

পুরুষের। শোনা যায়, মায়ের স্বভাব অতি-মাত্রায় শীতল ছিলো, তাঁর চরিত্রের অধৈর্যহীনতাই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। মেয়ে ছিলেন পণ্ডিতদের ঘরের, রূপের জোরে বিয়ে হয়েছিলো এখানে। কিন্তু সেই রূপের আগুন কেঁদে কেঁদে ঘরের কোণেই নির্বাপিত হয়েছিলো। শুধু তার স্বাক্ষরটুকু রেখে গেছেন ছেলের মধ্যে।

মিঃ মিত্র তাঁর মায়ের স্বভাবের অধিকারী না হলেও আকৃতিতে সম্পূর্ণ মায়েরই প্রতিমূর্তি। তেমনি টকটকে গায়ের রং, নিখুঁত মুখশ্রী, সুঠাম শরীর। কল্পিত গন্ধর্বদের মতো সুপুরুষ। তাকানো, কথা বলা, হাঁটা-চলা—সমস্ত ভঙ্গিই এতো অচঞ্চল যে, দেখা মাত্র সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। বয়স পাঁচ বছর আগে তিরিশের ঘর ছাড়িয়েছে, পিতৃবিয়োগ হয়েছে প্রায় দশ বছর আগে, মা মারা গেছেন শৈশবে। অর্থাৎ প্রথম যৌবনেই নির্বান্ধব অবস্থায় এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যতো দূর উচ্ছৃঙ্খল হতে পারেন, ততো দূরই হয়েছেন। দেশে-বিদেশে, যত্র-তত্র তাঁর অবস্থান। একদা ব্যারিস্টারি পাস করে-ছিলেন, যতো দিন পিতা জীবিত ছিলেন,

দেশে ফেরেননি, লণ্ডন শহরেই সেই পেশার বিনিময়েই চালিয়েছেন নিজেকে, নিজের উপার্জনেই কিস্তিতে ফ্ল্যাট কিনেছেন একটি, পিতার মৃত্যুর পরে দেশে ফিরলেও সেই ফ্ল্যাট তিনি বিক্রি করে দেননি। দুই দেশই এখন তাঁর দেশ। ভাগাভাগি ক'রে এপারে ওপারে ঘোরাফেরা করেন। এখনো বিয়ে করেননি, বিয়েতে তাঁর বিশ্বাস নেই, ভালোবাসা নামক শব্দটিতে তাঁর বিবমিষা। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন মেয়েতেই তবু কিঞ্চিৎ বসন্তের আবেদন আছে, বিভিন্ন শরীরেই তবু কিছু রোমাঞ্চের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিবাহ? থুঃ।

কখনো কখনো অবিশ্যি মনে হয়, যে-কোনো একটাকে বিয়ে ক'রে ফেলেন। বেশ বাড়িতে ঘরেতে থাকবে, গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখবে, সেবা-দেবা করবে—বিশেষত অসুখ-বিসুখ করলেই একজন এই ধরনের স্ত্রীলোকের অভাব তাঁকে কাতর করে। কিন্তু তার পরেই কী জানি কী ভেবে মনটা উদাস হ'য়ে যায়। মা নামক এমনিই একজন অপমানিত অসম্মানিত কোনো মহিলার ধূধু স্মৃতি বোধ হয় সমস্ত বাধা ঠেলে উঠে আসে অবচেতনের অন্ধকার থেকে।

কোনো মেয়ের সংস্পর্শ ছাড়া কখনোই তিনি থাকতে পারেন না। কিন্তু তার মধ্যে বাছবিচার আছে, মনোনয়নের প্রশ্ন আছে। পনেরো বছর বয়েস থেকে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো দিন তিনি এই নিয়ম অথবা এই স্বভাব থেকে চ্যুত হননি। কখনো তিনি পাড়ায় যাননি, পথের দালালের কবলস্থ হননি। যে মেয়ে বহুভোগ্যা, ভুলেও নজর দেননি তার দিকে। হাজার সুন্দরী হ'লেও উচ্ছিষ্ট ভেবে বর্জন করেছেন। তাতে তাঁর রুচি আহত হয়। অনেকগুলো শর্ত পূরণ না হ'লে নাকি তাঁর সম্ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। তাই তিনি ঘরে বসে উৎকৃষ্ট দাম দিয়ে উৎকৃষ্ট জিনিসের সন্ধান করেন। ভদ্রঘরের কুমারী মেয়েদের উপরই তাঁর প্রথম পক্ষপাত। যে ক'দিন ভালো লাগে সযত্নে রেখে দেন, তারপর আর ফিরে তাকান না। আপাতত ঝোঁক পড়েছে রিফিউজি মেয়েদের উপর। এক অদ্ভুত ধারণা হ'য়েছে স্বদেশে-বিদেশে এ পর্যন্ত যতো মেয়ে তিনি কাছে পেয়েছেন, এদের মতো সরল, ভীরু, পবিত্র এবং কৃত্রিমতাবর্জিত মেয়ে নাকি খুব কম দেখেছেন। হয়তো ঠিক, হয়তো নয়। বড়োলোকের খেয়াল, যখন যে দিকে ধাবিত হয় ছোটে আগুনের মতো। এই কর্মে মহিম সরকার তাঁর প্রধান টাউট। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য সে অসাধ্য সাধন করতে পারে, টাকার জন্য সে যে-কোনো কুকর্মে প্রস্তুত, তার ক্ষমতা অপরিসীম। সে দিনকে রাত করে, রাতকে দিন।

বাড়িটা মস্ত, ঘরের সংখ্যা অগণ্য এবং কলকাতা শহরে মিত্র সাহেবের মাত্র এই একখানা বাড়িই নয়, সারা লিনটন স্ট্রীট ভরতিই মিত্রদের জমি-জায়গা ছড়ানো। বস্তি বাজার ডোড়—সব আছে সেখানে। পিতৃপুরুষেরা থাকতেনও সেখানে, এখনো আছেন, কেবল নীলেন্দুনারায়ণের ঠাকুর্দাই হঠাৎ বিলেত-ফেরত হ'য়ে সে বাড়ি ছেড়ে সীতাগড়ের রাজার কাছ থেকে কিনে ফেললেন এ বাড়িটা। উগ্র সাহেব হ'য়ে স্ত্রী-পত্র নিয়ে বাস করতে এলেন এখানে। রাজবাড়ির ফ্যাশান অনুযায়ী বাগান ফোয়ারা সিংহমুখ ফটক ইত্যাদি সবই সাজানো ছিলো। ঝোপে-ঝাড়ে লুকোনো আলোর উচ্ছ্বাস, মোড়ে মোড়ে ইটালীয়ান পুতুলের বিবস্ত্র অবয়ব, নিকুঞ্জ, গিরিগুহা কিছুরই অভাব ছিলো না। পিছনে পেয়ারাবাগান। ছায়ায় ছায়ায় কর্মচারীদের আস্তানা এবং আশ্রিত আত্মীয়ের কলরোল।

স্বজন বলতে তেমন ঘনিষ্ঠ কেউ নেই অবশ্য মিত্রসাহেবের, তবু জ্ঞাতিগুষ্ঠি যারা আছে এ বাড়িতে তাদের বিষয়ে তিনি একেবারেই অবহিত নন। এই মস্ত তিন-মহলা বাড়ির কোন্ মহলের কোন্ খোপে যে কে বাস করে তা তিনি জানেন না। জানতে চান না। বৃদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক শ্বেত-শ্মশ্রু হরিশবাবুই সব দেখেন-শোনেন, বন্দোবস্ত করেন। তিনি সৎ লোক, যে

কাজের জন্য বেতন ভোগ করেন সে কাজে তাঁর নিষ্ঠা অনন্য। সে দিক থেকেও মিঃ মিত্র ভাগ্যবান পুরুষ। তাঁর যখন যতো টাকা প্রয়োজন, হরিশবাবুই যুগিয়ে দেন। মাঝে মাঝে বয়েস হ'য়েছে বলে বিষয়-আশয় বুঝিয়ে দিতে চান মিত্রসাহেবকে, মিত্রসাহেব সে কথা কানে তোলেন না।

রাস্তার দিকে পুব-দক্ষিণ ঘিরে খান বারো-চোদ্দো ঘর নিয়ে তাঁর নিজের রাজ্য-পাট, সেখানে তিনি একা বিরাজ করেন। নৈতিক চরিত্র যতোই কদর্য হোক, অন্য অনেক বিষয়ে একান্তভাবেই খাঁটি। কিঞ্চিৎ পড়াশুনো করার অভ্যাসও আছে। ঠাকুর্দার আমলের বড়ো লাইব্রেরী একতলায়, চারখানা ঘর জুড়ে। দোতলায় তাঁর অংশে তাঁর নিজস্ব পাঠাগার। সেখানে বসে তিনি শুধু পড়েনই না, লেখেনও। অল্প বয়সে কবিতা লেখার রোগ ছিলো, সেটা সেরেছে, বর্তমানে প্রবন্ধ লেখেন। অবিশ্যি লিখতে হয় বলেই লেখেন। স্বাধীন ভারতে তিনি হ'লেন একজন দুরন্ত দেশসেবক, নানা খাতে তাঁর দানের তালিকা। সেই লোক ইচ্ছে করুন চাই না করুন, বাণী তাঁকে দিতেই হবে। দেশকে সংচরিত্র করবার দায়িত্বে উপদেশ-মূলক প্রবন্ধ না লিখলে চলবে কেন? বড়ো বড়ো কাগজে সেইসব প্রবন্ধ ছাপা হয়, প্রশংসা হয়। তিনি মনে মনে হাসেন। অনভ্যস্ত হাতে ভৃত্যের সাহায্যে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাসতে হাসতেই সভা-সমিতিতে যান, গিয়ে সেসব বিষয়েই আবার বক্তৃতা দেন। গলায় দরদ ঢেলে বলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারাই বলুন, এই অনাদৃত লক্ষ্মীর দেশে কী ক'রে লক্ষ্মী অচলা হবেন। আমরা তাঁদের কী চোখে দেখি? কীভাবে ব্যবহার করি? কতোটুকু সম্মান দিতে শিখেছি আমরা? তাই আজ আমি আমার মা-বোনেদের কাছেই সর্বান্তঃকরণে এই আবেদন জানাবো, আপনারা জেগে উঠুন, এই অযত্ন-অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হোন। আপনারা জানুন, পুরুষের লালসার ইন্ধন এবং সেবাদাসী হবার জন্যই আপনাদের জন্ম নয়, আপনারা প্রথমে মানুষ, তারপরে মেয়ে। এই পুরুষ-শাসিত সমাজকে আপনারা ভেঙেচুরে নতুন ক'রে গড়ে তুলুন—'

তুমুল করতালির মধ্যে যতোক্ষণে তাঁর বক্তৃতা শেষ হয় ততোক্ষণে তিনি বিগলিত দৃষ্টিতে মা-বোনদের দেখেন ভালো ক'রে, একজন মেয়েকেও পছন্দ হয় না। ঠোঁট বাঁকিয়ে ভাবেন, 'ইস, জগৎ থেকে সুন্দর মেয়েরা যেন গঙ্গার ইলিশের মতোই অন্তর্হিত। একটাকেও ছুঁতে ইচ্ছে করে না।'

বলাই বাহুল্য, এতো যার বাছাবাছি তার জন্য জুটিয়ে আনা সহজ নয়। সুতরাং অনেক সময়েই খেলাধুলো বন্ধ থাকে, অনেক দিনই উপবাসে কাটে। অবশ্য ওইটুকু সংযম অথবা অপেক্ষা নিতান্ত মন্দ লাগে না তাঁর, আবেগ সঞ্চারিত হয়, ইচ্ছের জোর বাড়ে। এই জুটিয়ে আনার কাজে নিযুক্ত লোকেরা চাকরি যাবার ভয়ে গলদঘর্ম হ'য়ে ভদ্রঘরের মেয়ে-বউ ফুসলে বেড়ায়।

যদিও বহুভোগ্যাতে তাঁর আপত্তি, তা বলে গৃহস্থঘরের অল্পবয়সী সুন্দরী বউ পেলে তিনি ছাড়েন না। অন্য একটা লোকের ঘর ভেঙে দেওয়ার মধ্যে বেশ একটা নির্দয় মজা আছে। সরু সিঁথির লাল সিঁদুরের গরব নিয়ে সদ্য-বিবাহিত মেয়েগু[illegible] যখন অপরিমিত যন্ত্রণায় কাটা পাঁ[illegible]র মতো দাপায় তাঁর হাতে, ওদের সেই ভয় বেদনা ত্রাস লজ্জা শোক পথের ধুলোয় মিশে যাওয়ার হতাশা—বিচিত্র সব অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে নাটক দেখার সুখ হয়। নিজেকে বিধাতার মতো লাগে। অনুভব করেন এই সৃষ্টি তাঁর নিজের। সেই সঙ্গে কোথায় যেন একটা আক্রোশ চরিতার্থ হয়। বস্তুত কামনা চরিতার্থ করবার জন্য যতোটা নয়, এই আক্রোশ চরিতার্থ করবার জন্যই যেন এই খেলা তাঁর বেশী প্রয়োজন বলে বোধ হ'তে থাকে। তিনি চিন্তা ক'রে দেখেছেন, বাইরে থেকে তাঁকে যতোই লোভী অথবা কামুক বলে মনে হোক না কেন, আসলে ভিতরে ভিতরে তিনি তা নন, বরং কিছু নিস্পৃহই।

কিন্তু কিসের এই আক্রোশ? সেটাই তিনি ভেবে পান না। শৈশবে কোনো মেয়ে যে তাঁকে স্নেহ দিয়ে লালন করেন নি এটাই কি তার কারণ? নাকি আকৈশোর পিতার রক্ষিতাদের ঘৃণা ক'রে এসেছেন ব'লেই এই অদ্ভুত মনোবিকলন? যেহেতু তিনি মাতৃহীন ছিলেন, গবর্নেসদের হাতেই

থাকতে হ'য়েছে তাঁকে, সব সুন্দরী বিদেশিনী। তারা মোটা মাইনে নিয়েছে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, কিন্তু পরিচর্যা করেছে তাঁর পিতার। রাত্রে তাঁকে একা ঘরের অন্ধকারে ফেলে রেখে, বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে তারা কোথায় শুতে গেছে? এই উত্তর তিনি তখন খুঁজে পাননি, পরে পেয়েছেন। তখন তার শিশুপ্রাণ একা ঘরের নির্জন ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে থেকেছে শুধু। ওইটুকু মানুষটা তখন না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে জানালা ধ'রে। কতো কষ্ট জমা হ'য়েছে বুকের মধ্যে। আর ঘৃণা। ঘৃণার চেহারা তখন অস্পষ্ট ছিলো, নির্দিষ্ট মানুষও ছিলো না কেউ, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে যে উপলব্ধি কাজ করতো হৃদয়ে তার নাম ঘৃণা ছাড়া আর কী হ'তে পারে?

আর তারপর একটু বড়ো হ'য়ে উঠতেই বোর্ডিং। মা মারা গিয়েছিলেন চার বছর বয়সে, বোর্ডিং-এ ঢুকলেন সাত বছরের বালক হ'য়ে। মাতৃহীন অবস্থায় তিন বছর কাটিয়েছিলেন এ বাড়িতে। বোর্ডিং-এ জেলখানা হয়তো বাড়ির এই ঘৃণা পরিবেশের চাইতে কিঞ্চিৎ সহনীয় ছিলো, কিন্তু জেলখানাই তো? তাই কি বড়ো হ'য়ে উঠতে উঠতে জীবনের প্রতি সব মমতা, সব বিশ্বাস এমন নিঃশেষে হারিয়ে গেল? তাই কি এমন বীতশ্রদ্ধ আর নির্মম হ'য়ে উঠেছেন?

ছোটো ছোটো চুমুকে দামী মদের আস্বাদ গ্রহণ করতে করতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত যখন বন্ধ ঘরে বন্দিনীদের নিয়ে তিনি প্রমোদে মত্ত থাকেন, হঠাৎ হঠাৎ তখন এই চেতনা তাঁর চমকে ওঠে। তিনি অন্যমনস্ক হ'য়ে যান। সমস্ত উত্তেজনার উপর কে যেন এক পাহাড় বরফ ঢেলে দেয়।

যদি কারো উপর আক্রোশ পোষণ করতে হয়, তা হ'লে এরা কেন? এরা কে? অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এই ভাবনা তাঁকে উতলা করে? আক্রোশের একমাত্র পাত্র কি তাঁর বাবাই নন? সেই দুরন্ত অমিতাচারী এক লম্পট পুরুষ? বিয়ে ক'রে যে লোক স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র মাতৃহীন শিশুকে যে সর্বরকমে কাঙাল করেছে? কী নির্মম ছিলো! কী দয়ামায়াহীন। একটাই তো মাত্র সন্তান, তাও কতো অধিক বয়সের, মনের মধ্যে নিজের রিপু চরিতার্থ করা ছাড়া এতোটুকু স্নেহও কি অবশিষ্ট ছিলো না লোকটার? কোথায় কোথায় কতো দূরে সব ছাত্রাবাসে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন। স্ত্রীলোক নিয়ে হল্লা করেছেন বাড়ির মধ্যে, ছুটিছাটায় এলে আদর তো দূরের কথা, সামান্য অপরাধটুকুও বরদাস্ত করেন নি। মেরে ছাল তুলে দিয়েছেন পিঠের। যে বছর সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করলেন, তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন সাত সমুদ্র তের নদী পারে। বড়োলোকের ছেলে, বিলেতে পড়তে গেল। না, বাপ বেঁচে থাকতে আর ফেরেন নি তিনি। শোনা যায়, রোগে ভুগে ভুগে মরেছিলেন শেষটা, বিছানায় পড়ে ছিলেন এক বছর, পত্রের আকারে অনেক কাতর ক্রন্দন পাঠিয়েছেন আসবার জন্য, আসেন নি তিনি। তাঁর একটুও মায়া হয়নি। সুতরাং যদি কারো উপর কোনো আক্রোশ পোষণ করতে হয়, প্রতিশোধ নিতে হয়, সে তো তাঁর বাবা? এরা তো নয়!

তবে কি এই রাগের কারণ তাঁর বাবা নয়, মা? মায়ের উপর অভিমান থেকেই কি তিনি এই বিকৃত অভিরুচির অধিকারী হয়েছেন? মা কেন তাঁকে তাঁর ওই পাষণ্ড স্বামীটির ঔরসে জন্ম দিলেন? কেন ওই শরীরসর্বস্ব লোকটার কাছে অত অপমানের পরেও আত্মনিবেদন করলেন? যদি একটা সন্তান তার প্রয়োজনই ছিলো তা হ'লে পুষ্যি নিলেন না কেন? যদি নাই নিলেন, তবে যাকে নিয়ে এলেন সংসারে, কেন তাকে ফেলে চিরকালের জন্য চলে গেলেন? মায়ের উপর এই অভিযোগের ফলই কি সমস্ত নারীজাতিকে শাস্তি দেবার আসল কারণ?

কিন্তু সে ভাবনা ক্ষণিক। বছরে দু-চার দিন। বোধ হয় অত্যধিক হৃদয়হীনতার ক্লান্ত প্রতিক্রিয়া। অথবা সামান্য বিবেক-দংশন। অথবা মদ্যপানজনিত দিবাস্বপ্ন। এর বেশী নিশ্চয়ই কিছু নয়।

তাঁর এই একলা মহলে একাই তিনি সম্পূর্ণ। বাড়ির কর্মচারীরা (যারা নিতান্তই প্রয়োজনে আসে) তারা বাদে অন্য মহলের আত্মীয়-আত্মীয়ারা আসেন না কেউ। খুড়ী জেঠী পিসী অথবা কাকা জ্যাঠা পিসেমশায়ের দল ওই দিকটায় কিলবিল করে। সরকারী রন্ধনশালায় তারা খায়। খরচ মিত্রসাহেবের তহবিল থেকে চলে। মাসের গোড়ার দিকে একতলার ভিতরের বৈঠকখানায় কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি পদার্পণ করেন, সধবা-বিধবা, স্ত্রী-আত্মীয়ারা ভিড় ক'রে আসেন সেখানে, খুড়ো-জ্যাঠাবাও আসেন বাবাজীকে দর্শন করতে, প্রত্যেকেই তারা চাটুকারিতা করে, মিত্রসাহেব গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের মিথ্যুক জিহ্বাকে সংযত ক'রে বলেন, 'কার কী দরকার বলুন।' দরকারের তালিকা নিতান্ত হ্রস্ব হয় না, ফর্দটা হরিশবাবুর কাছে যায়, তিনি মাথা চুলকে বলেন, 'এভাবে এদের প্রশ্রয় দিতে গেলে কি—'

মিঃ মিত্র ওইটুকু শুনেই আসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠেন, 'যা ভালো বোঝেন করুন, তবে একেবারে ছেঁটে দেবেন না কিছু। প্রয়োজনের তালিকা এদের অশেষ, সেটাকেই সীমাবদ্ধ করুন।'

তবু হরিশবাবু মাথা নাড়েন, জানিয়ে দেন, 'প্রত্যহ দু'বেলা মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশজনের পাত পড়ে রান্নাঘরে, মাথাপিছু গড়ে আট আনা খরচ হ'লেও দিন পঁচিশটা

টাকা, মাসের শেষে তার অঙ্ক নেহাত কম দাঁড়ায় না, এর উপরে যদি আবার হাত-খরচাও চালাতে হয়—'

মিত্রসাহেব হাসেন একটু, শান্তমুখে, বলেন, 'কিছু তো কম পড়ছে না, মানুষ তো আমি একলা।'

কিন্তু একলা মানুষ তাঁরই যে কী বিপুল পরিমাণ টাকা লাগে তা তো আর বলতে পারেন না হরিশবাবু! আর শুধুই কি এইসব স্বার্থান্বেষী বেকার আত্মীয়ের দল? তার উপরে চাকর-বাকর কর্মচারী মিলিয়ে তো আরো পঞ্চাশটা মুখ! চলে যেতে যেতে ভাবেন, দয়াধর্ম ভালো কথা, কিন্তু এই দয়া নীলেন্দুর অপাত্রে বর্ষিত হচ্ছে। মিত্র-সাহেবকে মনে মনে তিনি নীলেন্দুই বলেন। তিনি যখন এ বাড়িতে কাজে ঢুকেছিলেন নীলেন্দুর তখন তিন বছর বয়েস। পরের বছর ওর মা মারা গেলেন। বত্রিশ বছর তিনি আছেন এখানে। নীলেন্দুর বাবার আমলে কষ্ট গেছে অনেক, লোক তিনি সুবিধের ছিলেন না, কিন্তু নীলেন্দু সোনার মানুষ, নীলেন্দুর হৃদয় আকাশের মত উদার। নীলেন্দুর শুভানুধ্যায়ী তিনি।
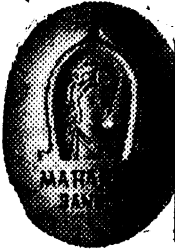
(ক্রমশ)

এ দেশে একটা কথা আছে—আকাশের রঙ আর মেয়েদের মন, এ দুটো জিনিসকে কখনো বিশ্বাস কোরো না। কখন যে তার রূপ বদলে যাবে কেউ জানে না। সকালে কড়া রোদ উঠলেও, অনেকে তাই বর্ষাতি নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে ভোলে না। একটু গরম পড়েছে কি, অমনি আকাশে কালো মেঘ, বৃষ্টি—বৃষ্টি আরম্ভ হল কি ঠাণ্ডা। অর্থাৎ সকালে কি দুপুরে যেসব রূপসী নারীদের কড়া রোদের নেশায় নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের দেহবসন পরিত্যাগ করে এক চিলতে কাপড়ের টুকরো পরে (যার নাম বিকিনি বা মনোকিনি) অবলীলাক্রমে ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে তপ্ত বালির ওপর চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল, কিংবা প্রায়-বিশ্ব-সুন্দরীর ভূমিকায় এই যে সব নারীদের হাব ভাব, স্নানের ঘাটের জনারণ্যে যাদের উদ্দাম দেহে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় পুরুষের মন ভোলাবার জন্যে, দ্যাখো : আমার দেহে যৌন উত্তেজক কত ঐশ্বর্যের খনি রয়েছে, যা তোমাকে দিতে পারি, যদি তোমাকে আমার পছন্দ হয়, যদি তুমি আমাকে জয় করে নিতে পারো, যদি তুমি আমাকে আমার ভোগ আর আনন্দের সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারো, রবীন্দ্রনাথ যাদের দেখলে কখনোই লিখতে পারতেন না—"শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে", সেই সব নারীদেরই হয়ত এদের মনমেজাজ পাল্টে যাবার মতই পরক্ষণে মেঘ-বৃষ্টি-শীতের সঙ্গে সঙ্গে আর সব লজ্জা আবরণকারী পোশাকের ওপর বর্ষাতি বা আলেস্টার চাপিয়ে সলজ্জ ভাবে পথে বেরুতে দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ যাদের দেখে বিমুগ্ধচিত্তে নিশ্চয়ই লিখতে পারতেন—"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।' এই উর্বশীদের জয়গান এখানে গ্রীষ্ম এলে। এদের জয়গান এদেশের ফ্যাশান স্রোতে। যেমন, এখন এদের চরণে জুতো সুচালো থেকে ভীষণ ভোঁতা হতে শুরু করেছে, নিম্নাঙ্গের বসন রকগুলি এখন মিনি রক হয়ে হাঁটু ছাড়িয়ে উরুদেশ ছাড়িয়ে আরো ঊর্ধ্বমুখী। বলতে হয়, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ কি" পশ্চিমের সভ্যতাই যেন পথ হারাতে বসেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এদেশে জন্মগ্রহণ করতে ভয় পাবেন, কেননা এদেশের বহুরূপী গোপিনীরা অনায়াসেই স্নানের ঘাটে কেষ্টঠাকুর তৈরি করে নিতে পারে। শুধু চাই সূর্য। সেদিন এক ভদ্রমহিলা কত দুঃখ করে বলছিলেন—তোমাদের দেশে এত সূর্যালোক, এত গরম, আর আমাদের এখানে কেবল ঠাণ্ডা। দুদিন গরম পড়তে না পড়তেই ঠাণ্ডা। তোমরা গরম আর সূর্যালোকের ব্যবসা করতে পারো না? আমাদের দেশে ত রপ্তানি করতে পারো। কথাটা আমাদের সরকার ও ব্যবসায়ীদের ভেবে দেখা উচিত। এদেশের সূর্যালোকের এত চাহিদা, একদিন তা যদি আমরা সরবরাহ করতে পারি, তবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা একেবারেই মিটে যায়।

এ দেশের জীবনে প্রকৃতির ঝড়ের চাইতে রাজনৈতিক ঝড়ের ঝাপটাই সব সময় বেশী। একদিকে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত জীবনে এ'দের আত্মবিশ্বাসের যেমন অভাব নেই, তেমনি রাজনৈতিক ঘটনায় বা রুশ-আমেরিকান আলোচনায় এ'দের আতঙ্কের শেষ নেই। পর পর দুটো মহাযুদ্ধে মার খেয়ে, এ'রা নিজেদের রাজনীতিতে একেবারেই প্রায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় পর্যন্ত। যেমন জর্মানদের এক রকম প্রায় লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে—যুদ্ধে যেমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনদিন জর্মানরা বিজয়ী হতে পারে নি, পারবে না, তেমনি ইংলণ্ডের ওয়েম্বলী মাঠে আজ পর্যন্ত কোন ফুটবল খেলায় জর্মানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিততে পারে নি—এ যেন এক ভাগ্যের খেলা। রাজনীতি যে খেলার জগতকে কি-ভাবে বিষাক্ত করে তোলে তার দৃষ্টান্ত গত বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আমেরিকার উন্মাদগ্রস্ত ফুটবল ফ্যানাটিকস-দের কাহিনী আজ কে না পড়েছে? ইংলণ্ড ও জর্মানীর ফাইনাল খেলায়, রুশ লাইনস-ম্যানের নির্দেশে জর্মানীর বিপক্ষে যে গোল হল, তার সেই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে এ-দেশের সাধারণ কাগজগুলি সাধারণ মানুষের কাছে এমন ভাবে ঘটনাকে তুলে ধরছে—যার অর্থ, এই গোলের কারণ রুশ-জর্মান শত্রুতা। খেলা কবে শেষ হয়ে গেছে, অথচ তাকে ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনার অন্ত নেই।

তবে এবার জর্মানদের জীবনে এক বিরাট জয়, এই বিশ্ব-ফুটবল খেলায়, তাঁরা রাশিয়ানদের হারিয়ে দিয়েছেন—এ যেন

স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের প্রতিশোধ। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার ব্যাপারে জর্মানদের যেমন একটা আতঙ্ক ছিল, সেটা দিনে দিনেই কমে আসছে, যা রুশ-জর্মান প্রীতির পক্ষে খুবই আশাপ্রদ। মনে পড়ে, বছর চারেক পূর্বেও "স্বর্গী এল দেশে"র মত রুশ জুজুদের ভয়ে জর্মানদের আতঙ্কের সীমা ছিল না। বার্লিনাররা সাধারণত রসিক। তাঁদের রসিকপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের কোন কোন জীবন-মরণের প্রশ্নেও। সেই সময় যখন দলে দলে পশ্চিম বার্লিনের মানুষ পশ্চিম জর্মানীতে ভয়ে ঘর-বাড়ি ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পশ্চিম বার্লিনের সরকার থেকে এখানকার প্রায় প্রত্যেক মানুষকে ১০০ মার্ক করে ৎসিটার-প্রেম (Zitter-Praemie) অর্থাৎ আতঙ্ক-গ্রস্ত থরো থরো কম্পিত মানুষদের জন্যে অর্থ সাহায্য। ভাবটা, রুশরা আসছে আসুক, ভয় পেয়ে পালিয়ে যেয়ো না—তোমাদের প্রত্যেককে ১০০ মার্ক করে দেওয়া হচ্ছে। সেদিন যাঁরা শত দুঃখ আর আতঙ্কের মধ্যেও হাত পেতে এই ১০০ মার্ক নিয়েছেন, তাঁরা এই রসপূর্ণ নামের জন্যে একবার হলেও হেসেছেন। আজ এক শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে যে, রাশিয়ানদের ব্যাপারে জর্মানদের আতঙ্ক অনেক কমে গেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানকার ডেমোসকপি ইনস্টিটিউটের রিপোর্টে। তাঁরা কয়েকটা প্রশ্নের ভিত্তিতে জর্মানদের জনমত সংগ্রহ করেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল—"রুশরা আমাদের চেপে রাখবার চেষ্টা করছে, আপনার এমন কোন অনুভব হয় কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে, ১৯৫২ সালে জর্মানীর শতকরা ৬৬জন মানুষ "হ্যাঁ" বলে সমর্থন জানায়, আর আজ মাত্র শতকরা ৩৮ জন জর্মান। অন্য দিকে "রুশরা জর্মানদের চেপে রাখবার চেষ্টা করছে না"—এ ব্যাপারে ১৯৫২ সালে সমর্থন জানায় শতকরা ১৫ জন জর্মান, আজ তা শতকরা ৩৭জন। আরো প্রশ্ন—বোঝাপড়ার সদিচ্ছায় প্রণোদিত হবার মত আগ্রহশীল মনোভাব রুশদের আছে বলে আপনার মনে হয় কি হয় না?" এ প্রশ্নের উত্তরে রুশদের সমর্থনে ১৯৫৯ সালে উত্তর দেয় শতকরা ১৭জন জর্মান, ১৯৬৬ সালে তা বেড়ে হয় ২৬%। রুশদের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালে রায় দেন শতকরা ৫৭ জন জর্মান, ১৯৬৬ সালে শতকরা ৫৪ জন জর্মান। এ ব্যাপারে জর্মানীর প্রবীণতম রাজনীতিজ্ঞ ও প্রাক্তন চান্সেলার ডঃ আদেনায়ারের মনোভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইদানীংকালে ডঃ আদেনায়ারের দুটো মন্তব্য জর্মানীর রাজনৈতিক জীবনকে আলোড়িত করেছিল। এক, তাঁর মতে, আজ রুশ জনসাধারণ ও মস্কো সরকার যুদ্ধবিরোধী। দুই, ভিয়েৎনাম থেকে আমেরিকার উচিত, তার সৈন্য সরিয়ে আনা। ডঃ আদেনায়ারের এই উক্তিতে জর্মানী ও আমেরিকান সরকারের মধ্যে একটা চাপা বিরক্তি প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রবীণ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ডঃ আদেনায়ারের এই উক্তিতে অবাক হবার কিছুই নেই। যদিও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমেরিকার চাপে পশ্চিম জর্মান সরকারকে ভিয়েৎনামের নরহত্যা যজ্ঞে আমেরিকার সাথী হতে হচ্ছে, এবং জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের এই যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে সমর্থনও আছে, তবু জর্মানীর চিন্তাবিদদের মনোভাব আমেরিকার বিপক্ষে। কিছুকাল পূর্বে পশ্চিম জর্মানীর ৫০ জন অধ্যাপক ও লেকচারারদের যৌথ ইস্তাহারে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমেরিকানদের নীতির
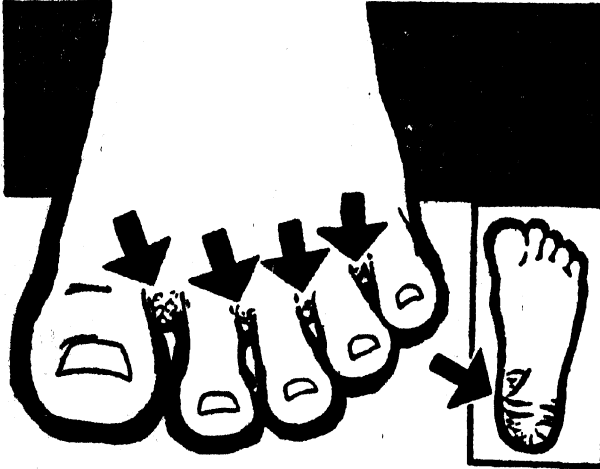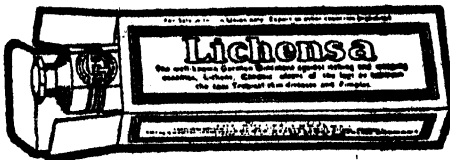
বিরুদ্ধে তাঁদের মতবাদ পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়েছে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে জর্মান সরকার সোজাসুজি আমেরিকানদের সাহায্য বা সৈন্যবল পাঠাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত কেবল মেডিকেল এইড নিয়ে "হেলগোলান্ড" নামে একটা জাহাজ ভিয়েৎনামে গেছে। অবশ্য ভিয়েৎনামের ব্যাপারে পশ্চিম জর্মানী যতটুকু নাক গলিয়েছে, তাতে অনেকখানি আমেরিকার চাপ রয়েছে। আজ ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র পশ্চিম জর্মানীই আমেরিকার সবচাইতে বিশ্বস্ত বন্ধু। সেই বন্ধুকে এর বেশী ভিয়েৎনামের যুদ্ধে ঠেলে দিলে, সারা বিশ্বের মানুষ তখন যে আঙুল দেখিয়ে জর্মানদের "যুদ্ধবাজ" বলে গালাগাল দেবে, সে ব্যাপারে এ'রা খুবই সচেতন। এ দেশের বামপন্থী পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়, ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমেরিকান পলিসির বিরুদ্ধে "কেন আমি ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে" শিরোনামায় কোন কোন অধ্যাপকের বক্তব্য। তাছাড়া, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনেই এই দেশের ছাত্ররা যেমন রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তাতে এ দেশের শিক্ষা-মহলে প্রশ্ন উঠেছে, ছাত্রদের রাজনীতি করবার কতটুকু অধিকার আছে, এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনার স্থান আছে কি না। এ ব্যাপারে বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানার মধ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনার স্থান দেওয়া হবে না।

আমেরিকার "ম্যাকনামারা যুদ্ধবাজ নীতি"তে প্রেসিডেণ্ট জনসন ভিয়েৎনামে যে-ভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর মত দার্শনিককে যেমন প্রশ্ন তুলতে হয়েছে, এই যুদ্ধে জনসন সাহেবকে আধুনিক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য করা হবে কি না, তেমনি এ দেশের বহু জর্মান গত যুদ্ধে বিধবা হওয়া নারীকে প্রশ্ন করতে শুনেছি, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সেদিন যে-সব আমেরিকানরা আদালতে আমাদের সেই সব যুবকদের ফাঁসি বা কারাগারের জন্য আদেশ দিয়েছিল, যে-সব পুরুষদের মধ্যে অনেককেই হিটলারের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধাপরাধী হতে হয়েছিল, সেই সব আমেরিকানরা আজ নিজের দেশের স্কুল-কলেজের যুবকদের জোরজবরদস্তি ধরে ধরে ভিয়েৎনামের মত একটা অন্যায় যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরও যুদ্ধাপরাধী করছে নাকি?

ভিয়েৎনাম কেবল আমেরিকান বা জর্মানদের মধ্যে নয়, অন্যান্য বিদেশীদের মধ্যেও যে কতখানি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, তার একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। এখানে একটি ভারতীয় ছাত্র ও আমেরিকান ছাত্রীর মাঝে গভীর প্রেম হয়। মেয়েটির বৃত্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কয়েক-দিন পূর্বে তাকে নিজের দেশে ডেট্রয়েট-এ তার মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে হয়।

বিচ্ছেদের পর এই দুইটি বিচ্ছিন্ন আত্মা বুঝতে পারছে, ওদের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি ওরা পরস্পরকে বিয়ে না করে, ঘর না বাঁধে। ভারতীয় ছেলেটির দেশের বাঁধন তেমন নেই। ওর কাছে এখন পৃথিবীর সব দেশই নিজের দেশ। আমার পাশেই থাকে ছেলেটি। ঘন ঘন ছুটে আসে পরামর্শের জন্য। ওর ইচ্ছে,

আমেরিকায় চলে গিয়ে ওর অন্তরতম জ্বলিয়াকে বিয়ে করে আমেরিকায় ঘর বাঁধে, সে দেশেই থেকে যায়। আমি বলি, "রাজ, তোমার জন্য জ্বলিয়া এত করে, ও ভারতবর্ষের সবকিছু ভালবাসতে শুরু করেছে, তা হলে ওকে তোমার বিয়ে করতে ভয় কেন? আমেরিকায় চলে যাও, যদি তোমার ঘরের বাঁধন বা অর্থনৈতিক কারণ বাধা না হয়ে থাকে।" রাজ বলে, "না, আমি আমেরিকায় যাবো না। আমার বয়স অল্প, আমেরিকান নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করলে হয়ত পাবোও। কিন্তু আমাকে ভিয়েৎনামে যদি পাঠিয়ে দেয়।" তাই রাজ এখন ডেট্রয়েট-এর কাছাকাছি ক্যানাডার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে; ভালবাসার ঘরেও ভিয়েৎনাম-আতঙ্ক।

এদিকে বিভক্ত জর্মানীর ওপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য নিয়ে এ দেশে তুমুল আলোড়ন পড়ে গেছে। বছর পাঁচেক পূর্বে আরো একবার এরকম প্রচণ্ড ধাক্কা খান পশ্চিম জর্মানী, যখন পণ্ডিত নেহরু দুই জর্মানীর অস্তিত্ব বর্তমান বলে ঘোষণা করে বসেন। তাই আবার এত কাল বাদে ভারত ও পশ্চিম জর্মানীর সম্পর্কে আজ নতুন ফাটল ধরবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মস্কো পরিদর্শন করতে গেলেন ভিয়েৎনামের সংকটজনক পরিস্থিতির ওপর রুশ সরকারের সংগে আলোচনা করতে, সেই সংগে ভারত-রুশ অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে আরো উন্নততর করবার জন্য। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়— প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর ভারত-রুশ যুক্ত ইস্তাহারে। ঘোষণা করা হল—দুই জর্মানীর অস্তিত্ব বর্তমান। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে পশ্চিম জর্মান সরকার। যে-ভারতকে আজ পর্যন্ত আমরা এত সাহায্য নানাভাবে করে এলাম, সেই ভারত কি না মস্কো থেকে এক মিলিয়ারডেন রুবেল সাহায্য পেয়ে, রুশ সরকারের চাপে বিভক্ত জর্মানীর সর্বনাশ করতে বসেছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস প্রেসিডেনট কামরাজ এসেছেন পূর্ব বার্লিন পরিদর্শন করতে। বন্-সরকার হঠাৎ এই দুই ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে বসেছে।

নয়াদিল্লীতে পশ্চিম জর্মানীর রাষ্ট্রদূত হের ফন মিরবাক ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে দুই জর্মানীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে ভারতের মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদপত্র জ্ঞাপন করেন। অবশ্য যাতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অচিরেই কোন বড় রকমের ফাটল দেখা না দেয়, তার জন্য পশ্চিম জর্মান সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি রেখেছেন। সেজন্যে পশ্চিম জর্মানীর এই প্রতিবাদপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তর থেকে না পাঠিয়ে আণ্ডার সেক্রেটারীর পত্র হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। একথা সত্য যে, এখন পর্যন্ত ভারত সরকার পূর্ব জর্মানীর অস্তিত্বই কেবল স্বীকার করে গেছে, তাতে কোন প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক দেবার চেষ্টা করা হয়নি। ভারত ও পূর্ব জর্মানীর মধ্যে কোন প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি। ভারতে পূর্ব জর্মান সরকারের তরফ থেকে কেবলমাত্র বাণিজ্য দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত অন্য আর কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ঘরপোড়া গরু রাঙা মেঘ দেখলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়। সুতরাং জর্মানদের এই জীবন-মরণের সমস্যায় ভারতের মত বিরাট রাষ্ট্রের এই স্বীকৃতি দানের ঘোষণা পশ্চিম জর্মান সরকারের হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি যে করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আমাদের প্রশ্ন, পূর্ব জর্মানীর অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা নিয়ে নয়। পূর্ব জর্মানীর অস্তিত্ব স্বয়ং পশ্চিম জর্মানীর বড় বড় শিল্পপতিরাই যখন অস্বীকার করে না, এবং দিনে দিনেই পশ্চিম জর্মানীর ব্যবসা পূর্ব জর্মানীর সংগে বেড়ে চলেছে, যেখানে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে জনসাধারণের যাতায়াতের ব্যাপারে আলোচনার জন্য পূর্ব বার্লিনের সরকারী মন্ত্রীকে পশ্চিম বার্লিনের সরকারের তরফ থেকে সম্বর্ধিত করতে হচ্ছে, যেখানে আজ দুই জর্মানীর একত্রীকরণ ও অন্যান্য সমস্যা আলোচনা করার জন্য দুই জর্মানীর তরফ থেকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে পার্টি লেভেল-এ আলোচনা চলেছে, অথবা কখনো কখনো কোন কোন পশ্চিমী নেতার মুখে পরোক্ষে পূর্ব জর্মানীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি শোনা যায়, তখন আমরা ভারতীয়রাই বা কেমন করে পূর্ব জর্মানীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করি, যেখানে দিনে দিনেই আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্ব জর্মানীর সংগে বেড়ে

চলেছে। প্রশ্নটা দেখা দেয়, যখন আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা বৃহৎ শক্তিশালী কোন দেশ পরিদর্শনে গিয়ে সেই রাষ্ট্রের মেজাজে ঢালা কোন যুক্ত ইস্তাহার ঘোষণা করে আসেন, যা আমাদের অন্য কোন বন্ধু রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যের ক্ষতিসাধন করতে পারে। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে পশ্চিম জার্মানী যখন পাকিস্তানকে রকেট দিয়ে সাহায্য করেছে, তখন যদি ভারত তার জবাব দিত—পূর্ব জার্মানীর অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্য দিয়ে, এবং তা যদি নয়াদিল্লী থেকে ঘোষিত হত, তবে তার একটা সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা থাকত, এবং আমাদেরও নীতির একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকত। যেমন, গত বছর প্রেসিডেন্ট নাসের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন—তুমি যদি আমার জীবন-মরণের সমস্যা আমার শত্রু ইসরাইলকে গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারো, পশ্চিম জার্মানী, তবে আমিও তোমার জীবন-মরণের সমস্যা তোমার শত্রু পূর্ব জার্মান সরকারের রাষ্ট্রনেতাকে পরম রাজকীয় সম্মানে সম্বর্ধিত করতে পারি। কিন্তু আমাদের নীতি ভিয়েৎনাম বা জার্মানীর ওপর ঘোষিত হয়, হয় ওয়াশিংটন থেকে, নয়ত মস্কো থেকে। এ কথা ত জলের মত পরিষ্কার, মস্কো থেকে পূর্ব জার্মানীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ভারত যেভাবে প্রকাশ করেছে, তাতে ভারতের নিজস্ব নীতির যতটা জয়গান না ঘোষিত হয়েছে, তার চাইতে বেশী প্রমাণিত হয়েছে, মস্কোর চাপে পড়ে ১ মিলিয়ারডেন রুবেলের জন্য ভারত তার নিজস্বতাকে বিক্রী করেছে। অবশ্য এ ব্যাপার নিয়ে জার্মানরা যাতে ভারতের সংগে বেশী খোঁচাখুঁচি না করে, তার পরামর্শ দিয়ে জার্মানীর বিশেষ দায়িত্বশীল পত্রিকা Sueddeutsche Zeitung লিখছে—"মস্কোতে যাই অনুষ্ঠিত হোক না কেন তা ভারত-জার্মান সম্পর্ককে অনেক কম মেঘাচ্ছন্ন করবে, যদি পশ্চিম জার্মানীর কোন কোন মহল এক মিলিয়ারডেন রুবেলের বিনিময়ে রুশদের কাছে নিজেকে বিক্রীত করেছে বলে ভারতকে অভিযুক্ত করা থেকে বিরত থাকে।"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই ধরনের বিবৃতির প্রসংগে এ'রা আরো বলেছেন, এ ব্যাপারে যদি কোন দায়িত্ব প্রথম কেউ তাঁর ঘাড়ে তুলে দিয়ে থাকেন, তবে সে তাঁর পিতা পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং, যিনি দুই জার্মানীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে এই বিতর্কের পথ রচনা করে গেছেন। দ্বিতীয় কারণ, ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দুই বিবদমান প্রতিবেশী রাষ্ট্র, পাকিস্তান ও চীনের কারণে ভারতকে বাধ্য হয়েই সোভিয়েৎ রাশিয়ার সংগে একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হচ্ছে। ভারতের আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাকে রাশিয়ার স্বারস্থ হতে হয়েছে, সেখান থেকে চাপে পড়ে ভারতকে জার্মানীর প্রসঙ্গে অপ্রিয় মন্তব্য করতে হচ্ছে।

এদিকে পশ্চিম জার্মান সরকার বন-এ আমাদের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে বিভক্ত জার্মানীর প্রশ্নে আরো পরিষ্কারভাবে ভারতের ভাবধারা জানতে চায়, যার ওপর আগামী নভেম্বরে পশ্চিম জার্মানীর চান্সেলার ডঃ এরহার্টের ভারত পরিদর্শনের প্রশ্ন নির্ভর করছিল। তাছাড়া কথা চলছে, ভারতের জন্যে আরো ৩০০ মিলিয়ন মার্ক 'development aid' মঞ্জুরের। ভারতের বক্তব্যর প্রসঙ্গে আগামী পার্লামেণ্টে এই সাহায্যের ওপর আলোচনা হবে। অবশ্য কিছু কিছু মহল থেকে দাবি তোলা হয়েছিল, ভারত যদি পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব জার্মান সরকারকে স্বীকার করে নেয়, এবং তার সঙ্গে কোন প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে পশ্চিম জার্মানীর উচিত ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে ঠিক সেই রকমই কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা নাকি সিংহলের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল, শ্রীমতী বন্দরনায়েক যখন পূর্ব জার্মানীর সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বন-এর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দপ্তর থেকে জানান হয়—ভারতের নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। পূর্বে যা ছিল, এখনো তাই আছে। ভারত পূর্ব জার্মানীর অস্তিত্বকে কখনো অস্বীকার করে না। তবে ভারতের তরফ থেকে এমন কিছু কখনো করা হবে না, যা দুই জার্মানীর একত্রীকরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, পশ্চিম জার্মানীর চেন্সেলার ডঃ এরহার্ট আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতে যাচ্ছেন। এ-ব্যাপারে Sueddeutsche Zeitung লিখছে ঃ—

—"This is not the only ommission on the part of the Federal Republic. The other is that the urgency of the German Question could perhaps be brought closer to India's attention if the Federal Chancellor were at last to make up his mind to return the visit Nehru paid the Federal Republic in the summer of 1956."

যতদূর দেখা যাচ্ছে, ডঃ এরহার্ট ১ই নভেম্বর নয়াদিল্লিতে পদার্পণ করছেন। তিনি কতদিন ভারতে থাকবেন এখনো স্থির নির্ধারিত হয় নি। সেটা নির্ধারিত হবে, ডঃ এরহার্ট পাকিস্তানে যাবেন কিনা, তার ওপর। পশ্চিম জার্মানী চায় না, ডঃ এরহার্টের ভারত পরিদর্শনে পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্ক মন্দ হয়। তাই যতদূর সম্ভব, ডঃ এরহার্ট ভারত পরিদর্শন শেষে ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তানও পরিদর্শন করে আসবেন। ভারতের তরফ থেকে এই আমন্ত্রণ প্রায় গত দুই বছর ধরে চলছে। কিছুকাল পূর্বে, ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী যখন বন্-এ আসেন, সেই সময় তিনি আবার ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম জার্মান চান্সেলারকে ভারতে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান।

নয়াদিল্লি থেকে পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রদূত এ কথা বিশেষভাবে বিশ্বাস করেন, ডঃ এরহার্টের ভারত পরিদর্শনের ফলে ভারত সরকারের সংগে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনায় ভারত ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে এমন এক বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হবে, যা পূর্ব জার্মানীর পক্ষে এক প্রচণ্ড আঘাত হয়ে দেখা দেবে, এবং যার ফলে ভারত ও পূর্ব জার্মানীর মধ্যে যে কোন প্রকার কূটনৈতিক সম্ভাবনাকে বেশ কয়েক বছরের জন্য দূরে সরিয়ে দেবে।

ভারতকে পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক সাহায্য প্রসংগে এ'রা জনসাধারণের ভুল ধারণার ব্যাপারে সচেতন করে দেবার জন্যে লিখছেন—

—"As the loan (1,000 million roubles from Soviet Union) is considerably older than the com-

munique there is no factual justification for this accusation. The attendant lamentation about ungrateful India, which has received so much money from the Federal Republic, shows that the commendably frank speeches of minister for economic co-operation Scheel are still not enough to paint an accurate picture in public opinion in the Federal Republic of the nature of development aid to India."

কেন লিখছে জর্মান পত্রিকা এ কথা? যেহেতু পশ্চিম জর্মানীর কাছ থেকে ভারত যে টাকা ধার পায়, তার শতকরা ৯০ ভাগ অংশই সাধারণ সুদের হারে। যদি এই টাকাটাই কোন ইউরোপীয় দেশকে দেওয়া হত, তবে তার নাম হত 'Export Credits'। যখন কোন এশিয়া বা আফ্রিকার দেশকে টাকা ধার দেওয়া হয়, তখন তার নাম হয় 'development aid'। এই 'development aid'-এর টাকা পশ্চিম জর্মানীর শিল্প ও সমৃদ্ধির পথই খুলে দিচ্ছে, কেননা সে টাকাটা একদিন না একদিন তার শেষ ফেনিগ পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হবে পশ্চিম জর্মানীকে।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

কৈফিয়ত

তারাশিস মুখোপাধ্যায়

> 'জাতিভেদপ্রথা : বাঙলার গ্রামসমাজে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বহু পাঠক ক্ষুণ্ণ হয়ে আমাদের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। প্রবন্ধটি কারো মনে আঘাত দেবার বা সমাজের কোনো জাতি বা শ্রেণীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে রচিত নয়, অন্তত লেখকের মনে এ ধরনের কোনো মনোভাব যে ছিল না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। তথাপি কোনো কোনো পাঠক এই প্রবন্ধ-পাঠে আঘাত পাওয়ায় আমরা দুঃখিত, আমরা তাঁদের কাছে ক্ষমা-প্রার্থী। আশা করব, প্রবন্ধকারের এই 'কৈফিয়ত'-এর পর তাঁরা সহৃদয়চিত্তে বিষয়টি বিবেচনা করবেন।
>
> —সম্পাদক

৬ই আগস্ট তারিখের "দেশ" পত্রিকায় "জাতিভেদপ্রথা : বাঙলার গ্রামসমাজে" নামে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেশ পত্রিকার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নিকটে এবং আমার নিকটে ব্যক্তিগতভাবে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং ভ্রম সংশোধনের জন্য দাবি জানাইয়াছেন। তাঁহারা যে যত্ন সহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার যদি কোনও ভুলত্রুটি হইয়া থাকে সেজন্য সম্পাদক বা পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন সমীচীন হয় নাই। বাঙলা দেশের সামাজিক অবস্থার বর্ণনার জন্য তাঁহাদের কোন দায়িত্ব নাই। দায়িত্ব আমার। কিন্তু আমার পক্ষ হইতে কি বক্তব্য আছে, আশা করি বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে তাহাও সম্যকভাবে পাঠকগণের পক্ষে বুঝিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান "কৈফিয়ত" সম্পাদকের কৃপায় যদি প্রকাশিত হয়, আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

আমি নৃতত্ত্বের ছাত্র, ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষায় গবেষণার কাজ করিয়া থাকি। মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলার বর্তমান কালে হিন্দু সমাজে জাতিভেদপ্রথা কি অবস্থায় আছে তাহা প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়াছি। এক শত বৎসর পূর্বে হিন্দু সমাজ যেমনটি ছিল এখন সেরূপ নাই। বিগত শতাধিক বৎসর ধরিয়া নানাবিধ সমাজ সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে নিম্ন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের মর্যাদার অনেক ইতরবিশেষ ঘটিয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ হইতে জাতিভেদপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে, এমন কথা ভাবিবার কারণ নাই। বিশেষত গ্রাম্য সমাজে ইহার প্রাবল্য এখনও যথেষ্ট অবশিষ্ট আছে। হয়ত আরও ৫০ বৎসরের মধ্যে জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে, ব্যক্তিসমাজের শাসন বা শোষণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভারত নূতন সাম্যতন্ত্রী সমাজ রচনায় সফলকাম হইবে।

কিন্তু আজও সেই জাতিভেদপ্রথা কত দূর টিঁকিয়া আছে, ইহার অনুসন্ধানে নৃতত্ত্ব সমীক্ষক লিপ্ত আছেন। জাতিভেদের বর্তমান অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। ভেদাভেদকে সমর্থন করা তাঁহার অভিপ্রায়ও নয়; বরং রোগের বর্তমান অবস্থা ঠিক ঠিক জানিতে পারিলে তাহা নিরাকরণের যথোচিত উপায় গ্রহণ করা আরও সহজসাধ্য হয়।

আমি বর্তমান কালে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে স্বীয় অনুসন্ধানের বশে থাকবন্দী হিন্দু সমাজের যে চেহারা দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা দিয়াছি। রিসলী, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি গবেষকগণ ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে বাঙালী সমাজের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সহিত সেই চিত্রের তুলনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সমাজে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিনা। বর্ণনায় তথ্য বেশী থাকে তত্ত্বাংশ কম থাকে। তথ্য দেখিয়া যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, সেই সমাজকে আমি সমর্থন করি তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানীর প্রতি বিশেষ অবিচার করা হয়। ডাক্তার যদি রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলেন তাহার কোন কোন অঙ্গে পচন ধরিয়াছে, তাহা হইলে ডাক্তার সেই রোগকে সমর্থন করিতেছেন, ইহা বলা সমীচীন হইবে না।

এই ভূমিকার পরে ব্যক্তিগতভাবে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব। সে

কার্য বৈজ্ঞানিক বর্ণনাকালে আমি করি নাই, করা উচিতও হইত না।

আমি থাকবন্দী হিন্দু জাতিভেদপ্রথায় বিশ্বাসী নহি, বর্তমান যুগে তাহা টি'কিয়া থাকার প্রয়োজন আছে তাহাও মনে করি না। চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে, এমন কথাও মনে করি না। জাতীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের আদর্শ আবাদী কংগ্রেসে এবং ভুবনেশ্বরে পরিপূর্ণ-ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সে সমাজ মন্ত্রবলে দু-এক বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা মনে করি না। আর্থিক ও সামাজিক সমতা বহু বেদনার মধ্য দিয়া, বহু সংস্কার চেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই মনে করি।

যাঁহারা সমসমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিবেন তাঁহাদের শক্তি কম নয়, নিজের উচ্চাধিকার কেহ সহজে ছাড়িয়া দিতে চায় না। এরূপ অবস্থার মধ্যে বাঙ্গালা দেশের জাতিভেদসঙ্কুল সমাজে যে-সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহার মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

একসময়ে নমঃশূদ্র বা নমঃব্রাহ্মণ জাতিকে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা উচ্চবর্ণজাত স্মৃতিকারগণ করিয়াছিলেন। আজ সে চাপ নানা ঐতিহাসিক কারণে শিথিল হইয়াছে। বহু শিল্পাশ্রয়ী জাতিকে অজলচল শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হইত। তাহাও আংশিকভাবে শহরে শিথিল হইয়াছে, গ্রামে সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। যোগী জাতি (যাঁহাদের 'যুগী' আমি বলি নাই, সেন্স্যাস রিপোর্ট আদিতে যাঁহাদিগকে ঐ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে) স্বীয় চেষ্টায় সমাজে উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শাসনের বাধা তাঁহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

ইহা সত্ত্বেও যাঁহারা গ্রামাঞ্চলে সমাজ গঠনের বিষয়ে গবেষণা করেন তাঁহারা লক্ষ করিয়াছেন যে, কুসংস্কার এখনও দূর হয় নাই। যোগী, নমঃব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির সামাজিক মর্যাদায় ইতরবিশেষ ঘটিলেও তাঁহাদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ ঘটিতেছে না, ব্যক্তি সমাজের দৃঢ়বন্ধন হইতে অন্তত বিবাহাদির ব্যাপারে মুক্তিলাভ করে নাই। সমসমাজের সর্বোত্তম লক্ষণ হইল, ব্যক্তি সমাজশৃঙ্খল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিবে এবং বিবাহে শ্রেণীগত বাধানিষেধ থাকিবে না।

কিন্তু শুধু গ্রাম্য সমাজে নয়, কলিকাতার মত প্রগতিশীল সমাজেও দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত নাঈ-ব্রাহ্মণ, নমঃব্রাহ্মণদের বিবাহাদি দুর্লভ। সুবর্ণ-বণিক, গন্ধবণিক আদি বৈশ্যবর্ণের মধ্যে পারস্পরিকভাবে তাহা অনুরূপ দুর্লভ। ভূমিজ-ক্ষত্রিয় (পুরুলিয়ায় বাস) এবং ব্যগ্র-ক্ষত্রিয়দের (হুগলী-আদি জেলায়) বিবাহ হয় না বলিলেই চলে। অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের কথা বাদ দিলেও, শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও বিবাহের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। যে সংস্কারটুকু আজ পর্যন্ত নাঈ-ব্রাহ্মণ, নমঃব্রাহ্মণ, যোগী, গন্ধবণিক, প্রভৃতি সমাজে বিগত শতবর্ষের (বা তাহার কম) চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে তাহার তিনটি লক্ষণ :

(ক) পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি এবং শিক্ষার সুযোগ লইয়া বিভিন্ন জাতি স্বীয় সংকীর্ণ জাতীয় বৃত্তির বেড়া অতিক্রম করিয়া ওকালতি, ডাক্তারি বা নূতন নূতন ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

(খ) নিজেদের জাতির অভ্যন্তরে যে-সকল শাখা-উপশাখা আছে, যাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিত না, সেগুলি মিটাইয়া মুছিয়া বিবাহের চল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় নাই।

(গ) থাকবন্দী হিন্দু সমাজে শতাধিক বর্ষ পূর্বে ব্রাহ্মণ শাসনের ফলে যাঁহাদের 'অজলচল', 'অস্পৃশ্য' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইত, সে-সকল বাধানিষেধ বিদূরিত হইতেছে। ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা বর্জন আমাদের লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার অন্যথা ঘটিলে আইনত দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

এই বিষয়ে সংস্কার-প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা অধিক সফল হইয়াছে।

কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে আমাদের লক্ষণীয় যে, যখন কোনও জাতিবিশেষ তথাকথিত 'নিম্ন' থাক হইতে উচ্চ থাকে আরোহণ করিবার চেষ্টা করেন, তখন তিনি তো থাকবন্দী সমাজের মধ্যেই স্বীয় জাতির স্থানের ইতরবিশেষ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বাঙ্গালা ও বিহারের মুসলিম সমাজের উদাহরণ লওয়া যাউক। মুসলিম সমাজে গ্রামদেশে জাতিভেদের মত একটি ব্যাপার

আছে। মোমিন বা জোলা, নিকারী বা মৎস্য ব্যবসায়ী, এবং সৈয়দের মধ্যে শ্রেণীগত ভেদ বর্তমান। সৈয়দ মোমিনের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু মোমিনকে জামাই করেন না। অকস্মাৎ যদি নিকারীরা বলেন যে, স্বয়ং পয়গম্বর মৎস্য ধরিতেন (তাহার উল্লেখ ইতিহাসে আছে), অতএব নিকারীরা জাতিতে সৈয়দগণের অপেক্ষা নীচু নয়, তাহা হইলে সামাজিক আন্দোলনের ফলে হয়ত শ্রেণীবিভক্ত মুসলিম সমাজে নিকারীর স্থানের পরিবর্তন ঘটিবে, কিন্তু তাহার দ্বারা শ্রেণীবিভাগ মিটিয়া যাইবে না। সুখের বিষয়, গত ৩০ বৎসর মুসলিম সমাজে সকল শ্রেণীভেদ মিটাইয়া ফেলিবার সফল প্রচেষ্টা হইতেছে।

কিন্তু ইহার সমতুল বাঙ্গালার গ্রাম্য হিন্দু সমাজে ঘটিতেছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। শহরাঞ্চলে হয়ত বা কিছু ঘটিতেছে। কিন্তু সে চেষ্টাও প্রধানত থাকবন্দী সমাজে কে কোথায় বসিবে তাহারই জন্য আন্দোলন। ইহার যথেষ্ট ফল ইতিমধ্যে ফলিয়াছে। ইহাতে কি হিন্দু সমাজ জাতিভেদপ্রথার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেছে, না জাতিভেদপ্রথার পরোক্ষ স্বীকৃতির দ্বারা তাহার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবস্থা সৃষ্ট হইতেছে?

সমসমাজের প্রতিষ্ঠা জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে যখন আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, তখন বর্ণভেদপ্রথার সুসংস্কৃত এক সংস্করণকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন কি? তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন নরসুন্দর বা সভাসুন্দর জাতি ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যেই স্থান পাইবার জন্য অভিলাষী কেন? শক্তিশালী কর্মঠ বাগদি জাতি (ব্যগ্রক্ষত্রিয়) ক্ষত্রিয়বর্ণের বেড়া ভাঙ্গিয়া মুক্ত না হইয়া সেই বেড়ার মধ্যে বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? ধর্ম-ঠাকুরের উপাসক বিখ্যাত ডোম পুরোহিত-গণ কি জাতিভেদপ্রথার মধ্যেই ব্রাহ্মণের মর্যাদা সহ চিরকাল বসবাস করিতে চান?

এরূপ সংস্কার জাতিভেদপ্রথাকে কায়েমী করিবে, সমসমাজ প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যতে নানাবিধ বাধার সৃজন করিবে। ইহাই আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় অভিমত। জাতিভেদ-প্রথার কাল বিগত হইয়াছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের কৌলীন্য বা ক্ষত্রিয়বর্ণের কৌলীন্যের পরিবর্তে বৈশ্যবর্ণের কৌলীন্য বা ধনকৌলীন্য পূর্বাপেক্ষা অনেক সুদৃঢ় হইয়াছে। জাতিভেদপ্রথা হইতে ব্যক্তিকে যেমন মুক্তি দিতে হইবে, ধনকৌলীন্য বা রাজনীতির বলের উপরে প্রতিষ্ঠিত এক নূতন কৌলীন্য হইতেও সমাজকে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। তবেই পৃথিবীতে মানুষ মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে।

সে আদর্শের কথা দূরে থাকুক। নৃতত্ত্বের সামান্য গবেষক হিসাবে বাংলার গ্রামে বৎসরের পর বৎসর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, মেদিনীপুর বা দিনাজপুরের মত প্রান্তদেশে, এমন কি কলিকাতা বা বর্ধমানের মত শহরেও জাতিভেদপ্রথা কায়েমী হইয়া বসিয়া আছে। মর্যাদায় কিছু ইতরবিশেষ ঘটিলেও সংস্কারপন্থীগণ এক বর্ণ ছাড়িয়া অন্য বর্ণে একটু জায়গা করিয়া লইতে চান। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ইহার বিশেষ বিরোধ সাধন করিয়া থাকেন।

এইসকল প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য যদি বিবৃত করি তাহার অর্থ কদাপি এরূপ হইতে পারে না যে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহা সমর্থন করি। বরং রোগ যে কত গভীর, কত ব্যাপক, স্বদেশী যুগ হইতে ৬০ বৎসর রাজনৈতিক বিপ্লবসাধনের পরেও সমাজ যে কত অ-নড় স্থিতিশীল রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উপর্যুক্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল।

যাঁহারা দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে বা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে স্থিতিশীল জাতি-ভেদপ্রথাসঙ্কুল সমাজের সমর্থক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এই ভাবিয়া যে, রোগের বর্তমান অবস্থার বৈজ্ঞানিক বর্ণনা রোগের স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা নয়।

গানের আসর

খেয়াল গানে বাদীস্বর

খেয়াল গান শুনে অনেকেই একটা নালিশ জানান যে বাদী সম্বন্ধে ওস্তাদরা শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালন করেন না। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি রাগের যে একটি করে বাদী স্বর গুরু পরম্পরা শুনে আসা হচ্ছে, গাইবার বেলায় দেখা যায় সেই স্বরকে বাদী হিসাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে বাদী স্বর যে কোন্‌টি হবে তা নির্ণয় করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রশ্নটি সত্যিই জটিল। আরও জটিল হয়েছে এই "শাস্ত্রীয়" শব্দটির কল্যাণে। আসলে শাস্ত্র যে কী তাই আমাদের জানা নেই। কয়েকটা শাস্ত্রীয় শব্দ আমাদের জানা আছে, আর তাই আমরা সব বলে ভেবে নিই। শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করা যায় তাহলে কেন যে খেয়াল গানে বাদীস্বর যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় না তার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

আমাদের সংগীত ছিল সংগঠনমূলক। সংগীতের আকারটা এমনি ছিল যে তার কোনো অংশে বিচ্যুতি ঘটলে সংগীতের স্বরূপটাই বিকৃত হত। "বাদী" শব্দটা যখন ব্যবহার করা হত তখন গান গাওয়া হত সংস্কৃত ভাষায় অথবা প্রাকৃতে। মাগধী গীতের তখন প্রাধান্য ছিল। এখন আমরা যেমন হিন্দী বা বাংলা গানে রাগ প্রয়োগ করি তখন সংস্কৃত বা প্রাকৃত গানে "জাতি" প্রয়োগ করা হত। বাদীস্বর ছিল এই জাতি গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখনকার গানের মত তান-বিস্তারের বাহুল্য তখন ছিল না। গানটুকু খুব নিয়ম বাঁচিয়ে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে গেয়ে যাওয়া হত। অতএব বাদী-স্বরকে রক্ষা করতে গেলে ঠিক সেই কাঠামোর প্রয়োজন—তা না হলে বাদী স্বর বলে একটা কিছু থাকলেও তাকে ঠিক চেনা যাবে না। ধ্রুপদ যদি খুব গোঁড়াভাবে গাওয়া যায় তাহলে বাদীস্বর নির্ণয় করা সম্ভব কারণ তাতে সংগঠনের প্রাধান্য থাকবে কিন্তু খেয়ালে তা সম্ভব হয় না।

এই জাতিপ্রযুক্ত গীতগুলিকে বলা হত প্রকরণ। প্রকরণের সব অংশই যে বাক্যে গঠিত হত এমন নয়, কেবলমাত্র বাক্যাংশকে বলা হত পদ বা বস্তু। কোনো কোনো গানে অনেকগুলি পদ থাকত আবার কোনো কোনো গানে থাকত একটি মাত্র পদ। গীতের এক একটি খণ্ডকে বলা হত বিদারী। এই একটি বিদারীর মধ্যেই জাতির সব লক্ষণগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হত।

এই যে জাতি সহযোগে গান গাওয়া হত—এর লক্ষণ ছিল দশটি—গ্রহ, অংশ, তার মন্দ্র ন্যাস অপন্যাস সংন্যাস বিন্যাস বহুত্ব এবং অল্পত্ব।

যে স্বর দিয়ে পদ আরম্ভ হত সেটিকে বলা হত গ্রহস্বর এবং বাদীস্বরই হত গ্রহস্বর। যে স্বরে গীতটি সমাপ্ত হত তাকে বলা হত ন্যাস স্বর। যে স্বরে গীতের একটি বিদারী বা খণ্ড শেষ হত তাকে বলা হত অপন্যাস স্বর। যে স্বরটি বাদী স্বরের সহযোগী এবং গীতের প্রথম বিদারী বা প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক তাকে বলা হত সংন্যাস স্বর। বিন্যাস স্বরটিও বাদীর সহযোগী তবে এটি বিদারীর শেষে প্রযুক্ত না হয়ে বিদারীস্থিত একটি পদের শেষে প্রযুক্ত হত।

জাতি গানে যাকে অংশস্বর বলা হত সেটি হচ্ছে বাদীস্বর। আমরা জানি যে বহুল প্রযুক্ত স্বরটি হচ্ছে বাদীস্বর। কিন্তু এই বহুল প্রয়োগের একটা বিশিষ্ট রীতি ছিল। সেই রীতি অনুসরণ না করলে বাদী বা অংশ স্বরের কোন সার্থকতা অনুভব করা যেত না। এর শাস্ত্রীয় বর্ণনা হচ্ছে এই রকম ঃ—

যে স্বরটি সংগীতে রঞ্জকত্ব প্রদান করে,

গীতখণ্ডে বা বিদারীতে যার সংবাদী বা অনুবাদীর বাহুল্য থাকে, যার থেকে তার এবং মন্দ্রের অবস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়, যে স্বয়ং স্বয়ং বা যার সংবাদী, অনুবাদী স্বর প্রভৃতি ন্যাস, অপন্যাস, বিন্যাস এবং গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয় প্রাধান্য এবং যোগ্যতা অনুসারে সেই বহুলপ্রযুক্ত স্বরটি বাদী বা অংশ বলে স্বীকৃত হয়।

এই বর্ণনা থেকে ধারণা করা যাবে বাদীস্বরকে কত রকম সম্পর্ক বজায় রাখতে হত। এই সম্পর্কগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করে বহুল প্রযুক্ত হলে তবে তা বাদীস্বর বলে নির্ধারিত হত নতুবা নয়। বাদীর সংগেই আর একটি শব্দ আছে. সেটিকে বলে "বহুত্ব"। কোনো কোনো স্বরকে বহুলভাবে স্পর্শ করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাকে বলে অলংঘন! আবার কোনো কোনো স্বরকে বারবার আবৃত্তি করার দরকার হয়। একে বলে অভ্যাস। যে স্বরটি অলংঘনের পর্যায়ে পড়ে তাকে প্রায় অংশস্বরের তুল্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এর অপর নাম ছিল "পর্যায়াংশ" অর্থাৎ অংশের পর্যায়ভুক্ত। গানের গতি এবং ভংগী অনুসারে এই স্বরটিকে বার বার প্রয়োগ করতেই হয়। এখন এই রকম একটি স্বরের বারম্বার প্রয়োগ হলে আর একটি স্বরও সংগতি-রক্ষার জন্য অনেক বার প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এইটি হচ্ছে অভ্যাস। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাদী ছাড়াও বাদীর মতই অপর স্বরও প্রযুক্ত হত। কালক্রমে এতটা সাবধানতা অবলম্বন করে স্বরপ্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি —এই কারণেই বাদীস্বরের প্রয়োগে অনেক গোলমাল থেকে গেছে।

শাস্ত্র অনুসারে এ কথাও জানা যায় যে. সেকালের গানে বাদীস্বর পালটানো যেত। একই জাতিতে ভিন্ন অংশস্বর নির্ধারিত হতে পারত। বলা বাহুল্য সে-ক্ষেত্রে সমস্ত আনুষংগিক স্বরগুলিও পরিবর্তিত হত। বর্তমান রাগসংগীতেও এটি ঘটে থাকে।

রাগসংগীত যখন প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন জাতি সংগীতের সংগে তার বিশেষ প্রভেদ ছিল না কেবলমাত্র কতকগুলি আচরণ রহিত হয়েছিল। সুতরাং তদানীন্তন রাগসংগীতে স্বরের বিন্যাস পূর্বের মতই ছিল। বহু পরবর্তীকালে, যখন ধ্রুপদ সংগঠিত হয়, তখনও গানের গতি এবং ভংগী এমন ছিল যে, তাতেও অন্যান্য স্বরের সংগে [illegible]পাত রেখে বাদীস্বর নিরূপণ করা যেত। কিন্তু খেয়ালগানে তার তেমন সম্ভাবনা রইল না। এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, খেয়ালের গতি, প্রকৃতি চঞ্চল। এতে তানের বাহুল্য রয়েছে। যে রক্ষণশীলতায় বাদীস্বরের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হয় সেই রক্ষণশীলতা খেয়ালগানে নেই। অতএব স্বাভাবিকভাবেই খেয়ালে বাদীস্বরকে যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে রাগসংগীতের অন্তর্নিহিত লক্ষণ অনুসারেই স্বরের ক্রমিক গুরুত্ব যে-কোনো একটি রাগে খানিকটা থাকেই—সেইটুকুই খেয়াল গানে রক্ষা করা যেতে পারে। বাদীস্বরকে ঠিকমত রক্ষা না করার জন্য খেয়ালিয়াকে দোষ দেওয়া বৃথা, কারণ খেয়াল গান অনেক বাঁধাবাঁধি থেকে মুক্তি নিয়েছে। খেয়ালে স্বরের সংগতি খেয়ালের ধর্ম অনুসারে নিরূপিত হবে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি।

শার্ঙ্গদেব

মহেনজোদারোর একটি পৃথিবী-বিখ্যাত শীলমোহরের ছবি। উপরে সিন্ধু লিপি

দিল্লির ডায়েরি

সুধাংশুবাবুকে দেখলে বোঝা যায় না। অতি সাদাসিধে মানুষ, কোথাও কোনো পাণ্ডিত্যের ভান অথবা অভিমান নেই, সহজ, সরল শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের একজন। কিন্তু প্রচণ্ড অধ্যবসায় এবং চমৎকার "কমনসেনস" তাঁকে হয়তো একদিন পৃথিবীর নামকরা লোকদের শ্রেণীতে সম্মানের সঙ্গে বসাবে।

আমাদের শচীন ভাই আমাদের মুখ ঝামটা দিয়ে বলতেন—এই সূত্রে যদিও নয়—"তোমাদের কী! রোশনি আর জেল্লা না থাকলে তো তোমাদের চোখে কিছু পড়ে না। যারা হাতে-মুখে কথা বলে, দশটা বড়লোকের নাম যাদের মুখ থেকে খসে প্রতি পাঁচ মিনিটে, তোমাদের কাছে, মানে বলছি, তোমাদের জেনারেশনটায়, তারাই হল একেবারে হিরে, ঐ ধরো গে।"

মানি, অন্তত, সুধাংশুবাবুর বেলায়। অর্থাৎ উনি হলেন শচীনদা-বিবৃত "হিরে"-দের উল্টোটি। না আছে জেল্লা, না আছে রোশনি, না আছে তাঁর পিঠে চমকানো বিলিতী (আমেরিকা সহ) ডিগ্রি। একজন ছবি-আঁকিয়ে শিল্পী, পেইনটার; কোনো সময়ে অনেক ছবি এঁকেছেন। কিন্তু আজ তাঁর শিল্প ও সাধনা গিয়ে পড়েছে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো লিপি গবেষণায়। মহেনজোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার লিপি-পাঠ উদ্ধার আর তার আগে লিপি উদ্ধার। একে মহেনজোদারো, তাতে আবার লিপি উদ্ধারের মতো কাজ! মনে হয়, কোনো একটি ব্যক্তি মস্ত এক মিউজিয়মে বসে, তাঁকে বন্দি করে রেখেছে থরে-থরে সাজানো র‍্যাকভরা ওজনওয়ালা কিতাব, আর সযত্নে রাখা নানা কাটুম-কুটুম ফটো, বিবর্ধক (ম্যাগনিফাইয়িং) কাঁচ; আর তাঁর নাকের মাঝখানটায় পুরু কাঁচের চশমা। বছর দুয়েক আগে করাচী থেকে মাইল চল্লিশ দূরে একটি মিউজিয়মে মহেনজোদারো থেকে পাওয়া অনেক জিনিস দেখেছিলাম—নানা ধরনের সিলমোহর, পুতুল খেলনা, জীবজন্তুর মূর্তি, আর তাদের গায়ে এক ধরনের উৎকীর্ণ বস্তু যে-গুলোকে সুধাংশু-বাবু এবং অন্যান্য লিপিবিদরা বলেন সিন্ধু লিপি, আর যেগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে স্রেফ রূপসজ্জা, ডেকরেশন।

সিন্ধু লিপিগুলোও দেখতে ছবির মতো, অর্থাৎ ড্রয়িং-এর মতো। এবং যে-কোনো লেখাই তো ড্রয়িং, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন চীন-জাপান কিম্বা প্রাচীন মিশর, তারা তো প্রায় পেইনটিং। এবং এই জিনিসটিই যোগসূত্র স্থাপন করেছে চিত্রশিল্পী ও টাইপোগ্রাফার শ্রীশুধাংশু রায় এবং সিন্ধু লিপির সঙ্গে। উনি আমাকে বললেন, (পাছে আমি ধরে নিই উনি হলেন স্যর জন মার্শেলের মতই একজন পণ্ডিত) : দেখুন আমি হলাম আর্টিস্ট মাত্র। এবং শিল্পীর চোখ আর মন নিয়ে আমি আজ বাসা বেঁধেছি অতি প্রাচীন সিন্ধু লিপিদের সঙ্গে। পাণ্ডিত্যের পোশাক গায়ে দিয়ে আমি লিপি উদ্ধারের কাজে এগিয়ে যাই নি, কারণ পৃথিবীর অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা এ-কাজে ফেল করেছেন। তার একটা মস্ত কারণ এই যে, তাঁরা তাঁদের প্রোথিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে ও-কাজে অগ্রসর হয়েছেন, কতগুলো সিদ্ধান্ত তাঁরা আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলেন। যেমন তাঁরা ধরে নেন, মহেনজোদারোর সভ্যতা হল দ্রাবিড় সভ্যতা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সিন্ধু লিপির ভিতর দ্রাবিড়ত্ব খুঁজতেন, আর দ্রাবিড়ত্ব দিয়ে লিপি পাঠোদ্ধার চেষ্টায় ব্রতী হতেন।

"কিন্তু আমি হলাম গ্র্যাফিক শিল্পী। আমি যেন ঐ মহেনজোদারো সভ্যতার সময়কার একটি "ছাপাখানা"র কম্পোজিটর। আমি যেন কেসে-রাখা টাইপ তুলে তুলে সাজাচ্ছি পাঁচ হাজার বছর আগেকার শীল-মোহর। আমাকে জানতে হবে কোন বাক্সে কোন্ অক্ষরটা। তাদের স্বরবর্ণ-রূপসজ্জা। আমি ঐতিহাসিক নই; আমি ঐতিহাসিকের পাণ্ডুলিপি দেখে অক্ষর সাজাচ্ছি। এই হল আমার প্রণালী।"

এটা উনি সেদিন একটা বক্তৃতাতেও বললেন এখানে ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামীর স্মৃতি বক্তৃতা হিসেবে। অনেক সুধীজনের সামনে। আমি জানিনা তাঁরা কতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন সিন্ধু সভ্যতার লিপি

চন্দ্রকেতুগড়ের একটি শীলমোহর। এর লিপি হল সেতু : সিন্ধু লিপি আর ব্রাহ্মী লিপির ভিতরে

1	ক	কা	কি	কী	কু	কূ	কৃ	কে	কৈ	কো	কৌ
2		া	ি	ী	ু	ূ	ৃ	ে	ৈ	ো	ৌ
3	অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	a	ā	ĭē	ĭīē	u	ūū	ṛ	ĕ	ēī	o	ōū

6	क का कि की कु कू के कै को कौ
7	ख खा खि खी खु खू खे खै खो खौ
8	ग गा गि गी गु गू गे गै गो गौ
9	E Ē Ĕ Ė É Ē

বাঙলা অক্ষরের বিবর্তন ও দেবনাগরীর সঙ্গে যোগসূত্র

আর দেড় হাজার বছর পরের ব্রাহ্মী লিপির সম্বন্ধ। কারণ, সুধাংশুবাবু নিজেই বললেন আমাকে, “জানেন, এই দেড় হাজার বছরের যে-ফারাক আর সেই অন্তবর্তী-কালীন লিপি-রূপ—তার উপরই আজ নির্ভর করছে আমার থিয়োরি, আমার একত্রিশ বৎসরের সাধনা।”

একত্রিশ বৎসর—সেই ১৯৩৫ সন থেকে যেদিন গুরুসদয় দত্ত সুধাংশুবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্যার জন মার্শালের তিনটি গ্রন্থ সিন্ধু সভ্যতার উপর। ঐ দিনটিই হল সুধাংশুবাবুর জীবনের এক অদ্ভুত পরিবর্তনের দিন-ক্ষণ, যে-ক্ষণে, ধরুন, রেশমী পোকা গুটির অভ্যন্তরে ঢুকে যায় তার নিজের তৈরি কারাগারে যাতে একদিন সে প্রজাপতির স্বাধীনতা নিয়ে ফিরে আসতে পারে মুক্ত দুনিয়ার, নীল আকাশের নিচে। এই চিত্রকর শিল্পীর কাছে আজ একটা মরা গরুর খুলি (মাথা) বিরাট অর্থময়। ও-থেকে উনি দেখিয়েছেন, তিনটি মানব সভ্যতার স্তর অতিক্রম করে, যে, ওটি আমাদের কালের প্রথম স্বরবর্ণ, “অ”।

তাঁকে বুঝতে পারলেন পাকিস্তানের পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর দানি, যাঁর গবেষণা অতি উচ্চ মূল্যের, তারপর ডক্টর গ্যাড, ব্রিটিশ মিউজিয়মের, ডক্টর কোকুনের, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের, সিডনি স্মিত, ম্যাককে, প্রফেসর ল্যাংডন (অকস্‌-ফোর্ড), প্রভৃতি মনীষিরা। এঁরা সকলেই প্রাচীন-লিপির ডাকসাইটে পণ্ডিত। তাঁরা আমাদের বাঙালী সন্তানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন যতোখানি গবেষণা সুধাংশুবাবু করেছেন সিন্ধু লিপি নিয়ে।

এ-অবধি সুধাংশুবাবু যা করেছেন তা হল এই : নানা রেখাময় চিত্র থেকে, চিত্রের জঙ্গল থেকে সিন্ধু-লিপিকে উদ্ধার করা। প্রথমত, শুধু অক্ষরগুলোকে, যার উচ্চারণ হয় না, ধরুন “ক”-র হসন্ত। দ্বিতীয়ত, তাদের সঙ্গাস্বরূপ স্বরবর্ণগুলোকে খুঁজে বের করা; তৃতীয়ত, যুগ্মশব্দাত্মক অক্ষর-গুলোকে বের করা; চতুর্থত, চিত্রময় অক্ষর থেকে রেখাময় অক্ষরের বিবর্তন দেখানো: পঞ্চমত, সিন্ধু-লিপি আর পরবর্তী ব্রাহ্মী লিপির ভিতরে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা।

এক-অক্ষর বর্ণমালা এবং তাদের কতকগুলির উচ্চারণ প্রকৃতি

এই পঞ্চম ক্ষেত্রেই আজ সুধাংশু রায়ের ভবিষ্যৎ। যদি উনি দেখতেন যে, ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তিও ঐ সিন্ধু লিপি থেকে, তাহলে খুলনা জেলার কাঠাল গ্রামের ছেলে, যাঁর বয়েস আজ পঞ্চান্ন, যিনি একদা ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ আর রমেন চক্রবর্তীর শিষ্য, তিনি বিশ্বের একজন অন্যতম আবিষ্কারক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করতেন।

বললেন আমার টেবিলের ওপাশে বসে, অতি সহজ সরল ভাবে: "হ্যাঁ, আমার মনে হয়, আর মাত্র একটি বছর। তাহলেই, পৃথিবীর সুধী সমাজের সামনে আমি হাজির করব আমার ফাইন্যাল মেমো—আমার তৃতীয় মেমো।"

আরো বললেন: জানেন, থিয়োরি হল যে, ভারতের গোটা ঐতিহ্যের গোড়ায় আছে সিন্ধু সভ্যতা, মহেনজোদারো। লিপিতেও, অর্থাৎ, ঐ প্রাচীনতম লিপি থেকেই উৎপত্তি, বিবর্তন, ব্রাহ্মী, প্রাচীন সংস্কৃত আর আজকের হিন্দী, বাঙলা, মারাঠী, গুজরাতী, সমস্ত ভাষার লিপি। আমাদের প্রাচীন মাতা—উনি সিন্ধু সভ্যতার মাতা, সিন্ধুলিপি, মহেনজো-দোরো।"

আমি অবাক, মানে বাঙালের মতো, চেয়ে খুলনার আরেকটি বাঙালের চোখের দিকে। সেই ১৯৩৫ সনে গুরুসদয় দত্ত হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্যর জন মারশেলের তিনটি বই। ব্যস্। তখন তিনি গুরুসদয় দত্তের নিজস্ব লোক-শিল্প সংগ্রহালয়ের ভার নিয়েছেন। বাঙলার নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন আর অবাক হয়েছেন লোক-শিল্পের চারুময়তায়। এবং হয়তো সেই সুবাদেই আজ ইনি রাজধানীর হস্তশিল্প বোর্ডের মিউজিয়মের একজন অন্যতম কর্মী।

আমি চেয়ে ছিলাম বে-ইস্ত্রি কোটের দিকে; টাই-এর গেরোর দিকে। কোথাও আর্ট নেই; আছে শুধু সরল মানুষের একটা আবরণ, যার নাম পোশাক, যেগুলো অনেক দেখেছেন সুধাংশুবাবু যখন বিলেতে গেলেন ১৯৬২-তে ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশোনার জন্যে। হয়তো সেদিনও কেউ কেউ তাঁর ভাঙ্গ-পড়া দেহাতি স্যুটের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি হেনেছে, কিন্তু সেদিন বড় বড় প্রফেসররা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন: "এগোও, গেট্ অ্যালং, গেট্ অ্যালং।"

"জানেন, বাঙলা দেশের চন্দ্রকেতুগড়? জানেন? দক্ষিণ-ভারতের সানুর? তারা আমার সেতু। সেতু, যার বয়েস হবে, ধরুন, এই হাজার দেড়েক, হ্যাঁ, তাই, জানেন, (না, আমি কিছুই জানি না, শুনেছি চন্দ্রকেতু-গড়ের নাম শ্রীপরেশ দাশগুপ্তের কল্যাণে) তারা আমার সেতু, সিন্ধু সভ্যতা, আর আর ব্রাহ্মী সভ্যতা, মানে সিন্ধুলিপি আর ব্রাহ্মী লিপির ভিতরে সেতু।

"মালমশলা আমার প্রচুর। প্রমাণ আমি করব যে, ঐ মহেনজোদারোর লিপি থেকে বিবর্তিত হয়েছে ব্রাহ্মী, আমার বাঙলা দেশের চন্দ্রকেতুগড়ের সভ্যতার সেতু ধরে, ইস্তক আমাদের সংস্কৃত লিপি। জানেন, আমাদের মাতৃদেবীকে চেনেন? আমাদের প্রাচীন মাতা মহেনজোদোরো!"

—খগেন দে সরকার

মন আজ
খুশীতে
ভরা

পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে আরো

গত পাঁচ বছরে জাতীয় আয় যে বার্ষিক শতকরা ৫ হারে বৃদ্ধি পাবে আশা করা হয়েছিল, প্রকৃত পক্ষে তার অর্ধেকেরও কম হারে জাতীয় আয় বেড়েছে। আভ্যন্তরিক উৎপাদনে ঘাটতি এবং মোট ব্যয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে বলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ তিন বছরে সাধারণ মূল্যসূচক শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আভ্যন্তরিক সঞ্চয়

১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫২ ভাগের সমান মূলধন বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাটানো হয়েছিল; এর সবটাই এসেছিল আভ্যন্তরিক সঞ্চয় থেকে। তৃতীয় যোজনার শেষে মূলধন নিয়োগ ও জাতীয় আয়ের অনুপাত বেড়ে শতকরা ১৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরিক সঞ্চয় ও জাতীয় আয়ের অনুপাত কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে—১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৯ ভাগ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা প্রায় ১০·৫ ভাগ হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিযুক্ত মূলধন সংস্থানের ব্যাপারে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি আশানুরূপ না হওয়ায় এবং ভোগের উপর সরকারী ব্যয় বেড়ে যাওয়ার ফলে আভ্যন্তরিক সঞ্চয় বৃদ্ধি যে শ্লথ হয়ে এসেছিল সেটাই তার জন্য মূলত দায়ী।

শিল্প-উন্নয়নের দিক থেকে দেখলে, এ কথা অবশ্যমান্য যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে দ্বিতীয় যোজনার আরম্ভ হতে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক দ্রব্য, সার ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্য শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

অর্থসংস্থানের সম্ভাবনা

চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ-সংগ্রহের প্রধান উপায়গুলির মধ্যে আছে : বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অনুরূপ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত মূলধনের উপর বছরে শতকরা ১১ ভাগ আগম অর্জন; আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৈচিত্র্যকরণের সঙ্গে সঙ্গে যে সব বিবিধ নতুন দ্রব্য উৎপন্ন হবে তাদের উপর আবগারী শুল্ক বসিয়ে বাড়তি অর্থসংগ্রহ; কৃষির উপর ধার্য করসমূহের পরিবর্ধন, জলসেচ বাবদ কর আদায় এবং বাণিজ্যিক শস্যের উপর বিশেষ শুল্ক আরোপ। যাতে আভ্যন্তরিক উৎপাদনকারীরা অকারণে প্রভূত লাভ না করতে পারে এবং যোগানের একটা বড়ো অংশ রপ্তানি সম্প্রসারণে নিয়োজিত হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর-ব্যবস্থার রদবদল করার যে এখনো সম্ভাবনা আছে এ কথা পরিকল্পনার খসড়া-লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে।

আয় ও সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের বণ্টনে যে অসাম্য আছে তা কমিয়ে আনার ব্যাপারে বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি। ধন-সম্পত্তির উপর অর্থাৎ বিত্তবানদের উপর কর বসাবার যে যথেষ্ট অবকাশ আছে সেটা অবশ্য খসড়া পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। শুধু সম্পদকর নয়, আয়করের আওতায় আরো বেশী লোক ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এলে এবং ওই কর-ব্যবস্থাকে আগের চাইতে কার্যকর করলে কেবল রাজস্ব সংগ্রহ নয়, ভোগ-সংকোচন সম্ভব হবে।

অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এরকম অভাব বা অসুবিধাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে এবং সেই বাধাসমূহ দূর করতে যা সময় লাগবে সেটা ধরে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনামূলক প্রচেষ্টাকে বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। একেবারে বর্তমানে যে সব বাধাবিপত্তি বড়ো করে দেখা দিয়েছে, সময়মতো সিদ্ধান্ত নিলে এবং তৎপরতার সঙ্গে কাজকর্ম করলে সেগুলি ক্রমশ অতিক্রম করা যাবে। বস্তুত, ভোগ, সঞ্চয়, কর্ম, স্বদেশীয়ানা ও রপ্তানির প্রতি আমাদের মনোভঙ্গী বৈষয়িক অগ্রগতির সাফল্য নিরূপণ করবে।

আবার, পরিকল্পিত উৎপাদনে যথাসময়ে পৌঁছানো গেল কিনা কেবল তার থেকে আর্থিক উদ্যোগের সাফল্য স্থির করা যাবে না ; কেননা, আরো গভীরে যে সব গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে সেগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নির্বাচনমূলক নীতি

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, একটা নির্বাচনমূলক নীতি অনুযায়ী আশু-প্রয়োজনীয় কয়েকটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করা এবং সমগ্র পরিকল্পনাকালের ভেতর

আমাদের উদ্যম পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত করে দেওয়ার দরকার দেখা দিয়েছে। সুখের বিষয়, আগের তিনটি পরিকল্পনার সময় আর্থিক ব্যবস্থার প্রায় সব প্রয়োজনীয় অংশে একটা কাঠামোর মতো গড়ে উঠেছে—যার ফলে ওই অংশগুলিতে অন্তত জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমান হারে বৈষয়িক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব। চতুর্থ যোজনায় তাই আগের পরিকল্পনাগুলির চাইতে অঞ্চল ও অংশগুলির আরো বেশী নির্বাচনমূলক উন্নয়ন করা যাবে।

নির্বাচনমূলক নীতি অনুসারে প্রকল্পগুলি বাছার ব্যাপারে, সেগুলির অর্থসংস্থান ও প্রশাসনের বেলা অনেক বেশী শৃংখলা পালন করতে হবে। যে সব উপাদান ও উপকরণের অনটন আছে সেগুলির নিয়োগ থেকে সর্বাধিক আগম পেতে হলে পরিকল্পনার কার্যক্রমকে উপযুক্তভাবে বিস্তারিত করে দিতে হবে। যে প্রকল্পগুলির কাজ ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়েছে, সেগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে। সেই সংগে, আনুষঙ্গিক অন্য সব প্রকল্পের অগ্রগতি যাতে মসৃণভাবে এবং সমতালে চলে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

শান্তিকুমার ঘোষ

মীরা মুখার্জির ভাস্কর্য/গ্যালারী কেময়ুলড

ঢোকরাদের কাজগুলি যখন আমরা দেখি তখন সেগুলিকে ভালবাসি, কেননা এগুলিতে খুব ছোটর মধ্যে অদ্ভুত কেয়ারি—ভারী ঠাণ্ডাকাজ—বড় অর্থে দু পাঁচ সের ঢালাই কখনও দেখিনি; আকারে বড়র দিক থেকে যা গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়—তা পাই মাপের আধার।

এসব কাজের মধ্যে—যেহেতু অনবরত রেখা ঘুরে ঘুরে যে কোন নির্দশন ওতপ্রোত—অবাক আলোর খেলা হয় এবং চমৎকার ভাবে তার সবটাই ডাইমেনসন এসে দেখা দেয়। এ ছাড়া মনোগত আবেগও দেখা যাবে তারা বাদ দেয় নি। তার সংগে নিদর্শনটির সংগে যে মায়িক সম্পর্ক, সেটি যে বড় আদরের সেই কথারও জানান সকলেরই চোখে পড়বে—কোথাও প্যাঁচার নাকে নথ কোথাও হাতীর কানে দুল।

শ্রীমতী মীরা মুখার্জি, সেখানেই ফিরে গেছেন যেখানে ঢোকরারা শুদ্ধ পদ্ধতি, যেখানে ঢোকরারা কিছু ভাবুক—এ কথা বললে গর্হিত হবে। নিশ্চয়ই ঢোকরাদের করা অভাবনীয় শ্রীশ্রীদুর্গা মূর্তির কল্পনা—(যা ২ই"×৩"র মধ্যে কাঠামো নিয়ে নির্মিত) ফলত আভাস মাত্রিক—অর্থাৎ বিমূর্ত, তা শ্রীমতী মুখার্জিকে আকর্ষণ করেছে। যে অতটুকু হয়েও কি করে ঐ মূর্তি বিরাট বৈচিত্র্যে সকল গুণ সমন্বিত।

এবং তার অন্যান্য জিনিসের বাস্তবতা, তাদের কাজ-কেয়ারি শ্রীমতী মুখার্জিকে ভাবিত নিশ্চয় করেছে; কিন্তু এখানেই তাঁর নিশ্বাস সরল হয় নি; কেন না, তিনি কোন ঐতিহাসিক শুরুতে ফিরে যেতে চান নি কিছুতেই—তিনি যা চেয়েছিলেন তা হচ্ছে তারও আগে যেতে, গভীরে যেতে, আদিম সত্যে পৌঁছতে—যেখানে একটি যন্ত্রত্ব আছে এবং এখানে তাকে বেড় করে কোন জড়তা অস্পষ্টতা ঝাপসা কিছু নেই।

এই যন্ত্রত্ব তাঁর হেতু যা তাঁর অতি-আধুনিকতা বোধকে, তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাঁর হাতের ঈর্ষাদায়ক চাতুর্যকে একীভূত করেছে। এই কথা শ্রীমতী মুখার্জির নির্মিত ক্ষুদ্র আকারের নির্দশন থেকে প্রায় ৬ ফুট লম্বাতেও প্রমাণিত। তাই তাঁকে মহিলা ভাস্কর না বলে শুদ্ধ ভাস্কর বলাই উচিত।

আমরা তাঁর কাজ দেখার কোন সুযোগ এ-যাবৎ পাই নি; তাই এবার তাঁর প্রদর্শনী দেখে সত্যই একাধারে চমৎকৃত ও আনন্দিত হয়েছি। প্রত্যেকটি বস্তু নিশ্চয় কথা কয়—এ ধারণা হয়েছে। সব থেকে বিস্ময়কর এখানেই যে ভাস্কর্যের জন্য আবহমান কাল থেকে এত শত মাধ্যম রয়েছে যেগুলি প্রাকৃতিক, সেগুলির একটাও না বেছে নিয়ে হঠাৎ ঢালাই কেন?

বিশেষত ঢালাই ঘরে যাওয়া তার থামালে কিছুক্ষণ থাকা—তার 'নীল-ঘরে'র রহস্যময় গরম যে কোন মানুষকে পাগল করে তুলবে। হয়ত এই সূত্রে অনেকেই বলবেন—'আপনারা যেটা উল্লেখ করছেন সেটা লোহা ঢালাইয়ের ব্যাপার।' কিন্তু আমরাও বলব, যাঁরা রাস্তার ধারে সাইকেলের চাকার হাপরে সের-দু-সের মুচি-র কাজ-করা-যায় ঢালাই দোকান দেখেছেন—যেখানে, পেপার ওয়েট, ধুপদানি ইত্যাদি ছোটখাট জিনিস তৈরি হয়; তাঁরা সত্যই বিরাট মূর্তি—মণ খানেক কি তারও বেশী নন-ফেরাস ঢালাই কারখানা যে কি তা ভাবতেও পারবেন—সেখানে অজস্র কালো কালো মুখ অজস্র মুখোত্থিত ভয়ংকর বৈদ্যুতিক তৎপরতা।

শ্রীমতী মুখার্জি ঢালাই ঘরের আপ দিনের পর দিন সহ্য করেছেন, ইদানীং হয়ত তা স্বাভাবিক! কিন্তু তবু এতগুলি ঢালাই কাজ এক সংগে দেখে আমরা থ হয়ে যাই। এই কথা অবশ্যই মনে পড়ে একটি নিদর্শন তাঁর ভাবনা মতন পেতে পর পর কত ঢালাই, একই জিনিসের তাকে করতে হয়েছে।

আরও বিশেষত যেখানে মোম-সুতোর কাজ আছে। এই সুতোর সৌন্দর্য ঢালাইয়ের দোষে সহজেই বিনষ্ট হয় এবং বিশেষত যেখানে একই সংগে পাঁচ দশ সের দানবিক গলা পিতলের ভয়াবহ দুর্দান্ত স্রোত ঘুরে যায়, বুদ্ধিসম্মত নালী সেই অব্যাহত গতিকে রোধ করতে পারে না।

শ্রীমতী মুখার্জির কাজ এক সীমিত ব্যাপার থেকে আর এক সীমিত ঘটনায় রূপান্তরিত। নিজেকে এমন এক সর্বাঙ্গীন পরীক্ষার মধ্যে এনে ফেলা বড় কম কথা

দি ভ্যান্স —কুমারী ডি মিরুরো

নর, বহু রূপ আমরা দেখেছি—কিরকি হার, সাগর দিঘী, চেলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই খেলা।

কাজ কেয়ারির (ডেকরেশন) অতীব চালাক আরোপ প্রতিটি কাজেই ছিল, কোথাও পরনের স্বল্প পরিসর স্থান জুড়ে, কোথাও গহনার এই কাজ-কেয়ারি একাধারে রূপকতা (ফ্যানটাসী) ও রোন্দুর দু-ই দিয়েছে। সব থেকে আরও আমাদের আকর্ষণ করে তাঁর ডাইমেনসন বোধ—কোথাও অল্প দেহ মোচড় দিয়ে সেটা আনা, অথচ তার তলাই কাজ-কেয়ারির তবু কনটিনুইটি নষ্ট হয় নি।

এ ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে অবয়বগুলিকে দারুণ নাটকীয় করে নির্মাণ করে বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করেছেন। কেন না, নাটকীয়তার মধ্যে একটা কন-ট্রাস্ট জাতীয় ভাব আছে অর্থাৎ সম্মুখীন করার আহ্বান থাকে (ফ্রনটাল)। তবুও আমরা দেখব এগুলির গুণ কখনই শ্রীহীন হয় নি। নাটকীয়তা অদ্ভুতভাবে ডাইমেনসনের উপর দিয়ে গেছে।

শ্রীমতী মীরা মুখার্জি'র কাজ আমাদের আনন্দিত করেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আবার য়ুরোপ চলে যাচ্ছেন।

*

কুমারী সুজানা ডি মিরুরো'র আঁকা চিত্রপ্রদর্শনী। একাডেমই অফ ফাইন আর্টস

কুমারী ডি মিরুরো একজন আরজেন-টিনা বাসী। ইনি সম্প্রতি ভারত সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে এখানে এসেছেন মিউরাল-চিত্র পদ্ধতি শিক্ষা করতে।

ইনি একজন পাকা শিল্পী। কেননা দেখা যাবে এখানে আসার পূর্বেই তাঁর চিত্র প্রদর্শনী ১৯৫৫ সালে বুনস আয়রারসের গালেরী মিউলার থেকে আরম্ভ করে বাহিয়া ব্লাঙকায়, মার প্লাতায়, উরুগুয়ের বিভিন্ন গ্যালারীতে হয়ে আসছে। এবং তিনি কুরুজু বুষাটিরা আরজেনটিনার-সালন নাসিওনাল পুরস্কার লাভ করেছেন।

এ ছাড়া আরজেনটিনার বিভিন্ন মিউ-জিয়ামে যথা, মিউজিও ডে বেলাস আরতুস ডি লা বোকা, মিউজিও ডি জন দিল, মিউজিও ডি রোঝারিও ইত্যাদিতে তার কাজ স্থান লাভ করেছে।

এখন দিল্লীতে এসে মিউরাল চিত্র পদ্ধতি শিখলেও তিনি আধুনিক শিল্পধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত, একথা তাঁর ছবি দেখলে বুঝা যায়। তিনি চিত্রত্ব, অর্থাৎ শীষটান ও আনু-ভূমিক সত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। অতএব রঙ সম্পর্কে আধুনিক মীমাংসা সহজেই আন্দাজ করা যায় যে তিনি জানেন।

কিন্তু দিল্লীতে কে বা কারা তাঁকে মিউরাল শেখায়—অবশ্য কলকাতায় হলে একই দশাই হত—তা আমরা জানি না। ফলে রঙ আমাদের মোটেই আনন্দিত করে নি। অথচ তিনি ইচ্ছে করলে যেমন বিবেচনার পরিচয় দি উভসে দিয়েছেন তেমন অন্য ক্ষেত্রেও করতে পারতেন।

তবে একটা কথা এখানে আসতে পারে, এত ছোটতে মিউরালের কিই বা আসতে পারে? বড় জোর ছোট দুরেকটা কাজ কেয়ারি যথা ফুল পাখি ইত্যাদি। যাই হোক এখানে সব বিষয়ই বলতে গেলে ভারতীয় শাড়ির লাইন, কাপড়ের রেখা তাঁর কাজকে ছন্দিত করেছে।

সর্বসমেত এই প্রদর্শনীতে তাঁর ২৭টি কাজ ছিল। তার মধ্যে কনফিডেনসের সংস্থান, ও দি উভসের গীতিময়তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ছাপা কাগজের একটি নমুনা
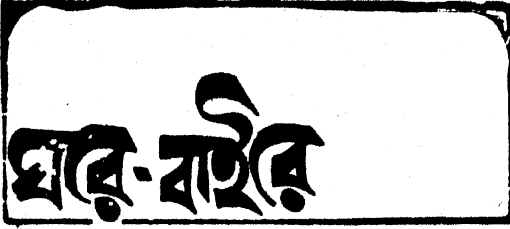
হাতের কাগজে হাতের ছাপা

সভ্য জগতের সবচেয়ে সাধারণ জিনিস কাগজ। হাজার হাজার চিঠি নিত্য লেখা হয়, লক্ষ লক্ষ বই ছাপা হয়, কোটি কোটি খবরের কাগজ ঘরে ঘরে বিলি হয়। পৃথিবীর আর্থিক মাধ্যমের অধিকাংশই কাগজ। চেক লেখা হয় কাগজে, মানুষে মানুষে সবচেয়ে নীরব, সবচেয়ে গোপন আদান প্রদান হয় কাগজে। এই কি সব? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাগজ নিয়েছে নূতন ভূমিকা। গোলাগুলি ভরা হয়েছে কাগজের খোলে, দড়ি পাকানো হয়েছে কাগজ দিয়ে। কাগজের মোড়কে রাসায়নিক সঞ্চয় পর্যন্ত জমা করা হয়েছে।

কাগজ কবে প্রথম ব্যবহার হয়েছিল তা নিয়ে মতের অমিল আছে। এ দেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি রামদাস স্বামী হাতের তৈরি কাগজের কথা লিখেছেন। তেঁতুল-বিচির মণ্ড দিয়ে কেমন করে কাগজ বানানো হত তাও তাঁর লেখাতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে প্যাপিরাস গাছের থেকে লেখার উপযুক্ত মসৃণ আস্তরণ তৈরি হত। সম্ভবত এই প্যাপিরাসই আজকের কাগজের প্রথম সূচনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে ছাপাখানার ব্যবহার আরম্ভ হবার সংগে সংগে কাগজের ব্যবহার ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

ব্যাপক প্রসারের আর পাঁচটা জিনিসের মত কাগজও 'মেশিন' যুগের কবলে বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। পৃথিবীর বিরাট সব কাগজের কারখানা সর্বগ্রাসী প্রসার দিয়ে মানমর্যাদায় মানদণ্ডমাফিক উন্নতি করে চলেছে। কিন্তু আজও রসিক সমাজে হাতের তৈরি কাগজের আদর শিল্পের আদরের মতই বেঁচে আছে। তাই হাতের তৈরি কাগজের ছোটখাটো আয়োজন যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরাও শিল্পের খাম-খেয়ালীপনায় যন্ত্র কলকারখানার কঠিন মানদণ্ডের বাইরে থাকতে চান। এই হাতের তৈরি কাগজের নূতনরূপে পরিবেশন করেছেন বোম্বাইয়ের কয়েকজন মহিলা। শ্রীমতী ভারতী দালাল, শ্রীমতী প্রতিমা শা কাগজের প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত। শ্রীমতী শিরিণ সাবাভালা ও শ্রীমতী অ্যান মুন্দকর সেই কাগজের উপর হাতে দেওয়া ছাপের কাজ করছেন। এঁরা একজনও শিল্পী নন, তবে শ্রীমতী সাবাভালা শিল্পী জাহাঙ্গীর সাবাভালার পত্নী! স্বামীর শিল্পের সংগে তাঁর উদ্যোগের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। হাতের ছাপা কাগজ একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব সৃজনী প্রতিভার সৃষ্টি।

হাতের কাগজের নরম, বৈচিত্রপূর্ণ পটভূমিকায় নানা রং ও সোনালী, রূপোলী ছাপা অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে আর তার নূতন থেকে নূতনতর ব্যবহারের উৎসাহ আনছে রূপরসিকের মনে। খাবার টেবিলে পাততে, উপহার মুড়ে দিতে, ভোজ টেবিলে মুখ-হাত মোছার ন্যাপকিন হিসাবে ব্যবহার করতে এই ছাপা কাগজ চমৎকার। ছোট বাতির ঢাকনার উপর ব্যবহার করে দেখুন সোনালী জরির কাজের মত ঝলমল করবে, ভাল ছবি বাঁধাতে চার পাশে এই কাগজ লাগিয়ে ফ্রেম সংযোগ করুন ছবির সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। আজকাল রেশম বা ব্রোকেডে চার পাশ সাজিয়ে ছবির ফ্রেম লাগাবার যে চলন হয়েছে তার চেয়ে সস্তায় প্রায় একই রকম সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে। মাথায় বাঁধবার রুমাল, গায়ে পরবার ব্লাউজ সবই হাতের ছাপা হাতের তৈরি কাগজ দিয়ে তৈরি হয়, আর ব্যবহার হলে ফেলে দিতেও এতটুকু মন খারাপ হবে না; কারণ, খরচ তো বেশী লাগে না।

হাতের তৈরি কাগজ আমাদের দেশের একটি কুটির শিল্প। ২০০।২৫০টি কেন্দ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির সংগে গভীরভাবে যুক্ত হাতের তৈরি কাগজের সংগে যান্ত্রিক সভ্যতার যোগ হয়নি বলেই সে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। হয়তো কোন কোন কেন্দ্রে মেয়েরাও এ-প্রচেষ্টার সংগে যুক্ত। বোম্বাইবাসিনী মহিলারা হাতের তৈরি কাগজের নূতন ব্যবহার ও নূতনতর রূপে রচনা করে এ-শিল্পের ভবিষ্যতের পথে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করেছেন সন্দেহ নেই। বিদেশেও নাকি অল্প দিনেই হতের ছাপা এই কাগজের বিশেষ সমাদরের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

হাতে তৈরি কাগজের উপর বিভিন্ন প্রকারের নকশার ছাপ

মণিপুরের মীনাবাজার

যদি হাতের তৈরি কাগজে হাতের ছাপার বিষয় কারও আরও কিছু জানবার আগ্রহ থাকে, তবে তিনি শ্রীমতী শার্লট ঘোষ, শিরাণ হ্যান্ড মেড্ পেপার, ইলিসিয়াম ম্যানশন—৪র্থ ফ্লোর, ওয়ালটন রোড, বোম্বাই-১—বি, আর—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

মণিপুরের মীনাবাজার

চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুরে। শাহী অন্তঃপুরের রূপসীর হাট বছরের সেরা সুন্দরীদের মেলা মীনাবাজারের নিত্যকার সমাবেশ সেখানে। রূপসী সেখানে পসরা আনে, রূপসীরা করে কেনাবেচা। ফল পাবেন, মাছ পাবেন, শাক-সবজি পাবেন আর পাবেন মনোহারিণীদের হাতে-বোনা তাঁতের কাপড়। বিনিময় অর্থনীতি আসবার আগে গোটা মণিপুর রাজ্যের পরিধানের দায়িত্ব নিয়েছিল মণিপুরের মেয়ে। নারীর প্রধান শিক্ষা ছিল তাঁত বোনা। ঘর বর পেতে হ'লে তাঁতের মাকুই তাদের মাপকাঠি। আজও নাকি মাকুতে যার বর্ণবিন্যাস আর নকশা গড়ে ওঠে অনায়াসে, সে মেয়ের কদর বেশী।

বারান্দায় রাখা তাঁতে সুতোর টানা লাগিয়ে ঘরণীরা ছোটে আর পাঁচটা পসরা-পণ্য আনতে। ছোটখাটো কারবারে তাদের একচেটিয়া অধিকার। দূরে পল্লী অঞ্চলের অল্প পসরার তরকারি, আনাজ, ফলমূল, শাক, মাছ নিয়ে আসে তারা ইম্ফলের বাজারে। ইম্ফল শহরবাসিনী মাইল দশ-বারো পথ বেয়ে আনাজ এনে সাঁঝের বাজারে ধরে দেয় খরিদ্দারের সামনে এমন দৃষ্টান্তও অল্প নয়। দাম-দর চেঁচামেচি তারা সহ্য করে না। বেশী বাড়াবাড়ি হ'লে খরিদ্দারের গায়ে জল ছিটিয়ে দু' কথা শুনিয়ে দেবে—বিশেষ যদি সে খরিদ্দার পুরুষ হয়। বাদশাহের মীনাবাজারের মত তাদের শখের বাজার তো নয়। এ তাদের জীবিকা। বিদেশীনীরা মণিপুরে পর্যটন করে এসে কখনও কখনও মন্তব্য করেন, মণিপুরের পুরুষ তাদের মেয়েদের মর্যাদা দেয় না। আমার কিন্তু মনে হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই চিত্রাঙ্গদা। তারা মর্যাদার আসনের ধার ধারে না। তারা নিজেদের মর্যাদা নিজেরা রচনা করেছে চিরকাল। পুরুষ তাদের পুতুল করে রাখবে, এ ভাবনা তাদের আসেনি।

যাতায়াতের পথ সুগম নয়। পিঠে বাঁধা শিশুসন্তান, মাথায় রাখা মাছের ঝুড়ি মণিপুরকামিনী যখন অর্থনীতির সব দায়িত্ব বয়ে বাজারে পৌঁছোয়, তখন কল্পনা করা কঠিন, এই মেয়েকেই হয়তো দেখবেন পরদিন গোবিন্দজীর অঙ্গনে নৃত্যপরা পূজারিনী। পথ বেয়ে আসার পরিশ্রমের বিন্দু বিন্দু স্বেদ সান্ধ্য হাটের কেনাবেচায় হারিয়ে গেছে। নতো লাস্যে ভক্তিতে সেই স্বেদ পরিণত হয়েছে অশ্রু-বিন্দুতে। বৈষ্ণবের ভক্তিরসের উৎস হ'তে গড়িয়ে এসেছে দু-চার ফোঁটা! কঠিন কাজের বোঝা বয়ে তাদের মনও কঠিন হয়নি, সুঠাম শরীরে আসেনি এতটুকুও উগ্রতা। আশ্চর্য নয় কি?

মণিপুর রাজ্যের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ, লড়াই, সংগ্রাম লেগেই থাকতো। দেশের সুস্থ সমর্থ পুরুষ রাজার ফৌজে থাকতো আটকে। এমনও সময় ছিল, যখন বছরের অনেকটা সময় প্রাসাদেই তাদের কাটতো। ঘরের দায়িত্ব বহন করে চলতো মেয়েরা। খাদ্য, বস্ত্র, শিশুপালন, সবকিছুর ভার বহন করতে অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হ'তো। তারই ধারা বহন ক'রে আসছে মণিপুরের মহিলা সমাজ।
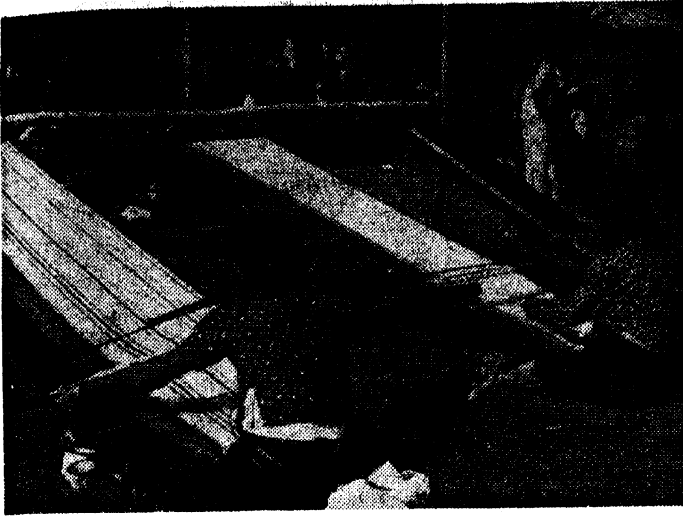
তাঁত তাদের ঘরোয়া শিল্প

তা বলে মণিপুরের সমাজ 'মাতৃশাসিত' বা matriarchal নয়। আশেপাশে আসামের কোন কোন সমাজে বংশ-পরম্পরা নির্ণীত হয় স্ত্রীলোকের দিক থেকে। মণিপুরে তেমন নয়। সেখানে নারী পুরুষের সহকর্মী সহমর্মী মাত্র। প্রয়োজনে মেয়েরা যুদ্ধ করেছে; রাজার অভাবে রানী রাজ্য শাসন করেছে, আবার চাষী বউ পাহাড়ের গায়ে সবুজ শস্যের স্তরে স্তরে সাজানো ক্ষেতে স্বামীর কাজে সাহায্য করেছে। দারিদ্র্যের দায় তারা অনায়াসে বহন করতে পেরেছে বলে এখনও মণিপুরী মেয়ে অসহায় নয়। আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত না হ'য়েও মণিপুরী নারী জীবনের কোন অবস্থায় কারও কাছে হার মানে না বা হাত পাতে না। সাঁঝের বাজারের মৃদু দীপালোকে ঘুরে ফিরে বেড়ালে দেখবেন, সেখানে তরুণী রূপসীদের কলহাস্যমুখরিত আয়োজন মাত্র সাজিয়ে রাখা নেই, সেখানে আছে বৃদ্ধা, বিধবা আর মধ্যবয়স্কাদেরও বেচাকেনার পর্ব। তাদের উপার্জনের প্রয়োজন হয়তো আরও বেশী।

তবে জীবনযুদ্ধে হার মানতে হয় না বলে মণিপুরী মেয়ে গুমরে মরে না। কোন অবস্থাতেই তারা হা-হুতাশ করে ঘরে বসে থাকে না। তাদের সবুজ পাহাড়, শ্যামল উপত্যকা আর উচ্ছল নদীর মতই তারা জীবনের তরঙ্গে হেসে গেয়ে চলে যায়। তাই রূপসীদের বেচাকেনা, হাটবাজারও দেখতে যায় সবাই। বোধ হয় আনন্দের একটু ছোঁওয়া নিয়েই ঘরে ফেরে। বাদশাহের সাধের সাজানো মীনাবাজার তো ইতিহাসের কথা। আধুনিক ভারতবর্ষে মণিপুরী মীনাবাজারই বা মন্দ কি?

—শ্রীমতী

সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতা চিড়িয়াখানায় একটি দুর্লভ সোনালী রঙের বিড়াল আমদানি করা হইয়াছে। তার খাদ্য হইল ভেড়া, ছাগল, মুরগি বা হরিণের মাংস।—"ভাগ্যিস বেড়ালের খাদ্য-তালিকায়

মাছ নেই, থাকলে খাদ্য-বিতর্কে মৎস্য দপ্তর জেরবার হতেন"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ওড়িশা সরকারের ১৩ জন মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর মধ্যে ১২ জনই পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। বিশু খুড়ো প্রশ্ন করিলেন—"এটা কি রেজিগনেশন, না মাস ক্যাজুয়েল লিভ !!"

"গণছুটি" (অভিধানে অবশ্য শব্দটি এখনও সংযোজিত হয় নাই) সম্পর্কিত সংবাদে শুনিলাম, শতকরা ৯৫ জন সরকারী কর্মচারী নাকি গণছুটির দরখাস্তে সহি করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"এই মওকাটা ইস্ট বেঙ্গলের (হায়, মোহনবাগান!) খেলার দিন নিলেই কিন্তু ভালো হতো, এক ঢিলে দু' পাখিই মরত !!"

আমাদের কাগজ হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড-এর "ক্যালকাটা নোট"-এর লেখক শ্রীঅরুণ বাগচি মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতের সমস্ত স্থান হইতে হিন্দু দর্শনার্থীরা কালীঘাটে আসিয়া সমবেত হন।"—কথাটি সাঁত্য, কিন্তু স্থানীয় হিন্দু দর্শনার্থীর ভিড় এবার কালীঘাটে কম হতে বাধ্য, কেননা মোহনবাগান আই এফ এ থেকে বিদেয় নিয়েছেন: হে মা কালী, আর কার জন্য করব"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের শহরতলিতে হলিউডের ধরনে একটি চলচ্চিত্রনগরী স্থাপন করিবেন বলিয়া নাকি রাজ্য সরকার প্রস্তাব করিবেন। সহযাত্রী বলিলেন—"উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু হলিউডের ধরন-ধারনটা নগর সম্বন্ধে যা-ই হোক, নাগর এবং নাগরী সম্বন্ধে কিন্তু বিপজ্জনক !!"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে প্রস্তাবক শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন, কান পাতিয়া শুনিলে রাজ্যের দিকে দিকে এই অনাস্থা প্রস্তাব শোনা যাইবে। শ্যামলাল সুর করিয়াই শুনাইল—"কান পেতে রই, আপন হৃদয় গহন দ্বারে।"

মাদ্রাজের একটি কলোনির কর্মীরা নাকি বেতন নেওয়ার সময় কোপীন পরিয়া গিয়াছিলেন।—"তাঁরা কোপীনবন্ত

সুতরাং ভাগ্যমন্ত" সংক্ষেপে মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ শেখ আবদুল্লাকে মুক্তিদানের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"শের-মুক্তিদানের চেয়ে ভূদান বা গ্রামদানই তো ছিল ভালো, তাঁত ছেড়ে আবার এঁড়ে কেনা কেন !!"

গিরিডি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সেখানে একটি কুক্কুট নাকি একটি সাপ ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।—"প্রবাদের ক্ষেত্রে অহি-নকুল সম্পর্কের সঙ্গে হয়ত অহি-মোরগ একটি নূতন সংযোজন হবে"—বলেন সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতায় নাকি আরো পাঁচটি ট্রাম বাড়িবে।—"এবং আমরা এই এক বিন্দু শিশিরের কথা নিশ্চয়ই মনে রাখব"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল করার বিতর্ক প্রসঙ্গে শ্রীহনুমনথিয়া বলিয়াছেন, ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই দেশে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এখন এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী, কারণ

যে উদ্দেশ্যে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহা সিদ্ধ হয় নাই। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"দেশাইজী কর্তৃক প্রবর্তিত অন্য একটি নিয়ন্ত্রণ 'সিদ্ধ' তো দূরের কথা, হাফ-বয়েলড্ পর্যন্ত হয়নি। সেটার সম্বন্ধে বর্তমানে তাঁর মতটা জানতে পারলে শুকনো গলাটা ভিজত !!"

পশ্চিমবঙ্গ পুলিস পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত আত্মহত্যার একটি খতিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"আত্মহত্যার আক্ষরিক অর্থে পরিসংখ্যানটা হয়ত নির্ভুল, কিন্তু ... অর্থে মাস বা গণ-আত্মহত্যার হিসেব নিশ্চয়ই ওতে নেই !!"

চীনের বালখিল্য লাল প্রহরীরা বাজারে-ছাড়া মাও-এর একটি ছবি সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন: তাঁরা বলেন, ছবিটিতে নাকি মাও-এর একটি মাত্র কান দেখানো হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"দুটি কাটা গেলে আর প্রকাশ্যে চলা-ফেরার বাধা থাকবে না !!"

পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় পাকিস্তান যে-সব ভারতীয় জাহাজ আটক করিয়াছিল, শুনিলাম, সেইগুলি ছাড়িয়া দিতে পাকিস্তান রাজী হইয়াছে। কিন্তু কোন একটি জাহাজে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের যে-সব যন্ত্রপাতি ভারত আমদানি করিয়াছিল সেইগুলি দেখিতে না পাইয়া প্রশ্ন করিলে নাকি পাক-তরফ হইতে বলা হইয়াছে, সেইসব যন্ত্রপাতি জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"ভারত কা মাল দরিয়ামে ডাল হল পাক-সংবিধানের নীতি, সুতরাং কড়া নোট বা কোন প্রশ্নের প্রশ্নই ওঠে না"—বলে শ্যামলাল।

কলকাতার ডায়েরি

পোপের গাড়ি লটারি করার সময় আবার দেখলাম মাদার টেরেসাকে। আবার মনে হল, 'মাদার' শব্দটি এই নির্মল-হৃদয় মহিলার নামে কত সার্থক। আপাদমস্তক পূতচরিত্র মাতৃত্বের প্রতি-মূর্তি, যেন মা মেরি।

পোপ ১৯৬৪ সালে বোমবাইয়ে এসে যে গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন, সেই দামী ফোর্ড লিংকন মোটরটি শুভেচ্ছার দানরূপে পান মাদার টেরেসা। গাড়িটি গত সপ্তাহে লটারিতে দিয়ে সাড়ে চার লাখ টাকা তিনি তোলেন তাঁর নতুন কুষ্ঠাশ্রমের জন্যে। টিকিট ছিল এক শ' টাকার। লটারি জিতে গাড়ির মালিক এখন টিভোলি পার্কের শ্রী আর এইচ জাভেরি।

লটারি যখন হয়, বেশির ভাগ লোকের নজর ছিল চকচকে গাড়ির দিকে, কিছু লোক তাকিয়েছিলেন সেই আসরে সবচেয়ে বিশিষ্ট, সবচেয়ে মহিমামণ্ডিত মাদাম টেরেসার মুখের দিকে, যা দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নুয়ে পড়ে।

অসাধারণ চরিত্র। দেশ সুদূর আলবেনিয়ায়, জন্ম যুগোস্লাভিয়ায়। গত সাঁইত্রিশ বছর আছেন কলকাতায়। "যেথায় থাকে সবার অধম, দীনের হতে দীন", সেইখানে তিনি তাঁর হৃদয় উজাড়-করা মমতা বিলিয়ে চলেছেন হাজার হাজার লোকের কল্যাণে। কালীঘাটে আছে তাঁর নিজের হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান 'নির্মল-হৃদয়'। বুকে ক্রুশ, হাতে জপের মালা নিয়ে নীল পাড়, সাদা শাড়ি পরা এই বিদেশিনী প্রতি বছর অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে চলেছেন শত শত বিড়ম্বিতের জীবনে। তা ছাড়া আছে লোয়ার সারকুলার রোডে 'নির্মলা শিশুভবন'। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর দল সেখানে খুঁজে পেয়েছে চিরকালের জন্য অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের আশ্বাস।

শুধু তাই নয়, দরিদ্র অনাথ শিশুদের জন্য মাদার টেরেসা নিজেই চালান চৌদ্দটি স্কুল, আটটি কুষ্ঠশুশ্রূষা কেন্দ্র, ক্লিনিক, ছ'টি দাতব্য চিকিৎসালয়, কারিগরি বিদ্যালয়—অনেক কিছু। সব কিছুরই কর্ণধার দয়ার সাগর টেরেসা জননী। আর আছেন সঙ্গী পোনে দু'শ'জন কল্যাণময়ী 'ভগিনী'।

কলকাতাই প্রধান কর্মকেন্দ্র। তা ছাড়া রয়েছে বোমবাই, দিল্লি, ঝাঁসি, আগরা, আমবালা, আসানসোল, রায়গড়, ভাগলপুর, অমরাবতী। নিঃশব্দ চরণে প্রতিটি জায়গায় ছুটে চলেছেন এই কর্মযোগিনী, করুণাময়ী মহিলা।

বয়স হয়েছে, তবু পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই। ওঠেন ভোর সাড়ে চারটায়, সাতটা থেকে কাজ শুরু। সেবার ডালি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন ঘড়িতে বাজে রাত ন'টা কি দশটা, বাড়ি ফেরার কথা মনে হয়। বেশির ভাগ চলা পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রামে-বাসে। গাড়িতে কখনই নয়।

কথা বলেন চমৎকার। কখনও ইংরেজী, কখনও হিন্দী, কখনও বাংলা। স্পষ্ট উচ্চারণ। এনটালির সেন্ট মেরি স্কুলে বাংলা পড়িয়েছেন অনেক দিন।

ভারত সরকার তাঁকে দিয়েছেন পদ্মশ্রী খেতাব, পেয়েছেন ম্যাগসেসে পুরস্কার; কিন্তু কোন সম্মানই তাঁর কাজের সমকক্ষ নয়।

তিনি অবশ্য লৌকিক কোন সম্মানের প্রত্যাশীও নন। তাঁর প্রতীক্ষা নতুন কোন বিড়ম্বিতের জন্য। যে মুহূর্তে সেই হতভাগ্যের জীবনে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন, এনে দিতে পারেন নতুন জীবনের আশ্বাস, সেই সময়ই মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান মিলেছে।

দুঃস্বপ্নের শহর এই কলকাতা। এখানে বাস জ্বলে, মিছিল ছোটে, জীবন প্রতি পদে পীড়িত হয়। তবু এই পীড়নের মাঝ-খানেও সেবার প্রদীপ জ্বালিয়ে নিভৃত সাধনায় নিমগ্না আছেন এই জননী টেরেসা। গ্রীষ্মের তাপ, বর্ষার জল মাথায় নিয়ে তিনি একা চলেছেন এ পথ থেকে ও-পথে। বুকে ক্রুশ, হাতে মালা, দু' চোখে করুণা।

✻

দেখে বুঝতে পারিনি এই গোলাপ, এই রজনীগন্ধা নকল—শোলার তৈরী। কী চমৎকার হাতের কাজ, কী অসাধারণ শিল্পবোধ।

ভদ্রলোক তাঁর হাতের কাজের কিছু নমুনা নিয়ে সেদিন এসেছিলেন দেখা করতে। তাঁর নাম অনিলকুমার ঘোষ। দেশ ছিল বরিশাল, এখন বাড়ি শ্রীরামপুর।

শোলা, মাটি, কাঠ, বাঁশ সব কিছুর কাজেই তিনি সিদ্ধহস্ত। গত সতেরো বছর গবেষণা চালাচ্ছেন নানা রকমের নতুন ডিজাইন নিয়ে। তাঁর তৈরী মাটির পুতুলের ডিজাইন এখন কিছু চলছে বাজারে। ইদানীং মেতেছেন শোলার কাজে। তিনিই বললেন, "শোলা দিয়ে শুধু তৈরী হয় চাঁদমালা আর মাথার মুকুট। আমি ঠিক করলাম অন্য জিনিসও বানাতে হবে। এই দেখুন শোলার ঘোড়া, কেমন টগবগে।"

সত্যিই তাই, বাজারে ছাড়লে বাঁকুড়ার ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দেবে।

তা ছাড়া বানিয়েছেন শোলা দিয়ে হাতি, পেঁচা-মুখো টাকা জমানোর বাক্স, ফুল, গাছ, লতাপাতা কত কিছু। দেখে চোখ জুড়ায়।

কঠিন অধ্যবসায়ের জীবন। বহু বছর নিরলস সাধনার পর এখন প্রশংসা মিলেছে গুণিজনের। স্বয়ং নন্দলাল বসু চিঠি লিখে সাধুবাদ দিয়েছেন তাঁর হাতের কাজ দেখে। পুরস্কার মিলেছে নানা সময়ে নানা কাজে। দিল্লি, কলকাতার নানা জাদুঘরেও আছে কিছু নমুনা।

এখন পার্ট-টাইম কাজ করছেন বারুই-পুরে রাজ্য সরকারের এক্সপেরিমেন্টাল-কাম-রিসার্চ ওয়ার্ক-শপে। প্রধানত শেখান শোলার কাজ। সনাতন শোলার কাজের কারিগরেরা নতুন নতুন ডিজাইন পেয়ে খুশী।

ব্যবহারিক নানা জিনিসের মাধ্যমে হাতের কাজের এই প্রচার এবং জনসাধারণের মধ্যে রুচিবোধ গড়ে তোলার জন্য অনিলকুমার ঘোষকে অভিনন্দন। আমরা কলকাতায় তাঁর অনন্য হস্তশিল্পের একটা প্রদর্শনী দেখতে চাই।

✻

সব বিজ্ঞপ্তির আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বক্তব্যটি সহজবোধ্য করা। কিন্তু আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আমাদের স্টেট ট্রান্সপোর্ট-কর্তৃপক্ষ ভিন্নমত পোষণ করেন। শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জি রোড আর মহিম হালদার স্ট্রীটের মোড়ে তাদেরই দেওয়া একটা বিজ্ঞপ্তিতে লেখা—"কার্যকালীন দিবসে ৯ হইতে ১০ ঘটিকা ব্যতিরেকে বাস থামিবে।"

'কাজের দিনে ৯টা থেকে ১০টা ছাড়া বাস থামবে'—এই কথাটা লিখলে কি মহা-ভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? নাকি আমাদের ধারণা হত, স্টেট ট্রান্সপোর্ট-কর্তৃপক্ষের পাণ্ডিত্য নেই?

—চাণক্য
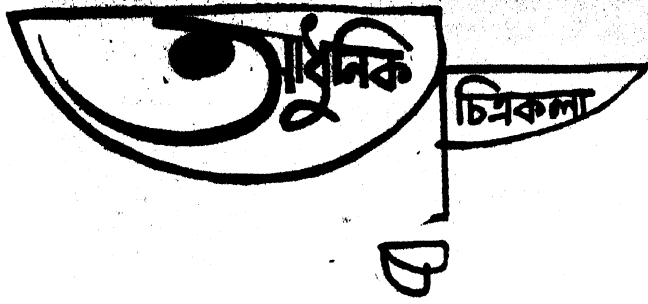
দেগাঃ নিজ প্রতিকৃতি

গতির শিল্পী ঃ এডগার দেগা

ইম্প্রেশনিস্ট, তবে যে-অর্থে পিসারো বা মোনে, সেই অর্থে নয়। বাতাসের শব্দ, গাছের পাতায় বাতাস, গাছের পাতায় আলো, হ্রদের জলে হিরক-জ্বলা আলো; বাইরে ব'সে পিসারো আর মোনে এই কম্পমান প্রকৃতিকেই ধরবার চেষ্টা করেছেন ক্যানভাসে। কিন্তু দেগা এ'কেছেন মানুষ, সূর্যের আলোয় নয়, কিংবা চাঁদের আলোতেও নয়, পাদপ্রদীপের আলোয়, যা সেই সব মানুষেরই গায়ে ফেলা হয় যারা কৃত্রিম অংগভংগিতে রত; হয় নাচিয়ে, নয় অভিনেতা। প্রকৃতি তো অচেতন শিল্পী, দেগা চাননি এই শিল্পীর সুন্দর মুহূর্ত ক্যানভাসে গে'থে নিতে, যে-সৌন্দর্য সচেতন মানুষের দ্বারা নির্মিত, তাই ছবির বিষয় হিসেবে নিতে পছন্দ করেছেন এবং সেইজনাই স্টেজের আলো সূর্যের আলোর চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় তাঁর কাছে, গাছ-ফুল-পাখির চেয়ে মানুষকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে দেগার। ভেবে দেখতে গেলে, দেগার ছবি ইংগ্রে-র ধ্রুপদী চিত্রাদর্শের পরিপন্থী তো নয়ই, বরঞ্চ সেই বিশ্বাসেরই এক নতুন রূপ। কিন্তু তাই ব'লে যে তিনি ইম্প্রেশনিস্ট নন এটা ঠিক নয়, কারণ তিনি এই নতুন চিত্রাদর্শ-বিশ্বাসীদের প্রতিটি প্রদর্শনীতেই নিজের ছবি রেখেছেন এবং নিজেকে প্রায় এক করে দেখেছেন এ'দের সংগে। মোনে, পিসারো, সিসূলে প্রভৃতির সংগে বহু জায়গায় তাঁর মতবিরোধ ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় ইম্প্রেশনিজমের বিরোধী ছিলেন দেগা; আসলে তিনি এই নতুন ইস্কুলের বেড়াটা বা সীমারেখাটা ছু'য়ে ফেলেছিলেন, যার ফলে এই চিত্রাদর্শ অতিক্রম ক'রে নতুন দিগন্ত তাঁর ছবিতে দেখা যায়। মোনে, সিসূলে এবং পিসারো বর্ণের চূড়ান্ত অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন; সেজান চিত্রে ঘনতা কতটা আনা যায় তার জন্য ছবিকে ক'রে তুলেছিলেন নিরেট লোহার মত নিভেজাল ও ভারি; দেগা অপর দিকে অঙ্কনরীতিতে (drawing) সূক্ষ্মতার উপর অনন্ত প্রতিভা আরোপ ক'রে চিত্রতনকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। রেখা দেগার ছবিতে গতিশীল বাস্তবতা আনছে, এবং রঙের ভূমিকা সেখানে রেখাঙ্কনের সূক্ষ্মতাকে আরো প্রকট ক'রে তোলায়। অবশ্য বয়সের সংগে সংগে তিনি রঙের ব্যাপকতর তাৎপর্য অনুভব করেন, যার প্রমাণ তাঁর ব্যালেরিনা পর্যায়ের ছবিগুলোর রেখা, গতি এবং নাটকীয়তা আনলেও, ছবিগুলোর যে-কবিতার দিক, ছন্দ ও ঝংকার, তা রঙের তীব্রতার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

প্যারিস শহরে ১৮৩৪ সালে এডগার দেগার জন্ম হয় এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে —বাবা ছিলেন ব্যাংকার। চিত্রাঙ্কনের পাঠ তাঁর শুরু হয় ইংগ্রের ছাত্র লুই লামথের কাছে একোল নাৎসিয়োনাল দ্য বোসার্ত-এ। অন্যান্য ইম্প্রেশনিস্টদের মতো তিনি বিদ্রোহ ক'রে বেরিয়ে আসেন নি আকাদেমির অনুশাসন থেকে, বরঞ্চ গভীর শ্রদ্ধার সংগে ছাত্রজীবনে দেগা ধ্রুপদী ধারায় ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছেন। এমন কি, ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত আমরা এই ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরকে পুরোপুরি ধ্রুপদী ধারায় ছবি আঁকতে লক্ষ করি। ১৮৬৫-র পর থেকে দেগার মধ্যে খুব এক ধীর পরিবর্তন আসে—রেখাঙ্কনের সূক্ষ্মতা পুরোপুরি বজায় রেখে রঙের ভূমিকা ক্রমশ অধিক তাৎপর্য-পূর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকে তাঁর ছবিতে। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁর রঙ ব্যবহার ছিল

ব্যালেরিনা

অত্যন্ত বেশি বাস্তবতার অধীন এবং সেই-জন্য তাঁর ছবি এই সময়টায় কিছুটা সংকীর্ণ এবং সজীবতাহীন হ'য়ে যেতে পারত, যদি না এই বিরাট চিত্রকর তাঁর চিত্রবিন্যাসের নতুনত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রাণসঞ্চার করতেন ক্যানভাসে। ছবিতে প্রাণ তখনই সঞ্চারিত হয় যখন চিত্রকর মুহূর্তকে ক্যানভাসে অমর করেন। যেদিন থেকে এডগার দেগা মুহূর্তকে আঁকতে চাইলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব ক'রে সেদিন থেকেই তিনি আর ধ্রুপদী চিত্রকর রইলেন না, নাম লেখালেন ইম্প্রেশনিস্ট দলে।

খুব নিঃসঙ্গ এবং অনিশ্চুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন দেগা। ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন প্যারিসের হিল্লোল-তোলা ভিড়াক্রান্ত রাস্তায়, খুঁজে বেড়াতেন নাটক, উজ্জ্বল উত্তেজক মুহূর্ত। মানুষের সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না—কিন্তু ভালোবাসতেন দ্রষ্টার মতো, বিদেশীর মতো, জীবনকে দেখতে, এবং তাই কাফে, রেস-কোর্স, অপেরা তাঁর অবিবাহিত জীবনের একমাত্র আনন্দদাতা ছিল। দেগা লিখেছেন, "আমি বিলিয়ার্ড খেলতে জানি না, তাস খেলায় অপটু, মানুষের সঙ্গে আমি সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম, তাই সমাজের পক্ষে আমাকে গ্রহণ করা অসম্ভব বুঝি। আমার কাছে দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নেই, আমি তৃতীয় ব্যক্তির মতো জীবনের গতি নিজে স্থির থেকে, দূরত্ব রেখে দেখতে ভালোবাসি।" দেগার ধুলো-ভরা ঘরে কোনো নারীর পায়ের ছাপ পড়েনি কোনোদিন, কোনো বন্ধু আসেনি, একা-একা জীবন কাটিয়েছেন ঘর-ভরা ডামি, জরির কোর্তা, নাচের জুতো, রঙিন ঘাঘরা আর রঙ-তুলি নিয়ে। দেগার স্বভাবে একটা মজার ব্যাপার ছিল, তিনি নিজে স্থির হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা-একা কাফেতে বসে থাকতে পারতেন কিন্তু তাঁর চোখের সামনে গতি না থাকলে তিনি অসহ্য হ'য়ে উঠতেন। ফরাসী কবি ভালেরি বলেছিলেন, দেগা কখনো জীবনের উজ্জ্বল দিকটা দেখল না কিন্তু অক্লান্ত-ভাবে চেষ্টা ক'রে গেল ক্যানভাসে একটি আনন্দের মুহূর্তকে ধরবার জন্য; নিষ্প্রাণ মেটে রঙের জিনিসটাকে ক'রে তুলল উজ্জ্বল, ঝলমলে, গতিশীল, কিন্তু নিজের জীবন ক্রমশ অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেল স্বেচ্ছায়।"

এই পোল্ ভালেরির সঙ্গেই দেগার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল—ভালেরি দেগার ওপরে যে বই লেখেন তাতে এই লোকটির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়। একটা ছোট্ট ঘটনার বর্ণনা আমি তুলে দিচ্ছি ভালেরি থেকে—"বাড়িতে ঘর ছিল সবচেয়ে অগোছালো—ঘরটায় ঢুকলে বোঝা যায় এ-ঘরে যে ব্যক্তির বাস তিনি বেঁচে থাকার জন্য, জীবনকে আনন্দময় বা উৎফুল্ল ক'রে তোলার জন্য, স্বল্পতম প্রয়াসেও নারাজ। ঘরে পুরোনো কিছু ফার্নিচার, একটি শুকনো টুথব্রাশ একটা গেলাসে, এবং ছড়িয়ে থাকা কিছু নিজের ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। এক সন্ধ্যায় দেগার সঙ্গে শহরে আমার একটা ডিনারে যাবার কথা, ওর ঘরে গিয়ে দেখি ও বসে আছে চুপ ক'রে, আসলে ভুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। আমি ঢুকতেই বোধহয় মনে পড়ল, তাই আমার সামনেই জামা-কাপড় বদলাতে আরম্ভ করল, এবং যে পোশাক পরল তা

[illegible] একটা শতচ্ছিন্ন পুরোনো শার্ট—টাই প'রে চলল আমার সংগে এক বড়লোকের ফর্মাল নৈশভোজে। —কিন্তু এই লোককেই আমি অন্য কতদিন পুরো ড্যান্ডি সেজে অপেরায় ব'সে থাকতে দেখেছি উইংসের পাশে, দেখেছি রেসের মাঠে, শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করছে মনুষ্য-শরীরের ফর্ম। নারীর শরীরের ভঙ্গী, তাদের হাঁটাচলার ধরন, তাদের ব্যবহার এমনভাবে আর কে লক্ষ করেছে দেগার মতো?"

দেগার ব্যালেরিনা পর্যায়ের ছবিগুলি যেহেতু সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য, তাই তারই একটি ছবি বেছে নিয়ে আলোচনা করছি।

[illegible] পর্যায়ে এবং স্কেচ করেছেন অসংখ্য। 'The dancer tying her shoe-lace." চিত্রটির মধ্য দিয়ে লক্ষ করা যাক্ দেগা কতটা ইম্প্রেশনিস্ট ছিলেন, কোথায়-কোথায় তিনি ধ্রুপদী ধাঁচ ব্যবহার করেছেন, এবং রঙের এবং রেখাংকনের চিত্ররচনায় তাৎপর্য কতখানি। ছবিটিতে এমন একটি মুহূর্ত দেখানো হচ্ছে, যা অসম্ভব রকমের গতিশীল। উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে নাচিয়েটি জুতোর ফিতে বাঁধছে, এ-অবস্থায় মেয়েটি মাত্র কয়েক সেকেন্ড থাকবে, তারপরেই উঠে দাঁড়াবে বা উঠে বসবে, যে-অবস্থায় আমরা মানুষকে সর্বদাই দেখি। ছবিটির দিকে তাকালেই প্রথম আমাদের যে-অনুভূতি হয়, তা হল "ক্যান্ডিড ফটোগ্রাফ" দেখার। একটি চলমান, গতিশীল, অস্থায়ী, মুহূর্তে একটি নাচিয়েকে দেখানো হচ্ছে যার উত্তর নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার শরীরের সাবলীল চলৎক্ষমতা, গতি। ইম্প্রেশনিস্টদের প্রথম দাবি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে মেটানো হয়েছে, তা হল মুহূর্তকে ক্যানভাসে অবরুদ্ধকরণ। ছবিটির মুহূর্তটি কতটা বাস্তব সেই প্রশ্ন আসে। নাচিয়েকে নৃত্যের একটি বিশেষ মুদ্রায় স্টেজে দেখানো স্বাভাবিক, কিন্তু একটি নাচিয়েকে জুতোর ফিতে বাঁধার অবস্থায় দেখানো যেন আরো বেশী বাস্তব, এ ছবি দেখে আমরা চমকে উঠি এই ভেবে যে, আরে, এতো একেবারে জীবনের মতো। অতএব দেখা যাচ্ছে এ ছবিতে দেগা অসম্ভব রকমে বাস্তবধর্মী।

ছবিটা যদিও প্রায় পুরোপুরি ইম্প্রেশনিস্টিক, তবু রেখাংকনের দিকে চিত্রকরের তীক্ষ্ন নজর লক্ষ করবার মতো। মেয়েটির শরীর একেবারে নিখুঁত এবং গভীর রেখার সাহায্যে আঁকা হয়েছে—লক্ষ করুন হাত, পা, পিঠের অংশ, স্কার্টের অংশ, মাথার পিছন দিকটা কেমন পরিষ্কার লাইনের সাহায্যে আঁকা হয়েছে। —এবার বর্ণবিন্যাসের প্রশ্নে আসা যাক্। লক্ষণীয় রঙের ব্যবহার এ ছবিতে শুধুমাত্র আবহাওয়া তৈরি করবার জন্য। রঙের ব্যাপারে বাস্তবতা অনুসরণ করা হয়নি একেবারেই। ছবিটিতে রঙ আসছে নিতান্ত চোখের তৃপ্তির জন্য এবং ক্যানভাসে উজ্জ্বলতা আনবার তাগিদে।

ছবিটিকে অবশ্য একটি কম্পোজিশন হিসেবেও নেওয়া যায়, কারণ মেয়েটির বসার ভঙ্গীটা এমনই যে, পুরো ছবিটাকে একটা ফুলের ছবি, কিংবা প্রজাপতির, বো-টাইও ভেবে নেওয়া সহজ। যদি সেভাবে তাকাই, তাহলে অবশ্য বাস্তবতার প্রশ্ন আসে না, রঙ প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

—[illegible] বসু

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতা

৩রা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের পত্রের উত্তরে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

(১) মতান্তর যে মনান্তর নয় একথাটা তিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এবং স্পষ্ট করে বলেছেন, সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। রাজনীতি ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না, তার রীতি-নীতিও রপ্ত করে উঠতে পারি নি। কিন্তু সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই তাঁর মতের সমালোচনা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না, কোনো সার্থকতাও দেখি না। এসব ক্ষেত্রে যাঁরা অযোগ্য, তাঁরা অমনোযোগ্যও।

(২) শঙ্খ ঘোষ বলছেন তাঁকে আমি ভুল বুঝেছি। তবে তো আমার সব অনুযোগই খণ্ডিত হল। একটি অনুযোগ তবু রয়ে গেল—ভুল বোঝার পথ তিনি স্বহস্তে কেটে দিয়েছিলেন, আমি স্বখাত সলিলে পড়ি নি। কেউ যদি লেখেন : "শেষ দশ বছরের কবিতায় (অনায়াসে লিখতে পারতেন 'কয়েকটি কবিতায়' বা 'বেশ কয়েকটি কবিতায়', কিন্তু লিখলেন unqualified ভাবে 'শেষ দশ বছরের কবিতায়') খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কতো বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইলেন তিনি (রবীন্দ্রনাথ)! এবং কতো সময়ে মনে হয়েছে একথা কেন কবিতায় বলতে হবে, এর মধ্যে কী আছে যা গদ্যেরই পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়? যেমন এই রচনাটির কিছু অংশ", এবং তার পরে 'প্রশ্ন' কবিতার সেই অংশগুলি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, "ছন্দ আর মিল ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে যা কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য, অনিবার্য, যা কেবলই গদ্য নয়", তাহলে যে-কোনো পাঠকের পক্ষে আমি যা বুঝেছিলাম তা ছাড়া অন্য কিছু বোঝবার খুব অবকাশ ছিল কি? এই বোঝাটাই কি অনিবার্য হয়ে ওঠে না যে শঙ্খের মতে তাঁর অননুমোদিত 'প্রশ্ন' কবিতাটাই রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতার প্রতিভূ এবং ঐ পর্বের কবিতা সাধারণভাবে "কবিতা হিসাবে অগ্রাহ্য?" যে-কোনো সামান্যোক্তির (generalisation-এর) ব্যতিক্রম অবশ্য থাকে। তাই যখন দেখি যে শঙ্খ 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর প্রতি "অসীম আসক্তি" প্রকাশ করছেন, তখন পূর্বোদ্ধৃত কথাগুলির অনুষঙ্গে কি এটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক ঠেকে না যে রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের রচনায় 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর মতো দুটো-চারটে কবিতা তিনি পেয়েছেন যা তাঁর সামান্যোক্তির ব্যতিক্রম, এবং সেই আবিষ্কারের আনন্দটাকে বড় সুন্দর ভাষায় ঘোষণা করলেন 'কবিতা-পরিচয়ের' প্রথম সংখ্যায়? 'প্রশ্ন'-এর নিন্দা প্রসঙ্গে শেষ দশ বছরের কবিতা সাধারণভাবে নিন্দিত হল, কিন্তু 'প্রথম দিনের সূর্য' যখন দ্বিধাহীন ভাষায় প্রশংসিত হল তখন সাধারণ ভাবে শেষ দশ বছরের কবিতা তো দ্বিধাজড়িত কোনো প্রশংসাও পেল না। সমালোচনার এই ভেদ-নীতি কি তাৎপর্যহীন, অ্যাক্সিডেন্টাল?

(৩) শঙ্খ 'প্রশ্ন' কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেছিলেন : "ছন্দ আর মিল ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে...যা কেবলই গদ্য নয়।" আমি প্রতিবাদ ক'রে লিখলাম "এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধ গদ্য নয়"। তার উত্তরে শঙ্খ বেশ জোর দিয়ে বলছেন, "নয় তো, এ তো পদ্য।" ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা যাই হোক, আমার নিজের ভাষায় বলি : কোনো কবিতায় কয়েকটি গদ্যধর্মী পংক্তি থাকলে যে কবিতার মূল্যহানি ঘটবেই এমন কোনো কথা নেই। গদ্যধর্মী পংক্তি ছন্দোবন্ধও হ'তে পারে, ছন্দছাড়াও হ'তে পারে। এহ বাহ্য। আসল কথাটা হচ্ছে, সমগ্র কবিতাটি এগুলিকে নিঃশেষে শুষে নিতে পেরেছে কিনা, এবং শুষে নেওয়ার ফলে সমগ্রের ধর্মহানি হয়েছে কিনা। কীভাবে শুষে নেওয়া হবে সেটা কবি এবং কবিতার উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের এবং এলিয়টের (কিংবা বিষ্ণু দে-র) কাব্যরসায়ন একই প্রকার হবে, ড্রাই স্যালভেজে এবং প্রশ্নে গদ্যধর্মী পংক্তির কাব্য-ধর্মান্তর একই প্রক্রিয়ায় ঘটবে—এ প্রত্যাশা কেন? এসব কথা নিয়ে মতান্তর যদি থা[illegible] থাকে তা উপরিতলের। আমাদের মধ্যে গভীর মতভেদ এই যে, আমি মনে করি নবজাতকের 'প্রশ্ন' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ

কবিতার অন্যতম না হলেও ভালো কবিতা, প্রকাশভঙ্গি শিথিল নয়, ভাবের জটিলতার সঙ্গে ভাষার গদ্যধর্মিতা তাল রাখতে পেরেছে; শঙ্খ মনে করেন 'প্রশ্ন' পদ্য কিন্তু কবিতা নয়, তার অনেকগুলি পংক্তি "কেবলই গদ্য", "কবির অভিপ্রায় এবং রচনার মধ্যে সামঞ্জস্য" ঘটে নি। গভীরতর মতভেদ এই যে আমার মতে 'প্রশ্ন' ও 'প্রথম দিনের সূর্য' ভাব এবং ভঙ্গি উভয়ত ভিন্ন; শঙ্খের ব্যাখ্যানুযায়ী দুটো কবিতার ভাব একই, ভিন্নতা ভঙ্গিতে; সে ভঙ্গিগত প্রভেদ এই যে 'প্রশ্ন'-তে অনেকগুলি "অকবিতার অংশ" রয়ে গেছে, সেগুলিকে "নির্মম ভাবে সরিয়ে দিলে" আমরা পাবো 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর মতো "একটি শুদ্ধ কবিতা।" গভীরতম মতভেদ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের মূল্যায়ন নিয়ে। তাঁর বিচারে ঐ পর্বের কবিতা—অধিকাংশ কবিতা—"অতিবাচন", "পল্লবিত ভাষণ", "বিস্তারিত বিশ্লেষ-প্রবণতা" ইত্যাদি দোষে দুষ্ট; আমার ধারণা গান বাদ দিলে অন্য যে-কোনো দশ বছরের তুলনায় শেষ দশ বছরের রচনায় সংহতিই লক্ষণীয়। ছোটো ছোটো কবিতার সংখ্যাধিক্য সংহতির অভাব সূচনা করে না। তা ছাড়া, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ "খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে" চান নি, অনেক কথাই বলেছেন; উপলব্ধির বৈচিত্র্যে এ পর্ব বিশেষরূপে ঐশ্বর্যবান।

আসল কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের অধিকাংশ কবিতা শঙ্খ ঘোষের ভাল লাগে না, আমার লাগে। এ নিয়ে তো তর্ক চলে না। সাহিত্য তত্ত্ব ও নীতি নিয়ে অবশ্য চলতে পারে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, আমাদের সাহিত্যনৈতিক ভিন্নতার মূলে রয়েছে জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিভেদ। আমি রবীন্দ্রনাথের (শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের) মানসিক প্রতিবেশী, খুব নিকট না হলেও খুব দূরের নয়। সন্দেহ করছি শঙ্খের মানসিক স্বদেশ বহু নদী প্রান্তর, হয়তো বা পাঁচ সাত সমুদ্র, পারে। উত্তর আসতে পারে, জগৎনিরীক্ষায় মৌলিক দূরত্ব থাকলেও সাহিত্য রসসম্ভোগে গরমিল ঘটবে কেন? পেশাদারী সাহিত্য-বিচারে নাও ঘটতে পারে, কিন্তু একেবারে ভিন্ন মনঃ প্রতিন্যাস যাদের তারা গানের একই ঝর্ণাতলায় গভীর অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। এ প্রশ্নের স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন; ইচ্ছা রইল।

(৪) শঙ্খ যখন বুঝতেই পেরেছিলেন যে ওটা মুদ্রাপ্রমাদ (বদ্ধ-পাগল এবং জন্ম-হাবা ছাড়া একমাত্র মুদ্রারাক্ষসই বলতে পারে যে, কোনো বক্তব্যই বিশুদ্ধ গদ্যে একটিমাত্র পংক্তিতে বলা যায় না) তখন তা নিয়ে অতগুলো কথা অপচয় করতে গেলেন কেন? তবু যদি সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে 'কবিতা

পরিচয়' হাতের কাছে ছিল, পাতা ওল্টালেই তো সন্দেহভঞ্জন হত। "বক্তব্য বিষয়ে"র পর্বে "ঐ" বিশেষণটি 'দেশ'-এ ছাপা হয়নি, কিন্তু না হলেও তো কণ্টেকস্ট্ থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে "আমি উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র মাঝে অসংখ্য বৎসরে" বা "যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া" এই বাক্য-দ্বয়ের বক্তব্য বিশুদ্ধ গদ্যে একটিমাত্র পংক্তিতে বলা যায় না—"যেভাবে বুঝিয়ে বলা গদ্যে সংগত ও প্রত্যাশিত"। খুব আপত্তিকর ঠেকছে কি? শংখ পাস্কালের কথা তুলেছেন। কিন্তু 'পাঁসে' তো বিশুদ্ধ গদ্য নয়, গদ্য কবিতার সমষ্টি। কয়েকটি তার অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা হয়েছে, কোনোটাই "গূঢ় দার্শনিক" তত্ত্বের গদ্য ব্যাখ্যানরূপে গ্রাহ্য নয়।

(৫) "কে তুমি" প্রশ্ন অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি কবিতা লিখেছেন—শেষ সপ্তকের শেষ কবিতা ('ছেচল্লিশ')। 'প্রথম দিনের সূর্য' ব্যাখ্যা করবার সময়ে এই কবিতাটির কথা মনে ছিল না, নইলে সেখানেই উল্লেখ করতাম। কবিতাটি খুব রসোত্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু "কে তুমি" প্রশ্নটি যে রবীন্দ্রনাথের মনে বহু দিন থেকে আন্দোলিত ছিল এবং ঠিক কী অর্থ বহন করত তা এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

সবশেষে একটা অনুরোধ। আমার নামের সঙ্গে "সাহেব" লেজুড়টি জুড়ে না দিলে আরও খুশী হতাম। উর্দু ভাষায় সেটা তবু মানায়, বাংলায় একেবারেই না। আর নামই তো যথেষ্ট। নিতান্ত যদি একটা লেজুড় লাগাতেই হয় তা হলে সরকার বাহাদুরের অনুমোদিত "শ্রী" তো রয়েছে—লেজুড় হিসেবে সবচেয়ে কম আপত্তিকর। তবে আমি বলি কি, ওসব শ্রী-ট্রী সরকারী খাতাপত্রের জন্যই তোলা থাক, আমরা বেসরকারী লেখক মানুষ, আমাদের পক্ষে "নাম—শুধু নাম—শুধু নামই" যথেষ্ট।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

ভ্রাম্যমাণ সবজি দোকান

"দেশের" ৩৩ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে রাজ্য সমবায় দফতরের "ভ্রাম্যমান সবজি দোকান"-কে কেন্দ্র করিয়া সমবায় ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়াসটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। মুনাফা-লোভি ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্যে ক্রমবৃদ্ধির অপ-প্রচেষ্টা রোধ করিতে সমবায়ই প্রধান অস্ত্র, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই।

কিন্তু প্রচেষ্টাটি সরকার কর্তৃক হওয়ায় উহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় বোধ করিতেছি এবং মনে একটু আতঙ্কও

...য়েছে। সরকারের এর পূর্ববর্তী ...গুলির ফলাফলই এইরূপ চিন্তার ... সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পরি-...য় যখন যে-কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে ...র হইয়াছেন তখন কয় একটি বৈশিষ্ট্য ...ক্ষ্য পড়িয়াছে. প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার-নির্ধারিত মূল্যে বাজার দর অপেক্ষা কিছু ...ই থাকে, তাই জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় তাঁরা বিভিন্ন অজুহাতে মূল্য অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিতে থাকেন ও পূর্বের খোলা-বাজার দরকে ছাড়াইয়া যান। খোলাবাজার কারবারীদের ইহাতে সুবিধাই হয়, তাহারাও সরকারের সহিত পাল্লা দিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকেন। সরকারের সরবরাহের স্বল্পতার দরুন জনসাধারণ বাধ্য হইয়াই অতি উচ্চমূল্যে দিয়া খোলা বাজার হইতে ক্রয় করেন। তৎপর সরকার হয়ত তাঁদের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া নেন, কিংবা বিক্রয় বন্ধ করেন। সরকারী ব্যবসায়ে দেখা যায় ১ কেজি সবজির জন্য হয়ত ১০জন কর্মী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাই মূল্যান্তর বৃদ্ধি করিতে তাঁরা বাধ্য হন, তবুও বৎসরান্তে দেখা যায় লোকসানের বহর। মূল্য বৃদ্ধির সহিত নাকি অনেক সময় কাহারও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিশেষ সম্পর্ক থাকে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সরকার কর্তৃক সবজির বর্তমান নির্ধারিত মূল্য আমার মনে হয় ব্যবসায়ীদেরই অধিক উৎসাহিত করিবে, কেননা এই নির্ধারিত মূল্য খোলাবাজারের মূল্য অপেক্ষা সামান্য কম, ক্ষেত্র বিশেষে সমান এবং সরবরাহ অতি সামান্য। তাই ব্যবসায়ীরা বর্তমান মূল্যেই সবজি সরবরাহ করিবে এবং অচিরেই সরকার মূল্য বৃদ্ধি করিলে (পূর্ব অভিজ্ঞতায় লিখিতেছি) তাহারাও লাভের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিবে। সুতরাং দেখা যাইবে ক্রমবর্ধমান মূল্যান্তর হইতে জন-সাধারণ রেহাই পাইবেন না বরং তাহাদের সমস্যা তিল হইতে তাল আকৃতি ধারণ করিবে।

... সাধনই যদি সরকারের উদ্দেশ্য ... তাহা হইলে সমবায় ব্যবস্থার এই অবস্থা ... দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকন করিয়া ইহার প্রয়োগে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিব, নইলে ফল হইবে হিতে বিপরীত।

শ্রীবুদ্ধদেব চ্যাটার্জী
কলিকাতা-২৫।

অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন

"অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন" প্রবন্ধের "জল কে চল"—কিঞ্চিৎ বিষয়ে লিখিতেছি।

"জল কে চল" কথাটাই জলের বিষয়ের নিবন্ধে অবান্তর মনে হইতেছে। মনে হইতেছে লেখক রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বধূ কবিতার "জলকে চল" কথা দুইটিকে অপপ্রয়োগের কাজে লাগাইয়াছেন।

"পৃথিবী ঠাণ্ডা হলে আকাশ ছেড়ে জলকে চল করে জল পৃথিবীতে চলে এলেও আজও তাকে কখনও কখনও আবার আকাশ স্পর্শ করতে যেতে হয়।"

গ্রামের বধূ না হয় বলিতে পারে "বেলা যে পড়ে এল জলকে চল"—তাই বলিয়া বৃষ্টির জল নদীর জল ইহারাও কি বলিবে জলকে চল? বিজ্ঞানে কাব্যের মেজাজ ভাল। জগদীশচন্দ্র "অব্যক্ত" পুস্তকে তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু কাব্যের অপপ্রয়োগ বেদনাদায়ক। তার পরে "জলকে কখনও কখনও আবার আকাশ স্পর্শ করতে যেতে হয়" এই কথারই বা অর্থ কি? "কখনও কখনও" কেন? জলের উপরিভাগ হইতে সর্বদাই বাষ্পীভবন চলে। এমনকি বরফের যে বড় বড় চাক তাহার গাত্র হইতেও সাধারণ অবস্থায় সর্বদা, (কখনও কখনও নয়) বাষ্পীভবন চলে।

"দুই পরমাণু হাইড্রোজেন সঙ্গে এক পরমাণু অক্সিজেন একত্রে 'আছি অবস্থায়' জলের মূর্তি গ্রহণ করে ইত্যাদি।"

এই "আছি অবস্থা"র মানে কি? ময়রার হাতে যখন ছানা আর চিনি একত্রিত হইয়া সন্দেশে রূপান্তরিত হয়, তখন কি ঐ দুটি রমণীয় পদার্থ "আছি অবস্থায়" রমণীয়তর সন্দেশ হয়, না এমনিতেই শুধু সন্দেশ। বিখ্যাত বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকদের অনেক লেখা পড়িয়াছি, কিন্তু এই "আছি অবস্থার" অস্তিত্ব কোথাও দেখি নাই।

"জলের স্থিতি নেই গতি আছে"—এই কথার অর্থ বোঝা গেল না। ইহার একটু পরেই লেখক বলিতেছেন, "ওই রকম অবস্থায় বহুদিন তাদের (জলের) থাকতে হয়"। "বহুদিন থাকতে হলে"—সেটা কি স্থিতি অবস্থা নয়?

"হাইড্রোজেন সালফাইড" ও নানা জৈব রাসায়নের পুঞ্জীভূত অবস্থার মধ্যে যে জল আটকা পড়েছে তারও সহজে মুক্তি হয় না ইত্যাদি।"

হাইড্রোজেন ও সালফার এই দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে "হাইড্রোজেন সালফাইড" হয়। ইহার ভিতর জল কোথায় খুঁজিয়া পাইলেন লেখক? "জৈব রাসায়নের পুঞ্জীভূত অবস্থা"টাই বা কি? জৈব রাসায়ন মানে তো organic chemistry. বোধ করি লেখক বলিতে চাহিয়াছেন—

জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের সহিত যে জল পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে ইত্যাদি। কিন্তু তাহা বলা হইয়াছে কি?

যাঁহারা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা লিখিবেন তাঁহাদের দায়িত্ব কঠিন। বাংলা কাগজের সম্পাদক বৈজ্ঞানিক নহেন। লেখকের নিষ্ঠার ও কৃতিত্বের প্রতি তাঁহাকে নির্ভর করিতেই হয়।

শান্তিদা শংকর দাশগুপ্ত
কলিকাতা-২৯

টমেটো-বেগুনের তরকারি

৩রা ভাদ্রর দেশ পত্রিকায় 'শ্রী...' লিখিত 'ঘরে বাইরে' পড়িয়া একটু ...লো-চনা করিতে বাধ্য হইলাম।

তিনি লিখিয়াছেন যে টমেটো-বেগুনের তরকারির বাঙ্গালীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু তিনি বোধ হয় অবগত নহেন যে, এই রান্না বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব। ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ অঞ্চলের গৃহিণীরা অতি সুস্বাদু করিয়া এই টক তরকারি রান্না করিতে জানেন। কোন কোন সময় ইহা উপকরণ অদল-বদল করিয়াও রান্না করা হয়। দেশে 'শ্রীমতী' লিখিত রান্নার নিয়ম প্রণালী যা পড়ি তাহার অনেক কিছুই বাংলাদেশের গৃহিণীরা ক্যালরী বা ভিটামিন সম্পর্কে ততটা খোঁজ না নিয়াও আবহমান কাল হইতেই রান্না করিয়া আসিতেছেন। তথাপি নির্ভেজালের দিনে সব খাদ্যেরই খাদ্যপ্রাণ বজায় থাকিত যাহা নাকি আজকের দিনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রান্না করিয়া পাওয়া যায় না।

সর্বশেষে লিখি শ্রীমতীর 'ঘরে বাইরে' বিভাগটি বেশ আকর্ষণীয় এবং সেই জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

ঊর্মিলা দাস
গৌহাটী।

অনেকটা মুক্ত থেকে নতুন জীবন-সমীক্ষার কষ্টিপাথরে সমগ্র আলোচনাগুলিকে যাচাই করতে প্রয়াসী হয়ে যথেষ্ট শক্তিমত্তা এবং উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনব গুপ্ত, ধনিক, ধনঞ্জয়, সম্মট, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রুদ্রভট্ট, ডঃ বাটবে, মোহিতলাল মজুমদার, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন এবং আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও তিনি সুগভীরভাবে আলোচনা করেছেন এবং নব নব মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন।

অভিনব গুপ্ত তন্ময়ীভবনের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন আর ডঃ নগেন্দ্র কাব্যের আনন্দ-আস্বাদকে সংবেদনের পর্যায়ে সমর্পিত করেছেন। কাব্যানুভূতিকে সত্যই কি শুধু মানসিক সংবেদ মাত্র বলা চলে? লেখক তাঁর "রীতি কাব্যের ভূমিকা" থেকে বার বার উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন (পৃ ১২০, ১৩৩)।

তৃতীয় অধ্যায়ে রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে সুবিস্তৃত এবং সুগভীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লোল্লট আর শঙ্কুকের দার্শনিক পটভূমি অতিক্রম করে ডঃ নগেন্দ্র ভট্টনায়কের সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তকেও [illegible]তামলকবৎ আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ("কাব্যাস্বাদের আর কাব্যের অভিব্যক্তিগুলি সহৃদয়জনের আস্বাদ্য কেমন করে হয়—এর সমাধান সর্বপ্রথম ভট্টনায়কই সাধারণীকরণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করলেন। এই প্রশ্ন বস্তুতপক্ষে সাহিত্যসমীক্ষার মৌল বিন্দু। এবং আচার্য ভট্টনায়ক এই সমস্যার সমাধান করে অপূর্ব সিদ্ধি অর্জন করলেন। আমার মতে বিশ্বের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনাশাস্ত্রে ভট্টনায়কের পূর্বে এই মূল প্রশ্নের এমন প্রামাণ্য সমাধান কোনো আচার্য প্রস্তুত করতে পারেন নি।" পৃষ্ঠা ১৫০)। ডঃ নগেন্দ্রের সামগ্রিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বলতম নিদর্শন এখানেই। সাহিত্যজিজ্ঞাসার মৌল তত্ত্ব সাধারণীকরণ প্রসঙ্গটি বুঝতে হলে এই গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠা থেকে ২১৩ পৃষ্ঠা অবশ্যপাঠ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'ভাবানুভাব' প্রসঙ্গটিকে এক দিকে মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরে এবং অন্য দিকে লৌকিক চৈতন্যধারায় অনুষঙ্গে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'ম্যাকডুগাল'-এর মনস্তত্ত্ব আর [illegible]চারের মানসিক বৃত্তি সমীক্ষাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে ভরত আর ধনঞ্জয়ের সাহিত্যদর্শনের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রসের পারস্পরিক সম্পর্ক, অঙ্গাঙ্গীভাব ও রসাভাসকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং ষষ্ঠ বা অন্তিম অধ্যায়ে রসের শক্তি ও সীমা বা সামর্থ্য প্রসঙ্গে [illegible]

ধরে তিনি নিজের মতটিকেও সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। সাকেত ও কামায়নী থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে রসকে আধুনিক যুগের সাহিত্যমানসে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে গ্রন্থটি কেবলমাত্র পূর্বসূরীদের চিন্তাধারার সংকলন মাত্র নয়, পরন্তু এই মহাগ্রন্থে ডঃ নগেন্দ্র চিরন্তন সাহিত্যজিজ্ঞাসাগুলিকে আধুনিক মানসচৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়।

অনুবাদ

রামকৃষ্ণদেব : জীবন ও বাণী। ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার প্রণীত। অনুবাদ : [illegible]কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা [illegible]১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা [illegible] পাঁচ টাকা।

ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার [illegible] তাঁর রচিত 'রামকৃষ্ণদেব' সম্বন্ধে ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। নিছক ভারততত্ত্ববিৎ বলতে যা বোঝায়, ম্যাক্সমুলার তার থেকে অনেকখানি বেশি ছিলেন। ভারত-ঐতিহ্য এ সমকালীন ভারতবর্ষ দুয়ের উপরেই তাঁর জীবন্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ভারতীয় দর্শনের উপর আলোচনা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে ভারতীয় দর্শনের তৎকালজীবিত বিগ্রহ রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ বিস্তারিত হয়েছিল।

এই বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ সালে রামকৃষ্ণদেবের লোকান্তরের এগারো-বারো বছর বাদে এবং লেখকের মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে। তখন বিবেকানন্দের বিপুল আন্তর্জাতিক পরিচয়, সেই সূত্রে রামকৃষ্ণদেবেরও। পশ্চিমী পাঠকদের মনে এই বইয়ের জন্য তখন শূন্যস্থান ছিল। এখানকার তথ্যাদি মূলত বিবেকানন্দ ও তাঁর আগেকার কেশবচন্দ্র সেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদির কাছ থেকে সংগৃহীত। কিন্তু এই বইয়ের পারোক্ষতা ঢেকে গেছে ঐকান্তিকতায়, আন্তরিকতায়। শুধু [illegible]

নয় সেই সময়ের সেই দেশের পাঠকদের পেরিয়ে এই মুহূর্তে এবং এই দেশের পাঠকদের কাছেও এই বইয়ের জীবন্ত আবেদন রয়ে গেছে। এর আগেও এই বইয়ের বাঙলা সংস্করণ হয়েছিল, অধুনা তা দুষ্প্রাপ্য। এই নতুন অনুবাদ এবং এই প্রকাশনা আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে সমাদরযোগ্য মনে হয়েছে। ১৩৪।৬৬

বিবিধ

বঙ্গবাসী কৃষ্ণচন্দ্র : দেশ ও কাল। হারাধন দত্ত। পুরোগামী প্রকাশনী। কলিকাতা-৪। পাঁচ টাকা।

এই পুস্তকে সেই সময়কার বাঙালী জীবনের মুখপত্র হিসাবে খ্যাত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা এবং তার অন্যতম সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু উজ্জ্বল ও বিস্মৃতপ্রায় তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নব্য হিন্দু আন্দোলন বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করেছিল। প্রথমটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাকে অমরতা দিয়েছে—'বঙ্গবাসী'ই এদেশে প্রথম রাজরোষে পতিত পত্রিকা। আর দ্বিতীয়টি—এদেশের প্রধান সংস্কার-আন্দোলনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের চোখে রক্ষণশীলতা বলে পরিগণিত হওয়ায় তার আশ্রয়দাতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রেখেছে।

যদিও 'বঙ্গবাসী'র প্রযোজনায় ও সাফল্যে কৃষ্ণচন্দ্রের অসামান্য ভূমিকা ছিল, তথাপি 'বঙ্গবাসী'র তুলনায় কৃষ্ণচন্দ্র একেবারেই প্রচ্ছন্ন চরিত্র। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত তাঁর সেই প্রচ্ছাদিত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে এই পুস্তকে নিষ্কাশ করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রয়াস, তিনি নিজেই মেনেছেন, অসম্পূর্ণ। এমন কি কৃষ্ণচন্দ্রের রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও তিনি প্রণয়ন করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু যে-সময়ে সংবাদিকের জীবন মূলত নেপথ্যচারী এবং রচনা দৈনিক কাগজের পত্রান্তরালে অস্বাক্ষরিত ও ক্ষণতোষিণী, সেই স্থান থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে তোলার দুঃসাধ্য কর্ম। শ্রীযুক্ত দত্তের এই প্রাথমিক হস্তক্ষেপের ফলে পরবর্তী গবেষকেরা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। সম্পাদক: হিরণ্ময় গুপ্ত। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস—কলিকাতা—১৩।

যুক্তরাষ্ট্রের ষট্‌ত্রিংশ প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনের জীবনী এবং সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পদটি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য এতে পরিবেশন করা হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিউবার্ট হামফ্রির জীবনীও অন্তর্ভুক্ত। শ্রীজনসন ও শ্রীহামফ্রির জীবনের বহু ঘটনার চিত্রও এতে আছে যার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে ওঁদের দুজনের ভারত ভ্রমণকালের দৃশ্যাবলী।

প্রাপ্তি সংবাদ

বিশ্ব সাহিত্যের রূপরেখা। নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ—২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১০·০০।

ললিতকলা ও জনমানস। আর্‌নল্ড হাউজার। অনুবাদ : ডঃ সুধীরকুমার নন্দী। সাহিত্যায়ন—৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য—৯·০০।

শুধু প্রেমিকার জন্য। প্রভাত চৌধুরী। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়—৭৮ কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য—২·০০।

উদো রাজা বুদো মন্ত্রী। ধীরেন্দ্রলাল ধর। অশোক প্রকাশন—এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২·০০।

পুরাণো দিনের হারানো কাহিনী। ধীরেন্দ্রলাল ধর। অশোক প্রকাশন—এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·০০।

অ-দ্বিতীয় পুরস্কার। শিবরাম চক্রবর্তী। অশোক প্রকাশন—এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·০০।

ফিরিঙ্গি হাওয়া। কণিষ্ক। আনন্দধারা প্রকাশন—৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৮·০০।

প্রমাদ প্রলাপ। রচনা: দয়ালচন্দ্র ঘোষ। সম্পাদনা : প্রমথনাথ চৌধুরী। কালিকানাথ চৌধুরী—৮বি, মহেশ চৌধুরী লেন, কলিকাতা—২৫। মূল্য ৩·০০।

অরণ্যদেব ✲ লী ফক

উভয় সংকট। সামনে সেই ভয়ংকর প্রাণী, পিছনে লাভাস্রোত!
সামনে যাওয়া অসম্ভব।
পিছনে যাওয়াও সম্ভব নয়।

যা হয় কোনও একটা পথ এখন নিতেই হবে।
কোন পথ নেবেন?
এগোনোও সম্ভব নয়। পিছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। পালাবার অন্য কোনও পথ খুঁজতে হবে।

অন্য কোনও পথ নেই। থেমে থাকাও চলবে না।
লাভাস্রোত এসে ঢুকছে।

সামনের পথই একমাত্র পথ। আপনারা তৈরী থাকুন। সুযোগ পেলেই এগিয়ে যাবেন।
?
কী করছেন আপনি?
4/10

জন্তুটির মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলেন অরণ্যদেব....
ঠক্ ঠক্ ঠক্

এগিয়ে যান!

কী হবে?
এখন তো থেমে থাকাও চলে না।

পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে আয়োজিত বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইটে জার্মান মুষ্টিক কার্ল মিল্ডেনবারজারকে পরাজিত করে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা কেসিয়াস ক্লে তাঁর বিশ্বজয়ীর খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এবার নিয়ে হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর পাঁচবার বিশ্বজয়ীর খেতাব। দুবার পরাজিত করেছেন নিগ্রো মুষ্টিক সোনি লিস্টনকে, একবার করে হেনরী কুপার, ব্রায়ান লণ্ডনকে এবং কার্ল মিল্ডেনবারজারকে। কেসিয়াস ক্লে-র ষষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী সম্ভবতঃ আমেরিকার ক্লিভল্যাণ্ডের উইলিয়ামস। মুষ্টিযুদ্ধ জগতে 'বিগ ক্যাট' নামে যাঁর পরিচয়। অবশ্য বিগ ক্যাটের সঙ্গে কেসিয়াস ক্লে-র লড়াইয়ের ব্যবস্থা এখনো পাকাপাকি ঠিক হয়নি। মিল্ডেনবারজারের বিরুদ্ধে জয়ের পর ক্লে-র ম্যানেজার বলেছেন—সম্ভবত নভেম্বর মাসে টেক্সাসে ক্লে-র সঙ্গে বিগ ক্যাটের লড়াই অনুষ্ঠিত হবে।

মিল্ডেনবারজার ও কেসিয়াস ক্লে-র লড়াই যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে বলে মুষ্টিযুদ্ধবিশারদেরা ধারণা করেছিলেন, তা হয়নি। এমন কি, স্বনামধন্য জো লুই মিল্ডেনবারজারকে খুব ছোট করে মনে করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, জার্মান মুষ্টিক তার চেয়ে অনেক বড়। বেশি কথা বলতে কি, কেসিয়াস ক্লে-র জীবনে এইটিও কঠিনতম লড়াই। ক্লে নিজেই স্বীকার করেছেন, চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁকে কেউই এমন বেগ দিতে পারেননি—যেমন দিয়েছেন কার্ল মিল্ডেনবারজার। তবু ক্লে জার্মান মুষ্টিযোদ্ধাকে নক আউট করতে পারেননি। ১৫ রাউণ্ডব্যাপী লড়াইয়ের ১২ রাউণ্ডে বিজয়ী হয়েছেন টেকনিক্যাল নক আউটে।

প্রথম তিন রাউণ্ড দুজনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কেউ কাউকে কাবু করতে পারে না। একজনের শক্তিপ্রবল মুষ্টির আঘাত আর একজন সিংহবিক্রমে প্রতিহত করেন। চতুর্থ রাউণ্ডে ক্লে-র ঘুষির আঘাতে মিল্ডেনবারজার টলতে টলতে নিজেকে সামলিয়ে নেন। পঞ্চম রাউণ্ডে ক্লে'র মুষ্ট্যাঘাতে মিল্ডেনবারজার রিং-এর দড়ির উপর পড়ে যান। জার্মান মুষ্টিকের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, বাঁ চোখ ফুলে ওঠে। তবু রক্ত-ঝরা অবস্থায় মিল্ডেনবারজার ষষ্ঠ রাউণ্ডে ক্লে'র সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। সপ্তম রাউণ্ডে মিল্ডেনবারজারের ঘুষির আঘাতে ক্লে হকচকিয়ে যান। অষ্টম রাউণ্ডে আবার ক্লে কোণঠাসা করে রাখেন তাঁর জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এই রাউণ্ডে মিল্ডেন-বারজার ক্লে'র বাঁ হাতের 'হুকে' ভূতলশায়ী হলেও এক, দুই, তিন করে আট গোনার সময়ের মধ্যেই আবার উঠে দাঁড়ান। নবম রাউণ্ডে দুই মুষ্টিকের মধ্যে আবার বাঘ-সিংহের লড়াই। কিন্তু দশম রাউণ্ডের শেষ দিকে মিল্ডেনবারজারের পতন। অবশ্য রেফারীকে সময় গুনতে হয়নি। পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সময়ের ঘণ্টা বেজে যাওয়ায় একাদশ রাউণ্ডে আবার লড়াই। এতক্ষণে মিল্ডেনবারজারের শরীর থেকে অনেক ঘাম-রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে, দেহে ক্ষতের চিহ্ন ফুটে উঠেছে, শক্তিও প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছে। সুতরাং দ্বাদশ রাউণ্ডে এক মিনিট পনেরো সেকেণ্ড লড়াই চলবার পর ব্রিটিশ রেফারী ওয়ালথাম মিল্ডেনবারজারের অসহায় অবস্থা দেখে যখন লড়াই বন্ধ করে দেন, তখন মিল্ডেন-বারজারের রক্তাক্ত দেহে ক্লান্তির চিহ্ন, তাঁর বাঁ চোখ রক্তে ভরে উঠেছে, মুষ্ট্যাঘাতে মুখ বিকৃত, দৃষ্টিশক্তি ঘোলাটে।

লড়াইয়ের শেষে কার্ল মিল্ডেনবারজার বলেছেন, ফলাফলে তিনি অসন্তুষ্ট নন। তিনি ভেবেছিলেন জিততে পারবেন, পারেননি। কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টারও কসুর করেননি। লড়াই শেষে ক্লে'র মন্তব্যঃ মিল্ডেনবারজার আমার সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, বড় বেশী বেগ দিয়েছে।

মুষ্টিযোদ্ধাবিশারদেরা বলেছেন, ক্লে তাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর লড়াই আকর্ষণীয় হয়নি। প্রথম দিকে মিল্ডেন-বারজারকেই বেশী ক্ষিপ্র বলে মনে হয়েছে এবং তাঁর কয়েকটি আঘাতও সহ্য করতে হয়েছে কেসিয়াস ক্লেকে।

অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি জার্মান মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্স স্মেলিং, যার কাছে জো লুইকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, বলেছেন—মিল্ডেনবারজারের চেয়ে ক্লে ওজনে ভারী বলেই জিতেছেন। জো লুইয়ের দিন হলে ক্লেকে হার স্বীকার করতে হত।'

যাই হোক, কেসিয়াস ক্লে এখন

বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের অজেয় যোদ্ধা কেসিয়াস ক্লে

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা। জো লুইয়ের সমান মর্যাদা লাভের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। দেখা যাক, 'বিগ ক্যাট'র সংগে তাঁর ষষ্ঠ লড়াইয়ের ফলাফল কি দাঁড়ায়।

❋

আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হবার মুখে। কিন্তু বেশীর ভাগ খেলাতেই আশানুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব এবং জনপ্রিয় দলগুলির মধ্যে কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় মোহনবাগানের বিদায় শীল্ডের আকর্ষণ বেশ কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে।

উপর্যুপরি চার বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবার লীগ বিজয়ী হয়ে পর পর পাঁচ বছর লীগ জয়ের সম্মান লাভ করবে, এমন আশা অনেকেই করেছিলেন। লীগ হারাবার পর ক্লাব সমর্থকদের আশা ছিল মোহনবাগান শীল্ড পাবে। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা।

এই ব্যর্থতা অনেককে হতাশ করলেও যাঁরা সত্যিকারের ক্রীড়ামোদী এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবাপন্ন তাঁদের মধ্যে কিন্তু হতাশার চিহ্ন নেই।

এমন একজন খেলোয়াড় মনোভাবাপন্ন মানুষের কথাই আজ বেশী করে মনে পড়ছে মোহনবাগানের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে। মানুষটি আর কেউ নন, মোহনবাগানের পরলোকগত সহ সভাপতি শ্রী ডি বি সেন, যাঁকে আমরা সকলে 'দাঁতিদা' বলে জানতাম।

মোহনবাগানের পরলোকগত সহ-সভাপতি শ্রী ডি বি সেন

ফুটবল মরসুমের মাঝখানে গত ২৯শে মে 'দাঁতিদা' মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কথায় কথায় একদিন তাঁকে বলেছিলাম—'এবার তো আপনাদের ক্লাবের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হবে যদি লীগ বিজয়ী হতে পারেন।' উত্তরে ঐ সদাহাস্যময় নিরহংকার মানুষটি বলেছিলেন—'পাঁচবার বা দশবার লীগ জয় মোহনবাগানের পক্ষে বড় কথা নয়—বড় কথা মোহনবাগানের ক্রীড়া আদর্শ বজায় রাখা। অবশ্যই সভ্য সমর্থকরা ক্লাবের জয়ে আনন্দ পায়, ট্রফি জিততে চায়। কিন্তু তারা ভুলে যায়, শুধু ট্রফি জেতা ক্রীড়া-আদর্শের বিরোধী। খেলোয়াড় এবং সভ্য-সমর্থকরা যদি শৃঙ্খলা, শালীনতা এবং আদর্শ বজায় রাখে তাতেই বজায় থাকবে মোহনবাগানের ঐতিহ্য। পাঁচবার লীগ বিজয়ী না হলে আমি একটুও দুঃখিত হব না।'

ডি বি সেনের মত এমন মানুষ হয়তো খেলার মাঠে খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে। কিন্তু যিনি মাঠ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁর কথাই আজ বেশী করে মনে পড়ছে।

নানা কারণে 'দাঁতিদা' সম্বন্ধে দেশ-এর পাতায় এতদিন কিছু লিখে উঠতে পারিনি। আজ তাঁর সম্বন্ধে দুই একটি কথা লেখার চেষ্টা করছি।

❋

'ট্রু স্পোর্টসম্যান'—কথাটা সাধারণত অনেকেই বলে থাকেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না। তাই যখন কাঁকে চোখে পড়ে তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে। বাল্যকাল থেকে কোন না কোন খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকেনি এমন লোক দেখা যায় না। কিন্তু খেলাধুলো যাঁরা করেন তাঁদের মন যে কতখানি উদার এবং বড় হওয়া প্রয়োজন তা আমরা জানলেও সে-মন ঠিকমত গড়ে তুলতে পারি না।

এমন লোকদের খেলাধুলোর ম[illegible] প্রয়োজন যাদের কোন দলগত বা [illegible] স্বার্থ থাকে না, বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ[illegible]য়, ব্যক্তিত্বে এবং নিষ্ঠায় যাঁরা খেলাধুলোকে এগিয়ে নিয়ে যান।

এমন একজনই মানুষ ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের দাঁতি সেন। খেলার মাঠে লোকে যাঁকে দাঁতিবাবু বলে জানত।

দাঁতিবাবুর ভাল নাম ছিল শ্রীদীনবন্ধু সেন কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁর ঐ ডাক নামটিই ছড়িয়ে পড়েছিল স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে।

বাগবাজার সেনবাড়ির সুযোগ্য সন্তান স্বর্গীয় মণিলাল সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন দাঁতিবাবু। মাতা স্বর্গীয়া নীরোদবালা ছিলেন বঙ্গমাতার সুসন্তান স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা। একাধারে পিতৃ-মাতৃ কুলের সুনাম রক্ষা করে দাঁতিবাবু বাল্যকাল থেকে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সর্বপ্রকার জ্ঞান অর্জন করা এবং সকল ভাল কাজে নিজেকে এগিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি কর্মজীবনে ছিলেন এটর্নী। দাঁতিবাবুর মাতামহ 'ভূপেন্দ্রনাথ বসু মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনিই প্রথম সভাপতি। দাঁতিবাবুর পিতা 'মণিলাল সেন যৌবনে ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি রাউন্ড হ্যান্ড বল দেওয়া প্রবর্তন করেন এবং তিনি

আই এফ এ শীল্ডের তৃতীয় রাউন্ডে মোহনবাগান এবং ব্যাঙ্গালোরের আর্মি সার্ভিস কোরের খেলায় সার্ভিস গোলরক্ষক দামোদরন মোহনবাগানের ডি মন্ডলের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করছেন

সোমবার ইসট বেঙ্গল ও মহমেডানের খেলায় শেষোক্ত দলের গোলরক্ষক মুস্তাফা একটি বল পান্‌চ করে বারের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।
—নিজস্ব চিত্র

মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম ফুটবল ক্যাপটেন ছিলেন। ছোট বেলা থেকে দাঁতিবাবু লেখাপড়ায় ছিলেন যেমন মেধাবী, খেলা-ধুলাতেও তেমনি ছিলেন কুশলী। সিটি কলেজে তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট ক্যাপটেন ছিলেন। তাঁর টীমে সে সময় কার্তিক বসু ও গণেশ বসু ক্রিকেট খেলতেন। এই সময় তিনি বাগবাজার ক্লাব ও মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন।

দাঁতিবাবুর অগ্রজ কানাই সেন সে সময় মেডিক্যাল কলেজের ও বাগবাজার ক্লাবের স্বনামধন্য খেলোয়াড়। এই সময় বাগবাজার সেনবাড়ির কানাই সেন, দাঁতি সেন ও গণ সেন যখন কোন ক্লাবের পক্ষ নিয়ে খেলতে নামতেন তখন তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা বহু নামকরা ক্লাবের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো।

শোনা যায়, একদিনে দুটি [illegible] সেন ও দাঁতি সেন দুটি ক্লাবের পক্ষ নিয়ে দুটি ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয়লাভ করেছিলেন। কানাই সেন ও দাঁতি সেন মোহনবাগান ক্লাবে খেলা শুরু করেন এবং উভয়েই ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ও হকি খেলায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন।

১৯২২ সাল থেকে বাংলার হ'য়ে দাঁতিবাবু বহু ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং নিজের খ্যাতি অম্লান রেখেছেন ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে। কয়েক বছর তিনি ছিলেন মোহনবাগানের ক্রিকেট ক্যাপটেন এবং ১৯৩৭ সাল থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগান ক্লাবের ক্রিকেট সাব কমিটির সদস্যভুক্ত হন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩১ সাল এবং ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি ক্রিকেট সম্পাদকের আসনও অধিকার করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সহকারী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এবং ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ২৪শে মে ১৯৬৬ সালের মৃত্যু দিনটি পর্যন্ত তিনি ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সহ সভাপতি।

খেলার ক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি, হকি অ্যাসোসিয়েশনের এবং সি এ বি'র কার্য-করী সমিতির সভ্য, ক্রিকেট ও হকি আম্পায়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য, ফুটবল রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য ও রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য ইত্যাদি। এ ছাড়া বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। বহু বিষয়ে বহু লোকের মধ্যে মত বিরোধ ঘটেছে কিন্তু সে সবের মীমাংসা করেছেন দাঁতিবাবু সকলকে কাছে টেনে নিয়ে। বিবাদ-বিসংবাদ দূরে করে শান্তির প্রতিষ্ঠায় তিনি চিরদিন আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই আমাদের বারবার মনে হয়, খেলার মাঠের নির্মল আনন্দ উপভোগ করে যারা ঘরে ফেরে তারা সত্যকার 'স্পোর্টসম্যান' বলে দাঁতি সেনকে চিরদিন মনে রাখবে।

—একলব্য

এলাইন ব্রেণ্ডা ট্যানার

আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় তো বটেই, সারা বিশ্ব সাঁতারে এখন অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের অভাবনীয় আধিপত্য। এই অল্পবয়সীদের মধ্যে আবার ক্যানাডার সাঁতার-পটিয়সী এলাইন ব্রেণ্ডা ট্যানারের বিশ্ব সাঁতারে এক বিশেষ স্থান। সদ্য সমাপ্ত কিংসটনের কমনওয়েলথ গেম থেকে কুমারী ট্যানার একাই চারটি স্বর্ণ ও তিনটি রৌপ্যপদক নিয়ে ক্যানাডায় ফিরে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক সাঁতার-ক্ষেত্রে পনেরো বছর বয়সী একটি মেয়ের পক্ষে এমন কৃতিত্বের দ্বিতীয় নজির নেই। শুধু তাই নয়, ট্যানারই বোধ হয় বিশ্বের প্রথম বালিকা, যে মাত্র সাড়ে এগারো বছর বয়সে আন্তর্জাতিক সাঁতারে সিনিয়র সাঁতারুর মর্যাদা পেয়েছে।

সাঁতারে এলাইন ট্যানারের আগমন কিন্তু ঘটনা-সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। ট্যানারের লিথো-আর্টিস্ট বাবা রোনাল্ড এবং অ্যাকাউন্টান্ট মা এডনার জন্ম ইংলণ্ডের এসেক্স শহরের কাছে ব্রেন্টউডে। ওরা এখন ক্যানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরের অধিবাসী। কিন্তু ট্যানারের বয়স যখন ৭ বছর তখন ওদের যেতে হয় ক্যালিফোর্নিয়ার সালিনাসে। সালিনাসে মিঃ ট্যানারের বাড়ির পাশেই ছিল 'সালিনাস সুইমিং ক্লাব'। ভ্যাঙ্কুভারে থাকতে ট্যানার শুধু জলের উপর ভাসতে শিখেছিল। বাবার ইচ্ছা হল বাড়ির পাশেই যখন সুইমিং পুল তখন এলাইন ওখানেই সাঁতার শুরু করুক। এবং সাঁতারে সুপটু হয়ে উঠুক। কিন্তু এলাইনের প্রবল আপত্তি। তার কথা : 'সাঁতার তো আমার জানাই আছে। নতুন করে আবার কি শিখব?'

কিন্তু যেহেতু বাড়ির পাশেই পুল সেহেতু এলাইনকে জলের ডাকে সাড়া দিতে হল। ছোট্ট মেয়ে দু' দিনের তফাতেই জলকে ভালবেসে ফেলল। আর তার পরেই পেল এ. এ. ইউ. চ্যাম্পিয়নশিপের এজ গ্রুপে ব্যাক স্ট্রোকের স্বর্ণপদক। তখন ঐ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিযোগিনী ছিলেন আমেরিকার দুই জল-পরী ডোনা ডি ভারোনা এবং শ্যারন স্ট্রাউডার, যাঁরা পরে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ডোনা ডি ভারোনা এবং শ্যারন স্ট্রাউডারের মত সাঁতারে সুপটু হবার জন্য এলাইন আগে থেকেই সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৫৯-এ যখন ভ্যাঙ্কুভারে ফিরে এসে ক্যানাডিয়ান ডলফিন ক্লাবে ভরতি হল, ঐ

ক্লাবের বাটারফ্লাই স্ট্রোকের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী মেরী স্টুয়ার্ট এবং তাঁর বোন প্যান-আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন হেলেন স্টুয়ার্ট এলাইন ট্যানারের মনে এনে দিল নতুন উন্মাদনা। ট্যানার এখন বিশ্ববিখ্যাত সুইমিং কোচ মিঃ হাওয়ার্ড ফারবির প্রিয় ছাত্রী। ছাত্রছাত্রীদের সবার সেরা করে গড়ে তোলা যে ফারবির শিক্ষার আদর্শ।

ক্যানাডা এবং আমেরিকার এজ গ্রুপ প্রোগ্রামই এলাইনের সাফল্যের সোপান। বয়সের সঙ্গে এলাইন ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে। অনুশীলনে অসাধারণত্ব নেই, আছে নিয়মনিষ্ঠা এবং ধারাবাহিকতা।

প্রতি দিন দেড় ঘণ্টা করে সাঁতার। সপ্তাহের ৭ দিনে বিরাম নেই। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সব ঋতুতেই সমানভাবে জলের বুকে সাঁতার কাটে এলাইন ট্যানার। শুধু ঐ জলে। জিমন্যাস্টিকস এবং ফ্রি এক্সারসাইজের নিয়মিত চর্চা। এর সঙ্গে টেনিস খেলা এবং কিছু কিছু অ্যাথলেটিকসের অনুশীলনও রয়েছে। আবার ভ্যাঙ্কুভারের হিলসাইড সেকেণ্ডারী স্কুলের ভাল ছাত্রী হিসাবেও ট্যানারের সুনাম।

যে বয়সে মেয়েদের সাজ-পোশাক এবং প্রসাধনের দিকে দৃষ্টি সেই বয়সে ট্যানার স্পোর্টস নিয়ে পাগল। ওর বাবা বলেন—'স্বপ্নকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় ওর অদ্ভুত আন্তরিকতা। প্রতিষ্ঠা অর্জনের আশায় ও রঙীন স্বপ্নের জাল বুনে চলে।' কিন্তু এলাইন ট্যানার বলে, 'সাঁতার সম্পর্কে আমার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। আমি জানি, যত বাধাই আসুক, আমি তা অতিক্রম করবই। যদি আমার আন্তরিকতা কমে যায় কিংবা জয়ের বাসায় ভাটার টান পড়ে সেদিনই আমি সাঁতার থেকে সরে যাব।'

নীল চোখ, কটা চুলের এই পাতলা মেয়েটির প্রথম বিশ্বখ্যাতি গত বছর গ্রেট ব্রিটেনের ব্ল্যাকপুলে। ১১০ গজ বাটারফ্লাই স্ট্রোকে প্রথম (সময় ৬৮·১ সেকেণ্ড), ৪৪০ গজ ফ্রি স্টাইলে তৃতীয় (সময় ৪ মিঃ ৫৩·৬ সেকেণ্ড), ২২০ গজ ফ্রি স্টাইলে চতুর্থ (সময় ২ মিঃ ৩৫ সেঃ) এবং ১১০ গজ ব্যাক স্ট্রোকে পঞ্চম (সময় ৭১·৭ সেকেণ্ড)। স্মরণ রাখতে হবে, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কারেন মুইর ও অ্যানি ফেয়ারলি এবং গ্রেট ব্রিটেনের লিণ্ডা লাডগ্রোভ বিশ্ব সাঁতারে সুপ্রতিষ্ঠিত, সবারই বিশ্ব রেকর্ড করার অতীত [illegible]।

গত এপ্রিলে ৬০·৭ সেকেণ্ডে ১ [illegible] গজ বাটারফ্লাই এবং ৪৪০ গজ মেডলে রিলে ব্যাক স্ট্রোক এবং ৫৮·৭ সেকেণ্ডে ১০০ গজ বাটারফ্লাই স্ট্রোক টেনে এলাইন ট্যানার অ্যামেচার রেকর্ড করেছেন। কমনওয়েলথ গেমে দুটি ফ্রি স্টাইল, দুটি ব্যাক, দুটি বাটারফ্লাই এবং ৪৪০ গজ মেডলে রিলে টেনে পেয়েছেন চারটি সোনার ও তিনটি রুপোর মেডেল। এবং উল্লেখ্য, ৪ দিনের মধ্যে ৭টি প্রতিযোগিতা, হিট নিয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ। ১৫ বছরের মেয়ের কাছ থেকে এর বেশি কতখানি আশা করা যায়?

ক্রীড়া-সাংবাদিকরা কুমারী ট্যানারকে 'থ্রিগিয়ার ওয়াণ্ডার গার্ল' বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম গিয়ারে জয়লাভের অদম্য আগ্রহ। দ্বিতীয় গিয়ারে নিজের সময়কে আরও উন্নত করার প্রচেষ্টা। তৃতীয় গিয়ারে যে-কোন প্রতিযোগিতা এবং যে-কোন প্রতিযোগিনীকে পরাজিত করার প্রতিজ্ঞা। সত্যই সাঁতারের বিস্ময়-বালিকা কুমারী এলাইন ব্রেণ্ডা ট্যানার।

মুকুল

আর কে নায়ার পরিচালিত "ইয়েহ্ জিন্দগী কিতনি হাসিন হ্যায়" ছবির নায়িকা সায়রা বানু—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাবার কথা

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব সংবাদ

মাই জেটারলিং-এর "নাইট গেমস" (সুইডেন) ছবিটি এবারকার ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে খুব সাড়া জাগিয়েছে। জনসাধারণের জন্য এই সুইডিশ ছবিটি নিষিদ্ধ হয়েছে। সমালোচকরা দেখেছেন "দি ডেইলি টেলিগ্রাফ"-এর সমালোচক প্যাট্রিক গিবস বলেছেন,

Indeed this film seems no more questionable than Bergman's "The Silence" which with some small cuts received an X certificate".

মা ও তার একমাত্র পুত্রের সম্বন্ধই ছবির বিষয়বস্তু। চিত্রনাট্যের আরম্ভে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক। সে প্রথম তার প্রণয়িনীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসছে। তারপর কয়েকটি ফ্ল্যাশব্যাক-এ তার শৈশবের ঘটনা দেখানো হয়েছে। তখন তার বয়স বারো। মায়ের জীবনের অনেক ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করেছে। এর পরিণাম ছেলের পক্ষে হয়ে উঠেছে বিষময়। মাতা-পুত্রের সম্বন্ধের বিষয়ে সমালোচক বলেছেন

"... is obviously an oedipal relationship with his beautiful, eccentric mother".

বড় হবার পর ছেলেটি হয়েছে "অ্যাবনরম্যাল"। শেষ পর্যন্ত তার প্রেয়সীই তাকে সুস্থ জীবনের সন্ধান দেয়। চিত্র পরিচালিকা জেটারলিং নিজেই কাহিনী রচনা করেছেন। সমালোচকরা তাঁর স্টাইল সম্পর্কে সপ্রশংস।

"সানডে টাইমস"-এর চিত্র সমালোচক ছবিটিকে 'মাস্টারপিস' আখ্যা না দিলেও "একস্ট্রা-অরডিনারি" বা অসাধারণ বলেছেন। মায়ের ভূমিকায় ইনগ্রিড থুলিনের অভিনয়ের গুণগান সবাই করেছেন। "সানডে টাইমস"-এর সংবাদদাতার মতে, এবারকার উৎসব খুব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি। উঁচুদরের ছবিও বিশেষ আসেনি। তিনি বলেছেন,

So, far this year, it is true, no masterpieces—but a fair show of young names and unexpected subjects.

আমেরিকার "দি ড্রিফটার" ছবিটি "সানডে টাইমস"-এর সমালোচকের ভাল লেগেছে। এক ছিন্নমূল বালকের কাহিনী নিয়ে এই ছবি। যদিও এতে ভাবাবেগ বেশী, তবু ছবিটি উল্লেখযোগ্য। এর পরিচালক এলেক্স ম্যাটার একটি নতুন নাম।

সংবাদে প্রকাশ, তপন সিংহ-কৃত "অতিথি" দেখে সমালোচকরা মুগ্ধ হয়েছেন। ছবিটি দেখার পর (৯ সেপ্টেম্বর) "দি রোম মেসাগেরো" পত্রিকার সমালোচক বলেছেন, উৎসবের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি চিত্রের অন্যতম "অতিথি"। কম্যুনিস্ট পত্রিকা "ল্যুনিতা" ছবিটির মানবিক আবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন। "অতিথি"র সংগীত, কারও কারও ধারণা, "অতিরিক্ত"। অন্যরা এর সংগীতে মুগ্ধ।

ভেনিস উৎসবের পুরস্কার

উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ডেন লায়ন পেয়েছে "ব্যাটল অব আলজিরিয়া"। জার্মানির "গুডবাই টু ইয়েস্টারডে" এবং আমেরিকার "ছাপাকুয়া" লাভ করেছে সিলভার লায়ন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পান যথাক্রমে জ্যাকস পেরি (ইতালিয়া "হাফ-এ-ম্যান") ও রুশ অভিনেত্রী নাতালিয়া আরিনবেকারোভ (দি ফার্স্ট টিচার)। ব্রিটিশ চিত্র "কুল দ্য ম্যাক" সমালোচকদের পুরস্কারে ভূষিত।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের অভিনয়

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান যেন না হয়, রবীন্দ্রনাথ সে ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। কোন নৃত্যনাট্য বা গীতি-নাট্য প্রথম অভিনীত হবার পরেই তিনি বিশ্বভারতীর শিল্পীদের বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। কলকাতায় এবং অন্যত্র। নিজেও সংগে করে কয়েকবার নিয়ে এসেছেন।

শ্রীলোকনাথ চিত্রমের "কাল তুমি আলেয়া" ছবিতে সংগীত পরিচালক রূপে উত্তম-কুমারের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটবে—নেপথ্যে কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আশা ভোঁসলেকে নিয়ে গানের রিহার্সাল-এ ব্যস্ত সুরকার উত্তমকুমার—সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সহকারী সংগীত পরিচালক শৈলেশ রায়কেও ছবিতে দেখা যাচ্ছে

কবিগুরুর তিরোধানের পরেও বিশ্বভারতীর শিল্পীরা একাধিকবার বাইরের রসিকবৃন্দকে তাঁদের অভিনয় দেখিয়ে গিয়েছেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ বিশ্বভারতীর শিল্পীদের বাইরে বেরোনো বন্ধ। অবশ্য গত বছর রবীন্দ্র-সদনের উদ্বোধনের সময় তাঁরা কলকাতায় একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে গেছেন।

বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিল্পীরা নিয়মিত, অন্তত বছরে একবার, কলকাতায় আসছেন না বলে এখানকার কলারসিক বা সমালোচকরা কিছুটা অন্ধকারে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের প্রামাণ্য মঞ্চ-প্রয়োগের পরিচয় তাঁরা পাচ্ছেন না। কোন্ অভিনয় শ্রেষ্ঠ, কোন্‌টা ব্যর্থ, তার বিচারের সুযোগও তাঁরা হারাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে, শান্তি-নিকেতন আশ্রমিক সংঘের অভিনয়ই বুঝি প্রামাণ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আশ্রমিক সংঘ এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার অর্জন করতে পারেননি। আশ্রমিক সংঘের কোন কোন শিল্পী, যাঁদের গত বছর এবং এবারকার অভিনয়ে দেখা গেছে, আদৌ আশ্রমে গিয়েছেন কিনা, যুক্ত থাকা তো দূরের কথা, সে বিচারের দায়িত্ব অবশ্য শিল্প-সমালোচকের নয়। সংঘ-কর্তারা "অনাশ্রমিক" শিল্পীকেও শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারেন। কিন্তু পারেননি বলেই ব্যাপারটা আরও দুঃখের।

এবারেও শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা হল। এতে ছিল দুটি গীতিনাট্য ('মায়ার খেলা' ও 'বাল্মীকি প্রতিভা'), একটি নৃত্যনাট্য ('ভানুসিংহের পদাবলী') এবং একটি নাটক ('তাসের দেশ')। কলকাতায় প্রায়ই এই নাটকগুলির অভিনয় দেখা যায়। বিভিন্ন শৌখিন সম্প্রদায় পরিবেশন করে থাকেন। সামগ্রিক বিচারে এ কথাই বলতে হয়, আশ্রমিক সংঘের প্রযোজনাব মান এমন কিছু উন্নত স্তরের নয়, যা দেখে অন্যান্য শৌখিন সম্প্রদায়গুলি শিক্ষালাভ করতে পারেন। বরঞ্চ একাধিক শৌখিন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমরা আরও ভাল অভিনয় পেয়েছি।

আসল কথা, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের কাছে আমাদের আশা অনেক বেশী। সেটা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে বলেই এই ভূমিকার প্রয়োজন। সংঘের "মায়ার খেলা", "ভানুসিংহের পদাবলী" ও "বাল্মীকি প্রতিভা" গতবার দেখেছিলাম। এবার দেখলাম "তাসের দেশ"। মঞ্চে ঝোলানো মাইকগুলি দৃষ্টিকটু লেগেছে। বুঝতে পারি, যন্ত্রের উপর নির্ভর করা ছাড়া শিল্পীদের উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আশ্রমিক সংঘের অন্য কোন মঞ্চ বেছে নেওয়া উচিত ছিল—যেখানে কোন কিছু দর্শকের শ্রুতি-গোচর করার জন্য মাইকের প্রয়োজন না। কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা এই মঞ্চে অভিনয় করে গেছেন। তাঁদের সামনে মাইক ঝুলতে দেখিনি। অবশ্য তাঁরা ছিলেন পাকা অভিনেতা-অভিনেত্রী।

সে যাক, অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও "তাসের দেশ"কেই সংঘের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা মনে হয়েছে। যদিও "তাসের দেশে"র রাজার অভিনয়, বাচনভঙ্গি একেবারেই নিরাশ করেছে। রাজকুমার গানের সঙ্গে ওষ্ঠ-সঞ্চালন করেছেন ভালই। নাচবার চেষ্টা করেছেন, আশানুরূপ পারেননি। মঞ্চসজ্জা বা পাত্রপাত্রীদের বেশভূষার জাঁকজমক আছে। যদিও 'তাসের দেশ'-এর প্রথম অভিনয়ে (রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পীদের ছবি দ্রষ্টব্য) পাত্রপাত্রীদের রূপসজ্জা তথা পোশাক অনারূপ ছিল। ওই 'ম্যাপ'-এ পাত্রপাত্রীদের একটা ভিন্ন জগতের, কল্পলোকের মানুষ মনে হত, ছবি দেখে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এই অভিনয়ে পাত্রপাত্রীদের বেশভূষায় সেই "ইলিউশন" পাওয়া গেল না।

মোট কথা, বিশ্বভারতীর শিল্পীদের কাছ থেকে আজকের দর্শকরা যেখানে রবীন্দ্র-নাট্যের প্রকৃত অভিনয় বা রূপ দেখবার সুযোগ পাচ্ছেন না, সে ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা তা পালন করতে পারছেন কি? এই প্রশ্নই সংঘের সমীপে উপস্থিত করতে চাই। এবং সেই সঙ্গে বিশ্বভারতীকে অনুরোধ জানাই, মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়কে বাঁচাবার জন্য তাঁরা নিয়মিত বাইরে আসুন, শিল্পরসিক ব্যক্তিদের কাছে ঐতিহ্যমণ্ডিত অভিনয় পরিবেশন করুন।

পি এ ফিল্মস-এর 'দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা' (পরিচালনা : নান্দু সেন) ছবিতে দেবী মুক্তা

চিত্র-সমালোচনা

বদতমীজ

বিশেষ কোন হিন্দী চিত্রের নায়ককে 'বদতমীজ' আখ্যা দেওয়ার মানে কী? পাগলামি, হ্যাবলামি, চ্যাংড়ামি তো সকলেই করে। তবে একদা যিনি "জংলী" ও "জানোয়ার" সেজেছিলেন, তাঁর "বদতমীজ" হওয়ার একটা বিশেষ অধিকার আছে বৈকি! নতুন ভূমিকার সার্থকতা নায়ক শাম্মি কাপুর প্রমাণ করেছেন। এই ছবির নায়কের কতখানি বেয়াদব, বেহায়া ও বখাটে হওয়া উচিত তা তিনি বেশ নিপুণভাবেই দেখিয়েছেন। নায়িকা সাধনাকে পাবার জন্য নায়ক অনেক কসরত করেছে, শঙ্কর-জয়কিষণের সুরের গান গেয়েছে, ছদ্মবেশ ধারণ করেছে (এই উদ্ভট উপকরণটি কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে যে এসেছিল, কে জানে) এই সবই নায়ক সম্পাদন করেছে এক এস্টেটের ম্যানেজার হিসাবে (ম্যানেজারের আর কাজ কী?), তার 'বস্' এক রাজাবাহাদুর (এরা কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি, হিন্দী চিত্রের পরিচালকই বলতে পারেন)। ওই গৃহেরই দুলালী সাধনা। সদা অশালীন বেশবাসে সজ্জিতা সাধনার অপর ভূষণ অভদ্রতা ও বদ্‌মেজাজ। একদা এক ফ্যান্টাসি দৃশ্যে সে তার "দিল্"-এর কাছ থেকে জানতে পেরেছে (এই কৌশলটি বুঝি পরিচালক মনোমোহন দেশাইয়ের নিজস্ব) যে সে শ্যামকে (নায়ক) ভালবাসে।

প্রেমের পর অবশ্য ওদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝিও দেখা গিয়েছে। সেটা নায়কের আত্মত্যাগের ফল। পঙ্গু সহোদরাকে পাত্রস্থ করতে গিয়ে নায়ক নিজের সুখ তথা প্রেয়সীকেও বিসর্জন দিতে রাজী। ছবিতে তথাকথিত ভিলেন নেই। একটি প্রায়-অপ্রকৃতিস্থ কমিক চরিত্র আছে। নায়িকার পাণিপ্রার্থী। তার কারসাজিতে নায়ক-নায়িকার সাময়িক বিচ্ছেদ অবশ্য ঘটেছে। যদিও তাদের অবধারিত মিলন কেউ ঠেকাতে পারেনি। কমেডি চিত্র 'বদতমীজ'; তাই এর অধিকাংশ চরিত্রই অর্ধ-উন্মাদোপম। প্রকৃতপক্ষে ছবিটি দেখা মানে কিছু সময় পাগলাগারদে কাটানো। তবে ছবির নামটি খুব জুতসই হয়েছে। ছবি দেখার পর দর্শকের মুখ থেকেও ফস করে একটি গালি বেরিয়ে আসতে পারে—'বদতমীজ'। কার উদ্দেশ্যে না বলাই ভাল।

"শংখবেলা" (পরিচালনা : অগ্রগামী) ছবির নায়ক-নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায় ও উত্তম কুমার ফটো-দেশ

"বৌদি" (পরিচালনা : পূর্ণেন্দু রায়-চৌধুরী) ছবির শিল্পী জিজি চক্রবর্তী ফটো—দেশ

ছবির পর ছবি

চলন্ত ট্রেনের কামরায় যে বিবাহিতা মহিলাকে দেখা গেছে, তিনি কার বউ, সেই পরিচয়টি প্রকাশ পাবে

কার বউ একটি নতুন কমেডি ছবিতে। নাম: "কার বউ" (ওরেস্টার্ন ফিল্মস লিমিটেড)। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছবির দুই প্রধান শিল্পী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। শ্রীকুমার সরকার পরিচালক-কাহিনীকার। শ্যামল মিত্র সংগীত পরিচালক। গত বুধবার ছবির মহরত-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ট্রেন-বিভ্রাটের ফলে বিখ্যাত এক চলচ্চিত্রাভিনেত্রীকে এসে উঠতে হল নতুন পরিবেশে। নতুন

নায়িকা-সংবাদ মানুষদের প্রীতিপূর্ণ সান্নিধ্যে তার কয়েকটি দিনের কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়েই

...-সংবাদ" (বি কে প্রোডাকশন্স)। ... দেবের এই কাহিনীর চিত্ররূপ ...ছেন অগ্রদূত। উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ... ছবির নায়ক-নায়িকা। বিশিষ্ট ...য় রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা, ...দার, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ... মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্য ঘোষ প্রভৃতি। ... মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

...কুমার সাজবেন বাজীকর, সুপ্রিয়া চৌধুরী হবেন প্রফেসর। ছবির নাম: "বাজীকর" (প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজার্স) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে ছবিটি পরিচালনা করবেন শ্রীবিমল রায়। জানা গেল, ছবিতে উত্তমকুমার গানও গাইবেন। শুটিং অবিলম্বেই শুরু হবে।

বাজীকর

তপন সিংহ পরিচালিত "গল্প হলেও সত্যি"-র একটি দৃশ্যে ছায়া দেবী, রবি ঘোষ ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—এ সপ্তাহে ছবি মুক্তি পাবে

রঘুপতি—কমল মিত্র, গোবিন্দমাণিক্য—অভী ভট্টাচার্য, গুণবতী—দীপ্তি রায়, অপর্ণা—শমিতা বিশ্বাস এবং জয়সিংহ—নবাগত আনন্দ মুখোপাধ্যায়। এদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকের চলচ্চিত্র-রূপ দিচ্ছেন পরিচালক বীরেশ্বর বসু। সম্প্রতি ছবির কিছু অন্তর্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। সংগীত ও আবহ-সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন দ্বিজেন চৌধুরী ও কালীপদ সেন।

বিসর্জন

বনপথে সরল বালকের 'মধুসূদন দাদা' বলে ডাকা এবং ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সেই পৌরাণিক ভক্তি-গাথা অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে দীপক পিকচার্স-এর "ভক্তের ভগবান"। "জন্মতিথি"-খ্যাত দিলীপ মুখোপাধ্যায় ছবির পরিচালক। রবীন মজুমদারকে এক বিশিষ্ট চরিত্রে এ ছবিতে দেখা যাবে। সম্প্রতি কালীপদ সেনের পরিচালনায় ছবির কিছু গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জুশ্রী বসু।

ভক্তের ভগবান

মুক্তিপথে "শেকসপীয়ারওয়ালা"

জেমস আইভরি পরিচালিত "শেকসপীয়ারওয়ালা" কলকাতায় অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাবে। গত বছর এই ছবির শিল্পী মধুর জাফরে বার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছবির সর্বভারতীয় চিত্রপরিবেশনস্বত্ব নিয়েছেন আর ডি বি অ্যান্ড কোং।

অল্প দৈর্ঘ্যের ডাচ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ডাচ (নেদারল্যান্ডস) দূতাবাসের সহযোগিতায় একটি পরীক্ষামূলক ডাচ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। অধিকাংশ ডাচ চিত্রগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর গোখলে মেমোরিয়াল হলে ছবিগুলি দেখানো হবে। ছবিগুলির নাম: —'রাইথাম অব রটারডাম, বেলস অব হল্যান্ড, বিগ সিটি ব্লুজ, প্যান, "ডাচ মাস্টারপিস", গ্লাস।

স্থিরচিত্র প্রদর্শনী

বাংলা মঞ্চের বিগত যুগের এবং বর্তমানকালের শিল্পীদের স্থিরচিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী মীরেন অধিকারী। অভিনীত নাটকের অনেক দৃশ্যও এতে রাখা হয়। গত সপ্তাহে নবনির্মিত "স্টুডিও মীরেন"-এ (বিধান সরণি) প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিনই ছিল স্টুডিওর উদ্বোধন।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় নান্দীকারের "শের আফগান" অভিনয়ের সমালোচনায় নাট্যকার পিরানদেলোকে ভুলক্রমে 'জার্মান' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি ইটালিয়ান। তবে তাঁর শিক্ষা-জীবন জার্মানীতেই কাটে। তিনি বন য়ুনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

বিবিধপ্রসঙ্গ

"ম্যাক-কল্‌স্‌" ম্যাগাজিনে "হু'জ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ" ছবি সম্পর্কে এলিজাবেথ টেলর একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছেন। ওই প্রবন্ধে টেলরের একটি মন্তব্য : "মহিলা চিত্র সমালোচকদের লিখতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, "কিউট ও ক্লেভার" হবার জনাই তাঁদের যত আগ্রহ। প্রকৃত সমালোচনার কাজ তাঁরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।" প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, ওই সাময়িক পত্রিকাতেই পলিন কেল-এর শেষ চিত্রসমালোচনা বেরিয়েছে। কাগজের মালিকরা শ্রীমতী কেলকে লেখার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কারণ, "দি সাউন্ড অব মিউজিক" সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নাকি পাঠকরা খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেননি।

মিস ইন্ডিয়া যাসমিন দাজি জানিয়েছেন, সিনেমায় অভিনয় করার কোন বাসনা তাঁর নেই। তিনটি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছে। কিন্তু তিনি তাঁর পড়াশোনা নিয়েই থাকতে চান। ভারত-সুন্দরী একজন মেডিকেল ছাত্রী।

হেলিভিশন ক্যামেরা সিস্টেম ব্রিটেনের কয়েকটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, "দি ব্লু ম্যাক্স"। হেলিকপ্টারে ক্যামেরা স্থাপন করে এই পদ্ধতিতে শূন্যের ঘটনা সহজেই তোলা যায়। মার্কেট ফিল্মস ব্রিটেনে এই পদ্ধতির সর্বস্বত্ব ক্রয় করেছেন।

ফিল্ম ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়ার ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত শিল্পী মন্টো সোহ্‌রাব মোদীর ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ।

মেগাফোনের পূজার রেকর্ডে কবিতা আবৃত্তি করেছেন সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় এবং আধুনিক বাংলা গান গেয়েছেন বিশ্বজিৎ

"আকাশ ছোঁয়া" ছবির (পরিচালনা : রাজেন তরফদার) একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী, চারুপ্রকাশ ঘোষ, বিনতা রায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

নাটক

নতুন মুখ-এর নাট্যাভিনয়

নবগঠিত নাট্যসংস্থা "নতুন মুখ" জন্মাষ্টমীতে প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের প্রথম নাট্যাভিনয় পরিবেশন করেন। তাঁরা মঞ্চস্থ করেন কিরণ মৈত্রর "বারো ঘণ্টা"। শিল্পীদের (এঁদের অনেকেই মঞ্চে নবাগত) টিমওয়ার্ক দেখে মনে হল, শৌখিন অভিনয়-জগতে তাঁরা একদিন সম্মানের আসন পাবেন। সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় সুষ্ঠুভাবে নাটকটি পরিচালনা করেন। বহু-অভিনীত হলেও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের এই বাস্তবধর্মী নাটকের অভিনয় দর্শকদের আগাগোড়া আকৃষ্ট করে রাখে। চরিত্রাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তপন চক্রবর্তী, মীণ চট্টোপাধ্যায়, অমল সিংহ, মৃগাংকমোহন দেব, মঞ্জিরা গাঙ্গুলী, পুলিন মজুমদার প্রভৃতি। নীলাদ্রি মিত্র কিছুটা অতি-অভিনয় করেছেন। ছোটখাটো চরিত্রে শংকর চট্টোপাধ্যায়, নিমাই দাস, আর্য বিশ্বাস, কল্যাণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন পালের আবহ-সংগীত ভালই হয়েছে।

নাটকাভিনয়ের প্রারম্ভে সংস্থার সভাপতি শ্রীঅপরেশ ভট্টাচার্য "নতুন মুখ"-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

রবিরূপ

সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে রবিরূপের শিল্পীরা "জীবন যৌবন" ও "বেকার বিদ্যালংকার" নাটক দুটি অভিনয় করেন। তমাল লাহিড়ীর পরিচালনার গুণে নাটক দুটি উপভোগ্য হয়। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় অচিন্ত্য দত্ত ও স্বপন দাসের। সংগীত পরিচালক মুরারি ভড় নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। **আলোয় বসন্ত সিংহের কাজ ভাল।**

সাংস্কৃতিকী

দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক [illegible] "দাক্ষিণায়নের" পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসরোবর প্রেক্ষাগৃহে সম্পন্ন হল। উপলক্ষে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য "ভানুসিংহের পদাবলী" ও "ঝুলন", বাদ্যবৃন্দ এবং সংগীতের এক বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশিত [illegible] নৃত্যাংশে যোগ দেন শান্তা বসু, [illegible] গাঙ্গুলী, জবা বাগচী, মিত্রা গোস্বামী, চুমকী গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

একক সংগীতে সুনীলকুমার রায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] শর্মিলা রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

*

সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে [illegible] কর্তৃক কবিগুরুর [illegible] গীতি-[illegible] অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত [illegible] অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়। কুমারী রেবা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্য দর্শকবৃন্দ [illegible]

প্রসন্নচিত্তে উপভোগ করেন। তিনি [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] 'নিরুপমা' [illegible] গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। গান গেয়েছিলেন [illegible] সুকান্ত [illegible] অন্যান্য কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মানসী বাগচী, [illegible] রায়চৌধুরী ও ধীরা গাঙ্গুলী। গ্রন্থনায় ছিলেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

HANDLE WITH CARE
murphy
murphy

৩৩ বর্ষ ॥ ৪৮ সংখ্যা
শনিবার ১৪ আশ্বিন ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীপীযূষকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩, ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষান্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ২৭.০০
ষান্মাসিক ১৪.০০
ত্রৈমাসিক [illegible]

[illegible]
বার্ষিক [illegible]
ষান্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]

[illegible]
বার্ষিক সডাক [illegible]
ষান্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]

[illegible]
বার্ষিক [illegible]
ষান্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]

দাম [illegible]

Saturday 1 October 1966

বাংলা বন্‌ধ

বাংলা বন্‌ধ-এর উদ্বেগপূর্ণ আটচল্লিশটি ঘণ্টা কেটে গেছে। সংকটপূর্ণ রোগীর শিয়রে যেভাবে মানুষ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে জেগে থাকে, সেভাবে যে অনেকেই এই বাংলা বন্‌ধ-এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে কারও আটকাচ্ছে না।

সৌভাগ্যের কথা, বাংলা বন্‌ধ-এর অর্থাৎ গত বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছুই ঘটে নি যাকে আমরা বড় রকমের গোলমাল বলতে পারি। কলকাতায় ছোটখাট কয়েকটা ঘটনা বা বিক্ষিপ্ত এবং কতিপয় অর্বাচীনের কীর্তি, তা বাদে আর কিছু ঘটে নি। কোনো একটি এলাকায় কিছুক্ষণ জনতা বনাম পুলিসে সংঘর্ষ হয়েছে বটে তবে এ ধরনের সংঘর্ষকে পূর্বের তুলনায় নিরীহ বলেই মনে হয়। কেউ কেউ হয়ত একে যথারীতি উভয় পক্ষের ব্যায়াম-চর্চা কালেও বলতে পারেন। অভ্যাস রক্ষার জন্য যা প্রয়োজন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থা শান্ত ছিল। যাই হোক, বন্‌ধ সত্ত্বেও নাগরিক জীবনে শান্তি ও শৃংখলা থাকার জন্য আমরা বামপন্থী দলগুলিকে, রাজ্য সরকার এবং জনসাধারণকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই বন্‌ধ সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতে দেখা যায় তিনি এই বন্‌ধ ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর কথা মতন, বাঁকুড়া, মালদহ শহর ও বালুরঘাট ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বন্‌ধ ব্যর্থ হয়েছে, কলকাতাতেও আংশিকভাবে সফল হয়েছে।

বামপন্থী নেতাদের ঘোষণা : বন্‌ধ-এর সাফল্য 'ঐতিহাসিক সাফল্য।' সেই সঙ্গে তাঁরা সরকারকে নানা দোষে অভিযুক্ত করেছেন, যেমন তাঁরা মনে করেন, রাজ্যব্যাপী প্রায় চার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে, শ্রমিকদের মধ্যে প্রাদেশিক ও ধর্মীয় জিগীর তুলে এবং বিরুদ্ধ প্রচার করে সরকার আন্দোলন ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিলেন। সর্বোপরি মিলিটারিকে তৈরী রাখা হয়েছিল।

দু' পক্ষের এই মনোভাব স্বাভাবিক। আমরা তৃতীয় পক্ষ, আমাদের পক্ষে এই মাত্র সান্ত্বনা যে, উভয় পক্ষই আমাদের অশান্তির মধ্যে পড়তে দেন নি।

বাংলা বন্‌ধ-এর মধ্যে ও পরে জনসাধারণের যে দুর্গতি হয়েছে তার কথাও এখানে বলা আবশ্যক। বন্‌ধ-এর আগে সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশ কাবু হয়ে পড়েছিলেন। বন্‌ধ-এর মধ্যে খুচরো ব্যাপারী, ছোটখাট দোকানী, নিত্যদিনের মুটেমজুর, ঠেলাঅলা, রিক্‌শাঅলাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়েছে। দুটি দিনের রুজি-রোজগার একেবারে বন্‌ধ। বন্‌ধ-এর পর সবজির দোকানে বাসি-পচা আনাজ তিনগুণ দামে বিক্রি হয়েছে। এরা দুদিন দোকান খুলতে পারে নি, ফলে তৃতীয় দিনে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে তাদের লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে। সাধারণ মানুষকে অবশ্য এই দুদিনের লোকসান পুষিয়ে নিতে দিবানিদ্রা বা তাসপাশার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

রাজ্যের সর্বত্র অচল অবস্থা সৃষ্টি করলে জাতীয় ক্ষতি কি বিরাট পরিমাণে হতে পারে তার হিসাব দাখিল করে লাভ নেই। সকলেই সেটা বোঝেন। তা সত্ত্বেও এই ক্ষতি, বিশেষ করে আমাদের এই দুর্গতির দিনে, কাকে উপকৃত করে আমরা জানি না।

বন্‌ধ-এর যাঁরা সমর্থক তাঁদের আমরা একটি প্রশ্ন করতে পারি। সরকার না হয় আমাদের দুর্গতির মধ্যে রেখেছেন—কিন্তু এই আটচল্লিশ ঘণ্টা সব কিছু অচল রাখার পর যখন মধ্যবিত্ত মানুষকে থলি হাতে বাজারে যেতে হয়েছে তখন কি তারা হঠাৎ সুখের মুখ দেখেছেন? যে মুটে-মজুর দিন-রোজগারীরা দুদিন এক পয়সাও রোজগার করতে পারল না, তারা কি তৃতীয় দিনে তিনগুণ কামাই করে নিতে পেরেছে?

প্রতিবাদের পরিণাম যদি এই হয়—গরীব ও মধ্যবিত্তকে আরও দুর্গতি সহ্য করতে হবে তবে বলা বাহুল্য তাতে আমরা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত না হয়ে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো মহলের তরফ থেকে আবেদন জানানো হয়েছিল, বন্‌ধকে এতটা দীর্ঘস্থায়ী না করতে। তাতে নেতাদের মন ভরে নি। প্রতিবাদ জানানোর পক্ষে গতানুগতিক বারো ঘণ্টা বা বড় জোর চব্বিশ ঘণ্টাও যদি পর্যাপ্ত না হয়ে থাকে তবে এই আটচল্লিশ ঘণ্টা নিশ্চয় পর্যাপ্ত। আমরা অপেক্ষা করে দেখতে পারি, এই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদের পর আমাদের মতন সাধারণ মানুষের কতটুকু লাভ হয়।

আত্মরক্ষার উপায়

একটা অঘোষিত গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ বিভাগ ঘটেছিল। দেশ বিভাগের দ্বারা সেই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটেনি। ইতিহাস (এবং ভূগোল)কে আমরা ফাঁকি দিতে পারি নি। সেই গৃহযুদ্ধের সমস্যা এখনো অমীমাংসিত। একদা যেটাকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলা হত, এখন সেটার গায়ে একটা আন্তর্জাতিক পোশাক চড়ানো হয়েছে। সেকালে "তৃতীয় পক্ষ" ছিল ইংরেজ, এখন "তৃতীয় পক্ষ" মাত্র একটি নয়, এখন আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীন সেই "তৃতীয় পক্ষের" অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গোদারা ছাড়া আনাচে-কানাচে আরো ছোটোখাটো মর্কটের পদধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। জটিলতা এবং বিপদ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এবং বাড়তির দিকেই চলেছে।

গৃহযুদ্ধ কেবল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয়, তার নিচের স্তরেও—এবং কেবল একটা মাত্র স্তরে নয়, একাধিক স্তরে—একটা গৃহযুদ্ধের আবহাওয়ার আঁচ অনুভূত হচ্ছে। কি ভারতে, কি পাকিস্তানে, খবরের কাগজে কলহ, বিবাদ, অশান্তি আর মারামারির খবর অন্য সব খবরকে ছাপিয়ে চলেছে। এগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে মানসিক উদ্বেগকে চাপা দেওয়ার চেষ্টার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়, কিন্তু সেটা সাময়িকভাবে দুশ্চিন্তা এড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়, তাতে বিপদ কমবে না, বাড়বে।

নিকটের অশান্তিকে চাপা দেবার আর একটা চিরাচরিত উপায় আছে। সেটা হচ্ছে ঘরের অশান্তি বা কলহের দিক থেকে মানুষের দৃষ্টিকে বহিশত্রুর দিকে আকর্ষণ করা। প্রজার দুঃখদারিদ্র্য বা অন্যবিধ অসন্তোষের সমাধান করতে না পেরে বা তার সমাধানের জন্যে যা করা দরকার তা করার অনিচ্ছার কারণে রাষ্ট্রকর্তারা বহিশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধের পাঁয়তাড়া কষায় দেশের লোককে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করেন বলে তাঁদের একটা অখ্যাতি আছে। অখ্যাতিটা অমূলক নয়। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে যে শত্রু নয় বা যাকে শত্রু বানাবার কোনো সংগত কারণ নেই তার সঙ্গে শত্রুতা একটা জাতীয় কর্তব্য বলে জাহির করা হয়। এর দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। এ ছাড়া নিজেদের শক্তি ও প্রভাবের এলাকা বৃদ্ধি তো "বৃহৎ রাষ্ট্রদের" স্বভাবের একটা অঙ্গ। এরই অন্য নাম পররাজ্য লোভ। বিভিন্ন কালে সেটা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়।

যেখানে আভ্যন্তর অসন্তোষকে চাপা দেবার জন্যে বিদেশী শত্রুর দিকে প্রজার মন আকর্ষণ করার চেষ্টা চলে, সেখানে কখনো কখনো সাময়িকভাবে রাষ্ট্রকর্তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে তার পরিণামফল দ্বিগুণ মারাত্মক হয়। বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টার ভিতর দিয়ে জাতির সংহতি ও বলবৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু যেখানে আভ্যন্তর দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা না করে বাইরের দিকে লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা হয় এবং জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটানো হয় সেখানে ভিতরের দুর্বলতা আরো বেড়েই যায় এবং রাষ্ট্র ক্রমশ আরো অন্তঃসারশূন্য হতে থাকে এবং একদিন ভেঙে পড়ে।

এই বিপদ আরো বাড়ে যদি একটা উচ্চস্তরের কলহেতে লোককে মাতিয়ে একটা নিম্নস্তরের কলহকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা হয়। যেখানে সেই উচ্চস্তরের কলহটার সমাধানও জাতীয় সংহতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, যেখানে আসলে যেটা অন্তর্কলহ সেটাকে বাইরের ব্যাপার বলে ধরে নিয়ে একটা বহিশত্রু কল্পিত হয়, যাকে শত্রু করে রাখা মানেই নিজেদের দেহের মধ্যে মারাত্মক রোগ পুষে রাখার শামিল। ভারত ও পাকিস্তান যদি পরস্পরকে বহিশত্রু মনে করে সেই শত্রুতার প্রতি স্ব স্ব প্রজাগণের মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়ে নিজেদের আভ্যন্তর দুর্বলতাগুলোকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে তবে না ঘরের না বাইরের কোনো সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হবে না, বরঞ্চ তার ফল বিপরীত হবে।

আজ চীন, আমেরিকা বা রাশিয়া যে কেবল ভারত-পাকিস্তান কলহের স্তরে নাক গলাতে পেরেছে তা নয়, এই দুই রাষ্ট্রের একান্ত আভ্যন্তর ব্যাপারেও এদের হস্তক্ষেপের সুযোগ ক্রমশ বাড়ছে। গৃহযুদ্ধ কেবল ভারত-পাকিস্তান স্তরে সীমাবদ্ধ থাকছে না, দুই রাষ্ট্রের ভিতরে নানা স্তরে তার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে। আজ আমেরিকা, রাশিয়া বা চীন কেবল ভারত-পাকিস্তান স্তরের কলহে হস্তক্ষেপের সুযোগ যে পাচ্ছে কেবল তা নয়, আমাদের আভ্যন্তর রাজনৈতিক ব্যাপারেও এদের হস্তক্ষেপের পথ আমরা আমাদের অসহিষ্ণু অদূরদর্শী স্বার্থবোধ ও নির্বুদ্ধিতার দ্বারা সুগম করে দিচ্ছি।

গৃহযুদ্ধ চিরকালই বিদেশীর হস্তক্ষেপ ডেকে আনে এবং বিদেশীরা বন্ধুর বেশে গৃহযুদ্ধের আগুনে ইন্ধন যোগায়। অস্ত্র এবং অর্থনৈতিক সাহায্যও সেই ইন্ধনরূপে আসতে পারে। যখন কোনো দেশে গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তখন প্রতাপশালী বিদেশীরা স্ব স্ব স্বার্থানুসারে পক্ষ বেছে নিয়ে "সাহায্য" বিতরণ আরম্ভ করে। সোজাসুজি যুদ্ধ হচ্ছে শেষ দশার ব্যাপার, তার আগে বিপদ নানা রাজনৈতিক রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। অনেক সময়ে ঘটনার প্রকৃত গতি ঠিক কী বুঝা যায় না, যখন বুঝা যায় তখন আর সামলাবার উপায় থাকে না। যেখানে উপরে গণতান্ত্রিকতার খোলস থাকে সেখানে ইলেকশনের গতিকে বিদেশী

"বন্ধু" নিজের স্বার্থের অনুকূল পথে চালাবার চেষ্টা করে যে দল তার মনোমত কাজ করবে বলে মনে করে তাকে ক্ষমতায় আনতে বা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করে। ক্রমশ দলগুলি তাদের বিদেশী "বন্ধুদের" মুখাপেক্ষী হতে হতে একেবারে তাদের দ্বারা কবলিত হয়ে যায়, তাদের বাঁচা মরা বিদেশীর হাতে এসে যায়।

এই বিবর্তনের ধারা উপমহাদেশের রাজনীতিতে শুরু হয়ে গেছে বলে অনেকের মনে আশঙ্কা জেগেছে। কারো রাশিয়া, কারো চীন, কারো আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকা শুরু হয়েছে। এই ধারা যদি চলতে থাকে তবে তার পরিণাম এই উপমহাদেশের পক্ষে কী হবে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়, কারণ তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীময় ছড়ানো রয়েছে।

এই মহাবিপদ থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরিয়ে আনা। আজ এক দল যদি চীনের দিকে মুখ করে থাকে, তবে আর এক দল রাশিয়ার দিকে মুখ করে থাকবে, আর এক দল আমেরিকার দিকে। [illegible] দেশকে যদি উচ্ছন্নে দেবার ইচ্ছা আমাদের না থাকে তবে জাতীয় নীতির মুখ একেবারে ঘরমুখী করা দরকার। এই উপমহাদেশে যদি কোনো একটি "বৃহৎ রাষ্ট্র" প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় তবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী "বৃহৎ রাষ্ট্র" নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না এবং ভারত-পাকিস্তান স্তরে তো বটেই, এই দুই রাষ্ট্রের আভ্যন্তর স্তরেও নিজের অনুকূলে দল সৃষ্টির চেষ্টা করবে। এই কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রবিশেষে কোনো একটা ক্ষুদ্র দেশের "নিরপেক্ষতা"র গ্যারাণ্টির কথা বিবেচনার যোগ্য হতে পারে কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সমন্বিত এই উপমহাদেশের "নিরপেক্ষতা"র কোনো গ্যারাণ্টির আলোচনা অর্থহীন। যদি "নিরপেক্ষ" থাকতে চায় তবে এই উপমহাদেশের নিজের আভ্যন্তর শক্তির দ্বারাই কেবল তা সম্ভব। এবং পৃথিবীর বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থায় আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া "নিরপেক্ষতা"র কোনো ভিত্তি হতে পারে না। আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া "নিরপেক্ষতা" যেমন সম্ভব নয় তেমনি সুরক্ষার জন্যে "নিরপেক্ষতা" আবশ্যক এবং এইগুলোর সঙ্গে গৃহবিপদ নিবারণের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা যদি কোনো দিকের বিদেশী সাহায্য চাই না বলে পণ করতে পারি তবে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা অন্ততপক্ষে বারো আনা নিবারিত হবে। এরকম পণ করতে সাহস লাগবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আত্মঘাত থেকে বাঁচবারও আর কোনো পথ দেখা যায় না।

২৬।৯।৬৬

এর্নাকুলামে কংগ্রেস কমিটির সফল অধিবেশন।
কম্যুনিস্ট বোম
গলিত নখদন্ত সিংহের বিবরে আশ্রয়।
কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহার
তাহলে টোপ গিললো।
ইস্তাহার
সদাশিব ত্রিপাঠীই উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী থেকে গেলেন।
বিজুর কৌশল

ডলফিনের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি রুশ বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে একটি আবেদন প্রচারিত হয়েছে পৃথিবীর কাছে। তাঁরা বলছেন, মানুষের স্বার্থে, তার নিজস্ব প্রয়োজনেই ডলফিন শিকার বন্ধ করা হোক। কৃষ্ণসাগরের ধীবরদের

মেমসাহেবদের নরম পোষাকের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে চিনচিলা। আজ তারা দুর্লভ

নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানীরা আশা করেন—অন্যান্য দেশ-গুলিও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।

অতল নীল সমুদ্রের বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ ছাপিয়েও তার দুর্গম-গভীর মানুষের কল্পনাকে আকুল করেছে যুগে যুগে। গ্রীক পুরাণের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমুদ্রতলের রহস্যজগৎ তার বর্ণ-বিচিত্র প্রবাল, তার মুক্তার সম্ভার, তার অপূর্ব অপরিচিত প্রাণীদের নিয়ে মানুষের চোখে স্বপ্নের কাজল পরিয়েছে বারবার। ছেলে-বেলায় আমরা পড়েছি জাপানী গল্প, কিংসলির রূপকথা, হানস আন্দেরসনের অপরূপ রূপক-কাহিনী। আর এই রূপ-স্বপ্নকে নিবিড় করে তুলতে সব-চাইতে সাহায্য করেছে এই ডলফিন।

ভয়ে ভরা অচেনা-সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে—চারিদিকেই যখন মৃত্যু আর অনিশ্চয়তা—তখন স্বাভাবিক সংস্কারবশেই মানুষ জেনেছে—কালো পিঠ আর সাদা বুক নিয়ে এই যে একদল সামুদ্রিক প্রাণী তাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—তারা তাদের বন্ধু। মানুষ দেখলে তাদের আনন্দের সীমা নেই, প্রবল বেগে জলের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে সেই উল্লাস প্রকাশ করছে তারা—কখনো বা আনন্দের মাত্রাধিক্যে ডেকের ওপরে এসে আছড়ে পড়ছে দু-একজন। তাদের আবির্ভাবের সংকেত থেকে মানুষ জেনেছে, সমুদ্রে ঝড় আসবে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়েছে: কম্পাসহীন রাডারহীন পালের জাহাজ তাদের ওপর লক্ষ্য রেখে বুঝেছে কূল কত দূরে—কোন দিকে কিভাবে চললে যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন। প্রাচীন নাবিকের কাছে তাই তারা শুভ-সম্ভাবনা, গ্রীকদের কল্পনায় তারা সমুদ্রের কল্যাণ-সত্তা। একের পর এক অদ্ভুত কাহিনী রচিত হয়েছে তাদের নিয়ে, মানুষের তারা সহমর্মী, মানুষের মতো সঙ্গীতমুগ্ধ—গ্রীক গল্পের আরিয়ন তাই বাঁশির সুরে ডলফিনকে বিমোহিত করে তার পিঠে চেপে সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধু গাল-গল্প নয়, আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরো অনেক রহস্যের

একদা এদেশের সর্বত্র ছিল হরিণের অবাধ বিচরণ। আজ কেবল স্মৃতি
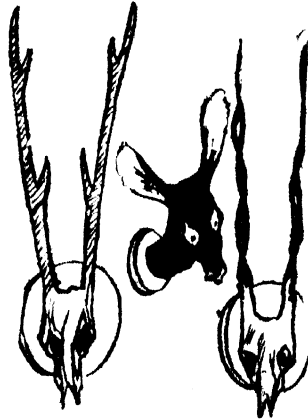
দ্বার খুলেছে। ডলফিনেরা মানুষের মতোই দাম্পত্যজীবনের অনুরাগী—স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি তাদের অসীম মমতা; তাদের ভাষা আছে—সে ভাষায় তারা ভাব-বিনিময় করে; তারা হাসতে জানে—মানুষ ছাড়া এ শক্তি যে পৃথিবীতে আর কারো থাকতে পারে, এ কথা কল্পনারও অতীত ছিল এত-কাল; তাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি বানরের চাইতেও সে মস্তিষ্ক অনেক বেশী উর্বর।
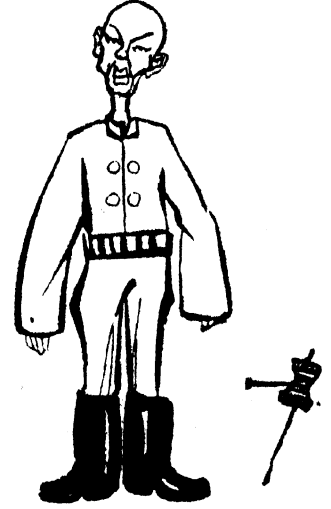
চীনের শিকার তিব্বতী

"The dying dolphin's changing hues"—কবি গান গেয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, 'ডলফিন শিকার বন্ধ করো।' তার মাংস যতই সুস্বাদু হোক—শিকারীর লোভে ক্রম-ক্ষীয়মাণ এই সামুদ্রিক প্রাণীটিকে এখনো যদি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা না যায়, তা হলে অতল সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের আত্মিক ঐক্য রচনা করবার যে অপূর্ব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা-ও চির-কালের মতো হারিয়ে যাবে। 'ডায়িং ডল-ফিন' নয়—জীবনের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করো তাকে। নিঃস্বার্থভাবেই যে মানুষের বন্ধু, মানুষকে দেখবা মাত্র যে আনন্দিত অভিনন্দন জানায়, তাকে এইভাবে নির্বি-চারে হত্যা করার মতো নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা আর নেই। তাই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দিকে দিকে তাঁদের আবেদন পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আজ মহাকাশের দূরতম প্রান্তে পাড়ি দিয়ে তার চিরকালীন অপরিচয়কে আবিষ্কার এবং অধিকার করবার জন্যেই মানুষের মন উতরোল। কিন্তু মাত্র কস-মোনটে নয়—হাইড্রোনটের সামনেও অতলের তেমনি রহস্যভরা আকুল আহ্বান। আকাশের

নিঃসীমতায় মানুষ নিঃসঙ্গ যাত্রী—কিন্তু সমুদ্রের গভীরে মানুষের একটি বিশ্বস্ত সহযাত্রী আছে—সে ডলফিন।

আমরা যা জানি না, তা সে জানে। জানে তার প্রাণীদের খবরাখবর, তাদের রীতিনীতি। জানে হয়তো খাদ্য-প্রাণে ভরা অচেনা গুল্মের সংবাদ, ব্যাধিহর ওষধির বৃত্তান্ত; বলতে পারে—কোথায় ডেরিক বসিয়ে দিলে পৃথিবী-ভাসানো পেট্রো-লিয়মের উৎস অবারিত হবে; জানে—কোথায় আছে মুক্তোর অনাবিষ্কৃত বিশাল ক্ষেত্র, কোথায় ছড়িয়ে আছে দামী-দুর্লভ ধাতু-রত্ন; বলতে পারে ঈজীয়ানের কোন নিভৃত নিলয়ে এখনো পড়ে আছে গ্রীক ভাস্কর্যের সব চিরন্তন উজ্জ্বলতা—অনেক ভেনাস দা মিলো, অনেক দীপ্তমূর্তি ফিবাস আপোলো, অনেক মহিমান্বিত বজ্রধর জুপিতার!

জৈব-খাদ্য সংসারে অনেক আছে, ডলফিনের মাংস না হলেই তার খাদ্যাভাব ঘটবে—এ কথা সত্য নয়। তবু লোভ সামলানো যাবে? নগদ লাভের মায়া কাটাতে পারলে অনেক বড়ো লাভের সম্ভাবনা আছে ভবিষ্যতে, এ কথা বোঝানো যাবে সহজেই? তা যদি হত, তা হলে পৃথিবীর অনেক প্রাণীই চির-বিনষ্টির পথ থেকে বেঁচে যেত—জাদুঘরে তাদের ছবি আর কঙ্কাল ছাড়াও আরো অনেক কিছু অবশিষ্ট থাকত আমাদের জন্যে; রঙিন পালকের প্রয়োজনে, শৌখিন চামড়ার পোশাকের তাগিদে, উজ্জ্বল লোমের দস্তানা পরবার বিলাসিতায় এবং অকারণ হত্যার পুলকে একটির পর একটি প্রাণী-সংঘ এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে যেত না। আফ্রিকার ক্ষত-বিক্ষত অরণ্য-সমাজে এখনো সেই হত্যার তাণ্ডব চলছে—বাংলা দেশের গণ্ডার আর হান্টিং লেপার্ডও তো এইভাবেই লুপ্ত হয়ে এল।

কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলছি কার জন্যে? আসলে আমাদের রক্তে সেই বাইবেলীয় কেইনের উত্তরাধিকার। বনের প্রাণী, সমুদ্রের ডলফিন—এরা তো অনেক দূরের জিনিস। ভ্রাতৃহত্যার ছুরিতে শান দেওয়াই আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তের অনুচিন্তন। এই রীতিতেই আমরা অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রাচীনতম মানবধারাকে নিঃশেষ করেছি; আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে পাঠিয়েছি ব্লু-বিয়র্ড রেড-বিয়র্ড জাতীয় হিংস্রতম মানুষ-শিকারীদের; মায়া-সভ্যতার যারা জন্মদাতা—তাদের বন্দুকের লক্ষ্য করে ছুটে গেছি 'এল-দোরাদো'র সন্ধানে। শোষণের স্বর্ণ-সাম্রাজ্য যখন দায়ে পড়ে ছেড়ে গেছি—তখন উপহার দিয়ে গেছি বিষ-জর্জরিত ভারত-পাকিস্তান, রক্ত-কলঙ্কিত কঙ্গো, আজকের যন্ত্রণাবিদ্ধ ভিয়েৎনাম। আমাদের অবদান 'মুলাটো', আমাদের অবদান আমেরিকান নিগ্রো, আমাদের অবদান ঔপনিবেশিক দেশে দেশে রাশি রাশি অপজাতক।

অতএব ডলফিন-শিকার আমরা বন্ধ করব না।

ছেলেবেলায় পড়া গলসওয়ার্দির একটা নাটকের কথা আমার মনে পড়ছে। নির্বিচার এবং অন্ধ ক্রোধে একদা যে মানুষটিকে হত্যা করা হয়েছিল—পরে তারই মর্মর-মূর্তিকে টুপি নামিয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদনের পালা। ঠিক সেই কাজটিই আমরা করব ডলফিনের ক্ষেত্রেও। ভবিষ্যতের যাদুঘরে তার একটি বহুমূল্য মূর্তি চমৎকার করে সাজিয়ে রাখব আমরা, তার তলায় টীকা লিখব: 'এই সমুদ্র-প্রাণীটি একদা মানুষের পরম বন্ধু ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি লুপ্ত হয়ে গেছে।'

সময় নষ্ট করছি—

বনফুল

তর্ক ক'রে সময় নষ্ট করছি।
আকাশ তর্ক করে না
সে মগ্ন বিরাট নীল মহিমার পরিব্যাপ্তিতে ঃ
ফুল তর্ক করে না
পাখীও না
তারা বিনা তর্কে ফোটে, গান গায়
নিজেদের স্বচ্ছন্দ মহিমায় তারা উদ্ভাসিত, বিকশিত
চলমান।

আমরাই কেবল তর্ক ক'রে সময় নষ্ট করছি।
তর্ক কি নিয়ে তা বলতে লজ্জা করে
স্বার্থের হাড় নিয়ে কুকুরদের চেঁচামেচি
এ উপমা দিতে লজ্জা হয় সত্যিই।
আত্মসম্মানে লাগে,
মনুষ্যত্ব কুণ্ঠিত হয়,
কারণ আমরা কুকুর নই, মানুষ।

তবু আমরা তর্ক করছি
চীৎকারের ঝঞ্ঝনায় কাঁপছে ঘরের ছাদ
দেওয়াল কাঁপছে
ভিত্ ন'ড়ে উঠছে।
মনে হচ্ছে হুড়মুড়িয়ে
পড়ে যাবে বুঝি সব।
প্রাগৈতিহাসিক স্তূপের মতো
হয়ে যাব আমরা
ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গবেষণার বিষয়।

তর্ক—তর্ক—তর্ক—
তর্কের আঁধি-ঝড় উঠছে চতুর্দিকে।
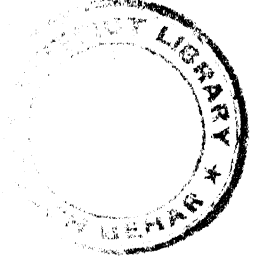
আমরা ভুলে যাচ্ছি নিজেদের
ভুলে যাচ্ছি
অহংকারের অন্ধকার প্রকাশ করে না কিছু
ঢেকে ফেলে সব।
বৃহতের বেদীমূলে
মহতের মহাতীর্থে
যে মহামানব তীর্থঙ্করেরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন
যে মহামানব তীর্থঙ্করেরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন একদা
তাই আমাদের লক্ষ্য।
কিন্তু আমরা তর্ক করছি
কেবলই তর্ক করছি।

ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করছে সপ্তর্ষি
বিনা তর্কে,
বিনা তর্কে শিশু পান করছে স্তনাসুধা
বিনা তর্কে প্রিয় আলিঙ্গন করছে প্রেয়সীকে।
বিনা তর্কে আসছে
জীবন-মৃত্যু-নিদ্রা-জাগরণ-স্বপ্ন।
বিরাট বিকাশের অনিবার্য বিবর্তন বিনা তর্কে।
তর্ক না করেই
সম্প্রসারিত হচ্ছে মহাজীবন
যুগ থেকে যুগান্তরে।

কালের বিরাট পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে
ঝ'রে পড়ছে অনুক্ষণ
পল-বিপল, দিবা রাত্রি
মাস বৎসর যুগ যুগান্তর।
সৌরজগৎ এগিয়ে চলেছে অনন্ত পথে।

আমরা কিন্তু এগোচ্ছি না
আমরা কেবল তর্ক করছি।

ভ্লাদিমির মায়াকভ্‌স্কি

['জনতার রুচির গালে এক থাপ্পড়'—এই নামে একটি ইস্তাহার বেরুলো ১৯১২ সালে। নতুন সাহিত্য অভিযান শুরু করে যে চারজন তরুণ কবি এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিল তাদের মধ্যে ১৯ বছরের ছোকরা মায়াকভ্‌স্কিই সবচেয়ে তেজী। ইটালীতে মেরিনেত্তি যে ফিউচারিস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার প্রভাব এসে পড়ে রাশিয়ায়, কবিতার পূর্ব সংস্কার ভেঙে একদল কবি বিপ্লব করলেন। যা কিছু তথাকথিত কবিত্বময়, প্রথা-সিদ্ধ সুন্দর, সেইসব আবরণ খুলে ফেলে এঁরা কবিতাকে রক্ত-মাংসের, সমসাময়িক জীবনের ও যথাযথ আবেগের প্রকাশ হিসেবে দেখতে চাইলেন। তারপর ১৯১৭ সালে এসে গেল রুশ বিপ্লব। মায়াকভ্‌স্কির মধ্যে একটা বেপরোয়া, তেজী, উদ্দাম-হৃদয় ছিল, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লবের মধ্যে। এবং রুশ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত হলেন। তাঁর জোরালো ও উচ্চকণ্ঠ শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারের ক্ষমতা ও ঝোঁক, তাঁর কবিতাকে বিপ্লবের প্রেরণা হিসেবে জনতার কাছে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, বিপ্লবীরা আসলে জন্ম-রোমাণ্টিক। সাম্যবাদী বিপ্লবের মধ্যে রোমাণ্টিকতার স্থান সামান্য, কিন্তু যে-সমস্ত কবি ও লেখক প্রথমে এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন এক প্রকার রোমাণ্টিক প্রেরণাবশত। এইজন্যই এইসব সাহিত্যকারদের মধ্যে অবিলম্বেই আত্মহত্যা, নির্বাসন ও স্বপ্নভঙ্গের হিড়িক পড়ে যায়। বিপ্লবের মধ্যে একটা প্রবল ভাঙাচোরা আছে—যা শিল্পকে সব সময়ই আকর্ষণ করে, কিন্তু পরবর্তী গঠনের যুগে শিল্পী নিশ্চিত খানিকটা উদাসীন। কারণ, তাঁর বুকের মধ্যে ব্যক্তিগত বিপ্লব থেকেই যায়। বিপ্লবের কবিতাগুলির জন্যই মায়াকভ্‌স্কি বিখ্যাত, কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতাবলী, ভয়ংকর আবেগ, আত্মঘাত, অপমানবোধ, ক্রোধ ও করুণা প্রার্থনা—ইত্যাদির মিশ্রণে পৃথিবীতে অনন্যস্বাদ।

১৯৩০ সালে মায়াকভ্‌স্কি আত্মহত্যা করেন। বয়েস মাত্র ৩৭, তখন তিনি খ্যাতি ও সম্মানের উচ্চশিখরে। তাঁর নোট বইয়ের মধ্যে যে কটা অসমাপ্ত কবিতা পাওয়া যায়, তার দুটি টুকরো আমরা এখানে উপস্থিত করেছি।]

আমাদের যাত্রা

বিপ্লবের দামামা বেজে উঠুক ময়দানে
উঁচে তোলো সারবন্দী অহংকারী মাথা
বিস্ময় সব শহর ভাসিয়ে দেবো বানে
দ্বিতীয় মহাপ্রলয় আজ ছড়াবে সবখানে।

দিনের বাহন হেলে পড়েছে অতি
বৎসরের গরুর গাড়ি ঢিমে
গতি আমাদের দেবতা, শুধু গতি
হৃদয়গুলি দামামা সম্প্রতি।

আমরা সোনার চেয়ে দামী, জানি
বুলেট যেন ভ্রমর, বুকে বেঁধে না
গানে আমরা হয়েছি শস্ত্রপাণি
গলার সুরে সোনার ঝনঝনা।

ধুসর মাঠ, আনো তোমার সবুজ
দিনের জন্য পথ বানাও ঘাসের
হে রামধনু, এবার নীলাকাশের
ঘোড়া ছোটাও বৎসরের, সঘন নিশ্বাসের।

তারায় ভরা আকাশ আজ ম্লান
ওদের ছাড়াই আমরা লিখেছি গান।
সপ্তর্ষিরা! শোনো আজ দাবি জানাই
আমরা স্বর্গে জীবন্ত যেতে চাই!

চালাও ফূর্তি! গান করো! উৎসব!
বসন্ত ঋতু প্রত্যেক ধমনীতে
হৃদয় এখন তোলো যুদ্ধের রব
ধাতুর দামামা হৃদয়ের বৈভব।

অসমাপ্ত

২

এখন রাত একটা
তুমি নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে আছো
অথবা, হয়তো, তুমিও আমার মতো......
আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই।
এখন কোনো মানে হয় না এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে
তোমাকে জাগিয়ে তোলা বা বিরক্ত করার—

৫

আমি জানি শব্দের ক্ষমতা, আমি জানি শব্দের মাদকতা
সেই শব্দ নয়, যা থিয়েটারে হাততালি পায়,
সেই শব্দ যা কফিন ফেটে বেরিয়ে দারুময় চার পায়ে হাঁটে
কখনো কখনো লোকে তোমাকে বাতিল করে, ছাপা হয় না,
প্রকাশক জোটে না
কিন্তু শব্দ তবু অশ্বারোহী, বল্গা দাঁত করে ছুটে যায়
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাজে সেই শব্দ
রেল ট্রেনও একসময় হামাগুড়ি দিয়ে আসে কবিতার
বিবর্ণ হাতে চুম্বন করার জন্য।
আমি জানি শব্দের ক্ষমতা। কখনো তাকে দেখায় খুব
সাধারণ
নর্তকীর পায়ের কাছে ঝরে পড়া পাপড়ির মতন
কিন্তু মানুষ তার নিজের আত্মায়, ওঠে, হাড়ের মধ্যে...

অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আঁদ্রে জিদ

দুনিয়ার লোক হন্দমুন্দ হয়ে প্যারিস যায়, এবং প্যারিসের ধনীদরিদ্র সকলেরই স্বপ্ন, কি করে গ্রামাঞ্চলে একখানা কুটিরাবাস নির্মাণ করা যায়। প্যারিসের ফ্ল্যাটখানাও থাকবে এবং সেখানে মাঝেমধ্যে আসবেন থিয়েটার অপেরা দেখবার জন্য, বন্ধুজনের (বান্ধবী তো নিশ্চয়ই) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

খাঁটি স্ট্যাটিস্টিক দেওয়া কঠিন,—ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, যে কজন মহৎ ফরাসি লেখক আমার প্রিয় তাঁদের প্রায় সকলেই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন 'মফস্বলে'। যাঁরা নিতান্তই কোনো না কোনো কারণে পেরে ওঠেননি—যেমন আলফঁস দোদে—তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন গ্রামাঞ্চলে, কোনো সখার বাড়িতে।

প্রভাঁসের যে-জায়গাটিতে দোদে বার বার যেতেন সেখানে দিন পাঁচেক কাটানোর পর এক অপরাহ্নে বসে আছি, যে-'ইন্'টিতে উঠেছিলুম (এসব 'ইন্' এমনই গাঁইয়া যে এগুলো না হোটেল, না ডাক-বাঙলো, না সরাই, না চটি—সব-কটিরই অল্প-বিস্তর সুবিধে অসুবিধে দুইই এগুলোতে পাবেন) তারই জানলার কাছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ঢেউখেলানো উঁচু নিচুর টক্করে ভর্তি জনপদ ধরিত্রীর দূরত্ব যেন আরো বাড়িয়ে দেয়—আপন দৃষ্টি যে কত দূর-দূরান্তে যেতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আশ্চর্য, সমুদ্র যদ্যপি দিগন্ত-বিস্তৃত তার পারে বসে মানুষের এ-অভিজ্ঞতা হয় না।

ইন্‌কীপার, পাত্র (Patron), মালিক—যে নামে খুশী ডাকুন—কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি প্রসন্ন বদনে বললুম "এ বাঁ, আলর্—" এ শব্দগুলোর মানে অভিধানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, যেমন "এই যে, হেঁহেঁ বেশ বেশ—" শব্দগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মানে ধরে কিন্তু আসলে এগুলো ফার্সী ভাষাতে যাকে বলে "তাকিয়া-ই-কালাম" অর্থাৎ "কথার তাকিয়া" অর্থাৎ যার উপর ভর করে কথাবার্তা আরাম পায়—জমে ওঠে।

তার পর বললুম, "বসবে না? একটা কিছু খাও।"

বললে, "এ বাঁ, আমি আপনাকে 'দেরাঁজ' ('ডিসএরেঞ্জ' শব্দার্থে অর্থাৎ ডিসার্ব বা বদার) করছি না তো?"

আমি প্রসন্নতর বদনে বললুম, "পা দ্যু"—বিলকুল না—।

বললে "মাসিয়ো, আমি আদৌ 'নোজ' না। বিশেষত যখন দেখতে পাচ্ছি, আপনি যখন আপন মনে, মনের সুখে আছেন। ও লা লা—কালসন্ধ্যায় আমাদের আড্ডাটি যা জমেছিল! আর আপনি যা হাসাতে পারেন—"

একদম গুল্। হাসাতে পারার মত তেমন কোনো স্টক্ আমার নেই। আসলে ব্যাপারখানা হয়েছিল এই যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলো গল্প, গোপাল ভাঁড় ইত্যাদি আমি তাদের শুনিয়েছিলুম আপন ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে। তাদের কাছে লেগেছে 'এপাঁতা' (ভয়ংকর মজাদার) এবং অরিজিনাল। অবশ্য এসব গল্প যখন প্যারিস-লন্ডনেই পৌঁছয়নি তখন প্রভাঁসের 'পাণ্ডব-বর্জিত' অজ পাড়াগাঁয়ে যে অরিজিনাল মনে হবে তাতে আর বিচিত্র কি? গোপালের দু'একটি 'রিস্‌কে' (risky আদিরসাত্মক) গল্প বলতেও ছাড়িনি, এবং তখন গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবই—এবং তিনিই ছিলেন আসরের চক্রবর্তী—সবচেয়ে বেশী চোখের ঠার মেরে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বললে, "মাসিয়ো, আমাদের গ্রামে ক'জন বিদেশী এসেছে সে আমি এক আঙুলে বলতে পারি—তাও তারা পাশের দেশ স্পেন বা ইতালির বাউণ্ডুলে—আর আপনি তো এসেছেন। কোথায় সেই সুদূর লাঁদ (l'Inde) থেকে। এখানে আপনি কি মধু পেলেন, বলুন তো।"

আমি বললুম, "তুমি তো বলছিলে, তুমি কখনো প্যারিস তক্ দেখোনি। তোমাকে

বোঝানো হবে শক্ত। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি, এটা অনেকটা রুচির কথা। আপন দেশেও আমি গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে, বাস করতে ভালোবাসি। তা ছাড়া এটা কবি মিসত্রালের দেশ।......আচ্ছা, অন্য লোক আসে না এখানে মিসত্রালের জন্মভূমি দেখতে?"

বেশ গর্বভরে বললে, "নিশ্চয়ই, মসিয়ো, তবে তারা সবাই ফরাসি—"

তারপর কি যেন মনে পড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এবারে সে উৎসাহভরে বললে, "ও লা লা। সে এক কাণ্ড।"

আমি ঈষৎ বেকুব কৌতূহলে শুধালুম "?"

"দুই লেখকের লড়াই। সে হলো গিয়ে ১৯৪৪-এর শেষের দিকের কথা। মার্কিনিংরেজ নরমাঁদিতে নেমে প্রায় সমস্ত ফ্রানস দখল করে ফেলেছে, ঐ সময়ে কি কারণে, কি করে যে দুই লেখক—হ্যাঁ খাঁটি ফরাসি—এসে উঠেছেন আমার এখানে। আর এই ঘরেই, আমরা কাল যেখানে দুপুর রাত অবধি কত আনন্দে হই হুল্লোড় করলুম, এসে বসেছেন সেই দুই লেখক; কিন্তু তাঁরা তাঁদের চতুর্দিকে যে আবহাওয়া নির্মাণ করলেন সেটি ঠিক তার উল্টো। এ্যাব্বড়া বড়া গেরেমভারী হাঁড়িপানা গম্ভীর এক জোড়া মুখ দেখে আমার গাঁইয়া খদ্দেররা তো আশ্রয় নিলে ঘরের অন্য কোণে।

ও'রা গুরুগম্ভীর আলোচনা করে যাচ্ছেন নিজেদের ভিতর—আমরা ওদিকে কান দি নি। কিছুক্ষণ পরে তাদের গলা চড়তে লাগলো, তারপর আরম্ভ হল রীতিমত ঝগড়া। তারপর আরম্ভ হল আমাদের ঐ পাহাড়ী বকরীতে বকরীতে যে রকম লড়াই হয় (১)। তারপর বলদে বলদে। অবশ্য আমাদের বলদ প্রতিবেশী স্প্যানিশদের বলদের তুলনায় তেমন কিছু না। (২)

কি নিয়ে ঝগড়া, মসিয়ো? জানু ফী নিয়ে—ছুঁড়ি নিয়ে? তা হলেও তো বাঁচতুম। সে তো হর-হামেশাই হচ্ছে। এ ঝগড়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস নিয়ে। বলি:—

ঐ সময়—অর্থাৎ তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি, অবশ্য হিটলারের পরাজয় সম্বন্ধে তখন সবাই নিঃসন্দেহ—এক ফরাসি লেখক লিখেছেন, এই যে আমরা, ফরাসিরা 'পাত্রি' (দেশ), 'পাত্রি' 'লিবেরতে', 'লিবেরতে' বলে চেঁচাই তার মূল্য কতটুকু? উনি নাকি তারপর লিখেছেন, ফরাসি [illegible] যদি তার গম দু পয়সা বেশী দামে বিক্রি করতে পারে তবে সে থোড়াই পরোয়া করে দেকার্ত আপন জাত-ভাই ফরাসি না দুশমন জরমন।

এই নিয়ে লেগেছে তুলকালাম ঝগড়া। এক লেখক বলছেন, যারা ফরাসি জাতের দেশপ্রেম নিয়ে এরকম বিদ্রূপ করে তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত। অন্য লেখক বলছেন, কথাটা টক হলেও হক। এবং যে ফরাসি লেখক এটা বলেছেন তিনি তো জর্মন বা তাদের 'দোস্ত' পেতাঁর সহযোগিতা করতে রাজী হননি। তাঁর সততা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করে তাদের হওয়া উচিত ফাঁসি। তখন প্রথম জন বললেন, "আজ যদি অমাদের ক্লেমাসো বেঁচে থাকতেন তবে ঐ যে ব্যাটা ফরাসির দেশপ্রেম নিয়ে মস্করা করেছে তাকে তাঁর নোংরা বন্দুকটা দিয়ে—পরিষ্কারটা দিয়ে নয়, সেটা দিয়ে তিনি বুনো শুয়োর মারেন—গুলি করে মারতেন।"

(১) প্রভাসের বকরী সম্বন্ধে লিখেছেন স্বয়ং দোদে—Le Chevre de M. Seguin.

(২) এও পাঠক পাবেন প্রাগুক্ত পুস্তকে।

এতক্ষণ মালিক ভায়া যে গম্ভীর সুরে কথা বলছিলেন তার থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং ক্লেমাসোই লীগ অব নেশনসে প্রতিবেদন পাঠ করছেন।

এবারে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "তারপর যা হল, মসিয়ো, সে সত্যি যাকে বলে কু দা তেয়াৎর্ (৩)—নাটকীয় ব্যাপার—, ইতিমধ্যেই যে আমাদের পাদ্রি সাহেব কখন এখানে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে এঁদের তর্কাতর্কি শুনছিলেন সেটা আমি লক্ষ্যই করিনি।

তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, "মেসিয়ো, আমি আপনাদের দেরাঁজ করতে চাই নে; সামান্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আপন পথে চলে যাবো। আপনারা শহরে সজ্জন—শুনেছি, আপনারা ব' দিয়ো'র (ভগবানের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আমার শুধু বক্তব্য, আপনাদের একজন বলছিলেন, আজ ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি কাকে যেন গুলি করে মারতেন। এ-ভোওয়ালা, মেসিয়ো—আজই সন্ধ্যায় এই কাগজখানা আমার কাছে এসেছে আমাদের কলোনি ট্যুনিস থেকে। তাতে প্রকাশিত হয়েছে একখানি চিঠি। ইটি লিখেছেন মসিয়ো ক্লেমাসোঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী—তার বয়েস এখন চুরাশি। তিনি লিখছেন,

—শের মসিয়ো জিদ্, আমি আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বহু বৎসর বাস করেছি। আমি বলতে পারি, আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনার পক্ষ নিতেন। তাঁকে কতবার বলতে শুনেছি, জমি! জমি!! শুধু জমি!! আর টাকা। ব্যস্ মাত্র এ দুটো বস্তুই আমাদের চাষীরা চেনে!

পাদ্রি সায়েব বললেন, "তা সে যাক! কিন্তু এটা কি ব' দিয়ো'র মিরাকল নয়, যে আজই আমি এ কাগজখানা পাবো, আজই আপনারা এ-আলোচনা তুলবেন, আজই আমি সেই পত্রিকাটি পকেটে করে আজই এখানে আসবো—এবং আপনাদের দ্বন্দ্বের সমাধান করে দেব!...ও রভোয়া মেসিয়ো! কাল রববার গির্জেয় দেখা হবে।"

কাহিনীটি শেষ করে মালিক মিটমিটিয়ে হেসে বললে, "এই যে বিরাট ফ্রান্সভূমি—এদেশের কারো বিশ্বাস, প্রভাঁসের লোক বড় সরল বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ, আর কারো বা বিশ্বাস তারা কুসংস্কার কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।...আপনার কি মনে হয়? আপনি তো এসেছেন ধর্মের দেশ L' Inde থেকে।"

আমি তার মিটমিটে হাসি থেকে তারই বিশ্বাস কোন্ দিকে বুঝতে পারলুম না॥ (৪)

---

(৩) Coup d'etat, cout de palais তুলনীয়। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র নানারকম 'কু' (অনেক সময়ই কিন্তু সেগুলো সিরামীয় 'সু'!) হচ্ছে বলে এটা উল্লেখ করলুম।

(৪) আঁদ্রে জিদ্-এর ডাইরি, Journal, 1939-42, 1942-49, Appendice, 200ff.

আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস

গিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়

সেন্ট ফ্রান্সিস-এর মৃত্যু হয়েছিল ১২২৬ সালে, কিন্তু তাঁর জন্মসময় বিতর্কের বিষয়। কেউ বলেন ১১৮১ সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল, কেউ বলেন ১১৮২ সালে। এই সময়টা ইউরোপ ক্রুসেড-এ মত্ত। অর্থাৎ ধর্ম অপেক্ষা ধর্মীয় যুদ্ধই তখন ইউরোপের মানস-লোক আচ্ছন্ন করে আছে। সমসাময়িক ভারতবর্ষে তখন মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণে হিন্দু সাম্রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কয়েক শতাব্দী পূর্বে তিরোহিত। রামানন্দ, রামানুজ, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্যের যুগ তখনও আরম্ভ হতে দেরি। ঠিক এই সময়টাতে বহুদিন ভারতবর্ষেও কোন যুগগুরু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়নি।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে সেন্ট ফ্রান্সিস-এর মানসিক যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, যদিও হিন্দুধর্ম তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল এবং তিনি যিশুখৃষ্টের একান্ত পূজারী ছিলেন। হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, একে কোন সংজ্ঞার বেড়ার মধ্যে সীমিত করা অসম্ভব। এর এত দিক আছে যে মনে হয় পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তাদের সারাংশ হিন্দুধর্মে বর্তমান। তাই হিন্দুধর্মে এত সম্প্রদায়-বাহুল্য। আমার মনে হয় সেন্ট ফ্রান্সিস হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের খুব কাছাকাছি। তাঁর মধ্যে ভক্তি, প্রীতি এবং সেবার যে আদর্শ দেখা যায় তা এই দুই সম্প্রদায়েরও অন্তরের কথা।

কিন্তু সেন্ট ফ্রান্সিস-এর ধর্মীয় জীবন আলোচনা করার পূর্বে এই মহাপুরুষের জীবনধারার কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। তাঁর পিতা সম্পত্তিসম্পন্ন বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। নাম পিয়েত্রো বার্নাদোন। তাঁর একমাত্র ছেলে বিলাসী তরুণ হিসাবেই বর্ধিত। পিয়েত্রো ছেলের হাব-ভাব চাল-চলন দেখে বলতেন "He is more like a prince than our son"—ফ্রান্সিস আমাদের ছেলে না রাজপুত্র বোঝা দায়। একদা পিয়েত্রো ফ্রান্সিসকে দোকানের ভার দিয়ে অন্যত্র কাজে গেছেন এমন সময় এক ধনী খরিদ্দার মখমল এবং অন্যান্য দামী জিনিস কিনতে ঢুকেছেন। ফ্রান্সিস তাঁকে জিনিসপত্র দেখাচ্ছেন। কিন্তু মাঝখানে এক ভিখারীও ঢুকল। খরিদ্দারের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত ফ্রান্সিস ভিখারীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেলেন না। খরিদ্দার চলে গেলেন, তৎক্ষণে ফ্রান্সিসের ফুরসত মিলল। কিন্তু ভিখারীও অদৃশ্য। ফ্রান্সিস দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন দোকান থেকে রাস্তায় তার খোঁজে। বিস্ময়াবিষ্ট ভিখারীকে দুই পকেট উজাড় করে সমস্ত টাকা পয়সা দিয়ে দিলেন এবং ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করলেন যে, দরিদ্রকে কদাপি বিমুখ করবেন না। সেন্ট ফ্রান্সিসের জীবনীর আধুনিক বিশ্লেষক জি কে চেস্টারটন বলেছেন, এই যে দোকান থেকে ছুটে বেরোনো এ তাঁর সারাজীবন দুঃস্থ ও দরিদ্রের পিছনে ছুটে বেড়ানোর শুরু।

পাখিদের মাঝে উপদেশদানরত সেন্ট ফ্রান্সিস

পিতার অর্থের বে-আইনী সদ্ব্যবহার এখানেই শেষ নয়। আরেকবার এই কাজ করতে গিয়ে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তাঁর বাড়ির কাছে সেন্ট দামিয়ানের ভাঙাচোরা গির্জা। এখানে ফ্রান্সিস প্রায়শ তাঁর যৌবনের ব্যর্থতার দিনে প্রার্থনা করতে আসতেন। হঠাৎ একদিন দৈববাণী শুনলেন "ফ্রান্সিস, তুমি দেখছ না আমার বাড়ি ভেঙে পড়ছে? তুমি আমার বাড়ি সারিয়ে দাও।" এই দৈববাণী শুনেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটা কিছু করতে হবে। নিজের ঘোড়াটাকে বেচে দিলেন তিনি এবং তারপরে তাঁর বাবার দোকানে গিয়ে [illegible] কাপড়ের বস্তাগুলোর উপরে [illegible]চিহ্নের মত করে রাখলেন এবং [illegible]অবিলম্বে সেগুলোকে তিনি বেচে দিলেন সেন্ট দামিয়ানের গির্জা মেরামতের জন্য। তাঁর বাবা পিয়েত্রো কিন্তু মোটেই ব্যাপারটাকে ধর্মীয় আলোকে দেখলেন না। তিনি ছেলেকে চৌর্যাপরাধে আইনের কাঠগড়ায় চড়ালেন। বিচারক তাঁর পক্ষে যে সূত্র স্বাভাবিক সেই সূত্র আওড়ালেন, "পিতার বস্ত্র চুরি করে বেচে দিয়ে যে ক্ষতি করেছ তা পূরণ করতে হবে।" ফ্রান্সিস ভেঙে পড়লেন না। বিপরীত পক্ষে তাঁর চরিত্রে হঠাৎ অভূতপূর্ব অগ্নিগর্ভ তেজ দেখা দিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমি এই মুহূর্ত পর্যন্ত পিয়েত্রো বার্নাদোনকে পিতা বলে সম্বোধন করেছি। কিন্তু পরমুহূর্ত থেকে আমি ঈশ্বরের ভৃত্যমাত্র। আমি শুধু পিয়েত্রো বার্নাদোনের অর্থই পরিশোধ করে দেব না। আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাঁর কাছ থেকে আমি যে বস্ত্রাদি পেয়েছি তাও তাঁকে ফিরিয়ে দেব।" এই বলে নিজের অঙ্গ থেকে পোশাক খুলে জড় করে তার উপরে কাপড়ের বস্তা বেচে যে অর্থ পেয়েছিলেন তা ছুঁড়ে মারলেন। কৃচ্ছ্রসাধকদের পরিধেয় একটি লোমস উত্তরীয়মাত্র পরে সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বেরিয়েছেন

জঙ্গলে চলে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রান্সিস যে ভাষায় তাঁর পিতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন তা যিশুখৃষ্ট কর্তৃক তাঁর পিতার প্রতি ব্যবহৃত ভাষার সহিত তুলনীয়, "what have I to do with thee ?"

জীবনে এই প্রথমবার তিনি রাগ করলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আরেকবার রাগ করেছিলেন যখন তিনি পিয়েত্রো স্টাকাচিয়াকে ভর্ৎসনা করেছিলেন বোলানা শহরে ফ্রান্সিসকানদের জন্য পঠনালয় স্থাপন করেছিলেন বলে। এই পঠনালয়কে তিনি ১২২০ সালে এই বলে বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন—"স্টাকচিয়া, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছ। আমার ইচ্ছা যে যিশুর অনুসরণে আমার সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণ পঠন অপেক্ষা প্রার্থনায় অধিক সময় ব্যয় করে।" এই ভর্ৎসনা অমূলক নয়। স্টাকচিয়া বড়ঘরের বিশিষ্ট আইনজীবী। ধর্ম অপেক্ষা ধর্মীয় বিধির উপরেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি; ভক্তি অপেক্ষা বিদ্যার উপরে, সাধনার অপেক্ষা আলোচনার উপরে। সেন্ট ফ্রান্সিসের আজন্ম সংস্কৃত, বিচারবুদ্ধি স্টাকচিয়ার শীলিত বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চতর পর্যায়ের। যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, কবীর, নানক, রামকৃষ্ণ কেউই পণ্ডিত ছিলেন না; কিন্তু পণ্ডিতদের গুরু ছিলেন সকলেই। যুগগুরু ধর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বিদ্বান বিরল। কিন্তু আসল কথা হল—ভগবদন্বেষীদের বিদ্যা অপেক্ষা ভক্তি-প্রীতির পসরারই আবশ্যক বেশী। নানক, কবীর বা রামকৃষ্ণদেবকে সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত বলা যায়। কিন্তু তাঁদের লীলাখেলার ইতিবৃত্ত বা বিশ্লেষণ রচনা করে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করা সহজ। সেন্ট ফ্রান্সিস ছিলেন নানক, কবীর, রামকৃষ্ণেরই মত আত্মার রাজ্যে অশিক্ষিত পটুত্বের অধিকারী, জাত ভক্ত।

পূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগের ইউরোপ ছিল ক্রুসেড-মত্ত। আবার ইতালীর শহরগুলিও ছিল পরস্পরের সহিত ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত। অর্থাৎ হিংসা, জিঘাংসা ও বর্বরতার মধ্যে ইউরোপের সভ্যতা আশ্চর্যভাবে নিজের পথ কেটে কেটে নদীর মত অগ্রসর হচ্ছিল। এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার স্বরূপ একটিমাত্র লাতিন বাক্যাংশেই স্বপ্রকাশ ঃ Homo homini lupus অর্থাৎ মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ক—মানপ্রষে-নেকড়ে বাঘের সম্পর্ক। এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন সেন্ট ফ্রান্সিস। তাঁর চক্ষে পিতা ভগবানের সমগ্র সৃষ্টি ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ, তাই নেকড়েকেও ভাই বলে সম্বোধন করতেন Brother wolf। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিক এবং যুগবিরোধী ছিল তথাপি তাঁর চরিত্রে সংস্কারক-সুলভ যুদ্ধং দেহি ভাব ছিল না। তাঁর চিত্ত ছিল বরঞ্চ করুণা ও বিনয়ের সুধাসিক্ত। তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর উদার বক্ষে ভ্রাতৃস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি পশু, পাখি ও নিষ্প্রাণবস্তুকেও। তাঁর অন্ধতা নিরোধকল্পে চিকিৎসক তাঁর চক্ষুতারকাকে অগ্নি-দগ্ধ রক্তবর্ণ শলাকা দ্বারা স্পর্শ করার প্রাক্কালে তিনি আগুনকে সম্বোধন করে বলেছিলেবন—"ভাই আগুন, ভগবান

তোমাকে শক্তিমান, সুন্দর ও আনন্দময় করে সৃষ্টি করেছেন। তুমি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করো।" এই কথা বলে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চলভাবে চিকিৎসকের রক্ত-শলাকাকে নিজের চক্ষে গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবী তাঁর একান্ত ভালবাসার পাত্র তাই তিনি সম্রাট পোপ বা সমসাময়িক অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কদাপি একটি কথা বলেন নি। তাঁর অন্তরে বিরোধ ছিল না সেজন্য তিনি কারও বিরোধিতা করেন নি। তিনি নিজে পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না এবং পুরোহিতদের ত্রুটিবিচ্যুতির সংবাদও তিনি জানতেন, তথাপি তিনি বলতেন, "যদি পুরোহিতগণ আমার প্রতি অন্যায় অত্যাচারও করে তথাপি আমি তাঁদের কাছে যাব। তাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করব।" কলহ-কোলাহল, শক্তিদ্বন্দ্ব, হিংসা, আন্দোলন ও যুদ্ধকামিতা যে সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার সেই সমাজে বাস করেও তাঁর সহনশীলতার সংজ্ঞা ছিল যিশুখৃষ্ট বা সেণ্ট পল-এর সহন-শীলতার অনুবর্তী। অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুই এই সহনশীলতার পরিসীমা।

কিন্তু তাই বলে সেণ্ট ফ্রান্সিস দুঃখের পূজারী ছিলেন না, যদিও [illegible] দুঃখের স্থান নগণ্য নয়। তিনি তরুণ গৌতমের মত সংসার ত্যাগ করেছিলেন সংসারকে সানন্দে সেবা করবার জন্য। তাঁর এই আনন্দবোধ এত প্রবল ছিল যে সর্বাপেক্ষা সাহসী ব্যক্তিও যা থেকে ভয় না পেয়ে পারে না—সেই ভয়ের কারণকে তিনি আক্ষরিক অর্থেই আলিঙ্গন করেছিলেন। অর্থাৎ সমাজ-পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগী রাস্তায় দেখে তিনি দু হাতে ভাই বলে জড়িয়ে ধরে-ছিলেন। এবং এই ঘটনাই ছিল তাঁর কুষ্ঠসেবাশ্রম স্থাপনের মূলে। কুষ্ঠরোগীদের জন্য চিকিৎসাশ্রম সেণ্ট ফ্রান্সিসই সর্ব-প্রথম স্থাপন করেন। আবার এই আনন্দেই তিনি দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের কোনরূপে ধনসম্পত্তি এমনকি নির্দিষ্ট আহারের ব্যবস্থা বা আশ্রয় থাক-এ তিনি চাননি। যেখানে-সেখানে কোন গাছ-তলায় বা কারও 'দোরগোড়ায় থাক' ও চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে খাও—এই শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন তাঁর শিষ্য বা ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়কে, তাঁর সব ফেলে দিয়ে সব পাবার আনন্দময় দারুণ আহ্বানে অদ্ভুত সাড়া পড়ে গিয়েছিল তৎকালে।

সেণ্ট ফ্রান্সিস ভগবানকে, যিশুকে দূরের বস্তু বলে দেখেন নি। তিনি তাঁর কাছে একটি দোলনা জাতীয় বস্তু রাখতেন যিশুর মানব জন্মের স্মারক হিসাবে। তাই দেখিয়ে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলতেন—"দেখ, তোমাদের ভগবানকে দেখ। তিনি দীনহীন, নিঃসহায় শিশু হিসাবে জন্ম নিয়েছিলেন মানুষের ঘরে, গরু ও গাধার মধ্যে।" তিনি বলতেন ভগবান শুধু কেবল নির্গুণ আত্মা মাত্র নয়। তিনি নিঃসহায় জীব। তাঁর দেহ রক্তাক্ত, তাঁর দেহে আঘাতের চিহ্ন বর্তমান। এ শুধুই বক্তৃতা নয়, শুধু ধর্মশিক্ষা নয়। তিনি যিশুর ধ্যানে নিজের সমগ্র সত্তাকে এমনভাবে মজ্জিত করে দিয়েছিলেন যে যিশুর অঙ্গের পাঁচটি আঘাত চিহ্ন তাঁর নিজের অঙ্গেও দেখা গিয়েছিল। ভক্ত ও ভগবানের এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবের উদাহরণ সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে বিরল।

"Birth, and copulation, and death.
That's all, that's all, that's all,
that's all,
Birth, and copulation, and death."

ভোর হবার পর-পরই মানসের ঘুম ভেঙে গেল। চোখে ব্যথা, কটকট করছে। মাথাও ভার।

রাস্তার কুকুরগুলো কাল সারা রাত জ্বালিয়েছে। চিৎকার, কান্না, কামড়া-কামড়ি—মানসের এক-একবার বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মেরে ওদের থামিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল।

কিন্তু হাতের কাছে পাথর কিম্বা এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে সে কুকুরগুলোকে অন্তত তার বাড়ির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এক-একবার তন্দ্রা আসে, ঘুমের মতন হয়, তারপরই মাথাটা দপদপ করে মানসের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে—কুকুরের টানা-টানা চিৎকারে রাতটা অসহ্য, ক্লান্তিকর। ঘুমনো যায় না।

এখনো কুকুরগুলো এখান থেকে নড়ে নি—এখনো থেকে-থেকে ওদের চিৎকার মানসের কানে এসে লাগছে। তার গলার নিচে ঘাম জমেছে, চুলকোচ্ছে। মানস খচখচ শব্দ করল, পাশ ফিরল। এত ভোরেও মশারির ভেতর বেশ গরম।

মানসের শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না, উঠতেও কষ্ট হল। বাচ্চু জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছে, তার পাশে কবিতা পড়ে আছে। মুখ অল্প খোলা, পেটি কোট হাঁটুর কাছে উঠেছে, তেল-কুচকুচে চুল, বালিশ কালো হয়ে এসেছে। গরমের জন্য ব্লাউজের বোতাম খুলে রেখেছিল কবিতা। ব্লাউজটা ছেঁড়া, ময়লা—ঘামের গন্ধ লাগল মানসের নাকে। কবিতার পেটিকোটের ফিতেও আলগা, তার বড় পেট উঠছে-নামছে। মানসের মনে হল, ঘুমিয়ে থাকলেও হাঁপানি রুগির মতন সে হাঁপাচ্ছে।

এই বিছানায় মানস আর শুয়ে থাকতে পারল না। ঘাম গরম, কবিতার তেল-কুচকুচে চুল বাচ্চার ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস, নোংরা চাদর বালিশ আর কুকুরগুলোর গোঙানি মানসকে ঠেলে বিছানা থেকে নামাল। নামবার সময় তার পা লেগে পচা পুরনো মশারি আর একটু ছিঁড়ল।

মানস কোনদিকে না তাকিয়ে রাগের ঝোঁকে সোজা বারান্দায় চলে এল। নিচে দেখল সামনের বাড়ির সিঁড়ির কাছে ভাঙা পাঁচিল ঘেঁষে এক পাল কুকুর মুখ বিকৃত করে উঠছে-বসছে, থেকে-থেকে চিৎকার করছে।

এখনো মানসের হাতের কাছে কিছু নেই। হালকা রোদ ফুটে উঠছে, জন্ডিস রুগির মতন মানস দেখল। তার চোখের সামনে দিয়ে গয়লারা যাচ্ছে গরু নিয়ে ক্রিং-ক্রিং সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে কাগজের হকাররা ছোট দড়ি দিয়ে ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ বেঁধে ছুঁড়ে মারছে এ-বাড়ি ও-বাড়ির দোতলা তেতলায়।

মানসের হাত নিসপিস করে উঠল। বারান্দা থেকে সে এল ভেতরে ভাঙা বেসিনের কাছে, যা থেকে জল পড়া বন্ধ হয়েছে বহু দিন, কল বিগড়েছে। ওটার দিকে চোখ পড়তেই রাগ আরও চড়ে গেল মানসের—তারই পাশে যেখানে কয়লার ছোট বড় চাঁই পড়ে আছে, সেখান থেকে বেছে-বেছে হাত কালি করে সে কয়েকটা টুকরো তুলে নিয়ে আবার বারান্দায় এল। কুকুর-গুলোকে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারল পটাপট।

কয়লার টুকরোগুলো রাস্তায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কুকুরগুলোর গায়ে
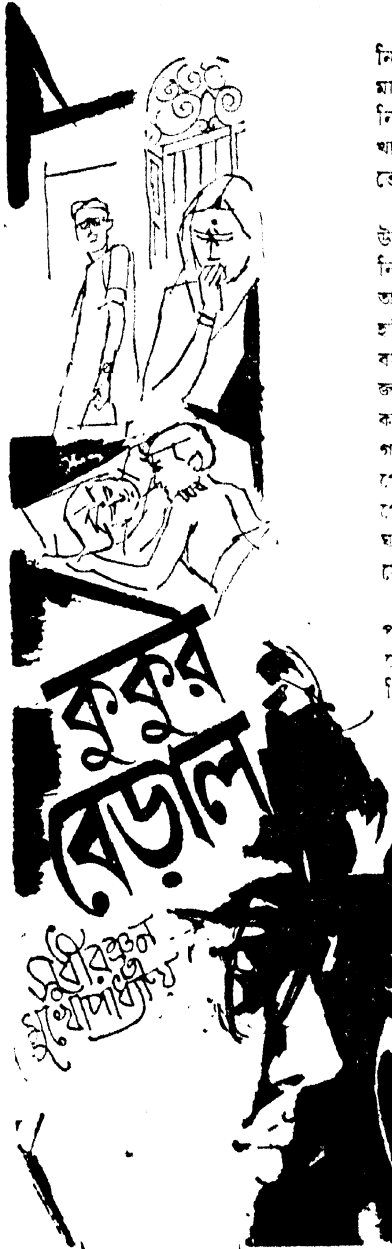
লাগল না একটাও। না লাগলেও মনে মনে কিছু শান্ত হল মানস। কুকুরগুলোকে থামাবার জন্যে যে-ঝাঁজ জমা হয়েছিল তার মাথার মধ্যে, এখন ব্যর্থ হলেও, একটা চেষ্টা করেছে বলে তা কিছু কম। হাত ঘুরিয়ে মানস আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে কয়লার কালো দাগ দেখল।

কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে পুজোর কথা মনে হল মানসের। এখন আশ্বিন। কিছু সময় থাকলেও পুজোর খুব দেরি নেই। দেখতে-দেখতে বছর শেষ হয়ে যাবে। তার বয়স শুধু আর অল্প বাড়বে। এর মধ্যে কবিতার পেট আরও বড় এবং দেহও ভারী হবে। আগামী বছরে এ সময় ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই কুকুর মারবার চেষ্টা করে হাত কালি করবে মানস—শুধু তার বিরক্তি বিতৃষ্ণা এই সব অনুভূতি আরও তীব্র ও ধারালো হয়ে উঠবে। কুকুর ভাঙা পাঁচিল ও বেসিন, ন্যাতার মতন রোদ আর কয়লার টুকরো—এসব যেমন স্পষ্ট করে দেখল মানস, ঠিক তেমন করেই তার ভবিষ্যৎও দেখতে পারল।

কিন্তু মানসের মনে হল, এখন শুধু ভাবনার একটা স্রোত তার শিরা এবং স্নায়ুর ওপর দিয়ে বড় নিঃশব্দে বয়ে গেল। গরম না, ঠান্ডা না, কোন উত্তেজনাই সে অনুভব করল না। হাত একটু দূরে রেখে কয়লার কালি থেকে সে তার ঘামে ভেজা আধ ময়লা শার্ট বাঁচাবার চেষ্টা করছিল—এখন তা-ও ভুলে গেল। মানস বড় ঠান্ডা এবং শান্ত হয়ে উঠল।

"এত সকালে উঠেছ যে?"

কবিতার গলা পেয়ে [illegible] কালি নিজের শার্টেই জোরে [illegible] মুছে ফেলল মানস। প্রথম প্রথম একটু অবাকও হল। যাকে সে অঘোরে ঘুমতে দেখেছে একটু আগে, যা দেখে চোখে ঘুম থাকলেও এখানে এসে মানস দাঁড়িয়ে আছে—সে এখন তার পাশে দাঁড়িয়ে সকালে ওঠার কারণ জিজ্ঞেস করল।

মানসের যে অনুভূতি কয়েক মুহূর্ত আগে একেবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, এখন কবিতাকে দেখে সেসব আবার চোখা-চোখা হয়ে উঠল। ঘুম থেকে এই মাত্র উঠেছে বলে কবিতার মুখ অপরিচ্ছন্ন, ঘাম শুকিয়ে শুকিয়ে কালো কপাল, বেঢপ শরীর। মানসের চোখ দুটো আবার কটকট করল, মাথার ব্যথা, শরীরটাও হঠাৎ যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

"কুকুরগুলো যা চিৎকার করছিল", অপ্রসন্ন মুখে মানস বলল, "তুমি কী করে ঘুমোচ্ছিলে—আশ্চর্য!"

"আমার আজকাল একটু বেশি ঘুম হয়", অল্প হাসল কবিতা। বিবর্ণ এবং বিষণ্ণ। মানসের দিকে তাকিয়েই একটা হাই তুলে আরও বলল, "এখনো চোখে ঘুম আছে, তুমি উঠে এসেছ দেখে—"

"ঘুমোও না", তাকে থামিয়ে দিয়ে মানস বলে উঠল। হাই তোলবার সময় কবিতার মুখের ভেতরটা দেখতে পেয়েছিল সে। কাঁকড়ার গর্তের মতন। ছেলেবেলায় মফঃস্বল শহরে ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে এক দুপুরে কাঁকড়া ধরতে বেরিয়ে ছিল মানস। শক্ত খোল, বড় বড় দাঁড়া।

"এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করছ?"

"কেন?" মানস কবিতার দিকে দেখল, অপরিষ্কার চোখ, "মুখ ধোও নি?"

"না।"

"কেন এখন উঠে এলে?" বারান্দার কোনায়-কোনায় ঘন ঝুলে, সাদা চুন কালো হয়ে গেছে। অনেক আগে পেনসিল দিয়ে

দেয়ালে বাচ্চু একটা ভূতের ছবি এ'কেছিল তা এখনো স্পষ্ট।

তার গলার স্বর একটু কাঠ-কাঠ। কবিতা কথা বলল না, আর একটা হাই উঠছিল, তা চাপল। রেলিঙে কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত দিয়ে নিচে তাকাল। কুকুরগুলোকে দেখেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

"এখন চা খাবে?" কবিতা জিজ্ঞেস করল একটা দায়-সারা প্রশ্নের মতন।

"না, আগে বাজার থেকে ঘুরে আসি", নিজের শার্ট পায়জামার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল মানস। এই পরেই বেরিয়ে পড়া যায়, এখন শরীর ঘষা-মাজা করার তার কোন ইচ্ছে ছিল না।

"চা খেয়ে যাবে না?" আর একবার প্রশ্ন করেই কবিতা মানসের উত্তর না শুনেই বলল, "খুব সকালে না গেলে মাছ পাওয়া যায় না, না?"

কী জানি, মাঝে মাঝে কমলাকে পাঠালেই তো পার, এত বেলা করে ও ওঠেই বা কেন?"

"ও গেলেই তো পচা মাছ নিয়ে আসে, শুধু পয়সা নষ্ট—" কবিতা মুখ নামিয়ে আস্তে কথা বলছিল। এ সময় তার যে ভাল-মন্দ খাবার ইচ্ছে হয়, সে কথাটা মানসকে আগে অনেকবার বললেও এখন আবার ইঙ্গীতে বুঝিয়ে দিতে চাইল।

"থলিটা দাও", ক্লান্তি না, উৎসাহ না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা—কিছু না, একটা যন্ত্রের মতন মানসের গলাটা শুধু যেন ঘড়ড়-ঘড়ড় করে উঠল।

কবিতা মৃদুস্বরে অপরাধীর মতন ফিস-ফিস করে উঠল, "তোমার যদি ইচ্ছে না-হয়, কমলাই যাবে, যা-খুশি নিয়ে আসুক—"

"আঃ, থলিটা দাও না, শুধু-শুধু দেরি করছ কেন!"

কবিতার পিছন-পিছন ভেতরে এল মানস। তার হাত থেকে একটা ভিজে ময়লা চটের থলি নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যত ছোট করতে পারে তত ছোট করে প্রয়োজন মতন পয়সা নিয়ে টলতে-টলতে রাস্তায় নামল।

বাজার খুব দূরে না, কাছেই। তাহলেও ট্রামে গিয়েছিল মানস, মোটে দু-তিনটে স্টপেজ। তার ফিরে আসতে মিনিট চল্লিশও লাগল না।

এখন রোদ বড় কড়া। হাওয়া কম। গেঞ্জি গায়ে নেই বলে শার্ট ঘামে পিঠের সঙ্গে সেঁটে আছে। মানসের চোখের কোণও ভিজে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িও ভিজে-ভিজে। তার মাথা দপদপ করছে, হাই উঠছে। ঘুমের কথা আর ভাবল না মানস—ভাবতে পারল না।

ট্রাম থেকে নেমেই সে দেখল দুর্গন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে খুব শব্দ করে কর্পোরেশনের একটা ছাই রঙের লম্বা গাড়ি যাচ্ছে। বাজারের ভারী থলি যেন ছোঁয়া বাঁচাবার জন্যে একটু আড়াল করে সে নিশ্বাস বন্ধ করে হাঁটতে লাগল।

মানস কখনো আঙুল দিয়ে নাক চেপে ধরে না, দুর্গন্ধ এড়িয়ে যেতে হলে নিশ্বাস বন্ধ করে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে যাওয়াই তার অভ্যাস। এখন খুব সহজে ঘ্রানেন্দ্রিয়কে বিকল করতে পেরেছে বলে সে মনে মনে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি অনুভব করল। এবং কর্পোরেশনের লম্বা গাড়ি অনেক দূরে চলে গেলেও এই তৃপ্তি আর দম বন্ধ করে থাকার কৃতিত্ব আরও কিছু সময় উপভোগ করবার জন্যেই সে হুস করে নিশ্বাস ফেলল না, বাড়ি এসে পৌঁছল।

কমলা উঠেছে। বড় কচ্ছপের মতন কালো পিঠ, শাড়ি সরে গেছে। খুব শব্দ

করে রান্নাঘরে কাল রাতের এ'ঠো বাসন নিয়ে বসেছে কমলা। থেকে থেকে হাঁচছে, সর্দিতে গরর গরর করছে।

বাজারের থলি একটা অশুচি জিনিসের মতন ছুঁড়ে দিয়ে মানস জোরে বলে উঠল, "আমি গেলেও যা, কমলা গেলেও তাই. কিছু পাওয়া যায় না, পচা মাছের গন্ধে বমি উঠে আসে, কেন যে রোজ ঠেলে ঠেলে পাঠাও আমাকে—"

কবিতা খাবার ঘরে ছিল, মানসের গলা পেয়ে বেরিয়ে এল। থলি থেকে দু-একটা আলু গড়িয়ে গড়িয়ে তার পায়ের কাছে চলে এসেছে। মানসের চিৎকারের কোন মানে খুঁজে না পেয়ে সে-ও শুকনো গলায় বলল, "তুমি যাও-ই বা কেন? আমি কাউকে ঠেলে ঠেলে পাঠাই না—"

"না, পাঠাও না", গরমে গা চিড়বিড় করছিল মানসের. "পচা মাছ পচা মাছ করে দিন রাত ঘ্যানর-ঘ্যানর, অনেকেরই তোমার মতন ইয়ে হয়, কিন্তু—"

"থাম! কাল থেকে কেউ আর তোমাকে কোথাও পাঠাবে না।"

"আমি জানি সব", মানস খাবার ঘরে পাখার তলায় এসে দাঁড়াল। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধোয়ার কথা তার মনেও এল না. "এখনো চা হয় নি?"

পেটের মতন মুখও ভারী হয়ে উঠল কবিতার। তার শরীর থরথর করছিল। টি-পট আর একটা ফাটা কাপ মানসের দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলল, "আজ বাজারে যাবার কথা আমি আগে বলিনি, তুমিই—"

"আচ্ছা, চুপ কর!"

"তাড়া দিয়ে থামিয়ে দিতেই জান শুধু. আমাকে এই অবস্থায় যা-যা করতে হয় অন্য কেউ হলে—"

"কী করত?"

"মরে যেত কিম্বা পালিয়ে বাঁচত।"

"তাই নাকি?" কবিতাকে বিদ্রূপ করে উঠল মানস, "এমন সহজ দুটো পথ থাকতে তুমি চুপচাপ বসে-বসে পচা মাছ খেয়ে দিন কাটাচ্ছ কেন?"

"উপায় নেই বলে", কবিতার চোখ এবং মুখের চামড়া ভেদ করে ঝাঁজ ঠেলে বেরুচ্ছিল, "যদি উপায় থাকত তাহলে আমি তোমার সদুপদেশের অপেক্ষা রাখতাম না—বুঝলে?"

খবরের কাগজ চোখের সামনে তুলে ধরে নিজেকে সংযত করবার খুব চেষ্টা করছিল মানস। বড় গরম চা। ঠাণ্ডা হতে কিছু সময় লাগবে। তা না হলে এক চুমুকে সে কাপ খালি করে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুকুর দেখত।

"তবে তুমি জেনে রেখ, একটা ঘৃণা ছাড়া এখন আমার মনে আর কিছু নেই। বেশি দিন না, আমার কথা যে মিথ্যে নয়, আমি তা প্রমাণ করে দেব।"

খবরের কাগজের প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে যেতে অনেক বেশি সময় ব্যয় করল মানস। তা-ও কিছু বুঝল না। কেননা কবিতার কথাগুলো তার মাথায় কাঁটা ফোটাচ্ছিল। মুখে কিছু না বললেও মানসের মন কবিতার বলা 'ঘৃণা' কথাটা বড় শক্ত করে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু শেষ অবধি তা পারল না। মানসের মনে হল কবিতার ওপর, এ সংসারের ওপর কোন অনুভূতিও যেন নেই তার, ঘৃণাও না।

খবরের কাগজে চোখ রেখেই বাজারের কথা মনে হচ্ছিল মানসের। মাছের পা[illegible]াদি, একটার পাশে অন্য একটা—অনে[illegible] ঠাণ্ডা চোখ, পিছল শরীর, আঁশটে গন্ধ। ছুঁতে ইচ্ছে করে না, তা-ও কিনতে হয়। বয়ে-বয়ে নিয়ে আসতে হয়। খেতেও হয়।

বাচ্চু এর মধ্যে কয়েকবার একটা বই হাতে দরজার কাছ অবধি এসে ফিরে গেছে। মা-বাবা ঝগড়া করছিল বলে ভেতরে ঢোকে নি। কবিতার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে বাচ্চুর অপ্রসন্ন মুখ দেখে নিয়েছিল মানস। এখন ওদের চুপ করে থাকতে দেখে ভয়ে-ভয়ে মানসের কাছে এসে দাঁড়াল বাচ্চু।

"বাবা, একটু বুঝিয়ে দেবে?"

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলে বিরক্তির একটা ছোট্ট শব্দ করল মানস "কী?"

বাচ্চু প্রথমে ভেবেছিল তার কথার উত্তর দেবে না মানস, কিম্বা জোরে বলে উঠবে, বিরক্ত কর না, যাও এখান থেকে। কিন্তু সেসব কিছু মানস বলল না দেখে বাচ্চু একসঙ্গে একটা ইংরেজি কবিতার অনেকটা পড়ে গেল।

বেশি সময় ধৈর্য থাকল না মানসের। হঠাৎ একসময় সে বাচ্চুকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "কেন রোজ-রোজ কাগজ পড়ার সময় আজে-বাজে বক আমার সঙ্গে?"

"ইস্কুলের পড়া বাবা, মাস্টারমশাই বলেছেন—"

"মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে বুঝে নাওনা কেন?"

বই-এর দিকে চোখ রেখে খুব করুণ স্বরে অনুনয় করল বাচ্চু, "শুধু এই কয়েকটা লাইন বুঝিয়ে দাও বাবা, মাস্টারমশাই বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি। শুধু এইটুকু, এই যে—

'Where the bread fruit fall
And the Penguin call
And the sound is the sound
of the sea'—"

"আঃ, থাম না!" একটু বেশি জোরে চিৎকার করে উঠল মানস। বাচ্চুর কথা ভাল করে না শুনলেও পেঙ্গুইনের ডাক এবং সমুদ্র গর্জন, এমন টুকরো-টুকরো দু-একটা শব্দ তার কানে বিদ্রূপের মতন ঝন-ঝন করে উঠল, "তোমাদের জ্বালায় এক মিনিট নিজের মনে বসে থাকা যাবে না—"

কবিতা এত সময় চুপচাপ ছিল, এখন আর স্থির থাকতে পারল না, ঠাস করে খুব জোরে বাচ্চুর গালে একটা চড় লাগিয়ে বলল, "কিসের জন্যে কথা শোন না, বাঁদর ছেলে! জান না, তোমার জন্যে আমাকে কথা শুনতে হয়—" বাচ্চুর হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলল, "যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে!"

বাচ্চুর কান্না আসছিল বলে সে ঠোঁট চাপছিল। সেখান থেকে নড়ল না। খবরের কাগজটা যা-তা করে ভাঁজ করল মানস। চা খাবার আর কোন ইচ্ছে ছিল না তার। একটা কাক জানলায় বসে ঝুঁকে পড়ে কা-কা করছিল। ঘর খালি হলেই টেবিল থেকে খাবার খাবলাবে।

অফিসে যাবার জন্যে মানস বাড়ি থেকে বার হল ঠিক সাড়ে ন'টার সময়। পা চলছে না, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, শরীর দুর্বল। কিন্তু আশ্চর্য, তার কোন রোগ নেই। মানসের মনে পড়ে না, গত কয়েক বছরের মধ্যে অল্প সর্দি-জ্বর ছাড়া তার কোন বড় অসুখ করেছে। শরীরের দিক থেকে ধরতে গেলে সে একটু বেশি রকমই সুস্থ। তাহলেও সে দুর্বল এবং অসুস্থ। আরও একটা কথা আজকাল প্রায়ই মানসের মনে হয়, সে যেন অল্পে অপ্রকৃতস্থ হয়ে উঠছে। তার কোন শখ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই, বেঁচে থাকবার ইচ্ছাও নেই। এমন অবস্থায় যে সে এখনো কেমন করে সুস্থ আছে—আশ্চর্য। তার মাথা মন, এবং সকল ইন্দ্রিয়কে চুম্বকের মতন আঁকড়ে রেখেছে তার সংসার।

রাস্তায় চলতে চলতে মানস ভাবল, সকালে এক সময় তার মনে হয়েছিল, আজ অফিসে না গেলেও হয়। একটু ঘুমের দরকার, দুপুরে কিছু সময় গড়িয়ে নিলে বিকেলের দিকে শরীরটা ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু কবিতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে সে-ইচ্ছা আর মানসের মনে থাকল না। সে ধরে নিল, বাড়িতে থাকলে তার অবস্থা আরও খারাপ হবে।

বড় রাস্তায় পড়ে ট্রামের অপেক্ষা করতে করতে মানস মনে মনে তার সারাদিনের কাজের হিসেব করে নিল। ডাক্তারকে ফোন করতে হবে, শনিবার সকালে কবিতাকে নিয়ে যেতে হবে তার কাছে। তারপর নিয়ম মতন হাসপাতালে গিয়ে-গিয়ে দেখিয়ে আসতে হবে। একটা প্রেসকৃপশন অনেকদিন থেকে পড়ে আছে মানসের ড্রয়ারে, আঠারো-কুড়ি টাকার ওষুধ। আজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার পাবার কথা, না পেলে কারুর কাছ থেকে কিছু টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করতে হবে।

ট্রামের অপেক্ষা করতে করতে ঠাস ঠাস শব্দ শুনে মানস পিছন ফিরে দেখল একটা থুড়থুড়ে বুড়ি ভাঙা ঝুড়ি থেকে গোবর তুলে তুলে ট্রাম-ডিপোর পাঁচিলে ঘুঁটে দিচ্ছে। খালি-খালি চোখ মানসের, তাহলেও সে বুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল ট্রাম আসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত।

ট্রামের ভেতরে ভিড়। ভাঙা পাখা ঘট-ঘট শব্দ করছে। বসবার জায়গা নেই।

কয়েকজন মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে মানসের একেবারে পাশাপাশি। ইস্কুল-কলেজের ছাত্রী কিম্বা কোন অফিসে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে—সে ঠিক বুঝল না। তাহলেও এক-একবার মানস চোখ ফিরিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে তাদের দেখে নিচ্ছিল। কচি মুখ, পরিপাটি বেশ-বাস। ধারালো চোখ। ওদের গা নিওড়ে সুগন্ধ উঠছিল।

এখন ক্লান্তিতে না, মানসের চোখ দুটো হঠাৎ আপনি বন্ধ হয়ে এল। নাক বন্ধ করার মতন, চোখ বন্ধ করে তার মনে হল কোথাও কাঁকড়ার গর্ত নেই। তার কান খোলা ছিল বলে সে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছিল, পেঙ্গুইনের মতন একটা পাখির ডাকও। আর কয়েক মুহূর্তের জন্যে সবুজ বনের ছায়াও তাকে যেন আড়াল করে রাখল। কী যেন পড়ছিল বাচ্চা, শুধু শুধু ছেলেটাকে অত জোরে মারল কবিতা!

মানস চোখ খুলে দেখল যতদূরে আসা উচিত ছিল, ট্রামটা তত দূরে আসে নি। বড় আস্তে চলেছে। এক-একটা সুন্দর ঝকঝকে গাড়ি ট্রামের গা ঘেঁষে ঘেঁষে হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মানসের অনেক দিন পর মনে হল সেও গাড়ি চালাতে খুব ভাল জানে। অমন একটা গাড়ি পেলে সেও আরও অনেক জোরে বেরিয়ে যেতে পারত।

একটা ওষুধের দোকান থেকে দুটো ছোট-বড় ট্যাবলেটের বাক্স কিনে মানস যখন রাস্তায় নামল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সস্তা কাঠের দোকান থেকে দুমদাম শব্দ উঠছে, ডিজেলের ধোঁয়ায় সরু গাছটা ঝাপসা। একটা লোক একদিকে গা চুলকোতে চুলকোতে ছ্যাঁক ছ্যাঁক পেঁয়াজি ভাজছে, সিনেমা হাউসের সামনে ভিড়। মানস দিশাহারা হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আজ পাওয়া যায় নি, দিন সাতেক দেরি হবে। পঁচিশ টাকা জোগাড় করেছিল মানস, কবিতার ওষুধ কিনতে আঠারো টাকা তিরিশ পয়সা লাগল। পকেটের মধ্যে খুচরো পয়সাগুলো সে আঙুল দিয়ে অনুভব করল। খুব খিদে পেয়েছে তার। এখনো ট্রামের ভিড় কমেনি, বাড়ি ফিরতে আরও কি[illegible] সময় যাবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজি ভাজা দেখল মানস। আর ইতস্তত না করে, একটু আগে যে গাছটা ডিজেলের কালো ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে এসেছিল, তার নিচে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গরম পেঁয়াজি মুখে পুরে খিদে মেটাল।

খিদে মিটল বটে মানসের, কিন্তু তার গলায় তৃষ্ণা খুসখুস করে উঠল। জল না, চায়ের দরকার। কাঠের দোকানের পাশে উনুন নিয়ে বসেছে একটা হিন্দুস্থানী, কালো কেটলি ধুঁকছে উনুনের ওপর। মাটিতে অনেক ছোট ছোট ভাঁড় সাজানো। এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না মানস, রাস্তা পার হয়ে কাঠের দোকানের পাশে এসে খুচরো পয়সা দিয়ে এক ভাঁড় চা কিনে তাড়াতাড়ি শেষ করল।

ওষুধের দুটো ছোট ছোট বাক্স হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একা একা পেঁয়াজি আর চা খেয়ে খিদে-তেষ্টা মিটিয়ে নিতে মন্দ লাগল না মানসের। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তার মনের অবস্থা যেমন ছিল, এখন তেমন না। অফিসের যতই কাজ তার থাক, আর যতই তাকে ছুটোছুটি করতে হোক, রোজকার মতন আজও মানসের মনে হল, বাইরের আলো হাওয়া ধোঁয়া অন্ধকার তার মাথাটা অনেক

হালকা করে দিয়েছে। চোখও কটকট করছে না। কিন্তু এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করবার নেই।

পর পর কয়েকটা ট্রাম চলে গেল। ইচ্ছে করলেই মানস একটাতে উঠে পড়তে পারত, খুব ভিড় না। সে নড়ল না, দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হল এখন নড়লেই তার শরীরের একটা হাড় কট্ করে উঠবে। দরদর করে ঘাম ঝরবে। এবং এখনো মুখে চা আর পেঁয়াজির যে স্বাদ লেগে আছে তা মুছে যাবে।

হঠাৎ মানস দেখল অন্ধকার ঘন, নিঃসাড়। রাস্তায় এখনো কোন আলো জ্বলে নি। চার পাশ থেকে ধোঁয়া তাকে ঘিরে ধরছে। অল্প পরে একটা ভিড়ের ট্রামেই সে লাফ দিয়ে উঠল। এবং তার মনে হল, সে বাড়ি ফিরছে। উস্কোখুস্কো চুল, ক্লান্ত শরীর, এলোমেলো শার্ট-প্যান্ট। মানস ভাবল, তার চেহারাটাও বোধ হয় পাগল পাগল দেখাচ্ছে। বাইরে তাকিয়ে আধ-পাগলা একটা মানুষের মতনই সে আপন মনে হাসল।

আজ রাত বড় নিঝুম হয়ে আছে। কুকুরের ডাক নেই। রিক্স ট্যাক্সির হর্ন, ঝড় বাতাস, কুলি-মজুরের গান—কোথাও কিছু নেই। কিন্তু কোন গোলমাল না থাকলেও উদ্‌গ্রীব হয়ে জেগে আছে মানস ফুটো ফুটো পচা মশারির মধ্যে। তার পাশে বাচ্চু ভোঁস ভোঁস করছে। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লে বড় জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। আর একটু ওপাশে রোজকার মতন কবিতাও শুয়ে আছে। মানস খুব সতর্ক হয়ে জানবার চেষ্টা করল, সে জেগে আছে কি না। কিছু বুঝতে পারল না। ঘর বড় অন্ধকার। কোন আলোর ক্ষীণ রেখাও কোথাও খেলছে না।

দু-একবার ছটফট করল মানস। বালিশে হাত মুখ এবং বিছানার চাদরে পা ঘষল। এই ধরনের অস্থিরতা প্রকাশ করে সে কবিতার সংগে কথা বলবার ও তাকে কাছে টেনে আনবার ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল।

এখন কবিতার সংগ লাভের একটা পাশবিক আগ্রহ উদ্দাম হয়ে উঠছিল বলে মানসের মনে হল, সন্ধ্যে থেকে এই মশারির মধ্যে ঢোকবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার সংগে একটাও কথা বলে নি কবিতা, তার দিকে ফিরেও দেখে নি। মাছের মতন চোখ, পিছল শরীর, আঁশটে গন্ধ—কবিতার কথা মনে করেই এসব ভাবল মানস এবং এত সময় কবিতা তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশের এই

উপায় অবলম্বন করেছে বলে অন্ধকারেই হাসল।

মশারির অসংখ্য ফুটোর একটার মধ্যে দিয়ে মশা এসেছে ভেতরে। মানসের কানের কাছে শব্দ হল। আর একটু পরেই নিজের শরীরের কোথাও হাত চালাল কবিতা। মানস তার হাতের আওয়াজ শুনল এবং ছটফট করল। খুশীর একটা আভাও ফুটে উঠল তার মুখে। কবিতা এখনো জেগে আছে।

"এখনো ঘুমোও নি?" নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল মানস। তার স্বর চাপা, ভাঙা ভাঙা। কেননা, সে জানত কবিতা কথা বলবে না। এমন প্রশ্ন আরও অনেকবার শোনবার পর, এক সময় উষ্মা এবং ঘৃণা আরও প্রকট করে তোলবার জন্যে সে হঠাৎ এলোমেলো কথার ঝড় তুলবে। রাগবে, চিৎকার করবে, কাঁদবে।

"শুনছ?" ঝুঁকে পড়ে কবিতাকে দেখল মানস, তার মুখ অন্য দিকে ফেরানো, দেহও। কবিতা একেবারে কাঠ। নড়ছে না, খুব সাবধানে নিশ্বাস ফেলছে। হয়তো তার গায়ে মশা বসছে—কিন্তু মানস জানত, সে এখন আর হাত তুলে শব্দ করবে না।

অন্ধকার মশারির মধ্যে শুয়ে কবিতার পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানসের একবার ভীষণ ইচ্ছে হল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাকে আদর করতে করতে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, কেন এমন মড়ার মতন পড়ে আছ?

কিন্তু হঠাৎ তেমন কিছু করতে পারল না মানস। সে ইতস্তত করল, তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলেও আরও কিছু সময় অপেক্ষা করা দরকার। মানস শার্ট খুলে মাথার কাছে রাখল। তার খুব গরম লাগছিল, "তুমি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করে আছ—"

এখনো কবিতা চুপচাপ। মনে মনে মানস বিরক্ত হচ্ছিল এবং তার বিরক্তি ও অধীরতা গোপন করবার খুব চেষ্টা করতে করতে সে একটু এগিয়ে এসে কবিতার পিঠের ওপর একটা হাত রাখল।

তার হাত খুব জোরে ছুঁড়ে ফেলে রুক্ষ গলায় কবিতা বলে উঠল, "ন্যাকামি করতে এসো না—"

"ন্যাকামি!" কবিতাকে কথা বলতে দেখে উৎসাহী হয়ে তার আরও কাছে সরে এল মানস, "আমার সব কথা তুমি ধর না, আমি তোমাকে যা বলেছি—"

"তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি—বুঝেছ?" মানসের কাছ থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল কবিতা, উঠে বসল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তোমার কথা ধরব না মানে? তুমি লাথি-ঝাঁটা মারবে আর আমি মুখ বুজে সয়ে যাব? কী ভাব তুমি আমাকে?"

"কী যা-তা বল!" কৃত্রিম উত্তেজনা প্রকাশ করল মানস, "আমি লাথি-ঝাঁটা মারব তোমাকে!"

"তা ছাড়া কী? আমি কিছু বুঝি না? এখন এসেছ সোহাগ করতে—"

"সে তো চিরকালই করি, কিছু বোঝ না তুমি!"

"না, বুঝি না, তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই", মানস আবার কবিতার কাছে এসে তার গায়ে হাত রেখেছিল, তাকে ধাক্কা দিতে দিতে উত্তেজিত হয়ে সে বলল।

"কবিতা, এ অবস্থায় এত অস্থির হয়ো না, বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে—"

"হোক! বাচ্চার ক্ষতি হোক, আমার ক্ষতি হোক, তাতে কার কী!"

"আমার অনেক কিছু", এলিয়ে পড়ল মানস, গলার স্বর অল্প নামিয়ে বলল, "আমার ভাবনা না থাকলে, টাকা ধার করে আমি ওষুধ নিয়ে আসব কেন, এতদিন আনতে পারিনি বলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়েছিল—"

"আমার জন্যে কিছু করতে হলেই তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু এ অবস্থার জন্যে আমি একা দায়ী নই—"

"তা তো জানিই।"

"জান তো মেজাজ দেখাও কেন, লজ্জা করে না আমার সঙ্গে পশুর মতন ব্যবহার করতে?"

মানস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। হাসল। আর বেশি কথা বলার উৎসাহ ছিল না তার। রাত বৃথাই বাড়ছিল ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে বিড় বিড় করে উঠল, "তুমি কিছু বোঝ না। টাকা-পয়সা, তোমার শরীর—এ সব ভাবনায় আমার কী মাথার ঠিক আছে!"

"খুব ঠিক আছে", কথা বলে বলে কবিতাও যেন ঈষৎ ক্লান্ত, "টাকা-পয়সার ভাবনা অনেকেরই থাকে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তারা কেউ তোমার মতন—"

কবিতাকে কথা শেষ করতে দিল না মানস। আগুনের মতন ঠোঁট দিয়ে তার মুখ অনেক সময় বন্ধ করে রাখল। কবিতা ছটফট করতে লাগল, অস্থির ও উত্তেজিত হল।

"না না, সরে যাও, এসব আমার ভাল লাগে না, সত্যি বলছি ঘৃণা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই—"

তার কথা ধরল না মানস। এত সময়ের পুঞ্জিত আবেগ উজাড় করে তাকে আরও কাছে টেনে নিবিড় বাহু বন্ধনে বাঁধল।

এখন কুকুর ডাকল না। ডাকলেও শুনতে পেত না মানস। কাঁকড়ার গর্ত, মাছের চোখ, পিছল শরীর ও আঁশটে গন্ধ—এ সবও মনে এল না মানসের, কেননা সত্যি তার ঘৃণাও ছিল না।

(৫)

যার জন্য পাথর-কুঠির নীলেন্দুনারায়ণ নিজে ব্যস্ত হয়ে এই রাত করে ডাক্তার ডেকে এনেছেন, তাকে নিশ্চয়ই যত্ন নিয়ে দেখা দরকার। তা দেখলেনও ডক্টর সামন্ত। তারপর বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

'আভ্‌লি ভারান্ডা' সপ্রশংস দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালেন, 'জানেন মিঃ মিত্র, আপনার এই বারান্দাটিতে দাঁড়ালেই আমার নস্টালজিয়া হয়। আমাদের গ্রামের বাড়িতে এরকম একটা বারান্দা ছিলো।'

মিঃ মিত্র একটি সিগারেট এগিয়ে দিয়ে লাইটারে আগুন উদ্‌গিরণ করতে করতে বললেন, 'মাঝে মাঝে আসতে কোনো বাধা নেই, তবে সেজন্য অসুস্থ হতে পারবো না আগেই বলে রাখছি।'

খোলা গলায় হাসলেন ডাক্তার—

'রোগী কেমন দেখলেন বলুন।'

'অত্যন্ত দুর্বল। প্রেসার ভীষণ নেমে গেছে। মনে হয় কোনো কারণে বড় বেশী স্ট্রেইন হয়েছে। অবিশ্যি ভাববার কিছু নেই তা নিয়ে, ও ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু—' একটু থামলেন, সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'কয়েকটা আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে শরীরে।'

'আঘাত?' অবাক হলেন মিঃ মিত্র।

'কণ্ঠনালীতে।'

'মানে?'

'মনে হয় কেউ খুব জোরে গলা টিপে ধরেছিলো।'

'সে কী!'

'তা ছাড়াও হাতে মুখে আরো অনেক দাগ, চাপ চাপ রক্ত জমে আছে এখানে-ওখানে।'

'স্ট্রেন্‌জ।'

'আচ্ছা, যখন অজ্ঞান হয় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কেন বলুন তো?'

'সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারলে একটা পারম্পর্য বোঝা যায়।'

একটু এড়িয়ে গিয়ে মিঃ মিত্র বললেন, 'আপনি তো জানেন, এখানে আমি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। কোন্ মহলে কোন্ মাসী পিসী ভ্রাতা ভগিনীর দল বিরাজ করেন, খোঁজও রাখি না। কে কখন অসুস্থ হয় তাও জানতে পারি না। এই মেয়েটি এই অবস্থাতেই আমার মহলে এসেছে।'

'ও।'

'তবে এই মুহূর্তে এর সব রকম দায়িত্বই আমার বলে জানবেন, এবং সারিয়ে তোলাটাই এখন মুখ্য কর্তব্য।'

'সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু চেহারা দেখে আমি আপনার ঘনিষ্ঠ কেউ বলেই ভাবছিলাম। এতো সুন্দর মেয়ে তো বড়ো সচরাচর দেখা যায় না?'

স্মিতহাস্যে মিঃ মিত্র বললেন, 'কমপ্লিমেন্টটা কাকে দিচ্ছেন? আমাকে, না মেয়েটিকে?'

ডক্টর সামন্তও হাসলেন, 'বলা থাক উভয়কেই। তবে প্রতিযোগিতা হলে আমি কিন্তু মেয়েটিকেই বেশী নম্বর দেব।'

'তা তো দেবেনই, মেয়ে যে।'

এর পরে দুজনেই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

ডক্টর সামন্ত বয়সে যদিও তাঁর চেয়ে অন্তত দশ-বারো বছরের বড়ো কিন্তু স্বভাবের তারুণ্যে যখনই আসেন তখনই হাস্যপরিহাসে একটা তাৎক্ষণিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আসেন রোগী দেখতে, চেহারাটা দাঁড়ায় আড্ডার। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

যাবার আগে ওষুধ লিখে, পথ্য বাতলে, আরো কিছু আদেশ নির্দেশ দিয়ে তিনি উঠলেন। বললেন, 'অনবরত আইস-ব্যাগটা দিয়ে যান। জ্ঞান হওয়া দরকার, অনেকটা সময় কেটে গেল। আর জ্ঞান হওয়া মাত্রই এক নম্বর ওষুধটা খাইয়ে দেবেন, সেটা জরুরী। তাতে ঘুম হবে ভালো।'

রাত করে আসার দরুন বত্রিশ টাকার জায়গায় চৌষট্টি টাকা দর্শনী নিয়ে তিনি

বিলিতী জ্যুতোর মশমশ শব্দ তুলে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। শায়লা সঙ্গে গেল তুলে দিয়ে আসতে।

মিঃ মিত্র এবার আর একটি টেলিফোন করলেন। নার্সের জন্য তাদের ব্যুরোতে।

'হ্যালো।'

'হ্যাঁ, শুনুন, আমাদের একজন নার্সের দরকার।'

'এখন?'

'যতো তাড়াতাড়ি হয়। ট্রেইন্ড নার্স।'

'কিন্তু এখন তো কাউকে পাবেন না।'

'দাম বেশী দেব।'

'তা হলেও না।'

'এখন কোনো নার্স নেই আপনাদের হাতে?'

'আগে থেকেই ওদের কাজ ঠিক করা থাকে, সেভাবেই যে যার কাজে চলে যায়। যারা খানিক আগে রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি সেরে ফিরেছে, তারা যাবে না। শিফটে কাজ হয় তো! রাত বারোটার শিফটে তিনজন মেয়ে ফাঁকা আছে, বলেন তো পাঠাতে পারি একজনকে।'

'ঠিক আছে, তাই পাঠাবেন।'

'আপনার ঠিকানা বলুন।'

'এলগিন রোড, পাথরকুঠি। আমার নাম নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র।'

'ও। নমস্কার, স্যার। স্যার, কিছু মনে করবেন না, না জেনে হয়তো কী বলতে কী বলেছি। আজকাল নার্সেরা স্যার বড়ই ইয়ে হয়ে গেছে। কথা শোনে না। আগে ধর্না দিত এখন বলে পারবো না। এদেরই বাজার, বুঝলেন না!'

'তা হলে বারোটায় পাঠিয়ে দেবেন।' বৃথা বাক্যব্যয় না করে টেলিফোন নামালেন।

কী এক উৎপাত এসে জুটলো, অথচ এক মুহূর্তে আগেও জানতেন না, এরকম একটা অনর্থের মধ্যে পড়ে যাবেন। তাঁর আশা-প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে এরকম যে একটা বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে তা তাঁর কল্পনারও ছিলো না। বঁড়শি এখন বিঁধে গেছে গলায়, গেলাও কঠিন, ফেলাও দায়। তথাকথিত চরিত্র নামক পদার্থটি তাঁর যে নরকে গিয়েই পৌঁছাক, ব্যথা-বেদনা মায়া-মমতার নিবাস হৃদয় নামের অস্তিত্বটা বোধ হয় এখনো ধুকপুক করছে বুকের মধ্যে। বিবেকের দাঁত বোধ হয় এখনো সব কটাই পড়ে যায় নি। নয়তো মেয়েটাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিলেই বা ক্ষতি ছিলো কী?

একটা দশ হাজার টাকা দামের জিনিস কি অমনিই ফেলে দেওয়া যায় নীলেন্দু-নারায়ণ? জেদের নিলামে চড়িয়ে আপনি ডেকে এনেছেন ওকে, এখন তো আপন স্বার্থেই সারিয়ে তোলার এই গরজ। তাই না? না। কক্ষনো না।

এই চিন্তার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতি-বাদী হলেন। সজ্ঞানে নিজেকে অত ছোটো ভাবতে আঘাত লাগলো। মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে বললেন, 'না, এ আমার লোভ নয়, এ আমার দায়, দায়, কর্তব্য। আমি পাথর-কুঠির নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র, টাকা আমার কাছে হাতের ময়লা। এ আমার আভিজাত্য। আমার উদারতা। সেই মনোবিকারেই আমি ব্যস্ত হয়েছি, সেই মন নিয়েই আমি দ্বিগুণ ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডেকেছি, সেবিকা খুঁজেছি। কোনো দান-প্রতিদানের প্রশ্ন নেই এখানে, দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নেই।

অবিশ্যি কারো জন্যে ব্যস্ত হয়ে কিছু করা এ-ও তাঁর প্রথম। কার জন্যই বা করবেন? কে আছে তাঁর? কে ছিলো? কাকে তিনি ভালোবেসেছেন জীবনে? কে তাঁকে ভালোবেসেছে? কেউ না। কেউ না। একটা নিঃসঙ্গ হাহাকার ছাড়া তাঁর নিভৃত

অন্তরে আর কিছু নেই, কিছু ছিলো না।

'শায়লা।'

বেল না টিপে তিনি ডেকে উঠলেন জোরে। এটা তাঁর অভ্যাস নয়।

ডাক্তারবাবুকে গাড়িতে তুলে ফিরে আসতে আসতে মনিবের ডাক শুনে শায়লা কয়েক সিঁড়ি টপকে এসে দাঁড়ালো।

'মহিমকো বোলাও।'

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো মহিম।

'স্যার।'

'মেয়েটির জ্ঞান হচ্ছে না কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি।

'আজ্ঞে, আমি তো কতো চেষ্টা করছি।'

'সমস্ত টাকাটা আত্মসাৎ করে তুমি কি ওকে চুরি করে এনেছ?'

'এ কি কথা, স্যার?'

'ওর বাপ যে রাজী ছিলো তা আমি কী করে জানবো?'

'আমি ঠিকানা দিচ্ছি, আপনি গোয়েন্দা লেলিয়ে দিন। আমার শত্রু সখারামকে পাঠান।'

'টাকা তুমি ঠিকমতো দিয়েছিলে তবে?'

'আজ্ঞে হাঁ, স্যার। মা কালীর দিব্যি, টাকা আমি ঠিকমতো দিয়েছি।'

'সংগে কে কে ছিলো?'

'রাখাল ড্রাইভার, ননীদাসী, রতনদাসী।'

'তারা সব সাক্ষী আছে যে, টাকা তুমি দিয়েছ?'

'আজ্ঞে, নিশ্চয়ই।'

'তারা সব কোথায়?'

'ননীদাসী রতনদাসী পেণছে দিয়েই চলে গেছে। কাল সকালে আসবে, তখন জিজ্ঞেস করবেন। রাখাল আছে, ডাকবো?'

'তুমি ওর বাবার হাতে সই করিয়ে আনলি কেন?'

'এ ক্ষেত্রে, স্যার, সেটা সম্ভব ছিলো না।'

'কেন?'

'বাপ লোকটি শেষ পর্যন্ত মন ঠিক করতে পারছিলো না।'

'কী বলছিলো?'

'তার সংগে কথাবার্তা পাকা না করেই আমি গিয়েছিলাম। আমি ভাবিনি, সত্যি সে তার মেয়ে নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করার জায়গায় এসে পেণছবে। আগের দিন আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো।'

'খুন?'

'সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে তবু আমি তাকে বলেছিলাম—অনেক কথাই বলেছিলাম, এসব ব্যাপারে যা বলে থাকি, যা আমি মুখস্থ করে রেখেছি, সে বয়ান আজ পর্যন্ত সকলের কাছেই সিদ্ধ হয়েছে। তবে এখানেও যে এই বাণ বিদ্ধ হবে তা আমি ভাবিনি, কর্তা। সত্যই ভাবিনি। কিন্তু দুঃখের সাগরে আর সাঁতার কাটার শক্তি ছিলো না লোকটির। নইলে কি আর তার মতো মানুষ—'

মহিম চুপ করলো।

মিঃ মিত্র তাকাতেই আবার বললো, 'আমি তবু গিয়ে কপাল ঠুকে দাঁড়িয়ে ছিলাম, গাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, ভিতরে ননী আর রতন বসেছিলো চুপ করে, দূর থেকে দেখলাম ওরা আসছে। বাপ আগে আগে, মেয়ে পিছনে। অমনি আমি ইংগিত দিলাম রাখালকে, আপনি তো জানেন স্যার, এই কাজে আমার মতো অভিজ্ঞ লোক এই শহরে খুব কমই আছে? আমি লোক চিনি। আমি বললাম, টাকাটা যে দিচ্ছি সাক্ষী থাকো কিন্তু দেরি ক'রো না। মেয়ে নিয়ে এলে হবে কী, লোকটা মুহূর্তে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো লাফিয়ে পড়তে পারে ঘাড়ে, আর তা ছাড়া হাজার হোক বাপ তো? টাকাই নিক, যাই নিক, কলিজা ছিঁড়েই তো দেয়? মর্জি ঘুরতে কতোক্ষণ?'

'বাজে কথা থাক, যা বলছিলে বলো।'

'দৌড়ে গিয়ে টাকাটা গ‍ুঁজে দিলাম হাতে, আর রাখাল বোঁ করে গাড়ি ঘুরিয়ে চোখের পলকে মেয়েটিকে তুলে পুরোদমে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এমন বিদ্যুতের মতো সব করলো যে, আমিই প্রায় পড়ে থাকছিলাম। কোনোমতে উঠে পড়লাম। পিছনের কাচ দিয়ে দেখলাম, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে অন্ধকারে ওর বাপ ছুটছে গাড়ির পিছনে।'

'তারপর?'

'মেয়েটি নিশ্চয়ই জানতো না কিছু, নিশ্চয়ই অন্য কথা বলে নিয়ে এসেছিলো। ননী আর রতন ওকে টান মেরে তুলে এনেছিলো। প্রথমটায় কেমন হতভম্ব হয়ে রইলো, তারপরেই যা শুরু করলো।'

'কী?'

'স্যার, এ পর্যন্ত কতো মেয়েই তো এনেছি, কেউ ইচ্ছায় এসেছে কেউ অনিচ্ছায় এসেছে, এমন দুরন্ত মেয়ে আর দেখিনি। এর ভয় ডর নেই, প্রাণের মায়া নেই, একটা বুনো বেড়াল, পোষ মানবার শিক্ষা নেই ওর।'

'ডাক্তার বলেছেন, কেউ এর গলা টিপে ধরেছিলো, তিনি দাগ দেখেছেন। আমি জানতে চাই তার অর্থ কী? কার এতো স্পর্ধা, কে এর গায়ে হাত দিয়েছিলো?'

জিব কেটে তিন হাত পিছিয়ে গেল

মহিম, 'ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন স্যার, যাকে আপনার জন্য নিয়ে আসছি, তিনি তো আমাদের মনিব এখন, এ কথা শুনলেও যে পাপ। আপনি, সাহেব, রাখালকে এখুনি ডাকুন, জিজ্ঞেস করে দেখুন কী ধরনের গুণ্ডো প্রকৃতির। যেন একটা বাঘিনী। কী ধস্তাধস্তি যে করেছে! অবস্থা-বৈগুণ্যে কী না হয়! আমি এদের উষ্টি-গুষ্ঠি চিনি, মেয়ে স্যার অতি সম্ভ্রান্ত বংশের, এমন বড়ো ঘরের মেয়ে কখনো আসেনি। এককালে অঢেল টাকার মালিক ছিলো, আর এখন চিকিৎসার অভাবে ঘরে বউ মরছে, ছেলে মরছে, খেতে পাচ্ছে না, শেষে মেয়েও বিক্রি করলো। অদৃষ্ট স্যার মানতেই হয়, নইলে—'

'থামো। তোমাকে বক্তৃতা দিতে ডাকিনি। আমি জানতে চাইছি, মেয়েটির হাতে মুখে গলায় ওসব কিসের দাগ?'

'না স্যার, কোনো অসুখ নেই।' মহিম জানে, তার মনিব নিজের স্বাস্থ্য বিষয়েও যেমন হুঁশিয়ার, অন্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সাবধান, সন্দিহান। বিশেষত মেয়েরা যখন আসে, প্রথমেই তিনি তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করেন, ডাক্তার দেখান। সে কথা মনে করেই জোর দিল সে, 'মেয়েটি একেবারে নীরোগ, পবিত্র। শুধু দুরবস্থায় পড়েছে, এ ছাড়া আর কোনো দোষ নেই।'

'কেবল বাজে কথা।' মিঃ মিত্রর বজ্রগম্ভীর আওয়াজে মহিম এতোটুকু হয়ে গেল। 'দাগগুলো কিসের, সেটা বল।'

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মহিমের। বিচার-বিবেকহীন বুকের ভিতরে কোথায় যেন বিবেকের পিঁপড়ে কুট করে কামড়ে দিল তাকে। ছেলেবেলাকার সেই গৌরকান্তি গগনকে মনে পড়ে গেল। তার নিজের যখন ষোলো-সতেরো বছর বয়েস গগন তখন ন-দশ বছরের বালক। হালদারবাবুদের সব ছেলের চেয়ে সুন্দর, সকলের চেয়ে মধুর। যখন-তখন মহিম বলে ঝুলে পড়তো গলা ধরে, আবদার করতো। মহিম তাকে ঘোড় ওড়া শেখাতো, মারবেল খেলায় জিতিয়ে দিত, ছোটোদের ঝগড়া করলে গগনের পক্ষ হয়ে দাঁড়াতো। চুরি করে আম জাম কুল কলা তেঁতুল—কতো কিছু যে নিয়ে আসতো ওর জন্য। তখনো, সেই ষোলো-সতেরো বছরের কাঁচা হৃদয় এমন করে পোকায় কাটেনি। সেই দুর্মর স্মৃতি কষ্ট দিল তাকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'অত্যন্ত দাপাদাপি করেছিলো, ওরা ধরে রাখতে পারছিলো না, আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে দিয়েছে। দু'বার প্রায় দরজা খুলে ফেলে লাফিয়ে পড়ছিলো, শেষে আমিই কোনো রকমে টেনে রেখেছি জোর করে। এই দেখুন—' মহিম তার ডান হাতের শার্ট তুলে ব্যান্ডেজ দেখালো, 'দাঁত বসিয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি গর্ত করে দিয়েছে এখানে। বাড়ি এসে ওষুধ দিয়ে বেঁধেছি। কী বলবো স্যার, সবশেষে আর কিছু না পেরে, আমাদের হাত থেকে বাঁচবার শেষ চেষ্টা হিসেবে নিজের গলা নিজেই টিপে ধরলো।'

'কী!'

'দু হাত দিয়ে এমন করে নলীটা চেপে ধরেছিলো যে, চোখ বেরিয়ে এসেছিলো। দু ছলক রক্ত পর্যন্ত উঠে এসেছিলো মুখের গাঁজলার সঙ্গে। তারপরেই অজ্ঞান হয়ে গেল।'

'আর তোমরা করছিলে কী? ঘাস কাটছিলে?'

'ছাড়াতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিলো তখনকার মতো ওর গায়ে যেন শত হস্তীর বল দিয়েছেন ভগবান। টানাহ্যাঁচড়াতে আরো কতো ব্যথা পেয়েছে তার কি ঠিক আছে কোনো? হাতে মুখে নিজেরই চড়-চাপড়ের দাগ। ভীষণ কাঁদছিলো।'

'হুঁ।'

'আর স্যার পলক ফেলতে না ফেলতে একটা ছেড়ে আর একটা বুদ্ধি খাটাচ্ছিলো আত্মহত্যা করবার।'

মিত্র সাহেব বারান্দা পেরিয়ে আকাশে তাকালেন, 'নাম কী মেয়েটির?'

'ওর বাপ যখন গাড়ির পিছে পিছে ছুটছিলো, চিৎকার করে ডাকছিলো সঙ্গে সঙ্গে, ঐটুকুই কানে গেল। একবার বলছিলো ওতন, একবার বলছিলো অতসী।'

মিঃ মিত্র চুপ করে রইলেন।

অপেক্ষা করে মহিম বললো, 'তা হলে আমি—'

চোখ না ফিরিয়েই বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।' তারপর তেমনিই বসে রইলেন চুপ করে।

(৬)

আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে এলো শহর, রাস্তা জনবিরল হলো। বারোটা প্রায় বাজে। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিলেন, তবু বসেছিলেন নার্সের জন্য। অবিশ্যি না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না। সম্পূর্ণ ভার তিনি মিসেস রায়ের উপরেই, অর্থাৎ মেট্রনের উপরেই ছেড়ে দিয়ে শুতে যেতে পারেন। মহিম অপেক্ষা করতে পারে দরজায় দাঁড়িয়ে। আরো অন্যান্য অনেকেই আছে হুকুম তামিল করবার জন্য। কিন্তু ঠিক এ ধরনের একটা দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করলেন।

আর কারো জন্য না হোক, ঐ মিসেস রায় মহিলাটির জন্যই একটু লজ্জাবোধ করছিলেন। তাঁর মহলে তাঁর জন্য অনেক মেয়েই আসে বটে কিন্তু কিছু আড়ালও আছে। বাইরের চেহারাটা খুব ভদ্র রাখেন তিনি। তাদের জন্য মিসেস রায়কে কখনো ডাকেন না। তাঁর চোদ্দোখানা ঘরের দুটি-চারটি ঘরে তখন সব কিছুর ব্যবস্থাই আলাদা হয়ে যায়। মিসেস রায় জানতেও পারে না কিছু। তার ঘর নীচে, নীচেই থাকে, ঘর সংসার সামলায়, উঠে আসে একান্তভাবেই খাওয়া-দাওয়ার তদারক

করতে। মিঃ মিত্রর খানাপিনা সরকারী রন্ধনশালায় চলে না। সব বন্দোবস্ত আলাদা। দোতলাতেই তাঁর বিলিতী ধরনে তৈরী কিচেন, উনুনও এসেছে সে দেশ থেকে। একটি উৎকৃষ্ট গোয়ান কুক রান্না করে দেয়। এই মহিলা মাঝে মাঝে পাল্টে দেয় খাবার. নিজে দাঁড়িয়ে শুক্তো শাক তেতোর ডাল ইত্যাদি দিশী রান্না রাঁধায়। ভালোই লাগে মুখ বদলাতে। দিশী রান্না খান বা না খান. খাবার সময়ে এসে দাঁড়াবেই মিসেস রায়। এই কর্তব্যটুকু অবশ্যই তার চাকরির অন্তর্গত নয়. নিজের নারীজনোচিত স্বভাবগুণেই এই যত্ন তার। বেশ ভালো লাগে মিঃ মিত্রর।

কিন্তু তাঁর পরিচর্যা করে বলে তাঁর স্ত্রীলোকদের পরিচর্যা নিশ্চয়ই করাতে পারেন না তাকে দিয়ে।

আহা! ঐটুকু মেয়ে আবার স্ত্রীলোক, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদটাও উঠলো মনের মধ্যে, অতসীর অচৈতন্য মুখের কাঁচা লাবণ্য ভেসে উঠলো চোখে। কতো বয়েস হবে? কুড়ি? বাইশ? তেইশ? উঁহু। এর চেয়ে বেশী না। টাকাকড়ির প্রলোভনে অন্য যেসব মেয়ে আসে, অথবা অভিভাবকদের প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করে, অনেক পরিপক্ক হয় তারা। ভালোবাসাহীনভাবে নিজেকে দিতে সব মেয়েই কষ্ট পায়, কিন্তু তার মধ্যে মনে মনে একটা বোঝাপড়াও থাকে তাদের। পুরুষের এই ভয়ংকর লোভের আগুনে অসহায়ভাবে জ্বলতে জ্বলতেও এই বোধ কাজ করে, এর জন্য তারা দাম নিয়েছে। কিন্তু দুঃখকে পরিহার করতে পারে না। অপমানে অসম্মানে তাদের বুক ফেটে যায়। তিনি যখন ছিবড়ে করে ফেলে দেন তখন নিশ্চয়ই সমস্ত পুরুষজাতিকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে যায়। নাকি সৃষ্টিকর্তা বিধাতাকে? নাকি অভিশাপ দেবার মতোও বুকে বল থাকে না?

হঠাৎ একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল। তখনো দেশ স্বাধীন হয়নি, যুদ্ধ চলেছে, সৈন্যতে ভরে গেছে কলকাতা শহর, তৈরী করা মন্বন্তরের বলি মানুষ প্রাণীরা "ফেন দাও, ফেন দাও" বলে চেঁচাচ্ছে দোরে দোরে, মরছে পথের ধারে, ছেঁড়া নেংটির ফালিতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে গাছের ডালে তলায় শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে টোকানো-কুড়োনো পচা-গলা শাকসবজি সেদ্ধ করে খাচ্ছে সঙ্গীর দল, মরা মায়ের নীরস বুকে টেনে ছিঁড়ছে ক্ষুধার্ত শিশু—এমনি দিনে কোনো এক বন্ধুর বাড়ি পার্টিতে গিয়ে লেকের ধারে মস্ত একটি পোড়ো বাড়ির সৈন্যাবাসে একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন।

ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকারে বাটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ভিখিরী যুবতীর দল, সৈন্যগুলো একটা একটা করে আসছে, দেখছে, তারপর টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। যখন মেয়েগুলো বেরিয়ে আসছে হাত-ভরা খাবার, মুখ-ভরা হাসি, চোখ-ভরা জল।

বন্ধু বললো, 'কী দেখছো? সরে এসো।'

তিনি বললেন—

'স্যরি—'

চিন্তাধারায় বাধা পড়লো. ফিরে তাকালেন মিঃ মিত্র। শ্যামলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'কী ব্যাপার?'

'নার্স আ গিয়া।'

'এসেছে?' প্রাণে যেন জল এলো, খুব নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। একটু পরেই দেখলেন যথাবিধি পোশাকে সুসজ্জিত নার্স উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

৬

তাঁকে নিয়ে তিনি যখন এগিয়ে এলেন. মেট্রন অতসীর মাথায় আইস-ব্যাগ চেপে বসে ছিলো শিয়রে।

'এখন কেমন?' নিচুগলায় প্রশ্ন করলেন তিনি। মেট্রন বললো, 'একবার দুবার একটু নড়েছিলেন, ডাক্তার ডাক্তার বলে কী বিড়বিড় করছিলেন, মনে হয় জ্ঞান ফিরে এসেছে। একটু খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।'

'আপনাকে আজ খুব কষ্ট দেওয়া হলো, কতো রাত হয়ে গেছে—'

'না, না, কষ্ট কেন?' মনিবের ভদ্রতায় মেট্রন সনির্বন্ধ হলো, 'মেয়েটির কাছে থাকবো বলে আমি তো আমার ঘর বন্ধ করে চলে এসেছি। জানতাম না কেউ এসেছে এখানে, এমন অসুস্থ হয়েছে এসে, আপনিও তা বলেননি কিছু। নইলে অনেক আগেই আসতাম।' সরলভাবে অতসীর মাথায় হাত বুলোলো, 'আপনার এতো বড়ো বাড়িতে কোথায় কোন আত্মীয়পরিজন এসে ওঠেন, আমি ঠিক খেয়াল রাখতে পারি না—'

মিসেস রায়ের কথা শুনে মিঃ মিত্র মনে মনে নিশ্চিন্ত হলেন।

তারপর নার্সকে বুঝিয়ে দিলেন সব। টুকটুক করে নিপুণ অভ্যস্ত হাতে নার্স চোখের পলকে গুছিয়ে নিল কাজ। ডাক্তারের আদেশ নির্দেশ শুনে নিল ভালো করে, টেম্পারেচরের চার্ট করলো, ঝিকে দিয়ে ব্যাগের বরফ বদলালো—আর যতোক্ষণ সে এসব করলো, ততক্ষণ মিঃ মিত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শুতে যাবার কথা ভাবলেন, কালকের মিটিং-এর কথা ভাবলেন, কী বক্তৃতা দেবেন তারও দু'-এক কলি আওড়ে ফেললেন মনে মনে। তারপর বিদায় নেবার আগে চোখ ফেরালেন রোগিনীর দিকে, ফিরিয়েই থমকালেন। দেখলেন, এক পলকে সে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, এবার হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মিঃ মিত্র একটু নিচু হয়ে হাতটা ধরলেন, ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কী?'

'ডাক্তার।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার এসেছিলেন।'

'বড়ো ডাক্তার!'

'হ্যাঁ, বড়ো ডাক্তারই এসেছিলেন।'

'আমার মা—'

'হ্যাঁ।'

'পার্থ।'

'হ্যাঁ।'

'মালতী—'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তারবাবু—'

'উনি চলে গেছেন।'

'আপনার পায়ে পড়ি—'

'এসব কি বলছো?'

'দয়া করুন, দয়া করুন, আমার মা, আর—আর—'

নার্স ওষুধ ঢেলে নিয়ে এলো, 'শুনুন, একটু হাঁ করুন তো।'

'ওদের আপনি বাঁচান, বাঁচান।' দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো, তারপরেই আবার ঝিমিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ধরে থাকা হাতটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

(ক্রমশ)

ক্যানাডার চিঠি

অল্পকাল আগে টেক্সাসের সভ্যভব্য শহরে যে বীভৎস কাণ্ড হল তার বিদেশীকৃত সংবাদ পৃথিবীর সুদূরতম আদিবাসীরও কানে হয়তো পৌঁছে গেছে এতদিনে। যদিও অবশ্য সে হয়তো স্বভাবতই অবাক হয়ে ভেবেছে মানুষ এখনো কেন এত অসভ্য, আদিম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়েদেয়ে, গাড়িতে-বাড়িতে সুপ্রচুর হয়েও কেন কোন যুবক নিজের বাড়িতে মা-বউকে খুন করে তারপর বন্দুক-রসদ নিয়ে ডজন ডজন নিরীহ পথচারীকে বেমক্কা গুলি করতে থাকে, সে-রহস্য অরণ্যের আদিবাসী যেমন জানে না, ছা-পোষা আমিও তেমনি জানি না। কিন্তু সভ্যসমাজে বাস করার ফলে অন্য বিড়ম্বনা আছে আমাদের। সেখানে খবরের কাগজ পড়তে হয় এবং রেডিও শুনতে হয়, এবং প্রতিদিন আরো ক-ঝাঁক নাপাম বোমায় আরো ক-হাজার নিষ্পাপ শিশু-বুড়ো-ছেলে-মেয়ে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হল তার খবর নেওয়া প্রাতঃকৃত্যের মতোই যেন একদিন আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তাই টেক্সাস-যুবকের নর-হত্যাকাহিনীর সঙ্গে যে-তুলনা প্রায় অনিবার্যভাবেই আমাদের মনকে পুনর্বার বিপন্ন করে, তা হয়তো আন্দামানের কিংবা নিউজিল্যান্ডের অস্তিত্বজর্জর লোকটির কাছে এখনো অপ্রাসঙ্গিক। তার সৌভাগ্যকে আমি সত্যিই ঈর্ষা করি।

অবশ্য এখানে-ওখানে বুদ্ধিজীবী সম্মেলন, প্রতিবাদী সভা ইত্যাদি হচ্ছে। কিন্তু সভাসমিতির সূক্ষ্ম আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় না বলে তার অক্ষমতাবোধও ক্রমে বিপুল হয়ে ওঠে, এবং বর্ধিষ্ণু আতঙ্কের মতোই তার গয়ং-গচ্ছতা বেড়ে চলে। কারণ এত বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে, সারা পৃথিবীর নিরস্ত্র অথচ অগণিত জনসাধারণ রাজনৈতিক উন্মত্ততাকে কী উপায়ে খানিকটা আবদ্ধ করতে পারে সে-সম্বন্ধে কারো কোনো থিওরি দেখি না। 'ঠাণ্ডা' লড়াইয়ের নাড়ি-নক্ষত্র নিয়ে রোজই তো কত পুঁথিপত্রও বেরোয়, কিন্তু যাদের হাতে বন্দুক নেই, নাপাম বোমাও নেই তাদের সম্ভবপর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছুই কি লিখবার নেই?

পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা হলে মাত্র আধডজনখানেক লোক ছাড়া হয়তো পৃথিবীর আর কারো মতামত প্রকাশের প্রশ্নই উঠবে না। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সে-রকম যুদ্ধ আজকের পট-ভূমিকায় সহজে সম্ভব নয়, ত হলেও কি সারা পৃথিবীর বিরক্ত জনসাধারণের সমালোচনার দাম নেই? বিশেষত, অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন দেশে প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনী তোড়জোড় শুরু হবে। সে-দেশের সজ্জনদের হাতে তাই এই মুহূর্তে অন্তত এই একটি অস্ত্র আছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এমন-কি কিউবা-সংকটের সময়েও তৎকালীন প্রেসিডেন্টের উপর দেশের জনমতের যে-পরিমাণ চাপ পড়েছিল আজ যেন তাও দেখা যাচ্ছে না।

একজন সুপরিচিত সোভিয়েট যুবক মার্কিনী কবি রবর্ট ফ্রস্টের মস্কো সফর-কালে তাঁকে বলেছিলেন যে, দুনিয়ায় প্রবৃত্তিগত-খারাপ লোক নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সংখ্যানগন্য. কিন্ত ভালো লোকেরা কখনোই তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ থাকেন না। কথাটা আজকের মতো সত্যি বোধ হয় কখনো হয়নি। এই ভিয়েৎনাম নিয়ে গত মার্চে মার্কিনে ও ক্যানাডায় আধাখেঁচড়া প্রতিবাদসভা, মিছিল ইত্যাদি হল, তারপরেই আবার যথাপূর্বং। মনে হয়, বিবেক ও দায়িত্ববোধ যেন এমন জিনিস যা মাঝে মাঝে পকেট থেকে বার করে দেখলে ও দেখালেই কর্তব্য সম্পন্ন হল। তবু বলব, সে-রকম সাময়িক বিবেকবোধের প্রকাশই বা আর কত ঘন ঘন ঘটে? সম্প্রতি ক্যানাডার ব্যান্‌ফ্‌ শহরে এবং অল্পকাল আগে টোরোণ্টোতে দুটি বড়ো বিতর্ক সম্মেলন হয়ে গেল, যার অংশবিশেষ আমরা টেলিভিশনযোগে দেখেশুনে উপকৃত হয়েছি।

টোরোণ্টোর বেসরকারি সম্মেলনটিতে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়েছিল। গত মাসের জেনিভা-

বিতর্কে দেখা গেছে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিবারণের ব্যাপারে রুশ-মার্কিন সম্মতির পথে বিশেষ অন্তরায় হচ্ছে বিস্ফোরণ নির্ণায়ক যন্ত্রের ক্ষমতা ও সূক্ষ্মতার প্রশ্নটি। আমেরিকানরা যথাস্থানে চাক্ষুষ পরিদর্শন ছাড়া অন্য ব্যবস্থায় রাজি নন, এবং রুশ সরকার স্বভাবতই এই অনাবশ্যক প্যাঁচে পড়তে চান না, যেহেতু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বহুদূরে থেকেই বিস্ফোরণ ধরা যায় বলে তাঁরা মনে করেন। সৌভাগ্যত, বেসরকারি আলোচনায় সংলোকের সংখ্যা বেশি থাকে। তাই জেনিভায় যে তর্ক মিটল না, টোরোণ্টোয় সে-সম্বন্ধে দরকারী খবর মিলল। সেখানে ক্যানাডিয় ও মার্কিন বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করলেন যে বিস্ফোরণ নির্ণয় করতে হলে অন্যের ঘরে ঢুকে হাঁড়ির খবর নেবার কোনোই প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, যন্ত্রপাতির সঙ্গে কিছু সর্বসম্মত রাজনৈতিক উপকরণ একত্র করে এই সমস্যার সুসমাধান হতে পারে। সুতরাং, অভিপ্রায় শুভ হলে কোনো পক্ষই অতঃপর এই ব্যাপারে জবরদস্তি করবেন না একথা আশা করা যায়।

ব্যানফে সম্মেলনে আমরা ক্যানাডার দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ চেস্টার রনিংকে দেখতে পেলাম। প্রধানমন্ত্রী পিয়র্সন এ-বছর তাঁকে চাকরিতে অবসর না-দিয়ে ইতিমধ্যে দু-দুবার হ্যানয় মুলুকে পাঠিয়েছিলেন, মীমাংসার পথ খুঁজবার উদ্দেশ্যে। দূরপ্রাচ্য রাজনীতিতে রনিং-এর তুল্য অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এদেশে নিঃসন্দেহে আর কারো নেই। (এবং তাঁর মতে আবার মার্কিন দেশে প্রকৃত চীন-বিশেষজ্ঞ একজনও নেই।) রনিং-এর মূল বক্তব্য, সংযুক্ত জাতিসংঘে কম্যুনিস্ট চীনের এবং উত্তর ভিয়েৎনামের আসন ছাড়া ভিয়েৎনাম সমস্যা সমাধানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি বলেন যে, ৭০ কোটি চীন নাগরিকের সরকারকে অস্বীকার করে ১ কোটি ২০ লক্ষ ফরমোসাবাসীর প্রতিনিধিকে জাতিসংঘ-মর্যাদা দেওয়া শুধুমাত্র মার্কিন অবাস্তবতা নয়, জাতিসংঘের অস্তিত্বের সম্ভাবনাও এর ফলে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। (এই মন্তব্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেক্রেটারি জেনারল উ থান্টের পদত্যাগের ইচ্ছা জানা যায়।) তিনি বলেন, বর্তমানের ইঙ্গিত থেকে প্রায় বোঝা যায় যে, মার্কিন সরকার অনিবার্যভাবেই লালচীনকে স্বীকার করার পথে এগোচ্ছেন—এখন শুধু অনর্থক কালক্ষেপণের ফলে জল আরো ঘোলা হচ্ছে।

রনিং বলেন যে, চীনের নৈঃসঙ্গ্য পৃথিবীর পক্ষে মারাত্মক। আর এতাবৎ ক্যানাডার ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, মার্কিনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত "শেয়াল ডাকা"-র ফলে চীনের চোখে ক্যানাডা মার্কিনী উপগ্রহ বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। ফলে, ভিয়েৎনামের ব্যাপারে ক্যানাডা অপেক্ষাকৃত সহজে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যে খানিকটা আদানপ্রদান হয়তো করতে পারত, তার পথ অনেকাংশেই এতকাল বন্ধ থেকেছে।

জনমতের চাপে, প্রায় অস্ফুট সমালোচনার অপরাধেই, প্রধানমন্ত্রী পিয়র্সন ইতিপূর্বে ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভর্ৎসনা আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু এদিকে রুশ ও চীনের সঙ্গে কোটি-কোটি ডলারের বাঁধা বাণিজ্যের স্বার্থ রয়েছে; সুতরাং মাঝে মাঝে সুনীতি-বক্তার ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য মার্কিন সরকার সেই প্যাঁচের কথা বোঝেন, তাই চোখের ঠারে আপাতত খানিকটা অনুমতিও এদিকে পৌঁছে গেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল মার্টিন ব্যানফ সভায় (এবং তারপর অন্যত্রও) বলেছেন যে ক্যানাডিয় সরকার "এশিয়া সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রস্তুত"। চীনকে জাতিসংঘে ঢোকাবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাও তিনি করতে চান। এসব আস্ফালনে মার্কিন সরকার শান্তই থেকেছেন।

জনসাধারণের স্মৃতি হয়তো কাছের দিগন্তেই সীমাবদ্ধ, তাই পল মার্টিনের এই আকস্মিক দৃঢ়বাচনে কেউ কেউ আশ্বস্ত হবেন। তথাচ মনে থাকা উচিত, মাত্র মাস দুয়েক আগেই অটোআতে আগন্তুক রুশ পার্লামেন্টরী প্রতিনিধিদলের নেতা ডিমিট্রি পলিয়ানস্কির সঙ্গে মার্টিন সাহেবের জোর বচসা হয়ে গিয়েছিল। বিষয়: ভিয়েৎনামে মার্কিন আক্রমণের নীতিগত ভিত্তি। ক্যানাডিয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিন জোর গলায় বলেছিলেন যে, আমেরিকার উদ্দেশ্য ভিয়েৎনামে শান্তিস্থাপন। অবশ্য সে-সময় গুপ্তচরসংশ্লিষ্ট ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্ক এমনিতেই বেশ তিক্ত ছিল।

যাই হোক, অন্যান্য বড়ো ও মাঝারি শক্তিগুলির তুলনায় ক্যানাডা এখনো রুশদেশের খানিকটা কাছাকাছি। বাণিজ্যের ব্যাপারে উভপাক্ষিক নির্ভরতা তো আছেই। তা ছাড়া পলিয়ানস্কি নিজেই আগামী বছরের আন্তর্জাতিক মেলার জন্য সোভিয়েট প্যাভেলিয়ন দেখাশোনা করে গেলেন। অদূর ভবিষ্যতে রুশ-ক্যানাডা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আরো বেশি সম্ভাবনাও আশা করা যাচ্ছে। মণ্ট্রিঅল-লেনিনগ্রাদ জলপথে রুশ জাহাজ পুশকিন যথারীতি পারাপার করছে, আকাশপথেও মণ্ট্রিঅল-মস্কো অচিরেই সংযুক্ত হল বলে। আর একেবারে সম্প্রতি রুশ সরকার ক্যানাডার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও কৃষিবিষয়ে জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের ইচ্ছাতেও বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

রুশ-ক্যানাডা 'সাহচর্যের' এই সূক্ষ্ম অথচ ক্রমবর্ধমান প্রবাহ অবশ্য একেবারেই ইদানীংকালের ঘটনা, এবং এর ভিত্তিও এই দুই দেশের কয়েকটি সাময়িক স্বার্থের উপর স্থাপিত। কাজেই এখনই এর ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি অনুমানের চেষ্টা না-করাই সমীচীন। কিন্তু মার্কিন-ক্যানাডা ঐতিহাসিক সম্পর্কের ফলাফল ক্যানাডার পক্ষে ক্রমগত যে-রকম বিষময় হয়ে উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রুশের সঙ্গে এই প্রায়-ব্যবসাদারি ঘনিষ্ঠতারও যেন একটা গভীরতর ইঙ্গিত আছে। প্রসঙ্গত, হালের আমলে এরই সমান্তরাল, হয়তো কম স্পষ্ট, অন্য এক 'সাহচর্যের' ইঙ্গিতও লক্ষ করা যাচ্ছে মার্কিন-পোল্যান্ড সম্পর্কের বিচিত্র ক্রমবিকাশে। টুকরো টুকরো নানা খবরই ওআরস থেকে এদিকে বেরিয়ে আসে। তার কিছু কিছু হয়তো নিতান্তই মুখরোচক খবরমাত্র। কিন্তু আধুনিক রাজনীতির প্রচ্ছন্ন পরিবেশে যে-ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসনে কোন টুকরো খবরই আজকাল আর অবহেলার বস্তু নয়। ধন্য রাজনীতি, ধন্য তোমার নির্লজ্জতা।

—সমীর দাশগুপ্ত

চৌদ্দ

দেখতে দেখতে দেওয়ালী পেরিয়ে শীত পড়ে গেল। শীতের এই শুরু এখানে অত্যন্ত মনোরম। আর্দ্রতার লেশমাত্র কোথাও নেই; আকাশ জুড়ে নীলের আভা, বাতাস শুকনো, সারারাত হিম আর শিশির ঝরে তৃণলতা বৃক্ষ যেটুকু সিক্ত হয় সকালের উজ্জ্বল রোদে তা শুকিয়ে গেলে সতেজ পরিচ্ছন্ন এক সবুজের দীপ্তি ফুটে ওঠে। এখনও উত্তরের বাতাস তেমন করে হানা দেয় নি, তবু শীতের দমকা এলোমেলো বাতাস বনের দিক থেকে মাঝে মাঝে ছুটে আসে, এসে শনশন শব্দ তুলে গাছ লতাপাতা বিশৃঙ্খল ও শিহরিত করে চলে যায়। গুরুডিয়ার শালবন এতদিন যেন ঘুমিয়ে ছিল, সাড়াশব্দ পাওয়া যেত না। এখন প্রায় রোজই সকালে দু-চারটে বয়েলগাড়ি কাঁচা পথ উঁচু-নীচু মাঠ দিয়ে শালের জঙ্গলে চলে যায়, চাকার নিরবচ্ছিন্ন চিকন শব্দের সঙ্গে বয়েলের গলায় ঘণ্টা বাজে ঠুং ঠুং, তারপর সারা দুপুর বাতাসে কাঠুরেদের কাঠ কাটার শব্দ; কখনও কখনও সেই শব্দ স্তব্ধ দুপুরে অন্ধ আশ্রমেও ভেসে আসে। বিকেল পড়ে আসার আগে আগেই গাড়িগুলো ফিরে যায়। দু-তিন দিন ধরে ওরা শুধু গাছ কাটে, তারপর একদিন গাড়ি বোঝাই করে ফেরে। লুটোনো শালের শাখা-প্রশাখায় পাতায় পথের ধুলো ওড়ে অল্প, মাটিতে আঁচড় লেগে থাকে।

বিকেল যেন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়, গাঢ় রোদ ফিকে হয়ে আসার আগেই কেমন এক অবসন্ন ভাব। নরম আলো গায়ে মেখে পাখিরা বনের দিক থেকে ফিরতে শুরু করে, ছায়া জমতে থাকে আড়ালে; আমলকির চারা, আতাগাছের ঝোপ ঘিরে জঙ্গলা ফড়িং, দু-চারটি প্রজাপতি তখনও বুঝি নাচানাচি করে; তারপর শীতের দমকা বাতাস এসে গাছ লতাপাতা কাঁপিয়ে সরসর শব্দ তুলে বয়ে গেলে মাঠ থেকে, গাছগাছালি থেকে শেষ আলোটুকু পালিয়ে যায়, অন্ধ-আশ্রমের সবজিবাগানের গন্ধ ভেসে আসে, সারের গন্ধ, মাটির গন্ধ এবং শীতের গন্ধ। গোধূলিটুকুও ফুটতে পারে না, ছায়া এবং অন্ধকার এসে সমস্ত কিছু ঢেকে ফেলে।

শীতের শুরুতেই অন্ধআশ্রমের নতুন কয়েকটা কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটা নতুন কুয়ো খোঁড়ানো হচ্ছিল, কুয়ো খোঁড়ানো শেষ হলে সেটা বাঁধানো হল। নতুন একটা চালা তৈরী হচ্ছে একপাশে, আর-একটা তাঁত ঘর বসবে। রাঁচি থেকে তাঁত আসছে। সুরেশ্বর আর শিবনন্দনজী মিস্ত্রী মজুর, ইট কাঠ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত।

হৈমন্তীর এ-সব বিষয়ে কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়ালে অনেকটা তফাতে আশ্রমের এই নতুন কাজগুলি দেখা যায়; হৈমন্তী দেখেছে অবশ্য, কিন্তু কোনো রকম উৎসাহ অনুভব করে নি। বরং কৌতুক অনুভব করেছে কেমন, মালিনীকে বলেছে, 'তাঁতের কাজটা তুমিও শিখে নিও, মালিনী।'

মালিনী বুঝতে পারত হেমদি তাকে ঠাট্টা করছে। তার মনে হত, হেমদি আজকাল অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

অবনী চোখে খুব একটা ভুল দেখি নি। কলকাতা যাবার আগে হৈমন্তী যা ছিল কলকাতা থেকে ফিরে ঠিক সে-রকম ছিল না। তার কোথাও যেন কিছু হয়েছিল। সেটা কি—তা স্পষ্ট করে বোঝা যেত না। তবে হৈমন্তীর ব্যবহারের মধ্যে এই পরিবর্তনটা লক্ষ করা যেত। স্বভাবে সে প্রগলভা ছিল না, এখনও তার আচরণে বা কথাবার্তায় আতিশয্য ও চটুলতা নেই, তার সেই গাম্ভীর্য অটুট ছিল, নিজের কর্তব্য সম্পর্কে তার অবহেলা বা উদাসীনতাও দেখা যায় নি। তবু হৈমন্তী কোথাও যেন একটু বদলে গিয়েছিল। মালিনী যেন স্পষ্ট দেখত, হেমদি একটু অন্য রকম হয়ে গেছে। এতে তার সুবিধে বই অসুবিধে হয় নি। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের একটা আড়াল আগে ছিল, মালিনী কখনও সেই বেড়া টপকাতে সাহস করে নি। এখন তার মনে হয়, সে সাহস তার হয়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করলে সে বেড়া টপকাতে পারে। হয়ত হেমদি পছন্দ করবে না, কিন্তু কিছু বলবেও না।

আগের চেয়ে হেমদিকে এখন ভালই লাগছিল মালিনীর। আগে যেসব কথাবার্তা না বুঝে বলতে গিয়ে সে হেমদির কাছে চোখের ধমক খেয়েছে বা যেসব তুচ্ছ কথা

ভাল লাগে বলে বলতে এসে হেমদির তরফ থেকে কোনো সাড়া পায় নি—এখন ভুল করে সেসব কথা বলে ফেললেও হেমদি দু-চারটে কথা বলে বা হাসে। মালিনী কোথাও যেন খানিকটা প্রশ্রয় পাচ্ছিল।

সেদিন হৈমন্তীর ঘরে বসে মালিনী নাটক শুনছিল। বাইরে দেখতে দেখতে বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। বিছানায় আধ শোওয়া হয়ে হৈমন্তী ইংরেজী গল্পের বই পড়ছিল, মাথার কাছে সুন্দর একটা শেড্ দেওয়া বাতি জ্বলছে। হৈমন্তী এবার কলকাতা থেকে এটা এনেছে, লণ্ঠনের সেই মেটেমেটে আলোতে ঘরটা এরকম দেখাত না, কাচের সাদা শেড পরানো এই নতুন বাতিতে অনেক সুন্দর পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

মালিনী রেডিয়োর সামনে ছোট একটি টুলে বসে। কোলে পশম, হাতে কাঁটা। নাটক শুনতে শুনতে তার পশম বোনা থেমে গিয়েছিল। হৈমন্তী তাকে কলকাতা থেকে উল এনে দিয়েছে, মালিনী বলে নি, নিজেই এনেছে হৈমন্তী, এনে নিজের হাতে নতুন একটা বোনা শিখিয়ে দিয়ে বলেছে, "শীতের আগে শেষ করে ফেল। গায়ে দেবে।"

বোনা প্রায় শেষ, এতদিনে শেষ হয়েও যেত, কোথায় একটা গোলমাল হয়ে যাওয়ায় অনেকটা খুলে ফেলতে হয়েছিল, আবার বুনতে হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

নাটক যখন হচ্ছিল হৈমন্তী মাঝে মাঝে বই বন্ধ করে শুনছিল, আবার পড়ছিল। নাটক শেষ হয়ে যাবার মুখে বইটা বন্ধ করে বালিশের পাশে রেখে হৈমন্তী সোজা হয়ে বসল। তার পা ছড়ানো, হাঁটু গুটোনো, পিঠ সামান্য নোয়ানো, দুটি হাত দু পাশ থেকে হাঁটুর কাছে এসে আঙুলে আঙুলে জড়ানো। রেডিয়োর দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে শেষটা শুনছিল। মালিনীও শুনছে।

সামান্য পরেই নাটক শেষ হল। মালিনী এতক্ষণ যে নিশ্বাস চেপে রেখেছিল এবার শব্দ করে সেই নিশ্বাস ফেলল, মুখটি কয়েক মুহূর্ত কেমন অন্যমনস্ক দেখাল।

নাটকের পর কি যেন একটা শুরু হয়েছিল, হৈমন্তী রেডিয়ো বন্ধ করে দিতে বলল। মালিনী বন্ধ করে দিল। তাকে রেডিয়ো খুলতে বা বন্ধ করতে বললে মালিনী ছেলেমানুষের মতন এক সুখ পায়। হৈমন্তীর কাছে দেখে দেখে এ দুটো জিনিস সে শিখেছে।

হৈমন্তী ছোট করে হাই তুলল, তুলে আলস্য ভেঙে বিছানা থেকে নামল। তার গায়ে মেরেলী, সাধারণ একটা শাল জড়ানো, শালের রঙটি ঘন কালো। গায়ের সাদা শাড়ির ওপর কালোটি আরও প্রখর হয়ে ফুটেছিল। হৈমন্তী আজ চুল বাঁধে নি, এলো করে ঘাড়ের কাছে জড়িয়ে রেখেছিল।

মালিনী কি যেন বলব বলব করছিল, কিন্তু চটিটা পায়ে গলিয়ে টর্চটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে হেমদি কলঘরে যাচ্ছে বলে এখন কিছু বলল না।

একটু পরেই হৈমন্তী ফিরে এল। ফিরে এসে বলল, "বাইরে বেশ শীত পড়েছে।"

মালিনী মাথা নাড়ল, যেন সে জানে বাইরে বেশ শীত পড়েছে।

হৈমন্তী আবার বিছানায় উঠে বসল।

মালিনী বলল, "শেষটায় যে কী ছাই হল বুঝলাম না।"

হৈমন্তী কথার জবাব না দিয়ে বালিশের ওপর থেকে বইটা আবার তুলে নিল।

মালিনী হৈমন্তীর জবাবের প্রত্যাশায়

থেকে শেষে বলল, "লোকটা কি পালিয়ে গেল?"

"পালিয়ে যাবে কেন. মরে গেল. গাড়ি চাপা পড়ে..."

"ও!...কী জানি. আমি ভাবলাম পালিয়ে গেল।"

"তুমি ওই রকমই ভাব।"

মালিনী অপ্রস্তুত হল না, লজ্জাও পেল না। বরং হেসে বলল, "অত গাড়ির শব্দ চেঁচামেচিতে কি কিছু বোঝা যায়! তার ওপর খালি ইংরিজী বলছে।"

হৈমন্তী বইয়ের পাতা হারিয়ে ফেলেছিল. খুঁজতে লাগল।

কথা বলার লোক সামনে থাকলে মালিনী বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। বলল, "হেমদি, আমি এই রকম একজনের কথা জানি।"

হৈমন্তী তার হারানো পাতা খুঁজে পেল। রহস্যটা এখনও মাঝামাঝি অবস্থায়। শ্রোতার মনোযোগের ওপর মালিনীর লক্ষ ছিল না, সে ঘটনাটা বলতে লাগল। 'অনেক দিন আগে. বুঝলেন হেমদি, আমরা তখন ছোট, এদিকে এত বাড়িটাড়িও হয় নি; তখনও লোকে পুজোর পর শীতের দিকে এখানে শরীর সারাতে আসত। একবার একজনরা এল—স্বামী স্ত্রী। দুজনেই দেখতে বেশ সুন্দর। খুব ঘুরত বেড়াত, হাটবাজার করত. কলের গান বাজাত; বউটা কত রকম করে যে সাজত! ওরা বলত শরীর সারাতে এসেছে। বেশ ছিল দুটিতে। হঠাৎ একদিন হই হই. ওদের বাড়ির সামনে কী ভিড়. পুলিসটুলিস পর্যন্ত এসে পড়ল। ওমা, শেষে শুনলাম, ওই বউটা অন্য লোকের বউ, তার সঙ্গে চলে এসেছে; যার বউ সে খোঁজ পেয়ে হঠাৎ এসে হাজির। বাব্বা, সে কী কাণ্ড!"

হৈমন্তী বইয়ের পাতা থেকে চোখ ওঠাল. মালিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তার সঙ্গে এর কি?"

"একই তো—", মালিনী অবাক হয়ে বলল, "এও তো অন্য লোকের বউকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার ফন্দি আঁটছিল।"

হৈমন্তী বিরক্ত বোধ করলেও না হেসে পারল না। বলল, "তুমি কিছু বুঝতে পার না। ভুলিয়ে নিয়ে যাবার ফন্দি কেউ আঁটে নি।"

"বারে. অতবার করে বলছিল।"

"বলে নি, লোকটা ভাবছিল। মনে মনে যা ভাবছে তা আমরা জানব কি করে. তাই মুখে বলছিল, ওটা ওর মনের ভাবনা।"

মালিনী এবার যেন বুঝতে পারল, যদিও তাতে তার লাভ কিছু হল না। বলল, সেই ভাবুক আর যাই করুক লোকটা খারাপ।"

হৈমন্তী কৌতুক অনুভব করল। "খারাপ না সে কিছু করে নি।"

"খারাপ ...

করে তাকাল. তারপর বলল, "সব জেনে-শুনে একজনের বউকে ঠকাচ্ছে, খারাপ নয়?"

হৈমন্তী বুঝতে পারল মালিনীকে এই বিষয়টা তার পক্ষে বোঝান মুশকিল। অনেক বকবক করতে হবে। বললেও মালিনী যে বুঝবে তা নয়। কতক সাদামাটা সরল ধারণা ও সংস্কার নিয়ে সে মানুষ হয়েছে. তাকে এত সহজে ভাল-মন্দের জটিলতা বোঝানো যাবে না। হৈমন্তী সে-চেষ্টা করল না. শুধু হেসে বলল, "তুমি এসব বুঝবে না। নাও, চুপ কর। বইটা শেষ করি।"

মালিনী চুপ করল। হৈমন্তী আবার বইয়ের পাতায় চোখ নামাল।

কয়েকটা লাইন পড়ল হৈমন্তী, কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও অস্বস্তি বোধ করছিল; যেন তার কিছু বলা উচিত ছিল মালিনীকে, সে বলে নি। বার বার এই উচিত বোধটা তাকে পীড়ন করছিল। হৈমন্তী অন্যমনস্ক হল, কি ভাবল সামান্য, আবার বইয়ের পাতায় মন বসাবার চেষ্টা করল। পারল না। কোথায় যেন খুঁত খুঁত করছিল। বইয়ের পাতায় আঙুল রেখে মুখ তুলে হৈমন্তী প্রথমে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর মুখ ফিরিয়ে মালিনীকে দেখল। সে যা বলতে চায় তা মালিনীর কাছে বলতে বা আলোচনা করতে তার মর্যাদায় বাধছিল। মুখে আটকাচ্ছিল। আসলে নাটকের দ্বন্দ্বটা ভালবাসার। লোভ দুর্বলতা সত্ত্বেও বা ভালবাসাই।

মালিনী পশম-বোনা থেকে মুখ ওঠাতেই হৈমন্তীর সঙ্গে চোখাচুখি হল। হেমদি তার দিকে তাকিয়ে কি দেখছে বুঝতে না পেরে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

হৈমন্তী কেমন বিব্রত হল। চোখ সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হল না; বরং নিজের বিব্রত ভাবটা যাতে মালিনী ধরতে না পারে, জোর করে মুখে সামান্য হাসি টেনে হৈমন্তী কিছু চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, "তুমি আর ক'দিন লাগাবে ওটা শেষ করতে?"

মালিনী পশমের বোনাটা তুলে দেখাল। "হয়ে গেছে, গলার কাছটায় একটু বাকি। হাতও সেরে ফেলেছি।"

"শীতে পরতে পারলে হয়!"

মালিনী এমন মুখ করে হাসল যেন মনে হল, হেমদি যে কি বলে! কতটুকু আর বাকি, দু তিন দিনের মধ্যেই সব হয়ে যাবে। মালিনী কি ভেবে বলল, "একটা কথা বলব, হেমদি?"

"না করলে কি তুমি বলবে না?" হৈমন্তী কৌতুক করে বলল।

"এটা শেষ হয়ে প্রথমে আপনি পরবেন।"

"আমি ?"
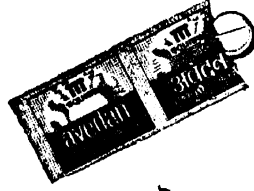
"পরবেন এক বেলা।...আমার খুব ভাল লাগবে।"

"তুমি পরলে যে আমার আরও ভাল লাগবে।"

"তা তো লাগবেই। আপনি আমার জন্যে এনেছেন।...আপনি একটু গায়ে দিলে আমার খুব আনন্দ হবে, হেমদি। আমি তো আপনাকে কখনও কিছু দিতে পারব না।"

হৈমন্তী দুর্বলতা অনুভব করছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল। "তুমি আজকাল বড় কথা বলতে শিখেছ।"

মালিনীর চোখ দুটি স্নিগ্ধ সরল অথচ কত যেন কৃতজ্ঞের মতন দেখাল। মালিনী বলল, "আমি কিছুই বলি না, হেমদি। আপনি রাগ করবেন ভেবে কিছু বলি না। কত কথা বলতে ইচ্ছে করে।...একটা কথা বলব ?"

"বলো।"

"এবারে কলকাতা থেকে এসে আপনি কেমন একটু হয়ে গেছেন।"

"কেমন ?" হৈমন্তী মুখ টিপে হাসল।

"আগে আমার মনে হত আপনি আমাদের এখানে বেশী দিন থাকবেন না, চলে যাবেন। এখন মনে হয় আপনি থাকবেন।"

হৈমন্তী বুঝতে পারল না মালিনীর এ ধারণা কি করে হল। এমনকি সে স্পষ্ট বুঝতে পারল না, মালিনীর আগের কথার সংগে পরের কথায় সম্পর্ক কি।

হৈমন্তী বলল, "কলকাতা থেকে এসে আমি কি হয়েছি তাই বলো।"

মালিনী যেন কি বলবে বুঝতে পারল না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একমুখ হাসি নিয়ে বলল, "আপনি আরও ভাল হয়েছেন।...আগে আপনাকে আমার ভয় ভয় করত, এখন তেমন করে না।"

হৈমন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল, "কেন ?"

"বা রে, আপনি যে আমাদের—আমাকে ভালবাসেন।"

হৈমন্তী মালিনীর চোখের দিকে তাকাল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে হৈমন্তী ভাবছিল : ভাবছিল কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর সকলেই তার পরিবর্তন দেখছে। এই পরিবর্তন যে স্পষ্ট কি তা তারা জানে না, হৈমন্তী জানে। এই পরিবর্তনের অনেকটা তার ইচ্ছাকৃত, কখনও কখনও জোর করে সে কিছু প্রমাণ করতে চায়। হয়ত দেওয়ালীর সময় গগন এলে হৈমন্তীকে আরও কিছু করতে হত, তাতে ইতরবিশেষ তারতম্য কি ঘটত সে জানে না। দেওয়ালীর সময় গগন আসতে পারল না। মার শরীর খারাপ হয়েছিল, জ্বরজ্বালা; মামার শরীরও ইদানীং তেমন ভাল যায় না। দুজনেরই বয়স হয়ে গেছে, দুশ্চিন্তা উদ্বেগ এমনিতেই থাকে, অসুখবিসুখ করলে ভাবনা বাড়ে। গগন আসতে পারে নি। লিখেছে কুসমাসের সময় আসবে। সেই সময়টা আরও ভাল হবে বেড়াবার পক্ষে।

গগন এখানে ঠিক যে বেড়াতেই আসছে তা নয়। মার তরফ থেকে সে কিছু বোঝা-পড়া সারতে আসছে সুরেশ্বরের সংগে। এই বোঝাপড়া যে কি হতে পারে হৈমন্তী তা অনুমান করতে পারে। কিন্তু মাকে সে এসব কথা বলতে চায় নি, বলে নি। বলে লাভ হত না। মা ভাবত, হেম বরাবর যা করেছে—এখনও তাই করতে চাইছে, নিজের ভালমন্দ, সংসারের উদ্বেগ দুশ্চিন্তার কথা না ভেবে নিজের জেদ আর ঝোঁক নিয়ে পড়ে আছে।

তা কিন্তু নয়। হৈমন্তী বরাবর জেদ ধরে কিছু করে নি। আজ সাত আট কি তারও বেশী—এতগুলো বছর জেদ ধরে বসে থাকা যায় না। জেদের কথা এটা নয়; সুরেশ্বরকে সুখী করার সব রকম চেষ্টা বরং। সুরেশ্বরের সাধ পূরণ করতে, তাকে তৃপ্ত করতে, তার প্রতি হেমের ভালবাসার জন্যে যা করার সে করেছে। তার অপেক্ষা যদি অকারণ হত অর্থহীন হত তবে সে এই অপেক্ষা করতে পারত না।

গুরুডিয়ায় এসে হৈমন্তী বুঝতে পেরেছে সুরেশ্বর তাকে অকারণে অপেক্ষা করিয়েছে। সুরেশ্বর এখন পূর্বের দুর্বলতা থেকে মুক্ত। কিন্তু সে দুর্বলতা না থাকলে সুরেশ্বর কোন অধিকারে তাকে এখানে টেনে আনল ?

কলকাতায় গিয়ে হৈমন্তী তার মন স্থির করে ফেলেছিল। সুরেশ্বরের আশ্রম সে এখনই ছেড়ে আসবে না। মা বা মামার কাছে সে দেখাতে চায় না, হৈমন্তীর এতদিনের বিশ্বাস ও প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। তা ছাড়া সুরেশ্বরের সংগে তার মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে হেরে যেতে চায় না। সে উপকৃত এবং কৃতজ্ঞ শুধুমাত্র এই বোধেই সে সুরেশ্বরকে কিছু প্রাপ্য ফিরিয়ে দিচ্ছে এ যেন সুরেশ্বর অনুভব করতে পারে।

হৈমন্তী মনে মনে ভেবে নিয়েছিল : তার এই দীর্ঘ অপেক্ষা, বিশ্বাস ও ভালবাসার মূল্য যেমন সুরেশ্বরের কাছে নেই, তেমনই সুরেশ্বরের অন্ধসেবার কোনো মূল্য তার কাছে থাকতে পারে না। এই সেবা, দয়া, ধর্ম, পুণ্য—যাই হোক, তার জন্যে সুরেশ্বরের যত দুর্বলতাই থাক হৈমন্তীর থাকবে না। সুরেশ্বরের এই অতীব দুর্বলস্থানে হৈমন্তীর পরম অবহেলা ও উপেক্ষা থাকবে।

গুরুডিয়ায় ফিরে এসে হৈমন্তী তার বিমর্ষ ভাব আর প্রকাশ করছে না। যেন তার বিমর্ষতার কোনো কারণ থাকতে পারে না। সে নিস্পৃহ, আশ্রম তার কিছু নয়, তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই আশ্রমে, রুগী এলে দেখবে, তার কাজ হাসপাতালেই শেষ, তার বাইরে নয়—এই মনোভাবে তার ভাল লাগছিল। নিজের নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে ডুবে থাকবে না, হয়ত হৈমন্তী তাও স্থির করে নিয়েছিল। একটি দুটি নিজস্ব সংগীও তার প্রয়োজন।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিজ্ঞান

আর্কাইটাসের পায়রা থেকে ''অ্যাপোলো''

আজ থেকে তেইশ শো বছর আগে ইতালীতে টারেণ্টাম নামে এক শহর ছিল। শহরটি আজও আছে শুধু তার নাম বদলে হয়েছে টারাণ্টো। সেখানে একদিন বহু দর্শকের সামনে সুতোয় ঝোলানো এক কাঠের পায়রা ডানার ঝাপ্টা না মেরে উড়তে থাকে। লোকে সেই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যায়। পায়রাটি যেদিকে উড়ছিল তার উল্টো দিকে ধোঁয়া ছাড়ছিল শোঁ শোঁ আওয়াজ করে। তার সৃষ্টিকর্তা আর্কাইটাস ছিলেন সে যুগের একজন স্বনামধন্য গণিতশাস্ত্রী, আবিষ্কর্তা, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা। তিনি ছিলেন গ্রীক্। যতদূর জানা যায় যে তাঁর পায়রার পরিচালিকা শক্তি ছিল বাষ্প; হাউই-এর মত পায়রার পিছন দিক থেকে ফিনকি দিয়ে বাষ্প বার করে সেই ধাক্কায় সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। লিখিত ইতিহাসে বোধ হয় জেট-কৌশল ব্যবহারের এর চেয়ে পুরানো কোনো দৃষ্টান্তের উল্লেখ নেই। আজ ২৩০০ বছর পরে মানুষ সেই জেট কৌশলকে এমন এক উন্নতির শিখরে উন্নীত করেছে—যা তাকে কয়েক বছরের মধ্যে গ্রহ-গ্রহান্তরে পেঁৗছে দেবে। এরই মধ্যে মানুষের যান্ত্রিক স্কাউটরা চাঁদ, মঙ্গল, শুক্র এমন কি সূর্যের আশ-পাশের লড়াই-এর ময়দানে উঁকি দিচ্ছে। রাশিয়ার লুনা উপগ্রহগুলির সাফল্যের পরেই আমেরিকার চন্দ্র-প্রদক্ষিণকারী মহাকাশযান হালে চাঁদের খুব কাছ থেকে বহু ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে চাঁদ ষোল আনা গোল নয়। ন্যাস্পাতির মত দেখতে (পৃথিবীর উল্টো)। এর আগে চাঁদের এত কাছ দিয়ে আর কোন স্পুৎনিক চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে নি। রাশিয়ার লুনা-১১ এবং লুনা-১০ চাঁদের প্রায় ১০০ মাইল দূরে দিয়ে ঘোরে। সেক্ষেত্রে মার্কিন মহাকাশযানটির কক্ষপথ ছিল চাঁদ থেকে মাত্র ৩১ মাইল দূরে যাতে চাঁদের মহাকর্ষ এড়িয়ে খুব কাছ থেকে ছবি তোলা যায়। ফলে সেটি তিন-তলা বাড়ির আয়তনের সমান জিনিসের পরিষ্কার ছবি তুলতে পেরেছে যেক্ষেত্রে চাঁদে যেসব জিনিস ১ কিলোমিটারের চেয়ে ছোট সেগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও দেখতে পাওয়া যায় না।

এর পর পৃথিবীর প্রথম যাত্রীরা যখন চাঁদের ভূমিস্পর্শ করবেন তখন তাঁরা কি দেখবেন? তাঁদের প্রোগ্রামটাই বা হবে কেমন?

যে চাঁদ নিয়ে আমাদের এত কবিকল্পনা
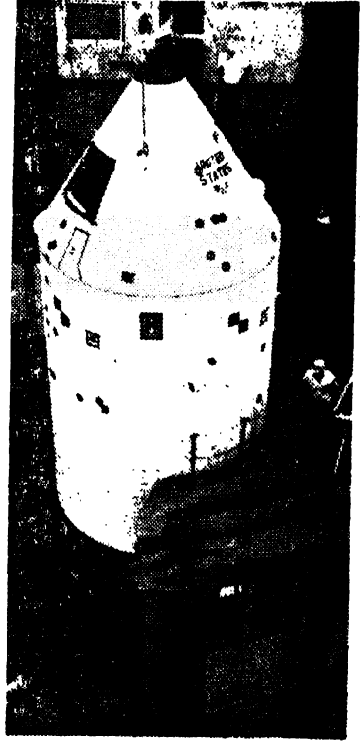
অ্যাপোলো মহাকাশযান

সেই চাঁদের প্রকৃতি কিন্তু অত্যন্ত তিরিক্ষে। পৃথিবীর রাজ্যের তুলনায় তার রাজ্য অনেক ছোট—মোটে ১/৪ ভাগ। তার না আছে জল বা মেঘ হাওয়া ঝড়-ঝাপ্টা। কাজে কাজেই গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি কেউই তার দিক মাড়ায়নি কোনদিন। চাঁদের প্রচণ্ড গরম দিন আর বরফের চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা রাত-গুলো যেন শেষ হতে চায় না—দিনের মেয়াদ পৃথিবীর এক পক্ষের সমান, রাতেরও তাই। দুপুরে যা গরম তাতে জল ফুটে যাবে; রাত্রে যা ঠাণ্ডা তাতে উপযুক্ত পোশাক না থাকলে মানুষ ঠাণ্ডায় মরে কাঠ হয়ে থাকবে।

চাঁদের এ হেন নির্মম দুনিয়া জয় করার অভিলাষে যে দুটি দেশ অগাধ অর্থব্যয় করে যাচ্ছে সে দুটি হচ্ছে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েতে কত টাকা খরচ হচ্ছে বা কত লোক চন্দ্র বিজয় প্রকল্পে কাজ করছে তা জানি না। আমেরিকার বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ২০০০ কোটি ডলার এবং তিন লক্ষাধিক কর্মী ঐ প্রকল্পে নিযুক্ত। কেন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ও লোকবলের ব্যবহার? অন্যান্য উদ্দেশ্য বাদ দিয়েও বলা যায় যে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন চাঁদকে সৌর জগতের প্রকৃতি ও উৎপত্তি রহস্য অনুশীলনের এক

সোভিয়েত মহাকাশ যানের ভিতরের দৃশ্য

লেবরেটরীতে রূপান্তরিত করা যাবে এবং অন্য গ্রহে যাত্রার পথে স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

চাঁদের বায়ুশূন্য পরিবেশে চলা-ফেরার মহড়া চলেছে আজ মহাশূন্যে যা আরম্ভ করেছিলেন লিওনফ। হালে কম্যাণ্ডার গর্ডন ৪০ মিনিট মহাশূন্যে পদচারণা করে অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করেন। চাঁদে গিয়ে সেরকম ব্যাপার যাতে না ঘটে সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে চাঁদে পাঠানো চলবে না।

কোনো যাত্রী যখন চাঁদের রাজ্যে পৌঁছাবেন তাঁর ওজন কমে যাবে অনেক। পৃথিবীতে তাঁর ওজন যদি ১০০ পাউণ্ড হয়, চাঁদের মহাকর্ষ পৃথিবীর মহাকর্ষের ১/৬ অংশ বলে চাঁদে তাঁর ওজন দাঁড়াবে মাত্র ৩০ পাউণ্ড। পৃথিবীতে মানুষ সাধারণত হাঁটবার সময় মিনিটে ১০০ বার পা ফেলতে পারে কিন্তু চাঁদে পারবে ২০ বারের মত। হাল্কা শরীরের জন্য সেখানে বোধ হয় ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে চলাটাই বেশি সহজ হবে।

আমেরিকা থেকে প্রথম যাঁরা চাঁদে যাবেন তাঁরা চাঁদের ভূমিকম্প, সেখানকার সৌর-বাত্যা আয়নোস্ফিয়ার, চৌম্বক ক্ষেত্র ও চাঁদের ভিতর থেকে বাইরে তাপ প্রবাহের মাত্রা পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

চাঁদকে মহাজাগতিক মানমন্দির বা লেবরেটরী হিসাবে ব্যবহার করার সুবিধা অনেক বেশী। একটি ২০০ ইঞ্চ দূরবীনের (যেমন আমেরিকার পালোমার মানমন্দির) সাহায্যে পৃথিবী থেকে যা দেখা যাবে চাঁদ থেকে ৪০ ইঞ্চ দূরবীনে তাই দেখা যাবে। চাঁদের আকাশের কালো রং, সেখানে আবহমণ্ডলের বাধা দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয় না বলে এই সুবিধা।

চাঁদের যে পিঠ আমরা দেখতে পাই না সেখানে যদি রেডিও-দূরবীন বসানো যায় তা হলে মহাজগতের সবদিক থেকে রেডিও-বার্তা শুনতে পাওয়া যাবে। কোন রকম গণ্ডগোল বা বাধা সেই বার্তা বিকৃত করতে পারবে না। চাঁদের মহাকর্ষের জোর কম বলে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বড় দূরবীন সেখানে বসানো সম্ভব হবে। অন্য কোন জগত থেকে যদি বুদ্ধিমান জীবের বার্তা আসে তাও চাঁদের শান্ত পরিবেশে সেই দূরবীনে ধরা পড়বে।

চাঁদে আবহমণ্ডল নেই এবং মহাকর্ষ দুর্বল বলে সেখান থেকে গ্রহ গ্রহান্তরে রকেটের সাহায্যে মহাকাশযান পাঠানো অনেক সহজ হবে। পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে একটি রকেট ছুঁড়ে দিতে হলে তার বেগ হাওয়া চাই ঘণ্টায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। চাঁদের ক্ষেত্রে সেই বেগ মাত্র ৮ হাজার কিলোমিটার। তা ছাড়া চাঁদে আবহমণ্ডল নেই বলে সেখানে ঠিক পৃথিবীর বিমানবন্দরে হাওয়াই জাহাজগুলি যেমন 'রান্‌ওয়ে' দিয়ে ছুটে আকাশে ওঠে তেমনি রকেটগুলিও রান্‌ওয়ে ব্যবহার করতে পারবে। পৃথিবীতে সেটা সম্ভব নয় এই জন্য যে, ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে ছুটবার সময় আবহমণ্ডলের ঘর্ষণে রকেটটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এই রকম আরো বহু সুযোগ-সুবিধা চাঁদে পাওয়া যাবে।

আমেরিকার চাঁদে অভিযানের ঘাটি তৈরি হয়েছে মেরিট দ্বীপে যা ক্যানাভেরাল উপ-দ্বীপের খুব কাছে। ক্যানাভেরাল এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা। স্প্যানিশ রাজত্বের সময় এই নামকরণ। শব্দটির মানে বেত্রকুঞ্জ। তার সাড়ে তিনশো বছর পরে প্রখ্যাত ফরাসী লেখক জুল্‌স ভার্নে তাঁর কল্পিত "চন্দ্রলোকে যাত্রার" ঘাটি হিসাবে এই ক্যানাভেরালকেই বেছে নেন। ক্যানাভেরাল (বর্তমানে কেনেডী) উপ-দ্বীপ আর মেরিট দ্বীপের মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে ব্যানানা নদী। পশ্চিমে ফ্লোরিডা। মাথার উপর মানুষের আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে চাঁদ।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

একটি 'হতে পারত' অতি মূল্যবান সংবাদ-চিত্র গ্রহণে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়ে অবশেষে এই ছবিটি তুলতে পেরে অনেকখানি সান্ত্বনা পেয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু আজ এই ছবির সঙ্গে জড়িত কাহিনীটুকু স্মরণ করলে খুঁজে পাই না সেই সান্ত্বনা। বরং দেখেছি নিজের ব্যর্থতার কথাই মনে পড়ে বেশী।

নেহরু ১৯৫২ সালে মার্চ মাসে শান্তি-নিকেতনে এসেছেন। বিশ্বভারতীর আচার্য হিসেবে এইটিই তাঁর প্রথম পরিদর্শন। সেদিন শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে পৌষ-উৎসবের মেলা ছিল না বটে, কিন্তু পরি-বেশের ভিতর ছিল এক স্নিগ্ধ মধুর রূপ। সর্বজনপ্রিয় এই অতিথিকে অন্তরের শ্রদ্ধা আর সমাদর জানাতে সর্বত্রই ছিল প্রাণের সাড়া।

নেহরু পরিদর্শন করে যাচ্ছেন একটির পর একটি 'ভবন'। এলেন কলাভবনে, সঙ্গে উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ। উনি কলাভবনের ঘরে ঘরে নানা বিভাগের কাজকর্ম দেখিয়ে যাচ্ছেন আচার্যকে। আমি ওখানে গিয়েছি ছবি তুলতে, কিন্তু মনোমত পরিবেশ না পেয়ে পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু। আমার বন্ধু বীরেন সিংহ বোধ হয় দু একটা ছবি তুলেছে। কিন্তু আমি শুধু আশায় আছি নন্দবাবু কখন আসবেন। তখনই ছবি তুলবো—নেহরু আর নন্দবাবুর একসঙ্গে। নাহলে যাঁর হাতের স্পর্শে এই কলাভবনের প্রতিটি ঘর রঙীন চিত্র-সম্পদে উদ্ভাসিত, সেই শিল্পাচার্য নন্দলালের অনুপস্থিতিতে ছবি তুললে সে ছবিতে মর্যাদার ছাপ থাকবে না বলে মনে করেছিলাম।

ইতিমধ্যে অনিল চন্দ মশাই নন্দবাবুকে নিয়ে এলেন ওদিকের একটা ঘর থেকে। কিন্তু নন্দবাবু বেশী এগিয়ে যেতে নারাজ বলে মনে হল। তাই অনিলবাবু পিছন থেকেই রথীন্দ্রনাথকে ডাকলেন—রথীবাবু, রথীবাবু—মাসটার মশাই এসেছেন। নেহরুর সঙ্গে কথা বলছিলেন রথীন্দ্রনাথ, অনিল-বাবুর ডাকে পিছন ফিরে তাকালেন। নেহরু তখন নন্দবাবুকে দেখতে পেয়েই আনন্দে ছুটে এলেন দুটি হাত বাড়িয়ে। এসেই জড়িয়ে ধরলেন, তারপর দুটি হাত ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলতে লাগলেন—আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আপনার শরীর কেমন আছে, বাড়িতে সব ভাল তো—এ জাতীয় নানা প্রশ্ন করে নেহরু অতি বিনয়ে মুখটা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নন্দবাবুও তেমনি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন নেহরুর হাত ধরে। মুখ তুলে তাকাচ্ছেন না কেউ। নেহরুর এত কথার পর নন্দবাবু শুধু একটি কথা জানতে চাইলেন—ইন্দু আসেনি বুঝি?

নেহরু এবার চোখ তুলে নন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—না, ও আমার সঙ্গে নানা স্থান ঘুরে ঘুরে একটু পরিশ্রান্ত বোধ করছিল। আমিই ওকে আনি নি, বলে এসেছি বিশ্রাম নিতে।

আর কোন কথা ছিল না। দুজনেরই কথা বোধ করি চাপা পড়ে গিয়েছিল আনন্দের মুহূর্তে। কিন্তু এর পরেও তাঁরা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন মুখোমুখি। তেমনি মুখ নীচু করে। তেমনি হাত ধরাধরি করে। তেমনি নীরবে।

আমি দাঁড়িয়ে দেখছি, দুই ভারত-লাল —জওহরলাল ও নন্দলালের এই মধুর মিলন-মুহূর্তকে। মুগ্ধচিত্তে তাকিয়ে আছি সারাক্ষণ, হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে।

এইখানেই আমার একটা মারাত্মক গাফিলতি হল। এ'রা দুজন মুখোমুখি ওই রকমভাবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার চোখের সামনেই। আমার হাতে ক্যামেরা-ফ্ল্যাশ রেডী ছিল। কিন্তু আমি এ'দের সৌন্দর্যময় মিলনের রূপটি দেখতে এত বেশী মগ্ন ছিলাম যে, আমি ভুলেই গিয়ে-ছিলাম ও-রকম একটি বিশেষ মুহূর্তের

ছবি তুলতে। যখন আমার হুঁশ হল, তখন দুজন হাত ছেড়ে দিয়েছেন। ওখান থেকে চলে যাচ্ছেন। উঃ কী ভুল করলাম! দারুণ একটা আফসোস আমার মনকে আঘাত করল।

ভেবেছিলাম নন্দবাবু এর পরেও নেহরুর সংগে থাকবেন, সুতরাং ছবি তোলার সুযোগ পাব। কিন্তু হায়! কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি নন্দবাবু নেই। তিনি আবার কোথায় গিয়ে একা চুপচাপ বসে আছেন কে জানে! নেহরু কলা-ভবন পরিদর্শন করে যখন বাইরে চলে এলেন, তখন আমি নিরুপায় হয়ে অনিলবাবুকে ব্যগ্রভরে বললাম—নন্দবাবুর সংগে নেহরুর ছবি তোলা হল না। অনিলবাবু আপনি দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

অনিলবাবু দৌড়ে বাইরে গিয়ে নেহরুকে জানালেন যে, ফটোগ্রাফাররা নন্দবাবুর সংগে একটা ছবি তুলতে চায়। নেহরু অমনি রাজী হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরে এলেন কলা-ভবনে আবার। এসেই নন্দবাবুর হাতের ভিতর দিয়ে নিজের হাত গলিয়ে এমনভাবে ধরলেন যাতে নন্দবাবু আবার না পালিয়ে যান। তারপরই আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বলো কোথায় দাঁড়াবো আমরা? বন্ধু বীরেন সিংহ দেখিয়ে দিল একটি স্থান। সেখানে গিয়ে খুশী মনে দাঁড়ালেন বিশ্বভারতীর আচার্য সংগে শিল্পাচার্যকে নিয়ে। পিছনে দাঁড়ালেন অনিল চন্দ এবং সুরেন কর। আমাদের ক্যামেরা থেকে দুবার ফ্ল্যাশের আলো পড়ল উজ্জ্বল দুটি রত্নের মুখে। এবার নন্দবাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে হাসিমুখে নেহরু তাকালেন আমাদের দিকে। আমার মন তখন পরিতৃপ্তিতে ভরা।

✻

এ-ছবি সামনে রেখে আজ আনন্দ কতটুকু পাই বুঝতে পারি না। কেবলি মনে হয়, এঁদের সেই সুন্দর মুহূর্তের ছবি তুলতে ব্যর্থ হয়ে এই ছবি দিয়ে যেন সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করছি। সান্ত্বনা হয়ত পাই, কিন্তু শান্তি পাই না। তদুপরি আজকাল এ ছবি দেখলে, আর একটি বিশেষ ব্যথা অনুভব করি। তখন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তাঁদের আত্মার উদ্দেশে।

—নীরোদ রায়

দিল্লির ডায়েরি

ঘুরে বেড়ানোর, দেখে বেড়ানোর মরসুম এল বলে। যদি আপনার রক্তে থেকে থাকে ঐ সংজ্ঞাহীন চাঞ্চল্য, তবে দিল্লিতে একবার আসতেই হবে। উপায় নেই। ধরুন আপনি কোনো রাজ্যের নামকরা মন্ত্রীদের একজন। কিম্বা আপনি ব্যবসায়ী, লাইসেন্স-পারমিট ইত্যাদির উদারককারী; হয়তো আপনি চাকুরিপ্রার্থী, ইউ পি এস সির দরজার দিকে আপনার; হয়তো আপনি ছাত্র। অথবা অপিসের কেরানী, ছুটিতে বেরুবার জন্যে টাকা বাঁচিয়ে রেখেছেন। সবাইকে আসতে হবে।

প্রফেসর, বৈজ্ঞানিক, কোটিপতি, সেলসম্যান, স্পাই, ধর্মগুরু, পরিব্রাজক, ফিল্ম তারকা, রাজনীতিক, ঠগ, স্মাগলার, শিক্ষক - ছাত্র - নেতা, তোষামোদকারী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, যিনিই একটা কিছু হতে চান, কিম্বা হয়ে গেছেন, তাকেই অন্তত একবার আসতেই হবে এই কর্মকেন্দ্রে। তাদের আসতেই হয় সুতরাং তাতে আনন্দ না-থাকারই কথা। তাই বেড়াতে আসুন, যখন হাতে কোনো কাজ থাকবে না, স্রেফ ঘুরে বেড়ানো, ইতালিয়ানরা যাকে বলে "দোলচে ফার নিয়েন্তে" (চমৎকার কিছু-না-করে)।

ভাল সময় অকটোবর নভেম্বর; তারপরেও ভাল ফেবরুয়ারির শেষ অবধি, তবে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে গরম জামা-কাপড় একটু বেশি লাগবে, এই যা। কলকাতার অনেকে মনে করেন যে, শীতকালে দিল্লি এলে (অন্যান্য পশমী জামা ছাড়াও) একটা ওভারকোট না হলে জমে বরফ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা পদে পদে। অত্যন্ত বাজে কথা। শহরে যখন সত্যিই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, তখন আপনাকে রাস্তায় অথবা বাইরে আসার কোনো কারণই থাকবে না।

এই শহরকে কেন্দ্র করে আপনি প্রাণভরে ভ্রমণ করুন। তীর্থ করতে চান তো হারিদ্বার-ঋষিকেশ মোটরে পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা। রেল আছে, বাস আছে। রাস্তা ভাল। এদিকে আম্বালা, চণ্ডিগড়, ভাকরা, সিমলা। যেখানে মন খুশি চলে যান, দিল্লিকে কেন্দ্র করুন কি না-করুন। করাটাই ভাল। তারপর এক-রাতের পথ জয়পুর, আজমীর, পুষ্কর ও সাবিত্রী মন্দির। যদি একটা মাথাগোঁজার জায়গা দিল্লিতে করে নিতে পারেন, তাহলে রাজধানীকে কেন্দ্র করেই ভ্রমণ আরম্ভ করুন, সুবিধে।

সাধারণ বাঙালীর পয়সা খুব বেশি না থাকারই কথা। তাই তাদের প্রথম নজর থাকে কালী বাড়ির দিকে। অল্প খরচায় থাকা খাওয়ার জায়গা। কিন্তু মুস্কিল বেশি দিন ওখানে থাকার উপায় নেই। (বারান্তরে একবার আমাদের কালীবাড়ি নিয়ে লেখার ইচ্ছা রইল। তাদের এখনো 'কালীর উপরই জোর বেশি, বাড়ির উপর নয়।) সস্তা দামের হোটেল আছে বইকি, পুরোনো দিল্লিতে। কিন্তু সস্তার তিন কেন, তেত্তিরিশ অবস্থা হওয়ার খুব
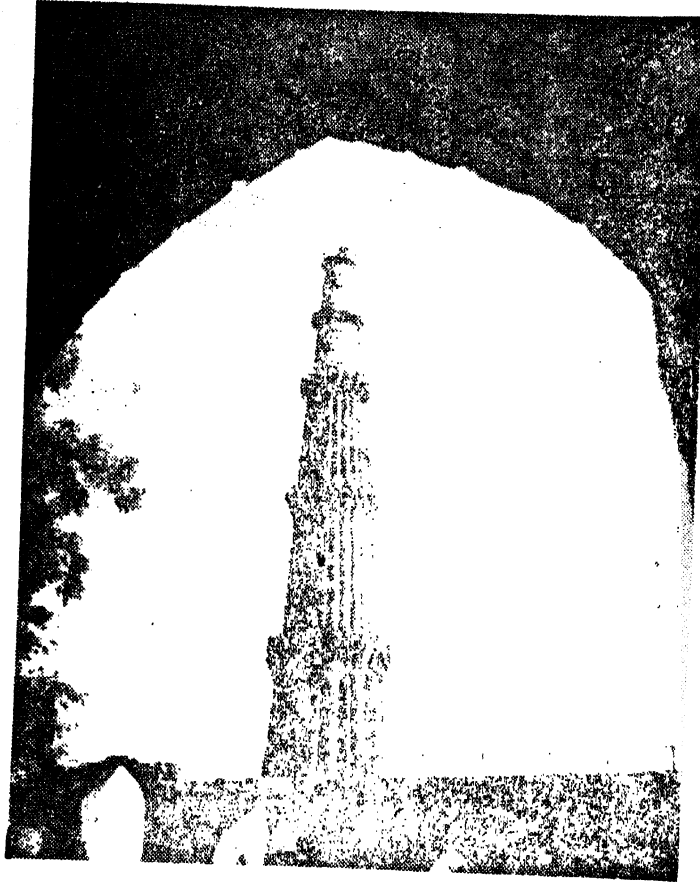
কুতব মিনার

সম্ভাবনা; এবং বাঙালীরা সাধারণত এড়িয়ে যান, যাওয়াও উচিত। একমাত্র আগ্রা হোটেল, বাঙালীর পছন্দসই, কিন্তু বেশ দরে।

তারপর, আবিষ্কার করতে আরম্ভ করুন পুরোনো দিল্লি, নয়াদিল্লি, নবতম দিল্লি, রাতের দিল্লি (মৃত), কূটনৈতিক আর রাজনৈতিক দিল্লি, অথবা ঐতিহাসিক কিম্বা সমাজসেবীর দিল্লি। রাজধানীর অনেক রূপ, আর যে-কোনো একটিকে আবিষ্কার করতেই ছুটি ফুরিয়ে যাবে। এই কয়েক মাস আগে কলকাতা থেকে এলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মচারী শ্রীরঘু ব্যানার্জি, আমাদের কাছে রঘুদা। তাঁর প্রথম চ্যালেনজ হল: "দিল্লি চেন? কচু চেন। চলো, আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দিচ্ছি এমন দিল্লি যা তোমরা দেখনি।"

বেরুলাম। পুরোনো দিল্লি। রাস্তা এক সময়ে এমন রূপ নিল যে, মোটরগাড়ি কেন, সাইকেল ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি যাওয়ারও উপযুক্ত নয়। আরম্ভ হল সরু অলিগলি। "বুঝলে, এ-হল এখনকার আদি-অকৃত্রিম মুসলমান এলাকা। চেয়ে দেখ।" জুতোর দোকান, পানের দোকান, আর মাঝে মাঝে রুটি-মাংস খাওয়ার দোকান। গলির পর গলি, সরু থেকে আরো সরু, উঁচু দালান যার ইটসুরকি আর স্থাপত্য সবই মুসলমানী। আমার মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে দেখা দামাস্কাস শহরের গলি। আবার ফিরলাম অন্য রাস্তায়। এবার একটা হিন্দু পাড়ার দিল্লি। প্রায় ঐ মুসলমান ধাঁচেরই কিন্তু চোখ রাখলে দেখা যায় স্থাপত্যের তফাত
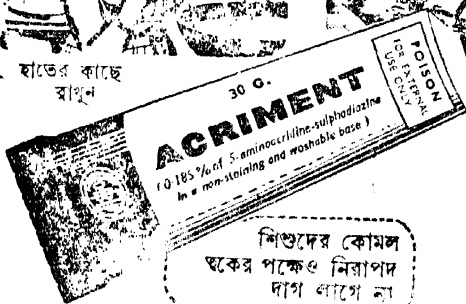
আর কিছুটা লোকগুলোর, যাদের বৃদ্ধরা ছোট্ট বারান্দায় বসে হুঁকো টানে কিম্বা লম্বাটে ছিলেমে তামাক খায় হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে। অমনি সরু গলি। ডাল, গেঁহু আর পাঁপড়ের দোকান। রাস্তায় তেলে-ভাজা, পকোড়া।

রঘুদা লোভ সামলাতে পারলেন না। "আরে, খেয়েই দেখো না, আসল পকোড়া পুরোনো দিল্লির। এখানে দাঁড়িয়ে, এই প্রতিবেশের গন্ধ গায়ে মেখে, টপাটপ খাও। আগামীকাল সকালে কী হবে? ভেবো না। আমি প্যারিসের অলিগলিতে জোয়ান বয়সে ঘুরে বেড়িয়েছি, মারামারি করেছি, খেয়েছি-দেয়েছি। আগামীকালের তোয়াক্কা কেন বাবা?" তারপর আবিষ্কৃত হল কোথায় কোন দোকানে, যার সামনে সাক্ষী থাকে একটা ত্রিশূল, পাওয়া যায় অতিউত্তম জিলিপি, কোন্ দোকানে জলের বদলে ঘি (বিশুদ্ধ) দিয়ে তৈরি হয় কচুরি, আর জামা-মসজিদের ছায়াতলে কোন্ কোন্ জায়গায় পাওয়া যায় মাখনের মতো নরম শিককাবাব, কাঠ কয়লার আগুনে সদ্য সদ্য সেঁকা।

দিল্লি কি আর একটা? শুধু নতুন পুরোনো নয়, পুরোনোরাও অনেক। শখ থাকলে খুঁজে বের করুন, প্রচুর আনন্দ। তবে কিনা ইতিহাসের বাতাস গায়ে লাগা চাই। কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ যে-শহর নাকি একদিন বানিয়ে ছিল ময়দানব পান্ডবদের কাজের; কোথায় ছিল রায় পিথোরার রাজধানী, আর তার বুকে কী করে গজাল কুতুব মিনার, মসজিদ আর বাদশাহী কবর কুতুবুদ্দিন আইবেক, শামসুদ্দিন ইলতুত-মিস, নাসিরুদ্দিন মামুদ খাঁ—কারোর শ্বেত প্রাসাদ, কারোর সবুজ প্রাসাদ, কারোর ছিল নীল প্রাসাদ। তারা সব ইতিহাসের উদরে। বিশাল মসজিদ, কুয়াত-উল-ইসলাম উঠেছিল অনেক হিন্দু মন্দিরের অংশ নিয়ে। সেই ২৩৮ ফিট উঁচু কুতুব মিনার, জয়ের মিনার: কেউ বলে হিন্দুদের তৈরি, কেউ বলে না, যথা স্যর সৈয়দ আমেদ। ইচ্ছে হয় প্রবেশ দক্ষিণা দিয়ে উঠে যান সিঁড়ি

নতুন দিল্লির কালিবাড়ি

বেয়ে (একটি মাত্র শর্ত, আত্মহত্যা করবেন না, এমন কি চেষ্টাও নয়)।

ওখলার কাছে কিলোখেরিতেও হয়েছিল এক রাজধানী, বলবনের পৌত্র কাইকোবাদের। খিলজিদের প্রথম রাজাও সেখানে আস্তা গেড়েছিলেন। যেতে পারেন সেখানে, পিকনিকের জায়গা ওখলা, আর শখ থাকলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারেন যমুনার খালে। আরো দিল্লি আছে: সিরি, তুগলকাবাদ, আদিলাবাদ, জাহাপনা, ফিরুজাবাদ,

চাঁদনি চক
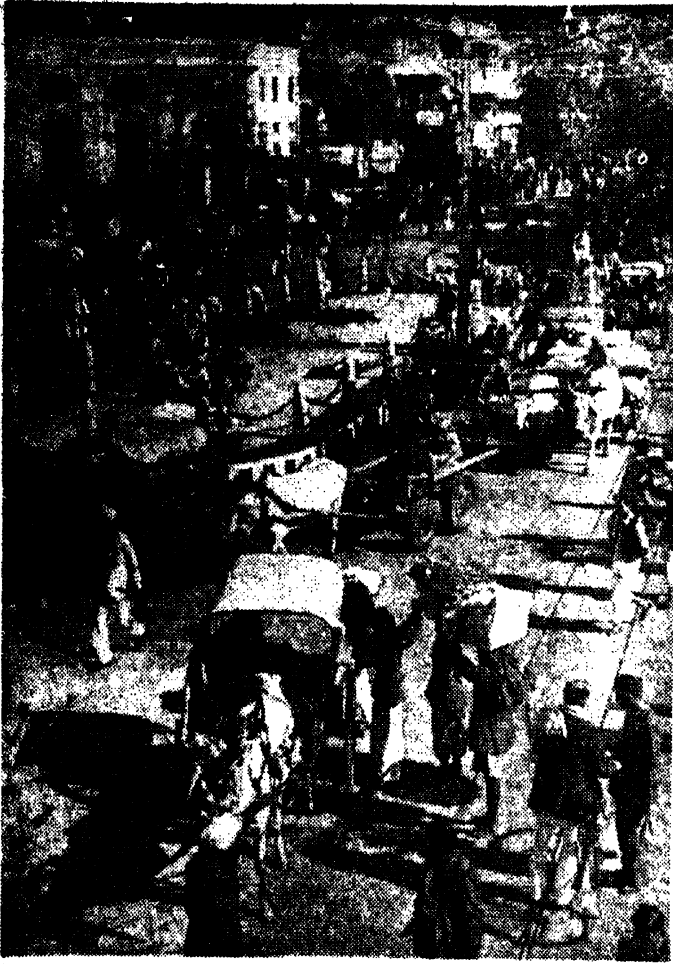
শেরশাহের পুরানো কিল্লা, হুমায়ুনের টিম্ব "দিন্‌পনা", আর তারপর শাজাহানাবাদ, লালকেল্লাকে কেন্দ্র করে। তারপর শুধু দুই শহরের কাহিনী, পুরোনো দিল্লি, নতুন দিল্লি, ভারত আর ইংরেজ।

খুঁজে নিন কোথায় লুকিয়েছিলেন বাহাদুর শা আর কোথায় ইংরেজরা তার তিন পুত্রকে কাপুরুষের মতো হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছিল (চাঁদনি চকের একটি স্থানে)। লালকেল্লার কোথায় ইংরেজরা করেছিল বাহাদুর শাহের বিচার আর সেই একই স্থানে কী করে হল নেতাজীর সেনাপতিদের বিচার (আই এন এ), বাস্তবে যা কিনা হল ইংরেজদের বিচার ভারতের হাতে। হ্যাঁ, লালকেল্লায় আছে একটি অপূর্ব জিনিস, দিল্লি এলে ভুলবেন না। "স'-এ-লুমিয়ের" (আলো-ধ্বনি) দিয়ে লালকেল্লার ইতিহাস সামনে তুলে ধরা। এটাও বারান্তরে এই কাগজে লেখার ইচ্ছা রইল। তার আগে আপনারা অনেকে হয়তো এসে দেখে যাবেন। এশিয়া ভূখণ্ডে (সুয়েজের পূর্ব পারে) এটিই প্রথম ও একমাত্র। কাছকাছি আছে মিশরের কায়রোতে।

এমনি এই দিল্লি আর তার কতো কিছু যার সঙ্গে ভারতের নাড়ীর সম্বন্ধ যেন। কিন্তু আজকাল খাবারদাবারের একটু অসুবিধে, মানে সবই পাওয়া যায়, দাম বেশি। বছর আটেক-ছয়েক আগেও মাছের ফিরিয়ালা বিনিপয়সায় দিতো মাছের মুড়ো। সে রাম-অযোধ্যার কাহিনী বলে   নেই। গত দু-বছরে পাকা রুই (কাটা   ড়ে তিন থেকে বেড়ে হয়েছে সাড়ে   -ছ' টাকা (যে-বাজার আমি জানি), যদিও কলকাতার দরে নাকি "সস্তা"! মাংস এক বছরে তিন থেকে চার টাকা কিলো। শাক সবজির দাম কোলকাতার চাইতে বেশি। চাল? বেশ ও ভাল পাওয়া যাচ্ছে। আমার মতো ছোট পরিবারে মাসে আমরা ছেড়ে দিই পাঁচ কিলো চাল আর অনেক-কিলো গম (কি জানি ১৫।২০ হবে)। ফল? দামি। শুকনো ফল? আরো দামি।

তবু জানেন, দিল্লি দিল্লিই বটে। এবং তার সঙ্গে যখন "হিল্লি" শব্দটা জোটে, তখন কথাই নেই।

—খগেন দে সরকার

এক বছরের অভিজ্ঞতা

প্রতি বছরের মতো এবারও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে যে কথাটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেটা নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নয়। দ্রব্যমূল্যে-স্ফীতি বজায় না রাখতে পারলে বৈষয়িক অগ্রগতি ব্যাহত হবে এ ব্যাপারটা বেশ কয়েক বছর ধরেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। আর্থিক ব্যবস্থার বর্তমান সংকটে কেবল স্বল্পকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন নয়, দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌল নীতি সম্পর্কে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে এটা বললেই যথেষ্ট হবে না। প্রকৃতপক্ষে, সমস্যার সমাধান আর তেমন অজানা নয়, এখন প্রয়োজন সংকল্প ও প্রয়োগ-ক্ষমতার।

বিবরণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালের নানা সমস্যা ও অসুবিধাগুলির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপাদান-রাশি ও সম্পদের সম্প্রসারণ যেখানে শ্লথ-গতিতে ও অসমসৃণভাবে ঘটেছে, সেখানে প্রতিরক্ষাজনিত অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াও, ব্যাঙ্ক থেকে বড়ো বহরে কর্জ নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী উভয় অংশে মূলধন নিয়োগ ক্রমবর্ধমান হয়ে পড়েছিল। চতুর্থ যোজনার সময় যাতে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি না হয় সেই উদ্দেশ্যে দেখতে হবে যেন কাজকর্মের বহর একটা নিরা-পত্তার সীমার ভেতর ধরে রাখা যায়। তাহলে নিয়ন্ত্রণাতীত বা অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার আর্থিক অবস্থাকে আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।

বার্ষিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

যা সব চেয়ে উদ্বেগের বিষয় সেটা হচ্ছে পরিকল্পনার আকার নয়, পরিকল্পনার গঠন ও তার প্রয়োগ। তার জন্য, আভ্যন্তরিক সঞ্চয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান এবং দ্রব্যমূল্যের উপর চাপ—এ সবের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বার্ষিক ব্যয়বহরকে নিয়মিত করার উপায় গ্রহণ করতে হবে।

বৈষয়িক অগ্রগতির স্বল্পকালীন অভীষ্ট হিসাবে দ্রব্যমূল্যে স্ফীতির মূল কারণ-গুলির দিকে মনোযোগদান এবং দীর্ঘ-কালীন নীতি রূপে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাবলম্বন অর্জনের প্রচেষ্টা আজ আর তর্কের অপেক্ষা রাখে না। স্বল্পকালে অর্থ সম্প্রসারণ বা মুদ্রাস্ফীতি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা যেমন বাঞ্ছনীয়, সেই রকম নিকট ভবিষ্যতে শ্রমিকদের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের আনুপাতিক বৃদ্ধিসাধন সমান জরুরী। তাতে মূল্য স্ফীতি সংরক্ষণ এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি দুটোই সহজসাধ্য হবে।

এই দিক থেকে দেখলে, চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় যে কৃষির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা সমর্থন করা যায়। কেন না, কৃষি অংশই শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেগুলি উৎপাদনের মোটামুটি সব কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষিসংক্রান্ত নতুন নীতির প্রধান ঝোঁকটা হচ্ছে বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে নিবিড় চাষবাস এবং সার ও অন্যান্য আবশ্যক উপকরণের যোগান বৃদ্ধির উপর।

১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষি উৎপাদনের সূচক ১৯৬০-৬১ সালের স্তরেই ছিল। ১৯৬৪-৬৫ সালের উৎপাদন ধরলে দেখা যায় যে, পরিকল্পনায় নির্ধারিত শতকরা ৫ বার্ষিক হারের জায়গায় কৃষি উৎপাদন বছরে শতকরা ২·৮ গড় হারের বেশী বাড়ে নি। ১৯৬৫-৬৬ সালে শিল্প উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালের চাইতে শতকরা ৩৯ ভাগ (পরিকল্পিত শতকরা ৭০ ভাগের তুলনায়) বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যে বৃদ্ধির আসল কারণ

পরিকল্পনায় যেখানে শতকরা ৬ বার্ষিক হারে অগ্রগতি ধরা হয়েছিল, সেখানে জাতীয় আয় প্রকৃত অর্থে বছরে শতকরা ২·৫ হারে বেড়েছে। অন্য দিকে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে টাকার যোগান শতকরা ৫৭·৯ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃত আয় বৃদ্ধি ও ক্রয়ক্ষমতার প্রসারের মধ্যে একটা বড়ো রকমের বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। মোট চাহিদার চাপ বেড়ে যাওয়ায় পাঁচ বছরে শতকরা ৩২·২ ভাগ দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি ঘটেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ দুই বছরে মূল্য শতকরা ২২ ভাগের মতো বেড়েছে।

তৃতীয় যোজনার অভিজ্ঞতা এই যে, পরিবহণ, শক্তি, রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য ও

আমদানীজাত কাঁচামাল ও কলকব্জার মাঝে মাঝে অনটন দেখা দেওয়ায় বৈষয়িক অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে। এইসব অভাবের দরুন প্রকল্পে মূলধন নিয়োগের পর তার থেকে ফল পেতে বেশী সময় লেগেছে এবং তা মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগামিতার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বাজেট-সংক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যয়ই মূলত দায়ী। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা থেকে সরকার কর্তৃক বড়ো বহরে ঋণ গ্রহণ প্রধানত অর্থ সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ব্যাঙ্ক থেকে সরকারকে ৫৯৬ কোটি টাকা (১৯৬৪-৬৫ সালে ৩০৩ কোটি টাকার জায়গায়) কর্জ দেওয়া হয়েছিল।

বহির্বাণিজ্য

বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, আলোচ্য বছরে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে ঘাটতি সংকটজনক হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরিক মূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে আমদানী সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়ে যায় এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাতে একদিকে যেমন কাঁচামাল ও কলকব্জার অভাবে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল, অন্য দিকে তেমনি চোরাই চালানে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষয় ঘটেছে।

এমনতর অবস্থায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করা হয়। আশা করা হয়েছে যে, আভ্যন্তরিক ও বহির্মূল্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা যাবে এবং আমাদের রপ্তানির প্রতিযোগিতা-ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হবে। অন্যান্য ব্যাপারের মতো, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারা যাবে কিনা তা নির্ভর করছে আমাদের সংকল্প ও উদ্যমের উপর।

শান্তিকুমার ঘোষ

অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র জন্ম-বার্ষিকী

দিন কয়েক আগে সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলুম। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে সে কালে আমাদের কাছে এক বিস্ময় ছিলেন। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। এখনকার মত এত বারোয়ারি অনুষ্ঠান তখন ছিল না। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে বড় বড় হস্টেলে গানের আসর বসত। বিকেল থেকে শুরু হয়ে রাত প্রায় গড়িয়ে যেত গানে গানে আর আমরা এক হস্টেল থেকে আর এক হস্টেলে পরিভ্রমণ করে বেড়াতুম নিজেদের প্রিয় শিল্পীর গান শোনবার জন্য। কৃষ্ণচন্দ্র দের কথা বিশেষভাবে মনে আছে এই কারণে যে, তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গায়ক আর আমার চোখে পড়েনি। কী তাঁর চেহারা ছিল! দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, শুভ্র, সুপুরুষ—সভাস্থলে প্রবেশ করতেন এক সম্ভ্রান্ত আত্মস্থভাব নিয়ে। যে মুহূর্তে গান ধরতেন সে মুহূর্তে সকলকার চিত্ত অধিকার করে নিতেন। হার্মোনিয়াম বাজাতেন অপূর্ব, তালে ছিল অসামান্য দক্ষতা। কাব্যসংগীতে এক শচীন দেব বর্মন ছাড়া তালে এমন বৈদগ্ধ্য খুব কম ব্যক্তিরই দেখেছি। কৃষ্ণচন্দ্র দের পরেই মনে পড়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কথা—সেই রূপবান ব্যক্তিত্ব এবং মেঘগম্ভীর কণ্ঠ। বাংলা রাগসংগীত এত ওস্তাদী সত্ত্বেও এত মিষ্টি কি করে হতে পারে ভেবে অবাক হয়ে যেতুম। তবে, জ্ঞানবাবুর কতকগুলি বিকৃতি ছিল—অনেক সময় সেগুলি কৌতুকজনক হয়ে দাঁড়াতো। ভীষ্মদেব আত্মস্থ হয়েই গাইতেন। তিনি ছিলেন অপূর্ব কৌশলী। হার্মোনিয়ামে তাঁরও হাত ছিল চমৎকার। কৃষ্ণচন্দ্র শুধু গায়ক ছিলেন না, অভিনেতাও ছিলেন। নাট্যসঙ্গীত কিভাবে গাইতে হয় তা তিনি জানতেন। অনেক সময় স্টেজের ভেতর থেকে উচ্চকণ্ঠ গান ধরে তিনি প্রবেশ করতেন—মনে হত রঙ্গমঞ্চের একটি অসামান্য ব্যক্তিত্বের কাছে অনালোকিত প্রেক্ষাগৃহের শত শত দর্শক সমস্ত শ্রবণ মন সমর্পণ করে ধন্য হয়ে গেছেন। আজকের রঙ্গমঞ্চে সে সম্ভাবনা আর নেই—সে যুগের নাট্যসঙ্গীত আজ স্মৃতির বস্তু।

কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল অতুলনীয় কণ্ঠবৈভব। খুশি মত উচ্চ গ্রামে তিনি তাঁর কণ্ঠকে অতর্কিতে পৌঁছে দিতেন আবার সংগে সংগে নামিয়ে আনতেন খাদে, কিন্তু কৃত্রিমতার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করতেন না। গলা যখন ছেড়ে দিতেন পুরোপুরিই ছেড়ে দিতেন স্বাভাবিকভাবে—এতে একটুও অসুবিধা বোধ করতেন না তিনি। এইটিই ছিল সেকালকার বৈশিষ্ট্য। রাগ, তাল এবং কণ্ঠ—তিনটিতে ফাঁকি প্রায় কেউই দিতেন না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—প্রথমে যোগ্যতা, তারপরে উচ্চাকাংখা। আজকার দিনে প্রত্যেকটি ভাল শিল্পীর ক্ষেত্রে এটি ছিল প্রযোজ্য। এই কারণেই আসরে বসতে তাঁরা পরোয়া করতেন না। শ্রোতাদের হৃদয়ে মর্যাদার আসন তাঁদের পাকা ছিল। এখন ধারা পাল্টেছে। কাব্যসঙ্গীতে রাগের আর সেই গুরুত্ব নেই—তাল বলে কিছু একটা থাকলেও তা অত্যন্ত লঘু—তবলার বোলও তদনুপাতে পাল্টেছে। অনেক তবলিয়া আধুনিক সংগীতের আসরে ডুগডুগি বাজান বললে অত্যুক্তি হয় না। বছর দু-তিন আগের কথা, শ্যাম পার্কে বঙ্গ সংস্কৃতির আসরে একজন আধুনিক গায়ক এলেন। তবলার ব্যবস্থা উপযুক্ত ছিল না বলে তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না। অবশেষে তাঁর মনের মত করে তবলা মেলানো হল—সময় বেশ খানিকটা গেল; কিন্তু—ও হরি, এক ফের যেতে না যেতেই তাল গেল কেটে। গায়ক মশাই বেশ চোখ বুজেই গেয়ে চলেছেন—বিপর্যয়টা তাঁর বোধগম্য হয়নি। তবলিয়া হুঁশিয়ার লোক। কয়েক সেকেণ্ড বাজনা ছেড়ে ঠুক্ ঠুক্ করে হাতুড়ির ঘা দিয়ে যেন বাজনাটা সেরে নিলেন, তারপরে সেবারকার মত ডুগডুগি বাজিয়ে উক্ত মহান শিল্পীকে বাঁচিয়ে দিলেন। আর শ্রোতারা?—তাঁরা হাততালি দিয়ে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করলেন, কারণ এর বেশী যোগ্যতা তাঁদের আর নেই। আধুনিক কাব্যসংগীতে কণ্ঠের কথা বোধ হয় না তোলাই ভাল, কারণ কণ্ঠ বলে তাঁদের যে একটা পদার্থ আছে মাইক না থাকলে সেটা বোঝা শক্ত। আগেকার গলা ছেড়ে গাওয়ার রীতিটাকে অনেক আধুনিক শিল্পী "শাউটিঙ" বলে উপহাস করে থাকেন। এ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কি জানি না কিন্তু গলা খুলে গাওয়াটাই কি শাউট-এর লক্ষণ? দিনুবাবুর রবীন্দ্র-সংগীতকে আমরা কখনো শাউটিঙ বলে

ভাবতে পারিনি। কৃষ্ণচন্দ্র দের "মনকুসুমের রঙ ভরা এই পিচকারিটি রাধে" বা "আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি" প্রভৃতি গানে কিছুমাত্র শাউটিঙ নেই কিন্তু বলিষ্ঠ শিল্পীর স্বকীয়তা আছে। কুন্দনলাল সাইগল, ধীরেন দাশ—এ'রা শাউট করতেন না কিন্তু দক্ষতায় এ'রা কিছুমাত্র পেছিয়ে ছিলেন না। আসলে আমরা চাই আমাদের আধুনিক শিল্পীদের সাঙ্গীতিক ভিত্তি আরো অনেক বেশী পাকা হোক। এদিক দিয়ে যেমন এ'দের একটা বড় দুর্বলতা আছে তেমনি অনেক গুণও এ'দের আছে, যা আগের শিল্পীদের ছিল না। এ'দের উচ্চারণ, গায়নভঙ্গী, সংস্কৃতিবোধ, রুচি-শীল পরিবেশন আগেকার তুলনায় অনেক ভাল একথা মানতেই হবে—শুধু এর সঙ্গে রাগসঙ্গীতের বনিয়াদ যদি পাকা হয় তাহলে এ'রা সঙ্গীতশিল্পে অসাধ্যসাধন করতে পারবেন। রাগসঙ্গীতে অধিকার নেই বলেই এ'দের অনেকে সব পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। স্রষ্টা শিল্পী যদি হতে হয়, আর ইতিহাসে স্বীকৃতি পেতে হয় তাহলে নানা বাজনার সহায়তায় কণ্ঠের দৈন্য ঢেকে কেবল কৌশল দিয়ে বাজিমাত করা যায় না।
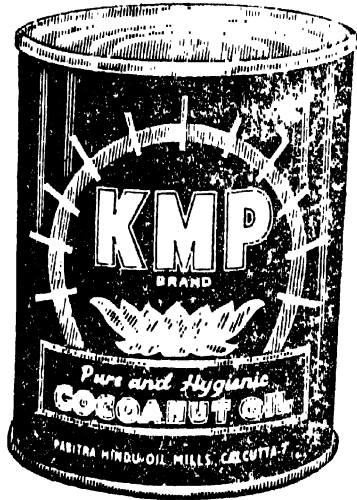
কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের আর একটি গুণের কথা উল্লেখ না করলেই নয়—সে হচ্ছে কীর্তনে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের কথা। জানি অনেকে মুচকি হাসবেন। তাঁরা বলবেন কৃষ্ণচন্দ্র ক্লাসিকাল কীর্তনে সুদক্ষ ছিলেন না, তিনি যা গাইতেন তা কীর্তনের একটি জনপ্রিয় রূপ মাত্র। কিন্তু এমন জনপ্রিয় মনোহর রূপই বা কজন সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর কীর্তনে ভক্তি এবং মাধুর্য-দুটিই প্রচুর ছিল। আধুনিক হোক আর যাই হোক তিনি সার্থক রসস্রষ্টা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "আমি চন্দন হইয়ে শীতল পরশে অঙ্গের পরশ লব"—এটি আধুনিক কীর্তন কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের এই রেকর্ডটি শুনে কার না চিত্ত বিগলিত হয়? রস যদিচ না রইল তবে সোমতাল, বড় দশকুশী মধ্যম দশকুশী—এসব ওস্তাদীর সার্থকতা কোথায়? সেই সব বড় বড় দিঙনাগাচার্যদের দূরে থেকে গড় করাই ভাল। শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র কীর্তনই বেশী করে গাইতেন। কীর্তনে ওস্তাদ স্বীকৃতির চেয়ে রসস্রষ্টার খ্যাতিই তাঁর কাম্য ছিল।

গত জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণচন্দ্রে তিয়াত্তর বৎসরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে খুব অনাড়ম্বরভাবে ঘরোয়া পরিবেশে। শ্রীপ্রভাস দে মহাশয়কে ধন্যবাদ তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। বৃথা হইচই-এর চেয়ে এইরকম ছোটখাটো উৎসবই জন্মবার্ষিকী পালনের পক্ষে ভাল। মান্যগণ্য শিল্পীদের আনাগোনা না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই, কারণ আজকের তথাকথিত অনেক রেকর্ড বা সিনেমা শিল্পী কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে যেখানে কৃষ্ণচন্দ্র দে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেখানে পৌঁছোতে পারবেন না। সুতরাং "গ্ল্যামার" আমরা চাইনে।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি কথা বড়ই সময়োচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, আমরা কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়কে স্মরণ করি, কারণ তিনি আমাদের আনন্দ প্রদান করেছিলেন। তাঁর জন্মোৎসবের মাধ্যমে আমরা সুরের জন্মোৎসবই পালন করছি। আজকাল সুরের জন্মোৎসব পালন করা হয় না, পালন করা হয় অসুরের জন্মোৎসব। কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্যি।

—শার্ঙ্গদেব

জেরাম প্যাটেল-এর আঁকা ছবির একটি নিদর্শন

অনিমেষ সেনগুপ্ত-এর চিত্র প্রদর্শনী : অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস

অনিমেষবাবুর সম্ভবত এইটিই সর্বপ্রথম প্রদর্শনী। এখানে তাঁর প্রায় বিশ খানি ছবি স্থান লাভ করেছে। কখনও জল-রঙ, কখনও প্যাটেল। বলতে আমাদের কষ্ট হয়, তাঁর কাজ আমাদের মন স্পর্শ করেনি। অনুশীলনের গলতি প্রায়-ছবিতেই দেখা যায়। হয় তাঁকে যেতে হবে অবয়বে—নয় ল্যানডস্কেপে। বয়সে তিনি এখনও নবীন, কি প্রয়োজন ছিল এই প্রদর্শনীর। এতে লোকে তাঁকে অন্যভাবেই নেবে।

পঞ্চম বার্ষিক শিশু চিত্র-প্রদর্শনী : অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস

অনেক ছেলেমানুষ আছে যারা ড্রইং-স্যার স্কুলে অনুপস্থিত খবর পেলে খুশী হয়, ড্রইংএর নামে তাদের ভয়; কিন্তু আবার অনেকেই আছে যারা পড়া ফেলে ছবি আঁকে। মা-বাপেদের খুব উৎসাহ, সেইসব ছেলেমেয়েদের অনাত্র ভর্তি করে দেন, যাতে আঁকায় তাদের হাত হয়।

ঐ 'অনাত্র'র মধ্যে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের স্টুডিও একটি যথার্থ সংস্থা। এখানকার পরিবেশ শৌখীন, পরিপাটি। একজন আর একজনের বেশ তফাতে বসতে পারে। হাতের সঙ্গে হাতের ঠেকাঠেকি হয় না—তাই মন সহজেই এক। ছোট ছেলে-মেয়ে একনিষ্ঠ—এ বড় আশ্চর্য দৃশ্য! তারা দেখা যায়—কতক অ্যাবস্ট্রাক্ট ভালবাসা দিয়ে অর্থাৎ রেখার উপর ভালবাসা রঙের উপর মায়া—এদিয়ে নিজের সবিশেষ আকর্ষণকে—কখনও বিস্ময়কে দম বন্ধ করে আঁকে। জিহ্বা অনেক বার হয়ে নাকের দিকে উঠা, অদ্ভুত একটা রেখা টেনে বা যাদুময় কোন রঙ আরোপ করে, এবার ছবি থেকে বুক মুখ উঠিয়েছে, শুধু এখনই মাথাটা খুব লাজুক কায়দায়, সমস্ত ছবির উপর চারিদিক বেড় করে, বৃত্তাকারে ঘুরে এল। তারা দম ফেলল। আমরা চোখের সামনে দারুণ অনৈসর্গিক নাচের প্রথম পর্ব শেষ হতে দেখলাম।

এদের মধ্যে অনেকে বেশ ভাল আঁকে। একটা বিষয়কে খাড়া করে তুলতে পারে। অবশ্য এই সূত্রে যে শিক্ষক সাহায্য করেন না এমন নয়। করতেই হয়। তবে এইদিক আমাদের মনে হয় যে একটা বিশেষ বিষয়কে অনেক রকমভাবে সাজাতেগুজোতে, রঙ দিতে ছেলেমেয়েদের বলা যায়—এবং সব শেষ হলে তাদের বা তাকে বলা হয় এবার তুমি যাছো কোনটা ভাল। তাহলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এবারকার প্রদর্শনীতে প্রায় পঞ্চাশজন ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছিল—সর্বসমেত ১৩৬টি ছবি স্থান পায়। এখানে স্কেচ ছিল, জল-রঙ ও প্যাস্তেলে করা কাজ ছিল। বয়স ৬।৭ থেকে ১৩ অবধি। প্রায় প্রত্যেক ছবির সামনে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে। প্রত্যেকটি বড় মজার, খুব চমৎকার।

তবু সুশোভন ব্যানার্জির (১৩) ৫নং, অনিতা দুগালের (১৩) ৪৮নং, নন্দিনী মাহেন্দ্র (১২) ৬৭নং, বীণা মাহেশ্বরী (১০) ৭৫নং, গিনি মুখার্জি (১০) ৭৬নং, ম্যাকম মুনসিফ (১২) ৮৫নং, বিজয় সালঙ্গিয়া (১০) ১০০নং, সুভায় রায় (১৩) ১১৭ ও ১২১ নং, অমিতা সেনগুপ্ত (৭) ১২৭নং, রজত ভাটিয়া (৫) ২১নং ইত্যাদির ছবি আমাদের আকর্ষণ করেছে।

জেরাম প্যাটেল-এর চিত্র-প্রদর্শনী : আর্টস অ্যান্ড প্রিণ্টস গ্যালারী

জেরাম প্যাটেল স্বদেশে নিশ্চয়ই নামকরা শিল্পী। আর্টস এণ্ড প্রিণ্টসের কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন কলকাতার শিল্প রসিকদের কিছু বোধ দেবার জন্য, কিছু জাগ্রত করার জন্য।

ক্যাটালগে তাঁর **বাউ হাউস** অনুপ্রাণিত অজস্র চেয়ারের ছন্দের মধ্যে বসে তোলা ফোটো আমরা দেখলাম। বেশ হয়েছে ফোটোখানা।

এখানে সব কিছুই একটা নূতন কিছু করব এই ভাব থেকে শুরু হয়েছে। দাদাইস্ত থেকে বহু কিছু হয়েছে, এ আর নূতন কিছু নয়। বাঙলা দেশে এ খেলা অনেক হয়েছে।

অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ আমরা ভালবাসি, কিন্তু সেই ভালবাসার জোরে, আমরা এগুলো ভাল বলতে পারি নি। এখানে শক থেরাপিও কাজ করে নি। ফলে মনে হয় ভারতের শিল্পধারার এখন অবয়বধর্মী হওয়াই উচিত। কারণ তাতে আরোপ ক্ষমতাটা পাকা হবে।

জীবনের যতো সব
দরকারী কাজ
জীবনের বহু দরকারী কাজে জুতো না-হলে ছোটদের চলে না। এমন সব কাজ যথা : ইট-পাথরে লাথি মারা, গাছে চড়া, মারবেল সুট করা, স্কুলে যাওয়া, হকি খেলা, ট্রাইসাইকেল চড়া, কিম্বা যেখানে মজা সেখানে উর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া। জুতো পায়ে না-থাকলে এসব কাজ কি জমবে! তাই জুতোর দরকার বড় বেশি। দেখতে ভালো, টিকবে ভালো, আরামে হাঁটতে ভালো—এমন জুতোই ছোটদের দরকার। আর এমন জুতোই তো বাটার জুতো, গত ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতায় উৎকৃষ্ট।
২.৭৫
৬.৯৫
৫.৯৫—৭.৯৫
৬.৯৫
৮.৫০—৯.৫০
Bata
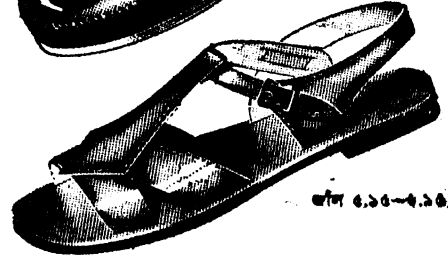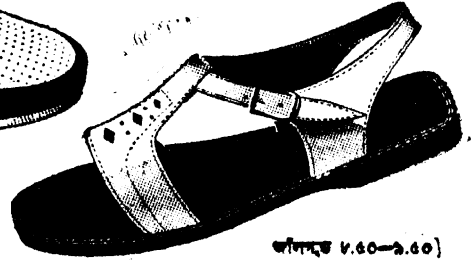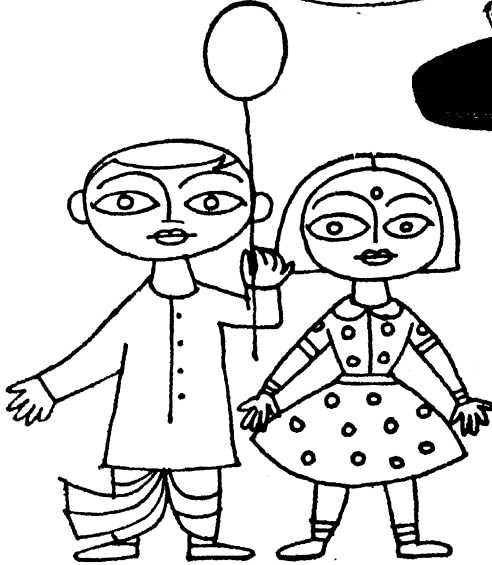
আই-এস-আই কি? বিস্কুটের প্যাকেট, অ্যালুমিনিয়মের বাসন, জমাট দুধের টিন, লিখবার কালির কাগজের বাক্স ইত্যাদি অনেক কিছুর গায়ে মার্কাটি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। যদি তাও খেয়াল না করে থাকেন তবে বড় বড় বিজ্ঞাপনে ফলাও করে আই-এস-আই লাইসেন্সধারী পণ্য,

আই-এস-আই প্রতীক চিহ্ন

কিনবার পক্ষে নিরাপদ বলে উৎপাদকরা প্রচার করছে তা নিশ্চয়ই আপনাদের চোখ এড়ায় নি। অথচ আই-এস-আই'এর ডিরেকটর জেনারেল ডাঃ এ এন ঘোষ দেখা হলেই দুঃখ করে বলেন মেয়েরাই বাজারের জিনিসের বড় খদ্দের কিন্তু তাঁরা স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান নিয়ে মাথা মোটেই ঘামান না। কিনেকেটে এনে ঠকে গেলে হাহুতাশ আজকের বাজারে কে না করে বলুন? হয়তো একটি ইলেকট্রিক প্লাগ কিনে এনে দেখলাম আমার বাড়ির যা প্লাগ লাগাবার সকেট তার মাপের সংগে মিলছে না, ছেলেমেয়েদের জামার কাপড় নূতনবেলার বেশ ঝকঝকে চকচকে মনমাতানো বাহার দেখে পুজোর বাজারে জড়ো করলাম কষ্ট করে কয়েকটি পোশাক, দু ধোপ যেতেই এদিকে ছোট, ওদিকে ঢিলে। মহাবিপদ! ব্যবসায়, বাণিজ্য, কলকারখানার ব্যাপারে তো বটেই, আমাদের দৈনন্দিন কেনাকাটার দুর্বিপাকেও আই-এস-আই বা Indian Standard Institute—ভারতীয় মানক সংস্থা এই সব পরিণতির সম্ভাবনা থেকে বাঁচবার সাহায্য করে।

কি করে সে সাহায্য হয়? পৃথিবীর মানুষ সবাই সমান। তারা দুঃখে কাঁদে, আনন্দে হাসে, সন্তানকে ভালবাসে, খিদে পেলে খায় আবার এত বড় মিলেও তারা বিচিত্র। দেশে দেশে আলাদা জাতিতে জাতিতে আলাদা ব্যক্তিবিশেষে আলাদা। পণ্যসম্ভারের বেলায়ও তেমনি কতগুলি মূল গুণ বিচার করে, তার একটা মান ঠিক করা হয়। একই ধরনের পণ্য, একই ধাতু, একই খাদ্য তার বৈশিষ্ট্য রেখে চললেও মূল গুণের মান বজায় রাখতে পারে। এখানেই আই সি-আই'এর ভূমিকা। আপনি আমি হয়তো রেশম কিনতে গেলাম। হাতে হয়তো পুজোর বাজারের সঞ্চয় ভালই আছে। দোকানী পসারীকে হাঁক দিয়ে বলতে পারি আনো যা কিছু তোমার সেরা জিনিস। পসারী তখন সামনে ধরে দিল দিব্যি ভাল মূল্যবান রেশমবস্ত্র। আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করে বললাম এতে চলবে না, আরও ভাল চাই। দোকানী বুঝে গেল ভাল রেশম আমরা চিনি না তবে অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত। সহকারীকে ইঙ্গিত করে বহু খুঁজে পেতে আনলো সে নিকৃষ্ট এক-টুকরো রেশমী কাপড়। দাম হাঁকল তিন-গুণ। খুশী হ'য়ে আপনি আমি কিনে বাড়ি এলাম। ঠকে গেলাম ঠিকই। কিন্তু না ঠকে চলাও তো কঠিন। কি করে আমরা সব জিনিসের ভালমন্দ চিনবো? আই-এস-আই মার্কা যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা কিন্তু ভালমন্দ বিচরের অনেকটা পরীক্ষা পার হ'য়ে পেীঁছেছেন খদ্দেরের দরবারে।

মান বা স্ট্যাণ্ডারড কথাটি আধুনিক সভ্যতার দান কিন্তু মানের মর্যাদা মানুষের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুগে যুগে জড়িত। মানুষের অভিজ্ঞতা, তার সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে মান-এর উপলব্ধি ও জন্ম। আদিম মানুষ চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতো, রান্না করে খেতে জানতো না, কিন্তু যেদিন তার নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তার ভাবী কালকে পেীঁছে দিল সেদিন আর সেটা নূতন রইল না। আস্তে আস্তে আগুন জ্বালাতে নেবাতে তারা জানল। আবার জানল সবাই। এই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার দান হ'ল মান। একই পরিবেশে, একই পরিস্থিতিতে দেশ বা দেশান্তরে মানুষ সভ্যতার পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। 'মান' তাদের উপলব্ধির প্রকাশ হিসাবে দিল ধরা। জানতে হয়তো তারা পারলো না, কাগজে তার রেকর্ড রইল না কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগে অতীতের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয় অংশটুকু সার্বজনীন স্বীকৃতি পেল ঠিকই।

এই স্বীকৃতির জোরেই খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগের সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আজ মহেনজো-দারো আর হারাপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার জগতকে অবাক করে দিয়েছে। একদিকে যমুনা উপত্যকায় মীরাট, অপরদিকে গুজরাতের সীমানা আর রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলা ২৫০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে ছিল এই সিন্ধুসভ্যতার প্রভাব। সে সভ্যতার ঘর-

চাউলো ঝেড়ে বেছে দেখাচ্ছেন খাদ্যদপ্তরের একটি মহিলাকর্মী

মাইলোর খই ভাজা

বাড়ি, ইঁটপাথর আলাদা করে ব্যক্তিগত নিজস্ব অভিজ্ঞতায় হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠেনি। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা, পরীক্ষার পর পরীক্ষায় যে ফল সার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে তারই মান-এর মিলিত প্রয়াসে সিন্ধু উপত্যকার বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি। সভ্যতার একদিকে যেমন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, অন্যদিকে তেমন ইঁট-পাথরের বস্তুতান্ত্রিক বিকাশের 'মান' বা স্ট্যান্ডারড। এ কথাই স্ট্যানডারড সম্বন্ধে রাজাগোপাল আচারী বলেছেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, উৎপাদনে স্ট্যানডারড-এর স্থান, সামাজিক ক্রমবিকাশে সংস্কৃতির মত। কথাটি এত সুন্দর যে 'মান' সম্বন্ধীয় আলোচনায় সর্বত্র রাজাজীর উক্তিটির উল্লেখ করা হয়।

উৎপাদনকারীর স্ব-ইচ্ছায় মান-এর লাইসেন্স নেবার ব্যবস্থা। কাজেই এ কথা কেউ বলতে পারে না যে আই-এস-আই ছাপের বাইরে যা কিছু সবই পরিহার্য। তা ছাড়া কেনাকাটার সকল ক্ষেত্রে মান নির্ণয় এখনও হয় নি। মান নির্ণয় অনেক সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন ধরুন 'চা'। চা-এর আই-এস-আই মার্কা হয় নি। আপনি যদি একই চা দুই প্যাকেটে দুরকম পান তবে তার মান নিয়ে উৎপাদকের কাছে যেতে পারেন, কিন্তু আই এস আই-এর পরীক্ষা হয়নি বলে আই-এস-আই সে বিষয় কিছু করতে পারে না। অথচ যদি ধরুন কোন বিস্কুট কোম্পানির আই-এস-আই মার্কা আছে আর আপনি একটি প্যাকেট কিনে দেখলেন বিস্কুট নরম অখাদ্য তখন তার ভিতরে খুঁজে দেখবেন ফুটো ফুটো নম্বর লেখা কাগজের টুকরো আছে। সেটি সমেত বিস্কুট মানক সংস্থার যে কোন অফিসে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা বিস্কুট আপনার ফেরত তো দেবেনই উপরন্তু ভবিষ্যতে ঐ কোম্পানিকে সতর্ক করে দেবেন। এমনও হতে পারে কোম্পানি দেখলো একবারের বহু প্যাকেটে এইরকম হয়েছে. হয়তো বা তারা বাজার থেকে সব কটি প্যাকেট ফিরিয়ে নিয়ে নেবে। আই-এস-আই মার্কা নেওয়া হয় স্ব-ইচ্ছায় কিন্তু এরপর লাইসেন্স নিলে মার্কার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তার জন্য আইন পর্যন্ত আছে। মানক-সংস্থা সর্বদা লক্ষ্য রাখেন যাতে ভাল গবেষণাগার-এর ব্যবস্থার উৎপাদকরা নিজেরাই উৎপন্ন জিনিসের উপর নজর রাখতে পারেন।

আই-এস-আই-এর আওতায় আবার সবকিছু আসেনা যেমন ওষুধ। ওষুধের মান, ভালমন্দ সব ড্রাগ কনট্রোল-এর হাতে। মানক সংস্থা সরকারী সংস্থা নয়। ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার প্রভৃতি দেশ জোড়া সহযোগিতায় মানক সংস্থার কাজ চলে। তার মধ্যে কনসুমার যা কেনাকাটা যাঁরা করেন তাঁদের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েরা এখানে নিজেদের এবং দেশের অনেক উপকার করতে পারেন। আই-এস-আই-এর যে মহিলা পরামর্শদাতা সমিতি আছে তাকে বাদ দিলেও কনসুমার অ্যাসোসিয়েশন বা খদ্দের সমিতি গঠন করে দেশের দূরতম কোণেও পণ্য, বিশেষ করে ভেজালবিহীন খাদ্যপণ্য দাবি করে মেয়েরা আন্দোলন চালাতে পারেন। আজকাল গুঁড়ো মশলার নামে নানারকম দুর্নাম শোনা যায়। আই-এস-আই মার্কা দেওয়া গুঁড়ো মশলার জন্য আই-এস-আই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে বাধ্য। কলকাতায় কিছুদিন আগে বেশ ভালভাবে

খন্দের সমিতির পত্তন হয়েছিল। উৎসাহী মহিলা এমন কি পদস্থ পুরুষকেও অনেক আলোচনার আয়োজন করতে দেখেছিলাম। তার কি পরিণতি হ'য়েছে জানিনা। সব উৎসাহের পরিণতি যেমন হয় তেমন যদি হয়ে থাকে তবে দুঃখের কথা। বিদেশে খন্দের সমিতি দারুণ ক্ষমতাশালী হয় দেখেছি। তাদের নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতা-মতের ভয়ে উৎপাদনকারী সর্বদা তটস্থ। মেয়েরা এক হ'য়ে যদি বলেন তোমার জিনিস ভাল না আর তার ভিত্তি থাকে তবে ভেজাল আর কালোবাজারের সাধ্য কি যে কিছু করে?

বিদেশের এই কেমকাটার মান সম্বন্ধে সচেতনতাও একদিনে আসেনি। inter-changeabilily তা একই জিনিসের অংশ বিশেষ একই মাপে হওয়া স্ট্যানডারড-এর একটি লক্ষ্য। গত মহাযুদ্ধে লন্ডন যখন হিটলারের বোমায় বোমায় অগ্নিকাণ্ড-বিধ্বস্ত, তখন আগুন নেবাবার জন্য প্রচুর নল বা হোস্ পাইপ দরকার হল। বিভিন্ন জায়গা থেকে হোস পাইপ এল। সঙ্কটের সময় সঙ্গীন অবস্থা। কোনটির সঙ্গে কোনটির মাপের ঠিক নেই। জুড়তে গেলে জোড়া লাগে না। স্ট্যানডারড এক নয়। এ ভাবে মূল্য দিয়ে, ঠকে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে উন্নত দেশে আজ "মান" এর এত মান।

ডাঃ ঘোষ বলছিলেন মান নির্ণয় করতে যে লম্বা পরীক্ষা, মতামত ইত্যাদির ব্যবস্থা তাতে মান চাইলেই মান পাওয়া যায় না। নানা স্তরে নানা ভাবে বাজিয়ে দেখে সকলের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পেলে তবে আই-এস-আই মার্কা মেলে। বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনিয়র, রাসায়নিক থেকে নিয়ে ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারী সবাই যেখানে মান সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবেন সেখানেই মান মেলে। বাজারে লোকপ্রিয় অনেক পণ্য আছে, হয়তো বা তার মধ্যে উচ্চ মানের পণ্যও আছে, কিন্তু তাঁরা স্ব-ইচ্ছায় যদি এই বিরাট আয়োজনের আওতায় আসতে চান তবেই আসবেন। মানক সংস্থার অফিস ভারতবর্ষের কয়েকটি জায়গায় আছে। প্রথম মান সচেতনতা প্রসারই ছিল শাখা অফিসগুলির কর্তব্য কিন্তু এখন কাজ এত বেশী যে বহু কাজ স্থানীয় ভাবে করা হয়। কলকাতায় ১১ নম্বর সুতারকিন স্ট্রীটে যে শাখা অফিস আছে স্থানীয় কাজের ভার অনেকটাই তাঁরা করেন, দিল্লির কেন্দ্রীয় মানক ভবনের ভরসা না করে। উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী সকলেই মানের জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, কারণ মানে স্বদেশের বাজার তো বটেই, বিদেশে বিশেষ মর্যাদা। বহির্বাণিজ্য ভাল করে না জেনে বুঝে জিনিস পাঠানো যায় না। লাইসেন্স সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আবেদন-কারীর 'মান' পেতে দেরি হচ্ছে বলে [illegible]

হয়েছে অনেক, কিন্তু আমাদের মেয়েরা খদ্দের হিসেবে এগিয়ে আসেন নি। নিজের চোখে দেখা বিচারের উপর নির্ভর করাই এখনও কেনাকাটার পথপ্রদর্শন করে। তবে আশা করা যায় আজকের কঠিন দুনিয়ার অদূর ভবিষ্যতে তাঁরাও আর পাঁচটা দারিদ্রের মত ব্যবহার্য জিনিসের মান সম্বন্ধেও যত্ন নেবেন।

মাইলোর খই

'নেই কাজ তো খই ভাজ' কথাটি খাঁটি নয় একদম। খই ভাজা বেশ ঝামেলাপূর্ণ কাজ। বাঙ্গালীর ঘরে খই পরম প্রিয় খাদ্যও। সেই খই না পাওয়ার দুঃখ নাকি বাংলার পল্লী অঞ্চলের কোথাও কোথাও মাইলোর খই দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা হচ্ছে। শুনলাম মাইলোর খই খেয়ে খুশী হচ্ছে সবাই। মাইলো সম্বন্ধে কিছু অলোচনা একবার আমরা করেছিলাম। তাই 'মাইলো'র খই ভাজার কায়দার খবর নিতে গিয়ে আমি দেখি উৎসাহের অন্ত নেই। বাংলা দেশের হাওয়ায় যে আর্দ্রতা আছে তাতে নাকি খই একেবারে ফুটন্ত ফুলের মত ফুটছে। আমার তো খেয়ে মনে হ'লো এ অনেকটা ছুট্টার খই এর স্বাদ। মাইলো দিয়ে আর যা তৈরী হয় তার দু একটা নমুনা দক্ষিণ ভারতের দান। খই কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের আবিষ্কার। দিব্যি কড়াইতে বালির খোলায় নারকেল কুচি নেড়ে খৈ ফুটবে। বালি চেলে পরিবেশন করলেই চমৎকার খাদ্য। নুতনত্বেও তো ছেলে বুড়ো সবাই ভালবেসে খাবে দুচারদিন।

—শ্রীমতী

রাজী বিরচিত একটি সঙ্গীত নাকি রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে গাওয়া হইবে এবং গাহিবেন শ্রীমতী সুব্বালক্ষ্মী।—"এই গানে কী সুর সংযোগ করা হয়েছে তা অবশ্য আমরা জানিনে, তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান অবস্থা শুনে মনে হয় পূরবী সুরটাই বোধ হয় লাগসই হবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল, যে নিজে তালকানা এবং ছন্দ বেসুরো।

ওয়েস্ট ইনডিজ দলের ভারত সফর প্রসঙ্গে সংবাদ-পরিবেশক বেশ সাহিত্য ফলাইয়া লিখিয়াছেন—ভারত সফরে তারকা খচিত ওয়েস্ট ইনডিজ দল।

—"এবং নিরস্তে স্টেডিয়ামের দেশে আমরাও ডিজায়ার অব দি মথ্ ফর দি স্টার-এর কথাটাই ভাবছি"—বলেন বিশুখুড়ো।

বর্তমান বিশ্বে সাফল্য সামান্য, নৈরাশ্য অনেক বেশি, বলিয়াছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট।—খুড়ো বলিলেন—"অর্থাৎ উত্থান কম, পতনই বেশি!!"

পলিট ব্যুরোর তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের বিবরণ দিয়া শ্রীসুন্দরায়া শেখ আবদুল্লার মুক্তি দাবি করেন—"সুন্দর, অতি সুন্দর; শেরের মুক্তিতে সুন্দরবন তার বিগত গৌরব ফিরে পাবে"—বলেন সহযাত্রী।

আচার্য বিনবা ভাবে তাঁর ৭২তম জন্মদিনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি আর বক্তৃতা দিবেন না। সহযাত্রী বলিলেন—"বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে, বলে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল কিন্তু ভাবেজীর সে ভাবনা নেই, সংপাত্র শ্রীজয়প্রকাশের হাতে বক্তৃতা-দান করে যান, আসলের চেয়ে সুদ বেড়ে যাবে!!"

বেতন এবং অন্যান্য মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কলিকাতার ৭৫টি সিনেমা হলে ধর্মঘট চলিতেছে। সহযাত্রী বলিলেন—"অথচ আমাদের একটা ধারনা ছিল, সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই ...

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য একতা প্রয়োজন।—"নির্বাচন-খেয়া পার হবার পর একতা-খেয়ানির সঙ্গে

সম্বন্ধটা কী দাঁড়াবে তা অবশ্যি বলা হয়নি"—বলেন শিবুখুড়ো।

কানপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসকর্মীদের সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষণা করিয়াছেন,—দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রশ্নই মুখ্য। শ্যামলাল বলিল—"প্রশ্নটি অতি কঠিন এবং এটা পাঠক্রমের বাইরে বলেই ভয় হয়, ঝেঁটিয়ে দারিদ্র্য বিদায় করতে দরিদ্র না দূর হয়ে যায়!!"

সংবাদে প্রকাশ উলুবেড়িয়াতে নাকি দুই বামপন্থী দলের মধ্যে হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে।—"তাঁরা বন্ধে বিশ্বাসী হলেও হাতাহাতি বন্ধে বিশ্বাসী নন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

'কলিকাতার রাজপথে শিক্ষক-শিক্ষিকার অবস্থান'—একটি সংবাদ শিরোনামা।—"ছাত্ররা যে অতঃপর রাস্তায় এসে দাঁড়াবে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, কয়েকশত রিকশাওয়ালা, হকার, দোকানদার "বনধের দুর্দিন খাবো কী" ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল করিয়া আসিয়া বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়ের বাড়ি ঘেরাও করে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এটাকে বুঝি বলা যায় ইংরেজী ব্যুমেরাং-এর বাংলা ভারশন—ঘেরাওরং!!"

আসাম বিধানসভায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা যখন এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেড় টাকায় 'গৃহিণী' সরবরাহের জন্য কোন এক ঠিকাদার ঠিক করা হইয়াছে, তখন সভার সদস্যগণ বিস্মিত হন (মাগগি গণ্ডার বাজারে এত সস্তায় 'গৃহিণী' পাওয়া যায় বলিয়াই কি এই বিস্ময়?) কিন্তু তাঁদের বিস্ময় কাটিয়া যায় শ্রীচালিহারই পরবর্তী উক্তিতে—তিনি বলিলেন, 'গৃহিণী' হইল কোন এক কোমপানির সেলাইর সাজ-সরঞ্জামের যথা সুতো ছুঁচ প্রভৃতি। সহযাত্রী বলিলেন—"অতঃপর সদস্যগণ হাসলেন, না দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি।"

দমদম থানায় দেড়মণ রসগোল্লা (পাঠক নিশ্চয়ই এখনো জিনিসটি ভুলিতে পারেন নাই) আটক করা হইয়াছে এবং উহা যে নির্ঘাত দুগ্ধজাত ছানা হইতে প্রস্তুত তাহাও পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে।

কিন্তু রসগোল্লাটা লইয়া কী করা যায় তাহা কেহই ধরিতে বা বুঝিতে পারেন নাই। "আমাদের জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারতাম, "ইতর"দের বিলিয়ে দিন, এ জিনিস কি কোন ভদ্রলোক রাখতে পারেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সাহেবগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল সেখানে একটি গাভীর শিঙ-এর গুঁতোয় ঘায়েল হইয়া একটি চিতা বাঘ বনে পালাইয়া যায়। সহযাত্রী বলিলেন—"হবে না কেন, সে দেশেতে বেড়াল পালায় নেংটে ইঁদুর দেখে-রই যে যুগ চলছে!!"

বিদেশী বই ও এদেশী ক্রেতা

২০শে অগাস্ট 'দেশ' পত্রিকায় আলী সাহেবের পঞ্চতন্ত্র পড়ে একটা পুরোনো ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠল। সেই সঙ্গে একটু সান্ত্বনাও পেলাম এই ভেবে যে ব্যথার ব্যথী অন্তত একজনও আছেন।

বিদেশী বই সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাকে একাধিকবার নাকের-জলে চোখের-জলে হতে হয়েছে। কলকাতার সব চাইতে বড় পুস্তক বিক্রেতার শরণাপন্ন হয়েছি, (তাঁরাই সাধারণত আমার পুস্তকের প্রয়োজন মেটান) তাঁরা কয়েক মাস বসিয়ে রেখেছেন এবং তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বলেছেন পাওয়া যাবে না। শেষে সরাসরি বিদেশে চিঠি লিখেছি, সেখান থেকে pro-forma invoice আনিয়েছি, তারপর আমার ব্যাংককে চিঠি লিখেছি টাকাটা পাঠিয়ে দেবার জন্য। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন বই-এর জন্য কোন exchange দেওয়া হয় না। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করেছি, বলেছি পুরোনো সার্কুলার দেখুন তাতে ...শো টাকার সমতুল্য এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর করা যেতে পারে এমন নির্দেশ আছে। তাঁরা ...হয়ে পুরোনো সার্কুলার ঘেঁটেছেন ...রপর যখন দেখেছেন আমার উক্তিই যথার্থ ...খন মোক্ষম এবং শেষ অস্ত্র ছেড়েছেন, আপনার বই 'টেকনিক্যাল' তো? আমি অম্লানবদনে উত্তর দিয়েছি, হ্যাঁ, যদিও আমি মনে জানি আমার বই ফাইন আর্টস সংক্রান্ত। যাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল (একটি ...শেষ ঘটনার উল্লেখ করছি) তিনি কিন্তু ...বার পাত্র নন (যেন আমার বই আনা বন্ধ ...লে তাঁর চাকরীটি বেঁচে যাবে), আমার ...ভয়েসের দিকে তাকিয়ে বললেন কিন্তু ...খানে তো লেখা রয়েছে 'মিনিয়েচার্স ফ্রম ...ড' বেরেনসন কালেকশান', এ বই তো ...ন হচ্ছে ফাইন আর্টস-এর, এর জন্য তো ...চেঞ্জ দেওয়া যাবে না। আমি বললাম ফাইন আর্টস-এর, কিন্তু টেকনিক্যাল। ...পনার সার্কুলারে এমন তো উল্লেখ নেই বইটি সায়েন্স-এর হতেই হবে। সায়েন্স- ...না হয়েও বই টেকনিক্যাল হয়। তিনি ...লেন টেকনিক্যাল মানেই ইনজিনীয়ারিং। ...ম বললাম আজ্ঞে না ডিকশনারিতে সে ...লেখে না, বলে পকেট থেকে oxford- ...ছোট ডিকশনারিটি বার করলুম। ভদ্রলোক দেখেও কিন্তু মানতে রাজি নন। আমি বললুম চলুন আপনার ওপরওয়ালার কাছে। সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বিস্তর তর্কাতর্কির পর শেষে আমার জিৎ। অবশ্য 'এ' ফর্মে আমায় ডিক্ল্যারেশান দিতে হয়েছিল বইটি টেকনিক্যাল।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করলুম। এরকম একাধিকবার আমায় ভুগতে হয়েছে। প্রথম প্রথম যখন আইনের এত অন্ধিসন্ধি জানতাম না তখন নিরাশ হয়ে ফিরেছি। পরে আস্তে আস্তে কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করতে শিখেছি এবং দেখেছি বাঁকা আঙ্গুলে ঘি সহজেই ওঠে। কিন্তু একটা জিনিস আমি আজও বুঝতে পারছি না, কিছু সংখ্যক (তারা নিতান্তই মুষ্টিমেয়) লোকের পড়াশুনো বন্ধ করে দেশ কত ফরেন কারেন্সি বাঁচাবে?

যেবার আমি নিজে সরাসরি বই আনাতে পেরেছি বিদেশ থেকে সেবার আমি লাভবানই হয়েছি। যে-ক্ষেত্রে পুস্তক বিক্রেতা আমার কাছ থেকে নিত পাউন্ড প্রতি ১৬ টাকা এবং ডলার প্রতি ৫ টাকা (মুদ্রামূল্য হ্রাসের আগের কথা বলছি) সেক্ষেত্রে আমায় দিতে হয়েছে যথাক্রমে তেরো টাকা পাঁচ আনা এবং চার টাকা বারো আনা। কাজেই ১ পাউন্ড মূল্যের বই সোজা যদি লন্ডন থেকে আনিয়ে (ডাক খরচ বহন করেও) আমার সাশ্রয় হয়েছে অন্তত কুড়ি টাকা। যে পেটে না খেয়েও বই পড়ে তার কাছে কুড়ি টাকা যথেষ্ট বইকি।

এদেশী পুস্তক বিক্রেতারা বিদেশী পুস্তক প্রকাশকদের কাছ থেকে কত পারসেণ্ট কমিশান পান জানি না। তবে যখন দেখছি এঁরা সরকারী রেটেই বর্তমানে বই বেচছেন এবং তাতে লাভও করছেন তখন অনুমান করতে পারি এঁদের কমিশানের অংকটা সামান্য নয়। অথচ এঁরাই কিছুকাল আগে সরকার-নির্ধারিত বিনিময় হারের ২০ পার্সেণ্ট বেশী ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতেন। মুদ্রামূল্য হ্রাসে আমার যা ক্ষতি হবার তাতো হয়েছেই। (আমার বিদেশী বই কেনা বন্ধ হয়েছে) কিন্তু একটা জিনিস ভেবে তৃপ্তি লাভ করছি যে এইসব রাঘব বোয়ালদের খোরাক কিছুটা কমেছে।

জনৈক পুস্তক প্রেমিক

॥ ২ ॥

আপনাদের ২০-৮-৬৬ (৪২ সংখ্যা) দেশ পত্রিকাতে শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলী মহাশয়ের "পঞ্চতন্ত্র" নামক প্রবন্ধটি পড়ে সত্যি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। আমি নিজে

একজন বিলাতী পুস্তক বিক্রেতা হয়ে কি করে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত ভিত্তিহীন আক্রমণকে বেমালুম হজম করি বলুন তো?

আমি জানি না উনি কোন মিঃ রায়ের কথা বলেছেন যিনি একই বই পাঁচ কপি না কিনলে অর্ডার নেবেন না। আমার মনে হয় তিনি আদৌ পুস্তক বিক্রেতা নন অথবা শ্রীআলীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু যিনি শুধুমাত্র রসিকতা করেছিলেন। আর তাছাড়া আমি বুঝলাম না, এই তথাকথিত মিঃ রায়ের বক্তব্যটাকে শ্রীআলী কি ক'রে মেনে নিলেন সমগ্র বুক ট্রেড্-এর বক্তব্য ব'লে।

এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে—উনি সখেদে বলেছেন যে, বিদেশী বই আগেও পাওয়া যেতো না আর ডিভ্যালুয়েশনের পরে আরো পাওয়া যাবে না। এর কারণ অবশ্য উনি বলেন নি। তবে আমার মনে হয় ঠিক দোকানে ঠিক Title আর Author-এর নাম নিয়ে properly approach করা হয়নি—কারণ যদি কেউ কাঠের ফার্নিচার কিনতে বউবাজারে না গিয়ে নিমতলার কাঠের গুদোমে ছোটেন, তাহলে কি তিনি ঠিক জিনিস কিনতে পারবেন? অবশ্য ডিভ্যালুয়েশনের পরে [illegible] পাওয়া (Specially order দিয়ে [illegible]নো ছাড়া) একটু মুশকিল হয়েছে [illegible]ইকি—কারণ শ্রীআলী নিজেই বলেছে[illegible] ফরেন বুক-সেলারদের হিতৈষী বন্ধুরা ঘটি ঘটি অশ্রু ফেলেছেন...তাঁরা যে কারণে অশ্রু ফেলেছেন—এক্ষেত্রে কিন্তু সত্যি সেই কারণেই বই পাওয়া মুশকিল হবে। এক ডলার বইয়ের দাম ৭·৫০ পয়সা। কিন্তু যাঁদের মাধ্যমে এই বিদেশী বই বাজারে রিটেলারদের কাছে আসে, তাঁদের, অর্থাৎ Wholesellers-দের কমিশন গড়ে শতকরা ৩০ টাকা থাকে—(যদিও ডঃ আলী বলতে যাচ্ছিলেন ৮০% কিন্তু আমাদের প্রতি নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই বলেছেন ৬০%—এটা ভ্রান্ত নিজস্ব ধারণা—কারণ Statistics সাধারণত গড় নির্ণয় করেই হয়ে থাকে।) Publishers আর Publication-এর ওপর নির্ভর করে কমিশন ভ্যারি করে ২০% থেকে ৪০% অবধি। ৫০/৫৫% কমিশন কয়েকটি Publishers বিশেষ বিশেষ Publication-এ allow করেন—সেটা উদাহরণ নয় বরং ব্যতিক্রম, আর ব্যতিক্রম নিয়ে তর্ক চলে না।

এই Wholesellersরা Publishersকে payment করেন ৫·২৫ পয়সা বইটির দাম হিসেবে। তা হলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এদের কত লাভ। এই লভ্যাংশ ২·৭৫ পয়সা থেকে একজন Retailer পায় ১·৫০ পয়সা। অর্থাৎ বাকিটা লাভ, তাই না?—না, এই থেকে চিঠিপত্র লেখালিখি, Bankকে

কমিশন দেওয়া, বইটা আসার postal খরচা—সর্বোপরি নিজস্ব establishment খরচা—এসব বাদ দিলে ২৫ পয়সাও থাকে না। এহেন অবস্থায় যদি কোন Whole-sellers বিদেশী বই নিয়ে না আসেন তাহলে কি খুব দোষের হবে? না দোষের হয়েছিল সেই সব হিতৈষীদের, যাঁরা আমাদের দুঃখে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলেছিলেন? বলবেন যে, যাঁরা Retail করেন তাঁদের তো রইলো ১·৫০ পয়সা? নাঃ, তাও থাকে না—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই Retailerরা Customerদের কিছুটা অংশ discount দিয়ে থাকেন, কারণ এটা এক রকম নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব...

সলিল রায়
প্রপ্রাইটার ঃ শান্তি বুক স্টোরস, হুগলী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

এই বৎসরেই বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হইবে। শিশু সাহিত্যে বাঙ্গালী লেখকগণ বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অথচ তাঁহার জীবন কথা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের ঔৎসুক্য মিটাইবার মত গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে (১৯৬১) লিখিয়াছেন ঃ 'মৌলিক রচনা ও সম্পাদনা-সংকলন ইত্যাদি ধরিয়া বর্তমানে তাঁহার চুয়াল্লিশ খানি বই-এর সন্ধান পাইতেছি।' (পৃ ১৯৮) এই চুয়াল্লিশখানি গ্রন্থের নামের তালিকা বোধ হয় কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। (ইতিমধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পুস্তিকা বাহির হইয়াছে কিনা জানি না) শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যোগীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ "জ্ঞানমুকুল" (১ম সং ১৮৯০; ২য় সং ১৮৯৩) বর্তমানে বিলুপ্ত, দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। (পৃ ১৯৯) অতএব দেখা যাইতেছে তাঁহার সমস্ত রচনা এখন একত্র করা অসম্ভব।

যোগীন্দ্রনাথের "খুকুমণির ছড়া" (১৮-৯৯) সেকালে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছিলেন ঃ 'এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে বোধ করি একটি নূতন উদ্যম। ...আশা করি, বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচারের সহিত বাঙ্গালীর অনাদৃত অবজ্ঞাত গ্রাম্য সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গের সুধী সমাজ কর্তৃক যথোচিতভাবে আরব্ধ হইবে। ("রামেন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৫৬,

২৪২০, ৪২৮) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ "সাধনা" পত্রিকায় (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) এবং 'ছেলেভুলান ছড়া' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (মাঘ ও কার্তিক ১৩০১) ছাপা হয়। (এই দুইটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের "লোক সাহিত্য" গ্রন্থের (১৯০৭) প্রথমে স্থান পাইয়াছে।) অতএব লোকসাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রেও যোগীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য।

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনেরও একটু সম্পর্ক রহিয়াছে বলিতে পারি। ১৯০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে (৭ ভাদ্র ১৩১২) তিনি "বন্দেমাতরম" নামে একখান জাতীয়-সঙ্গীত-সংগ্রহ বাহির করেন। এই সংকলনের ভূমিকায় সখারাম গণেশ দেউস্কর লেখেন; দেশের বর্তমান অবস্থায় এইরূপ একখানি সঙ্গীত সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই সময়ে এই অভাবের পূরণে অগ্রসর হইয়া সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। অধিকতর সুখের বিষয়, তিনি এই পুস্তকখানি স্বদেশী কাগজেই মুদ্রিত করিয়াছেন। সংগ্রহটি প্রকাশিত হইবার এক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ ছাপিতে হয়। British Musium-এ ইহার যে ষষ্ঠ সংস্করণ রক্ষিত আছে তাহার প্রকাশ সাল ১৯০৮। ১৯৪৮ সালে (২রা আষাঢ় ১৩৫৫) যোগীন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ সিটি বুক সোসাইটি হইতে এই বইখানির এক পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির করেন। কিন্তু এই সংস্করণ ঠিক কত নম্বরের সংস্করণ জানি না।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ক্যাটালগ-এ (১৯২০) যোগীন্দ্রনাথ সরকার-কৃত "কর্মলিনী" (১৯১৩) নামে ২৮৫ পৃষ্ঠার একখানি সামাজিক উপন্যাসের উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থখানি কখনও দেখি নাই। ঐ ক্যাটালগ-এ "বিদ্যাসাগর" নামেও তাঁহার একখানি গ্রন্থের (১৯০৮) সংবাদ পাইতেছি। এই বইখানিও দেখি নাই।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
দিল্লী।
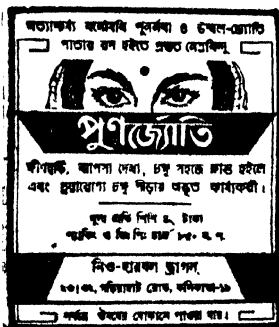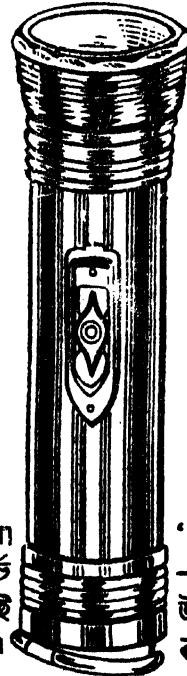
কলকাতার ডায়েরি

সব পালটাচ্ছে, হরতালের চেহারাই বা পালটাবে না কেন? কলকাতা শহরে যাঁরা দীর্ঘকালের বাসিন্দা, তাঁদের অনেকে আগেও হরতালে মেতেছেন, এখনও দেখছেন। কথা হচ্ছিল শ্যামবাজারের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি বললেন, "মশাই, হরতাল আমরাও করেছি, সেই স্বদেশী আমলে। তখন অন্য ব্যাপার ছিল। পান-সিগারেটের দোকান সমেত সব বন্ধ, পথে ফুটবল-ক্রিকেট নেই, ঘরে ঘরে অরন্ধন। হরতালকে আমরা পবিত্র বলে মনে করতাম। প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে এই কলকাতা শহরে হরতাল কবে চালু হল, জানেন? সেই ১৯১৯ সালে। ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্টের প্রতিবাদে। তারপর ব্রিটিশ আমলে বহুবার হয়েছে। এই হরতালই এখন আপনাদের 'বন্‌ধ্‌' হয়ে দেখা দিয়েছে। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ল। আমরা, বাঙালীরা তো শুনি হিন্দীর বিরুদ্ধে, কিন্তু দেখছি, কথাটা ঠিক নয়। বাংলা ভাষায় একের পর এক হিন্দী শব্দ বেশ বেমালুম চালিয়ে দিচ্ছি। গুজরাতী 'হরতাল' শব্দকে কনুই মেরে কায়েম হয়েছে এই 'বন্‌ধ্‌'। গত দু তিন বছরে ঢুকে পড়েছে 'জওয়ান', 'ঘেরাডালো' ইত্যাদি ইত্যাদি, রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে আরও ঢুকবে। তা সে যাক গে, হরতালের কথা বলছিলাম, আমাদের যৌবনে হরতাল জিনিসটা রুটিনের ব্যাপার ছিল না, কদাচিৎ হত। আর এখন? 'পালন' করতে করতে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে আমি সবিনয় জানালুম, এখনও হরতালে দোকানপাট বন্ধ হয় এবং ঘন ঘন ডাকা হয় না।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন—"কী বলছেন? হিসেব নিয়ে দেখুন গত পনের বছরে অন্তত তিরিশবার হরতাল হয়েছে এই কলকাতায়। তা ছাড়া জেলায় জেলায় বাড়তি আরও তো আছেই। এই বছরের কথাই ধরুন না। ন' মাসও কাটেনি। এই কলকাতাতেই তিনটে হয়ে গিয়েছে।"

ভদ্রলোক একটু দম নিলেন, তারপর বললেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা, আর একটি জিনিস বলতে ভুলে গেছি। আমাদের সময় হরতালের দিনে কেউ থিয়েটার সিনেমায়ও যেতুম না, এখন দেখি, হরতাল ভাঙতে না ভাঙতেই সিনেমা থিয়েটার পাড়ায় হাউস ফুল।"

আমি প্রতিবাদ জানিয়েও বললুম, আজ্ঞে না, এবারে সিনেমা হাউসও 'বন্ধ'।

"খোলা থাকলে তো যেতেন"—ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গেই জবাব দিলেন।

"না তাও হত না"—আমি জানাই, এবারের হরতাল বার ঘণ্টার নয়, আটচল্লিশ ঘণ্টার, খোলা থাকলেও সম্ভব হত না।"

"বেশ, সিনেমা না হোক, তাস পেটবেন" তৎক্ষণাৎ তিনি মন্তব্য করেন।

আর কথা বাড়ালুম না। বাত, শ্লেষ্মা বা পিত্ত—একটা কিছুর আধিক্যবশত হোক আর অন্য যে-কোন কারণেই হোক, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সম্ভবত সম্প্রতি কুপিত হয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি নমস্কার সেরে পথে নেমে পড়লুম।

পথে এসে দেখি, দুদিকে দুটো মিছিল। এক দলের বক্তব্য, এবারের আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল ব্যর্থ হয়েছে; অন্য দলের বক্তব্য, সম্পূর্ণ সফল।

কোন্‌টা ঠিক? তার উত্তর জানি, তবে বলব না। বলতে নেই।

*

কলকাতা থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে, তবু এতদিন যাওয়া হয় নি। এই সেদিন গেলাম।

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রামের কথা বলছি। ব্যানডেল থেকে দেড় মাইল, রিকশা সব সময় তৈরী। চমৎকার জায়গা। কলাবাগান আর বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে পিচের রাস্তা সোজা গিয়ে উঠেছে শরৎ-চন্দ্রের বাড়িতে। এপাশে নতুন তৈরী শরৎ স্মৃতিমন্দির, ওপাশে পুরোনো বৈঠকখানা ঘর। পেছনে বাড়ি। বাড়ির সামনে লেখা—'স্বাগত'। কিন্তু সে বছরের একটি দিনের জন্যে। দিনটি ৩১ ভাদ্র, শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। স্বাগতমের তলায় লেখা রয়েছে, 'ভিতরে আসিবেন না।'

অনেকেই আশ্চর্য হন, এইরকম অনাদর বিজ্ঞপ্তিতে। বাড়িটির বর্তমান মালিক, শরৎচন্দ্রের দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে জিগগেস করেছিলাম, কেন ওই কথাটা লেখা।

ভদ্রলোক বললেন, কী করব বলুন, প্রতিদিন প্রচুর লোক আসছে দূর দূর জায়গা থেকে, এসেই বলা নেই কওয়া নেই সোজা চলে যায় বাড়ির ভিতরে। তখন হয়ত বাড়ির মেয়েরা স্নান করছে, কিংবা আমরা খেতে বসেছি। ছাপোষা গৃহস্থ মানুষ, একটু আবরু না থাকলে চলে না। অথচ শরৎচন্দ্রের ভক্তদের ভিতরে ঢুকতে মানা করলে সবাই চটে যায়। তাই বাধ্য হয়ে ওই নোটিস ঝুলিয়েছি।

ব্যাপারটা বোঝা গেল। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, বাড়িটি সরকার নিয়ে নিচ্ছেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি তো নিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের জন্মগৃহও তো অনায়াসে জাতীয় সম্পত্তি করা যেতে পারে। শুনেছি, বাড়ির মালিকেরা বাড়ি ছাড়তে রাজী। তাই যদি হয়, তবে দেরি কেন?

চাণক্য

'মার্লি বন্দরে বন্যা'

সিস্‌লে (১৮৩৯-১৮৯৯)

যে পাঁচজন ইম্প্রেশনিস্ট নিয়ে আলোচনা করলুম তাদের মধ্যে সিস্‌লেই হয়তো সবচেয়ে কম বিখ্যাত। সত্যি কথা বলতে কী, তাঁর ছবি এমন কিছু নয় যা আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে আমাদের, যদিও ইম্প্রেশনিস্ট ওথাপি বর্ণচ্ছটাতে চোখ ধাঁধানোর মসলা নেই, সিস্‌লের যেটা আকর্ষণ সেটা তাঁর কবিত্ব। যে চিত্রকরের ক্যানভাস কবিতা বলে সে চিত্রকর চিত্র-শিল্পী হিসেবে কত বড় সে প্রশ্নের মধ্যে যেতে চাই না, তবে এটুকুই যথেষ্ট বলা যে, সিস্‌লের ছবি আমাদের আনন্দ দিতে সক্ষম; এক কাব্যিক অভিজ্ঞতা।

জন্ম ১৮৩৯-এ প্যারিস শহরে, মৃত্যু ১৮৯৯-এ মরেতে। আলফ্রেড বালক বয়সে কিছু পোরট্রেট ইত্যাদি এঁকেছিলেন কিন্তু পরিণত চিত্রকর হবার পর ল্যান্ডস্কেপ শিল্পীদের দলে নাম লেখালেন। তাঁর ছবিতে কোনো দিনই বিরাট কোনো পরিবর্তন আসেনি, তার কারণ সিস্‌লের চিত্রাদর্শ কখনই ইম্প্রেশনিজমের আদর্শ-চ্যুত হয়নি। প্রথমজীবনের ছবিতে কুর্বে ও কোরোর প্রভাব দেখেই বোঝা যায় কোন ধারার তিনি চিত্রকর। শিল্পী-জীবনের আরম্ভে তাঁর আর্থিক কষ্টে পড়তে হয়নি, বাঁচোয়া, কিন্তু ইম্প্রেশনিস্টদের সঙ্গে তুলি মেলাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর সমালোচনা, বিদ্রূপ, অবহেলা কুড়োতে হয়েছিল সমকালের চিত্রকলাবিদদের কাছ থেকে। এমন সময় গেছে যখন আলফ্রেড সিস্‌লে মাত্র তিরিশ ফ্রাঁ-র জন্য প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিজের ছবি নিয়ে; হয়তো তিরিশ মেলেনি পঁচিশে রফা হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা মজার ব্যাপার আছে—শিল্পী মারা না যাওয়া পর্যন্ত কখনো কেউ তাঁর কাজের দাম দেয় না; সিস্‌লের ক্ষেত্রেও তাই মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ছবি কোনোই সমাদর পায়নি ফ্রান্সে।

সিস্‌লে একজন ল্যান্ডস্কেপ-শিল্পী, এবং ল্যান্ডস্কেপ গণ্ডির মধ্যেও তাঁকে নির্দিষ্ট করা যায় এই বলে যে, সেন্‌ নদীর উপত্যকার ফঁতেব্লো অঞ্চলের দৃশ্য তাঁর চিত্রের বিষয়। মোনের মতই তিনি ছবিতে জলের ওপর আলোর চোখ-ধাঁধানো বহুরঙের খেলা ধরবার চেষ্টা করেছেন আকাশের নিচে বসে রামধনু-প্যালেট নিয়ে প্রকৃতি আঁকবার সময়। কিন্তু এক দিক থেকে বলা যায়, তিনি হয়তো মোনের চেয়ে এই ব্যাপারে অধিক শক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে, কারণ, তাঁর চিত্রে আলোর উচ্ছ্বাস কাঠামো ভাঙেনি ল্যান্ডস্কেপের: গাছ, বাড়ি, মেঘ, জল সমস্ত কিছু নিজের উপাদান নিয়ে স্বস্থানে সঠিক—যেখানে আলোর সর্বোপরি প্রভাবে সব মিলে মিশে দেহহীন, বায়বীয় সত্তা নিচ্ছে মোনের ল্যান্ডস্কেপ। ফর্ম কখনো হারিয়ে যায় না সিস্‌লের ছবি থেকে, তবে চিত্র রচনায় বা চিত্রবিন্যাসে তাঁর অমনোযোগ লক্ষণীয় যার ফলে একটি ক্যানভাসে বহু বেশী জিনিস অসুসজ্জিত-ভাবে এসে পড়ে তাঁর ছবিতে।

১৮৭৯র পর সিস্‌লে মরে শহরে চলে আসেন এবং ফ্রান্সের এই ছোট্ট শহরের অপূর্ব কিছু কবিত্বময়, লিরিকধর্মী ছবি

আঁকেন। যদিও সিস্‌লের জীবন বাজিল, মোনে, রেনোয়ারের মতই, অর্থাৎ শিল্পী-জীবনে এ'রা সবাই চিত্রাদর্শ এক হওয়ায় একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তথাপি দেখবেন সিস্‌লে বিষয়ে বড় কম লেখা হয়েছে, যেখানে রেনোয়ার বা মোনের জীবন বিষয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। কারণ, সিস্‌লে বড় ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—তাঁর জীবনে কোনো অ্যাডভেঞ্চার বা শিল্পীর খেয়ালী হইচই ছিল না। জীবনেই শুধু অ্যাডভেঞ্চারের অভাব নয়, সিস্‌লের ছবিতেও কোনোরকম উন্দামতা বা ঔদ্ধত্য নেই। যদিও ইম্প্রেশনিস্ট, তথাপি দেখবেন রঙের উজ্জ্বল ব্যবহারে চমক দেবার ঝোঁক তাঁর ছবিতে একেবারেই দেখা যায় না, যেটা মাঝে মাঝে রেনোয়ারের বা মোনের ছবিতে অত্যন্ত প্রকট।

আমি সিস্‌লের "মারলি বন্দরে বন্যা" চিত্ররচনাটি নিয়ে আলোচনা করছি। ছবিটিতে কী কী আছে দেখুন:—আকাশ, মেঘ, গাছ, জল, বাড়ি, নৌকো, মানুষ সবই উপস্থিত। বন্যার পরে আকাশ নীল হয়ে গেছে, থইথই জল এখনো সরেনি, নৌকো করে লোক জলমগ্ন অবস্থা দেখতে বেরিয়েছে—ছবিটা চোখের তৃপ্তি, ভাবতে শীতল লাগে। মোনে যদি এ ছবি আঁকতেন তা হলে আলোর খেলায় উচ্ছ্বসিত করে তুলতেন সমস্ত ক্যানভাস এবং বাড়ি, গাছ, নৌকো, মানুষ নিজেদের সত্তা হারিয়ে মিশে যেত আলোকসমন্বয়ে। ছবিটা বন্যার ছবি আর থাকত না, হত আলোর বন্যার ছবি। কিন্তু সিস্‌লে উজ্জ্বল আকাশ, জলে ঝিকমিকে আলোর প্রতিফলন, রঙিন স-ডাস্ট হোটেল সবই এঁকেছেন কিন্তু কোথাও মাত্রা অতিক্রম করে নিজের ইম্প্রেশনিজম্‌ প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি। তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্ব লক্ষণীয় উক্ত চিত্রে—প্রকৃতি এবং মানুষ এ ছবিতে পাশা-পাশি রয়েছে। ক্যানভাসের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে বাড়িটা, যে বাড়ি দেখলেই মনে হয় এই প্রাচীন ইট-কাঠের কাঠামো খালাসীদের জুয়ার আড্ডার খোঁয়াড় এবং দুটি মানুষকে সিস্‌লে এনে প্রকৃতির সারল্য ভেঙে দিচ্ছেন—বন্যা এইজন্যই ছবির বিষয় যেহেতু তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর এক বিরাট আঘাত।

শুদ্ধশীল বসু

REPORT FROM A CHINESE VILLAGE by Jan Myrdal, translated by Maurice Michael, illustrated by Gun Kessle.

সুইডিশ সাংবাদিক ও লেখক জন মিউর্ডাল খ্যাতনামা সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ গুন্নার মিউর্ডালের পুত্র। তাঁর আলোচ্য বইটি মূলে সুইডিশ ভাষায় ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়; ইংরেজী অনুবাদটি ব্রিটেনে প্রকাশিত হয়েছে গত বছর।

১৯৬২ সালে সস্ত্রীক জন মিউর্ডাল চীনা সরকারের কাছ থেকে উত্তর চীনের পার্বত্য অঞ্চলে লিউ লিং নামে একটি ছোট্ট গ্রামে এক মাস থাকবার অনুমতি পান। কৌতূহলী পাঠক মানচিত্রে লিউ লিং-এর সন্ধান পাবেন না, উত্তর শেন্সি প্রদেশে য়েনান নামে একটি শহরের সন্ধান পেতে পারেন, তারই অব্যবহিত দক্ষিণে লিউ লিং, যার পঞ্চাশ ঘর বাসিন্দা, এবং কৃষি জীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। মিউর্ডালের বইটি এই গ্রামের জীবনের উপর আক্ষরিক অর্থে একটি রিপোর্ট : গ্রামের বিভিন্ন নরনারীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ইন্টারভিউ-এর ফলাফল তিনি এতে দাখিল করেছেন। একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকায় তাঁর নিজস্ব বক্তব্যটুকু পেশ করে বাকি সব কথা তিনি লিউ লিং-এর অধিবাসীদেরই বলতে দিয়েছেন, নিজেকে শুধু দরদী শ্রোতা হিসাবে পিছনে প্রচ্ছন্ন রেখে একের পর এক রঙ্গমঞ্চে চরিত্রদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন : তারা বলে গেছে তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী, তাদের প্রাক্‌বিপ্লব জীবনের গ্লানির ইতিহাস, এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন, জমিদার ও কৃষকদের ভাগ্যের পতন-উত্থান, বিপ্লবের ও গেরিলা-যুদ্ধের আশা-আশঙ্কার উত্তেজনা, কুয়োমিনটাঙের নিষ্ঠুরতা, সমবায় প্রথায় কৃষির জন্য তাদের সংগ্রাম, সে পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও তাদের অতিক্রম করবার প্রয়াস, যৌথ খামার প্রথার সাফল্যে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। পুরুষেরা বলে গেছে কৃষক-বিপ্লবে তাদের অংশ গ্রহণের কাহিনী, নারীরা বর্ণনা করেছে পারিবারিক জীবনের বিবর্তন, বিবাহপদ্ধতির পরিবর্তন, আগেকার দিনের বাঁধা পায়ের যন্ত্রণা এবং শাশুড়ীদের গঞ্জনার কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলেছে। ছোট গ্রামের ছোট আশাভরসা : বাইরের জগৎ যাদের কাছে অপরিচিত, রাজধানী রাজনীতি দূরের ধ্বনি—যার প্রতিধ্বনি কখনো বা যাদের গিরিগহ্বরস্থিত গ্রামে পৌঁছায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রন্থের পাতা যাদের চোখের সামনে কখনো ধরা হয় নি, কিন্তু যারা বাঁচতে এবং ভালোবাসতে জানে, বোঝে হাসি-কান্নার মর্ম, পারে উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে পাথুরে জমিতে ফসল ফলাতে, পারে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে আপন অধিকারের জন্য লড়াই করতে—এমন কতগুলি 'সাধারণ' মানুষ তাদের আত্মকাহিনীর মাধ্যমে লাভ করেছে সেই অসাধারণত্ব যা আমরা রসোত্তীর্ণ

জন মিউর্ডাল

উপন্যাস বা নাটকের চরিত্রদের মধ্যে দেখে থাকি। তাদের মধ্যে কেউ নিরক্ষর, কেউ বা অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখেছে, একজনের লেখক হবার আকাঙ্ক্ষা, আর এক জন হয়তো গায়ক হতে পারতো, একজন চিকিৎসক, দুজন শিক্ষক, একজন শিক্ষিকা। প্রবীণ কৃষকেরা পুঁথিবিদ্যায় বঞ্চিত কিন্তু অভিজ্ঞতা-জাত বুদ্ধিতে অপরাজেয়। প্রায় সবাইকারই পারিবারিক পটভূমিকা চাষবাসের। তাদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী, আহার ও পরিচ্ছদ,

---

প্রকাশক . William Heinemann Ltd..

সামাজিক আচারব্যবহার, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য, গৃহনির্মাণপদ্ধতি, সবার উপরে তাদের জীবনের নির্ভর কৃষির সমস্ত খুঁটিনাটি—এসব তথ্য থেকে গ্রামের যে জীবন্ত ছবিটি ফুটে ওঠে তা মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। বিশেষত লেখকের চিত্রশিল্পী স্ত্রী গুন কেসলের গৃহীত আলোকচিত্র এবং অঙ্কিত স্কেচগুলি থেকে পারিপার্শ্বিকের দৃশ্যগত রূপ—প্রকৃতির চড়াই-উৎরাই, বৃদ্ধদের বলিরেখাঙ্কিত মুখ, তরুণীদের সলজ্জ হাসি, শিশুদের বিস্ময়-চকিত স্নিগ্ধতা, গৃহাভ্যন্তরের অনাড়ম্বর সজ্জা, রান্নাঘরের উনুন, আচারের মৃৎপাত্র—সবই এত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে যে, শব্দের সঙ্গে চিত্রের এই যোজনা লিউ লিং নামক গ্রামটিকে আমাদের নিকট প্রতিবেশীতে রূপান্তরিত করে, বিশেষত যখন মনে রাখা হয় যে, বইটির উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মাত্র বছর তিনেক আগে এবং ঐ মানুষগুলি ঐ পারিপার্শ্বিকেই এখনও তাদের সহজ সুখ-দুঃখে জীবন-যাপন করে চলেছে, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আশায় শুধু দিন গুনছে না, পরিকল্পনা করছে এবং খাটছেও বটে। নয় বছরের ছোট্ট মেয়ে হু য়েন চিং এতদিনে নিশ্চয় কিশোরী, সে কি এখনও স্কুলে যাচ্ছে, না আবার স্কুল পালিয়ে দিদিমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে? হারানো দশ সন্তানের শোকে এখনও কি অশ্রু-বিসর্জন করেন প্রৌঢ় লি হাই-যুআন? তাঁর স্ত্রীর কি এখনও আশা যে, তাঁদের একমাত্র জীবিত সন্তানের বধিরতা একদিন ঘুচবে? হারানো ডাক্তারী বইগুলির জন্য এখনও কি শোক করেন বৃদ্ধ কাও চিয়া-জেন?

তাঁর ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে, সুইডিশ পল্লীজীবনের প্রতি নাড়ীর টানের দরুন চীনের স্বাধীনচেতা কৃষকদের মর্ম-কথা বুঝতে তাঁর বিশেষ সহায়তা হয়েছে। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি খুঁজেছেন 'সাযুজ্য সংযোগ', শোধ করেছেন পূর্বপুরুষদের নিকট তাঁর ঋণ। কিন্তু এই আবেগ কেবল তাঁর কর্মপ্রেরণার উৎস, তা তাঁর রিপোর্ট নেবার ও দেবার আঙ্গিককে যাতে প্রভাবিত না করে তার জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন: নিজের থেকে তাদের দূরত্ব বজায় রেখে তাদের আত্মকথা বলতে অবাধিত সুযোগ দিয়েছেন, দোভাষীর সাহায্য নিয়ে কথোপকথনে একটি শান্ত অনুত্তেজিত তৃতীয় পক্ষনির্ভর 'ক্লিনিক্যাল ইন্টারভিউ'এর ছন্দ এনেছেন। বইটি তিনি লিখেছেন আধুনিক চীন সম্বন্ধে কোনো 'সর্বশেষ সত্য' পরিবেশনের উদ্দেশ্যে নয়; কোনো দেশ সম্বন্ধে তেমন কোনো শেষ কথা বলাও অসম্ভব। চীনের কৃষকবিপ্লব, যা আধুনিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তা একটি ছোট চীনা গ্রামের কৃষকদের নিজেদের চোখেই কেমন দেখায়, তাতে তারা যে অংশ নিয়েছে সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা যা-ই বলুক, তাদের কি মতামত, পুরোনো আর নতুন জীবনের মধ্যে কি কি পার্থক্য তাদের কাছে বিশেষ অর্থবহ—তিনি সে-সবের উপরেই একটি তথ্যনির্ভর মানবিক ডকুমেন্টারী রচনা করেছেন। তাঁর মতে শুধু ভাসা-ভাসা 'ইমপ্রেশনের' বর্ণনা দিয়ে এশিয়ার চাষীদের জীবনের বাস্তবতাকে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের কাছে বোধ্য ও প্রাঞ্জল করা সম্ভব নয়, তার জন্য এ জাতীয় প্রামাণ্য রিপোর্ট চাই। তাঁর এ প্রত্যয় জন্মায় দিল্লীতে বিভিন্ন সমাজ-তাত্ত্বিক বৈঠকে সুদীর্ঘ আলোচনায় অংশ গ্রহণের ফলে: যাঁদের সঙ্গে আলোচনা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাঁদের মধ্যে তিনি শ্রীমতী কুসুম নায়ারের উল্লেখ করেছেন—ভারতীয় পল্লীজীবনের উপর শ্রীমতী নায়ারের 'Blossoms in the dust' বইটি তাঁর মনে নাকি গভীর রেখাপাত

করে। সে কারণে ভারতীয়দের কাছে মিউর্ডালের রিপোর্টের একটি বিশেষ আবেদন ও মূল্য নিশ্চয় আছে।

অবশ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে বইটি পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝবেন ভারতীয় পাঠকের পক্ষে বইটির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি। চীন ভারতের নিকট প্রতিবেশী, সন্নিহিত অতীতে 'ভাই-ভাই', কিন্তু বর্তমানে তার সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক মোটেও প্রীতির নয়। এই অমিত্র প্রতিবেশীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে শুধু পিকিং সরকারের আস্ফালন, মাও সে-তুঙের বিভিন্ন সংলগ্ন-অসংলগ্ন বাণী বা লাল রক্ষিবাহিনীর পশ্চিমবিরোধিতার মজাদার খবর এসব দিকে নজর রাখলেই চলবে না, তার আভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস কোথায় তার সন্ধান নিতে হবে। তাঁর রিপোর্টের জন্য উত্তর শেনসির অন্তর্গত একটি গ্রামকেই মিউর্ডাল বেছে নিয়েছিলেন কেন তার কারণ একাধিক, কিন্তু প্রধান কারণগুলি এই যে, সে অঞ্চলের কৃষকেরা অসাধারণ কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও স্বাধীনচেতা হওয়াতে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সেখানে কৃষকবিদ্রোহের একটি ঐতিহ্য আছে, ১৯৩০ সালে সেখানকার কৃষকেরা জমিদার ও খাজনা-আদায়কারীদের বিতাড়িত করে জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়, তার পরবর্তী অধ্যায়ে এ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখান থেকে প্রেরণা লাভ করে, তথাকথিত 'মুক্তি সেনাবাহিনী' এখান থেকেই সারা চীন জয় করে। আর এ অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের মধ্যে লিউ লিংকেই বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ এই যে, কৃষকবিপ্লবের কতগুলি দিকের একটি অবিমিশ্র ও স্পষ্ট পরিচয় এখানে মেলে, এ গ্রামের কৃষক নেতারা মাও সে-তুং উত্তর শেনসিতে পদার্পণ করার আগেই নিজেদের বিপ্লবকে সাফল্যের পথে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন, বিপ্লব তাঁদের পক্ষে বহিরাগত ছিলো না, ছিলো স্বকৃত আন্দোলন, এবং সমবায় ও যৌথ চাষপ্রথা নিয়ে চীনের সর্বপ্রথম পরীক্ষানিরীক্ষার অন্যতম ঘটনাস্থল এই গ্রামটি। এ-সমস্ত কারণে এ বইটি থেকে গ্রামীণ নরনারীদের জবানবন্দিতে কৃষিবিপ্লবের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা বিশেষ মূল্যবান ; একই ঘটনাবলীর উপর একাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্যদানে একটি বহুমাত্রিক বাস্তবতা মূর্ত হয়ে ওঠে, বিভিন্ন জবানবন্দির আপাত-বিরোধিতা প্রচ্ছন্ন সত্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে।

সমবায় ও যৌথ চাষের প্রবর্তন করতে গিয়ে কৃষক নেতারা দেখেন যে, জমিদার-বিতাড়নের পরও নিজেদের মধ্যেই অনেক বাধা আছে, যারই একটু ভালো জমি বা অপরাপরের সঙ্গে হাত মেলাতে অনিচ্ছুক; এমন অবস্থায় জবরদস্তি না করে শুধুমাত্র আলোচনা, বিশ্বাস উৎপাদন ইত্যাদির সূত্রে, প্রয়োগ করে, মিলিত উদ্যমের অধিকতর উৎপাদনী ক্ষমতার প্রমাণ হাতে-নাতে দিয়ে ধীরে-সুস্থে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। সংঘে যোগদান ছিলো সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত; কাউকে জোর করা হয় নি। ফলে ক্রমে ক্রমে সকলেই সংঘের উপযোগিতায় আস্থাবান হয়ে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছে। প্রথম প্রথম প্রত্যেক চাষী মিলিত জমিতে নিজের ভাগ অনুসারে শস্যের অংশ পেতো, পূর্ণ যৌথ প্রথা চালু হবার পর শুধু শ্রম অনুসারে শস্যের বণ্টন হচ্ছে; তা ছাড়া যে যে পরিবারে শারীরিক বা অন্য কারণে খাটিয়ে মানুষের অভাব তাদের শস্যসাহায্য দেওয়া হচ্ছে। শস্যোৎপাদন ছাড়াও প্রতি পরিবারের নিজস্ব ছোট প্লটে পারিবারিক প্রয়োজন ও ইচ্ছামত সব্জি ফলানোর অধিকার আছে। এ-সমস্ত উপায়েই চাষীরা নিজেদের মালিক হতে পেরেছে, পেয়েছে পরিশ্রমের মূল্য। নিজেদের ব্যাপারের দেখাশোনা তারা নিজেরাই করে—তাদের স্বায়ত্তশাসনের গণতান্ত্রিকতা লক্ষ করবার মত। ভারতের কৃষি সমস্যায় এসব তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। পিকিঙের সঙ্গে আমাদের মতের মিল না থাকলেও লিউ লিঙের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

ভিয়েৎনামে এখন যে সংঘর্ষ চলেছে, ভিয়েৎনামী কৃষকদের চোখে তা কেমন লাগে তাও এ বই থেকে অনুমান করা যায়।

কেতকী কুশারী ডাইসন

কবিতা

অলকানন্দা। নিশিকান্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্লট। কলিকাতা-৫১। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এখনকার মাঝারি-ধরনের কবিদের 'প্রেরণা' নিষিদ্ধ অলিন্দে, সিনেমার পোস্টারে কিংবা সচল-শকটের জানালায় অবস্থান করে থাকেন। কিছুকাল আগে এক শ্রুতকীর্তি বিদেশী কবিকে বলতে শোনা গেছে, তাঁর কাব্যলক্ষ্মী পায়ের নীচের শান উদ্ভিন্ন করে পদনখ থেকে ক্রমশ তাঁকে আশরীর অধিকার করে ফেলেন। আগে কিন্তু ব্যাপারটি এরকম ছিল না। তখন কাব্যাধিষ্ঠাত্রী ছিলেন দেবদুহিতা। মাটিতেও তাঁর গতায়াত ছিল, তখন স্মৃতি-সংস্থিত কিশোরপ্রেমের অনতিসান্নিহিত স্বর্গ থেকে কবিকে তিনি প্রভাবিত করতেন। রবীন্দ্রনাথ বাদ থাকুন। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে শিরোধার্য করেছিলেন, সেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যলক্ষ্মী অলকা ও অমরায় আরূঢ় থেকেই দায়িত্ব সমাপন করেননি, কবিকে সেখানে সনির্বন্ধ স্বাগত জানাবার জন্য দ্যুলোকদেহলীতে সশরীরে হাজির থেকেছেন।

স্বর্গের দূতী যে কাব্যলক্ষ্মী, তার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের আর তেমন পরিচয় নেই। তাকে আমরা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের লীলাসঙ্গিনীর মধ্যে সর্বশেষ প্রত্যক্ষ করেছি, এবং তাকে আমরা কালক্ষেপ না করে তুলে দিয়েছি মরমীয়াদের হাতে, তন্ত্রাচারীদের হাতে; অর্থাৎ কবিতার প্রকোষ্ঠ থেকে সাধন-আশ্রমে। এর আগে তার দরকার হয়নি : দীর্ঘ পুরাতন বাঙলা সাহিত্য ধরে মরমী চর্যা ও কাব্য-সাধনা ছিল অন্যোন্যনির্ভর। বলা বাহুল্য, এই মুহূর্তে তা নিতান্তই পুরাতন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আটপহরিয়া পৃথিবীর প্লাবিতে বিপর্যস্ত হয়ে তারই মধ্যে আমরা ওতপ্রোত রয়েছি। তার বাইরের সত্যে আর আমরা তেমন যত্ন নই।

অন্তত তার উপরের সত্যে আমাদের আর তেমন আকর্ষণ নেই। আর নিশিকান্তের এই কবিতাগুচ্ছের মুখপাতেই সেই স্বর্গের নদীটি; অলকানন্দা যার নাম, স্বর্গের রূপ ও রহস্যের কিরণ-কণিকাগুলি তরঙ্গিত করে বয়ে যায়। কয়েক পাতা না এগোতেই চোখে পড়ে তাঁর কবিতার ঈশ্বরী সর্বতোভাবেই জগদীশ্বরী, মহামায়া। তিনি যে-ভাবে সেই ঈশ্বরীর নিয়োজিত চিরকিশোর কবির ভূমিকায় প্রস্তুত হন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হেতু তা আমাদের অপরিচিত লাগে না, দূরেরও লাগে না। অথচ সময়ের দিক থেকে তিনি আমাদের আরও কাছের জন বলে, আমাদের সেই স্খলিত বিলীয়মান বিশ্বাসটিকে তাঁর কবিতার মধ্যে এত সশরীরে চলাফেরা করতে দেখে এতক্ষণ-বলা ঐ যুগ-ব্যবধানের কথা একবার মনে হয়, একবার মনে হয় তিনি আমাদের পৃথিবীর আঁচ এড়িয়ে খুব সংবৃত জগতের মধ্যে পুরাতন ঐশ্বর্য-সম্ভার নিয়ে দরজা দিয়েছেন।

বস্তুত কোনো কোনো অংশে নিশিকান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগত সধর্মা। সেই অংশ এত আপাতদৃশ্য যে, চিনিয়ে দেওয়ার দরকার করে না। অনেক জায়গায় রবীন্দ্র-নাথের ভাবনা ও ভাষা ব্যবহার করেই তাঁর কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই-জন্যে তাঁকে চিনে নেওয়ার বা চিহ্নিত করার প্রলোভন বিপজ্জনক। রবীন্দ্রনাথের যে প্রশংসা এই বইয়ের জ্যাকেটে মুদ্রিত রয়েছে, তাও তাঁর সম্বন্ধে অতি-পল্লবগ্রাহী পরিচয়, খুব সুবিচারও নয়। যে ঐতিহ্যাশ্রয় দিয়ে আমরা দুজনকে সন্নিহিত করে একজনকে প্রমাণ করতে চেয়েছি, তা-ও আপাতসুবিধাকর মাত্র। অধিকাংশ দিক থেকেই নিশিকান্ত অনেক বেশী আমাদের বাঙালী ঐতিহ্যবাহিনীর অঙ্গী-ভূত। এতে ভুল বোঝার কারণ নেই, তাঁর রবীন্দ্রীয় এবং রবীন্দ্র-পুরস্কৃত সুরচিত বাণীশিল্প সত্ত্বেও তিনি অনেক বেশী নাইভ্‌, প্রাকৃতিক, স্বভাবানুগামী। তারও চেয়ে বড়, দুজনে আলাদা পৃথিবীর মানুষ। নিশিকান্ত রবীন্দ্রনাথের ভয়ানক বিপরীত। যদিও তাঁর 'ঊর্ধ্ব-আকুল তৃষা' সহজে মিলিয়ে নেওয়া যায়, 'ধূলিজনমের যবনিকা টুটি উজ্জ্বল উপলব্ধি নয়' ব্যবহৃত লাগে, কিংবা তাঁর

অতীন্দ্রিয়-রূপান্তরে প্রমূর্তিয়া দাও সর্বদেহ
এ সীমার গণ্ডি হোক অসীমের বিকাশের গেহ

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত সীমা-অসীম-তত্ত্বের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়, তথাপি

তাঁরা সগোত্র নন। একটু অভিনিবেশেই ধরা পড়ে নিশিকান্তের বেদবাহ্য বিশ্বাস, আর আমাদের সব চাইতে পরিচিত সমা-লোচনার বাক্যাংশটি হলো: রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট। নিশিকান্তের শব্দসম্ভারের অস্খালিত তৎসমতা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় পদতলের মাটির আর্দ্রতা চারিপাশের বন্য বহু-স্ফুরিত সবুজের জটিল কটুগন্ধ এবং তার ভিতরকার আদিম বাঙলা দেশকেও অনুভব করে ওঠার কোনো বাধা নেই। আর মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য, বাঙলা দেশের ঐতিহ্য বেদান্তের নয়, বেদবাহ্য তন্ত্রাচারেরই বটে।

আসলে নিশিকান্তের নিকটতম কোনো কবি-সতীর্থকে যদি সন্ধান করতে হয়, তা হলে মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর ঈষৎ সম্ভাবনা অতিক্রম করে অন্তত অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পিছোতেই হয়। আসলে তাঁর অনন্য মিল রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে, তাঁর আচরিত মাতৃকাতন্ত্র এবং তাঁর বাণীনিঃশ্বাস—সব সমেত। 'আমি তোমার অলস ছেলে' কিংবা 'মাগো তোমার আকাশভরা কোলে/হাসবো আমি শিশু-চাঁদের মতো' ইত্যাদি চরণগুলি অসচেতন হলেও হাতের পাতায় উঠে আসে। আর, যে কবিতায় জননী তাঁর জন্য কনককলসে আলোকসুধা এনে দেন (স্বর্ণকলস), যে কবিতায় নিস্তব্ধবয়ান অটলমুখের চরণতলে তাঁর জীবন্মুক্ত গতি জীবন-উন্মুখ হয়ে থাকে (নিস্তব্ধবয়ান), অথবা যেখানে কেশরীবাহনা মাতার বাহন হিসাবে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন: 'জগৎ ধারণ করো, আমি করি জগদ্ধাত্রী দেবীরে ধারণ' (ত্রিকূল), সেখানে বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকের আত্মোপলব্ধিকালীন মহাশক্তির স্মিতমুখী জগদ্ধাত্রী-রূপের সমীপে আত্ম-নিবেদনে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতার পঙক্তি-গুলি যেন সহসা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তত কয়েকটি কবিতায় তিনি অবিমিশ্র সহজিয়া, শেষ কবিতায় (কমলতরী) রাগানুগা বৈষ্ণব কবিদের বংশধারা যেন তাঁর মধ্যে সঞ্জীবিত লাগে, এবং দুই জায়গাতেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল নেই।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নন এবং নিশিকান্ত তাঁর কবিতার বহু স্থানে যা বলেছেন এবং 'অর্ঘ্য' কবিতার পুরো পরিসর জুড়ে যা প্রতিপাদন করেছেন তা হলো—কবিতা তাঁর কাছে শিল্পসাধনা নয়, সাধনচর্যার অঙ্গীভূত। সেই কারণে রবীন্দ্র-সহায়িত এবং স্বপরিশীলিত বাণীশিল্প সত্ত্বেও তাঁর কবিতা বড় নিরাবরণ, বক্তব্যভারাতুর এবং রবীন্দ্রানুসারী বা রবীন্দ্রোত্তর কোনো গোষ্ঠেই তাঁর কবিতাকে খুব খাপ খাওয়ানো যায় না। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর কবিতাকে কান্তিকান্ত কুলবলয়ে রেখে এসেছে কিংবা তাঁর বিশ্বাস, তাঁর কবিতাকে রক্ষা করতে

পারেনি—এ কথাও নিতান্ত অর্থহীন। বরং তাঁরই কবিতার ভাষা ধার করে লেখা যায়: নিরল বাণী হারশিখরিত সরণীতে তাঁর কবিতা এখনো বিজনচারিণী, প্রবেশাধিকারকুণ্ঠিত নিশাভ্যন্তরে, গুহা প্রদোষান্ধকারে এবং অপাবৃত আকাশের সূর্যচন্দ্রতারকাদীপনের তলায় একাকী রহস্যে স্নান করে দাঁড়িয়ে আছে। নিরাবৃত নিসর্গ বলতে যা বুঝি আমাদের চেতনা থেকে বা আমাদের ভৌগোলিক দেশ থেকে বোধ করি তা এখনো অন্তর্হিত হয়নি।

নিশিকান্তের কবিতায় আধুনিক পাঠক ঐ ক্রমশকুণ্ঠিত উদয়াস্তনিসর্গের সাক্ষাৎ পেয়ে বিস্মিত হবেন, তদ্ভিন্ন কাব্যানুরাগীদের জন্য এই সহজ আমন্ত্রণ নিশিকান্ত তাঁর গুহ্যসাধনমার্গ থেকেও অস্বীকার করেননি। তার উপরে রয়েছে এই কবিতাগুলির বিস্ময়কর উজ্জ্বল প্রতিমানগুলি, এবং সুদর্শন নিক্কণিত শব্দসম্ভার। এই বইয়ের আদ্যোপান্ত রচিত রূপোলী শব্দের আনুকূল্যে, ঐ মহার্ঘ্য অলংকৃত শব্দসম্ভার বহু দিন বাঙলা কবিতায় দেখা যায়নি, এমন কি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরও শীতল, হিসেবী মেজাজে শব্দের ঐ স্বপ্নোপচয় ঝরে গেছে। আর যাঁরা যুগানুবর্তিতার তাড়নায়, প্রাত্যহিকতার ভাষায় কবিতা লিখতে নিরত—তাঁরাও, আমার মনে হয়েছে, এই কবিতা পড়ে অন্তত এক লহমা আত্মবিস্মৃত হয়ে ভাবতে পারবেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী পরিমাণে সচ্ছল ও পুরস্কৃত ছিলেন। নিশিকান্ত সেই পুরোনো অম্বরিস্তকর স্মৃতিগুলিকে তাঁর পদ্যবন্ধে পরিবেশন করেছেন। ৪০৬/৬৫

ধর্ম

শ্রীশ্রীদেবর্ষিনারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী (শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী—তৃতীয় খণ্ড)। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃ সম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা, তর্ক-তর্কব্যাকরণতীর্থ। পূর্বভাগ মূল্য ৭ টাকা ৫০ পয়সা; উত্তরভাগ মূল্য টাঃ ৮·০০।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদি আচার্য শ্রীহংস ভগবান। তাঁর শিষ্য শ্রীসনকাদি চতুঃসন—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার, যাঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র, তাঁদের শিষ্য দেবর্ষি নারদ এবং তাঁর শিষ্য শ্রীনিম্বার্ক। দুই খণ্ডে রচিত এই সুবৃহৎ গ্রন্থে দেবর্ষি নারদ সম্পর্কে ও তাঁর উপদেশাবলী নিয়ে সম্যক আলোচা করেছেন সুখচর কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মোহান্ত স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী।

দেবর্ষি নারদের পরিচয় অবশ্যই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য হিসাবেই নয়। তিনি দেবর্ষি—সকল শাস্ত্র-পুরাণাদিতে—তাঁর উল্লেখই নয় কেবল, তাকে গৌরবের ভূমিকায় দেখা যায়। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, পরমজ্ঞানী, ভগবদ্‌গুরু। সাধারণ লোকের ধারণা নারদ দেবতাদের দূত এবং যেখানে যতো কলহ তার মূলে তিনি। দেবতাদের দূত তিনি নিঃসন্দেহ—সে দৌত্যের মূলে আছে মানবকল্যাণ, ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। আর কলহপ্রিয়তা? শ্রীকৃষ্ণের কথায় "দেবর্ষি নারদ জগতের কল্যাণের জন্যই কলহ উপস্থিত করেন, কোনরূপে স্বার্থের জন্য নহে।"

দেবর্ষি নারদের বিচিত্র বিশাল জীবনী ও তাঁর বহুমুখী জ্ঞান ও বহুতর উপদেশ বিভিন্ন শাস্ত্র-পুরাণাদি মন্থন করে স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী আমাদের উপহার দিয়ে... কেবলমাত্র ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নন, অতি ...রণ পাঠকও—অবশ্য শ্রদ্ধাবান হওয়া চাই—এই গ্রন্থপাঠে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করবেন। সম্পূর্ণ একালের আস্তিক্যবুদ্ধিহীন পাঠকও দেবর্ষি নারদের বৈদগ্ধ্য ও সূক্ষ্ম কৌতুকপ্রিয়তায় মুগ্ধ হবেন।

(২২২।৬৬, ২২৩।৬৬)

প্রাপ্তি-স্বীকার

খঞ্জর। শ্রীহিরন্ময় মুন্সী। শ্রীসঞ্জয়কুমার চ্যাটার্জী নন্দভবন, কল্যাণপুর, পোঃ বিঃ দেওঘর, এস পি। মূল্য ০০·৫০।

সাতটা থেকে দশটা ও নটা থেকে বারোটা। শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স ১/১/১ এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য ৫·০০।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম। ডঃ অনুকুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় —৬/১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

ছড়ায় এন সি সি। লেঃ বাসুকীনাথ দাস। নয়া প্রকাশ—২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·৫০।

দুঃখকষ্ট এবং বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও যৌবনদীপ্ত বাঙলায় আজ নবজীবনের জয়গান। সাগর-সংগ্রামী মিহির সেনের সপ্ত-সিন্ধু অভিযান সফল হয়েছে। পর্বত অভিযাত্রী সংঘের উদ্যোগে দুঃসাহসী বাঙালী অভিযাত্রীরা দুর্জয় মানা শীর্ষ জয় করেছেন।

তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের মধ্যে সাঁতার এবং বিপজ্জনক পর্বতে আরোহণ প্রধানত অভিযান হলেও খেলাধুলারই অঙ্গ, এতে উন্নত ধরনের কলা-কৌশল, বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং অসমসাহসের প্রয়োজন। বলা যেতে পারে, রিগার স্পোর্টস। তাই নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ এবং বিভিন্ন রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ পর্বতারোহণকে স্পোর্টসের মধ্যেই ধরে নিয়েছেন। আর সাঁতারের তো কথাই নেই। তবু অভিযানের সঙ্গে স্পোর্টসের অনেক পার্থক্য। স্পোর্টসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রামের আকর্ষণ আছে, কোলাহলমুখর দর্শকের করতালির মধ্যে কলানৈপুণ্য দেখাবার প্রেরণা আছে, কিন্তু জীবনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু অভিযানে পদে পদে বিপদ, পদে পদে বাধা, প্রতিনিয়ত জীবন-সংগ্রাম এবং প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই। অজানাকে জানার আগ্রহ, দুর্জয়কে জয় করার নেশাই অভিযানের প্রেরণা। সাগর-সংগ্রামী মিহির সেন এবং বাঙালী পর্বত অভিযাত্রী দল সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই নতুন নতুন অভিযানের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন এবং দুর্জয় সংকল্পে একের পর এক সাফল্যের তট এবং শীর্ষ স্পর্শ করেছেন। ১৯৬০ সালে যাঁরা নন্দাঘুণ্টি এবং ১৯৬৪ সালে কাব্রুডোম পর্বত জয় করেছিলেন এবং ১৯৬১ সালে প্রাকৃতিক বাধায় মানা থেকে ফিরে এসেছিলেন সেই বাঙালী অভিযাত্রীরাই এবার মানার শিখরে ভারতের তিন-রঙা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে এসেছেন। আর ইংলিশ চ্যানেল ও পক প্রণালী বিজয়ী সাঁতারু মিহির সেন ২৩শে আগস্ট থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর—এক মাসেরও কম সময়ে জিব্রাল্টার, দারদানেলেস ও বসফরাস প্রণালী জয় করে তাঁর সাত সাগরে সাঁতার কাটার স্বপ্ন সফল করেছেন।

দুই অভিযানের সাফল্যই আমাদের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর কাছে পরম আনন্দ-সংবাদ। কারণ, আমরা এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার ক্রীড়ানুরাগী সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকার বাঙালী যুবকের অভিযান-স্পৃহায় যাঁর অপরিসীম আগ্রহ ও আনন্দ, তিনি পর্বত অভিযাত্রী সংঘের সভাপতি হিসাবে শুধু মানা অভিযানেই আর্থিক সাহায্য করেন নি, পক প্রণালী থেকে আরম্ভ করে মিহির সেনের প্রতিটি অভিযানে আর্থিক সাহায্য করেছেন, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। বাঙালী ছেলেদের নন্দাঘুণ্টি এবং কাব্রুডোম জয়ের মূলেও আমাদের ক্রীড়ামোদী এবং অভিযান উৎসাহী সম্পাদকের দান ছিল অভিযাত্রীদের প্রধান সম্বল। সুতরাং গর্ব এবং আনন্দ আমাদেরও কম নয়।

*

পর্বতারোহণে যেমন জীবনের আশঙ্কা আছে, বরফের মধ্য দিয়ে খাড়াই পর্বত উত্তরণে প্রতিনিয়ত পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে, ঝড়-ঝঞ্ঝার বিপদ আছে, ধসের তলায় চাপা পড়ে সমগ্র দলের ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তেমন সাগরের মধ্যে সাঁতার কাটারও বিপদ অনেক। সাপ, হাঙ্গর, জেলি ফিশ, ভয়ঙ্কর বরাকুদা মাছের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে তরঙ্গসঙ্কুল অশান্ত সমুদ্রে সাঁতার কেটে সাফল্যের তট স্পর্শ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাপ, হাঙ্গর বরাকুদা ছাড়াও নানা জানা-অজানা প্রাণীর আবাসস্থল হচ্ছে সমুদ্র। সুতরাং প্রতিনিয়ত অজানা আশঙ্কা। তার

সপ্ত-সিন্ধুর সফল অভিযান

ইংলিশ চ্যানেল ও পক-প্রণালী পারের পর সাগর-সংগ্রামী মিহির সেনের স্বপ্ন ছিল সপ্ত-সিন্ধু জয় করা। জিব্রালটার, দারদানেলেস এবং বসফরাস প্রণালী জয়ের পর আজ সে স্বপ্ন সফল। মিহির সেনই পৃথিবীর প্রথম পুরুষ যিনি পাঁচটি অভিযানে সাত-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে সাফল্যের তট স্পর্শ করেছেন।

সাফল্যের খতিয়ান

ইংলিশ চ্যানেল পার—১৯৫৮-র ২৭ অক্টোবর। সময় ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। ইংলিশ চ্যানেলের প্রস্থ কুড়ি একুশ মাইলের মত।

পক প্রণালী পার—১৯৬৬-র ৫ ও ৬ এপ্রিল। সময় ২৫ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। ভারত মহাসাগরের বুকে সিংহলের তালাইমানার থেকে ভারতের ধনুষ্কোটি পর্যন্ত দূরত্ব ২২ মাইল।

জিবরালটার প্রণালী জয়—১৯৬৬-র ২৩ আগস্ট। সময় ৮ ঘণ্টা ১ মিনিট। আতলান্তিক ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্তী জিবরালটার প্রণালীর দূরত্ব স্পেনের উপকূল থেকে মরক্কোর দিকে চিউটা পর্যন্ত ২৩ মাইল।

দারদানেলেস প্রণালী অতিক্রম—১৯৬৬-র ১০ সেপ্টেম্বর। সময় ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। মর্মর সাগরের গালিপলি থেকে এজিয়ান সাগরের মোহনা পর্যন্ত দারদানেলেস প্রণালীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ মাইল।

বসফরাস বিজয় — ১৯৬৬-র ২১ সেপ্টেম্বর। সময় ৪ ঘণ্টার কিছু কম। কৃষ্ণ সাগরের রুমেলিফেনার থেকে মর্মর সাগরের লিনডারস টাওয়ার পর্যন্ত বসফরাস প্রণালীর দূরত্ব ১৬ মাইল।।

বসফরাস প্রণালী পারের আগে মিহির সেনের গায়ে 'গ্রীজ' মাখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রী সেনের চোখে মুখে দৃঢ়তার অভিব্যক্তি

উপর স্রোতের আবর্ত, ঘূর্ণিস্রোতের ছলনা এবং প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা। ঝড়ের সময় সমুদ্রের জল যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে, যে-ভাবে উত্তাল তরঙ্গ রুদ্রনৃত্যে লক্ষ হাতে করতালি বাজায় তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো জানবার কথা নয়। ভুক্তভোগী হয়েও মিহির সেন বার বার অভিযানে নেমেছেন, সমুদ্রের ভয়াল সুন্দর রূপের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের পাড়ি জমিয়েছেন এটাই বিশেষত্ব।

কি প্রয়োজন ছিল মিহির সেনের এই কষ্টসাধ্য অভিযানে নামার? তিনি বুদ্ধি-জীবী ব্যারিস্টার। ভারতের প্রথম সাঁতারু হিসাবে প্রথম জীবনেই ইংলিশ চ্যানেল জয় করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তারপর অভিযানে এগিয়ে আসার তো তাঁর কোন প্রয়োজনই ছিল না! দেহের উপর বয়সের ছাপও নেমে আসছিল। কিন্তু বয়সের ভার তাঁর মনের সজীবতাকে একটুও ম্লান করতে পারে নি, অভিযান-স্পৃহায় চিড় ধরাতে পারে নি। বরং অনুশীলনের রেওয়াজ রেখে নিজেকে ধীরে ধীরে অধিকতর কষ্টসাধ্য অভিযানের জন্য গড়ে তুলেছেন। অজানাকে জানার আনন্দে, অজেয়কে জয় করার নেশায় আরও মেতে উঠেছেন। তিনি বাঙালীর 'ঘরকুনো' অপবাদ সাগরের জলে ধুয়ে দিতে চেয়েছেন। তরুণ যুবকদের দেখাতে চেয়েছেন, চেষ্টার অসাধ্য পৃথিবীতে কিছুই নেই। তিনি নিজেই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ১৯৫৮-র অক্টোবর মাসে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের আগে, একবার নয়, দুইবার নয়—পাঁচবার মিহির সেন চ্যানেল অতিক্রমে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থতা তাঁকে বিমুখ করতে পারে নি। মিহির সেনের সাগর-অভিযান থেকে আগামী দিনের উৎসাহী যুবকদের এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।

সমুদ্রে শুধু সাঁতার কাটাই নয়—সাঁতার কাটার আয়োজন এবং ব্যবস্থাদি করাও যে কত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার ব্যাপার, বিদেশী মুদ্রার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাও কারো অজানা নেই। বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ, ছাড়পত্রের ব্যবস্থাদি করার ঝামেলাও অনেক। স্বীকার করি, মিহির সেনের পক্ষে যেটা সহজে সম্ভব হয়েছে, অপরের পক্ষে সেটা অনেক কষ্টসাধ্য। কিন্তু এ কথাও সত্য, ধাপে ধাপে এগিয়েছেন বলেই মিহির সেন তাঁর অভিযানের আয়োজনকে সহজ করে নিতে পেরেছেন। অপর সাঁতারুরাও যদি ধাপে ধাপে এগিয়ে যান তবে নিশ্চয়ই সাফল্যের তট স্পর্শ করতে পারবেন।

সংবাদে প্রকাশ, মিহির সেনের সাত সাগরে সাঁতার কাটার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নাভা পাবলিক স্কুলের ১৫ বছর বয়সী সাঁতারু দারী ঠক্কর সিং দিল্লির একটি সুইমিং পুলে ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট অবিরাম সাঁতার কেটেছে। সেও ইংলিশ চ্যানেল, পক প্রণালী, জিব্রাল্টার, দারদানেলেস ও বস-ফরাস জয় করতে চায়। প্রশংসনীয় উদ্যম, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দারী ঠক্কর সিং-এর মত ভারতের আরও পাঁচজন তরুণ যদি এই প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসে তবে সরকারের পক্ষে কি সকলকে সাহায্য করা সম্ভব হবে? নিশ্চয়ই না। এইসব অভি-যানের জন্য যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন।

মিহির সেনকেই কি বিদেশী মুদ্রার জন্য কম অসুবিধায় পড়তে হয়েছে? তাই তরুণদের কাছে আমার পরামর্শ ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার। আর সংগোপনে নিজেকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলার।

আজ বিশ্বের সাঁতার-ক্ষেত্রে তরুণদেরই জয়গান। অভিযানে অবশ্য পৃথক কথা। প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে তরুণদের একচ্ছত্র আধিপত্য। কিছু দিন আগে কিংসটনের কমনওয়েলথ গেমে ক্যানাডার পঞ্চদশী কুমারী এলাইন ট্যানার ৪টি সোনার ও তিনটি রুপোর মেডেল পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ১৯ বছর বয়সী সাঁতারু পিটার রেনল্ডস পেয়েছেন ৪টি সোনার মেডেল।

ভ্যাংকুভারে সদ্য সমাপ্ত ব্রিটিশ কলম্বিয়া সেন্টিনিয়াল সাঁতারে প্রতিষ্ঠিত ৭টি বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে ৬টি রেকর্ডই করেছেন অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা। এদের মধ্যে ইংলণ্ডের সুসান উইলিয়ামের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবি রাখে। সুসানের বয়স মাত্র ১৪ বছর। মস্কোতে ১৩ বছর বয়সী স্কুল ছাত্রী ইরিনা পসডিনাকোভার ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে বিশ্ব রেকর্ড করার ঘটনা আরও বিস্ময়জনক।

কাজে কাজেই ভারতের তরুণ-তরুণীদের অভিযানের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের জন্যও নিজেদের প্রস্তুত করার সাধনায় তারা ব্রতী হতে পারে। বিশ্বের তুলনায় ভারতের সাঁতার-মান অনেক নীচুতে। সুতরাং কেউ যদি প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তবে তিনিও কম খ্যাতি অর্জন করবেন না। সাগর-সংগ্রামী মিহির সেন বসফরাস প্রণালী জয়ের পর বলেছেন, দূরপাল্লার সাঁতারে ওখানেই তাঁর ইতি। তিনি জলের বুকে প্রায় ৬ হাজার মাইল সাঁতার কেটেছেন। মিহির সেনের কাছেও আমাদের আশা, অতঃপর তিনি ভারতের অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের সাঁতারে সুপটু করে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টায় নিজের উৎসাহ ও উদ্যম কাজে লাগাবেন।

একলব্য

সর্বসমেত প্রায় ৬ হাজার মাইল সাঁতার কাটতে জীবনের বহু সময় জলের বুকে কাটিয়েছেন সাগর-সংগ্রামী মিহির সেন

পি এণ্ড টির টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন শান্তি ঘোষ

অ্যান্টোনিও কারবাজল

আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্ষেত্রে অনেক খেলোয়াড় আছেন যাঁরা অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল, দুই ধরনের ফুটবল খেলায়ই সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম জীবনে অ্যামেচার হিসাবে, পরবর্তী জীবনে প্রোফেশনাল হিসাবে। কিন্তু মেক্সিকোর গোলকিপার অ্যান্টোনিও কারবাজলের রেকর্ড কেউ স্পর্শ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। কারবাজলই পৃথিবীর একমাত্র খেলোয়াড় যিনি পাঁচটি বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই গোলকিপার হিসাবে কারবাজলের সুনাম। বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে যদি অলিম্পিক অনুষ্ঠান চাপা না পড়তো তবে অনেক আগেই কারবাজলকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেখা যেত। যুদ্ধের জন্যই চার বছর দেরি হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মরণ আলিঙ্গনের পর আবার মানুষ যখন বন্ধুত্বের আলিঙ্গনের জন্য অধীর হয়ে উঠল, লন্ডনে ১৯৪৮ সালে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হল, সেই অনুষ্ঠানে কুড়ি বছর বয়সী কারবাজলকে দেখা গেল মেক্সিকো ফুটবল দলের গোলকিপার হিসাবে। মেক্সিকো অবশ্য প্রথম রাউন্ডেই কোরিয়ার কাছে ৫—৩ গোলে হার স্বীকার করে বিদায় নিল। কারবাজলের বিরুদ্ধেও হ'ল পাঁচ পাঁচটি গোল। কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞের ধারণা, কারবাজল গোলে না থাকলে মেক্সিকোকে হয়তো আরও বেশী গোলে হার স্বীকার করতে হত।

যাই হোক, ১৯৫০ থেকে কারবাজল প্রোফেশন্যাল খেলোয়াড়। যে মেক্সিকো বিশ্ব কাপের প্রতিটি অনুষ্ঠানের মূলে প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পেয়েছে, ১৯৫০ থেকে সেই মেক্সিকোর রক্ষাব্যূহের প্রধান স্তম্ভ অ্যান্টোনিও কারবাজল। কিন্তু দলের জয়ের মূলে গোলকিপারের হাত কতখানি? ভাল গোলরক্ষক পরাজয় থেকে, বিপর্যয় থেকে দলকে রক্ষা করতে পারে—দলকে জিতিয়ে দিতে পারে না। তাই গোলরক্ষায় কারবাজলের অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও মেক্সিকো মূলে প্রতিযোগিতায় কোনবার সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ১৯৫০-এ ব্রাজিল থেকে ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এসেছে, ১৯৫৪-য় সুইজারল্যান্ডে সুনাম অর্জন করতে পারে নি, ১৯৫৮-য় সুইডেনেও ব্যর্থতার গ্লানি। কিন্তু কোনবার গোলরক্ষকের ত্রুটিতে মেক্সিকোকে হেরে যেতে হয় নি।

১৯৬২তে চিলির প্রতিযোগিতা গ্রুপ লীগে চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে

মেক্সিকোর ৩—১ গোলে জয় কারবাজলের অসাধারণ ক্রীড়াকীর্তির পরিচয়। যে চেকোস্লোভাকিয়া শেষ পর্যন্ত চিলিতে রানার্সের সম্মান পায়, মেক্সিকোর বিরুদ্ধে গ্রুপ লীগেও তারা মন্দ খেলে নি। ৩—১ গোলের ব্যবধানে জয়পরাজয়ে জয়ের ঘরে চেকদের নাম থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু একটি নয়, দুটি নয়—অন্তত চার-পাঁচটি অবধারিত গোল বাঁচিয়ে কারবাজল তাঁর দেশকে জয়ের সম্মান এনে দেন। সেই দিন থেকেই তিনি মেক্সিকোর জাতীয় বীর, মেক্সিকো ফুটবলের প্রাণপুরুষ।

মেক্সিকোর ফুটবলে কারবাজলের দাম অনেক বেশী। অত দাম দিয়ে ওঁর ক্লাব ওঁকে রাখতে চায় নি। মেক্সিকোর ফুটবল ম্যানেজার ইগনাসিও ট্রেলেস-এরও ইচ্ছে ছিল তরুণ গোলকিপার দিয়ে কারবাজলের স্থান পূরণ করার। কিন্তু পুরনো স্মৃতিই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬১ সালের স্মৃতি। সেবার ওয়েমব্লীতে আন্তর্জাতিক খেলায় ইংলন্ডের কাছে মেক্সিকোকে ৮—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সে পরাজয়ে কারবাজলের অবশ্য কিছুই করার ছিল না। খেলার কয়েক দিন আগে আহত হওয়ায় মাঠের বাইরে বসে থেকে দেখেছিলেন নতুন গোলকিপার 'মোটা'কে একটি একটি করে আটটি গোল খেতো। সুতরাং ইগনাসিও ট্রেলেস কারবাজলকে বদলাবার ঝুঁকি নিতে চান নি।

এদিকে মেক্সিকো ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে রটে যায়, পর পর পাঁচটি বিশ্ব কাপের ফাইন্যাল রাউন্ডে খেলার দিক দিয়ে কারবাজল এক নতুন রেকর্ড করতে যাচ্ছেন। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় মেক্সিকোকে ৮টি ম্যাচ খেলতে হয়। তার মধ্যে ৪টি ম্যাচ খেলেন কারবাজল, ৪টি নতুন গোলরক্ষক ক্যালডারন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে খেলা আর মূল প্রতিযোগিতায় খেলার মধ্যে অনেক পার্থক্য। লন্ডনের মূল প্রতিযোগিতায় কারবাজল খেলবেন কিনা এইটাই প্রশ্ন।

লন্ডনের গ্রুপ লীগে মেক্সিকোর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স, ইংলন্ড ও উরুগুয়ে। তিনটি খেলাই ওয়েমব্লীতে। জুলাইএর ১৩ তারিখে ফ্রান্সের সঙ্গে মেক্সিকোর খেলায় কারবাজল দলে নেই। দর্শকরা বেশ কিছুটা হতাশ। ১৬ তারিখে ইংলন্ডের সঙ্গে মেক্সিকোর খেলাতেও কারবাজল অনুপস্থিত। সুতরাং সবাই ধরেই নিয়েছিল, উরুগুয়ের সঙ্গে মেক্সিকোর শেষ খেলাতেও কারবাজলকে দেখা যাবে না। কিন্তু ১৯ তারিখের ঐ খেলায় কারবাজল মেক্সিকোর গোল রক্ষা করলেন এবং সম্ভবত জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলায় অংশ গ্রহণ করে সৃষ্টি করলেন নতুন রেকর্ড। ঐ খেলায় তাঁর অপরাজিত থাকার ঘটনাও উল্লেখ্য। ফ্রান্স ও মেক্সিকোর খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। ইংলন্ড ২—০ গোলে পরাজিত করে মেক্সিকোকে। কিন্তু উরুগুয়ে কারবাজলের বিরুদ্ধে কোন গোল করতে পারে নি। শিকারী বিড়ালের মত ওত পেতে বসে থেকে তিনি সব আক্রমণ ব্যর্থ করেন।

ঢেউ খেলানো কালো কোঁকড়া চুলের দীর্ঘ-দেহী গোলকিপার কারবাজলকে আর কোন দিন হয়তো আন্তর্জাতিক আসরে দেখা যাবে না। কারণ, লন্ডনে খেলার আগেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বিশ্ব কাপের পর ফুটবল খেলায় আর অংশ গ্রহণ করবেন না।

মুকুল

আলোচনাকালে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ৬৯টি প্রেক্ষাগৃহের কোন একটিরও বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরি কার্যকর না করার অভিযোগ ইউনিয়ন কখনও উত্থাপন করেননি। বরং ৬৯টি প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি বিধিবদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরির চেয়ে বেশী বেতন দিচ্ছেন। অন্য বিরোধ অর্থাৎ বিধিবদ্ধ সর্বনিম্ন বেতন-হারের 'পুনর্বিন্যাস না করা' সম্পর্কে প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের যে কিছুই করণীয় নেই তা ইউনিয়ন ভালভাবেই জানেন। বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল যাতে রায় দিতে পারেন তার জন্য অ্যাসোসিয়েশন যে-কোন অবস্থায় তার বক্তব্য ট্রাইব্যুনালের কাছে পেশ করতে প্রস্তুত। কর্মীরা কাজে যোগ দিতে রাজী—ইউনিয়ন এই আশ্বাস

শ্যাডো প্রোডাকশন্স-এর "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" (পরিচালনা : অজিত লাহিড়ী) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও তরুণকুমার

আশার আলো

পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রায় দেড় সপ্তাহকাল ধরে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অচিরেই তার অবসান ঘটবে বলে আশা করা যায়। সিনেমা কর্মীদের ধর্মঘট এবং মালিকদের লক-আউট সম্পর্কে রাজ্য সরকার একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছেন। আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিকে বিরোধ মীমাংসার জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসবে।

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন :

৬৯টি প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধের বিষয়টি পশ্চিম ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালের বিবেচনার জন্য প্রেরণের নির্দেশ দিয়ে রাজ্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন, তার একটি প্রতিলিপি অ্যাসোসিয়েশনের হস্তগত হয়েছে। উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে কর্মচারীদের ইউনিয়নের মনোভাবও অ্যাসোসিয়েশন লক্ষ করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইউনিয়নের বিবৃতি দেখে মনে হয়, আইনের বিধান অনুযায়ী বিরোধের বিষয়টি মীমাংসার জন্য পাঠাতে তাঁরা প্রস্তুত নন। ইউনিয়ন এখন দাবি করছেন যে, 'বিধিবদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরি "কার্যকর না করা" এবং "পুনর্বিন্যাস না করা"-ই বিরোধের প্রধান কারণ। অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যে-কোন সহযোগের ক্ষেত্রে কিংবা শ্রম দফতরে বিভিন্ন সময়ে

"বালিকা বধূ" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো-দেশ

"খেয়া"-র গান রেকর্ডিং : ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার এবং প্রযোজক সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রকে দেখা যাচ্ছে ফটো: দেশ

দিলে অ্যাসোসিয়েশন লক-আউট তুলে নেবার নির্দেশ দিতেও তৈরী।

অপর দিকে, বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলেছেন, সিনেমা কর্মীদের মূল দাবিগুলি এড়িয়ে গিয়ে কয়েকটি দাবি শ্রম আদালতে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে রাজ্য শ্রমমন্ত্রী পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছেন। সরকার বা মালিকেরা সুবুদ্ধির পরিচয় না দিলে যে-কোন পরিস্থিতির মধ্যেও কর্মচারীরা নির্দিষ্ট কতগুলি চিত্রগৃহে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বাধ্য হবেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় আরও তিনটি সিনেমা হাউসের দরজা খোলা হয়েছে। ওই-সব চিত্রগৃহে ইংরেজী ছবি দেখানো হয়। সারা পশ্চিম বাংলায় মোট ছয়টি সিনেমা হাউস চালু আছে। এইসব সিনেমার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ চিত্রগৃহ এতদিন যাবৎ বন্ধ থাকার ফলে অবস্থা কীরূপ সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে তার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে আশা করা যায়, ট্রাইব্যুনালে এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটবে।

বোম্বাইয়ে "মলুয়া"

বোম্বাইয়ে বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে লোক-ভারতীর শিল্পীরা এ সপ্তাহে "মলুয়া" গীতিনাট্য পরিবেশন করছেন। সংস্থার অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় পর পর তিন দিন (২৮, ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর) "মলুয়া" মঞ্চস্থ হবে। "মলুয়া"-র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় পরই লোক-ভারতী এই আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

"সমসাময়িক য়ুরোপীয় সিনেমা নিরাশ করেছে"

—তপন সিংহ

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ফিরে এসে শ্রীতপন সিংহ এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, "সমসাময়িক য়ুরোপীয় সিনেমার গতি-প্রকৃতি দেখে নিরাশ হয়েছি। ভেনিসে কয়েকটি ছবি দেখলাম। লণ্ডনেও কিছু ছবি দেখবার সুযোগ হয়েছে। দেখলাম, যৌনবাসনার বিকৃতিকেই অতি আধুনিক কালের চলচ্চিত্রকাররা সিনেমার প্রধান উপজীব্য করে তুলেছেন। পশুসুলভ যে বৃত্তির কথা আমরা জানি এবং যা দেখতে ঘৃণা বা অস্বস্তি বোধ করি, মহা উৎসাহে তা দর্শকের চোখের সামনে মেলে ধরার একটা ঝোঁক এসেছে বর্তমান য়ুরোপীয় সিনেমায়। আর্ট জীবনের প্রিয়-অপ্রিয় সব সত্যকেই নির্মমভাবে দেখাতে পারে। যদি বুঝতাম আর্টের প্রয়োজনেই দূষিত ও বিকৃত কামনা এবং কর্মের প্রতি চিত্র-নির্মাতার এই অনুরাগ তবে দুঃখের কোন কারণ থাকত না। এ যেন বিকৃতকে দেখাবার এক জঘন্য বিকৃতি। হয়ত মানুষের অস্তিত্বের গভীরতর সত্য ও সৌন্দর্য দেখাবার শক্তি তাঁদের নেই। তাই এই অপপ্রয়াস।"

ত্রুফোর সায়ান্স ফিকশ্যান "ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান" শ্রী সিংহ দেখে এসেছেন। ছবিটি তাঁর ভাল লাগেনি। "এ ধরনের একটি বিষয়বস্তুর চলচ্চিত্রে সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু তা [illegible] পরিণত। ছবিটিকে সাবজেকটিভ "সায়েন্স ফিকশান" বলা যেতে পারে। [illegible] চিত্রায়িত [illegible] হয়েছে। কাল্পনিক মানুষের [illegible] ধরা যায় না। ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান-এ বই পোড়ে। বই পোড়ানো অর্থাৎ মানুষের চিন্তাকে দাবিয়ে রাখার যে চেষ্টা সভ্যজগতে কালে কালে দেখা গিয়েছে তার প্রতীকী চিত্রবিন্যাসে ছবিতে আছে। তা ছাড়া এমন একটি কল্পলোক দেখানো হয়েছে যেখানে স্মৃতির সাহায্যে জ্ঞানরাশি এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

"কিন্তু ছবিটি দেখে মনে হল, পরিচালকের সঙ্গে শিল্পীর চিন্তা-ভাবনা বা কর্মের কোন 'কো-অরডিনেশান' নেই। এর কারণ হয়ত এই, ত্রুফো এমন একটি ভাষায় ছবি করেছেন যার উপর তাঁর কোন দখল নেই।

"এই কথা ত্রুফোকে আমি বলেছি। আমাদের আলোচনার সময় দোভাষীর কাজ করেছেন চিত্রপরিচালক রোজেলিনি। রোজেলিনিকে খুব ভাল লেগেছে। তাঁর ছবিটি দেখেও খুব আনন্দ পেয়েছি। 'নন-কমপিটিটিভ' বিভাগে ছবিটি দেখানো

হয়। ফরাসী বিপ্লবের একটি অধ্যায় নিয়ে তোলা।"

ভেনিস-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন শ্রী সিংহ। জানা গেল, "অতিথি"-র "লিরিক্যাল বিউটি" সমালোচকদের মন আকর্ষণ করেছে। যদিও এর মন্থর গতির কথা অনেকেই বলেছেন। পার্থ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সম্পর্কে সকলেই সপ্রশংস ছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল, হয়ত পার্থই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে যাবে।

প্রায় পাঁচ শ' জনের প্রেস কনফারেন্সে শ্রীসিংহকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। 'রিয়ালিস্ট' গ্রুপের একজন তরুণ সাংবাদিক প্রশ্নবাণে নাকি শ্রী সিংহকে জর্জরিত করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা, "জমিদার বাড়িতে যে কামান দেখানো হল তা কি বুর্জোয়া 'স্যাডিজম'-এর প্রতীক?" শ্রী সিংহ উত্তরে বলেন, "কোন রাজনীতিক অবধারার বশবর্তী হয়ে আমি কিছুই দেখাইনি।" পরে এই সাংবাদিক শ্রী সিংহের সঙ্গে দেখা করে বলেন, "মিস্টার সিনহা, আজকের দিনে মানুষের জীবন ও রাজনীতিকে আলাদা করা যায় না। আমি একজন ইহুদী। তুমি ভাবতে পার, আমার মা, বাবা ও বোনকে মেরে একই ফার্নেসে-এ পোড়ানো হয়েছে।" শুনে শ্রী সিংহ স্তম্ভিত।

বিদেশ সফরকালে বার্গম্যানের "সায়লেন্স" ছপনবার দেখে এসেছেন। ছবি সম্পর্কে শ্রী সিংহ বলেন, "জীবনের অনেক নগ্ন সত্য ছবিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোন পীড়া বোধ করিনি। প্রতি ক্ষণেই মনে হয়েছে, একজন দার্শনিকের বিশ্লেষণ দেখছি। চিন্তার খোরাক ছবিতে আছে। আর রয়েছে মৃত্যুর একটি অদ্ভুত দৃশ্য। এমন দৃশ্য দেখাতে হলে শক্তির প্রয়োজন।

"বার্গম্যান ও ফেলিনির মত পরিচালক এখনও রয়েছেন বলে য়ুরোপের সিনেমার উপর আস্থা হারাইনি। এঁদের সঙ্গে ত্রুফোর মত পরিচালকের কোন তুলনা হয় না। অনেক দিন ধরে তাঁরা শিল্পের সঙ্গে জড়িত। জীবনের যে-কোন 'আসপেক্ট' দেখাবার ক্ষমতা তাঁদের আছে। তাঁদের চিন্তা আছে, দার্শনিক প্রত্যয় রয়েছে। ত্রুফোর মন এতটা পরিণত নয়।"

রাজেন তরফদার পরিচালিত "আকাশ ছোঁয়া" চিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

নেপথ্যে

দুটি গান রেকর্ডিং-এর মধ্য দিয়ে গত সপ্তাহে 'খেয়া' ছবির কাজ শুরু হল। শ্যামল মিত্রের নতুন ছবি "খেয়া" (রূপছায়া প্রোডাকশন্স)। কাহিনী লিখেছেন নীতা সেন।

গান রেকর্ডিং-এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তমকুমার। গান টেক-এর প্রথম নির্দেশ তিনিই দিলেন। গান গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পরে সুরকার-প্রযোজক শ্যামল মিত্রের গানও রেকর্ড করা হল।

"খেয়া"-র নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায় এলেন একটু পরে। নায়ক অনুপকুমার ও পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন।

হেমন্তকুমার গানের ফাঁকেই তাঁর কাবুল সফরের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। সেখানে পারসীক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন তিনি। বললেন, বেশ আগ্রহের সঙ্গেই শ্রোতরা গান শুনেছিলেন। এবং রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও শ্রোতারা খুব কৌতূহল প্রকাশ করেছেন।

উত্তমকুমার নিজেই এখন সংগীত পরিচালক। নিজের সংগীত পরিচালনা সম্পর্কে শিল্পী দু একটি কথা বললেন। 'গানের স্কোপ' সব বাংলা ছবিতে বিশেষ থাকে না। তবু দিতে হয়। "খেয়া"-তে উত্তমকুমার নেই, মাধবী ও অনুপ বাদে বিকাশ রায়, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভানু-বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। গানগুলি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি **দুরন্ত চড়াই** ছবির আউটডোর শুটিং সেরে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সমরেশ বসুর কাহিনীর ভিত্তিতে চিত্রনাট্য পরিচালক শ্রী চট্টোপাধ্যায় নিজেই রচনা করেছেন। মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগত সোমেন চক্রবর্তী ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্যে গান গেয়েছেন শ্যামল মিত্র, শিপ্রা বসু ও সলিল মিত্র।

অগ্রদূত গোষ্ঠী ভেঙে যাচ্ছে এই সংবাদ বিভূতি লাহা অস্বীকার করেছেন। এই জনশ্রুতির প্রতিবাদ করে শ্রী লাহা বলেছেন, অগ্রদূত গোষ্ঠী আজও আছে এবং থাকবে। তবে তিনি নিজের নামে একটি ছবি অবশ্য প্রযোজনা-পরিচালনা করবেন। তাঁর নিজস্ব ব্যানার-এর নাম 'চিত্রভারতী'।

প্রথমে নাম ছিল "ঋষি অরবিন্দ", এখন নাম হয়েছে **মহাবিপ্লবী অরবিন্দ** (এ-কে-বি ফিল্মস)। শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী

ডিলেক্স প্রোডাকশন্স-এর "কেদার রাজা" (পরিচালনা : বলাই সেন) ছবিতে জিনিয় চক্রবর্তী ও দীপ্তি রায়

জীবনের অধ্যায় নিয়েই ছবি। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন দিলীপ রায়, দীপক গুপ্ত চিত্রপরিচালক।

"অভিশপ্ত চম্বল"-এর গান রেকর্ডের জন্য চিত্র পরিচালিকা মঞ্জু দে এবং সংগীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত বোম্বাই রওনা হয়েছেন। ছবির গানগুলি গাইবেন মহম্মদ রফি, আশা ভোঁসলে ও মান্না দে।

ইতিমধ্যে "গৃহদাহ"-র শুটিং-এর আবার বাধা পড়েছিল প্রদীপকুমারের অসুস্থতার দরুন। অবশ্য এর জন্য শুটিং প্রোগ্রামের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। গত সপ্তাহে পরিচালক সুবোধ মিত্র উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন ও প্রদীপকুমারকে নিয়ে ছবির "ব্যাক প্রোজেকশান"-এর কিছু শট নিয়েছেন।

তপন সিংহের "হাটে-বাজারে" ছবির যে ইনডোর শটগুলি নেওয়া হয়েছে তার একটিতে বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে "প্লে-ব্যাক" গানের তালে নেচেছে পার্থ মুখোপাধ্যায় ('অতিথি' ও 'বালিকা বধূ' খ্যাত)। নাচ অর্থাৎ বিশেষ অঙ্গ-ভঙ্গি পার্থকে আগেই অভ্যাস করে নিতে হয়েছে। ছবিতে পার্থ সেজেছে বৈজয়ন্তীমালার ছোট ভাই।

বিদেশে কণ্ঠশিল্পী আমন্ত্রিত

আমেরিকায় সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দেবার বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে দুই জনপ্রিয় কণ্ঠ-শিল্পী গীতা দত্ত ও সুবীর সেন গত সপ্তাহে বিদেশ যাত্রা করেছেন। তাঁরা ব্রিটিশ গায়না, ডাচ গায়না, ত্রিনিদাদ, সুরিনাম প্রভৃতি জায়গাতেও গানের আসরে যোগ দেবেন। তারপর যাবেন ইংলন্ড ও হল্যান্ডে।

ফিল্ম ক্র্যাফট-এর "পঞ্চশর" (পরিচালনা ঃ অরূপ গুহঠাকুরতা) ছবিতে সুস্মিতা সান্যাল ও অনিল চট্টোপাধ্যায় ফটো-দেশ

একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান

গানের আসর কিংবা জলসা কলকাতায় অনেক হয়। মহাজাতি সদনে গত শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) যে গানের আসরটি বসে-ছিল তার বুঝি তুলনা নেই। তাতে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের গান এবং লোকসংগীতের আয়োজন করা হয়েছিল। আসরের প্রথম শিল্পী ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। তিনি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেন। পরে সুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, ফিরোজা বেগম, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, এবং লোকসংগীতে নির্মলেন্দু চৌধুরী ও পূর্ণদাস বাউল গান গেয়ে আসরটি চিত্তাকর্ষক করে তোলেন। এঁদের প্রত্যেকের গানই উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানের সুর বাঁশিতে পরিবেশন করেন হিমাংশু বিশ্বাস। তবলায় ও যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন রাধাকান্ত নন্দী, শ্যাম দাস, সলিল মিত্র, অমল দেব প্রভৃতি। এঁদের অনুষ্ঠানও প্রশংসনীয় হয়।

অভিনব ও মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শিল্পীরা শ্রোতাদের কাছে আরও প্রিয় হলেন। এবং সেই সঙ্গে রসিকজনের শ্রদ্ধাও অর্জন করে নিলেন। রোগশয্যায় শায়িত প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীঅঙ্কুর মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যকল্পে শিল্পীরা গান গাইতে এসেছিলেন। বহু ব্যস্ততার মধ্যেও বিনা/পারিশ্রমিকে জনপ্রিয় শিল্পীরা আসরে যোগ দিয়ে মানবতাবোধের যে পরিচয় দিলেন বাংলার সাংবাদিকরা তা কোনদিন বিস্মৃত হবেন না।

পরলোকে চেরকাসফ

আইজেনস্টাইনের "ইভান দি টেরিবল"-এর শিল্পী নিকোলাই চেরকাসফ গত ১৪ সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। স্বদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান তিনি পেয়েছেন। তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত। ১৩৫১ সালে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে শিল্পী কলকাতায় এসেছিলেন।

তখন তিনি ও চিত্র পরিচালক পুডভকিন শ্রীরঙ্গম-এ "ষোড়শী" অভিনয় দেখেন। জীবানন্দর ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ির অভিনয় বিদেশী শিল্পীকে মুগ্ধ করেছিল।

*

ব্রজেন্দ্র কিশোর স্মৃতি সংগীত সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠান আগামী ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থান ঃ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম।

রবীন্দ্র-ভারতী মঞ্চে **শিশু সংঘের** বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১ অক্টোবর দুটি নাটিকা (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘোড়া হাটের পালা" এবং সুকুমার রায়ের "হ য ব র ল") অভিনীত হবে।

অরণ্যদেব লী ফক

গুহার মধ্যে বিকটাকার সেই অন্ধ জন্তুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে -----
সাবাশ! আপনি একজন অদ্ভুতকর্মা!
অভিনন্দন পরে জানাবেন। এখন প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করুন।

ওদিকে গুহার বাইরে -----

ও আমাদের নাগাল পাবার আগেই সরে পড়তে পারব।
ওর চাইতেও বড় বিপদ আসন্ন।

গুহা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে লাগল -----

শুরু হয়েছে অগ্ন্যুৎপাত! আগুন-পাহাড় জেগে উঠেছে, রাগে থরথর করে কাঁপছে -----
4/24

দেখুন সেই প্রাণীটি লাভাস্রোতে চাপা পড়ল।
!

লাভাস্রোত এগিয়ে আসছে! ওর নীচেই আমাদের সমাধি ঘটবে!
ভয় নেই!

আঃ, পৃথিবী কী সুন্দর!
হীরো আর ডেভিল! আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!
বেঁচে গেছি!

হঠাৎ একটা মারাত্মক বিস্ফোরণে আগুন-পাহাড়ের চূড়া বিদীর্ণ হল!
পালাও এখান থেকে।

নুন্‌-কুনের মানা শীর্ষ জয় বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বসুধারাতল থেকে ২১ সেপটেমবর প্রেরিত তারবার্তায় শ্রীধ্রুব মজুমদার জানাচ্ছেন, গত ১৯ সেপটেমবর অপরাহ্ণে বাংলার কয়েকজন দুঃসাহসী পর্বতারোহী মানার স্বর্ণশীর্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। এই বিজয়-গৌরবের আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করার আগেই পর্বতগাত্রে চার এবং পাঁচ নমবর শিবিরের মাঝামাঝি জায়গায় ২০ সেপটেমবর কয়েকজন শেরপা দুর্ঘটনায় পতিত হন। দুর্ঘটনার বিশদ বিবরণ এখনও মূল শিবিরে এসে পৌঁছয় নি। পাঁচ বছর আগে মানা অভিযাত্রীরা শীর্ষে আরোহণ করতে পারেন নি। প্রথম এবং দ্বিতীয় মানা অভিযানের ব্যবস্থা করেন কলকাতার পর্বত অভিযাত্রী সংঘ—ভারতে অসামরিক পর্বত অভিযান উদ্যোক্তাদের মধ্যে যার স্থান সর্বপ্রথমে। এই সংঘের সভাপতি আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। মানা পর্বত শীর্ষে আরোহণ করেছেন প্রাণেশ চক্রবর্তী, পাসাং ফুতার, শেরপা শেরিং, শেরিং লাকপা এবং পাসাং শেরিং। অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব করেছেন বিশ্বদেব বিশ্বাস।

দেশী সংবাদ

১৯ **সেপটেমবর**—বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্পর্কে কলকাতার সিনেমা হলে কর্মচারীদের ধর্মঘটের পালটা ব্যবস্থা হিসাবে সিনেমা মালিকদের সংস্থা আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩১৮টি সিনেমা হলের মধ্যে ৩১৫টিতেই লক আউট ঘোষণা করেছেন। বাকী তিনটি সিনেমা হল অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আজ নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস পারলামেনটারি পারটির সভায় ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য রচিত কংগ্রেসের খসড়া নির্বাচনী ইস্‌তাহারে দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লিখিত না হওয়ায় তার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

২০ **সেপটেমবর**—আসামের বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টির জন্য দেশে বিদেশে একদল লোক প্রস্তুত হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এরা নাগা পাহাড়ের উত্তর সীমান্ত থেকে মিজো জেলার দক্ষিণ কোণ পর্যন্ত গোটা পার্বত্য অঞ্চল, মণিপুরে এবং ত্রিপুরার পূর্ব সীমান্তে 'যথাশীঘ্র সম্ভব' একটি "সুসংহত সশস্ত্র" সংগ্রাম শুরু করতে চায়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আগমন উপলক্ষে বামপন্থী দলগুলি বাঁকুড়ায় যে হরতালের আহ্বান জানান তার ফলে শহরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইতস্তত অবরোধ এবং পুলিস-জনতায় সংঘর্ষ হয়। পুলিস লাঠি চারজ করে এবং চার রাউণ্ড গুলি চালায়। চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২১ **সেপটেমবর**—তেইশ হাজার সাতশ পঞ্চাশ কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনা ছাটাই করে আঠার হাজার কোটিতে দাঁড় করাবার জন্য আবারও জোর সুপারিশ জানিয়েছেন ভারতীয় **[illegible] কমিটি।** সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অকারণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারেরও তাগিদ জানিয়েছেন।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সমাজ-বিরোধীদের আটক করার ছুতানাতায় সরকার বহুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করছেন। অন্যদিকে হরতাল পণ্ড করার ও গোলমাল বাধাবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস পারটি বহু সমাজবিরোধী গুণ্ডা নিয়োগ করেছে—আর এই পরিকল্পনায় মদত দিচ্ছে পুলিস।

২২ **সেপটেমবর**—ভারত ইনদোনেশিয়াকে যে ১০ কোটি টাকা ঋণ দেবার সিদ্ধান্ত করেছে, সেই টাকায় ইনদোনেশিয়া ভারতের কাছ থেকে কয়েক ধরনের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করবে। আজ অপরাহ্ণে এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৩ **সেপটেমবর**—কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ প্রকাশের উদ্দেশে আজ এরনাকুলামে বিরোধী দলগুলির উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। কেরল রাজ্যের এই প্রাচীন শহরে এই ধরনের বৃহৎ আন্দোলন এই প্রথম।

২৪ **সেপটেমবর**—নিখিল - ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে আজ শাস্ত্রীনগরে সভাপতি কামরাজ বলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের জয়লাভের জন্য বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেসকর্মীদের কাছে আবেদন জানান।

মানা-কামেট পর্বত অভিযাত্রী দলের ৬ জন সদস্য একটি দুর্ঘটনায় পড়েছেন। আহত ব্যক্তিদের নিয়ে আসার জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানি হেলিকপটার বোরাস থেকে উড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ২২ ও ২৩ সেপটেমবর ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী যে বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন তা অল্প কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রাজ্যের প্রায় সর্বত্র সাফল্যের সঙ্গে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে। কলকাতায় দু' একটি রুটে মাত্র কয়েকখানা সরকারী বাস চলাচল করেছে। দূরপাল্লার কয়েকখানি ট্রেন ছাড়া সব ট্রেন বন্ধ ছিল। ট্রাম একদম চলেনি। সরকারী অফিস আদালত এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিতেও কাজকর্ম বন্ধ ছিল।

২৫ **সেপটেমবর**—দুইদিন আলোচনার পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আজ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনী ইস্তাহার অনুমোদন করেছেন। অনুমোদিত ইস্‌তাহারে বড় কমের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। এই ইস্‌তাহারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১৯৭৬ সালে পঞ্চম পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যূনতম জাতীয় চাহিদা বহুলাংশে মিটানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিদেশী সংবাদ

১৯ **সেপটেমবর**—ইনদোনেশিয়ায় সোয়েকারন-বিরোধী আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়েছে। এর পুরোভাগে আছেন ছাত্রেরা। এবার তাদের সোচ্চার দাবি : সোয়েকারনকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে এর পেছনে সামরিক কর্তৃপক্ষের সমর্থন নেই।

২০ **সেপটেমবর**—ইনদোনেশীয় সেনাবাহিনী মধ্য জাভার সিজেলাজের একটি কম্যুনিস্ট ঘাটি দখল করে নিয়েছে। উভয়পক্ষে অল্প সময়ে প্রচুর গোলাগুলি বর্ষণ হয়েছিল। সরকারী সেনাবাহিনী আত্মগোপনকারী কম্যুনিস্টদের ও লুকানো অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে বার করার জন্য জোর তল্লাসী চালাচ্ছে।

২১ **সেপটেমবর**—পারলামেনটে দাঁড়িয়ে গত অকটোবরের ব্যর্থ কমিউনিসট অভ্যুত্থানের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রেসিডেন্ট সোকারনকে ইনদোনেশীয় পারলামেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেনটের কাছে সরকারীভাবে তাঁর নীতির কৈফিয়ত তলব এই প্রথম।

২২ **সেপটেমবর**—সোভিয়েট সরকারী সংবাদপত্র "ইসভেস্তিয়া" এইরূপ ইঙ্গিত করেন যে, চীন-মারকিন গোপন যোগসাজসের ফলে প্রেসিডেনট জনসন উত্তর ভিয়েতনামের শহরগুলির কাছে বড় বড় ঘাটির উপর বোমাবর্ষণ করতে মনস্থ করেন।

২৩ **সেপটেমবর**—রাষ্ট্রসংঘে মারকিন রাষ্ট্রদূত মিঃ আর্থার জে গোলডবার্গ আজ সাধারণ পরিষদে বলেন, হ্যানয়ের পক্ষ থেকে যদি যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের অনুরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়, তাহলে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখতে প্রস্তুত আছে।

২৪ **সেপটেমবর**—ইনদোনেশিয়ার ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবানদ্রিও গত অকটোবরের ব্যর্থ কমিউনিসট অভ্যুত্থানের জন্য প্রেসিডেনট সোয়েকারনকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেনট সোয়েকারনই ইনদোনেশিয়াকে পিকিং-এর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৫ **সেপটেমবর**—২৯ ঘণ্টার মধ্যে মধ্য ও পশ্চিম জাপানে দুইবার ঘূর্ণি ঝড়ে তিনশত লোক নিহত অথবা নিখোঁজ হয়েছে এবং সাত শতাধিক লোক আহত হয়েছে। এই ঘূর্ণি ঝড়ে চার হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং প্রায় ৪০ হাজার বাড়ির ক্ষতি হয়েছে।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীবিমল ব্যানার্জী

শারদীয় **বিংশশতাব্দী** ১৩৭৩

সম্পূর্ণ সাতটি উপন্যাস লিখেছেন

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র	—	দক্ষিণের জানালা
২। সমরেশ বসু	—	গলের লিখনে একদিন
৩। শক্তিপদ রাজগুরু	—	ন্দরের বন্ধন কাল
৪। চিত্তরঞ্জন ঘোষ	—	আলো হাতে
৫। সৌরি ঘটক	—	হাসপাতাল
৬। প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়	—	স্বর্ণ মৃগয়া
৭। বিশু দাস	—	দূরতম নক্ষত্রের ওপারে

— বিশেষ আকর্ষণ —

'বিংশ শতাব্দী'তে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে সংগৃহীত কাজি নজরুল ইসলামকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠি ও তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশে কাজি নজরুল ইসলামের লিখিত একটি কবিতা।

— প্রবন্ধ লিখছেন —

মুজফ্‌ফর আহমদ, সতীশ পাকড়াশী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ [illegible] রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি।

— গল্প ও রম্যরচনা লিখছেন —

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কুমারেশ ঘোষ আশা দেবী, সুধাংশু ঘোষ সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

— রঙ্গজগৎ —

সাক্ষাৎকার—অঞ্জনা ভৌমিক, সুমিতা সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, স্বপনকুমার ও অন্যান্য। বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি।
বাংলা, বোম্বাই ও বিদেশের রঙ্গজগতের অনেক অপ্রকাশিত চাঞ্চল্যকর সংবাদ ও অসংখ্য ছবি।

— অন্যতম আকর্ষণ —

দণ্ডবায়সের কাকাণ্টক ও বিভিন্ন কার্টুন

গ্রাহকগণঃ—নয় টাকা দিয়ে যারা বিংশ শতাব্দীর বার্ষিক অথবা পাঁচ টাকা দিয়ে ষাণ্মাসিক গ্রাহক হবেন, শারদীয় সংখ্যার জন্য তাদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না, যারা কেবল একটি শারদীয় সংখ্যা নেবেন, তারা চার টাকা দাম ও রেজেস্ট্রিযোগে পাঠাবার খরচ বাবদ পঁচাত্তর পয়সা। মোট চার টাকা পঁচাত্তর পয়সা পাঠাবেন।

চার শতাধিক পৃষ্ঠার বই॥ মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে॥ দাম—চার টাকা মাত্র॥

বিংশ শতাব্দী । ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৫ । ফোন ৫৫-২৭১১

(সি ১০৫৫)

দেশ

৩৩ বর্ষ ।। ৪৯ সংখ্যা

শনিবার ২১ আশ্বিন ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

Saturday 8. October 1966

ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা

পৃথিবীর সর্বত্রই ছাত্রদের একটি আলাদা মূল্য আছে, সমাজে তাদের বিশেষ ভাবে দেখারও রেওয়াজ বহুকালের। আমাদের দেশেও ছাত্রদের আমরা স্বতন্ত্র একটি মর্যাদা দিতে চেয়েছি একদা এবং তাদের আদর্শ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছি, অধ্যয়নই তাদের ছাত্রজীবনের তপস্যা হওয়া উচিত। এ-সব নীতিবাক্য অবশ্য দীর্ঘদিন অচল অকেজো হয়ে গেছে। রাজনীতির ঢেউ ছাত্রসম্প্রদায়ের মাথার ওপর ভেঙে পড়ার পর এদেশে যা ঘটেছে তা সকলেরই জানা, পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র হবে। কিন্তু যদি এমনই হত, লেখাপড়া এবং কেতাবী রাজনীতির চর্চা করে তাদের ছাত্রাবস্থা শেষ হত, তবু মনে হয় না আমাদের এমন কোনো অভিযোগ থাকত। দুঃখের বিষয় এখন ছাত্রদের মধ্যে পাঠচর্চা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা যত না দেখা যায় তার বেশী দেখা যায় উচ্ছৃঙ্খলতা। আজকাল এমন দিন বড় যায় না যেদিন খবরের কাগজের পাতায় কোথাও না কোথাও বড় আকারের ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদ না থাকে। গত কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই এই উচ্ছৃঙ্খলতা এত ব্যাপক আকারে দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টতই অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করে একটি সমীক্ষাদল গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সমীক্ষা দলের মোটামুটি কাজ হবে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ অনুসন্ধান করা।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তির কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু ব্যাপক ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি নজর পড়তে এত দেরী হবার কারণ যে কি ছিল তা আমরা জানি না। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ—প্রভৃতি রাজ্যে গত এক বছরে যতগুলি উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গেছে তাতে মনে হয়, রোগের প্রকোপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাবার পর যেন অভিভাবকের খেয়াল হয়েছে—অবস্থা বেশ সংকটাপন্ন।

আজকাল ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার বাঁধাধরা কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনও রাজনৈতিক কারণে, কখনও অন্য কোনো রকম আন্দোলনের ধুয়ো হিসেবে, কখনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে, কখনও পানের দোকানে দেশলাই চাওয়া নিয়ে, কখনও সিনেমা হলের টিকিট কেনা নিয়েও এই গন্ডগোল বেধে যায়। তবে রাজনীতি একটা বড় কারণ। লক্ষ করলে বোঝা যায় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলাদলি কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষে ছাত্রসমাজের মস্তক চর্বণ করছে; বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, এমন কি নিতান্ত স্কুলগুলিও আমাদের রাজনৈতিক দলাদলির বা প্রভাব বিস্তারের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রধানত রাজনীতির দূষিত আবহাওয়া ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলতার কারণ হলেও সেটা সব নয়। ছাত্রসমাজের মতিগতির মধ্যে ইদানীং একটা অস্থিরতা, অধৈর্য ও অবজ্ঞার ভাব এসেছে। আমাদের ধারণা—সামাজিক ভাবে একালের তরুণ মহলে সামগ্রিক ভাবে যে মানসিক তিক্ততা দেখা যাচ্ছে তারই অংশবিশেষ ছাত্রমহলেও চোখে পড়ে। নানা কারণেই আজকের যুবক সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ, এবং সেই কারণগুলি আমাদের সামাজিক সমস্যা। ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ অনুসন্ধানে এই দিকটি বাদ দেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার যে সমীক্ষাদল গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, শিক্ষাগত ও সামাজিক কারণ ছাড়াও উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক ও ভাবগত কারণ অনুসন্ধান করা হবে। সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তবে আমরা মনে করি সমস্যাটি যেরকম ব্যাপক ও গভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে সর্বদিক দিয়ে সযত্নে তার বিচারবিবেচনা না হলে কোনো যথার্থ কাজ হবে না।

সরকার নাকি এমনও মনে করেন, ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যা ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার মুখ্য কারণগুলির একটি। এই অনুমান সংগত হলেও হতে পারে তবে এই কারণটি বিবেচ্য হতে পারে না, কেননা ছাত্রসংখ্যা ক্রমাগতই বাড়বে, কমবে না, এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্ক আর কখনোই পুরোনো দিনের সম্পর্কের মতন হতে পারবে না। এখন শিক্ষকতা ততটা আদর্শের জন্য নয় যতটা বৃত্তির জন্যে। ছাত্রদের মনোভাবের মধ্যেও সেই অতীত দিনের গুরুভক্তি নেই। তবু একথা ঠিক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতি হওয়া উচিত।

ছাত্রদের মধ্যে আজ যে ধরনের হতাশা, নৈরাশ্য, তিক্ততা ও বীতশ্রদ্ধ ভাব সৃষ্টি হয়েছে তা নষ্ট করতে হলে প্রধানত আমাদের সামাজিক পরিবেশ পালটানো দরকার। আর সেটা অচিরে পালটাবে এমন তো দেখি না। তবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠচর্চার সমস্যা এবং শিক্ষান্তে তাদের রুজি-রোজগারের সমস্যা যদি কিছুটা মেটে তবে অনুমান করি কিঞ্চিৎ উপকার হবে।

পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন চাই

ভারত সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের প্রথম বৎসরের ছ' মাস অতীত হয়ে গেছে। একটা পরিকল্পনার ধাঁচও তৈরি করে লোকের সামনে বার-করা হয়েছে, কিন্তু সেটা বাস্তবে কি হয়ে দাঁড়াবে, কল্পিত বা কাগজে অঙ্কিত নকশার সঙ্গে গড়ার কাজের কতটা মিল থাকবে, সে বিষয়ে প্ল্যান্-কর্তাদের মনেও কোনো দৃঢ় প্রত্যয় নেই। যে-কোনো প্ল্যানেই কিছুটা অনিশ্চয়তার জায়গা থাকে, কিন্তু এ যেন বড়ো বড়ো অঙ্ক লিখে কাগজের নৌকো ভাসানোর ব্যাপার চলছে। "সাহায্য" কী পাওয়া যাবে, বৈদেশিক "সাহায্য" কী পাওয়া যাবে, বৈদেশিক "সাহায্যে"র সুবাতাস কোন্ দিকে কতটা জোরে বইতে পারে, তাই নিয়ে।

বৈদেশিক সাহায্যের মানে প্রধানত ধার পাওয়া এবং ভারতে বিদেশী পুঁজিপতিদের টাকা খাটানো। এ দুটির জন্য ভারত সরকার লালায়িত এবং এগুলো সম্বন্ধে কী পরিমাণ আশা পূরণ হবে, তা ঠিক বুঝা যাচ্ছে না বলে অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ, "সাহায্যদাতারা" এখনো কিছু বলতে চাইছেন না। অর্থমন্ত্রী প্রাণপণে পূর্ব-পশ্চিমে তোয়াজ করে বেড়াচ্ছেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও নাকি ভারতের জন্য যথাসাধ্য বলা-কওয়া করছিল, কিন্তু ভারত-ত্রাণ ক্লাবের সদস্যরা কে কতটা করতে রাজী সে বিষয়ে চট্ করে কিছু বলছেন না, অপেক্ষা করছেন। কিসের জন্য? ভারতের আগামী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের জন্য কী? অথবা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যও আছে?

আমেরিকা ও অন্য কয়েকটি দেশ সম্বন্ধেও শোনা যাচ্ছে যে, ভারতকে "সাহায্য" দানের আগ্রহ কমতির দিকে, ডিভ্যালুয়েশন সম্পর্কে ভারত সরকারের মার্কিন উপদেশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও। কিছু কাল আগে থেকে ভারতে টাকা খাটাবার ব্যাপারে বিদেশী পুঁজিপতিদের যে-সব নতুন সুখ-সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে (লাভের টাকা বার করে নেওয়া, তৈরী মালের বিক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করা ইত্যাদি বিষয়ে), তাতে বিদেশী টাকাওয়ালা মহলে ভারত সরকারের প্রতি একটা নূতন "শ্রদ্ধার" ভাব জেগেছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টের "বাস্তব বুদ্ধির" প্রশংসা অনেক কাগজে বেরিয়েছিল এবং অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির মুখ থেকেও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু হায়, বিদেশী বন্ধুদের বিশ্বাস স্থায়ী করা যাচ্ছে না। ভারত সরকারের যে-সব ভালো কাজ বিদেশের প্রভাবশালী মহলের প্রশংসা লাভ করেছিল, সেগুলো ভারতে সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত থাকেনি। কোনো কোনো বিষয়ে সমালোচনা কেবল বিরোধী দলীয়দের মুখ থেকে শোনা যায়নি, সরকারী দলের মধ্য থেকেও কিছু কিছু শোনা গিয়েছিল। সেইজন্য বিদেশী বন্ধুদের ভয় হচ্ছে, ঐসব ভালো কাজে ভারত সরকারের মতি স্থির থাকবে কিনা। তার ওপর সামনে ইলেকশন। সরকারী দলের মধ্যে খেয়োখেয়ির খবর বিদেশী কাগজগুলিতে বেরুচ্ছে এবং ভারতের ইলেকশনে কী হবে, তাই নিয়ে বিদেশী পর্যবেক্ষক এবং খবরের কাগজগুলির মাথাব্যথা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। এই অবস্থায় বিদেশী "সাহায্যদাতারা" চট্ করে কিছু কবুল করছে না। "দেখি কী হয়", এইরকম একটা ভাব তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

এই "দেখি কী হয়" ভাবটা কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শকের ভাব নয়, এমন কি, পক্ষবিশেষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দর্শকের ভাবমাত্রও নয়। ভারতের ইলেকশনকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টার ভাবও এর সঙ্গে আছে। খোলাখুলিভাবে সে চেষ্টা করার সময় হয়ত এখনো আসেনি। আড়ালে-আবডালে যা হবার হবে, তা ছাড়া, বিদেশী মতের প্রচার এমনভাবে শুরু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের লোকের মনে কোনো বিশেষ আশা বা ভয় জাগিয়ে দেওয়া। যদি কোনো বিশেষ দেশের কাছ থেকে আমরা কোনো বিশেষ সাহায্য একান্ত কাম্য বলে মনে করি এবং যদি সেই দেশের মত এই বলে প্রচারিত হয় যে, অমুক অমুক দলের হাতে কর্তৃত্ব না থাকলে বা না এলে "দাতার" মনে বিশ্বাস আসবে না, তা হলে তার প্রভাব আমাদের উপর কীরকম হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

অবশ্য বিদেশী প্রচার সোজাসুজি হবে না, কারণ, তা হলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে পনেরো আনাই নিষ্ফল হতে পারে। আর সোজাসুজি বিদেশী প্রচার জনগণের মধ্যে করা হয়ও না, সেটা আসে দলের ভিতর দিয়ে। দলকে অর্থাৎ দলের চালকদের প্রভাবান্বিত করতে পারলেই প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অনেক সময়ে বিদেশী কী চায় বা বিদেশী যে কিছু পরামর্শ দিচ্ছে, সেইটে দেশী সাধারণ লোকের কাছ থেকে অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট রাখাই দলের কাজ হতে পারে। সাধারণ লোকে বিদেশী ব্যাপার নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামায় না। যুদ্ধ বা ঐরকম কোনো সংকটকালে ছাড়া তথাকথিত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশেও কোনো বিদেশী ব্যাপারে "ইলেকশন ইস্যু" হয়ে উঠে না, অর্থাৎ লোকের ভোট দেওয়া না দেওয়া তার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় না। লোকে দলকে ভোট দেয়। সুতরাং দলের নেতৃত্ব কীভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে, সেইটাই দেখার বিষয় এবং সেটা দলের ঘোষিত বাক্যের মধ্যে ক্বচিৎ দেখা যাবে। অনেক সময়ে ঘুরিয়ে ধরে মানে বুঝতে হয়। যেখানে বিদেশী একাধিক পক্ষ পরস্পর বিপরীত দিক থেকে দলগুলিকে

গান্ধীজীর দূত

ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র রক্ষার জন্য একজন দক্ষ মানুষের দরকার হয়েছিল। সেই মানুষটির নাম সুধীর ঘোষ। তাঁরই আত্মকথা 'গান্ধীজীর দূত'।

'গান্ধীজীর দূত' শিগগিরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার কারণ, এই আত্মকথা বস্তুত ভারতবর্ষের অনতি-অতীত কালের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ; ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্বের বহু নেপথ্য-ঘটনার চাঞ্চল্যকর কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে।

আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় সেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কয়েকটি নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। সেবাগ্রাম থেকে ডাউনিং স্ট্রীট, দিল্লি থেকে ওয়াশিংটন আর মসকো—সর্বত্র যে-মানুষটির অসংকোচ অবাধ গতিবিধি, তাঁর এই স্মৃতিচারণা যে পাঠকচিত্তে এক বিপুল আলোড়ন আনবে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করে এবং কিছুটা সফল হয়, সেখানে একদল আর একদলকে বিদেশী প্রভাবাধীন বলে প্রচার করে। "আমরা অমুকের প্রভাবাধীন", এমন কথা কোনো দল বলে না, প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বলে, "তোমরা অমুকের প্রভাবাধীন"।

যত দিন কেবল কারো ওয়াশিংটন এবং কারো মস্কোর তাঁবেদার, এই নিয়ে পরস্পর আক্রমণ চলত, ততদিন ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সরল ছিল। মস্কোর সঙ্গে পিকিং-এর ঝগড়া হবার পর থেকে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়েছে। পিকিং-এর তাঁবেদাররা এখন বিদেশীর মুখাপেক্ষী বলে মস্কো এবং ওয়াশিংটনের তাঁবেদারগণ কর্তৃক ভর্ৎসিত হচ্ছেন এবং উল্টে মস্কো এবং ওয়াশিংটনের মুখাপেক্ষীদের অনুরূপ ভর্ৎসনা করছেন। মস্কোর তাঁবেদাররা ওয়াশিংটনের তাঁবেদারদের ভর্ৎসনা করছেন, কিন্তু যাঁরা মস্কো এবং ওয়াশিংটন উভয়ের প্রসাদপ্রার্থী, তাঁরা কেবল চীনা-দরদীদের ভর্ৎসনা করতে পারছেন। এই অবস্থায় কারা যে কোন্ ফাঁক দিয়ে কোন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে কারবার করছেন, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে সঠিক জানা কঠিন। বিভিন্ন দলের প্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে কেবল সন্দেহ, সংশয় ও ভয় বাঁধ হচ্ছে। এই অবস্থায় নিজেদের মধ্যে বিভেদ এবং বিদেশীর হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন, তা সে যে দিকেরই হোক। লাভের গ্যারাণ্টি দিয়ে পশ্চিমা মূলধনের মালিকদের ডেকে আনার প্রতিবাদে যাঁরা পঞ্চমুখ, তাঁরা যদি কম্যুনিস্ট দেশগুলি থেকে প্রাপ্ত "সাহায্য-দান" বা "কো-অপারেশনে"র হিসাবটা ভালো করে খতিয়ে দেখেন, তা হলে দেখবেন যে, নিঙড়ে রস বার করে নিতে পূর্ব-পশ্চিম সমান ওস্তাদ।

বিংশ শতাব্দীর অপূর্ব আবিষ্কার এই "সাহায্যদানে"র কবল থেকে নিজেদের কিছুকালের জন্য মুক্ত করে আনা যায় না কি? গৃহবিবাদ এবং বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচবার আর কোনো উপায় আছে কি? বর্মা তো কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে গিয়েও এবং বিদেশী "সাহায্য" না নিয়েও বেঁচে আছে। এ কথা ঠিক, বর্মার সংবাদ দেশী কাগজে বেরোয় না। বর্মা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র দেশ, যার খবর কাগজে বেশী থাকে না। কিন্তু যাদের খবর থাকে, তাদের কীরকম খবর থাকে? ভারতবর্ষও যদি কিছুকালের জন্য বর্মার মতো নিজেকে সরিয়ে আনে, বিদেশী "সাহায্যে"র লোভটা দমন করতে পারে, তা হলে হয়ত কিছু দিন ভারতও "সংবাদের যোগ্য" থাকবে না। গৃহযুদ্ধ যদি ভালো করে বাধে, তা হলে অবশ্য ভারত "হেড লাইনে" থাকতে পারবে, কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দে থাকা হবে? বলা হতে পারে, বর্মা একলা থাকতে পেরেছে, তার কারণ, বর্মার খাবার অভাব নেই, ভারতবর্ষ ক্ষুধার্ত। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে— এ আশ্বাস তো কর্তারা প্রতিদিনই দিচ্ছেন। একদিন ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বাবলম্বী হবে, এ কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে সেই দিনটি কাছে এগিয়ে আনার জন্য অন্য সব কিছু পরে দেখা যাবে বলে এই দিকটাতেই জাতি একবার "ডু অর ডাই" চেষ্টা করে দেখুক না কেন?

১।১০।৬৬

'দেশী এবং বিলাতী'

ভদ্রলোক দোকানে ঢুকে সেই বহু-বিখ্যাত প্রসাধনীটি চাইলেন। দোকানদার এগিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

'একি—দিশী!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দিশীই বেরিয়েছে আজকাল।'

'তার মানে খানিকটা পারফিউমড্ প্যারাফিন? না মশাই, ও চলবে না।'

'অনেকেই তো নিচ্ছেন। বলছেন, ভালোই।'

'ছেড়ে দিন ও-সব কথা। বিলিতী আসল জিনিস থাকে তো তাই দিন।'

'কোথায় পাব, বলুন? ইম্‌পোর্ট নেই।'

'থাকে তো দিন না। বেশি দাম দিতে রাজী আছি।'

'আজ্ঞে না, হবে না। মার্কেটের ও-দিকটায় খোঁজ করতে পারেন।'

'দিশী—দিশী!'—গজগজ করতে করতে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ঠিক কথা—ইম্‌পোর্টেড্ জিনিস না হলে এখন আর মন ভরে না আমাদের। স্বনির্ভর হওয়ার সংকল্পে, স্বদেশী শিল্পের প্রসারে এবং সর্বোপরি ডলার-সংরক্ষণের তাগিদে বিদেশী ছোটখাটো জিনিসগুলোও মুঠোর বাইরে চলে গেছে আজকাল। যে-প্রসাধনীটি উক্ত ভদ্রলোক সন্ধান করছিলেন, এককালে বড়ো-সড়ো মুদির দোকানেও সেটি কিনতে পাওয়া যেত। এখনও পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু সেটা বহু সন্ধানসাপেক্ষ, আর দাম—

অতীতে বিশেষ একটি ট্যালকাম পাউডার সম্বন্ধে আমার কিছু দুর্বলতা ছিল। ক'দিন আগে কোনো দোকানের শো-কেসে তার অর্ধাবগুণ্ঠিত মূর্তিটি দেখা গেল। সচকিতে জানতে চাইলুম, 'কত দাম?' উত্তর এল, 'সতেরো টাকা।' অথচ যতদূর মনে পড়ছে, সে-সময়ে টাকা চারেকের বেশি লাগত না।

জিজ্ঞেস করলুম, 'বিক্রি হয়?'

দোকানদার একটু হেসে বললেন, 'ছ'টা পেয়েছিলুম ক'দিন আগে। পাঁচটা বিক্রি হয়ে গেছে।'

আমাদের মতো মধ্যবিত্ত সভয়ে সরে আসতে পারে, কিন্তু বিক্রি হয়, নিশ্চয়ই হয়। দেশের গ্রামগুলো কোন্ তিমিরে ডুবছে, সে-কথা না ভাবলেও চলে, কিন্তু সরকারী হিসেবে প্রকাশ—অবিভক্ত ভারতবর্ষে যেখানে লক্ষপতির সংখ্যা আঙুলে গোনা যেত, এখন তা অগণনীয়—তাঁদের ওপরে কোটিপতি মহামান্যেরা তো আছেনই। সুতরাং চার টাকার জিনিস সতেরো টাকা কেন, সাতাত্তর টাকা হলেও তা পড়ে থাকবে না।

যাই হোক, এ-সব নিয়ে অনধিকার-চর্চা সুনন্দর নয়। আমি ভাবছি, মনস্তত্ত্বটার কথা। সেই কবে যেন আমরা ভেবেছিলুম—বিদেশী বর্জন করব, নিজের দেশে যা পাই, তাই নিয়েই খুশী হবো, পরের কাছে আমরা কাঙাল-বৃত্তি করব না কিছুতেই। সেদিনের ছবিগুলো আজও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। আমার কেদার বাঁড়ুজ্জের উপন্যাস থেকে একটি চরিত্রের কথা মনে আসছে। বিদেশী জিনিসের ওপর স্বদেশী লেবেল লাগিয়ে, মেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড লেবেল তুলে দিয়ে সে ট্রেনে ফিরি করছে—বলছেঃ

দেশীকে বলি বাউণ্ডুলে বিদেশীকে বলি বাঁট্

দেখছেন কি, আমাদের দুঃখ রাত্রি পার হয়ে এল—এ-সব হচ্ছে সোনার ভারতের স্বদেশ-লক্ষ্মীর দান।

একালে এ-সব রোম্যাণ্টিক-সংস্কার থেকে আমরা মুক্ত। এবং, কী আশ্চর্য প্যারাডক্স—এই মনস্তুষ্টিটা আমাদের শুরু হয়েছে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর থেকেই। অথবা, প্যারাডক্স কথাটা ভুল হল—স্বাধীনতার প্রধান লক্ষণই নিশ্চয় আত্মবিস্তার—আন্তর্জাতিকতা, অতএব দেশকালের এই-সব সীমিত ব্যাপারকে আমরা পরপাঠ অতিক্রম করে গেছি। প্রথম দিনকতক বোধ হয় একটু ধাঁধা লেগেছিল, রাতারাতি আমরা খদ্দরের কোট-ট্রাউজার এবং গান্ধী টুপির রেনাসাঁসে অনুপ্রাণিত হচ্ছিলুম, তারপরেই সত্যদর্শন ঘটল। আমরা 'ফোর-

এন' (ইংরেজী 'ফরিন' শব্দের রাষ্ট্রভাষাগত অপভ্রংশ)-এর মহিমা বুঝতে পারলুম, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিতে নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণিত হলুম, বিদেশী ধারা প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে তার প্রতিশোধ নেবার আকুলতায় স্বদেশী ডিস্টিলারীগুলোতে শ্রাবণের প্লাবন বইয়ে দিলুম, ইংলিশ মিডিয়াম এবং ইংলিশ সিস্টেম চালিত স্কুলই যে একমাত্র যথার্থ জ্ঞানলাভের জায়গা—এই সত্যে নিশ্চিত হলুম, রবীন্দ্রনাথের নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করলুম, ক্যালিপ্সো সংগীত শুনে জানতে পারলুম—সত্যিকারের লোকগীতি কাকে বলে।
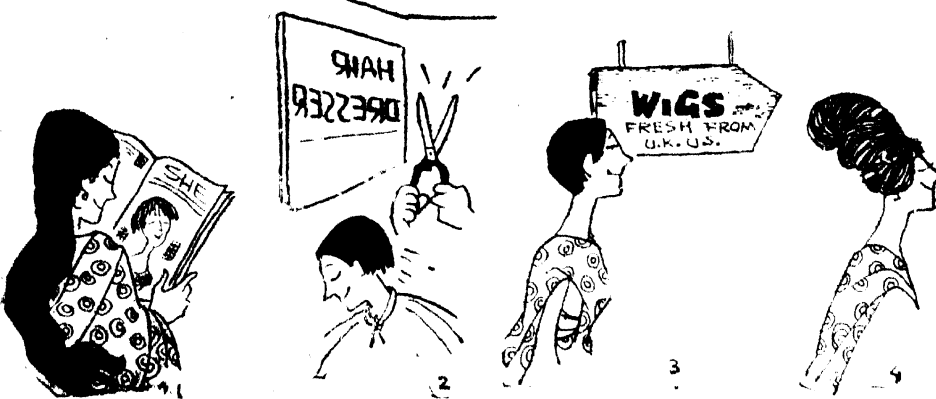
স্বাধীন জাতির আত্মবিস্তার এইভাবেই ঘটে থাকে—কিছু মধ্যযুগীয় মানুষ ছাড়া এই নিয়ে কেউ মন খারাপ করেন না। কিন্তু শুধু কেবল মানসিক আন্তর্জাতিকতা হলেই তো চলবে না, 'মাঝে মাঝে' বৃহৎ জগতের 'পরশখানি'ও দরকার হয়। বিদেশী জিনিস না হলে সে পরশ কোথায় পাওয়া যাবে, চিত্ত ভরবে কী ক'রে! ডলার বাঁচিয়ে, আমদানি বন্ধ করে—সেখানে বৃহৎ বিশ্ব থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য ভাগ্যবানদের অসুবিধে হয় না, তাঁরা বিদেশী গাড়িতে চড়েন, তাঁদের খাওয়ার টেবিলে বিলিতী হেরিং মাছের টিন থাকে, তাঁরা অস্ট্রেলিয়ান সিগ্রেটও কিনতে পারেন। মুশকিল আমাদেরই। সেই পুরোনো চার টাকার ট্যালকামের লোভানিটি সত্তেরো টাকায় মাথা ঠুকে ফিরে আসে।

ভাবতে ভাবতে মনে হল, শুধু আমরাই?

তা তো নয়। আসলে 'বিদেশী' শব্দটাই রোমাঞ্চকর, রহস্যময়—তা সব দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করে। বিদেশী বস্তুর গুণাগুণই কি সব সময়ে এই প্রলোভনটা জাগায়? 'ইমপোর্টেড্' কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দূরে সমুদ্রের গন্ধ আসে, অচেনা মাটি আর অজানা মানুষের স্পর্শ মেলে, যে-কোনো বিদেশী জিনিস ব্যবহার করবার

দূরে নীহারিকা কাছে উল্কাপিণ্ড
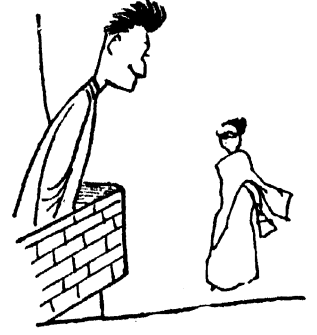
সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমরা বিশিষ্ট হয়ে উঠি।

ইয়োরোপের একটা শ্রেষ্ঠ দেশ ঘুরে এসে বন্ধু বললেন, ভারতীয় একটি বিশেষ 'ব্লেড্' সেখানে পৌঁছানো মাত্র [illegible] কিউ পড়ে— চক্ষের পলকে উ[illegible] যায়। (ব্যক্তিগতভাবে, বিনা পয়সায় পেলেও আমি এ-বস্তু দিয়ে দাড়ি কামাতে রাজী নই।) এমনকি, তাঁদের ব্যবহার-করা ভারতে তৈরী জামা-কাপড়েরও খরিদ্দার জুটে গিয়েছিল—যে-কোনো দাম দিতে প্রস্তুত। আসলে, এ-সবের পেছনে একটি চিন্তাই কাজ করছে হয়তো। সুদূরের স্পর্শ পেতে চাই—বিশিষ্ট হতে চাই—দূরে সমুদ্র, দূর আকাশের আঘ্রাণে রোমাঞ্চিত হতে চাই।

তা যদি না হয়, তা হলে শেফীল্ডের দেশ ইংল্যান্ডের দোকানদার কেন ছুরি-কাঁচি দেখিয়ে সগর্বে বলে—'আসল জর্মান জিনিস?' সুরুচির দেশ ফ্রান্স কেন বিমোহিত হয় রুশ 'লান্দিসি'র গন্ধে? ভারতীয় বিড়ি কী কারণে আমেরি[illegible]কার হৃদয় জয় করে নেয়?

হয়তো সেই রোমান্স, সেই শি[illegible]রণই আমাদের বিদেশী-প্রীতির একটা [illegible]লক্ষ্য উৎস; হয়তো এই কারণেই দশ টাকা[illegible] দিয়ে একখানা সাবান কেনবার প্রস্তাবেও [illegible]রাও পিছিয়ে যাই না। কে জানে!

আর আমি—এই আমিই তো আজ [illegible]আট-দশ দিন ধরে একটা বিলিতী [illegible]সম কেনবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়া[illegible]!

সন্ততি

মণীশ ঘটক

একটিমাত্র ঘর ছিলো আমার
যখন তোমরা এসেছিলে,
একের পর এক,
আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ,
আমার ধ্যানের ধন,
আমার জ্যোতির ঊর্মিমালায়।

ভরে উঠেছিলো আমার ঘর, অকুলান ঘর,
একটিমাত্র ঘর।
ভরে উঠেছিলাম আমি, স্বপ্নের অনেক আমিকে
তোমাদের মধ্যে পেয়ে।

আজ অনেক ঘরে ভরা বাড়ী আমার
একের পর এক
খালি হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছেই।
সেইসব খালি ঘরে
স্বপ্নচারী আমি আজ খুঁজে বেড়াই
এ ঘরে তোমাকে, ও ঘরে তাকে,
আনন্দ পাই বসিয়ে
এ ঘরে তোমাকে, ও ঘরে তাকে।

এইসব ঘরগুলো কখন
আবার একটি ঘর হয়ে যায়,
সেই অনেক আগের একটি ঘর—
যে ঘরে তোমরা ছিলে
আমার দেহে এক হয়ে
আমার মনে এক হয়ে
আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দে এক হয়ে
যেন কোনো ঢেউ না ওঠা মহাসমুদ্রের
গোপন অতল মণিকোঠায়!

আমার অনেক ঘরের
অনেক ছড়ানো নির্জনতায়
আবার আমি এক হয়ে উঠি॥

আলাদা রকম

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আসলে আমি তো একটু অহঙ্কারী;
মুশকিল সেইখানে।
আসলে আমি তো একটু বায়নাবাজ;
মুশকিল সেইখানে।
আসলে আমি তো অন্য কারো মুখে ঝাল খেতে যাব না;
মুশকিল সেইখানে।

তা ছাড়া দেখুন, আমি টান হয়ে হাঁটতে ভালবাসি।
তদুপরি
গুরু-টুরু যেহেতু মানি না,
হাঁটু ভেঙে বসবার বিদ্যায় খুব পটু নই।
হঠাৎ কেউ যদি বলে, "ভদ্রমহোদয়,
সবই তো বুঝলুম, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয়
দাদারা যে অন্য কথা বলেছেন..."
তা হলে কী আর বলব, "ধুত্তোর দাদারা"
বলে হয়ত হেসে উঠতে পারি।
মুশকিল সেইখানে।

আসলে আমি যে একটা পুরোপুরি আলাদা মানুষ,
মুশকিল সেইখানে।

মানাশিখর বিজয়ঃ বাঙালী পর্বতারোহীর অমর কীর্তি
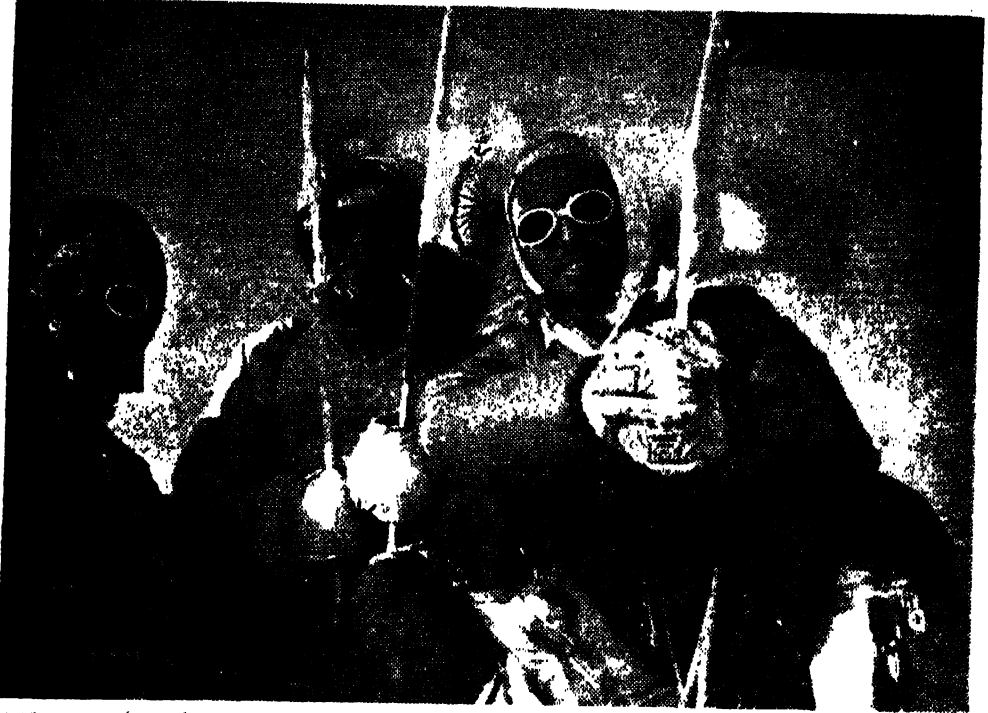
১৯৬১-তে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ ফিরে আসার পর পর গত ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতার পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের তরুণ সদস্য প্রাণেশ চক্রবর্তী সঙ্গে চারজন শেরপা—পাসাং ফুতার, শেরপা শেরিং, শেরিং লাকপা এবং পাসাং শেরিং-এর সঙ্গে ২৩৮৬০ ফুট উঁচু দুর্ধর্ষ মানা শৃঙ্গে আরোহণ করে ভারতের মধ্যে প্রথম এই গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। উপরের চিত্র : মানা শৃঙ্গে জাতীয় পতাকা হবতে ডান দিক থেকে প্রাণেশ চক্রবর্তী, শেরপা লাকপা এবং শেরপা পাসাং শেরিং—ফটো : পাসাং ফুটার)

(নীচের চিত্র) পর্বতারোহণের ইতিহাসে অমর কীর্তির অধিকারী বাংলার দুঃসাহসী তরুণদল গত রবিবার কলকাতায় ফিরলে হাওড়া স্টেশনে তাঁদের বিপুল জনতা সম্বর্ধনা ও অভিনন্দনে ভূষিত করেন

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

হাতে কমণ্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি

প্রভাসের লোক বড়ই অনাড়ম্বর। তাই সায়েবের বড়ফাট্টাই নিয়ে সেখানে মস্করা জমে ভালো।

সাট্টে বাবতে একদা মহামুশকিলে পড়েছিলেন লর্ড কার্জন।

আমি জানি আমার নগণ্যতম—অর্থাৎ আমার প্রিয়তম পাঠকও প্রত্যয় যাবেন না যে, লর্ড কার্জনের মত বিলেতের খানদানী পরিবারের নিকষ্য কুলীন সায়েবের মত ডালভাতে—সরি, আই মীন বেকন-আণ্ডা—নিয়ে গর্দিশে পড়তে পারেন। টাকাকড়ির অভাব এমনিতেই ছিল না, তদুপরি বিয়ে করেছিলেন মার্কিন কোটিপতির দুহিতা—নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় (আবার ভুল করলুম, মার্কিনিংরেজ মেয়ে শাদি করে শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীকে সেখান থেকে ঘেঁটি মেরে শিকার করে ঘরে বাঁধে অন্য মোকামে) পিতাকে উত্তমরূপে দোহন করেই এসেছিলেন। তাই স্বীকার করে নিচ্ছি গল্পটি অন্য কারো বাবতে হতে পারে এবং ডিটেলে ভুল থাকবে এন্তের। কিন্তু আমার নিপীড়িত কর্মক্লান্ত স্মৃতিশক্তি তবু যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বারবার অভিমানভরে বলছে, এটা লর্ড কার্জন অব্ কিডলস্টনেরই কাহিনী—কার্জনের মুসলমানপ্রীতি দেখে অনেকেই বলতেন লর্ড কার্জন অব্ খিদিলস্তান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কীকে কচুকাটা করা হল সেভ্রে-এর সন্ধিচুক্তিতে (তখনই এ-দেশে খেলাফত আন্দোলনের দানা বাঁধে), কিন্তু ঐ সময় উদয় হল মুস্তফা কামাল পাশার, (পরে আতা তুরক) এবং তিনি সে সন্ধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে খেদিয়ে বের করে দিলেন গ্রীকদের তুর্কী থেকে। তখন আবার নয়া করে সন্ধিপত্র তৈরি করতে হবে। ইওরোপময় হাহাকার রব উঠেছে, 'বর্বর' মুসলমান তুর্ক 'সুসভ্য' খৃষ্টান গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছে তার 'হক্কের' (বে-) দখলী জমি থেকে—নূতন সন্ধিতে এটা মানা চলবে না (ফাত্তাকি'গুলি নয়)। তাই নয়া সন্ধিটা যাতে চোস্ত-দুরুস্ত হয় সেজন্য লজান বৈঠকে পাঠানো হল তামাম ইওরোপের কুটিলস্য কৌটিল্য মহামান্য কার্জনকে।

গণ্ডা দশেক সুটকেস ট্রাঙ্ক নিয়ে নামলেন পরমপ্রতাপান্বিত কার্জন লজান শহরে। দুনিয়ার রিপোর্টার জড় হয়েছে তাঁর অবতরণভূমিতে।

মালপত্র যখন নামছে তখন দেখা গেল, সেই বাক্সটি ভাঙা লগেজের সঙ্গে আলাদা করে অতি সন্তর্পণে নামানো হল একখানা ছোট্ট ফুট-স্টুল—লর্ড কার্জন মিটিং-মাটিং সর্বত্রই এই জিনিসটির উপর পা না রেখে দু' দণ্ড বসতে পারেন না। ঐটে দেখা মাত্রই এক ঠোঁট-কাটা ফরাসী সাংবাদিক টিপ্পনী কাটলে—"ভোয়ালা ল্য ত্রোন দ্য দামা!" (Voila le trone de Damas!)—"ঐ হেরো, দামাস্কসের সিংহাসন"—অর্থাৎ নয়া মাহমুদ কার্জনের 'চলচৌকি' পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগর (স্থান পরিবর্তন না করে একটানা এক জায়গায় আছে) দমস্কের সমতুল্য। ...তা সে যাক্ গে, এটা ঈষৎ অবান্তর।

তুর্কীর পক্ষ থেকে এসেছেন জেনারেল ইসমেৎ পাশা (পরে প্রেসিডেন্ট ইনেনু)।

জোর কনফারেনস, জোরালো উপ-কনফারনস, সব-কমিটি আরো কত কী। কার্জন বজ্রনির্ঘোষে—থানডারিং—লেকচার ঝাড়লেন টেবিল থাবড়ে। ইসমেৎ দিব্য ইংরিজী বোঝেন,—ভান করলেন বোঝেন না, তদুপরি তিনি কানে খাটো। থানডারিং লেকচারের প্রতিটি তাঁর কানের কাছে অনুবাদ করে দিতে হয়—থানডার তৎক্ষণে ঠাণ্ডা। গরমাগরম উত্তর দিতে হল। সেপাই ইসমেৎ পারবেন কেন অরেটর কার্জনের সঙ্গে? তবু চললো লড়াই।(১)

সন্ধেবেলা এঁরা সবাই একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করে নিতেন। আজ

---

(১) কার্জন-ইসমেতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইসমেতের শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ জয় হলে পর সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। অতিশয় সবিনয় তিনি নিবেদন করেন, "না, না, আমার আর কী কীর্তি! আমি কালা—আল্লাকে অসংখ্য শোকরীয়া ধন্যবাদ।"

এখানে ডিনার, কাল সেখানে ডানস, পরশু জীনিভা হ্রদে নৈশভ্রমণ।

এক সন্ধ্যায় কার্জনের ভ্যালে তাঁকে যথারীতি অত্যুত্তম ডিনার স্যুট পরিয়ে দিয়ে, সাদা বো-টি নিখুঁত বেঁধে দিলে পর সদাশয় লর্ড বললেন, "আজ আর তুমি আমার জন্য জেগে থেকো না; ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি কোনো রকমে ম্যানেজ করে নেবো'খন।" এ যে কত বিরাট সদাশয়তা সেটা সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন না। এসব লর্ডরা ভ্যালে-র সাহায্য বিনা জামা-কাপড় পরতে তো পারেনই না—আর বো বাঁধার বেলা তো ৯৯% স্রেফ ঘায়েল—ছাড়তে পর্যন্ত পারেন না।

ভ্যালেটি ছিল কার্জনের চেয়েও খানদানী—অবশ্য তার আপন ভ্যালে সম্প্রদায়ে। বো বাঁধাতে তার ছিল বিশ্ব রেকর্ড। ১১ সেকেণ্ডে সে যা বো বাঁধতো, মনে হত, একদম মেশিনে তৈরি, রেডিমেড বো। অন্য লোক এ স্থলে সে সন্দেহ এড়াবার জন্য বো-টি একটু ট্যারচা করে নেয়। খানদানী কার্জনের বেলা অবশ্য এ সন্দেহ করতে যাবে কে? ...বহু বৎসর পরে হিটলারের ভ্যালে লিঙে এর কাছাকাছি অর্থাৎ ১২ সেকেণ্ডে আসতে পেরেছিলেন। লিঙে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, হিটলার প্রতিবার চোখ বন্ধ করে এক, দুই গুনতেন এবং লিঙের বো বাঁধা শেষ হলে সোল্লাসে বলতেন, "লিঙে, এবারও কেল্লা ফতে করেছ—মাত্র বারো সেকেণ্ড!" ...উপস্থিত এ বো অনুচ্ছেদ থাক।

কার্জন তো গেলেন ব্যানকুয়েটে wined and dined হতে—সঙ্গে 'ক্রোন দ্য দামা' বা 'দিমিশকের ময়ূর সিংহাসন' বগলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ইংরেজী এনসাইকলপীডিয়া, ফরাসী লিত্রে, জর্মন ব্রকহাউস—চরম পরিতাপের বিষয়—সবাই নীরব। বিবেচনা করি নিমন্ত্রণ-কর্তাই সেটি সাপ্লাই করেছিলেন। কিন্তু সে রাত্রে কিসে যেন কি হয়ে গেল, কার্জন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং রাত দশটা-এ গারটার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলে ঢুকতেই দেখেন বিরাট হল জুড়ে লেগেছে ধুন্দুমার নৃত্য—সে রাত্রে সে হোটেলে ছিল গ্যালা ড্রামস। তারই এক পাশ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠতে হবে লিফটে। যেতে যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন—কে ঐ লোকটি? বড্ডই যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। উৎকৃষ্টতম স্টাইলের নিখুঁত ফুল ডিনার-ড্রেস পরে সাতিশয় সুরুচিসম্মত পদ্ধতিতে নাচছে একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতীর সঙ্গে।

সর্বনাশ! ও গড!! এ যে তাঁরই ভ্যালে!!! নাচছে তাঁরই ঈভনিং ড্রেস পরে।

আহা, সদয় সহৃদয় পাঠক, তুমিও আমার সঙ্গে সবেদন কণ্ঠ যোগ দিয়ে বলবে, আহা,

বেচারী ভেবেছিল কত্তার ফিরতে যখন্ দেরি হবে তখন সে-ই বা দু' চক্কর নেচে নেয় না কেন?

কিন্তু এ যে ডবল মহাপাপ—খাস বিলেতে নিশ্চয়ই, এ স্থলে ডবল ফাঁসির চেয়েও কড়া আইন আছে।

তুলনা দিয়ে কি প্রকারে বোঝাই? কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যদি হঠাৎ কোনো এক পরিচিতের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁরই এক চেনা চাঁড়াল তাঁরই গরদ পরে বামুন সেজে পুজোর ঘরে ঘণ্টা বাজিয়ে ধুমধাম লাগিয়েছে আর বউ-ঝিরা তাকে ঢিপঢিপ করে পেন্নাম করছে তা হলে তাঁর মনের অবস্থাটা কোন্ রস দিয়ে বর্ণাতে হয়?

*

কার্জন হুকুম জারি করলেন, ব্যাটাকে যেন অতি ভোরের ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—নাক বরাবর লণ্ডন। একটা ঠিকে ভ্যালে যেন তদ্দণ্ডেই যোগাড় করা হয়।

এখানেই শেষ? আদৌ না। এ তো সবে শুরু।

পরদিন সকালে কার্জন খাটে শুয়ে শুয়ে দেখেন, ঠিকে ভ্যালে ওয়ার্ড-রোবের দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকাচ্ছে। অচেনা, নয়া ঠিকে—কার্জনও দরদী-দিল আদমী, শুধোলেন, "কি হল?"

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "হুজুর, সঠিক ঠাহর হচ্ছে না। পাতলুনগুলো গেল কোথায়?"

লম্ফ মেরে কার্জন গিয়ে দেখেন, সত্যিই তো, পাতলুনগুলো গেল কোথায়? আছে বটে অনেকগুলো, কিন্তু স্ট্রা ই পা ট অর্থাৎ ডোরাকাটা পাতলুনগুলো কোথায়? সে-গুলোর যে এক জোড়াও নেই। আর সেই পরেই তো তিনি যাবেন দুপুরের কনফারেনসে। খাঁটি ফুল মর্নিং ড্রেস। সামনের দিকে ট্যারচা করে কাটা হাঁটুজোকা কোট, সেই কাপড়েরই তৈরী ম্যাচ করা কিংবা ফেনসি ওয়াসকিট—এই ওয়াসকিটেই সাদা পাইপিং লাগাবেন কিনা তাই নিয়ে জীবন-মরণ সমস্যায় পড়েছিলেন আমার সুবন্ধু স্যার সিরিল হবজন-জবসন ফর্বস-রবার্টসন লণ্ডনে—এবং তার সঙ্গে সাদায় কালোয়, কিংবা ঈষৎ ধুসর রঙের ডোরাকাটা স্টাইপাট ট্রাউজারজ—তার তো কোনো চিহ্নই নেই।

সর্বনাশ! এখন উপায়?

গাঁইয়া পাঠক—যতই ধানাই-পানাই করি না কেন, আম্মো এখনো তাই—তুমি বলবে, কেন অন্য পাতলুন পরে গেলে হয় না? নিশ্চয়ই হয়। যান না আপনি নিচে কপ্পিন, উপরে দু'শালা-শাল, মাথায় তুর্কী টুপি, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে আধুনিকদের বুফে লানচ পার্টিতে টালিউডে—কে বারণ করছে? সে কথা থাক।

কিন্তু ব্যাটা ভ্যালের চুরি করারই যদি মতলব ছিল তবে কোট-ওয়েসকিট ম্যাচিং-টাই-কলার পেটেণ্ট লেদার জুতো মায় স্প্যাটস এগুলো ফেলে গেল কেন? এস্তেক ডাইমণ্ড পিনও যথাস্থানে রয়েছে। উঁহু, তা নয়। নিশ্চয়ই সুদ্ধমাত্র তাঁকে রাম-ইডিয়েট বানাবার জন্য।

ঝাড়ো টেলিগ্রাফ। পকড়ো রাসকেলকো ক'হী ভী হোয় টেরেন মে—চাহে প্যারিস, চাহে লনদন!

সে না-হয় হল। কার্জনের রোআবে বাঘের দুধের অর্ডার আকছারই যায় টেলিগ্রামে।

কিন্তু স্ট্রাইপাট ট্রাউজারজ তো আর বাঘের দুধ নয়, বাঘিনীর দুধও নয়। আপাতত সে বস্তু মেলে কোথা? ওদিকে

প্লেনারি কনফারেন্সের সময় যে ঘনিয়ে আসছে। হে ভগবান! প্রতি মুহূর্তের এ কী গব্বযন্তনা।

*

এমন সময় করিডরে শতকণ্ঠে বাইশটে ভাষায় চিৎকার হই-হল্লোড়।

পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! কোথায়? কোথায়?

যে মেয়েটি ভ্যালে, চাকরবাকরদের কুটুরি-গুলোতে তাদের বিছানাপত্র ঝেড়েঝুড়ে দেয় সে কার্জনের ভ্যালের তোশক ঝাড়তে গিয়ে, দেখে তার নিচে পরিপাটিরূপে টান-টান করে সাজানো চার জোড়া স্ট্রাইপাট পাতলুন। আমরা, গরীব দুখীরা যাদের বাধ্য হয়ে মাঝেমধ্যে স্যুট পরতে হয়, তারা জানি, পাতলুনের ক্রীজ দুরুস্ত করার জন্য এর চেয়ে মহত্তর মুষ্টিযোগ নেই।

কিন্তু সর্বজ্ঞ কার্জনের সেদিন নবীন জ্ঞানসঞ্চয় হল॥ (২)

(২) কাহিনীটি যিনি আমাকে সর্বপ্রথম বলেন তাঁর মতে লিটন স্ট্রেচিই নাকি ইটি সকলের পয়লা লিপিবদ্ধ করেন। আমি ভিন্ন ভিন্ন কীর্তন শুনেছি॥

তোমার উদ্দেশে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

"In search of you, in search of you...."

এইখানে তুমি থাকো। ওই সাদা বাড়িটায়, যার চূড়ায় শ্বেতপাথরের পরীটাকে বহু দূর থেকে দেখা যায়। নির্জন তোমাদের ব্যালকনি, বড় বড় জানলায় ভারী পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে লাগানো এয়ারকুলার। মসৃণ সবুজ লনে বুড়ো একটা স্প্যানিয়েল কুকুর ঘুমিয়ে আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, এসব এক পুরুষের ব্যাপার নয়। জন্মের পর থেকেই তুমি দেখেছো খিলান-গম্বুজ, বড় ঘর, ছাদের ওপর ডানা-মেলে-দেওয়া পরী—যা কেবলই উড়ে যেতে চায়। যায় না।

বিকেলের রাস্তায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে কালো যুবতী আয়া মন্থর পায়ে প্র্যাম ঠেলে নিয়ে চলেছে। কদাচিৎ দু-একজন ভবঘুরে লক্ষ্যহীন চোখ চেয়ে হেঁটে যায়। বড় সুন্দর অভিজাত নিস্তব্ধতা তোমাদের। তাই যদিও আমার পথে পড়ে না, তবু আমি মাঝে মাঝে তোমাদের এই নির্জন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে যাই।

আজ দেখলুম তোমাকে। তুমি একা হেঁটে যাচ্ছিলে।

যখন ক্বচিৎ কখনো তুমি এরকম হেঁটে যাও, তখনই বলতে কি তোমার সঙ্গে এক সমতলে আমার দেখা হয়। আজ যেমন। নইলে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখি তোমাদের মভ রঙের মোটর গাড়িতে। হু-হু করে চলে যাও।

তোমাদের পুরোনো মোটর গাড়িটায় কোনো গোলমাল ছিল কি আজ! কিংবা নিকেলের চশমা চোখে তোমাদের সেই বুড়ো ড্রাইভারটার!

অনেকদিন দেখা হয় নি। দেখলুম এই শীতকালে তুমি বেশ কৃশ হয়ে গেছ। সাদা শাড়ী পরেছিলে, তবু কচি সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছিল তোমাকে। সুন্দর অভ্যাস তোমার—শাড়ীর আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীর ঢেকে দাও, মুখ নীচু করে হাঁটো—যেন কিছু খুঁজতে খুঁজতে চলেছ। নাকি পাছে কারো চোখে চোখ পড়ে যায় সেই ভয়েই তোমার ওই সতর্কতা। ও-রকম মুখ নীচু করে যাও বলেই বোধ হয় তুমি কোনোদিন লক্ষ করো নি আমায়। আজকেও না।

মোড়ের মাথায় রঙ্গন গাছের ছায়ায় যে লাল ডাকবাক্সটা আছে তুমি সেটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিলে। তোমাকে আর দেখা গেল না। এত কাছ দিয়ে গেলে আজ যে, বোধ হয় তোমার আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল একটুক্ষণের জন্য তোমার পিছু নিই। নিলুম না। কেননা ফাঁকা রাস্তার মোড় থেকে বেঁটে, মোটাসোটা, কালো টুপি পরা লাল ডাক-বাক্সটা স্থির গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল তোমার পিছু নিতে গেলেই সে গটগট করে হেঁটে এসে আমার পথ আটকাবে।

একটু আগে আমি ওই মোড় পেরিয়ে এলুম। বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূরে এক গাড়ি-বারান্দার তলায় দেখলুম জটলা করছে

পাড়ায় বখাটে ছেলেরা। বড় রাস্তাতেও রয়েছে নির্বোধ পুরুষের ভীড়। একা ওই-ভাবে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে তুমি বহু দূরে আছ, সুরক্ষিত আছ। অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তুমি তত দূরে নও। আমি তাই অনেকক্ষণ ভাবলুম তুমি ঠিকঠাক চলে যেতে পেরেছিলে কিনা।

তোমাদের পাড়া ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই কয়েকটা ভিখিরির ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রুক্ষ চুল, করুণ চোখ, কৃশ চেহারা। লক্ষ করলুম একটি ছেলের মাথায় টোপরের মুকুট, একটি মেয়ের গলায় শুকনো গাঁদা ফুলের মালা। কাছেই ফুট-পাথের কোথাও বসে এতক্ষণ বর-বউ খেলছিল বোধহয়। কিছু সময় তারা আমার পিছু নিল। 'দাও না, দাও না।' উল্টো দিক থেকে ধীর গতিতে হেঁটে আসছিল একজন পুলিস। কাছাকাছি হতে হঠাৎ কি ভেবে সে তার হাতের ব্যাটনটা দুলিয়ে বলল, 'ভাগ!' বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেলে সে একবার আমার দিকে চেয়ে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। আমিও হাসলুম। বাচ্চাগুলো দূর থেকে চেঁচিয়ে বোধ হয় আমাকেই বলছিল 'ভাগ! ভাগ!'

(২)

রাত সোয়া ন'টায় সোমেনের পড়ার ঘরের পাশে হলঘর থেকে ওদের পুরোনো প্রকাণ্ড দেয়াল-ঘড়িটায় পিয়ানোর টুং টাং বেজে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে হাই তুললুম। সোমেন তার বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল।

চলে আসছিলুম, সোমেন ডাকল 'মাস্টারমশাই!'

'বলো।'

'কাল সবাই বরানগর যাচ্ছি, মাসীমার বাড়ি। পড়বো না।'

'আচ্ছা।'

'আর মাস্টারমশাই...' বলে ও লাজুক মুখে একটু হাসল।

'কি হল?'

কথা না বলে ও ইঙ্গিতে হলঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। হলঘর পেরিয়ে ওদের অন্দরমহল। আজ হলঘরটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে অন্ধকার থাকে। বললুম 'তুমি না এস ও পি সি-তে বক্সিং করো! একটা অন্ধকার হলঘর পার হতে পারো না!' বলতে বলতে কাঁধে হাত রাখলুম। কিছুদিন আগে পৈতে হওয়ায় ওর মাথার চুল এখনো ছোটো ছোটো—আর দণ্ডীঘরের ব্রহ্মচর্যের আভা এখনো ওর সমস্ত শরীরে ফুটে আছে।

'এই ঘরে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন না! বেঁচে থাকতে যিনি তোমাকে অত ভালবাসতেন, মরার পর কি তিনি তোমাকে ভয় দেখাতে আসবেন?'

শুনে সামান্য শিউরে উঠল সোমেন। আমি ওর মাথায় হাত রাখলুম। কখনো যখন হোম-টাস্কের খাতার [illegible] ঝুঁকে থাকা ওর মনোযোগী মুখে [illegible]ল-বাতির সবুজ ঢাকনার আলো এসে [illegible], কিংবা যখন কখনো ভুলে যাওয়া প[illegible] মনে করার চেষ্টায় ও দাঁতে ঠোঁট চেপে, হাত মুঠো করে অসহায় চোখে টাল-মাটাল তাকায় তখন আমার কখনো কখনো মনে হয়—এই সুন্দর, পবিত্র ছেলেটি আমার। এই আমার ছেলে সোমেন—যার হাতে রাজ্যপাট দিয়ে খুব শীগগীরই একদিন আমি বাণপ্রস্থে যাবো।

আমি হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সোমেন এক ছুটে অন্ধকার হলঘর পার হয়ে গেল।

আমাদের বাসার সদর দরজার ছিটকিনিটা বাইরে থেকেই খোলা যায়। প্রথমে দরজাটা টেনে বন্ধ করো। তারপর ডান দিকের পাল্লাটা আস্তে চেপে ধরো। খুব অল্প একটু ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে দাও বাঁ হাতের আঙুল। এইবার আঙুলটা ডান দিকে বেঁকিয়ে দিলেই তুমি ছিটকিনির মুখটা নাগালে পাবে। সেটা ওপরে তুলে ঘোরাও। তারপর ছেড়ে দাও। ঠক করে ছিটকিনি খুলে যাবে।

রাত সাড়ে দশটায় কৌশলে সদরের ছিটকিনি খুলে, অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে আমি ঘরে ঢুকলুম। বাতি জ্বলছে। মার বিছানায় মশারি ফেলা। মার জেগে থাকার কোনো শব্দ শোনা যায় না।

রান্নাঘরে আমার ভাতের ঢাকনা খুলে বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। মা টেরও পায় নি। আজকাল বড় সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে মা। বয়স হচ্ছে। কথা বলতে বলতেও হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে নেমে আসে মাথা। খেয়াল হতে চমকে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করে,

'কি বলছিলাম যেন!' আমি হেসে বলি, 'কিছু না, মা, কিছু না।'

রান্নাঘরের জানালার একটা শার্শি ভাঙা। মেঝের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঝোল, আর তার সঙ্গে এখানে-ওখানে বেড়ালের পায়ের ছাপ ভাঙা শার্শিওলা জানালাটা পর্যন্ত গেছে। ভাতের পাশে কালচে আর মেরুন রঙের দুটো তরকারি, হাতল ভাঙা কাপে হলুদ ডাল। রাতে ঠান্ডা এই খাবারের দিকে চেয়ে মনে হয় মুখে দিলে বড় বিস্বাদ লাগবে।

খেয়ে ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরাবো, মা ঘুমের মধ্যেই 'অঃ' শব্দ করে পাশ ফিরল।

'কে!'

'আমি।'

মা চৌকির শব্দ করে উঠে বলল, 'দেখ তো, একটা চিঠি এসেছে বিকেলে। চোখে ভাল দেখি না। দেখ তো। কর্তার চিঠি মনে হয়।'

মশারির ভিতর থেকে হাত বের করে মা আমার হাতে চিঠি দিল, 'জোরে পড়।'

কালচে রঙের পাকিস্তানী পোস্টকার্ডের ওপরে ইংরিজীতে লেখা—'কালী'। তার নীচে—পাঠ : "পরমকল্যাণবরেষু, বাবা রম, ইতিপূর্বে তোমার নিকট কার্ডে পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়াছ কিনা জানাইও। তোমাদের চিঠি না পাইলে চাঞ্চল্য ও চিন্তা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখনি অসুখ অশান্তি দেখা দেয়. সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায়—চোখে ভালরূপ দেখিতে পারি না বলিয়া নানারূপে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বর্তমান অবস্থা-ব্যবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তাড়াতাড়ি কোনো কিছু না হইলে অবস্থা ক্রমশ জটিল ও সংকটাপন্ন হইবে। তোমার কাগজাত ঢাকা আসিলে অবশ্য খবর পাওয়া যাইত। অনিলের সহিত যোগাযোগ করিও। ঐ সঙ্গে কলিকাতা পাকিস্তানী হাই-কমিশনার বরাবর দরখাস্ত দিয়া তাহাতে অনুমতি পাইবার ব্যাপারে রিকমেন্ড করাইয়া পাঠাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কারণ এখানকার ডি আই জি হইতে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য জানিবা।... বলিয়াছিলাম, বরং মুসলমান হইব তবু ভিটা ছাড়িব না।...অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি...তোমরা নিকটে না থাকায় অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, রিকমেন্ড থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে। ...দেরী হইলে আরো বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িব...তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে মরিতে চাহি। তোমার গুড়া কাকিমার মাথার কিছু বিকৃতি দেখা দিয়াছে—আজ চার-পাঁচ মাস যাবৎ নানা-রূপ চিকিৎসা চলিতেছে।...সোনারপুরে

দুই চালা তোলার চেষ্টা করিও। বর্তমান যে দুঃসময় দেখা দিয়াছে তাহাতে মিতব্যয়ী না হইলে নিরুপায় হইবা। সাবধানে থাকিও ও মঙ্গল জানাইও। অন্যান্য এক প্রকার। ইতি অং তোমার বাবা।"

চিঠি শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সারা দিন তুই করিস কি? সার্টিফিকেটটার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করলে যদি হয়, করিস না কেন! অনিলের কাছে যা—ও অত বড় চাকরি করে, ঠিক বের করে দেবে।'

'যাব।'

'যাস। বুড়ো বয়সে এখন জেদ কমেছে লোকটার, এই বেলা নিয়ে আয়।'

মা মশারির ভিতরে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, 'চোখে কেমন কুয়াশার মতো

দেখি আজকাল। কর্তা আসবে, তার আগেই একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস তো!'

আমি মায় মশারি তুলে দিয়ে ভিতরে পায়ের কাছে গটিসুটি মেরে, শুলুম। 'মশা ঢুকছে না!' বলে ছোট্টো একটু ধমক দিয়ে মা আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কি এত খরচ করিস! এতদিন একটু আধটু জমালে দুটো দোচালা সত্যিই উঠে যেত। একটু গাছগাছালি লাগাতে পারতুম। নিজেদের বাগানের ফলপাকুড় খাই না কত দিন!'

'একটু আদর করোনা, সোনা মা!'

(৩)

আমার সামনের রাস্তায় হঠাৎ পড়ে লাফিয়ে উঠল একটা লাল বল। এমন চমকে উঠেছিলুম! তারপরই শোনা গেল সামনের হলুদ বাড়িটার দেয়ালের আড়াল থেকে বাচ্চা ছেলেদের চীৎকার, 'ওভারবাউন্ডারী... ওভারবাউন্ডারী!...মিলনের একুশ!' শুনে আমি আপন মনে হেসে উঠলুম।

পিছনের পার্কটার দেখে এলুম এক পাল কাকের সভা বসেছে। আর খোলা মাঠে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে খেলছে বাতাস। মোড় ফিরতেই মুখোমুখি দেখা হল সেই মোটা, বেঁটে, লাল ডাকবাক্সটার সঙ্গে। দূরে দেখা যায় তোমাদের বাড়ির চূড়ায় পরীটাকে—আকাশের দিকে বাড়ানো এক হাত—অন্য হাতে সে তার বাঁ দিকের স্তন ছুঁয়ে আছে।

তখন দুপুর। রাধাচূড়া গাছের তলায় জলের ড্রাম, পেতলের থালা, আর ছাতুর ঝুড়ি সাজিয়ে বসেছে এক অল্পবয়সী ছাতুওয়ালা। তাকে ঘিরে রিক্‌শওয়ালাদের ভীড়। এক হাত খাবারের থালায় রেখে অন্য হাতে লোভী পাখি-পক্ষীদের তাড়াতে তাড়াতে যখন মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে তখন মনে হয় ঐ খাবারের সঙ্গে আকাশ, মাটি ও উদ্ভিদের বড়ো মায়া মিশে আছে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে খাই।

চমৎকার দিন আজ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। শীতের খর বাতাস বইছে।

তুমি আজ কোথাও ছিলে না। যখন তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলুম তখন দেখি একটা ঘাস-ছাঁটা কল বাগানময় ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মালী। ব্যালকনিতে দুটো ডেকচেয়ার। তোমাদের অর্ধবৃত্তাকার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে একা একটা স্কুটার, যার রঙ ছানার জলের মতো সবুজ।

সারা দুপুর আমি আজ আর ভুলতে পারলুম না—ঐ ঘাস-ছাঁটা কল দুটো ডেক-চেয়ার, আর ঐ সবুজ একা একটা স্কুটার।

(৪)

আজ প্রথম পিরিয়ডে আমি ক্লাসে ছাত্রদের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের ভিতরে তখনকার গার্হস্থ্য চিত্র আর সমাজজীবন বিষয়ে একটা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে জানালার কাছে এসে যখন দাঁড়ালুম তখন দেখা যাচ্ছে আকাশে নীচু একটু মেঘ। বৃষ্টি হবে কি। বৃষ্টির আগে ভেজা মাটির যে গন্ধ পাওয়া যায় আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম। বৃষ্টি এল না। শেষ ক্লাস ছিল সেভেন-এ। ওরা গেল ক্লাশ লীগে ক্রিকেট খেলতে। টিফিনে তাই ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসছি, গিরিজা হালদার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সই করুন।' চটপট সই করে দিলুম। হালদার গজগজ করতে করতে কমন-রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কিসে সই করলেন, একবার পড়েও দেখলেন না।' চেঁচিয়ে বললুম, 'যে কেনো আন্দোলনই করুন—আমি সঙ্গে আছি। বিপ্লব দীর্ঘ-জীবী হোক।' বেরিয়ে এসে খুশী মনে দেখলুম ঝকঝক্ করছে দিন।

পাবলিক ইউরিন্যালের নোংরা দেয়ালে পেন্সিলে লেখা অনেক অশ্লীল কথার মধ্যে কে লিখে গেছে—গোপাল আর নাই। 'গোপাল' থেকে পেন্সিলের [illegible] রেখা 'নাই'-তে এসে গভীর। যেন [illegible] হতাশা থেকে ক্রমে ক্রোধ! লেখা নেই [illegible] মনে হয় হতাশার 'হায় গোপাল' থে[illegible]রু, শেষে এসে রাগ—'নাই কেন?' [illegible] যা আছে—গোপাল আর নাই। আমি পড়লুম—'হায়! গোপাল!' পড়লুম, 'গোপাল আর নাই কেন?'

বেরিয়ে আসছি, দেখি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রামের স্টপে ভীড়ের মধ্যে একটা চেনা মুখ! সুধাকর না! কলেজ টীমের দুর্দান্ত লেফট আউট ছিল। দেখি গায়ে চর্বি জমেছে, থল্ থল্ করছে ভুঁড়ি, কাঁধে ঝুলছে শান্তিনিকেতনের ঝোলা ব্যাগ। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

ফার্স্ট ডিভিসনেও কিছুদিন খেলেছিল সুধাকর। তখন ওর দৌলতে ডে-স্লিপে কত খেলা দেখেছি। মনে পড়ে, লাইট হাউসে দুজনে দশ আনার লাইন দিতে গেছি, দুটো অচেনা ছেলে লাইন থেকে ডেকে বলল, 'আপনি এস সেন না?' সুধাকর মাথা নাড়ল—হ্যাঁ। 'আসুন না, এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।' লাইনে দাঁড়িয়ে সুধাকর চাপা গলায় বলেছিল, 'কি রে শালা, দেখলি!'

চার বছর আগে শেষ দেখা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিট্যালের সামনে। তখন ওর মায়ের ক্যান্সার। ইউটেরাসে। দুজনে চৌরঙ্গী পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলুম। বললে, 'খেলা ছাড়ার পরই একটা মজার চাকরী পেয়ে গেছি ভাই। কনস্ট্রাকশনে। কাজকর্ম কিছু বুঝি না, কিন্তু এধার-ওধার থেকে কেমন করে যেন পয়সা এসে যায়।' পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি ইমমর‍্যাল নই, খেলার মাঠেও মার না খেলে কখনো মারিনি।' তখন শীত শেষ হয়ে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে, তবু সুধাকরের

গায়ে ছিল একটা পুরোনো ব্লেজার—বুকের কাছে মনোগ্রাম করা, যেন চোখ পাকিয়ে বলছিল—আমি খেলোয়াড় সুধাকর।

আমি ওকে ডাকলুম না। দূরে থেকে দেখলুম ধুতি-পাঞ্জাবি-চপ্পল পরা মোটা থলথলে সুধাকর যেন সবাইকে দেখিয়ে চলন্ত ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে চটপটে পায়ে পা-দানিতে উঠে গেল।

সন্ধেবেলায় কফি হাউসে অনেকের সঙ্গে দেখা। অমর ফিরেছে বিলেত থেকে অনেক দিন পর। আড্ডা তাই জমজমাট ছিল। অমররা সিং। পাঞ্জাবী শিখ। বাঙালী হয়ে গেছে। আগে দাড়ি গোঁফ পাগড়ী ছিল না। আজ দেখি জালে ঢাকা দাড়ি, মাথায় জরির চুমকি দেওয়া পাগড়ী। বললুম, 'আগে না তুই ছিলি মেকানাইজড শিখ! তবে আবার কেন দাড়ি গোঁফ পাগড়ী, হাতে কেন তোর বালা?'

হাতজোড় করে বলল, 'রিলিজিন নয় ভাই, এ আমার পলিটিক্স। বিলেতে গিয়ে দেখি ইন্ডিয়ানদের পাত্তা দেয় না। আমার গায়ের রঙ ফরসা, অনেকেই সাহেব বলে ভুল করে, খাতির যত্ন পাই। কেমন লেগে গেল সেন্টিমেন্টে। তাই দাড়ি গজিয়ে পাগড়ী বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—ইন্ডিয়ানদের যা পাওনা তাই দাও আমাকে। খাতির চাই না।'

রাত আটটার সময় ওরা উঠে গেল মদের দোকানে। সেলিব্রেট করবে। আমি গেলুম না। যাওয়ার সময় তুলসী আড়ালে ডেকে বলে গেল, 'অনিমেষকে একবার দেখতে যাস। ওর অসুখ।'

'কি অসুখ।'

মুখ টিপে হেসে বলল, 'বলছিল, অসুখের নাম মীরা। দেখিস গিয়ে।'

(৫)

রাত সাড়ে ন'টায় আমি লণ্ডনের এক অচেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। চারদিক হিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে। একটা দোতলা বাস হল্টে থেমে আছে, বাস-এর পিছনে বিজ্ঞাপন—'সিনজানো'। চোখে পড়ে অদ্ভুত পুরোনো ধরনের পথিক লাইটপোস্ট, ভিক্টরীর দালানের ভারী স্থাপত্য, পিছনে দূরে বহুতল স্কাইস্ক্র্যাপারের জানালায় আলোর আভাস। ওভারকোটের পকেটে আমার দুই হাত। আমি হেঁটে যাবো। সামনের যে-কোনো পাব-এ রহস্যময়ভাবে ঢুকে আমি খেয়ে নেবো এক গ্লাস বীয়ার, অল্প গুন-

গুন করে গাইবো ঐ অচেনা শব্দটি যা কিনা একোনো মদের নাম—সি-ই-ন্-জা-আ-ন্-ও-ও'র। ঘরে ফেরার আগে আমি কোনো হোটেলের বলরুমে ঢুকে নেচে নেবো দু চক্কর নাচ, 'হেঃ এ, ট্যুইস্ট, ট্যুইস্ট, ট্যুইস্ট।'

আমি দূর বিদেশে পেঁাছে গেছি আজ। ঘন কুয়াশার পর্দা সরালেই দেখা যাবে আমার চারধারে জীবন্ত এই ছবি।

চেনা রাস্তাঘাট আজ আর চেনা যাচ্ছিল না। বিবর্ণ দেয়াল, ছেঁড়া পোস্টার, কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষ—এই সবই ঢাকা পড়েছিল। কলকাতায় বড় সুন্দর ছিল আজকের কুয়াশা। হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ধরিয়ে নিলুম একটা সিগারেট। ট্র্যাফিকের সবচেয়ে সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি ঝলসে উঠলে স্টেটবাসের গীয়ার বদলানোর শব্দ হয়েছিল। জ্বলে উঠল সবুজ। 'আস্তে ভাই ট্যাক্সিওয়ালা' বলতে বলতে আমি ডান হাত ট্র্যাফিক পুলিসের ভঙ্গীতে তুলে ধরে দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

আমার যাওয়ার কথা বকুলবাগান, সেদিকে না গিয়ে আমি মোড় নিলুম ডাইনে, এসে দাঁড়ালুম আদিগংগার পোলের ওপর। আমার পায়ের তলা দিয়ে অন্ধকার রেল গাড়ির মতো বয়ে চলেছে জল। না, গংগা কোথায়! এ তো রাইন! অদূরে ট্রাফলগার স্কোয়ার থেকে ভেসে আসছে রাতের ঘুম-ভাঙা কবুতরের পাখার শব্দ, আমার পিছনে অস্পষ্ট ইফেল টাওয়ার, সামনে বহু দূরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে শম্ভুগঞ্জের দিকে ভেসে চলেছে গুদারা নৌকা। কুয়াশার আবডাল সরে গেলেই সব দেখা যাবে। কিংবা বলা যায়, কুয়াশার আবডালেই বহু দূরের সব কিছু পুরোনো এই কলকাতার হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি এসে গেছে। কাছে আসবার এই তো সুসময়—বর্ষায়, বা ঝড়ে, বা কুয়াশায়! ভালবাসায় একাকার হয়ে যায় পৃথিবী, সমুদ্র তার তট অতিক্রম করে উত্তাল হয়ে আসে স্থলভূমির দিকে, আমাদের চেনা শহরে ফুটে ওঠে অচেনা বিদেশের ছবি।

আজ রাতে তুমি একবারও খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে কি? যদি দাঁড়াও, তবে—আমার মনে হয় তুমি টের পাবে তোমাদের বাড়ির চূড়ার শ্বেত-পাথরের পরীটা কুয়াশার আড়ালে তার মার্বেলের ভিত ছেড়ে উড়ে গেছে মোড়ের ওই লাল রঙের বেঁটে ডাকবাক্সটার কাছে। বহুকালের পুরোনো [illegible] প্রেম—কেউ কথনো টেরও পায়নি। [illegible] পায়ের কোনো শব্দ না করে যদি তুমি ছাদে উঠে যেতে পারো তবে দেখবে—পরীটা সত্যিই নেই।

নাকি রাতের ডাকে চিঠিপত্র চলে গেছে বলে হাল্কা সেই ডাকবাক্সটাই বেলুনের মতো উড়ে এসেছে তোমাদের ছাদে! পরীটার কাছে! এখন তাই ডাকবাক্সটা খুঁজে না পেয়ে পৃথিবীর ভুলো মানুষেরা ভাবছে—কোথায় গেল আমাদের এতকালের চেনা সেই ডাকবাক্স! নাকি আমাদরই রাস্তা ভুল!

(৬)

অনিমেষ একা থাকে। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম।

শুয়ে আছে। দেখলুম নাকটা অল্প ফুলে লাল হয়ে আছে। মুখের এখানে-ওখানে ফাটা-ছেঁড়া, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত টানা লম্বা একটা কালশিটের দাগ।

আমাকে দেখে কনুইয়ে ভর রেখে উঠবার চেষ্টায় মুখ ভয়ংকর বিকৃত করে বলল, 'চারটে লোক! বুঝলি, চারটে লোক ফিলজফি পাল্টে দিয়ে গেল।'

'কি হয়েছে তোর?'

'কি জানি! একা পড়ে আছি, সিগারেট এনে দেওয়ারও লোক নেই। আর শালা দুপুরটা যে কি লম্বা মনে হয়!'

'চারটে লোক কারা?'

পাশ ফিরে বলল, 'চিনি না! নাইট শো দেখে ট্যাক্সিতে ফিরছি, তখন রাত বারোটা। আমার ঘরের সামনে ঐ যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঠের মতো, বড় রাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে যেই মাঠে পা দিয়েছি, টের পেলুম ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আবছা চারটে লোক। তক্ষুনি কেন যেন মনে হল—বিপদ। ফিরে দেখলুম ট্যাক্সিটা ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম, ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার ডাকি। ততক্ষণে চারটে লোক চটপটে পায়ে এসে আমার চার-ধারে দাঁড়াল। মুখোমুখি যে, তার হাতে একটা সাইকেলের চেন। জিজ্ঞেস করল—তুমি শালা অনিমেষ চৌধুরী? মীরার সংগে তোমারই ভাব? বোঁ করে চেনটা এসে মুখে লাগল। পড়ে যাচ্ছিলুম, ধরে বলল,

ঘরে চল। ঘরে নিয়ে এল। আমি তালা খুললে চারজনই ঢুকল ঘরে। বলল, তোমাকে কাট মারতে হবে। আমি অল্প টলছিলুম, মাথায় ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগছিল, তবু ওদের কথা বুঝলুম। বললুম, কেন? বলল, মীরার সঙ্গে বিয়ে হবে হরির। ছেলেবেলা থেকে ওদের ভাব, মাঝখানে তুমি কে? হরিকে আমি চিনি, মীরাদের বাসায় কাজেকর্মে আসে, ছুতোরের কাজ করে, জগুবাজারে দোকান আছে। আমি মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, মীরা শিক্ষিতা মেয়ে, হরিকে বিয়ে করবে কেন? আমার বুকে আঙুল ঠুকে বলল, কেন, শালা শিক্ষিতা মেয়ের শরীরে ফুল ফোটে না? পাতা গজায় না? হাসল, বিয়ে করতে না চায়, আমরা জোর করে দেব। সমাজের ব্যবস্থা আমরা পাল্টে দিচ্ছি শীগগীরই। তোমাকে চিঠি লিখতে হবে। লেখো। ওরা বলে গেল, আমি লিখলুম—প্রিয় মীরা, তোমার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। কাল থেকে তোমার সঙ্গে কাট। দেখা হলে আমাকে না চিনবার চেষ্টা ক'রো। আমি তোমাকে আর ভালবাসি না। ইতি অনুতপ্ত অনিমেষ। লেখা হলে ওরা একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দাও। দিলুম। তারপর ওরা আমাকে মারল, মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল মেঝেয়। বলে গেল, যদি কথার নড়চড় হয় তবে আবার দেখা হবে, না হলে গুডবাই।'

অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে চকমকে চোখে হাসল, 'মীরা এসেছিল দু দিন পর। দরজা খুললুম না। বাইরে থেকেই বলল, 'অফিসে তোমাকে ফোন করে পাই নি। তুমি এত খারাপ বাংলা লেখো, জানতুম না। এ চিঠি তুমি লিখেছো? শান্তভাবে বললুম, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করল, কেন? বললুম—'

'কি বললি!'

ধপ করে বালিশে মাথা ফেলে অনিমেষ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে হাত নাড়ল, 'দূর শালা! সে অনেক কথা। ছেড়ে দে। তোর কাছে যে ক'টা সিগারেট আছে দিয়ে যা।'

আমার সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বালিশের পাশে রাখল, 'মীরার কথা এখন আর ভাবছিই না। ভাবছি ঐ চারটে লোকের কথা। কী আত্মবিশ্বাস! আমাকে দিয়ে ঐ চিঠি লিখিয়ে নিল, আমার ঘরে ঢুকে মেরে গেল আমাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমার জোর কতখানি। আমি শালা হারামীর বাচ্চা এতদিন ভদ্রলোক...'

রাতে বেড়াল খুঁজতে গিয়ে মা পড়ে গিয়েছিল উনুনের ধারে। হাঁটুতে চোট। একটা আঙুলে সামান্য পুড়েছে। ডাক্তার বলে পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'কেন মা, এত কাজকর্ম করতে যাও?'

মা মিনমিন করে বলল, 'বউ আন।'

স্বপ্ন দেখলুম।

আমার চোখের সামনে দেয়ালের পর দেয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেয়ালের গায়ে কে যেন অবিশ্রাম চক্ দিয়ে লিখে যাচ্ছে—গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। কোথাও লেখা—'হায় গোপাল!' কোথাও বা—'গোপাল আর নাই কেন?' আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিয়ের 'স্বাগতম' লিখবার লাল শালুতে উড়ছে করপোরেশনের বিজ্ঞাপন, বসন্ত—টীকা নিন। বিষাদ—টীকা নিন। ভয়—টীকা নিন।

(৭)

দেখলুম, স্টিয়ারিং হুইলে বন্ধ তোমার দুই অসহায় হাত, অহঙ্কারে একটু উঁচু তোমার মাথা। কপালের ওপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা ঘুরলি। দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছো। তোমার কপালে ঘাম। তোমার মুখ লাল। পাশে খাকী শার্ট পরা নিকেলের চশমা চোখে বুড়ো সেই ড্রাইভার। একটু ডানদিকে হেলে সে তার একখানি সাবধানী হাত বাড়িয়ে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তোমার হাতের দিকে।

বড় ভালবাসায় তোমাকে আগলে নিয়ে গেল তোমাদের পুরোনো মভ্ রঙের গাড়ি। মোড়ের বেঁটে মোটা লাল ডাকবাক্সটা তার কালো টুপি পরা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাপি মোটোরিং মাদ্‌মোয়াজেল, হ্যাপি মোটোরিং!' বাড়ির চূড়া থেকে শ্বেতপাথরের পরীটা পূব থেকে পশ্চিমে মাথা ঘুরিয়ে বহু দূর পর্যন্ত একবার দেখে নিল—কোনো বিপদ আছে কিনা। যত দূরেই যাও, সে তোমাকে ঠিক চোখে চোখে রাখে।

যদিও একটু টাল খাচ্ছিল তোমার গাড়ী, তবু বলি, তুমি অনেকটা শিখে গেছ। আর ক'দিন পরেই তুমি তোমার গাড়ী একা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

চোখ বুজে দেখলুম, দূরে রাসবিহারীর জংসনে ট্রাফিকের লাল আলোয় থেমে আছো তুমি।

থেমেছিলে? নাকি অপেক্ষা করেছিলে?

দেখো একদিন আমি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দু' হাত দু' দিকে ছড়িয়ে দাঁড়াবো তোমাদের ঐ মভ্ রঙের মোটর গাড়ীটার মুখোমুখি। চেঁচিয়ে হয়ত বলব, 'বাঁচাও', কিংবা হয়ত বলব, 'মারো আমাকে।' কুয়াশায় বা ঝড়ে বা ধূলিপাতে কোনো দিন

(৮)

ফেব্রুয়ারী। কলকাতায় এবারের শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম। রাস্তায় খুব ধুলো উড়ছে। চারদিকেই রাগী ও বিরক্ত মানুষের মুখ।

বিদায়ী শীতের সম্মানে একদিন স্কুল কামাই করা গেল। 'ম্যাটিনিতে' বেলেল্লা একটা হিন্দী ছবি দেখলুম আমি আর তুলসী। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি। লবীতে দাঁড়িয়ে তুলসী হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছিল। বললুম, 'তোর জমবে না কিছুই। তোর হাতে জল দাঁড়ায় না।' অসময়ে বৃষ্টি, তবু রাস্তায় জল জমে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ। হাতে স্যাণ্ডেল, কাপড় গুটিয়ে দুজনে ছপ করে জলে নামলুম। হঠাৎ অকারণে খুশী গলায় তুলসী বলল, 'পৃথিবী জায়গাটা মন্দ নয়, কি বলিস।'

পাড়ার চেনা ডাক্তার ধরে একদিন টি এ বি সি দিয়ে দিল। দু' দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। মা কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেল বারবার। এমন ভাব—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস, হতভাগা ছেলে, এবার পেয়েছি তোকে। তৃতীয় দিনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলুম। সকালেই দেখি, মা বাক্স খুলে কবেকার পুরোনো লালপেড়ে গরদের শাড়িটা বের করে পরেছে। 'কি ব্যাপার?' মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হাসল, 'কাল রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।' মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর জ্বরটাও সারল। কালীঘাটে একটু পুজো দিয়ে আসি।'

আমি আর গিরিজা হালদার স্কুল থেকে একসংগে বেরোলুম একদিন। হালদার গলা নামিয়ে বলল, 'আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি আছে মশাই। আপনাকে বলব একদিন।' পরমুহূর্তেই রুমাল বের করে বলল, 'গরম পড়ে গেল।' রেস্টুরেন্টে বসলুম দুজনে, গিরিজা হালদার কাটলেট খেল না, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো টোস্ট। আমার মশাই নিরামিষ। দেখেন না হিন্দুর বিধবারা কতদিন বাঁচে।' হালদার প্রাণায়াম-টানায়াম করে। দম বন্ধ করে এক গ্লাস জল খেয়ে মুখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছেন কলকাতায় অনেক দিন কিছুই ঘটছে না! না লাঠি চার্জ, না গোলা-গুলি, না কারফিউ। তেমন বড় বড় একটা মিছিলও দেখছি না বহুকাল। লোকগুলো মরে গেছে, কি বলেন!' অন্যমনস্কভাবে বললুম, 'হুঁ।' হালদার টেবিলে আঙুলে বাজিয়ে গুন গুন করল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে...'

দূর গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপরে উড়োজাহাজের বিষম শব্দ। অন্যমনে সাড়া দিই—'যাই।'

রাতে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম, 'মা, ও মা, তুমি আমায় ডাকলে।' মা জেগে উঠে অবাক গলায় বলল, 'না তো' বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে বলল, 'ঘুমো।' চৌকির শব্দ করে পাশ ফিরল মা, বলল, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না রে?' আমি নিঃশব্দে হাসলুম, 'না তো!'

তারপর অনেকক্ষণ জেগে থাকি। মারও ঘুম আসে না বলে, সারা দিন কী যে করিস! ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনদের একটু খোঁজখবরও তো নিতে হয়! আমি মরলে আর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে কে না কে!' মার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, বুঝতেও পারি না, কে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে। একটু খোঁজ নিস।' জবাব দিই, 'কে কোথায় থাকে মা!' মা আস্তে আস্তে বলে যায়, 'কেন, মাঝেরহাটে তোর রাঙা কাকীমা, কাঁচড়াপাড়ায় সোনা ভাই...', শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মনে পড়ে, ছুটির এক দুপুরে বসে ছিলুম ছোট একটা চায়ের দোকানে। চারটে টেবিল, প্রতি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার, আর সবুজ পর্দাওলা দুটো কেবিন খালি পড়ে আছে। মাছি ওড়ার শব্দ শোনা যায়। দেয়ালে ভয়ংকর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার। দুপুরের ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে অনেকক্ষণ একা বসেছিলুম। এ সময়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন সাদা চাদর গায়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক। চোখে চোখে পড়তেই আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। বড় দয়ালু ও'র চোখ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম উনি মনে মনে বললেন, 'এই যে, কি খবর?' তটস্থ আমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে উত্তর দিলুম 'এই যে, সব ভাল তো?' পরমুহূর্তেই উনি চোখ সরিয়ে নিলেন, গিয়ে বসলেন কোণের একটা চেয়ারে, পত্রিকা খুলে মুখ আড়াল করে নিলেন। আমি টেবিলের কাছে আমার অন্ধকার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। সেই ভাবটুকু তারপর কেটে গিয়েছিল, যখন সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে তুলতে এসে চা দিয়ে গেল।

একদিন স্কুলে এল টেলিফোন। 'শীগগীর বাড়িতে আসুন।' শরীর হিম হয়ে এল। রিসিভার নামিয়ে রাখলুম আস্তে আস্তে। দীর্ঘদিন ধরে যেন এ রকম একটি আহ্বানেরই ভয় ছিল আমার। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে 'মা' এই শব্দ বেজে উঠেছিল। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি এসে দেখলুম ঘরে চার-পাঁচজন পাড়া-পড়শী, বালিশে মার নিরক্ত মুখ, আধখোলা চোখ, ভয়ংকর লাল ঠোঁট ফ্যাকাশে। ডাক্তার ব্লাডপ্রেসারের পারদের দিকে চেয়ে আছে। বলল....'তাড়াতাড়ি করুন।' বুঝতে না পেরে আমি চারদিকে চেয়ে বললুম, 'কি?' আবার কে যেন বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন।' আমি বুঝতে পারলুম না, বাচ্চা ছেলের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম,

কি?' বাড়িওয়ালার বউ আমাকে এক দিকে টেনে নিয়ে বলল, 'যা তারকেশ্বরে মানত করে আয়!'

পরদিন। আমি তারকেশ্বর থেকে ফিরছিলুম। ভিড়ের ট্রেন। আমি বসবার জায়গা পাইনি। ট্রেন থামছে। প্রতিবার আমি মফস্বলের লোকের মতো নিজেকেই জিজ্ঞেস করছি, 'এটা কি হাওড়া? এই কি হাওড়া?' অনেক ঘাড়, অনেক মাথার জঙ্গল সামনে, আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ এক ঝলক তেতো জলে ভেসে গেল মুখ, কষ বেয়ে জামা-কাপড় ভাসিয়ে দিল, 'এটা কি হাওড়া' আবার এই প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি চোখের সামনে পড়ছে কালো চাদর, ঝড়ের মতো ছুটেছে ট্রেন, অথচ যেন বাতাস লাগছে না। পড়ে যাচ্ছি, কয়েকটা হাত আমাকে ধরল। টের পেলুম, আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর সব শব্দ —যেন আমি আবার মায়ের কোলের সেই শিশু রম—এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। তবু সেই আধ-চেতনার মধ্যে আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আপনারা সবাই শুনুন। আমি রমেন। আমার মায়ের বড়ো অসুখ। দু দিন আমি তাই কিছুই খাইনি।' আমি বলতে চাইছিলুম, 'আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী।' আমার প্রাণপণে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি আজ আপনাদের ইচ্ছাশক্তিগুলি ভিক্ষা চাই। আপনাদের আশীর্বাদগুলি ভিক্ষা চাই।' ট্রেনের মেঝেয় ঘোর অন্ধকারের ভিতরে দুটো সাদা পা। যেন চেনা! মুখ দেখা যায় না, তবু বুঝলুম সেই বুড়ো ভদ্রলোক; আজও তার চোখ কথা বলছিল। 'আমি তোমার জন্যই এসেছি রমেন। তুমি ভাগ্যবান। চলে এসো।' আমি কাঁদছিলুম, 'আমার মার বড় অসুখ। আমার বাবা বিদেশে পড়ে আছে।' সহজ উত্তর দিল না তার চোখ, বলল, 'জীবন ও মৃত্যুই কিছু লোকের দেখাশোনা করে; কিছু লোককে দেখে ভাগ্য; কিছু লোককে ধর্ম এসে নিয়ে যায়।'

ভালো হয়ে গেলে মা একদিন চিন্তিত মুখে বলল, 'চোখে ভাল দেখি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস!' হাসলুম 'কই!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল 'আর কর্তার সার্টিফিকেটটা? সেটা পেলি না!'

(৯)

তখন বিকেল। পাকিস্তানী হাই-কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে যাবো, এমন সময় হঠাৎ দেখি—তুমি! শিকড়সুদ্ধ আমার ডালপালা নাড়া খেয়ে গেল।

বলতে কি, স্কুটারের পিছনের সীটে তোমাকে মানায় না। এত খোলামেলা আর এত ভীড়ের মধ্যে।

দেখলুম সবুজ রুমালে ঘিরেছো মুখ, আজ নীল শাড়ি পরেছিলে, স্কুটারের পিছনের সীটে তুমি জড়োসড়ো, টালমাটাল। চওড়া পুরুষের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হাসছিলে ভয় পাওয়া হাসি—'পড়ে গেলু—উ-[illegible]!'

তারপরই অবহেলায় আমাকে পেছনে ফেলে রেখে ছুটে গেল তোমাদের স্কুটার। যেতে যেতে আচমকা ঘুরে গেল বাঁয়ে—পড়ো পড়ো হল, পড়ে গেল না। তোমরা গেলে পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

আমি গড়িয়াহাট রোড ধরলুম। অপরাহ্নের আলোর ফুটপাথে আমার দীর্ঘ ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অচেনা মানুষ। তাদের ছায়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনেই ট্রাফিক পুলিসের উত্তোলিত হাত, আর গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে আছে। একজন হকার আমাকে উদ্দেশ করে ধীর গম্ভীর গলায় হাঁকল, 'গেঞ্জী...!' এসব কিছুই আমি তেমন খেয়াল করলুম না। আমার মন গুনগুন করছিল, কেন তুমি কোনো দিনই লক্ষ করলে না আমায়! 'হায়, আমি যে আছি তুমি তা জানোই না!'

রাত্তে ঘুম না এলে জেগে থেকে মাঝে মাঝে বড়ো সাধ হয়, তুমি এসে একদিন বলবে 'আমাকে চাও?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমি শান্ত চোখে চেয়ে বলব, 'চাই না।'

কলকাতার ডায়েরি

দুপুরে জাদুঘরের সামনে এলেই সেই পরিচিত দৃশ্য। বিরাট থামওয়ালা বাড়ির ভিতর থেকে পিল পিল করে বেরোচ্ছে দেহাতী লোকেরা, ছেলেদের মাথায় পাগড়ি, মেয়েদের মুখে ঘোমটা। রাস্তার ওপাশে ঘোড়ার গাড়ি, বিরাট বিরাট দূরপাল্লার বাস। সেই গাড়িতে উঠতে চওড়া চৌরংগী জুড়ে চলেছে ওদের মিছিল। ডবল ডেকার, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কারের তোয়াক্কা না করে হাতে হাত ধরা ছেলে-বুড়ো মেয়ের দল এলোপাতাড়ি ছুটে চলেছে এপার থেকে ওপারে। বাস বোঝাই হলে সোজা পরেশনাথের মন্দির। আর বাসের পেছন পেছন ধাওয়া করে ভিতরে-বাইরে-ছাদে লোক বোঝাই ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ির লোকদের চোখে অপার বিস্ময়। কারও কারও মুখে স্বগতোক্তি—"আ-রি বাপ আজীব শহর—"।

আজব শহরই বটে। কত লোক আসে এই কলকাতায়। চাকরির ধান্দায়, ব্যবসার পাত্তায়, লেখাপড়ার চেষ্টায়। প্রতিদিন হাজার হাজার। তা ছাড়াও আসে দু' জাতের লোক। একদল আসে দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসা করাতে, অন্য দল স্রেফ বেড়াতে।

বেড়ানোওয়ালাদের আবার দু' ভাগ। পুজো কিংবা বড়দিনের ছুটিতে যাঁরা পালা করে আসেন, তাদের নজর থাকে পার্ক স্ট্রীটের রেসতোরাঁয় আর শ্যামবাজারের থিয়েটার পাড়ায়। কিন্তু অন্য যাঁরা শহর-দেখনেওয়ালা, তাঁদের পুজো-বড়দিন নেই, সারা বছরই আসার পালা এবং এসেই সোজা ছোটেন কালীঘাটের মন্দিরে, মা কালীর কাছে পুজো দিতে। তারপর ধরা বাঁধা কয়েকটি জায়গা—জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের মন্দির হাওড়ার পুল।—ব্যস শহর দেখা শেষ।

জাদুঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের যাত্রীরা শেষের দলের। তাঁরা আসেন আরা, ছাপরা, বালিয়া, ভাগলপুর, দারভাঙ্গা থেকে। কেউ সোজা বাস রিজার্ভ করে, কেউ ট্রেনে হাওড়ায় নেমে ঘোড়ার গাড়িতে। পূর্ববঙ্গ থেকে লোক আসা কমে যাওয়ার পর থেকে ঘোড়ার গাড়ির মালিকরা বেশ দু পয়সা কামাচ্ছে এই দেহাতী লোকদের শহর কলকাতা দেখিয়ে। এরা সঙ্গে চাল-চিঁড়ে বেঁধে আনে; আনে ছাতুর গুঁড়ো, লংকার টুকরো। তাই দিয়েই লাঞ্চ-ডিনার সারে, সারা দিন চক্কর মেরে শহর দেখা চুকোয় এবং দিনের শেষে ফের 'মুলুক' ফেরার গাড়ি ধরে।

সেদিন এদেরই একজনকে ধরেছিলাম জাদুঘরের উলটো দিকের ফুটপাতে। তাঁর নাম মহেশ্বর মাহাতো। বয়স ষাটের উপর, বাড়ি মুঙ্গের জেলায়। আশেপাশের গাঁয়ের আরও জনা চল্লিশ লোকের সঙ্গ ধরে কলকাতা দেখতে এসেছে। এই প্রথম আসা।

জিগগেস করলাম, এসে কী কী দেখা

হল? সঙ্গে সঙ্গে জবাব—"বাবুজী, কালী-মাঈকে গড় করে সিধা চিড়িয়াখানা। শের-ভালু-উল্লু-বান্দর—কত জানোয়ার। সেখান থেকে সোজা জাদুঘর। ইসকে বাদ পরেশ্‌-নাথকা মন্দির।"

জানতে চাইলাম কলকাতায় কি আর দেখার কিছু নেই। মহেশ্বরের বক্তব্য—থাকতে পারে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে ওই কটি জিনিসের কথা। ওসব না দেখলে জীবন বৃথা। মুলুকে তার জরু গরু জমি জেরাত আছে, বেটাকে ভি শাদি করিয়েছে, এখন এই বুড়া বয়সে 'ভারী শাহার' এই কলকাত্তা দেখতে না আসলে গাঁয়ে ইজ্জত বাড়বে না যে! আর ভগমানের কিরপায় ধান বেচে দু-চার পয়সা তার হাতে থাকেও। সেই টাকা দিয়েই তো সে কলকাতা দেখতে এসেছে। তার বাবাও এসেছিল।

'কিন্তু এত জায়গা থাকতে জাদুঘরে ঢুকে তোমরা কী দেখ?'—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে একগাল হেসে বলল, বাচ্চা বয়সে তার বাপের কাছে কালীঘাটের আর পরেশনাথের মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে জাদুঘরের কথাও শুনেছে। এটা না দেখলে কলকাতা দেখাই হয় না। —'আরি বাবা, কিতনা বড়া বাড়ি!' মহেশ্বর মাহাতো সামনে জাদুঘরের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলে ওঠে।

সংগী অন্য সবাই একে একে এসে গিয়েছে, চারটে ঘোড়ার গাড়িও বোঝাই, বাকি মহেশ্বর মাহাতো। কোচোয়ানের তাড়া খেয়ে আর বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প চালাবার সাহস পেল না। বাঙালীবাবু ভাইয়াদের কায়দায় আমাকে 'নোমোস্কার' জানিয়ে বিরাট সাদা গোঁফে তা দিতে দিতে গাড়ির ছাদে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। গাড়ি ছুটল পরেশনাথের মন্দিরের দিকে।

ইতিমধ্যে আর একটি দল অতি কষ্টে রাস্তা পার হয়ে বাসের খালি আসনগুলো ভরতি করে ফেলল। বাসের সামনে হিন্দীতে লেখা : রিজার্ভ, হাজারিবাগ—কলকাত্তা।

ঝলমলে দোকানপাট বিরাট-বিরাট দালানকোঠা, হাজার হাজার পথের মানুষ—কারও দিকে ওদের নজর নেই, একমাত্র লক্ষ্য পরেশনাথের মন্দির। ওইটুকু দেখা হয়ে গেলেই আবার হাওড়া স্টেশন কিংবা গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড।

ততক্ষণে মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে কালীমায়ের লম্বা জিব, জাদুঘরের কংকাল, চিড়িয়াখানার সাদা বাঘ আর পরেশনাথের মন্দিরে কাচের চিকমিক। দেশে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নাতিনাতনি, অপেক্ষা করছে গাঁয়ের লোকেরা। তেঁতুল-তলায় খাটিয়া পেতে হুঁকোয় টান দিতে দিতে সেই সব কথা যখন রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারবে মহেশ্বর মাহাতোরা তখন মনে হবে কলকাতায় যাওয়া সত্যি সত্যিই সার্থক। এবং মহেশ্বরের ছেলে কৈলাস সেদিন থেকেই টাকা জমাতে শুরু করবে, কালী-মায়ের পায়ে প্রণাম সেরে জাদুঘরে ঢোকার স্বপ্ন দেখবে।

চাণক্য

বঙ্কিম সরণী

প্রমথনাথ বিশী

॥ ২৭ ॥

"দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না"

ছো]ট ইন্দিরায় ও বড় ইন্দিরায় দুস্তর প্রভেদ; ছোট রাজসিংহে ও বড় রাজ[সি]ংহে প্রভেদ তার চেয়ে কম দুস্তর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র একসময়ে চারখানা একমেটে [প্র]তিমা তৈরি করে অটচালার এক পাশে [রে]খে দিয়েছিলেন। কৌতূহলী দর্শক [সে]গুলো দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে সত্য, [কি]ন্তু দোমেটে ও চিত্রিত হলে সেগুলো যে [ক]তখানি বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে এ কথা [স]কলের ধারণার বাইরে ছিল। ইন্দিরা ও [রা]জসিংহ দোমেটে এবং চিত্রিত হয়ে পূর্ণা[ঙ্গরূ]পে আত্মপ্রকাশ করেছে। সময় ও সুযোগ [পে]লে রাধারাণী এবং যুগলাঙ্গুরীয় বই [দু]খানাও পূর্ণাঙ্গ হতে পারতো। বৌদ্ধ [যু]গের কাহিনী যুগলাঙ্গুরীয়; এক দিকে [তা]ম্রলিপ্ত, আর এক দিকে কাশী, আবার [অ]ন্য দিকে সিংহল; সেই সঙ্গে আছে সমুদ্র[যা]ত্রার পাট; জাদুকরের কলম চালাবার [য]থেষ্ট অবকাশ ছিল; বইখানা পূর্ণাঙ্গ হয়ে [উঠ]লে বাংলা সাহিত্যের নূতন সম্পদ হতে [পা]রতো। রাধারাণীতে এরকম অবকাশ [না] বলে মনে হয়; তবে ওস্তাদ জাদুকরের [শূ]ন্য টুপির মধ্য থেকে কখন কটা [খ]রগোশ বের হবে কেউ বলতে পারে না। [ত]বে মোট কথা এই যে, ত্রয়ী রচনায় ক্লান্ত [বঙ্কি]মচন্দ্রের মন অনেক কাল আগে রচিত [শি]শু উপন্যাস চতুষ্টয়ের দিকে আকৃষ্ট [হ]য়েছে। দুটি বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে, [অ]ন্য দুটিও হলে হতে পারতো।

স্ত্রীলোকের বুদ্ধিকে বঙ্কিমচন্দ্র নার[কে]লের মালা বলেছেন, আধখানা বই নয়। [ছো]ট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহও আধখানা [ব]ই নয়। ছোট ইন্দিরায় গল্পটা আছে, মন [মা]জানো নেই, হাসিও নেই। ছোট রাজসিংহ [আ]ধখানারও কম। ওতে কেবল রূপনগরের [কা]হিনীটাই আছে; কাহিনীর দিল্লীর অংশ [এ]কেবারেই অনুপস্থিত। আওরঙজেব, [জে]বউন্নিসা, যোধপুরী বেগম, দরিয়া বিবি [ন]েই। মোবারক খসড়ায় আছে; নির্মল[কু]মারী আছে তবে তার ইমলি বেগম রূপ [অ]প্রকট; আধখানারও কম, একমেটের চেয়ে [অ]ল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইন্দিরা ও [র]াজসিংহের পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পূর্ণ নূতন [গ্র]ন্থ। অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না, [তাঁ]রা সীতারামকে শেষ উপন্যাস মনে করেন এবং উপন্যাসগুলিকে কালানুক্রমিক সাজাবার সময়ে বড় ইন্দিরা ও বড় রাজসিংহকে ছোটর তারিখে বিন্যস্ত করেন। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত স্বীকার করে নেওয়াই যুক্তিসংগত। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা। অনেকের মতে, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের একজন, কৃষ্ণকান্তের উইল লিখবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিতে ভাটার টান দেখা দিয়েছিল। এ একেবারেই বস্তুসিদ্ধ নয়। পরিকল্পনার অভিনবত্বে আনন্দমঠ, কাহিনীর আকর্ষণে দেবী-চৌধুরানী অসামান্য। আর যে মাপকাঠিতেই পরিমাপ করা হোক না কেন, সীতারাম ও রাজসিংহ অসামান্য। এই সঙ্গে ধরতে হবে কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন। তা হলে দেখা যাবে যে, কৃষ্ণকান্তের উইল রচনার অনেক পরেও তাঁর চিন্তাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি এতটুকু কমে নি, বরঞ্চ গাঢ়তর হয়েছিল। বস্তুত তাঁর শেষ রচনা রাজসিংহ, তাঁর বিচিত্র সৃষ্টি-প্রতিভার শীর্ষে চিরভাস্বর স্বর্ণকিরীট। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিম্লান রশ্মি বাষ্পলেখা-হীন, বনরেখাহীন দিগন্তে অস্তগত হয়েছে, শেষ নজরেও তার দীপ্তি সমান উজ্জ্বল ছিল।

রাজসিংহের নূতন আলোচনা লেখার পথে একটি দুর্লঘ্য অন্তরায় আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিত আলোচনাটি সেই অন্তরায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে, আজ থেকে তিয়াত্তর বৎসর আগে এই আলোচনা লিখিত। তারপর থেকে উত্তরোত্তর অধিকতর মাত্রায় পাঠকের মনে রাজসিংহ সম্বন্ধে ধারণা রবীন্দ্রনাথের অভিমতের দ্বারা রঞ্জিত। বস্তুত, রাজসিংহের ভালমন্দের উপরে এখন আষ্টেপৃষ্ঠে রাজহস্তের পাঞ্জার ছাপ। এমন অবস্থায় আলোচনা করতে গেলে হয় সরাসরি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করতে হবে, নয় অদ্ভুত ও অবাস্তব কিছু বলে হাস্যকর হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। উভয় সংকট!

আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক নূতন কথা বলেছেন, তার মধ্যে কয়েকটিতে আমাদের বিশেষ দরকার। রবীন্দ্রনাথের মতে, রাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিক-

অংশের নায়ক রাজসিংহ, আওরঙজেব ও বিধাতাপুরুষ আর উপন্যাস অংশের নায়িকা জেবউন্নিসা। "উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানি না।" রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন যে, রাজসিংহ উপন্যাসের গতি অতিশয় দ্রুত; এত দ্রুত যে, অনেক আবশ্যক ভার কমিয়ে দিতে হয়েছে, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু বর্ণিত হয়েছে। তাঁর তৃতীয় বক্তব্য, ঐতিহাসিক উপন্যাসে, যেখানে ইতিহাসের সত্য ও মানবহৃদয়ের সত্যকে এক রজ্জুতে বন্ধ করে রথ চালাতে হয় সেখানে এ ছাড়া উপায় নাই। তাঁর চতুর্থ বক্তব্য, রাজসিংহ উপন্যাসের গতি ও পরিণামের মধ্যে তিনি বিধাতাপুরুষের হস্তক্ষেপ লক্ষ করেছেন। হয়তো তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তব্যকে স্বতন্ত্র বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়টির মধ্যে তৃতীয়টি প্রচ্ছন্নভাবে আছে আর প্রথমটির মধ্যে চতুর্থটি। ঐতিহাসিক অংশের অন্যতম নায়ক "বিধাতাপুরুষ"। আগেই বলেছি যে, আজকার দিনে রাজসিংহের নূতন আলোচনা করতে গেলে অদ্ভুত ও অবান্তর কিছু বলে হাস্যকর হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। সেই ঝুঁকি স্বীকার করেই অগ্রসর হব।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত রাজসিংহের আলোচনাটি না কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ কেবল চিন্তিত, সুলিখিত সাহিত্য সমালোচনা য়, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রথের অনেক ধারণার বাহনও বটে। আবার দুটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের রণায় যে স্বাভাবিক পার্থক্য আছে তারও রিচয় পাওয়া যায় ঐ রচনাটিতে। যথাযথভাবে বুঝতে পারলে রবীন্দ্রনাথ ও ঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝতে সাহায্য করবে রচনাটি, ল ও অমিল দু-ই দেখিয়ে দিয়ে। এখানে টো আবশ্যক যথাসাধ্য সে চেষ্টা করবো।

"রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার য়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক রংজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ, পন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানি , নায়িকা জেবউন্নিসা।"

প্রথমে উপন্যাস অংশকেই ধরা যাক। জেবউন্নিসা কি সত্যই নায়িকা? কেন? প্রেম ও মৃত্যুর আঘাতে বিলাসের জড়ত্ব থকে অপ্রত্যাশিতভাবে জাগ্রত হয়ে উঠে নিঃসন্দেহ একটি নায়কোচিত মহিমা লাভ রেছে জেবউন্নিসা, কিন্তু তাতেই কি তার নায়িকা পদপ্রাপ্তির অধিকার লাভ হয়েছে? একে বাদ দিলেও কাহিনী একরকম দাঁড়ায়; কাহিনীর ঐশ্বর্য অনেকটা লোপ পায় সত্য, তবে কাহিনীটা লোপ পায় না। ছোট রাজসিংহ এইরকম একটা কাহিনী; তাতে জেবউন্নিসা নাই, জেবউন্নিসা-মাবারকের প্রেমকাহিনী নাই, তবু খর্বিত-মহিমা হয়েও কাহিনী টিকে আছে। পূর্ণিমার রাতে জ্বলন্ত উল্কার প্রচণ্ড আলোয় ক্ষণকালের জন্য পূর্ণচন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে তাই বলে তাকে রাত্রির নায়িকা বলা চলে না। রাত্রির নায়িকা পূর্ণশশী।

উপন্যাস অংশের নায়িকা নিঃসন্দেহ চঞ্চলকুমারী। জেবউন্নিসার বেদনা যতই তীব্র হোক তবু সে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার; মোগল অন্তঃপুরের সংকীর্ণ পল্বলে দু'-একটি তরঙ্গ তুলে শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্য পক্ষে, চঞ্চলকুমারীর সমস্যাময় বেদনা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। রূপনগরের অন্তঃপুরে চিত্রদলনের ক্ষুদ্র পদাঘাত ক্রমবর্ধিত তরঙ্গবলয়ে বিস্তার লাভ করতে করতে ভারতেতিহাসের চার দিগন্তকে স্পর্শ করেছে। রাজসিংহ রূপে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎস সেই কোমল চরণের আঘাত যার মধ্যে নিহিত ছিল বিরাট সংকটময় সংঘর্ষ। চঞ্চলকুমারীকে বাদ দিলে উপন্যাস টেকে না। সে জয়ী পক্ষে বলে তার বেদনাকে লঘু করে দেখলে উপন্যাস অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক অংশের তিনজন নায়ক ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ ও বিধাতাপুরুষ। ঔরঙ্গজেব ঐতিহাসিক অংশের নায়ক নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে কি ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও? ছোট রাজসিংহে ঔরঙ্গজেব নাই, তবু কাহিনীটা আছে। তর্ক উঠতে পারে, বড় রাজসিংহের বেলায় ঔরঙ্গজেবকে অন্যতম নায়ক বলে ধরতে হবে। অন্যতম নায়ক না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিশ্চয়। নায়ক বলবো কাকে? যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া কাহিনী অচল হয়ে পড়ে, অবশ্যই সে নায়ক। জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু হয়েছে তৃতীয় অঙ্কে তবু তার অদৃশ্য প্রভাব পরবর্তী অঙ্ক দুটোকে চলমান করে রেখেছে। একমাত্র রাজসিংহ সম্বন্ধে সেই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, প্রত্যক্ষেই বেশী, কাহিনীর মেরুদণ্ডের কাজ করেছে এই যুগপুরুষ। এ তো গেল ঐতিহাসিক অংশের বিবরণ। উপন্যাস অংশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানেন না। এখানে একটি গুরুতর সমস্যার ইঙ্গিত আছে। তবে কি গ্রন্থের ঐতিহাসিক ও উপন্যাস অংশ আলাদা? তা যদি হয়ে থাকে তবে রাজসিংহ উপন্যাসকে নিতান্তই ব্যর্থ রচনা বলতে হয়। এ কথা অবশ্য কেউ বলবে না। যদি ইতিহাসে ও উপন্যাসে মিলে গিয়ে একটি অখণ্ড রচনা হয়ে থাকে গ্রন্থখানা, তবে ইতিহাস ও উপন্যাসের আলাদা নায়ক-নায়িকা কল্পনা করবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রাজসিংহ নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারী। বাকি থাকলো বিধাতাপুরুষ। তাঁর অবস্থা কী দাঁড়ায়?

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসের ধারণার মধ্যে বিধাতাপুরুষের স্থান নাই। ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও অনৈসর্গিকের ছায়াপাত
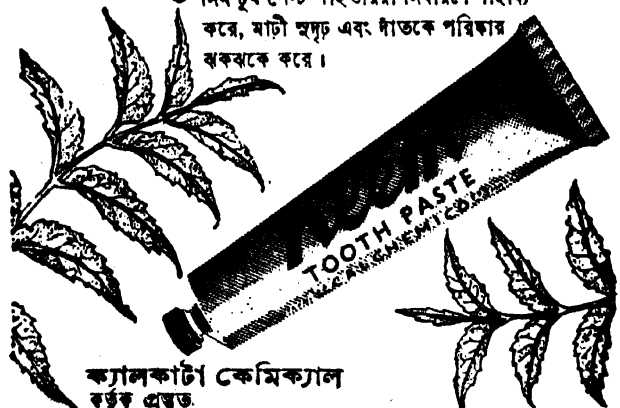
দেখেন নি বা কল্পনা করেন নি; নৈসর্গিক কার্যকারণের দ্বারাই সমস্ত ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র ভগবানের অভিপ্রায় ও হস্তক্ষেপ লক্ষ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস বিধাতা-পুরুষের অভিপ্রায় বা হস্তক্ষেপ বর্জিত। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম সংগীতে আপাত-দৃষ্টে দুর্গা থাকলেও তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তি নন, তিনি দেশের রূপকমাত্র, "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী"। রবীন্দ্রনাথের জনগণমন সংগীত ভারত ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়ে আন্দোলিত, নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত। বঙ্কিমচন্দ্র র‍্যাশনাল, রবীন্দ্রনাথ সুপার র‍্যাশনাল; দুজনে বিস্তর প্রভেদ। তাই রবীন্দ্রনাথের চোখে বিধাতাপুরুষের লীলা পড়লেও লেখকের অনভিপ্রেত বিধাতাপুরুষকে এ ক্ষেত্রে বাদ দেওয়াই যুক্তিসংগত। তা হলে নির্গলিত হয়ে দাঁড়ালো এই যে, রাজসিংহ গ্রন্থের ঐতিহাসিক ও উপন্যাস অংশ আলাদাভাবে বিবেচনা করা অনাবশ্যক, দুয়ে মিলে এক; আর তার নায়ক রাজসিংহ, নায়িকা চঞ্চলকুমারী।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিজ্ঞান

মহাকালের চরিত্র কী ?

আমাদের এই দুনিয়ায় সময়ের দাম কষা হয় টাকা দিয়ে। এখানে 'সময় হচ্ছে টাকা'। কিন্তু টাকার বিনিময়ে যদি সময় কেনা যেত তাহলে কোটিপতিরা টাকা দিয়ে আয়ু কিনে হাজার হাজার বছর বাঁচতে পারতেন।

সময়ের রথচক্র হাজার মাথা খুঁড়লেও পিছন দিকে ফেরানো যায় না, যে সময় চলে গিয়েছে তা কোনদিন ফিরে আসবে না। লক্ষ্য যদি ভাল হয় তা হলে সময় তার সপক্ষে কাজ করে। আর লক্ষ্য যদি অসৎ হয়, সময় কাজ করে তার বিপক্ষে। নদীর স্রোতের গতি বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ করা যায় কিন্তু কালস্রোতের গতি অবারিত।

এই যে বললাম, সময় কারো সপক্ষে কাজ করে, কারো বা বিপক্ষে, তার মানে কি এই যে, সময়ের একটা বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে? যদি থাকে তাহলে সময়কে আমরা চোখে দেখতে পাই না কেন, কেন পারি না অনুভব করতে? যে-কোন বস্তুরই একটা চেহারা আছে, আছে নির্দিষ্ট কতকগুলি ধর্ম। জীবাণবিক ও পারমাণবিক দুনিয়াকে এমনি চোখে দেখা না গেলেও অনুবীক্ষণের চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, তার ধর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। কিন্তু সময় অনুবীক্ষণের চোখেও ধরা পড়ে না। তা হলে তার চেহারা ও চরিত্র আমরা চিনব কি করে?

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, সময়ের মত অজ্ঞেয় কিছুই নেই। আইনস্টাইন সময়ের সেই অভিজ্ঞতার রহস্যজাল ছিন্ন করে সবপ্রথম স্থান ও পাত্রের সঙ্গে সময়কে বেঁধে দেন আপেক্ষিকতার সূত্রে। স্থান ও পাত্র যখন বস্তু তখন সময় বস্তু না হলে তাকে প্রথম দুটি বস্তুর সঙ্গে বাঁধা যাবে কি করে? আইনস্টাইন বললেন, 'সময় গতিবেগের উপর নির্ভরশীল।' এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। কাল যা অজ্ঞেয় ছিল, আজ তাকে জ্ঞানের সীমানার মধ্যে নিয়ে আসছে মানুষ। যেমন বলা যায় ১০০ বছর আগে পরমাণু ছিল অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয়। আজ সেই চিরকালের পরমাণু শুধু বিভাজ্যই নয় সে আজ পরিবর্তনীয় ও রূপান্তরণীয়। তার জন্ম আছে, আছে লয়। রহস্যময় মহাজগতের কুহেলিকাজাল আজ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তেমনি মহাকালের রহস্যও কি একদিন উদ্ঘাটিত হবে না?

কবি মায়াকভস্কি সময়কে বিদ্যুৎ-পরিবাহক তারের সঙ্গে জুড়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই কল্পনায় আমরা রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম কিন্তু সেই কল্পনার যে কোন বাস্তব বুনিয়াদ থাকতে পারে সে কথা ভাবতে পারিনি। হালে কোন কোন বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের তত্ত্বের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন যে, স্থান-পাত্রের মত সময়েরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে। শুক্রে মেরুজ্যোতির এবং চাঁদে অগ্ন্যুৎপাতের আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানাচার্য কজিরেফ তাঁদেরই একজন। কিছু দিন আগে ভূগোল-শাস্ত্রীদের এক অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন :—

"দীর্ঘকাল জ্যোতিষ্ক-জগতের গঠন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমার ধারণা হয়েছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির এমন কতকগুলি প্রচ্ছন্ন

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

শক্তি আছে যেগুলির সঙ্গে এতদিন আমাদের পরিচয় ছিল না। কালের গতি থেকে সেগুলির উদ্ভব। সময়কে আমরা প্রাকৃতিক শক্তির সমতুল্য মনে করতে পারি। কালের গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জ্যোতিষ্কগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে।"

তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য

কজিরেফ বিভিন্ন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। ধরুন একটা বন্দুকের গুলি। গুলিটা একই সময়ে বন্দুকের নলে ও লক্ষ্যস্থলে থাকতে পারে না। তার অর্থ, কার্য ও ফলের মধ্যে রয়েছে সময়ের একটা ব্যবধান এবং যে বেগে কার্য ফলে রূপান্তরিত হয় সেটাই হচ্ছে কালের গতি-বেগ। কোন কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব যদি না থাকে তা হলে তার গতিবেগের প্রশ্ন ওঠে কি?

সময়ের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তার গতি সব সময় এক দিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে, কার্য বা কারণ থেকে ফলের দিকে, কোন সময়েই অতীতের দিকে বা ফল থেকে কারণের দিকে নয়। একে কালের দিক-ধর্ম বলতে পারেন, যাকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে 'ডাইরেক্টিভিটি।' ধরুন, মা যখন শিশুকে বুকে চেপে ধরেন তখন নিউটনের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে (প্রতিটি ক্রিয়ার এক সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে) মায়ের হাত যত জোরে শিশুকে চেপে রাখে শিশুর দেহও ঠিক ততজোরে মায়ের হাতে ঠেলা দিচ্ছে। তার মানে কারণ ও ফল সমতুল্য। আচার্য কজিরেফের মতে এই নিয়ম সর্ব-ক্ষেত্রে ষোল আনা খাটে না। তাঁর মতে আসল চেহারার সঙ্গে আয়নার প্রতিবিম্বের যেমন সামান্য কিছু পার্থক্য থাকে, কারণ ও ফলের মধ্যে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেই রকম পার্থক্য থাকতে পারে। তিনি কার্য বা কারণকে বলছেন সক্রিয় শক্তি এবং ফলকে (প্রতিক্রিয়া) বলছেন নিষ্ক্রিয় শক্তি। কর্মের সঙ্গে কর্মফলের পার্থক্য আছে বলেই অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের পার্থক্য, যার স্রষ্টা হচ্ছে কালের গতি।

ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিনির্দেশক যন্ত্রের নাম জাইরোস্কোপ। যন্ত্রটি যখন ঘোরে তখন তার এক প্রান্ত বসে চ্যাপটা হতে থাকে, অন্য প্রান্তটি ঠেলে উঁচু হয়ে ওঠে। সদাবর্তনশীল গ্রহ-উপগ্রহগুলিও তো ঘুরে চলেছে একইভাবে। সেগুলিতে কি জাইরোস্কোপের মত ব্যাপার ঘটছে? আচার্য কজিরেফ লেনিনগ্রাদের মানমন্দিরের দূরবীণ দিয়ে বৃহস্পতি ও শনির যেসব আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছেন সেগুলিতে নাকি দেখা গিয়েছে যে, গ্রহ দুটির উত্তর গোলার্ধ একটু বসা এবং দক্ষিণ গোলার্ধ একটু উঁচু (হৃৎপিণ্ডের মত দেখতে) পৃথিবীর চেহারাও ঐ ধরনের অর্থাৎ ষোল আনা গোল নয়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ঘনত্ব ও মহাকর্ষ দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে বেশী এবং বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরুর যত দূরে থাকা উচিত ছিল তার চেয়ে ১০০ মিটার দক্ষিণে আছে এবং দক্ষিণ মেরুও আছে ততটা দূরে। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরুবিন্দু ২১০ কিলোমিটার বেশী কাছে এবং দক্ষিণ মেরু আছে ২১০ কিলোমিটার বেশী দূরে।

...বর্তনশীল গ্রহগুলিতে একই মধ্যরেখার ...ত্তর ও দক্ষিণ ভাগের বিন্দুগুলি ঘুরতে ...রতে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে মধ্য-...রেখা বরাবর কতকগুলি শক্তি সৃষ্টি করে। ...দিকে মহাকর্ষ গ্রহের মধ্যে চাপ সৃষ্টি ...রে। উত্তর গোলার্ধে ঐসব শক্তি উত্তর দিকে ...রিচালিত হয়। কিন্তু সেখানে কোন দক্ষিণমুখী শক্তি না থাকলে উত্তর মেরু ১০০ মিটার বসে যায় কি করে? এই প্রশ্নের জবাবে আচার্য কজিরেফ বলছেন যে, সেটি এক 'অসমতুল' শক্তি যার প্রভাবে পৃথিবীর স্থলভাগের অধিকাংশ রয়েছে উত্তর গোলার্ধে এবং জলভাগের অধিকাংশ রয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধে। মধ্যরেখা বরাবর উত্তরে ও দক্ষিণে বিভিন্ন বিন্দুর আবর্তনের বেগ সমান নয় বলে সেই পার্থক্য থেকে জন্ম হয় ঐ অসমতুল শক্তির। সময়ের গতি থেকেই সেই শক্তির জন্ম, যার বেগ কজিরেফের হিসাবে সেকেণ্ডে ৭০০ কিলো-মিটার। সেই শক্তি নাকি আবহমণ্ডলের নিচের স্তরকে উত্তর দিকে ঠেলে দেয়, যার জন্য দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বেশী। অবশ্য অন্য একটি প্রচলিত ও স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মত এইসব ব্যাপারের কারণ হিসাবে দুই গোলার্ধের মহাকর্ষের পার্থক্যের দিকে অংগুলি নির্দেশ করেন।

সময়ের গতিকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারা যায় তা হলে সেই শক্তি দিয়ে ১ গ্লাস জল মাত্র ১ ডিগ্রী গরম করতে হয় বহু বছর লেগে যাবে। কজিরেফের অনুমানে মহাজগতে সূর্যনক্ষত্রগুলির রাজ্যে এমন সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলে যেগুলির ইন্ধন হচ্ছে সময়। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, জ্যোতিষ্কের আয়ু যদি একমাত্র পারমাণবিক ভাঙন-গড়নের উপর নির্ভর করত তা হলে মহা-জগতে একদিন দেখা দিত স্থিতিসাম্য এবং নক্ষত্রগুলিকে শেষ পর্যন্ত তাপীয় মৃত্যুর কবলে পড়তে হত। কিন্তু মহাকাল তাদের বাড়তি শক্তি জোগাবার এক অফুরন্ত আড়ত হিসাবে তাদের বিচ্ছুরিত জ্যোতি—শক্তির ফাঁক ভরাট করে দেয় বলেই তাপীয় মৃত্যু তাদের কাছে ঘেঁষতে পারে না।

আচার্য কজিরেফের অনুমিতি এখনো প্রমাণের প্রতীক্ষায়। তার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং সে সম্পর্কে শেষ কথা বলবার সময় এখনো আসে নি। কিন্তু ভেবে দেখুন তাজমহল বা পিরামিডের কথা, অভ্রভেদী এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বা বিশাল মস্কো বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কথা। সেগুলি কি সময় দিয়ে গুণ করা বাস্তব শক্তি নয়? প্রতিটি নতুন বছর এক একটি শক্তির সাগর। মহাকালের আবর্তনের মধ্যরেখা অনুসরণ করলে যে জিনিসটি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, কোন প্রগতি-শীল আদর্শ নিয়ে মানুষ যখনই কাজে নেমেছে সময়ের গতি তাকে জয়ী করেছে সেই আদর্শকে। আর সেই অগ্রগতির প্রতি-ক্রিয়ারূপে যে নির্জীব শক্তি সময়ের গতিরোধ করার চেষ্টা করেছে, মহাকাল তাকে নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়েনি।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

পনেরো
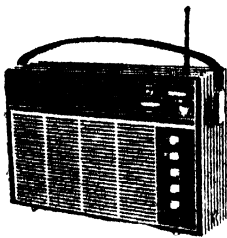
ধ হাসপাতালের কাজের বাঁধাধরা সময় বলে এতদিন কিছু ছিল না। কা সম্ভবও নয়। তবু ওরই মধ্যে মোটা-টি যে সময়টা ছিল সেটা সকালের দিকে, লা পর্যন্ত। দেহাত, গাঁ গ্রাম, আশে-শের পঁচিশ-ত্রিশ মাইল এলাকা থেকে কে একে রুগী এসে জুটতে জুটতে বেলা য় যেত। সকালের প্রথম বাসটা গুরুডিয়ায় সে সাতটা নাগাদ, তারপর যেটা আসে টা এসে পৌঁছতে সাড়ে দশ, কোনো নোদিন এগারোটা। যেমন করেই আসুক, তেই আসুক, যারা চোখ দেখাতে আসত রা নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছতে পারত না, হেরফের হত। হাটের ন ইদানীং যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তে দুপুরেও রুগী আসত, দুপুরের রও, হাটের পথেই যেন কাজটা সেরে ত।

শীত পড়ে যাওয়ায় নানা রকম অসুবিধে ছিল। সকালের বাসে বড় কেউ এসে পৌঁছতে পারত না, বাসের ভরসায় যারা সে থাকত তাদের আসতে বড় বেলা হয়ে যত। অন্য যারা—গরুর গাড়িতে কিংবা টুঠা থেকে হেঁটে আসত তারাও সব একে কে আসছে, যার যেমন সুবিধে। শীতের বলা, দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে আসত। ার ওপর মোটামুটি কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন রুগী লেও একটা কথা ছিল : এক একটি রুগীর পছনে হৈমন্তীকে যে সময় ব্যয় করতে হত াতে কলকাতার হাসপাতালে তিনটে ুগীর চোখ দেখা হয়ে যায়। দহাতের মানুষ, যত সরল তত াকা, আর অসম্ভব ভীতু। চোখের ওপর মালো ফেলার আগেই তাদের কী আতঙ্ক!

সাধারণত হাসপাতালের কাজ সেরে ফরতে হৈমন্তীর দুপুর হয়ে যেতে লাগল। হাটের দিন দুপুরটাও তার হাসপাতালে কাটাতে হত। এক আধ দিন এমন হয়েছে—দুপুরের পর হৈমন্তী ফিরছে, হঠাৎ হাট-ফেরৎ গরুরগাড়ি করে কেউ এল, ঠিক যেমন করে হাটের পর তারা বেচাকেনার পয়সা নিয়ে স্টেশনের দোকানে সওদা করতে যায়।

স্বভাবতই, এই সব কারণে, হৈমন্তীর নানা রকম অসুবিধে হতে লাগল। স্নান খাওয়া, বিশ্রামের মোটামুটি একটা নিয়ম সে মানতে পারছিল না। অথচ দীর্ঘদিন সে এই অভ্যাস পালন করে আসছে। অসুখের পর থেকে এই ধরনের কোনো কোনো নিয়মে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, এবং এ বিষয়ে তার কিছু মানসিক দুর্বলতাও জন্মে গিয়েছিল।

একদিন দুপুরের পর, আর-একদিন হাটবারে বিকেল করে দুই রুগী আসায় সে ফিরিয়ে দিল, দেখল না। তারপর যুগল-বাবুকে বলে দিল, সকাল আটটা থেকে বারোটার মধ্যে, আর হাটবারের দিন একটা পর্যন্ত যেসব রুগী আসবে শুধু তাদেরই দেখবে হৈমন্তী। এটাই হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময়। সকলকেই এই নিয়ম মানতে হবে, যুগলবাবু যেন সকলকেই তা বুঝিয়ে দেন।

কথাটা সুরেশ্বরের কানে গেল। এর আগে রুগী ফিরিয়ে দেবার সংবাদও তার কানে গিয়েছিল। সুরেশ্বর হয়ত বিরক্ত হয় নি, কিন্তু কেন যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, বিষয়টা নিয়ে হৈমন্তীর সঙ্গে তার কয়েকটা কথা হওয়া দরকার। আগে সন্ধ্যের দিকে হৈমন্তী প্রায় রোজই তার ওখানে আসত, গল্পটল্প করত; আস্তে আস্তে আসা-যাওয়া হৈমন্তী কমিয়ে দিয়েছিল। কিছুকাল ধরে সে বড় একটা আর আসছিল না। পুজোর পর কলকাতা থেকে ফিরে সে দু-চার বার এসেছে, কিন্তু ইদানীং একেবারেই নয়। সকালে কোনোদিন হাস-পাতাল ঘরে, কোনোদিন রুগীদের ঘরের দিকে সুরেশ্বরের সঙ্গে হৈমন্তীর দেখা হয়েছে। অন্ধআশ্রমের নতুন কাজকর্ম নিয়ে সুরেশ্বর নিজেও খুব ব্যস্ত। আশ্রমের মধ্যে মাঠে ঘাটে দেখা হয়ে গেলেও তেমন কোনো কথাবার্তা দু' জনের মধ্যে হয় নি। হৈমন্তীর সুবিধে-অসুবিধের কথা কিছু বলে নি হৈমন্তী।

সুরেশ্বর কথাটা বলার জন্যে হৈমন্তীকে ডেকে পাঠাতে পারত। কিন্তু সুরেশ্বরের যে ধরনের স্বভাব তাতে এ-ধরনের কথা-বার্তা বলার জন্যে হৈমন্তীকে ডেকে পাঠানো তার উচিত মনে হল না। তা-ছাড়া, হৈমন্তীর ঘরের দিকে সে বড় একটা যায় নি কখনও। মাঝে মাঝে তারও যাওয়া উচিত।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সুরেশ্বর হৈমন্তীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

হৈমন্তীর ঘরের দরজায় পরদা ঝুলছে, আলো জ্বলছে ভেতরে. রেডিয়োতে গান হচ্ছিল. মৃদু সুরে পুরুষালী গলায় কেউ গান গাইছে। কৃষ্ণপক্ষ, অগ্রহায়ণের শেষ. বাইরে বেশ শীত।

সুরেশ্বর সামান্য সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটি শুনছিল। এই গান তার বহুশ্রুত. কথাগুলি এখনও মনে আছে, সুরও হয়ত ভুলে যায় নি সুরেশ্বর। শুনতে বড় ভাল লাগছিল সুরেশ্বরের।

গান শেষ হলে সুরেশ্বর ডাকল, "হেম।"

ঘরের মধ্যে মালিনী ছিল, সুরেশ্বরের গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজায় এসে পরদা সরাল। মালিনী যেন অবাক. সামান্য অপ্রস্তুত। সুরেশ্বরকে ভেতরে আসতে বলতে পারল না মালিনী, শুধু পরদাটা আরও তুলে ধরল।

সুরেশ্বর ঘরে ঢুকল।

হৈমন্তী বিছানার ওপর উঠে বসেছে, পায়ের দিকে একটা হালকা কম্বল ছিল, পাট ভাঙা; বোঝাই যায় পায়ের ওপর টেনে নিয়ে শুয়ে বা বসে ছিল।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল হৈমন্তী। মালিনী বিব্রত ভাবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।

জানলার দিকে চেয়ারের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে সুরেশ্বর বলল, "বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানের শেষটুকু শুনছিলাম।"

হৈমন্তীর বেশবাসে সামান্য অবিন্যস্ত-ভাব ছিল : গায়ের আঁচলটা ঢিলেঢালা, তার ওপর ছোট হালকা শাল জড়ানো। কোমরের কাছে আঁচলের কাপড় অনেকটা ঝুলে আছে, কুঁচি দিয়ে শাড়ি না পরার জন্যে সামনে কোনো কোঁচ ছিল না। একেবারে সাধারণ-ভাবে ঘরোয়া করে শাড়ি পরা। মাথার উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। হৈমন্তীর চোখ মুখ, মাথার চুল শুকনো ও লালচে দেখাচ্ছিল।

নিজের অবিন্যস্ত ভাবটা শুধরে নিয়ে হৈমন্তী রেডিয়ো বন্ধ করে দিতে গেল। সুরেশ্বর বাধা দিল, বলল, "থাক না; গানটা শুনি।"

হৈমন্তী রেডিয়োর সামনে দাঁড়িয়ে সুরেশ্বর জানলার কাছে চেয়ারটিতে বসেছে

বসে অল্প অস্বস্তি বোধ করে হাত বাড়িয়ে জানলার বন্ধ পাট খানিকটা খুলে দিল। বাইরের ঠান্ডা বাতাস ও শীত এল দমকা। রেডিয়োতে গান হচ্ছিল : 'আমার মাঝে তোমার লীলা হবে...'

সুরেশ্বর এভাবে আসবে, আচমকা, হৈমন্তী ভাবে নি। খুব কম, আঙুলে গুণেই বলা যায় হয়ত, সুরেশ্বর ক'দিন তার ঘরের বারান্দায় বা ঘরে পা দিয়েছে। এভাবে হুট করে এসে পড়ে হৈমন্তীকে যে খানিকটা বিব্রত করেছে সন্দেহ নেই। হৈমন্তীর শরীর ভাল নেই, বিছানায় পায়ের ওপর কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে ছিল, বইও পড়ছিল না আজ, মালিনী বসে ছিল, তার সঙ্গে গল্প করছিল।

হঠাৎ সুরেশ্বর এখানে কেন? কতক্ষণ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে? এত মন দিয়ে গান শোনারই বা কি হল তার?...হৈমন্তী সুরেশ্বরকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করল। সুরেশ্বর একমনে গান শুনছে। শীত এমন কিছু কম নয়, তবু সুরেশ্বরের গায়ে হাতকাটা ছোট একটা ফতুয়া ধরনের গরম জামা ছাড়া পশমের কিছু নেই। পায়ের চটিটাও দরজার কাছে খুলে এসে খালি পায়ে বসে আছে।

হৈমন্তী আরও কয়েক মুহূর্ত রেডিয়োর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পাশের টুলটার ওপর বসল, মালিনী সেখানে নিত্য বসে। তার ঠান্ডা লাগছিল, বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে আসায় পায়ের পাতা কনকন করছিল।

গান শেষ হল।...কি একটা অন্য জিনিস শুরু হতেই রেডিয়োটা বন্ধ করে দিল হৈমন্তী।

সুরেশ্বর যেন খুবই পরিতৃপ্ত হয়েছে, মুখ জুড়ে স্মিত হাসি, গানের থেকেই একটা কলি আবৃত্তি করল : 'আনন্দময় তোমার এ সংসারে, আমার কিছু আর বাকি না র'বে।'

হৈমন্তী সুরেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল, চোখ লক্ষ করল।

সুরেশ্বর বলল, "এ একটা ভাল ব্যবস্থা করেছ। মাঝে মাঝে তোমার এখানে এসে গান শুনে যাব।"

একসময়ে সুরেশ্বরের সংগীতপ্রীতি ছিল। নিজেও সে একটু আধটু চর্চা যে না করেছে এমন নয়। হৈমন্তীর এসব অজানা ছিল না। কিন্তু এখনও যে সুরেশ্বরের সঙ্গীতপ্রীতি আছে হৈমন্তীর তা জানা ছিল না। মালিনীর কাছে অবশ্য শুনেছে, সুরেশ্বরকে নাকি আপনমনে অনুচ্চ কণ্ঠে গান গাইতে কখনো সখনো শোনা যায়; তেমন ভাগ্য, সে গান শোনার ভাগ্য, হৈমন্তীর এখানে এসে পর্যন্ত যদিও হয় নি। হৈমন্তী মনে মনে কেমন উপহাস বোধ করল : অন্ধআশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ-মহারাজ (বিজলীবাবু বেশ বলেন, হৈমন্তীর হাসি পায়) সাধারণ গানের ভক্ত এ যেন কেমন কথা!

সুরেশ্বর এবার বলল, "বাইরে দাঁড়িয়ে আগের গানটা শোনার সময় আমার মনে হল, এখনও যেন সুরটা মোটামুটি মনে আছে।..." বলে সুরেশ্বর দু মুহূর্ত থেমে যেন অত্যন্ত সারল্যে এবং খুশীতে মৃদু সুরে গাইল : 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।' গেয়ে থেমে গেল।

হৈমন্তী অতিমাত্রায় বিস্মিত হল। অপলকে তাকিয়ে থাকল মানুষটির দিকে। গলা যেমনই হোক, সুরের ভুলচুক যাই থাকুক তবু ওই মানুষ এখনও গান গাইতে পারল! লোকমুখে শুনলে বিশ্বাস হত না, কানে শুনেও যেন হৈমন্তীর বিশ্বাস হচ্ছিল না। সুরেশ্বর এক সময় এ-সব গান যে গাইত হৈমন্তী জানে। স্মৃতির মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে সুরেশ্বরের সেই পুরোনো চেহারাটি ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

সুরেশ্বর বলল, "এই গানটা আমার মারও খুব পছন্দ ছিল।...তবু, মার অহংকার কোনোদিন ঘোচে নি।"

হৈমন্তী গায়ের গরম শাল আরও একটু ঘন করে নিল।

সুরেশ্বর হৈমন্তীর ঘর দেখতে লাগল।

ইদানীং আসা হয় নি ঘরে। বিছানার ওপর মোটা কভার, ছোট টেবিলে লেসের কাজকরা ঢাকনা, নতুন বাতি, জানলায় পরদা, এক-পাশে আলনা, বইপত্র সাজানো রয়েছে অন্য পাশে, কিছু-বা একধারে পড়ে আছে।

দেখতে দেখতে সুরেশ্বর বলল, "তোমার এই ঘরটায় কুলোচ্ছে না, না হেম?"

হৈমন্তী প্রথমে কোনো জবাব দিল না; পরে বলল, "হয়ে যাচ্ছে...।" বলে কাশল। তার কাশির শব্দ কানে লাগে।

"অসুবিধে হচ্ছে। হচ্ছে না?"

"তেমন কিছু না।"

হৈমন্তীর চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুরেশ্বর এবার বলল, "তোমার শরীর খারাপ! গলা ভার ভার লাগছে।"

"নতুন শীত; ঠান্ডা লেগেছিল।"

"জ্বর হয়েছিল?"

"অল্প: ছেড়ে গেছে।" হৈমন্তীর বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল সে খুব নির্লিপ্ত, নিরুত্তাপ।

হৈমন্তীর চোখ মুখ লক্ষ করতে করতে সুরেশ্বর বলল, "তোমার মুখটুখ এখনও ফুলে রয়েছে।...ওভাবে জড়সড় হয়ে আছ কেন? শীত করছে?"

হৈমন্তীর শীত করছিল। পায়ের পাতা দুটো কনকনে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে গা সিরসির করছে।

"ওষুধপত্র কিছু খেয়েছ?" সুরেশ্বর জিজ্ঞেস করল।

মাথা নোয়াল হৈমন্তী: খেয়েছে। তার শরীর অসুস্থ এটা যেন সুরেশ্বরের অনেক দেরীতে চোখে পড়েছে। মনে মনে হৈমন্তী বিরক্তি বোধ করল কেমন।

"বিছানায় ছিলে, বিছানাতেই গিয়ে বসো না।" সুরেশ্বর বলল।

"থাক।"

"তোমার শরীর খারাপ আমায় তো কেউ বলে নি।"

"বলার মতন কিছু না।"

সুরেশ্বর যেন অন্যমনস্ক হল সামান্য। পরে বলল, "এখানকার শীত সওয়া নেই তোমার; গোড়ায় ঠান্ডাফান্ডা লাগবে, সইয়ে নিতে হবে ধীরে ধীরে।"

এমন সময় মালিনী এল। দু কাপ চা নিয়ে এসেছে। এটা তার নিজের বুদ্ধিতে ঠিক নয়, খানিকটা আগে হৈমন্তী তাকে চায়ের কথা বলেছিল, সুরেশ্বর আসার আগেই। সাধারণত এ-সময় একবার ওরা চা খায়। তাছাড়া হৈমন্তীর গলা অল্প ব্যথা ব্যথা করছিল, মাথাও সামান্য ধরে আছে।

সুরেশ্বর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হেসে মালিনীকে বলল, "খাতির নাকি?"

মালিনী সঙ্কুচিত হল। বলল, "হেমদি আগেই চা খেতে চেয়েছিলেন।"

"ও!...তা রোজ বুঝি গানবাজনা শোনা হচ্ছে?"

মালিনী নীচু মুখে সামান্য মাথা হেলাল।

"হেমের শরীর খারাপ আমায় বলো নি তো?"

মালিনী চুপ। হেমদি সম্পর্কে দু-একটা কথা আগে সে সুরেশ্বরকে বলত। হেমদি জানতে পেরে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল। হেমদির সর্দিজ্বরের কথাটা অবশ্য সে একবার ভেবেছিল সুরেশ্বরকে বলবে, তারপর আর বলা হয়ে ওঠে নি, জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল বলেই বোধ হয়।

হৈমন্তীর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে মালিনী চলে গেল আস্তে আস্তে।

চা খেতে খেতে সুরেশ্বর আবার হৈমন্তীকে বিছানায় গিয়ে বসতে বলল। হৈমন্তী উঠল না। এক সময়ে, দিনের পর

দিন সুরেশ্বরের চোখের সামনে সে বিছানায় শুয়ে বসে থেকেছে, সুরেশ্বর তার মাথার কাছে কখনও, কখনও বালিশের পাশে বিছানায় বসে থেকেছে। আজ হৈমন্তীর সে-বয়েস নেই, সেই অবস্থাও না।

সুরেশ্বর এবার কথাটা তুলল। বলল, "হেম, তোমার সঙ্গে একটা কথা আলোচনা করতে এলাম। কিন্তু তুমি ওভাবে বসে থাকলে বলি কি করে!.. তোমায় ওই কম্বলটা এনে দেব?"

সমস্ত ব্যাপারে সুরেশ্বরের এই নম্র, মধুর, শিষ্ট কথাবার্তা ও আচরণ একসময়ে হৈমন্তীর পছন্দ হত। এখন হয় না। এখন মনে হয় এ এক ধরনের কৃত্রিমতা, মানুষকে মোহিত করার, বশ করার কৌশল। হৈমন্তী সন্দিগ্ধ হল। হঠাৎ সুরেশ্বরের এখানে আসা, এসে খুশী মনে গান শোনা, গান শুনে নিজেও কৌতুক করে একটু গান গাওয়া, তারপর ক্রমে ক্রমে অবস্থাটা সইয়ে নিয়ে বলা—হেম তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে এলাম—এর অর্থটা কি? কিসের আলোচনা?

হৈমন্তী নিতান্ত বাধ্য হয়ে বিছানার ধারে গিয়ে বসল, বসে কোলের ওপর দিয়ে কম্বলটা পায়ে চাপা দিল।

সুরেশ্বর বলল, "শুনলাম তুমি হাসপাতালে চোখ দেখানোর একটা বাঁধাবাঁধি সময় করে দিয়েছ?"

হৈমন্তী তাকাল, স্থির চোখ রেখে সুরেশ্বরের মুখোভাব দেখল। তা হলে এই হাসপাতালের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছে!...জানতাম তুমি আসবে, মনে মনে ভাবল হৈমন্তী, কৈফিয়ত চাইতে আসবে।

"হ্যাঁ, সময় বেঁধে দিয়েছি", হৈমন্তী বলল।

সুরেশ্বর শান্ত ভাবেই বলল, "তোমার যে খুব অসুবিধে হচ্ছিল—তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু, আমি বলছিলাম, ওদের কথা ভেবে অন্য কিছু করা যায় না?" সুরেশ্বর এমন ভাবে বলল যেন মতামত চাইছে। কিন্তু হৈমন্তী জানে মতামত নিতে সুরেশ্বর আসে নি, তার মতামত ব্যক্ত করতে এসেছে।

"না, আর কিছু করা যায় না," হৈমন্তী শক্ত ভাবে বলল। মনে মনে যেন সে ঠিক করে নিয়েছে সে যা স্থির করেছে তার জন্যে শেষ পর্যন্ত শক্ত থাকবে।

সুরেশ্বর জোর গলায় কিছু বলল না, শান্ত গলায়, হৈমন্তীকে যেন বোঝাচ্ছে, নরম গলায়, প্রায় অনুরোধ করার মতন বলল, "আমি জানি হেম, ওদের সময়জ্ঞানটা কম। কিন্তু তুমি তো জানোই কিভাবে সব আসে, কত দূর দূর থেকে। নানা ঝঞ্ঝাট করে আসা, গাড়িটাড়ি পায় না ঠিক মতন।"

হৈমন্তী বিরক্ত হল, কি বলতে চায় সুরেশ্বর? সারাটা দিন ওই রুগীদের নিয়ে তাকে থাকতে হবে নাকি? হৈমন্তী বলল, "হাসপাতালের একটা নিয়ম থাকে।"

"থাকে, তবে সেসব হল শহরের হাসপাতাল। এটাকে তুমি সেভাবে ধরছ কেন?"

"কিভাবে ধরব?"

"তর্কের কথা নয়, হেম। আমি ওদের অসুবিধের কথা তোমায় জানাচ্ছি শুধু। তুমি যদি নিয়ম ঠিক করে দেবার আগে আমায় একবার জানাতে..."

"না জানিয়ে অন্যায় হয়েছে," হৈমন্তী বিরক্ত গলায় বলল, "কিন্তু আমার পক্ষে হাসপাতালটাকে মেঠাইমণ্ডার দোকান করে রাখা সম্ভব না।"

সুরেশ্বরের কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল। "তুমি কি আমাদের হাসপাতালটাকে শহরের হাসপাতাল করে তুলতে চাও?"

"আমি কিছুই চাই না। সব জিনিসের একটা নিয়ম থাকা দরকার। আমি তোমার রুগীদের চাকর নই যে যখন তারা ডাকবে আমায় ছুটতে হবে। আমার স্নান, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রামের একটা সময় রাখা দরকার।" হৈমন্তী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

সুরেশ্বর এবার কেমন ক্ষুব্ধ হল। বলল, "কত দূরে থেকে সেদিন দুজন এসেছিল তুমি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছ। নিজের সামান্য অসুবিধে করেও কি তুমি তাদের দেখতে পারতে না?"

হৈমন্তীর আর সহ্য হল না। প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঙ্গে বলল, "না, পারতাম না। শীতের বেলা, আমি দেড়টা দুটোর সময় স্নান করে ভাত খেতে বসি। তার পরও তোমার রুগীরা যদি আসে, আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। তোমার রুগীরাই শুধু মানুষ নয়, আমিও মানুষ।"

সুরেশ্বর কেমন যেন বিস্মিত হল। এমন রূঢ়, নির্মম, নির্দয় প্রত্যুত্তর যেন সে আশা করে নি। বলল, "হেম, আমি কি তোমায় তোমার যা অসাধ্য তা করতে বলেছি? আমি শুধু বলতে এসেছিলাম, তোমার অসুবিধের কথা আমায় যদি জানাতে..."

"তোমায় জানাবার হলে জানাতাম।"

সুরেশ্বর অবাক হল। "হাসপাতালের ব্যাপারে আমায় তুমি জানাবে না...?"

"না। হাসপাতালের রুগীদের আমি কখন দেখি, কি করে দেখি, কেন দেখি না—এসব আমার তোমাকে জানানোর কোনো দরকার আমি মনে করি না। আমি ডাক্তার, আমার অধিকার যদি তুমি না মানো, তবে আমি রুগী দেখা বন্ধ করে দেব।"

সুরেশ্বর স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে বসে থাকল।

(ক্রমশ)

স্টকহল্‌ম্‌-এর রাজবাড়ী

নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক। উত্তর ইউরোপের ছোট ছোট এই তিনটি দেশ নিয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। ছেলেবেলায় গল্পে ও ইতিহাসে এদের আদিম অধিবাসী ভাইকিংদের বীর্যবত্তা এবং কীর্তি-কাহিনী শুনেছি। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দিনেমারদের আক্রমণের বিবরণ পড়েছি। এখন স্বচক্ষে এদের বর্তমান কালের অবস্থা দেখছি।

এই তিনটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে সুইডেন। আয়তনে প্রায় আমাদের পশ্চিম বাঙলা, আসাম ও বিহার প্রদেশের সমান—৪৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার-এর মত। দেশ থেকে যখন স্টকহল্‌ম্‌-এ আসার কথা হল, তখন ভেবেছিলাম কত না উত্তরে, প্রায় উত্তর মেরুর দেশে যাচ্ছি। কিন্তু এ দেশে স্টকহল্‌ম্‌কে দক্ষিণ সুইডেনের মধ্যেই ধরা হয়। এখান থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে 'ওস্তারসুন্দ' (OSTERSUND) নামক শহরটি এ-দেশের ঠিক মাঝামাঝি। আয়তনে এত বড় দেশ, কিন্তু লোকসংখ্যা শুনলে অবাক হতে হয়। এত বড় দেশে মাত্র ৭৫ লক্ষ লোকের বাস—বৃহত্তর কলকাতায়ও তার চেয়ে বেশী লোকের বসবাস। ডেনমার্ক সব চাইতে ছোট—৪৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার। নরওয়ের আয়তন ৩২৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যার দিক থেকে ডেনমার্কে প্রায় ৪৭ লক্ষ, এবং নরওয়েতে ৩৮ লক্ষ। ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই তিনটি দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত নরওয়ে সুইডেনের অধিকারে ছিল। ঐ বছরে গণভোটে নরওয়েজিয়ানরা সুইডেন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পক্ষে স্থির করে। ১৭ই মে ১৯১৭ সালে তারা নিজেদের রাজা নির্বাচন করে, ডেনমার্কের রাজবংশের রাজপুত্র নরওয়ের রাজা নির্বাচিত হন।

এই তিনটি দেশের ভাষাও প্রায় একই গোষ্ঠীর; মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা যায়। আমাদের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও এর দূর সম্পর্ক আছে। মুখ্যত জার্মান এবং খানিকটা ইংরাজী ভাষা থেকেও অনেক শব্দের উৎপত্তি। আধুনিক সুইডিশ ভাষার শব্দসম্ভার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশী ভাষার (প্রধানত জার্মান এবং ইংরাজী) থেকে নেওয়া। কেউ যদি ইংরেজী এবং জার্মান দু ভাষাই জানেন, অনায়াসে তিনি গোড়া থেকেই সুইডিশ খবরের কাগজ পড়ে মোটামুটি বুঝতে পারবেন। সুইডিশ ভাষার সঙ্গে নরওয়ের ভাষার খুব নিকট সম্পর্ক এবং উচ্চারণও পরস্পরের বোধগম্য। ডেনমার্কের ভাষাটা একটু অন্য ধরনের। ওদের উচ্চারণে আছে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। কাঠখোট্টা ধরনের একরকম শব্দ ওদের গলা থেকে বের হয়—অনেকটা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের 'সুইট্‌জার' ডয়েট্‌সের মত (Schweizer Deutsch) অর্থাৎ জার্মানভাষী সুইসদের ভাষা। এরা বলে, ওটা ভাষা নয়, গলার এক রকম রোগ মাত্র। দক্ষিণ সুইডেনের লোকেদেরও অনেকটা ডেনিশের মত উচ্চারণ, বহু বৎসর পর্যন্ত ঐ অঞ্চল ডেনমার্কের অধীনে ছিল সেই জন্যেই বোধ হয় নরওয়েতে এখন আবার প্রাচীন নরওয়েজিয়ান ভাষার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। স্কুলের ছাত্ররা এখন দুই ভাষাই শিখছে—প্রাচীন এবং আধুনিক নরওয়েজিয়ান। ওদের উচ্চারণটা আবার বেশ সুরেলা। ওদের কথা শুনলে মনে হবে যেন মিষ্টি গান শুনছেন। নরওয়ের সংশ্লিষ্ট সুইডেনের অর্থাৎ ওয়ার্মল্যাণ্ডের (Varmland — প্রসিদ্ধ সুইডিশ লেখিকা সেলমা লাগারলফের দেশ) সুইডিশ উচ্চারণও তেমনি মিষ্টি।

নোবেল পুরস্কারের দেশ এই সুইডেন। কৃতী বিজ্ঞানী এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী অ্যালফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সেই অর্থের এক বিরাট অংশ তিনি এক ফাউণ্ডেশনে দান করে যান। এই টাকা

স্টকহল্মস্থিত সুইডিস পার্লামেন্ট হাউস

থেকে প্রতি বছর পাঁচটি বিষয়ে বিশ্বের কৃতী সন্তানদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের পুরস্কার 'সুইডিশ অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স' থেকে ঘোষণা করা হয়। চিকিৎসা বিদ্যার পুরস্কার দেওয়া হয় বিশ্ববিখ্যাত "ক্যারোলিন্স্কা ইন্স্টিটিউট" থেকে। সাহিত্যের পুরস্কারপ্রার্থী নির্বাচন করেন সুইডিশ অ্যাকাডেমী, শান্তির পুরস্কার দেওয়া হয় "অস্লো"-তে নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট থেকে। নোবেল সাহেবের জীবদ্দশা থেকেই এই রকম ব্যবস্থা। ঐ সময়ে নরওয়ে সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শান্তি এবং সাহিত্যের পুরস্কার প্রার্থী নির্বাচন সম্বন্ধে সারা বিশ্বে প্রতি বছর বেশ আলোচনা চলে। সত্যিই এই দুই বিষয়ে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন ভয়ানক কঠিন, শান্তির পুরস্কারের জন্যে মহাত্মা গান্ধী এবং নেহরুজীর মনোনয়ন না হওয়ার জন্যে ভারতবাসীর খেদ চিরকাল থেকে যাবে। তেমনি অনেকের ধারণা অনেক ভাষার অনেক কৃতী সাহিত্যিক হয়ত সাহিত্যের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যাঁদের রচনা তর্জমার মাধ্যমে নির্বাচনী কমিটির কাছে পেঁছায় নি। প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর এখানকার কনসার্ট হাউস থেকে সুইডেনের রাজা স্বয়ং এই পুরস্কার বিতরণ করেন। সেই সময়ে পুরস্কারপ্রার্থীরাও তাঁদের কাজ সম্বন্ধে এ-দেশের জনসাধারণকে ভাষণ দিয়ে থাকেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে সাহিত্যের পুরস্কার অর্জন করেন। কিন্তু মহাযুদ্ধের জন্যে সেই সময়ে তিনি তাঁর ভাষণ দিতে আসতে পারেন নি। এসেছিলেন অনেক 'পরে ১৯২১ সালে। তারপর ভারত থেকে নোবেল পুরস্কার পান স্বনামধন্য বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ পদার্থবিদ্যার "রমণ রশ্মি"র উপর তাঁর কাজের জন্যে। এ ছাড়া এশিয়া থেকে ২।৩ জন জাপানী বিজ্ঞানী এই পুরস্কার অর্জন করেছেন। মুখ্যত ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে যে আবিষ্কার সেই থেকে অর্জিত অর্থ আজ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যে নিয়োজিত হচ্ছে নোবেল পুরস্কারগুলির মাধ্যমে, গঠনাত্মক কাজের জন্যে।

সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে এই তিনটি দেশেই রাজতন্ত্র কায়েম আছে, যদিও রাজারা শুধুমাত্র নামেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, পার্লামেন্টের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টিই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সব কটি দেশেই কিছু দিন আগে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী পার্টি (Social Democratic Party)

দ্বারা গঠিত সরকার ছিল। কিন্তু গত নির্বাচনে নরওয়েতে সমাজতন্ত্রীরা হেরে যায়। সুইডেনে গত ৩০ বছরেরও ওপর সোস্যালিস্ট পার্টি মন্ত্রিত্ব গঠন করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী তাগে এরলান্ডার প্রায় ১৫।২০ বছর ধরে ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এই বছরে ফিনল্যান্ডে যে নির্বাচন হল তাতেও সোস্যালিস্টরা এবার মন্ত্রিত্ব গঠন করেছে, তবে কম্যুনিস্টদের কোয়ালিশন নিয়ে। ফিনল্যান্ডের সরকারে তাই জন তিনেক কম্যুনিস্ট মন্ত্রীও আছেন। সুইডেনে রাজতন্ত্র আর কত দিন চলবে তাই নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চলছে। বর্তমান রাজা ষষ্ঠ গুস্তাভ খুব জনপ্রিয় সন্দেহ নেই এবং ভদ্রলোক খুবই শিক্ষিত। বয়স যদিও এখন পঁচাশীর কাছাকাছি, কর্মক্ষমতায় যে কোন যুবাকেও হারাতে পারেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্য তাঁর—রাজ-সিংহাসনের চেয়ে গবেষণার দিকেই তাঁর টান বেশী। তিনি যখন রাজা হন তখন তাঁর বয়স প্রায় ৭০-এর কাছাকাছি। সেই সময় পর্যন্ত পড়াশুনোয় এবং গবেষণায় সময় কাটে তাঁর। অনেকেই বলে থাকেন, রাজ-সিংহাসনে না বসলে হয়ত তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজই করতেন। খুবই সাদাসিধে চালচলন তাঁর—অনেক সময়ে রাজাকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা গেছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী এরলান্ডারও মাঝে মাঝে 'আন্ডারগ্রাউন্ড' বা ট্রামে-বাসে করে তাঁর অফিসে যান। বছর দু-তিন আগে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভিলা ছেড়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে এসেছেন। একই বাড়িতে আরও বিশ-পঁচিশটি ভাড়াটের বসবাস।

রাজা গুস্তাভ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান ১৯৪৭ সালে। তাঁরই একমাত্র পুত্র কার্ল গুস্তাভ বর্তমান যুবরাজ। তাঁর বয়স এখন মাত্র একুশ। এ বছর স্কুল ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়ে নেভীতে মিলিটারী সার্ভিস করছে। পড়াশুনোয় মোটেই কৃতী নয় ছেলেটি। এ-দেশের জনসাধারণের অনেকের ধারণা, এরকম একজন সাধারণ ছেলেকে রাজা করার চাইতে রাজতন্ত্র উঠিয়ে দিয়ে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করাই বাঞ্ছনীয়। রাজতন্ত্র উঠিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এ-দেশে সোস্যালিস্ট পার্টির প্রোগ্রামের মধ্যেও আছে, কিন্তু এই বিষয়ে তারা খুব জোর দিতে চায় না—অন্তত এই বৃদ্ধ রাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত। পরে হয়ত রাজতন্ত্র কি গণতন্ত্র এই নিয়ে ভোট নেওয়া হবে।

স্কান্ডিনেভায়ার সব ক'টি দেশের মধ্যে সুইডেনই সবচেয়ে ধনী। সাধারণ লোকের আয় গড়ে মাসে দেড় হাজার সুইডিশ ক্রাউনের মত। আমাদের দেশের টাকায় প্রায় দুই হাজার টাকা। তবে এর থেকে শতকরা ৩০।৫০ ভাগ যায় সরকারের তহবিলে আয়কর হিসাবে। ঠিক কতটা বাদ যায়, তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত আয়ের ওপর। সম্প্রতি এক ব্রিটিশ স্ট্যাটিসটিক্সের মতে সুইডেন গড়পড়তা আয় অনুসারে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান রাখে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই স্থান ছিল ক্যানাডার। তবে এ-দেশে লক্ষপতি হবার আশা খুব কম জনাই রাখে—কারণ, প্রথমত, এখানে ট্যাক্সের হার প্রচণ্ড এবং দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ বৃহৎ সংস্থাই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। বছর ৪০।৫০ আগে অবশ্য সুইডেনের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। তবে গত দুই মহাযুদ্ধে সুইডেন ছিল নিরপেক্ষ। মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এ-দেশের লোককে পোহাতে হয়নি। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অন্য দেশগুলির সমানে যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এ-দেশের লোকেদের যে-

স্টকহল্‌ম্‌ এর প্রসিদ্ধ 'কনসার্ট হাউস'। এখানে প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর সুইডেনের রাজা নোবেল পুরস্কার বিতরণ করেন

সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তা ছাড়া গত মহাযুদ্ধে দু' পক্ষেই জিনিস-পত্র বিক্রি করে সুইডেন তার অবস্থার বেশ কিছু উন্নতিও করে নিয়েছে। হিটলার অল্প সময়ের মধ্যে ডেনমার্ক অধিকার করে নেয়। তারপর উত্তর নরওয়ের বন্দর 'নারভিক' (NARUIK) দখল করে নেয়। এই নারভিক বন্দর থেকেই সুইডেনের প্রসিদ্ধ Ironore বিদেশে রপ্তানি হয়। নরওয়ের নারভিক থেকে সুইডেনের 'কিরুণা' (KIRUNA) শহরের (যেখানে খুবই ভাল quality-র Iron ore পাওয়া যায়) দূরত্ব ভয়ানক কম। কিরুনা থেকে সুইডেনের নিকটতম বন্দর UMEA-র দূরত্ব ৪০০ মাইলের কম নয়, এবং তাও শীতকালে বরফে জমে থাকে নারভিক উত্তর মেরুর কাছে হলেও Gulf stream-এর জন্য বার মাস বরফমুক্ত থাক। জার্মানিরা যখন নারভিক বন্দর দখল করে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সুইডেনের Iron ore এর রপ্তানি ওদের হাতে চলে যায়। পরে জার্মান সৈন্যদেরও সুইডেনের মধ্য দিয়ে সুইডিশ ট্রেনে করে নরওয়ে এবং ডেনমার্কে পাঠান হয়। সুইডিশ সরকার সে সময়ে টুঁ শব্দটি করেনি। শুধু বলেছিল যে, জার্মানির কাছ থেকে রেল ভাড়া আদায় করা হবে। তবে বহু দিন সেই দাবি করতে সাহস পায়নি। পরে হিটলারের পতন যখন আসন্ন, সুইডেন সময় বুঝে তখন সেই টাকা দাবি করে। সইডেনের এই "আপাত নিরপেক্ষতার" জন্যে নরওয়ে এবং ডেনমার্কের লোকেরা এদের ওপর আজও বেশ [illegible]। অবশ্য সইডিশরা বলে, তাদের আত্মরক্ষাই তখন ছিল তাদের প্রধান সমস্যা। অন্যথা সুইডেনও অনায়াসে শত্রুর কবলে পড়ত।

এখনও পর্যন্ত সুইডেন তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে। প্রতি-বেশী রাষ্ট্র দুটি—নরওয়ে এবং ডেনমার্ক পশ্চিম রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা NATOর সক্রিয় সভ্য। দুই দেশেই মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। কিছু সংখ্যক জার্মান সৈন্যও মাঝে মাঝে মহড়া দিতে এসে থাকে। কিন্তু মনে হয় যে, নরওয়ে এবং ডেনমর্ক-এর জনসাধারণ জার্মানিদের সম্বন্ধে তাদের পূর্ববৈরিতা সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি। কারণ, কিছু দিন NATO-র অন্তর্গত জার্মান সেনাদলের অবস্থান নিয়ে ঐ দুই দেশের লোকেদের মধ্যে বেশ অশান্তি এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সুইডেন বেশ সাবধানে কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত না থেকে নিজের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে সুইট্জারল্যাণ্ডের মত।

কৃষ্ণা দত্ত

এই যে এখানে...

- নতুন কিং সাইজ নং ১
- নতুন চোখ ঝলকানো মোড়ক—
- নতুন গোলাপী রঙের সাবান—
- সদ্যতোলা গোলাপের সুগন্ধে ভরপুর।
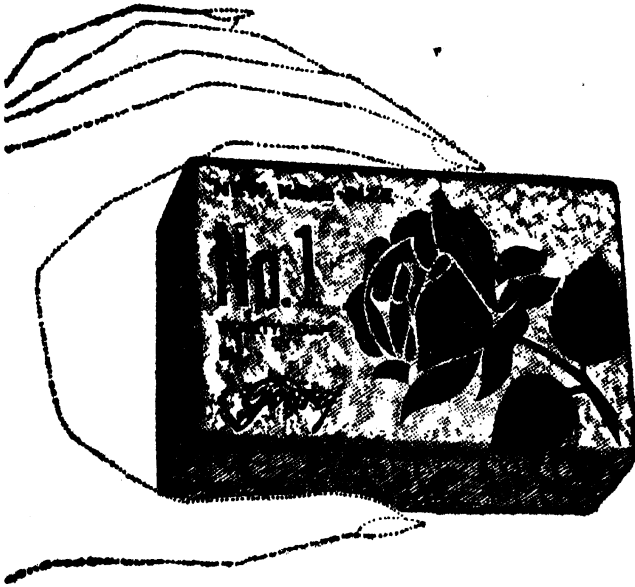
গোদরেজের কিং সাইজ নং১—প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী সারা পরিবারের সাবান। এর মনমাতানো গোলাপের মিষ্টি গন্ধে খুঁতখুঁতে লোকদেরও খুশী করবে। এটি অনেক বেশীদিন টেকে, অনেক বেশী ফেনা দেয় এবং এই দামের অন্য সাবানের চেয়ে আরো অনেক কিছু বেশী দেয়। আজই নং ১ সাবান কিনে ব্যবহার করুন।

গোদরেজ নং ১
ব্যক্তিগত পছন্দে
প্রথম
কম দামের দিক
থেকেও প্রথম

Godrej
গোদরেজ
সব সাবানের
সেরা

যদিও এই ছবিটি 'বন্দী' নামে নানা পত্রিকায় তখন ছাপা হয়েছিল এবং কয়েকটি প্রদর্শনীতেও বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল, কিন্তু আসলে সে বন্দী ছিল না। সে আমারই বন্ধু দ্বিজেশ সেন। পাশের বাড়ির।

প্রায় বছর ত্রিশেক আগের কথা। তখন আমি ফোটোগ্রাফির জগতে প্রবেশাধিকার অর্জন করেছি মাত্র। নানা স্থানের বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু কিছু ছবি ছাপা হয়েছে, গৌহাটি থেকেই দূর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে ফোটোগ্রাফির মারফত। কাজেই তখন আমার ছবি তোলায় উৎসাহ একটু বেশী, সর্বদাই নজর রাখছি ছবির বিষয়-বস্তুর দিকে।

বন্ধু ম্যাট্রিক পাস করেই কলকাতা চলে এসে একটি কলেজে নাম লিখিয়েছে। কিছু-দিন বাদে একদিন হঠাৎ দেখি, সে ফিরে এসেছে গৌহাটিতে। শুনলাম, কলকাতায় আর লেখাপড়া করবে না। আনন্দ হল আমাদের দলের একজন একনিষ্ঠ সভ্যকে ফিরে পেয়ে। তখনকার দিনে মফস্বলে কলকাতা-ফেরত কোন লোক বর্তমানের একজন বিলেত-ফেরতের চেয়েও বেশী আমল পেত। বন্ধু এতখানি সুযোগ পেয়ে খুব জমিয়ে বসল মফস্বলী বন্ধুদের নিয়ে। আমরা অতি মনোযোগ দিয়ে হাঁ করে শুনি তার কলকাতার গল্প, আর কল্পনায় রচনা করে নিই অদেখা বিষয়বস্তুর রূপ। মনে মনে আফসোস করি আমাদের মন্দ ভাগ্যের জন্য। বিলেত যেতে না পারার মতই আফসোস।

বয়সের ধর্মেই হয়ত বন্ধু তার বিশেষ গোপনীয় একটি কথা আমার কাছে বলে ফেলল একদিন। সে নাকি পালিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে, কারণ কি একটি বোমার মামলার সঙ্গে তার নাম জড়িত হওয়ায় পুলিস তার পিছু নিয়েছে। পুলিসের ধর-পাকড় শুরু হতেই সে একদিন খসে পড়েছে চুপচাপ। গোপনীয় কথার ধর্মই হচ্ছে বিস্তৃতভাবে জানাজানি হওয়া—তাই এ কথাটিও বন্ধুমহলে ছড়িয়ে পড়তে বেশী দিন লাগল না। যদিও তখন ইংরেজ-নিধন-যজ্ঞে বাঙালী যুবসমাজ ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, গুলি-বোমা চলছিল চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মেদিনীপুর, কলকাতায়—তবুও কেন জানি, বন্ধুকে আমরা সেই দলভুক্ত করতে রাজী হই নি। আমরা অপরের মাইনের অঙ্কটা যেমন ডিস্‌কাউন্ট দিয়ে হিসেব করি, তেমনি অনেকেই বুঝে নিলাম, কথাটায় ভেজাল আছে। বন্ধু একটু সরল প্রকৃতির বলেই বোধ করি এ কথাটা আদৌ আমল পেল না। কেউ বিশ্বাস করল না। কিছু দিন পর এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল, তখন বোঝা গেল কলকাতার চাল মাঠে মারা গেছে।

যাই হোক, আমি আছি আমার তালে। বন্ধুর একমাথা ঝাঁকড়া চুল দেখে একদিন কেন জানি আমার ইচ্ছে হল এই ধরনের একটা ছবি তুলতে। বন্ধুকে জানালাম কথাটা। এই ব্যবস্থামত একদিন দুপুর বেলা ওদের ঘরেই জানালার মোটা শিক ধরে দাঁড় করিয়ে দিলাম বন্ধুকে। মনোমত করে তুললাম এই ছবিটি।

কিছু দিন বাদেই ঘটল এক আশ্চর্য রকমের ঘটনা।

সেদিন বিকেল বেলা বাড়িতে ফিরছি, দেখি পাশের বাড়ির ফটকে বহু লোক। কী ব্যাপার জানতে গিয়ে দেখি বাড়ির ভিতরে পুলিসের লোকজন। শুনলাম, দ্বিজেশকে ধরে নিতে এসেছে; সে নাকি এক বোমার মামলার আসামী। হতবাক হ'য়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ফটকের এক-পাশে। পুলিস বেষ্টনীতে বন্ধু ফটকের বাইরে আসবার সময় আমার চোখাচোখি হল। মাথা নেড়ে জানাল—যাই। ওর মুখে তখন হাসি ছিল, আমার ছিল না।

✻

অতীত দিনের বিবর্ণ স্মৃতিতে এ ছবি আজো স্মরণ করিয়ে দেয় ছবি তোলার পরবর্তী কাহিনী। বন্ধুর ছবি কিংবা ছবির মর্যাদা—কিছুই তেমন মনে ধরে না। মনকে শুধুই আচ্ছন্ন করে দেয় সেই ঘটনাতেই যে, আমার পরিকল্পিত ছবি শেষকালে বাস্তব রূপ নিয়েছিল। এতে বেদনা আর আনন্দের মিশ্রিত অনুভূতি জেগেছে মনে। গর্বও অনুভব করেছি, কারণ ব্রিটিশের হাতে রাজনৈতিক বন্দীরা তখন ভারতবাসীর সম্মানিত জন।

—নীরোদ রায়

(৭)

অধিক রাত্তিরে শুয়ে বেলায় ওঠার অভ্যাস মিঃ মিত্তির বহুকালের। ছেলেবেলায় এজন্য মার খেতেন বাবার কাছে। বোর্ডিং-এর প্রভুরা খেতে না দিয়ে শাস্তি দিতেন। তবু ছাড়তে পারতেন না এই স্বভাব। পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া অন্য বই হাতে নেওয়া বারণ ছিলো। বাড়িতেও তাই, বোর্ডিং-এও তাই। অথচ পড়ার নেশায় পাগল হ'য়ে যেতেন তিনি। বাড়িতে থাকতে লুকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে হোক ঢুকতেন গিয়ে পরিত্যক্ত লাইব্রেরী ঘরে, যা পেতেন তুলে নিয়ে আসতেন নির্বিচারে, লুকিয়ে রাখতেন শোবার ঘরে তোশকের তলায়, তারপর রাত্তিরে সব ঘুমুলে নিশ্চিন্ত মনে পাতা উল্টোতেন। কোনো বই বুঝতেন, কোনো বই বুঝতেন না, কিন্তু বেছে আনবেন, এমন অবকাশ হ'তো না ব'লে তারই পাতা উল্টিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হ'তো। বোর্ডিং-এও চলতো সেই লুকোচুরির খেলা। নিয়মমতো আলো নিবে গেলেও মোম জ্বালিয়ে চেষ্টা করতেন পড়ার। এই করতে করতেই রাত-জাগা অভ্যাস হ'লো। আর এই করতে করতেই বড়ো হ'য়ে উঠলেন একদিন, স্বাধীন হলেন, ইচ্ছেমতো পড়ার সুযোগ ঘটলো, এবং ঐ ঘুমের আগে পড়ার অভ্যেসটাই কায়েমী হ'য়ে গেল।

কিন্তু সেই রাত্রি আর বই হাতে নিলেন না। এমনিই চুপ ক'রে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন।

হয়তো বা বই হাতে নেননি বলেই ঘুম আসছিলো না, ছটফট করছিলেন, আজে-বাজে চিন্তা ভিড় করছিলো মাথায়। নাকি দেরি ক'রে খেয়েছেন বলে? মাথার কাছে অন্ধকারে দেখতে-পাওয়া ঘড়ির কাঁটাটা অনেকবার ঘুরলো, তবু রোজের মতো বালিশে মাথা দিয়েই তিনি নিবিড় নিদ্রায় অভিভূত হ'তে পারলেন না।
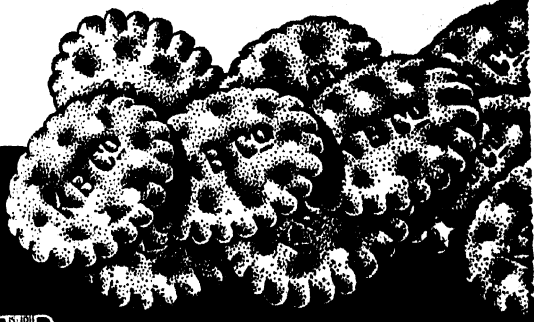
শুতে শুতেই প্রায় একটা বেজেছে, জেগে থেকে থেকে কুয়াশা রং রং রাত চারটের ভোরও দেখলেন। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিলো, মাথার উপর ফ্যান ঘুরছিলো সজোরে, পায়ের তলাকার ভাঁজ হ'য়ে পড়ে থাকা রেশমী চাদরটা গায়ে জড়ালেন। ভালো লাগছিলো। এই ভোর যেন তাঁর মায়ের স্মৃতি। যে মাকে তাঁর একটুও মনে নেই।

অতএব পরের দিন ঘুম ভাঙতে যে অনেক বেলা হ'য়ে যাবে এ তো যথাযথ কথা। এমনিতেই আটটার আগে শয্যা ছাড়েন না, সেদিন তাকিয়ে দেখলেন ন'টা বেজে তেত্রিশ। তৎক্ষণাৎ বেল টিপলেন। তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো, আজকের দিনটা তাঁর কাজে ঠাসা। বিদেশ যাবার আগে এবার তাঁকে অনেক কিছু ক'রে যেতে হচ্ছে। বিষয়-সম্পত্তির অনেক বন্দোবস্ত। এর আগে এই দায় তাঁর ছিলো না। এটা নতুন। সিংহাসনে আরোহণ করবার খেসারত। সত্যিই খেসারত। নইলে মাথার উপর এতো-দিন দু দু'টো মামলা ঝুলেছিলো কেমন ক'রে? জ্ঞাতি-গুষ্ঠীরা ভেবেছিলো তিনি অক্ষম, নিস্তেজ, উদাসীন। ঠকিয়ে নিচ্ছিলো অনেক কিছু। দু'টো ভেড়িই আত্মসাৎ ক'রে বসেছিলো। বাড়িতে আসতে দিয়েছেন ব'লে অধিকার সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছিলো। এ-সব ঠিক কচুরিপানার মতো। একটা টানলে আরো কতো এসে হাজির হয়। শুধু ভেড়ি নিয়েই মামলা জুড়েছিলেন হরিশবাবু। আস্তে আস্তে দেখা গেল, নিঃশব্দে অনেক কিছু তারা গ্রাস ক'রে বসেছে। 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন' করতে করতেও রেগে

গেলেন একদিন, দেখলেন, কখন যেন দাঁড়িয়েছেন হরিশবাবুর পাশে। খুলে বসেছেন নথিপত্র। এইবার মিটে এসেছে সব, খাবার আগে এখন বিলি-বন্দোবস্তের পালা।

চায়ের বাগান দু'টো লীজ দিয়ে যাচ্ছেন, সেই ব্যাপারে পার্টির সঙ্গে লাঞ্চ আছে সাড়ে বারোটায়। গ্র্যান্ড হোটেলে অপেক্ষা করবে তারা।

দৌড়ে এলো শায়লা, চটি এগিয়ে দিল, চা আনতে ছুটলো, পোশাক ঠিক করতে ব্যস্ত হ'লো। তিনি সোজা বাথরুমে ঢুকে গেলেন। হাত-মুখ ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে একেবারে স্নান সেরে ফিটফাট। তারপর ব্রেকফাস্ট।

বেরিয়ে যাচ্ছেলেন। বাড়ির রুগ্ন অতিথিটির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সিঁড়ির মুখ থেকে ফিরে এলেন আবার, ধীরে ধীরে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকলেন গিয়ে ও ঘরে।

আজকের দিনটা তো ভারী সুন্দর! পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরেই কথাটা মনে হ'লো তাঁর। দক্ষিণের বড়ো বড়ো জানালা দু'টো খুলে দেওয়া হয়েছে, এ পাশে পশ্চিমের জানালাও খোলা। মস্ত বাতাবী গাছটা প্রায় নুয়ে এসেছে ঘরের মধ্যে, হাত বাড়ালে পাতা ধরা যায়। যদিও বেলা এখন এগারোটা, তবু আজ রোদ স্তিমিত, হাওয়া শীতল, আকাশে কালবৈশাখীর খন্ড খন্ড মেঘের ভিড়।

তিনি তাঁর নিজের ঘরের জানালা সব সময় বন্ধ রাখেন। তাঁর ধারণা, যেহেতু এটা গ্রীষ্মকাল, সকাল থেকেই বুঝি তাপ উঠে আছে। জানালা খুললেই একেবারে সর্বনাশ। রাত্তিরে অবশ্য খুলে দেন, কিন্তু সকাল না হ'তেই শায়লা ঘরে ঢুকে ভেজিয়ে রেখে যায় সব, নইলে চোখে আলো লেগে ঘুম নষ্ট হয়। আর সেই যে ভেজিয়ে দেয়, খোলে আবার রাত্রে। তিনি আলো না জ্বাললে দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে দেখতে পান না কিছু। আটটা বাজলো কি চন্দনগন্ধ খসখস পড়ে গেল রদিকে, ভিস্তিটা এসে তিন ঘণ্টা অন্তর রে পিচকিরি দিয়ে জল ছিটোতে গলো।

তাঁর পাথরের বারান্দায়ও পর্দা পড়ে যায় সে সময়ে। কাজেই জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখা তাঁর পক্ষে প্রায় একটা নতুন দৃশ্য দেখার মতোই। বিশেষ আজকের আকাশ, যে আকাশ মেঘে মেঘে পাহাড় বানিয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীলের সমুদ্র। আর জানালার তলায় যিনি শয়ান, তিনিও ছবিটি সমাপ্ত করার পক্ষে মন্দ সহায় নন। ক্লান্তভাবে শুয়ে আছে চুপচাপ, যেন রোদ্দুরে ঝলসে-যাওয়া একমুঠো ফুল।

কিন্তু কালকের মতো এলোমেলো বিস্রস্ত নয়, পরিপাটি। মাথা আঁচড়ানো চুল লম্বা একটি বেণীতে আবদ্ধ, মুখে হালকা পাউডারের প্রলেপ, ঘরময় অডি-কোলনের মিষ্টি গন্ধ। এমনকি, পরনের শাড়ি, ব্লাউসও দোপদুরস্ত। ব্লাউসটা ঢলঢল করছে গায়ে, শাড়িটি সাদা খোলের উপর সরু কালো পাড়। দেখেই বুঝতে পারলেন এ-সব মিসেস রায়ের, নিশ্চয়ই তিনিই দিয়ে গেছেন সব। মনে মনে কৃতজ্ঞ হ'লেন।

নার্স এগিয়ে এসে জ্বরের চার্ট দেখিয়ে বললো, 'রাতটা খুব খারাপ গেছে। কেবল ভয় পেতে পেয়ে আঁতকে উঠেছেন। আমি খুব নার্ভাস বোধ করছিলাম। হার্ট পালস্, প্রেশার কিছুই স্বাভাবিক ছিলো না। ঝিকে বলেছিলুম, আপনাকে যদি একবার খবর দেয়।'

'এতো জ্বর উঠেছিলো?' চার্টটা হাতে নিয়ে প্রায় চমকে গেলেন তিনি, 'খবর দিলেন না কেন? আমার ঘরে টেলিফোনের কানেকশনও আছে।'

'তা তো আমি জানি না, তবে অসুবিধে হয়নি কিছু। ঝি গিয়ে মেট্রনকে ডেকে নিয়ে এলো, উনি ছিলেন সারা রাত।'

'ও।'

'ভোর চারটা থেকে তারপর জ্বর কমতে শুরু হ'লো। ঘুমিয়েও পড়লেন।'

'এ-সব জামা-কাপড়ও বোধ হয় মিসেস রায়ই পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'কিন্তু আরো কয়েকটা জিনিসের দরকার—'

'নিশ্চয়ই। বলুন। এক কাজ করুন, আপনি বরং একটা লিস্ট ক'রে দিন।'

'লিস্টটা কি মিসেস রায়ের কাছেই দেব?'

'বেশ তো। উনিই দেখে শুনে আনিয়ে দেবেন সব। আমি বলে দেব।'

ঘড়ির দিকে চোখ ফেললো নার্স, 'বারোটার সময় অন্য নার্স আসবে, আমার
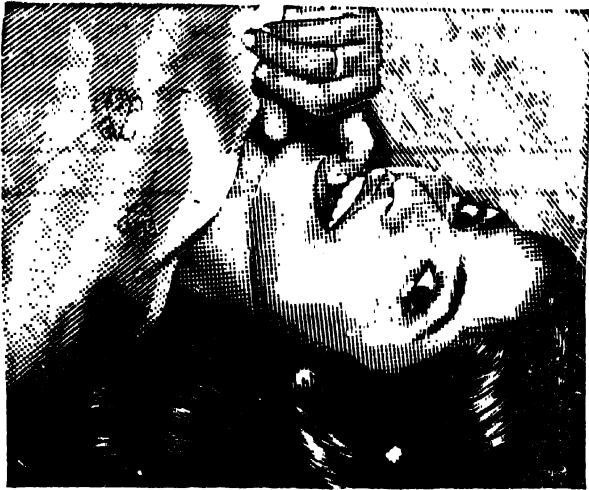
ছুটি তখন। আমাকে কি আজ রাত্তিরেও আসতে হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ডিউটির সময়টা বদলালে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'কী রকম বলুন?'

'সাধারণত আমরা আটটা থেকে আটটা করি। জরুরী দরকারেই বারোটার ডিউটিতে আসি।'

'তাই আসবেন।'

'তা হ'লে আমি আজ রাত আটটায় আসবো, সকাল আটটায় চলে যাবো। আমার পরে যে নার্স আসবেন, তাঁকেও তা হ'লে সেভাবেই ব'লে দেব।'

'তাই দেবেন।'

ঘরে তিনি রোগিণীর মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন, আস্তে কপালে হাত ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছো?'

ক্লান্ত চোখে তাকালো অতসী।

'তুমি কে?' ফিসফিস করলো সে।

'আমি?' একটু হাসলেন তিনি, 'এই একজন মানুষ।'

'তুমি মানুষ?'

'কী মনে হয়?'

'ওদের তাড়িয়ে দিয়েছ?'

'কাদের?'

'ডাক্তার এলে অসুখ থাকে না।'

'সেজন্যই তো তোমাকে ভালো ক'রে দিতে এসেছি।'

'আর ওদের?'

'ওরা কারা?'

'কারা?'

'তুমিই তো জানো।'

'দেখনি?'

'কই, না!'

'ঐ যে পালিয়ে গেল তোমাকে দেখে?'

'আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল?'

'আমার ভয় করছে।'

'কাকে? আমাকে?'

'না, ওদের।'

'ওরা কে? কেউ তো নেই এখানে।'

'উঃ! কী ভীষণ অন্ধকার।'

'অন্ধকার কোথায়?'

'অন্ধকার। অন্ধকার।'

'দিনের বেলা কখনো অন্ধকার হয়?'

'আমি অন্ধকারে ভয় পাই।'

'কী সুন্দর আলো আসছে জানালা দিয়ে, কী সুন্দর আকাশ—'

'উঃ, কী কষ্ট।'

'কোথায় কষ্ট।'

'আমাদের লণ্ঠনটা ভেঙে গেছে।'

'ভাঙুক।'

'যদি লণ্ঠনটা থাকতো, যদি লণ্ঠনটা নিয়ে যেতাম—'

'শোনো—'

'ডাক্তারবাবু—'

'ডাক্তারবাবু এখন নেই—'

'আমি আপনার পায়ে পড়ি—'

'শোনো—'

'আমি জানি আপনি ডাক্তার, আপনি খুব বড়ো ডাক্তার, আমি আপনার পায়ে পড়ি—'

'কী মুশকিল!'

'একবার চলুন, শুধু একবার, দয়া করুন।'

'শোনো, শোনো, আমি ডাক্তার নই।'

'আপনি তো একজন মানুষই, আপনি তো পাষাণ নন, কেন অস্বীকার করছেন, কেন একবার আসছেন না! আমি ওদের একলা ফেলেই শুধু আপনার জন্যই চলে এসেছি—'

'আমি সত্যিই ডাক্তার নই।'

'দয়া করুন—'

'খেয়েছ?'

'আপনি এতো সুন্দর, তবু এতো নিষ্ঠুর?'

'নিষ্ঠুর ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার নই।'

'তবে আমি কী দেখছি?'

'স্বপ্ন।'

'না।'

'তবে।'

'অন্ধকার।'

'অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না?'

'তোমাকে দেখছি।'

'আমি কি অন্ধকারের মতো?'

'আমাদের আলো নেই। কিন্তু আমি দেখলাম, যখন তুমি এলে, ওরা সব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।'

প্রহসন মন্দ নয়। শেষে মেয়েটি তাঁকেই

ত্রাণকর্তা ঠাওরালে? এসেই চলে যাবেন ভেবেছিলেন, বসলেন একটু। ওষুধ নিয়ে এলো নার্স, অতসী সবেগে আপত্তি জানালো, 'না, না, আমাকে না, আমাকে না, আমার কিছু হয়নি—'

চোখের জলে ভেসে গিয়ে মিঃ মিত্রর হাত জড়িয়ে ধরলো, 'পার্থর জন্য আপনাকে ডেকেছি। আমার মার জন্য ওষুধ এনেছি। ডাক্তারবাবু আমার বোনকেও একটু দেখুন। আপনি ওর পাটা ভালো ক'রে দিন—'

মিঃ মিত্র নার্সের দিকে তাকালেন। নার্স বললো, 'সারা রাত এই ধরনের প্রলাপ বকেছে। শুনুন,' অতসীর মুখের কাছে নিচু হ'লো সে, 'একটু হাঁ করুন তো—'

'না, না—'

'শোনো,' নার্সের হাত থেকে মিঃ মিত্র নিজের হাতে নিলেন ওষুধটা, 'লক্ষ্মী মেয়ের মতো খাও তো, তা হলে আমি তোমাদের সকলকে ভালো ক'রে দেব।'

'মাকে?'

'মাকেও দেব।'

'মালতীকে?'

'মালতীকেও দেব।'

'সবাইকে?'

'সবাইকে।'

'আমাকে?'

'তোমাকেও।'

'আমার তো কিছু হয়নি।'

'হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'অসুখ করেছে।'

'আমারও অসুখ করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে কী হবে?'

'কী আবার। ওষুধ খাও সেরে যাবে। আর এই যে দেখছো নার্স দাঁড়িয়ে আছেন, এর কথাও কিন্তু শুনতে হবে।'

'নার্স?'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তারবাবু, মার জন্য আপনি নার্সও নিয়ে এসেছেন? আপনার এতো দয়া?'

'কিন্তু তুমি যদি কথা না শোনো, ওষুধ না খাও, তা হ'লে কী হবে জানো?'

'কী।'

'আমি আর আসবো না।'

'কেন?'

'রোগীরা কথা না শুনলে ডাক্তারের রাগ হয় না?'

'হ্যাঁ।'

'তবে?'

'এবার তবে সবাই ভালো হ'য়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা ঢাকার বাড়িতে চলে যাবো?'

'নিশ্চয়ই। কথা শুনলে সব হবে।'

তবে কেন আমি হারিয়ে গেলাম? কে আমাকে বললো, ডাক্তার আনতে যাবে না? আমি তার কথা শুনলাম, আর সে আমাকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। কে? কে? কে নিয়ে গেল আমাকে?' উত্তেজনায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো কপালে, আর তারপরেই হঠাৎ উঠে বসে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'বাঁচাও, বাঁচাও!' দু' হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মিঃ মিত্রকে, একটা তাড়িত পায়রার মতো থরথর ক'রে কাঁপলো কতোক্ষণ, তারপর নিস্তেজ হ'য়ে ঢলে পড়লো।

মহিম এসে উঁকি মেরেছে ঘরে। সে জানতো না, এই সময়ে রোগীর ঘরে বিছানা আগলে বসে আছেন তার মনিব। মনিবের গতিবিধি, স্বভাব, অভ্যাস সবই তার জানা। সেই অনুসারে বরং তার ধারণা হ'য়েছিলো, কোনো রকমে আজো যদি মেয়েটা তেমনি মড়ার মতো অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকতে পারে, উচ্ছিষ্ট না ক'রেই ধুলো পায়ে তাড়াবেন তিনি। লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা কি রোগ শোক সইতে পারে? এবং সেটাই সে চাইছিলো।

খুব আশ্চর্য, কাল রাত্রে মনটা তার কেমন যেন ভার হ'য়ে ছিলো। মনের বালাই নিয়ে ভোগার রোগ তার কখনোই নেই। অথচ কাল যে কী হ'লো। আর আজই বা তার জের কাটছে কই? কেবলই মনে হচ্ছে আর যাকেই আনি, হালদার বাড়ির মেয়ে আনা আমার উচিত হয়নি। আর মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়েও যেন মায়া এসে যাচ্ছিলো। গগনের মেয়ে বলেই কি? ভাবছিলো, মনিব যদি তাড়িয়েই দেয়, শাপে বর হবে। সে নিজে গিয়ে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে ঘরে। বলবে, 'গগন, তোমার সাপও মরেছে, লাঠিও ভাঙেনি। এবার তুমি সুখে থাকো।' ক্ষিপ্ত হ'য়ে যদি মেরেই বসে দু' ঘা, মারুক। কিন্তু এই ভার থেকে তো মুক্তি পাবো? কিন্তু এ কি? এর লোভ কি এতো দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, একটা রুগ্ন মেয়েকেও ভোগ করার বাসনায় বসে আছে মাথার কাছে? আর মেয়েটাই বা কী? ভয় পেলো আমাকে দেখে আর স্বয়ং বাঘটাই যে বসে বসে থাবা চাটছে পাশে, 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে ঢুকলো গিয়ে তারই বিবরে? খাদ্য আর খাদকের এমন মহামিলন আর কে কবে দেখেছে?

বোকা মেয়ে, সরল মেয়ে, কিছু জানে না সংসারের। কিছু বোঝে না। ভদ্র চেহারা দেখে ভেবেছে সেই বাঁচাবার কর্তা। বেচারা। কিন্তু ওর এই ভুল আমার ভেঙে দেওয়া উচিত, শুধরে দেওয়া উচিত। ওকে জানানো দরকার: ওর আসল শত্রু আমি নই, এই লোকটি, এই যে ছদ্মবেশে বসে আছে বন্ধুর মতো। কিন্তু ঐ ঘোর অন্ধকারে আমাকে কাল দেখলো কখন? কেমন করে মনে রাখলো চেহারা? একটু পরেই তো অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রইলো।

কাল রাত্রের সেই ভীষণ মর্মভেদী আর্তনাদই তাকে সমানে তাড়া করে ফিরছিলো, এই মুহূর্তে আবার তার শ্রবণ দ্বিতীয় আঘাতে বিধ্বস্ত হলো।

মিঃ মিত্র 'কাকে' বলে সতোক্ষণ ফিরে তাকালেন ততোক্ষণে সে চমকে সরে গেছে, নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে দেয়ালে।

শূন্য দরজা থেকে চোখ ফিরিয়ে রোগী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তার মূর্ছাহত দেহটা সন্তর্পণে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। নার্স তাড়াতাড়ি নাড়ি টিপলো, দৌড়ে নিয়ে এলো কোরামিনের শিশিটা, খাইয়ে দিল কয়েক ফোঁটা, শংকিত গলায় বললো, 'শীগগির ডাক্তারকে খবর দিন।'

আহত মেয়েদের এই ভয়ের চেহারা কিছু নতুন নয় মিত্রসাহেবের চোখে, তাদের কম্পকাতির সঙ্গেও তাঁর মন্দ পরিচয় নেই, কিন্তু কোনো মেয়ে কারো হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাঁকেই সাগ্রহে সরল হাতে আলিঙ্গন করেছে এই অভিজ্ঞতা তাঁর নতুন। ভিতরে ভিতরে তিনি যেন একটা দায়িত্ব বোধ করলেন; দৌড়ে এসে দাঁড়ালেন টেলিফোনের কাছে। খবর পেয়ে একটু পরেই এসে গেল ডাক্তার। মূর্ছাও ভাঙলো, মাঝখান থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আর রাখা হলো না সাড়ে বারোটার সময়ে। কী করবেন বেলাটা তো রোগীর ঘরেই কাটলো।

(ক্রমশ)

খাদ্যশস্য নীতি

খাদ্যশস্য নীতি কমিটির সাম্প্রতিক একটি বিবরণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বর্তমান সমস্যার জন্য নীতির ত্রুটিজনিত নয়, গৃহীত নীতিগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতাই দায়ী। খাদ্য জাতির কাছে এখন আর সাধারণ কোনো সমস্যা হয়ে নেই, দেশের নিরাপত্তা রক্ষার মতো অতি প্রয়োজনীয় একটি জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। খাদ্যশস্য নীতি কমিটি তাই একটি জাতীয় খাদ্য বাজেট প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ সুপারিশ করেছে।

এলাকা বিভাগ ও র‍্যাশনিং ব্যবস্থার অনুমোদন

খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজ্যকে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল বা এলাকা হিসাবে গঠন করার বর্তমান নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। তার কারণ, বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিলে শস্য উদ্বৃত্ত রাজ্য থেকে ঘাটতি রাজ্যে পাঠানো হবে কিনা সন্দেহ এবং একটা বড়ো পরিমাণ শস্য লুকিয়ে ফেলা হবে চড়া দাম, ফটকা ব্যবসায় ও কৃত্রিম ভাবে অভাব সৃষ্টি করার জন্য। ফলে উদ্বৃত্ত রাজ্যসমূহে মজুতি সারা দেশের পক্ষে দুর্দশার কারণ হবে। আগামী কয়েক বছর ধরে সামগ্রিকভাবে খাদ্যের যোগানে আমাদের দেশ ঘাটতি থাকবে বলে সরকার কর্তৃক যথেষ্ট খাদ্য মজুত করার আগে এখনি আঞ্চলিক বিভাগ তুলে দেওয়া ঝুঁকির কাজ হবে।

আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে অন্তত ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের একটি ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি প্রতিটি রাজ্যে প্রধান খাদ্যশস্যের বেলা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ন্যূন পরিমাণের ফসল আদায় করা হবে। এই ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে কলের মালিক অথবা ব্যবসায়ীদের নিকট হতে শস্য আদায় করা যেতে পারে।

র‍্যাশনিং ব্যবস্থার একটি আনুষঙ্গিক দায়িত্ব হচ্ছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ। ইতিপূর্বে কৃষি মূল্য কমিশন তাই কৃষক ও চালের কলের মালিকদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতের শস্য আদায় করা অনুমোদন করেছে।

দশ লক্ষের বেশী লোকের নগরগুলিতে আইন মূলক র‍্যাশনিং এবং অন্য অঞ্চলগুলিতে পরিবর্ধিত র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু রাখার সপক্ষে খাদ্যশস্য নীতি কমিটি মত দিয়েছে। বলা হয়েছে, সেই সংগে গ্রামদেশে দরিদ্র ও জমিহীন লোকদের জন্য অধিক সংখ্যক সুলভ মূল্যের বিক্রয় কেন্দ্র খোলা দরকার। বৃহৎ নগরগুলি কৃষি অঞ্চলে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বেশীর ভাগ শোষণ করে নেয়। নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ঐ নগরগুলি একবার বেষ্টিত হলে গ্রাম অংশের জন্য আরো খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে। যে সব অঞ্চলে চাহিদার চাপ অত্যধিক সেগুলিকে অন্য যে সব অঞ্চলে ক্রয়ক্ষমতা অল্প সেই অঞ্চলসমূহ থেকে আলাদা করে রাখা বাঞ্ছনীয়।

খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের বহরের তুলনায় সরকারের বর্তমান সংগঠন ব্যবস্থা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। খাদ্য বণ্টনের বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রশাসন ও সংগঠন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও শক্তিবৃদ্ধি অপরিহার্য।

খাদ্যশস্যের মূল্য

খাদ্যশস্য নীতি কমিটি প্রস্তাব করেছে যে, সংগ্রহ মূল্য ন্যূন অবলম্বন মূল্যের ঊর্ধ্বে বেঁধে দিলে ভালো হয়। কিন্তু ব্যবসায়-সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের তেমন প্রয়োজন নেই।

এর আগে কৃষি মূল্য কমিশন সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছে। অনটনের সময় সর্বোচ্চ মূল্য যেখানে বলবৎ করা যায় না এবং উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলিতে শস্য লুকিয়ে রাখার ঝোঁক দেখা দেওয়ার ফলে শস্য সংগ্রহ দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে

পড়ে, সেখানে সর্বোচ্চ মূল্য নিরূপণের মানে হয় না।

উৎসাহবর্ধক মূল্য কি রকম হবে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা কঠিন। অনেক কিছু নির্ভর করবে উৎপাদন-ক্ষমতার মান —নিয়োজিত উৎপাদকের অনুপাতে উৎপাদনের পরিমাণের উপর, মূল্য নীতি ও অন্যান্য পন্থার মাধ্যমে এমনভাবে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সব চেয়ে বেশি ফল লাভের জন্য কৃষি কর্মে অধিকতর মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করা হয়।

দেশে যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে সে সময় খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে চাষীদের উৎসাহিত করার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। ফসল উৎপাদন বাড়াবার জন্য চাষীদের মূল্যবৃদ্ধি ছাড়া অন্যভাবে উৎসাহ দেওয়া সম্ভব। (সেই সূত্রে অবশ্য দেখা উচিত যাতে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের সঙ্গে কৃষিদ্রব্যের দামের একটা সামঞ্জস্য থাকে।) তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য সংরক্ষণ এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন, যেমন জলসেচ, জলনিকাশন, মৃত্তিকা সংরক্ষণের বন্দোবস্ত দ্বারা কৃষিকর্মের আনুষঙ্গিক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনা যায়। (সুলভে উন্নত ধরনের বীজ ও সার বণ্টনও তাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে।) সেই রকম, কৃষকদের ভেতর কারখানাজাত সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি ও সেই সব দ্রব্য যাতে উচিত দামে পাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করে দিলে তারা উৎপাদন বাড়াতে এবং বাজারে ফসল বিক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

র‍্যাশনিং শস্য সংগ্রহ, মূল্যনিয়ন্ত্রণ এ সবেরই খাদ্য সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান সম্ভব নয়। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, যথাসময়ে আবশ্যক উপকরণের যোগানের অভাব, সংগঠনের ত্রুটিবিচ্যুতি— এই সব কারণে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি গত কয়েক বছর ধরে শ্লথ হারে হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষি উৎপাদনের সূচক ১৯৬০-৬১ সালের স্তরেই ছিল। কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হলে, দেখা যাবে, কৃষি উৎপাদন গড়ে বার্ষিক শতকরা ২·৮-এর বেশী হারে বাড়েনি, যদিও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পিত হার ছিল বছরে শতকরা ৫ ভাগ। নতুন খাদ্য উৎপাদন নীতিতে একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে নিবিড় চাষ এবং সার ও অন্যান্য উপকরণের যোগান বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

গুরু রবিশঙ্কর-চেলা বিট্‌লে হ্যারিসন

সলিল ঘোষ

"জর্জ উই লাভ ইউ", "উই ওয়ান্ট জর্জ", "জর্জ উই আর ডাইং ফর ইউ" "জর্জ কাম আউট", "রবিশংকর দরজা খোলো"—ইত্যাদি ধ্বনিতে বম্বের 'গেটওয়ে অব্ ইণ্ডিয়া' মুখরিত। শত শত বালখিল্য অপ্রাপ্তবয়স্ক 'টিনেজার'-দের বেলেল্লাপনা চলছে, তাজমহল হোটেলের সামনে, আশপাশে। রাস্তা জাম। এইসব ছেলেমেয়েদের বেশীর ভাগই অবস্থাপন্ন ঘরের, সকলেই 'বিট্‌ল্ ফ্যান'। মেয়েদের সংখ্যাই বেশী, প্রায় ৯৫%। নানারকম পোশাকে ভিড় করেছে তাজের সামনে, এদের অনেকেই একেবারে নিজেদের বাড়ির গাড়ি নিয়ে এসে রাস্তা বন্ধ করে ধর্না দিয়েছে। সময় অসময় নেই, সারাদিন ধরে হল্লা লাগিয়েছে দর্শন পাবার জন্য। উপরে রাস্তার ধারের তাজের তিন-তলার রাজসিক "স্প্যানিশ স্যুইটে", ত্রাস্ত হয়ে বসে আছে, বিশ্ববিখ্যাত বিট্‌ল্ চতুষ্টয়ের অন্যতম, জর্জ হ্যারিসন, সস্ত্রীক। অত্যন্ত গোপনে বম্বেতে এসেছিলেন জর্জ, প্রেস, পাবলিক সকলকে ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু তাঁর ভক্ত 'টিনেজার' মেয়েদের কি এড়ান যায়! কোথা থেকে কে কোথায়, টের পেয়ে গেল, প্রায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই, আর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। জমে গেল ভিড়, হল্লা, হোটেলের চারিপাশে। এদের হিস্টিরিয়া, 'উহু—আহা' থেকে পার পাবার-জন্য "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়লেন পণ্ডিত রবিশংকর ও জর্জ। বড্ড বিপাকে পড়লেন দুজনে। ভক্তদের এড়িয়ে কিছু করা অসম্ভব। শুধু টিনেজার হলেও বা হত, তাদের পিতামাতারাও আসরে নেমেছেন ততক্ষণে। কোথায় তাদের পুত্র-কন্যাদের দিনরাত হোটেলের পাশে ধর্না দেবার বিরুদ্ধে চড়-চাপড় মারবেন তা নয়, উল্টে তাদের পুত্র-কন্যারা কি করে একবার বিট্‌ল্-এর দর্শন পায়, তা নিয়ে নিজেদের প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করলেন। এ একেবারে "স্টাটাস সিমবলের" ব্যাপার। মেয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবীদের কাছে বলতে পারবে জর্জের সঙ্গে করমর্দন করেছে, অটোগ্রাফ নিয়েছে বা হাতে চুমু খেয়েছে। এটা কি কম বড় কথা হল।

ইয়োরোপ আমেরিকার মত ঠিক এই ধরনের ভক্ত জর্জ এদেশে আশা করেননি। এদের বেশীর ভাগই ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সের অবস্থাপন্ন পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন পরিবারের, পার্শী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, সিন্ধী, গোয়ানীজ, খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়েরই বেশী। মারাঠী নেই বললেই চলে। এরা বিট্‌ল্ জর্জ যাঁর কাছে ভারতীয় সংগীত শিখতে এসেছে, সেই রবিশংকরকেই হয়ত জানেনা, বা তার বাজনা শোনেনি। কিন্তু বিট্‌লদের ভাল ভাবেই জানে। এতে তারা বা তাদের পিতা-মাতারা মোটেও লজ্জিত নন। এমনই এদের শিক্ষা।

জর্জ আমাকে বলেছিল—"আমি ভাবতেই পারিনি যে; এখানেও এই অবস্থার সম্মুখীন হব"। উত্তরে বলেছিলাম—"তোমরাই ত ওদের পাগল বানিয়েছ, এখন এড়ালে চলবে কেন। টিনেজাররা সর্বত্রই এক, আর তাছাড়া বম্বে বা দিল্লী ভারতবর্ষ নয়। সেজন্য এখানকার হালচাল দেখে এ দেশ সম্বন্ধে কোন ধারণা কোরো না।" জর্জ বলল—"তা ঠিক"।

এইসব ভারতীয় টিনেজাররা হয়ত আজ বিট্‌লদের মাধ্যমে ভারতীয় সংগীতের পরিচয় পাবে। এর মধ্যেই কিছু কিছু ভারতীয় বিট্‌লদের ও টিনেজারদের দেখলাম রবিশংকরের প্রোগ্রামে ভিড় করছে, এই প্রথম। কারণ এরা এতদিন খবর পেয়েছে যে ইয়োরোপের বিট্‌ল্ ভক্তরা রবিশংকরের কনসার্টে ভিড় করেছিল। আর তাছাড়া সিলোন রেডিওতে বিট্‌লদের সব আধুনিক রেকর্ড সেতারের আওয়াজে, তাও এরা শুনেছে। যাই হোক, বিদেশী বিট্‌লদের মাধ্যমে এদেশী পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন এই সব টিনেজাররা যদি দেশের সংস্কৃতির প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়, তাহলে আনন্দিত হবারই কথা।

জর্জ বম্বেতে আসেন শুক্রবার ১৬ই সেপ্টেম্বর। উদ্দেশ্য, নিরিবিলি এ দেশে কয়েকটা দিন কাটান আর পণ্ডিত রবি-শংকরের কাছে সেতারের প্রাথমিক তালিম

সেতার শিক্ষার্থী জর্জ হ্যারিসন

নিয়ে যাওয়া। সারা বিশ্বে বিট্‌ল্‌দের যে "ইমেজ্‌" হয়েছে, আসলে কিন্তু এরা ঠিক অতটা চ্যাঙড়া নয়। এই অল্পবয়সেই এরা রীতিমত সিরিয়াস প্রকৃতির, নানা বিষয় নিয়ে ভাবে, চিন্তা করে এবং ইন্‌টেলেকচুয়াল বলা চলে। অন্য তিনজনকে সাক্ষাৎ জানি না, কিন্তু জর্জকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখে, কথাবার্তা বলে, অত্যন্ত সিরিয়াস ধরনের ছেলে বলে মনে হয়েছে। নানান কারণে জর্জ বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সেতার শেখার আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়াও, ইদানীং সে ভারতীয় দর্শন, জীবনধারা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও পড়াশোনা করছে। অনেকে হয়ত এসবকে নিছক খামখেয়াল বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু জর্জ এ বিষয়ে যেরকম অধ্যবসায় নিয়ে লেগেছে, সেটাকে শুধু খামখেয়াল বলা চলে না। যদিও তা খামখেয়াল বা হুজুগ হয়, তবে সেটাও প্রশংসনীয়। এই খামখেয়ালই বা ক'জনের হয়। অন্য তিনজন বিট্‌ল্‌ কিন্তু জর্জের মত ভারত সম্বন্ধে অতটা আগ্রহী নয়।

জর্জের স্বভাবের একটা দিক বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তার সঙ্গে মেশার সময়। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, সে সম্বন্ধে আমাকে আগে বলেছিলেন। জর্জের সঙ্গে আলাপ হবার পর তা আরও ভাল বুঝতে পারলাম।

পৃথিবীর ইতিহাসে, এত অল্পবয়সে, এত অল্প সময়ে বিট্‌ল্‌দের মত খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তিও খুব কম লোকই অর্জন করতে পেরেছে। সারা বিশ্বে তারা আজ বন্দিত এবং সে বন্দনার এরকম নমুনাও পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এ ছাড়া, এই অল্পবয়সে তারা আজ লক্ষপতি। এসব সত্ত্বেও, জর্জের নম্র ও বিনয়ী স্বভাব, আন্তরিকতা, মুগ্ধ করবে যে-কোন লোককে। কোন প্রকার গরিমা নেই ব্যবহারে।

জর্জের আরও উদ্দেশ্য, সেতার শেখার সঙ্গে কোন ভাল শিক্ষকের অধীনে, যোগাসন অভ্যাস করা। কিন্তু হোটেলে যেভাবে দিনরাত সবাই বিরক্ত করা শুরু করল, এমনকি, প্রেসের লোকেরাও, যে তখন তিনি সাংবাদিকদের জানাতে বাধ্য হলেন—"আমি এখানে বিট্‌ল্‌রূপে আসিনি, ব্যক্তিগত কাজে জর্জ হ্যারিসন-রূপে এসেছি, আমাকে যদি কেউ বিরক্ত না করে তবে বাধিত হব।" এতে কিছুটা অবশ্য কাজ হ'ল। রাস্তার ধারের স্যুইট ছেড়ে, পাঁচতলার এক কোণায়, খুব নিরিবিলি এক স্যুইটের বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন হোটেল কর্তৃপক্ষ। রাস্তার টিনেজারদের গণ্ডগোল সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। এখানে একেবারে Seriously বসলেন সেতার শেখার কাজে। রবিশঙ্কর নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা সারাদিন ধরে

তাদের আরামপ্রদ বন্ধ তাপনিয়ন্ত্রিত স্যুইটের মেঝেতে ডবল-কার্পেটে বসে চলল শেখা ও শেখানোর পালা। এর আগে পর্যন্ত জর্জ নিজে নিজে এলোপাথাড়ি সেতারে স্ট্রোক দিয়েছে আর সেতার রেকর্ড শুনেছে। নিজে ভাল গীটার বাজিয়ে। এবারে একেবারে অ—আ—ক—খ থেকে আরম্ভ করলেন, জটিল ওই যন্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনে। তাঁর জন্য অত্যন্ত সাধারণ পাঁচ তারের সেতার মাঝারি সাইজের। স্বীকার করতেই হবে, জর্জের দ্রুত প্রোগ্রেস, তাঁর অধ্যবসায় ও আন্তরিকতা।

পাঞ্জাবি, পায়জামা পরিহিত, হাতে পুরোনো ধরনের ঘড়ি (হাল ফ্যাশানের নয়) আর সেই বিট্‌ল্‌ চুল নিয়ে মনে মনে সারেগামা আউড়ে চলছে তার সেতার শেখার পালা ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর ২৪ বছর বয়সের তুলনায়, কম বয়সের বলেই মনে হয়। সামান্য গোঁপ, দাড়ির কোন চিহ্ন নেই এবং চোয়াড়ে গাল, মাথা "মপ-চুলে" ঢাকা। সেতার বাজানর জন্য তাঁর মিজরাফ্‌ রঙীন প্লাসটিকের সরু টিউব দিয়ে মোড়া, যাতে হাতে না লাগে বা না কেটে যায়। সেতার বাজানর বসার ভঙ্গী প্রায় আয়ত্ত ক'রে এনেছেন, যদিও ডান পা-টা পুরোপুরি গুটিয়ে রাখতে অসুবিধা বোধ করেন। বেশ কিছুক্ষণ বাজানর পর, দুটো পা'কে সোজা ছড়িয়ে হাঁটু ঝাঁকাতে শুরু করেন, রক্ত চলাচলের জন্য। জর্জের লম্বা লম্বা মোটা আঙুল। এখনও আড়ষ্টতা ভাঙেনি অঙ্গুলি সঞ্চালনে। শরীরকে ভারতীয়দের মত আরও নমনীয় করার জন্য যোগাসন অভ্যাসও আরম্ভ করেছে জর্জ, বিশেষজ্ঞের নির্দেশে। গুরু রবিশংকর সেতারের প্রাথমিক নানান গৎ ইত্যাদি ইংরেজীতে খাতায় লিখে দিয়েছেন, সেই মত জর্জ বাজিয়ে অভ্যাস করে। আবার অনেক সময় রবিশঙ্কর কিছু বাজান, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে তা সেতারে তোলে এবং জর্জ নিজে যদিও বলেছেন যে, রবিশঙ্করের মত সেতার বাজাতে তাঁর ৩০।৪০ বছর লাগবে, কিন্তু রবিশঙ্করের ছাত্র, যে জর্জকে বহু সময় তালিম দিচ্ছে, সে বলল, জর্জ যদি এভাবে অভ্যাস করে, তবে পাঁচ বছর বাদে, সেতারী-রূপে আসরে বাজাতে পারবে।

জর্জ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, এ দেশ সম্বন্ধে কতকগুলো ভাসা-ভাসা প্রথম দর্শনের ধারণা ব্যক্ত করলেন, যার সম্পর্কে তাঁর সঠিক কোন জ্ঞান নেই। প্রথমত, "এ দেশের লোকেরা, তাঁদের নিজেদের মহান, বিরাট ও বিচিত্র সংস্কৃতির প্রতি তেমনভাবে সচেতন নয়, এমনকি, সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। তা না হ'লে এ দেশের লোকেরা রবিশঙ্করের মত শিল্পীর পিছনে না ঘুরে, আমার জন্য ধর্না দিত না।" এই সমস্যাটা ঠিক সোজাভাবে বলা যায় না। সর্বদেশেই এক অবস্থা, ভারতবর্ষ এর থেকে কোন বাদ নয়। আর বম্বেতে যারা ওর জন্য চেঁচামেচি করেছে, তারাও ভারতের প্রতিনিধি নয়। এ ছাড়া, সর্বক্ষেত্রে "পপ" শিল্পীদের জনপ্রিয়তা আর একজন ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতধর্মী শিল্পীর জনপ্রিয়তার পার্থক্য থাকবে। একজন রাজকাপুর বা সিয়ান কোনারী (জেমস বণ্ড)কে দেখতে যা ভিড় হবে, এলিয়া কাজান বা ফেলিনিকে দেখতে সে ভিড় হবে না।

জর্জ আরও বলেছিল—"শহরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে, অনেক জায়গায় দেখলাম, রাস্তার ধারে ফুটপাথে সব ঝোপড়া বানিয়ে অত্যন্ত নোংরাভাবে লোকেরা বাইরে থেকে এসে বাস করছে।

শহরে তাদের থাকার স্থান নেই। অথচ এরা ত শহরের বাইরে ফাঁকা স্থানে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশেও থাকতে পারত, ঝোপড়া বানিয়ে। তা না করে শহরে এসে এভাবে কেন বাস করছে।" এখানেও সমস্যাটা সে বুঝতে পারে নি। বাইরে যদি তারা থাকতে পারত তবে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে কেন? শহরের বাইরে বা গ্রামাঞ্চলে জীবিকার্জনের অসুবিধার জন্যই এরা শহরে চলে আসে। এখানে জীবিকার্জনে অনেক সুবিধা। যে কোন উপায়ে, যে কোন কাজ করে দিন গুজরান করা চলে, যা বাইরে হয় না। তাই বাসস্থান না থাকা সত্ত্বেও এরা শহরে এসে ভিড় জমায়। জর্জ বুঝল। বিদেশীদের কাছে "ভারতবর্ষ একটি বিরাট পায়খানা", সে প্রশ্নটিও জর্জের মনে জেগেছে।

রবিশঙ্কর ও জর্জ সেতার নিয়ে ব্যস্ত। আমি শুধু এক কোণায় বসে দেখছি, গুরু আর অভিনব শিষ্যের আদান-প্রদান। আর কেউ নেই স্যুইটে। জর্জের স্ত্রী প্যাটী (প্যাট্রিসিয়া বয়েড) গেছেন বাজারে কেনা-কাটা করতে। কিন্তু জর্জের সেতার শেখার সাধনা নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ফোন ত আসছেই একটার পর একটা। আমাকেও মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে, একটার পর একটা। কোথাও বলছি "গুরু-শিষ্য আজ সোনাভালা বেড়াতে গেছেন।" কেউ বলছে, 'লণ্ডন থেকে ট্রাঙ্ককল করছি আমি, আবার কেউ বলছে "আমি পণ্ডিতজীর স্ত্রী কথা বলছি।" এরই মধ্যে হোটেলের বয়-বেয়ারার মাধ্যমে আসছে কার্ড অটোগ্রাফের জন্য। এ-ছাড়া, আবার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মাধ্যমে কোন গণ্যমান্য লোকও এসে হাজির হলেন, নিমন্ত্রণ করতে লাঞ্চে, বেড়ানতে, কিম্বা ব্যবসায়িক কোন "সেল্‌স্ গিমিক্"-এর উদ্দেশ্যে। রেকর্ড বিক্রির কথা নিয়েও কেউ এসেছিল। "তোমার যদি কখনও 'রিল্যাক্স্' করার ইচ্ছা হয় তো বোলো। আমি ফ্যানদের কাছে, অটোগ্রাফ রেকর্ড বিক্রির আয়োজন করব তোমার জন্য।" জর্জ একটু বিরক্ত ভাব নিয়ে বলেছিল—"দেখ, আমি নিজের কাজে এখানে এসেছি, তোমার রেকর্ড বিক্রি করে রিল্যাকস করতে আসি নি।" এরই মধ্যে আবার হোটেলের পাবলিক রিলেশন অফিসারও দুটি মেয়েকে নিয়ে ফটোগ্রাফ নিয়ে গেল আর অনেক বাক্‌তাল্লা মেরে গেল। জর্জ 'ওবলাইজ' করল ওদের পরে চোখ টিপে আমাদের বলল—"এই লোকটা মন্দ না।"

এই বিট্‌লদের সেতার শেখানর ব্যাপার নিয়ে রবিশঙ্করকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেকে বলেছে, এই "নভিস" বিট্‌লকে নিয়ে, সেতার শেখানর এত মাতামাতি কেন? অন্য কোন সুযোগ্য ছাত্রের জন্য রবিশঙ্কর কি এত সময় দিতেন? রবিশঙ্কর ঠিক সেভাবে ব্যাপারটা দেখছেন না। সেতার সঙ্গীতের বিষয়ে জর্জের আন্তরিক আগ্রহ রবিশঙ্করকে খুবই মুগ্ধ করেছে এবং তিনি কোন প্রকার গুরুদক্ষিণা না নিয়েই জর্জকে সেতার শেখাচ্ছেন। আজ ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ভারতীয় সঙ্গীত, বিশেষ করে সেতারের যে জনপ্রিয়তা তাতে [illegible]করের মত শিল্পীর কৃতিত্ব প্রচুর। [illegible] দেশের শ্রোতাদের কাছেও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, এতকাল এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু রবিশঙ্কর আজ তাকে এমন কি "পপ-সঙ্গীতে"র শ্রোতাদের কাছেও জনপ্রিয় করতে পেরেছেন, প্রচার করে তাদের আগ্রহী করতে পেরেছেন, এটা ভারতীয়দের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা এবং তাঁর পক্ষে খুবই কৃতিত্বের। আর "পপ-সঙ্গীতের পোপ"রা মানে বিট্‌ল্, রোলিং স্টোন, ইয়ারবার্ড দলগুলি যখন এই নিয়ে আজ চর্চা করতে চাইছে, সেটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার অপরদিকে, এদেশে অনেকে এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন বিট্‌ল্‌দের ভারতীয় সঙ্গীত বা সেতারে এই আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমরা কৃতার্থ হলাম, আমাদের সঙ্গীত কৃতার্থ হল, রবিশঙ্কর কৃতার্থ হল। সে রকম ভাবটাও কোন কাজের কথা নয়। কোন দিকেই বাড়া-বাড়ি হওয়াটা ঠিক নয়। যা কিছুটা হয়েছে এর মধ্যেই।

জর্জকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"হঠাৎ তুমি রবিশঙ্করের প্রতি কিভাবে প্রথম আকৃষ্ট হলে?" তার উত্তরে জর্জ যা বলল তাতে মনে পড়ল, পাশ্চাত্য সিম্ফনী অর্কেস্ট্রার একজন ভারতীয় সমঝদারের সংগে কয়েক বছর আগে আমার এক তর্ক।

ভিয়েনা ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা বম্বেতে এসেছে, প্রায় ১০০জন শিল্পী, বিশ্ববিখ্যাত কনডাকটর ভন কারায়ান তা পরিচালনা করলেন। শুনেছিলাম এ অনুষ্ঠান, ভালও লেগেছিল, পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও। পরদিন পরিহাসচ্ছলে বলেছিলাম, পাশ্চাত্য সংগীতের সমঝদারটিকে চটানর জন্য—অর্কেস্ট্রা শুনতে শুনতে আমার কি মনে হয়েছিল জান? ১০০জন শিল্পী, অতসব যন্ত্র নিয়ে, অতবড় সংগীতজ্ঞের নির্দেশে সংগীতের যে 'টোটাল' এফেকট আনল, সেই এফেকট আমাদের ভারতীয় সামান্য একটি সেতার যন্ত্রে রবিশঙ্কর আনতে পারে একলা।"—চটে গিয়েছিল বন্ধুটি—"ননসেনস—তোমাদের সব চীপ ন্যাশনাল প্রাইড, কিছু না বুঝে।" কিন্তু জর্জের কথায় আমার উক্তির কিছুটা সমর্থন পেলাম।

জর্জ বলেছিল আমাকে—"আমার এক বন্ধু রবিশঙ্করের বাজনা শুনেছিল, সে প্রথম তার কথা আমাকে বলে এবং আমি সে শুনে তাঁর একটা রেকর্ড কিনি। রেকর্ডে সেতার বাজনা শুনে আমার খুব ভাল লাগে। তারপর একটার পর একটা, তাঁর যত রেকর্ড ছিল সব কিনে, সদাসর্বদা শুনতাম আর ততই সেতারের প্রতি আমার মোহ জন্মে যেত। পরে সাক্ষাতে রবিশঙ্করের বাজনা যখন শুনলাম, আমি একেবারে 'ফ্ল্যাট্'—এ রকম "টোট্যাল মিউজিক"-এর আস্বাদ ওর সেতারের আলাপে যা পেলাম সে রকম উপলব্ধি আমার আগে কখনও ঘটে নি। আমি তখনই স্থির করলাম, ওই যন্ত্র আমি শিখব এবং তাঁর কাছেই।" এবং এরই ফলে, এত দূরে দেশে বিশেষভাবে আসা।

ভারতের টিপিক্যাল উচ্চাঙ্গ সংগীত-এর আসরের পরিচয় পেলেন জর্জ, ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রে। বম্বের শহরতলি সান্তা-ক্রুজের সংগীতচক্র "সুবারবান মিউজিক সার্কেলে" রবিশংকরের অনুষ্ঠান ছিল, সারা রাত ধরে। ৩০০জন সভ্যের বসার উপযোগী একটা সাধারণ হলে, ৫০০ জনের ঠাসাঠাসি, মেঝেতে বসে। সর্বদা যা হয়। রবিশঙ্কর, কৌশিকী কানাড়া রাগের ওপরে খাম্বাজ দিয়ে শুরু করলেন—জমজমাট আসর, শ্রোতাদের সবাই সমঝদার। সস্ত্রীক জর্জ সারারাত সামনে বসে অন্যদের সংগে এই বাজনা শুনলেন। জর্জ-এর এই আসরে আসা একেবারে গোপন ছিল, তাই টিনেজাররা রাত্রে আর হামলা করতে পারে নি। আল্লারাখার সংগত তবলাবাদন আরও উন্নত ধরনের আজকাল হয়েছে, মোলায়েম অনেক 'ম্যাচিওর্'। এই জলসার কোন তুলনা ছিল না। রবিশঙ্করও জর্জকে সেদিন প্রাণ-ভরে শোনালেন সেতার যন্ত্রের নানান বৈচিত্র্য। ওই একটি যন্ত্রের দ্বারা তিনি কত রকমের কত কি যে কাজ দেখালেন, তা অপূর্ব এবং অন্য কোন শিল্পী তা আজ পর্যন্ত করতে পারে নি। সেতার বাজে এই সব নানান রকম কাজের বৈচিত্র্য আনার জন্য এই যন্ত্রের সম্ভাবনা আরও বিস্তারিত করার জন্য তাঁকে সমালোচনারও সম্মুখীনও হতে হয়েছে। অনেকে বলেন যে, তিনি সেতার-যন্ত্রের বাজ নষ্ট করে দিচ্ছেন। কিন্তু তার বাজনা শুনলে এই সমালোচনা যে ঠিক নয় তা বোঝা যাবে।

জর্জ আরও কয়েকটা দিন এদেশে থেকে দু-চার স্থান ঘুরে, অজন্তা-এল্লোরা দেখে নিজের দেশে ফিরে যাবেন। এর মধ্যে রবি-শংকরও আবার বিদেশে যাচ্ছেন, ইউ-নেসকোর আমন্ত্রণে আর বি বি সির টেলিভিশনের এলিস ইন ওয়ানডারল্যানড"-এর সংগীত-রচনায়।

আশা করব রবিশঙ্কর আর জর্জের "যুগলবন্দী" একদিন শুনব। ক্ল্যাসিক্যাল আর পপ সংগীত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের সমন্বয় একদিন ঘটবে। সব এক হয়ে যাবে। আর শেষ কালে এটাও স্বীকার করব যে বম্বের টিনেজাররা প্রথম ২।৩ দিন উৎসাহ-আধিক্যবশত কিছু গণ্ডগোল করলেও পরে স্বাভাবিক ব্যবহার করেছে। জর্জকে নিয়ে আর কোন মাতামাতি হয় নি। অনেকের মতে এখানে প্রথমদিকে যা হইচই হয়েছে তা রবিশঙ্কর ও বিটলসদের প্রচার

জয় দিয়ে প্রতিবার স্নানের পর…

আপনার ত্বক আরও কোমল, মসৃণ ও কমনীয় হয়ে ওঠে।
চামেলীর সুগন্ধযুক্ত জয়!

জয় সৌন্দর্য্য সাবান আপনার শরীরের প্রতি রোমকূপ পরিষ্কার ক'রে আপনার ত্বকে অপরূপ কমনীয়তা এনে দেয়। জয় দিয়ে প্রতিবার স্নানের পর আপনার ত্বক আরও কোমল, মসৃণ ও কমনীয় হয়ে ওঠে। চামেলীর অপরূপ সুগন্ধ জয় সাবানে শেষ পর্য্যন্ত ঘিরে থাকে…বিশেষ ফয়েল মোড়কে প্যাক করা ব'লে।

কোমল লাবণ্যের জন্য —

জয়
সৌন্দর্য্য সাবান

টাটার তৈরী

Bensons/I-TJS-107 Ben

শিশু পরিচর্যা

মহাতীর্থ

অনেক দিনের আশা ছিল, মাদার টেরেসাকে দেখবো। দেখেছি তাঁকে। তবে পথ চলতে, আর্তের পাশে সেবার মূর্তিতে, অক্লান্ত মহিমার ঝলকটুকুতে মন ভরেনি। ভেবেছিলাম আরও একটু সুযোগ, আরও একটু সময় কি করে পাওয়া যায়। বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা বলতেন, লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে একটু এগিয়ে যাও, যাকে জিজ্ঞাসা করবে সেই বলে দেবে মাদার টেরেসার ঠিকানা। কথা কিন্তু ঠিক নয়। মাদার টেরেসা কি এক জায়গায় থাকেন? সারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে যেখানে দুঃখ দৈন্য নিরাশা, মাদার যে তাঁর 'নির্মল হৃদয়' সেখানেই পেতে দিতে ছুটে যান। তবে মাদারের প্রসাদী নির্মাল্য দেখে এলাম সেদিন নির্মলা শিশুভবনে।

পর পর না হ'লেও কাছাকাছি তিনখানা বাড়ি। মাদারের আড়ম্বরহীন অফিস, স্কুল আর তারপর নির্মলা শিশুসদন। জোড়া গির্জার প্রায় উল্টো দিকে বললেই চলে। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, দরজায় সকালে বিকেলে কত লোক জমা হয়ে আছে। তারা শিশুভবনের কেউ নয়। অনাথ দরিদ্র আসে, অঞ্জলি ভরে খাবার নিয়ে যায়, দুধ নিয়ে যায় শিশুর জন্য।

প্রথমে আমরা শিশুভবনে ঢুকিনি। মাদার টেরেসার সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী সহকর্মীরা ছাড়াও সাহায্যকারিণী আছেন। শ্রীমতী মণিকা ঘোষ তাঁদের একজন। শ্রীমতী ঘোষের সঙ্গে অফিস-বাড়ির দরজায় পা দিতেই আন্তোনিয়ার সঙ্গে দেখা। আন্তোনিয়ার আর এক নাম সুখী। সুখী এককালে ছিলেন সুখী গৃহিণী। ঢাকার হাসনাবাদে বাড়ি। দেশ বিভাগের পর কলকাতায় এসেছিলেন দুটি মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে। এনটালির সেন্ট মেরি স্কুলে মেয়েরা পড়াশুনো আরম্ভ করলো আর সুখীর সুখের সংসার নূতন মাটিতে নূতন করে গড়ে উঠলো। কিন্তু সুখীর স্বামী মারা গেলেন কিছুদিন পরে। তারপর দুই মেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে মাদারের মিশনারিজ অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছে। সুখী সন্ন্যাসিনী নয়, কিন্তু সন্ন্যাসিনীদের "মাসিমা"। মাসিমার ভূমিকায় আন্তোনিয়া আবার সুখ খুঁজে পেয়েছে। বয়স হয়েছে, সামনের একটা ভাঙ্গা দাঁত নিয়ে কি সুন্দর হাসি হেসে যে সুখী মাসিমা আমাদের আপ্যায়িত করে ডেকে নিলেন তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমার নেই। মাদার কি হাসতেও শেখান সবাইকে?

গাদা গাদা ওষুধ, গুঁড়ো দুধ, কাপড় জামা বস্তাবন্দী হয়ে অঙ্গনে জমা করা আছে। ছাপ দেখলাম যে কত দেশ-বিদেশের তার ঠিকানা নেই। তারই এক পাশে আবার মাসিমা ছোলা রোদে দিয়েছেন। ভেঙ্গে ডাল করা হবে।

অফিস-বাড়ি থেকে অল্প দূরেই শিশুভবন। শিশুভবনে ঢুকতেই দেখি একটি ছোট ছেলেকে জোর করে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হ'চ্ছে। ছেলেটি সমানে চীৎকার করে কাঁদছে। মনটা দমে গেল। কি হয়েছে এই শিশুর, কে জানে। সিস্টার সামনেই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ছেলেটি কোনও বয়েজ হোমে থাকতো। অসুস্থ হওয়ায় হোমের ফাদার তাকে শিশু-ভবনে পাঠিয়ে দেন সেবার জন্য। এখন সে সুস্থ হয়েছে কিন্তু ভবনকে সে ভালবেসে ফেলেছে। ভবন ছেড়ে যেতে তার ঘোরতর আপত্তি।

এক কোনায় বসেছিল আনমনা একটি মা। কোলে তার দিন কয়েকের শিশু। সঙ্গিনী বুঝিয়ে বললেন, মেয়েটির মাথার ছিট আছে। স্বামী তাকে ঘরে নেয় না। শিশুপালনের ক্ষমতা নেই মেয়েটির, তাই এসেছে সে তাকে মাদারের আশ্রমে। আমরা নেহাত সাধারণ মানুষ। শ্রীমতী ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর কি এ কথা বিশ্বাস হয়? শ্রীমতী ঘোষ বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাস আমাদের আওতার বাইরে। মাদার বলেন, যে শিশুর গৃহ নেই,

আর্থার (শ্রীমতী ঘোষ-এর কোলে)

শিশুর মেলা

একবার বা ছুটে যাচ্ছেন কোনও অসুস্থ শিশুর কি প্রয়োজন তাই দেখতে।

আর একটু বড় শিশুরা আছে পাশের ঘরে। তাদের গতি অবাধ, এ বয়স অভিযানের আনন্দে ভরা। আমরা যে দেখতে তাই অভিযাত্রী-দল এগিয়ে এসেছে। খোকন ভাল করে কথা বলতে পারে না। বারে বারে হাত তুলে নমস্কার করে বলছিল 'মাসিমা দিদি' আসুন। আপন তার কেউ নেই। আত্মীয়তার সম্বোধনগুলি তার মুখে তাই দুটোই এক। আবার কারও বা মুখে খই ফুটছে, কত খবরই না এক মুহূর্তে জানিয়ে দিল। মালতী ভাল করে ছাটতে পারে না। তবু সেও এসে যোগ দিয়েছে। বেচারা মানিক এক কোণে চুপটি করে খাটে বসে পা দোলাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, সে খেয়েছে কিনা। মুখটি ছোট করে উত্তর দিল, "ম্যায় বিমার হু।"

আরও একটু বড়র দল বেশ গুছিয়ে একটি ঘরে থাকে। তারা অনেক কাজে সাহায্য করে, পড়াশুনো করে। আগামী দিনের জীবিকায় উপযুক্ত হবার তাদের

আশ্রয় নেই, সেই পাবে আশ্রয়। সে কিভাবে এসেছে, সে প্রশ্ন অবান্তর।

সিঁড়ির দেওয়ালে শিশুর ক্রমবিকাশের ছবি সব টাঙানো। কি বয়সে স্বাভাবিক শিশুর কি করা উচিত তারই বর্ণনা। ভবনের শিশুদের অনেকেই ব্যতিক্রম। তাদের কেউবা জড়বুদ্ধি আবার কেউ প্রতিভার পূর্বলক্ষণে ঝলমল করছে, কেউ বা বিকলাঙ্গ, কেউ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। প্রথম ঘরখানাতে থাকে সব-চেয়ে ছোট শিশুর দল। ঠিক যেন সাজানো বাগান। সামনেই চারপাশে রেলিং তোলা ছোট্ট বিছানায় হাত পা নেড়ে খেলা করছে আর্থার। কি নরম তুলতুলে হাসিতে মুখভরা ছেলে! আর্থার সম্পূর্ণ অনাথ নয়। তার বাবা নেই কিন্তু মা আছেন। ছেলে মানুষ করবার ক্ষমতা নেই বলে আর্থার এসেছে শিশুভবনে। মাস চারেক হবে মাত্র তার বয়স। কোনও খাটে বা দু' দিনের শিশু, কোথাও চার দিনের, এমনি করে সব শুয়ে আছে সারি সারি। বোতলের দুধও যেন খেতে পারে না, তাকে ড্রপার দিয়ে ফোটা ফোটা করে মুখে দুধ দেওয়া হয়। শিশু মহারাজ বা বেবি কিং কথাটি যে কত দূর খাঁটি তা উপলব্ধি হয় এই শিশু-মহলে এসে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে প্রত্যেকটি শিশু কেবলমাত্র অবোধ উপলব্ধিবিহীন জীবনের প্রথম অবস্থা নয়। একটিকে দেখলাম গালে ফোড়া হয়েছে বলে দুই দিকে মলমের উপর স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। শিশুর মোটেই সেটা পছন্দ নয়, রাগে সে গর্জন করে চলেছে সিংহশাবকের মত। ভবনের ভারপ্রাপ্ত সিস্টার লুর্ড একবার দুধের বোতল মুখে ধরছেন কারও কাছে,

নিশ্চিন্ত আশ্রয়

প্রভৃতি। দুরন্ত শিশুর মেলায় সাহায্য করতে বাইরের অনেক মেয়েও আসে। অন্য কাজের হয়তো সুযোগ নেই, নেই তাদের দু-বেলা খাবার সংস্থান। তারা নানা কাজে সাহায্য করে খেতে পায়, পারিশ্রমিক পায়। বিপথে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, ঘর যাদের হয়েছে পর তাদেরও ফিরে যাবার, অন্ন-সংস্থান করবার সুযোগ আছে মাদার টেরেসার অন্তহীন আশ্রয়ে।

কতরকমের খেলনা চারদিকে রাখা। বাচ্চাদের জামা-কাপড় এত পরিচ্ছন্ন, বিছানার চাদরটি পর্যন্ত তক্‌তক্‌ করছে। পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষত ধর্মের ইতিহাসে শিশুর প্রতি কর্তব্যের বহু নির্দেশ আছে, বহু আখ্যানও শুনেছি। সক্রেটিসের গ্রীসে অনাথ শিশুর দায়িত্ব গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, ইহুদী ধর্মে গৃহহীন শিশুর পালন ধর্মব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। আধুনিক সভ্যতায় বহু দেশে বহুবার শিশুর প্রতি দায়িত্বের 'চার্টার' নিয়ে চর্চা চলেছে। মানুষের অধিকার বা Human Rights-এর সর্বজনীন ঘোষণায় ইউনাইটেড নেশনস্ দাবি করেছে সকল শিশুর সমান সামাজিক সুরক্ষা, "all children, whether in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection" (article 25, section 2) কিন্তু কতটুকু সার্থকতা সম্ভব হয়েছে বাস্তব জীবনে? পৃথিবীর বহু দেশেই স্বাভাবিক আশ্রয়বঞ্চিত শিশু আজও সারা জীবন বঞ্চনার বোঝা বয়ে হারিয়ে যায় সীমাহীন দুঃখের অন্ধকারে অথবা তারা হয়ে ওঠে সমাজের বোঝা। কখনও বা প্রতিশোধ নেয় উপেক্ষিত, অনিশ্চিত জীবনের। হয়ে ওঠে সমাজবিরোধী ও দুর্দান্ত। অর্থনৈতিক কারণে যেখানে সাধারণের জীবনই বিড়ম্বিত তাদের সমস্যা যে আরও কঠিন হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই মাদার টেরেসার শিশুভবন দেখে ভাবছিলাম আরও কত হয়তো শিশু-দল হারিয়ে যাচ্ছে, আমরা জানতেও পারি না।

শ্রীমতী ঘোষের কাছে শুনলাম, অনাথ শিশুদের মধ্যে অনেককে দত্তক দেওয়া হয়েছে। ভারতের বাইরে ও ভারতে এ পর্যন্ত ১৮৪টি শিশু দত্তক হিসাবে বিভিন্ন সংসারে মা-বাবা পেয়েছে। মাদার টেরেসার এই বিরাট শিশুর দলের কারও যদি প্রতি-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কেউ চান, তবে ৬।৭ বছরের একটি শিশুর শিক্ষাভার বছর দশেকের জন্য নিতে পারেন। এই দশ বছরে সে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। মাত্র ২৫্ মাসে খরচ। কোনও বোর্ডিং স্কুলে এই খরচায় পড়ানো সম্ভব নয়। এ কেবলমাত্র মাদারের ছেলেমেয়েদের জন্য সব স্কুল-কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থা। ৬।৭ বছরের ছেলেমেয়ে বছর দশেকে স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারে, অথবা অন্য কোনও অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে। শিশুর ধর্ম-শিক্ষা সম্বন্ধে তার পালক পিতামাতা নির্দেশ দিতে পারেন। বিশেষ নির্দেশ না থাকলে মাদার টেরেসার আশ্রমের উপযুক্ত শিক্ষাই সে পাবে। পালক পিতামাতা স্কুল থেকে নিয়মিত প্রগ্রেস রিপোর্ট পাবেন। মাদার টেরেসার সহকর্মী সন্ন্যাসিনীরা এই ছেলেমেয়েদের উপর নজর রাখেন, মাঝে মাঝে দেখে আসেন। ছুটিতে তারা শিশুভবনে আসে। কোনও ছোট্ট শিশুর খরচ যদি কেউ দিতে চান, তবে সে টাকা ব্যাংকে জমা করে রাখা হয়, যত দিন না সে শিশু স্কুলে যাবার যোগ্য হয়। যদি কোনও শিশু লেখাপড়ায় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে তাকে হাতের কাজ শেখানো হয়।

যদি কেউ কোন শিশুর ব্যয়ভার বহন করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। ঠিকানা : মিশনরিজ অব চ্যারিটি, ৫৪-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা ১৬। দরখাস্তের উত্তরে শিশুর সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর এবং তার ছবি পাঠানো হবে। এই খবরের নকল থাকবে সঙ্গে। একটি কাগজে পালক পিতা বা মাতা সই করবেন ও শিশুভবনে ফেরত পাঠাবেন। শিশুমঙ্গল তহবিল বা Child Welfare Fund-এর টাকা জমা হয় ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক, ৩১নং চৌরঙ্গীতে। অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪৭১০৪৬।

শিশুর প্রতি ভালবাসার দান এ পর্যন্ত যা এসেছে, শিশুর সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দান অনেক সময় স্বল্পবিত্তের সামান্য আয়ের মহান ত্যাগ। অল্প দিন আগে একটি বিদেশিনী জানিয়েছেন, তাঁর অঙ্গরাগ ব্যবহার বন্ধ করে মাসে ২৫্ টাকা দিতে চান। ভালবাসার দানের এই ত্যাগটুকু ভালবাসা ও দানকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলে।

মাসে ২৫্ টাকায় বদলে, বছরে ৩০০্ কেউ ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। সম্ভবস্থলে ১০ বছরের ৩,০০০্ টাকাও একসঙ্গে এসেছে।

এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে বা কোনও বিস্তারিত বিবরণ পাবার আগ্রহ কারও থাকলে শ্রীমতী মণিকা ঘোষ, ৪নং রবিনসন স্ট্রীট, কলকাতা ১৬—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। শ্রীমতী ঘোষের টেলিফোন নম্বর ৪৪-৪২৮৭।
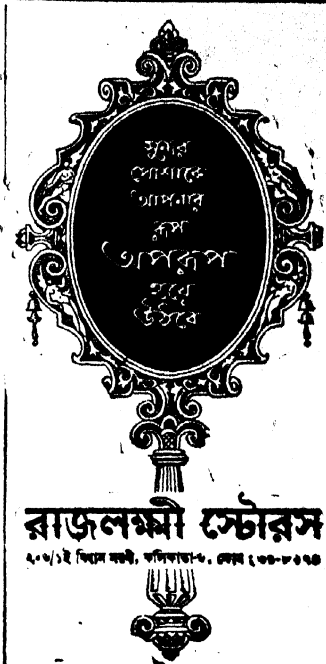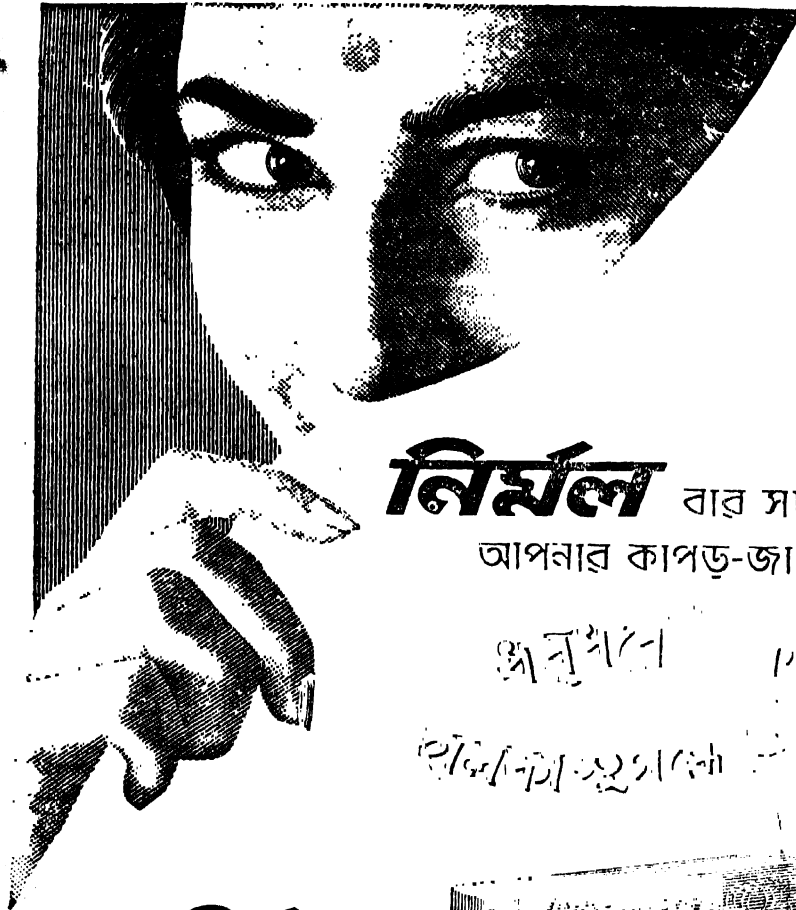
শ্রীমতী

নির্মল

বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে ওঠে।

নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়শুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে। নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

নির্মল

পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই কাটতিতে সবার ওপরে.

নতুন দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশন

দিল্লির ডায়েরি

পাঁচকুইয়া রোড়ের পাশে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বাহুল্যবর্জিত, যেন মিশনের সন্ন্যাসীদের মতই। আর প্রতিদিন ওখানে আসেন অনেক নরনারী ও বালক-বালিকা। কেউ ধর্মশিক্ষার জন্যে, কেউ মানসিক শান্তি-লাভের আশায়, কেউ অধ্যাত্মমূলক ও দার্শনিক আলোচনার জন্যে। আরো অনেকে উপাসনা ও পুজোর জন্যে।

ঐ পরিবেশের অন্তর্গত মিশনের অফিস-বাড়ি, যার সামনেটা বাগানবিলাস লতায় সাজানো। ছোট্ট একটি কোঠায় আলাপ করছিলাম মিশনের সচিব স্বামী স্বাহানন্দের সঙ্গে। আমি তাঁকে প্রথম আমার একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বলি, মাদ্রাজ শহরে। কয়েক বছর আগে, একদিন দুপুরে, মাদ্রাজের বাসে যাচ্ছি। বসার জায়গা ছিল না। আরো ১০।১২ জনের মতো লোহার ডান্ডা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার হাঁটুর কাছাকাছি বসে আছেন কয়েকজন। হঠাৎ তাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ইংরেজীতে বললেন, আমি বাঙালী কিনা, বাঙলা দেশ থেকে এসেছি কিনা। উত্তর দিলাম, আমি বাঙালী ও এসেছি বাঙলা দেশ থেকে। (একই সঙ্গে মনের পেছনে একটা দুশ্চিন্তা চলছিল: কি রে বাবা, বাস্ থেকে নামিয়ে দেবে নাকি? এখানেও কি বাঙাল খেদাও?) উনি বললেন: "আপনি আমার জায়গাটায় বসুন।" বলে আঙুল দিয়ে স্থানটি দেখিয়ে দিলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত, উনি আমার চাইতে বয়সে বেশী, আর আমার কোনো কষ্টও হচ্ছিল না। ধন্যবাদ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। উনি কিছুতেই শুনবেন না। তারপর বললেন: "ইউ সি, আপনি হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের দেশের লোক। আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে পারি না। আপনাকে, প্লিজ, বসতেই হবে।

ধন্যবাদ দিয়ে বসলাম। বসাটা কিছুই নয়। কিন্তু এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়তো খুব কম লোকেরই হয়। ভারতের খুব কম স্থান আছে যেখানে যাইনি; কিন্তু একজন লোকের যে গভীরতা থেকে আসে ঐ ধরনের অনুরোধ, যে প্রাণ থেকে প্রকাশ পায় সাধারণের এই অসাধারণত্ব, তা অত্যন্ত বিরল। স্বামীজীকে বললাম এইজন্য যে, উনি দিল্লির ভার নেওয়ার আগে প্রায় ১২ বৎসর মিশনের কাজে কাটিয়েছেন ঐ

স্বামী স্বাহানন্দ

মাদ্রাজ শহরে। যে মাদ্রাজী মহাশয় আমাকে ঐ অনুরোধ করেছিলেন, তিনি এ'দেরই কল্যাণময় প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

দিল্লির এই রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র অনেক দিনের পুরোনো, সেই ১৩২৭-এ শুরু, ছোটখাটভাবে। ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৬-এ কেন্দ্রটি আসে এই বর্তমান স্থানটিতে। স্বামী স্বাহানন্দ কার্যভার নিয়েছেন আজ প্রায় সাড়ে চার বছর।

নম্রভাষী, জ্ঞানী ও সুধী ব্যক্তি স্বামী স্বাহানন্দ, যিনি বেদান্ত কেশরীর সম্পাদক ছিলেন মাদ্রাজে পাঁচ বছর, আর যার ইংরিজীতে লেখা ছান্দোগ্যোপনিষদ খুব নাম করেছে ইতিমধ্যে। ও'র দ্বিতীয় বই (অদ্বৈত দর্শনে) "পঞ্চদশী" (চার শ বৎসরের প্রাচীন একটি গ্রন্থের উপর টীকা ও ব্যাখ্যা) বেরুবে আসছে ছ মাসের ভিতর। স্বামিজী বেলুড় বিদ্যামন্দিরে অধ্যাপক ছিলেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সন অবধি। তারপর যান মাদ্রাজে।

দিল্লিতে ও'র সহায়তা করেন আরো দুজন সন্ন্যাসী : স্বামী সত্যানন্দ (সহকারী সচিব) ও স্বামী অপরানন্দ। মিশনে ব্রতী আছেন আটজন ব্রহ্মচারী। তার
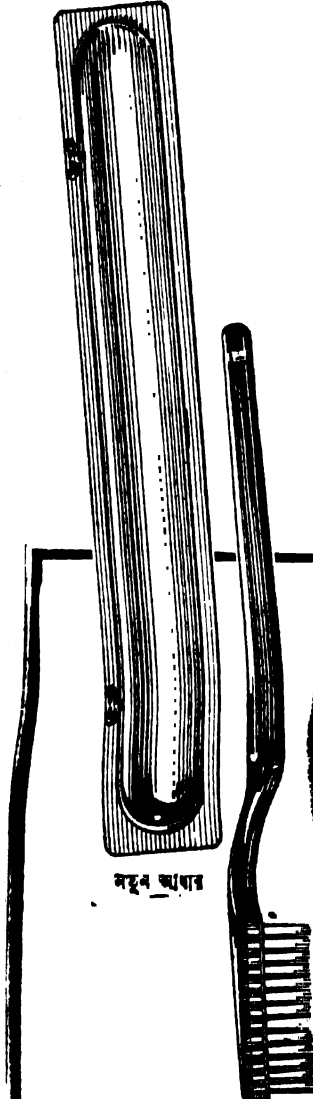
ভিতর একজন পান্‌জাবী, দুজন হিন্দী-ভাষী, একজন তেলেগুভাষী, একজন কানাড়াভাষী, আর দু-তিনজন বাঙালী। এঁদের শিক্ষা-দীক্ষা নিতে হয় সুদীর্ঘ ৯ বৎসর (এর দু বৎসর বেলুড় মঠে)। আর তারপর তাঁরা উন্নীত হতে পারেন স্বামিজীর পর্যায়ে।

এই মিশনের অনেক কার্যকলাপ রাজধানীতে, যেখানে রয়েছে নানা জায়গায় 'আঠারোটি' ছোট ছোট কেন্দ্র, যথা ডিফেন্স কলোনি, জোরবাগ্‌, চাণক্যপুরী, সাউত এক্সটেন্‌শেন্‌, কারোলবাগ, কীর্তিনগর, এবং পুরোনো দিল্লির নয়ী সড়কে। ছোট কেন্দ্র-গুলোর পরিচালনা স্থানীয় লোকেদের হাতে। স্বামিজী প্রতি মাসে একবার অথবা দু মাসে একবার যান ও বক্তৃতা দেন। রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচারে মিশন সাহায্য করে থাকে।

এই মিশনের সমাজকল্যাণ কাজে বিরাট অংশ নিয়েছে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল (ক্লিনিক) ও একটি হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি। যক্ষ্মা হাসপাতালটি আমরা দেখে এসেছি : পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। আউটডোরে দেখলাম অনেক রোগীর ভিড়। প্রায় সকলেই নিম্ন-আয় কোঠার নরনারী: শ্রমিক, ফিরিওয়ালা, অনেক রাজস্থানী মজদুর যারা রাজধানীর রাস্তা তৈরি করে, আর ইট-পাথর দিয়ে গাঁথে নিত্য বিরাট ইমারত। ১৯৩৩ থকে এই হাসপাতাল কাজ করছে। আর্য সমাজ থেকে নিজের বাড়িতে আসে ১৯৪৮-এ।

হাসপাতালের অধিকর্তা ডক্টর ইন্দুভূষণ মজুমদার। গত ২৫ বৎসর কাজ করছেন এই হাসপাতালে। গত বছর একমাত্র আউটডোরে চিকিৎসা ইত্যাদি হয়েছে ১,৩২,৬৫২ জনের (নতুন কেস্‌ ১,৭৭৭)। অধিকাংশই বিনা পয়সায়, নতুবা নামমাত্র পয়সায় (যারা দিতে পারে)। প্রয়োজনমতো রোগীদের দোতলায় বেডে রাখা হয় এক মাস। সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতালে জায়গা পাওয়া মাত্র তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বেড অছে ২৮টি।

মিশনের বাড়িতে আছে ডক্টর রায়ের হোমিওপ্যাথি ডিস্‌পেনসারি। উনি অনেক দিনকার লোক। আজ ৩৩ বৎসর যাবৎ রোজ সকালে রোগী দেখে আসছেন অবৈতনিকভাবে। চিকিৎসাও বিনি পয়সায়। গেল বছর চিকিৎসা করেছেন ৩৫,৪০৪ জনকে।

মন্দিরে উপাসনা ও প্রার্থনা হয় প্রত্যহ। পণ্ডিতরা হিন্দীতে তুলসী রামায়ণ পাঠ করেন। আর প্রতি রবিবার ইংরিজীতে বক্তৃতা হয় বেদান্ত দর্শনের উপর। প্রায় ৬।৭ শ লোক উপস্থিত থাকেন। যাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করতে চান, তাঁদের জন্যে আছে তিনটি শিক্ষা গ্রুপঃ

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত যক্ষ্মা হাসপাতালে রোগাক্রান্ত শিশু-সহ প্রতীক্ষারত জননী

ইংরিজী, বাংলা আর হিন্দীতে। স্বামী স্বাত্মানন্দ বিশেষ কয়েকটা বক্তৃতা দিয়েছেন গত বছর মিশনে এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অন্যান্য কার্যের ভিতর উল্লেখযোগ্য হল শ্রীসারদা মহিলা সমিতি, যার অধীন হল একটি শিশু শিক্ষাদান বিভাগ, "সারদা মন্দির"। মহিলা সমিতির নেতৃত্বে আছেন শ্রীমতী মেখলা ঝা (প্রধানমন্ত্রীর সচিব এল কে ঝা মহাশয়ের স্ত্রী) ও শ্রীমতী জয়রাজন। সাহাদ্রার একটি কুষ্ঠাশ্রমে সমিতির লোকেরা সহায়তা করেন নানাভাবে। লেডি হার্ডিনজ হাসপাতালেও রোগীদের সেবা এঁরা করে থাকেন, বিশেষত গরিবদের।

শিশুদের জন্যে (৬—১২ বৎসরের) মিশন প্রাঙ্গণে ক্লাস হয় প্রত্যেক রবিবারে সকালে। গড়ে ৪০ জন শিশু ক্লাসে আসে সপ্তাহে। প্রার্থনা, সংগীত, প্রাচীন কালের গল্প, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সারদা মায়ের কাহিনী শোনে ছেলেমেয়েরা।

মিশনের প্রভাব বাড়তিমুখী। বাইরের অনেক স্থান থেকে অনুরোধ আসে এখানে মিশন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে (যথা, মিরাট, গোয়ালিয়র, গুরগাঁও, জয়পুর, আজমীঢ়)। কিন্তু মিশনের প্রাচীন কেন্দ্র (বেলুড় মঠে) থেকে অনুমতি আসেনি। কারণ, লোকাভাব, অর্থাৎ উপযুক্ত সংখ্যক সন্ন্যাসীদের অভাব।

—খগেন দে সরকার

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন, ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। শ্যামলাল বলিল—

"কথাটা নূতন না হলেও ভালো কথা তো নতেই। তবে মনে হয় বিপদ-আপদের জন্য 'পি এল ৪৮০ নং ক্রাচ্ হাতের কাছে রেখে দেওয়া ভালো!!"

রাজ্য বিধানসভায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলা বন্ধ-এর সাফল্য সম্পর্কে সরকার এবং বিরোধী সদস্যের মধ্যে তর্কাতর্কি হইয়া গেল। খুড়ো বলিলেন—"সে খবর শুনেছি। কিন্তু এটা অনেকটা তৈলাধারে পাত্র, না পাত্রাধারে তৈল গোছের তর্ক অর্থাৎ যার কোন মীমাংসা নেই। আমরা বলি, এ সম্পর্কে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করলে হয়ত বন্ধ-এর সাফল্য বা অসাফল্য সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় পেঁছান সম্ভব হতে পারে।"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নূতন স্লোগান দিয়াছেন—'এক দেশ, এক টিম' —"ঠিক বলেছেন, এক টিম হলে আর হেরে যাওয়ার ভয় নেই, যে-কোন খেলাতেই ওয়াকওভার"—বলেন সহযাত্রী।

বাঙালী পর্বত অভিযাত্রী দল দুর্জয় মানা পর্বতশৃঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়া আসিয়াছেন। সহযাত্রী তাঁদের এই জয়ে পরম আনন্দে গান ধরিলেন—"তারা মানে না মানা।"

অন্য দিক হইতে প্রাপ্ত সংবাদে শুনিলাম, শ্রীমিহির সেনের সপ্ত-সিন্ধু সন্তরণের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এ গর্ব শুধু বাঙালীর নয়, সমস্ত ভারতের; যদিও ভারত এখনো "দুঃখসাগরটা সাঁতারি পার" হতে পারেনি!!"

কংগ্রেসের কথা এবং কাজের মধ্যে যে কোন সংগতি নাই এই কথাটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে উল্লেখ করিয়া শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈন বলিয়াছেন, এর্নাকুলাম মিউনিসিপ্যাল কর্তৃক নেতৃবৃন্দ এবং প্রধান-মন্ত্রীর সম্মানে যে ভোজানুষ্ঠান করা হইয়া-ছিল তাহাতে আড়ম্বরের অভাব ছিল না, ইহা কি কৃচ্ছ্রতা? খুড়ো বলিলেন—"ভোজে বদহজমের কোন ভয় নেই। একটুখানি জোয়ান-এর আরক খেয়ে নিলেই যে হয়, এ কথা শ্রীজৈন নিশ্চয়ই জানেন!!"

মন্ত্রীরা কে কোথায় দাঁড়াইবেন তাহার একটা ফিরিস্তি কিছু দিন আগে প্রকাশিত হইয়াছে। —"কে কোথায় বসে পড়বেন সে ইঙ্গিত অবশ্য ফিরিস্তিতে নেই"—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ ফরমোজা হইতে আমদানি-করা তাইচুং ধানের চাষের ব্যবস্থা হুগলিতে করা হইয়াছে।

কিন্তু কী ধরনের এবং কী পরিমাণ সারের প্রয়োজন এবং জমির মাটিই বা কিরকম হইবে এসব জানা না থাকায় চাষীদের খুবই অসুবিধা হইতেছে। সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"তাইচুং ধান থেকে খেনো হয় কিনা তা না জানায় আমাদেরও অসুবিধে কিছুমাত্র কম হচ্ছে না!!"

এর্নাকুলামে প্রদত্ত এক ভাষণে শ্রীমোরারজী দেশাই নাকি বলিয়াছেন—যাঁহারা হিন্দীর বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহারা জানেন না, দেশকে

কোন দিকে লইয়া যাইতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"অনেকেই জানেন বইকি, হিন্দী বন্ধ পর্যন্ত তো দেশ পেঁছে গেছে!!"

এ আই, সি, সি-র অধিবেশনে অকস্মাৎ প্রবল বারিপাত হওয়ায় শ্রীমতী ইন্দিরা খুব আনন্দিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে-কোন উৎসবের শেষে বৃষ্টিপাত শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করা হয়। সহযাত্রী বলিলেন—"শাস্ত্রীনগরের কথা জানিনে, তবে কলিকাতা নগরীতে উৎসব শেষে প্রবল বারিপাত হলে আর ঘণ্টা চারের মধ্যে বাড়ি যেতে হত না।"

সর্বশেষ সংবাদে শুনিলাম, শিক্ষা-খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু বিশু খুড়ো বলিলেন—"স্কুল-কলেজ আর শীঘ্র খোলা হবে না মনে করেই ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে কিনা তা অবশ্য বোঝা গেল না।"

অনুরূপ অন্য একটি সর্বশেষ সংবাদে শুনিলাম, কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। —"সুতরাং অতঃপর "পুজো-শেল" ছাড়া আর কোন কথা ক্রেতারা ভাবতেই পারবেন না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

বেরিলি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নয় বছরের একটি বালিকা অনাবৃষ্টি অবসানের নিমিত্ত দেব-মন্দিরে গত দশ বারো দিন যাবৎ অনশন শুরু করিয়াছে।—"সমাসন্ন ইলেকশনে প্রায়োবেশন অস্ত্রটি ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রেই তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করি, ভোট-প্রার্থীরা (সর্বদলীয়) চেষ্টা করে দেখতে পারেন"—বলেন বিশু খুড়ো।

নিখিল বিশ্বাসের চিত্র ও শর্বরী রায় চৌধুরীর ভাস্কর্য প্রদর্শনী : জর্মন কালচারল ইনস্টিটিউটের সৌজন্যে : ম্যাক্সম্যুলার ভবন।

আমাদের দেশীয় শিল্পকলার ধারা-বিধি সম্পর্কে যাঁরা কিছুটা অবহিত, যাঁরা প্রায়ই প্রদর্শনীতে যান তাঁরা সকলেই নিখিল বিশ্বাসের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত।

স্কেচ : নিখিল বিশ্বাস

আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁর কাজের সংখ্যা ১২টি।

চিত্রগত স্থান অর্থাৎ স্পেস এই কথাটা তাঁর কাছে ছেলেমানুষি লোক গল্পের ভাবনা হয়ে নেই। ক্রমে সেটার রহস্যময়তা অটুটভাব খুলে মেলে আসছে। এই সত্যটা তাঁর ছবিগুলি দেখলে বুঝতে পারি।

স্পেস কথাটা নিয়ে আমরা যদি একটু পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে খুব ভাল হয়। ধরা যাক পটে মনসার ভাসানের বা যে কোন পাকা হাতের পট, অথবা যে কোন পুরাতন কাঁথায়—সমস্ত রেখাভঙ্গ ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রাভিমুখী—অন্যদিক দিয়ে কেন্দ্র থেকে সব উৎসারিত সমস্ত কিছুই বিকীর্ণ হচ্ছে।

এ রকমটি বহু চিত্রে, অনেক টেরা-কোটাতে। কিন্তু ছোট ছেলের কাছে এই স্পেস খুব মজার সমস্যা। ছবি আঁকা শেষ হলে তা দেখে সে বলে, 'যাঃ ঐ খানটাতে ফাঁক থেকে গেল—ছবিটা ফোকলা ফোকলা লাগছে'—তার কাছে পাকা-মন কাঁদানো বাস্তবতা একটা ফাঁক বই কিছু নয়।

অনেক কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আছেন তাঁদেরও এই ভাবে স্পেসকে নিছক ফাঁক বলেই ভাবতে হয়। তাঁরা বলেন, ঐখানটা ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে। অতএব হয় কয়েকটা বিন্দু, কিম্বা জলদি স্ট্রোক, অথবা প্রিমিটিভ মোটিভ যা মনে আছে, যা জুতসই তম বসিয়ে দিতে বাধ্য হন। কেন না কাটা পেরেকের বিজ্ঞাপনেও রমণীর মিষ্টি মুখখানি চাই—এর সঙ্গে টাইপোগ্রাফী স্থির করা—ছাপা অনেক।

ফলে সমস্ত স্পেসটায় দেখি একটা কারসাজ (অ্যারেনজমেন্ট) খেলে উঠেছে; সংস্থান নেই। সংস্থান কথাটা যদিও বহুকালের তবু ইদানীংকার অনেক বিখ্যাত সমালোচক, স্পষ্টই বলেন, যেমন মারিস রেইনা, আঁদ্রে লোৎ, এবং সমস্ত শিল্পীকুলও বলেন, আগে কারসাজ ছিল, কোন কম্পোজি-শন ছিলনা।

আধুনিক চিত্রকলা ছবির সমগ্রতা নিয়ে ভেবেছে, ফ্রেমকে নিয়ে চিন্তা করেছে, স্পেসকে নিয়ে চুল চেরা তর্ক করতে রাজি। এই দিক থেকে ফ্রেঞ্চ কিউবিজমকে (...আর একটি কিউবিজম ১৯১১ খৃঃ জেগে উঠেছিল, যার মধ্যে ল্য ফাকনইয়ে-র 'সাস', দ্যলোনেই-র 'ভিল দ্য পারি' এবং লা ফ্রেঃনোই-র 'ক'কেরং দ্য লে'য়ার'—ছবিগুলি বিশেষ পরিচিত। এই কিউবিসমকে আমি বলি—কিউবিসম ফাঁসেজ, এবং এর জোরে অন্য কিউবিসম যা স্পেনীয় আধ্যাত্মিকতায় দীপ্ত—তার সঙ্গে প্রতি-পক্ষতা করতে পারি—আঁদ্রে লোৎ—পারল প্যাতিয়্যর—৩৪৯ পৃ) ধরা যেতে পারে।

[illegible] এই প্রবন্ধ [illegible] দিয়েছে।

স্পেসের ব্যবহার, নিখিলবাবুর কাছে, আমরা তখনই বুঝব যখন তাঁর একক-বিষয় বস্তুর ছবিগুলি দেখব। কাগজের সাদা কালোর বিপরীতে আঁকাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম্পোজিশন হয়ে দেখা দিয়েছে। এর আগে আর্টইস্ট্রি হাউসের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখেছিলাম; সেগুলির সবলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবার তেমন কোন গল্প নেই—আছে কলম আর তুলির খেলা।

কিন্তু কোথাও কোথাও কালোর সঙ্গে টোন—যেমন ব্লে মোভ, শুকরে টেরাকোট আমাদের মনে প্রশ্ন তুলেছে যে তবে কি উনি কালোর প্রাধান্যে সমস্ত কিছু হার্ড হয়ে না দেখা দেয় ভেবেছিলেন? আর একটা হরফী আঁচড় যা আমাদের কষ্ট দিয়েছে সেটা (৯নং) ছবিতে ঘোড়ার গ্রীবা যেখানে দারুণ টেনসানে নেমেছে—অন্যদিকে সম্মুখে পদদ্বয়ে ইতিমধ্যে নিজের নামটা না লিখলেই পারতেন।

যাই হোক তাঁর কক, তাঁর আঁকা বুল, তাঁর ম্যান এণ্ড হর্স আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে। একান্ত অনুরোধ এবার কিছু রঙে খেলা দেখান। যাতে লেডী মুখার্জি তাঁকে রঙ সরবরাহ করতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে, নিখিলবাবুদের প্রদর্শনীতে লেডী মুখার্জি গিয়েছিলেন, ছবি দেখার পর বললেন—'নিখিল তোমার জন্যে আর রঙ রাখতে হবে না—রঙের দরকার ত তোমার তেমন নেই'

শর্বরী রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য এখানে অনেকগুলি ছিল। সর্বসমেত ১২টি। তার মধ্যে খানতিনেক বাদে সবগুলিই নূতন দেখলাম। শর্বরীবাবুর উপর তাঁর কাজ দেখে দারুণ বিশ্বাস জন্মেছে। যদিও তিনি প্রদোষ দাশগুপ্ত, যিনি গড়ের মাঠের সুভাষ বোসের মূর্তিটি করেছেন—নামী ভাস্করের কাছে ছেলে বেলা কাজ শুরু করেন, পরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ শেখেন।

প্রথম চোখে যাঁরা নব্য ভাস্কর্য দেখতে অভ্যস্ত নন, তাঁদের কাছে শর্বরীবাবুর শিল্পকর্মে ন্যূনতম সরলতাই ওতপ্রোত হবে। এ সরলতা কিন্তু কখনই চোখ-ধাঁধা নয়—মন ভোলান নয়; যেটা অনেক সময় একাডেমিইজমের মধ্যে থাকে।

এখানে ছোট একটু হদিস নেওয়া যাক। রোঁদ্যার অবয়বগুলি তাঁর স্নায়ুস্পর্শ—নেয়রভাসিতে দা লা তুষ—জেগে উঠেছে পরেই আনতোয়ান লুই বারই এর সরলতা। ক্রমে ফ্রাঁসোজ পামপোঁ আরও বলিষ্ঠতা দেখান তাঁর 'শ্বেত ভাল্লুক' নামক শিল্পকর্মে—পামপোঁর ব্যাপারে সমালোচকরা বলেন—তাঁর শ্বেত ভাল্লুক একটি যথার্থ মাস, যাতে কোন ডেকরেটিভ ডিটেইল নেই'—

এখানেও শর্বরীবাবুর কাজে আর একটু অন্য ভাবে এসেছে। ইনি যা নিয়ে কাজ করেছেন, যা তার চোখের সামনে ছিল, তাকে কখন সখন চিত্রগত রেখার আরোপ করে একটা বিশেষত্ব দিয়েছেন। এই বিশেষত্ব অথচ বাস্তবিক নয়, যেমন আমরা দেখি খাঁচার বা বনে টিয়া পাখী তার সমস্ত চেহারা নিয়ে হঠাৎ ডেকরেটিভ হয়ে গেল—সে রকম নয়।

সে রেখাগুলি অত্যন্ত জ্যামিতিক—আবার যদি গণিতশাস্ত্র থেকে এই কথাটি নেওয়া যায়—যে অখণ্ডতা কনটিনউইটি নির্দেশক। যেমন 'শোয়ান প্লাসটারের কাজটি' পায়ের কাছের রেখা—এবং উত্তমাঙ্গ ছোট হওয়ার ন্যায় হিসাবে কাজ করে।

যেমন কাঠের রমণী স্ট্যাচু্যে, এখানে স্তনের অল্প হেলান রেখায়—আলোতে কালোতে মিশে যে রেখা ঘটে উঠে—সমগ্র দেহই গতিশীল—অথচ বেশ লাজুক।

আমরা অনেক রূপায়িত প্যাঁচা দেখেছি—ঢোকরা বা কালীঘাট এবং নানা রকমের কিন্তু এখানকার (নং ৬) প্যাঁচাটি দারুণ হয়েছে।

শর্বরীবাবু আমেরিকায় যাচ্ছেন তাদের নিমন্ত্রণে, আমেরিকার সুবুদ্ধিতে আমরা সত্যিই খুশী।

এক্সপ্রেশনিজম

ইম্প্রেশনিস্টরা আলোর সৌন্দর্য রঙের সাহায্যে ক্যানভাসে ধরেছিলেন; এই চিত্রাদর্শে শিল্পীর মানসিক অবস্থা একেবারেই অনাবশ্যক। দৃশ্য এবং শিল্পীর দৃষ্টিশক্তি এই দুইয়ের ওপরই নির্ভর করে ইম্প্রেশনিজম্‌। কিন্তু সমস্যা হল এইখানে যে, আলো একা একা আঁকা যায় না, কোনো বস্তুর উপর পড়ে সে প্রস্ফুটিত হয়, অতএব জড় বস্তুর আমদানি হল ক্যানভাসে। জড় বস্তু যখন এল তখন অনেক ঝামেলা—প্রথমত কম্পোজিশনের ব্যাপার, তারপর মানুষ আলোর প্রভাবে যকে-তাকে যা-তা দেখে ফেলে (যেমন একবার সাঁওতাল পরগনায় আমি বিকেলের আলোতে একটা কাককে বক ভেবে গুলি করে দিয়েছিলাম), তা ছাড়া অতীতের দৃশ্য দর্শন-অভিজ্ঞতা এড়ানো যায় না (মনে নেই লণ্ডনের পার্লামেন্ট হাউস আঁকতে গিয়ে মোনে আলজিয়ার্সের সূর্য লটকে দিলেন আকাশে)—সমস্যার পর সমস্যা। —মোনে, পিসারো, বাজিল সিসলে প্রভৃতিরা কিছুটা নাঈভ (naive) ছিলেন বলে রঙের ওপর রঙ চালিয়ে গেছেন, এসব চিন্তার মধ্যে না গিয়ে. কিন্তু সচেতন ছিলেন যাঁরা অত্যধিক যেমন সেজান, দেগা, তুলুস-লোত্রেক, ভ্যান গ, তাদের কাছে এই চিত্রাদর্শ নিতান্ত ছেলেমানুষি ঠেকেছিল দুদিন পরেই। রেনোয়া সুন্দরী নারীকে প্রকৃতি আঁকছি বলে ছবির একচেটিয়া বিষয় করে নিলেন, সেজান ক্যানভাসের বস্তু কীভাবে সাজানো হবে সেই চিন্তায় মগ্ন, দেগা ও তুলুস-লোত্রেক ঘোড়া, কাফে, বেশ্যাবাড়ির দিকে ঝুঁকে এড়িয়ে গেলেন ব্যাপারটা, আর ভ্যান গ পুরোপুরি নতুন এক চিত্রাদর্শ খাড়া করে নতুন দরজা খুলে ফেললেন চিত্র-জগতে। এই চিত্রাদর্শই এক্সপ্রেশানিজম্‌ বলে পরিচিত হল পরে।

আমি যখন সবে তরুণ, একবার পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার এমন সুন্দর সঙ্গী জুটে গেল, আর এত ভালো মেজাজে ছিলাম, সমস্ত কিছু সুন্দর লেগেছিল। নিটোল ধবধবে বরফ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা, তার নিচে কাছের সবুজ পাহাড়, তিস্তার নীল জল, আমার কাছে স্বপ্ন মনে হ'ত। বনের পথে হাঁটার শব্দে সমস্ত শরীরে বাজনা শুনতে পেতুম; পাহাড়ী পাখীর গান, ভুটিয়া মেয়ে—আনন্দের হিল্লোল তুলত। ইচ্ছে করত এই দৃশ্য এঁকে ফেলি ক্যানভাসে। ব্যাপারটা জানি না বলে মনের ইচ্ছে মনেই রইল।—তারপর বহুদিন পরে সেরকমই একদিনে আমি ফিরে গিয়েছিলাম পাহাড়ে, আমার জীবনের এক অস্থির মুহূর্তে, একা। আমার মন খারাপ ছিল তখন, পৃথিবী বিষের মত লাগছিল, শহরের আনন্দই বিস্বাদ লাগছিল না বলে ভেবেছিলুম কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা চূড়ো ভালো লাগবে। কিন্তু এবার গিয়ে যে-বিন্দু থেকে সবচেয়ে সুন্দর দেখেছিলাম পাহাড়, সেরকমই এক উজ্জ্বল দিনে, দাঁড়ালাম সেখানে। আমার কাছে সেই নিটোল মধুর দৃশ্য এবার ভয়াবহ মনে হ'ল। একটা অগোছালো, এবড়ো-খেবড়ো জিনিস যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, যেন দম বন্ধ হ'য়ে যাবে পাহাড়ী পথে হাঁটলে, নিচে তিস্তা যেন বিষধর সাপ কিলবিল করছে, আর সাদা কাঞ্চনঘণ্টা যেন এক বিশাল দানবীর বীভৎস নিরস্ত [illegible]। আমি পাগলের মতো ফিরে এসে যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলাম। —[illegible] [illegible] কোনো রূপ নেই, পরিস্রুত জলের মতো তা, আমাদের মনকে তার ওপরে আমরা আরোপ করি—যদি ভালো থাকে ভালো দেখি, সুন্দর লাগে, মধুময় মনে হয়, যদি তা বিষিয়ে থাকে, তিস্তা কেউটের ছানার মতো কিলবিলে কুৎসিত হ'তে বাধ্য। —এক্সপ্রেশোনিস্টরা চেয়েছিলেন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে দ্রষ্টার মনকে প্রকাশ করতে, বস্তু তাদের ছবিতে আয়নার মতো, শুধু মাত্র শিল্পীর মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। এই সূত্রে মনে করুন এল্‌ গ্রেকোর "টলেডোর দৃশ্য" চিত্রটি—এই ক্যানভাস টলেডোকে পাহাড় থেকে কেমন দেখায় তার চিত্ররূপ, নাকি শিল্পীর মানসিক অবস্থার প্রকাশ মাধ্যম?

এতক্ষণ খালি ভাবের কথাই হল, ইতিহাস-তথ্য মেনে নেওয়া যাক্‌ কিছুটা। এক্সপ্রেশনিস্টিক ছবি আঁকার প্রথম জোয়ার এল ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০০ পর্যন্ত। এই দলের পান্ডারা হ'লে ভ্যান গ, টুলুস-লোত্রেক, এন্‌সর, মুংখ্‌, হোড্‌লার প্রভৃতিরা। রঙের তীব্রতা নাটকীয় বিষয় নির্বাচন, ফর্মের স্বেচ্ছাকৃত ভঙ্গন, চিত্র-বিন্যাসের নূতনত্ব এবং সর্বোপরি রেখাঙ্কনের উদ্দামতা—এই সবের মধ্য দিয়ে ১৮৮০-৯০-এর এক্সপ্রেশোনিস্টরা আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। ভ্যান্‌ গ নিজের জীবন ও শিল্পের সামঞ্জস্য রেখে যে-উদাহরণ সৃষ্টি করেন তার জোরেই বিশ শতক জুড়ে এক্সপ্রেশনিজমের খুঁটি এত জোরালো। ভ্যানগার পূর্বে যে কোনো ধরণের অতিকৃতি (exaggeration) ক্যারিকেচার ব'লে হাল্কা করে দেওয়া হ'ত—ঠিকই ক্যারিকেচার এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত এক্সপ্রেশনিজম্‌, কিন্তু ভ্যান গগ্‌-এর কাছে এর অর্থ অন্য। এক্সপ্রেশনিজম্‌ তাঁর মতে এক[illegible] ধর্মীয় আত্মপ্রকাশ।

এক্সপ্রেশনিজমের দ্বিতীয় ঢেউ [illegible] ১৯০৫-এ জার্মানীতে। [illegible], মুংখ্‌, [illegible] তখন এই চিত্রাদর্শের [illegible]।

ফ্রান্সেও এই ধারায় তখন ছবি আঁকছেন রুয়ো, পিকাসো (ব্লু এবং নিগ্রো পিরিয়ড), মাতিস ডেরেইন, ভ্লামিংক প্রভৃতিরা। এক্সপ্রেশনিজম্ এমন একটি ব্যাপক সংজ্ঞা যে, এই চিত্রাদর্শের মধ্যেও অনেক ভাগ সম্ভব—ফোভিস্টরাও এক্সপ্রেশনিস্ট, এনসরও তাই, মুংখ্‌ও আত্মপ্রকাশে উৎসুক, কিন্তু এর অন্যের চেয়ে দারুণ আলাদা। নর্ডিক এক্সপ্রেশনিজমের নেতা ইবসন ও স্ট্রিন্ডবার্গের শিল্পী সংস্করণ, মুংক্ প্রভাবিত হয়েছিলেন কীর্কেগাডের জীবন-দর্শনে এবং তাই তাঁর চিত্রে বিষণ্ণতা আর অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই।—হয়তো বিষণ্ণতা কথাটা তাঁর ছবির বিষয়ে বললে ব্যাপারটা মধুর করে দেওয়া হ'ল, বলা যাক্ জীবন সম্পর্কে হতাশা এবং ভয়াবহতা। মুংকের প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয় ১৮৯২ সালে এবং সমগ্র ইউরোপের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধের ওপর তার প্রভাব অবশ্যমান্য হয়ে দেখা দেয়। এক্সপ্রেশনিজম্ ছড়িয়ে পড়ে মুনিখ থেকে সমগ্র ইউরোপে।

ইতিহাসের কথা এই অবধি বলেই থামছি কারণ এক্সপ্রেশনিজম্ খুঁজতে হ'লে বিশ শতকের সব চিত্রকরের ভিতরেই তা পাওয়া যাবে, মিছিমিছি দৈর্ঘ্যে বেড়ে যাবে প্রবন্ধ, যা এমনিতেই আমরা জানব ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পীদের আলোচনাকালে। একটা কথা শুধু মনে রাখবেন, আবার বলছি মানুষের চারিদিকে যা থাকে তা প্রতিস্রুত জলের মতো স্বাদহীন গন্ধহীন, আপনার মন তার ওপরে প্রতিবিম্বিত হয় বলে কখনো তা সুন্দর-মধুময় মনে হয়, মন খারাপ থাকলে নীল তিস্তাও কেউটের বাচ্চার মতো কিলবিলে নাক্কারজনক।

শুদ্ধশীল বসু

অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন

শ্রীশান্তিদাশঙ্কর দাসগুপ্ত "জলকে চল" পর্যায়ে লেখা সম্বন্ধে যে চিঠি দিয়েছেন তার প্রথমার্ধের উত্তরে কি লিখব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তিনি যদি আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সরস রূপায়ণ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারেন সেখানে আমার কিছু করার নেই—সেটা তাঁর ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। করলে খুশী হতুম, ভাবতুম আর আর অনেক পাঠকের মত তিনিও একজন যিনি পছন্দ করেন। আপনাদের [illegible] আমার শব্দচয়ন সম্পর্কে তিনি কটাক্ষপাত করেছেন যে, "বিখ্যাত বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকদের অনেক লেখা পড়িয়াছি কিন্তু...ইত্যাদি।" ভাষা হল [illegible]বতী, স্রোতবতী। কোন প্রবন্ধকার বিশেষ কোন শব্দ ব্যবহার [illegible] বলে [illegible] করার অপরাধটা কোথায়, আমার ঠিক বোধগম্য হল না। তা [illegible] পর [illegible]

"জলের স্থিতি নেই গতি আছে..." ইত্যাদিতে পত্রলেখকের আপত্তি কেন, আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে তা বুঝতে পারলুম না। স্থিতি বা গতি দুটিই আপেক্ষিক—এটা তো লেখক অস্বীকার করবেন না! এখন stop watch নিয়ে সময় দেখে ঠিক কতক্ষণ থেমে থাকলে "স্থিতি" আর তা না হলে 'গতি' বলব এমন বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতা আমার লেখায় আমি দিচ্ছি না তা বোধ হয় আমি গোড়াতেই অকপটে স্বীকার করেছি। হিমালয় কয়েক কোটি বছর আগে ছিল না, এখন আছে, হয়তো আবার কয়েক কোটি বছর বাদে থাকবে না। এর জন্য বহু দুরূহ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বইও আছে, আপনাদের মত সুপণ্ডিত পত্রলেখকও আছেন। সরস এবং মনোরম করে বিজ্ঞানকে সর্বজনগ্রাহ্য করে কিছু বলতে গেলে তাই এঁদের [illegible] মুখোমুখি হতে হবে। [illegible]

সালফাইডের মধ্যে কোথাও জল ঢোকাবার চেষ্টা করিনি। পত্রলেখক যদি তাকে জলে ফেলেন আমি নাচার। আর জৈব রসায়নের (যদিচ ছাপা হয়েছে রসয়নের) ইত্যাদি বলতে জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের সহিত যে জল পুঞ্জীভূত অবস্থায় আছে ইত্যাদি আমি বোঝাতে চেয়েছি। প্রথমে না বুঝে উনি প্রশ্ন করেছেন, তারপর আমি যা বলতে চেয়েছি সে কথাই উনি নিজের ভাষায় আর একবার লিখেছেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মুশকিল হচ্ছে, লেখার মাঝখান থেকে একটি দুটি লাইন খটাস করে ভোজে তুলে এনে তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যা ইচ্ছে তাই মানে করে অথবা না বুঝবার [illegible] করলে আমার কিছু করার নেই। নিঃসঙ্গম বিজ্ঞানীদের রক্ষাকবচ বিশেষ, তাই তো বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে এত বুঝান ও বুঝে নেবার অবকাশ থাকে। আমি যা বলতে চেয়েছি তা বুঝবার জন্য দ্বিতীয়বার বা বারবার যদি তলব পড়ে তা আমায় করতে কোন ক্ষতি নেই। তা ছাড়া লেখক-পাঠকের মধুর সম্পর্কটাকেও তো আর অহি-নকুলের মত বিচ্ছিন্ন করে ভাবার কোন কারণ নেই।

[illegible]

[illegible]

গত এই আশ্বিনের দেশ পত্রিকায় 'মধ্য [illegible]ন চিত্র প্রদর্শনীর' চিত্র সমালোচনায় শিল্পী সুনীলমাধব সেনের ছবি সম্পর্কে আপনাদের চিত্র সমালোচক যে কদর্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন সেই শিল্প-কর্মটি আমি দেখেছি। ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে তৈরী এই শিল্পটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি এই ছবির ক্ষেত্রে কোন "—" (আপনাদের চিত্র সমালোচকের ভাষা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করতে লজ্জা বোধ করছি) চিহ্ন দেখতে পাইনি। [illegible]

একটি বিমূর্ত্ত শিল্প যার সঙ্গে কোন রক্ত মাংস শরীরের সম্বন্ধ আছে মনে হয় না, অথচ আপনাদের চিত্র সমালোচক এই প্রকার একটি সৃষ্টির মধ্যে কি করে অকুস্থল খুঁজে পেলেন তা বুঝতে পারলাম না। কারণ ছবিটির বহু স্থানেই ঐ প্রকার ঝাঝরি রয়েছে। যাই হোক, সমালোচনাটি পড়ে আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, এইরূপ নিম্ন শ্রেণীর চিত্র সমালোচনা আপনাদের স্বনামধন্য পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়াই উচিত ছিল।

লীনা ঘোষ
কলিকাতা ৪

কলকাতার ডায়েরি

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৬ সংখ্যা ৩৩শ বর্ষ দেশে "চাণক্য" লিখিত কলকাতার ডায়েরীর মধ্যে শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ সম্বন্ধে যেসব কথা লেখা হয়েছে তাতে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে মনে হয়।

শ্রী ঘোষ নিঃসন্দেহে একজন গুণী ব্যক্তি। কিন্তু শোলার ফুল, পুতুল ইত্যাদি তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন—এ দাবি বড় বেশী বলে মনে হয়। প্রথমত, মালাকাররা শুধু টোপর চাঁদমালাই করত না; আজ থেকে এক শ' বছর আগেও তাদের তৈরী শোলার অলংকার, পাখি, খেলনা ইত্যাদি রসিক-জনকে আনন্দ দিয়েছে। বাংলা দেশের শিল্পের ইতিহাসের মধ্যে তার বহু উল্লেখ আছে। এমন অনেক সুদক্ষ কারিগর আজও বেঁচে আছেন যাদের হাতের কাজ দেখলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়।

বারুইপুরের এক্সপেরিমেণ্টাল ওয়ার্কশপ কাম রিসার্চ ইনস্টিটিউট গত কয়েক বছর যাবৎ এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—অনেক নতুন ডিজাইন দিয়েছেন, খেলনা ইত্যাদি তৈরীর অনেক সহজ পদ্ধতির হদিশ তাঁরাই দিয়েছেন, শোলা দিয়ে আরো কি কি করা যেতে পারে—সে-সব সম্বন্ধেও অনেক নতুন তথ্য তাঁরা আমাদের দিয়েছেন। এই ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমরা বহু দিন আগে থেকে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিবহাল আছি। শোলার কাজে বিভিন্নভাবে আমরা তাঁদের সাহায্য পেয়েছি। যত দূর জানি, শ্রী ঘোষ মাত্র কয়েক মাস আগে ঐ ইনস্টিটিউটে যোগ দেন এবং এ যাবৎ কয়েকটি মাত্র শোলার ডিজাইন তিনি দিয়েছেন, এর প্রায় সবগুলিই তাঁর আগেকার মাটির কাজের নকল মাত্র।

শ্রী ঘোষের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক; আমরা তাতে নিশ্চয়ই সুখী হব। কিন্তু তিনিই প্রথম শোলার খেলনা বা পুতুল তৈরী করে মালাকারদের হাতে তুলে দিয়েছেন—এ দাবি নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

শ্রীঅমিয়কুমার হালদার
সভাপতি,
মহেশপুর শোলা শিল্প সমবায় সমিতি

আই এস আই

১ অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীমতী রচিত 'আই-এস আই' সম্বন্ধে রচনাটি পড়লাম। শ্রীমতীকে ধন্যবাদ যে, তিনি বর্তমান ভারতের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্থার কর্মপদ্ধতি সহজ ভাষায় আলোচনা করেছেন। কিন্তু, আমার একটি ছোট জিনিস জানাবার আছে। আই-এস-আই বা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউশনের বর্তমান ঠিকানা (কলিকাতা শাখা অফিসের) ৫ নম্বর চৌরঙ্গী অ্যাপ্রোচ, কলিকাতা ১৩। যদিও পূর্বে অফিস ১১ নম্বর সুতারকিন স্ট্রীটেই ছিলো।

কুশল বাগচী
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর,
আই-এস-আই।

অন্যদেশের কবিতা

আঁদ্রে ব্রেতোঁ

গত সপ্তাহে বুধবার ২৮শে সেপ্টেম্বর, ফ্রান্সে আঁদ্রে ব্রেতোঁর মৃত্যু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বেড়াচ্ছিলেন তিনি, এমন সময় হাঁপানির টান ওঠে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৭০ বছর। ব্রেতোঁর জন্ম, ১৮৯৬ সালে নর্মাণ্ডিতে।

'অন্য দেশের কবিতা' পর্যায়ের শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে সুররিয়ালিজমের উন্মেষের আলোচনা দিয়ে, ব্রেতোঁ সেই আন্দোলনের জনক। এই শতাব্দীর শুরুতে প্যারিসে ডাক্তারির ছাত্র ছিলেন ব্রেতোঁ, ফ্রয়েডের মানসশিষ্য, কিছু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগ দেন ত্রিস্তান জারার ডাডাইজম্ নামের পাগলামির আন্দোলনে, তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে, ১৯২৪ সালে বার করেন সুররিয়ালিজমের ইস্তাহার। পরবর্তীকালে সমগ্র ফ্রান্স তথা সারা পৃথিবীর অধিকাংশ লেখক সুররিয়ালিজমের প্রতি আকৃষ্ট বা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

ব্রেতোঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই, তাঁর কবিত্বময় উপন্যাস 'নাদযা', এ ছাড়া তাঁর তিনটি কবিতার বই আছে। কিন্তু ব্রেতোঁ যতখানি ছিলেন নতুন ভাবনার উদ্গাতা বা আন্দোলনের মন্ত্রদাতা, কবি হিসেবে নিজে ততখানি সার্থক হন নি। তাঁর কবিতা কিছুটা ঠাণ্ডা। সুতরাং, কোনো কবিতার বদলে আমরা তাঁর সুররিয়ালিস্ট মেনিফেস্টোর কিছুটা অংশ এখানে অনুবাদ করছি। এ কাজ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ, এলেন মার্কস তাঁর আধুনিক ফরাসী কবিতার সংকলনে ব্রেতোঁর সুররিয়ালিস্ট মেনিফেস্টোই কবিতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, বন্ধু-বান্ধবরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, [illegible] ছেড়ে ব্রেতোঁ আমেরিকায় গিয়ে থাকতেন। পরবর্তীকালে জাঁ পল সার্ত্র যখন একজিস্টেন্সিয়ালিজমের বাণী এনে সুররিয়ালিজমের শত্রু হিসেবে দেখা দেন, তখন প্রবাস থেকে ফিরে বৃদ্ধ ব্রেতোঁ দলবল আবার ডেকে লড়াইতে নামতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাঙা দল আর জোড়া লাগেনি। দলবদ্ধ আন্দোলন হিসেবে সুররিয়ালিজম্ নিজের কাজ শেষ করে গেছে। গত পনেরো-[illegible] ধরে ব্রেতোঁ প্রায় [illegible] জীবন [illegible]।

গীয়ম আপোলিনেয়ারের প্রতি প্রশস্তি

সদ্যমৃত গীয়ম আপোলিনেয়ারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি জানাবার জন্য, যিনি, আমাদের বারবার মনে হয়েছে, আমাদেরই মতো একই প্রেরণার বশীভূত ছিলেন, যদিও কখনো কখনো মাঝারি ধরনের সাহিত্যরীতির কাছেও আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সুপো (ফিলিপ সুপো—ব্রেতোঁর বন্ধু ও গৌণ কবি) এবং আমি সুররিয়ালিজমের উদ্ভাবন করেছি, শুদ্ধতম প্রকাশের নতুন রীতি, এবং আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে এই চিন্তা ভাগ করে নিতে চাই।......

সুররিয়ালিজম : বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ। শুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয়া, এর দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে চাই, হয় শব্দের দ্বারা, কাগজের উপরে, অথবা অন্য কোনো উপায়ে, চিন্তার প্রকৃত গঠনরূপ। চিন্তার শ্রুতিলিখন, যুক্তির কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা ব্যবহার না করে, কোনো নান্দনিক বা নৈতিক পূর্বধারণা আরোপ না করে।

আভিধানিক। প্রেম। সুররিয়ালিজম এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কিছু কিছু চিন্তায় অনুষঙ্গ গরিষ্ঠ বাস্তব, এবং এ পর্যন্ত তা অবহেলিত,—স্বপ্নের সর্বশক্তিমানতা, ভাবনার স্বার্থহীন খেলা। অন্য সব রকম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকৌশলকে আজ থেকে এ অবহেলা করে এবং জীবনের প্রধানতম সমস্যাগুলি এর দ্বারাই রূপায়িত হয়। সর্বাত্মক সুররিয়ালিজমে যাঁরা আস্থা জানিয়েছেন : সর্বশ্রী আরাগঁ, বারোঁ, বোয়াফার, ব্রেতোঁ, কারিভ, ক্রেভেল, দেলতেইল, দেনো, এলুয়ার, জেরার, লিমবুর, মালকিন, মরজ, নেভিল, নোল, পেরে, পিসোঁ, সুপো, ভিত্রাক। এখন পর্যন্ত এরাই শুধু মাত্র, কারুর ভুল করার উপায় নেই, এ ছাড়া চমকপ্রদ ইসিডোর দুকাস ছাড়া—তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আমি জানি না। এ ছাড়া, যদি ফলাফল দেখে বিচার করতে হয়, তবে আরো অনেক কবিকেই সুররিয়ালিস্ট বলা যায়, দান্তে থেকে শুরু এবং সাফল্যের শিখরের সময়ে শেক্সপীয়ার। জোচ্চুরি করে যাকে বলা হয় 'প্রতিভা', বারবার আমি তার বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি, তার মূল পদ্ধতিগুলি, অন্য কোনো উপায়েই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, আমাদের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ছাড়া।......

সুইফট্ সুররিয়ালিস্টিক তাঁর বদমায়েশিতে
সাদ সুররিয়ালিস্টিক তাঁর সেডিজমে,
শাতুব্রিয়া সুররিয়ালিস্টিক বিদেশী আকর্ষণে...
উগো (ভিক্তর হুগো) সুররিয়ালিস্টিক যখন তিনি
নির্বোধ নন...
পো (এডগার অ্যালান) সুররিয়ালিস্টিক
দুঃসাহসিক অভিযানে........
বদলেয়ার সুররিয়ালিস্টিক নৈতিকতায়
র‍্যাঁবো সুররিয়ালিস্টিক জীবনের আচরণের ও অন্যত্র
মালার্মে সুররিয়ালিস্টিক গোপনে ভাগ করা আত্মবিশ্বাসে
জারি (আলফ্রেড) সুররিয়ালিস্টিক আবসাঁথ পানে
নুভো সুররিয়ালিস্টিক চুম্বনে......ইত্যাদি

অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লোকগীতি ঃ বাংলা

বাংলার পল্লীগীতি। চিত্তরঞ্জন দেব। পরিবেশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: আট টাকা মাত্র।

মানব-সভ্যতা ও মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস সম্যক অনুধাবন করলে এ-কথাটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নগর-কেন্দ্রিক উচ্চকোটি জনগণের শিল্প-সংস্কৃতির পাশাপাশি গ্রাম-কেন্দ্রিক অশিক্ষিত সাধারণ জনতার শিল্প-সংস্কৃতির স্রোতধারা নিরন্তর প্রবহমান। শুধু প্রবহমান নয়, বৈচিত্র্যে ও বেগবত্তায় তা কোনো অংশে ন্যূন নয়। বরং প্রাণ-প্রাচুর্যে তা আরো উজ্জ্বল। বাংলা দেশের গণ-সংস্কৃতি বৈচিত্র্যে, গভীরতা ও প্রাণবত্তায় পূর্ণ। বাংলা দেশের লোক-সংগীত ও লোকগাথা এক অপার বিস্ময়ের বস্তু। এই বিশাল সংস্কৃতি-জগৎ আমাদের শিক্ষিত নগরজনের একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল। বহু ব্যাপারের ন্যায় এ-ব্যাপারেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান আধুনিক বাঙালীর সাংস্কৃতিক গুরু রবীন্দ্রনাথ এবং তার পরেই সৌভাগ্যবশত আমরা কয়েকজন মহৎ গবেষকের আবির্ভাব লক্ষ করি, যাঁরা লোক-সংগীত ও লোকগাথা উদ্ধারে নিরতিশয় পরিশ্রম করে বঙ্গ-বাসীকে এত অমূল্য রত্নের সন্ধান দেন। তাঁদের অনেকের নাম আমাদের সুপরিচিত। লোক-সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও পুনরুদ্ধারে শ্বেতাঙ্গ গবেষকদের দানও প্রচুর।

লোকগীতি বা পল্লীগীতি সংগ্রহ ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রেই যাঁর নাম মনে আসে, তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তারপরেই নাম করতে হয় কেদারনাথ মজুমদার ও চন্দ্রকুমার দে'র। এ'রা অবশ্য প্রধানত পূর্ববঙ্গের লোকগীতি-লোকগাথা নিয়েই বেশী ব্যাপৃত ছিলেন। এ'রা এবং এ'দের পরবর্তী আরো অনেক গবেষক পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সংগীত নিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও চর্চা চালিয়েছেন।

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চার অঞ্চল নিয়েই বাংলা দেশ এবং এই চার অঞ্চলেরই আছে বিভিন্ন ধরনের লোক-সংগীত। তাই পরবর্তীকালে গবেষকগণ সকল অঞ্চলের লোক-সংগীত নিয়েই অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছেন, আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক জগৎ। আজ শিক্ষিত জনেরা যে পল্লী-সংগীতে এতো আকৃষ্ট, তার মূলে রয়েছে বহু গবেষকের সমষ্টিগত প্রয়াস।

কী বিচিত্র বাংলার লোক-সংগীত, কী অফুরন্ত গ্রাম-বাংলার গানের ভাণ্ডার! তত্ত্বকথা, দেবদেবীর মাহাত্ম্য সেখানে যেমন পাই, তেমনি পাই মানুষের মহিমার জয়গান, মানবপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল কাহিনী, রাগ, অনুরাগ, অভিমান, দ্বেষ, হিংসা, রসিকতা, চুটকি প্রভৃতি নানাবিধ মানবিক অনুভূতির রূপায়ণ, কী বৈচিত্র্য তার ভাষা ও সুরের! ভাটিয়ালি সুরে যেমন মন উদাস করে, বাউলের গানে তেমনি ডুব দিতে হয় অন্তরের অন্তস্তলে, গম্ভীরার ব্যঙ্গে টুসুর অভিযোগে কীর্তনের বৈদগ্ধে, চটকার চুটকিতে, কবিগানের শিক্ষায়......। গানের দেশ বাংলা। যে-কোনো উৎসব, যে-কোনো অনুষ্ঠান, যে-কোনো দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্মে বাঙালী গান না গেয়ে পারতো না বোধ হয়। সাধারণ কথাও তার গান হয়ে যেতো, না হলে সাধারণ প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধার মধ্যে এতো ছন্দ, এতো সুর। এখানেই পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে বাংলা দেশের পার্থক্য।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব পল্লীগীতি নিয়ে দীর্ঘ-কাল অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছেন। দীর্ঘদিন পূর্বে তাঁর "পল্লীগীতি ও পূর্ব-বঙ্গ" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর বহু দিনের গবেষণার পরে তিনি বর্তমান পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যার তুল্য পুস্তক ইতিপূর্বে বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নি। পাঁচশো পৃষ্ঠার উপরের এই বইখানিতে লেখক বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলের প্রায় সকল প্রকার লোকসঙ্গীতের নিদর্শন তুলে ধরেছেন। ভালোমন্দ বাছাই করার দিকে তিনি যাননি—বিলুপ্তপ্রায় লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গীতগুলিকে সংগ্রহ করে রক্ষা করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য মনে করেছেন। এই সংগ্রহে তিনি পল্লীগীতিগুলিকে বিষয়-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করেছেন, যেমন, লৌকিক ধর্ম উৎসব ও অনুষ্ঠান—যার মধ্যে আছে গম্ভীরা, গমীরা, গাজন, নীল, ঝুমুর, জারি, টুসু, আগমনী ও বিজয়া ইত্যাদি; বহিঃ প্রাকৃতিক—যেমন, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মৈষাল, বারমাস্যা, ধানকাটার গান, পালা-গান, ইত্যাদি; অন্তর ধর্ম—যথা, বাউল, সংকীর্তন, দেহতত্ত্ব, ইত্যাদি। এ-ছাড়া ছড়া, প্রবচন, ধাঁধা অনাচার, প্রতিবাদ; এবং বিবিধ বস্তু, যেমন, গাজির গান, হোলির গান, রঙ্গ-রসিকতা ইত্যাদি। এ-ছাড়া ছড়া, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদিও তিনি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে পরি-বেশন করেছেন। পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে লোক-বাদ্য, লোক-নৃত্য ও পরিভাষা-পরিচয়। লোক-বাদ্যের চিত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে।

ত্রুটিহীন পুস্তক রচনা, বিশেষ করে এই ধরনের সংগ্রহ সংকলন, অভাবনীয়। সামান্য ত্রুটি (যেমন ফরিদপুর-যশোর-নদীয়ার সঙ্গমস্থলে "অষ্টক গান" নামে এক

ধরনের নাচ-সহযোগে গানের কোনো উল্লেখ পেলাম না, পেলাম না "গারশি" নামে একটি লৌকিক অনুষ্ঠানের; অথবা কবিয়াল এণ্টনি ফিরিঙ্গীকে ইংরেজ-তনয় বলা) নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, তবু বলবো এ-পুস্তকের ন্যায় সর্বব্যাপী (conprehen-sive) পুস্তক ইতিপূর্বে আর নজরে পড়ে নি। আর লেখার সহজ, সচ্ছন্দ ভঙ্গীতে পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক। আয়তনের তুলনায় মূল্য নিতান্ত নগণ্য। শিক্ষিতজনের কাছে একান্ত অনুরোধ এ-পুস্তক পাঠ করলে আনন্দ ও রস লাভ করবেন। শ্রীদেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

(১৬৩।৬৬)

ধর্ম

তপোবনের বাণী। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী) প্রণীত। শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বর্ধমান হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক পুস্তকের মুখবন্ধে গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়াছেন—'তিনি বঙ্গভঙ্গের যুগে স্বদেশী আন্দোলনের উষাকালে দেশ-মাতৃকার চরণে নিবেদিত-প্রাণ স্বাধীনতা-যজ্ঞের একজন আদি-হোতা, স্বদেশী শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মহামনীষীর সহকর্মী, আবার তন্ত্রাদি শাস্ত্রে স্যার জন উড্রফের সহযোগী উপদেষ্টা।' বর্তমানে ইনিই বাংলার মনস্বী এবং সাধক সমাজের সর্বজনপূজ্য স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী। ১৯৩৮ সালে তাঁহার লিখিত 'তপোবনের বাণী' 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বালানন্দ স্মারক গ্রন্থমালায় প্রথম পুস্তকস্বরূপে ইহা পুনঃপ্রকাশিত করা হইয়াছে। পুস্তকের আলোচনায় স্বামীজী তাঁহার প্রখর মনস্বিতা, সর্বোপরি প্রত্যক্ষানুভূতির প্রভাবে এ-দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সারভূত অধ্যাত্মতত্ত্বের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন। দেওঘরস্থ পুণ্যশ্লোক বালানন্দ গিরিমহারাজের আশ্রমের নাম তপোবন। এই আশ্রমের পুণ্যময় প্রতিবেশে প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়। লেখার মূলে তিনি গিরিমহারাজের তপঃ-প্রভাবিত শক্তির প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছেন। এ-দেশের তত্ত্বদর্শীগণ মানুষের জীবনের পরম প্রয়োজনস্বরূপ সাধ্যতত্ত্ব বস্তুকে 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লেখক তপোবনের নিরালা শান্ত গুহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হন। অন্তর্মুখীন সে গতি, বাহির হইতে মোড় ফিরাইয়া ভিতরের দিকে গতি। আমাদের মনে হয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একবার শ্রীশ্রীগিরিমহারাজের শরণাপন্ন হইয়া সংসারী সাধারণ মানুষের পক্ষে পরমতত্ত্বোপলব্ধির উপায় কি জানিতে চাহেন। গিরিমহারাজ উত্তরে বলেন—'উল্টাইয়া লও।' অর্থাৎ যে মনটি সংসারে দিতেছ সেটি ভগবানের দিকে অভিনিবিষ্ট কর। এইটি করিতে পারিলেই আমাদের ভিতরে গুহাহিত যে পরম সত্যটি রহিয়াছে, তাহা পরিস্ফূর্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের পক্ষে মুক্ত এবং নিত্য জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এইটি করিতে হইলে গ্রন্থকার স্বামীজীর ভাষায় —"এক জায়গায় খাঁটি পাত্তা লাগিয়ে নিতে হয়" এবং "সে জায়গাটা হচ্ছে আমারই অন্তরতম বস্তুটা।" এই পরম বস্তুর পাত্তা পাইবার উপায় সদ্গুরুর আশ্রয়। আমাদের ভিতরে বিশ্বের সব শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে—'স এষ বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।' শুধু আবাদের ভিতরই নয়, পৃথিবীর প্রতি অণু-পরমাণুতেও সেই গুহাহিত শক্তি গহ্বরেষ্ঠ আছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের ভাষায়—'আমরা পুঁজিতে ইচ্ছামত দিতে পারিনে এই তো আফসোস। সেইটে হয় কি করে, তার ফিকিরই হচ্ছে সাধন।' এই ফিকির জানিয়া লইলে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটে। 'সেই শক্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে 'ঘুমিয়ে' রয়েছে বলেই না সব কিছু হয়েছে এক একটা গুহার মত। এক একটা গুহা ভেঙ্গে বড় হতে গেলে ভেতরকার কুণ্ডলীগুলো, গাঁট-গুলো, কতক খুলতেই হবে। যাতে তার বাঁধান, তাতে করেই মুক্তি; যবে ব্রহ্মচারিজী যেমন বলতেন উল্টো প্যাঁচ।' গ্রন্থকার এই প্যাঁচ খুলিবার প্রেরণা আমাদের জাগ্রত করিয়াছেন। তিনি আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—মানুষ নানান গণ্ডী স্বীকার করে নিজেকে যেন আটকে চেপে একটুকু করে রেখেছে। এসবের ভিতর দিয়েও সে বাঁধন ঠেলে মুক্তি চাচ্ছে, তার আপন বিকাশ ও আপন স্ফূর্তি, আপন রসাস্বাদনটি অকৃপণ, অকুণ্ঠিত করতে চাচ্ছে। "বাসুদেব সর্বম ইতি এটা কেবল শ্রেয়ের পথ নয়, প্রেমের পথও বটে।" অধ্যাত্মরসপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই পুস্তকখানির আলোচনায় এবং অনুধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন।

২৪৬।৬৬

বিবিধ

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা। আশীষ বসু। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার। মূল্য ১·২৫।

হাতের কাজে শিল্পসৃষ্টিতে পশ্চিম-বঙ্গের খ্যাতি ইতিহাসের কথা। দীর্ঘকাল নানা রাজনীতিক বিপর্যয় এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেক কিছুর মতন হস্ত-শিল্পেও একটা দারুণ আকাল দেখা দিয়েছে। এখন অবশ্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কারুশিল্পীদের পুনর্বাসন এবং তাদের তৈরি সামগ্রী দেশের এবং বিদেশের বাজারে [illegible] করার চেষ্টা হচ্ছে। সেই প্রচেষ্টারই [illegible] নিদর্শন আলোচ্য পুস্তিকা। এতে আছে পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোহা, কাঁসা, তামা, পিতল, মাটি, শাঁখ, কাঠ, শোলা দিয়ে তৈরি শিল্পসামগ্রী থেকে হীরা-মুক্তা, চুনি-পান্না, সোনা রূপার ও ফুলের গহনা, মিষ্টান্ন-শিল্প, দেশী বাদ্যশিল্প, স্টেজ-ড্রেস সিন-পেণ্ট প্রভৃতির সচিত্র বিবরণ। পুস্তিকা খানি পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পের প্রতি জন-সাধারণের অনুরাগ জাগিয়ে তোলায় সহায়ক হবে।

ফুটবল মরসুমের চিহ্নিত শেষ দিন ৩০শে সেপ্টেম্বর আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। ময়দান এখন খেলাধুলোর জন্য বন্ধ। চিরাচরিত প্রথামত পয়লা অক্টোবর থেকে ১৫ দিনের জন্য ময়দানে খেলাধুলো করা চলে না। দখলী মাঠে যাতে ক্লাবের স্বত্ব-স্বামিত্ব না জন্মায়, তার জন্যই ব্রিটিশ আমল থেকে এই ব্যবস্থা। আগে ক্লাবের তৈরী তাঁবুও ভেঙে ফেলা হত। এখন তাঁবু শুধু বন্ধ রাখা হয়। মাঠে খেলাধুলো করার অধিকার থাকে না। ১৫ অক্টোবরের পর ক্রিকেট মরসুমের সূচনা। এদিকে কলকাতার ফুটবল দলগুলির ডি সি এম এবং রোভার্স, ডুরান্ডে অভিযানের পালা।

কলকাতার ফুটবলে এবার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের জয়-জয়কার। তারা লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড জয় করে কলকাতা ফুটবলের দুর্লভ সম্মান 'ডাবলসে'র অধিকারী হয়েছে।

'ডাবলস' লাভ ইস্ট বেঙ্গলের কাছে অবশ্য নতুন সম্মান নয়। কলকাতার ফুটবল ক্ষেত্রেও নতুন ঘটনা নয়। অনেক ক্লাবই এর আগে ডাবলস পেয়েছে, ভবিষ্যতেও পাবে। তবে দুই দিক দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তারা মোট ৯বার শীল্ড জয় করে এক দিকে যেমন ৯বার আই এফ এ শীল্ড জয়ে অতীতের ঐতিহ্যশালী দল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের রেকর্ড স্পর্শ করেছে, তেমনি এবার নিয়ে পাঁচবার 'ডাবলস' লাভের এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ছাড়া কোন দল এর আগে ৯বার শীল্ড বিজয়ী হতে পারেনি। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে আর কোন দল পাঁচবার ডাবলস লাভেরও সম্মান পায়নি। সুতরাং ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের পাঁচবার 'ডাবলসে'র সম্মান লাভ এক দিকে যেমন কলকাতার ফুটবলের অনন্য কৃতিত্ব, অপর দিকে এ বছরের সাফল্য তাদের দলগত সংহতি এবং উঁচু মানের ক্রীড়া-কীর্তির পরিচায়ক। যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার লাভও বটে।

*

লীগের ২৮টি এবং শীল্ডের ৮টি খেলার ফাঁকে ফাঁকে সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই, ইস্ট বেংগলই একমাত্র দল, যারা একটা স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে খেলে গেছে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ইস্ট বেংগল কোন দিন খারাপ খেলেনি। অনেক খেলাতেই তারা সুনাম বজায় রাখতে পারেনি, নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে আক্রমণ রচনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, এমন কি, কোন কোন খেলায় তাদের পতন আসন্ন বলেও মনে হয়েছে। তবু অন্যান্য দলের সঙ্গে তুলনায় ইস্ট বেঙ্গলের ক্রীড়াধারা অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে রক্ষণভাগের তো কথাই নেই।

আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পুরো মূল্য দিয়েও বলা যায়, দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগই এবার ইস্ট বেংগলের লীগ ও শীল্ড জয়ের প্রধান কারণ।

বি এন রেল দলের বিরুদ্ধে শীল্ড ফাইন্যালে জয়ের পর ইস্ট বেংগলের সভ্য-সমর্থকরা গোলদাতা পি সেকে কাঁধে চড়িয়ে আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন

বি এন আর ও ইস্ট বেঙ্গলের প্রথম দিনের শীল্ড ফাইন্যাল খেলায় রেল গোলরক্ষক দীপক দাসকে একটি বল ধরতে দেখা যাচ্ছে

গোলরক্ষক থঙ্গরাজের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষকের মর্যাদা থাকলেও এর আগে এই কলকাতার মাঠেই তিনি আগে যে ক্রীড়া-[illegible]র স্বাক্ষর রেখেছেন, তার চেয়ে এ বছরের ভূমিকা অনেক উজ্জ্বল। গৌরবোজ্জ্বল জীবনের শেষ পাদে এসে থঙ্গরাজ এত ভাল খেলতে পারবেন কিনা, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু থঙ্গরাজ প্রমাণ করে দিয়েছেন, এখনো তিনি ভারত-শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক।

[illegible] [illegible]টি এখনো পুরোপুরি [illegible] আছে। কোন খেলায় ঠিক [illegible] নেই। একটি খেলায় দেখেছি, বিপক্ষ সেন্টার ফরোয়ার্ড থঙ্গরাজের বাঁ দিক তাক করে বাঁ পায়ের শট নিতে উদ্যত, গোলাভিমুখী [illegible] গতি আন্দাজ করে থঙ্গরাজও দেহের পুরো [illegible] রেখেছেন বাঁ দিকে, সেন্টার ফরোয়ার্ড চকিতে ডান পায়ে বল নিয়ে [illegible] থঙ্গরাজের ডান দিক দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] সে শটে পরাজিত হতে পারেন। কিন্তু থঙ্গরাজও চকিতে বাঁ দিক থেকে দেহকে সম্পূর্ণ টেনে এনে ডান দিকে ঝাঁপ দিলেন, উড়ন্ত থঙ্গরাজের বজ্রমুষ্টির বাধা পেয়ে বল হল বিপথগামী। এই প্রক্রিয়ার জন্য দেহের কতখানি পেলবতা ও সাবলীলতা প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়।

গোলকিপারের একটি ভুল যেমন একটি দলের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তেমন গোলকিপারের একটি ভাল শট রুখবার একটি দলের ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। সুতরাং ভাল গোলকিপার দলে থাকলে দলের সব খেলোয়াড়ের আত্ম-বিশ্বাস বাড়ে, পেছন দিকে বেশী নজর রাখার [illegible] বদলে আক্রমণাত্মক ভূমিকার প্রেরণা আসে।

থঙ্গরাজের [illegible] [illegible] তিনজন খেলোয়াড় সম্বন্ধেও এ-কথা বলা যেতে পারে। আমার [illegible] [illegible], বি দেবনাথ, নাইম এবং শান্ত মিত্র এখন নিজ নিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বি দেবনাথকে এবার মারডেকাগামী ভারতীয় দলে স্থান দেওয়া হয়নি, তবু রাইট ব্যাকে দেবনাথের চেয়ে আর কেউ ভাল, এ কথা স্বীকার করতে পারছি না। তেজী স্টপার জারনেল সিং-এর পরে তো বটেই, জারনেল সিং-এর পাশেও স্টপার হিসবে নাইমের যোগ্যতা অনস্বীকার্য। কারণ, জারনেলের গৌরবের দিনে অপরাহ্নের ছায়া নামতে আরম্ভ করেছে। আর নাইমের জীবনে এখন মধ্যগগনের দীপ্তি। লেফট ব্যাক হিসাবে শান্তচিত্ত খেলোয়াড় শান্ত মিত্রেরও জুড়ি কম। সুতরাং ডিপ ডিফেন্স বলতে যা বোঝায় ইস্ট বেঙ্গলের সেই ব্যূহ প্রায় দুর্ভেদ্য। মধ্যভাগের মাজাও বেশ শক্ত। হাফ ব্যাক পি সিংহের পরিপূরক নেই। পুরনো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, পুরনো খেলোয়াড় রাম বাহাদুরও তেমনি এবার দেখিয়েছেন বাড়তি বিক্রম।

ইস্ট বেঙ্গলের পুরোভাগও অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক সঙ্গতিপূর্ণ। পরিমল দে আরও পরিমার্জিত এবং

ইস্ট বেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেলের সেমি ফাইন্যাল খেলায় রেল দলের গোলের মুখে সীতেশ দাসের গোল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

প্রাণবন্ত। পায়ের শটে শক্তি ও গতি আগের চেয়ে বেশী। কলা-নৈপুণ্যের দিক দিয়েও আগের চেয়ে কুশলী খেলোয়াড়। সীতেশ দাস আরও বেশী পরিশ্রমী। নৈপুণ্যগত উৎকর্ষে ভাটা পড়লেও সমাজপতির অভিজ্ঞতা বেড়েছে। পাঞ্জাবের সিংহশিশু হিসাবে দলে এসেছেন গুরুকৃপাল সিং। দেহের শক্ত বাঁধুনি, মজবুত কাঠামো, মেহনতী মানুষ। ক্রীড়াগত পরিশুদ্ধ দক্ষতায় এখন পর্যন্ত জাত খেলোয়াড় হিসাবে পারগণিত না হলেও গুরুকৃপাল বিপক্ষ রক্ষণব্যূহকে তছনছ করে দিতে ওস্তাদ। দু পায়ে আছে বুলেট শট। সুতরাং খেলোয়াড় সম্পদে সম্পদশালী ইস্ট বেঙ্গলের কলকাতা ফুটবলের 'ডাবলস' লাভ সামর্থ ও সংহতির পুরস্কার।

*

এখন আই এফ এ শীল্ডের খেলা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। ৩৭টি দল নিয়ে এবার আই এফ এ শীল্ডের খেলার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই ৩৭টি দলের মধ্যে কেরালার আলিন্ড এফ সি এবং ব্যাঙ্গালোর জেলা দল শেষ পর্যন্ত খেলতে আসেনি। বাইরের নাম-করা দলের মধ্যে যারা এসেছিল তাদের মধ্যেও এক ইণ্ডিয়ান নেভি এবং মধ্যপ্রদেশ একাদশ রাউন্ড থেকে খেলার সুযোগপ্রাপ্ত এবং শক্তিশালী দল হিসাবে পরিচিত হায়দরাবাদ একাদশ কোনক্রমে এরিয়ানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে পরের খেলাতেই বি এন রেল দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। তবে হায়দরাবাদের অনেক শক্তিই তো আমরা কেড়ে নিয়েছি। ওদের নাইম, হাবিব ও আফজলের মত তিনজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এখন কলকাতার খেলোয়াড়। স্বনামখ্যাত ইউসুফ খাঁরও পায়ে চোট থাকায় কলকাতায় খেলতে আসতে পারেন নি।

নেভি অর্থাৎ নৌবাহিনীর খেলোয়াড়দের জলের সঙ্গে সম্পর্ক বেশী হলেও জলের মাঠে খেলাতে কিন্তু অনভ্যস্ত। বোম্বাই এবং পশ্চিম ভারতের শুকনো মাঠেই ওরা খেলতে অভ্যস্ত। কিন্তু এবার আই এফ এ শীল্ডে কলকাতার জলকাদার মাঠে ওদের ক্রীড়াপদ্ধতি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। যদিও কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওদের কাছে শক্তিশালী মোহনবাগানের পরাজয় এবারকার শীল্ড খেলার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফলাফল তবু ওদের জয় ফ্লুকের ফল নয়। সেমি-ফাইন্যালে বি এন রেলের কাছে ইণ্ডিয়ান নেভি দলকে হার স্বীকার করতে হলেও রেল দলের খেলোয়াড়দের চেয়ে নৌবিভাগের খেলোয়াড়রা কোন অংশে খারাপ খেলেনি। নেভির ব্যাক উচিলের দুরন্ত ক্রীড়াধারা এবং গোলরক্ষক এস সি বসুর অসাধারণ দক্ষতা দর্শকদের হাততালি আদায় করে নিয়েছে। গোলকিপার এস সি বসু যে ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে আগামী দিনের আশা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৪ দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা এবারকার শীল্ডের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লীগে যে মহমেডান দলকে চারটি খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছে এবং দুবারই তার স্বীকার করতে হয়েছে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে, শীল্ডে কিন্তু সেই মহমেডান দল ইস্ট বেঙ্গলকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছে। ৪ দিন তারা দাপটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংগ্রামমুখী ক্রীড়াধারায় অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রাখে।

এবার ইস্ট বেঙ্গল এক দিক দিয়ে রাজস্থান ক্লাবকে ৫—০ গোলে, মহমেডান স্পোর্টিংকে ০—০, ১—১, ০—১ ও ১—০ গোলে এবং সেমি-ফাইন্যালে ইস্টার্ন রেলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে উঠে। অপর দিক থেকে ফাইন্যালে উঠতে বি এন রেলকে একে একে পরাজিত করতে হয় পোর্ট কমিশনার্সকে ৪—১ গোলে, বালি প্রতিভাকে ২—১ গোলে এবং মেটাল

শীল্ড ফাইন্যালের দ্বিতীয় দিনে ইস্ট বেঙ্গলের লেফ্‌ট-ইন পি দের পায়ের উপর থেকে একটি নিশ্চিত গোল বাঁচাচ্ছেন বি এন রেলের গোলরক্ষক দীপক দাস

ফাইন্যালে ইণ্ডিয়ান নেভিকে একই ফলাফলে।

জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী ক্লাব মোহনবাগান অপ্রত্যাশিতভাবে কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে বিদায় গ্রহণ করায় শীল্ড প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হলেও ইস্ট বেঙ্গল ও বি এন রেল দলের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করেও ক্রীড়ামোদী মহলে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং খেলা দেখার টিকিটের জন্যও হাহাকার পড়ে যায়। প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। কোন সময়ই ক্রীড়ামান মাঝারিয়ানার উপরে ওঠে না। দ্বিতীয় দিনের খেলায় প্রথমার্ধের ২৭ মিনিটের সময় পি দের দেওয়া গোলে ইস্ট বেঙ্গল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। দু দিনের খেলার দর্শনী থেকে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। লীগ ও শীল্ডের খেলার দিক দিয়ে একে রেকর্ড সেল বলা যেতে পারে। কারণ, লীগ বা শীল্ডের নির্দিষ্ট টিকিট মূল্যে কোন চারিটি খেলায় এর আগে ৬৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় নি।

ইস্ট বেঙ্গলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় স্টপার নাইম জনডিস ও প্যারা টাইফয়েড রোগের আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়ায় ফাইন্যালে খেলতে পারেন নি। দলের অধিনায়ক চন্দন ব্যানার্জি যিনি প্রয়োজনে আগেও স্টপারের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনিই স্টপার হিসাবে খেলেন এবং যোগ্যতার সঙ্গেই নিজ দায়িত্ব পালন করেন। সেন্টার ফরোয়ার্ড গুরুকৃপাল সিং-এর পায়ে চোট থাকায় তিনিও প্রথম দিন ফাইন্যালে খেলতে পারেন নি। দ্বিতীয় দিন খেলায় অংশ নেন। সমভাবে বি এন রেল দলকে নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড রাজেন্দ্রমোহনের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। তাঁরও পায়ে চোট ছিল। দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালে বিরতির পর তিনি মাঠে নামলেও আদৌ নিজ সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। দু দিনই রেল দল পরাজিত প্রতিযোগীর মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অপর দিকে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দিলেও ইস্ট বেঙ্গল দ্বিতীয় দিনের খেলায় একটির বেশী গোল করতে পারে না।

শীল্ডের খেলায় এবার ৮ জন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিকের অধিকারী হয়েছেন। নীচে হ্যাটট্রিকের খতিয়ান এবং সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল:

হ্যাটট্রিক

এ ভট্টাচার্য (বাটা) ৫ গোল—হাওড়া জেলা দলের বিরুদ্ধে;

বি লাহিড়ী (এরিয়ান)—বাটা স্পোর্টসের বিরুদ্ধে;

রামচন্দ্রন (মধ্যপ্রদেশ)—বিহার রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের বিরুদ্ধে;

পি মজুমদার (বি এন আর)—পোর্ট কমিশনার্স দলের বিরুদ্ধে;

ইন্দার সিং (জলন্ধর লীডার্স ক্লাব)—হুগলী জেলা দলের বিরুদ্ধে;

চুনী গোস্বামী (মোহনবাগান)—এ এস সি ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে;

গুরুকৃপাল সিং (ইস্ট বেঙ্গল)—রাজস্থান ক্লাবের বিরুদ্ধে;

পি কে ব্যানার্জি (ইস্টার্ন রেল)—মধ্যপ্রদেশ একাদশের বিরুদ্ধে;

সমস্ত খেলার ফলাফল

প্রথম রাউণ্ড

রাজস্থান ক্লাব ৩ : ২৪ পরগনা জেলা ১
উয়াড়ী ক্লাব ১ : চন্দননগর স্পোর্টিং ০
হুগলী জেলা ১ : জর্জ টেলিগ্রাফ ০
জামসেদপুর ২ : খিদিরপুর ক্লাব ১
উড়িষ্যা এফ এ ১ : হাওড়া ইউনিয়ন ০
বাটা স্পোর্টস ৫ : হাওড়া জেলা ১
বালি প্রতিভা ৫ : বার্নপুর ইউনাইটেড ০
পোর্ট কমিশনার্স ১ : কালীঘাট ক্লাব ০
স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২ : ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস ২ : ০

দ্বিতীয় রাউণ্ড

রাজস্থান ক্লাব ২ : কোর অব সিগন্যাল গোয়া ০
মহমেডান স্পোর্টিং ৪ : উয়াড়ি ০
জলন্ধর লীডার্স ক্লাব ১ : ৪ : হুগলী জেলা ১ : ২
ইস্টার্ন রেল ১ : জামসেদপুর ০
আসাম পুলিস ২ : উড়িষ্যা এফ এ ০
মধ্যপ্রদেশ ৯ : বিহার রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ০
এরিয়ান ৪ : বাটা স্পোর্টস ০
বালি প্রতিভা ৪ : দিল্লী একাদশ ০
বি এন আর ৪ : পোর্ট কমিশনার্স ১
ইণ্ডিয়ান নেভি ০ : ৩ : স্পোর্টিং ইউনিয়ন ০ : ০
আলিণ্ড এফ সি—স্ক্র্যাচ : ব্যাঙ্গালোর জেলা—ক্র্যাচ
এ এস সি ব্যাঙ্গালোর ৫ : ইয়ং স্টারস এলাহাবাদ ১

তৃতীয় রাউণ্ড

ইস্ট বেঙ্গল ৫ : রাজস্থান ০
মহমেডান স্পোর্টিং ০ : ২ : লীডার্স ক্লাব ০ : ০
ইস্টার্ন রেল ৯ : আসাম পুলিস ০
মধ্যপ্রদেশ ২ : পাঞ্জাব পুলিস ১
হায়দরাবাদ ১ : এরিয়ান ০
বি এন আর ১ : বালি প্রতিভা ০
ইণ্ডিয়ান নেভি ৩ : ৩ : আলিণ্ড এফ সি—স্ক্র্যাচ
মোহনবাগান ৬ : এ এস সি ব্যাঙ্গালোর ০
ইণ্ডিয়ান নেভি ৩ : ৩ : অলিণ্ড এফ
ইস্ট বেঙ্গল ০ : ১ : ০ : ১ : মহঃ স্পোর্টিং ০ : ১ : ০ : ০
ইস্টার্ন রেল ৩ : মধ্যপ্রদেশ ১
বি এন আর ২ : হায়দরাবাদ ১
ইণ্ডিয়ান নেভি ২ : মোহনবাগান ১

সেমি-ফাইন্যাল

ইস্ট বেঙ্গল ২ : ইস্টার্ন রেল ১
বি এন আর ২ : ইণ্ডিয়ান নেভি ১

ফাইন্যাল

ইস্ট বেঙ্গল ০ : ১ : বি এন আর ০ : ০

অজয় বসু

সৈয়দ নাইমুদ্দিন

গত ক' বছর থেকেই ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এ বছর অন্ধ্র প্রদেশের খেলোয়াড় সৈয়দ নাইমুদ্দিন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেলেন ফুটবলের মক্কা কলকাতার ক্রীড়া-আসরে।

কাদের দেওয়া এ সম্মান? না, ভেটারেন্স ক্লাবের, যে ক্লাবের সভাপতি স্বয়ং গোষ্ঠ পাল এবং অতীত দিনের দিক্‌পাল খেলোয়াড়দের নিয়ে যাঁদের নির্বাচক সমিতি। সুতরাং সন্দেহ করার কিছু নেই যে, নাইম এ বছরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়।

এখানে বলা দরকার, উঁচু তারে বাঁধা ভাল খেলা বা ভাল খেলার নৈপুণ্য এবং যোগ্যতাই ভেটারেন্স ক্লাবের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বিচারের মাপকাঠি নয়। ক্রীড়া-কীর্তি অবশ্যই বিচারের মুখ্য মাপকাঠি। কিন্তু তার সঙ্গে খেলার মাঠে এবং মাঠের বাইরে খেলোয়াড়ের আচরণও বিচার্য বিষয়। দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি, সব দিক দিয়েই নাইমকে 'বেস্ট ফুটবলার অব দি ইয়ার' নির্বাচন যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার দান। যেমন নাইমের ক্রীড়াদক্ষতা, তেমন তাঁর ভদ্র ও বিনীত আচরণ। ফুটবল খেলতে গিয়ে কেউ ফাউল করবেন না, এমন আশা দুরাশা। ফুটবল খেলায় ফাউল করার অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের পক্ষে। আবার অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেও ফাউল হয়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনেও নাইম কোন ক্ষেত্রে ফাউল করেছেন বলে মনে পড়ে না। আর রেফারী বা খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি বা ঝগড়া-ঝাঁটি করার নজির নাইমের ক্রীড়াকোষ্ঠিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরও অনেক খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা এই সদ্‌গুণের অধিকারী। ক্রীড়া-শৈলীর সঙ্গে এই সদ্‌গুণের মিশ্রণেই নাইম 'বেস্ট ফুটবলার অব দি ইয়ার'-এর সম্মান পেতে পারতেন। প্রয়োজনের তাগিদেও ফাউল না করার দৃষ্টান্তে নাইম মহিমায় ও মর্যাদায় দর্শক চোখে আরও বড় হয়ে উঠেছেন। সত্যিই ভারতীয় ফুটবলের [illegible] [illegible] মহিমা সৈয়দ

এ বছরের ফুটবল মরসুমের তিনটি দৃষ্টান্ত থেকেই আমি নাইম সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশের প্রেরণা বোধ করছি। লীগে ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানের প্রথম খেলা। চকিত পায়ে মোহনবাগানের 'কালো

কেউটে' কানন নাইমের পাশ দিয়ে একটি বল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই বলেই শেষ পর্যন্ত গোল করলেন মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক। ইচ্ছে করলে নাইম পেনাল্টি সীমানার বাইরেই কাননকে ফাউল করে বিপদের সম্ভাবনা দূর করতে পারতেন, করেননি।

ইস্ট বেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেলের লীগের খেলা, যে খেলায় এ মরসুমে ইস্ট বেঙ্গলের একমাত্র পরাজয় এবং নাইমের ভুলে পি কে ব্যানার্জির বিজয়সূচক গোল. সে খেলাতেও ইচ্ছে করলে নাইম পি কে-কে ফাউল করে বিপদ কাটাতে পারতেন। কাটাননি। নাইম বলটি মিস্ করার ফলেই পেনাল্টি সীমার অদূরে পি কে বল পেয়েছিলেন এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে শট করলেও ব[illegible] আয়ত্তে নেবার ফাঁকটুকুর মধ্যে নাইম পি কে ব্যানার্জিকে পা বাড়িয়ে ফেলে দিতে পারতেন। কারণ, পি কে অফ্‌সাইডে ছিলেন না। কিন্তু দলের সমূহ বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও নাইম পি কে-কে ফাউল করা নীতিজ্ঞানহীনের পরিচায়ক বলে মনে করেছেন। ঠিক একই ধরনের অবস্থা লক্ষ করেছি আই.এফ এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্ট বেঙ্গলের দ্বিতীয় দিনের খেলায়। সেখানেও নাইমের ভুলে মহমেডান দলের বাসির গোল করেছেন। কিন্তু বাসিরকেও প্রতি ক্ষেত্রে দেখেছি পরাজিত সৈনিকের মত ফুটবল যোদ্ধার নীতিবোধ। দেখেছি, লাঞ্ছনময় মস্তকে নাইমকে ভুলের মাসুল গুনতে। বিপদের মুখে এই নীতিবোধের পরিচয়ে অবশ্যই দলের ক্ষতি। কিন্তু ভুলের জন্য অনুতাপে দগ্ধ হয়েও নীতি বিসর্জন দেননি নাইম। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

এতক্ষণ নাইমের ভুলের কথাই বলেছি। তাঁর ক্রীড়াশৈলীর কথা কিছু বলিনি। পরলোকগত ফুটবল 'কোচ' রহিম সাহেবের হাতে গড়া ফুটবল শিল্পী নাইম। প্রথমে খেলতেন রাইট ইনে। পরে ব্যাক। ব্যাক হিসাবেই সারা ভারতে ও'র ফুটবল খ্যাতি। ১৯৬৩-তে পেনাং-এ ভারতীয় যুব দলের অধিনায়কের সম্মান পাবার পর ঐ বছরই প্রাক্-অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের বড় দলে স্থান। পরম শক্তিশালী হায়দরাবাদের রক্ষণভাগের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে এ ক' বছর সুনাম। ওই বছরই ইস্ট বেঙ্গলের ডাকে কলকাতায় এসে নতুন জায়গায়, অর্থাৎ স্টপার হিসাবে খেলেছেন। এবং সুবিখ্যাত জারনেল সিং, দৃঢ়চেতা সি প্রসাদ, উঠতি খেলোয়াড় সঞ্জীব বসু ও জন এবং অসমসাহসী অরুণ ঘোষের মত সব স্টপারদের মধ্যে বছরের সেরা স্টপার হিসাবে স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্যাক নাইমের চেয়ে স্টপার নাইমের ভূমিকা আরও সফল।

সন্দেহ নেই, নাইম অপেক্ষাকৃত মন্থর কিন্তু বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। ধীর স্থির ক্রীড়াভঙ্গিতে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। চটকদার হবার প্রচেষ্টা নেই। দৈহিক সামর্থ্যের সবিক্রম আস্ফালনে ও'র প্রবল অনীহা। অথচ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। গোলের মুখের জটিল পরিস্থিতিকে সহজ প্রয়াসে হালকা করে দেবার ও'র অসাধারণ দক্ষতা।

এইখানেই নাইম ফুটবলের সুন্দর শিল্পী। শিল্পের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যা অতি সহজে এবং সাবলীল ভঙ্গিতে করা হয়— যার মধ্যে কষ্টসাধ্য প্রয়াসের প্রমাণ মেলে না, তাই শিল্প। যেমন পাখি যখন ডানা ঝটপট করে আকাশে উড়ে বেড়ায়, তখন তার ওড়ার মধ্যে সৌন্দর্য ফোটে না, শিল্প প্রকাশ পায় না। কিন্তু যখন ডানা মেলে সাবলীল গতিতে নীল আকাশের বুকে চিরে ধেয়ে চলে, ডানা নাড়া চোখে পড়ে না, তখনই ফুটে ওঠে শিল্পের ছবি। ফুটবল খেলাতেও যিনি দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি না করে জটিল পরিস্থিতি সহজ ভঙ্গিমায় লঘু করে তুলতে পারেন, তিনিই ফুটবল শিল্পী। নাইমও একজন ফুটবল শিল্পী।

—[illegible]

অরণ্যদেব লী ফক

আগুন-পাহাড়ের চূড়ায় বিস্ফোরণ...
সত্যিকারের শিলাবৃষ্টি যে কাকে বলে, অ্যাদ্দিনে সেটা বুঝলুম।
এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। আপনি আর ডঃ লার্ড ঘোড়ায় উঠে বসুন।

প্রায় এসে পড়েছি!

পাহাড় থেকে সামনে পাথরের চাঁই উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে!
নদী পার হতে পারলে বেঁচে যাব!

অরণ্যদেব, আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি!
ধন্যবাদ, লঙ্গোবাসী, তোমরা প্রকৃত বন্ধু!

কী ব্যাপার হয়েছে জানিস? অরণ্যদেবই গুপ্ত পাহাড়টাকে ফাটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।
ঠিক বলেছিস।
কী বলছে ওরা?
কিছু না, নতুন একটা কিংবদন্তীর সূচনা হতে চলল ---

আপনি আমাদের রক্ষা করলেন। কে আপনি?!
সেটা জেনে আপনার কী হবে? অরণ্য-রক্ষী বাহিনীকে খবর পাঠাচ্ছি, তারা এসে আপনাদের নিয়ে যাবে।

খবর যাচ্ছে অরণ্য-রক্ষী-বাহিনীর কাছে ----
ডঃ লার্ড বেঁচে আছেন --- গরম নদীর কাছে... আগুন পাহাড় থেকে আগুন বেরোচ্ছে...

অরণ্যরক্ষীদের সদর-ঘাঁটিতে ---
তাহলে আর আশা নেই।
'আগুন-পাহাড়ে অগ্ন্যুদগার'
ওঁদের ছেড়ে দিয়ে আমি অন্যায় করেছি ---
স্যার, একটা খবর এসেছে...

জঙ্গল থেকে খবর এসেছে --- দুজনেই জীবিত --- আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন...
!
!!
আগামী সপ্তাহে : ভূমিকম্প (২৭)

গত সপ্তাহে "গৃহদাহ"-র সেটে প্রদীপকুমার, সুচিত্রা সেন ও পরিচালক সুবোধ মিত্র
ফটো-দেশ
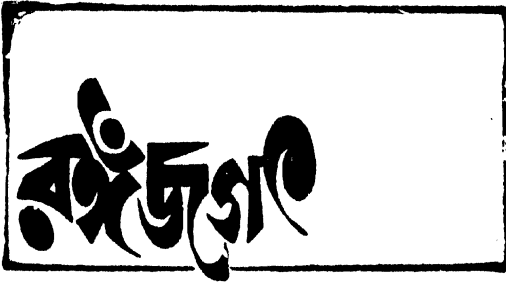
অচল অবস্থার অবসান হোক

আশা ছিল, গত সপ্তাহেই সিনেমার মালিক-কর্মচারী বিরোধের অবসান ঘটবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা-সংকট পরিস্থিতি এখনও অপরিবর্তিত। সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই ধরনের অচল অবস্থা সম্ভবত এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। এত দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘটও চলেনি। এই অবস্থার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষ দায়ী সে বিচারের সময় এখন নয়। তবে উভয় পক্ষই জানেন, দীর্ঘস্থায়ী এই সিনেমা-হরতালে সাধারণ চিত্রামোদীরা সন্তুষ্ট নন। বিশেষত পুজোর অল্প আগে এই সিনেমা-সমস্যা তাদের আরও নিরাশ করবে। সিনেমা ছাড়া পুজোর আনন্দ অনেকের কাছেই অসম্পূর্ণ। দর্শকদের প্রতিও সিনেমা কর্মচারী ও মালিকদের একটা দায়িত্ব আছে। তা ছাড়া এই দীর্ঘকালব্যাপী হরতালের দরুণ চলচ্চিত্র ব্যবসার কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তা উভয় পক্ষেরই বোধগম্য। কর্মচারীদের ভাবা উচিত, যে চলচ্চিত্র শিল্প তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে তার অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে তাঁরা নিজেদেরই দুর্গতি বাড়িয়ে তুলছেন। নিজেদের দাবি আদায়ের অন্য কোন গঠনমূলক ও কল্যাণপ্রদ পন্থা তাঁরা বেছে নিতে পারেন কিনা সে-বিষয়ে এখনই তাঁদের অবহিত হওয়া উচিত। অপরদিকে সিনেমার মালিকরাও সিনেমা কর্মচারীদের দাবি আরও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন আমরা এই আশাও পোষণ করি। আসল কথা, অতি সত্বর এই ধর্মঘটের অবসান প্রয়োজন। এর জন্য উভয় পক্ষকেই হয়ত কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

গত সপ্তাহে সিনেমা-মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। পরে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের জনৈক মুখপাত্র বলেন, "কর্মচারী ইউনিয়ন এখনও অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছেন। এই অবস্থায় 'লক-আউট' চালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।" অপরদিক কর্মচারী ইউনিয়নের মুখপাত্র বলেন, বিরোধ-মীমাংসার যে শর্ত তাঁরা দিয়েছেন তা মালিক পক্ষ মেনে নেননি। সংকটাপন্ন অবস্থার জন্য তাঁরা মালিক পক্ষকে দায়ী করেন।

পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে কোন কাজ হবে না। সিনেমা বন্ধ থাকুক এটা যদি কোন পক্ষেরই কাম্য না হয়ে থাকে তবে উভয়কেই খোলা মন নিয়ে আবার আলোচনায় বসতে হবে। ভ্রান্ত আত্মমর্যাদা-বোধ যেন কোন পক্ষেরই শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে। সিনেমা শিল্পের সমস্যা সৃষ্টির অধিকার কারো নেই। বহু কলাকুশলী ও কর্মীর জীবিকার উৎস এই চলচ্চিত্র শিল্প। সিনেমা কর্মচারীরা তাঁদের দাবিকেই শুধু প্রাধান্য দিতে গিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যান্য কারিগর, কলা-কুশলী ও কর্মীদের কথা যেন ভুলে না যান। আর যে অগণিত দর্শক এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের নৈতিক দাবির কথাও যেন তাঁরা বিস্মৃত না হন। এ-ব্যাপারে উভয়কেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করি। তাঁরা যেন চলচ্চিত্র শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলে না যান।
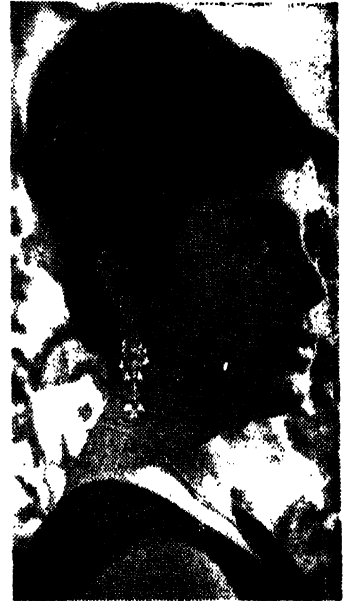
ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল পরিচালিত "ছায়াপথ" ছবিতে সুস্মিতা সান্যাল

আউটডোরে ক্যাপিটল ফিল্মস-এর "দুরন্ত চড়াই" (পরিচালক-জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) ছবির একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সোমেন চক্রবর্তী

ছবির পর ছবি

তীরভূমি

অভিনেতা-পরিচালক বিকাশ রায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে "তীরভূমি" গুরু বাগচী পরিচালনা করবেন) লোক ভারতী প্রোডাকশন্স।। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, রুমা গুহ-ঠাকুরতা।

শঙ্খবেলা

অগ্রগামী পরিচালিত অনুরাধা ফিল্মস-এর "শঙ্খবেলা" পুজোয় মুক্তিলাভ করবে জানা গেল। উত্তম-কুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী ছবির তিন প্রধান শিল্পী। পাহাড়ী সান্যাল, মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও শিশুশিল্পী বাপীকে ছবির উল্লেখযোগ্য চরিত্রে দেখা যাবে। সুধীন দাশগুপ্ত সংগীত-পরিচালক।

নতুন আঙ্গিকে "অভ্যুদয়"

১৯৪৫ সনে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে রঙমহলে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রথম "অভ্যুদয়" অভিনীত হয়। সজনী-কান্ত দাস, শ্রীসুবোধ ঘোষ এবং শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করলেন—কথায় ও গানে। এই রচনার নাম "অভ্যুদয়"। সংগীত পরি-চালনার দায়িত্ব নিলেন শ্রীসুকৃতি সেন। নৃত্য পরিকল্পনা করেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই গীতি-নৃত্যনাট্য "অভ্যুদয়" নতুন আঙ্গিকে গত সপ্তাহে প্রযোজনা করলেন কৃষ্টি-কল্যাণ গোষ্ঠী (মডেল লেবার ওয়েলফেয়ার সেণ্টারে)। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং সূত্রধারের কণ্ঠে (মহেন্দ্র গুপ্ত অভিনীত) জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা দর্শকের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সম্মিলিত নৃত্যাংশও খুব উপভোগ্য হয়েছিল (প্রহ্লাদ দাস পরিচালিত)। কিন্তু প্রথম দিকে প্রায় দৃশ্যই অকারণে দীর্ঘ, গানগুলি পৌনঃ-পুনিকতায় ভারাক্রান্ত। এর দরুণ গীতি-নৃত্যনাট্যটি মন্থর হয়ে পড়েছে—যা দর্শকের মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। গানের সুর খুবই চিত্তাকর্ষক (সুকৃতি সেন রচিত)। কিন্তু মাইকের দোষ কিংবা গাওয়ার ত্রুটি যে-কারণেই হোক্, গানের কথা স্পষ্ট হয়নি। ফলে দর্শকের মনের প্রেরণাও অনেকটা স্তিমিত হয়েছে।

আলোকসম্পাত বেশ প্রশংসনীয়। সুন্দর আলোক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নানা রঙের 'ব্যাকগ্রাউন্ড', আগুনের শিখা, সূর্যোদয় প্রভৃতি চমৎকার পরিস্ফুটিত। এই কৃতিত্ব শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

গীতি-নৃত্যনাট্যের ভূমিকা স্বরূপ প্রথম দৃশ্যের অভিনয় ক্লান্তিকর। তবে শিল্পীদের নাচ ভাল। তাই সব মিলিয়ে নৃত্যনাট্য হিসাবে "অভ্যুদয়" সুখভোগ্য। উপরিপাওনা হিসাবে এতে রয়েছে দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

সুষ্ঠু সম্পাদনার ভিতর দিয়ে "অভ্যুদয়" যত বেশী অভিনীত হয় ততই ভাল। বর্তমান আদর্শহীনতার যুগে এই অভিনয়ের প্রয়োজন আছে।

অভিনয়ের পূর্বে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীবিজয় সিংহ নাহার এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্র[illegible]চন্দ্র সেন এই নাটকের সাফল্য কামনা [illegible]ন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে কোন একটি অনুষ্ঠানে সায়রা বানুকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন দিলীপকুমার—তাঁদের আসন্ন পরিণয়ের কথা শোনা যাচ্ছে

"শঙ্খবেলা" ছবিতে শিশুশিল্পী বাপী ও বসন্ত চৌধুরী

"জাগো" বিশ্বরূপার নতুন নাটক

বনফুলের "ত্রিবর্ণ" উপন্যাস অবলম্বনে রচিত "জাগো"—বিশ্বরূপার নতুন নাট্যোপহার। কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন রাসবিহারী সরকার। নাট্যপরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। থিয়েটারস্কোপ-এর নতুন ডাইমেনশন-এ (তৃতীয় পর্যায়) নাটকটি পরিবেশিত হবে। অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে ১২ অক্টোবর।

বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে রয়েছেন অসিতবরন, নির্মলকুমার, সুমিতা সান্যাল, জয়শ্রী সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাবণী বসু, রূপক মজুমদার, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, আরতি দাস, সংগীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি।

রঙমহলের নতুন উপহার "অতএব"

কমেডি নাটক অভিনয়ে রঙমহলের শিল্পীগোষ্ঠীর বিশেষ সুনাম আছে। এবার তাঁরা উপস্থিত করছেন বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা হাসির নাটক "অতএব"। জহর রায় ও হরিধন মুখোপাধ্যায় নাট্যপরিচালক। এঁরা দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়ও করবেন। অন্যান্য প্রধান শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মীজনার্দন মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, মৃণাল, মিন্টু প্রভৃতি।

চিত্রপ্রদর্শক-সংস্থা

কলকাতার যে-সব চিত্রগৃহে বিদেশী ছবি দেখানো হয় সেই কয়েকটি সিনেমার প্রদর্শকরা তাঁদের পুরনো সংস্থা 'সিনেমাটোগ্রাফিক এক্জিবিটার্স' অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা'-র পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট। কীভাবে তা সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রদর্শকরা গত সপ্তাহে এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। সভাপতি ছিলেন মেয়র শ্রীহাফেসজী।

হলিউডের নতুন নৈতিক বিধি

আমেরিকার ফিল্মের ক্ষেত্রে নতুন নৈতিক বিধি-নিয়মের প্রবর্তন আসন্ন। গত ৩৬ বৎসর ধরে হলিউডে যে "মরাল কোড" চালু ছিল তা অচিরেই উঠে যাচ্ছে। আরও বেশী উদার, আধুনিক ও যুক্তিসঙ্গত নৈতিক শাসনের কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি শ্রীজ্যাক ভ্যালেন্টি। তিনি বলেছেন, "বর্তমান সমাজের জীবনধারা, সংস্কৃতি, নৈতিক বোধ এবং প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই নীতির পরিবর্তন করা হবে।"

নতুন কোড অনুযায়ী কিছু সংখ্যক ছবি পরিণত বয়সের দর্শকদের জন্য চিহ্নিত করতে হবে। কোন একটি বিষয়বস্তু কীভাবে দেখানো হবে তার উপরই নতুন কোড-এ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন বিষয়ই নিষিদ্ধ করা হয় নি। পুরনো কোড-এ গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমান ব্যবস্থায় নিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু নজর রাখতে হবে, শিল্প ও বাস্তবের শর্ত পালন করে কীরূপে তা বিন্যস্ত করা যায়। অতীতে হলিউডের ছবিতে 'নগ্ন দেহ' দেখানো বারণ ছিল। এখনকার কোড-এ বলা হয়েছে, অকারণ ও অনর্থক 'নগ্নতা' দেখানো চলবে না।

তবে অবশ্য স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এমন অবৈধ যৌন সম্পর্কের অনুমতি সংশোধিত কোড-এ নেই। নৃশংসতা, ক্রাইম, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ বিধি আরোপ করা হয়েছে। শ্রীভ্যালেন্টি বলেছেন, সরকারী আইন মারফত ফিল্ম সেন্সরশিপ এবং ছায়াছবির শ্রেণীভেদ চাপিয়ে দেওয়া আমেরিকান ঐতিহ্যের বিরোধী।

ভরতনাট্যমের অনুষ্ঠান

কুমারী সুজাতা গত সপ্তাহে (বুধবার) রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অল্পাধিক দুই ঘণ্টাকাল ভরতনাট্যম পরিবেশন করেন। তাঁর নৃত্যভঙ্গি, পদছন্দ এবং অভিনয় ও মুদ্রার কমনীয়তা দর্শকদের মুগ্ধ করে। শিল্পী শ্রীমতী টি এ রাজলক্ষ্মীর ছাত্রী।
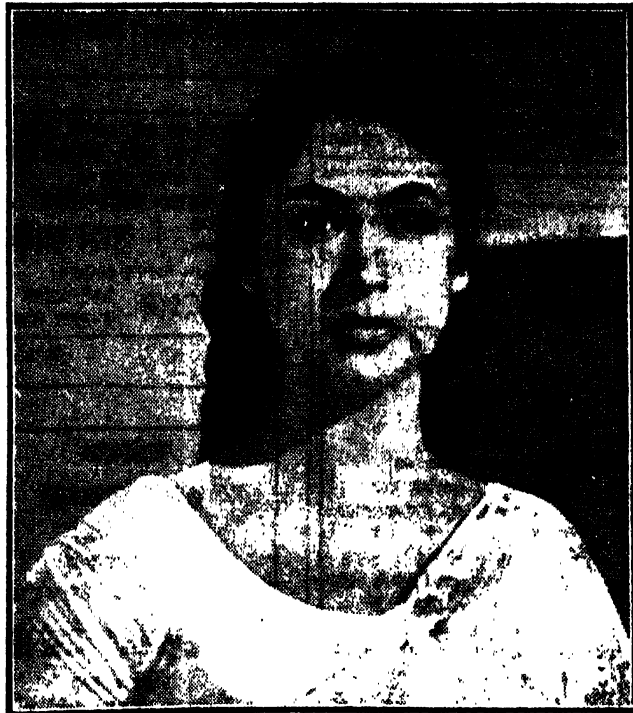
বি এম ডি মুভীজ-এর 'জীবনমৃত্যু' ছবিতে (পরিচালনা : হীরেন নাগ) সুপ্রিয়া চৌধুরী

স্মৃতি-পূজা

অভিনেত্রী সংঘ মহাত্মা গান্ধী, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন করেছিলেন। বিভিন্ন সালে ২ অক্টোবর এ'দের প্রত্যেকের জন্মদিন। সংঘ ৩ অক্টোবর এক সভায় মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীলালবাহাদুরের মহৎ দানের কথা স্মরণ করেন। ওই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। পরের দিন এক সভায় শ্রীঅচ্যুতকুমার দত্ত নাট্যাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নাট্যাচার্যের জন্মদিন উপলক্ষে থিয়েটার লাইবর পয়লা অক্টোবর করপোরেশন মডেল স্কুলে বাংলা নাট্যপ্রগতির এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

পরিণয়-বন্ধনে দিলীপকুমার ও সায়রা বানু

বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, দিলীপকুমার ও সায়রা বানু পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। ইউ এন আই-এর বার্তা অনুযায়ী তাঁদের 'এনগেজমেণ্ট' ইতিমধ্যে হয়ে যাবার কথা। দিলীপকুমারের 'ফ্যান'-রা এতদিন অনেক জনশ্রুতিই শুনেছেন। এক একবার এক একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর আসন্ন বিবাহের সংবাদ রটেছে। কিন্তু সায়রা বানুর নাম কখনও শোনা যায়নি। এই দুই শিল্পীর প্রণয় ও পরিণয়ের খবরে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কবে ঘনিষ্ঠতা হল ও কী-ভাবে তাঁদের সম্পর্ক সুন্দর পরিণতিতে এসে ঠেকল তা কারো জানা ছিল না।
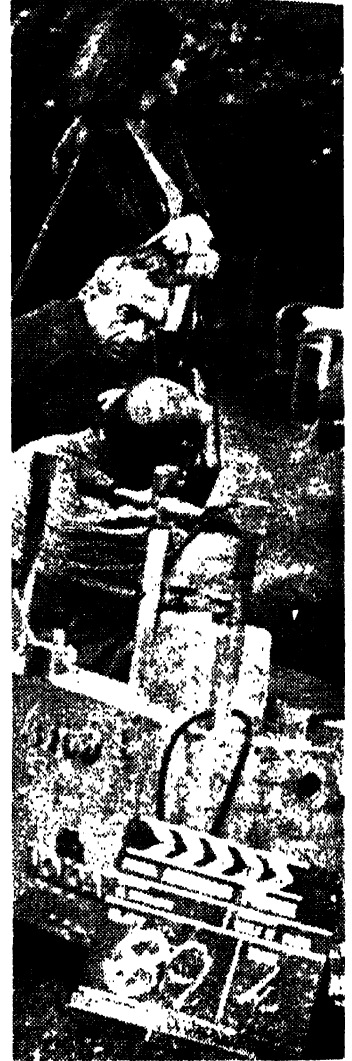
ভাবী শিল্পী-দম্পতিকে এখন সকলেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দিলীপকুমারের বয়স বর্তমানে ৪৪, সায়রা বানুর ২৬। জনপ্রিয় অভিনেতা দিলীপকুমারকে দর্শকরা যে হিন্দী চিত্রে শেষ দেখেছেন তার নাম : "দিল দিয়া দর্দ লিয়া", এখানে সায়রা বানুকে দর্শকরা শেষ দেখেছেন "আও প্যার করে" ছবিতে।

লণ্ডনে স্যুটিংয়ে ব্যস্ত চিত্রপরিচালক আন্তোনিয়নি

কে কোথায় কী করছেন

মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিয়নি এখন আছেন লণ্ডনে। সেখানে তিনি একটি ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। আপাতত এর নাম: "দি ব্লো আপ"। খুব গোপনে ছবির কাজ চলছে। আন্তোনিয়নি চান না, ছবির স্ক্রিপট নিয়ে এখনই আলোচনা হয়।

"কেদার রাজা" (পরিচালনা : বলাই সেন) ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও বলাই সেন

জানা গেছে, ছবির প্রধান চরিত্র একজন ফটোগ্রাফার। কালার ছবি।

রেনোয়া আবার ফ্রান্সে এসেছেন একটি ছবি করার জন্য। তাঁর ছবির নাম: "সে লা রেভল্যুসিয়"। রেনোয়া সম্পর্কে বড় খবর, তিনি ৭১ বৎসর বয়সে ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছেন। উপন্যাস তিনি লিখে ফেলেছেন। নাম: "লে কাহিয়ে দ্যু কাপিতেন জর্জ"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় কাহিনী রচিত। মুগ্ধ নায়ক তার ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায় দগ্ধ। প্রেমের কথা তিনি মুখ ফুটে কখনও বলতে পারেননি। যখন বলার জন্য তৈরি হলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ক্লদ শ্যাব্রল ফ্রান্সে তাঁর নতুন ছবি নিয়ে ব্যস্ত। নাম : ইসতোয়ার দেল। দুই 'কাজিন'-এর গল্প। একজন সুন্দরী, অপরজন সাধারণ। সুন্দরী যখন অন্য-জনের কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য হয়, কী ঘটে?

ভিসকন্তি যে ছবির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তার নাম: Lo Straniero। কামুর উপন্যাসের ভিত্তিতে এই ছবি। পটভূমি আলজিরিয়ার।

ব্রিটেনের **জোসেফ লসে** "অ্যাকসিডেন্ট" নামে একটি ছবি তৈরি করছেন। কালার ছবি, অক্সফোর্ডের পটভূমিতে শুটিং চলছে।

ফ্রান্সো রোজির হাতেও এখন ছবি আছে। নাম: "আই সন্তারৌন দেল ভ্যাতিকানো।" আঁদ্রে জিদের উপন্যাস অবলম্বনে তিনি ছবিটি করছেন।

আমেরিকার নির্বাক চলচ্চিত্র

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি। প্রদর্শনীতে থাকবে গ্রিফিথ, ওয়ালশ ও ডি-মিলের ছবি। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ৪ অক্টোবর দেখানো হয়েছে 'আমেরিকা', 'দি থিফ অব বাগদাদ' এবং 'রোড টু ইয়েস্টারডে'।

*

সিনেক্লাব অফ ক্যালকাটা ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজ-এর সহযোগিতায় আমেরিকা ও জার্মানীর পুরনো ক্লাসিক চলচ্চিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। আগামী ৮ই ৯ই ও ১০ই অক্টোবর গোখলে মেমোরিয়াল হলে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। আমেরিকার চলচ্চিত্র : "আমেরিকা"; রোড টু ইয়েস্টারডে: থিফ অব বাগদাদ, ফল অব বেবিলন: অরফানস, অব দি স্টরম। জার্মান চলচ্চিত্র : ওয়াক্স ওয়ার্কস—(নির্বাক) ডাচ মাস্টারপিস (অল্প দৈর্ঘ্য চিত্র)।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত 'চেম্মিন'-এর প্রযোজক আবু এবং পরিচালক রামু কারিয়াত তাঁদের ছবির ষোল মিলিমিটারের একটি প্রিন্ট নিয়ে বিদেশ সফরে বেরিয়ে পড়েছেন। য়ুরোপের বিভিন্ন শহর ঘুরে তাঁরা আমেরিকায় যাবেন। সম্প্রতি এই মালয়ালম ছবিটি বোম্বাইয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে।

[illegible] একটি নতুন

নাম : "প্রুডেন্স অ্যান্ড দি পিল"। জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল ব্যবহারের বিষয় নিয়ে ছবির বিষয়বস্তু।

জেমস বণ্ডের এবার বিয়ে হচ্ছে। পরবর্তী ছবিতে জেমস বণ্ডের পরিণয় দেখানো হবে এক জাপানী সুন্দরীর সঙ্গে। আকিকো ওয়াকাবায়াশি ওই চরিত্রে অভিনয় করবেন। সিন কোনারি সাজবেন জেমস বণ্ড। ছবির নাম : "ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস।"

দক্ষিণীর সমাবর্তন উৎসব

আগামী ১৬ অক্টোবর, সন্ধ্যায় "ত্যাগরাজ-হলে" দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর উৎসবে ভাষণ দেবেন এবং স্নাতকদের যোগ্যতা-পত্র বিতরণ করবেন।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

ইন্দো-আমেরিকান সোসায়েটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের নৃত্য ('ড্যান্সেজ অব ইণ্ডিয়া') পরিবেশন করেন আনায়েত

দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন এবং বিক্ষোভ এই সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিষয়। কিছুদিন আগে বার কাউন্সিলের পরীক্ষা প্রত্যাহার ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে উত্তর ভারতে যে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা ক্রমশ উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশের নানাস্থানে সম্প্রসারিত হয়। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কোন কোন অঞ্চলে নানাবিধ কারণবশত ছাত্র উচ্ছৃংখলতা চলে। গত ২৯ সেপটেমবর লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিন ঘণ্টা এবং ৩০ সেপটেমবর পাঁচ-ঘণ্টাব্যাপী ছাত্র ও পুলিসের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলে। ফলে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় চলতি সেশনের বাকী অংশ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। গোয়ালিয়রেও কয়েকটি কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ সংসদের কংগ্রেস দলের সদস্যদের এক বৈঠকে বলেন, দেশে ব্যাপক ছাত্র হাঙ্গামা বড় রকমের সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং এই সমস্যা প্রশমনের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

দেশী সংবাদ

২৬ সেপটেমবর—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের অনাস্থা প্রস্তাবটির আলোচনাকালে প্রধানত বনগাঁ ও বাঁকুড়ায় পুলিসের গুলি চালনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষের সদস্যগণের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আয়ের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ বেমানান রকমের বেশী হয়েছে দেখে কলকাতাস্থ আয়রন অ্যানড স্টীল কনট্রোলার অরগ্যানাইজেশনের দুজন সিনিয়র গেজেটেড অফিসারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২৭ সেপটেমবর—নেহরু অধৈর্য হয়ে পড়ার ফলেই কি ভারত বিভাগ? প্রশ্নটি আজ ইউনেসকো আয়োজিত আন্তর্জাতিক নেহরু গোলটেবিল বৈঠকে বিতর্কের সৃষ্টি করে। কেউ বলেন হাঁ, কেউ বলেন না। সাংবাদিক শ্রীরমেশ থাপার বলেন যে, সব তথ্য জানা গেলে হয়ত দেখা যাবে—নেহরুর এত অধৈর্য না হলেও চলত।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, শুভেচ্ছা ও সৌভ্রাত্রের প্রসারের জন্য ১৯৬৫ সালের জহরলাল নেহরু পুরস্কার পাবেন বলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও পুরস্কার-বিচার সভার সভাপতি ডঃ জাকির হোসেন আজ ঘোষণা করেছেন। ১৪ নবেম্বর নেহরুর জন্মদিনে ভারত সরকারের এক লক্ষ টাকার এই পুরস্কার ভারতের রাষ্ট্রপতি নয়াদিল্লীতে উ থান্টকে দিবেন।

২৮ সেপটেমবর—পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের অনাস্থা প্রস্তাব আজ ৮৪—১৪৩ ভোটে বাতিল হয়েছে। তবে আজ অনাস্থা-বিতর্ক বহু নাটকীয় ঘটনা, আবেগ উত্তেজনা, উত্তাপ ও বিক্ষোভে পরিপূর্ণ ছিল। এই ঘটনার পরেই ডেপুটি স্পীকার বিধানসভার বর্তমান পর্বের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডেপুটি স্পীকার শ্রীনরেন সেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিরোধীদের নিন্দাসূচক প্রস্তাব আলোচনায় দিতে রাজি না হলে তীব্র বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। তার পরেই মাত্র একজনকে রেখে বিরোধীরা সবাই একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সভা ছেড়ে চলে যান।

২৯ সেপটেমবর—পঁচিশ হাজার পোর্ট এবং ডক মজুদরের ধর্মঘটের ফলে আজ কলকাতা বন্দর প্রায় অচল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য চেয়ারম্যান শ্রী বি বি ঘোষ আজ বিমানে দিল্লী চলে যান।

৩০ সেপটেমবর—নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের দাম শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। যদিও বস্ত্রশিল্পকে এই ধরনের কাপড়ের দাম শতকরা ছয় ভাগ বাড়াতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকার স্থির করেছেন যে, নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের উপর ধার্য মৌল উৎপাদন শুল্ক ছেড়ে দেওয়া হবে। এর ফলে বেশীর ভাগ ক্রেতা যে ধরনের কাপড় কেনেন তার দাম শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগের বেশী বাড়বে না।

একদিকে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সংখ্যা ৩৫ লক্ষের মত, অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানে ২২৩৭টি পদ উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে খালি পড়ে আছে। আজ রোটানডা হলে রাজ্য কর্মসংস্থান কমিটির বৈঠকে রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর যে বিবরণী পেশ করেন, তাতে এই তথ্য জানা যায়।

১ অকটোবর—প্রয়োজন ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী মরসুমে খাদ্যনীতির কিছুটা হেরফের করার প্রস্তাব করেছেন। এবার চালকলগুলির উপর এখনকার মত ষোল আনা লেভি ধার্য করা হবে না—আট আনা ধার্য করা হবে।

২ অকটোবর—মানা শৃঙ্গ-বিজয়ী পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ আজ সকালে কলকাতা ফিরেছেন। পর্বতারোহণের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তিত্বের অধিকারী বাংলার এই দুঃসাহসী তরুণের দলকে হাওড়া স্টেশনে বিপুল জনতা আন্তরিক অভিনন্দনে অভিষিক্ত করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৬ সেপটেমবর—ভারত আজ দক্ষিণ-পশ্চিম আফরিকার উপর দক্ষিণ আফরিকার কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম আফরিকার অধিবাসীরা যতদিন পর্যন্ত প্রশাসন ভার নিতে সমর্থ হচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত ওই দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনীতিবিদ ডঃ সি পি রামস্বামী আয়ার ৮৬ বৎসর বয়সে আজ লনডনে পরলোকগমন করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, ঐ সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে ভাষণ দেওয়ার জন্য ডঃ আয়ার লনডনে আসেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক (১৯১৭-'১৮) এবং ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব দেওয়ান ডঃ রামস্বামী আয়ার ১৯৬২ সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলার নিযুক্ত হন।

২৭ সেপটেমবর—বিশ্ব ব্যাংক 'ভারতকে সাহায্য কর' গোষ্ঠীতে তার ভূমিকাটি বর্জন করছে না বরং সদস্যদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য পীড়াপীড়িও করবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দানের বৈঠক বসতেই এত দেরি হবে যে, চতুর্থ যোজনার প্রথম বছরের কাজে হাত দিতে ভারতকে খুবই বিপদে পড়তে হবে।

২৮ সেপটেমবর—প্রেসিডেনট জনসন ও পশ্চিম জার্মানীর চ্যানসেলার লুডউইগ এরহারড দু দিনব্যাপী আলোচনার পর এক যুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ইউরোপে কম সৈন্যদের সম্পর্কে যে ভীতি রয়েছে, তা আলোচনার জন্য বৃটেনকে এক সম্মেলনে আহ্বান জানিয়েছেন।

২৯ সেপটেমবর—ডিউক অব এডিনবরাকে অপহরণের জন্য ষড়যন্ত্র করে ফকল্যানড দ্বীপপুঞ্জকে মুক্তিপণ হিসাবে দাবি করা হয়েছে বলে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গতকাল রাত্রে আরজেনটিনার উগ্রপন্থীরা স্থানীয় ব্রিটিশ দূতাবাসের বাসভবনের উপর গুলিবর্ষণ করে।

৩০ সেপটেমবর—আজ দক্ষিণ আফরিকার বোটসোয়ানা (বেচুয়ানাল্যানড) সাধারণতন্ত্র জন্মগ্রহণ করলো। এই রাজ্য দীর্ঘ ৮১ বছর বৃটিশ শাসনাধীন ছিল। স্বাধীন বোটসোয়ানার বর্তমান জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার। এই দেশে দারিদ্র্য ও অন্নাভাব কায়েম হয়ে বসেছে।

১ অকটোবর—পাকিস্তান বেতারের ঘোষণায় জানা যায় যে, আজ পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, খুলনা, বরিশাল সদর, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির উপর দিয়ে ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে ঝড় বয়ে গিয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কত লোক মারা গিয়েছে তার খবর পাওয়া যায়নি।

২ অকটোবর—নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে হাসুয়া-ইবো দুই উপজাতির মধ্যে দাঙ্গার ফলে ৩০০ জনের বেশী লোক মারা গিয়েছেন। হাসুয়ারা ধর্মে মুসলমান এবং এই অঞ্চলে সংখ্যাগুরু। পক্ষান্তরে ইবোরা প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দা এবং উত্তরাঞ্চলে সংখ্যালঘু। স্থানীয় সেনাবাহিনী এখন স্পষ্টতই বিদ্রোহী।

নূতন ধরনের উপন্যাস

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নূতন উপন্যাস
উপচ্ছায়া ৫৲

প্রশান্ত চৌধুরীর নূতন উপন্যাস
আলোকের বন্দরে ৪॥
শক্তিমান লেখকের শক্তিশালী উপন্যাস

প্রভাতদেব সরকারের
নূতন উপন্যাস
মথুরানগরে ৫॥

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
প্রায় সমগ্র কাব্য সঞ্চয়ন
যতীন্দ্র কাব্যসম্ভার ১২॥

সুমথনাথ ঘোষের
নবতম উপন্যাস
বনরাজিনীলা ৭৲

চিত্রগুপ্তের
এক বিচিত্র রচনা
যদিদং হৃদয়ং মম ৪॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
সর্বশ্রেষ্ঠ হিমালয় ভ্রমণ
উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲
॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

অবধূতের
নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥
॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণকাহিনী
গহন গিরি কন্দরে ৬৲
বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা (নূতন মুদ্রণ) **৬॥**

নির্মলকুমারী মহলানবিশের
বাইশে শ্রাবণ (নূতন মুদ্রণ) **৬৲**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গোপন পত্র (নূতন মুদ্রণ) **৪৲**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
তালপাতার পুঁথি ১৫৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পা বাড়ালেই রাস্তা (নূতন তৃতীয় মুদ্রণ) **৫॥**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
শিলাপটে লেখা ৭॥

কালিকারঞ্জন কানুনগোর
রাজস্থান কাহিনী ৮৲

ডাঃ সুকুমার সেনের
নট নাট্য নাটক ৪॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
কলধ্বনি ৪॥

মনোজ বসুর
সাজবদল ৫॥

আশাপূর্ণা দেবীর
রঙের তাস ৭৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর
সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা
বড়বাবু ৭৲

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন
কাব্যমালঞ্চ
নূতন মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
— সাড়ে পাঁচ টাকা —

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ॥ ৩৪-৮৭৯১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীবলেন্দ্রকুমার মুখার্জি

নতুন ফর্মুলায় তৈরী গয়া। আপনার কল্পলোকের মনোমোহিনী ট্যাল্‌কম। কুয়াশার মত মিহি মৃদুল, অন্য যেকোনো ট্যাল্‌কমের চেয়ে ঢের বেশী সুচারু, ঢের বেশী লঘুভার। গয়া-র ওস্তাদ শিল্পীদের সৃষ্টি এই মধুগন্ধ পাউডার আপনাকে সারাদিন সুরভিত, সারাদিন তাজা রাখবে।

ভিনদেশী **ব্ল্যাক রোজ,** টাটকা ফুলেল **গার্ডেনিয়া** আর মন-মাতানো **পাসপোর্ট**—যেটা ইচ্ছে বেছে নিন।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ
(ইংলণ্ডে সম্মিলিতবদ্ধ)
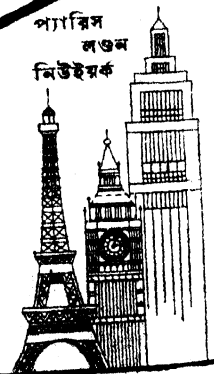
চুপ ! এইমাত্র ওঁর কাশি বন্ধ হয়েছে···এবার আরামে ঘুমাচ্ছেন।

ফর্মূলা 44 কাশি নিবারক মিকশ্চারটি শক্তিশালী···সর্দি, ফ্লু বা ব্রঙ্কাইটিস্-জনিত কাশিতে দ্রুত কাজ দেয়, আর তার প্রভাব বহুক্ষণ ধ'রে থাকে···আপনি কাশি থেকে নিষ্কৃতি পান।

রাত ঘন্টাখানেক আগে ওঁর জ্বর হচ্ছিলো, আজ রাতটা কাশির উৎপাতে ভুগতে হবে, ঘুম আর আসবে না। আমি ওঁকে ভিক্স্ ফর্মূলা 44 কাফ মিকশ্চার দিলাম। সত্বর ওঁর কাশি বন্ধ হোলো, আর এখন উনি আরামে ঘুমাচ্ছেন।

ফর্মূলা 44 শক্তিশালী। এতে সত্বর কাশি বন্ধ হয়, ফলে আপনি আরামে ঘুমাতে পারেন।

ফর্মূলা 44 ফলপ্রদ। এটি সরাসরি কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে কাজ করে যেখানে কাশির উৎপাত।

ফর্মূলা 44 পূর্ণ আরাম দেয়। এটি গলার প্রদাহ উপশম করে, বুকে ও নাকে জমা শ্লেষ্মা পরিষ্কার ক'রে দেয়, ফলে, কাশি থেকে আপনি পূর্ণ আরাম লাভ করেন।

এই কারণেই অধিকাংশ লোক কাশি থেকে সত্বর আরাম পেতে ফর্মূলা 44 ব্যবহার করেন। আপনিও পরখ ক'রে দেখুন। এর প্রথম চামচেই টের পাবেন ভিক্স্ ফর্মূলা 44 কত শক্তিশালী আর কত শীগ্গির এতে ফল দেয়।

সত্বর, নিশ্চিত আরাম পেতে হলে সঠিক মাত্রায় সেবন করুন

বড়দের, ১৫ বছর ও তার বেশী মাত্রা ১ থেকে ২ চামচ
ছোটদের ৬ থেকে ১৪ বছর ½ থেকে ১ চামচ
শিশুদের ৬ বছরের কম ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে

প্রয়োজন মত প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর মাত্রা সেবন করবেন

২ সাইজে পাওয়া যায়

Formula 44
COUGH MIXTURE

ভিক্স্ ফর্মূলা 44

শক্তিশালী কাফ মিকশ্চার

NAS 5145

ORORO
WOWOW
ORORO
WOWOW
ORORO
WOWOW

শিশুদের জন্য উৎকৃষ্ট দুগ্ধ-খাদ্য গ্ল্যাক্সো প্রস্তুতকারকদের দ্বারা প্রচারিত

শিশু-খাদ্য প্রস্তুতে ৫০ বৎসরের অধিককালের অভিজ্ঞতা

গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরিজ
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

ট্রেডমার্কের রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী

Bensons 1/GL-28Ben

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৩ বর্ষ ॥ ৫০ সংখ্যা
শনিবার ২৮ আশ্বিন ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ৬.২৫
মফস্বলে
বার্ষিক সডাক ২৮.০০
ষাণ্মাসিক ১৪.০০
ত্রৈমাসিক ৭.০০

Saturday 15 Oct. 1966

শিক্ষক কর্মবিরতির অবসান

গত দশই সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি শুরু হয়েছিল, তারপর পর্যায়ক্রমে অবস্থান সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পর দশই অক্টোবর পুনরায় শিক্ষকরা কার্যে যোগদান করলেন। পুরো একটি মাস স্কুল বন্ধ থাকার পর পুজোর মুখে আবার স্কুলঘরের ধুলো পরিষ্কার হল, এ-সংবাদ নিশ্চয় আনন্দের। ছেলেমেয়েরা অবশ্য বছরের গোড়া থেকে দফায় দফায় স্কুল বন্ধের যে মজা পেয়ে আসছিল, পুজোর মুখে—অর্থাৎ যখন অন্যান্যবার দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা চুকে গিয়ে পুজোর ছুটি শুরু হয়—সেই সময় স্কুল খোলায় বেজার মুখ করছে। তাদের ধারণা ছিল, ছুটি পর্যন্ত স্কুলের পাট আর বসবে না। অবশ্য অভিভাবকরা অনেকেই সন্দেহ করেছিলেন, পুজোর মুখে অন্তত মাইনে নেবার জন্যে স্কুল একবার খুলবে। যাই হোক, স্কুল যে আবার খুলেছে—তাতে আমরা কৃতার্থ বোধ করছি।

শিক্ষকদের ধর্মঘট সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। শিক্ষকরা যা ভাবেন বা বলতে চান তার সঙ্গে অভিভাবকদের তেমন মতের মিল হয় না, আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাবও অন্যরকম। এই মতভেদ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এমন কি এই রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষকদের যেসব দাবি-দাওয়ার কথা শুনেছি তাকে অন্যায্য বলতেও বাধে। সমাজের নানা বৃত্তির মানুষ যথার্থ প্রয়োজনের তুলনায় আজ কতটুকু পান! সকলেরই ভার লাঘব হচ্ছে আর শিক্ষকদের হচ্ছে না, এমন কথাও ঠিক নয়। তবে, শিক্ষকদের জন্যে সরকার আরও তৎপর হলে ভাল, না হলে তাঁদের বারে বারে ধর্মঘট করতে হবে এ যুক্তিও আমাদের পছন্দ নয়। এই যে, গত এক মাস ধরে, বিশেষ করে নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এই পড়ার বছরে, শিক্ষকরা কর্মবিরতি শুরু করে দিলেন, তাতে কার কি লাভ হল? কি পেলেন শিক্ষকরা? সরকার কি বা দিলেন? পুরো লোকসানটাই ছাত্রছাত্রী আর বেচারী অভিভাবকের ঘাড়ে চাপল। বলা বাহুল্য, এটা হল জনসাধারণের ধারণা; শিক্ষকরা নিশ্চয় পালটা যুক্তি দেখিয়ে নিজেদের সমর্থন করতে পারবেন। তবে এবারের ধর্মঘটের পরিণাম দেখে অনেক শিক্ষকই নিরাশ হয়েছেন।

আমাদের স্কুল কলেজের পড়ার হাল আজ কারও অবিদিত নেই। যেসব শিক্ষক বা অধ্যাপকরা ক্ষণে ক্ষণে কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের ডাক দেন তাঁরাও অন্য সময়ে গোপনে হয়ত পড়াশোনার হাল দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এমন একটা অবস্থায়, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাববেন না, বা তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গরজ অনুভব করবেন না—এমন শিক্ষকদের কথা আমরা চিন্তা করতে কষ্ট পাই। ধরে নেব, তেমন শিক্ষক নেই বা থাকলেও তা সংখ্যায় নগণ্য। কাজেই আমরা আশা করব, বার বার এবং থেমে থেমে যেন শিক্ষকদের এই ধরনের কর্মবিরতি আর না ঘটে। ধাপে ধাপে আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা কার্যকর তা হয়ত ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুধাবন করতে পারেন। সরকারী পক্ষের কর্তাদের জানা উচিত তাঁরা শিক্ষকদের সমস্যাটাকে জিইয়ে রেখে এই দুর্দিনে জনসাধারণের অশেষ ক্ষতিসাধন করছেন।

শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বর্তমান আন্দোলনকে 'সাফল্যমণ্ডিত' বলা হয়েছে। যদি এর দ্বারা তাঁরা তৃপ্ত হন তবে আমাদেরও তা স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই। অনেক সময় হয়ত আমরা ভাবি, আন্দোলন করা অর্থই কিছু দাবি-দাওয়া আদায় করে নেওয়া। মনে হয়, দাবি-দাওয়া আদায় না হলেও কোনো কোনো সময় সমবেত প্রতিবাদ একটা বড় রকমের নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। শিক্ষকরা সেদিক থেকে জয়যুক্ত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি যে ধরনের মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তা হয়ত অনেকের ভাল লাগে নি। তবে সরকারের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, এবং এই আন্দোলন যাতে কোনো গণ্ডগোলে না দাঁড়াতে পারে তার জন্যে তাঁরা সতর্ক ছিলেন। যাই হোক, শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ায় সরকার পক্ষও নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁরা ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি কোনো রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না-গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুবিবেচনার কাজ করেছেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, শিক্ষকরা স্থির করেছেন এবারে স্কুলে পুজোর ছুটি কমিয়ে গত এক মাসের বন্ধের লোকসান যথাসম্ভব পুষিয়ে দেওয়া হবে। এটিও **আমাদের শিক্ষকদের বিবেচনা ও দায়িত্ববোধকে প্রশংসনীয় করে তুলেছে।**

বৈদেশিকী

প্রতিবেশী রাজ্য নেপাল ও ভারত

স্বাধীন ভারতের গবর্নমেন্ট যেখানেই নিজের সত্তাকে স্বরচিত ভূমিকার অবলম্বন যোগাতে পারে নি এবং যেখানেই তাকে ব্রিটিশ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টিত হতে হয়েছে সেইখানেই বেধেছে গোলমাল। নামে স্বাধীন কিন্তু আসলে ভারত-শাসনকারী ব্রিটিশ শক্তির আওতার মধ্যে অবস্থিত ছিল—এরূপ রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক বেশ সহজ, সরল, পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে পারে নি। হিমালয় অঞ্চলের নেপাল-ভুটান প্রভৃতি রাজ্যগুলির সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে খাটে। তিব্বত যতদিন কম্যুনিস্ট চীনের দ্বারা কবলিত হয় নি ততদিন পর্যন্ত অবস্থাটা এক রকম ছিল, তিব্বত চীনাদের অধিকারে যাবার পর থেকে অবস্থাটা অন্য রকম হয়ে গেছে। এই সব রাজ্যের সুরক্ষা এবং যাতায়াতের সমস্যা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে এই সব রাজ্যের যোগাযোগের পথ কেবল ভারতের ভিতর দিয়েই ছিল, যতদিন পর্যন্ত অন্য কোনো প্রতাপশালী বিদেশী রাষ্ট্র এদের গা-ঘেঁষাঘেঁষি প্রতিবেশী হয়ে উঠে নি ততদিন পর্যন্ত এদের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি ব্রিটিশরাজের উত্তরাধিকারীর দৃষ্টির মতোই ছিল—যদিও ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরও নেপাল এক বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে রইল। সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের চাকরিতে গুর্খা সৈন্যের নিয়োগ। ভারত স্বাধীন হবার পরেও এই ব্যবস্থা চলতে দেওয়া কখনই উচিত হয় নি। ভারত সরকার যদি নিয়োগপ্রার্থী সকল গুর্খাকে ভারতীয় সৈন্য বিভাগে কাজ দিতে নাও পারতেন তাহলেও ভারতের পক্ষে অন্যভাবে নেপালকে এরূপ অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া অসম্ভব ছিল না যাতে করে ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগে নেপালীদের চাকরি না নিলেও নেপালের এক রকম করে চলে যেতো। ব্রিটিশ সেনানীতে গুর্খা সৈন্য রিক্রুট করার সুখ-সুবিধাদানের চুক্তিতে ভারতের স্বীকৃতিদান অনুচিত হয়েছিল। ঐ রকম চুক্তি না থাকলে স্বভাবতই ভারত ও নেপালের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্টভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেত। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে নেপালী সৈন্য রিক্রুট করার সুবিধা দিয়ে ভারত সেই সুযোগ অনেকখানি হারিয়েছে।

অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কর্তারা অথবা তাঁদের প্রতিনিধিরা নেপালের প্রতি ব্যবহারে নিজেদের চালচলন কিছুকাল এমন করে তুলেছিলেন যেন তাঁরা ব্রিটিশরাজের উত্তরাধিকারী। এমনিতেই এটা ভুল পথ ছিল। তারপর তিব্বত চীনাদের হাতে যাবার পরে আরক্ষার সমস্যা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনি বদলে গেল যে পূর্বের কায়দায় চলার প্রশ্ন আর উঠেই না।

এ ছাড়া নেপালের আভ্যন্তর রাজনীতির নানা অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কাঠমাণ্ডু এবং নূতন দিল্লীর মধ্যে নানা রকম সন্দেহ এবং ভুল বুঝাবুঝিরও অবসর ঘটেছে। রাজা মহেন্দ্রের সব ক্রিয়াকলাপ যেমন ভারতের ভালো লাগে নি তেমনি নেপাল সরকারেরও ভারতের প্রতি ক্ষুব্ধ হবার কারণ কিছু কিছু ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু সাময়িকভাবে যত ভুল বোঝাবুঝিই হক না কেন ভারত ও নেপালের স্বার্থ এমনভাবে জড়িত যে একে অপরকে অনাত্মীয় মনে করে চলা অসম্ভব।

কিছুকাল থেকে ভারত সরকারের কর্তারা বুঝতে পেরেছেন, আমাদের প্রতিবেশী অনেক রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ততটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ নয় যতটা হওয়া উচিত ছিল। এ জন্য কিছু চেষ্টাও আরম্ভ হয়। লালবাহাদুরজী প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথম বিদেশী সফর যেটা করেছিলেন, যতদূর মনে পড়ছে, সেটা নেপালেই। কিন্তু তারপর আবার সব ওলট-পালট হয়ে গেল, "গোদা"-দের নিয়েই আবার আমরা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

তবে মুশকিল এই যে, "বন্ধুত্ব" করার "চেষ্টা" দেখলে লোকে আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হয় না। এক পক্ষ হিসেব করলে

আর এক পক্ষও হিসেব করবে। রাজনীতিতে হিসেব আছে, হিসেব থাকবেও। স্বার্থের লেনদেনের কথা বাদ দিয়ে কেউ চলবে না কিন্তু এসব সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতকগুলি স্বাভাবিক বন্ধন আছে। স্বার্থের জমাখরচ থাকলেও কাউকে একটু দূরের কাউকে একটু কাছের মানুষ বলে মনে হয়। সংকটের দিনে কাছের মানুষটাই সহজে টানে।

ভারত ও নেপালের মধ্যে রাষ্ট্রগত ভিন্নতা থাকলেও জাতিগত ভিন্নতা নেই। তবুও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যভাব বৃদ্ধির অনেক অবসর আছে, "সম্পর্কের উন্নতি"র অবসর আরো অনেক আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেপাল সফরের যে-সব বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকেও বুঝা যায় যে, ভারত-নেপাল সম্পর্ক আরো সহজ ও সরল হতে পারত। আশা করা যায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নেপাল ভ্রমণের ফলে পূর্বের অনেক গেরো খুলে যাবে, কিন্তু গেরো যে অনেক ছিল তা কাগজের খবর থেকেই বুঝা যায়।

একটা ব্যাপার প্রথমেই চোখে পড়ে। খবরে দেখা যায় শ্রীমতী ইন্দিরার রাজনৈতিক আলোচনা সবই নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সংগে। রাজার সংগে শ্রীমতী ইন্দিরার দেখাশুনা সবই কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সংগে সংশ্লিষ্ট। "কাজের কথা" হচ্ছে সবই শ্রীথাপার সংগে। প্রধানমন্ত্রীর কথা হবে প্রধানমন্ত্রীর সংগে—এটা রীতি বা ফর্মের দিক দিয়ে ঠিক কিন্তু সকলেই জানেন যে নেপালের আসল কর্তৃত্ব রাজার হাতে, "প্রধানমন্ত্রীর" হাতে নয়। একবার কল্পনা করুন নেহরুজী জীবিত আছেন, তিনি নেপালে গিয়েছেন এবং সেখানে ভোজসভা অথবা ঐ রকম কোনো অনুষ্ঠানে মাত্র তাঁর সংগে রাজা মহেন্দ্রের দেখা বা দু-পাঁচটা কথা হচ্ছে কিন্তু "কাজের কথা" সবই হচ্ছে রাজা মহেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীথাপার সংগে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শ্রীথাপা যা বলছেন তা সবই রাজা মহেন্দ্রের অনুমোদিতক্রমেই, সুতরাং নেপাল সরকারের বক্তব্য বুঝতে শ্রীমতী ইন্দিরার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এবং শ্রীমতী ইন্দিরা যা বলছেন তাও নিশ্চয়ই সঠিক ভাবে রাজা মহেন্দ্রের কাছে পৌঁছচ্ছে। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রের এরূপ "ফর্মাল" ব্যবহার, নিজে শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত রাজনৈতিক আলোচনা না করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীথাপার মারফত আলোচনা করলেন—এটাকে একটা আহত অভিমানের অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। ভারত যত বড়ো দেশই হোক তার রাষ্ট্রীয় মান নেপালের চেয়ে বেশি নয়—এইটে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় এই ফরম্যালিটি।

আর একটা ব্যাপারেও রাজা মহেন্দ্র ভারতকে একটু "শিক্ষা" দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট টিটো, প্রেসিডেন্ট নাসের এবং শ্রীমতী ইন্দিরার মধ্যে নূতন দিল্লীতে যে-আলাপ-আলোচনা হবে সেটা যে "নন্-এলাইনড"দের "শীর্ষ" সম্মেলনের ধরনের কিছু নয়, নিতান্তই বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা—একথা ইন্দিরাজীকে দিয়ে রাজা মহেন্দ্র বলিয়ে নিয়েছেন। এইভাবে দিল্লী বৈঠকের গুরুত্ব হ্রাস করিয়ে রাজা মহেন্দ্র দেখাতে চান "নন্-এলাইনড"দের মধ্যে ভারতের অনন্য সাধারণ প্রাধান্য কিছু নেই। দিল্লীর বৈঠক যদি বিশেষভাবে "নন-এলাইনড"দের বৈঠক হত তাহলে নেপালকে বাদ দেওয়া যেত না এইটেই ইন্দিরাজীকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হল। এই দিল্লীর বৈঠক ভারতের পক্ষে ছুঁচো গেলার মত হয়েছে। এর দ্বারা কার যে কী লাভ হবে বুঝা যায় না।

৭।১০।৬৬

বাংলা কংগ্রেস
জয়লাভে কংগ্রেসী উচ্চাশা
মানা বিজয়ীদের সঙ্গে
অতুল্য ঘোষের
সাক্ষাৎকার।
'আমরাও কি পারবো?'

স্মৃতি-কথা

আনন্দ বাগচী

হয়ত কলকাতা আছে কলকাতাতেই তবু মন
প্রবোধ মানেনা আজ, মীনে করা আশ্বিনের নীলে
আকাশ স্তম্ভিত মনে হয়, দূরে হাওড়ার ব্রীজ
ঝাপসা পেন্সিলে আঁকা কার অতিকায় কররেখা;
আকুল গঙ্গায় ভাসে ঘাটেঘাটে উন্মত্ত জোয়ারে
লঞ্চ ডিঙি নৌকো আর দূরে কাছে বিচিত্র স্টীমার।

তবু মনে হয় যেন ক্রমশই দূরে যেতে যেতে
আশ্বিনের কলকাতা, কফিখানা, পুরনো বন্ধুর ডাকনাম,
দুই ফুটপাথ জুড়ে গাঢ় রোদ্দুরের আঁকিবুঁকি
স্মৃতির মতন ঠাণ্ডা মীনাক্ষির মত অপলক
যেন স্তব্ধ বন্ধ ঘরে সিনেমার রঙীন স্লাইড
অথবা বুকের মধ্যে ফাটা রেকর্ডের গান শোনা
কলকাতা রয়েছে যেন অটোগ্রাফে পুরনো স্বাক্ষরে॥

টান মেরে ছিঁড়ে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

টান মেরে ছিঁড়ি আমার মহুয়া রাত
তবুও ছিঁড়তে দ্বিধা কেন সাপ খোলো
কবরের গান সবুজের কল্লোলে
বক্ষে লুকিয়ে ঝটিতি ঝড়ের স্বাদ॥

তবুও ছিঁড়তে দ্বিধা জাগে কেন মনে
কবরী'র নীচে রয়েছে জগৎ এক?
চড়া রোদ তবু হাড়গুলো কনকনে
বিবেকের হাসি ভাঙা দাঁতে দেয় সেঁক॥

ভেবেছি বলবো বলগা আলগা করো
ভেবেছি ছিঁড়বো আমার মহুয়া রাত
তবুও যে তুমি, কী করে বলবো আজ
ফিরিয়ে নেবার সরিয়ে নেবার হাত॥

চারিদিকে দেখি মশগুল মাছিগুলো
পচা খাবারের ক্যানেস্তারাকে ঘিরে
শৈশব নেই কৈশোর বিস্মৃত
বাঁচবার দেনা কোনে গানে কোন নীড়ে॥

তোমার বাসা কোথায়

তারাপদ রায়

তোমার কোনো বাসাও নেই।
তোমার কাছে যাই না কোনো দিন,
এখানে শুয়ে মেঘের নিচে ছাদে;
মেঘের মত কোথায় উড়ে যাবো,
তোমার বাসা কোথায়?

তোমার বাসা মেঘের মত ওড়ে,
ছাদে শুয়ে স্পষ্ট দেখি চোখে
ঐ তো ঘর, ঐ জানালা
মেঘের মত কোথায় উড়ে যায়,
তোমার বাসা কোথায়?

ক্ষণবন্ধ

হরপ্রসাদ মিত্র

এই লোকালয়, পথ, সরোবর,
আকাশ দেখতে দেখতে—
স্মৃতি বিস্মৃত মনন
অথবা অমনন—যাই হোক,
যে অনুভবের নদী পার হই
অগোচরে যার দিকে—
কী জানি কী তার স্বরূপ।
সে নেই, নেই তো এ সংবিতে।

খোলা চোখে রূপ,
চোখ বুজলেই জগৎ দৃশ্যহীন;
সময়ের জালে সত্যকে ধরে
যেটুকু ধীবর-মন,
তাতেই আমার সাগর পাহাড়
বন-বনান্তর সব;
আলোর দেয়ালে আবদ্ধ আছি
অগোচরে যার দিকে —
কী জানি কী তার স্বরূপ।
সে নেই, নেই তো এ সংবিতে।

তাই ভালোবাসা দুর্বল, ভীরু, ক্ষণবাদী আমরণ।
যা কিছু ধরেছে,—হারিয়েছে সব ধন।

আঁদ্রে ব্রেতোঁ

আঁদ্রে ব্রেতোঁর মৃত্যুর ছোট্ট একটুকরো খবর বেরিয়েছে কাগজে। আজ শুধুই কয়েক লাইন খবর মাত্র। কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে এক সময় টাইটানের মতো আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর; মহাপ্রস্থানের সময় নতুন যুগ, তখন হাতের গাণ্ডীব হারিয়ে গেছে—একটা নিঃসঙ্গ নির্জন ছায়ামূর্তির মতো ব্রেতোঁ কয়েক লাইন ইতিহাসের ভেতর মুছে গেলেন।

অল্প বয়সে আমরা সালভাদোর দালির
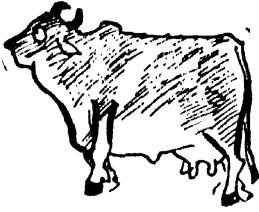
রিয়ালিজম

ছবির প্রতিলিপি দেখতুম; সেই 'ব্যাণ্ডেজ বাঁধা গরু', সেই 'ছাতার সমারোহ', সেই বিচিত্র একটা ল্যাণ্ড্স্কেপ (বোধ হয় হার্বার্ট রীডের বইতে)—যেখানে ঘোড়ার জিনের মতো কী দেখা যায়—কয়েকটা অস্বাভাবিক চ্যাপ্টা বাঁকা ঘড়ি—কে জানে, মৃত-সময়ের প্রতীক কি না। 'স্যুর-রেয়ালিজ্ম্।' বস্তুতর জগতের, চিত্রভাষা—কী নাম দেব বাংলায়? অতি-বাস্তবতা?

সেদিন এই আন্দোলনের অধিনায়ক যিনি, তিনি আঁদ্রে ব্রেতোঁ। সালভাদোর দালি কবে সরে গেলেন 'স্যুর-রেয়ালিজ্ম' থেকে—অনুপ্রেরণা পেলেন ক্যাথলিক বিশ্বাসের ভাবলোকে। আজ ব্রেতোঁর কায়িক মৃত্যু ঘটল। অতি-বাস্তবতাও তাঁর আগেই সাহিত্যিক মৃত্যু বরণ করে নিয়েছিল।

সূত্রপাত সেই 'দাদাইজ্ম্' থেকে। স্থান জুরিখ, উদ্গাতা ত্রিস্তান ৎসারা। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ—'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত।' বুদ্ধিজীবী মনে ক্লান্তি, হতাশা, শূন্যতা, সমস্ত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ। সেই মনোজগৎ, শার্ল বোদ্ল্যারের সেই সর্বগ্রাসী 'এনুই।'

না—না—না—কিছুই না—কিছুই নেই

সুররিয়ালিজম

স্নেহবিহীন দুগ্ধ নামক তরল পদার্থ

—' এই দাদাইজ্ম্। পরিপূর্ণ নৈতিবাদ। অনিঃশেষ নৈরাজ্য। 'দা—দা' শিশুর অস্ফুট কাকলি। তার সব অর্থহীনতা নিয়ে এক অচেতন শৈশবে অবগাহন।

কিন্তু মন এমন করে হারাতে চাইল না। পরিত্যক্ত শিশুর মতো দাদাইজ্মের আবির্ভাব, অলালিত জাতকের মতো মৃত্যু-চিহ্নিত তার ললাট। যে যাওয়ার জন্য এসেছিল, সে গেল। দেখা দিল 'স্যুর-রেয়ালিজ্ম্।' সেই আন্দোলন ফ্রান্সের শিল্প-সাহিত্যে এক নতুন পদক্ষেপ নিয়ে এল। আঁদ্রে ব্রেতোঁ তার অধিনেতা।

কে আসল স্যুর-রেয়ালিস্ত্? তার পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রেতোঁ নিজেই অনেক কথা লিখেছেন—প্রচার করেছেন একাধিক ম্যানিফেস্টো—সেগুলো এই আন্দোলনের দলিল। তা ছাড়া অসংখ্য আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে, আমাদের সহজ করে বোঝাবার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত হার্বার্ট রীড্, মার্সেল র‍্যাইমো-র অসাধারণ বইটি রয়েছে সাহিত্য-পাঠকের জন্যে। আর ব্রেতোঁর ভাষায় সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বোধ হয়ঃ 'হানা-দেওয়া মস্তিষ্ক—হণ্টেড্ ব্রেন।'

কিন্তু 'হণ্টেড্ ব্রেন' লক্ষণে—দর্শনে নয়। দাদাইজ্মের স্পষ্ট উত্তরাধিকার স্যুর-রেয়্যালিজ্মেও গূঢ়নিহিত। শিশুর চেতনায় স্বপ্ন-বাস্তব একাকার, নীল বেলুন, মা-র মুখ, দোলনা দেওয়াল, খিদের কান্না, বাইরের কাকের ডাক, ঘুমের দেয়ালা—সব মিশে যায় এক সঙ্গে, জড়িয়ে যায়, হারিয়ে যায়, ভেসে ওঠে। মনকে নিয়ে এসো সেই নিরঞ্জন বিশৃঙ্খলার মধ্যে, যুক্তি তোমার শত্রু, বুদ্ধি তোমার সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়; চেতনার অবাধ মুক্তি—কার্য-কারণহীনতায় তোমার সত্তাকে নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতো ভাসিয়ে দাও। বস্তু এবং কল্পনা, স্বপ্ন এবং প্রত্যক্ষ, সম্ভব এবং অসম্ভব—এক সঙ্গে মিলে গিয়ে অনন্যপূর্ব তোমার শুভ্রচেতনা জীবনের সব প্রশ্ন, সব যন্ত্রণা, সব প্রাত্যহিকতা থেকে মুক্তিলাভ করুক।

'কবিতা মাত্রেই অনুকরণ'—আদি মনীষীর এই প্রখ্যাত উক্তিকে আর একভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন দাদাপন্থীরা। তাঁরা বলেছিলেন, সন্দেহ নেই কবিতা অনুকরণ, কারণ পূর্বগামীদের চিন্তা আমরা অতিক্রম করতে পারি না, তাদের ভাব-ভাবনার অনুবর্তন করে চলি সংস্কারে, অভ্যাসে, ট্র্যাডিশনে। এইসব কিছু আমরা ছিন্ন করব, কোনো বন্ধন রাখব না।

সমস্ত বন্ধন মিশে, গলে তলিয়ে গেল অতি-বাস্তবতার এই অবাধ আত্মিক

রিয়ালিজম — সুররিয়ালিজম

স্বাধীনতায়। সিগমুন্ড্ ফ্রয়েডের একটা পরোক্ষ ভূমিকা নিশ্চয় ছিল—সেই 'বিমুক্ত ভাবানুষঙ্গ' নিশ্চয় ছায়া ফেলেছিল স্বাধীন 'স্বপ্ন-জাগর' এই দর্শনে। কাব্যে এবং শিল্পে এর বিস্তৃতি ঘটল স্পর্শাতুর অনুভূতিস্পন্দিত চেতনায়—কল্পনা এবং উৎকল্পনার সহাবস্থান ঘটল, আর আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হল রূপকল্প, একটির পর একটি বিচ্ছিন্ন—যোগসূত্রহীন চিত্রবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ঘটল এর পরিপূর্ণতা।

কিন্তু স্যুর-রেয়ালিজ্‌মের পরিণামও নির্দেশিত ছিল এর ভেতরে। এই পরিশুদ্ধ অপ্রভাবিত মানসিক অবস্থা কি সম্ভব? সমাজ আছে, জীবন আছে, শিক্ষা-সংস্কার আছে, বুদ্ধি আছে এবং সর্বোপরি যে 'লজিকে'র বিরুদ্ধে প্রধান জেহাদ—সে প্রতিমুহূর্তে অরক্ষিত দুর্গের মতো এই অবিন্ধ চৈতন্যকে আক্রমণ করছে। অতএব ইতিহাস তার রায় দিল—সাহিত্যের নিত্য-বহমান নির্মম ধারায় উপনদীর মতো আত্মদান করতে হল স্যুর-রেয়ালিজ্‌মকে আর, তারই সূত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিক ধর্মে স্মরণীয় হয়ে রইল কতগুলি নাম: সাহিত্যে ব্রেতোঁ, পোল ভালেরি, পোল এল্যুয়ার, লুই আরাগোঁ; শিল্পে দালি, ম্যাক্স আর্নস্ট, জোয়ান মিরো, কিরিকো, পোল দেল্‌ভো। এঁদের অনেকে সরে গেছেন, পরে তীব্র সমালোচনাও করেছেন, কিন্তু তাঁদের শিল্পে সাহিত্যে এই আন্দোলনের একটা নিত্য ভূমিকা রয়ে গেছে।

আজ আঁদ্রে ব্রেতোঁর কায়িক মৃত্যুর সঙ্গে স্যুর-রেয়ালিজ্‌মের একটা অস্পষ্ট প্রত্যক্ষ সংযোগও শেষ হয়ে গেল। আমি ভাবছিলুম সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বাপরের তৃতীয় পাণ্ডব, কলির পদক্ষেপে, হাতের গাণ্ডীব হারিয়ে একটা নিঃসঙ্গ নির্জন ছায়ামূর্তির মতো বিলীন হয়ে এলেন।

ঘরে পা দিয়ে অধ্যাপক বললে, 'কী ভাবছ?'

বললুম, 'আঁদ্রে ব্রেতোঁর কথা।'

চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'ডেকাডেন্ট।'

বললুম, 'হতে পারে। কিন্তু জীবনকে মাপবার শ্রেষ্ঠ মাপকাঠিই হচ্ছে অবক্ষয়।'

একটু চুপ করে রইল অধ্যাপক। হেসে উঠল তারপরে।

'হাসছ যে?'
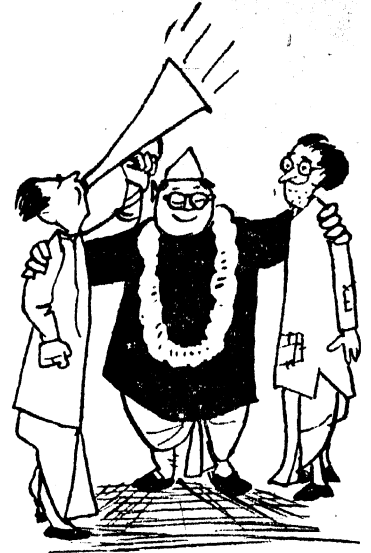
ভাবছি, আজ বাংলা দেশটাকে দেখলে আঁদ্রে ব্রেতোঁ কী ভাবতেন। মাস্টারমশাইরা স্কুলে নেই—জেলখানায়; চালের কন্ট্রোল এবং কর্ডনিং—অথচ আড়াই টাকা কে-জিতে সর্বত্র প্রাপ্তব্য; ছানার মিষ্টান্ন নিষিদ্ধ, অথচ এই মুহূর্তেই তুমি আমাকে রাজভোগ খাওয়াতে পারো। চারদিকেই আবো অসংখ্য স্বপ্ন এবং বাস্তব, সম্ভব এবং অসম্ভব, কার্যকরণ বর্জিত কণ্ট্রাডিকশনের অপূর্ব সমারোহ—এই তো তোমার স্যুর-রেয়ালিজ্‌ম হে! এর চাইতে ভালো উদাহরণ তুমি কোথায় পাবে?'

বিরক্ত হয়ে বললুম, থামো, ভাল্‌গারাইজ্ কোরো না।'

অধ্যাপক বললে, 'তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না—কফি আনাও।'

দাদাইজম্

(সি ১২৫৪)

গান্ধীজীর দূত

সুধীর ঘোষ

গান্ধীজী ও বীজ-আলু

১৯৪৩ সনের মন্বন্তরে বাংলা দেশে প্রায় পনর লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। গান্ধীজী তখন পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হওয়ায় ১৯৪৪ সনের ৫ই মে তারিখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাবার পরেই তিনি ঠিক করেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তিনি বাংলা দেশে যাবেন। কিন্তু তখনও যুদ্ধ চলছে। জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিপুল সামরিক উদ্যোগের সদর-ঘাটি তখন কলকাতা। বাংলা আর আসাম তখন বস্তুত সামরিক দখলভুক্ত এলাকা। অসামরিক মানুষদের গতিবিধি—বিশেষত পূর্ববঙ্গে—তখন কড়া নিয়ন্ত্রণের অধীনে। গান্ধীজী মুক্তি পাবার পর সস্ত্রীক আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডেভনের ডারটিংটন হল-এর লেনার্ড এলমহার্স্ট। ইমারজেন্সি সারভিসের সূত্রে বাংলা দেশের গভরনর কেসির কাছে কিছুকাল কাটিয়ে তিনি তখন ইংল্যানডে ফিরছিলেন। এলমহার্স্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী; তা ছাড়া শিক্ষাবিদ্ হিসেবেও তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। ভারতবন্ধু এই মানুষটি সারা জীবনই এ-দেশের সেবা করেছেন। শান্তিনিকেতনের পল্লী - উন্নয়ন - কেন্দ্র শ্রীনিকেতনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবার যে আন্দোলন, তিনি তার অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলা দেশের চেহারা পালটে দেবার জন্য তার নদীজলসম্পদকে কাজে লাগানো দরকার; গভরনর কেসি তার জন্য এই কৃষি-অর্থনীতিবিদকে (এলমহার্স্ট্ এখন কৃষি-অর্থনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান) একটি উন্নয়ন-প্রকল্প রচনা করতে বলেছিলেন। সেই কাজ শেষ করে এলমহার্স্ট তখন ইংল্যানডে ফিরছিলেন। আমার তখন মনে হল যে, গান্ধীজীর সঙ্গে যদি তিনি দেখা করেন, এবং ব্রিটিশ সরকারে তাঁর যে-সব বন্ধু আছেন (যথা সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স), দেশে ফিরে গিয়ে তিনি যদি তাঁদের কাছে গান্ধীজীর চিন্তার একটা আভাস দেন, এবং গান্ধীজীর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের একটা বোঝাপড়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন, তা হলে মন্দ হয় না। এলমহার্স্ট আর আমি গান্ধীজীর সঙ্গে দুবার সাক্ষাৎ করলাম। কথাবার্তাও হল। কিন্তু গান্ধীজীর রাজনৈতিক পদক্ষেপ অতঃপর কী হতে পারে, তার বিশেষ আন্দাজ পাওয়া গেল না। প্রায় সারাক্ষণই তিনি শুধু বাংলা দেশের কথাই বললেন। বললেন সেই পনর লক্ষ মানুষের কথা, অনাহারে যারা মারা গিয়েছে। বললেন যে, সেই নিদারুণ দুঃসময়ে তিনি বাংলা দেশে যেতে পারেননি, সেখানকার মানুষকে সাহায্য করতে পারেননি, এই দুঃখ তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

গান্ধীজীর শরীর তখন খুবই দুর্বল। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু বাংলা দেশের কথা তখনও তিনি নিমেষের জন্যে ভুলতে পারেননি। তাঁর সম্ভাব্য সফর এবং তার বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে পরবর্তী কয়েক মাস তাঁর সঙ্গে আমার পত্রবিনিময় হয়েছে। গান্ধীজীর বাংলা-সফরের বিষয়ে তখন আমি গভরনর কেসির সঙ্গেও কথা বলি। কেসি অস্ট্রেলিয়ার মানুষ; আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। ভারতবর্ষে সাধারণত যে-সব গোঁড়া ব্রিটিশ গভরনর দেখা যেত, এই কারণেই কেসির সঙ্গে তাঁদের কোনও মিল ছিল না। তিনি একেবারে আলাদা ধাঁচের মানুষ। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, বাংলা দেশে আসবার জন্য গান্ধীজী উৎসুক; কিন্তু তাঁর গতিবিধিকে যদি এতটুকুও নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তাহলে তিনি আসবেন না। স্বদেশের কোটি-কোটি নরনারীর চিত্তে গান্ধীজীর প্রভাব যে কী অসামান্য, কেসি তা জানতেন; ভারতবর্ষের এই মুকুটহীন রাজার সঙ্গে তিনিও একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভাইসরয়ের অবশ্য আপত্তি ছিল। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে হল না। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে শ্রমিক সরকার ক্ষমতা পেতেই সুযোগ এসে গেল। ইতিপূর্বে মিঃ চারচিলের নির্দেশে লর্ড ওয়াভেল সিমলায় ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। গান্ধীজীও তাতে যোগ দেন। এ হল জুন মাসের কথা। সেই সম্মেলনের সূত্রে গান্ধীজী তখন সিমলায় ছিলেন। সম্মেলন শুরু হয়েছিল ২৫শে জুন তারিখে। তার

পরদিনই সিমলা থেকে গান্ধীজী আমাকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

ম্যানরভিল,
সিমলা,
২৬-৬-৪৫

"ভাই সুধীর,

তুমহারে এগারো জুনকে খতকা উত্তর আজ হি দে-সকতা হুঁ। ম্যাঁয় ক্যা কর রহা হুঁ সো তো জানতে হো। যানে কো ম্যাঁয় তো বহুত উৎসুক হুঁ, লেকিন সব জাগা যানা হোগা।

শান্তি কো ঔর তুমকো বাপুকা আশীর্বাদ।"

অর্থাৎ ঃ

"ভাই সুধীর,

তোমার এগারোই জুনের চিঠির উত্তর আজই দিতে পারছি। আমি যে এখানে কী করছি, তা তো তুমি জানো। বাংলায় যাবার জন্য আমি তো খুবই উৎসুক, তবে সেখানে সব জায়গাতেই যেতে হবে।

শান্তি আর তোমার জন্য বাপুর আশীর্বাদ রইল।"

এই ছোট্ট চিঠিখানি হাতে নিয়ে আমি গিয়ে গভরনর কেসির সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি বললেন, সিমলায় গিয়ে আমি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে পারি, এবং তাঁকে আশ্বাস দিতে পারি যে, তিনি যাতে বাংলা দেশে যেখানে-খুশি যেতে পারেন এবং যাঁর-সঙ্গে-খুশি দেখা করতে পারেন, গভরনর তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আমি যখন সিমলায় গিয়ে রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়িতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলুম, তিনি তখন হেসে আমাকে বললেন, "কেসির চিত্ত কীভাবে জয় করলে বলো।" কেসির সম্পর্কে আমি তাঁকে যা বললুম, তাতে তিনি খুশী হলেন। আলোচনার শেষে—একেবারে অপ্রত্যাশিত-ভাবে—তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখনই কলকাতায় না ফিরে তাঁর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর স্পেশ্যাল ট্রেনে (একটি বগি, একটি ইন্‌জিন ও একটি গার্ডস ভ্যান সংবলিত এইরকমের স্পেশ্যাল ট্রেন সেই সর্বপ্রথম তিনি ব্যবহার করলেন) আমি সিমলা থেকে সেবাগ্রাম যেতে রাজী আছি কিনা। সম্মতি জানিয়ে আমি বললুম, কালকা থেকে আমি তাঁর ট্রেনে উঠব। ট্রেন ছাড়বার খানিক বাদেই তিনি আমাকে তাঁর কাছে গিয়ে বসতে বললেন। বললেন, "তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তুমি কি আমার সঙ্গে কিছু কাজ করতে রাজী আছ?" তাঁর এই কথাগুলিতে যেন জাদু ছিল। ইতিপূর্বে, কোনও বিষয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার এমন বুঝলে তবেই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি। এখন আমি তাঁর একজন ষোল-আনা 'সাকরেদ' হয়ে উঠলুম। বাইবেলের ভাষা ধার করে বলতে পারি, গান্ধীজী ছিলেন মানুষ ধরবার ধীবর।

ওয়ার্ধা থেকে সেবাগ্রাম পর্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে। এই রাস্তার ওপরেই এক জায়গায় কলকাতা-বোমবাই রেলপথ অতিক্রম করতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর ছোট্ট স্পেশ্যাল ট্রেনটি, বিশেষ করে আমাদেরই জন্য, সেখানে থামল। এক-এক করে গান্ধীজী আমাদের সবাইকে ট্রেন থেকে নামতে বললেন। তিনি নামলেন সর্বশেষে। সেই ধুলিধূসর রাস্তায় দু মাইল হাঁটবার পর কয়েকটি মাটির বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। সেই তাঁর বিখ্যাত সেবাগ্রাম আশ্রম। সেবাগ্রাম আশ্রমে সে-যাত্রায় আমি কয়েকটা দিন ছিলুম। তার মধ্যে কলকাতায় রওনা হবার আগের দিন রাতে গান্ধীজীর সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল, বিশেষ করে তারই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। মেল ট্রেন ধরে আমার কলকাতায় রওনা হবার কথা। বোমবাই-কলকাতা ট্রেন খুব সকালে ওয়ার্ধা থেকে ছাড়ে। সেই ট্রেন ধরতে হলে ভোর চারটে নাগাদ আশ্রম থেকে যাত্রা করতে হবে, এবং কর্দমাক্ত রাস্তায় (তখন বর্ষাকাল) পায়ে হেঁটে মাইল চার-পাঁচ পাড়ি দিয়ে রেল-স্টেশনে পৌঁছতে হবে। আগের দিন রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্বে গান্ধীজী তার জন্য তিন-চার জন লোকের একটা রীতিমত বৈঠকই বসিয়ে দিলেন। ভোর চারটেয় কে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেবে, কে আমার সুটকেশ বহন করে স্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের একেবারে পাকা ব্যবস্থা না-করে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। এও তিনি বলে দিলেন যে, আমার ঘরে একটা কেরোসিন লণ্ঠন থাকা চাই। শেষ রাত্তিরে অন্ধকারে চার-পাঁচ মাইল হাঁটা চলবে না; লণ্ঠনটি

হাতে ঝুলিয়ে আমাকে হাঁটতে হবে। প্রতিটি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে তিনি শুতে গেলেন। খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

কলকাতায় ফিরে আমি মিঃ কেসির উপরে আবার হানা দিতে শুরু করলাম। তখন জুলাই মাস। ইংল্যানডে শ্রমিক সরকার ইতিমধ্যে ক্ষমতার আসনে শক্ত হয়ে বসেছেন। ফলে কেসিরও তাঁর আপন ইচ্ছেমত চলবার আরও সুবিধা হল। গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করবার প্রশ্ন নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁর যে টানাপোড়েন চলছিল, শ্রমিক সরকারের সমর্থন পাওয়ায় কেসিই তাতে জিতলেন।

গান্ধীজীর বাংলা-সফর যে লর্ড ওয়াভেলের মনঃপূত নয়, গান্ধীজীকে একখানি চিঠিতে তা আমি জানিয়েছিলাম। তবে ওয়াভেলের সপক্ষে তাতে আমি এও বলেছিলাম যে, গোঁড়া হলেও তিনি আন্তরিক। গান্ধীজীর কাছ থেকে পত্রপাঠ এই চিঠির জবাব পাওয়া গেল। তাতে আন্তরিকতার সংজ্ঞাটা তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

সেবাগ্রাম
২৮-৭-৪৫

"প্রিয় সুধীর,

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেলাম।

কোনও মানুষকে এই অর্থে আমরা আন্তরিক বলি যে, তিনি জ্ঞানত অসৎ নন। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্য-গুলিকে ঠিকমত বিচার করবার কষ্ট স্বীকার না করে তিনি যদি তাড়াহুড়ো করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, তা হলে বলতেই হবে যে তিনি নিজে সে-কথা না-জানলেও, বস্তুত তিনি মিথ্যাচারী। ভারত-বর্ষের অসংখ্য মানুষ সম্পর্কেও সম্ভবত এ-কথা প্রযোজ্য। আন্তরিকভাবে তারা বিশ্বাস করে যে, অস্পৃশ্যতা একটা দৈব বিধান। বস্তুত তারা মিথ্যাকেই আঁকড়ে আছে। এটা যে মিথ্যা, তা প্রমাণও করা যায়।

বর্ষা একটু ধরলেই আমি বাংলায় যেতে চাই। যাওয়া সম্ভব হলে সর্বাগ্রে মিঃ কেসির সঙ্গেই আমি দেখা করব।

পুস্তিকাগুলি পেয়েছি।

তোমাদের দুজনকেই আমার আশীর্বাদ জানাই।

বাপু"

অতঃপর গান্ধীজীকে এই সুসংবাদ দেবার জন্যে আমি ওয়ার্ধায় গেলাম যে, তাঁর বাংলায় যাবার পথ এবারে পরিষ্কার হয়েছে। শুনে তিনি গভরনর কেসিকে একটি চিঠি লিখলেন। কেসির কাছে সেই তাঁর প্রথম চিঠি। চিঠিখানি এখানে তুলে দেওয়া হলঃ

সেবাগ্রাম,
২রা অগস্ট, ১৯৪৫

"প্রিয় বন্ধু,

শ্রীসুধীর ঘোষের অনুগ্রহে আপনার দুটি বক্তৃতার কপি আমি পেয়েছি। গতকাল আমার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে খানিকটা সময় ছিনিয়ে নিয়ে তার একটি আমি পড়লাম।

আপাতত দুটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই চিঠি লিখছি। নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ যে নীতি নির্ধারণ করেছেন, তা অনুসরণ করেই অবিলম্বে আপনি বস্ত্রের ঘাটতি মেটাতে পারেন। বাংলা দেশেও এই প্রতিষ্ঠানটির শাখা রয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে নিজের সুতো নিজে কাটতে, এবং প্রতিটি গ্রামকে নিজের কাপড় নিজে বুনে নিতে অনুরোধ করা—এক কথায় এই হচ্ছে এঁদের পরি-কল্পনা। পৃথিবীতে এর চাইতে বড় সমবায় উদ্যোগের কথা ভাবা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি গো-সম্পদের। এ-ব্যাপারে আপনি খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বললে ভাল হয়। তবে তিনি অসুস্থ; এক্ষুনি হয়ত তাঁকে পাওয়া না-যেতে পারে। গো-সম্পদের সমস্যা সম্পর্কে খুব সম্প্রতি তাঁর

বিরাট একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীসুধীর ঘোষ আমার বাংলা-সফরের ব্যাপারে আপনার একখা আমাকে জানিয়েছেন। আপনার বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। বাংলা দেশে বর্ষা একটু ধরলেই আমি সেখানে যেতে উৎসুক। যখন যাব, তখন আমার প্রথম কাজই হবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে গান্ধী"

হিজ এক্সেলেন্সি দি গভর্নর অব বেংগল, কলকাতা।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১লা ডিসেম্বরের আগে গান্ধীজীর পক্ষে বাংলায় যাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৪২ সনের অগস্ট মাসে কংগ্রেসের তাবৎ প্রথম সারির নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে কংগ্রেস-সংগঠনও ছত্রখান হয়ে যায়। এখন মুক্তি পেয়ে কংগ্রেস-নেতারা সংগঠনে আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গান্ধীজীরও রাজনৈতিক কাজের বোঝা ভীষণভাবে বাড়ল। কংগ্রেসের মধ্যে কীভাবে আবার নতুন করে প্রাণশক্তি ও কর্মোদ্যোগ সঞ্চার করতে হবে, তা নিয়ে সহকর্মীদের উপদেশ-পরামর্শ দিতে হত। সেও বিরাট কাজ। সেই বিপুল দায়িত্ব থেকে ছুটি নিয়ে তাঁর পক্ষে বাংলায় আসা তখন সহজ ছিল না। তাঁর স্বাস্থ্যও তখন ভাল যাচ্ছিল না; সেদিকেও লক্ষ্য রাখবার দরকার ছিল। বর্ষার পরে সেবাগ্রাম থেকে তিনি পুনায় এলেন। অতঃপর বাংলা-সফর সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করবার জন্য আমাকে তিনি পুনায় ডেকে পাঠান। তাঁর তখন মনে হচ্ছিল যে, দু মাসের জন্য তিনি বাংলা-সফরে যেতে পারবেন, এবং ১লা নভেম্বর তাঁর পক্ষে পুনা থেকে যাত্রা করা হয়ত সম্ভব হবে।

১৯৪৫ সনে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাংলা দেশের অগ্রগণ্য রাজনৈতিক নেতা। তিনি একজন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী মানুষ; কংগ্রেস হাই কমান্ডেরও তিনি তখন সদস্য। পরে তিনি বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী হন। এখন যাঁরা বাংলা দেশের রাজনৈতিক নেতা, তখন তাঁরা বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। (শুধু বাংলা দেশ বলে কথা কী, কংগ্রেস হাই কমান্ডের যাঁরা এখন সদস্য, তাঁদেরও অধিকাংশই তখন অখ্যাত ছিলেন।) ডঃ বিধানচন্দ্র রায় যে বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, সেটা এর পরবর্তী কালের ঘটনা। এ যখনকার কথা বলছি, ডঃ রায় তখন প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন মাত্র। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছাড়া বাংলা দেশে আর-একজন যে বিখ্যাত গান্ধীবাদী সমাজ-কর্মীর প্রতিষ্ঠা ছিল, তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। বাংলা দেশে তাঁকে 'ছোট গান্ধী' বলা হত। এই দুজন নেতাকে কেন্দ্র করে দুটি [illegible]-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আপনাপন [illegible] দুজনেই এঁরা সাধু-প্রকৃতির মানুষ; গান্ধীজীর খাঁটি শিষ্য। দুজনেই এঁরা গান্ধীজীর সমান ঘনিষ্ঠ ছিলেন; গান্ধীজী এঁদের দুজনকেই খুব গভীরভাবে স্নেহ করতেন। তবে এঁদের ঘিরে যে দুটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, পরস্পর সম্পর্কে যে সেই গোষ্ঠী দুটির চিত্তে বিশেষ [illegible] ভালবাসা ছিল, তা নয়। দুটি গোষ্ঠীই চাইছিলেন যে, গান্ধীজীর বাংলা-সফরের ব্যবস্থাপনা-ভার তাঁদেরই উপর অর্পিত হোক। তার কারণ, গান্ধীজীর সফর-সংক্রান্ত দায়িত্বভার যে-গোষ্ঠীর উপরে ন্যস্ত হবে, তাঁদের সম্মানও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। গান্ধীজীর আস্থাভাজন হওয়া—এর চাইতে বড় আর কোনো সম্মান তখন ভারতবর্ষে পাওয়া সম্ভব?

গান্ধীজী [illegible] সমস্যার কথা [illegible]। বাংলা দেশের রাজনৈতিক কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমরা [illegible] খাস লোক; কিন্তু পরস্পরের প্রতি [illegible] ভাল থাকবে [illegible] না। এই সমস্যাটি আলোচনা করবার জন্য গান্ধীজী আমাকে পুনায় ডেকে পাঠালেন। তিনি জানতেন যে, উপদলীয় কোন্দলে আমার আসক্তি নেই। সারাটা জীবনই আমার মধ্যস্থতা করে কাটল; এই মধ্যস্থতায় [illegible] বিশেষজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু তাতে লাভ হয়েছে এই যে, রাজনীতিতে আমার বিশেষ সুবিধে হয়নি। যাই হোক, উপদলীয় কোন্দলে আমার আগ্রহ ছিল না বলেই গান্ধীজী আমাকে ভালবাসতেন। খবরের কাগজের জন্য ইতিমধ্যে আমি একটি বিবৃতি তৈরি করে রেখেছিলাম। শ্রীসতীশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন
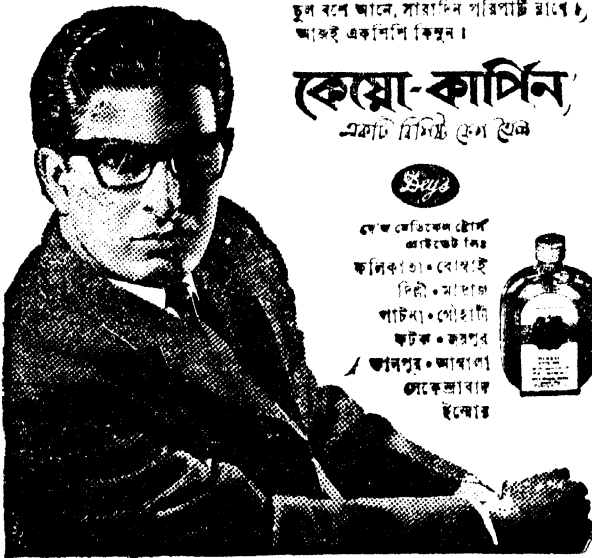
এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেটিকে অল্প-একটু বদলে দিয়েছিলেন। সেটি সঙ্গে নিয়ে আমি পুনা রওনা হলাম। বিবৃতিটি এই :

"নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজী বাংলা দেশে আসছেন। এখানে এসে প্রথম দিন-দশেক তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে থাকবেন। তারপর তিনি বাংলা দেশের কয়েকটি জেলায় সফর করতে যাবেন। স্থির হয়েছে যে, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমা এবং ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমা তিনি সফর করবেন। তারপর যাবেন শান্তিনিকেতনে।

আসাম ও উত্তরবঙ্গ সফরের জন্য গান্ধীজী খুবই উৎসুক, কিন্তু সেখানে তিনি যেতে পারবেন কিনা এখনই তা বলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থার উপরে নির্ভর করছে। আসাম ও উত্তরবঙ্গে যাওয়া যদি গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব না হয়, তা হলে সেখানকার বন্ধুরা নিশ্চয়ই তার কারণ বুঝবেন।

১৯৪৩ সনে এই প্রদেশের পনর লক্ষাধিক নরনারী অনাহারে মারা গিয়েছেন। এখানে এসে সাহায্য করা তখন গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই দুঃখ তিনি ভুলতে পারেননি। দুর্ভিক্ষের জের এখনও চলছে; দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষ ঘটবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই প্রদেশে দুর্নীতি, মুনাফাবাজি চোরাকারবারি এবং অন্যান্য নানা সমাজবিরোধী কাজ এখন অবাধে চলছে, এবং তার চাপে বাংলা দেশের কোটি কোটি লক্ষ নরনারী আজ আর্তনাদ করছে। গান্ধীজী এখানে এসে তাদের মধ্যে থাকতে চান, তাদের দুঃখ দেখতে চান তাদের অংশ নিতে চান, তাদের সাহায্য করতে চান।"

পুরো ব্যাপারটা আমার সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধীজী এই বিবৃতির খসড়ার উপরে তাঁর নিজের হাতে একটা বার্তা লিখে দিলেন, এবং আমাকে বললেন যে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে আমি এই বার্তাটি যেন তার করে পাঠাই। বার্তাটি এই :

"বাংলা-সফর কয়েকটা দিনের জন্য পিছিয়ে দিতে হল। তার জন্য দুঃখিত। কবে পৌঁছব, সঠিক বলা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব বেশী জায়গায় যেতে ব্যগ্র; তবে স্বাস্থ্যের কারণে যথাসম্ভব কম জায়গায় হয়ত যেতে পারব। মতটা পারি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং দুঃখের অংশ নেওয়াটাই আসল কথা। কলকাতায় পৌঁছে চূড়ান্ত কার্যসূচী স্থির করবার পক্ষপাতী।"

গান্ধীজী অতঃপর ডঃ ঘোষের কাছে হিন্দীতে একটি দীর্ঘ চিঠির ডিকটেশন দিলেন; আমাকে বললেন, আমি যেন তা বাংলা দেশের দুই নেতার কাছে নিয়ে যাই। অবস্থা যেখানে অস্বস্তিজনক, সেখানেও

গান্ধীজীর সঙ্গে লেখক

গান্ধীজী খোলাখুলি সব জানাবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই চিঠিখানিতেও সেই খোলা-মেলা অকপটতার প্রমাণ মিলবে। চিঠিখানিকে এখানে বাংলায় তর্জমা করে দিচ্ছি :

পুনা
১৮-১০-৪৫

"ভাই প্রফুল্ল,

জওহরলালজী সম্পর্কে তোমার চিঠি ও তার পেয়েছি। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি।

সুধীর গতকাল এখানে এসে পৌঁছেছে। কাল আর আজ তার সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। আমার সিদ্ধান্তটা টেলিগ্রাম করে জানানো সম্ভব হয়নি; টেলিগ্রাম খুব দীর্ঘ হয়ে পড়ত। তাই এই চিঠি পাঠাচ্ছি। সুধীর নিশ্চয়ই ছোট একটা তারবার্তা তোমাকে পাঠিয়েছে।

সব কথা বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে, আপাতত শুধু এইটুকুই তোমরা জানিয়ে দাও যে, "অনিবার্য কারণবশত ২রা নভেম্বর তারিখে গান্ধীজী কলকাতায় আসতে পারবেন না। তাঁর আসবার সঠিক তারিখ নির্ধারিত হলেই সেটা ঘোষণা করা হবে। সম্ভবত তিনি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ আসবেন। সংবাদপত্রে তাঁর যে সফরসূচী প্রকাশ করা হয়েছে, সেটা বাতিল করে দেওয়া হল। তবে যেখানেই তাঁর যাবার সম্ভাবনা আছে, সেখানকার সংগঠকদের আগে থাকতেই জানানো হবে, যাতে তাঁরা সফরের কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন। এই সূত্রে এখনই যেন কেউ টাকাপয়সা খরচ করে না বসেন; সেটা ঠিক হবে না। যেখানেই তিনি যান, যাতায়াতের ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে; কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা একমাত্র তখনই করা সম্ভব। গান্ধীজী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, যে-সব জায়গায় তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তার সবগুলিই তিনি সফর করতেন। তবে তাঁর বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা মনে রাখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে,

যদিও তিনি যথাসম্ভব বেশী জায়গায় যেতে ইচ্ছুক, তবু কার্যত তিনি হয়ত তার কয়েকটিতেই মাত্র যেতে পারবেন।" এইটুকুই প্রকাশ করতে পারো। এবারে বলি, আমার ইচ্ছা কী। সম্ভব হলে আমি মেদিনীপুরে, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরকামতা, শান্তিনিকেতন আর আসামে যেতে চাই। অন্য কোনও জায়গা যদি বাদ পড়ে গিয়ে থাকে—যথা ফেণী—তবে সেখানেও আমার যাবার ইচ্ছে। তোমরা সবাই মিলে আমার কার্যসূচী স্থির করবে; স্থানীয় সংগঠকদের সেই কার্যসূচীর কথা জানিয়ে দিতে পারো। যানবাহনের ব্যবস্থাও করে রাখতে হবে। সংবাদপত্রে এসব খবর এখনই জানিয়ো না। সফরসূচী চূড়ান্তভাবে স্থির হবার পরে সেটা জানানো যাবে। প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করে রাখতে সময় লাগে। সেইজন্যই এসব প্রস্তাব করেছি। অন্য আর কোথায় কোথায় সহজে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব, সেটা ঠিক করতে পারো।

আমার সঙ্গে কে-কে থাকবেন, এক্ষুনি সেটা তোমাকে জানানো দরকার বলে আমি মনে করি না। তবে এ বিষয়ে যদি কোনও পরামর্শ দেবার থাকে, দিতে পারো।

ইতিমধ্যেই যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছুক। আমার সঙ্গে যদি তা ছাড়াও আরও কিছু লোকের দেখা করিয়ে দিতে চাও তা হলে তাঁদের ডাকতে পারো। মৌলানা সাহেব বর্তমানে কলকাতায় আছেন। তাঁকে বিরক্ত করো না। তবে তাঁর যদি কিছু পরামর্শ দেবার থাকে, তা হলে তাঁর কাছে গিয়ে জেনে নিয়ো।

স্বাগত-ভাষণের জালে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। তবে নিজের হাতে অথবা বন্ধুদের হাতে কাটা সুতো যাঁরা দিতে চান, তাঁরা যত খুশি দিতে পারেন। সেই সুতোর থেকে খাদিবস্ত্র বানিয়ে যথাসম্ভব শস্তা দামে সেখানে বিতরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। কেউ যদি দান হিসেবে টাকাকড়ি দিতে চান, দিতে পারেন; কিন্তু বিশেষ করে যেন টাকা তুলবার চেষ্টা করা না হয়। এটা স্বেচ্ছার দান হওয়া চাই। তবে মনে রেখো, সুতো কিংবা টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সফরের ব্যবস্থা করা হয়নি।

মিঃ কেসির সঙ্গে আমি দেখা করব, সে-কথা বলাই বাহুল্য। জনসাধারণের জন্য তাঁর কাছ থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া যায়, নেব। পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, আমি যেখানেই গিয়ে ঘাটি গেড়ে বসি, আমার উপস্থিতি সেখানেই দীনদরিদ্র মানুষদের চিত্তে একটা স্বস্তির ভাব এনে দেয়। শুধু সেইটুকুও যদি সম্ভব হয়, আমি সুখী হব।

বাংলার রাজনীতিতে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। একে তো তেমন ইচ্ছেই আমার নেই; তার উপরে আমি এ সম্পর্কে বিশেষ খবরও রাখি না।

এ-ব্যাপারে তোমরা যে সিদ্ধান্ত নাও না কেন, সেটা যেন নেহাত সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত না হয়; সিদ্ধান্তটা সর্ববাদিসম্মত হওয়া চাই। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছা অনুযায়ী এ-সব ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া ঠিক নয়। আমার প্রস্তাবিত সফরে যাঁরা আগ্রহশীল, কোনও একটা বিশেষ কাজ সম্পর্কে তাঁদের কোনও একজনের যদি মনে হয় যে, সেটা করা ঠিক হবে না, তা হলে সে-কাজ আমি করতে চাই না। আমার সফর নিয়ে কিছুতেই যেন ঝগড়া না বাধে। ঝগড়া মেটানোই আমার ধর্ম। এই চিঠিখানি, কিংবা এর একটি নকল, সতীশবাবুকে দিও। তোমাদের
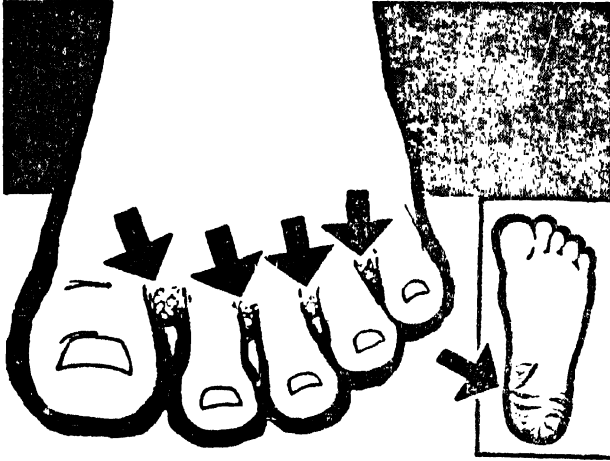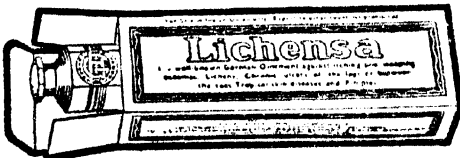
শরীর আলাদা বটে, কিন্তু আমি গিয়ে পৌঁছবার আগে তোমরা একমন হও, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তোমরা দুজনেই একই গুরুর খ্যাতিমান শিষ্য; এবং সেই গুরু হচ্ছেন পি সি রায়ের মতন মহান মানুষ। তোমাদের হৃদয় সত্যিকারের ঐক্যবন্ধনে বাঁধা পড়েছে, এইটেই আমি দেখতে চাই। তোমরা দুজনেই তো আমারই কাজ করছ। তাহলে তোমাদের মধ্যে বিরোধ থাকবে কেন? যাই হোক্, এই সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের করুণা রয়েছে, সেইটেই বড় কথা।

বাপুর আশীর্বাদ নাও।"

১৯৪৫ সনের ১লা ডিসেম্বর বিকেল-বেলা গান্ধীজী কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। গভরনর কেসি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে গান্ধীজীর জন্যে আমার হাতে ছোট্ট একটি স্বাগত-লিপি তুলে দেন, এবং বলেন যে, দু-এক দিনের মধ্যে আমি তাঁদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। কেসির স্বাগত-লিপিটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

গভর্নমেন্ট হাউস,
কলকাতা,
১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৫

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

সুধীরের হাতে আমি আপনাকে এই চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি খুবই উৎসুক। যখন আপনার ইচ্ছে হয়, তখনই দেখা হতে পারবে। কাল (রবিবার) কিংবা সোমবারও তার ব্যবস্থা হতে পারে।

মনে হয়, দীর্ঘপথ ভ্রমণের পর আপনি এখন ঈষৎ ক্লান্ত। তবে আশা করি যথা-সম্ভব আরামদায়ক হয়েছিল এবং পথে বিশেষ কষ্ট হয়নি।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর জি কেসি"

গান্ধীজী বললেন, দু-এক দিনও তিনি অপেক্ষা করতে রাজী নন, সেইদিনই সন্ধ্যায় তিনি গভরনরের সঙ্গে দেখা করবেন। সুতরাং গভরনরকে আমি ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গান্ধীজী সেখানে পৌঁছচ্ছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যিনি পয়লা নম্বর শত্রু, ব্রিটিশ রাজের একজন প্রতিনিধির প্রতি তাঁর আচরণে যে এত গভীর সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যাবে, কেসি সে-কথা ভাবতেও পারেননি। এদিকে গান্ধীজীও একজন ব্রিটিশ শাসকের আচরণে এতটা আগ্রহের পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। সন্ধ্যা সাতটা

থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্যন্ত সেদিন তাঁদের আলোচনা চলেছিল। কথা হচ্ছিল, নানান বিষয় নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর জীবন নিয়ে, টলস্টয় খামারের বাসিন্দাদের নিয়ে, জেনারেল স্মাটসের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে— এক কথায় যাবতীয় বিষয় নিয়ে তাঁরা গল্প করছিলেন। রাত যখন সাড়ে নটা বাজে তখন আমি আলোচনায় বাধা দিয়ে বললাম, "বাপু, এবারে আমাদের ওঠা দরকার। গভরনরের নিশ্চয়ই এখনও খাওয়া হয়নি।" তাঁরই জন্যে যে গভরনর আটকা পড়ে গেছেন, ডিনার খেতে পারেননি, এই কথাটা জানতে পেরে গান্ধীজী বড়ই কষ্ট পেলেন। গান্ধীজী তাঁর খাওয়ার পাট সূর্যাস্তের আগেই চুকিয়ে দিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভরনররা যে সূর্যাস্তের আগে ডিনার খেতে অভ্যস্ত নন, গান্ধীজীর তা মনে ছিল না।

বিরাট লাট-প্রাসাদের (ভারতবর্ষের রাজধানী ১৯১১ সনে কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবার আগে ব্রিটিশ বড়লাটরা এই বাড়িতেই থাকতেন) দোতলার গভরনরের পাঠকক্ষ। গান্ধীজীর সঙ্গে সেইখানেই তাঁর কথাবার্তা হচ্ছিল। বিদায় নিয়ে আমরা যখন উঠে পড়লাম, সৌজন্য-বশত কেসিও তখন আমাদের সঙ্গে নীচে নেমে এলেন, এবং পর্চ পর্যন্ত এগিয়ে এসে গান্ধীজীকে গাড়িতে তুলে দিলেন। পর্চ পর্যন্ত আসতে হলে একতলার বিরাট হলঘরটিকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করে আসতে হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে সেই হল অতিক্রম করে আসতে আসতে যে-দৃশ্য কেসির চোখে পড়ল, তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন যে, লাট-প্রাসাদের পরিচারকদের প্রত্যেকে সেই হল্‌-এ এসে হাজির হয়েছে। খানসামা, পাচক, ঝাড়ুদার, দফতরী—সংখ্যায় তারা প্রায় দু শো। সেই বিরাট পরিচারক-বাহিনী হল্‌-এর দু' ধারে করজোড়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অনেকেরই আদুড় গা; আবার অনেকেরই এমন জামা-কাপড়, গভরনরের সামনে যা পরে হাজির হওয়া চলে না। আসলে ব্যাপারটা এই যে, গান্ধীজীর আগমন-বার্তাটা হঠাৎ তারা শুনতে পেয়েছিল। লাট-প্রাসাদের পরিচরক-মহলে অকস্মাৎ এই খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, মহাত্মাজী 'লাট-সাহেব'-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শুনে তাদের মনে হয়েছিল, মহাত্মাকে দর্শন করবার এই মস্ত সুযোগ। খবর পেয়েই তারা ছুটে আসে। কিন্তু 'লাটসাহেব'ও যে মহাত্মাজীকে বিদায় জানাবার জন্যে উপর থেকে নীচে নেমে আসবেন, তা তারা ভাবতে পারেনি। কী করে ভাববে। এমনটা তো এর আগে কোনও 'লাটসাহেব' কখনও করেননি। যাই হোক, গভরনরকে দেখে তারা একটু ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হল। ব্যাপার দেখে কেসিও কিছু কম বিস্মিত হননি। সমবেত পরিচারকদের দিকে হাত তুলে গান্ধীজীকে বললেন, "দেখুন একবার ব্যাপারটা। বিশ্বাস করুন, আমি ওদের ডাকিনি।" পরের দিন আমি কেসির সঙ্গে আবার দেখা করতে এসেছিলাম। কেসি তখন আমাকে বললেন, "জানো, এমন দৃশ্য দেখব, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। গভর্নমেণ্ট হাউসের এই পরিচারকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান! এ-দেশের মুসলমানদের হৃদয়েও যে গান্ধীর এমন প্রতিষ্ঠা, তা আমি জানতুম না।"

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় গান্ধীজীর সফর সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা ব্যাপার নিয়ে গভরনর আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর গান্ধীজীকে বলতে বললেন যে, বাংলা দেশের জনসাধারণ যে গান্ধীজীর জন্যে সমস্ত কিছুই করতে প্রস্তুত, তা তিনি জানেন; তবু গভরনর হিসেবে তিনিও কিছু করতে চান। এই মহান মানুষটির সফরে তো অনেক যান-বাহনের দরকার হবে; তাঁকে অতিথি হিসেবে গণ্য করে গভরনর সেই যানবাহনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতে ইচ্ছুক। তা কি তাকে করতে দেওয়া হবে? এ সম্পর্কে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি কেতা-মাফিক যে নোট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, গভরনর সেটি আমার হাতে তুলে দিলেন। সেটি হচ্ছে এই:

"(১) শান্তিনিকেতন ও রামপুরহাট সফর

ইসট ইনডিয়ান রেলওয়েকে এ-বিষয়ে জানানো হয়েছে, এবং মিঃ গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য তারা পৃথক একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ব্যবস্থা করতে রাজী হয়েছেন। সাধারণ ট্রেনের সঙ্গেই এই কামরাখানি জুড়ে দেওয়া হবে।

(২) তমলুক ও কাঁথি মহকুমার সফর

সরকারী একটি স্টীম লনচ তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের কলকাতা থেকে উড়িষ্যা খালের মুখে গেঁওখালি (তমলুক মহকুমা) পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। বন-বিভাগের একটি মোটর বোট (তাতে ৬ থেকে ৮ জন পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে যেতে পারেন কিংবা ২ জন *লোক শুয়ে যেতে পারেন) সেখান থেকে তাঁকে গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাবে।* যেখানে যেখানে দরকার, জেলা ম্যাজিসট্রেট সেখানে-সেখানে সরকারী গাড়ির ব্যবস্থা করবেন।

(৩) পূর্ববঙ্গ সফর

যে-ট্রেন গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাবে ও যে-ট্রেন চাঁদপুর থেকে ছাড়বে, তাতে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য বি এ রেলওয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা জুড়ে দেবেন। গোয়ালন্দ থেকে সাধারণ সারভিস স্টীমারে তাঁরা মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত যাবেন (তাতে তাঁদের জায়গার ব্যবস্থা থাকবে)। মুন্সীগঞ্জে মিঃ গান্ধীর ব্যবহারের জন্য একটি সরকারী স্টীম লনচ তৈরি রাখা হবে। সাধারণ স্টীমারে তিনি চাঁদপুর যাবেন (জায়গার ব্যবস্থা আমরা করব)। দরকার হলে চট্টগ্রাম একটি লনচ কিংবা কয়েকটি মোটরগাড়ির ব্যবস্থা করবে।

আগে থাকতেই যে-সব কথা জানিয়ে *রাখা দরকার, তা এই:*

(১) তাঁর দলের মোট সদস্যসংখ্যা (গেঁও-খালিতে দ্বিতীয় একটি মোটর বোটের ব্যবস্থা রাখবার দরকার হতে পারে; যদি হয়, তবে এক সপ্তাহেরও আগে সে-কথা জানানো প্রয়োজন)।

(২) একটি পাকা সফরসূচী

আমি যে সফরসূচী পেয়েছি, মনে হয়, সেটা পাকা নয়, তার অদল-বদল ঘটতে পারে। একেবারে শেষ মুহূর্তে যদি হঠাৎ যানবাহনের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তবে সেই ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হবে।

(৩) সম্ভবত মিঃ গান্ধীকে এ-কথা বুঝিয়ে বলা যেতে পারে যে, শুধু তাঁর ও তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যই সরকারী যানবাহনের *ব্যবস্থা করা হয়েছে।"*

বাংলা দেশের গ্রামে-গ্রামে যে-পথ দিয়ে ঈশ্বর-প্রেরিত এই মানুষটি একদা হেঁটে গিয়েছিলেন, আমাদের উত্তরপুরুষরা হয়ত একদিন সেই পথ দিয়ে হাঁটতে ও তাঁর চরণের স্পর্শে পবিত্র সেই পথের ধূলিরাশি চুম্বন করতে চাইবে। গান্ধীজীর সম্পর্কে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, "ভবিষ্যৎ কালের নরনারীদের পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত হবে যে, পৃথিবীর পথের উপর দিয়ে সত্যিই এমন একজন মানুষ একদা হেঁটে গিয়েছেন।" আমাদের উত্তরপুরুষর

জানতে চাইবে, আইনস্টাইন যে এমন কথা বলেছিলেন, এর কারণ কী।

গান্ধীজী এই সফরসূচীর কিছু পরিবর্তন করেন। তিনি দেখলেন যে, মেদিনীপুর জেলার যত জায়গায় তাঁর যাবার ব্যবস্থা হয়েছে, তত জায়গায় তিনি যেতে পারবেন না। তাই তমলুক মহকুমার সুতাহাটাকে (বাসুদেবপুর) তিনি তাঁর সফরসূচী থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। ঢাকা আর চট্টগ্রামেও তিনি যেতে পারেননি। তার পরিবর্তে মেদিনীপুর-সফর শেষ হবার পর, কলকাতা থেকে তিনি আসামের গৌহাটি ও ধুবড়িতে যান। কলকাতা থেকে গান্ধীজী প্রথম যান ডায়মণ্ডহারবার; সেখান থেকে যান মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে। মহিষাদল থেকে সরকারের বন-বিভাগের একটি ছোট লনচে করে তিনি কাঁথি যান। খালপথে কুড়ি মাইল; লনচে এই পথ পাড়ি দিতে আমাদের পুরো একটি সকাল লেগে গেল। খালের দুই ধারে সারাটা পথ শুধুই আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কাঁথিতে যেতে গান্ধীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেখানে তিনি কয়েকটা দিন কাটালেন। ১৯৪২ সনের অকটোবরে মেদিনীপুরের এই এলাকাটিই সাইক্লোন আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। পৃথিবীর এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে আর কখনও এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটেনি। সেদিক থেকে এই তাণ্ডব সম্পূর্ণই অস্বাভাবিক। সাইক্লোনের প্রলয়ের মধ্যেই হঠাৎ একদিন রাত্রে সমুদ্র থেকে ২০ ফুট উঁচু এক জলোচ্ছ্বাস এসে জেলার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এবং তার ফলে কয়েক শত গ্রামের সলিল-সমাধি ঘটে। বেশ কিছুদিনের জন্য সেই গ্রামগুলি ২০ ফুট জলের তলায় ডুবে ছিল। পরে এক-সময়ে সমুদ্রের জল আবার সরে গেল বটে, কিন্তু সেইসব গ্রামের যাবতীয় জলাশয়কে একেবারে লোনা করে রেখে দিয়ে গেল। মানুষ আর গো-মহিষের তৃষ্ণা মেটাবার মতন এক ফোঁটা পানীয় জল সেখানে ছিল না। গোটা এলাকার শস্যও একেবারে নষ্ট হয়েছিল। দেশের যানবাহনকে তখন যুদ্ধায়োজনের অগ্রাধিকারের দাবি মেটাতে হচ্ছে; ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে দ্রুত সেখানে খাদ্যশস্য পাঠানো হবে, তারও উপায় ছিল না। এইভাবেই শুরু হল বাংলা দেশের সেই ভয়ঙ্কর মন্বন্তর।

যুক্তরাজ্য আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ফ্রেন্ডস অ্যামবুলেনস ইউনিট পাঠানো হয়েছিল, তাদের উদ্যোগে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় দুর্ভিক্ষত্রাণের কাজ চলতে থাকে। গোটা ১৯৪৩ সন জুড়ে সেই ত্রাণকার্যেই আমি নিয়োজিত ছিলাম। যাঁদের সঙ্গে তখন কাজ করেছি, তাঁরা ব্রিটেন আর আমেরিকার আদর্শনিষ্ঠ শান্তিবাদী একদল তরুণতরুণী। যুদ্ধে যাবার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় এঁরা দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর বিশিষ্ট কোয়েকার বন্ধু আলেকজানডারের অনুরোধে আমি ভারতবর্ষে ফ্রেনডস অ্যামবুলেনস ইউনিটে যোগদান করেছিলাম। অতঃপর দুর্ভিক্ষ ও তার পরবর্তী কালে বাংলা দেশের এই অংশে আমি তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি। ১৯৪৩ সনের ফেবরুয়ারি মাসে আমি কাঁথিতে গিয়ে সেবার কাজ শুরু করি। কাঁথি মহকুমার লোকসংখ্যা তখন প্রায় সাত লক্ষ। আর এক বছর বাদে যখন আমি সেখান থেকে চলে আসি, কাঁথির লোকসংখ্যা তখন হ্রাস পেয়ে পাঁচ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। চলে আসবার সময় স্থানীয় একদল যুবক আমার সম্মানার্থে এক বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। সভাস্থলে আমার ব্রিটিশ আর মারকিন সহকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের যাতে বুঝতে সুবিধে হয়, তার জন্য স্থানীয় জনৈক যুবক স্থির করে যে, সে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবে। বক্তৃতায় সে বলল যে, আমি অতি চমৎকার লোক, কাঁথির লোকদের আমার কাছে কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। অতঃপর গম্ভীরভাবে যে-কথা জানাল, বাংলা তর্জমা না-করে সেটা একেবারে ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করছি। ছেলেটি বলল, মিঃ ঘোষ হ্যাড 'অরগানাইজড দি ফেমিন' ভেরি এফিসিয়েনটলি! তা এক বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা যেখানে সাত লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষে নেমে আসে, সেখানে দুর্ভিক্ষকে যে অতি দক্ষভাবে অরগানাইজ করা হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কী।

সফরকালে গান্ধীজীর প্রধান কাজ ছিল প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান। প্রতিদিন সন্ধ্যা পাঁচটায় তিনি একটা খোলা জায়গায় প্রার্থনায় বসতেন, এবং আমরা সবাই তাঁর প্রিয় ভক্তিমূলক গান গাইতুম। সভাস্থলে প্রায় দু-তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ হত। আমাদের গানের শেষে গান্ধী সেই সমবেত জনতাকে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে রামধুন গাইতে বলতেন। রামই তাঁর ঈশ্বর। গান্ধীজীর সেই প্রার্থনাসভার দৃশ্য বস্তুত অবিস্মরণীয়। দূর গ্রামাঞ্চলের নরনারীরাও দলে দলে তাঁর সভায় আসত। সকালে তারা তাদের গ্রাম থেকে (অনেকেই বাচ্চা কোলে নিয়ে) রওনা হত, এবং সন্ধ্যা পাঁচটায়

গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় এসে যোগ দিত। খাবার-দাবার তাদের সংগেই থাকত। পথেই তারা খেয়ে নিত। বিশ্রাম নিত গাছতলায়। গ্রামাঞ্চলের শান্ত পরিবেশে, অস্তসূর্যের লাল আভা যখন সারা আকাশে ছড়িয়ে গেছে, তখন, লক্ষ মানুষের সেই জনতা একযোগে হাতে তালি দিয়ে, তাল রেখে, এই বিশ্বজগতের নিয়ন্তা রামের নামে গান গাইত। গান্ধীজীর পাশে বসে, হৃদয়কে-নাড়া-দেওয়া এই ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করতুম, এবং ভাবতুম, কেমন করে এটা সম্ভব হয়: লক্ষ লক্ষ সরল গ্রামবাসীর ওই জনতা—এই নামগানের মধ্য থেকে কোন্ শান্তি ওরা আহরণ করছে। এই অস্বাভাবিক পরিবেশের সান্নিধ্যে এসে কিছু একটা প্রেরণা যে তারা পেত, তাতে সন্দেহ নেই।

মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে গান্ধীজী আরও কয়েকবার গভরনর কেসির সংগে দেখা করেন। গান্ধীজীর প্রধান সেক্রেটারি শ্রীপ্যারেলাল তাঁর 'দি লাসট ফেজ' (শেষ অধ্যায়) গ্রন্থে সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীপ্যারেলালের মতে, "ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ শাসক-মহলের সংগে কংগ্রেসের যে বিরোধ চলছিল, সেই বিরোধের মরুভূমিতে এই প্রথম একটি মরূদ্যানের দেখা পাওয়া গেল।" দিল্লির আমলাদের অবশ্য তখনও জংগীভাব। বাংলা দেশের অসট্রেলীয় গভরনর যে তারই মধ্যে গান্ধীজীকে এতটা সৌজন্য দেখালেন, এটা তাঁদের আদপেই ভাল লাগেনি। গান্ধী-কেসি বৈঠকগুলিকেও তাঁরা সুনজরে দেখেননি। তাঁদের অসন্তোষ অচিরেই প্রকট হয়ে উঠল। এ যখনকার কথা বলছি, ভারতের ব্রিটিশ বণিক-সভার (অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস অব কমারস) বার্ষিক সভার বক্তৃতা দেবার জন্য ভাইসরয়রা তখন প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আসতেন। ক্ষমতাবান ইংরেজদের এই বার্ষিক সভা তখন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত, এবং এই অনুষ্ঠানকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হত যে, উপর্যুপরি কয়েকজন ভাইসরয় সেখানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন। যাই হোক, সেবারকার অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ভাইসরয় দিল্লি থেকে রওনা হবার আগে কেসি তাঁর কাছে প্রস্তাব করেন যে, কলকাতায় এসে তিনি যদি গান্ধীজীর সংগে সাক্ষাৎ করেন তো বেশ হয়। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কেসি এই প্রস্তাব করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর সংগে যেমন মাঝে-মাঝেই গান্ধীজীর বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হচ্ছে, তেমনি লর্ড ওয়াভেলের সংগেও যদি হয় তো মন্দ কী, তাতে ভালই হবে।

ব্রিটিশ বণিক সভার অনুষ্ঠানে ভাইসরয় যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে কিন্তু অন্য রকমের সুরের ছোঁয়া লাগল। তিনি সেখানে বললেন : ''ভারত ছাড়ো' ধ্বনিটা 'চিচিং ফাঁক'-এর মতন এমন কোনও জাদুমন্ত্র নয়, আলিবাবার রত্নগুহা যা খুলে দিতে পারে। মীমাংসা নির্ভর করছে অনেকগুলি পক্ষের উপরে। কংগ্রেস আছে, সংখ্যালঘুরা আছে, মুসলিমরা আছে, দেশীয় রাজন্যরা আছেন, ব্রিটিশ সরকার আছে। এদের সকলের মধ্যে যেমন করেই হোক, কিছুটা অন্তত মতৈক্য হওয়া চাই।"
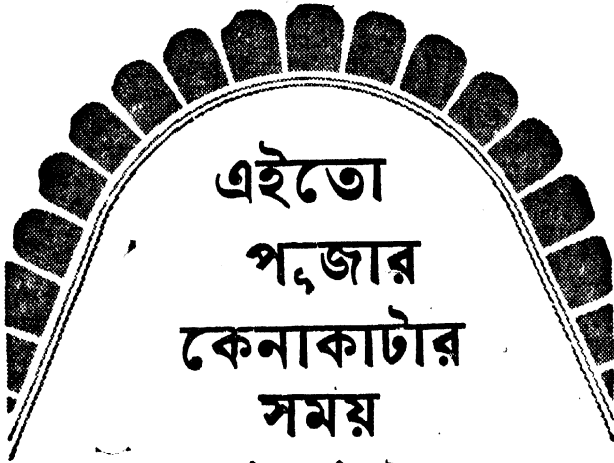
যে-মনোভাবের ভিত্তিতে গান্ধী-কেসি সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়েছিল, ভাইসরয়ের এই মনোভাবের সংগে তার দুস্তর পার্থক্য। আসলে গান্ধীজী আর কেসির মধ্যে মাঝে-মাঝেই যেভাবে আলোচনা হচ্ছিল, ভাইসরয় আর তাঁর আমলারা তাতে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ অ্যাবেল এই সময়ে আমার হাতে একটি প্রেস-স্টেটমেনটের খসড়া তুলে দেন, এবং বলেন যে, কাগজে এটা ছাপতে দেবার আগে এবং গান্ধীজীর সংগে ভাইসরয়ের সাক্ষাৎ হবার আগে, খসড়াটা আমি যেন একবার গান্ধীজীকে দেখাই। খসড়াটা হচ্ছে এই:

"বাংলার গভরনর ও মিঃ গান্ধীর মধ্যে যে-সব সাক্ষাৎকার হয়েছে এবং ভাইসরয় ও মিঃ গান্ধীর যে সাক্ষাৎকার হবে, তা নিয়ে অনেক জল্পনা চলছে। এইসব জল্পনার ফলে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে বলে, এবং কোনও একটি বিশেষ দলের সংগে আলোচনার ব্যবস্থা হচ্ছে কিংবা হতে পারে এই সন্দেহ দেখা দিতে পারে বলে, এর বিরুদ্ধে সরকারীভাবে একটা বিবৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। অবস্থার এই পর্যায়ে কোনও দলের সংগেই আলোচনা করবার কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই। মুখ্য দলগুলির নেতাদের সংগে দেখা করতে, তাঁদের মতামত শুনতে, এবং তাঁদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখতে ভাইসরয় সর্বদাই প্রস্তুত; তবে নির্বাচনের আগে আলোচনা হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।"

কিন্তু গান্ধীজী তো ভাইসরয়ের সংগে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেননি; গভরনর কেসিই বন্ধুভাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রেস-স্টেটমেনটের খসড়া পড়ে গান্ধীজী তাই মোটেই খুশী হলেন না। নম্রভাবে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আরও দুটি বাক্য যেন এ স্টেটমেনটের সংগে জুড়ে দেওয়া হয়। আমাকে সেই বাক্য দুটি তিনি ডিকটেশনও দিলেন। বাক্য দুটি হচ্ছে:

"তবে মিঃ গান্ধীর ক্ষেত্রে ভাইসরয় যেহেতু জানতে পারেন যে, ভাইসরয়ের কলকাতা-সফরের সময় মিঃ গান্ধীও এখানে থাকবেন, তাই মিঃ গান্ধীর সংগে তিনি দেখা করতে চান, এবং যেসব বিষয়ে ভাইসরয়ের সংগে তাঁর পত্রালাপ চলছিল তা নিয়ে তাঁর সংগে কথা বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাইসরয়ের এই ইচ্ছায় মিঃ গান্ধী খুশী হয়েছেন, এবং সোমবার তাঁদের সাক্ষাৎ হবে।"

ভাইসরয় ও জর্জ অ্যাবেল কিন্তু এই বাক্য দুটিকে প্রেস-স্টেটমেনটের সংগে জুড়ে দিতে অসম্মত হন। ফলে গভরনর কেসি খুবই অস্বস্তিতে পড়েন। নেহাতই সামান্য একটা ব্যাপার। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেও যে বিদ্বেষ ফেনিয়ে উঠল, সেই বিদ্বেষই সে-আমলে ইংগ-ভারত সম্পর্ককে অভিশপ্ত করে রেখেছিল।

গান্ধীজীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। ভাইসরয় কিংবা আর-কারও সংগে রাজনীতি আলোচনার ইচ্ছাই তখন ছিল না তাঁর। দেড় মাসের এই বাংলা-আসাম সফরে তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, তিনি গ্রামের মানুষদের মধ্যে গিয়ে থাকবেন। তাতে যদি তারা কিছুটা স্বস্তি আর সান্ত্বনা পায় তো সেইটুকুই লাভ। গান্ধীজী যখন কলকাতার উত্তরে সোদপুর আশ্রমে থাকতেন, তখন গ্রামাঞ্চল থেকে দলে-দলে মানুষ তাঁকে রোজ দেখতে আসত। মাঠে লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা আর চারা বসানো, সেচ, ফসলহানি ইত্যাদি নানান সব সমস্যার কথা তারা বলত; ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান্ধীজী সে-সব শুনতেন। আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটা জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছিল; সেখানে, স্নানের আগে, গান্ধীজী একটা তক্তাপোশে শুয়ে থাকতেন, আর তাঁর শরীরে তৈল মর্দন করা হত। ডিসেমবরের এক উজ্জ্বল সকালে তিনি হঠাৎ সেখানে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া সেই জায়গাটিতে তক্তাপোশের উপরে গান্ধীজী শুয়ে আছেন,

আর তাঁর পৌত্র কান্‌ গান্ধী তাঁকে তেল মাখাচ্ছেন। সারাটা দিনই তো গান্ধীজীকে হাজার কাজে ব্যস্ত থাকতে হত. সকালে এই সময়টাতেই তিনি খানিকটা নিরিবিলি চিন্তা করবার অবকাশ পেতেন। চোখ বুজে

গান্ধীজী শুয়ে ছিলেন। আমি যেতে তিনি চোখ খুলে বললেন যে, হুগলি থেকে এক-দল আলু-চাষী তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছিল, তাদের সমস্যার কথা শুনে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। এই গরিব চাষীরা বছরের এই সময়টাতে আলুর চাষ করে। এবারে বীজ-আলু বসাবার সময় তো পার হতে চলল. কিন্তু পোস্তার আলু-বাজার থেকে বীজ-আলু কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর মাত্র দিন কয়েকের মধ্যে যদি তারা বীজ-আলু না পায়. তা হলে এবারে আর আলুর চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না. ফলে ছেলেপুলে নিয়ে তাদের অনাহারে থাকতে হবে।

"তোমাকে এর একটা বিহিত করতে হবে, এবং আজই করতে হবে।" রীতিমত জোর দিয়ে গান্ধীজী আমাকে এই নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, "তুমি তো বলো যে, এই গভরনরটি লোক ভাল। তা তিনি এই গ্রামবাসীদের জন্যে বীজ-আলু যোগাড় করে দিন না। দিলে তবে বুঝব যে, তিনি সত্যিই ভাল লোক।"

শুধু নির্দেশ দিয়েই গান্ধীজী ক্ষান্ত হলেন না। তেল মাখা আর স্নান শেষ করেই তিনি বীজ-আলুর ব্যাপারটা নিয়ে গভরনর মিঃ কেসিকে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠিখানি এই:

খাদি প্রতিষ্ঠান,
সোদপুর,
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫

"প্রিয় বন্ধু,

মনের মধ্যে প্রবল দ্বিধা নিয়ে এই চিঠি লিখছি। যত দেখছি-শুনছি, বাংলা দেশের ঘটনায় আমার বেদনা ততই বাড়ছে। সমস্যার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি। এর আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

সতীশবাবুর কাছে শুনলাম, আলু-চাষীরা বীজ-আলু পাচ্ছে না, এদিকে আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বীজ-আলু বসাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। বাজারে সরকারী কনট্রোলের বীজ-আলু অবশ্য আছে। কিন্তু চাষীরা তা পাচ্ছে না।

সতীশবাবুর খবর যদি সত্যি হয়, তবে তো বুঝতেই হবে, এ-ব্যাপারে কোথাও একটা মারাত্মক গলদ রয়েছে। জানি না, আপনি এর কিছু বিহিত করতে পারেন কিনা। এই ধরনের কাজকর্ম আপনি যাঁকে দিয়ে করান, সেই মিঃ দে-র কথা আমি আপনার কাছে শুনেছি। আপনিই বলছিলেন যে, মানুষটি বেশ চালাক-চতুর। এই জরুরী সমস্যার যাতে একটা বিহিত হয় তার জন্যে কি তাঁকে কিংবা অন্য কোনও অফিসারকে আমার কাছে পাঠাতে পারবেন?

এই চিঠি যাতে এক্ষুনি আপনার হাতে পৌঁছায়, তার ব্যবস্থা করছি। বাংলা দেশের বিরাট পটভূমিকায় এই সমস্যাটাকে হয়ত খুবই ছোট দেখাচ্ছে, কিন্তু দরিদ্র চাষীদের জীবনে এইটেই এখন সবচাইতে জরুরী সমস্যা। তাদের জীবিকার টান পড়েছে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেনসি দি গভরনর অব বেংগল, কালকাটা

চিঠি হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমি লাট-ভবনে পৌঁছলাম। জানালাম, লাট-সাহেবের সংগে এক্ষুনি আমাকে দেখা করতে হবে। গভরনরদের সেকালে অতি বৃহৎ ব্যক্তি বলে গণ্য করা হত। বলা নেই কওয়া নেই, অল্পবয়সী এক যুবক এসে দুম করে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিসে ঢুকে পড়ে বলবে যে, এক্ষুনি তার লাটসাহেবের সংগে মোলাকাত করা চাই, এমন কথা সে-আমলে স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারত না। এমন ভাবে দেখাসাক্ষাতের রেওয়াজই ছিল না তখন; মনে করা হত যে, এ-সব নেহাতই কেতাবিরুদ্ধ কাণ্ড। তদুপরি গভরনরের সেক্রেটারি তখন জে. ডি. টাইসন। ঝানু সিভিল সারভ্যানট; নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি বরদাস্ত করতেন না। যাই হোক, আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, "আপনার আলোচনায়

বিষয়টা কি খুব জরুরী? তাঁকে আপনি কী বলতে চান?” উত্তরে বললুম, “গভরনরকে আমি বীজ-আলুর কথা বলব।”

শুনে টাইসন তো স্তম্ভিত। “বীজ-আলু? কী বলছেন মশায়? বীজ-আলুর সঙ্গে বাংলা দেশের গভরনরের কী সম্পর্ক? আপনি কি পাগল হয়েছেন?”

কথা না বাড়িয়ে আমি মহাত্মা গান্ধীর চিঠিখানি এগিয়ে দিলুম। গান্ধীজীর আপন-হাতে লেখা চিঠি; উপরে লেখা ‘জরুরী’।

টাইসন জব্দ। পাশেই গভরনরের অফিস-ঘর। সেখানে গিয়ে টাইসন তাঁকে জানালেন যে, বীজ-আলুর ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মুহূর্তকাল বাদেই গভনরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন টাইসন; আমাকে বললেন, গভরনর আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অতঃপর আমি গিয়ে গভরনরের ঘরে প্রবেশ করলুম।

আমাকে ঢুকতে দেখেই লাটসাহেব বললেন, “ব্যাপার কী, সুধীর? বীজ-আলুর আবার কী হল? সব খুলে বলো তো।”

গভরনরের হাতে গান্ধীজীর চিঠিখানি আমি তুলে দিলাম। তারপর, বীজ-আলু নিয়ে হুগলির চাষীরা কী সমস্যায় পড়েছে এবং গান্ধীজীর কাছে এসে কীভাবে তাদের দুঃখের কথা জানিয়েছে, সব খুলে বললাম। শুনে গভরনর বললেন, অসট্রেলিয়া আর ব্রিটেনের রাজনীতির হাড়হদ্দ তিনি জানেন, কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে আর কেউ কখনও তাঁকে বীজ-আলু খুঁজতে বলেননি। “যাই হোক, আমার যেটুকু সাধ্য, তা করছি।” বলে তিনি মিঃ টাইসনকে ফোন করে ডেকে আনালেন; এবং গম্ভীর গলায় তাঁকে বললেন, “দেখ টাইসন, বাংলা দেশে অনেক বছর তুমি ম্যাজিসট্রেটগিরি করেছ। সুতরাং বীজ-আলু সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও তোমার জানবার কথা। বেশ, তা হলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চটপট কাজে লেগে যাও, এবং যেখান থেকে পারো বীজ-আলু যোগাড় করো। কাজটা আজই করা চাই। তার কারণ, বীজ-আলুর জন্য মিঃ গান্ধী খুবই অস্থির হয়ে উঠেছেন।”

মাথা চুলকে টাইসন বললেন, কৃষি-দপ্তরের সেক্রেটারি সুবিমল দত্তকে বরং ডেকে আনা যাক, তিনিই এর যা-হয় বিহিত করতে পারবেন।

সুতরাং সুবিমল দত্তকে (পরে তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি এবং মস্কোতে আমাদের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন) ডাকা হল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। মুখে উদ্বেগের ছাপ। সেটা স্বাভাবিক। সেকালে লাট-প্রাসাদে এমনভাবে সাধারণত ডাক পড়ত না। সুতরাং উদ্বেগ হতেই পারে। যাই হোক, গভর্নরের ঘরে অতঃপর বীজ-আলু সম্পর্কে রীতিমত একটা বৈঠক বসে গেল, এবং তাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, মিঃ দত্ত আর আমি সেখান থেকে নিমতলায় পোস্তার আলুপট্টিতে যাব। সেখানে শ্রী দত্ত বাংলা সরকারের একজন সেক্রেটারি হিসাবে, জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করে, বীজ-আলুর গোটা স্টক আটক করবেন, এবং ন্যায্য দরে সেই বীজ-আলু গ্রামবাসীদের মধ্যে বণ্টন করবার ব্যবস্থা করবেন। আড়তদাররা আসলে কারসাজি করে বীজ-আলুর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছিল। যে-দাম দেওয়া আলু-চাষীদের সাধ্যাতীত, সেই চড়া দাম তারা হেঁকে বসত। গরিব চাষীদের সর্বনাশ করে এই-ভাবে তারা প্রচুর মুনাফা লুটছিল। সরকারের একজন সেক্রেটারির পিছনে বেশ-কিছু পুলিস আর লালপট্টি-কুর্তা পরা চাপরাসী এসে আলুর আড়তে হাজির হয়েছে, এই দেখে তো আড়তদাররা ঘাবড়ে গেল। মাননীয় সেক্রেটারি মহাশয় আলু-পট্টির মাঝখানে একটা কেরোসিন-কাঠের বাক্সের উপরে উঠে দাঁড়ালেন, এবং তাড়াতাড়ি করে একটা চিলতে কাগজে তিনি যা লিখেছিলেন, সেটা সবাইকে পড়ে শোনালেন:

“ভারতরক্ষা বিধিবলে বাংলা দেশের গভরনর বাহাদুরের উপরে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে, সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমি, সুবিমল দত্ত, বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, এতদ্দ্বারা এই বাজারের যাবতীয় বীজ-আলু আটক করছি, এবং এই আদেশনামার উপরে আমার সীলমোহর লাগিয়ে দিচ্ছি।”

সেক্রেটারি মহোদয় কিন্তু তাঁর সীলটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি হতোদ্যম হলেন না। সেই চিলতে কাগজের উপরে চটপট তিনি একটা বৃত্ত এঁকে ফেললেন, এবং সীলমোহরের কথা-গুলিকে সেই বৃত্তের মধ্যে হাতে লিখে দিয়ে তার তলায় নিজের নাম সই করে দিলেন।

লালপট্টি-কুর্তা পরা চাপরাসীরা সেই চিলতে কাগজটিকে সেখানে একটি দেওয়ালের গায়ে সেঁটে দিল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে এই ভয় দেখা দিয়েছিল যে, আড়তদাররা হয়ত এই চিলতে কাগজের বিজ্ঞপ্তিকে গ্রাহ্য করবে না। কিন্তু চিলতে-কাগজেই নিমেষে ফলোদয় হল। সেক্রেটারি মহোদয় দেখতে বিশেষ জবরদস্ত নন, রোগাপানা নিরীহ চেহারার একজন বাঙালী ভদ্রলোক। কিন্তু চাপরাসীরা তো আর তা নয়। তাদের দেখেই আড়তদারদের মধ্যে সম্ভবত আতঙ্ক উপস্থিত

হয়েছিল। তারা আর কথা বাড়াল না। অবোধ বালকের মতন তাদের যাবতীয় স্টক তারা ন্যায্য দামে ছেড়ে ছিল। সারাটা দিন সেই বাজারের মধ্যে আমরা (সেই যে ছেলেটি পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য জ্বলন্ত জাহাজের ডেকের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মত) ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, এবং সানন্দে দেখতে লাগলাম যে, গ্রামবাসীরা এসে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে বীজ-আলু নিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সারাটা দিন ভাল-ভাল সব কাজ করে বয়স্কাউটরা যেভাবে তার ফিরিস্তি দেয়, সেইভাবে সন্ধ্যাবেলায় আমরা গভর্নর আর মহাত্মা গান্ধীকে গিয়ে জানালাম যে, সেই একটি দিনেই আলু-চাষীদের মধ্যে মোট ২৫০ মন (প্রায় পাঁচ হাজার কিলোগ্রাম) বীজ-আলু বণ্টিত হয়েছে। শুনে মহাত্মাজীর আনন্দের আর সীমা রইল না। আমার কাজের নমুনা দেখে তিনি বেশ গর্ববোধ করলেন। অতঃপর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছেন, মহাত্মার কাছে প্রথমেই তাঁদের প্রত্যেককে শুনতে হয়েছে বীজ-আলুর গল্প। স্বয়ং নেহরুও রেহাই পাননি।

॥ ৮ ॥

শরীরকে অতসী অনেক দিন খাটিয়েছে, অনেক অত্যাচার সইয়েছে, অনাহারে অর্ধাহারে চিন্তায় ভাবনায় শ্রান্তিতে একেবারে সীমান্তে এনে পৌঁছে দিয়েছে। এবার শরীর তার শোধ নিল। রোগশয্যা তাকে গভীর আগ্রহে আঁকড়ে ধরলো। তিন সপ্তাহ কেটে গেল, তবু তার অবস্থার একটুও উন্নতি হলো না। জ্বর ছাড়লো না, প্রেসার বাড়লো না, হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত রইলো, মাথার দুর্বলতাও এমন জায়গায় এসে পৌঁছুলো যেখানে এসে সে তার অতীত জীবন সম্পূর্ণভাবেই বিস্মৃত হলো। তার বর্তমান জগতের অচেনা পরিবেশে একমাত্র নীলেন্দুনারায়ণ মিত্র ছাড়া আর কারোরই কোনো অস্তিত্ব রইলো না তার কাছে। সে ভাবলো, আর সবাই তার শত্রু, সবই তার ভয়ের। সে জানলো না, এ বাড়ি তার নয়, বাড়ির মালিকটির উপরও তার কোনো দখল নেই। মূঢ় বুদ্ধি নিয়ে সে এক ধরনের প্রেমেই পড়লো।

ডক্টর সামন্ত বললেন, 'এ অসুখ এর আজকের নয়, বহু দিনের তিল তিল সঞ্চয়। জানি না কোথায় ছিলো, কার মেয়ে, কিন্তু খাদ্যাভাবই এই অসুখের মূল।' মাথা নেড়ে আফসোস করলেন, 'আপনাকে কী বলবো মিঃ মিত্র, স্বাভাবিকভাবে ভগবান একে এমন সব উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি করে ভবধামে পাঠিয়েছিলেন যে, যার কোনো তুলনা নেই। যতোটা যুদ্ধ করবার সবলেই করেছে, কিন্তু জানেন তো, তেল না পেলে সব যন্ত্রই মরচে ধরে? যুদ্ধই করেছে, রসদ কিছু ছিলো না।'

চিন্তিতভাবে মিঃ মিত্র বললেন, 'তা হ'লে এখন করণীয় কী?'

'আর কী? প্রচুর তেল সরবরাহ। তারপর নেবে বা জ্বলে সেটা আমার হাতযশ আর আপনার ভাগ্য।'

'ভাগ্যই বটে', হাসলেন একটু, 'শুনুন ডক্টর সামন্ত', বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের সিগারেটটা তিনি ঠুকতে লাগলেন, 'বেঁচে থাক, বা মরে যাক সেটা কথা নয়। এমন যেন না হয় চিকিৎসার অভাব বা অযত্নে মারা গেল। সেটা আমার পক্ষে যতো কলঙ্কের হবে, ততোই দুঃখের হবে। আশ্রয় দিয়ে আশ্রিতকে যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারিনি এই ভেবে অহমিকাও কম আহত হবে না। সুতরাং ঐ তেল সরবরাহের জন্য আপনি ভাববেন না। আপনাদের শাস্ত্রে যা করণীয় সব করুন, এই হচ্ছে আমার অনুরোধ। অন্তত সেদিক থেকে যেন এতোটুকু ত্রুটি না হয়।'

ডক্টর সামন্ত ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবলেন। অন্যমনস্কের মতো বললেন, 'কী সুন্দর একটা তাজা মেয়ে, কী সুন্দর বয়েস, আর কী কাণ্ড করেছে স্বাস্থ্যটা নিয়ে।' মিত্র সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন, 'ডাক্তারি করছি আজ পঁচিশ বছর, তবু এই সুন্দর বয়সটাকে হারিয়ে যেতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।'

'আপনার কি ধারণা, মেয়েটি বাঁচবে না?'

'তা কি কেউ বলতে পারে? তবে বেঁচে থাকার পনেরো আনা সম্বলই ও খুইয়ে বসেছে।'

'তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই।'

'নিশ্চয়ই না।'

'তাই বলছিলাম—'

'দেখছেন তো, মাথাটা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে।'

'পাগল নয় তো?'

'না, না। শরীর সেরে গেলে বুদ্ধিও সবল হয়ে উঠবে।'

'তা হলে সেই সবল হবার উপায়টাই বাতলে দিন।'

'একটা কাজ করবেন?'

'বলুন।'

'আপনি একে হাসপাতালে দিয়ে দিন।'

'কেন?'

'আপনার কোনো দায়িত্ব থাকে না তা হ'লে।'

'আমি কি দায়িত্ব নেবার অনুপযুক্ত?

অথবা দায়িত্বকে ভয় পাই বলে আপনার ধারণা?'

'ও দুটো কথার একটাও আমি ভাবিনি।'

'তবে?'

'ধরুন, এই যে একটা অবসেসন হয়েছে, আপনাকে না দেখলেই ভয় পায়, মন খারাপ করে থাকে, অন্যদের বিশ্বাস করতে পারে না, সেটা হয়তো পরিবেশের বদলে কেটে যাবে।'

'নার্সদের তো আজকাল আর তেমন ভয় পায় না। তা ছাড়া আমাকে না দেখলে মন খারাপ ক'রে থাকে এটাও ঠিক কথা নয়।'

'আচ্ছা, আপনি কি মেয়েটিকে এর আগে সত্যি কখনো দেখেননি?'

'কখনো না।'

'মেয়েটি বোধ হয় চিনতো।'

'না, তাও নয়।'

'কী ক'রে জানেন? কতো জায়গায় যান, কাগজে কতোবার নাম বেরোয়—'

'আমি খুব ভালো ক'রে জানি ডক্টর সামন্ত, ও আমাকে কখনো দেখেনি, কোনো দিন চিনতো না। ওর অসুস্থ বুদ্ধিতে আমার উপর হয়তো বস্তুতই একটা বিশ্বাস জন্মেছে, কিন্তু সেটা একান্তভাবেই কাকতালীয়। ওর বিষয়ে সব কথা আপনাকে বলা যাবে না, সব আমি জানিও না, তবে এটুকু জানি, সেই রাত্রে ও গুণ্ডার হাতে পড়েছিলো।'

'আঁ—'

'সেই 'শক' সহ্য করতে না পেরেই অজ্ঞান হয়ে যায়—'

'সে কী! আপনার এখানে কী ক'রে এলো?'

'সেটুকু উহ্য থাকবে এই গল্পে। মোট কথা, আমার লোকজনেরা ওকে যখন অচৈতন্য অবস্থায় আমার এখানে এনে তুললো, সেই প্রথম আমি ওকে দেখলাম এবং এখানে এসে যখন ওর জ্ঞান হ'লো ও-ও সেই প্রথম আমাকে দেখলো। আমার মনে হয়, গুণ্ডাদের বদলে আমাকে দেখে ওর ধারণা হ'লো আমিই ওকে রক্ষা করেছি—'

'ঠিক।'

মিঃ মিত্র হাসলেন, 'চরিত্রটি যেমনই হোক, চেহারাটা তো মোটামুটি ভদ্রলোকের মতোই? তাই দেখেই বেচারা ঠকেছে। আমার দেহের এই প্রতারক প্রচ্ছদপটটিই ধুলো দিয়েছে ওর চোখে।'

প্রতারক প্রচ্ছদপট কথাটি শুনে খুব কৌতুক বোধ করলেন ডক্টর সামন্ত। খোলা গলায় হাসলেন হো হো ক'রে। হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু সাহেব, ধুলোটা একটু বেশী পড়ে গেছে কিনা, তাই
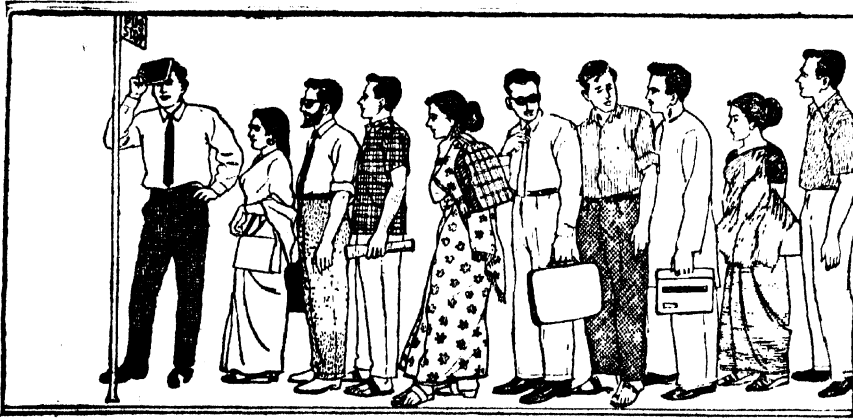
বলছিলাম, একে হাসপাতালে দেওয়াই সব দিক থেকে নিরাপদ।'

'এখানে নার্সরা বেশ যত্ন নিয়ে সেবা করে। আর দেখুন, হাসপাতালেই যাক আর যেখানেই যাক, দায়টা তো এখন আমারই?'

'ধরে নিন ও বাঁচবে না। কী দরকার অশান্তি বাড়িয়ে? আমি তো দু'টো তিনটে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছি, তারই একটায় নিয়ে নিতে পারি। সেখানে যথেষ্ট যত্ন হবে।'

'এখানে কি হচ্ছে না?'

'হয়তো হচ্ছে—'

'হয়তো কেন?'

'এখন ওর চিকিৎসার প্রধান বস্তুই হলো ওর খাওয়া। সইয়ে সইয়ে বুঝে বুঝে এমন সব খাদ্য ওকে খাওয়াতে হবে—'

মিঃ মিত্র অসহিষ্ণু হ'য়ে বাধা দিলেন, 'আপনি যেরকম যেরকম বলে যান সব কিছুর বন্দোবস্তই করা হয় এখানে।'

'তা নিশ্চয়ই হয়।'

'তবে?'

'আপনার ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ধরছি না আমি। আমি বলছিলাম, আয়োজনটাই তো সব নয়, সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারও প্রয়োজন।'

'মানে?'

'নার্সরা বলছে, ওকে খাওয়ানো একটা মহামারী ব্যাপার, তুমুল কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়, কারো কথা শোনে না। হাসপাতালে গেলে নার্সরা জোর করবে, ধমকাবে—'

'এখানে ধমকাক না, এখানে জোর করুক না—'

'প্রাইভেট নার্সরা কক্ষনো তা করতে সাহস পায় না।'

'কেন?'

'বাড়ির লোককে ভয় পায় ওরা। এখন বলছেন বটে ধমকাক, জোর করুক, কিন্তু এই আপনিই হয়তো সেই ধমকানো শুনলে একদিন ক্ষেপে যাবেন। আর মেয়েটি তো শুধু দেহেরই রোগী নয়, মনেরও তো রোগী। একবার জেদ ধরলে তাকে দিয়ে কিছু করানো অসম্ভব। তার উপরে বাড়িতে থাকলে অচেতন বুদ্ধি দিয়েও ওরা অনেক রকম চালাকি করতে পারে। ভান ক'রে মূর্ছা যেতে পারে, অসুস্থ হ'তে পারে—অর্থাৎ জানে তো আদর কববার লোক আছে বাড়িতে।'

'কিন্তু ওর তো তা নেই। এটা ওর বাড়িও নয়, আপন জনও কেউ নেই।'

'সেটা তো আপনি আমি জানি, ও তো জানে না? ওর তো ধারণা, ও-ই এখানকার একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।'

মিঃ মিত্রর চোখে এক টুকরো ছায়া ভাসলো। তিনি চুপ ক'রে সিগারেট খেতে লাগলেন।

ডক্টর সামন্তও একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, 'প্রশ্রয় পেলেই রোগী বেয়াড়াপনা করে। গোলমাল করে। হাসপাতালে গেলে একদম ঠান্ডা।'

'আপনি বলছেন প্রশ্রয়টা হবে 'আমার দিক থেকে?'

'নিশ্চয়ই।'

'অর্থাৎ আমার প্রশ্রয়েই রোগী অবাধ্যতা করবে নার্সদের সঙ্গে?'

'একজ্যাক্টলি।'

'অর্থাৎ হাসপাতালে গিয়ে আমাকে না দেখলেই সোজা থাকবে?'

'রাইট।'

'এবং সে ভালো হবে?'

'সেটা কথা দিতে পারে না কেউ। বিশেষত এই ধরনের রোগীকে। এ তো যে-কোনো মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে। একটা ধমক দিয়ে দেখুন না।'

'প্রেসার বলছিলেন ভীষণ নীচে, তা হলে গ্লুকোস দিচ্ছেন না কেন?'

'নিতে পারলে তো? দিতে হবে ভেইনে, একটু এদিক ওদিক হলেই হৃৎপিণ্ডটি বন্ধ হয়ে যাবে। ঐজন্যই তো বলছিলাম, চেনা নেই জানা নেই কী দরকার চোখের উপর একটা মৃত্যু দেখে। যা হবার বাইরে বাইরেই হোক।'
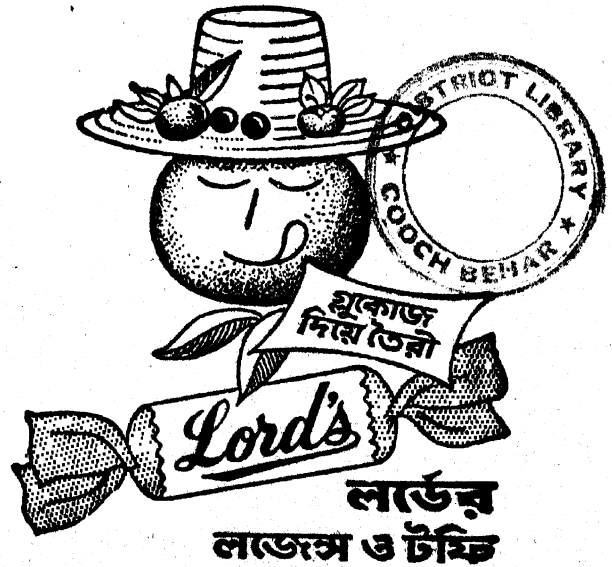
এ কথায় ডক্টর সামন্তকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হলো। মনে হ'লো একটা জীবনের যেন কোন মূল্য নেই এঁর কাছে। এবং কেন মূল্য নেই সেটাও স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি। যেহেতু মেয়েটি অসহায়, যেহেতু এই মুহূর্তে সে নামগোত্র-পরিচয়হীন একটা মানুষ। মিঃ মিত্র জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

কিন্তু তা নয়, অনেক দিক বিবেচনা ক'রেই ডক্টর সামন্ত এই প্রস্তাব করেছিলেন। যখন তখন রক্ত দিতে হ'তে পারে, ইনজেকশন দিতে হ'তে পারে, ডাক্তার ডাকতে হতে পারে—দেহের এই শোচনীয় অবস্থায় কতো কিছুই যে হ'তে পারে তার কি অন্ত আছে? সেই কারণেই বাড়িতে থাকা অনিরাপদ। শেষে তিনি বললেন: 'তা ছাড়া আপনাকে যদি একেবারেই দেখতে না পায়, যদি মনে মনে জানে যে, আপনি আর নেই ওর জগতে, সেটা ওর পক্ষে মঙ্গল হবে। কেননা সারাক্ষণ এই আশায় আশায় থাকার যে একটা স্ট্রেইন, সেটা ক্ষতিকর—'

মিঃ মিত্র বললেন, 'আশায় আশায় থাকা কথাটা বোধহয় ঠিক বললেন না, আমি আগে একবার ওকে দেখতে আসতাম, এখন দু'বার আসি।'

'কিন্তু সারা দিন তো আর আসছেন না। আপনাকে ছাড়া থাকতেও সব সময়ে নিজেকে ইনসিকিওরড্ মনে করে। যদি এমন হতো যে, আপনি ওকে যথেষ্ট সময় দিতে পারছেন, খাওয়ার সময় থাকছেন, ঘুমুবার সময় থাকছেন, সত্যি সত্যিই আপনজন হ'য়ে এখানেই আবদ্ধ রেখেছেন নিজেকে, আমি বাজি ধরতে পারি তা হলে ও অনেক দ্রুত সেরে উঠতে পারতো। কিন্তু তা যখন আপনি পারছেন না, সেই নার্সদের হাতেই যখন ওকে থাকতে হচ্ছে সারাক্ষণ, তখন আপনাকে ওর মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়াই ভালো। সেদিক থেকে হাসপাতাল অনেক বেশী কার্যকরী হবে।'

'তার মানে শারীরিক অসুস্থতাই শুধু নয়, ব্যক্তিগত সংস্পর্শের অভাবও ওর ক্ষতির একটা মস্ত বড়ো কারণ?'

'নিশ্চয়ই। শুনুন, শরীর আর মন দুইই ওর ভেঙে গেছে. এখন দুইই দুইয়ের পরিপূরক। অর্থাৎ শরীরটা সারিয়ে তুলতে পারলে যেমন মনটা সুস্থ হবে, তেমনি মনটাকে প্রফুল্ল রাখতে পারলেও শরীর সেরে উঠবে তাড়াতাড়ি।'

'তা হলে একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট ক'রে দেখবো নাকি?' মিঃ মিত্র হাসলেন।

স্টেথেসকোপটা গলায় ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কাঁচাপাকা চুলে হাত ডুবিয়ে ডক্টর সামন্তও হাসলেন, 'দেখুন না।'

'আমার যে এতোটা মূল্য তা কিন্তু আমি জানতুম না। নিজের উপর বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছে।'

সিঁড়ি পর্যন্ত ডক্টর সামন্তকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

১

সত্যি সত্যি এক্‌স্‌পেরিমেন্টের কথাই ভেবে কিনা কে জানে, পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠেই মিঃ মিত্র সর্বপ্রথম এ ঘরে এসে দাঁড়ালেন। নার্স শশব্যস্তে বসবার আসন এগিয়ে দিল।

বেলা তখন আটটা। এই সময়ে তাঁর ঘরে বেড-টি যায়, কিন্তু তিনি জানেন, এটাই রোগিনীর প্রাতরাশের সময়। তাই দেখতে এলেন খাদ্যের প্রতি সে কতোটা সুবিচার করে। দেখলেন, এর মধ্যেই দরজা জানালা খুলে, বিছানা ঝেড়ে, ঘর [illegible]

একেবারে ঝকঝকে ক'রে ফেলেছে নার্স। মুখ ধুইয়ে দিয়েছে, মাথা আঁচড়ে দিয়েছে, খাবার সামনে রেখে প্রস্তুত। কিন্তু অতসী খাচ্ছিলো না, তাকিয়ে ছিলো জানালা দিয়ে বাইরে আকাশে। হঠাৎ অসময়ে তাঁকে দেখে আলো জ্বলে চোখে। শিশুর মতো সরল অভ্যর্থনায় উদ্বেল হ'য়ে বললো, 'তুমি এসেছো?'

কাছে বসলেন মিত্র সাহেব, বললেন, 'খেয়ে নাও, তারপর কথা।'

'আমি খাবো না।'

'কেন?'

'না।'

'না খেলে কী হবে জানো?'

'কী?'

'ডক্টর সামন্ত বলেছেন, হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।'

'ডক্টর সামন্ত? তুমি?'

'আমি ডক্টর সামন্ত নাকি?'

'তবে তুমি কে?'

'চেনো না, না?'

'তুমি ডাক্তার। খুব বড়ো ডাক্তার। আমি জানতাম না। তুমি এতো ভালো, তোমার এতো দয়া।'

'আমি ডাক্তার নই। আমি নীলেন্দু।'

'তুমি নীলেন্দু?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ডাক্তার নও?'

'না।'

'তবে কী হবে?'

অতসীর চোখে জল এসে গেল।

'এ কী? কী হলো?'

'আমি জানি তুমি ডাক্তার। আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবার জন্য এসব বলছো।'

'বেশ তো, ঠিক আছে, আমি ডাক্তার। হ'লো?'

এবার খুশী হ'য়ে অতসী হাত বাড়িয়ে দিল। সে-হাত তিনি মুঠোয় তুলে নিয়ে বললেন, 'তা হলে এবার খাও কেমন?'

'না।'

'তা হলে চলো হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

'হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সেখানে গেলে তুমি ঠিকমতো খাবে, তাড়াতাড়ি ভালো হ'য়ে যাবে—'

'আমার কী হয়েছে?'

'অসুখ করেছে।'

'আমি কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

'তোমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কেন হাসপাতালে যাবো?'

'আমার বাড়ি আর তোমার বাড়ি কি এক?'

'এক নয়?'

'না।'

'কেন?'

'কথা শোনো না কিনা, তাই।'

'তুমি এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'যেখানেই থাকি না কেন, তোমাকে ঠিক হাসপাতালে দিয়ে আসবো।'

'না।'

'তবে খাও।'

'হাসপাতালে গেলে মানুষ মরে যায়।'

'কে বলেছে?'

'কে বলেছে?'

'আমি কী ক'রে জানবো? তুমি তো বলছো?'

'ঐ যে কার যেন অসুখ করেছিলো, কে যেন বললো হাসপাতালে গেলে মরবার সময় জল খেতে দেয় না, তোমাকে দেখতে দেয় না।'

'হাসপাতালের সব রোগীরাই বুঝি আমাকে দেখতে চায়?'

'আমি চাই।'

'তুমি চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'তুমি কেন থাকো না?'

'এই তো আছি।'

'আমি তোমাকে চাই, ওরা ডেকে দেয় না।'

'কেন আমাকে চাও?'

'মন কেমন করে।'

'আমার জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'পাগল।'

'তুমি যেয়ো না।'

'তা হলে আমার কথা শোনো।'

'কী কথা?'

'আমি তো ডাক্তার, আমি যা যা খেতে বলবো খাবে, যেমন যেমন থাকতে বলবো থাকবে—'

'কিন্তু ওরা?'

'কারা?'

'ওরা খাবে না?'

'কাদের কথা বলছো?'

'ঐ যে অসুখ করলো, বার্লি ফুরিয়ে গেল, মিছরি ছিলো না, লণ্ঠনটা ভেঙে গেল। উঃ কী কষ্ট। কী কষ্ট।'

'কিছু কষ্ট নেই।'

'তারপর বললো, 'চল, চল, ডাক্তার ডাকবি না?' আমি তখন গেলাম—'

'শোনো—'

'না, না, না, আমি খাবো না, খাবো না।'

'কেন খাবে না?'

'ওরা খায়নি।'

'সবাই খেয়েছে।'

'সবাই খেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভয় পাই।'

'কিসের ভয়?'

'কী যেন দেখি, কে যেন আসে—ঐ যে, ঐ যে—।'

'শোনো, শোনো—'

'অনেকগুলো লোক, কী ভয়ানক অন্ধকার—'

'সব তোমার ভুল।'

'ভুল?'

'দুঃস্বপ্ন।'

'তুমি আছো তো?'

'আছি বই কি।'

'তুমি যেয়ো না।'

'না। কিন্তু এবার খাও লক্ষ্মীটি—'

ফলের রসের গ্লাসটা তিনি তুলে ধরলেন মুখের কাছে। তারপর একটু ডিম, একটু রুটি, একটু আপেল—এই ক'রে ক'রে অল্পে অল্পে সবই খাইয়ে দিলেন।

নার্স বললো, 'এতো দিনের মধ্যে এই প্রথম উনি খেলেন ঠিকমতো। অন্য সব কথা ভয়ে ভয়ে শুনলেও খাবার কাছে আনলেই কান্না।'

ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মিঃ মিত্র বললেন, 'ঠিক আছে, এবার থেকে আমি আসবো, আমি উপস্থিত থাকবো এই সময়গুলোতে।'

(ক্রমশ)

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

জরমানীর আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী আর সব বছরের মত এবারও প্রায় সমাগত। এই পুস্তক প্রদর্শনীতে পৃথিবীর বহু দেশের বই—সর্ব শ্রেণীর, সর্ব রুচির—যেভাবে আলোড়িত হয়, তা জরমানীর অন্য সব বিস্ময়ের চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। এই সাহিত্য উৎসবকে কেন্দ্র করে জরমানীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে আলোড়ন দেখা দেয়, তা একটা দেশের মননশীলতার অ্যাক্রবাটস্ (acrobats) বলা চলে। এই প্রদর্শনীতে যোগদান করার জন্যে কেবল পশ্চিম জরমানীর প্রকাশক আর লেখক কবিরাই ফ্রাংকফুর্টের দিকে পাড়ি জমান না, এমন কি আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপের বহু প্রকাশকদের সঙ্গে লেখক সাহিত্যিকরাও যাত্রা করেন ফ্রাংকফুর্টের দিকে। "নাখ্ ফ্রাংকফুর্ট, নাখ ফ্রাংকফুর্ট"—জয়ধ্বনি।

পশ্চিম জরমানীর প্রকাশক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচাইতে বড় উন্মাদনা—কোন সাহিত্যিকের বই বছরের "Best-Seller" আখ্যায় ভূষিত হবার সম্ভাবনা রাখে। প্রথম সারির লেখকদের মধ্যে কে রাখেন এই চ্যালেঞ্জ? গ্যুন্টার গ্রাস্ ত তাঁর নতুন নাটক নিয়েই ব্যস্ত! মাক্স্ ফ্রিশ ইতিমধ্যে তেমন কিছুই লেখেন নি। বাকী রইলেন, জরমান সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রটি, যাঁর নাম দেশে-বিদেশে ক্রমশই খ্যাতি লাভ করছে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্যে সুইডেনের নোবেল কমিটিতে নাম ঝুলে আছে, হাইনরিষ ব্যোল। হাইনস্যান্ডার ব্যোল এ-দেশের পাঠকের মুখে যতটা না বহু উচ্চারিত, তার চাইতে অনেক বেশী উচ্চারিত বিদেশে। তবু এ বছর, প্রকাশক মহলের ধারণায়, হাইনরিষ ব্যোল-এর সর্বশেষ ২৫৬ পৃষ্ঠার বই "End of an Official Journey" সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রির দাবি রাখে। বইটা সবে Kiepenheuer & Witsch থেকে প্রকাশ হতে চলেছে। তবে ব্যোল-এর সাথে প্রতিযোগিতা করবে Stefan Andres-এর "Taubenturm" (Dove-Cote)। প্রকাশক—Piper-Verlag।

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে Witkiewicz-এর লেখা "Unersaettlichkeit" (Insatiability)। লেখক ১৯৩৯ সালে আত্মহত্যা করে মারা যান। তাঁর এই বইয়ের বিষয়-বস্তু—চীনাদের আক্রমণে ইউরোপের পতন। আর একজন তরুণ লেখকের নাম সবার চোখের সামনে ভাসছে, যাঁর বই-এর ওপর চলচ্চিত্র "Schonzeit fuer Fuechse" (Close season for foxes) গত বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। সেই Guenter Seuren-এর নতুন উপন্যাস Lebeck-ও এ-দেশের পাঠকদের বিশেষ কৌতূহল যে সৃষ্টি করবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

গত বছর ডঃ আদেনাওয়ারের "আমার স্মৃতিকথা" বইটি এ-দেশে বহুলবিক্রীত বই। এ বছর তার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। যুদ্ধোত্তরকালের জরমানীর বিস্ময়কে জানতে হলে ডঃ আদেনাওয়ারের এই বইটি বিশেষভাবে পড়া উচিত। গত যুদ্ধের জরমান রাজনীতির ওপর নতুন মাল-মসলা নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে। "Kriegspropaganda 1939-1941, geheime Minister-Konferenzen Im Reichs propaganda ministerium" (War propaganda from 1939 to 1941, Secret Ministerial Conferences in the Reich's Ministry of propaganda) যে বইটি "Hitler's Lagebesprechungen" (Hitler's Strategy Conferences) বইটির মতই বহু নতুন তথ্য আর তত্ত্বে ভর্তি।

ব্রেখট

এ-দেশের রাজমিস্ত্রীরা যেমন অশ্লীল ভাষার রাজা, সে ভাষার রাজ্যে ফ্যাক্টরী বা অন্য কোন বিভাগের শ্রমিকরা একেবারেই নাবালক. তেমনি মাওয়ারার অর্থাৎ এই রাজমিস্ত্রীরা মদ্যপানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এক নিশ্বাসে বীয়ারের সমুদ্র পান করে ফেলতে পারে এরা। আমি একটি রাজমিস্ত্রীকে দেখেছি, অসম্ভব দ্রুতগতিতে ইট আর পাথর বসিয়ে যেত সে বিরাট বাড়ি তৈরির সময় —সে সারাদিন প্রায় কিছুই খেত না, কেবল ৩০ থেকে ৩৫ বোতল বীয়ার পান করত, আর সজোরে ঢেঁকুরের আওয়াজ তুলত। আমি মাঝে মাঝে জরমানীর লক্ষ লক্ষ
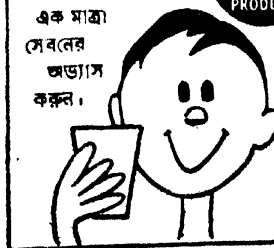
নতুন প্রাসাদগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবি—এই বাড়িগুলির ইটপাথরের পেছনে কত বিলিয়ন বিলিয়ন হেকটর লিটার বীয়ারই না খরচ করা হয়েছে। আমার এই প্রসঙ্গ টানবার উদ্দেশ্য—ফ্রাংক্‌ফুরটের বিশাল পুস্তক প্রদর্শনীর ইটের সারির মত লক্ষ লক্ষ বইয়ের কথা ভাবলে জরমানীর মাওয়ারারদের কথা মনে পড়ে যায়। পৃথিবীর এত সুন্দর সুন্দর বই সাজানো রয়েছে এই প্রদর্শনীতে ভয় হয়—এদের বিষয়-বস্তু কেবল আকণ্ঠ বীয়ারের নেশায় রচিত হয়নি ত, কেবল ঢেঁকুরের যৌন-আওয়াজ নয় ত, না মানুষের জীবনের আত্মিক দিকটার প্রতিচ্ছবির প্রতিশ্রুতিও রয়েছে এই সারি সারি বইগুলিতে। মানুষের জীবনের কত আনন্দ আর আশার ভরসাস্থলই না হতে পারে বই লেখার অলিম্পিক প্রতি-যোগিতাটি এই ফ্রাংকফুরটের বিশ্বমেলায়।

২৪৪৯টি প্রকাশনী সংস্থা (গত বছর যার সংখ্যা ছিল ২০৮৩)—তাতে বিভিন্ন বইয়ের নামের সারি সাজানো থাকবে ১৮০.০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার)—গত বছর ছিল দেড় লক্ষ। বই পড়ুয়াদের এমন মক্কা আর কোথায় আছে? এর এক-

তৃতীয়াংশ বই সবে ছাপা হতে চলেছে, বাকীগুলি ছাপা হয়ে গেছে। এই পুস্তক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করছে না কেবল— লাল চীন, আলবানিয়া, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আর বুলগেরিয়া। ২৪৪৯ জন প্রকাশকের মধ্যে ৮১৮ জন জরমান, আমেরিকার ২৪০, ইংলণ্ডের ২১৫, ফ্র্যান্সের ১৪৯ ও সুইজারল্যান্ডের ১২৫ জন প্রকাশক এ'দের মধ্যে উল্লেখজনক। ফ্রাংকফুরটের এই ১৮শ আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীটি চলবে ২২শে থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
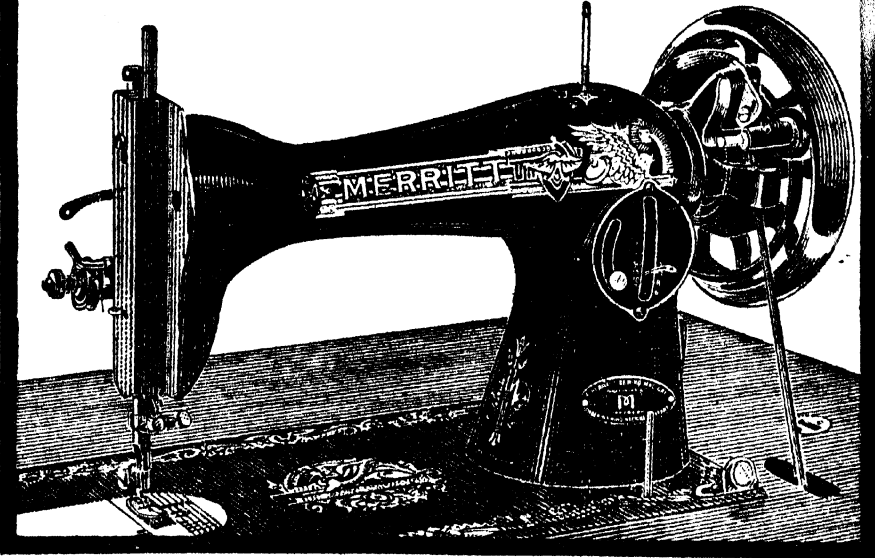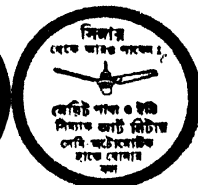
যুদ্ধোত্তরকালের কোন্ মহৎ সাহিত্যিকের নামে গ্যেটে শিলারের জরমানীর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে? টোমাস মান্, না— ব্রেখ্ট্? যদিও দুজনেই দীর্ঘকাল প্রবাসে কাল কাটিয়েছেন স্বেচ্ছানির্বাসনে। মান্-এর মহৎ সাহিত্যের আবেদন যেখানে সীমাহীন, সেখানে "Classicist" ব্রেখ্ট্-এর আদর্শ-বাদিতা অতলস্পর্শী। সে কথাই অনুধাবন করার জন্যে গত মাসে জরমানীতে ব্রেখ্ট্-এর দশম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্যাপন করা হল।

বেরথল্ট্, ব্রেখ্ট্, সেই গ্রেট ব্রেখ্ট্-এর মৃত্যু দশ বৎসর পূর্বে জরমানীর সংস্কৃতি নাটক ও সাহিত্যজীবনে যেন প্রচণ্ড দুর্ঘটনা। আর পৃথিবীর মানুষ, যাঁরা সাহিত্য ও নাটকের পূজারী, নাটকের নতুন ধর্মের সন্ধানে ব্রতী. তাঁরা যেন অসহায় বোধ করলেন এক মহৎ সহযোদ্ধাকে হারিয়ে। পৃথিবীর বহু মানুষের কাছে পূর্ব বার্লিনের মাটি, যেখানে স্প্রে নদীর ধারে ব্রেখ্ট্-এর সাধনা Schiffbauer-damm থিয়েটারটি অবস্থিত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটাই যেন একেবারে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ল। ব্রেখ্ট্ আর এখানে নেই! ভাবা যায় না! ব্রিজটার ওপর এসে দাঁড়ালে মনে হয়—সত্যি, স্প্রে নদীর জলে আর স্রোত নেই। স্তব্ধ, শোকাবহ।

দশ বৎসর অতিক্রান্ত। জরমানী আর ইউরোপ আমেরিকার নাট্যজগতে ব্রেখ্ট্ আজও প্রবহমাণ। আরো বহুকাল পরে হয়ত আরো বহু দেশে দেশে ব্রেখ্ট্-এর নাম ব্রেখ্ট্-এর নাটকের মতই মানুষের মুক্তি আর আদর্শে গিয়ে আশ্রয় নেবে। আর সব বিখ্যাত নাট্যকারের মত মাক্স্ ফ্রিশ্, ডুর্রেন্মার্ট বা হুবাল্সার-এর কোন কোন উক্তির মধ্যে দু' কথায় ব্রেখ্ট্-এর পরিচয় হয়ে যেতে পারে, যেমন— "signal ineffectuality of a classicist", কিংবা "Old gold"।

ব্রেখ্ট্কে নিয়ে আজ আলোচনার অন্ত নেই। কী পূর্বে, কী পশ্চিমে। এমন খুব কম শিক্ষিত বিদেশীকেই খুঁজে পাওয়া যাবে, যাঁরা জর্মান মাটিতে পা দিয়ে "গ্রেট ব্রেখ্ট্"-এর নাম উচ্চারণ না করে

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে"—রবীন্দ্রনাথের গানের কলিটি যেন ধরা পড়েছে বার্লিনের অ্যারন্স্ট রয়টার প্লাৎসে বেরন্হার্ট হাইলিগারের "দী ফ্লামে" (অগ্নিশিখা) ভাস্কর্যশিল্পে

ফিরে যেতে পারেন। ব্রেখ্ট্-এর ওপর পড়াশুনা করতে আসেন, এমন বিদেশীর সংখ্যা জরমানীতে নেহাত কম নয়। ও'রা ব্রেখ্ট্-এর নাট্যভূমি জরিপ করতে চান। "Weimar Playwrights"-এর সঙ্গে তাঁর নাটক, নাটকের মধ্যে যে গভীর প্রশ্ন আর অভিব্যক্তি রয়েছে যা প্রতিদিনের জীবনকে আলোচনায় সম্মুখীন করে দেয়, তার তুলনা করায় গভীরে অনেক সত্যকেই যে খুঁজে পাওয়া যায়—তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান।

সেদিন হুবাইমরে গ্যেটে আর শিলার পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন নতুন নাটকের গঙ্গোত্রীকে। আর আজকের জরমানীতে সেই নতুন প্রবাহকে নবতর রূপ দেবার চেষ্টা করে গেলেন ব্রেখ্ট্। নাটকের ইতিহাসে সেকাল আর একালের এই তিন মহারথীর অবদান জর্মান নাটককে ক্ল্যাসিক্যাল থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নীত করা। গ্যেটে আর শিলারের মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য ছিল সেদিনের সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে মানবতার মহৎ উপাদানগুলির আদর্শের মাধ্যমে মানুষের জীবনে ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাকে ফিরিয়ে আনা। ঠিক তেমনি সমান্তরালভাবে একালে জীবন দিয়ে গেলেন ব্রেখ্ট্ অন্যায় অবিচারে কলুষিত এই সমাজ ও পৃথিবীকে বদলাবার জন্যে। গ্যেটে-শিলারের আদর্শ আর ব্রেখ্টের আদর্শের মধ্যে পার্থক্য শুধু সেইখানেই, যেখানে সমাজকে পাল্টাবার জন্যে আদর্শকে কি-ভাবে তার ওপর প্রয়োগ করা হবে তার প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু তাঁদের তিনজনের সামনেই ছিল এক আদর্শ সমাজ ও সমাজ-

ব্যবস্থা। স্বভাবতই একালের ব্রেখ্‌ট্‌ বেছে নিয়েছিলেন সাম্যবাদকে—যার জন্যে তাঁকে দীর্ঘকাল রাজনীতির বলি হতে হয়েছে। লক্ষ করবার বিষয়—হবাইমার, সেদিনের আর থিয়েটার আম শিফবাউয়ারডাম, আজকের—দু'টিই পড়েছে পূর্ব জরমানীর ভাগে।

ব্রেখ্‌ট্‌-এর ১০ম মৃত্যুবার্ষিকীতে আর একজনের কথা মনে পড়ছে, তিনি হলেন, Piscator, যাঁর অবর্তমানে জরমান নাট্য আন্দোলনের বিরাট অভাব স্বভাবতই অনুভূত হয়। জরমানীর (কেবল পশ্চিমের) বড় বড় শহরগুলিতে কম করে হলেও প্রায় দুই হাজারের ওপর বছরে বিভিন্ন নাটক ও অপেরা মঞ্চস্থ হয়, এবং এত সহজে সহজ মূল্যে থিয়েটারের টিকিট আর কোন দেশে পাওয়া যায় কিনা জানি না। এমন সঙ্গীত, অপেরা আর নাটকের দেশেই ব্রেখ্‌ট্‌-এর মত বিরাট নাট্যকারের জন্ম সম্ভব। আমি বলি, আমাদের দেশে ব্রেখ্‌ট্‌কে নিয়ে গভীর আলোচনা হোক—আমাদের চিন্তার রাজ্যের জড়তা অনেক কেটে যাবে।

"আধুনিক তরুণ কবিদের জন্যে"—যদি এই ধরনের কোন শিরোনামায় আমার এই ছোট সংবাদটা পরিবেশন করা যায় তা হলে কেমন হয়? ঘটনাটা হামবুরগের। একটা উৎসবের—কবিতা পাঠের। আয়োজন করা হয়েছে "Schutzverbandes Deutscher Autoren Nordwest e v"-এর তরফ থেকে। এই সংস্থার পরিচালককে তরুণ কবিদের রাখাল বলা চলে। নাম—Carl Heinz Trinckler—হঠাৎ একদিন নাকি এক পার্টিতে নেশার ঘোরে তাঁর মাথায় এই পরিকল্পনাটা উদয় হল, যাকে লোকে বলে—"Schnapsidee"। এই উৎসবের নাম দেওয়া হল—"Lyrik und Jazz" (কবিতা ও জ্যাজ সংগীত)। যদিও কবি হাইনরিখ হাইনে থেকে বেন, আন্‌ৎসেনস্‌বেরগার পর্যন্ত অনেক কবির কবিতার সাথেই আজ জ্যাজ সংগীতের আমেজ মিশিয়ে বাজারে লং প্লেইং রেকর্ড করে ছাড়া হচ্ছে। কে বলে কবিতার শ্রোতা কম? জরমানীর বহু শিক্ষিত মানুষের ঘরে যেমন বাখ্‌, বেঠোফেন থেকে স্ট্রাভিন্‌স্‌কি, হেনৎসের রেকর্ড পাবেন, তেমনি হাইনে, হালডারলিন, রিল্‌কে থেকে বেন্‌, অ্যান্‌ৎসেনস্‌বের্‌গারের কবিতার বই নয়, রেকর্ডও আপনি পাবেন। কেবল আপনি বাখ্‌-এর নিজস্ব সংগীতই পাবেন না, তার ওপর jazz মিশিয়ে নিউ ইন্‌টারপ্রিটেশান "PLAY BACH"ও পাবেন। আর শুধু হাইনে নয়, তার সাথে jazz মিশিয়ে "JAZZ UND LYRIK"ও পাবেন। আমি এ'দের সংগ্রহ করি, প্রচারও করি তাই। (আমাদের দেশেও কি রবীন্দ্রনাথ, কি জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গে বাঁশী-সেতারের সুরে মিশিয়ে, এমন কি অধুনাতম রবিশঙ্করের জ্যাজ মিশিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। "আরো কবিতা পড়ুন" বা "হপ্তা কবিতার পত্রিকা"র চাইতে এর আবেদন যে আরো ব্যাপক ও গভীর এবং আর্থিক দিক থেকে লাভজনকও, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।) যাইহোক, আবার হামবুরগে ফিরে আসা যাক।

ঠিক করা হল, হামবুরগের শেয়ার মারকেটের বাড়ির সামনে কবি[illegible] পাঠের ব্যবস্থা করা হবে। কয়াৎ হল [illegible] সপ্তাহ দুয়েক পূর্বের ঘটনা। স্থানট[illegible] ঠিকমতই বাছাই করা হয়েছে। কবিতার [illegible]গে শেয়ার মারকেটের দালালির কি কোন সম্পর্ক আছে—প্রশ্ন করেন বহু উন্নাসিক জরমান কবিতার শত্রুরা। আর এই সংস্থা এমন এক তরুণ কবিকেই এই উৎসবের মধ্যমণি করে এনেছে, যাঁর বিরুদ্ধে স্প্রিংগার প্রকাশকের যত সংবাদপত্র আছে, তাদের চীৎকারের অন্ত নেই। এই কবি Peter Ruehmkorf (বয়স ৩৬)-কে, এ'রা চাপা ক্রোধে বলেন—"এ যেভাবে সুর ধরে অহেতুক কথা বলে তাতে ওকে লাল মার্কা রূমেকর্‌ফ বলা চলে।"

শেয়ারের মার্‌কেট প্লেসে, যেখানে একটা বিশাল মোটরের লরীতে "কবিতা ও জ্যাজ" সংগীতের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, সেখানে প্রথমেই হোমারের ওডেসী থেকে লাইন তুলে সেই শক্তিকে আহবান জানানো হচ্ছে, (যেমন প্রাচীন গ্রীসে প্রকাশ্য স্থানে কোন কবিতা পাঠ বা বর্ণনার পূর্বে কোন ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর অলৌকিক শক্তির আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নেওয়া হত)—"Andra moi ennepe musa polytropon hos mala polla,"

কাবারেটের ধাঁচের কবিতা পাঠ। সে কবিতার মধ্যে রয়েছে বিদ্রূপ, [illegible] আর ব্যঙ্গ, সমালোচনা, আর আক্রমণ, নেতাদের বিরুদ্ধে।—"হে পিতৃভূমি, বীর পুরুষদের [illegible],

সব বাঁধন ছিঁড়ে তোমাদের দেহের চর্বি বেরিয়ে আসছে”—জাতীয় ব্যঙ্গকবিতার সঙ্গে জ্যাজের কীর্তন, র‍্যুমকর্ফ যখন আবৃত্তি করে চলেছে, তখন তাঁর সঙ্গে উত্তর জরমান রেডিয়ো স্টেশনের জ্যাজ সঙ্গীতের দল সুরের মেজাজ লাগিয়ে দিচ্ছে। যেন হামবুর্গের মানুষ আবার এক নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক জীবনের আস্বাদন গ্রহণ করবার সুযোগ পেল। এই কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হামবুর্গ সরকারের সংস্কৃতি-সূচির মধ্যেই পড়ে। অবশ্য প্রথম দিকে এর নাম হওয়ার কথা ছিল “Beat und Jazz”। কিন্তু কিছুকাল পূর্বের ঘটনা—যখন ইংলণ্ডের বিটল্‌সরা হামবুর্গে এসে নাচে, তখন হামবুর্গের হাজার হাজার টীন-এইজারদের সঙ্গে পুলিসের যে লড়াই হয়ে যায়, তাতে পুলিসের তরফ থেকে ৮জন অতি গুরুতর-ভাবে আহত হয়। সেই “Beat” শব্দটি নামের মধ্যে থেকে যাওয়াতে হামবুর্গের সেনাটের কর্মকর্তাদের শরীরে রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম। প্রার্থনা নামঞ্জুর।

তবুও “Jazz” কথাটির জন্যে উদ্যোক্তা ট্রিন্‌কলারকে সেনাটের কাছ থেকে “হ্যাঁ” আদায় করবার জন্যে ৬ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছে। যদিও “হ্যাঁ” কথায় সায় দিলেও সরকার সেদিন সন্ধ্যায় একদল পুলিসকে অনুষ্ঠান-স্থলে পাঠিয়ে যথাযথ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করলেন—কি জানি, বার্লিনের রোলিং স্টোন আর হামবুর্গের বিট্‌ল্‌স্‌দের উত্তেজক সংগীতের প্ররোচনার মতই এই “Lyrik ও Jazz”-এর যৌথ মাদক দ্রব্যের উত্তেজনায় এই শ্রোতাদের হাতেও পুলিসের মার খাওয়া আর অনুষ্ঠানের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ভাঙা চলবে কিনা! কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল, উঠতি গুণ্ডাদের আগমন একেবারেই হয়নি। পুলিসের কর্তা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—“কবিতা হালুব স্টারকারদের কাছে টানতে পারেনি, তাই আজ গণ্ডগোলের সুযোগ নেই।” (হালব স্টারকাররা হচ্ছে জরমানীর টেডীবয়। এদের গায়ে কালো চামড়ার কোট, চুলে বিচিত্র কায়দা, বাহন খুদে মোটরবাইক, যার পেছনে একটি Sexy মেয়েকে তুলে নেওয়া চাই, সেই সঙ্গে একটি ট্রানজিসটার রেডিয়ো। জরমনীতে ক্রমশই এরা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওরা যে পথ ধরে চলবে, সে পথে ওদের মোটরবাইকের আওয়াজ, চিৎকার আর ট্রানজিসটার ঘোষণা করবে ওদের জয়যাত্রাকে।)

এদের ছাড়াও র‍্যুমকরফের কবিতা পাঠ (পুলিসের আতঙ্কগ্রস্ত গণনা থেকে) দুই হাজারের ওপর শ্রোতা সংগ্রহ করতে পেরেছিল। আর সেই অনুষ্ঠানের খরচ মোট ২৪০০ মার্ক। ট্রিন্‌কলার তবু মনে করেন—উদ্যোক্তারা হামবুর্গের মানুষের জীবনে এক নতুন সংস্কৃতির স্রোত বয়ে আনতে পেরেছে।

আর কবি র‍্যুমকরফ পারিশ্রমিক হিসাবে সেই সন্ধ্যায় কবিতা পাঠের জন্য পেলেন ২৫০ মার্ক (প্রায় ৫০০ টাকা) অনেকে বলাবলি করলেন, এই Honorar-এর অংকটা তাঁর কবিতা-বইয়ের কাটতির অনুপাতে একটু বেশীই পড়ে গেছে। অন্য দিকে কবির হিসেবমতে একটা কবিতা ঠিকমত তৈরি করতে গেলে শুরুতেই কমপক্ষে ৮০০ থেকে ১০০০ মার্ক, অর্থাৎ দু' হাজার টাকা “invest” করা প্রয়োজন। একটা দীর্ঘ ভাল কবিতা রচনা করতে গেলে মাসে কমপক্ষে ১৮০ ঘণ্টার প্রয়োজন। এবং প্রতি ঘণ্টা পরিশ্রমের জন্য কবি র‍্যুমকরফ দাবি জানাচ্ছেন, ঘণ্টায় ৫½ মার্ক, অর্থাৎ প্রায় ১০ টাকা।

হিসাবটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জরমানীতে যখন ইচ্ছে করলেই যখন-তখন কাজ পাওয়া যায়—অর্থাৎ হাতে কিছু করার নেই, একটা কিছু কাজ যোগাড় করে কয়েক ঘণ্টা কাজ করলেই যেখানে ৩০।৪০ মার্ক সংগ্রহ করা যায়, যে দেশে বিনে পয়সায় একটা কথা পর্যন্ত কেনা যায় না, যে দেশের মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘণ্টার মূল্য কমপক্ষে ৩½ মার্ক, সে দেশে একজন কবি বা লেখক তাঁর একটা লেখার জন্য ১০০০ মার্ক অনায়াসেই দাবি করতে পারেন। যেখানে “ম”কার-ন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দাবি আর গাড়ি থেকে আরম্ভ করে আপন অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তের মাপকাঠি যাচাই করা হয়

মার্কেটর মত্যো, সেখানে একজন কবি বা লেখক যখন এত বিরাট অঙ্কের টাকার লোভ সংবরণ করে একটা কবিতা বা প্রবন্ধ লেখেন, তখন তাঁকে করুণা না করে পারা যায় না। আমাদের দেশে হয়ত তার ঠিক উল্টো ছবি। অনেক আধুনিক কবির উদ্ভব বেকার জীবন থেকে। কিংবা স্কুল-কলেজ বা অফিসের শেষে কিছুই করার নেই, চাল নেই, ডাল নেই, আকাশে চাঁদের বাতিতে —মৃত্যুর কালি—আচ্ছা, কবিতা লেখো। পাশের বাড়ির মেয়েটি প্রতিদিন জানালায় এসে দাঁড়ায়—মনের কথা কে শুনবে?—কবিতা লেখো। এখানে স্কুল-কলেজের শেষে সময় থাকলে অনেকে কাজ নিয়ে টাকা রোজগার করতে বেরিয়ে পড়ে—গাড়ির পেট্রোল চাই, Weekend-এ নাচতে যাওয়া চাই— নয় তো দূরে দেশ বেড়াতে যাবার জন্য টাকা জমানো চাই। আর পাশের বাড়ির মেয়েটি জানালায় এসে দাঁড়ালে তো কবিতা না লিখে তার সঙ্গে 'ডেট' করে কোথাও নাচতে যাবে, মদ খাবে, মাতাল হবে, গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে। মেয়ের সঙ্গে বিছানায় যাবে। যে দেশে

ভোগ-বিলাস পথে ঘাটে ছড়িয়ে রয়েছে, সে দেশে কবিতা লেখা বা আত্মার শোধন-কার্য নিয়ে গবেষণা চালানো যেন এ দেশের বলড্যান্সের (নাচের) পার্টিতে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীকে নাচের জন্য তোয়াক্কের সুরে অনুরোধ না জানিয়ে সারা রাত্রি একা বসিয়ে রাখা—জরমানীর "হিবরট্ শাফটস্ হুন্ডার" (অর্থনৈতিক আশ্চর্য) এর মার্ককে অবহেলা করা। অবশ্যই যে-সব পেশাদারী লেখক ও মুদীর মধ্যে ব্যবসাগত কোন পার্থক্য নেই, তাঁদের কথা আলাদা।

ছামবুরগের সেই কবিতা পাঠের শেষে তার পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজক টিনকলার ও আরো তিনজন তরুণ কবির মধ্যে এবার অন্য আলোচনা শুরু হল। বহু তরুণ কবির মত এবার এই, তিন তরুণ কবি Heike Doutine, Uwe Herms ও Rolv Heuer-ও চাইলেন ভিয়েৎনামের ওপর কবিতা পাঠ করবার জন্য। টিনকলার বেঁকে বসলেন। যদি সেনাট বেঁকে বসে। তা ছাড়া স্পিংগার প্রকাশনীর চিৎকার ত আছেই। টিনকলার চাইলেন—কবিতা পাঠের পূর্বে প্রাথমিক পরীক্ষা। তিন কবির ব্যক্তিত্বে আঘাত পড়ল—এ সেনসারশিপ্ চলবে না। তাঁদের ধর্মঘটে শেষ পর্যন্ত টিনকলার মাথা নত করলেন। সংস্কৃতি সংস্থা স্থির করল—কবিতার কোন প্রকার পরীক্ষা করা হবে না। কেননা, কবিরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কবিতা পাঠের অন্তরালে কোন প্রকার রাজনৈতিক অন্দোলন চালানো হবে না।

কিন্তু এখানকার বহু পাঠক ও শ্রোতার মনে সংশয় রয়ে যাচ্ছে, যখনই তাঁদের কবি Herms-এর প্রেসিডেন্ট জনসন-এর ওপর কবিতার লাইন মনে পড়ে যায়, যার বিষয়-বস্তু—ভিয়েৎনামে প্রেসিডেন্ট জনসন ও আমেরিকার বর্বরতার সীমা যেখানে এসে পৌঁছেছে, তাতে তাঁকে, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জনসনকে আর কোন প্রকারেই মানুষ বলা চলে না। তবে এখনো একটা চিহ্ন রয়ে গেছে, যাতে তাঁকে মানুষ বলে চেনা যায়, —সেটা হল, ভিয়েৎনামের দুঃস্বপ্নে এখনো যে তাঁর রাত্রে কেবল বদ্ ঘুম হয় তার জন্য।

সেদিন এক বন্ধু মন্তব্য করে—আচ্ছা, ভিয়েৎনামের ওপর কবিতা লেখাটা কি একটা বিলাস হয়ে দেখা দিল এ-দেশে? আমি বলি—এর জন্য দায়ী তোমাদের টেলিভিশন! প্রায় প্রতি দিন কী বীভৎস সব দৃশ্য টেলিভিশনে দেখানো হয়। এতে তোমাদের দেশের বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ হয়ত সেই বীভৎস রস উপভোগ করে, যে বীভৎস রস উপভোগ করবার জন্য তোমরা ক্রাইম ফিল্ম কি অন্যান্য উত্তেজনামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাক। তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ অন্য পথ ধরে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ-মিছিলে যোগদান করেন, নয়ত ভিয়েৎনামের ওপর কবিতা লেখেন।

এঁদের হজম-ক্ষমতা আছে বলতে হবে। আমি যখনই প্রতি দিন সন্ধ্যায় দৈনন্দিন কার্যসূত্রে পৃথিবীর খবর দেখতে টেলিভিশন রুমে যাই, মনে মনে ঈশ্বরের নামে একবার প্রার্থনা জানিয়ে নিই—হে দয়াময় ভগবান, আর যাই দেখতে হোক, অন্ত যেন আর ভিয়েৎনামের ওপর নারকীয় দৃশ্যগুলি দেখতে না হয়। কেন জেনে-শুনে নিজেকে উত্তেজিত হতে দিই! আর উত্তেজিত হলেই তো সভ্য জগতে সভ্য মানুষের মনের গভীরে অসভ্য আদিম প্রকৃতিটা ছাড়া পেয়ে সহস্র কণ্ঠে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে শুরু করে দেবে। মনকে একবার শাসন করে নিই—যদি একান্তই উত্তেজিত হয়ে পড়ি, তা হলেও কোন প্রকারেই বেচারী প্রেসিডেন্ট জনসনকে আর সবার সাথে গলা মিলিয়ে গালাগালি দেওয়া চলবে না।

ডঃ আদেনাওয়ার আর প্রেসিডেন্ট দ্য গল থেকে আরম্ভ করে সারা পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ বলছে—তোমরা আমেরিকান সৈন্যরা যতদিন ভিয়েৎনামের মাটিতে যুদ্ধাস্ত্র শ্রেসভ্যতার রবট প্রয়োগ করে, দর্পভরে মানবতাকে পদদলিত করে শক্তির আস্ফালন দেখাবে, ততদিন ভিয়েৎনামের সমাধান নেই। যন্ত্রসভ্যতা যৌন রোগের বীভৎসতাকে হার মানাতে পারে—তার দৃষ্টান্ত ভিয়েৎনাম। এখানের রেডিয়োতে প্রতি দিনের খবর—উত্তর ভিয়েৎনামে কত বোমা বর্ষণ করা হল, আর কত ভিয়েতকং মারা হল। জাঁ লুক গদারের ছবি —Pierrot le Fou-তে আনা-কারিনার প্রশ্ন কানে বাজে—"কেবল একটা মৃত্যুর সংখ্যা বলেই খালাস। কিন্তু এরা কারা—সে কথা বলা হল না কেন? তাদের মধ্যে মা আর শিশুরাও ছিল কিনা, সপরিবারে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল কিনা, সন্ধ্যাবেলা খেতে বসেছিল কিনা, সে খবর নেই।" তার উত্তর দিচ্ছে B B C-র তোলা ছবি।

প্রায়ই বহু ছবির মত সেদিন B B C-র তোলা ভিয়েৎনামের ওপর ডকুমেন্টারী ফিল্মটা আবার টেলিভিশনে বিস্তারিত-ভাবে সেখানকার নারকীয় ঘটনাগুলিকে দেখানো হল। তার বীভৎস দৃশ্যগুলির বর্ণনায় যাবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে সেদিনের সে ছবিটির দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে কতগুলি প্রশ্ন মনে দেখা না দিয়ে পারল না।

ভিয়েৎনামের ছোট্ট গ্রামগুলি থেকে দলে দলে কংকালসার বৃদ্ধ, নারী ও র

শিশুর দল বেরিয়ে আসছে, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, পেছনে তাদের প্রিয় ভাঙা কুঁড়েঘরগুলি বোমার আগুনে জ্বলছে, মাথার ওপর আমেরিকান হেলিকপটার শয়ে শয়ে শকুনের মত উড়ছে মৃতদেহের খোঁজে—সামনে দাঁড়িয়ে এই অসহায় মানুষগুলিকে ধমকাচ্ছে রাইফেলধারী আমেরিকান সৈন্যরা। এরা এই বিদেশীদের চেনে না। ভাষাও বোঝে না। একটি বুড়ী, হাতে এক ফালি কলা—কলাগুলি দেখিয়ে মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত চোখে সৈন্যটিকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করল। কে কার কথা, আর মনের ভাষা বোঝে। সৈন্যদের মুখে ঘৃণার ছাপ, ধমকাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে হয়, কে তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে, সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে এই অর্ধমৃত মানুষগুলিকে ধমকাতে, ভিয়েতকং শিকার করার নামে এদের ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি-গুলিকে পুড়িয়ে দেবার অধিকার কে তোমাদের দিয়েছে? কি করে এই দৃশ্য ভোলা যায়, সেই চাষী পরিবারটি তার যা কিছু সামান্য সম্বল, সব গরুর গাড়িতে তুলে গ্রাম ছেড়ে চলেছে, চারিদিকের গুলি-গোলা আর হেলিকপটারের আওয়াজে আতঙ্কিত গরুগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, গাড়িতে মানুষ আর জিনিসপত্তর যা ছিল, সব চারিদিকে ছিটকে পড়ছে—এক দিকে যন্ত্রদানবের ধ্বংসকার্য, অন্য দিকে গ্রামীণ জীবনের কপোতভয়—এইসব বীভৎস দৃশ্য দেখে এখানকার দর্শকরা হেসে উঠছে। যেন কী মজার দৃশ্য! লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

বলতে হয়—তোমরা পশ্চিমী সভ্য জগতের মানুষ, তোমাদের ভোগ-বিলাস-ঐশ্বর্যের আর সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক জীবনের দৃষ্টি দিয়ে কোন দিন এশিয়ার মানুষদের চিনতে পারবে না। তোমরা প্রাসাদে মানুষ হয়েছো, এই বলে জঙ্গলের (?) মানুষদের তোমরা চেনো না—কিন্তু তোমাদের এই বর্বরতা নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। ওরা যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবেই ওদের থাকতে দাও। ওদের ভাগ্য আর স্বাধীনতা ওরা নিজেরাই একদিন চিনে নেবে। B B C-র মন্তব্যই তুলে দেওয়া যাক—এই গ্রামের মানুষ-গুলো ভিয়েতকং-এর সংগে সাত বছর বাস করেছে, আর আমেরিকান সৈন্যরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সারা গ্রামটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা, ভিয়েতকং শিকার করা। এক স্থানে ছবিটা দেখাচ্ছে—দুটি ভিয়েতকং-এর (?) মৃতদেহ একটার ওপর আর-একটা পড়ে আছে, একটি আমেরিকান সৈন্য মৃতদেহগুলির ওপর এক পা রেখে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে—বিজয়ী শিকারীর বেশে—আর-একটি সৈন্য তার ফটো তুলছে। এই সৈন্যটিই হয়ত দেশে ফিরে গিয়ে ওর শিকার-কাহিনী ফটোগুলির মাধ্যমে আর দশজনের কাছে গর্বের সাথে বর্ণনা করবে। এরা একদিন যেত আফ্রিকায় বাঘ, সিংহ শিকার করতে, আর আজ ভিয়েৎনামে ভিয়েতকং শিকার করতে। কিন্তু কেউ ঠিকমত বলতে পারে না—কে যে ভিয়েতকং আর কে যে সাধারণ মানুষ। ঠিক এমনি ছবি তুলত, জরমান সৈন্যরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদীদের মেরে ফেলে তাঁদের নিয়ে ছবি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। ভাবতে এতটুকুও অবাক লাগে না, আজ যারা আমেরিকান শান্তি সেনা নামে এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে অনগ্রসর দেশের মানুষের (?) মানুষ করবার উদ্ধারকার্যে ব্যস্ত, তারাই কাল ডাক পেলে—"বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড"রূপে দেখা দিতে যেমন সময় লাগেনি—তেমনি স্বাধীনতার নামে 'শৃঙ্খলা' আনার নামে কী ভারতবর্ষের, কী আফ্রিকার নিরীহ চাষা-ভূষা মানুষ-গুলোকে ভিয়েতকং শিকারের মত খুন করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। কেননা, যে ঘৃণা আর অবজ্ঞাভরে একটা জাতি আর একটা জাতিকে সভ্য করবার চেষ্টা করে, সেখানেই রয়েছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর ভিয়েৎনামের নরহত্যা যজ্ঞের সম্ভাবনাময় আয়োজন। অথচ এই সাদা চামড়ার সভ্য মানুষরা কালো চামড়ার মানুষদের সভ্য করার নামে পৃথিবীর দেশে দেশে কত সভ্যতাকেই না ধ্বংস করেছে।

এখানে ভিয়েৎনাম একটা উপলক্ষ্য মাত্র। বিন্দুতে সিন্ধু দেখার মত একটা দৃষ্টান্ত—ভারতবর্ষের ৪৫০ মিলিয়ন মানুষ যেখানে হাত দিয়ে খাবার খায়, যা ভারতীয় জীবনধারার অঙ্গ সেটাও যখন এ দেশের বহু মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে, মুখের ওপর বলে বসে—আদিমতা, তখন রোগটা ধরা পড়তে বেশী অসুবিধা হয় না। আমি এ-দেশের বন্ধুদের সবিনয়ে বলি—ভারতবর্ষকে আর এশিয়ার মানুষকে—তাঁদের চালচলন, সংস্কৃতি, শিক্ষা আর ট্রাডিশনকে শ্রদ্ধা করতে শেখো, তোমাদের চাইতে ঠিক ভিন্নমুখী তাঁদের জীবন ও দর্শনকে জানবার চেষ্টা করো, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিকে তোমাদের ওপর নির্ভর করিয়ে না রেখে নিজের পায়ে যাতে দাঁড়াতে পারে, সেভাবে অর্থনৈতিক আর কারিগরী সাহায্যদান করো, সবচাইতে বড় কথা—মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতে শেখো—দেখবে, কম্যুনিজম-এর সমস্যা নেই, ভিয়েৎনামে যুদ্ধ নেই। তোমাদের সমগ্র জরমানীর ভাগ্য যখন সমগ্র জরমান জাতি নির্ধারণ করতে চাইছে, তখন সমগ্র ভিয়েৎনামই বা কেন, ভিয়েৎনামীদের দ্বারা হবে না। তা হলে সাদার আর কালোর দাবিটা বুঝি এক হয়ে যায়। আর আমরা, এশিয়াবাসীরা, তোমাদের যে কত বড় বোকা—সেই ঘৃণাটাও শেষ হয়ে যায়!

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

ষোলো

নীচে কিছু সময় বসে থেকে সুরেশ্বর উঠল। তার মুখে না প্রসন্নতা, না অসন্তোষ বা বিরক্তি। স্মিত সরল হাসিও ছিল না; কেমন এক গাম্ভীর্য ঘন হয়ে উঠেছিল মুখে। এই গাম্ভীর্য কোনো মানুষের ক্রোধ বা বিতৃষ্ণাও প্রকাশ করে না: মনে হয় অন্যমনস্কতাবশত এবং বেদনাজাত এক মালিন্য সৃষ্টি হয়েছে।

হৈমন্তীর ঘর থেকে শান্ত ভাবেই বিদায় নিয়ে সুরেশ্বর বাইরে চলে এল।

বাইরে শীত বেড়েছে। উত্তরের বাতাস এখনও তেমন করে বইতে শুরু করে নি, তবু আজ বাতাসে ধার ছিল, থেমে থেমে উত্তরের দমকা আসছিল। অগ্রহায়ণের শেষ, চারপাশে হিমের ধূসরতা জমছে, আকাশের তারাগুলি তেমন করে যেন জ্বলছে না। সুরেশ্বর ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল, যেন শীতের মধ্যে একা একা পায়চারি করছে।

হৈমন্তীর আজকের ব্যবহারে সে দুঃখিত, হয়ত ক্ষুব্ধ। তবু সুরেশ্বর হৈমন্তীর স্বপক্ষে চিন্তা করছিল। অপরের প্রতি বিরক্ত হওয়ার মধ্যে কৃতিত্ব বা কষ্ট কিছুই নেই—যেন এই ধরনের মনোভাবের বশবর্তী হয়ে সে হৈমন্তীর প্রতি সহৃদয় হচ্ছিল এবং, ভেবে দেখার চেষ্টা করছিল হৈমন্তী এতটা রূঢ় হল কেন।

হেম যে অসংগত কিছু বলেছে তা হয়ত নয়, সুরেশ্বর ভাবছিল, হাসপাতাল আর মেঠাইমণ্ডার দোকান কখনও এক হতে পারে না। কলকাতার হাসপাতালে হেমের যা শিক্ষা তাতে সে নিয়মের বাইরে যেতে চায় না, হয়ত পারে না। হাসপাতালের বাঁধা নিয়ম সে রাখতে চায়। এতে দোষের কিছু নেই, বা তার পক্ষে অন্যায় কিছু হয় নি। তাছাড়া, সুরেশ্বর নিজেও মনে করে, হেমের নিজের শরীর স্বাস্থ্যের ওপর লক্ষ রাখা উচিত, অনিয়ম ও অত্যধিক পরিশ্রম তার পক্ষে ক্ষতিকর।

কিন্তু, সুরেশ্বর ভাবল, হেম সহৃদয়তার সঙ্গে বিষয়টা বিবেচনা করতে কেন রাজী হল না? এই অনিচ্ছুক আচরণ তার কেন? যদি সে অত্যধিক পরিশ্রমের কথা তোলে তবে তাব বিবেচনা করা উচিত ছিল, এখানে তা নিত্য হয় না, প্রত্যহ একরাশ রুগী এখানে চোখ দেখাতে আসছে না। সকালের দিকে দু চারজন, বেলায় আরও কয়েকজন। মোটামুটি হিসেব নিলে হয়ত দেখা যাবে, সারাদিনে সাধারণভাবে আট দশজনের বেশী রুগী আসে না। হাটের দিন কিছু বাড়ে। তেমনি আবার মাঝে মাঝে সারাদিনে একটি দুটি রুগীর বেশীও যে হয় না।

হেমের ঐ-সব কথা ভাবা উচিত ছিল; ভাবতে পারত, কোনো কোনোদিন যেমন তার অত্যধিক পরিশ্রম হয়, কোনো কোনোদিন আবার তেমন তার হাতে প্রচুর সময় থাকে, বিশ্রাম পায়। তাছাড়া একথা ঠিকই, এটা কোনো শহর-গঞ্জ নয়, এখানে চোখ দেখাতে আসব বললেই আসা যায় না। আসা যাওয়ার এই অসুবিধে তার বিবেচনা করা উচিত ছিল। ইচ্ছে থাকলেও অনেকে যে উপায়হীন হয়ে দেরীতে আসে হেম কি তা বোঝে না? না কি তা বিবেচনা করা তার দায় নয়?

সুরেশ্বর মনে করে না, বিষয়টা বা সমস্যাটা গুরুত্বের কিছু ছিল। সামান্য ব্যাপার, হয়ত তুচ্ছ ব্যাপার। হেম হাসপাতালের নিয়ম রাখতে চাইছে, রাখ; কিন্তু তার বাঁধাধরা সময়ের সামান্য এদিক-ওদিক করেই তা করা যেত। সুরেশ্বর ভেবেছিল, হেমকে বলবে : তুমি বরং সকালের দিকটা, আরও একটু আগে হাসপাতাল থেকে চলে এস, স্নান খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম সেরে দুপুরে আবার একবার যেয়ো, বিকেল পর্যন্ত থেকো।'

সুরেশ্বরের ধারণা, মোটামুটি এই নিয়মটাতে কারও অসুবিধে হবার কারণ নেই। যেসব রুগীর আসতে বেশ বেলা হয়ে যায়, তারা—, আর যারা দুপুরের দিকে আসে তাদের হেম দুপুর-বিকেলে দেখতে পারে। হাটের দিন ছুটকো এক আধজন অসময়ে এসে পড়লেও হেম তাদের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

শীতের মধ্যে অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ্বর নিজের ঘরের কাছে চলে এল।

হেম বড় অবুঝ হয়ে উঠেছে। সে তার কাজ এবং অধিকার নিয়ে আজ যা বলল তাতে সুরেশ্বর ক্ষুব্ধ হয়েছে। সুরেশ্বর বাস্তবিকই নিজের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যায় নি। হাসপাতালের ব্যাপারে নিজের মতামত চাপানোর কথাও সে ভাবে নি। তবু হেম ধরে নিল, সুরেশ্বর তার অধিকার দেখাতে এসেছে!...আমার আশ্রম, আমার হাসপাতাল, আমার কথা মতন কাজ হবে—ঠিক এই ধরনের মনোভাব কি সুরেশ্বর কোথাও প্রকাশ করেছে? জানত করে নি, অজানত যদি করে থাকে সে জানে না। হেমকে সুরেশ্বর ডেকে পর্যন্ত পাঠায় নি, নিজে এসেছিল, কোনো কৈফিয়ত চায় নি, রূঢ় কথা বলে নি। তবু হেম তাকে অন্যরকম ভাবল।

কিন্তু..., সুরেশ্বর এখন কোথাও যেন অদ্ভুত এক পীড়ন বোধ করল। অনুভব করল, হৈমন্তীর শেষ কথাটা তার অহংকারে লেগেছে। এর আগে কখনো কেউ সুরেশ্বরকে এভাবে বলে নি, যা বোঝাবার অবকাশ দেয় নি যে, সুরেশ্বর এই আশ্রমকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে। হেম ঘুরিয়ে সে-কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বলতে চেয়েছে, তার অধিকারের সীমা সুরেশ্বর লঙ্ঘন করতে গিয়েছিল।
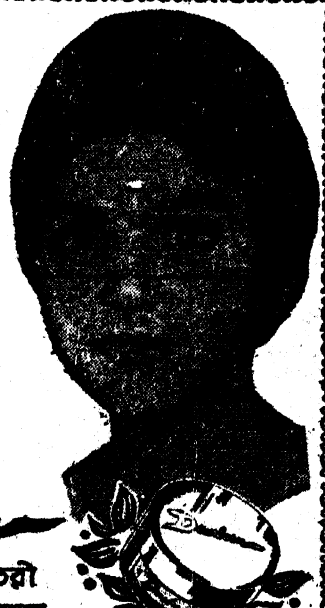
আশ্চর্য! আজ চার বছর তো সুরেশ্বরের একথা মনে হয় নি, আশ্রমের ওপর সে কর্তৃত্ব করার আনন্দ পেতে চায়! বা এমনও তার মনে হয় নি, এই আশ্রমের সঙ্গে তার অদ্ভুত এক অহংকার জড়িয়ে আছে, এবং নিজের অধিকার সে যত্রতত্র প্রয়োগ করার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে। এই আশ্রম আমার, আমি এর মালিক, আমায় তোমাদের মান্য করা উচিত—এ-ধরনের নোংরা, বিশ্রী চিন্তা ও আত্মসন্তুষ্টির ভাব সুরেশ্বরের কোনোদিন কি হয়েছে!

মাথা নাড়ল সুরেশ্বর, না তার মনে এমন কোনো অহং-বোধ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে কোথায় যেন কাতর হল এবং ভাবল, যদি এই বোধ আমার না থাকে তবে হেমের কথায় বিচলিত হলাম কেন? কেন আমার তখন মনে হয়েছিল, কী স্পর্ধা হেমের, কী স্পর্ধা! যদিও আমি তখন স্তম্ভিত নির্বাক ছিলাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে কে যেন হঠাৎ বিশ্রীভাবে আঁচড় বসিয়ে দিয়েছিল, জ্বালা করছিল; কেমন এক তপ্ত রোষ আমার চোখে ও মুখে এসে পড়েছিল। আমি সংযত থাকার চেষ্টা করেছি, পারত পারি নি, হেম আমার চোখ মুখের ভাব দেখতে পেয়েছে।

কেন এমন হয়, কেন? সুরেশ্বর যেন গ্লানি অনুভব করছিল। মাথা মুখ নীচু করে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দা উঠল।

নিজের সমর্থনে তার যুক্তি নেই এমন নয়। হেমের সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে অগ্রাহ্যের ভাব ছিল, নির্দয়তা ছিল; অবিবেচনা ও অন্যায়ের জন্যে হেমের ওপর তার বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। সুরেশ্বর এই ধরনের রূঢ়তা প্রত্যাশা করে নি। তবু, সুরেশ্বরের মনে হল—সে হেমের কাছে তার কর্তৃত্ব প্রকাশ করে ফেলেছিল। সুরেশ্বর বলেছিল : 'হাসপাতালের কথা আমায় জানাবে না...?' বাকিটা বলে নি, কিন্তু বোঝাই যায় সুরেশ্বর বলতে চেয়েছিল, আশ্রমের কোথায় কি হয়, কি হচ্ছে, কি হবে—সবই তাকে জানানো দরকার; তাকে না জানিয়ে তার মতামত না নিয়ে কিছু হতে পারে না। হেম সুরেশ্বরের এই প্রভুত্ব অথবা কর্তৃত্বের রূপটি ধরতে পেরেছে...পেরেছে বলেই সমান উদ্ধত হয়ে তার অধিকারের কথা তুলেছে।

ঘরে এসে বসল সুরেশ্বর। লণ্ঠনের আলো তেমন উজ্জ্বল নয়। ঘর প্রায় আবছা

অন্ধকার হয়ে আছে, কনকন করছে ঠান্ডা, ভরত্ত একটা বই অন্য জানলা বন্ধ করে নি ঘরের, জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

কেমন যেন অপরাধীর মতন বসে থাকল সুরেশ্বর; তার গ্লানি ও অনুশোচনা হচ্ছিল। এখন বেশ স্পষ্টই সে বুঝতে পারছিল, হেমের কাছে যতই সে বিনীত নম্র সরল হয়ে উপস্থিত হয়ে থাকুক তার মধ্যে কোথাও এই বিশ্রী অহঙ্কার ছিল। আশ্রমের ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করা তার সহ্য হয় নি, ভাল লাগে নি। সে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সুরেশ্বর তার বিচলিত ভাব দমন করল। তার মনে হল, হেম যেমন খানিকটা বাড়াবাড়ি করেছে, সেও সেই রকম খানিকটা বাড়াবাড়ি করছে। এতটা কাতর হবার বা গ্লানি বোধ করার কিছু নেই। আশ্রমের ভালমন্দ, রুগীদের সুবিধে অসুবিধে দেখা তার কর্তব্য। হেম যদি অন্যায় করে, যদি তার কাজেকর্মে রুগীদের বা হাসপাতালের ক্ষতি হয় সুরেশ্বরের সে-বিষয়ে কথা বলার অধিকার আছে। যুগলবাবু কি শিবনন্দনজীও একথা বলতে পারতেন। যুগলবাবুও রুগী তাড়ানোর ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। শিবনন্দজী —যাঁর সঙ্গে হাসপাতালের কোনো সম্পর্ক নেই, তিনিও কথাটা শুনে বলেছিলেন, কাজটা ভাল হয় নি।

মনের ক্ষুব্ধ ও কাতর ভাবটা কমে এলেও সুরেশ্বর কোথাও যেন একটা কাঁটা ফুটে আছে অনুভব করছিল। এই কাঁটা কি, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। হতে পারে হৈমন্তীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত, হতে পারে নিজের কোনো দুর্বলতা আজ তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অন্য কিছুও হতে পারে।

জীবনের যে সমস্ত মোটা তার সুরেশ্বর মোটামুটি একটা সঙ্গতির মধ্যে বেঁধে ফেলেছিল বা সে-চেষ্টা করে আসছিল তার মধ্যে কোনো একটা তার সুরেশ্বরের বাঁধা-ঘাট ছেড়ে হঠাৎ যেন ছিঁড়ে লাফিয়ে উঠল আজ। সেটা কি? অহঙ্কার?

অহঙ্কার সুরেশ্বরের মধ্যে বরাবরই ছিল, বাল্যকাল থেকেই। সম্ভবত মার চরিত্র থেকে এই অহঙ্কার-বোধ সে পেয়েছিল। বাবা যে ধরনের অহঙ্কারী ছিলেন তা সাধারণ অহঙ্কার, বিত্ত ও বংশমর্যাদার অহঙ্কার; কিন্তু মার অহঙ্কার ছিল অন্য রকম। রূপের জন্যে মার কোনো অহঙ্কার ছিল না, কেননা অসামান্য রূপ সত্ত্বেও মা সেই রূপের মধ্যে বাবাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। হয়ত সেজন্যে রূপের ব্যাপারে মা হতাশ হয়ে পড়েছিল। মার অহঙ্কার ছিল অন্য জায়গায়, এবং সেটা অদ্ভুত। মা হঠাৎ হঠাৎ এমন কিছু করে বসত বা সচরাচর লোকে করে না। একথা ঠিক, মার স্বভাব খেয়ালী ছিল এবং মা ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকত না সব সময়; তবু মা সংসারের মধ্যে এমন কোনো কোনো আশ্চর্য কান্ড করে বসত যা কল্পনা করা যায় না। নিজের জীবনেও মা এরকম করেছে। বিনুমাসি যখন খুব একটা খারাপ অসুখে পড়ল, মা তাকে নিজের ঘরে এনে তুলল, নিজের বিছানায়। মাসখানেক ধরে বিনুমাসির রোগের সঙ্গে মার যেন দু বেলা লড়াই চলল। বিনুমাসি সেরে উঠলে মা নিজের ভারী ভারী দুটো গহনা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এবার ধর্মকর্ম করগে যা, পরের বাড়িতে অনেক দিন কাটালি। তুই যা—আমি তোকে মাসে মাসে বিশ পঁচিশটা টাকা দেব। কারো বাড়িতে ঝিগিরি করবি না, হারামজাদী; আমার দিব্যি রইল। যা।'...বিনুমাসি যাবে না, মা তাকে জোর করে খাওয়ালো। লোক বলেছিল : একটা ঝিয়ের জন্যে এত আদিখ্যেতা দেখানো কেন?...বিনুমাসি যদিও ঠিক ঝি ছিল না, তবু মার নিজের দাসী তো বটেই। বিনুমাসিকে পুরী পাঠিয়ে মা প্রায়ই বলত : 'বিনু পোড়ারমুখী যতদিন বাঁচবে ততদিন আমার কথা ভাববে, বুঝলি'। এই রকম অনেক করেছে মা, কাউকে মেয়ের বিয়েতে নিজের গয়না দিয়ে দিয়েছে, কাউকে আশ্রয় দিয়েছে বারবাড়িতে বরাবরের মতন, কাউকে আবার সামান্য কারণে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলতে কি, নিজের জীবনে মা এই অদ্ভুত অহঙ্কারের জন্যে স্বামীকে পর্যন্ত অন্য রমণীর সঙ্গে বসবাস করতে ছেড়ে দিয়েছে।...এই অহঙ্কারের মধ্যে মার এক আশ্চর্য আত্মতৃপ্তি ছিল। মা ভাবত, এইসব করে মার মর্যাদা বাড়বে, লোকে মার গুণগান গাইবে। এই রকম গুণগান কিন্তু বিনুমাসি ছাড়া আর কেউ গায় নি। বিনুমাসি এখনও বেঁচে আছে, বুড়ো হয়ে গেছে, পুরীতেই

থাকে, সুরেশ্বরকে অন্তত বছরে দু একবার চিঠিও লেখে। বিজয়ার পর বিনুমাসির চিঠি আসে : বাবা সুরেশ, আমরা বিজয়া-দশমীর আশীর্বাদ নেবে...।...বিনুমাসি এখানে আসতে চায়, সুরেশ্বর আনে না। এতকাল যার পুরীতে কাটল, তাকে এখানে এনে কষ্ট দেওয়া।

আর এই অহঙ্কারের মূল্য বাবাও দেন নি। এমন কি তিনি কোনোদিন অনুভবও করেন নি, তাঁর অপ্রকৃতিস্থ স্ত্রী তাঁকে ভালোবাসনা নিবৃত্তির জন্যে যে অফুরন্ত স্বাধীনতা দিয়েছিল তার জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল। বাবা কখনও মার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন না। শুধু মা মারা যাবার পর বাবা একদিন মার ঘরে বসে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

এই অহঙ্কার-বোধ সুরেশ্বরকেও বাল্য-কাল থেকে অধিকার করে বসেছিল। চাপা বেদনার মতন চাপা এই অহঙ্কার তার ছিল। পরে বয়েস হলে সুরেশ্বরের মনে হয়েছে, এই অহঙ্কার তার জীবনেও আত্মতৃপ্তির কারণ, এবং এই বোধই তার অভিমান। বাবার উপপত্নী ও তার সন্তানকে যখন সুরেশ্বর সম্পত্তির অংশ হিসেবে অর্থাদি দেয় তখনও সুরেশ্বর এই অহঙ্কার ও অভিমান বোধ করেছিল। সে যে দিতে পারে, দিতে তার কষ্ট নেই—এই কথাটা যেন সে বোঝাতে চেয়েছিল। যেমন মা বাবাকে অন্য রমণীর হাতে তুলে দিয়ে নিজের অহঙ্কারে আত্মপরিতৃপ্তি লাভ করেছিল, সেই রকম সুরেশ্বর নিজের সংগত দাবির খানিকটা অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে অভিমানকে রক্ষা করেছিল ও আত্মতুষ্টি লাভ করেছিল।

হৈমন্তীর অসুস্থতার সময়ও কি সুরেশ্বর যা করেছিল তা অহঙ্কারবশে?

সুরেশ্বর আপাতত যে কোনো কারণেই হোক কথাটা আর ভাবতে চাইছিল না। সম্ভবত বিষয়টা আরও জটিল এবং জটিল বলেই নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না, ভাবাও উচিত না। অনেক সময় কর্তব্য পালন করে মানুষ আত্মতৃপ্তি পায়, সাহায্য করেও সুখ বা আনন্দ পায়। সেভাবে দেখলে , সেই অদ্ভুত যুক্তিই মানতে হয়, মানুষ এক ধরনের সুখান্বেষী যন্ত্র বই কিছু না, তার প্রত্যেকটি কাজই যান্ত্রিক। ঘড়ির কাঁটার মতন সে শুধু ঘুরতে পারে, দম যতক্ষণ আছে, যতক্ষণ কলকব্জা না বিগড়োচ্ছে। আর এই কলকব্জাও বাঁধা ধরা, মাপামাপি করে বসানো। এই ধরনের যুক্তিতে সুরেশ্বরের কোনো আস্থা কোনো কালেই নেই। শীতার্ত, গরীব, নিরাশ্রয় ভিক্ষুককে আশ্রয় দিলে, বা তাকে একটা টাকা সাহায্য করলে আত্মতৃপ্তি ঘটে, আর আত্মতৃপ্তি ঘটে বলেই আমার দয়া-বোধ জাগে এমন নির্মম যুক্তি স্বীকার করা যায় না। সেভাবে বিচার করলে মানুষের কিছু থাকে না, সবই একটা আত্মতৃপ্তির হেতু হয়ে দাঁড়ায় : দয়া, ধর্ম, প্রেম, করুণা, মমতা—কি বা নয়।...হেমকে বা হেমদের পরিবারকে সাহায্য করার পিছনে সুরেশ্বরের কিছু গোপন ক্রয়-বিক্রয় ছিল—এমন তার মনে হয় না। তার মনে হয়েছিল সাহায্য করাটা তার কর্তব্য; তার মনে হয়েছিল, হেমকে সে ভা[illegible]সে, তার মনে হয়েছিল—তার কাছে [illegible]হেমের জীবনের মূল্য আছে। এবং এ[illegible] ঠিক, সাহায্য করে, ভালেবেসে, হেমের জীবনের জন্যে মূল্য আরোপ করে সে সুখ পেয়েছিল। যদি কেউ মনে করে, সুরেশ্বরের এ-সবই অহঙ্কার-বোধ থেকে এসেছে তবে হৈমন্তীর আজকের কথাটা সুরেশ্বর এখন আর খুঁটিয়ে না ভেবে হৈমন্তীর আজকের ব্যবহার থেকে যা বোঝা গেছে তার কথা ভাবতে লাগল।

হেম তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, আশ্রমের প্রতিও না। এই অসন্তোষ এবং বিরক্তিবশে সে বিরূপ হয়ে উঠেছে। সে রুষ্ট, অপ্রসন্ন। আজকাল সুরেশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন একটা রেষারেষির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যেন। অন্তত আজকের আচরণ থেকে মনে হয়, হেম যা করেছে তা সুরেশ্বরকে অবজ্ঞা করার জন্যে, তাকে আহত করার জন্যে। এই রেষারেষির কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু হেম ক্রমশই কেমন তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছে, এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে সে সুরেশ্বর ও এই আশ্রমকে এড়িয়ে থেকে তার অবজ্ঞা বোঝাতে চাইছে।

হেম কেন অকারণে এই অশান্তি সৃষ্টি করছে সুরেশ্বর বুঝতে পারল না। ভাল না লাগলে সে চলে যেতে পারে, জোর করে তাকে কেউ ধরে রাখবে না।

(ক্রমশ)

একটি অতি মর্মান্তিক কাহিনীর সাক্ষী এই ছবিটি। এটি আমার গোচরে এলেই দেহে রোমহর্ষ অনুভব করি। শিউরে উঠি যেন। অতীতের স্মৃতি বিজড়িত বহু ছবির ভিতর এই ছবিটি যেন একটি কলংক। তবে ছবিকে এ অপবাদ দেওয়াটা ঠিক নয় বোধ করি, ওটা প্রাপ্য ছবিগত কাহিনীর। যে-কাহিনীর রচয়িতা সুন্দরবন।

দোষের হবে না, যদি কেউ 'সুন্দরবন' নাম শুনেই কল্পনায় রচিত করে থাকে এক নয়নাভিরাম বন-সৌন্দর্যের রূপ। তার কল্পনায় বাধা পাবে না স্নিগ্ধ চাঁদের আলো নদীর বুকে ডিঙ্গির তলায় থান থান হয়ে যেতে। উপরন্তু যদি কেউ সুন্দরবনের মধু-র আস্বাদন লাভ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই সে এই বনানীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিহ্বলতায় বলবে—তাহা, কী সুমধুর সেই বন। সুন্দরবন।

কী করে জানি না, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতই এই ভয়াবহ অরণ্য এলাকার নাম হয়েছিল সুন্দরবন। এ-এলাকার বহু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করেও মোটামুটি বলা যায়—নৌকোয় ভ্রমণকালে ডিঙ্গির তলায় কুমীর চলে সাব্‌মেরিনের মত, তার ডাঙ্গায় বনের আড়ালে আড়ালে চলে নর-খাদক রয়্যাল-বেঙ্গাল। জল স্পর্শ করলেই চুম্বকের মত দেহটাকে টেনে নিয়ে যাবে সাব্‌মেরিন, আর স্থলে পদ স্পর্শ মাত্রেই মিলবে রয়্যাল-বেংগলের আলিঙ্গন। এসব বিপদ সর্বজনবিদিত, তবুও দেখা যায় প্রতি বছরই বহু প্রাণ বেঘোরে হারায়। পেটের দায়ে যাদের মধু-সংগ্রহ কিংবা মাছ ধরার কাজে নামতে হয়, তারা বহু সতর্কতা অবলম্বন করেও অনেক সময় রেহাই পায় না এইসব বিপদের হাত থেকে।

তেমনি সতর্কতায় একজন জেলে ডাঙ্গায় পা ছুঁইয়েছিল মাত্র, আর তখুনি কোথা থেকে এক বাঘ এসে লাফিয়ে পড়ল তার উপরে। ডিঙ্গি থেকে সঙ্গীরা সবাই বৈঠা-লাঠিসোটা নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে এসেও কোন সুবিধা করতে পারল না। ওদের চিৎকার-হল্লার ভিতর সঙ্গীটি ব্যাঘ্রকবলমুক্ত হতে আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হল সব। একটি আর্তনাদে জানিয়ে দিল তার পরিণতি। ঘাড় মট্‌কে বাঘ নিয়ে গেল তাকে টেনে-হিঁচড়ে বনের ভিতর।

যেদিন এই ব্যাপারটি ঘটেছিল সেদিন আমরা একটি স্টীম-লঞ্চে যাচ্ছিলাম সেই নদীপথে। বেলা দ্বিপ্রহর তখন। আমাদের নজরে এল জেলেদের বহু ডিঙ্গি একত্রিত করা। বলাবলি করে স্থির করলাম কিছু মাছের সন্ধান করা যাক। আমাদের লঞ্চ দাঁড় করানো মাত্রেই দেখি একটি ডিঙ্গি ছুটে আসছে আমাদের দিকে। লঞ্চের কাছে এলে পর একটি জেলে কাতরকণ্ঠে জানাল—হুজুর আমাদের একজনকে বাঘে নিয়ে গেছে।

—বাঘে নিয়ে গেছে? কখন?

—তা হুজুর চার-পাঁচ ঘণ্টা হবে।

—কি করে নিল? তোমরা ছিলে কোথায়?

—আজ্ঞে আমরা এই ডিঙ্গিতেই ছিলাম। ডিঙ্গিটা খালে বাঁধা ছিল জোয়ারের জলের অপেক্ষায়। তা জল আসতেই লোকটা ডাঙ্গায় নেমেছিল দাঁড়টা খুলতে। আর হুজুর একটা বাঘ এসে অমনি ওর উপর লাফিয়ে পড়ল। আমরা কিছু করতে পারলাম না, ওকে টেনে নিয়ে গেছে জঙ্গলের ভিতরে।

আমাদের লঞ্চে যাঁরা এ-কাহিনী শুন-ছিলেন, তাঁদের ভিতর বোধ করি বন-বিভাগের বড়কর্তা ছিলেন। তিনিই জেলেদের প্রশ্ন করলেন—তা তোমরা এখন কি করতে চাও?

—আমরা হুজুর আর কিছুই করতে পারি না। আপনারা দয়া করে যদি লাসটা আনবার ব্যবস্থা করে দেন তো—।

আমার মনে হল কী সাংঘাতিক কথা! জংগলের ভিতরে গিয়ে বাঘের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে আসা? ওটা যে রয়্যাল-বেঙ্গলের সান্ধ্য ভোজের আহার!

বন বিভাগের বড়কর্তা ইতিমধ্যে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আচ্ছা দাঁড়াও। বলেই ভদ্রলোক ভিতরে এসে তাঁর রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এলেন। সঙ্গে আরও একজন বন্দুকধারীকে নিয়ে তাঁরা নৌকোয় রওয়ানা হলেন ডাঙ্গার দিকে। আমরা বুঝলাম ভদ্রলোকের এসব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

কিছু সময় কেটে গেল। আমরা উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে আছি সেই বন আর ডিঙ্গির

দিকে। কিছুই কল্পনা করতে পারছি না তখন, এক সময় ডিঙ্গি ফিরে এল, দেখি তার ভিতর পড়ে আছে সেই লোকটির দেহ। ক্ষত বিক্ষত একটি লাস্। ঘাড় মটকে বুক চিরে রক্ত শোষণ করার চিহ্ন তার দেহে অতি স্পষ্ট। জেলেদের দেখে মনে হল ওরা যেন সন্তুষ্ট।

*

এ ঘটনা বছর পনেরো অতীতের। প্রত্যক্ষভাবে আমি সেদিন যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম, তাতেই আমার মন থেকে সুন্দরবনের সুন্দরত্বটুকু মুছে গিয়েছিল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাতে এখনও কল্পনা করতে পারি সেই ভয়ংকর স্থানটির কথা—যেখানে বাঘ-কুমীর আর মানুষ এক গণ্ডির ভিতর বসবাস করে স্বতন্ত্র অধিকার বজায় রেখে। যেখানে জেলেরা বাঘের মুখে প্রাণ তুলে দিতে রাজী, কিন্তু আপত্তি শুধু প্রাণহীন দেহ ছেড়ে দিতে। এটা বোধ হয় ওদের অধিকারগত প্রশ্ন।

—নীরোদ রায়

ধ্বনি
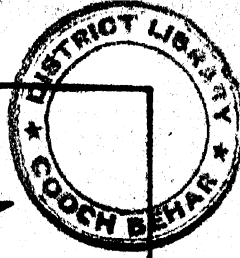
নাট্যবস্তু এবং আনুষঙ্গিক সঙ্গীতের নানা বিষয়ে নিয়ে একটা বিধিবদ্ধ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। এই আলোচনায় তিনি প্রথম পথপ্রদর্শন করেছেন বলে পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। অবশ্য তাঁর আগেও বহু আলোচনা নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ সংগ্রহকার এবং প্রকৃত পথপ্রদর্শক। ভরতের চিন্তার সঙ্গে রসবোধ ছিল, কিন্তু দার্শনিকতা ছিল না। তিনি প্রযুক্ত বিদ্যা নিয়েই আলোচনা করে গেছেন। লোক হিসাবে তিনি ছিলেন যাকে বলে 'প্র্যাকটিকাল'। কোথায় কি প্রয়োগ করতে হবে না হবে, কিসের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, কোন বিষয় বুঝতে গেলে অপর কোন বিষয় জানতে বা বুঝতে হয়—এইসব ব্যাপারই তিনি আলোচনা করে গেছেন। নন্দনতত্ত্বের গূঢ় আলোচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নাট্যসঙ্গীতের আলোচনা করলেন এবং নাট্যসঙ্গীতের আলোচনা করতে গিয়ে মার্গসঙ্গীত আর মার্গতাল নিয়ে যতটুকু জানা দরকার তারও বিশদ বিবৃতি প্রদান করলেন। এর ফলে মার্গসঙ্গীতের প্রযুক্ত বিদ্যা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক আলোচনা তাঁর নাট্যশাস্ত্রে থেকে গেল। এর পরে এই ধরনের সংগ্রহকার ছিলেন সঙ্গীতরত্নাকর রচয়িতা সোঢ়ল পুত্র নিঃসঙ্ক শার্ঙ্গদেব। ভরত ছিলেন তাঁর আদর্শ। ভরতকে এত চমৎকারভাবে বোঝাতে আর কেউ সমর্থ হন নি। এই গ্রন্থের তাল-অধ্যায় পড়লে নাট্যশাস্ত্র সুগম হয়। ভরত যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর চোখের সামনে যে সঙ্গীতের প্রকাশ অহরহ প্রত্যক্ষ ছিল তার আর বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নি। ফলে, বহু শতাব্দী পরে তাঁর আলোচিত বস্তুগুলি বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ, তখন আর সেসব বস্তু প্রচলনের মধ্যে ছিল না, নিঃশঙ্ক প্রচুর পরিশ্রম করে ভরতের বর্ণনাকে সুবিন্যস্ত করে যাতে পাঠকেরা মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করে দিলেন। সঙ্গীতরত্নাকরের তাল-অধ্যায় হচ্ছে মধ্যযুগীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের একটা খুব বড় রিসার্চ। নিঃশঙ্ক কিন্তু দার্শনিকতাকে বাদ দেন নি। তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি নাদ-তত্ত্বের যে আলোচনা তাঁর পূর্বে হয়ে গেছে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে গেছেন। তাঁরও বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বের সঙ্গীত সাহিত্যিক বৃহদ্দেশী-কার মতঙ্গ নাদ এবং ধ্বনির তত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেন। বস্তুত ধ্বনিই যে সঙ্গীতের মূল সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা তাঁর গ্রন্থেই আমরা পাই।

ধ্বনি শব্দটির দুটি প্রয়োগ দেখা যায়—একটি আলঙ্কারিক, অপরটি সাঙ্গীতিক। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা যে অর্থে ধ্বনিকে ব্যবহার করেছেন তাও যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। সঙ্গীতের ধ্বনি হচ্ছে শব্দ বা নাদ যা সুরে একটি প্রকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। কাব্যে যে ধ্বনির কথা বলা হয়েছে তার অর্থ ভিন্ন—এই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

বৃহদ্দেশী গ্রন্থের প্রারম্ভ হয়েছে মতঙ্গ এ' নারদের কথোপকথন থেকে। মতঙ্গ বললেন—"দেশে দেশে প্রবৃত্তোহসৌ ধ্বনির্দেশীতি সংজ্ঞিতঃ"—দেশে দেশে প্রবৃত্ত যে ধ্বনি তাই দেশী বলে সংজ্ঞিত হয়।" এই বচন শুনে নারদ প্রশ্ন করলেন "ধ্বনির দেশীত্ব কিভাবে নির্ণীত হল? এ সম্বন্ধে তো কোনো আলোচনা নেই—আপনি বুঝিয়ে বলুন।" উত্তরে মতঙ্গ যা বললেন তার অর্থ হল এই যে, প্রত্যেক দেশ বা স্থান থেকে যে ধ্বনি উৎপাত হয় তার এক একটি বিশেষ অনুভূতি আছে। এই ধ্বনি থেকেই বিন্দু, তার পরে নাদ, তারপরে মাত্রার উদ্ভব হয়েছে। মাত্রা থেকে এল স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণ। এই বর্ণ থেকেই পদ এবং বাক্যের সৃষ্টি। তারপর বাক্য থেকে মহাবাক্য যা বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধারণ করে আছে। এই সবই ধ্বনিত হচ্ছে। ধ্বনিই প্রকাশের আদিরূপ। গন্ধর্বসম্ভব এই যে সঙ্গীত এও সেই ধ্বনিরই প্রকাশ। মহামুনি মতঙ্গ বলছেন—

> ধ্বনির্যোনিঃ পরাজ্ঞেয়া ধ্বনিঃ সর্বস্য কারণম্‌।
> আক্রান্তং ধ্বনিনা সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌॥

এর পরেই মতঙ্গ নাদ-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন কিন্তু ধ্বনি আর নাদ—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? নাদও তো ধ্বনিরই প্রকাশ। সঙ্গীতশাস্ত্রে নাদের ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয়েছে তাতে দুটির অর্থগত ভেদ পরিষ্কার নয় এবং পাঠকের অনেক প্রশ্নের সদুত্তর এই স্বল্প বর্ণনায়
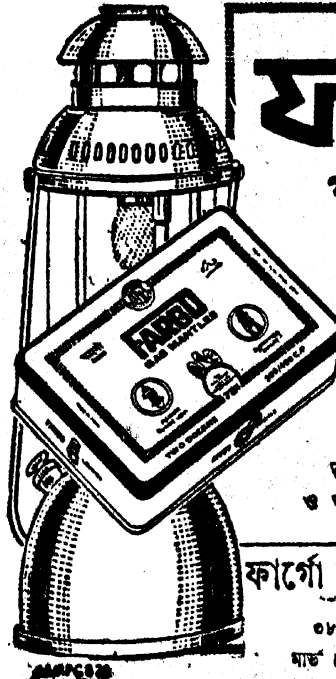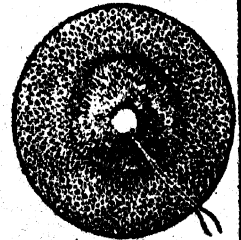
থেকে মেলে না। মতঙ্গ প্রথমে ধ্বনির উল্লেখ করেছেন এবং স্পষ্টই বলেছেন যে নাদ ধ্বনির পরবর্তী অভিব্যক্তি। সঙ্গীত রত্নাকর ধ্বনির উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নি, একেবারে নাদ থেকে সঙ্গীতোৎপত্তির প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছেন। স্বতই পাঠকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে ধ্বনি বা নাদ যে কোন একটির প্রসঙ্গ তুললেই তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত, মতঙ্গ এই দুটি শব্দের আলাদা বর্ণনা দিলেন কেন আর কেনই বা রত্নাকরে ধ্বনির আলোচনা বর্জিত হল। এর প্রধান উত্তর হচ্ছে এই যে, ধ্বনির অর্থ অনেক ব্যাপক, তা সামগ্রিকভাবে একটি দেশ বা জনপদকে অধিকার করে আছে। আর নাদ হচ্ছে দৈহিক ব্যাপার, দেহ থেকেই নাদের উৎপত্তি। মতঙ্গ ধ্বনির সাধারণ অর্থই করেছেন সঙ্গীত। সেই সঙ্গীত কি রকম? না, একটি দেশে বা একটি স্থানে পরিব্যাপ্ত যে সকল সুরধ্বনি লোকের মনোরঞ্জন করছে তাই। এই কারণে তিনি দেশী সঙ্গীতের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলছেন—মেয়েরা, বালকেরা, রাখালেরা এমনকি রাজা-রাজড়া পর্যন্ত নিজেদের দেশে নিজেদের ইচ্ছানুসারে অনুরাগভরে যে সব গান করে থাকে—তাই হচ্ছে দেশী সঙ্গীত। সঙ্গীতের এই যে এক একটা সম্মিলিত রূপ তাই হচ্ছে ধ্বনি এবং দেশে দেশে এদের প্রচলন অনুসারে এগুলিকে বলা হয় দেশী সঙ্গীত।

নাদ উৎপন্ন হচ্ছে দেহ থেকে, এটা দৈহিক ব্যাপার বলে নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব একেবারে দেহের উৎপত্তি থেকে তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। দৈহিক বিশ্লেষণ এবং নাড়ীগুলির বিস্তৃত বর্ণনার পর তিনি নাদের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তিনি বলছেন—আত্মা প্রকাশোন্মুখ। এই যে নিজেকে প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা—এই আকূতিই অন্তঃকরণকে জাগ্রত করে। আত্মা দ্বারা উদ্বুদ্ধ মন দেহস্থিত বহ্নিকে তাড়না করে। সেই বহ্নি মারুত বা বায়ুকে প্রেরণ করে। ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত বায়ু সেই বহ্নি দ্বারা তাড়িত হয়ে ঊর্ধ্বমার্গে উত্থিত হয় এবং আঘাতের দ্বারা নাভি-হৃদয়-কণ্ঠ-মুখে ধ্বনিকে বা শব্দকে প্রকটিত করে। যে নাদ হৃদয়সম্ভূত তার আখ্যা মন্দ্র, কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন নাদের নাম মধ্য এবং মস্তিষ্কসম্ভূত যে নাদ তাকে বলা হয় তার। এই দেহসম্ভূত নাদকেই বাইশটি অংশে ভাগ করা হয়েছে যার এক একটি অংশ শ্রুতি বলে পরিচিত।

মতঙ্গের বিচারে এই যে নাদ—তা এই ভুবনে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য ধ্বনির অন্তর্গত। এই রকম বহু নাদ থেকে উদ্ভূত স্বরসমূহে বহুপ্রকার সঙ্গীত সৃষ্টি করছে এবং সেই সব সঙ্গীত আবার এক একটি শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। এই এক একটি শ্রেণীই হচ্ছে এক একটি ধ্বনি। অতএব ধ্বনিই হচ্ছে সব সঙ্গীতের কারণভূত। এইভাবে ধ্বনির একটি অর্থ হচ্ছে সঙ্গীত।

আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ বা ব্যঞ্জনা দ্বারা আরও চমৎকার অর্থ যখন ধরা দেয় তখন কাব্যের উৎকর্ষ ঘটে। সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং সর্বসম্মত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তদীয় সাহিত্য-দর্পণে বলেছেন— "বাচ্যাতিশায়িনি ব্যঙ্গে ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তমম্।" মহামুনি মতঙ্গের সময় অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনির আলোচনা ছিল না। কিন্তু মতঙ্গ যেভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্বনির আলোচনা করেছেন আলঙ্কারিকেরা কাব্যের ক্ষেত্রে অনেকটা সেই চিন্তাধারাই অনু[illegible] করেছেন। মতঙ্গের মতে ধ্বনিই সঙ্গীতের সার এবং আলঙ্কারিকদের মতেও ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। যে কাব্যে ধ্বনি দ্বারা অর্থের ব্যাপ্তি নেই তা কাব্যই নয়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও শব্দই ধ্বনি নয়, যদিচ আভিধানিক অর্থে শব্দের সঙ্গে ধ্বনির কোনও পার্থক্য নেই। নাদ যখন শব্দমাত্রই নয়, তা সুরে ধ্বনিত হয় তখনই তো তা সঙ্গীত বলে পরিচিত হয় এবং মতঙ্গ তাকেই ধ্বনি বলেছেন। কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে যে পার্থক্য তাও ধ্বনিগত পার্থক্য। একই পদ যখন পড়ে যাই তখন তা কাব্য, কিন্তু পড়াকে অতিক্রম করে যখন সুরে তাকে প্রকাশ করি তখনই তা সঙ্গীত। বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তিকে একটু পরিবর্তিত করে যদি বলি পাঠ্য অবস্থা থেকে সুরের ব্যঞ্জনায় যখন আরও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয় তখনই তা সঙ্গীত। সুরের ব্যঞ্জনায় এই যে কাব্যের উৎকৃষ্ট রূপান্তর এইটিই তো ধ্বনি। আলঙ্কারিকদের ধ্বনির থিওরী এইভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও খাটে।

—শার্ঙ্গদেব

মনোরম মাধুর্য দিয়ে
বোনা ভয়েল ! নরম হাল্কা,
পাতলা মনভুলানো কমনীয়তা,
জমকালো বর্ণসুষমা, আকর্ষণীয়
ডিজাইন আপনার মনের মত...
আপনার পছন্দ হবেই।

॥ ২৮ ॥

"দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না, কাহারও সাধ মিটে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসে বিধাতাপুরুষের লীলা বা হস্তক্ষেপ স্বীকার করেন না, তবে ধর্মের প্রভাব বা অভাব স্বীকার করেন। বিধাতাপুরুষকে না মানলেও ধর্মকে মানতে বাধা নাই। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা আবশ্যক যে, বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ নিরীশ্বরবাদী নন, বরঞ্চ ঘোরতর ঈশ্বরবাদী, এমন কি অবতারবাদী। তবে যে ইতিহাসে তাঁর অভিপ্রায় স্বীকার করেন না তার কারণ বিধাতাপুরুষ সৃজিত নৈসর্গিক নিয়মাবলীই ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মূলত বৈজ্ঞানিক ও নৈয়ায়িকের মন; তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মন অনেক বেশি অধ্যাত্মপরায়ণ ও কবিজনোচিত। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে ধর্ম বলেন, তার সঙ্গে বিধাতাপুরুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। তাঁর ধর্ম বৌদ্ধ দর্শনের Law কিংবা শেকসপীয়র যাকে moral order বলেন তা-ই। ইতিহাস নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যাত হলেও তার চরম নিয়ামক ধর্ম বা Law বা moral order। ধর্মপালনে সার্থকতা, ধর্মের ব্যত্যয়ে পতন। বিষয়টি রাজসিংহের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভালো হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালো মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অনপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দুর অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেমন হয়েন, রাজানুচর ও রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেবউন্নিসা ও নির্মলকুমারীর তুলনায়, মানিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এইজন্য এসকল কল্পনা। ঔরঙ্গজেবের উমে ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক। এজন্য উভয়ই আপন আপন সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়ই ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন; ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্র জাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মারহাট্টা শিবাজি ও ইংলণ্ডের তাৎকালিক নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পরের তুলনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা উইলিয়াম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়াম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্মাত্মা বীরপুরুষগণের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; এ-দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।"

ধর্ম ও অধর্ম বলতে কি বোঝায়, কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তযোগে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর এই ধর্মের প্রভাবে কেমন করে রাজ্য স্থাপন এবং ধর্মের অভাবে কেমন করে রাজ্যের অধঃপতন ঘটে তাও বুঝিয়েছেন। এই বিষয়টিই "ত্রয়ী" উপন্যাসগুলিতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নানা কারণে সম্পূর্ণ সফলকাম হননি; একটি প্রধান কারণ—বাস্তব ভিত্তির অভাব। আনন্দমঠে ও দেবীচৌধুরাণীতে যথার্থ কোন ইতিহাসস্বীকৃত নৃপতি ছিল না যাকে অবলম্বন করে বিষয়টি প্রকট হতে পারে। সীতারামে অবশ্য একজন রাজাকে পাওয়া গিয়েছে, তবে তার পরিণাম ইতিহাস কর্তৃক সুনির্দিষ্ট; পরাজিতকে বিজয়ী বর্ণনা

করা চলে না। তাই তার পরাজয়ের মধ্যে যে অধর্মের কারণ ছিল তাই বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল এমন একজন ঐতিহাসিক নৃপতি যিনি ধার্মিক ও বিজয়ী, ধার্মিক বলেই বিজয়ী। ইতিহাস পাঠের অভিজ্ঞতায় এমন তিনজন নৃপতির নাম তিনি জানেন—শিবাজি, রাজসিংহ ও রণজিৎ সিং। তিনি রাজসিংহকে গ্রহণ করেছেন।

রাজসিংহকে গ্রহণ করবার আরও কিছু কারণ ছিল। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে রানী করবে স্থির ক'রে বলেছিল, পুরুষ হলেই ভালো হত, তবে এত গুণান্বিত ও ধনান্বিত পুরুষ পাওয়া সহজ নয়। সীতারামে গুণান্বিত ও ধনান্বিত পুরুষ পাওয়া গেল, তবে ইতিহাস বাদী, সীতারাম পরাজিত। তাই পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে রাজ্য কি দোষে ধ্বংস হয় দেখিয়েছেন। এতেও তাঁর অভিপ্রায় এক দিক দিয়ে সিদ্ধ হয়েছে, ধর্মের অভাব পতনের কারণ। এবারে অন্য দিকটা, বড় দিকটা, ধর্মের প্রভাবে প্রবল শত্রুর পরাজয় বর্ণনা করবার সুযোগ। রাজসিংহের চরিত্র ও ইতিহাস সেই সুযোগ দিয়েছে। রাজসিংহ পরিশোধিত ও পূর্ণতর সীতারাম। দুজনেরই বীরত্বের মূলে একই আবেদনের প্রেরণা, হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করলে কে রক্ষা করবে; প্রত্যক্ষে দুইজন হিন্দু নারী, শ্রী ও চঞ্চলকুমারী; পরোক্ষে সমস্ত হিন্দু সমাজ। ধর্মত্যাগে সীতারাম ব্যর্থ, ধর্মবলে রাজসিংহ চরিতার্থ। এতক্ষণে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ-ক্ষেত্রে যাকে ধর্ম মনে করেছেন তা Religion নয়, আবার অনুষ্ঠানগত কোন ব্যাপার নয়, তাকে মনুষ্যত্ব বলা যেতে পারে, ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলন গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত তাই বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়লো, যার উল্লেখ অন্যত্র করেছি, আবার ভাষান্তরে এই মাত্র করলাম। আগে বলেছি যে, কৃষ্ণকান্তের উইল ও বিষবৃক্ষ প্রভৃতির সূক্ষ্ম শিল্পকলা আর ত্রয়ীতে সুপ্রকট নীতিচেতনা রাজসিংহে এসে সুসমন্বিত হয়ে তাকে কেবল যে পরিশোধিত ও পূর্ণতর সীতারামে পরিণত করেছে তাই নয়, তাকে মহাকাব্যের বিভূতিমণ্ডিত ও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তিতে পরিণত করেছে। Art ও Morality-র এখানে বিরল সমন্বয়। এই দুই আপাতবিরুদ্ধ গুণের কদাচিৎ সমন্বয় ঘটে থাকে। ঘটে। যে-সব সাহিত্যিক নিছক শিল্পকলায় সন্তুষ্ট থাকতে চান না, শিল্পে ও নীতিতে সমন্বয় সাধন ক'রে শিল্পকে উন্নততর পদবী দান করতে চান, সাহিত্যকে অধ্যাত্ম-সাধনার সহায় ক'রে তুলতে ইচ্ছা করেন, স্বভাবতই তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। টলস্টয় এই কাজটি করতে চেয়েছিলেন, একমাত্র সুপ্রসিদ্ধ "তেইশটি গল্প" ছাড়া আর কোথাও সার্থক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পেরেছেন মনে হয় না। বোধ করি, সেই-জন্যই হতাশ হয়ে শেষ জীবনে শিল্প-সৃষ্টি পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম ও Polemics শ্রেণীর রচনায় বিপুল প্রতিভার নিয়োগ করেছেন। শিল্পকলা ও নীতির মধ্যে কোন একটাকে ছাড়তে হলে তিনি শিল্পকলাকেই ছাড়তে রাজী হতেন না।

শিল্পে ও নীতিতে সুসমঞ্জস রচনার মহৎ দৃষ্টান্ত রাজসিংহ। আরও কিছুকাল বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকলে মহত্তর কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতেন কিনা বলা যায় না। বলা যায় না এইজন্যে যে, বঙ্কিমচন্দ্র মূলত শিল্পী; শিল্পকলা তাঁর প্রথম প্রণয়লক্ষ্মী; তিনি সপত্নী নীতির প্রতি স্বভাবতই বিদ্বিষ্ট; তার ঘরে প্রণয়ীর ঘন ঘন যাতায়াত আদৌ তাঁর পছন্দ নয়; আর দুইজনাকে এক ঘরে আনয়ন, বলা বাহুল্য, অধিকতর অপছন্দ; এ হেন ক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়া মাত্র নিজের কাছে প্রণয়ীকে আত্মসমর্পণ করতে যে বাধ্য করবেন, এ তো খুব স্বাভাবিক। টলস্টয় শেষ জীবনে "তেইশটি গল্প" ছাড়া অন্য যে রসসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ও দুই সমন্বিত হয়নি, শিল্পলক্ষ্মীই আপন প্রাধান্য রক্ষা করেছে। এই কারণেই সাহিত্যে শিল্প ও নীতির সুসমঞ্জস দৃষ্টান্ত এত দুর্লভ।

গোয়েটে বলেছিলেন যে, কালক্রমে কালচার ধর্মের স্থান অধিকার করবে। তার পরে এক শ' বছর কেটে গিয়েছে, গোয়েটের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না; বরঞ্চ যা দেখা যাচ্ছে, তা নিতান্তই প্রতিকূল; কালচার এখন রাজনীতির স্থান অধিকার করতে চলেছে। অদূরভবিষ্যতে হয়তো রাজনীতি শব্দটাই পরিত্যক্ত হবে, ওর মধ্যে অনেক কলংক,

অনেক ভ্রান্ত, লোক, বিশেষ পুঞ্জীভূত; তার বদলে কালচার বা সংস্কৃতি শব্দটা ব্যবহৃত হ'লে দ্বিধাবন্দ্বের প্রবেশ-বাধা দূর হ'তে পারবে। কিন্তু টলস্টয় ও বঙ্কিমচন্দ্রে কালচার (বা শিল্পকলা) পুরাতন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, নূতন অর্থের অংকুর তখনো দেখা দেয়নি।

শিল্প ও নীতিতে সাম্য-সাধনের আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কখন উদিত হ'ল, নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না, হয়তো তাঁর পক্ষেও দিন তারিখ স্থির ক'রে বলা সম্ভব ছিল না। তবে মোটের উপরে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা চলে। প্রথম, বঙ্গদর্শন প্রকাশ। বঙ্গদর্শন-পত্র বিবিধার্থ সংগ্রহের ন্যায় একখানি পত্র নয়; বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তার প্রকাশ। দ্বিতীয়, কমলাকান্তের দপ্তরের সূচনা। তৃতীয়, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন নিবন্ধটি। তিনটিই গুরুতর, শেষেরটির গুরুত্বের সঙ্গে স্পষ্টতা জড়িত।

বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় লেখক বলেন, "যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তিদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে যাহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখনো কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র-লোকের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত ও সহৃদয়তাসম্পন্ন।"

উপর্যুক্ত বিষয়ে পাঠক সমাজকে সচেতন ক'রে তোলা বঙ্গদর্শন প্রকাশের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যও আছে, যেমন বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ। মোট কথা এই যে, বিশেষ একটি মিশন বা আদর্শ নিয়ে বঙ্গদর্শনের জন্ম। শিল্পে ও নীতিতে মিলনের দিকে এই প্রথম পদক্ষেপ।

তারপরে কমলাকান্তের দপ্তর। কমলাকান্ত একজন মিশনারি, আদর্শবাদী পুরুষ। দেশ, সমাজ, সাহিত্য, মানবধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে যে মত সে পোষণ করতো, তখনকার পক্ষে তা নূতন, এখনো পুরাতন হয়ে যায়নি। শিল্পে ও নীতিতে মিলনের দিকে এই দ্বিতীয় পদক্ষেপ; কমলাকান্ত শিল্পরুচি ও নীতিবোধে বিমিশ্র মানুষ।

তৃতীয়, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন নিবন্ধ, রচনাকাল ১৮৮৫ সাল। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি, এখন ইশারায় স্মরণ করিয়ে দিলেই কাজ চলবে। নিবন্ধটিতে বারোটি সূত্র আছে সাহিত্যে রীতি ও নীতি বিষয়ে। এখানে দুটি উদ্ধার ক'রে দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সহিত গণ্য করা যাইতে পারে।"

"যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সেসকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না। সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।"

এখানে স্পষ্টাক্ষরে শিল্প ও নীতির মিলনের ঔচিত্য ঘোষিত হয়েছে, তবে সে কাজ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে অনেক

আগে। ১৮৮৫ সালে পূর্বোক্ত রচনা, তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে।

বলা বাহুল্য, আনন্দমঠ প্রভৃতি গ্রন্থীতে শিল্প ও নীতির মিশ্রণ হয়েছে বটে, তবে মিলন হয়নি, নীতি প্রবলতর। পাঠক একটা "Palpable design" আছে বুঝতে পারে, রসবোধ কুণ্ঠিত হয়। লেখকও মনোভাব লুকোননি, শাস্ত্রীয় শ্লোক ও তার ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সচেতন ক'রে রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তিনবার আংশিক সাফল্যের পরে রাজসিংহে এসে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন। রাজসিংহের আগে শিল্প ও নীতির মিশ্রণ মাত্র ঘটেছে, রাজসিংহে এ দুয়ের মিলন। গ্রন্থীতে শিল্প ও নীতি প্রয়োগের গঙ্গা-যমুনার ধারা, মিশ্রিত হ'য়েও মিলিত হয়নি, ভেদরেখাটি স্পষ্ট; রাজসিংহে কাশীতলবাহিনী গঙ্গা; দুয়ে মিলে এক হ'য়ে গিয়েছে, একে দুই দু'য়ে এক।

এ বিষয়ে আলোচনার আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহ রচনার আগে কৃষ্ণচরিত্র লিখিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এত দিন যে পূর্ণমানবের সন্ধান করছিলেন, যার মধ্যে চার প্রকার বৃত্তির সমান ও সুসমঞ্জস অনুশীলন ঘটেছে, এত দিন পরে তাকে আবিষ্কার করেছেন কৃষ্ণের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। এখন আর কাল্পনিক প্রফুল্লর বা আধা-কাল্পনিক সীতারামের প্রয়োজন নাই; রক্ত-মাংসের ঐতিহাসিক একজন মানুষকে পাওয়া গিয়েছে। (বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন)। অতঃপর এই ঐতিহাসিক ব্যক্তির ছায়া যার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, নায়ক বলে তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা হবে না। রাজসিংহে তেমন একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর কাছে কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ, রাজসিংহ আদর্শ নায়ক। কারণ, "অন্যান্য রাজকীয় গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ... রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।" এতকাল লেখক যার সন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সেই রক্ত-মাংসের আদর্শ নায়ককে দরজার গোড়ায় ইতিহাসে দেখতে পেলেন; আর শুধু তাই নয়, তার ঐতিহাসিক প্রতিনায়করূপে এমন আর-একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, যিনি অন্যান্য রাজকীয় গুণে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মশূন্য। "ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল।" শিল্প ও নীতির গঙ্গা-যমুনার একাকার ধারা। পাঠক সব সময়ে জানতেও পারে না যে, দুই নদীর জলধারা তার নৌকার নীচে প্রবাহিত। আগে হ'লে, যেমন গ্রন্থীতে হয়েছে, লেখক "Palpable design"-এর দ্বারা পাঠককে সচেতন ক'রে দিতেন; এখানে design নিশ্চয় আছে, তবে আদৌ Palpable নয়। লক্ষ মত্তহস্তীর বলকে পরাজিত করতে পারে, এমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে আমরা বাস করছি, তবু তো সচেতন নই। এই designটি প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুনিপুণ অথচ শিল্পসঙ্গত পন্থা অনুসরণ করেছেন। কোথাও স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেননি, কেবল ইঙ্গিত ও উপমা প্রভৃতি দিয়ে, যদুপতি ও রুক্মিণী হরণের কাহিনী স্মরণ করিয়ে রাজসিংহ ও কৃষ্ণের সাধর্ম্য ধীরে ধীরে পাঠকের মনে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন। বিচারে বসলে design ধরা পড়ে অথচ

রসোপভোগে বাধা জন্মায় না। শিল্পের দাবি ও নীতির দাবি, কারো মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি। (বিষয়টির প্রতি আমার স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীবিজিত দত্ত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।) বঙ্কিমচন্দ্রের যা অভীষ্ট, এত দিন পরে তা সিদ্ধ হ'ল। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এ প্রচেষ্টা একবার মাত্র সফল হয়েছে, তাই রাজসিংহের স্থান এমন অনন্যসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের শুরু হয়েছিল, তার কথায় জের টেনে শেষ করা যেতে পারে। তিনি লক্ষ করেছেন, রাজসিংহ উপন্যাসে গতির তীব্রতা। গতির তীব্রতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনীর ন্যায় অপেক্ষাকৃত অন্তর্মুখী উপন্যাসগুলিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। রাজসিংহ ঘটনাপ্রধান উপন্যাস, স্বাভাবিক-ভাবেই গতি এখানে তীব্র, রবীন্দ্রনাথের মতে যতটা প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। কিন্তু সর্বত্র নয়। ছোট রাজসিংহের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ এবং পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহের তৃতীয় খণ্ডের রসিকা পানওয়ালী নামে দশম পরিচ্ছেদ অকারণ দীর্ঘ। পরিচ্ছেদটির একমাত্র উদ্দেশ্য, মাণিকলাল কর্তৃক মোগল সিপাহীর পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব সংগ্রহ। রসিকা পানওয়ালীর সহায়তায় কার্যটি উদ্ধার করেছে মাণিকলাল। কিন্তু সেজন্য কি দীর্ঘ একটা পরিচ্ছেদের আবশ্যক ছিল? এর চেয়ে অনেক গুরুতর বস্তু সংগ্রহ, নির্মলকুমারীকে বাগ্দত্তা বধূরূপে লাভ, আধখানা পরিচ্ছেদে সম্পন্ন করেছে হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল। পাঠক বিশ্বাস করেছে, উপরিন্তু মধ্যে পেয়েছে লেখকের ধমক। লেখকের উপরে পাঠকের বিশ্বাসের গভীরতায় লেখকের প্রতিভার সার্থকতা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠার চরমে, তখন অনেক কিছু আপাত-অবিশ্বাস্য পাঠক বিশ্বাস করে নেয়, মাণিকলালের বধূলাভকেও করে নিয়েছে। তবে পোশাক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের প্রয়োজন যে আর কিছুই নয়, ক্ষণকালের জন্য লেখক নিজে রসিকা পানওয়ালীর গুণে মগ্ন হয়ে গল্পের প্রচণ্ড প্রবৃত্তি ভুলে গিয়েছেন। লেখক যতই প্রতিভাবান হোন, তিনিও মাঝে মাঝে নিজের সৃষ্টিতে মগ্ন হয়ে কর্তব্য বিস্মৃত হন। কথিত আছে, প্রজাপতি ব্রহ্ম সরস্বতীকে সৃষ্টি করে সেই কন্যাস্থানীয়ার রূপে মোহ অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরুণ, তরুণ, করুণ এই তিনটি শব্দের মোহ সারা জীবনে কাটিয়ে উঠতে পারেননি, ওদের একটা এলেই পাঠককে ধরে নেয় বাকি দুটো আসবে এবং বড় ভুল করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিজাত কর্তব্য বিস্মৃতির উদাহরণ পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদটি। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গূঢ় আলোচনাটির যথাসাধ্য সমালোচনা শেষ হ'ল, এবারে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যেতে পারে।

রাজসিংহ আটটি খণ্ডে সমাপ্ত। অষ্টম খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জেবউন্নিসা শুনলো যে, যুদ্ধে মবারকের মৃত্যু হয়েছে, "তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপরে পড়িয়া কাঁদিল—বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী বিপ্রলাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।" মবারকের মৃত্যুতে ও জেবউন্নিসার শোকে কাহিনীর একটি অগ্নিময় সূত্রের শেষ হ'ল, কিন্তু কাহিনীর শেষ হ'ল না।

পূর্ণাহুতি—ইণ্টলাভ নামে ষোড়শ পরিচ্ছেদে কাহিনীর শেষ।

"যুদ্ধান্তে জয়শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিল, রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি বলিলেন, একটা কথা বাকি আছে। আমার

সেই কন্যাটা। কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রহণ করিবেন কি? রাজসিংহ বলিলেন, তবে উদয়পুরে চলুন। বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই সহস্র ফৌজ লইয়া উদয়পুরে গেলেন। বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তারপর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তারই অধিকার, উপন্যাস লেখকের সেসব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।"

নায়ক-নায়িকার মিলনে, যা নাকি কথা-সূচনায় অভিপ্রেত ছিল, কাহিনীর সমাপ্তি। চঞ্চলকুমারী যে নায়িকা, জেব-উন্নিসা বেদনার মহার্ঘতা সত্ত্বেও যে নায়িকা নয়—এ তার একটি অতিরিক্ত প্রমাণ।

রাজসিংহের আটটি খণ্ড যেন মহাকাব্যের আটটি সর্গ। বাস্তবিক, রাজসিংহ উপন্যাসে মহাকাব্যের অনেক গুণ বর্তমান। অনেকের মতে, হাল আমলের উপন্যাস প্রাচীন মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। মহাকাব্যের মতোই বৃহৎ জীবনখণ্ডকে ধারণ করবার ক্ষমতা উপন্যাসের আছে; আবার মহাকাব্যের মতোই মহাকাব্যোপম উপন্যাসও নিতান্ত বিরল। ইউরোপীয় সাহিত্যে ওয়ার অ্যান্ড পীস মহাকাব্যোপম বলে স্বীকৃত, কোন দ্বিতীয় নাম থাকলেও এমন সর্বজন-স্বীকৃত নয়। বাংলা উপন্যাস-জগতে কোন গ্রন্থকে মহাকাব্যোপম বলা যায় কি? গোরাকে অনেকে মহাকাব্যোগুণান্বিত মনে করেন। দেশ ও কালের সংকীর্ণতা, পাত্র-পাত্রী ও ঘটনার সামান্যতা গোরার মহাকাব্য পদবী দাবির অন্তরায়। তবে গোরা ও আনন্দময়ীতে মহাকাব্যোচিত অসামান্যতা কিছু আছে বটে। যোগাযোগ উপন্যাস তিন পুরুষের কাহিনীতে সম্পূর্ণ হ'লে মহাকাব্যের দ্বিতীয় দাবিদার হ'তে পারতো। প্রথম অবিসংবাদী দাবিদার বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ।

দেশ ও কালের বিস্তার, পাত্রপাত্রীর অসামান্যতা, ঘটনাসমূহের অভিনবত্ব ও সুদূরদর্শী পরিণাম সমস্ত একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে রাজসিংহ গ্রন্থকে সাধারণ উপন্যাসের স্তর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত ক'রে দিয়েছে। রামায়ণে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব, মহাভারতে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার্থে কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃযুদ্ধ যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়। মোগল সাম্রাজ্য-শক্তির সঙ্গে হিন্দু রাজশক্তির দ্বন্দ্ব, যার পরিণামে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা—নিশ্চয়ই মহাকাব্যোচিত বর্ণনীয় বিষয়। রামায়ণ, মহাভারত আমাদের দেশে মহাকাব্যের আদর্শ। সেই রামায়ণ,

মহাভারতের একটি মৌলিক শিল্পগুণে রাজসিংহে বর্তমান: সে গুণটিকে ক্লাসিক্যাল সংযম বলা চলে। অবান্তর, অনাবশ্যক ও অনতি-আবশ্যকের ভারে হাল আমলের উপন্যাস পীড়িত। রাজসিংহে এ-সমস্ত কিছুই নাই। একটি অনতিদীর্ঘ পরিচ্ছেদে চঞ্চলকুমারী ও নির্মলকুমারী রাজসিংহকে পত্র লেখা স্থির ক'রে ফেলে ভরতব্যাপী অগ্নিকাণ্ডের ইন্ধন সংগ্রহ করলো; আধখানা পরিচ্ছেদে মাণিকলাল ও নির্মলকুমারী বিবাহ স্থির ক'রে ফেলল; একটি পরিচ্ছেদে দস্যু মাণিকলাল রাণা রাজসিংহের বিশ্বস্ততম অনুচরে পরিণত হ'ল; নামমাত্র আয়াসে নির্মলকুমারী আলমগীর বাদশার ইমনিবেগমরূপে দেখা দিল; এমন আরও আছে। গুরুতর ঘটনার এরূপ লঘু পদক্ষেপ যথার্থ মহাকাব্যের চাল। রোমান্টিক সাহিত্যের উচ্চৈঃশ্রবার গতি বক্র ও জটিল, আড়াই ঘর যায়; ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের ঐরাবতের গতি সরল ও সংক্ষিপ্ত। বাংলা সাহিত্যে এই ক্ল্যাসিক্যাল গুণটির আধার বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি আধারে ক্ল্যাসিক্যাল, আধেয়ে রোমান্টিক। এখানেই তাঁর অনন্যসাধারণত্ব: বাংলা সাহিত্যের গুণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও তাঁর গুরুত্ব অধিক।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। শুধু তাই নয়, আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমি পূর্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" অপর পক্ষে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর এবং আনন্দমঠ প্রভৃতি তিনখানিও ঐতিহাসিক উপন্যাস। আমাদের মতে, যে মত যথাস্থানে ব্যক্ত করিয়াছি, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর এবং সীতারাম (গীতার শ্লোকগুলি সত্ত্বেও) ঐতিহাসিক উপন্যাস; আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী নয়, কারণ, এ দু'খানি ইতিহাসের সত্যকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সত্যে পদার্পণ করেছে। আর রাজসিংহ তো ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরম। এখন এ মতভেদের কারণ কি? গুরুতর কোন কারণ আছে মনে হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র যত নির্মম হ'তে চান, অপরে তত নির্মম নন। অর্থাৎ এখানে মতভেদের কারণ গুণগত নয়, মাত্রাগত। বিষয়টি "ঐতিহাসিক উপন্যাস-এ" রবীন্দ্রনাথ সম্যকভাবে আলোচনা করেছেন। "ব্যক্তিবিশেষের সুখ-দুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে; জগতের বড় বড় ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, এইরূপে ব্যক্তিবিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থানপতন, ঘাত-প্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া ওঠে। ......বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর বিপদ-সম্পদ, হর্ষ-বিষাদ আপনার করিয়া বুঝিতে পারি, কারণ, সে-সমস্ত সুখ-দুঃখের কেন্দ্রস্থল নগেন্দ্রের পরিবারমণ্ডলী। নগেন্দ্রকে আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতে কিছুই বাধে না। কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখ-দুঃখ, জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলে রাগিণী

বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।" এইভাবে যে একটা বিশেষ রসের সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথ তাকে ঐতিহাসিক রস আখ্যা দিয়েছেন। "এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।"

এখন এই ঐতিহাসিক রসটি দুর্গেশ-নন্দিনীতে কম, মৃণালিনীতে কিছু বেশী, চন্দ্রশেখরে ও সীতারামে আর-একটু বেশী; রাজসিংহে পুরো মাত্রায় বিরাজমান। তা যদি হয়, তবে অন্যগুলির সঙ্গে রাজসিংহের পার্থক্য মাত্রাগত দাঁড়ায়, গুণগত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র মাত্রাধিক্যকেই লক্ষ করেছেন তাই অন্যগুলির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করতে চান নি।

রাজসিংহে অনেকে ঐতিহাসিক তথ্যগত ত্রুটি লক্ষ করছেন। এসব ত্রুটি এড়িয়ে চললে ভালো হত, তবে যে তা সম্ভব হয়নি, তার কারণ রাজসিংহ রচনার সময়ে ঐতিহাসিক গবেষণা অনগ্রসর ছিল। সমস্ত বিষয় নিঃশেষে জেনে শুনে নিয়ে লিখলেই আপদ চুকে যেত, তবু চূড়ান্ত প্রশ্নটার মীমাংসা হল না। কেমন করে জানা যাবে যে, সব জ্ঞান নিঃশেষে আয়ত্ত হয়েছে? আজকার জ্ঞান আগামী কল্য নববাবিষ্কৃত দলিলের বলে সিংহাসনচ্যুত হবে না তার নিশ্চয়তা কি? বাস্তবিক, ও পথে মীমাংসা নাই। আসল কথা, ঐতিহাসিক রসটি আছে কিনা? কি পরিমাণে আছে? তার উপরেই উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব ও গুণের মাত্রা নির্ভর করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসবলীর মধ্যে নয়, আমার যত দূর জানা আছে, পৃথিবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের মধ্যেও রাজসিংহের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে।

আর একটা বিষয়ের আলোচনা সেরে নিলে এ প্রসঙ্গের শেষ হয়। রাজসিংহকে আমরা মহাকাব্য বা মহাকাব্যগুণান্বিত গ্রন্থ বলেছি: আবার বলছি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ দুয়ের মধ্যে কি যোগাযোগের পথ নাই? আবার রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হতে হয়। ঐতিহাসিক রস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।" যোগাযোগের পথ এখানে, এই রসের অস্তিত্বে।

ঐতিহাসিক রস ও মহাকাব্য ঘন-সন্নিবিষ্ট। রামায়ণ মহাভারত, ইলিয়াড ওডীসির মধ্যে ঐতিহাসিক রস যে আছে তার প্রমাণ ইতিহাসবেত্তারা ঐসব মহাকাব্যের মধ্যে ইতিহাসকে নিরন্তর সন্ধান করছেন। যখন এসব কাব্য লিখিত হয়েছিল তখনই কাহিনী ও তথ্য ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে পড়েছিল, কবিরা তাদের কাব্যপদবী দান করেছেন। এমন করবার কিছু প্রয়োজন ছিল কি? "এরূপ ব্যাপার আগাগোড়া কল্পনা হইতে সৃজন করা যায় না যে, তাহা নহে; কিন্তু যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দূরস্থ যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী, তাহাকে কোন একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয় উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।"

মহাকাব্যে দেশ ও কালের ব্যাপ্তি এবং ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর যে অসামান্যতা অত্যাবশ্যক, ইতিহাস কবির হাতের কাছে তা গুছিয়ে দেয়। সর্বোপরি ইতিহাসের পরিচিত ঘটনাবলী আমাদের মনের মধ্যে আগে থেকে যে স্মৃতি ও সংস্কার সৃষ্টি করে রেখেছে—আমাদের কাছে টেনে নিয়ে কিংবা সেই কালকে আমাদের কাছে টেনে এনে রসাস্বাদনের পথ সুগম করে দেয়। এই কারণেই পৃথিবীর মহাকাব্যগুলির ভিত্তি ইতিহাস; আবার এই কারণেই মহাকাব্যোপম ওআর অ্যান্ড পীস, দি ডাইনাস্টস ও রাজসিংহেরও ভিত্তি ইতিহাস। আগে বলেছি, প্রাচীন মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী হাল আমলের উপন্যাস; এখন কিঞ্চিৎ সংশোধন করে বলছি, মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রাজসিংহকেই তজ্জাতীয় রচনা বলা যায়, পৃথিবীর সাহিত্যেও · সমকক্ষ অধিক নাই। ...প)
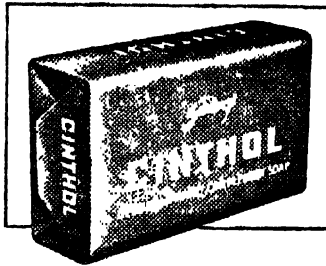
পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান

যদি কোনো একটা ব্যাপারে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়েছে বলতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। প্রথম তিনটি যোজনায় ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি নতুন কর্মপ্রার্থীদের কাজের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর তাৎপর্য হল চতুর্থ পরিকল্পনার আরম্ভ থেকে দেশে ১ কোটি ৪০ লক্ষ বা তার বেশি সংখ্যায় বেকার থাকবে। তার উপর, যারা ঐ যোজনা কালে উপার্জনের বয়সে পৌঁছাবে তাদেরও ধরতে হবে।

বেকার সমস্যার বহর

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় হিসাব করা হয়েছে যে, এই সময়ের ভেতর ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক কাজ চাইবে। কিন্তু আশা করা হচ্ছে, ১ কোটি ৮৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৯০ লক্ষের মতো নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। তার মধ্যে কৃষি অংশে প্রায় ৫০ লক্ষের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দেবার কথা আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ৪০ লক্ষ বা তার বেশি লোককে কাজের সুযোগ দেওয়া যাবে না।

খসড়া লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার বড়ো রকমের কোনো রদ-বদল করার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। অবশ্য বৈর্যক্তিক উদ্যোগের ফলে দেশে একটা অর্থনৈতিক কাঠামোর মতো গড়ে উঠেছে বলে কাজের যোগান উচ্চ স্তরে অব্যাহত রাখা হবে শিল্পনীতির অন্যতম অভীষ্ট। কর্ম সৃষ্টির ব্যাপারে সাফল্য যে পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর নির্ভর করবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সম্পূর্ণ কর্মহীন ব্যক্তি ছাড়াও, ভারতের শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে অনেক আংশিক বেকার (যারা সুযোগ পেলে আরো কাজ করতে ইচ্ছুক) আছে। একটি নির্ণয় অনুসারে এদের সংখ্যা হল প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। বিশেষ করে, পল্লী অঞ্চলে অত্যন্ত অল্প মজুরী এবং নিম্নমানের উৎপাদন-ক্ষমতা ঐ সমস্যার দু-একটি লক্ষণ।

গ্রাম অঞ্চলের শ্রম-সম্পদ

নতুন পরিকল্পনার খসড়ায় পল্লীর কাজ-কর্মের উপযুক্ত কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য ৯৫ কোটি টাকা রাখা হবে। আশা করা হচ্ছে, পরিকল্পনা কাল শেষ হবার ভেতর ১৫ লক্ষ লোককে বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়া যাবে।

১৫ থেকে ২৫ বছরের গ্রাম্য যুবকদের ভেতর থেকে একটি 'কর্মী বাহিনী' গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে (তাদের দক্ষতা বা কর্মকুশলতা অর্জনের সুবিধা করে দিয়ে)। তার জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় গ্রামীণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

গ্রামগুলির শ্রম-সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে হলে ছোট ছোট চাষীদের গ্রাম থেকে জনাকীর্ণ শহরে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্য সম্পাদন, বিশেষ করে কৃষিজাত উপাদান

থেকে সেখানে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য শিল্প-স্থাপন, পল্লীবাসীদের কাজের সংস্থান করে দিতে সাহায্য করবে।

জমির উপর অত্যধিক চাপের ফলে অনেক সক্ষম ব্যক্তিদের গ্রাম ছেড়ে কাজের সন্ধানে চলে আসতে হয় শহর-অঞ্চলে। বেশির ভাগ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গতি ও দক্ষতা না থাকার দরুন নবাগতদের অনেককেই গৃহভৃত্য বা ফেরিওয়ালার বৃত্তি নিতে বাধ্য হতে হয়। গ্রামের লোকদের শহর-অঞ্চলে চাকরি পাবার সম্ভাবনা বর্তমানে সীমাবদ্ধ একাধিক কারণে। প্রথমত, শহরগুলিতে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শ্রমিকবাহিনী পুষ্ট হয়েছে; দ্বিতীয়ত, শহর-অঞ্চলে আগের থেকেই পুরো বা আংশিক বেকার যথেষ্ট সংখ্যক রয়ে গেছে; তৃতীয়ত, অবিবাহিত মেয়ে ও গৃহকর্ত্রীদের মধ্যে বাড়ির বাইরে কাজ নেবার ইচ্ছা ক্রমে দেখা যাচ্ছে এবং ফলে শহর-অঞ্চলে শ্রমিকদের যোগান বেড়েছে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে শ্রমনির্ভর পূর্ত-কার্য আরম্ভ হলে সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা সম্ভব হবে। ঐ কার্যক্রম কর্মক্ষম গ্রামবাসীদের জন্য কাজ সৃষ্টি করবে; প্রধানত জমির উন্নয়ন ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি হবে তার লক্ষ্য। মৃত্তিকা সংরক্ষণ, রাস্তা তৈরি, বৃক্ষ রোপণ, জল সেচ ইত্যাদি কাজে শ্রম বেশি লাগে বলে এ রকম প্রকল্প স্থানীয় স্তরে শ্রম সম্পদের সম্যক ব্যবহারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। অবশ্য তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির দরকার।

প্রশিক্ষণের ভূমিকা

খসড়ায় হিসাব করা হয়েছে যে, চতুর্থ যোজনাকালে ৮৬,০০০ ইঞ্জিনীয়ারিং স্নাতক এবং ১৪০,০০০ ডিপ্লোমাধারীদের প্রয়োজন হবে; বর্তমান ও পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে সবসুদ্ধ তাদের সংখ্যা বার্ষিক শতকরা প্রায় ১১ হারে বাড়লে ভালো হয়।

প্রশিক্ষণের সুযোগের সম্প্রসারণ ডিপ্লোমা স্তরে বেশি হওয়ার দরকার যাতে ১৯৮৬ সালের ভেতর প্রত্যেক গ্রাজুয়েটের সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ডিপ্লোমা-ধারী কারি[illegible] পাওয়া যায়। প্রধান ঝোঁকটা [illegible]বে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার প্রতিটি স্তরের মান উন্নয়নের উপর।

চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত কর্মীদের দারুণ অভাবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে পরিকল্পনার খসড়ায়। মেডিকেল কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ১৯৬৫-৬৬ সালে ১০,৬২৫ থেকে প্রতি বছর বাড়িয়ে ১৯,০০০ করতে হবে—বর্তমান বিদ্যায়তনগুলির সম্প্রসারণ এবং ২৫টি নতুন কলেজ স্থাপন উভয়ের দ্বারা। তাহলেই ডাক্তার-জনসংখ্যার অনুপাত (গত ১৫ বছর ধরে যা ১ : ৫,৮০০-র প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে) ১৯৭৬ সালের ভেতর ১ : ৩,৫০০-র পৌঁছাবে।

দেখা যাচ্ছে, দেশের শ্রমসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার আর্থিক উদ্যোগের শুধু একটা সদিচ্ছামূলক সম্পূরক নীতি বলে ধরে নিলে চলবে না, পরিকল্পনার অন্যতম মুখ্য নীতি হিসাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। এতদিন কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে, এখন জনবলের সুষ্ঠু নিয়োগের প্রতি মনোযোগ দেবার সময় এসেছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

শিল্পীর সমাবেশ

কমলাচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টার

শুনছিলাম ইকনমি শব্দটি নাকি গ্রীক ভাষায় গৃহস্থালির হিসেব পত্র, নড় জোর ঘরোয়া সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবহার হতো। সেই ইকনমি থেকে আজকের ইকনমিক্স প্রায় এক বিমূর্ত বিজ্ঞানে এসে পৌঁছেছে। তবু আমরা জোর করে বলতে পারি জ্ঞান বিজ্ঞান, পরিকল্পনা সব পণ্ড করে দিতে পারে ঘরকন্নার গৃহজাত অর্থনীতি। দারুণ বাস্তবতায়, নিষ্ঠুর দৈনন্দিন ব্যবহারিক বা ফলিত প্রয়োগে ভাবের স্থানের নিতান্ত অভাব সেখানে। দেখুন হিসেব করে ঘরে ঘরে ঘরের মেয়ের কাহিনী। তাদের কতজন যে অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় সেরা কুশলীকে কাবু করে রাখতে পারে তার ইয়ত্তা নেই।

মেয়েটির নাম নাই বা নিলাম। ঘটনাটি নিছক সত্য। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের বিপর্যস্ত গৃহিণী। স্বামীর মাসিক আয় তিন শ' টাকা। ঘরে দুবেলা আঠারোটি পাতা পাততে হয়। ন'টি পোষ্য নিয়ে নিতান্ত নাকাল হওয়া ভিন্ন গতি নেই। যৌথ সংসার নাকি ভারতবর্ষে উঠে যাচ্ছে অথচ মেয়েটি বলে গেল, সংসারে তার ভরণপোষণের মুখাপেক্ষী আপনজন গুটি পাঁচেক। ছেলেমেয়ে দুটি। কিন্তু তাদের স্কুলের মাইনে দেওয়া হয়নি মাস ছয়েক। খেটে খাওয়া শ্রমিকের সংসার হলে হয়তো অনেকেই ঘরের খরচের কিছু কিছু উপার্জন করতে পারতো কিন্তু সামাজিক প্রথায় নিম্ন মধ্যবিত্তের সেখানেও মস্ত বাধা। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি এসেছিল বালিগঞ্জ বণ্ডেল রোডে কমলাচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টারে। আশা ছিল অন্ততঃ ছেলেমেয়ে দুটির স্কুলের মাইনের সংস্থান করতে পারবে, না হলে তাদের স্কুল ছাড়তে হবে। ৩০ টাকা মাস মাইনেতে সে হেম সেলাই করবে, বোতাম লাগাবে। কর্মীদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন কাজ ঘরে নিয়ে যেতে। ঠিকে কাজে উপার্জনও বেশী, ঘরের বাইরেও অনেক সময় কাটাতে হয় না। মেয়েটি কিন্তু রাজী হয় নি। ঘরের চাকাতে বাঁধা গৃহিণীর কি আর ফালতু সময় পাওয়া সম্ভব? তার চেয়ে বরং কেন্দ্রে চলে এলে বসে কাজ করবে। মেয়েটি এখন আরও একটু বেশী উপার্জন করে। ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনে, বইখাতা, কাপড়জামা সবই সে আজ যুগিয়ে যাচ্ছে। ক'দিন আগেও মা ও মেয়ের দুজনের মধ্যে ছিল মাত্র এক জোড়া চটি। মা বাইরে গেলে মেয়েকে ঘরে থাকতে হতো, আবার মেয়ে কোথাও গেলে মা রাস্তায় নামতে পারতেন না। এখন মেয়ে স্কুলে যায়, মা বণ্ডেল রোডের সেণ্টারে কাজে আসেন। ঐ ক'টি টাকা মাত্র, কিন্তু অভাবের সংসারে তার মূল্য অনেক।

এতো মাত্র একটি মেয়ের কাহিনী। এরকম আছে শত শত। সবার খবর জানবার সুযোগও হয় না। এই সেণ্টারেরই মেয়েদের কথা আরও কত শুনলাম। সম্পন্ন সংসারের বিপন্ন বউও আসে। ধরুন শ্বশুরের তিনতলা প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত অক্ষম পুত্র ঘর বেঁধেছেন সস্তা পাড়ার সামান্য আশ্রয়ে। স্বামী হয়তো চেষ্টাও করেন উপার্জন করতে কিন্তু শারীরিক বা মানসিক শক্তিতে সামান্যই হয় আয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে বাজারের আলু বেগুন বিক্রির পয়সায় নিত্যপ্রয়োজনীয়টুকুও জুটিয়ে উঠতে পারেন না। অবোধ শিশুর অবুঝ আবদার বুকে করে বউটি এসে দাঁড়ায় কেন্দ্রে। স্বল্প-পরিসর ঘরের কোণে শিশু খেলা করে।

মা করে সেলাই বা বোনার কাজ। দিনান্তে যা পাওয়া যায় তাতে অভাবের কিছুটা কাটে। কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টারে স্থানাভাব কর্মীদের ভাবিয়ে তুলেছে। তবু সেই স্থানটুকুতেই এই শিশুও মানুষ হচ্ছে। সবাই যে সেখানে মা।

কতদূর থেকে মেয়েরা আসে ভাবাও যায় না। শ্রীরামপুর, রামরাজাতলা, ডায়মণ্ড-হারবার আরও কত দূর থেকে পথ বেয়ে, ট্রেনে, বাসে আসে তারা উপার্জনের সন্ধানে। শ্রীরামপুরের একটি মেয়েকে কর্মী সুনীলা দেবী বলেছিলেন ট্রেন খরচা করে বাঁচবে কতটুকু? তার জন্য করবে এই অক্লান্ত পরিশ্রম? মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল যে সেটুকুতে হবে তার সংসারের কেনাকাটার কিছুটা। হয়তো বাজার থেকে দু'দিন সে কিনতে পারবে মাছ। হয়তো বা শিশুর জন্য আসবে দুধের ছিটে ফোঁটা। নিতান্ত নিঃস্বার্থ আয়োজন বলে সম্ভব হলেই কর্মীরা পারিশ্রমিক বাড়াতে চেষ্টা করেন। এদিকে তৈরী জিনিসের দাম বেশী হলে বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছনে থেকে যাবে। কাজেই লাভের অংশ সীমিত। তবু সেই সামান্য পারিশ্রমিক বৃদ্ধিতে মেয়েদের কত আনন্দ! পুজো বলে সবাইকে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে সুনীলা দেবী সসঙ্কোচে খবরটি পেশ করলেন। মেয়েরা কিন্তু খুশী

শাড়ী ও ব্যাগের সমন্বয় করে সাজানো হচ্ছে

হলেন আশাতীত ভাবে। পাঁচ টাকা কি কম? তাতে তাদের অভাবের শতছিদ্রের যদি একটি দুটিও বন্ধ হয় মন্দ কি?

সুনীলা দেবী বলছিলেন এইসব গৃহস্থ সংসারের লুকিয়ে থাকা মেয়েদের কতগুণ, কত তাদের প্রতিভা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। হাতের কাজ কি চমৎকার। প্রবীণা নীহারকণা মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হলো। রান্নাঘরের মানুষটি। কয়েকটি সন্তানের জননী। পাবনা জেলায় বাপের বাড়ি আর ফরিদপুরে ছিল শ্বশুর ঘর। দুই-ই গেছে। যায়নি শুধু তাঁর অপূর্ব সূচিশিল্প। সারা ভারতবর্ষে এক সময় যে এম্ব্রয়ডারি বা কশিদার কাজ অত্যন্ত উচ্চ মানে এসেছিল তার প্রায় সবটুকুই ছিল পল্লী রমণীর দান। সেই রং-এর অপূর্ব সমন্বয়, সৌন্দর্যের অদ্ভুত সমাবেশ কোন অজানা প্রতিভার স্বীকৃতিতে এই আপাত দৃষ্টিতে সামান্য গৃহস্থ গৃহিণীদের হাতে বিকশিত হয় তারও অশেষ নিদর্শন দেখলাম। বাতিকের কাজ এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। কর্মীরা নির্দেশ দেন, পরিকল্পনা করেন কিন্তু কি অক্লান্ত সাধনা এই মেয়েদের। তার তুলনা নেই।

যাঁরা কাটা কাপড়ের বিভাগে কাটিং করেন তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু বিশেষ শিক্ষা না নিয়েও যাঁরা দক্ষ শিল্পী তাঁদেরও সমান আদর সেখানে। ছেলেদের বুশশার্ট থেকে নিয়ে, মেয়েদের ব্লাউজ, সায়া, ছোটদের ফ্রক ইত্যাদি সব অর্ডার নেওয়া হয়, আবার কেন্দ্রের ছোট্ট দোকান ঘরে (১৫নং কুইন্স পার্ক) তৈরী জিনিসও প্রচুর পাওয়া যায়। পারিশ্রমিক সামান্য। হাতাবিহীন সুতির ব্লাউজের জন্য দিতে হয় মাত্র ১ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পশমের বোনা জিনিসও দেখল ম নানা রকম। নূতনত্বের অভাব
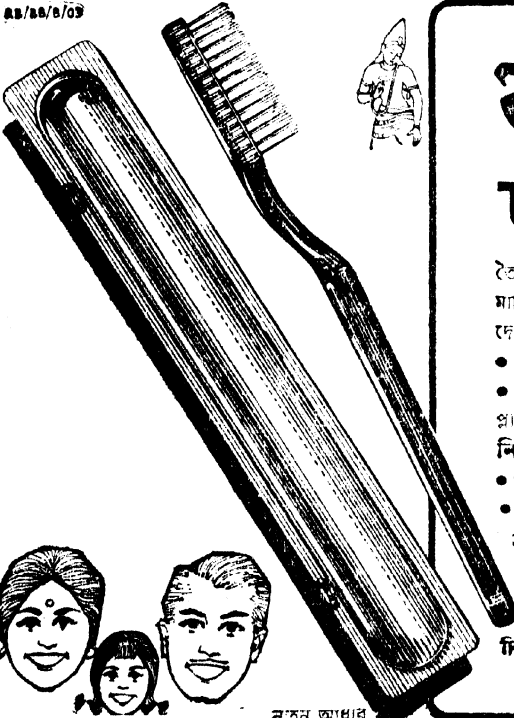
এক সময় নেটের উপর রেশম সুতো দিয়ে লেস তৈরি করার খুব চলন ছিল। এখানে দেখলাম নেটের উপর পশম সুতো দিয়ে সুন্দর গায়ের চাপা তৈরী করেছে মেয়েরা। রঙীন কাপড়ের টুকরো জুড়ে যে নকশাদার নমুনার বাহার হয় তার নিদর্শন দেখেছি বিহারের, উড়িষ্যার পল্লীশিল্পে, তাও যে আবার ২৪ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলের মেয়েরা করে জানা ছিল না। শুনলাম ডায়মণ্ড-হারবার থেকে শিল্পীদল এসেছিল তাদের শিল্পের খবর নিয়ে।

আপাতত নিয়মিত কাজ করা মেয়ে আছে ১৯টি। বাকী ১২১টি মেয়ে কাজ নিয়ে যায়। পারিশ্রমিকও পায় কাজ হিসেব করে। এক সময় ঠিকে কাজ করিয়ে বিক্রি করবার সুযোগ করে দেবার জনাই কেন্দ্রটির পরিকল্পনা হয়েছিল। পরে কর্তৃপক্ষ লক্ষ করলেন এত অর্ডার, এত কাজ নিয়মিত কিছু মেয়েকে কাজে না রাখলে অসুবিধা হতে পারে। কোন কোনও মেয়ে ঠিকে কাজ করে মাসে ১২০।১২৫ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন। এত সুন্দর বকেয়া বা সাদা এমব্রয়ডারী দেখলাম যে লক্ষ্ণৌ চিকনকারির শ্রেষ্ঠ জিনিসের সঙ্গে তুলনা চলে। সক্ষ্ম কাজ, পরিষ্কার হাত হবে মজুরী ভালই পায় মেয়েরা।

২৫ মাস কয়েক আরম্ভ হয়েছে কেন্দ্রটি। এর মধ্যেই যথাসাধ্য উন্নতি করেছেন কর্মীরা। দু একটি বড় রকমের বাধা অতিক্রম করতে পারলেই দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে যাবে এবং মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার নতুন পথের নানা সন্ধান মিলবে আশা করা যায়। এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সাহায্যের উপর ভিত্তি করেই কেন্দ্রের কাজ চলেছে। দীর্ঘ সময় যে সব মেয়েরা কাজ করেন তাদের বিকেলে যে চা এবং জলখাবার দেওয়া হয় সেটুকু পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাতাদের খরচ। স্বর্গীয় কমলচন্দ্র চন্দ্র বলতেন নিম্নমধ্যবিত্তের অবস্থাই বাংলা দেশে সবচেয়ে শোচনীয়। আবার সেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ঘরণীরই জীবন সবচেয়ে বিপর্যস্ত। তাদের জন্য সহানুভূতি বা সাহায্য বা চাঁদার খাতার চেয়ে বেশী দরকার তাদের নিজের উপর নির্ভর করতে শেখা। সেই মহান উদ্দেশ্যের স্মৃতিতেই তাঁর স্ত্রী গৌরী চন্দ্র এবং দুই কন্যা সুনীলা রায় ও নীরা সরকার এই কেন্দ্রের পত্তন করেন। সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন অনেক আত্মীয় বন্ধু। কেউ বা দিলেন আশ্রয়, কেউ টাকা, কেউ সময় ও শিক্ষা। এখনও চালু কেন্দ্রের কেনাকাটা পর্যন্ত কর্মীরা নিজ হাতে করেন। বাজারে ঘুরে কোথায় কি ভাল ও সস্তা তাও খুঁজে ফেরেন তাঁরা নিজে। তবে কাজ বেড়ে যাওয়ায় কিছু মূলধন অর্থের প্রয়োজন, নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করার জন্য একটি

বাতিক এঁদের বৈশিষ্ট্য

গৃহের প্রয়োজন। স্বল্পবিত্ত সংসারের মেয়েরা যদি উপকার পান এবং কেন্দ্র যদি এই দারুণ দুঃসময়ে সামান্য আশাভরসাও কয়েকজনের জীবনে আনতে পারেন তবে নিশ্চয়ই সরকারী সাহায্য আস্তে আস্তে আসবে। হিসেব রাখা থেকে নিয়ে সমস্ত কাজ কর্মীরা নিজেরা দেখছেন আজ কিন্তু ক্রমশ যে পরিকল্পনার পথ ধরে এঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে প্রতিষ্ঠান বড় হবে নিশ্চয়ই। ঘরের বেয়ারা, ব্যক্তিগত যানবাহন হয়তো সবটা কাজ সামলাতে পারবে না।
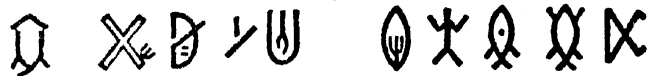
কমল চন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টার দেখে ফিরতে ফিরতে আরও একটি কথা মনে হচ্ছিল। ৮৩/১ বণ্ডেল রোড তো একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকেন্দ্র। ছোট ছোট শহরে মেয়েরা কেন এগিয়ে আসেন না। সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁদের কিছু সমস্যার সমাধান করতে? পল্লী অঞ্চলেও কিছু কাজ সম্ভব। অবশ্য কাজের চেয়ে বিক্রির ব্যবস্থার অসুবিধা সেখানে বেশী। কিন্তু সমবায় প্রথায় ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার সুযোগও তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছে। সমবায় প্রথায় মূলধন সাহায্য সহজে পাওয়া যায়।

ভ্রম সংশোধন

৪৬ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় শিরাণ হাতে ছাপা কাগজ-এর নিয়ম লিখতে গিয়ে একটু ভুল হওয়াতে পাঠক পাঠিকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এদের আসল নামঃ "Shiran Handprinted Papers" (শিরাণ হাতে ছাপা কাগজ)। ছাপা হাতে হয় কিন্তু কাগজ যে-কোনও প্রকার ব্যবহার করা চলে। হাতের তৈরী কাগজই একমাত্র ব্যবহার্য তা নয়। চিমনলাল পেপার কোম্পানীর হাতের তৈরী কাগজের বিভাগ থেকে দুটি মেয়ে আগামী নভেম্বর মাসে কলকাতার ফাইন আর্টস সোসাইটির হলে প্রদর্শনী নিয়ে আসবেন। তখন হাতের ছাপা কাগজ আমাদের ভাল করে দেখবার সুযোগ হবে।

—শ্রীমতী

কোন্ মায়া লাগল চোখে?

☑ সমুদ্রসৈকতে বরবর্ণিনীর উত্তোলিত বাহুলতা?

☑ না, অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার?

দুটোই : কারণ, যে মেয়েরা অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করেন, সমুদ্রের ধারে তাঁরা সব সময়ই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন। আজকের দিনে প্রকৃত সুন্দরী হতে গেলে মুখ, হাত, পা, বাহুমূল রাখতে হবে লোমজঞ্জালহীন—এ তাঁরা জানেন। তাঁদের পছন্দ মৃদু সুরভিত অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার ক্রীম, যার কমনীয় রমণীয় ছোঁয়ায় সমস্ত অবাঞ্ছিত লোম নির্মূল হয়। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই···পোড়া-জলো খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকার ভয় নেই। শুধু একটু ক্রীম বুলিয়ে নেওয়া—ব্যস, দেখতে দেখতে আপনার চামড়ায় আসবে রেশমী চেকনাই। অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করুন। সমুদ্রসৈকতে আপনাকেও তাহলে লোকে চেয়ে চেয়ে দেখবে।

রমণীয় রূপে লোম

নির্মূল করবার ক্রীম

Registered User: Geoffrey Manner & Co. Ltd.

CMGM-9AF 8N

জ্যোতিষ্কের জন্ম, স্থিতি, লয়

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লা প্লাস একবার যখন নেপোলিয়নের কাছে সৌর জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর বস্তুবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন তখন নেপোলিয়ন প্রশ্ন করলেন, "আপনার এই তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বরের ভূমিকাটা কোন্‌খানে?"

লা প্লাস জবাব দিয়েছিলেন, "আমার তত্ত্ব খাড়া করার জন্য ঈশ্বর বলে কোন শক্তির অস্তিত্ব ধরে নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি।"

তার ১০০ বছর আগে নিউটন তাঁর শেষ বয়সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে গ্রহগুলির সূর্য প্রদক্ষিণের পিছনে অন্য কোন এক শক্তির অদৃশ্য পরিচালিকা শক্তির কল্পনা করেছিলেন। সেই শক্তিটি গ্রহগুলিকে একবার ধাক্কা দিয়ে ঘুরিয়ে দেবার পর সেগুলি লাট্টুর মত আজও ঘুরপাক খাচ্ছে। তাঁর এই ধারণা তিনি প্রকাশ করেন ওয়েস্টমিনিস্টার গির্জার প্রধান পুরোহিতের কাছে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে এ যুগে শুধু সৌরজগত কেন, মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর হয়েছে নতুন আলোকপাত। নিউটনের বর্ণিত 'অন্য এক শক্তির প্রথম ধাক্কার' সত্যতা স্বীকার করে নিলে এটাও মেনে নিতে হবে যে, মহাবিশ্বের সর্বত্র পরিচালিকা শক্তির গতি হবে একদিকে কারণ ধাক্কাটা তো সবকিছুকে একটাই দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু আজ জানা গিয়েছে যে সবকিছু একদিকে ঘোরে না। যাই হোক এখন যে তত্ত্বটি খাড়া করা হয়েছে সেটি অনুসারে মহাবিশ্ব স্পন্দনশীল অর্থাৎ একবার প্রসারিত হচ্ছে একবার হচ্ছে সংকুচিত। প্রতিটি স্পন্দন থেকেই জন্মলাভ করছে নতুন নতুন গ্রহনক্ষত্র, পুরানো নীহারিকা ও তারা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করছে নতুন মহাজাগতিক বাষ্প-মেঘপুঞ্জ ও ছোট ছোট তারা যেগুলিকে বলা হয় "শাদা বামন" (White Dwarf)।

মহাশূন্যের যেখানে বাষ্প ও ধূলিকণা ঘন হতে থাকে সেখানেই জমাট বাঁধে নতুন নক্ষত্র। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভিক্টর আম্বার্তসুমিয়ান বলছেন যে, আমাদের চোখের সামনে সদাসর্বদা নতুন নতুন নক্ষত্র বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। এমন সব অতিঘন বস্তুর বিস্ফোরণ ভাঙগনের মধ্য দিয়ে নতুন তারার জন্ম হয় যেগুলির ঘনমান হাজার সূর্যের সমান। কাল-পুরুষের (ওরায়ন) নীহারিকার নক্ষত্রগুলি পরীক্ষা করে হালে আচার্য আল্লা মাসেভিচ্‌ও একই কথা বলেছেন।

নবজাত নক্ষত্র ক্রমে ক্রমে বাষ্পমেঘ থেকে নিজেকে স্বাতন্ত্র করে নেবার সময় মহাকর্ষের চাপে গরম হয়ে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠতে থাকে। তারপর মহাকর্ষ চাপ জাত উত্তাপ বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছায় যখন শুরু হয় পারমাণবিক শক্তির খেলা যা নক্ষত্রটিকে একটি তাপ পারমাণবিক যন্ত্রে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ সেটির মধ্যে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীণগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে প্রচন্ড শক্তি মুক্ত করে দেয়। সেটাই হচ্ছে নক্ষত্রের পরিণত বয়স, যখন মহাকর্ষ ও অভ্যন্তরীণ বাষ্প চাপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এক ভারসাম্য। দহনক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন, হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমাগত শক্তি ছাড়তে থাকে এবং নক্ষত্রটি উজ্জ্বল আলো দিতে থাকে। আমাদের সূর্যের মত নক্ষত্রে এই প্রক্রিয়া চলে ১০০০ কোটি বছর পর্যন্ত (সূর্য তার আধাআধি সময় পার হয়েছে)। আর যে সব নক্ষত্রের ঘনমান সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি সেগুলিতে এই প্রক্রিয়ার মেয়াদ অনেক কম বলে সেগুলির অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্তি ঘটে।

পরবর্তী পর্যায়ে নক্ষত্রের মর্মস্থলে হাইড্রোজেন পুড়ে শেষ হয়ে গেলে হিলিয়ামে টান পড়ে। তখন সেখানে অপেক্ষাকৃত ভারি মূল পদার্থগুলি তৈরি

সূর্যের একাংশ। পাশের সাদা গোলকটি সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর আয়তনের প্রতীক

হতে থাকে এবং কেন্দ্রের কাছে তাপমাত্রা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই অবস্থায় পারমাণবিক ইন্ধনের অভাবে নক্ষত্রের মর্মস্থল চ্যাপ্টা হতে থাকে এবং তার আকারের পরিবর্তন শুরু হয় বিকিরণের ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য। তখন নক্ষত্রের বাইরের খোল ফুলে উঠে এবং উপরের তাপমাত্রা কমে তার রং লালচে হতে থাকে। তখন তাকে বলা হয় "লালদৈত্য" (Red giant)।

এর পর নক্ষত্রের শুরু হয় পড়তি বয়েস অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্ব ও জরা। তখন আর দহনের কোন খোরাক থাকে না। তার মর্মকেন্দ্রে শক্তির পারমাণবিক উৎস শেষ হয়ে যায় এবং লৌহ পরমাণুগুলি জ্বলে না। এইটিই হচ্ছে তার সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় অবস্থা। এই অবস্থায় নক্ষত্রটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে পারে তার বহিরাবরণ খসিয়ে। কিম্বা সে রকম ভয়ংকর কিছু না ঘটে খোলটি আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে যেতে পারে যার ফলে নক্ষত্রের জীবনের স্থিতিসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এই দুই রকমের প্রক্রিয়াই বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন কিন্তু এগুলি কি কারণে ঘটে তা তাঁরা এখনো বলতে পারেন না, কারণ এইসব মহাজাগতিক ভাঙ্গা-গড়ার পর্ব ঘটে বহু লক্ষ বছর ধরে কিন্তু পৃথিবীর জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীর আয়ু ১০০ বছরও নয় অর্থাৎ মহাকালের তুলনায় এক বিদ্যুৎ চমকের সমান।

বিবর্তনের ফলে ফেটে না গিয়ে নক্ষত্রটির বস্তুকণাগুলিকে যদি কোটি কোটি বছর পরে নতুন তারার জন্ম দিতে হয় তাহলে তাকে তার অন্তিম দশায় বেঁচে থাকতে হবে বহুকাল। সেই দশাটি কি রকম?

সেই দশায় ভিতরে বাষ্পের চাপ কমে গিয়ে নক্ষত্রের বস্তু আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকবে যার ফলে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবে মহাকর্ষের আধিপত্য। মহাকর্ষের চাপ সেখানে হবে এত বেশি যে, ১ ঘন সেন্টিমিটার নাক্ষত্র পদার্থের ওজন দাঁড়াবে প্রায় ১০০ টন। সেই প্রচণ্ড শক্তি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের খোল চ্যাপটা করে দিয়ে সেগুলিকে 'স্বাধীন' করে দেবে। শেষে আবার একটা স্থিতাবস্থা আসে যখন তারাটি রূপান্তরিত হয় 'শাদা বামনে'। বহু কোটি বছর বেঁচে থেকে সে শাদা আলো বিকীর্ণ করে যাবে। তার পৃষ্ঠে তাপমাত্রা দাঁড়ায় ১০ হাজার ডিগ্রী। আমাদের সূর্য ঐ ধরনের 'শাদা বামন' হয়ে যাবে। একমাত্র সূর্যের মত ঘনমানের তারার পক্ষেই শাদা বামনে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব।

কোন নক্ষত্রের ঘনমান যদি সূর্যের দ্বিগুণ হয়, তাহলে তার উত্তাপ ত্যাগ করার সময় মহাকর্ষের চাপ এত বেশি প্রচণ্ড হয় যার ফলে তার এক ঘন সেন্টিমিটার বস্তুর ওজন ১০ কোটি টন হতে পারে। ইলেকট্রন-গুলি সেই প্রচণ্ড চাপ সইতে পারে না কিন্তু প্রোটন ও নিউট্রন এত বেশি নমনীয় যে, সেগুলি মহাকর্ষের ঐ চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তারাটির ভেঙে পড়া রুখতে পারে। কিন্তু সেই তারার ব্যাস শেষ পর্যন্ত ১০।১২ কিলোমিটার হয়ে দাঁড়ায়। সেগুলিকে বলা হয় 'নিউট্রন নক্ষত্র' বা 'বেরিয়ন' নক্ষত্র। উদ্ভবের সময় সেগুলির তাপমাত্রা কোটি ডিগ্রী হতে পারে কিন্তু হাজার বছরের মধ্যে সেগুলির দ্যুতি ম্লান হয়ে যায়। তখন সেগুলিকে আর দেখতে পাওয়া যায় না; কারণ, সেই তাপমাত্রায় সেগুলি যে এক্স-রশ্মি বিকীর্ণ করে তা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ঐ ক্ষুদে তারাগুলির মাঝখানটায় রয়েছে নিউট্রন-অতি তরল অবস্থায়। তারপরের স্তরের তরলতা স্বাভাবিক এবং সবচেয়ে বাইরের স্তর প্লাজমা দিয়ে তৈরি। কেউ কেউ বলেন যে, সূর্যেরও নাকি একদিন ঐ অবস্থা হবে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

তুষার ধসের মধ্যে দিয়ে যাত্রা

দিল্লির ডায়েরি

আমাদের পাহাড়ে-ওঠা পর্বত-জেতা ছেলেরা। নেহাত সাদামাঠা, শস্যশ্যামলা সমতলভূমি বাঙলা মায়ের ছেলেরা। মুখে একগাল দাড়ি, একগাল হাসি। চক্ষু অনেকের রক্তবর্ণ, ক্রোধে নয়, পরিশ্রম ক্লান্তি আর বোধ হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেনের অভাবে। কারো দাড়িগোঁফ মানানসই· কারোর ছেলেমানসেমি। অর্থাৎ, অগস্ট মাসের ২৯ থেকে যেদিন হরিদ্বারে আমার সঙ্গে দেখা—একুনে ৪২ দিন—সবই পাহাড়-পর্বতে এমন মেতে গেল যে, দাড়ি গোঁফ কামানোর সময় কোথায়। সত্যি, যে পাহাড় চড়ে সেই দাড়ি গজায়, যদিও উল্টোটা সত্যি নয়। তবে অনেকে আছে, যেমন আমাদের পাহাড়-প্রেমী ছেলেদের ভিতর সাংবাদিক ধ্রুব মজুমদার, তাদের বদন-কেশ গজায় কি না-গজায়। তাতে বড়জোর প্রমাণ হয়, আমরা অনেকে মংগোল রক্তে "রক্তিয়ান"।

সেই এক-গাল-দাড়ি-হাসি ছেলেদের সঙ্গে দিল্লি থেকে দেড়শো মাইল মোটর দৌড়ে দেখা পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে যেখানে হরকি-গৌরির গঙ্গা শীতলবুকে বয়ে যায় নিরন্তর, যেখানে সাধু সন্ন্যাসী, চোর, বাটপাড় আর বদমায়েশরা বিশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চায় নিচ থেকে উপরে। আর ওখান থেকে পনেরো মাইল ঋষিকেশ, যেখানে কেশ আছে প্রচুর কিন্তু ঋষিরা গায়েব।

পাহাড়ে ছেলেদের সঙ্গে মিল পেলাম ঋষিকেশ যেতে। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ যাওয়ার পথে মোটরযান ট্যাক্স-দেওয়ার আগল-পথ। দাঁড়ালাম পাহাড়ে-ছেলেদের উপস্থিতি-আশায় আমি আর অতি-সুযোগ্য সহকর্মী সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ। ইনিও একটি পাহাড়-প্রেমী সাংবাদিক, যার পাহাড় দেখা মাত্র দাড়ি গজায় এক ফুট! মোটরগাড়ি দাঁড়াল কি না-দাঁড়াল, এক ভিক্ষুক রমণী অভ্যর্থনার জন্যে হাজির। পরিষ্কার ইংরিজী ভাষায় উনি আমাদের দুজনকে ভাষিত করলেন : "প্লিজ! হেলপ মি। গিভ্ মি হেলপ। ফোর আনা পাইস (চার আনা পয়সা), ফোর আনা পাইস্ গিভ্ প্লিজ।"

একজন দরিদ্র বিধবা। মুখচোখ ক্লান্ত। গলায় ঝুলছে একটি ছোট্ট ফটোগ্রাফ, কোনো একজন সাধু-সন্ত ব্যক্তির। "প্লিজ ফোর আনা পাইস্। নট মোর প্লিজ।" আমি বেপ্লিজড হয়ে ফোর আনা পাইসের চাইতে বেশি কিছুই তার হাতে দিলাম। উনি তখনও বলছেন : আই নো নট হোয়াট ইউওর মাদার টং, সো আই স্পিক ইংলিশ। বললাম, মা আমরা বাঙালী। "ও, বাঙালী? তা বাবা, তোমরা কোত্থেকে?" ইংরিজী আর নেই। বিধবা ভিখারিনী বাঙালী।

দুয়েকটা প্রশ্নাত্তে বললেন, একদা বাড়ি ছিল "খুলেন্যা" জেলায়। বাবা সরকারী কাজ করতেন পাটনায়। "ওখানেই· একটু-আধটু লেখপড়া শিখেছিলাম।" বিয়ে হয়েছিল একজন পুলিসের সঙ্গে। তাকে খুন করে গুণ্ডা বদমায়েশেরা। "তারপর থেকে আমার না আছে ঘর, না আছে সংসার। আছেন শুধু ইনি।" বলে আঙুল দিয়ে দেখালেন সাধুসন্ত মহাশয়ের ফটোগ্রাফটি। গলায় একটি দড়ি থেকে ঝুলছে, মোটা নয় সরু দড়ি। বিধবা ভিখারিনীর ঋষিকেশের পাথেয়, হিমালয়ের পাথেয় তার বিশ্বাস; তার ফেইথ ঐ ছোট্ট একটি ফটো-গ্রাফে। বিশ্বাস, আস্থা, সমর্পণ—হয়তো এই তার জীবনের সম্বল।

আমাদের পাহাড়ে-ছেলেদের খোঁজে আমরা দুজনে আস্তানা নিলাম দেরাদুনের একটা নামকরা হোটেলে। মোটসোটা

মানাতে পর্বতারোহীদের হাসিখুশীভাব

মানাতে "তুষারমানব" ও শেরপা

শেঠজী (আসলে পেশোয়ারী হিন্দু) হোটেলের মালিক। বিস্তর পয়সা। তার অপিস ঘরে ঝুলছে সাধুসন্তের, দীক্ষা-মন্ত্র গুরুদেবের ফটোগ্রাফ। অন্য দেয়ালে শেঠজীর সঙ্গে নেহরুজীর ফটো। তারও জীবন পাথেয় আস্থা বিশ্বাস।

আর ঐতো আস্থা-বিশ্বাস-আত্মপ্রত্যয় যা কিনা পথ দেখাল বিপদসঙ্কুল মানা পর্বত অভিযানে, পর্বত শিখর বিজয়ে, আর পাহাড়ের প্রতিশোধ কামনার শিকারগ্রস্থ আহত মানা-কামেত অভিযাত্রীদের জীবন-রক্ষায়। সব কিছুর গোড়াতেই ঐ আস্থা আর বিশ্বাস। এবং মানা অভিযাত্রীদের নেতা বিশ্বদেব মশায়ও যে বিশ্বাস, তা একেবারে অ্যাকসিডেনট নাও হতে পারে, কারণ তার দলের ছেলেরাও এগিয়ে গেছে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় পথ ধরে। তা না হলে উত্তর দিন একটা প্রশ্নের। প্রাণেশ চক্রবর্তী, প্যাকাটির মতো যুবক বাঙালী হাতের তেলোয় জীবন নিয়ে কী করে সৃষ্টি করল অভিযান ইতিহাস? সে আর তার তিন শেরপা সহচর তুফান, বরফ, পাথর আর মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে উঠে গেল ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু মানা পর্বত শিখরে। মানার মানা কে মানে?

কিন্তু আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। একুশে অগাস্ট যখন এদের বিদায় দিয়েছিলাম হরিদ্বারে মানা-যাওয়ার পথে, তখন বলে-ছিলাম, "যদি বিজয়ী হও, আবার আসব এখানে তোমাদের অভ্যর্থনায়।" ভায়ারা বিজয়ী হল ঠিকই (১৯শে সেপ্টেম্বর), কিন্তু তাদের হদিশ নেই। কে যে কোথায়, কখন আসবে কোন্ পথে, নো পাত্তা, হঠাৎ যেন কোথায় হারিয়ে গেল বাঙলা দেশের দস্যিছেলেরা। আমরা হয়রান।

হয়রান শুধু কি আমরা? ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা (ইণ্ডিয়ান মাউন-টেনিয়ারিং ফাউনডেসন), তার সভাপতি শ্রীসারিন ও সচিব শ্রী আর এম চক্রবর্তী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী আর মুখ্য সচিব শ্রী কে কে দাস, সবাই হয়রান। মানা দলের কে কে দুর্ঘটনায়

আহত, তারা কী দশায় আছেন, কোথায় নামবে হেলিকপ্টার, কোথায় যাবে সীমান্ত রক্ষীদের দল ও আমাদের সৈন্য বিভাগের লোকেরা—সকলেই হয়রান। অভিযাত্রীদের আত্মীয়স্বজনরা টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন। ইতিমধ্যে গৌরভায়া উড়ে এল কলকাতা থেকে আর বিশ্রামহীন দৌড়ে মোটর নিয়ে পালাম থেকে চলে গেল বেরিলি, যেখানে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চারজন আহত শেরপা। আবার ঐদিনই সে এল ফিরে, একেবারে যাকে বলে রিপোর্টারের দৌড়ে।

তারপর আমাদের দ্বিতীয় ক্যাম্প হরিদ্বার। তৃতীয় ক্যাম্প ঋষিকেশ। চতুর্থ ক্যাম্প দেরাদুন। আমরা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ করছি, আবার উল্টোটাও—চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয়। অভিযাত্রীরা কবে এসে পৌঁছবে, জানবার উপায় নেই। অ্যামবেসেডার গাড়ির চাকা ঘায়েল হল দু'বার। তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করেও দিল্লির টেলিফোন পাওয়া গেল না। নিরুপায় হয়ে ঋষিকেশের সুভায় রেস্তোরাঁর সুভাষচন্দ্র (অ-বাঙালী) আমাদের নিয়ে গেলেন এক আর্মি ক্যাম্পে। সেখানে সাক্ষাৎ নায়েক-সুবেদার ভৌমিকের সঙ্গে। ঘণ্টা দুয়েক পরিশ্রম করে শেষটায় উনি একটা "মেসেজ" নিয়ে গেলেন সিগন্যাল তাঁবুতে। কিন্তু মুশকিল এই যে, খবর আদানপ্রদানের বিশেষ কোনো চ্যানেল (যথা ইউনিটের নাম ইত্যাদি) আগে থেকে স্থির না থাকলে সৈন্য বিভাগ থেকে যোগাযোগ সাধন করা অত্যন্ত কঠিন।

ফলাফলের আশায় থাকতে থাকতে আমরা আবার উপস্থিত দ্বিতীয় ক্যাম্পে, এবার পোস্ট অফিসে। বললাম, আমরা টেলিফোন করব যোশীমঠে পোস্ট মাস্টার সাহেবকে। "টেলিফোন নহি হোগা; বাবুজী খানেকো গায়া।" "নহি জী, হম্ লোগ্ কুছ নহি জানতা, টেলিফোন তুরন্ত চাহিয়ে, ওঁর বুক করিয়ে"। "ক্যায়সা করেংগে? বাবুজী খানা খানেকো গায়া"। আমরা দুজনে বেশ একটু গলা চড়িয়ে আমাদের প্রয়োজনের তাগিদকে ভাষা দিচ্ছিলাম। হয়তো অমিষ্ট ভাষার গুণেই "বাবুজী" যেতে যেতে ফিরে এলেন, এবং আমাদের কল্ বুক্ করে খানা খানেকো লিয়ে চলে গেলেন। পোস্ট মাস্টার মশায়কে পাওয়া গেল এক ঘণ্টা পরে, আর উনি জানালেন যে, অভিযাত্রীরা হাজির আছে যোশীমঠে এবং সেই দিন বিকেলে রওনা হবে।

আবার চতুর্থ ক্যাম্প, কারণ, থাকার জায়গা ভাল নেই দ্বিতীয় তৃতীয় ক্যাম্পে। ওখান থেকে টেলিফোন দিল্লি, হরিদ্বার ইত্যাদি। জানা গেল, অভিযাত্রীরা তার করেছে, তারা পৌঁছবে ৩০শে সেপ্টেম্বর। সেদিন বিকেলে দ্বিতীয় ক্যাম্পে এসে সাক্ষাৎ। পাহাড়-চড়া ছেলেরা ক্লান্তিতে ঢলে পড়েছে একটি বিশ্রামশালায়। হঠাৎ মনে হল, এদের ভিতরেও যেন পাহাড়ের সৌনতা। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। তারপরই একেবারে কোলাকুলি আর অভ্যর্থনার কলরবে মুখর বিশ্রামশালার কক্ষটি।

কিছুকাল কাটিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে চললাম আমাদের বেস্ ক্যাম্প দিল্লিতে। ঝড়জল, রাত্রি আর অমনি সময়ে রুড়কির খালের ধারে চাকা গেল চুপসে। দেশলাই জ্বালিয়ে চাকা লাগল। শহরে এসে মিস্ত্রীকে বাড়ি থেকে এনে চাকা মেরামত। তারপর দৌড় দৌড়, আর বেস্ ক্যাম্পে আমরা এসে পৌঁছলাম, অর্থাৎ আমাদের অভীষ্ট শিখরে, রাত দুটোয়। আমাদের এই অভিযান শেষ।

—খগেন দে সরকার

এই কৌটোটি খুলুন....

এক প্রলেপ তুলে নিন..

রূপ যেন অপরূপ হয়ে উঠবে!

ল্যাক্‌মের এই অতি-সূক্ষ্ম যাদুমন্ত্র আপনার ত্বকের সঙ্গে অপূর্বভাবে মিশে যায় (আপনার গায়ের বর্ণছটার সঙ্গে মিলে যায়), আপনি অবাক হয়ে ভাববেন এই নতুন আপনিই সত্যিকারের আপনি কিনা। খুঁত সব মিলিয়ে গিয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠে। চকচকে ভাবটা কেটে যায়। রোমকূপগুলি অদৃশ্য হয়ে ওঠে। ম্লান ছায়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সহসা আপনার সমস্ত মুখখানি কমনীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে··· আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই সূক্ষ্ম প্রলেপ একটুও এঁটেল হয়ে ওঠে না···আপনার ত্বককে সারাদিন কোমল, মসৃণ, স্নিগ্ধ রাখে। প্রতিদিন? তা' নির্ভর করে আপনার ওপর···

রূপচর্চার সঙ্কেত

চটপট কমনীয়তার প্রলেপের জন্য ল্যাক্‌মে কম্প্যাক্ট ব্যবহার করুন—প্রেস্-করা পাউডারের এই মসৃণ কেকটি প্রত্যেক সুন্দরী মহিলার হ্যাণ্ডব্যাগে থাকবেই থাকবে।

রূপসী ইয়াসমিন দাজি—মিস্ ইণ্ডিয়া ১৯৬৬ ও মিস্ ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার রানার-আপ
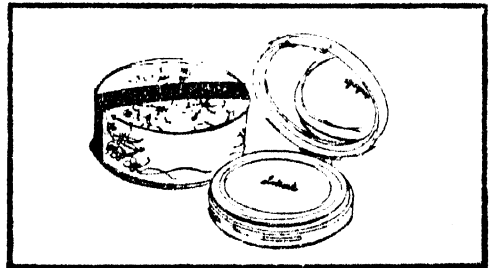
কলকাতার ডায়েরি

অবশেষে সেই 'সুপার মার্কেট' হল। সরকারকে ধন্যবাদ, সার্কুলার রেল, স্টেডিয়াম কিংবা সাবওয়ে'র মত কাগজে-কলমেই থাকেনি, চার মাসের মাথায় নানা রকমের পসরা সাজিয়ে হাজির হয়েছে।

কিন্তু নাম? 'সমবায়িকা' মুখে মুখে চলার পক্ষে উপযুক্ত নয়। 'বড়বাজার' তো চলবে না, তবে কি স্কুলের নাম আর বাড়ির নাম আলাদা রাখার মত 'সুপার মার্কেট'ই মুখচলতি হয়ে পড়বে? কেউ কেউ বলছেন, তার চেয়ে বরং বলা হোক 'সুপার বাজার'। মন্দ নয়, 'হেড পণ্ডিত' আর 'হুকপকেটে'র মত আর-একটি মিশ্র শব্দ আমদানি হবে বাংলা ভাষায়, বলতেও জিবের কসরত দেখাতে হবে না।

'মহাবিপণি' বা 'বৃহৎ বিপণি' বলা যায় কিনা, তা-ও অনেকে ভাবছেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক নাম যাই দেওয়া হোক, শেষ-মেষ হয়ত ওই 'সুপার মার্কেট'ই বহাল থাকবে। পাড়ার ছেলে পিন্টুর আসল নাম যে রাজীবলোচন এ খবর ক'জন রাখে। তেমনি সমবায়িকা খাতাপত্রেই তোলা থাকবে, সবাই বলবেন (বলছেনও), 'চলুন, সুপার মার্কেট ঘুরে আসি।'

সে যাই হোক, লিন্ডসে স্ট্রীটের এই বহুতল বাড়ির একতলায় ঢুকে বারবার মনে হচ্ছিল, 'উলওয়ার্থ' আর 'সীয়ার্স' নামধারী বিদেশী দোকানের কথা। তিন-চারতলা জুড়ে এলাহি কারবার, পাওয়া যায় না, এমন জিনিস নেই। আমাদের এই সমাবায়িকাও সেই আদলে, তবে মিনিয়েচার মডেলের। তাছাড়া, দোকান খুললে কী হবে, এখনও সব জিনিস আসেনি। যেমন সবজি এবং মাছ। আর যা আছে, তা-ও বাড়ন্ত। চাহিদা এত বেশী, পলকে ফুরিয়ে যায়। দাম অবশ্য কিছু সস্তা।

সবচেয়ে বড় কথা, দোকান সাজানো ভালোই। দেয়ালের রঙ এবং আলোর বিন্যাসে সংগতি আছে। আছে ঘোরাফেরার মত ফাঁকা জায়গা। সার সার আয়নাও ফিট করা চারধারে। এই আইডিয়াটা মন্দ নয়, তবে স্বদেশী আয়নার এমনই বাহাদুরি যে, নিজের মুখ চেনা যায় না, কেমন যেন আঁকাবাঁকা ধরনের হয়ে যায়, মোটর গাড়ির চাকার গোল চাকতিতে চোখ পড়লে যেমন দেখায়।

উপরি পাওনা হল, কড়িতে বাঘের দুধ না মিলুক, ওখানেই কফি মেলে। বাজার করে করে ক্লান্ত হলে কোণায় বসে কাপে চুমুক দেওয়া যায়। এবং হলফ করে বলতে পারি, ও-দামে সাহেব পাড়ার কোথাও কফি মিলবে না।

তবে কফি পাওয়াটাই তো আসল ব্যাপার নয়, সুপার মার্কেটকে আর-একটি নিউ মার্কেট বানানোও কাজের কথা নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালীদের অবস্থার কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়চড় হল না এই দোকান খুলেও। আসল যেটা দরকার, সেই শাক-সবজি আর মাছের এখনও পাত্তা নেই। আর অন্য জিনিস কিছু সস্তায় যদি-বা পাওয়া যায়, সেই লাভের গুড় ট্যাকসি ভাড়াতেই বেরিয়ে যাবে। দোকানটা উত্তর বা দক্ষিণ কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ায় নয়, খাস সাহেব পাড়ায়। সেখান থেকে বাজার করে থলি হাতে ট্রামে-বাসে ওঠা দারদানেলিস পার হওয়ার চেয়েও দুঃসাহসিক ব্যাপার।

তবে হ্যাঁ, আগেই বলেছি, যাঁরা গাড়ি হাঁকিয়ে নিউ মার্কেটে বাজার করতে আসেন, তাঁদের কাছে সুপার মার্কেট, থুড়ি সমবায়িকা সত্যিসত্যিই আনন্দ সংবাদ।

একজনের বাড়ি ওয়েলসে, অন্য জনের অস্ট্রেলিয়ায়। দুজনে দেখা হল সিডনীর এক মধুযামিনীতে। অতঃপর যা হয়—বিয়ে। এবং বিয়ের পর হনিমুন।

না, তাঁদের হনিমুন অন্য দশজনের মত নয়। এমনকি, আমার যে কিপটে বন্ধু পয়সা বাঁচাতে একা একাই হনিমুনে গিয়েছিল, তার মতও না। রবীন আর পামেলা বিনোবা ভাবেকে হার মানাতে পায়ে হেঁটেই তাঁদের মধুচন্দ্রযাত্রা শুরু করেছে। তাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, গ্রীস যুগোশ্লাভিয়া হয়ে যাবে লণ্ডন।

গত সপ্তাহে ওরা দুজনেই পৌঁছেছে কলকাতায়। আছে দক্ষিণ কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। এবং ঘুরতে ঘুরতে সেদিন দুজনেই হঠাৎ হাজির আমাদের অফিসে। রবীনের চোখে কৌতূহল, পামেলার চোখে মোহিনী মায়া।

এই লাফাযাত্রী দম্পতির কলকাতা কেমন লেগেছে জিগগেস করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উত্তরটা অভাবিত হয় নি। অন্য দশজন বিদেশী যেমন বলেন, ওরাও তেমনি কোরাসে গলা মিলিয়ে সেই একই উচ্ছ্বাসে বলেছেন, 'চমৎকার, ওয়ানডারফুল সিটি।' এই ওয়ানডারফুলত্বের কারণ কলকাতা বড়ই আতিথেয়পরায়ণ।

অতি উত্তম কথা, সুন্দরী বিদেশিনীর মুখে এই প্রশংসা শুনে আমরা ক্ষণিকের জন্য অন্তত ট্রামবাসের ভিড়ে পিষ্ট, মিছিলে ধর্মঘটে অতিষ্ঠ নগরবাসের কথা ভুলতে পারব।

✻

লোকসংগীতশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর জীবনে অনেক সম্মান জুটেছে। দেশে-বিদেশে ঘুরেছনও বিস্তর। বাকি ছিল ইংল্যাণ্ড—আমাদের ভূতপূর্ব জমিদারের দেশ। এবারে সেখান থেকে ডাক এসেছে তাঁর। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে তিনি এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় লণ্ডন গেলেন। সঙ্গে সঙ্গতিয়া রাধাকান্ত নন্দী। নেহরু স্মৃতি ভাণ্ডারে টাকা তুলতে কয়েকটি খয়রাতি অনুষ্ঠানে ও'রা গান গাইবেন।

শ্রীচৌধুরী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন দোতারা ও একতারা। সহজেই অনুমান করতে পারি দোতারার পিড়িং পিড়িং আওয়াজের সঙ্গে নদীর জল নাচানো, আকাশের নীল-কাঁপানো গলায় পূব বাংলার গান গেয়ে তিনি গোটা ইংল্যান্ড মাত করে দিয়ে আসবেন।

নির্মলবাবুকে সাবধান করে দিয়েছি রাস্তাঘাটে যেন তিনি গান না ধরেন। লনডনের পুলিস বড় কড়া। ১৯৫৫ সালে ওয়ারসর পথে তিনি গান ধরেছিলেন বলে হাজার হাজার লোকের ভিড়ে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে যায়।

চাণক্য

ইন্দ্রিয় বিলাসী চিত্রকর তুলুস লোত্রেক

শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর শিল্পের কোনোই যোগ নেই। অর্থাৎ, সারাজীবন যে লোকটা ছা-পোষা বাঙালীর মত জীবন কাটিয়ে গেল সে লোকটারই ছবিতে চূড়ান্ত অস্থিরতা, উড়নচণ্ডি-মেজাজ। এই আয়রনির উদাহরণ বিশ শতকে এতই পর্যাপ্ত যে আজ সেটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু তুলুস্-লোত্রেকের ছবি দেখে তাঁর যে জীবন কল্পনা করতে ভালো লাগে তার সঙ্গে সত্যের হুবহু মিল দেখলে অবাক হবেন।—যেহেতু এই চিত্রকরের জীবন এবং শিল্পকর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটা অন্যটা বলে দেয়, সেহেতু আজকের প্রবন্ধে তাঁর জীবন তুলে ধরলেই বোধ হয় তাঁর শিল্পীসত্তা সর্বাপেক্ষা প্রকাশমান উঠবে।—জীবন দিয়েই আরম্ভ করছি তাই।

রক্ত গভীর নীল কারণ কাউন্ট আলফ'স দ্য লোত্রেক-মঁফা এক নিশ্বাসে তেরো শতক অবধি পেছিয়ে যেতে পারতেন তাঁর বংশ বিবরণীতে, কাউন্টেসও কম বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন না (কিন্তু হায়রে, তাদেরই ছেলের কত পুত্রকন্যার মাত্রা জানতই যে বাবাটি কে—ওই খোঁড়া আর্টিস্ট না তার পরের দিন যে এসেছিল)—এদেরই শিশু হেন্রি তুলুস্-লোত্রেক ১৮৬৪ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সে এ্যালবাইতে জন্মান। হেন্রি পেয়েছিল বংশজাত জমিদারী মেজাজ তাই ছেলেবেলা থেকেই তার ঘোড়ার শখ, শিকারে ঝোঁক, আমোদে মন। কিন্তু বালক বয়সের চাঞ্চল্যে দু' দুবার দুর্ঘটনা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল—ঘোড়া থেকে পড়ে চিরকালের মত খঞ্জ হেন্রি তড়িংগতি-অশ্ব এ'কে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে লাগলেন। হেন্রির বাবা যে রকম বংশ-সচেতন লোক হয়তো হেন্রিকে বন্দী করতেন শ্যাতোর-র (Chatteaw) একেবারে উপরের তলায় যাতে খোঁড়া ছেলেকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দিতে না হয়, কিন্তু "আর্টের" প্রতি অনুরাগ যেহেতু তখন আভিজাত্যের মার্কা তাই পরিবারে সত্যি একজন শিল্পী জন্মেছে সে কথাটা প্রচার না করে পারলেন না, অতএব টুলুস্-লোত্রেক ক্রাউচ হাতে ছবি আঁকার স্কুলে যেতে আরম্ভ করলেন।

তেইশ বছর বয়সে হেন্রি প্যারিসে এসে স্বাধীন চিত্রকারের জীবন আরম্ভ করেন। ম'মার্তের আবহাওয়ায় পড়ার ফলে শিল্পের ইতিহাসে এক দুর্লভ ঘটনা ঘটল, আলফ'সের কাউন্ট, অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাবান শিল্পী তুলুস্-লোত্রেক, যার দু'হাতেরই নিচে ক্রাউচ, কিন্তু বংশ মর্যাদা আর গুণের গরিমায় উচ্চঘরের কন্যাদের লোভনীয় পাত্র, বেছে নিলেন "নিচের মহল" : ছবির বিষয় হ'ল, পাপ, ক্লেদজ কুসুম, নিশাচরের জীবন, বিকৃত মানুষ, যন্ত্রণা। কিন্তু এসব তাঁর দূর থেকে দেখা অভিজ্ঞতা নয়—তিনি প্যারিসের রাত্রের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন; আড্ডা ছিল সস্তা-সুঁড়িখানার নাচিয়েদের আসরে, রাত্রিযাপন হ'ত বহুবল্লভার বিছানায়, দিনের বেলায় সময় কাটত রেসের মাঠে। তুলুস্-লোত্রেকের শিল্পী জীবনের

জেন আব্রিল

ছাড়া এই সময়টা, এতদিনে তার বয়স পঁচিশ। অসাধারণ সব পোস্টার আঁকছেন, তেলছবি আর লিথোগ্রাফের জুড়ি নেই: সার্কাসের চরিত্র, উজ্জ্বল জকি, ক্যান-ক্যান নাচিয়ে, সমকামী মহিলা, নষ্ট প্রতিভা, মাতাল—এদেরই ছবি। হেন্‌রির দ্বিতীয় গৃহ এখন হয় মুলাঁ রুজ্‌ নাইট-ক্লাব নয় বেশ্যাপাড়া। এই মেয়েদের কাছে তুলুস্‌-লোত্রেক ছিলেন অসাধারণ প্রিয়, কারণ, টমাস্‌ ক্রেভেনের ভাষায়,

"He was at ease among the whores and would line with them, collectively, for a fortnight at a time; and with no false modesty, they would reveal to him naturally the unaccountable ways of men who segregate certain obliging females for the purposes of carnal satisfaction"!

বয়স যখন তাঁর মাত্র আটাশ, অধিক মদ্যপানের ফলে তিনি শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভয়ানক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন যার ফলে কোহল আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে কিছুদিন কাটাতে বাধ্য হন। এই সময়ে তাঁর পিতার বার্তাটি বেশ মজার,

তুলুস-লোত্রেক : নিজের আঁকা

তিনি বলেছিলেন "হেন্‌রিকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দাও, সেখানেই ও সুখে থাকবে কারণ ও দেশে সব লর্ড, সব কাউন্টই মদ্যপানে দিন কাটায়।" বাবার কথায় নয়, অস্কার ওয়াইল্ডের বিচার দেখার জন্য, এর কিছুদিনের মধ্যেই তুলুস্‌-লোত্রেক চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন এবং এই ঐতিহাসিক বিচারের কিছু ছবিও আঁকেন। এই সময় পোস্টার এঁকে হেন্‌রির প্রচুর অর্থ উপার্জন। তাছাড়া Elles নামে যে সিরিজ আঁকেন ইংলন্ড থেকে ফিরে, যার বাংলা হয়তো "খুকি সিরিজ"ই সবচেয়ে ঠিক, তা বিক্রি করেও প্রচুর টকা পেয়েছিলেন তিনি। ১৮৮৯ সালে লোত্রেক হাভ্‌র-এ সুন্দরী এক ইংরেজ বার-মেডকে ভালোবাসেন, কিন্তু মেয়েটি তাঁর সঙ্গে কিছুদিন প্রেম করে, এক জকির সঙ্গে উধাও হয়, এবং লোত্রেক ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসেন বর্দোতে মায়ের কাছে। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স যখন মাত্র ছত্রিশ।

তুলুস্‌-লোত্রেক ছিলেন কট্টরপন্থী দাগা, দামিয়ে ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ। জীবনের প্রথম দিককার ছবি ইম্প্রেশনিস্ট ধাঁচে, কিন্তু পরে এই চিত্রাদর্শ তাঁর হাস্যকর ঠেকেছিল—মানুষহীন দৃশ্যাবলি উজ্জ্বল আলোয় নির্বিকারে মনে এঁকে যাওয়া অর্থহীন বোকামি বই কিছু নয়। তাঁর ছবির বিষয় কৃত্রিম আলোয় প্যারিসের উদ্দাম রাতের জীবন, যেখানে মানুষ সেজেগুজে শক্ত হয়ে বসে থাকে না, মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসে নেশার ঝোঁকে উত্তেজনায়; নাচের ছন্দে উন্মুক্ত হয় প্রাণের আনন্দ, গতি আর উদ্দামতায় মুখর হয়ে ওঠে আবহাওয়া। রঙের উজ্জ্বলতা, চিত্র-বিন্যাসে সঙ্গীতময়তা, গতি, তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁর বিখ্যাত ইম্প্রেশনিস্ট-ধর্মী পোর্ট্রেট "Young Rorty" আঁকেন—চিত্র রচনাটি অসাধারণ কারণ সমগ্র ইম্প্রেশনিস্ট যুগে এমন চমৎকারভাবে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে পোর্ট্রেটে, খুব কম চিত্রকরই সক্ষম হয়েছেন। এই পর্যায়ে আরেকটি উল্লেখ-যোগ্য পোর্ট্রেট তুলুস্‌-লোত্রেকের মায়ের, এইটিও ইম্প্রেশনিস্ট কায়দায় বেঁধে রেখা-ঙ্কনের সাহায্যে অঙ্কিত হয়েছে। কুড়ি বছর বয়সের পর থেকেই তিনি পূর্বসূরীর কায়দা বর্জন করলেন এবং দাগার [illegible] ছবি আঁকতে শুরু করেন। তাঁর ওপর দাগার প্রভাব সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট "a la mie" চিত্র রচনাটিতে—দাগার "absinthe" ছবির এক নতুন সংস্করণ মনে হয় এটিকে।

দ্যগার মতনই তুলুস্‌-লোত্রেক জাপানী ছবিতে অত্যন্ত উৎসাহিত ছিলেন। জাপানী ছবির চিত্রবিন্যাস, তলভাগের সাহায্যে গভীরতা না এনে "বিষয়কে" একেবারে সামনে স্থাপন করা, ছবির মধ্যে বস্তুটিকে মাঝে না রেখে পাশে রাখা—এই সব তুলুস্‌-লোত্রেককে মুগ্ধ করেছিল। অবশ্য জানা যায় না তার ছবিতে জাপানী প্রভাব আসছে দ্যগার মাধ্যমে না চাক্ষুস দর্শন-অভিজ্ঞতা থেকে, তবে তিনি যে সম্পূর্ণভাবে নিজের কায়দার সঙ্গে প্রাচ্য কায়দা খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন তা তাঁর পোস্টারগুলো দেখলেই বোঝা যায়। রঙে লিথোগ্রাফ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম, এর ওপরে লোত্রেক সারা জীবন পরীক্ষা চালিয়ে যান। দ্যগা ও লোত্রেকের কিঞ্চিত তুলনামূলক আলোচনা হয়তো আবশ্যক; দাগা যদি হন বেগের শিল্পী, লোত্রেক আবেগের। শারীরিক গতি ক্যানভাসের গতির মধ্যে দ্যগার, কিন্তু লোত্রেকের ছবিতে

গতি আসছে "আর্ট" থেকে। যেহেতু দ্যগা শুধুমাত্র দ্রষ্টা বা দর্শক ছিলেন, তাই তাঁর চিত্র-রচনায় আবেগের স্থান একেবারেই নেই, কিন্তু লোত্রেক যেহেতু তাঁর চরিত্রদের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, তাদের সংগে নিজের একাত্মিকরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁর ছবিতে চরিত্ররা "টাইপ" নয়, "ব্যক্তি"। দ্যগার ছবিতে যদি শিল্প প্রধান হয়, লোত্রেকে জীবন। এই দিক থেকে হয়তো লোত্রেক অনেক বেশী রোমান্টিক দ্যগার চেয়ে, কারণ, ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধান রোমান্টিকদের অন্যতম আদর্শ, যেখানে ধ্রুপদী ধারার শিল্পীরা যুগে যুগে পরিবেশ বা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে তুলেছেন নাটক। সেই পুরোনো শেক্সপীয়ার-রাসিন্ বনাম আর কি!

তুলুস্-লোত্রেকের সব ছবি বিষয়েই প্রায় একই কথা প্রযোজ্য, তাই আজকের আলোচনায় কোনো বিশেষ ছবি নিয়ে ব্যাখ্যা করার খুব দরকার বোধ করছি না। "Jane Avril" এবং খড়ি দিয়ে আঁকা "Femme accroupie de dos" ছবি দুটি মুদ্রিত হল, চিত্রকর বিষয়ে যে কথা বলেছি, তার উদাহরণ হিসেবে ছবি দুটি দেখলে ভালো লাগবে। এই জেন আভ্রিল, মুলাঁ রুজের নটী, লোত্রেকের সবচেয়ে প্রিয় মডেল ছিলেন। ছিপছিপে, ছটফটে এই মেয়েটির সংগে হেনরির সখ্যতা ছিল গভীর। ছবিটি আসলে একটি পোস্টার, বুঝতেই পারছেন—লক্ষ করুন কী চমকপ্রদভাবে সাজিয়েছেন ছবিটিকে এবং নাচিয়েটির মুখে দেখুন কি পরিমাণ অভিব্যক্তি। সমস্ত ছবিটিতে আনন্দ, উদ্দাম আর সংগীতের আগুন—অনেক কবিতা যেমন পড়লে মনে হয় দেখছি তা, তেমনি এ ছবি দেখলে মনে হয় যেন কাগজ থেকে বাজনা উঠে আসছে। জেন আভ্রিলের শরীরে বাজনা বাজে আমরা শুনতে পাই। উজ্জ্বল নাইট ক্লাবে শোনা আধা ভুলে যাওয়া গান মনে পড়ে।

"Femme accroupie de dos"-মেজাজটা কিন্তু আলাদা। এ ছবির আটপৌরে অচেতন স্বাভাবিকত্বই যেন আমাদের বেশী নাড়া দেয়—কাঁথার গন্ধে, পুরোনো বিছানায়, নিজের ঘরে অগোছাল অবস্থায়, মাড়হীন ল্যাদল্যাদে পাজামা পরে যে শান্তি, যে আরাম, সেই আরাম এই ছবিতে। ছবিটির মধ্যে কোথায় যেন একটা 'ঘরে ফেরার' মত ব্যাপার আছে, বিশেষত জেন আভ্রিলের উত্তাল নৃত্য দেখার পর এরকম কোন সরল বালিকা, আটপৌরে, অচেতন, দেশী আবহাওয়ার জন্যই তো তেষ্টা পায় আমাদের, তাই না?

—শুদ্ধশীল বসু

ভারতের নানা প্রদেশে ছাত্র বিক্ষোভ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে; পুলিসে-ছাত্রে সংঘর্ষ হইতেছে এবং অনিবার্যরূপে (?) সর্বসাধারণের জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হইতেছে। বিশু খুড়ো বিষণ্ণবদনে 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দ-মাণিক্যের উক্তিটি একটু ঘুরাইয়া বলিলেন —"হায় ছাত্র, অবশেষে পুলিস দিয়া দিতে হইল শিক্ষা!"

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে মুড়ি-চিঁড়ার মূল্য নিয়ন্ত্রণ বাতিল করা হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"তা হলে এই দু'টি বস্তুর সঙ্গে আবার পরিচয়

করানো অবান্তর হবে না"—এই বলিয়াই তিনি ছোটবেলার ছড়া কাটিলেন—"তিল হতে তৈল হয়, দুধে হয় দৈ, ধানেতে তৈয়ার হয় মুড়ি চিঁড়া খৈ।"

সম্প্রতি জাতি তার জনকের জন্ম-বার্ষিকী পালন করিয়াছে, অর্থাৎ ঋণের খাতায় আর-কিছু জমা দিয়াছে, অর্থাৎ গান্ধী-নামপূত নানা ঘাটে পুষ্প-স্তবক অর্পণ করিয়াছে এবং মর্মরমূর্তির পাদমূলে সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"একটি অসমর্থিত সংবাদে শুনলাম, কাটনীদের মধ্যে অনেকেই পুরনো এবং কাজে কাজেই পুরনো চরখায় ধরেছে জং: আর নূতনদের মধ্যে, তাঁদের সংখ্যাই বেশি, সুতো কাটা কারো সড়গড় হয়নি এবং এটা নিতান্ত একদিনের ব্যাপার বলে এদিকেও কেউ বড় একটা নজর দেননি!!"

এক সংবাদে শুনিলাম, চিড়িয়াখানার দর্শনী বাঁধা করা হইয়াছে। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"এতে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ যে ব্যবসা-বুদ্ধিতে একটু খাটো, তা-ই প্রমাণ হলো। তাঁদের জানা উচিত ছিল, চিড়িয়াখানার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান এদিক-সেদিক গড়ে উঠেছে; সেখানে দর্শনী না দিয়েই (অবশ্যি আক্কেল-সেলামী দিতে হয়) জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়।"

কলিকাতায় সম্প্রতি একটি সুপার মার্কেট খোলা হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"কলকাতার কেতা নিয়ে যে-ক্ষ্যাপা বাউলেরা এককালে বাগবাজার-শ্যামবাজার-বউবাজারের গান লিখেছিলেন, তাঁরা থাকলে ঐ সঙ্গে সুপার বাজার হকার বাজারটাও জুড়ে দিতেন এবং আমরা গাবগুবাগুব না হলেও পরমানন্দে বগল বাজাতে পারতাম।"

পূজার ঠিক আগেই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ পাইলাম। সহযাত্রী বলিলেন—"এই নিয়ে অনশন আমরা করিনি, এমন কি, অবস্থান ধর্মঘটও নয়। কেননা, মিলের লক-আউটের পরিণতি অতি ভয়াবহ, রাতারাতি কৌপীনবন্ত বা বাটপাড় সম্পর্কে নিঃশঙ্ক!!"

পূজা-বাজারের কেনাকাটার এক রিপোর্টে শুনিলাম, এবার ব্লাউসের গলার কাট্ অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। —"কিন্তু দরটা যে অনেক ওপরে উঠে

গলা পর্যন্ত কাট্ করছে, সে খবরটা রিপোর্টার বলেননি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির উদ্যোগে "দ্বীপের মায়া" নাটিকা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"নাটিকাটি দেখে মনে হল, জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয়, বাঁচার চেয়ে মৃত্যু বুঝি আরো মধুর, যেমন মনে হয়েছিল "মহুয়া" নাটকের নদেরচাঁদ ঠাকুরের; তাই না সে গেয়েছিল—কোথায় পাব কলসী গো কন্যা, কোথায় পাব দড়ি, তুমি হয়ো গহীন গাঙ্ আমি ডুইব্যা মরি!!"

সংবাদে শুনিলাম, সমাজতন্ত্রী দলের নির্বাচনী প্রতীক "গাছ"ই নির্দিষ্ট রহিল। শ্যামলাল বলিল—"খুব ভালো, খুব ভালো" —এবং গান ধরিল —"সবাই দিচ্ছেন কোঠাবাড়ি, আমায়

গাছতলাতে বাড়ি, এ-ঘর ভাঙবে নাকো টুটবে নাকো ক্ষয় হবে না কোনকালে" —বুঝিলাম শরতের অতিথিটি বুঝি শ্যামলালের প্রাণের দ্বারে আসিয়াই প্রথম ঘা দিল।

মধ্যপ্রদেশ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে শুনিলাম, সেখানে ছাত্র নেতারা যখনই ক্লান্ত হইয়া ধর্মঘট অবসানের সামান্যতম ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখনই কে বা কাহারা চুড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"চুড়ি প্রেরণের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট; কিন্তু অর্থটা প্রাঞ্জল নয়। ঝান্সী বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত এবং অতীতে হলেও ঝান্সীর রানী চিরকালের। সবাই জানেন, চুড়ির সঙ্গে তরোয়ালও তাঁর হাতের শোভা বর্ধন করেছিল। ছাত্র নেতাদের অনুরাগীরা যদি তা ভুল করে থাকেন, তবে বলব শিক্ষা বন্ধ অচিরে বন্ধ হোক।"

কলিকাতায় ভারতীয় জনসংঘের বৈঠকে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, কাশ্মীর পাক এবং চীনা চরদের ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা এই ব্যাপারে এখনো কোন আমল দিতে চাই না, কেননা, আমরা জানি, ক্রীড়াভূমি হলেও স্টেডিয়াম এখনো হয়নি, হলে দেখা যাবে!!"

অরণ্যদেব ★ লী ফক

ডঃ লাভ আর কার্ল বেঁচে আছেন? ঠিক বলছ তো?
ঠিক বলছি, কর্নেল উইকস। তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।
কর্নেল উইকস নিজেই যাচ্ছেন।
খুব খুশী হয়েছেন উনি।
JUNGL

স্যান্ডি, আনন্দে আমার গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।
আমারও হচ্ছে স্যার।

ওই আসছে আপনাদের জন্যে হেলিকপ্টার
আপনার পরিচয় পর্যন্ত পেলাম না।
পরিচয় উনি গোপন রাখতে চান।
ওই তো ওঁরা।

ডঃ লাভ, কার্ল, আপনারা ভাল আছেন তো?
ভালই আছি কর্নেল উইকস—!
GLE PATROL

আগুন-পাহাড়ের মধ্যে আপনাদের হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছিল। উদ্ধার পেলেন কী করে?
আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
বলা চলবে না।

আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করি। বেতারে আপনি শেষ-খবরে বলেছিলেন 'বিরাট একটা ডো'। সেই 'ডো' বস্তুটা কী?
ডোম্বরা!
?

বিচিত্র সেই প্রাণীরা নিশ্চয়ই বেঁচে নেই।

অবগুন্ঠিতা'র রহস্য যখন জানাই হয়ে গেছে, তখন ওর নামটা এবারে পালটে দেওয়া দরকার।
তুমি যেই হও, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা, তোমাকে ধন্যবাদ।
৫/৪
আগামী সপ্তাহে নতুন কাহিনী
২৮

"কবিতার ভাষা"

'দেশ'-এর গত কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক আবু সঈদ আইয়ুবের "'প্রশ্ন' ও 'প্রথম দিনের সূর্য'" এবং "কবিতার ভাষা" শীর্ষক অসামান্য প্রবন্ধাবলীর জন্য তাঁকে ও আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রথমত এবং প্রধানত এই কথাটাই জানাতে চাইছি যে, তাঁর উক্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্বের জটিল ও দুরূহ সমস্যাগুলির যে বৈদগ্ধ এবং একাধারে যে প্রাঞ্জলতা ও গভীরতার সঙ্গে তিনি ব্যাখ্যান করেছেন, তাতে বিস্মিত পুলকে অভিভূত হয়েছি। আধুনিক বাংলা গদ্য, অনেক ক্ষেত্রে, কাব্যের চেয়ে কিছুমাত্র কম নির্মম নয়; জটিল তত্ত্বগুলি অক্ষম প্রকাশের গুণে জটিলতর হয়ে উঠেছে—যেন দুর্বোধ্য জটিলতাই রচনার উৎকর্ষের মানদণ্ড—এ-বিষয়ের উদাহরণ আশঙ্কাজনকভাবে সুপ্রতুল হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় এই-জাতীয় রচনার আদর্শ আমাদের পক্ষে অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। (এই প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর "ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক সার্থক প্রবন্ধাবলীকেও কৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করছি।) অধ্যাপক আইয়ুবের বক্তব্য-বিষয়ে প্রতিবাদিতার অবশ্য অভাব হবে না, কারণ, তর্কের শেষ নেই।

এই পত্রের দ্বিতীয় অভিপ্রায়, অধ্যাপক আইয়ুবের প্রাসঙ্গিক দু-একটি গৌণ উক্তির বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় উপস্থিত করা।

রবীন্দ্র-সংগীতে, বিশেষ করে ভালো গানগুলিতে, নিছক কাব্যোৎকর্ষকে অতিক্রম ক'রে কথা ও সুরের, কাব্যের ও সংগীতের, অপূর্ব সংমিশ্রণে যে অপরূপ নব শিল্প-রূপের সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্র-সংগীতের যে সেইখানেই মহিমান্বিত বৈশিষ্ট্য, এ কথা সুবিদিত। অধ্যাপক আইয়ুবও এ-বিষয়ে কয়েকটি সুপরিচিত উদাহরণ দিয়েছেন। তবু রবীন্দ্র-সংগীতে কথার গৌরবের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, এ কথাও মোটের ওপর মেনে নিতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তার সাঙ্গীতিক রূপেরও যে একটা স্বকীয়তা আছে, এবং সে-স্বকীয়তা যে মহার্ঘ, এবং বহু বহু গান যে নিছক সুরের সংগঠন ও বিন্যাসের দিক থেকে, 'কম্পোজিশন'-এর দিক থেকে (স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ যাকে 'ডিজাইন' আখ্যা দিয়েছেন), অসামান্য সৃষ্টি, অধ্যাপক আইয়ুবের কাছ থেকে এ-বিষয়েও সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পেলে খুশী হতাম। ঐসব গানের সুরগুলিই যে কী অনির্বচনীয় রসে ভরপুর, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই, যখন দক্ষ শিল্পীর হাতে গীটারে, এস্রাজে, সেতারে, স্বরোদে, বেহালায় তা রূপায়িত হয়ে ওঠে। ঐ সুর-গুলি অর্কেস্ট্রাসমন্বিত হলে তাদের আবেদন যে আরো কতো গভীর ও সূক্ষ্ম হতে পারে, তার একটিমাত্র উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, 'অতিথি' ছায়াচিত্রে "আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে" গানটির অর্কেস্ট্রা রূপটিকে। সেখানে নানা যন্ত্রের সহযোগের বিশেষ আনুকূল্য থাকলেও সুরের মূল রূপটিই ইন্দ্রজাল বিস্তার করে; সহযোগী যন্ত্রগুলি সুরের নিজস্ব বৈভবে সমৃদ্ধ করে তোলে মাত্র।

অপর পক্ষে, মার্গ-সংগীতে যেখানে কথার স্থান আছে, অর্থাৎ কণ্ঠসংগীতে (তেরেনা জাতীয় সংগীত ছাড়া), কথার ভূমিকা সাধারণত নগণ্য হলেও, অনেক ভালো ভালো বন্দিশী গানে কাব্যের ভূমিকা বা অর্থগৌরব যে একেবারেই অনুপস্থিত, তা বলা যায় না। অধ্যাপক আইয়ুব ফৈয়াজ খাঁর বিখ্যাত 'ফুলবন কি' গানটির যে উদাহরণ দিয়েছেন, সেখানে অর্থের রসপূর্ণ ব্যঞ্জনা কি একেবারেই নেই? ফৈয়াজ খাঁর তোড়ি রাগিণীতে 'গরবা মৈঁ সঙ্গ লাগে' অপূর্ব গানটিতে সব কথা ছেড়ে তিনি 'গরবা' কথাটিকে আশ্রয় করে সুরের যে বিন্যাস করেছেন, তা-ও তাৎপর্যপূর্ণ। বহু উৎকৃষ্ট ভজন গানে কথা ও সুরের উৎকর্ষ সুন্দরভাবে মিলিত হয়েছে (অধ্যাপক আইয়ুবও এ-কথা বলেছেন); ভজনগুলিকে খেয়ালের আঙ্গিকে গেয়ে অনেক ক্ষেত্রে এই সুমঞ্জস রসকে ক্ষুণ্ণ করা হয়ে থাকে।

মার্গ-সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আইয়ুব প্রধানত খেয়াল গানকেই মনের সামনে রেখেছেন মনে হয়; তিনি যে-সব শিল্পীর উল্লেখ করেছেন (শুভলক্ষ্মী ছাড়া), তাঁরা সকলেই প্রধানত খেয়াল গানের শিল্পী। তাই তিনি প্রধানত তার শৈলীগত বিস্তারের দিক, তার রূপকল্পের অত্যাশ্চর্য বৈভবের দিক'-এর কথা বলেছেন। মার্গ-সংগীত প্রসঙ্গে এ-সব কথাগুলি যে অনস্বীকার্য, তাতে আর সন্দেহ কী? তবে মার্গ-সংগীতের আদি রূপ ধ্রুপদ গানকে যদি মনে করা যায়, তা হলে তার আলাপ ও লয়কারী অঙ্গের বিন্যাসের দিককে ছেড়ে দি[illegible] গানগুলিরই আটসাঁট বাঁধুনি এবং [illegible] সৌষ্ঠব ও সংহতির বিশেষ মূল্য দিতে হয়। সেখানে বিস্তার-বৈভবের কথাটাই একমাত্র কথা নয়। বোধ হয় অনেকটা সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সংগীত-রচনায় ধ্রুপদের রূপকল্পকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

যাই হোক, এ-সব কথা হল প্রাসঙ্গিক ও গৌণ। অধ্যাপক আইয়ুবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে আমার আন্তরিক সমধর্মিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে নানা দিক থেকে আঘাত করবার, অস্বীকার করবার যে উদাম ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, তাতে তাঁর মতো আমিও ক্লিষ্ট, কখনো কখনো বিচলিতও বোধ করি। কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বাস পাই অন্তরের গভীর-দেশ থেকে। রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত যুগ-যুগান্তের সীমাকে অতিক্রম করে আমাদের দিকে প্রসারিত হয়েই থাকবে। শুভবুদ্ধির ব্যত্যয় ঘটলে তাকে হয়তো সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যান করে চলব। কিন্তু যুগে যুগে বারে বারে সেই প্রসারিত হস্ত আমাদের গ্রহণ করতেই হবে।

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

কাব্যগ্রন্থ

শতদ্রু। সুশীল রায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

অতি সম্প্রতিকালের বাংলা কাব্যে যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস, পীড়িত আত্মার নগ্ন-প্রকাশ, চিৎকার, বিস্ফোরণ, আন্দোলন এবং অগ্নিকাণ্ড—এ সবই সোচ্চার। এরই মধ্যে কেউ কেউ বিবিধ অভিজ্ঞতা ও আত্মলীন ভাবনায় মগ্ন থেকে অরূপ সৌন্দর্যের পথে পা বাড়ান, দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেন দিগন্তে। সুশীল রায় সেই রকম একজন কবি। তাঁর অধুনা প্রকাশিত শতদ্রু কাব্যগ্রন্থে এক কথায় কবি শতদ্রুর রূপোলী ঝরনায় অবগাহন করেছেন চল্লিশোত্তর প্রেমিকের মন নিয়ে। চাঞ্চল্য, উদ্দামতা, বিস্ফারবোধ ইত্যাদিতে আক্রান্ত না হয়ে প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণা স্বীকার করে নিয়েই তিনি যাত্রা করেছেন কখনও প্রকৃতির রূপ-অন্বেষণে, কখনও প্রথম যৌবনের থরথর স্মৃতি রোমন্থনে। সর্বত্র সংযত শুদ্ধপ্রাণ সম্পন্ন শিল্পীর রূপময় আত্মপ্রকাশ।

কবি সুশীল রায় যন্ত্রণা, হতাশা ইত্যাদি যাবতীয় অসুখ থেকে নির্বাসিত নন। তিনি সামাজিকতা থেকে দূরে আছেন এমন দাবি করেন নি। স্পষ্টই বলেছেন : 'এ যুগে বসতি করি, যুগের যন্ত্রণা সুতরাং।' কিন্তু তাঁর কবিমনের দাবি আরও বেশি : 'আকাশে আশ্চর্য চিহ্ন এঁকে/মুক্তির স্বাদ দেয় যাবতীয় যন্ত্রণার থেকে।' এই মুক্তির আস্বাদ তিনি পেয়েছেন মুখ্যত প্রকৃতির অপরূপ মায়ার জগতে। সেখানে কবির কর্ম : 'ফসলের ফোয়ারায় ভরাশস্য-মাঠে/ করি ধারাস্নান—'; 'জ্যোৎস্নার উল্লাস নিয়ে রৌদ্রের তপস্যা করে বাঁচি—'; 'নদীর কল্লোলে কান পেতে বসে আছি—'।

সেই সঙ্গে কবি মুগ্ধ চোখে মমতা মাখানো হৃদয়-ব্যাকুলতা নিয়ে দেখেছেন পরিচিত বৃক্ষ, ফুল, পাখি আর পরিচিত মানুষের গভীরে লুকোনো অপরিচয়ের মাধুর্য। দেখেছেন কৃষ্ণবর্ণ ফুল, চঞ্চল চড়ুই, দুপুরের চিল, দুধসাদা বক, কাচ-পোকা, জিরাফ, লোভী টিকটিকি—আরও কত কী। আর দেখেছেন শবরী, ফিরিওলা, মজুরেরা, একটি বন্ধু এবং সেই সঙ্গে আর একজন যে নাকি 'চরিত্র হারিয়ে.....হয়েছে ফতুর।'

বিস্ময়ে কবি-আত্মা মাঝে মাঝে রূপের সন্ধানে পেছনের রূপময় জগতে ভ্রমণ করেছেন নিঃশব্দ আকাঙ্ক্ষায়। স্মৃতি-সুখের উল্লাসে ক্ষণে ক্ষণে কবিচিত্ত হিল্লোলিত, শিহরিত। মৌতাত, তিনজন, স্মৃতি, দম্পতী, উই, শ্বেতপত্র, এক দুই তিন—ইত্যাদি কবিতায় প্রথম আলোর প্রহরের যে উত্তাপ, যে বেদনাঘন সুখ, যে অকারণ খুশীর হাওয়া কবির ভুবন মধুময় করেছিল—তার জন্য আত্মমগ্ন ধীর অভিজ্ঞ কবিচিত্তের ব্যাকুলতা ধরা পড়ে।

রীতিপ্রকরণের দিক থেকে শতদ্রুতে কোন বিশেষ প্রয়াস নেই। এই দিক থেকে কবির বলবার বিষয়টির সঙ্গে বলবার ভঙ্গীটির বিশেষ সাজুয্য লক্ষণীয় এবং তা কাব্যশিল্প বিচারে সমর্থনযোগ্য। কয়েকজন পূর্বসূরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতাগুলি এই গ্রন্থে সংযোজিত হওয়ার মূলে কাব্য-রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটেছে বলেই মনে হয়। কেননা, এই ধরনের কবিতাগুলি শতদ্রুর সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। পরিশেষে সংযোজিত কাব্যনাট্য কালান্তক অনেকদিন আগেকার লেখা। আবেগমধুর, সুখপাঠ্য। প্রেমিক-সত্তার ক্রম উন্মোচনে কবির মুন্সিয়ানা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

২৪৩।৬৬

অন্তরালে প্রতিজ্ঞা। রাম বসু। মৌসুমী, ১৪-সি ডি এল রায় স্ট্রীট, কলকাতা ৬। তিন টাকা।

দুপহরী। আরতি দাস। সাহিত্য, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা ২০। তিন টাকা।

আলোচ্য দু-জন কবির মধ্যে রাম বসু নিঃসন্দেহে প্রবীণ। 'অন্তরালে প্রতিজ্ঞা' তাঁর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। বছর দশ-বার আগেও রাম বসু যে রকম লিখতেন এখনকার কবিতার সঙ্গে তার প্রভেদ বিস্তর। কিন্তু এই ভিন্নতা, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য, তাঁর অগ্রগতির নির্ভুল চিহ্নবহ পদক্ষেপ নয়। তখন তিনি অধিকাংশই লিখতেন গদ্য কবিতা; টানটান, ঋজু, সাবলীল; অল্প টানে গভীর সঞ্চারী ছবি ফোটাবার দক্ষতায় সমসাময়িকদের চোখে ঈর্ষণীয় ছিলেন তিনি; তারপর তিনি কি কারণে যেন শুদ্ধ ছন্দ-মিল বজায় রেখে কবিতা লিখতে চাইলেন; আর তখন থেকেই তাঁর কবিতা কেমন অনভ্যাস-আড়ষ্ট, নিষ্প্রাণ, নির্জীব। 'অন্তরালে প্রতিজ্ঞা'তে অধিকাংশ কবিতাই ছন্দ-মিলের। তবু যে দু-পাঁচটি গদ্য কবিতা রয়েছে তা পুরনো রাম বসুকেই মনে পড়ায়। ছন্দ-মিল কবিতার শত্রু নিশ্চয়ই নয়, বরং সার্থক গদ্য কবিতা লেখাই দুরূহতর, তবু রাম বসুর ক্ষেত্রে উল্টোটাই ঘটেছে। দোষটা পুরোপুরি আঙ্গিকগত শৈথিল্যও নয়। তিনি বোধ হয় কবিতার প্রতি ততটা মনোযোগীও আর নন। নইলে তাঁর কবিতায় মধুসূদনের 'আত্মবিলাপে'র প্রতিধ্বনি শোনা যায় কেমন করে?

'এখনো গেল না তৃষ্ণা, পীত চোখে দোরে
দোরে ঘুরে
মৃত আলো অলেয়ার বাণবিদ্ধ, কি চাস,
কি চাস?...
সঞ্জীবিতা, বন্যাদ্বীপ, দিগন্তকেন্দ্র পাবার
আশায়
বাড়ানো দু হাতে রুক্ষ মরীচিকা পেলি
উপহার......' (নিজের প্রতি)

যে চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর বিশিষ্টতা, যে অনায়াস নৈপুণ্যে তিনি লিখতে পারেন—'পিঙ্গল সিংহের মতো ওৎ পেতে স্তব্ধ খালিয়াড়ি' কিংবা 'কাঁসার ঘড়ার মতো ঝকঝকে মেয়েদের দল' 'মেঘগুলো গহনায় যাও' 'মা মরা ছেলের মতো বাউন্ডুলে ক্ষেয়াঝোপ', তার পাশাপাশি কেমন করে লিখলেন, 'গোঙানো বিষাদ পোয়াতির মতো রমনীয়', 'খৃষ্টের কষ্টের মতো ফলগুলি', 'মহাপ্রস্থানের পথে কুকুরের মতন কেউ নেই এখন আমার', 'মানুষের দাম? বড়জোর পাঁচ টাকা বিনিময়ে ব্যালট পেপার?' ভাবতে বিস্ময় লাগে।

আরতি দাসের 'দু পহরী' সম্ভবত প্রথম কবিতার বই। আরতি দাস কবিতায় বড় কিছু বলতে চান না, চেনা জগতের পরিধিতে একটি-কি-দুটি শান্ত সুন্দর ছবি মিষ্টি আদরে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি—

শেওলা-সবুজ মস্ত কাঠের গুঁড়ি,
নিরীহ পিঁপড়ে পায়ে দেয় সুড়সুড়ি,
ঘাস-জোবা জলে ছোট্ট ব্যাঙের লাফ,
সাত সাত খুন মাফ—
কালো জলে যার শুষনিডাঙার বিল
পড়ন্ত রোদে হেসে ওঠে ঝিলমিল।
(নবজাতক)

তাঁর নিচু গলায় ঘরোয়া ভঙ্গিতে আঁকা ছবিগুলি বেশ স্পষ্ট:

'সময় আমার
মাঠ পাড়ি দিতে মাঝপথে থামা টেন',
(দু-পহরী) কিংবা
অচেনা লোকের ভিড় চিনি নে কাকেও
যাকে চেনা মনে হয় চেয়ে থাকে সে-ও।
(সঙ্গত)

সরল, হৃদয়গ্রাহ্য, আন্তরিক কবিতার সংকলন হিসেবে 'দু পহরী' অনেকের ভালো লাগবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পত্রিকা

Transition : সম্পাদক শ্রীঅরূপকুমার দত্ত। ১৬২/১০০, লেক গার্ডেনস, কলিকাতা ৪৫। মূল্য ১·২৫।

সিরিয়াস জাতের পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন থাকলেও বাজারে বেশী সংখ্যায় চোখে পড়ে না। এবং সেই কারণেই এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে ইতিহাস, সমাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ এবং কবিতা ও গল্প চিন্তাশীল ও রুচিবান পাঠকদের ভাল লাগবে। বেশ একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্ট প্রকাশন বলে অভিহিত করা যায়। আলোচ্য সংখ্যার লেখক তালিকায় আছেন শিশির-কুমার ঘোষ, এরিক ফ্রোম, অমিতানন্দ দাস, কে চন্দ্রশেখরন, পি লাল, বিভাসজ্যোতি মুৎসুদ্দী, মুরলীদাস মেলওয়ানি, অরূপ দত্ত ও অরুণ ভট্টাচার্য।

সন্দেশ। (ভাদ্র-আশ্বিন)। লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত। ১৭২।৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯। মূল্য ৩·০০

সন্দেশের আলোচ্য সংখ্যাটিতে বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক প্রায় প্রত্যেকেরই রচনা দেখা যাবে। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়ের রচনা ছাড়াও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা রয়েছে। কবিতা, গল্প, নাটিকা উপন্যাস, ছবি, ধাঁধার উত্তর কোনো জিনিসেরই ঘাটতি নেই। ছোটদের অবশ্যই ভাল লাগার মতন সংগ্রহ।

উত্তরসূরী। অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; ৯ বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য ১·৫০।

উত্তরসূরীর আলোচ্য সংখ্যাটি মোটামুটি গত এক যুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা। শিল্পচর্চা, সংগীত, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ফিল্ম শিশুসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন পরিচিত লেখকরা: দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস ভট্টাচার্য, শোভন সোম, হীরেন্দ্র চক্রবর্তী, পরিমল চক্রবর্তী, সুশান্ত বসু, অনিল চক্রবর্তী প্রভৃতি।

সংগঠন। সম্পাদক শ্রীনীতিশচন্দ্র মজুমদার। বেঙ্গলি স্কুল বিল্ডিং—বিলাস-পুর, আর এস, মধ্যপ্রদেশ।

বিলাসপুর বাঙালী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকখানি প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যের প্রতি ঘনিষ্ঠ অনুরাগের একটি নিদর্শন। সমিতির সদস্য ছাড়া হরপ্রসাদ মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মনোজিৎ ভট্টাচার্য, বোম্মানা বিশ্বনাথম-এর রচনায় সংখ্যাখানি সুখপাঠ্য। প্রকৃত একটি সাহিত্য পত্রিকার রূপ দেবার প্রশংসনীয় চেষ্টা।

সুপ্রভাত। সম্পাদক : নকুল চক্রব[illegible] ও বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী। ১৯।২এ, [illegible]শ্বর ঘটক লেন, কলিকাতা-২৭। ম[illegible] ·৫০ পয়সা।

মননশীল সাহিত্যের সম্প্রসারণের এবং সেই সঙ্গে নতুন লেখক সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য পত্রিকা-খানি। সাহিত্যসৃজনে ব্রতী ছোট পত্রিকা-খানির রচনা ও আঙ্গিকে রুচি এবং নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

পরিচিত মুখ গুলি। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য—১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ৩·০০।

মৌলিক নিষাদ। মৃণাল দত্ত। পুনশ্চ প্রকাশনী—২৪এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা-৩২। মূল্য ২·০০।

মা সারদামণি। মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। বসু বুক স্টল—১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

অ্যালকাবেট ক্লাব। শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়। নিওরিট—৪৫ মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১। মূল্য ২·০০।
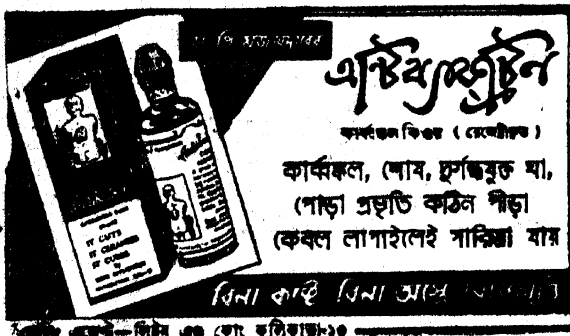
গল্পে প্রাণী। অমরনাথ রায়। ওরিয়েন্ট লংম্যানস লিমিটেড—১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-১৩। মূল্য ২·০০।

ফানুস। দিলীপ বসাক। রূপক—৩০-১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

নবজীবন বিদ্যাপীঠ। পংকজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরূপা প্রকাশনী—৫/এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা-৪। মূল্য ৩·০০।

রমণী। পি ভৈভিয়ালিঙ্গম অকিলন্দম। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম। শিশু সাহিত্য সংসদ—১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

মধুরেণ সমাপয়েৎ। দীপ্তিকুমার শীল। পুষ্প অ্যান্ড কোং—১৯বি নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য ২·০০।

কলকাতায় খেলাধুলোর এখন অকাল। ময়দান খেলাধুলোর জন্য বন্ধ। ময়দানের বাইরে শহরের আশেপাশের মাঠেও কোন বড় আকর্ষণ নেই। তা ছাড়া মহাপূজো আসন্ন। এ সময় খেলাধুলো নিয়ে মাতামাতি করতেও কারো মন বড় একটা সাড়া দেয় না। তাই বাইরের খবরই সম্বল।

বাইরের খেলাধুলোর মধ্যে ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে কলকাতার দুটি শক্তিশালী দল ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিদায় গ্রহণ রীতিমত অপ্রত্যাশিত ঘটনা। দুটি দলকেই কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল মীরাটের শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারের সংগে প্রথম দিন গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ করে দ্বিতীয় দিন ১—০ গোলে হেরে গেছে। একই ফলাফলে মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম দিনের খেলায় পরাজিত হয়েছে রাজস্থান আর্মড কনস্টুবলারী দলের কাছে।

শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারের ফুটবল খেলায় তেমন খ্যাতি নেই। হকির এক শক্তি-শালী দল হিসাবেই ওদের পরিচিতি। আর ফুটবল দল হিসাবে রাজস্থান আর্মড কনস্টুবলারীর নাম এর আগে অনেকেরই কানে পৌঁছায়নি। সেই শিখ রেজিমেন্ট এবং বিকানীরের আর্মড কনস্টুবলারীর পক্ষে ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান দলকে পরাজিত করা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসে, কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন ও শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল এবং বেশীর ভাগ উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে গড়া শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং-এর হীনবল দলের কাছে পরাজয়ের কারণ কি? এ কী বেশী খেলার ফল? না, পাঁচ মাসব্যাপী প্রতিনিয়ত ফুটবলের পরিণতি? শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে দুর্বল দলের জয় অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। কিন্তু পর পর দুটি দলের এভাবে 'পরাজয় স্বীকার করায় সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, কলকাতার খেলোয়াড়রা 'স্টেল' হয়ে গেছেন। যাঁরা দৈহিক সম্পদে সম্পদ-শালী, শারীরিক সামর্থ্যে পটু তাঁদের সংগে ক্রীড়া-সংগ্রামে পেরে ওঠেন নি। ফুটবলের পীঠস্থান বলে কলকাতাবাসীর একটা গর্ব আছে। যদিও ফুটবলে কলকাতার পর্যাপ্ত প্রাধান্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তবু ডি সি এম ফুটবলে কলকাতার দুটি শক্তিশালী দলের পরাজয় থেকে নিশ্চয়ই কিছু শেখার আছে। শুধু ডি সি এম কেন, আই এফ এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যালে ইণ্ডিয়ান নেভির কাছে মোহন-বাগানের পরাজয় থেকেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। একটি শিক্ষা অবশ্যই শারীরিক পটুতা অর্জনের শিক্ষা। অপর শিক্ষা ফুটবল বিশেষজ্ঞদের বিচার বিবেচনা।

✻

টোকিওতে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় কোন অপ্রত্যাশিত ফলাফল নয়। কারণ, এর আগে ভারত যে পাঁচবার ডেভিস কাপের খেলায় জাপানের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সেই পাঁচবারই বিজয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে ভারত ৬ বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করল।

প্রথম দিনের দুটি সিংগলস খেলার মধ্যে রামনাথন কৃষ্ণন জাপানের ওসামু ইশিগুরোকে পরাজিত করা সত্ত্বেও প্রেমজিত ও ওয়াতানাবের খেলা সমান সমান অবস্থায় অসমাপ্ত থাকায় ভারতের জয় সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ ছিল। কারণ, ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী অসুস্থ

টোকিওতে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় জাপানের ওয়াতানাবে ও ভারতের কৃষ্ণনের খেলার দৃশ্য
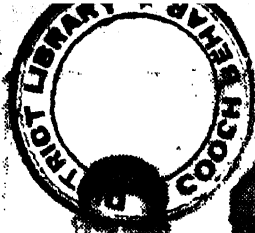
সাঁইথিয়ায় মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টার্ন রেলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলার দুই দলের অধিনায়ক বসির ও পি কে ব্যানার্জি। মাঝখানে খেলার প্রধান উদ্যোক্তা অঞ্চলপ্রধান শ্রীশিশির দত্ত

থাকায় তাঁর খেলায় অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না। কৃষ্ণনও অনেকদিন পরে ডেভিস কাপে খেলছেন। দ্বিতীয় দিন অসমাপ্ত খেলায় ওয়াতানাবে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন। ফলে ডাবলসের খেলার গুরুত্ব খুবই বেড়ে যায়। ডাবলসের খেলায় জয়দীপ-প্রেমজিৎ জুটির মধ্যেই সমন্বয় বেশী। কৃষ্ণনের সংগে প্রেমজিতের খেলার রেওয়াজ কম। কিন্তু কৃষ্ণন ও প্রেমজিত সুন্দর সমন্বয় এবং উন্নত কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে স্ট্রেট সেটে জাপানী জুটি ইশিগুরো ও ওয়াতানাবেকে হারিয়ে দেন। পরের দিন ওয়াতানাবের বিরুদ্ধে কৃষ্ণন এবং জাপানের এক নম্বর খেলোয়াড় ইশিগুরোর বিরুদ্ধে প্রেমজিৎ বিজয়ী হতে কোনই বেগ পান না। কৃষ্ণনের খেলায় অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে এবং তাঁর নিপুণ হাতের চলি, ড্রাইভ ও পাসিং শট প্রতিরোধ করতে ওয়াতানাবেকে কোর্টের মধ্যে ছুটাছুটি করে বড়াতে হয়। ইশিগুরো প্রেমজিতের কাছ থেকে প্রথম সেটটি আদায় করলেও বিচক্ষণতার সংগে খেলে প্রেমজিৎ পরের তিনটি সেট লাভ করেন। এই খেলায় পরাজয়ের পর ৩০ বছর বয়সী জাপানী খেলোয়াড় সামু ইশিগুরো টেনিস খেলা থেকে বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

ভারতকে এখন আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি-ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানীর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ও খেলায় জিতলে আমেরিকা ও ব্রাজিলের খেলার বিজয়ী দেশের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এবং বলা বাহুল্য, তারপর চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার সংগে শেষ খেলা।

*

পাতিয়ালায় ২৩শ জাতীয় সাঁতারে সার্ভিস দলের সাঁতারুরাই আবার প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি পেয়েছেন।

গত কয়েক বছর থেকেই সার্ভিস দলের সাঁতারুরা ভারতীয় সাঁতারের পুরোভাগে রয়েছেন। পাক-ভারত সংঘর্ষের ফলে গত বছর তাঁরা জাতীয় সাঁতারে অংশ নেন নি। এবার অধিকাংশ বিষয়ে প্রাধান্যের পরিচয়ে ১৫৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন। সার্ভিস দলের সংগৃহীত পয়েন্টের পাশে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বাংলা দলের ৫৪ পয়েন্টের তুলনা করলেই বোঝা যায়, সার্ভিস সাঁতারুদের নৈপুণ্য কত বেশী। বাংলার নামকরা অনেক সাঁতারু সাউথ ইস্টার্ন এবং ইস্টার্ন রেল দলে যোগ দিলেও ভারতীয় রেল দল কিন্তু ৫৪ পয়েন্টের বেশী সংগ্রহ করতে পারে নি। তাদের স্থান তৃতীয়। এর পর উত্তরপ্রদেশ ২৯ পয়েন্ট, মহারাষ্ট্র ২৫ পয়েন্ট, পাঞ্জাব ১৪ পয়েন্ট ও দিল্লি ১২ পয়েন্ট পেয়েছে।

জাতীয় সাঁতারে এবার যাঁরা নতুন রেকর্ডের অধিকারী তাদের মধ্যে সার্ভিসের থামা সিং, বাংলার রাজীব সাহা, সুশীল ঘোষ ও প্রীতি সমাদ্দার এবং রাজস্থানের কুমারী রিমা দত্তের নাম উল্লেখ করবার মত।

পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে কুমারী রিমাই একমাত্র সাঁতারু যিনি দুটি রেকর্ডের অধিকারী। ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক আর ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে তাঁর নতুন রেকর্ড। ১০০ মিটার বুক সাঁতারে আগের রেকর্ড ছিল ১ মিনিট ২৭·১ সেকেণ্ড। এবার হয়েছে ১ মিনিট ২৩·৪ সেকেণ্ড। ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে উন্নতি ১·৩ সেকেণ্ড। আগের ২ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডের পাশে ২ মিনিট ৩৮·৭ সেকেণ্ড।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে রাজীব সাহার উন্নতি ·৫ সেকেণ্ড। আগের ১ মিনিট ১৭·৬ সেকেণ্ডের জায়গায় ১ মিনিট ১৭·১ সেকেণ্ড।

সার্ভিসের থামা সিং তার ২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকের জাতীয় রেকর্ড ২ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ডকে ২ মিনিট ৪২·৮ সেকেণ্ডে নামিয়ে এনেছেন।

জুনিয়র বিভাগে ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে বাংলার সুশীল ঘোষ জাতীয় রেকর্ডকে নামিয়ে এনেছেন ১ মিনিট ১৮·৮ সেকেণ্ড থেকে ১ মিনিট ১৮·২ সেকেণ্ডে। ১০০ মিটার বুক সাঁতারে বাংলার প্রীতি সমাদ্দারের নতুন রেকর্ড ১ মিনিট ২৪·৮ সেকেণ্ড। এ সময় গৌরাংগ মল্লিকের রেকর্ডের চেয়ে ·৩ সেকেণ্ড উন্নত।

*

জেলা, মহকুমা এবং শিল্পনগরীর ফুটবল উৎসাহীরা অনেক সময় কলকাতার নামকরা ফুটবল দলগুলিকে নিজ নিজ কেন্দ্রে এনে প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে থাকেন। এর দুটি উদ্দেশ্য। এক মফস্বল এবং শিল্পাঞ্চলের ফুটবল ক্রীড়ামোদীদের নামকরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ দেওয়া। দুই—প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে খেলার মাঠ বা ইউটিলিটি স্টেডিয়াম নির্মাণে কার্যকরী সাহায্য করা। সাঁইথিয়ার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এবং আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি শ্রীশিশির দত্তের উদ্যোগে এ বছর সাঁইথিয়ায় দুটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। প্রথম খেলায় লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্ট বেঙ্গলের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এরিয়ান ক্লাব। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টার্ন রেলের মধ্যে দ্বিতীয় খেলার ফলাফল ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। দুটি খেলাকে কেন্দ্র করে সাঁইথিয়ায় যথেষ্ট উৎসাহের সাড়া জাগে। এই ধরনের আরও প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে একটি ইউটিলিটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা সাঁইথিয়ার ক্রীড়া-সংগঠকদের উদ্দেশ্য।

একলব্য

জিমনাস্টিকসের কসরৎ
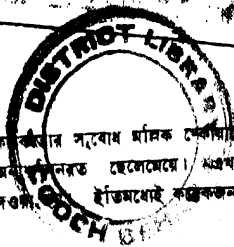
কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের শ্রীনরেন গলের জিমন্যাস্টিক শিক্ষা কেন্দ্রে অনুশীলনরত ছেলেমেয়ে। এখানে সপ্তাহে তিন দিন জিমন্যাস্টিকস শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই কয়েকজন ছেলেমেয়ে জিমন্যাস্টিকসে বেশ পটু হয়ে উঠেছে

আলফ র‍্যামসি

একজনের গলায় রাশি রাশি ফুলের মালা। আর একজনের গলায় ফাঁসির দাড় পরাবার হুমকি। দুইজনই বিশ্ব ফুটবলের রূপদক্ষ শিল্পী—দুই দেশের ফুটবল কোচ। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

আমি ইংলণ্ডের ফুটবল কোচ-ম্যানেজার ও সিলেক্টর আলফ র‍্যামসি এবং ব্রাজিলের কোচ ভিনসেণ্ট ফেওলার কথা বলছি। ইংলণ্ড বিশ্ব কাপ জেতার পর র‍্যামসি পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী মানুষ, সারা গ্রেট ব্রিটেনে তার সেদিন রাজার সম্মান। আর বিশ্ব কাপের গ্রুপ লীগে ব্রাজিলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর ফেওলার গর্দান যাবার উপক্রম। ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনারিওতে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে লিখে দেওয়া হল—'আমরা কোচ ফেওলা এবং নির্বাচক সমিতির সদস্যদের জন্য অপেক্ষা করছি। তারা ব্রাজিলের সম্মান ও সুনাম ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন।' ওদিকে ইংলণ্ডে র‍্যামসিকে নিয়ে মাতামাতি। তাঁকে 'স্যার' খেতাব দেবার গুঞ্জরন।

ক্রীড়াকীর্তি স্তম্ভে আলফ র‍্যামসির কথা টেনে আনায় অনেকে বিস্ময় বোধ করতে পারেন। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, র‍্যামসি অতীত দিনের কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড় যিনি টটেনহ্যাম হটস্পার দলে নিয়মিত রাইট ব্যাকে খেলেছেন, টটেনহ্যামকে দ্বিতীয় এবং প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়নের সম্মান এনে দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক খেলায় ৪২ বার ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, দুবার পেয়েছেন জাতীয় দলের অধিনায়কের সম্মান। খেলা থেকে অবসর নেবার পর র‍্যামসির ফুটবলের রূপকারের ভূমিকা, খেলার মধ্যে রূপলাবণ্য ফোটাবার প্রচেষ্টা দলকে ঢেলে সেজে দলের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় আনার চিন্তা। তারই ফলে ইপসউইক টাউন ক্লাবের তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় থেকে প্রথম ডিভিসনে প্রোমোশন। আজ ফুটবলে ইংলণ্ডের বিশ্বজয়ের মূলেও ওঁর ভূমিকা সবচেয়ে বড়।

নিজে বড় খেলোয়াড় ছিলেন বলেই দল গড়ার কাজটা অনেক সহজ হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে বড় খেলোয়াড় তো অনেকেই আছেন। কোচ হিসাবে ক'জন সফল। আসল কথা, আধুনিক ফুটবল সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাসই ওঁর সাফল্যের সোপান।

আধুনিক ফুটবলে খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যগত উৎকর্ষই শেষ কথা নয়। আধুনিক ফুটবল প্রায় যুদ্ধবিশেষ। এর

মধ্যে পুরোপুরি যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি এবং মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা। কার টেম্পারামেণ্ট কেমন, প্রতিপক্ষের ক্রীড়াধারার বিরুদ্ধে কার খেলা বেশী কার্যকরী, কাকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, কি উপায়ে খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপিত করা যাবে—এসব ব্যাপার জানা না থাকলে আধুনিক ফুটবলে সাফল্যলাভ করা শক্ত। কারণ, ফুটবলের মান অনেক উন্নত, শিল্পী খেলোয়াড়ের অভাব নেই এবং ফুটবল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলছে নিত্য নতুন গবেষণা।

আলফ র‍্যামসি সোল এজেণ্ট হিসাবে যেদিন থেকে জাতীয় দল গড়ার ভার পেয়েছেন সেইদিন থেকেই তাঁর এইসব চিন্তা। কিন্তু ট্যাকটিকস, স্ট্র্যাটেজি এবং ট্যালেণ্টের কথা মনে রেখেও তিনি বেশী জোর দিয়েছেন টেম্পারামেণ্ট, বডি ফিটনেস এবং টিম-ওয়ার্কের উপর।

শুধু তারুণ্যের উপর জোর দিতে হবে এ মতবাদে র‍্যামসি বিশ্বাসী নন। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের শতবার্ষিকী উৎসবে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে ফুটবলে ইংলণ্ড দলের সাফল্যের পর যখন কথা উঠেছিল বিশ্ব-কাপের দল গড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই দলের খেলোয়াড়দের এক সঙ্গে রেখে তালিম দিয়ে সুপটু করে গড়ে তুলতে হবে তখন র‍্যামসি সে উপদেশ প্রত্যাখ্যানও করেননি, আবার গ্রহণও করেননি। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রতিভাবান তরুণরা তরুণদের মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ। অভিজ্ঞতা ও পরিমার্জনের জন্য পরবর্তী বড় প্রতিযোগিতা লীগের কষ্টিপাথরে এদের যাচাই করে নেবার প্রয়োজন আছে। না হলে খাদ ধরা পড়ে না। একজন প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় সাধারণ লীগ ম্যাচে খারাপ খেলতে পারেন। আন্তর্জাতিক খেলায় তো কথাই নেই। এর অর্থ এই নয় যে, ঐ খেলোয়াড়কে দল থেকে ছেঁটে বাদ দিতে হবে। দেখতে হবে তার ব্যর্থতার কারণ কি! আত্মবিশ্বাসের অভাব কেন? লীগ ম্যাচে খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যের নিরিখে দল গড়াই ছিল র‍্যামসির নীতি। অবশ্যই জাতীয় দলে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতার প্রতিও দৃষ্টি ছিল। আর সতর্ক দৃষ্টি ছিল সংহতির দিকে। ফুটবল একজনের খেলা নয়—এগারোজনের খেলা—এগারোজনের একটি দল। সুতরাং কয়েকটি অংশ দিয়ে যেমন একটি মেসিন তৈরি করা হয় তেমন ১১ জন খেলোয়াড় দিয়ে একটি জীবন্ত ফুটবল মেসিন গড়ার কাজে দু[illegible] রাত্রি-দিন চিন্তা করেছেন আলফ র‍্যা[illegible]।

ফাঁকা মাঠের অনুশীলনের উপর বেশী জোর না দিয়ে জোর দিয়েছেন ম্যাচ প্র্যাকটিসের উপর। তাও দুর্বল দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়—পৃথিবীর সব শক্তিশালী দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলকে পটু করার প্রয়াসে সারা কণ্টিনেণ্টে এবং ফুটবল-সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সফর করেছেন র‍্যামসি ইংলণ্ড দলের সঙ্গে।

আর আত্মবিশ্বাসে খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে ওঁর নিজের বিশ্বাসই বোধ হয় অন্যতম অনুপ্রেরণা। সব সময়ই বলেছেন—'সহজাত প্রতিভার অধিকারী যত খেলোয়াড় এখন ইংলণ্ডে আছেন, পৃথিবীর কোন দেশে এত খেলোয়াড় নেই। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে আমরাই জয়ী হব।'

অবিচলিত নিষ্ঠা, ফুটবলের জ্ঞান এবং আত্মপ্রত্যয়ের ফলেই ফুটবল খেলোয়াড় র‍্যামসির চেয়ে আজ ফুটবলের রূপকার র‍্যামসির ভূমিকা অনেক বড়।

—মুকুল

চিত্রামোদীর হতাশা

সিনেমা কি খুলবে না? এই প্রশ্ন আজ চিত্রামোদীদের মুখে মুখে। পুজো এসে গিয়েছে। এখন সিনেমা না হলে কি চলে? প্রমোদে মন ভরিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকেই গিয়ে নাট্যালয়ে ভিড় করছেন। পেশাদারী ও শৌখিন মঞ্চের মুখপাত্ররা বলছেন, এত বিক্রি এর আগে আর হয়নি। রাজপথের মোড়ে নতুন ছবির সুন্দর সুন্দর হোর্ডিং টাঙানো রয়েছে। সিনেমা বন্ধ না থাকলে কয়েকটি ছবি হয়ত এরই মধ্যে মুক্তি পেত। যে ছবিগুলি চলতে চলতে থেমে গেল তার হোর্ডিংও সিনেমা হাউসের গায়ে টাঙানো রয়েছে। চিত্ররসিকরা হোর্ডিংগুলোর দিকে আজও বুঝি সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। তারপরেই তাঁদের নজর পড়ে বন্ধ কল্যাপসিবল গেটের সামনে ঝুলিয়ে রাখা, কিংবা দেওয়ালে এ'টে দেওয়া কর্মচারীদের দাবির প্ল্যাকার্ডের উপর। এ যেন এক 'ড্রামাটিক আইরনি'। সিনেমা-রসিকদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে কিনা, জানি না। তবে এমন হতাশার স্বাদ প্রমোদ-বিলাসীরা সম্ভবত এর আগে পাননি।

এখনও নতুন ছবির মহরত হচ্ছে। শুটিং চলছে। সিনেমার পত্র-পত্রিকায় স্টারদের ছবি বেরোচ্ছে। ঘড়ির কাঁটার মত সব ঠিক চলছে। একদিকে নিয়মিত ঘটছে সব কিছু, অপরদিকে একটা বড় অনিয়ম। প্রস্তুতির কাজে বিরাম নেই। প্রেক্ষাগৃহের সামনে দাঁড়িয়েই সবাই শুধু অপ্রস্তুত।

তালা খুলতে সময় লাগে না। জট অন্যত্র। তলে তলে পাকিয়ে উঠেছে, শক্ত হয়েছে। তাই হয়ত ছাড়াতে সময় লাগছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, অচল অবস্থার অবসান ঘটতে আর দেরি নেই। প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকার দূর করার আশু প্রয়োজনীয়তা দু' পক্ষই বুঝতে শুরু করেছেন। আর ভুল নয়, ব্যবসার ক্ষতি নয় —এই বোধ নাকি ক্রমশই জাগছে। আলোচনা চলছে। সমাধানের ঘাটে ভিড়ল বলে।

রবিবার সন্ধ্যায় সায়রা বানু ও দিলীপকুমার বোম্বাই রওনা হন; খবর পেয়ে 'ফ্যান'রা দলে দলে এয়ারপোর্টে ভিড় করেন—ভিড় ঠেলে সায়রা ও দিলীপ প্লেনের দিকে এগোচ্ছেন

ফটো—দেশ

অল্প দৈর্ঘ্যের জীবনীচিত্র

স্বামী অভেদানন্দর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে "যুগাচার্য অভেদানন্দ" নামে একটি অল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। অভেদানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি গত সপ্তাহে ছবিটির এক বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

বিশ মিনিটব্যাপী এই ছবিতে স্বামী অভেদানন্দর আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্ম-জীবনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অল্প বয়সে বালক কালীপ্রসন্নর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য ও শিষ্যত্ব লাভ, পরবর্তী সন্ন্যাস-জীবনে বিদেশে বেদান্ত প্রচার এবং দেহ-ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা ছবিতে রয়েছে।

ছবিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এতে অল্প অবকাশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারণা এবং তাঁর অপর কয়েকজন লীলা-সহচরের, বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের, কথাও আছে। এবং স্বামী অভেদানন্দর বাণীও এই চিত্রে সংযোজিত। পরিচালক শ্যামল চক্রবর্তী একটির পর একটি দৃশ্য ও ঘটনা নিপুণভাবে বিন্যস্ত করেছেন। কী তাঁর কাজ এবং কী তাঁকে দিতে হবে সে বিষয়ে পরিচালক সচেতন ছিলেন। একটি মহান

প্লেন ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে শিল্পীরা জনতার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন : পিছনে বোম্বাইয়ের চিত্রপ্রযোজক এইচ এস রাওয়েল ফটো—দেশ

জীবনের পরিচয় তুলে ধরতে হলে যে নিষ্ঠা, গবেষণা ও উপলব্ধির প্রয়োজন তা পরিচালকের ছিল। এবং শিল্পগুণে ও দৃশ্যগঠনের দিক থেকেও ছবিটি বিশিষ্ট। পরিচালককে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন ক্যামেরাম্যান দীপক দাস। তাঁর ক্যামেরার কাজ উঁচুদরের।

ছবিতে বেশী পরিচিত মুখ কম দেখালেই ভাল হত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় শিল্পী না নিয়ে তাঁদের প্রতিকৃতির সাহায্য নিলে পরিচালক দর্শকমনে আরও বেশী পরিমাণে ভক্তিরসের সঞ্চার করতে পারতেন। অন্তরঙ্গ পার্ষদ-দের উদ্দেশে ঠাকুরের সেই ঐতিহাসিক আহ্বান 'ওরে আয়' সুরের বদলে সংলাপের মধ্য দিয়ে শোনালেই ভাল হত। স্বামী অভেদানন্দর বৃদ্ধ বয়সের রূপসজ্জায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চমৎকার মানিয়েছে। তিনি অভিনয়ও করেছেন সুন্দর।

ছবিটি দর্শকমনে আধ্যাত্মিক প্রেরণা এনে দেয়। এ-দিক থেকে এই সৎ ও সার্থক প্রয়াস জনসাধারণের অভিনন্দন পাবে।

নেপথ্যে

গত সপ্তাহে কলকাতায় আর ডি বনসাল প্রোডাকশন্স-এর "ঝুক গয়া আশমান" হিন্দী ছবির লোকেশান শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। ছবির নায়ক-নায়িকা রাজেন্দ্র-কুমার ও সায়রা বানু কলকাতায় এসেছিলেন।

সায়রা বানুকে এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা জানাতে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা তো অবাক। সায়রা বানুর সঙ্গে প্লেন থেকে নামলেন দিলীপকুমার। দিলীপকুমার ও সায়রার বিয়ের কথা সকলেই জানেন। তাই দুজনকে একত্রে দেখে কারো বিস্মিত হবার কথা নয়। তবে দিলীপকুমার কলকাতায় আসবেন এটা কারো জানা ছিল না।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের চিত্রজগতে ধর্মেন্দ্র-মীনাকুমারীকে নিয়ে যত কথা হয়েছে, রাজেন্দ্রকুমার সায়রা বানুকে নিয়ে তার চেয়ে কম কথা হয়নি। এমন খবরও পাওয়া গেছে যে, রাজেন্দ্রকুমার নাকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজকদের বলেছেন, "সায়রাকে হিরোইন করে নিচ্ছেন না কেন?"

দুই সহশিল্পীর স্বাভাবিক হৃদ্যতার চেয়েও বেশী একটু ঘনিষ্ঠতা সায়রা ও রাজেন্দ্রকুমারের ক্ষেত্রে অনেকেই লক্ষ করেছেন। হঠাৎ একদিন সবাই জানলেন, সায়রার জীবনে দিলীপকুমার ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ আর কেউ নেই। ত্রিভুজ উপাখ্যান দ্বিভুজ হল। কেমন করে? একটি সূত্রে প্রকাশ, দিলীপকুমার নাকি একদিন সায়রাকে বলেছিলেন, "সায়রা, তোমার সম্বন্ধে এ কি শুনছি। এ তো ভাল কথা নয়। নিজের কথা ভাবতে হবে তো। তুমি কি মনে কর সে (রাজেন্দ্রকুমার) তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে-দের ত্যাগ করবে? শোন, তুমিও দুঃখ পাবে, অন্যকে দুঃখ দেবে।"

"কাকে দুঃখ দেব?"

"ধর, আমাকে।"

এরপর দিলীপকুমারের আর কো[...] বলতে হয়নি। সায়রার মুখ লজ্জা[...]ল হয়ে উঠেছিল। একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলল সায়রা, "সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

কলকাতায় ছিল রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রার শুটিং। দিলীপকুমারও চলে এলেন। ভাবী বধূকে একদিনের জন্যও ছেড়ে থাকা বুঝি দিলীপকুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল প্রযোজকের। রবিবার একটি পার্টিতে সাংবাদিকদের স[...] রাজেন্দ্রকুমার, সায়রা বানু, পরিচালক লেখ ট্যাণ্ডনের দেখা-সাক্ষাতের জন্য একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন শ্রীবনসাল। নিমন্ত্রণ চিঠিও বিলি করা হয়েছিল। পরে শ্রীবনসালের অফিস থেকে টেলিফোনে জানানো হল, পার্টি হচ্ছে না। কারণ হিসাবে জানা গেল, দিলীপকুমার ও সায়রা বানু নাকি বোম্বাই ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। রবিবার কলকাতায় তাঁদের থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। শোনা যাচ্ছে, বোম্বাইয়ে তাঁদের বিয়ে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

কণ্ঠশিল্পীর বিদেশ যাত্রা

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে লণ্ডন, এডিনবরা, ম্যাঞ্চেস্টার এবং অন্যত্র গান গাওয়ার জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু চৌধুরী গত সপ্তাহে বিলাত রওনা হন। তবলাবাদক রাধাকান্ত নন্দীও তাঁদের সঙ্গে যান। নেহরু মেমোরিয়াল [...]বিলে টাকা তোলার উদ্দেশ্যে [...]নের আসরের আয়োজন করা হয়েছে। [...] মাউণ্টব্যাটেন এই ট্রাস্টের উদ্যোক্তা।
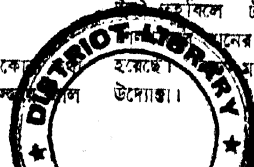
রেকর্ড-সমালোচনা

পুজোর গান

হিমাংশুকুমার দত্তের সুরে এইচ এম ভির নতুন রেকর্ড

হিমাংশুকুমার ছিলেন বিগত যুগের শেষ ইনস্টিটিউশনধর্মী সুরকার। তিনি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গীতচিন্তা চটুল বা লঘু ছিল না। হিমাংশুকুমার চিরাচরিত পথে চলেন নি, তিনি অনুকরণপ্রিয় ছিলেন না। বাংলা গানে টপ্পার বৈশিষ্ট্য ছিল, তানকর্তবেরও অভাব ছিল না। ছন্দোপ্রধান রচনাও তাঁর আগে বহু হয়েছে। তাঁর পথ এই সব কটি থেকেই স্বতন্ত্র—ছোট ছোট অলঙ্কার এবং মীড়ে তিনি মনের গহনে পৌঁছেছেন। একটুখানি গমকে অনেকখানি প্রকাশ করেছেন। ইংরেজীতে যাকে বলে সাজেস্টিভনেস বা জ্ঞাপকতা তাঁর সুরে সেই সুদুর্লভ স্পর্শ পাওয়া যায়। অল্প ইঙ্গিতে তিনি প্রচুর অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন। কারুণ্যের কত বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছোট ছোট প্রয়োগকর্মে।

বলা বাহুল্য, তাঁর এই স্বল্পভাষিত্বকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। সে যুগেও খুব অল্প শিল্পী তাঁর এই স্বকীয়তাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শৈল দেবী, উমা বসু, শচীন দেববর্মণ—এঁদের কথা প্রথমেই মনে আসছে। কিন্তু আরও কয়েকজন ছিলেন বা আছেন যাঁরা এই দুর্লভ গুণের অধিকারী। গ্রামোফোন কোম্পানী এঁদের রেকর্ডগুলিকে পুনর্জীবিত করেন নি কিন্তু করা যেতে পারত, এবং তা হলেই বোধ হয় এই ক্লাসিকাল সৃষ্টিগুলি সুরক্ষিত হত। হয়ত তাঁদের উদ্দেশ্য বর্তমান জনপ্রিয় শিল্পীদের এই কাজে নিয়োগ করা, যাতে আধুনিক শ্রোতাদের কাছে এই রেকর্ডগুলি চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু যখন আলোচ্য রেকর্ডে "চাঁদ কহে চামেলি গো" বা "ছিল চাঁদ মেঘের পারে"—শুনলুম তখন আগের দুটি রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করে মনে হল—"হল কালের ভুল, পুব হাওয়াতে ধরে দিলেম দখিন হাওয়ার ফুল।" এসব গান যেন এই সব কণ্ঠের উপযোগী নয়। গ্রামোফোন কোম্পানী নিশ্চয়ই ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য রকম ভাবেন কিন্তু আমাদের মানসে সেই ভাবধারা প্রবহমান নয়।

শিল্পীরা কষ্ট করে গানগুলি তুলেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; তবে কয়েকটি গানে সুপরিচিত অপর কণ্ঠের ছায়াপাত ঘটেছে। এমন কি ট্রেনার মহাশয়ের কণ্ঠের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট **হয়ে উঠেছে। এই বিড়ম্বনা পরিহার করা যেতে পারত।**

সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত

তথাপি, অকুণ্ঠিত প্রশংসা করা যেতে না পারলেও গানগুলি মোটামুটি সুগীত। শুধু সূক্ষ্মতা, মীড়ের কাছে আর একটু গভীরতা এবং গমকে, অলঙ্কারে আর একটু সুচিন্তিত দক্ষতার পরিচয় পেলে সুখী হতাম। এ যুগের শিল্পীরা যদি গত যুগের শিল্পের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারেন তবে দুর্ভাগ্যকেই দায়ী করব, তাঁদের নয়। তাঁরা যে এই গানগুলি গেয়েছেন এবং একজন মহৎ সুরকারকে আবার এ যুগের কাছে পরিচিত করেছেন—এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রামোফোন কোম্পানীকেও এজন্য সাধুবাদ প্রদান করি।

আলোচ্য চারটি গানের মধ্যে শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ, স্বর্গত শৈলেন রায় এবং অজয় ভট্টাচার্যের রচনা নির্বাচিত করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামল মিত্র, শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়।

অন্যান্য রেকর্ড

গীতশ্রী শেফালী ঘোষ এবং শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি রাগপ্রধান রেকর্ড সুগীত।

এই গানগুলির মধ্যে হিন্দী গানের ছকে ফেলে বাংলা গান রচনা করবার প্রয়াস দেখা গেল। হয়তো এতে ব্যবসায়িক সাফল্য আছে কিন্তু সমস্ত প্রয়াসটাই একটা নিছক অনুকরণের প্রহসন বলে মনে হয়। "বাজু মোর খুলে খুলে যায়" যে কোন গানের এবং কোন গায়কের অন্ধ অনুকরণ তা সকলেই বুঝতে পারেন। কথা হচ্ছে এই রকম সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস দিয়ে কি আমাদের সঙ্গীত ভাণ্ডারের শোভা বাড়বে? নকলে কৃতিত্ব নেই কিন্তু আসলটি খাস্তা হবার **সম্ভাবনাই বেশী। এই ধরনের বস্তু বাংলা খেয়াল বা ঠুংরী নামে পরিচিত হলে ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে ভাবব, আমাদের** চিন্তায় ঘুণ ধরেছে।

অতুলপ্রসাদ

শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তের গাওয়া দুটি গান খুবই ভাল লাগল। গায়িকার কণ্ঠের আকৃতি আমাদের মুগ্ধ করেছে। শ্রীঅর্ঘ্য সেনের কণ্ঠে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু গান দুটি এভাবে না শেখানোই উচিত ছিল। এঁর কণ্ঠেও যেন ট্রেনারের "ম্যানারিজম্" কানে বেশী করে বাজল। "তুমি মধুর অঙ্গে" গানটি আরও দ্রুত লয়ে হওয়া উচিত ছিল। ছন্দের মাধুর্য এই গানে ধরা দেয় নি—তা ছাড়া এমন কিছু কিছু স্বকীয়তা আছে যা না থাকাই উচিত ছিল। সচেষ্ট হলে এবং সুযোগ পেলে এই শিল্পী ভবিষ্যতে খ্যাতি অর্জন করবেন।

আধুনিক গান

হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া

এইচ এম ভি ও কলম্বিয়ার পুজো-রেকর্ডের একটা ঐতিহ্য আছে। প্রতি বছরেই এই সময়ে শিল্পীদের গাওয়া নতুন গানের রেকর্ড প্রকাশ করা হয়। শ্রোতারা প্রতীক্ষায় থাকেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর পুজো-রেকর্ডের সুনাম এবার কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে মনে হয়। গ্রামোফোন কোম্পানি নিজেই এর জন্য অনেকটা দায়ী। বোম্বাইয়ের ফিল্মের কয়েকজন প্লে-ব্যাক শিল্পীর (মুকেশ, সুমন কল্যাণপুর, মহেন্দ্র কাপুর) বাংলা গান এবার কোম্পানি উপহার দিয়েছেন। রসিক শ্রোতারা এই গানগুলি বিনা দ্বিধায় বর্জন করতে পারেন। গানগুলি সুগীত তো নয়ই, বরঞ্চ অশ্রাব্য। বিশেষত মুকেশ ও মহেন্দ্র কাপুরের গান। ভালই হল, কোন গান বাড়িতে রাখতে হবে কোনটা হবে না এই বিচারের কাজটি কোম্পানি নিজেই বেশ সহজ করে দিয়েছেন। তালাত মামুদ অবশ্য কোম্পানির পুরনো গায়ক। এবার তিনি ব্যর্থ।

প্রসঙ্গত বলি, অন্তত পুজোয় বাংলা গানের দায়িত্বটা বাঙালী কণ্ঠশিল্পীদের হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত। এঁরা কম জনপ্রিয় নন। বিশেষত পুজোয় গুণগ্রাহীদের আনন্দবর্ধনের চেষ্টা তাঁরা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই করে থাকেন। শ্রোতারাও তাঁদের গান শুনতে চান। এই দেওয়া-নেওয়ার পর্বের একটা 'ট্র্যাডিশন' আছে। এখানে অপরের অকারণ অনধিকার প্রবেশের ব্যবস্থা কেন? বোম্বাই-শিল্পীদের গান, যদি সুশ্রাব্য হয়, দেওয়ালিতে বের করা হোক—তাতে কোন আপত্তি নেই। পুজোর গান বাঙালী শিল্পীদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকুক।

কলকাতার শিল্পীদের আধুনিক গীতি-**গুচ্ছ সামগ্রিকভাবে অন্যান্যবারের মত**

চিত্তাকর্ষক হয়নি। কিছু কিছু গান যাতে রাগাশ্রয়ী হয় সে-বিষয়ে সম্ভবত প্রযোজক-দের লক্ষ ছিল। এ-দিক থেকে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের "নিশি পোহালে যেয়ো না চলে", উৎপলা সেনের "বাজায়ো না আর মোহন বীণা", মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের "আমি যমুনা কিনারে একা" বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুর-রচনা এবং গাওয়ার গুণে উপরের গানগুলি (প্রথম দুটি সতীনাথের সুরে এবং তৃতীয়টি সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের), এবং প্রায় একই পর্যায়ে রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত ইলা বসুর "গান ফুরালো জলসাঘরে" শুনে সংগীতরসিকরা খুবই তৃপ্তি পাবেন। সুরের মাধুর্য অঙ্গুলিগ্রাহ্য এই কয়েকটি গানেই বেশী পাওয়া গেছে।

সুখশ্রাব্য গান আরও আছে। যেমন, নির্মলা মিশ্রর "যেও না এমন করে" (সুরঃ রতু মুখোপাধ্যায়), দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের "ভেবে তো পাই না ও মুখের সাথে" এবং সুবীর সেনের "না হয় থাকলে আরো কিছুক্ষণ" (অভিজিৎ), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের "যারে যা ফিরে যা" এবং সবিতা চৌধুরীর "ঐ ঘুম ঘুম ঘুমন্ত" (সলিল চৌধুরী), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের "এতটুকু আমি কতটুকু পারি দিতে" (নিখিল চট্টোপাধ্যায়), প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আমার মন-রাধিকার মন ছিল যে" (রবীন চট্টোপাধ্যায়), আরতি মুখোপাধ্যায়ের "চিনেছি চিনেছি তোমার এ মন" (সুধীন দাশগুপ্ত), মৃণাল চক্রবর্তীর "ও রঙিলা পাখি" (শৈলেন মুখোপাধ্যায়), পিণ্টু ভট্টাচার্যের "আমার দুখের রজনী" (অনল চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি। শিল্পীরা গানগুলি গেয়েছেন চমৎকার। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান নিরাশ করেছে। দুটি রোমাণ্টিক গান তাঁর কণ্ঠে নষ্ট হল।

জনপ্রিয় শিল্পীদের অনেকেই নিজেদের গানের সুর নিজেরাই দিয়েছেন। এ'রা হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সুররচনার নিজস্ব ঢঙ এ'রা সকলেই অল্পবিস্তর আবার উপস্থিত করেছেন। অবশ্য 'ফ্যান'দের তা সন্তুষ্ট করতে পারে। তবে মান্না দে ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে নতুনত্ব কম।

গত কয়েক বছর ধরে দেখছি, এবারেও দেখলাম, আধুনিক গানের ভাব ও ভাষা যেন দিনের পর দিন রিক্ত হয়েই চলেছে। কিছুকাল আগে রবীন্দ্রসংগীতের কথা তাঁদের গানে খুঁজে পেতাম। এখনকার দোষ দেখছি পৌনঃপুনিকতা, নিজেদের কথাই নিজেরা বার বার পরিবেশন করে চলেছেন। সুরের সঙ্গে কৃত্রিম কথার যোগান দিচ্ছেন। উদাহরণ দিই, "সে দাগ কখন দাগা পেল", "তাই কি কাঁঠালি চাঁপা পাঠালি রে গন্ধ", "কনক চাঁপা বরণী", এর সঙ্গে "পিছে ফেলে সরণী", "মুখে তার সেই হাসি, সে যে সর্বনাশী", "দুরু দুরু হিয়া ঘিরে মাধবীর কম্পন", "আমার জীবন যেন একটি খাতা", "মাছরাঙা মন যেন কাঁচ-ভাঙা চোখে", "গুণ গুণ গুঞ্জন", "দোল দোল দোলনায় দোদুলে দোদুল দোল দুলেছে", "দুটি চোখে ঝরোঝরো জোছনারি স্বপ্ন", "কার বাঁশীতে বাসন্তী রং" ইত্যাদি। তা ছাড়া "মন পবনের নাও", "বউ কথা কও", "ছেঁড়া খাতার পাতা-গুলো", "রঙের রসের মেলা", "দুখের দেউলে", "ঝরা পাতা", "আলেয়ার পিছে পিছে", "যাক না যা গেছে", "রাতজাগা পাখী", "রঙিলা পাখী", "গানের পাখী", "প্রাণের পাখী", "স্বপ্ন পাখী" প্রভৃতি

কথার বুঝি আর শেষ নেই। বেশীর ভাগ গান লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। একজনকে দিয়ে বেশী গান লেখালে এই বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন সুনীলবরণ, সুবীর হাজরা, সুধীন দাশগুপ্ত, মিণ্টু ঘোষ, সলিল চৌধুরী, প্রণব রায়, শ্যামল গুপ্ত প্রভৃতি। তবে ভাল কথাও এবারকার গানে কিছু পাওয়া গেছে। যেমন, "চোখে অলি বসে আছে ফুলকে যে ভুলে", "মরণটাকে জীবন ভেবে মরেই বেঁচে আছি", "মন আমার পর হয়ে গেছে সেই থেকে, চোখে তার চোখ পড়ে", "গান ফুরালো জলসাঘরে", "আলো জেবলে যাই সবার আঁধারে, নিজের ছায়ায় রহি কাঁদিবারে" ইত্যাদি।

গানের কথার বাধা যত কঠিনই হোক, গায়করা তা বরাবরই কাটিয়ে উঠেছেন। এবারেও তা পেরেছেন। পুজোর গান অন্য বছরের তুলনায় এ বছর ততটা চিত্তাকর্ষক না হলেও কয়েকটি আধুনিক গান (বলা বাহুল্য, এই সমালোচকের মতে) হাটে-বাজারে, পুজোর প্যাণ্ডেলে, অনুরোধের আসরে বাজবে। গানগুলি হল: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "চলে চলে", শ্যামল মিত্রের "এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে", উৎপলা সেনের "আজ থেকে সেই অনেক দিনের পরে", ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের "আমার হু হু করে বুক", ইলা বসুর "কথা কইতে জানা নয়ন" এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের "সুখের পৃথিবী দিয়েছে ফিরায়ে।"

নির্মলেন্দু চৌধুরীর দুটি লোকসংগীত ("ও বনহস্তিনী, ও মেঘবরণী" এবং "ও নদীরে ও মোর তিস্তারে") প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। মেজাজ ও সুর-রচনার দিক থেকে এত ভাল গান পুজোয় এর আগে শিল্পীর কাছ থেকে পাইনি। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া রজনীকান্তের দুটি গান ("মাগো এ পাতকী যদি ডুবে যায়" ও "কুটিল কুপথ ধরিয়া") পুজোর গানের ডালি সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

কৌতুকের আয়োজনও এবার কম নয়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহকারী চিন্ময় রায় উপহার দিয়েছেন "হরিদাস পালের গুপ্তকথা" কৌতুক-নক্সা (রূপদর্শী রচিত)। রূপদর্শীর রচনা পড়তে হয়ত বেশী ভাল লাগে। তবে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরস বাচনভঙ্গির গুণে রেকর্ডেও কৌতুক-নক্সাটি উপভোগ্য। কৌতুক-গীতিতে মিণ্টু দাশগুপ্তের জুড়ি নেই। দুটি জনপ্রিয় গানের 'প্যারডি' তিনি উপহার দিয়েছেন। 'মণিহার' ছবির "নিঝুম সন্ধ্যায়" গানটির ভাষান্তর শ্রোতাদের হাসাবে। বেশ কালোপযোগী কথা। দুটি গানেরই কথা তিনি সুন্দর-ভাবে পাল্টে নিয়েছেন। তাঁর গাওয়ার মধ্যেও কৌতুকের এমন একটি রেশ আছে যা শিল্পীর জনপ্রিয়তা বাড়াবে।

রূপছায়া চিত্রর "খেয়া"-র শুটিং আরম্ভ হয়েছে—সেটে অনুপকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

ইলেকট্রিক গীটারে শ্রীসুনীল গাঙ্গুলীর চারটি বাজনা যাঁরা ফিল্মের গান পছন্দ করেন তাঁদের ভাল লাগবে। চারটি গানই হিন্দী ফিল্ম থেকে বাছাই করা হয়েছে। বাদক হিসাবে শিল্পীর নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

মেগাফোন

মেগাফোনের এবারকার শারদীয়া উপহারে বৈচিত্র্য আছে। গানের চেয়ে সুর, সুরের চেয়ে কথাই তাঁরা এ-বছর বেশী দিয়েছেন। লং-প্লেয়িং রেকর্ডে (৩৩⅓ আর পি এম) বারোখানি রবীন্দ্রসংগীতের সুর (আমি তোমায় যত, ধ্বনিল আহবান, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, আলো আমার আলো, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা, আজি বিজন ঘরে, আমার পরাণ যাহা চায়, একটুকু ছোঁয়া লাগে, আমার হৃদয় তোমার আপন হাতে, আমি চিনি গো চিনি তোমারে) বটুক নন্দী ইলেকট্রিক গীটারে বাজিয়েছেন। তা-ছাড়া অপর একটি রেকর্ডে (৭৮ আর-পি-এম) তিনি 'মণিহার' ছবির দুটি গানের (আষাঢ় শ্রাবণ মানে না ও নিঝুম সন্ধ্যায়) সুর শুনিয়েছেন। তাঁর আঙুলের স্পর্শে যেন জাদু আছে, গীটার কথা বলে। শ্রীনন্দীর বাজনা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করবে। মেগাফোনের অপর বিশেষ উপহার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতা (বাঁশী, দুরন্ত আশা, ঝুলন, ঝড়ের দিনে) শিল্পী কখনও উদাত্ত, কখনও মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন (এক্সটেনডেড প্লে রেকর্ডে)। অভিনেতা বিশ্বজিৎকে দিয়ে গান গাইয়ে মেগাফোন কোম্পানি শিল্পীর ফ্যানদের ধন্যবাদার্হ হবেন। ফিল্ম স্টারকে দিয়ে দুটি আধুনিক গান গাওয়ানো মোটেই 'স্টাণ্ট' হয়নি। বিশ্বজিৎ সত্যিই ভাল গাইতে পারেন। আশঙ্কা হয়েছিল ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। মোটেই তা নয়। বিশ্বজিতের গলায় সুর আছে, তাঁর তালজ্ঞান রয়েছে। দুটি গান "কি মিষ্টি লাগল যে" এবং "বলাকা ও বলাকা"—নচিকেতা ঘোষের সুন্দর সুরে বিশ্বজিৎ যোগ্যতার সঙ্গে গেয়েছেন। কালীপদ সেনের সুরে রুমা গুহঠাকুরতা গেয়েছেন "মানিনী মন রেখো না" ও "সখি জল আনিতে চল"। শিল্পীকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ালেই ভাল হত। তন্ময় চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন দুটি রবীন্দ্রসংগীত "অনেক কথা বলেছিলেম" ও "পথিক মেঘের দল"। শিল্পী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন।

জহর রায়ের এবারকার কৌতুক-নক্সার নাম "শ্যালে শ্যালে কোলাকুলি"। শুনতে শুনতে হাসতে হাসতে দম আটকে যায়।

অতুলপ্রসাদের জন্মোৎসব

কল্যাণী টাউন ক্লাব অতুলপ্রসাদের ৯৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে মহালয়ার দিন এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। ধারাভাষ্যপাঠের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গান অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে। ৮ ও ৯ অক্টোবর ক্লাবের মঞ্চে অভিনীত হয় দুটি নাটক : "জীবন ও যৌবন" এবং "অংশীদার"।

সুরেশ সংগীত সংসদ

পরলোকগত সংগীতবিদ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিরক্ষা এবং সংগীতশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। নাম : সুরেশ সংগীত সংসদ। সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের অবসান এই সপ্তাহের বিশেষরূপে উল্লেখজনক ঘটনা। একটানা সাতাশ দিন কর্মবিরতি, অবস্থান সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য এই তিন পর্যায়ের আন্দোলনের পর ৮ অকটোবর নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করেছেন। ১০ অকটোবর থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদিগকে সমিতি কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ধৃত শিক্ষকদের মুক্তিদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলে নির্দেশ দিয়েছেন। আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের শাস্তিদান সম্বন্ধে যে সারকুলার দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করা হবে এবং পূজার আগে সরকারী সাহায্যের ও সরকারী মহার্ঘ ভাতার টাকাও বিদ্যালয়গুলিতে দ্রুত পাঠান হবে—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন, শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীযতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে একথা জানান। ১০ সেপটেমবর থেকে রাজ্যের চার হাজার বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কর্মবিরতি, ১৩ সেপটেমবর থেকে অবস্থান সত্যাগ্রহ ও ২৬ সেপটেমবর আইন অমান্য শুরু হয়। আইন অমান্য করে ২২৬৬ জন শিক্ষক কারাবরণ করেন। শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহার করায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিংহ আনন্দ প্রকাশ করেন। ১০ অকটোবর সোমবার স্কুলগুলি খুলবে।

দেশী সংবাদ

৩ **অকটোবর**—সম্প্রতি বেশ কয়েকবার ভুটানের চুম্বি উপত্যকার দক্ষিণে ডোলকার পশুচারণ এলাকায় চীনা অনুপ্রবেশ ঘটেছে। চীনা সৈন্যরা সেখানে নতুন নতুন পরিখাও খনন করেছে।

সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, আজ অপরাহ্নে মারমুখো ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস দ্বারভাঙ্গা মেলা প্রাঙ্গণে আত্মরক্ষার্থ গুলি চালায়। এ ছাড়া কানপুরের এক সংবাদে জানা যায় যে, সেখানে আজ পুলিসের সঙ্গে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ছাত্ররা গেরিলা কায়দায় পুলিসের সঙ্গে লড়াই করেন।

৪ **অকটোবর**—চলতি মাসের শুরুতেই ২৪ পরগনা, হাওড়া ও নদীয়া জেলার আংশিক রেশনে চাল দেওয়া প্রায় বন্ধ। কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেড় লক্ষ টন চালের। কিন্তু দিয়েছেন মাত্র এক লক্ষ টন। কাজেই এই তিনটি জেলায় আংশিক রেশনে আর চাল দেওয়া যাবে না। তবে গম দেওয়া হবে।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ছাত্র হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আজ কানপুরে একদল মারমুখো ছাত্রকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস গুলি ও কয়েক স্থানে লাঠি চালায়। কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক নিয়ে ১৮ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় একটি কলেজ প্রাঙ্গণে পুলিসের সঙ্গে ছাত্রদের জোর লড়াই চলে।

৫ **অকটোবর**—আজ ইমফলে প্রাপ্ত এক সরকারী সংবাদে জানা গিয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে তিন মাস সামরিক শিক্ষা গ্রহণের পর বৈরী নাগা মিজো ও পাইতেদের তিন শত লোকের এক মিশ্র দল মণিপুরে প্রবেশ করেছে।

সাম্প্রতিক ছাত্র-অশান্তির কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী নন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। উঁচু ক্ষমতার অধিকারী ওই কমিটিতে আছেন—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী সি ডি দেশমুখ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি এস কোঠারী, যোজনা কমিশনের সদস্য ডঃ ভি কে ভি রাও, প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডঃ শ্রীনিবাসন এবং জাতীয় সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীর ডিরেকটর জেনারেল মেজর জেনারেল বীরেন্দ্র সিং।

৬ **অকটোবর**—কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরাসরি 'যথেচ্ছাচারের' অভিযোগ করে পশ্চিম বাংলার অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে এক পত্র পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে এযাবৎ রাজ্য সরকার 'নেকস্ট' বিলে। রুলের অপপ্রয়োগের দ্বারা যে কয়েক লক্ষ টাকার অপচয় করেছেন, তা যাতে উদ্ধার করা যায়, সেজন্য অ্যাকাউনটাানট জেনারেল স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে অনুরোধ করেছেন।

বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ আজ দেরাদুনে ছাত্র-পুলিস সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছে। প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিসের জনৈক সুবেদার, একজন কনেস্টবল ও কয়েকজন হোমগার্ড আহত হয়েছে।

৭ **অকটোবর**—আজ ফিরোজাবাদে মারমুখো ছাত্র-জনতার ওপর পুলিস গুলি চালালে একজন নিহত ও ছজন আহত হয়। সহর্ষতেও উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের উপর পুলিস গুলি চালায়। বিহারের ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনা ঝরিয়া, সাহেবগঞ্জ, কাটিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ছাত্র-বিক্ষোভের বিস্তার ঘটেছে।

খাদ্যসংকট তীব্র আকার ধারণ করার দরুন আসামে গোলপাড়া জেলার কোকরাঝরা মহকুমার ১১টি ক্ষেত্রে পিতামাতা সন্তান বিক্রি করেছেন বলে একটি স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি শিশু নাকি ১০০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে বিক্রীত হয়েছে।

৮ **অকটোবর**—কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন, যেন রাজ্যের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ অন্তত ২০০ কোটি টাকা কমানো হয়। রাজ্য সরকার যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তাতে প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১৮ কোটি টাকা; দিল্লি সেটাকে ছেঁটে ৪২০ কোটিতে দাঁড় করাতে চান। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন যে, বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য আলাদা করে তাঁরা কোন টাকা দিতে পারবেন না।

৯ **অকটোবর**—সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভের মোকাবিলা যেভাবে করছেন আজ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তার সমালোচনা করা হয়। সদস্যরা ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ও তাঁদের নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

আজ নয়াদিল্লিতে ছাত্রবিক্ষোভ শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে আলোচনার উপসংহারে সভাপতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী সি ডি দেশমুখ বলেন : বর্তমান ছাত্রবিক্ষোভকালে পুলিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

৩ **অকটোবর**—আজ জাকরতায় প্রেসিডেনট সোয়েকারনের বাসভবনের সামনে সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে ৪০ জন আহত হন। এঁরা সেখানে বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন।

৪ **অকটোবর**—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের ঢাকার সংবাদে বলা হয়েছে যে, গত শনিবার যে ঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছে তাতে দু' হাজার লোক মারা গিয়েছে। কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছে, মৃতের সংখ্যা তিন হাজারও হতে পারে।

৫ **অকটোবর**—চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীচেন ই পাকিস্তানকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় পাকিস্তান চীনের বন্ধুত্ব এবং সেই সঙ্গে সবরকম সাহায্যই পাবে।

৬ **অকটোবর**—কাঠমানডুতে আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সহায়তায় নির্মিত সুন্দরীজাল প্রকল্পের উদ্বোধনকালে প্রতিশ্রুতি দেন যে, নেপালের তৃতীয় যোজনা রূপায়ণে ভারত ৪০ কোটি টাকা সাহায্য দেবে।

৭ **অকটোবর**—আজ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং অবিলম্বে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, একমাত্র এই পথেই ভিয়েতনাম সমস্যাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আলোচনা বৈঠকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

৮ **অকটোবর**—ইনদোনেশীয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবানদ্রিয়োর বিরুদ্ধে মামলায় প্রদত্ত এক সাক্ষে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রেসিডেনট সোয়েকারন একবার ইনদোনেশীয় কমিউনিসট নেতা ডি এন আইদিতের নিকট থেকে একটি পত্র পেয়েছিলেন। এই পত্রে কমিউনিসটপন্থী বিপ্লবকে কীভাবে কার্যকর করতে হবে তার একটি পরিকল্পনা দেওয়া ছিল।

৯ **অকটোবর**—এক বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর মতে : ভবিষ্যতে চীনের সম্ভাব্য পারমাণবিক আক্রমণের হাত থেকে ঠিকমত আত্মরক্ষা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারবে না। পারমাণবিক আক্রমণ রাশিয়া থেকে এলে তো পারবেই না।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুস্থ, চকচকে চুলের জন্য...
টাটার সুগন্ধিত
কোকোনাট হেয়ার অয়েল
যাতে আছে বিশুদ্ধ নারকেল তেল।
বিচক্ষণ মায়েরা জানেন যে টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েলে শুধু বিশুদ্ধ নারকেল তেল আছে। ওতে চুলের গোড়া পুষ্ট করে, চুল ঘন ও সুস্থ ক'রে তোলে। টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল চার রকমের মনোরম সুগন্ধে পাওয়া যায়—গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার, চামেলী ও পুষ্পা।
Tatas Perfumed
HAIR OIL
COCONUT
LAVENDER
BENSONS/I-TCO.94 BEN

Kleertone
ক্লীয়ারটোন সুরুচি ও
মিতব্যয়িতার স্বাক্ষর !
ইস্ত্রি ঃ
"এলিপ্যান্ট" ইস্ত্রি
"সুপার" অটো কণ্ট্রোল
"ইম্পিরিয়াল" স্বয়ংক্রিয় ইস্ত্রি

কেটলি ঃ
তাপ-প্রতিরোধক হাতল, ঢাকনির উপর
গোল হাতল ও পায়া সমেত "ইম্পিরিয়াল"
কেটলি, সসপ্যান কেটলিও
পাওয়া যায়

টোস্টার ঃ
টোস্টের জন্য
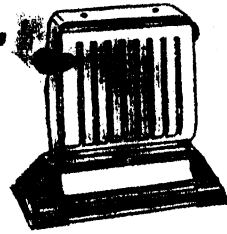
র‍্যাডিয়েন্ট হট প্লেট ঃ
ঝামেলা নেই, খরচ নেই—
আপনার রান্নাকে সহজ করে তোলে
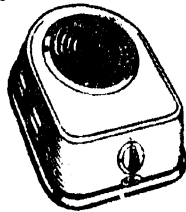
ফোল্ডিং স্টীল ফার্নিচার ঃ
দেখতে সুন্দর, দামেও কম
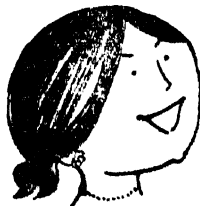
এই সব ক্লীয়ারটোন সামগ্রী ব্যবহার করলে আপনি
নিরাপত্তা ও দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে
পারেন। আর সারিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোন ভাবনা
নেই, কেননা ভারতের যে কোন জায়গাতেই এগুলি
সারিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া
সমস্ত উৎপাদনই ১-বছরের জন্য গ্যারাণ্টিযুক্ত।

GRA
সব বড় ইলেক্‌ট্রিকের দোকানে এবং নীচের ঠিকানায়ও পাওয়া যায়
জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস্ লিমিটেড
বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বাঙ্গালোর, সেকেন্দ্রাবাদ ও পাটনা
চান যদি উন্নত জীবনযাপন, নিন তবে ক্লীয়ারটোন উৎপাদন

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম তো নয়, যেন জাদু—শীলার মুখ দেখেই তা বোঝা যায়

মাত্র ৭ দিনেই মুখখানি কত পরিষ্কার, কত মসৃণ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে

মনে হয়েছিল, জীবনটা বুঝি একা-একাই কাটিয়ে দিতে হবে। বিয়ের স্বপ্ন ছিল আমার কাছে আকাশ-কুসুম।

আমার খুঁতটা ছিল কোথায়? টানা টানা চোখ, মুক্তোর মত দাঁত—কিন্তু হায়, মুখের ত্বক? একেবারে রুক্ষ, শুকনো শ্রীহীন। ভাবলাম, তাড়াতাড়ি একটা কিছু না করলেই নয়!

আমি পণ্ডস-এর ৭ দিনে সুন্দর হবার নিয়ম মেনে রোজ রাত্তিরে দুবার পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখতে লাগলাম। প্রথমবার মাখতেই দেখি মেক-আপ সম্পূর্ণ উঠে যায়।

দ্বিতীয় বারে, সাবানও নাগাল পায়না এমন সব লুকনো ময়লা বেরিয়ে আসে। পণ্ডস কোল্ড ক্রীমে এভাবে আমার ত্বক কোমল হতে লাগল—মুখের শ্রী ফিরতে লাগল।

অবাক হয়ে গেলাম! মাত্র ৭ দিনে কোথায় গেল সেই খসখসে ভাব? মুখখানি হয়ে উঠল কমনীয় সুন্দর, আর সেই সঙ্গে আমার কপালও খুলল:—বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল!

ভুলেও আর গায়ের এমন রঙকে, এমন মুখশ্রীকে আমি মাটি হতে দেব না। পণ্ডস-এর ছোঁয়ায় এখন থেকে আমার মুখে জেগে থাকবে রমনীয় লাবণ্য আর আমার সৌন্দর্য থাকবে অটুট।
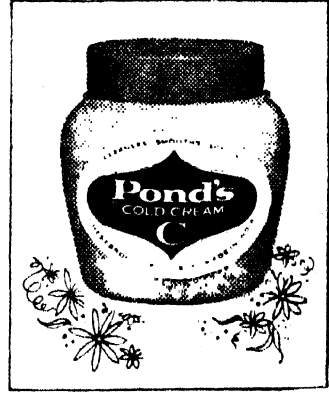
বিনামূল্যে '7 DAYS TO BEAUTY' পুস্তিকার জন্যে ১৫ পয়সার ডাকটিকিট সহ

এই ঠিকানায় চিঠি দিন:

JWT/P 4569

চীজব্রো-পণ্ডস্ ইন্‌ক্‌, ডিপার্টমেণ্ট ১৩, ১৩, গানবো স্ট্রীট, বোম্বাই—১

নতুন ধরনের উপন্যাস

অদ্বিতীয়া ॥ সুশীল রায়

সুশীল রায় সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অতি সুপরিচিত নাম। রবীন্দ্রানুজ যে স্বল্প কয়েকজন সাহিত্যিক সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সমান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, সুশীল রায় তাঁদের মধ্যে শুধু 'একজন'ই নন, 'বিশিষ্টজন'। তাঁর রচিত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা প্রভৃতি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

"অদ্বিতীয়া" সুশীল রায়ের সব-নতুন উপন্যাস। অদ্ভুত এর কাহিনী; আশ্চর্য এর বয়ন-নৈপুণ্য। উপন্যাস রচনার যাবতীয় প্রচলিত এবং স্বীকৃত রীতিনীতি এতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত; অথচ এর কাহিনী উপস্থাপন-পদ্ধতি, রচনাভঙ্গি, পরিবেশন-বৈশিষ্ট্য—সব মিলিয়ে পাঠকের মনে এমন একটা গভীর ছাপ এঁকে যায়, যা একমাত্র কোনও মহৎ সাহিত্যই পারে। যেসব পাঠক 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ' পেলেই খুশী হন, যেহেতু তাতেই তাঁদের অশেষ তৃপ্তি, এ উপন্যাস তাঁদের জন্য নয়; বরঞ্চ নতুনের অভ্যর্থনায় যাঁরা আগ্রহোন্মুখ, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যাঁদের সসম্মান সমাদর সদা-উদ্‌গ্রীব, "অদ্বিতীয়া" শুধু তাঁদেরই জন্য। দাম ৪·০০

সদ্য প্রকাশিত হল

---

০ নানা স্বাদের আকর্ষণীয় গ্রন্থ ০

কাশ্মীর '৬৫ ॥ আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন ॥ ১০·০০

মেঘ বৃষ্টি রোদ ॥ রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৩·০০

ঠগী ॥ শ্রীপান্থ ॥ ৫·০০

প্রেম ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৪·০০

ণক সংহিতা ॥ কালিদাস রায় ॥ ৩·৫০

সম্পাদকের বৈঠকে ॥ সাগরময় ঘোষ ॥ ৬·০০

ইন্দ্রজিতের আসর ॥ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ৩·০০

তপস্বী ও তরঙ্গিণী ॥ বুদ্ধদেব বসু ॥ ৩·০০

শ্রীগৌরাঙ্গ ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

[illegible] প্রচারিত
[illegible] শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ
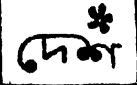
৩৩ বর্ষ ॥ ৫১ সংখ্যা
শনিবার ৫ কার্তিক ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
[illegible] পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা ১
[illegible] শ্রীজানকীকুমার [illegible]
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
[illegible] ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
[illegible] ২৫.০০
[illegible] ১২.৫০
[illegible] ৬.২৫

মফঃস্বলে
[illegible] ২৭.০০
[illegible] ১৪.০০
[illegible] ৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
[illegible] ২৭.০০
[illegible] ১৪-০০
ত্রৈমাসিক .. ৭.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ-ডাকে)
[illegible] ৪৬-০০
[illegible] ২৩.০০
[illegible] ১১.৫০

[illegible]
(বিমান-ডাকে)
[illegible] ৩১.০০
[illegible] ১৬.০০
[illegible] ৮.০০

[illegible] পয়সা
[illegible] (অতিরিক্ত) [illegible]

DESH

Saturday 22 October 1966

দুর্গোৎসব

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে—এ শুধু কবির কথাই নয়, একদা বাংলা দেশের হৃদয়ে দুর্গোৎসবের যে প্রতিষ্ঠা ছিল তার বুঝি তুলনা নেই। শরতের নীল আকাশ, স্বচ্ছ রৌদ্র, কাশ ফুল, পরিপূর্ণ জলাশয়, মাঠে মাঠে ধান আর আগমনীর গানে যে সুর বাজত তার সবটাই ছিল উমার পিতৃগৃহে আসার মধুর ভূমিকা। কন্যাকে নিজগৃহে আনার এত সাজসজ্জা, এত আমন্ত্রণ, এমন অপেক্ষা বুঝি আর কোথাও দেখা যাবে না। বাংলার আকাশ, মাঠ, ফল, ফুল, মানুষ—সবই যেন এই মোহন রূপে রূপময় হয়ে উঠত। সেই বাংলার আজ দ্বিখণ্ডিত অবস্থা, এক খণ্ডে পড়ে আছে নদীমাতৃক বাংলার একটি বিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ হৃদয় আর এ-খণ্ডে আমাদের দুঃখ-দৈন্যভরা মন আর সেই শরৎ প্রকৃতি। তবু দুর্গোৎসব আমাদের সম্বৎসরের অপেক্ষার বস্তু, শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের যতটা হৃদয়ের যোগাযোগ ঠিক ততটাই সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজনে বন্ধু-বান্ধবে প্রতিবেশীতে পরস্পরের সঙ্গে আমরা যেন এই আনন্দ ভাগ করে নি, নিয়ে আনন্দ পাই।

সেই আনন্দের আজ কতটা অভাব ঘটেছে সবিস্তারে তা বলে লাভ নেই। এটা ঠিক, পূর্বের দুর্গোৎসবের সঙ্গে আজকের অনেক তফাত। সমাজের সেই চেহারাও আজ বদলে গেছে। তখনকার দিনে যা ছিল অন্তরের বস্তু, শান্ত ও স্নিগ্ধ আজ তা প্রখর ও প্রবল বললে ভুল হয় না। মানুষের মনও একালে কিছু কম বদলায় নি। আজ শহুরে জাঁক, সময়ের ঢেউ এসে পড়েছে মাথায়। তাঁতের শাড়ির চেয়ে ডেকরনের খাতির বেশী, আলতার চেয়ে নেল-পালিশের। ধুতি পাঞ্জাবি বুঝি উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে যুবক মহলে—তার জায়গায় টেরিলিন পাত পেড়েছে। পুজোমণ্ডপে যত বেশী মাইক আর আলোর খেলা তার দশ ভাগের এক ভাগও ঢাক কি সানাই বাজে না। মনে হয়, আমাদের দৃষ্টিটা এখন প্রতিমার ওপর ততটা নয় যতটা প্যাণ্ডেলের ওপর; অর্থাৎ চোখের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও একটা পরিবর্তন এসেছে সব দিক দিয়ে, ভক্তি শ্রদ্ধা না থাক আড়ম্বর যেন থাকে। এদিক থেকে আমরা কি হারিয়ে কি পেতে যাচ্ছি তার কথা নাই বা বললাম। তবে, সময়ের পরিবর্তনটুকু মানে মানে মেনে নেওয়াই বুঝি ভাল।

এ-বছরের দুর্গোৎসব সম্পর্কে আমাদের কিছু আশংকা ছিল। যেরকম আবহাওয়া হয়ে এসেছিল তাতে উদ্বিগ্ন বোধ না করে পারি নি। সৌভাগ্যের বিষয়, এখন পর্যন্ত এমন কিছু ঘটে নি যাতে পুজোর দিনগুলি বেদনাদায়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকল। তবে, বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তাতে স্বস্তি লাভেরও কোনো কারণ নেই। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ভাল নয়, নানা দুর্গতিতে সেখানের মানুষ পীড়িত। অনেকগুলি জেলায় বৃষ্টির স্বল্পতা হেতু ফসলের ফলন ভাল না হবার কথা শোনা যাচ্ছে, তার ওপর অনটন ও অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। শহরের অবস্থাও কিছু ভাল না, সাধারণ মানুষ নানাভাবে পীড়িত হচ্ছে, রেশনের চাল গম ছাড়া আর কোথাও যেন ধরা বাঁধা কোনো দাম নেই, কাপড় চোপড় থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সব জিনিসেরই দাম চড়ে গেছে। পুজোর সময় দুজন আত্মীয় অতিথি হিসেবে বাড়িতে এলে তাকে আদর আপ্যায়ন করাই মুশকিল। তবু এত কষ্টের মধ্যেও যে যার সামর্থ্য মত পুজোর উৎসবটুকু পালন করতে কার্পণ্য করছে না। দু দণ্ড শান্তি, একটু বিশ্রাম, সংসামান্য আনন্দ লাভের জন্যে আমাদের কী প্রাণান্ত চেষ্টা। মনে হতে পারে এই চড়া-বাজারেও যখন পুজোর ভিড় গিজগিজ করছে, যখন দেশভ্রমণের জন্যে মাথাফাটাফাটি আর ঘর্মপাত তখন বুঝি আমরা বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। দুঃখের বিষয় অর্থনীতির হিসাব এখানে অচল; বরং এই ভিড় ও উত্তেজনার পিছনে আমাদের যে নিঃস্বতা, ক্লান্তি ও ক্ষণিক সুখের মুখ দেখার বেপরোয়া চেষ্টা রয়েছে তার কথা কারও অজানা নয়। যাই হোক, নিরানন্দের দিনে দু দিনের আনন্দ যদি জোটে তাতেই বা ক্ষতি কি!

এই দুর্গোৎসবের চেহারাটুকু কোথাও যেন আর বিষণ্ণ না হয় আমরা সেই কামনা করি। শত কষ্টের মধ্যেও বাঙালীর সম্বৎসরের দুর্গোৎসবটুকু নির্বিঘ্ন ও আনন্দময় হোক।

...য় পরনির্ভরতার অবসান ...ে কর্তব্য

...নাইটেড নেশনস কর্তৃক সৃষ্ট খাদ্য ও ...ষি সংস্থা—ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকাল-...র্গানাইজেশন, সংক্ষেপে যার নাম ...-ও—তার বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ ...৯৬৫-৬৬ সালে পৃথিবীর মোট খাদ্য ...ন আগের বছরের চেয়ে ভালো হয় ...দিও এক বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ...কোটি বেড়েছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ ...রিকা এবং প্রাচ্য দেশগুলিতে খাদ্য ...ন মাথাপিছু চার থেকে পাঁচ শতাংশ ...। উত্তর আমেরিকায় চার শতাংশ ...়, পশ্চিম ইউরোপে নয় শতাংশ ...। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে ও সোভিয়েট ...নে কিছু কমেছে।

...-এ-ও'এর ডিরেক্টর জেনারেল-এর ...র্ট প্রকাশিত আর একটি বিশেষ ...যোগ্য তথ্য হচ্ছে এই যে, উত্তর ...রিকায় যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ...ছিল এবং যেখান থেকে ভারত ও অন্যান্য খাদ্য-ঘাটতির দেশে গত কয়েক বছর ধরে খাদ্য আমদানি চলছিল সেই মজুতের পরিমাণ যে-স্তরে নেবে গেছে, গত দশ বছরের মধ্যে তত নিম্নস্তরে কখনো নামে নি। সুতরাং খাদ্য রপ্তানি করা সম্পর্কে আমেরিকা আরো কড়াকড়ি করবে, যারা ধারে কিনতে চায় তাদের আরো শক্ত শর্ত মেনে নিতে হবে। বিদেশ থেকে আগত খাদ্যের উপর নির্ভরশীলতার জন্যে ভারতবর্ষকে যে-মূল্য দিতে হচ্ছে তার স্বরূপ দেশের লোকের কাছ থেকে যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা "সরকারী মুখপাত্রদের" একটা প্রধান কাজ হয়েছে। সরকারী কর্তাদের নিজেদের দৃষ্টিও এই ব্যাপারের তলা পর্যন্ত সব সময়ে পৌঁছায় কিনা সন্দেহ। মাঝে মাঝে ধ্বনি ওঠে "খাদ্যে ভারতবর্ষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই হবে" এবং খাদ্য বাড়াবার জন্যে নানা স্কীমের খসড়া তৈরি হয়, তার কোনোটা কাগজপত্রেই থাকে, কোনোটাকে কাজে খাটাবার চেষ্টা হয়, যেগুলো কাজে খাটাবার চেষ্টা হয় সেগুলোর মধ্যে ক্বচিৎ দু-একটা স্থায়ী এবং সার্থকভাবে চালু থাকে। সোজাসুজি খাদ্যশস্য আমদানি না করেও বিদেশীর প্রভাবাধীন হওয়া যায় যদি উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো অংশ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বিদেশীর করতলগত হয়। যেমন, যদি বেশি করে কেমিক্যাল সার ব্যবহারের উপর উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে এবং সেই সার দেশেই উৎপন্ন করার ব্যবস্থা হয় কিন্তু সেই সারের কারখানা এবং সারের ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব যদি অংশত বিদেশীর আয়ত্তাধীন হয় তাহলে সেই পরিমাণ পর-নির্ভরশীলতা থেকেই যাবে। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিকে একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা বলে যেমন ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং অনতিবিলম্বে তার অবসান হবে বলে আশা দেওয়া হয়েছিল, তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশীর হস্ত প্রবেশের ব্যাপারটাকেও একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা বলে চালানো

'কোথায় পাবো তারে'

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-এর পরে, দেশ পত্রিকায় কালকূটের দ্বিতীয় রচনা 'কোথায় পাবো তারে' আগামী ১৯শে নভেম্বর থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

হবে। এবং তার ফলও একই রকম হবে অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য পেছুতেই থাকবে, বিদেশীর উপর নির্ভরতা কোনো না কোনো আকারে থেকেই যাবে—"অন্ন দাসত্ব" ঘুচবে না।

যে-গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বেরুবার কি কোনো উপায় নেই? একটা উপায় তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটাও আমেরিকার হাতে। আমেরিকা যদি বলে, "কোনো শর্তেই আর তোমরা আমাদের কাছ থেকে খাদ্য পাবে না।" তাহলে আমাদের "স্বয়ংসম্পূর্ণ" হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। না, কেবল আমেরিকা "না" বললেই হবে না। আমেরিকা না দিলেও আর পাঁচ দুয়ারে ঘুরে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করা যেতে পারে. অন্তত পক্ষে যতদিন অন্যত্র থেকে কিছু পাবার ভরসা থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষা করতে যারা অভ্যস্ত হয়েছে তাদের বাইরে তাকানো বন্ধ হবে না।

পনেরো বছরের অভিজ্ঞতার ফলে ভিক্ষার কৌশল আয়ত্ত করার ব্যাপারে নয়াদিল্লি একটা দক্ষতা অর্জন করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল এই যে, এই ব্যাপারে যাঁরা দক্ষতালাভ করেছেন তাঁদের দ্বারাই আবার ঠিক একটা উল্টো ধরনের কাজের অর্থাৎ আত্মনির্ভরতা অর্জনের কাজের সফল নেতৃত্ব কেমন করে সম্ভব? সুতরাং একটা আমূল নড়াচড়া ছাড়া ভারত যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে এ আশা করা ক্রমশই কঠিন হচ্ছে।

অন্তত পক্ষে কিছুকালের জন্যে খাদ্য এবং আরো দু'-একটি ব্যাপারে যদি আমরা বাইরের পৃথিবীকে ভুলে থাকার মতো সাহস করতে পারি তাহলেই প্রাণে বাঁচার এবং স্বাধীনতা রক্ষার উপায় হতে পারে। কোনো কিছু পরিকল্পনার কথা উঠলেই আমাদের প্রথমেই যে-চিন্তা মনে আসে সেটা হচ্ছে আমেরিকা বা রাশিয়া বা আর কারো কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে? কোনো কারণে যদি আমেরিকা এবং রাশিয়ার সঙ্গে যোগ রাখা আমাদের সম্ভব না হয় তাহলে কি ভারতবর্ষ বাঁচবে না, বাঁচতে পারবে না?

এমনও হতে পারে যে, রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বেধে গিয়ে দুই-ই সাংঘাতিকরকম জখম হয়ে গেল। যারা নিউক্লিয়ার মারণ অস্ত্র পৃথিবীতে এনেছে সেই অস্ত্রের আঘাত তাদের গায়ে কোনো দিন লাগবে না এরূপ বিশ্বাস না করাকে পাগলামি বলা যায় না। মাও-সে-তুং অবশ্যি মনে করেন যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ফল চীনাদের পক্ষে ভালোই হবে—চীনা কিছু মারা গেলেও বাকী যথেষ্ট সংখ্যায় থাকবে যারা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারবে। ভারতবর্ষ এইভাবে লাভবান হবার কথা ভাবতে পারে না, হয়ত চীনারাও যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ চায় তা নয়, নিউক্লিয়ার অস্ত্র দেখিয়ে চীনাদের ঘায়েল ভয় দেখাতে চায় মাও-সে-তুং-এর কথা হয়ত তাদেরই উত্তর দেবার জন্যে। যাই হোক ভারতবর্ষ নিউক্লিয়ার যুদ্ধ চায় না কিন্তু নিউক্লিয়ার যুদ্ধ যদি বেধেই যায় এবং ভারতবর্ষ কোনো রকমে তার আঁচের বাইরে থাকতে পারে তাহলে কি সে বাঁচতে পারবে না যদি আমেরিকা রাশিয়ার কাছ থেকে আমাদের খাদ্যে বা শিল্পে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়? তখন যদি রাশিয়া এবং আমেরিকার সাহায্য ছাড়া বাঁচার কল্পনা ভারত করতে পারে তাহলে সে কল্পনা এখন কেন অসম্ভব হবে একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক না?

১৬।১০।৬৬

কংগ্রেস প্রার্থী
আসন্ন নির্বাচনে
কংগ্রেস-প্রার্থী তালিকা
অনুমোদন লাভ করেছে।
বাঁকুড়ার ঘোড়ারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত
পূজায় পুণ্যস্নান।
বিভিন্ন ক্ষেত্রে
রুশ-মার্কিন
বিরোধের অবসান
আসন্ন। হাইড্রো-
জেন বোমাই
সেতুবন্ধের
কাজ করছে।

'এবার পুজোয়'

অনাবৃষ্টির অনেক রুক্ষ কঠিন মাটিতে এখনো লাঙলের আঁচড় পড়ল না; আমন ধানের আনন্দ-সম্ভার দূরে থাকুক, রবিশস্যের সম্ভাবনাও বিলীন—কৃষকের

চোখে দুর্দিনের আতঙ্ক; ক্ষোভ, অনিশ্চয়তা, যন্ত্রণা, অবিশ্বাস আর গ্লানি। তবুও শরৎ। কলকাতা থেকে দু পা বাড়ালেই কয়েক গুচ্ছ কাশের ফুল, কিছু লাল-সাদা শালুক, ক'টি পদ্মের কুঁড়ি; বুনো হাঁসের আসবার খবর কলকাতার নিউ মার্কেটে পাখির বাজারে—আদিগন্ত বিল আর জলার স্বপ্ন নিয়ে শহরের খাঁচায় অপেক্ষা করছে কাটিকেঁটিয়া, সরালি, লালশর—ভাগ্যবানদের খাওয়ার টেবিলে জায়গা হবে তাদের; নীল পাহাড়ী নদীর রুপোলী বালি থেকে চলে এসেছে স্নাইপেরা, পোকা-মাকড়ের সঞ্চয় ভরা মাঠ থেকে এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে বগেরি—কেউ রোস্ট হয়ে, কেউ মোগলাই হয়ে স্বাদবৈচিত্র্য-সন্ধানীর রসনাকে রসায়িত করবে।

এই সব খাঁচার পাখি—এই শরৎ—কোথায় একটা মিল আছে এদের মধ্যে। বাঙালী কবির সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে আসে : "যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইয়ে মাংস খোড়ে।" কিন্তু কী হবে এ-সমস্ত তত্ত্ব কথায়, বিষণ্ণ ভাবনায় পা বাড়িয়ে? তার দিন সামনে অনেক পড়ে আছে। আপাতত ভৌগোলিক শরৎ, ক'টি ছুটির দিন, কিছু চাঁদার যন্ত্রণা আর আমাদের শারদোৎসব—বাঙালীর দুর্গাপুজো।

মনে আসছে আগেকার সেই দিনগুলো ঢাকা মেল, চট্টগ্রাম মেল, বরিশাল এক্সপ্রেস, নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস—'ঘরমুখো বাঙাল আর রণমুখো সেপাই' বলে পশ্চিমবঙ্গের মৃদু পরিহাসটুকু। আজ আর 'বাঙাল' ঘরমুখো নয়—ঘর হারা; শেয়ালদার সেই পুজোর ভিড় এখন দৈনন্দিন ডেলি-প্যাসেঞ্জারীতে—যার দৌড় হয়তো এখন রানাঘাট-বনগাঁ পর্যন্তই। এখন আর এক জনতা পাগল হয়ে ছুটেছে হাওড়া স্টেশনের দিকে : 'পালাও—পালাও—এই দম-আটকানো শহর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাও—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যেখানে হোক।' অবশ্য শেয়ালদাকেও একেবারে কাঙালিনী বলতে পারি না, তারও দার্জিলিং-শিলঙের ছোট্ট একটি পশরা আছে, এক টুকরো পাঠানকোট এক্সপ্রেসও আছে।

অতএব 'ছুটির বাঁশি' যখন বাজল, তখন ছোটো—ছুটে পালাও যেদিকে হোক; ছোটো পাহাড়ের কোলে, সমুদ্রের ধারে, ঐতিহাসিক গম্ভীর মন্দিরের দিকে, নবাবী আমলের দুর্গ-মিনার-সমাধি-ভুলভুলাইয়ার পথে, কোনো বন-বাংলোর নির্জনতায়, নিদেনপক্ষে শাল-মহুয়ার হাতছানিতে। আজ ছুটির চেহারাটাই বদলে গেছে অনেকখানি। আগে ঘরমুখো মানুষকে বারমুখো করবার জন্য রেল-কোম্পানী লোভানি দিত। হাত বাড়ালেই যৎকিঞ্চিত অর্থমূল্যে পাওয়া যেত ভারত-ভ্রমণের অবাধ ছাড়পত্র; আজকে ছবিটা একেবারে পালটে গেছে, ঘরের ডাক আজও দু-একজন শুনতে পান, কিন্তু পূর্ব-বাংলার চৌদ্দ আনা চন্ডীমন্ডপে এখন শেয়াল-কুকুর চরে বেড়ায়; আজকের ছুটি শুধু ছোটার জন্যে আর একটি রেলের টিকেট সংগ্রহ করতে আটচল্লিশ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা।

কলকাতার পুজো—ভিড়—অ্যামপ্লি-ফায়ার! সেই ভয়েই আমরা বেশির ভাগ পলাতক। সেই সব পুরোনো দিনের সঙ্গে কত তফাত, যখন পুজো দেখবার জন্যে, চিড়িয়াখানা-সিনেমার আকর্ষণে আমরা শরতের মাঠ, কাশফুল, পদ্মদীঘি আর

পদ্মার পুল পাড়ি দিয়ে কলকাতার আসতাম! কেউ কেউ আজও আসবে—আসবে বনগাঁ-রানাঘাট থেকে, চন্দননগর-হুগলী-ব্যান্ডেল অথবা বর্ধমান থেকে, কিন্তু সেই সব দিন, সেই মানসিকতা আর ফিরে আসবে না। আজকের হৃতশ্রী জরতী কলকাতার দুর্গোৎসব করুণ, ক্লান্ত, বিরক্তিকর।

শ্রীশ্রীদুর্গাপুজো উপলক্ষে দেশ পত্রিকার কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা (৩৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা) আগামী ৫ই নবেম্বর প্রকাশিত হইবে।

তবু প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে, শালু দুলছে, বাচ্চাদের মুখ খুশিতে ভরে উঠছে, পাড়ার জোয়ান ছেলেদের এতটুকু ফুরসৎ নেই, দোকানে ভীড় জমেছে। আবার পুজো আসছে শহরে। জার্নাল লিখতে লিখতে বাইরের রাস্তায় ছোট্ট একটি মেয়ের কলধ্বনি কানে এল : 'এইবারে কিন্তু আমারে একটা লাল ব্যাগ কিন্যা দিতে হইবো। দিবা না বাবা ?'

ক্লান্ত-জীর্ণ-জরতী কলকাতার বুকের ভেতরে এই তো পুজোর সুর। পথে যে ছেলেটি একটু আগেই উত্তেজিত হয়ে বলছিল : 'এবারে মাইকে কিন্তু একটাও হিন্দী ফিল্মের গান চলবে না—' তার গলায় উৎসবের আর এক কণ্ঠ। কুমারটুলীতে খড়-মাটি-রঙ দিয়ে আরো নতুন ধরনের—আরো জীবন্ত মূর্তি গড়বার যে সাধনা চলেছে, সেখানে উৎসবের প্রাণ-মধুকরটি যেন গুঞ্জন করে উঠছে।

ভুল বলছিলুম। কে বলে কলকাতার দুর্গোৎসব জীর্ণ, বিষণ্ণ, প্রমত্ত? আসলে আমরাই স্বাদ ভুলে গেছি। সংকীর্ণ আর সন্দিগ্ধ মন নিয়ে, শ্রান্তি আর তিক্ততায় আমরাই তার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি।

দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, যন্ত্রণা আছে জেনেও তো আমরা বাসর সাজাই, আশীর্বাদ করি নব-জাতককে, প্রিয়-পরিজনের কপালে পরিয়ে দিই শুভৈষণার তিলক-চন্দন। সব দুঃখের ভেতরে দুঃখকে ভুলতে জানি বলেই আমরা বেঁচে থাকি—নইলে সামগ্রিক আত্মঘাতে কবে পৃথিবীকে আমরা শূন্য করে দিয়ে যেতুম। এবারের পুজো—কলকাতার উদ্দাম দুর্গোৎসবও তাই ব্যর্থ হয়ে যাবে না—যাঁরা আমাদের মতো শ্রান্ত, বিস্বাদ, বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়নি, তারা অঞ্জলি ভরে এবারেও উৎসবের মাধুরীটুকু পান করে নেবে।

এই জার্নাল যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে, তখন কলকাতা আলোয় উজ্জ্বল, মাইকে মুখরিত, আরতির ধূপের ধোঁয়ায় প্রতিমার মুখ আচ্ছন্ন, ঢাকের শব্দে শহর উতরোল, শিশুর কাকলি উচ্ছলিত প্রতিমা দেখবার জন্যে মেয়েদের অক্লান্ত অভিযান; যাঁরা দূর যাত্রায় বেরিয়েছেন তাঁরা সবাই প্রায় পৌঁছে গেছেন লক্ষ্যে—পাহাড়ে, সমুদ্রে, তীর্থে, ঐতিহাসিক শহরে তাঁদেরও মুক্তির মুহূর্তগুলো রমণীয় হয়ে উঠেছে। উৎসব আর ছুটি—এই ক'টি দিনের জন্যে সব সার্থক, সব পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক—সুনন্দর এই শুভেচ্ছা আপনারা গ্রহণ করুন।

কলকাতার এই আনন্দযজ্ঞে সুনন্দরও ডাক ছিল; কিন্তু সে-ও ভীরু, সে-ও ক্লান্ত; পালাবার জন্যে তারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সুতরাং 'চল মুসাফির, বাঁধ গাঁটরিয়া।' সেই গাঁটরিয়া বাঁধবার জন্যেই এখন উঠতে হবে কলম ফেলে। সময় নেই—সময় নেই।

তার আগে আর একবার শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি। সেই সঙ্গে বিজয়ার অভিনন্দন। ইংরেজিমতে যাকে বলে : 'ইন অ্যান্টিসিপেশন।'

কিসের জন্যে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলিগাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে—বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না! মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে
কারণ, নাকি উড়োজাহাজ? কারণ, নাকি হলুদবাড়ি?
বলতে এলে বেঁধে ঠেঙাবো, কারণ আমার ছ্যাকড়াগাড়ি
উল্টোপথেই চলবে শুধু, আমি তোমার দেশেও স্বাধীন!

যার করতল নেই সে কাকে ভিক্ষে দেবে?
যার করতল নেই সে কাকে হাত বুলোবে?
উলুকঝুলুক করবে এবং বলবে—অসীম
ভালোবাসার রোদন আমার হে কস্তুরী—

এই সমস্ত তুমিই পারো সহ্য করতে, তোর লালসা
সবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে—মন চেতনা কেড়ে নিচ্ছে
বলছে, বেঁধে ফেলাই হলো, শুভবিবাহ'

অনেক কথা বলবো বলে উঠেছিলাম মঞ্চে যখন
মিটিং হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে—লম্বা ঘড়ি
গা ঘষছে গোল ঘড়ির সঙ্গে—দুই নাবালক
বলছে, ভারি যন্ত্রণা পাই—
যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর? ফুটবলে ফাঁক? ছাটুর বাখা?
যন্ত্রণা কি ভালোমানুষ সবার হাতেই তালি বাজাবে?
মিন্টি খোকন, তোদের লেখা পড়তে পারি
এমন লেখা লেখ্ না যেমন লম্বালম্বি দিঘির ধারে পথের রেখা!

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে—বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না।

নিঃসঙ্গ নায়ক

শান্তনু দাস

পঁচিশ বছর ধরে সারা পথ ধুলো পায়ে হেঁটে
কখন চাবুক খেয়ে কুকুরের মত আমি নিঃশব্দে কুন্ডলিত হই,
অথচ প্রতিক্ষণ কেন তুমি ডাকো দূরে গভীর তটিনী,
কেন তুমি ব্যাপ্ত হও অযাচিত স্থবির হৃদয়ে ঃ

ভগ্ন নৌকোয় যেন সবাই আশ্চর্য এক নিঃসঙ্গ নায়ক......
চোখ তুলে তাকাতে পারি না
চোখ খুললে মনে হয় প্রশস্ত চাঁদোয়ার নীচে
দাঁড়াবার স্থান কোথা নেই,
তবুও নৌকো চলে বাঁধা-ঘাট ছেড়ে
পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে আদিম আদিমতর হয় ঃ

স্বপ্নাবলী বুদ্বুদের তীব্র জলোচ্ছ্বাসে
ঘুরে...ঘুরে...ঘুরে...ডুবে যায়...
সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অবরুদ্ধ দৈত্যের অভিশপ্ত দেহ,
পাটাতনে ঢেউ আছড়ে পড়ে,
পরস্পর ছুঁয়ে থাকি উষ্ণতম হৃদয়ের তাপে ঃ

তবু এই মোহাচ্ছন্ন স্বপ্ন নিয়ে ফিরে আসি আমি
আমাদের ফিরে আসতে হয়,
প্রতিক্ষণ কেন ডাকো গভীর তটিনী এই বাঁকে
প্রাজ্ঞতম বৃদ্ধের মত দুঃখ মাথা নাড়ে ধীরে,
চোখ তুলে তাকাতে পারি না
কেন তুমি ব্যাপ্ত হও অযাচিত নিরুত্তাপ গভীর হৃদয়ে।

অন্যদেশের কবিতা

একগেনি একতুশেংকো

[রুশ বিপ্লবের বছর পনেরো পর থেকেই শুরু হয় রাশিয়ার সাহিত্যের সবচেয়ে দুঃসময়ের কাল। সাহিত্যের ওপর আদর্শবাদের জুলুম এসে সৃষ্টিশীল লেখকদের চুপ করিয়ে দেয়। ১৯৪১ সালে সমস্ত সাহিত্যের গ্রুপগুলোকে জোর করে ভেঙে তৈরী হয় একমাত্র রাষ্ট্রশাসিত 'সোভিয়েট লেখক সমিতি' এবং যেসব রচনায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের স্পষ্ট ছাপ নেই, তা তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হতে থাকে। এই সময়েই আইশাক বাবেল তিক্ত হাস্যে বলেছিলেন, এখন খাঁটি লেখকদের দেখাতে হবে, হিরোইজম অফ সাইলেন্স। ততদিনে ইয়েসেনিন এবং মায়াকভস্কি আত্মহত্যা করেছেন, পাস্তেরনাক ও আখমাতোফা চুপ।

স্টালিনের শিল্প-বিরোধী শাসন ও লাভেন্তি বেরিয়ার পুলিশ-চক্র শেষ হলে জেগে ওঠে রাশিয়ার দ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়। এরা বিপ্লব চোখে দেখেনি, বিপ্লবের পরবর্তী দুঃখ ও নিষ্পেষণ সহ্য করেনি, এরা সুসময়ের ফসল ভোগ করছে। সুতরাং শিল্পে সাহিত্যে এরা স্বাধীনতা ও বিশ্ব আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল। এই নবীন দলের প্রধান কবি এফতুশেংকো এবং ভজনেসেনস্কি। ক্রুশ্চফের আমলে পশ্চিমের জানালা কিছুটা খুলে যায়, রুশ সংস্কৃতিদলের সঙ্গে ইওরোপ ভ্রমণ করার সময় এফতুশেংকো রাশিয়ার বাইরে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হন। প্যারিসের একটি পত্রিকায় তাঁর অতিসচেতন আত্মজীবনী ছাপা হতে থাকে।

তরুণ এফতুশেংকোর কবিতা সরল ও ধ্বনিপ্রধান। তাঁর কবিতার বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, হাজার হাজার লোক শুনেছে তাঁর কবিতা পাঠ। তাঁর আবেগ সহজে মর্মভেদ করে। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন, আমি কম্যুনিজম জানি না, ভালোবাসা জানি। ইয়ং কম্যুনিসট লীগ থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল, তাও গ্রাহ্য করেননি।

কিন্তু ক্রুশ্চফকে যতটা উদার মনে করা হয়েছিল, শেষদিকে সে ধারণা তিনি নিজেই ভেঙেছেন। একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ফিলিস্টিনিজম নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। অতিরিক্ত স্বাধীনতার বাড়াবাড়ির জন্য পশ্চিম ভ্রমণের মাঝপথেই এফতুশেংকোকে দেশে ফিরিয়ে এনে ধমকে দেওয়া হয়। ক্ষমা প্রার্থনা করে এফতুশেংকো কম্যুনিজম ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানান। তাঁর কবিতা এখনো তারুণ্যের দীপ্তি ও দুঃসাহসময়।]

সীমান্তের বিরুদ্ধে

পৃথিবীর সব সীমান্ত আমায়
বিরক্ত করে।
আমার বিশ্রী লাগে যে আমি কিছুই জানি না
বুয়েনোস এয়ারিস কিংবা নিউ ইয়র্ক
সম্পর্কে।
আমার ইচ্ছে করে এলোমেলোভাবে
ঘুরে বেড়াই লণ্ডনের পথে পথে,
কথা বলি মানুষের সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা
ভাষায়।
বালকের মতন আমার ইচ্ছে হয়
সকালবেলার প্যারিসে
বাসে চড়ে বেড়াতে।
এবং,
আমি চাই একটি শিল্প
যা আমারই মতন
পরিবর্তনশীল।

একটি কবিতা

আমি ভিজে মাটির ওপর শুয়ে থাকবো
আমার কোদালটাকে জড়িয়ে।
মুখের মধ্যে একটা ঘাসের শিস
টক্‌টক ঘাস।
এই অভিশপ্ত জমিকে খুঁড়তে খুঁড়তে
এত জোরে—যাতে কোদালটা ভেঙে যাবে প্রায়,
ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়বো,
কিন্ত ঘুমের প্রশ্নই তো ওঠে না।
'কী?
নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারো না?
দেখো তো ঐ ছোট্ট পাখিটাকে!'
আকাশ-নীল ব্লাউজ আর বুট পরা মেয়েটির
কাছ থেকে এই বিদ্রূপ ভেসে আসে।
এবার সে একটা বিরক্তিকর গান শুরু করবে:
'যেদিন পাবো প্রিয় তোমায়
সারা শরীরে নখের দাগ বসাবো'—
তার ধূসর রঙা কোদালটা হাওয়ায় ঝলসিয়ে
কানের দুলে ঝমঝমে শব্দ করে
সে এইরকম চালিয়ে যাবে—যতক্ষণ না
ছেলেরা গমরে গমরে ওঠে।
প্রত্যেকেই তাসবে:
'সাপিনী একটা!
আংকা, একটু চুপ করতে পারো না!'
শুধু আমি জানি
আকাশের তারা এবং লেবুর ঝোপ জানে
যখন সে আমার সঙ্গে রাত্রি বেলা অরণ্যে যায়
লেবুর গন্ধময় রাত্রে সে কেমন নিঃশব্দে
হাত দিয়ে ঘাসগুলোকে সরায়
মাতালের মত অসংবদ্ধ ওর পদক্ষেপ
কি দুর্বল আর অসহায়,
রৌদ্র-তামু হাত দু'খানি ঝুলিয়ে
সে আমার সঙ্গে কথা বলে সুন্দর বিভ্রান্ত ভাষায়...।

অনুবাদ: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গান্ধীজী ও ১২৫ বছরের পরমায়ু

সে যাত্রায় থেকে আমি কলকাতায় ফিরবার এক সপ্তাহের মধ্যে, ১৯৪৬ সনের ১৯শে ফেবরুয়ারি তারিখে, কমনস সভায় ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত একটি মিশন খুব শিগগিরই ভারত অভিমুখে রওনা হবেন। ১লা মার্চ তারিখে কাগজে এই খবর পড়লাম যে, তরুণ ব্রিটিশ এম-পি উডরো ওয়াট এই মিশনের সঙ্গে, মিশনের অন্যতম সদস্য সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে, আবার ভারতে আসছেন। ইতিপূর্বে ব্রিটেন থেকে যে পারলামেণ্টারী প্রতিনিধিদল ভারত-সফরে এসেছিলেন, সেই দলেও তিনি ছিলেন। সে-যাত্রায় ওয়াটের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওয়াটকে এবং তাঁর মারফতে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে আমি আগেভাগেই সতর্ক করে দিলাম যে, গান্ধীজীকে আমি চিনি, পাকিস্তান-প্রশ্নের ফয়সালা করবার জন্য যদি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনও চেষ্টা চলে, ভারতবর্ষে তাহলে বিপর্যয় ঘটবে। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যারা বিলেত থেকে রওনা হবার আগে ১৯৪৬ সনের ১লা মার্চ তারিখে ওয়াটকে একটি চিঠি লিখে বন্ধুভাবে এই কথাটা আমি জানিয়ে দিলাম। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল:

> ১১ ল্যান্সলক প্লেস,
> বালিগঞ্জ পোঃ
> কলকাতা,
> ১লা মার্চ, ১৯৪৬।

"প্রিয় উডরো,

আজ সকালে কাগজে খবর দেখলাম, ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে তুমিও সম্ভবত সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আবার ভারতে আসছ। এই খবর পড়ে আমি খুশী হয়েছি। ভাবতে আমার ভাল লাগছে যে, ভারত সম্পর্কে তোমার আগ্রহ এখনই ফুরিয়ে যায়নি, এবং বর্তমান যুগের জটিলতম সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টায় তুমি সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের সমস্যাকে তোমরা যেভাবে বিচার করো, সে সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব কী, সেটা তোমাকে জানিয়ে দেবার জন্যেই এই চিঠি লিখতে বসেছি।

৯ই ফেবরুয়ারি তারিখে উইলিংডন বিমান বন্দরে তোমাদের বিদায় জানিয়ে ফিরে আসবার পর কর্মসূত্রে সেই দিনই সন্ধ্যায় আমি গিয়ে অ্যাবেলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দক্ষিণ ভারতের অনাবৃষ্টি-এলাকায় সফর সেরে ভাইসরয় তার খানিক আগে দিল্লিতে ফিরেছেন। খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি তখন খুবই উদ্বিগ্ন। খাদ্য-সংকট সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন। ভাইসরয়ের একটি চিঠি নিয়ে আমাকে গান্ধীজীর কাছে যেতে বলা হল। গান্ধীজী যাতে এসে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁর জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি স্বীকৃত হলুম। ১০ই ফেবরুয়ারি সকালে দিল্লি থেকে বিমানযোগে আমি নাগপুর যাই এবং সেখান থেকে ধুলো-ভর্তি পথে মাইল ছেচল্লিশ মোটর চালিয়ে ছোট্ট একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছই। সেইখানেই গান্ধীজী থাকেন। আমার বিশ্বাস ছিল, সরকারের সঙ্গে অতীতে যতই বিরোধ ঘটে থাক, খাদ্যের ব্যাপারে সাহায্য করতে তিনি রাজী হবেন। কিন্তু দিল্লি যাবার প্রস্তাব তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং আমাকে বললেন, দিল্লি যাবার জন্য আমি যেন তাঁকে পীড়া-পীড়ি না করি। তবে, যে-সব বিষয়ে ভাইসরয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছিলেন, ভাইসরয়ের তরফে কোনও সরকারী প্রতিনিধিকে যদি সে-সব বিষয়ে কথা বলবার অধিকার দিয়ে পাঠানো হয়, তাহলে গান্ধীজী যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী, তাও তিনি জানালেন। অ্যাবেল তার পরদিনই দিল্লি থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে আসেন। বিলেতের কাগজে সে-খবর তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে সরকারী কিছু কথাবার্তা বলতে রাজী হলেন বটে, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল যে, তাঁর অন্তরে মোটেই সাড়া জাগেনি। দেশের মেজাজ যে এখন কীরকম, গান্ধীজীর এই মনোভাব থেকেই তা বোঝা যাবে। এটা যে নেহাতই তাঁর একটা জেদের ব্যাপার, তা তোমাদের ভাবা ঠিক হবে না।

এবারে শোনো, তুমি নিজে যেভাবে ভারত-সমস্যার সমাধান করতে চাও, সে

সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব কী। তোমার সমাধানটা আমি মোটামুটি জানি। ১০ই ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় গান্ধীজীর ছোট্ট কুটিরে বসে, এ-বিষয়ে বেশ শান্তভাবে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হল। প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি কথা বললেন। তাঁর মন কীভাবে কাজ করছে, তা আমি বুঝতে পারছিলাম। তোমার প্রস্তাব, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির সীমা আবার এমনভাবে নতুন করে বিন্যাস করা হোক, যাতে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে আর উত্তরপূর্বে বিরাট এমন দুটি এলাকার সৃষ্টি হয়, স্পষ্টতই যা মুসলমান-প্রধান। সেক্ষেত্রে সেই এলাকা দুটির শাসনভার সর্বদা মুসলিমদের হাতে থাকবে এবং সেই হবে তাদের পাকিস্তান; এবং বাকী ভারতবর্ষের শাসনভার থাকবে অন্যদের হাতে। অতঃপর যথাসময়ে গড়ে উঠবে একটি কেন্দ্রীয় শাসন-সংস্থা; যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সেই সংস্থার হাতে থাকবে; এবং যেমন পাকিস্তান তেমনি বাকী ভারত তাতে অংশ গ্রহণ করবে। গান্ধীজীকে আমি তোমার এই ধারণার কথা বললাম যে, এই পথে অগ্রসর হলে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়ত সম্ভব হবে; পক্ষান্তরে মুসলিমদের যে দাবি তোমাদের বিবেচনায় প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, প্রথম থেকেই তাকে নাকচ করলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। এর উত্তরে গান্ধীজী বললেন, ভারতবর্ষকে এইভাবে বিভক্ত করা সম্ভব কিন্তু এ-সমাধান 'কাপুরুষের সমাধান'। গান্ধীজী যা বলেছেন ঠিক তাই আমি জানালাম। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে, ক্যাবিনেট মিশন যদি তোমার প্রস্তাবিত পন্থায় এগোতে চান, তবে তাতে কোনও লাভ হবে না, সে প্রায় ইঁটের দেওয়ালে মাথা ঠোকার সামিল হবে। ১৯৪২ সনে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁর প্রস্তাব শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, এটা হচ্ছে একটা "পোস্ট-ডেটেড চেক অন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক।" ক্রিপসের প্রস্তাব অতঃপর হালে পানি পায়নি। সুতরাং যুদ্ধের কথাগুলিকে গুরুত্ব দিও।

১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার এই শেষ আলোচনার পর (আলোচনার সময়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও উপস্থিত ছিলেন) আমি নিজেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এমন কোনও মীমাংসা সম্ভব নয় যা লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই মেনে নেবে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার যে-সিদ্ধান্তই নিন, জোর করে তা কংগ্রেস কিংবা লীগের উপরে চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে। যদি মুসলিম লীগের উপরে চাপিয়ে দাও, তাহলে তোমরা অসুবিধের না-ও পড়তে পারো; ব্রিটিশ শক্তি ও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি কংগ্রেসের শক্তি যদি যুক্ত হয়, সেই মিলিত শক্তিই তাহলে লীগ ও কমিউনিস্টদের মিলিত শক্তিকে দাবিয়ে রাখতে পারবে। পরন্তু সেই শক্তির সঙ্গে যদি কিছুটা জ্ঞান ও ঔদার্য যুক্ত হয়, এবং কংগ্রেস যদি মুসলিমদের হাতে তাদের প্রাপ্যের চাইতেও বেশী ক্ষমতা ও চাকরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে কাজ চালিয়ে নেবার মতন একটা ব্যবস্থা হয়ত মুসলিমদের সঙ্গে করে নেওয়া যাবে; বড় রকমের কোনও অভ্যুত্থানও সেক্ষেত্রে হয়ত ঘটবে না। পক্ষান্তরে জোর করে তোমাদের সিদ্ধান্ত যদি তোমরা কংগ্রেসের উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করো, তাহলে তোমরা রেহাই

পাবে না। এ সম্পর্কে আমি দৃঢ়নিশ্চিত। তোমাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আগে থাকতেই আমি একটা বিরূপ ধারণা করে নিয়ে যে এ-কথা বলছি, তা নয়। আমি গান্ধীজীর অনুরাগী ঠিকই, এবং আমার সহানুভূতি যে কংগ্রেসের দিকে তাতেও সন্দেহ নেই; কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও এখানকার অবস্থাকে আমি নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারি। কংগ্রেস থেকে পাকিস্তানের ব্রিটিশ-সংস্করণ মেনে নেবার সম্ভাবনা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু অথবা সর্দার প্যাটেল তোমাকে যা-ই বলে থাকুন, তাতে কোনও সুবিধে হবে না। বুদ্ধের চিত্ত এ ব্যাপারে অটল।

আমার ধারণা, ব্রিটিশ সরকার এখন একটিমাত্র কাজই করতে পারেন; ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের একাধিপত্য মেনে নিয়ে এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে (মুসলিম সহ) সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। অন্য কোনও বিকল্প-ব্যবস্থা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে; কংগ্রেস হয়ত জ্ঞান ও ঔদার্যের পরিচয় দিতে পারে, এবং মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের শান্ত করবার কোনও পথও হয়ত কংগ্রেস খুঁজে নিতে পারে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান প্রশ্নের ফয়সলা করবার জন্য যদি ব্রিটিশ তরফে কোনও চেষ্টা চলে, তবে তার পরিণামে বিপর্যয় ঘটবে।

যাই হোক, শিগগিরই যে তুমি আবার ভারতে আসছ, এটি সুসংবাদ। আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই হয়ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হয়ে দিল্লি আসতে হবে। কূটনৈতিক বুদ্ধি তোমার সহজাত; সুতরাং কাজটা তোমাকে মানাবে। আমার তো মনে হয়, আমরাও তোমাকে বরদাস্ত করতে পারব। আর্থারকে আমার সালাম জানিয়ো' শুভেচ্ছা জানাই।

সুধীর

মেজর ডবলু ওয়াট. এম পি,
হাউস অব কমনস,
লনডন।

পুনশ্চ : তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে স্যার স্ট্যাফোর্ডকে এ-চিঠি দেখাতে পারো।"

ওয়াট এর উত্তরে জানালেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন সদস্যকে আমার চিঠি তিনি দেখিয়েছেন; কিন্তু চিঠি পড়ে তাঁরা বিশেষ উৎসাহিত হননি! ওয়াটের চিঠি-খানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

১৭ চ্যাটসওয়ার্থ কোর্ট,
লনডন ডবলু এস,
১১ই মার্চ, ১৯৪৬

প্রিয় সুধীর,

তোমার দীর্ঘ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। চিঠি-খানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ক্যাবিনেটের অন্য-তিনজনকে তোমার চিঠি দেখানো হয়েছে। চিঠি পড়ে তাঁরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না।

এখন তো ক্যাবিনেট মিশনের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রধানত এরই ফলে ব্রিটিশ তরফে প্রথম প্রস্তাব কী হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে আমার ধারণাও ইতিমধ্যে পালটেছে। যে-কাজ একজন ভাইসরয়ের পক্ষে করা শক্ত, তিনজন ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর মিলিত চেষ্টায় তা সম্ভব হওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখন এই পথে চিন্তা করছি যে, গান্ধীজী যাকে বলেন তোমাদের 'ঘাড় থেকে নামা', প্রথমত তারই জন্য এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে, এবং তোমাদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে হবে।

সাক্ষাৎ মতো এ-বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলব। সাক্ষাতের জন্য আমি খুবই উৎসুক।

দিল্লি থেকে আমাদের কাজ শুরু হবে। তবে আশা করি, সেখানে আমাদের বেশীদিন থাকতে হবে না। তার কারণ, দিল্লিতে এই সময়ে দারুণ গরম পড়ে।

আমার বিবেচনায় একটা ব্যাপার খুবই জরুরী। সেটা এই যে, আলোচনায় বুদ্ধ যাতে যোগ দেন, যে করেই হোক তার ব্যবস্থা করতে হবে। আলোচনায় যোগ দিলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে, আমাদের এই উদ্যোগটা খাঁটি, এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া অন্য-কিছু করবার ইচ্ছা কারও নেই।

চিরকালের জন্য তোমার
উডরো।"

সুধীর ঘোষ, এসকোয়্যার,
১১ লাভলক প্লেস,
বালিগঞ্জ পোঃ,
কলকাতা।

স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্

১৯৪৬ সনের ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছল। গান্ধীজীর
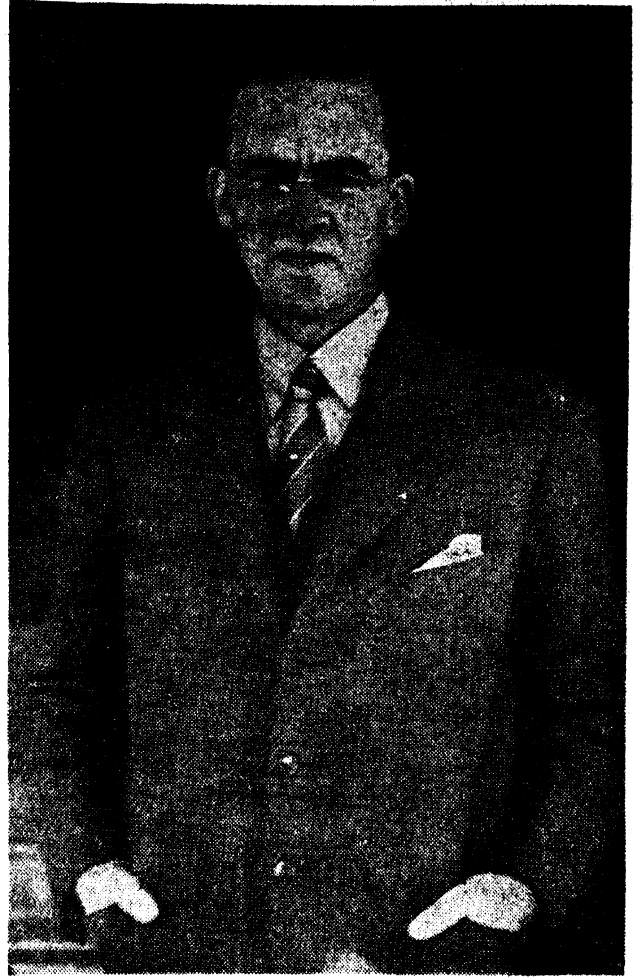
সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা খবরের কাগজ তাঁদের আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। ২৬শে মার্চ তারিখে তাঁরা আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেইদিনই বিকেলে গিয়ে আমি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ ব্রেকারের সঙ্গে দেখা করলুম।

ভাইসরয়-ভবনের সাউথ উইংয়ে ক্যাবিনেট মিশনের দপ্তর বসেছিল। আমি যখন জর্জ ব্রেকারের অফিস-ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, তখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস হঠাৎ হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে সেখানে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে জর্জ বললেন, "স্যার, ইনিই মিঃ সুধীর ঘোষ।" শুনে স্যার স্ট্যাফোর্ড বললেন, "তাই বুঝি? তা মিনিট কয়েকের জন্যে আমার ঘরে একবার আসুন।" আমি তাঁর অনুসরণ করলুম। ক্রিপস সম্পর্কে নানান রকমের খবর ইতিপূর্বে আমার কানে এসেছিল। শুনেছিলাম, তিনি কঠোর প্রকৃতির মানুষ, স্বল্পভাষী, উদাসিক। তাই তাঁর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে আমি কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করছিলাম। কিন্তু যা আমি আদৌ আশা করিনি, মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেখলুম, তিনি বেশ খোলামেলাভাবে আমার সঙ্গে কথা কইতে শুরু করেছেন। (কেউ যে আমার সম্পর্কে তাঁকে কী বলেছিলেন, তা আমি জানতুম না।)

স্যার স্ট্যাফোর্ড বললেন, "আমাদের একটা উপকার করতে পারেন? সদ্য আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। এসে দেখছি, ভাইসরয় আমাদের জন্যে যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেই অনুযায়ী চললে ১০ই এপ্রিলের আগে মিঃ গান্ধীর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তার অর্থ, মিঃ গান্ধীর সঙ্গে দেখা হতে আমাদের আরও প্রায় হপ্তা দুয়েক লাগবে। এটা আমাদের ভাল ঠেকছে না। আমাদের ইচ্ছে ছিল, এখানে পৌঁছেই সর্বপ্রথম মিঃ গান্ধীর সঙ্গে আমরা দেখা করব। অথচ ভাইসরয় আমাদের কার্যসূচী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, এবং সেই অনুযায়ী আমন্ত্রণ-লিপিও পাঠানো হয়েছে। এই অবস্থায় মিঃ গান্ধী এখন আসতে রাজী হবেন কিনা জানি না। অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে অন্যান্য একগাদা লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে, এও আমাদের পছন্দ নয়। আপনি কি একবার বিমানযোগে পুনা কিংবা যেখানে তিনি আছেন, সেখানে—যেতে পারবেন, এবং অবিলম্বে তাঁকে দিল্লি আসতে রাজী করাতে পারবেন?

আমি বললুম, "আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তিনি আসতে রাজী হবেন কিনা, তা বলতে পারি না।"

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তক্ষুনি কাগজ কলম টেনে নিয়ে গান্ধীজীর নামে এই চিঠিখানি লিখে দিলেন :

ক্যাবিনেট প্রতিনিধিদলের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন, নয়াদিল্লি,
২৮শে মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আগামী সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে; এই আমন্ত্রণের ব্যাপারে যে বিভ্রাট ঘটেছে, তার খবর পেয়ে আমি অতিশয় দুঃখ বোধ করছি। আপনি জানেন, আবার আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য এবং এই সমস্যা সংকুল সময়ে আপনার প্রাজ্ঞ উপদেশ লাভের জন্য আমি খুবই উৎসুক।

আগাথা হ্যারিসনকে আমি কথা দিয়েছি যে, আগামী রবিবারে তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনার বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকব। আমার আশা, আপনিও হয়ত সেখানে থাকবেন, এবং অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আমরা আত্মিক সাযুজ্যে মিলিত হতে পারব। সত্যিই আমি আশা করছি যে, আপনার পক্ষে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে। তাতে আমার আর-একটা লাভ এই হবে যে, সরকারীভাবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই আমি ঘরোয়াভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাব।

আপনার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ অবশ্য আমি একাধিকবার পেতে চাই। তার কারণ, আমাদের বর্তমান প্রয়াসের গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে সহজ নয়; যতটা সম্ভব সাহায্য আমাদের পেতে হবে এবং যে সাহায্য আপনি দিতে পারেন, তার চাইতে প্রার্থনীয় এবং প্রাজ্ঞজনোচিত সাহায্য আর কিছুই হতে পারে না।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস"

চিঠিখানা তিনি আমাকে পড়ে শোনালেন। জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে তো? আমার মনে হল, চিঠিখানা বেশ আন্তরিক হয়েছে; অনুরোধের ভঙ্গিটাও বেশ জোরালো হয়েছে। গান্ধীজী তখন পুনার তিরিশ মাইল দক্ষিণে এক গ্রামে ছিলেন। গ্রামের নাম উরুলিকাঞ্চন। স্যার স্ট্যাফোর্ডকে আমি সে কথা জানালাম। বললাম, আমি তাঁর কাছে যাব; এবং ক্যাবিনেট মিশন যে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসুক, সে কথা তাঁকে জানাব।

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় এক এক টার্নবুল এসে ঢুকলেন। বললেন, মিঃ ঘোষ বিদায় নেবার আগে ভারত-সচিব তাঁকে একটা কথা বলতে চান। একই দিনে অতএব ভারত-সচিবের সঙ্গেও আমার দেখা হল। তাঁর সঙ্গেও সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। এই প্রবীণ ইংরেজ ভদ্রলোকের সৌজন্যে আমি সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দয়া করে কি আমি তাঁর কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে মিঃ গান্ধীকে পৌঁছে দেব? আমি বললুম, "নিশ্চয়, এ তো আমার পক্ষে আনন্দের কাজ।" শুনে তক্ষুনি তিনি একটি চিঠি লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন। চিঠিখানি এই :

২ উইলিংডেন ক্রেসেণ্ট,
২৮শে মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্বের সূচনা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। সেদিন আপনি ক্লিমেনটস ইন-এ আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিয়েছিলেন। পুনর্বার আপনার সঙ্গে দেখা করে সেই পুরনো পরিচয় আর বন্ধুত্বকে আবার ঝালিয়ে নেবার জন্যে আমি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

বুধবার অপরাহ্নে যে বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে তো শুধুই বৃহৎ নীতি নিয়ে আলোচনা হবে। তার আগেই যদি আপনি ঘরোয়া আলোচনার জন্যে সময় করে একবার এই ছোট্ট বাড়িটিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন, তাহলে আমি খুবই খুশী হব।

শুনেছি, সন্ধ্যা সাতটা আপনার পক্ষে প্রশস্ত সময়। আগামী রবিবার কিংবা সোমবার আমি সেই সময়ে আপনার দেখা পেতে উৎসুক রইলাম। যদি অন্য সময়ে এলে আপনার সুবিধে হয় তো তা-ই আসবেন: বস্তুত রবিবার আমার হাতে আর কোনও কাজ নেই।

বাড়ি থেকে রওনা হবার আগে আমার স্ত্রী আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, আপনার সঙ্গে দেখা হলে যেন আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানাই।

চিরকাল আন্তরিকভাবে আপনার
পেথিক-লরেন্স"

ভারত-সচিব আমাকে জানালেন যে, আমি যাতে বিমানযোগে পুনা রওনা হতে পারি, তার ব্যবস্থা করবার জন্য ভাইসরয়কে তিনি অনুরোধ করেছেন; ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ জর্জ অ্যাবেল এ-ব্যাপারে সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। জর্জ অ্যাবেল যথাসময়ে আমাকে জানালেন, পরদিন সকালে যে-বিমানটি বোমবাই যাবে, তাতে তিনি অনেক কষ্টে আমার জন্যে একটি আসনের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এ যখনকার কথা বলছি, বিমান পরিবহণের ব্যবস্থা তখন কড়া নিয়ন্ত্রণের অধীনে; এবং সমস্ত আসনই তখন সাধারণত সামরিক বিভাগের লোকদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। কীভাবে তিনি একজন মিলিটারী অফিসারকে হটিয়ে দিয়ে তাঁর আসনটি আমার জন্যে দখল করেছেন, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি বেশ

সবিস্তারে আমাকে তার সালংকার বর্ণনা দিলেন। অতঃপর জানালেন যে, বরখাম্বা রোডের যে বাড়িতে আমি থাকি, রাত চারটের সময় ভাইসরয়ের গ্যারাজ থেকে সেখানে একটি গাড়ি পাঠানো হবে এবং সেই গাড়িই আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পালাম বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবে।

শেষ রাত্তিরে আমি অনেক কষ্টে ঘুম থেকে উঠলাম, এবং যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পায়চারি করতে করতে লক্ষ্য রাখছি, কখন গাড়ি আসে। কিন্তু গাড়ি আর আসে না। অধৈর্য হয়ে শেষে ভাইসরয়-ভবনের গ্যারাজে ফোন করলুম। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ওদিক থেকে উত্তর এল, "মিনিট দুয়েকের মধ্যেই গাড়ি রওনা হচ্ছে।" গাড়ি আসতে ড্রাইভারকে আমি কষে ধমক লাগালাম। বিরক্তিটা অকারণ নয়। বিস্তর দেরি হয়ে গিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছিল, প্লেন ধরা সম্ভব হবে না। ড্রাইভার বলল, ঘুম থেকে সে সময়মত উঠতে পারেনি। দেরির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সে ঝড়ের বেগে বিমান বন্দরের দিকে গাড়ি ছোটাল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। পালামে পৌঁছে শুনলুম, একটু আগেই প্লেন ছেড়ে গিয়েছে। রয়াল এয়ার ফোর্সের যে অফিসারটির হাতে বিমান বন্দরের দায়িত্ব (পালাম তখন রয়াল এয়ার ফোর্সের নিয়ন্ত্রণাধীন), আমার দেরি দেখে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, আমি যে একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি তা তিনি জানেন। সেই জন্যেই প্লেনটিকে তিনি নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরেও দশ মিনিট আটকে রেখেছিলেন। তবু যে আমি প্লেন ধরতে পারলুম না, সে-দোষ পুরোপুরি আমারই।

রয়াল এয়ার ফোর্সের অফিসারটিকে বুঝিয়ে বললুম যে, সেই সকালেই আমার পুনা পৌঁছনো চাই; সুতরাং যেমন করেই হোক তাঁকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তিনি বললেন, ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলে হয়ত আর-একটা প্লেন পাওয়া যেতে পারে। কী আর করি, বিরসমুখে বসে রইলুম। আধ ঘণ্টাটাক বাদে অফিসারটি এসে বললেন, "প্লেনটাকে ধরতে না-পারায় আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং ভালই হয়েছে। খবর পেলুম, ইঞ্জিনে গোলযোগ ঘটায় ওটি আবার বিমান বন্দরেই ফিরে আসছে।"

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ভদ্রলোক আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, কিছু একটা হয়েছে। ঠিক তা-ই। তিনি বললেন, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে, প্লেনটি ধ্বংস হয়ে গেছে। দাউ-দাউ করে তাতে নাকি আগুন জ্বলছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, এই দুঃসংবাদে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। হবারই কথা। প্লেনটিতে বেশির ভাগই ছিলেন মহিলা-যাত্রী; সামরিক বিভাগের নার্স। ঘটনাটি তার ফলে আরও দুঃখদায়ক হয়ে উঠেছিল। পরে জানা গেল যে, সেই দুর্ভাগা বিমানের একজন যাত্রীও রক্ষা পাননি।

রয়াল এয়ার ফোর্সের অফিসারটি কিন্তু সেই অবস্থাতেও আমার কথা ভোলেননি। চেষ্টা করে তিনি একটা ছ-আসনের বীচ-ক্র্যাফট প্লেন যোগাড় করলেন, এবং একমাত্র যাত্রী হিসেবে আমাকে তাতে তুলে দিলেন। পাইলটকে তিনি বললেন যে, জরুরী কাজে আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে যেতে হচ্ছে, তাই বোমবাইয়ে না থেমে সরাসরি আমাকে পুনার সামরিক বিমান-ঘাটিতে নিয়ে নামিয়ে দিতে হবে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আমি পুনায় পৌঁছে গেলাম; সেখান থেকে রওনা হলাম উরুলি-কাঞ্চন গ্রামের দিকে। আমি যে খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছিলুম, সে-কথা বলাই বাহুল্য। গান্ধীজীর কাছে গিয়ে ভারত-সচিব আর স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের চিঠি তাঁর হাতে তুলে দেবার আগেই তাই আমি তাঁকে দুর্ঘটনার বিবরণ শোনাতে লাগলাম। সব শুনে গম্ভীরভাবে গান্ধীজী বললেন, "এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি ১২৫ বছর বাঁচবে।"

গান্ধীজী চিঠি দুখানি পড়লেন; ব্রিটিশ সরকারের দুই মন্ত্রী তাঁকে যা লিখেছিলেন, তা নিয়ে একটুক্ষণ চিন্তা করলেন; তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন "সত্যিই কি তোমার মনে হয় যে,.. কাজের সূচী পালটে এক্ষুনি আমার দিল্লি যাওয়া উচিত?" আমি বললুম, এই দুই ইংরেজ ভদ্রলোক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান; এ-ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; এবং আমার মনে হয় যে, তাঁদের এই বাগ্র আহ্বানে গান্ধীজীর সাড়া দেওয়া উচিত।

মিনিট কয়েক গান্ধীজী এ নিয়ে চিন্তা করলেন; খানিকটা আত্মমগ্নভাবেই দু-একটা কথা বললেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এর উপরে কিছু নির্ভর করছে না। তবে তোমার যখন এ-ব্যাপারে এতটাই আগ্রহ, তখন তাই হোক; আমি যাব। প্রার্থনা আর সন্ধ্যার খাওয়া শেষ হবার পরেই আমি রওনা হতে পারি।"

ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি আগেই রেল-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, সুধীর ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক যদি পুনা স্টেশনে গিয়ে স্টেশন-সুপারিনটেনডেনটের সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে যেখানেই তিনি যেতে চান না কেন, একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে। স্টেশন সুপারিনটেনডেনটের অফিসে হাজির হয়ে তাঁকে আমি নিজের নাম জানালুম। বললুম

থেকে তিরিশ মাইল দূরে উরুলী-কাঞ্চন গ্রামের ছোট্ট স্টেশন থেকে গান্ধীজী সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় দিল্লি যাত্রা করবেন। গান্ধীজীর দলে মোট ১৩ জন লোক থাকবেন; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ছাড়া তিনি উঠবেন না।

ছোট্ট একটি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিলেন পুনার স্টেশন মাস্টার। সামনে ইঞ্জিন, পিছনে গার্ড ভ্যান, মাঝখানে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা—এই হচ্ছে সেই স্পেশ্যাল ট্রেন। যাত্রা করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ড্রাইভারকে আমি বলে রাখলুম যে, সকালবেলায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য গান্ধীজী বোমবাইয়ে নামবেন। ড্রাইভারটি বেশ বুদ্ধিমান। শেষ-রাত্রে আমাদের না-জাগিয়ে বোমবাইয়ের কাছে দাদর স্টেশনে সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখল; তারপর সকাল হতে বোমবাই স্টেশনে গিয়ে ঢুকল। বোমবাই স্টেশনে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে বহু গান্ধীভক্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্টেশন থেকে আমাদের উত্তর-বোমবাইয়ের হরিজন-পল্লীতে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা যে আসব, মাত্র কয়েক ঘণ্টা

আগেও তো তা কেউ জানতেন না। দেখে বিস্মিত হলাম যে, এরই মধ্যে আমাদের এই স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতি উপলক্ষেও ঢালাও ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ইতিমধ্যেই সাড়া জেগেছিল। ভাইসরয় যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, তাকে নাকচ করে গান্ধীজীকে এই যে বিশেষভাবে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানানো হল, এর অর্থ কী হতে পারে, রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে কৌতূহলের সীমা ছিল না। অনেকেই আশা করছিলেন যে, এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে। এই যাত্রাকে তাই অনেকে ঐতিহাসিক যাত্রা বলে আখ্যাত করলেন।

স্পেশ্যাল ট্রেনে যত তাড়াতাড়ি দিল্লি পৌঁছানো যাবে ভাবা গিয়েছিল, তত তাড়াতাড়ি অবশ্য পৌঁছানো গেল না। ট্রেনটিকে ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই দাঁড়াতে হচ্ছিল। তার কারণ, দেশ জুড়ে এই খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, মহাত্মা গান্ধী দিল্লি চলেছেন। গান্ধীজীর যাতায়াতের খবর যে কী করে এত তাড়াতাড়ি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত, এবং ট্রেন কখন কোন স্টেশনে পৌঁছবে, জনতা যে কী করে এত তাড়াতাড়ি তার খবর পেয়ে যেত, ভাবতে সত্যিই বিস্ময় লাগে। জনতা এসে স্টেশনে-স্টেশনে ভিড় করত এবং দাবি জানাত যে, তারা যাতে গান্ধীজীর দর্শন পায়, তার জন্য ট্রেন সেখানে থামাতে হবে। স্টেশন মাস্টাররাও সানন্দে সে-দাবি মেনে নিতেন। সিগন্যালম্যানরা থামবার সিগন্যাল দিত; ফলে ইনজিন ড্রাইভারেরও ট্রেন না-থামিয়ে উপায় থাকত না। গান্ধীজীর দলে বাকি যাঁরা দিল্লি যাচ্ছিলেন, তাঁদের চোখে আমিই ছিলুম ভাইসরয়ের বিশেষ প্রতিনিধি। সুতরাং ট্রেন থামবামাত্র আমার কাছে তাঁরা কৈফিয়ত দাবি করতে লাগলেন। এক-একটা স্টেশনে ট্রেন থামে, আর তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "ট্রেন থামল কেন? ব্যাপার কী?" শেষ পর্যন্ত আমি অতিষ্ঠ হয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরা ছেড়ে ইনজিনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম, এবং ড্রাইভারকে বললুম, স্টেশন মাস্টাররা থামবার নির্দেশ দিলেও যেন ট্রেন থামানো না হয়। পরপর কয়েকটি স্টেশনে তা-ই করা হল; রেললাইনের দু ধারে বিস্তর লোকজন দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সে-সব জায়গায় ট্রেন থামানো হল না। এত মুহুর্মুহু যে আমাদের থামানো চলবে না, রেল-কর্মচারীরাও অতঃপর তা বুঝে গেলেন। কিন্তু তাতেও যে বিশেষ কাজ হল তা নয়; বোমবাই থেকে দিল্লির নিজামুদ্দীন রেল-স্টেশনে পৌঁছতে সে-যাত্রায় আমাদের বিস্তর সময় লেগেছিল।

নিজামুদ্দীন থেকে সরাসরি আমরা রীডিং রোডের ভাঙ্গী কলোনীতে চলে এলুম। সেখানে বাল্মীকি-মন্দিরের পাশে, নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারদের বস্তিতে, গান্ধীজীর সদর-দপ্তর বসেছিল। তার ঘণ্টাখানেক বাদেই ১নং উইলিংডন ক্রিসেন্টে গিয়ে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আর লর্ড পেথিক-লরেনসের সঙ্গে দেখা করলুম আমি। সার স্ট্যাফোর্ড তক্ষুনি ভাঙ্গী কলোনিতে চলে এলেন। পরে এলে তাঁর পক্ষে প্রার্থনাসভায় যোগ দেওয়া সম্ভব হত না। ভারত-সচিব বললেন, সন্ধ্যা সাতটায় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে চান। গান্ধীজী তো সৌজন্যের প্রতিমূর্তি। তিনি বললেন, ভারত-সচিবের আসবার দরকার নেই; তিনিই বরং ২নং উইলিংডন ক্রিসেনটে গিয়ে ভারত-সচিবের সঙ্গে দেখা করবেন।

পরদিন সকালে গান্ধীজী বললেন, আমাকে গিয়ে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে রেলভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে। শুনে আমি অস্বস্তিতে পড়লুম। তার কারণ, গান্ধীজীর সুবিধের জন্যই সরকার থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ভাড়া দেবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী বললেন, ভাড়া আমাদের দিতেই হবে। নিজেই তিনি হিসেব করে বললেন, বোমবাই থেকে দিল্লি পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতে মাথাপিছু রেলভাড়া হচ্ছে ২৭ টাকা ৬ আনা; সেই হিসেবে আমাদের ১৩ জনের ভাড়া মোট ৩৫৫ টাকা ১৪ আনা দাঁড়াচ্ছে। টাকাটা তিনি আমার হাতে তুলে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে আমি যেন এই টাকাটা দিয়ে দিই। সুতরাং রেলের ভাড়া মেটাবার জন্য আমি জর্জ অ্যাবেলের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। সেকালে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন রীতিমত গণ্যমান্য মানুষ; হাত পেতে তাঁকে ভাড়া নিতে হবে, এই ব্যাপারটা তাঁর মোটেই পছন্দ হল না। গর্জন করে তিনি বললেন, "আমার কাছে ভাড়া মেটাতে আসবার অর্থ কী? আমি কি একজন স্টেশন মাস্টার? আর তা ছাড়া, বৃদ্ধকে যে আদৌ ভাড়া মেটাতে হবে, তাই বা কে বলল? সরকার তাঁর সুবিধের জন্যে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাঁর কাছে তো তার জন্য ভাড়া চাওয়া হয়নি। তবে?"

সুতরাং ব্যাখ্যা করে তাঁকে আমার বুঝিয়ে বলতে হল যে, এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি একজন সাধারণ মানুষ নন; তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছের বিরুদ্ধে কারও যাবার উপায় নেই; সুতরাং টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে কোনও লাভ হবে না। স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা না থাকলে তিনি আর-পাঁচ জনের মতই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠতেন এবং নিজের দলের প্রত্যেকের ভাড়া মিটিয়ে দিতেন। ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে কোনও অনুগ্রহ নেবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

শুনে জর্জ অ্যাবেল বললেন, "বেশ, তবে তাই হোক। তবে বৃদ্ধ যখন ভাড়া দিতে এতই ব্যস্ত, তখন আমরাও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া তো আমরা নেব না, পুনা থেকে দিল্লি পর্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনের খরচা তাঁকে মেটাতে হবে।"

বলে তিনি রেলওয়ে বোর্ডকে ফোন করলেন। এবং তাঁদের কাছ থেকে হিসেব জেনে নিয়ে পুনা থেকে দিল্লি পর্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনের খরচাটা আমাকে জানালেন। মোটামুটি ১৮,০০০ টাকা। জর্জ বললেন, গান্ধীজীর কাছে ভাড়া আদৌ চাওয়া হয়নি। তবু যদি তিনি ভাড়া মেটাবার জন্য জিদ করেন, তবে ওই ১৮,০০০ টাকা তাঁকে দিতে হবে।

অগত্যা আমি গান্ধীজীর কাছে ফিরে এসে জানালুম যে, তিনি যদি ভাড়া দিতে চান তো পুরো ১৮,০০০ টাকা তাঁকে দিতে হবে। গান্ধীজী কিন্তু এ-কথা মেনে নিলেন না। তাঁর যুক্তি পাকা। এমনিতে তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে এলে ১৩ জনের ভাড়া পড়ত ৩৫৫ টাকা ১৪ আনা। সুতরাং ওই অঙ্কটাই তাঁর কাছে রেল-কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য। তিনি তো স্পেশ্যাল ট্রেনে আসতে চাননি; সরকার তাঁদের নিজের গরজে তাঁর জন্যে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং তার খরচা তিনি দিতে যাবেন কেন? না, স্পেশ্যাল ট্রেনের খরচা তিনি দেবেন না। তৃতীয় শ্রেণীর যা সাধারণ ভাড়া, তিনি তা-ই দেবেন এবং সরকারকে তা নিতে হবে।

সুতরাং আবার আমি ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে গেলুম। গিয়ে বললুম, "দ্যাখো জর্জ, যদি ভাল চাও তো লক্ষ্মী ছেলের মতো টাকাটা নিয়ে নাও। বৃদ্ধকে আমি চিনি। তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, যুক্তি-তর্কে তাঁকে হারাতে পারবে, তো মস্ত ভুল করছ।"

জর্জ অ্যাবেল আর কথা বাড়ালেন না, চুপচাপ টাকাটা নিয়ে নিলেন। অতঃপর রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এই মর্মে তিনি একটি চিঠি লিখে দিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর শুভেচ্ছাসহ টাকাটা তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

(ক্রমশ)

কলকাতার ডায়েরি

অবশেষে পুজোর বাজার শেষ, মণ্ডপ জমজমাট, মা এসে গিয়েছেন। চারদিকে হাঁকডাক, ঠেলাঠেলি, পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচানোর ভার সারা কলকাতার।

এবং পুজো মানেই সার্বজনীন, বাড়ির পুজো আর ক'টা, আঙুলে গোনা যায়। এই সার্বজনীন শুরু কবে? ১৭৯০ সালে। তখন কী হত? বাঈজি নাচত, সাহেবরা ভোজ খেত, চিৎপুরের লোক শ্যামবাজারের নামে হাততালি দিত এবং দুর্গোৎসব ব্যাপারটাই ছিল বিশিষ্টদের করতলগত। ১২৩৯ সালের ২১ আশ্বিন তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখছেন—

"এতন্নিকটবর্তী স্থান সকলেতে শ্রীশ্রীমহামায়ার মহাপুজো মহাঘটাপূর্বক সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে এই পুজোপলক্ষে নগর মধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য তিন-চারি স্থানে হইয়াছিল। অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজা বাহাদুরের উভয় বাটিতে মহানবমী পর্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে। তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ্দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবলোক গমন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটিতে প্রতিপদাবধি নবমী পর্যন্ত নাচ হয়। তথায় নেক্কী প্রভৃতি নর্তকী নিযুক্তা ছিল।"

ভাগ্যিস সালটা ১৩৭৩ নয়, নইলে সবাই বলতেন, 'আজকালকার ছেলেছোকরাদের পাল্লায় পড়ে অধঃপাতে গেল দেশটা, মায়ের পুজোয় আর আগেকার সেই ভক্তিশ্রদ্ধা আন্তরিকতা নেই।' ভেবে দেখুন, ইদানীং যদি পুজোর আসরে বাঈজি আনিয়ে নাচাবার ব্যবস্থা হত কিংবা সাহেবসুবো ডেকে (ব্রিটিশ শাসকরা নাই থাকুন, বিদেশী কোম্পানি আর দূতাবাসের কল্যাণে ওঁরা এখনও কলকাতার মুকুটমণি) ফুর্তির ফোয়ারা ছোটানো হত, তাহলে গৌরবময় অতীতের রোমন্থনে আবিষ্ট কতিপয় মহাশয় ব্যক্তিরা কীভাবেই না আক্রমণ করতেন একালের লোক আর একালের রুচিকে।

আমি তো বলি, আগেকার শহুরে পুজোর চেয়ে এখনকার ব্যবস্থাদি ঢের ঢের রুচিসম্পন্ন। গ্রামের কথা আলাদা, তবে সেখানেও যে সব সময় নিরামিষ ব্যাপার চলে এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। শহরে বিজয়া দশমীর মিছিলে উদ্দামতা নজরে পড়ে বটে, কিন্তু সমাচার চন্দ্রিকার বর্ণনা যদি সত্য বলে ধরে নিই, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে আগেকার পুজোর দিনের জন্যে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। বরং দুর্গাপুজোর উৎসবটা সকল স্তরের সকল লোকের মধ্যে ছড়িয়ে ইদানীং

...জ্জার সাজ্জেজনীরা হয়েছে এবং অনেক ...মণ্ডপেই মণ্ডপ- সজ্জানো বা আমোদ-প্রমোদেও রুচির ছায়া পড়ে।

অতএব অতীতের জন্যে আক্ষেপ করে কাজ কী, তারচেয়ে আসুন পুজোর কটা দিন সবাই মিলে আনন্দময় করে তুলি। এবং পরবর্তী সংখ্যার জন্যে অপেক্ষা না করে, এখনই ডায়েরির পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে রাখছি বিজয়ার শুভেচ্ছা।

*

বিমানে বীমা আছে, আছে জাহাজে, রেলে নেই কেন? তাহলে কি রেলে দুর্ঘটনা আমাদের দেশে কম? না, তাও তো নয়, রেলগাড়ি উলটে আকছার লোক মরছে। সুতরাং রেলযাত্রী বীমা চাই।

প্রস্তাবটি আমার নয়, প্রতাপাদিত্য রোডের বাসিন্দা জনৈক মনোরঞ্জন সরকারের। ভদ্রলোক কাজ করেন ডাক বিভাগের ডেভলেপটর অফিসে। 'দুর্ভপত্র' নিয়ে হরদম নাড়াচাড়া করেন বলেই বোধহয় মৃত্যুর কথাটা তাঁর অনবরত মনে পড়ে।

সেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। মাথায় তাঁর নানা রকম পরিকল্পনা খেলছে, কথা প্রসঙ্গে জানালেন রেলযাত্রী বীমার কথা। তাঁর উদ্ভাবিত এই পরিকল্পনাটি অনেকটা বিমানবীমার মতই সংক্ষেপিত ইংরেজী নাম আর ডব্লু এ এল টি—রিলিফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার এগেনস্ট লস অব লাইফ ইন ট্রেন ট্রাভেলিং। দীর্ঘ নাম, কিন্তু ব্যবস্থাপত্র সরল। সব স্টেশনে থাকবে বীমা দপ্তর। পাঁচ পয়সার প্রিমিয়ামও থাকবে, তবে যাত্রীরা ইচ্ছে করলে এক টাকা, দু' টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকার যাত্রীবীমা করতে পারেন, দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালে প্রিমিয়াম মত নগদ টাকা। তাতে লাভ তিনদিকে। দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবার বাঁচবে অসহায় অবস্থা থেকে, রেলের ঘরে বছর বছর আসবে প্রিমিয়ামের অনেক টাকা এবং বীমার কাজে লোক লাগিয়ে বেকারী ঘোচানো যাবে হাজার হাজার ছেলের।

শ্রীসরকার তাঁর পরিকল্পনাটি পেটেন্ট করিয়ে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরে কপিরাইটের খাতায় তাঁর প্রস্তাব রেজেস্টারি হয়ে পড়ে আছে অনেক দিন। রেল দপ্তরের কাছেও তিনি চিঠি লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক সংবাদ, প্রস্তাবটি নাকি রেল দপ্তরের বিবেচনাধীন।

শ্রীসরকার বললেন, "মশাই আমার মাথায় আরও অনেক প্রস্তাব আছে, ওই আমার শখ, কিন্তু সরকারের কাছে সাড়া পাই না সব সময়। আমার আর একটি পরিকল্পনাও কপিরাইট করিয়ে নিয়েছি। তার নাম 'ওয়েস্ট মট স্ক্যাপ ল্যান্ড'। এই বাংলা দেশেই সেচখালের দৈর্ঘ প্রায় আঠারশ' মাইল। সেই খালের পাড়ে পাড়ে সুপারি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা। এক মাইলে লাগানো যাবে ৩৫২০টি গাছ, আঠারশ' মাইলে ৬৩,৩৬,০০০ হাজার। প্রতি গাছে এক কিলো করে যদি সুপারি পাওয়া যায়, তাহলে কিলো প্রতি পাঁচ টাক দরে সরকারের বার্ষিক আয় কত ... টাকা হয়, ভেবে দেখুন। প্রস্তাবটি ... করেছি অনেকদিন, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে সাড়া নেই। তবে হ্যাঁ, রেলমন্ত্রীর মুখে এই সেদিন রেলযাত্রী বীমার কথা শুনে মনে হল, আমার পরিশ্রম সার্থক। এক একটা রেলদুর্ঘটনা হয়, আর আমি আমার প্রস্তাবটা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিই। এইতো সেদিন বেলগাঁও আর হায়দরাবাদের কাছে পরপর দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দেখি এবারে কী হয়, সরকারের টনক নড়ে কিনা।"

ভদ্রলোকের ফোলিওব্যাগে একগাদা কাগজপত্তর। সব খুলে ধরলেন আমার সামনে। নানা রকম চিঠি আর তার জবাব। খবরের কাগজের কাটিংও অনেক। আমাকে সবিস্তারে বোঝাতে শুরু করলেন তাঁর সব পরিকল্পনার কথা। আমি বললুম—"সুপারি চাষে আমার আগ্রহ নেই, তবে রেল যাত্রী বীমায় আছে। বিমানে উড়তে যেমন করি, আপনার প্রস্তাব যদি কার্যকর হয়, তাহলে রেল চড়তেও আমি বীমার প্রিমিয়াম জোগাবো। বিমানে অনেকবার বীমা করেও স্ত্রীকে লাখ টাকার মালিক করতে পারিনি, লটারির টিকিট কেটে কেটেও বিফল হয়েছি, দেখি, রেলের দৌলতে পরিবারকে বড়লোক করে যেতে পারি কিনা।"
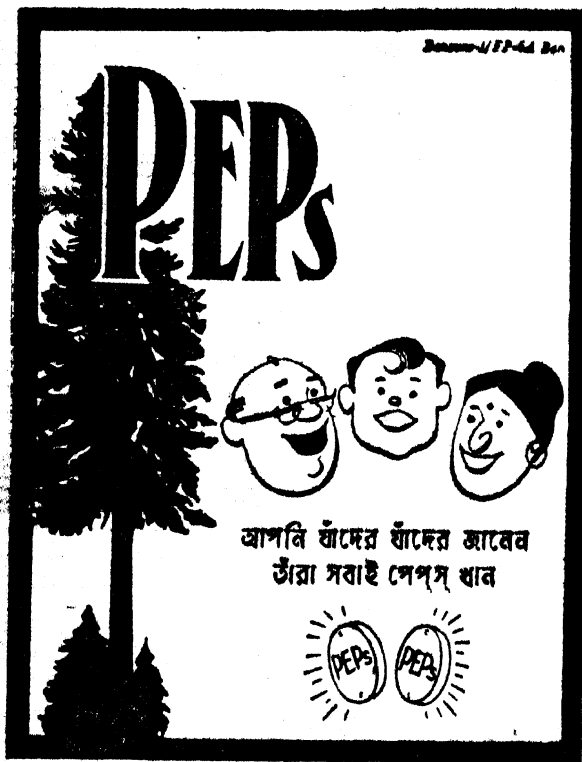
বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারত বাইরে থেকে সব চেয়ে বেশি কর্জ নিয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশ বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ৩৪টি এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা হতে ১৪টি ঋণ (যা মোট ১৬৪·৭ কোটি ডলার হবে) পেয়েছে।

অনিশ্চয়তার কারণ

গত পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনগ্রসর দেশসমূহকে প্রদত্ত সরকারী সাহায্যের পরিমাণ একরকম অপরিবর্তিত রয়েছে এবং নিকট ভবিষ্যতে তার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা কম। কানাডা ও সুইডেনের মতো উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে, উত্তমর্ণ দেশগুলির বেশির ভাগ প্রধানত তাদের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সমস্যা এবং অর্থসম্পদের উপর আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের চাপ উভয় কারণে ঋণদানের ব্যাপারে কড়াকড়ি করছে। তা ছাড়া, ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘর্ষের ফলে কর্জের বহর বাড়িয়ে দেওয়া সম্বন্ধে দ্বিধা ও আপত্তি দেখা দিয়েছিল সমৃদ্ধ দেশগুলির ভিতর। কর্জদানের সময় আশা করা হয়েছিল যে, গৃহীত ঋণ ফলপ্রসূ হবে কিন্তু সে-আশা পূরণ হয় নি। এইসব কারণে ঋণের কড়ার আরো কঠিন করা হয়েছে: সরাসরি অর্থসাহায্যের অনুপাত কমে গেছে, সুদের হার বেড়েছে এবং কর্জের মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হল, ঋণ পরিশোধের জন্য ভারতকে ইতিমধ্যে তার রপ্তানিজাত আয়ের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ (১৯৬৫-৬৬ সালে ৮০৫ কোটি টাকা মোট রপ্তানির ভেতর ১৪৯ কোটি টাকা কর্জশোধে লেগেছে) দিতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে, বিশেষত খাদ্য আমদানির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারে দাম চাইলে, ঋণ শোধের বোঝা আরো বেড়ে যাবে।

বেসরকারী মূলধন

সরকারী সাহায্যের এবম্প্রকার নিস্তেজ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মতো দেশগুলি কি বাইরে থেকে বেসরকারী মূলধন আশা করতে পারে? বস্তুত, গত কয়েক বছরে বৈদেশিক বেসরকারী মূলধনের নিয়োগ কেবল অল্পসংখ্যক পেট্রোলিয়াম-রপ্তানিকারী দেশগুলিতে বেড়েছে। তার উপর বেসরকারী ঋণের কড়ার আরো কঠিন হওয়ায় কর্জশোধের বোঝা (সরকারী ঋণের তুলনায়) অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে পড়ে। সব শেষে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মতো দেশগুলি বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় তারা দরিদ্র দেশে বেসরকারী মূলধন নিয়োগের পথে বাধা-নিষেধ আরোপ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশও তার স্বর্ণ সংরক্ষণের ব্যাপারে আজ অসুবিধা ও সমস্যায় পড়েছে। আর্থিক অবস্থার অবনতির দরুণ তারা দরিদ্র দেশগুলিকে দেয় সাহায্যের পরিমাণ বা বহর সম্বন্ধে পাকাপাকি কোনো কথা দিতে পারছে না।

বৈদেশিক সাহায্য ব্যাপারে এরকম অনিশ্চয়তা থাকায় অনগ্রসর দেশগুলির দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার কাজ যে ব্যাহত হয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার সম্প্রতি প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণে। সাহায্যকারী দেশগুলি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বৈষয়িক উদ্যোগের উপর জোর দিয়ে থাকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তারা এক বছরের বেশি সময়ের জন্য সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিতে অসম্মত।

বৈদেশিক ঋণের শর্ত

বিদেশ থেকে ঋণ কি রকম শর্তে পাওয়া যায় তা অনগ্রসর দেশগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সুদের হার যত অল্প ও ঋণের মেয়াদ যত দীর্ঘ হয় অধমর্ণ দেশের পক্ষে কর্জশোধ দেওয়া তত সহজ। প্রসঙ্গত, ভারত তার অতীতের ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আশার কথা, কানাডা ইতিমধ্যেই সেরকম ব্যবস্থায় রাজী হয়েছে। ব্রিটেন তার বর্তমান অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের পুরানো ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত হতে পারে। ব্রিটিশ সরকার একবার রাজী হলে খুব সম্ভব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ নীতি অনুসরণ করবে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে [illegible] কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয় এরকম [illegible] কোটি ডলার সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা তা এখনো বলা যাচ্ছে না। দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য-দানের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বর্তমান [illegible] হারে ঋণ সংগ্রহ করতে [illegible] সম্মুখীন হচ্ছে বলে ব্যাঙ্ক [illegible] ভবিষ্যতে তার প্রদত্ত ঋণের উপর [illegible] সুদের হার বাড়িয়ে দেবে।

...লম্বনের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়া গেলে পরিকল্পনার রদবদলের প্রয়োজন হবে। এই অভিপ্রায়ে, অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একটি অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য পরিকল্পনা বিকল্প হিসাবে বর্তমানে প্রণয়ন করা হচ্ছে।

যখন কেবল খাদ্যশস্য বা কলকব্জা আমদানির জন্য নয়, অতীতের ঋণশোধ (বা তার সুদদান)-এর জন্যও আমাদের নতুন করে বিদেশ থেকে কর্জ নিতে হচ্ছে, সে সময় বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে ক্রমাগত অনিশ্চয়তা নিশ্চয় উদ্বেগের বিষয়। সেরকম পরিস্থিতিতে ভারতকে তার আর্থিক উদ্যোগের গতি অব্যাহত রাখতে হলে নিজের চেষ্টার উপর আরো নির্ভরশীল হতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাবলম্বন অর্জন হচ্ছে এখন আমাদের অভীষ্ট, যাতে আভ্যন্তরিক সঞ্চয় থেকেই বৈষয়িক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় এবং দেশ আপন বেগে এগিয়ে যেতে পারে। সেই দিক থেকে নতুন পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পুনর্বিবেচনা বাঞ্ছনীয়।

শান্তিকুমার ঘোষ

রবিগীতিকার যৌথ-সংগীত পরিবেশন
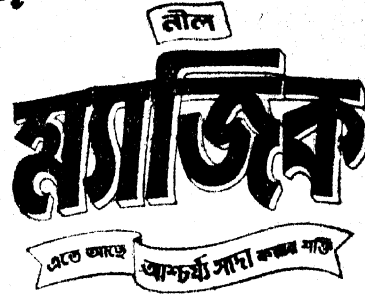
“কাহিনী-সমৃদ্ধ রবীন্দ্র সংগীত।” শুনছিলাম সেদিন এখানকার আরউইন স্কুলের ব্যায়ামাগারের খোলা-মাঠে বসে। একটা নতুন রকমে যেন পরিচয় পেলাম একুনে পনেরোটি গানের, যদিও তাদের অনেকগুলোই অনেকবার শোনা।

এর পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য সংগীত-নৃত্য-শিষ্য শান্তিদেব ঘোষ। তাঁর “রবীন্দ্র সংগীত” বই-এ উনি তুলে ধরেছেন অনেকগুলো উদাহরণ, কীভাবে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা গান ঘটনার, অথবা স্মৃতি, অথবা পারিপার্শ্বিকের অন্তর্নিহিত চাহিদায় লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন এবং অন্যদের শিখিয়েছেন। “সাময়িকভাবে গান রচনার হাত দিলেও গানগুলি তাকে অতিক্রম করে সর্বকালের উপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে”, বলেছেন শান্তিদেব ঘোষ তাঁর বই-এ।

কিন্তু দিল্লিতে সেই সমস্ত গানগুলোর পনেরোটাকে যিনি কয়েকশো শ্রোতার সামনে পরিবেশন করছেন, যৌথ ও একক সংগীতের মাধ্যমে, তিনি শান্তিনিকেতনের একজন প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীসুধীর চন্দ। মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ইনি খাড়া করেছেন রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার একটি সংস্থা, “রবি-গীতিকা।” এবং তার ছাত্র-ছাত্রীরাই গাইলেন ঘটনা-সমৃদ্ধ গানগুলো।

শান্তিনিকেতন শুকনো জায়গা, একসময়ে বেশ জলাভাব ছিল আজকের দিনের মতো রাস্তায় জল, বাড়িতে বাগানে কলের স্বপ্নও কেউ দেখেনি। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন “রবীন্দ্র সংগীত” গ্রন্থে কী করে ১৩২৯ সালের প্রথম দিকে একটি নলকূপ বসানোর কাজে মেতে গেলেন আশ্রমের অধ্যাপকরা। “দিনের পর দিন তাঁরা কুলিদের জলে কাদায় কাজে সাহায্য করছেন। গুরুদেব প্রায়ই সেখানে উপস্থিত থাকতেন তাতে সকলেই প্রেরণা পেতেন। এই উৎসাহকে আরো বর্ধিত করার জন্য ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ‘এসো হে তৃষ্ণার জল, এসো এসো হে’ গানটি তিনি রচনা করলেন।”

হয়তো ঐ সময়কার জল-সমস্যা নিয়ে অন্য একটি গানের ঘটনা-কথা বলেছেন শ্রীমতী রানী চন্দ তাঁর “গুরুদেব” গ্রন্থে। বিলেত থেকে আনা কল কেউ কাজে লাগাতে পারছিল না। শেষে অমূল্যবাবুকে তাঁর উৎসাহ দেখে অনুমতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। “সেই অমূল্যবাবুই একদিন ঐ টিউবওয়েল বসিয়ে তুলে ফেললেন জল মাটির তলা হতে। সেদিন গুরুদেবের কী আনন্দ! বললেন, ‘সভা সাজাও, অমূল্যকে আমি মান দোব’। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই গাওয়া হল, ‘হে আকাশবিহারী নীরদ বাহন জল’।”

প্রথমটি যৌথ-গীতে গাইলেন রবি-গীতিকার পঞ্চাশজন সভ্য-সভ্যা, তার ভিতর যদিও পুরুষদের সংখ্যা মাত্র ১৩ জন, অধ্যাপক সুধীরবাবুকে নিয়ে। বেশ উতরে ছিল গানটা। অন্যটিও হয়েছিল সমগীতিরূপেই। যে ঘটনাগুলো অত্যে লোকের আনন্দ দিয়েছিল মাটির বুক থেকে জল তুলে, গানগুলোও তাই যৌথরূপে দেওয়া ঠিক হয়েছে।

একটা গান থামে, আমরা কথক মশায় শ্রী বি কে ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে থাকি পরবর্তী গানের ঘটনাটি শুনতে। কোনোটা শুনে কেউ হাসে, কোনোটায় গভীর বেদনার আর কবি অনুভূতির ইঙ্গিত। সুরে আকাশ ভরল, “হে মাধবী দ্বিধা কেন”।

জানতাম এবার বনমালীর গল্প আসছে। লেখা আছে নির্মলকুমারী মহলানবিশের “কবির সংগে দাক্ষিণাত্যে”। ১৩২৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি। সেবারে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মদিন উপলক্ষে গানটা অনেককে শেখাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নতুন রচিত গান, “হে মাধবী দ্বিধা কেন”। “সেদিন হঠাৎ গানের মাঝখানে দেখি কবির পুরাতন ভৃত্য বনমালী কবির জন্যে এক

ঘটনা-সমৃদ্ধ রবীন্দ্র সংগীত গাইছেন রবিগীতিকার সভ্যসভ্যারা। সামনে এসরাজ নিয়ে সুধীর চন্দ

সত্যসত্যাদের একটা অংশ

স্লোট আইসক্রিম নিয়ে ঘরে ঢুকবে কিনা ইতস্তত করছে। একবার চৌকাঠের ভেতরে পা দিয়ে উঁকি মেরেই পরক্ষণে পা টেনে নিয়ে বারান্দায় ফিরে যাচ্ছে। বার কতক ঐ রকম করবার পর হঠাৎ কবির নজরে পড়া মাত্র তিনি বনমালীর দিকে ফিরে হাত নেড়ে গেয়ে উঠলেন, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন? ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন?' বনমালী তৎক্ষণে দে-ছুট, হাসতে হাসতে বললেন: 'আমার নীলমণিকে যদিও কবিত্ব করেও মাধবী বলা চলে না, তবু বাঁদরটার দ্বিধাটা ঠিক মাধবীরই মত।' সেদিন ও গানটা আমাদের আর শেখা হল না", বলেন নির্মলকুমারী। (রবিগীতিকার পঞ্চাশজন কোনো দ্বিধা না-করে প্রাণখুলে গাইল মাধবীর ইতস্ততার গান, এবং সে মাধবীকে কে না চেনে? কোথায় সে না আছে?)

এল একটি একক গান, গাইলেন সুধা বসুরায়, "অলি বারবার ফিরে যায়" ভালই গাইলেন। ইতিবৃত্ত কবির "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী"তে। মিস মালের সেই গান খুব ভাল লেগেছিল বলেছিলেন,
"It is so sweetly pretty, so quaintly beautiful and it sounds so pathetic with its minor tones!"
এবং পোর্ট সৈয়দে একজন জার্মান সহযাত্রী কবির গান শুনে তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন এবং গলা সাধতে উপদেশ দিলেন। কবির মন্তব্য: "প্রথমবার যখন ইংলণ্ডে ছিলুম, তখন যদি এই কাজ করতুম, মন্দ হত না। আর কিছু না হোক নিদেন পক্ষে হয়তো একটা উপার্জনের পন্থা থাকতো'।"

অলি যেতে না যেতে সুধীর চন্দের ব্যারিটোন গলায় ঝরে পড়ল "ঝরঝর বরষে বারিধারা"। কঠিন গান, মার্গ সংগীতাংগ। "ফিরে বায়ু হা হা স্বরে জনহীন অসীম প্রান্তরে—অধীরা পদ্মা তরঙ্গ আকুলা, নিবিড় নীরদ গগনে"। ইস্টিমারে কবির মনে বারবার উঁকি দিচ্ছিল সেদিনের নতুন রচিত গানটা এবং ইস্টিমারের ডেকে ভিজতে ভিজতে কবি ঐ গানের সঙ্গে পদ্মার দৃশ্যের মিল দেখছিলেন। কবি সেদিন তাঁর কথায় ছিলেন "এই ঝড় বৃষ্টি বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতা।" (ছিন্নপত্র)।

"জীবন স্মৃতি"র কোনো একটি ঘটনার আশ্রয়ে যৌথ গান হল "ঘন কুসুমে কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে।" নিজেকে রহস্য আবৃত করবার একটা ইচ্ছা কবিকে একদম পেয়ে বসেছিল। একদিন দুপুরের মেঘলা দিনের অবকাশে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। এবং ঐ কবি বর্ণনা করলেন কী করে নিজেকে রহস্যাবৃত করে উনি লিখলেন "ভানু সিংহের পদাবলী", যা তাঁর কোনো বন্ধু সত্যই মনে করেছিলেন প্রাচীন পুঁথির অন্তর্গত কবিতারাজি। (কে আজ মনে রাখে সেই স্লেটে লেখা গান? কিন্তু সে-কথাটা কবি কতো সুন্দর করে বলেছেন)।

আমরা মন দিয়ে শুনলাম সুপর্ণা-শ্রীপর্ণা আর শর্মিলার একত্রে গাওয়া "ওগো দখিন হাওয়া"। তিনজনেই একেবারে বাচ্চা মেয়ে। ভাল গলা আর সুর জ্ঞান, সুধীরবাবুর শিক্ষণ কাজও সার্থক। অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়া" বইএ এটার ছোট্ট কথাটা লেখা আছে। কৌতূহল থাকলে বের করে পড়ে নিন।

কিশোরী মন্দিরা সেন গাইল "আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে"। কে জানতো ১৩২৯ বর্ষামঙ্গলের জন্যে তৈরি হতে হতে কবির গলা যাবে ভেঙে (অনেককে শেখাতে হচ্ছিল কিনা)। শান্তি-দেব ঘোষ তাঁর "রবীন্দ্র সংগীত" গ্রন্থে জানিয়েছেন: "ভাঙা গলা নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন, নানাপ্রকার ওষুধ-পাচন নিজে খাচ্ছেন, আমাদেরও খাওয়াচ্ছেন, আমাদের গলাও যাতে না ভাঙে। সেই ভাঙা গলায় একটি গান রচনা করে দিনেন্দ্র-নাথ ও আমাদের সকলকে ডেকে শি[illegible] দিলেন সন্ধ্যায় গাইবার জন্য। "আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে।"

নন্দিতা চ্যাটার্জি গাইলেন "জীবনে পরম লগন" (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রে আছে কবির নিজস্ব মন্তব্য)। অঞ্জনা চ্যাটার্জি গাইলেন "বড় বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে" (ছিন্নপত্র)। অতি কঠিন সুরের গান। গাইতে পারাটাই সার্থক। আরো যথা: শুক্লা সেনের গলায় "যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ...মৈত্রেয়ী দেবীর বই)। ইত্যাদি।

এর আগেও সুধীর চন্দ কয়েকটা নতুন দিক দেখিয়েছেন সংগীত পরিবেশনের। এ বছরের গোড়ার দিকে করেছিলেন রবীন্দ্র নাথকে বাদ দিয়ে ঠাকুর পরিবারের অনেকের রচিত গান: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র নাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণ-কুমারী দেবী, বলেন্দ্রনাথ, হেমলতা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। (রবিগীতিকার গান শেখানোর ইস্কুল হল শংকর মার্কেটে, ২৬ নম্বর ফ্লাটে। খোঁজ নিতে পারেন শ্রীতুষার সেনের কাছে, ৯০।৮ কনট সারকাস, টেলিফোন ৪২৫৫৩।)

—খগেন দে সরকার

॥ বাংলা সাহিত্যের অসামান্য লেখক ও অসাধারণ বই ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তালপাতার পুঁথি ১৫, কিরীটী রায় ১০, ঝড় ১০, অপারেশন ৬॥০ অরণ্য ৬॥০ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥০ ধূসর গোধূলি ৫, উত্তরফাল্গুনী ৬॥০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৭॥০ কালো ভ্রমর ৫, ঐ ২য় ৫॥০ কালো-হাত ৬, ঘুম নেই ৫, নীলতারা ৫, ধূপশিখা ৫, নূপুর ৪, নিশিপদ্ম ৫, বেলাভূমি ৮॥০ মধুমিতা ৫॥০ রতিবিলাপ ৪॥০ মুখোশ ৫॥০ মায়ামৃগ ৩, রাতের রজনীগন্ধা ৫, হীরা চুনি পান্না ৫, উল্কা ২॥০ চক্র ৩, ছিন্নপত্র ৫, বহুত মিনতি ১০, পিয়া মুখচন্দা ৪॥০ বহ্নিশিখা ৮, মল্লার ৪,

প্রবোধকুমার সান্যাল

তিন কন্যার ঘর ৭, কাচকাটা হীরে ৪, মহা-প্রস্থানের পথে ৬, দেশদেশান্তর ৩॥০ অরণ্যপথ ৩॥০ আঁকাবাঁকা ৫, আগ্নেয়গিরি ২॥০ উত্তরকাল ৪॥০ জল-কল্লোল ৫॥০ তুচ্ছ ৪॥০ নদ ও নদী ৬ বন্যাসঙ্গিনী ৩॥০ বিবাগী ভ্রমর ৭॥০ বেলোয়ারী ৭, শ্রেষ্ঠগল্প ৫ ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে ৩, উত্তর হিমালয় চরিত ১১,

প্রমথনাথ বিশী

লালকেল্লা ১৪, রবীন্দ্র সরণী ১০, অনেক আগে অনেক দূরে ৪॥০ কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০ গল্প পঞ্চাশৎ ৮, নিকৃষ্ট গল্প ৫, মাইকেল মধুসূদন ৪॥০ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (দুই খণ্ড একত্রে) ১০, রবীন্দ্র-নাথের ছোটগল্প ৫॥০ চিত্রচরিত্র ৬, বিচিত্র উপল ৪, প্রাচীন আসামী হইতে ৪, হংসমিথুন ২,

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম—৭, ২য়—৭,

প্রশান্ত চৌধুরী

কান পেতে শুনি ৫, নদী থেকে সাগরে ৮, ঘণ্টা-ফটক ৪, ডাকো নতুন নামে ৪, আলোকের বন্দরে ৪॥০

প্রফুল্ল রায়

মন্ত্রো ৫, নাগমতী ৫, তটিনী তরঙ্গে ৬, প্রথম তারার আলো ১০,

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমের যাত্রী ৫॥০ ভারত সংস্কৃতি ৫॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥০ স্বপ্নতনু ৪॥০ অমলতাস ৬, বেনামী বন্দর ২,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম ৫, ২য় ৫॥০ ৩য় ৬ দোলগোবিন্দের কড়চা ৬, কথাচিত্র ৩, কবি ও অকবি ৩॥০ ক্ষণ অন্তঃপুরিকা ২, গল্পপঞ্চাশৎ ৯, নয়ান বৌ ৬,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী ৬॥০ অপরাজিত ৯, ইছামতী ৮, বিভূতিবিচিত্রা ১২॥০ আরণ্যক ৬, অভিযাত্রিক ৫॥০ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥০ ঐ নাটক ২, উৎকর্ণ ৪, কিন্নর দল ৩, কুশলপাহাড়ী ৫॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৯, দেবযান ৬, মুখোশ ও মুখশ্রী ৩॥০ মেঘমল্লার ৪, যাত্রাবদল ২॥০ শ্রেষ্ঠগল্প ৫, অথৈ জল ৫॥০ অরণ্য মর্মর ৭, অনুবর্তন ৬, নবট্রুলিয়ার কাহিনী ৩,

বিমল কর

খোয়াই ৩, পান্থশালা ৩॥০ জীবনায়ন ৫, পরবাস ৪॥০ সীমারেখা ৪॥০

বিমল মিত্র

একক দশক শতক ১৪, বেনারসী ৫॥০ কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩০, শ্রেষ্ঠগল্প ৫, তিন ছয় নয় ৬,

মনোজ বসু

বন কেটে বসত ১০, গল্পপঞ্চাশৎ ১০, সাজবদল ৫॥০

মহাশ্বেতা দেবী

বায়োস্কোপের বাক্স ৬, সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥০ অজানা ৪॥০ আঁধার মানিক ১২॥০

শঙ্কু মহারাজ

নীলদুর্গম ৬॥০ পঞ্চপ্রয়াগ ৫, বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৭, গহন গিরি কন্দরে ৬,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান শ্রীমতী ৭, নিবেদনমিদং ৭,...

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আরকান ৫, ইরাবতী ৪॥০ উপকূল ৩, চন্দনবাঈ ৫, তরঙ্গের পর ৫, মেঘ ও মৃত্তিকা ৫, শহরে বন্দরে ৪॥০ নায়িকার মন ৪॥০ ক্লান্ত বিহঙ্গী ১১

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

সাতেরো

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মালিনীকে ডাকল হৈমন্তী।

শীতের গাঢ় দুপুরের নিবিড়তা এবার যেন কেটে যাবার সময় এসেছে, রোদ নিষ্প্রভ ও হলুদ হয়ে এল। মালিনীর ঘরের দিকে পশ্চিম হেলে বারান্দায় রোদ পড়ে আছে একটু।

মালিনীর সাড়াশব্দ নেই। হৈমন্তী আবার ডাকল।

উত্তরের বাতাসে আজ বেশ ধার। আজকাল দুপুর ফুরোবার আগে থেকেই উত্তর থেকে বাতাস আসতে শুরু করে। ঝাপটা দিয়ে বাতাস আসছে। ঝাঁক বেঁধে ফড়িং আর প্রজাপতি নেমেছে মাঠে; মাঠের রোদে, ঘাসের ডগায়, ফুলগাছের ঝোপে-ঝাড়ে ফড়িং আর প্রজাপতি উড়ছিল। টিয়া ডাকছিল।

বার দুই ডাকার পর মালিনী বাইরে এল। শীতের দুপুরে ঘুমোচ্ছিল, চোখ ফুলে গেছে; ঘুম থেকে উঠে আসায় হাই তুলছিল বড় বড়।

হৈমন্তী বলল, "স্টেশনে যাবে?"

মালিনী প্রথমটায় যেন বুঝল না, পরে বুঝল। "আপনি যাচ্ছেন?"

"যাবে তো তাড়াতাড়ি নাও। তিনটে প্রায় বাজে।"

স্টেশনে যাবার কথা বললে মালিনী সব সময় পা তুলে থাকে। তবে যাবার আগে সুরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করা তার অভ্যেস। অন্য দিন হেমদি আগেভাগেই বলে রাখে, মালিনীও অনুমতি নিয়ে রাখে সুরেশ্বরের, হাতের কাজকর্মও সেরে রাখে। আজ একেবারে হুট্ করে বলা, হাতেও সময় নেই, দাদা হয়ত এখন বিশ্রাম করছেন, কাজ-কর্মও কিছু সেরে রাখে নি সে। মালিনী দোলামোলা করল, সে যেতে চায়—কিন্তু

মালিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী বলল, "কি ভাবছ?"

"না, ভাবি নি—" মালিনী মাথা নাড়ল। "দাদাকে যে কিছু বলি নি, হেমদি। কাজ সারাও হয় নি।"

"ও! তবে থাক; তোমায় যেতে হবে না।" হৈমন্তী আর অপেক্ষা করল না; তার হাতে তোয়ালে, কলঘরের দিকে চলে গেল।

মালিনী বেশ দ্বিধায় পড়ল। হেমদি একা একা যাবে, সেটা কি ভাল দেখাবে? দাদা হয়ত রাগ করবেন। হেমদি যে একলা কখনও স্টেশনে যায় নি তা নয়, সেবার গিয়েছিল। দাদা একটু অখুশী হয়েছিলেন। একগাদা বই, কিছু জিনিসপত্র নিয়ে হেমদি ফিরে এলে দাদার নজরে পড়েছিল। অত জিনিস-পত্র হেমদি একলা বয়ে আনায় দাদা আড়ালে মালিনীকে বলেছিলেন, তুমি সঙ্গে গেলে পারতে।

সে তো পারতই মালিনী। কিন্তু সেদিন অনেকগুলো কাজ ছিল হাতে, হেমদিও হঠাৎ যাওয়া স্থির করে ফেলেছিল। আজও সেই রকম। দুপুরে শুয়ে শুয়ে হয়ত হঠাৎ মাথায় পোকা ঢুকেছে, স্টেশনে যাব, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। কিংবা পড়ার বই ফুরিয়ে গেছে, জিনিসপত্রও কিছু কেনা-কাটা করতে হবে, স্টেশন যাচ্ছে।...তা যাক্, এখন কি করা যায়? চলে যাবে মালিনী? ছুট্টে এক দৌড়ে গিয়ে দাদাকে বলে আসবে? হাতের কাজগুলো আর-কাউকে সেরে দিতে বলবে?

এত তাড়াতাড়ি সব হয় না। হাতের কাজ অবশ্য এমন কিছু নয় যায় দু'একটা চটপট সেরে, বাকিটা পারবতিয়ার হাতে দিয়ে সে চলে যেতে না পারে। কিন্তু

দাদা? দাদাকে না বলে সে যায় কি করে?

হৈমন্তী কলঘর থেকে ফিরল, চোখমুখ ভিজে, কপাল আর কানের কাছের এলোমেলো চুলগুলিতে জলবিন্দু, গলার তলায় সাবানের একটু ফেনা।

হেমন্তী কাছে এসে মালিনী বলল, "হেমদি, আপনি তৈরি হতে থাকুন, আমি একছুটে দাদাকে একবার বলে আসি।"

হৈমন্তী যেতে যেতেই জবাব দিল, "থাক।"

মালিনীর পাশ দিয়ে চলে গেল হৈমন্তী। মালিনী এবার বলল, "চা খেয়ে যাবেন না?"

"সময় নেই—"

"জল বসিয়ে দিচ্ছি, আপনার কাপড় বদলাতে বদলাতে হয়ে যাবে।"

হৈমন্তী কোনো জবাব দিল না, ঘরে ঢুকে গেল।

এ এক জ্বালা হল মালিনীর। হেমদি হয়ত রাগ করল। সত্যি, রাগ করার কথাই। হেমদি কি তার মতন, যে এখন লাটুঠা পর্যন্ত একা একা টঙটঙ করে হাঁটবে, হাতে হয়ত একগাদা বই থাকবে, তারপর লাটুঠার মোড়ে গিয়ে হাঁ করে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা, দেহাতীগুলো আবার হেমদিকে চিনে গেছে, উঁকিঝুঁকি দেবে, খাতির দেখাবে, পানের দোকান থেকে ভাঙা টিনের চেয়ার এনে রাস্তার সামনে পেতে দেবে বসতে।

মালিনী ঘরে এসে তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসিয়ে দিল স্টোভে। দিয়ে চোখমুখ ধুয়ে আসতে গেল।

হৈমন্তী প্রায় তৈরি হয়ে নিয়েছে মালিনী চা নিয়ে এল।

অবনীর কাছ থেকে আনা খান ছয়েক বই চামড়ার কালো বড় ব্যাগটায় পুরে নিচ্ছে হৈমন্তী। মালিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দু মুহূর্ত, তারপর বলল, "আপনি চাটুকু খান হেমদি, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।"

হৈমন্তী পিছন ফিরে মালিনীর দিকে তাকাল না, জবাবও দিল না।

মালিনী কি করবে বুঝতে পারল না; তার মনে হল হেমদি রাগ করেছে। ইতস্তত করে মালিনী আবার বলল, "আপনার হতে হতে আমারও হয়ে যাবে। আপনি বরং ব্যাগটা আমায় দিয়ে এগুতে থাকুন আমি রাস্তায় আপনাকে ধরে নেব।"

"থাক্, তোমায় যেতে হবে না", হৈমন্তী এবার জবাব দিল।

মালিনী চুপচাপ। তারপর আস্তে করে বলল, "আপনি একলা যাবেন?"

"কেন, কি হয়েছে?" হৈমন্তী দেওয়ালে টাঙানো আয়নার কাছে গিয়ে মুখ দেখে মাথার চুল সামান্য ঠিক করে নিল।

"ফিরতে তো রাত হয়ে যাবে।" ভয়ে ভয়ে মালিনী বলল।

"সে ভাবনা আমার।"

মালিনী বুঝতে পারল না সে এমন কি করেছে যার জন্যে হেমদি তার ওপর এত রেগে গেল। হেমদির আজ ক'দিন কেমন অদ্ভুত রাগ-রাগ ভাব হয়েছে।

হৈমন্তী তাড়াতাড়ি চা খেতে লাগল। চা খেতে খেতেই গরম কোটটা টেনে নিয়ে বিছানায় রাখল।

এবার সরলভাবে মালিনী বলল, "হেমদি, আপনি একলা একলা স্টেশনে গেলে দাদা রাগ করবেন।"

হৈমন্তী যেন থমকে গিয়ে মালিনীর মুখের দিকে তাকাল, চোখ লক্ষ করল। মুখের গাম্ভীর্য আরও ঘন হয়ে এল;

মালিনী কিছু বুঝতে পারল না, তাকিয়ে থাকল সরলভাবেই।

হৈমন্তী বিরক্তভাবে বলল, "তোমার দাদা কি আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় ঘুরতে বলেছে?"

কথাটার জটিল অর্থ মালিনী ধরতে পারল না, বলল, "সেবার আপনি একলা গিয়েছিলেন, দাদা আমায় বললেন—আমি কেন সঙ্গে যাই নি।"

সুরেশ্বর কি হৈমন্তীর আসাযাওয়ার খবরদারি করতে চায়? হৈমন্তীর মুখ লাল হয়ে উঠল রাগে, চোখমুখে হলকা লাগল আঁচের। মালিনীর সামনে নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে হৈমন্তী বলল, "তুমি যাও, কর্তামি করো না।"

মালিনী কেমন বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর অপরাধীর মতন মুখ নীচু করে চলে গেল।

অল্প একটু সময় হৈমন্তী কেমন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, কিছু ভাবতে পারল না। চা আর খেল না। জানলা বন্ধ করে দিল, দরজার তালা খুঁজে নিল। গরম জামাটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে, ব্যাগ হাতে বাইরে এল। তালা দিল দরজায়। মালিনীই সাধারণত তার ঘরদোর বন্ধ করে, দরজায় তালা দেয়, চাবি রাখে। আজ হৈমন্তী নিজের হাতেই সব করল, মালিনী খানিকটা তফাতে তার ঘরের কাছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তালার চাবিটা পর্যন্ত দিল না হৈমন্তী। সব দেখেশুনেও যেন হৈমন্তী কিছু দেখে নি, মালিনীকে উপেক্ষা করে সে মাঠে নেমে গেল, মাঠ দিয়ে অন্ধ আশ্রমের ফটকের দিকে চলে গেল, তারপর ওপারে জামতলার রাস্তায়।

গত কয়েকটা দিনই হৈমন্তীর খুব স্বস্তির মধ্যে কাটছে না। মনের মধ্যে যেন কিছু জমে আছে, রাগ ক্ষোভ বিরক্তি মালিন্য নাকি দুঃখ বা অনুশোচনা তা বোঝা যেত না। নিজের যথার্থ মনোভাব নিজে বেশীর ভাগ সময়ই বোঝা যায় না। কখনও হৈমন্তীর মনে হত সে ক্ষুব্ধ ও আহত হয়ে আছে, কখনও মনে হত সুরেশ্বরের সঙ্গে তার বোঝাপড়ার একটা দরকার ছিল, এবং এই চাপা কলহ বা রেষারেষি যেন তার শত্রু। মাঝে মাঝে আবার এমনও মনে হত, সেদিন ঝোঁকের মাথায় হৈমন্তী বেশী রূঢ় হয়ে পড়েছিল। অতটা রূঢ় হওয়া তার উচিত হয় নি হয়ত। অথচ নিজের দিক থেকে হৈমন্তী তেমন একটা দোষও খুঁজে পেত না। সেদিন তার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল; মানুষ মাত্রেরই মাথা গরম হয়, এতে লজ্জায় মরে যাবার কি আছে! সবাই তো আর সুরেশ্বর নয়, গাছপাথরের মতন সহিষ্ণু হবে, শান্ত হবে। কিন্তু, সুরেশ্বর ওপর ওপর যতটা ধীরস্থির শান্ত ভাব দেখায় ভেতরে ততটা নয়। সুরেশ্বরের দৃষ্টিতে বিরক্তি এবং রাগ হৈমন্তী সেদিন লক্ষ করেছে। তার কথায় সুরেশ্বর অসন্তুষ্ট হয়েছিল, অপমান বোধ করেছে। হৈমন্তীর সন্দেহ নেই, সুরেশ্বর এই আশ্রমের সকলের কাছে আনুগত্য চায়, সম্মান চায়, না পেলে আত্মমর্যাদায় আঘাত পায়।

এই মর্যাদা হৈমন্তীরও না থাকার কারণ নেই। সুরেশ্বর নিজের মর্যাদার বিষয়ে যদি এত সচেতন হতে পারে, তবে অন্যের

মর্যাদা সম্পর্কেও বা কেন হবে না? হৈমন্তীর যথার্থ মর্যাদা কি সে দিতে চায়!

গুরুডিয়ার কাঁচা রাস্তা ধরে লাটঠার পথে হাঁটতে হাঁটতে হৈমন্তী এলোমেলো ভাবে কথাগুলো ভাবছিল। শীতের এই ভরা দুপুরে পথ হাঁটতে তার খারাপ লাগছিল না। আগে একলা একলা এভাবে ফাঁকায় হাঁটতে তার ভাল লাগত না, বা এতটা পথ হাঁটার অভ্যেসও তার ছিল না। আজকাল হৈমন্তীর মোটামুটি অভ্যেস হয়ে গেছে। সে হাঁটতে পারে, ভালও লাগে।

সুরেশ্বর তার একা একা স্টেশনে যাওয়া পছন্দ করে না নাকি? কেন? মালিনী তার সংগে সংগে থাকবে এটাই কি সুরেশ্বরের ইচ্ছে? নাকি আদেশ? তাই বা হয় কেমন করে, যদি হত, মালিনী তার সংগে আজ যেতে পারত! দাদার বড় অনুগত মালিনী, অনুমতি না নিয়ে আশ্রমের বাইরে পা বাড়াতে সাহস করে না। মালিনী অনুমতি নেয় নি বলে যেতে সাহস করল না। শেষ পর্যন্ত যে যেতে চেয়েছিল সেটা বোধ হয় ওই ভয়ে—যদি সুরেশ্বর রাগ করে!

চিন্তাটা কেমন জটিল হয়ে সুতোর জট পাকানোর মতন জড়িয়ে যেতে লাগল।

কোনো কোনো সময় ভাবনার ঝোঁক নোঙরা হয়ে ওঠার উপক্রম হচ্ছিল। সুতোর জট হাতে করে খুলতে গিয়ে খুলতে না পারলে বার বার চেষ্টায় যেমন আঙুলের ময়লা লেগে কোনো কোনো জায়গা কালচে হয়ে আসে—সেই রকম নানাভাবে চিন্তাটাকে ছাড়াতে গিয়ে কোথাও কোথাও মনের ময়লা লাগছিল। হৈমন্তীকে সর্বক্ষণ ছায়ার মতন অনুসরণ করতে বলার মতন মন সুরেশ্বরের নয়। স্টেশনে সে মাঝে মাঝেই যাচ্ছে বলে সুরেশ্বর মালিনীকে হৈমন্তীর ওপর চোখ রাখতে বলবে—এ রকম কুৎসিত নোঙরা সুরেশ্বর কখনও ছিল না, কখনও হবে না। তার ঈর্ষার বা সন্দেহের......

ঈর্ষা বা সন্দেহ কথাটা যেন মাথার মধ্যে ঝিলিকের মতন এল। অনেক সময় যেমন চোখ ফেরাতে গিয়ে বা অন্য কোনো দিকে তাকাতে গিয়ে সহসা রোদের কোনো ঝিলিক বা প্রতিফলিত আলোর তীর এসে চোখের মণিতে লেগে চোখটা কেমন হয়ে যায়, সেই রকম মনে এবং চিন্তার মধ্যে ঈর্ষা ও সন্দেহ কথাটা তীরের মতন এসে লাগল। হৈমন্তী কেমন অ-জ্ঞানে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল, বেহুঁশ, কিছু দেখতে পেল না, কিছু ভাবতে পারল না, নিশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেল। তারপর হঠাৎ বুকে কষ্ট অনুভব করতেই চোখ তুলে পথ এবং গাছ-পালা দেখল, নিশ্বাস নিল। একটা গরুর গাড়ি আসছে, অনেকটা দূরে লাটঠা, শনশন বাতাস বইছে, শালের চারাঝোপের ওপর দিয়ে বুনো মুরগী ফরফর করে উড়ে গেল।

ঈর্ষা, সন্দেহ...! কার ওপর ঈর্ষা, কি বিষয়ে সন্দেহ?

মনে মনে অবনীর মুখ দেখতে পেল হৈমন্তী। ইদানীং অবনীর সঙ্গে তার মেলামেশা বেশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দেখাসাক্ষাৎ ঘটছে। হৈমন্তী স্টেশনে যায়, অবনীও আসে; তবে একেবারে হালে কাজেকর্মে অবনী তেমন আসতে পারছে না। হৈমন্তী আজও অবনীর কাছে যাচ্ছে। শুধু অবনীর কাছে নয়, তার কিছু কেনাকাটা করার আছে; রেডিওর ব্যাটারী, একটা ক্রীম, মাথার তেল, ওভালটিন—এই সব।

হৈমন্তী হাঁটতে লাগল। এখন তার কেমন অদ্ভুত লাগছিল। সুরেশ্বরের মধ্যে ঈর্ষা বা সন্দেহ বলে কিছু থাকতে পারে এ কথা ভাবা যায় না। কি কারণেই বা ঈর্ষা হবে? অবনীর সঙ্গে হৈমন্তীর মেলা-মেশায় তার কিছু আসে যায় না, যায় কি! সুরেশ্বর ন্যায়ত ও সঙ্গতভাবেই অবনীর ওপর ঈর্ষা বোধ করতে পারে না, হৈমন্তীর ওপর সন্দেহও তার থাকা উচিত নয়। বলতে কি, আজ হৈমন্তী ও সুরেশ্বরের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে হৈমন্তী অন্য কারও সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করছে, কি ধরনের ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে ওদের তাতে কি এল গেল, তার! যদি ভালবাসার কথাও হয় হৈমন্তী অন্য কাউকে ভালবাসল কি বাসল না তা নিয়ে সুরেশ্বরের গায়ে জ্বালা ধরার কিছু নেই।

চিন্তাটা এবার যেন কৌতুকের মতন হয়ে উঠেছে। হৈমন্তী নিজের এই হাস্যকর চিন্তায় লঘু হয়ে হেসে ফেলতে গেল। অথচ হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না, কোথাও যেন একটা বাধা এল। কিসের বাধা?

এমন তো হতে পারে—হৈমন্তী ভাবল: সুরেশ্বর অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এখানে হৈমন্তীর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, সে একা; সুরেশ্বরই তাকে এই জঙ্গলের দেশে আনিয়েছে, কাজেই হৈমন্তীর প্রতি তার দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ আছে। সুরেশ্বর সেই দায়-দায়িত্ব বোধের জন্যে তার অভিভাবক, এবং সেই হিসেবে হৈমন্তীর প্রতি লক্ষ রাখে।

কিন্তু, হৈমন্তী ভেবে পেল না, এটা কি ধরনের অভিভাবকত্ব যে তার ব্যক্তিগত বিষয়ের ওপর সুরেশ্বর নজর রাখবে? হৈমন্তী ছেলেমানুষ নয়, বা সে সুরেশ্বরের আশ্রয়াধীন নয় যে, সুরেশ্বর তার হাঁটা-চলা বেড়ানো অথবা কারও সঙ্গে মেলা-মেশার ওপর চোখ রাখবে।

মনে মনে যে কৌতুকের ভাব এসেছিল সামান্য আগে সে ভাব আর থাকল না হৈমন্তীর। বরং সে বিরূপ হয়ে উঠল আবার। মানুষটা নোঙরা হতে পারে না, তার মনে নিশ্চয় সন্দেহ বা ঈর্ষা থাকতে পারে না; থাকলে হয়ত ভালই হত। আসলে হৈমন্তীর ওপর সুরেশ্বর এক ধরনের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব দেখাতে চায়। বোঝাতে চায়, সে হৈমন্তীর অভিভাবক, তার ভালমন্দের মালিক।......চিন্তাটা বিশ্রী
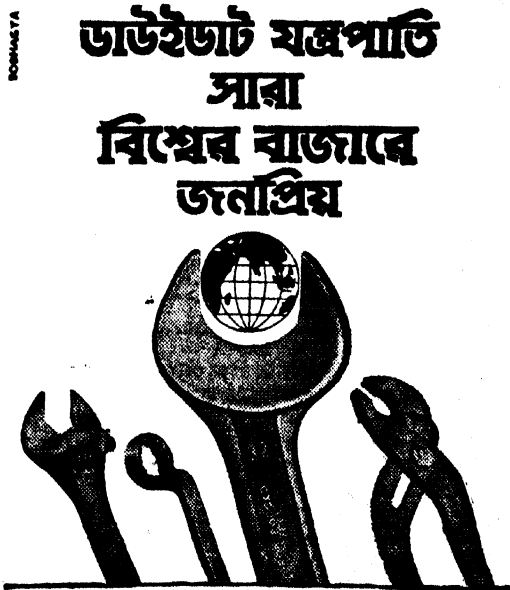
লাগল, এবং হৈমন্তী হঠাৎ সুরেশ্বরের ওপর তীব্র ঘৃণা অনুভব করল। তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ইচ্ছা, রুচি, মনের ওপর অন্ধ-আশ্রমের মালিকের মালিকানা স্বত্ব থাকবে নাকি? আমায় কি তুমি তোমার আশ্রমের ঘরবাড়ি, তাঁত, ঝি চাকর পেয়েছ? নাকি তুমি ভেবেছ আমি বোকার মতন তোমায় বিশ্বাস করে এসেছিলাম বরাবর, ভালবেসে-ছিলাম—তার জোরে তুমি আমার জীবন-মরণের প্রভু হয়ে গেছ?

মাঠের ওপর দিয়ে কিছু ধুলো উড়ে এল, কিছু শুকনো পাতা। সামনে লাটঠার মোড়। হৈমন্তী হঠাৎ কেমন জোরে জোরে হাটতে লাগল, কপালের দুপাশ বেশ গরম। সূর্য একেবারে মুখোমুখি। মাথায় রোদ লাগছিল বলে হৈমন্তী এই ফাঁকায় মাথায় কাপড় টেনে হাটছিল, এবার কাপড়টা ফেলে দিল মাথা থেকে।

দূরে বাস আসছে। সময় মতন পৌঁছে গেছে হৈমন্তী। হঠাৎ হৈমন্তীর অদ্ভুত একটা কথা মনে এল। যদি আজ সে অবনীর বাড়ি থেকে না ফেরে কি করবে সুরেশ্বর? কি সে করতে পারে...?

(ক্রমশ)

আমাদের ছায়াপথ

১৮শ শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে বহু অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। সৌর জগৎ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, গ্রহ-উপগ্রহগুলি এক শো বছর পরে কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে তাঁরা নির্ভুল ভবিষ্যদবাণী করে গিয়েছেন। তারপর আজ বিংশ শতাব্দীতে মানুষ মহাজগতের আরো অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে। আজ এমনসব রেডিও দূরবীণ উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলি বহু কোটি আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত নক্ষত্র ও নীহারিকার রেডিও-বার্তা শুনতে পায়।

১৫ হাজার কোটি নক্ষত্র নিয়ে আমাদের সর্পিল ছায়াপথ যার আয়তন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। আমরা জানি, আলোকরশ্মির সূর্য থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লাগে মাত্র ৮ মিনিট ১২ সেকেন্ড। সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগ সম্পন্ন সেই আলোকরশ্মির ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে প্রায় ৭০ হাজার বছর লাগে। মহাবিশ্বে এইরকম আরো অসংখ্য ছায়াপথ ও নীহারিকা আছে। আমাদের ছায়াপথে নিকটতম নক্ষত্র আলফা সেণ্টাউরির দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৪ কোটি কিলোমিটার বা ৪ আলোক-বৎসরের সামান্য বেশী।

গোটা মহাজগতের গতির একদণ্ড বিরাম নেই। সুদূর ছায়াপথ বা নীহারিকাগুলি আমাদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য বেগে, যে বেগ দূরত্বের অনুপাতে বাড়ে। আমাদের ছায়াপথও আবর্তনশীল। তেমনি আমাদের সূর্যও ছায়াপথের নিউক্লিয়াস বা মর্মকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে আসছে। সেই মর্মকেন্দ্র হচ্ছে এক ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ যা থেকে কতকগুলি সর্পিল বাহু বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। সেগুলির বাষ্পমেঘ ও বস্তুকণারাশির মধ্যে ছড়িয়ে আছে বহু অনুজ্জ্বল ও অতিবৃহৎ তারা।

ছায়াপথের মর্মকেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে তারায় তারায় ব্যবধানও বেড়ে যাবে সেই অনুপাতে। মহাবিশ্বের অন্য সব কিছুর মতই ছায়াপথের নক্ষত্র সংস্থান কিছু খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়, তার মধ্যে আইন ও শৃংখলা আছে। গ্রহগুলি যেমন নির্দিষ্ট নিয়মে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে ঠিক তেমনি ছায়াপথের প্রতিটি নক্ষত্র আবর্তন করে যাচ্ছে তার মর্মকেন্দ্রকে। সেই মর্মকেন্দ্র থেকে সূর্যের

ছায়াপথের একাংশ

দূরত্ব ৩০ হাজার আলোক বৎসর। সূর্যের একবার ছায়াপথের মর্মকেন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় মহাজাগতিক বা ছায়াপথ বৎসর যা হচ্ছে ২৫ কোটি পার্থিব বছরের সমান। ধরুন পৃথিবীর বয়েস যদি ৪০০ কোটি বছর হয় তার মানে পৃথিবীর জন্মদিনের পর থেকে এ পর্যন্ত সূর্যের বয়েস হয়েছে ১৬ ছায়াপথ বৎসর।

ছায়াপথে একই ধরনের ভৌতিক ধর্মসম্পন্ন তারাগুলি এক সঙ্গে জোট বেঁধে আছে। সেইরকম একটি জোটের নাম 'গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ', আর একটি 'সমতল নক্ষত্রপুঞ্জ'। প্রথম জোটের তারাগুলির বেগ দ্বিতীয় জোটের তারাগুলির চেয়ে অনেক বেশি। আর এক ধরনের নক্ষত্রপুঞ্জ আছে যাদের বলা হয় 'যুগ্মতারা'। এই পুঞ্জগুলিতে এক জোড়া বা তার চেয়েও বেশি তারা একই মহাকর্ষ কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। যেখানে এক জোড়া তারা আছে সেখানে সেটি এত ঘনিষ্ঠ যে তাদের একটি তারার মতই দেখায় পৃথিবী থেকে। একমাত্র বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করে তাদের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। তাদের একটি হচ্ছে মুখ্য, অন্যটি গৌণ অর্থাৎ সেটিকে মুখ্যের উপতারা বা গ্রহ বললে অন্যায় হবে না।

সূর্যের এলাকায় সূর্যকে নিয়ে যে ৩২টি নক্ষত্র আছে তারই নিকটতম নক্ষত্রটি হচ্ছে আলফা সেণ্টাউরী (অশ্বাসুর)। এটি যুগ্মতারা। যুগ্মতারার আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে লুব্ধক যার একটি উপতারা আছে যার আয়তন সূর্যের চেয়ে বেশি না হলেও ঘন মান সূর্যের ৩০ হাজার গুণ। ঐ এলাকার লুব্ধক হচ্ছে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ঐ এলাকায় সর্বসাকুল্যে ১১টি যুগ্মতারা আছে, কিন্তু লুব্ধক ও অশ্বাসুর বাদে অন্যগুলি সূর্যের তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ। সূর্যের তুলনায় অশ্বাসুর পৃথিবী থেকে ৩০ গুণ বেশি দূরে। অত দূরে থাকলে সূর্যকে আমরা দেখতাম এক ফিকে হলদে টিমটিম তারার মত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অধিকাংশ তারাই সূর্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশি জ্যোতিষ্মান।

যুগ্মতারার ক্ষেত্রে উপতারাটি যে সব সময়েই নক্ষত্রধর্মী হবে এমন কথা নেই। ধরুন সিগ্নি (অশ্বিনী) নক্ষত্রের কথা। তার উপতারার জড়মান সূর্যের জড়মানের মাত্র ২।৩ শতাংশ অথচ বৃহস্পতির ১০।১২ গুণ। তাহলে সেটির পক্ষে কি নক্ষত্রের মত জ্যোতিষ্মান হওয়া সম্ভব? না সম্ভব নয়। আসলে গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্যটা কোনখানে? পার্থক্যটা হচ্ছে এইখানে যে নক্ষত্রের বুকে অহরহ হাইড্রোজেনের দহন থেকে উদ্ভূত হিলিয়াম বাষ্প যে পারমাণবিক শক্তি মুক্ত করছে তাই বিকীর্ণ হয় জ্যোতি হিসাবে। গ্রহে সেই দহনক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই বলে সে নিজে আলো দিতে পারে না, তাকে অন্যের আলো ধার করতে হয়। গ্রহের জড়মান এত কম যে, তার চাপ কোনরকম পারমাণবিক ক্রিয়া ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পারমাণবিক ক্রিয়া ঘটাবার জন্য গ্রহের জড়মান সূর্যের জড়মানের অন্তত ২০।২৫ ভাগ হওয়া চাই। যেখানেই গ্রহবিশেষের জড়মান সেই স্তরে পৌঁছবে সেখানেই গ্রহটি রূপান্তরিত হবে নক্ষত্রে। এই দিক থেকে বলা যায় যে, যুগ্মতারাগুলির বহু উপতারা আসলে তারার পর্যায়ে ওঠেনি, গ্রহ হয়েই রয়েছে। সূর্যের কাছাকাছি মহাশূন্যে শতকরা ৮০ই যুগ্মতারা এবং তাদের অনেকগুলিরই সূর্যের গ্রহের মত গ্রহ আছে যেগুলি তাদের নিজেদের সূর্যের কাছ থেকে আলো পায়। ঐসব তারা যেমন সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড় তেমনি তাদের গ্রহগুলিও সৌর গ্রহগুলির চেয়ে অনেকগুণ বড়।

বিভিন্ন তারার রং ভিন্ন ভিন্ন রকমের

কেন? আমরা জানি কোন জিনিসকে অল্প গরম করলে সেটি থেকে লালচে আভা বার হয়। তাপ আরো বাড়ালে রং বদলে লাল থেকে কমলা রং হয়ে যায়। আরো বাড়ালে হয় হলদে, তারপর সাদা। আর গ্যাসের আধিক্য থাকলে নীল দেখায়। সুতরাং তারার

যুগ্ম তারা

রঙের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তার তাপমাত্রা আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে যে, বহু যুগের পুরানো তারাগুলির তাপমাত্রা ১০ থেকে ২৫ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। হলদে ও কমলা রঙের নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা ৫ থেকে ৮ হাজার ডিগ্রী এবং লালগুলির ৩ থেকে ৪ হাজার ডিগ্রী। আমাদের সূর্য মধ্যম গোত্রীয় পীতাভ নক্ষত্র। যে তারাগুলি নীল দেখায় সেগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং এখনো বাষ্পীয় অবস্থায় আছে, যেমন বৃশ্চিক। সেটির আয়তন আমাদের গোটা সৌর-জগতের সমান।

আমাদের সূর্যের মত একক নক্ষত্র সংখ্যায় খুব বেশি নয়। একক নক্ষত্র হলে মহাকর্ষ কেন্দ্রও হবে একটি, যুগ্মতারা ক্ষেত্রে হবে একাধিক। যে নক্ষত্রের রাজ্যে মহাকর্ষ কেন্দ্র একটি সেখানে গ্রহগুলির কক্ষপথ মোটামুটি গোলাকার বা ডিম্বাকার। আর যেখানে মহাকর্ষ কেন্দ্র একাধিক সেখানে গ্রহের কক্ষপথও হবে কুটিল। কক্ষপথ কুটিল হলে গ্রহগুলি সব সময় সমানভাবে তাপ ও আলো পায় না বলে সেখানে জৈব জগতের উদ্ভব সম্ভব নয়। একমাত্র সেইসব গ্রহে জীবের আবির্ভাব হতে পারে যার বার্ষিক আবর্তনের মহাকর্ষ কেন্দ্র অর্থাৎ সূর্য মাত্র একটি। তেমনি নক্ষত্র বিশেষের জড়মান অত্যধিক হলে তার বিকীর্ণ তাপও হবে অত্যধিক। ঐ সব অতিকায় নক্ষত্রের আয়ু অত্যধিক জড়মান ও বিকিরণের প্রভাবে কোটির কোঠায় পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে সেগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। সেগুলির নাম 'সুপার নোভা' (অতিকায় নতুন নক্ষত্র)। কাল-পুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জে এই ধরনের বহু তারা আছে। একমাত্র সূর্যের মত নাতিবৃহৎ নক্ষত্রের পক্ষেই দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব এবং ঐ ধরনের নক্ষত্রের গ্রহে প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব।

ছায়াপথের রাজ্যে গ্রহনক্ষত্রগুলি সাজানো রয়েছে বাষ্পমেঘের মধ্যে যার উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, অঙ্গার ইত্যাদি বিভিন্ন মূল পদার্থ। নির্দিষ্ট পরি-বেশে, নির্দিষ্ট আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় সেগুলি যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে একসঙ্গে মিশতে পারে তাহলে উদ্ভব হবে প্রাণবস্তুর।

পৃথিবী থেকে ৫০ কোটি আলোক-বৎসরের মধ্যে আরো অন্তত ১০ কোটি ছায়াপথ আছে, কোনটি অপবৃত্তাকার, কোনটি চক্রাকার, কোনটি বা অসম আকারের। আমাদের ছায়াপথের এবং ২০ লক্ষ আলোকবৎসর দূরে অবস্থিত আন্দ্রো-মেদা ছায়াপথের চেহারা গোল। এই দুটি ছায়াপথের আবার এক জোড়া করে অসম আকারের উপছায়াপথ আছে। সেগুলি আবিষ্কার করেছিলেন ভূ-প্রদক্ষিণকারী নাবিক মেগেল্লান। আমাদের ছায়াপথের ও আন্দ্রোমেদার নিউক্লিয়াসের জড়মান ১০ হাজার সূর্যের সমান।

মহাবিশ্বে ছায়াপথগুলি দল বেঁধে থাকে। আমাদের ছায়াপথ এমন একটি দলের সদস্য যাতে ১৩টি ছায়াপথ আছে। এই ধরনের সমষ্টিকে বলা হয় মহাছায়াপথ। আমাদের ছায়াপথে সৌরজগতের মত ১০ কোটি গ্রহবিশিষ্ট নক্ষত্রজগৎ আছে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

"এত
সাদা
ধবধবে
হয়
কিসে?"
Tinopal

॥ ২৯ ॥

"দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না"

ইতিহাসের উপরে কাব্যের জিত, কারণ ইতিহাসের অধিকার তথ্য মাত্র, কাব্যের অধিকার সত্য, মন্তব্য করেছেন এরিস্টটল। এ কথা উপন্যাস সম্বন্ধেও সত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধেও, উপন্যাসও কাব্য। আরও এক কারণে, ইতিহাসের উপরে উপন্যাসের জয়। ইতিহাসে ঘটনাপুঞ্জ দেখে, প্রেক্ষাগৃহে বসে দর্শক যেভাবে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়কে দেখে। তবে আর এক শ্রেণীর রচনা আছে তাকে ইতিহাস না বলে ইতিহাসের উপাদান বলা উচিত, যেমন ডায়ারী, চিঠিপত্র ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ; এসব পড়লে ইতিহাস সম্বন্ধে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে জানা যায়, সে যেন কোন সুযোগে নেপথ্যে ও সজ্জাগৃহে প্রবেশ করে নাটকের পাত্রপাত্রীকে দেখা। কিন্তু চরম দেখাটা কাব্যের হাতে, এ ক্ষেত্রে উপন্যাসের। নাটকের পাত্রপাত্রীর মনের মধ্যে প্রবেশ করবার ক্ষমতা একমাত্র তারই। ইতিহাস বাইরে থেকে ভিতরে দেখতে চেষ্টা করে; কাব্য ভিতর থেকে বাইরে দেখতে চেষ্টা করে; এই দুই দেখায় যেখানে মেলে সেখানেই শিল্পের চরম, অর্থাৎ একই সঙ্গে ভিতর বাইরে মিলিয়ে পূর্ণভাবে দেখা। এই রকম পূর্ণভাবে দেখবার পরিচয় চন্দ্রশেখরে আছে, সীতারামে আছে, তবে রাজসিংহের মতো স্পষ্টভাবে, পূর্ণভাবে আর কোথাও নাই। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

নির্মলকুমারী লাল কেল্লায় প্রবিষ্ট হয়ে কার্যোদ্ধার করেছে। তারপরে যোধপুরী বেগমের আদেশে একজন খোজার সঙ্গে বাইরে যাত্রা করেছে। "নির্মলকুমারী অতি প্রফুল্ল মনে খোজার সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু সহসা সে প্রফুল্লতা দূর হইল—রঙমহালের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, কি বিপদ, পালাও, পালাও এই বলিয়া খোজা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইল। নির্মল বুঝিল না যে, কেন পালাইতে হইবে। এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিল, পালাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল ফটকের নিকট, পরিণত বয়স্ক, শুভ্রকেশ একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিল, এই কি ভূত প্রেত যে তাই ভয় পাইয়া খোজা পালাইল? নির্মল নিজে ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে। এ জন্য সে না পালাইয়া ইতস্তত করিতেছিল; ইতিমধ্যে সেই শুভ্রকেশ পুরুষ আসিয়া নির্মলের নিকটে দাঁড়াইল। নির্মলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?"

জ্যোৎস্নালোকিত লাল কেল্লার নির্জন চত্বরে নিঃসঙ্গ শুভ্রকেশ বাদশাহ আলমগীরের এমন সত্য কোনো ইতিহাস গ্রন্থে আছে কি? স্বভাবতই নাই, কারণ এ কবির কল্পনা। কিন্তু কল্পনা এখানে ইতিহাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, যাকে আমরা আগে বলেছি ভিতরের দেখায় ও বাইরের দেখায় মিলনরেখাটি। ঐতিহাসিক আলমগীরের শত শত তথ্যচিত্র অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু এই চিত্রটি বাদশাহকে বুঝতে যেমন সাহায্য করে এমন আর কিছু নয়। আরও আছে।

ঔরঙ্গজেব ও নির্মলকুমারীতে কথোপকথন চলছে। ঔরঙ্গজেব শুধোচ্ছেন, যদি তোমার স্বামী না থাকিত তবে আসিতে?

নির্মল। এ কথা কেন?

ঔরঙ্গজেব। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকে বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকে ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বলো যে স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়, পোড়া পাহাড়ের মতো হৃদয়, একটু স্নিগ্ধ হয়।

নির্মল ঔরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাস করিল, কেননা ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠের স্বর বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল।

নির্মল বিশ্বাস করলো, আমরাও বিশ্বাস করলাম, কারণ, লেখক বিশ্বাস করেছেন, তাঁর চোখে পড়েছে দুনিয়ার হীরা-জহরত-মণি-মুক্তার তলে বাদশার পোড়া পাহাড়ের মতো হৃদয়। ঐতিহাসিকের চোখ এ দেখে না, কারণ হৃদয় তার অধিকারবহির্ভূত।

ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না, কাহারও সাধ মিটে না।

ঐতিহাসিক বলবেন, এ শ্মশানবৈরাগ্য অর্থাৎ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ঐ ক্ষণটা তো মিথ্যা নয়। এমন অসংখ্য মনের

[illegible] তো জীবন বলে। জীবন কবিদের [illegible] বিষয়, ঐতিহাসিকদের সাধনা [illegible] অংশমাত্র নিয়ে। ঐতিহাসিক [illegible] ঔরঙ্গজেবকে অঙ্কিত করেছেন, কবি তাকে গভীরতর করে দেখালেন। মানুষকে বুঝতে হলে এই দেখার একান্ত আবশ্যক। ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে প্রতিকূল মত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু কবি বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের প্রতি সমবেদনাপরায়ণ। এই কারণেই তিনি ঔরঙ্গজেবের পরম হিতার্থী। যদুনাথ সরকার কৃত ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস পাঠ করে যত লোকে ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে ধারণা করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোকের ধারণা পুষ্ট রাজসিংহ পড়ে। ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব "নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রুর, দাম্ভিক, আত্মহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক।" রাজসিংহের ঔরঙ্গজেব, সর্বাংশে নয়, হৃদয়ের গভীরতর এক অংশে, যে অংশ নির্মলের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তার নিজের কাছেও অজ্ঞাত ছিল, সেই সুনিভৃত, অজ্ঞাতপ্রায় অংশে প্রেমবুভুক্ষু, চিরতৃষিত সামান্য মানব, অতি দীনহীন নগণ্য এক নারীর কাছে করজোড়ে প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান। ঐতিহাসিক যখন নিশ্চিন্ত হয়ে সীমানার উপরে পিলেপ গাড়ে, কবিরা তখন অতর্কিত-ভাবে এসে জীবনের সীমানা বাড়িয়ে দিয়ে যান। বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই কাজটি করেছেন, রাজসিংহে সবচেয়ে বেশী।

রাজসিংহ উপন্যাসে, রাজসিংহ ও চঞ্চল-কুমারীর অপ্রত্যাশিত বিবাহ কাহিনীর মধ্যে জেবউন্নিসা-মোবারক উপকাহিনীর কোন প্রয়োজন ছিল কি? সে প্রয়োজন শিল্পগত, না তত্ত্বগত? কি পরিমাণে লেখকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে এই উপকাহিনীর প্রবর্তনে? এসব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে গোড়া থেকে আরম্ভ করা আবশ্যক।

রাজসিংহে রাষ্ট্রদ্বন্দ্বের প্রাধান্য হলেও প্রণয় কাহিনীর অভাব নাই। মোবারক-জেবউন্নিসার প্রণয়কাহিনী অন্য সব প্রণয়-কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে তবেই তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে।

চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহ, নির্মলকুমারী-মাণিকলাল, দরিয়াবিবি-মোবারক এবং জেবউন্নিসা-মোবারক; এই চার মিথুনের প্রণয়কাহিনী কখনো স্বর্ণবর্ণে, কখনো কখনো অগ্নিবর্ণে রাজসিংহ উপন্যাসের উপরে তন্তুজাল বয়ন করে দিয়েছে। জেব-উন্নিসা, দরিয়া ও মোবারককে নিয়ে যে দুটি প্রণয় কাহিনী গড়ে উঠেছে তার বুনন জ্বালাময় দীপ্তিময় অগ্নিবর্ণের সুতোয়।

প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর বিচিত্র প্রণয় কাহিনী যার পরিণাম বিবাহে। এটিকে মূল সুর বলে গণ্য করলে মাঝখানে তিনটি গৌণ সুর এসে পড়েছে যারা কখনো হরণে, কখনো পূরণে মূল সুরের মাধুর্য ও সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বঙ্কিমচন্দ্র অন্য প্রকার প্রেমের অস্তিত্ব ও আকর্ষণ অস্বীকার না করলেও দাম্পত্য প্রেমকেই নরনারীর চরম নির্ভর মনে করতেন। তিনি আরও মনে করতেন যে, দাম্পত্য প্রেম সরলভাবে স্বভাবের পথে যখন আসে তখন অবশ্য কথা নেই, কিন্তু অনেক সময়েই এত অনায়াস তার অভ্যাগম নয়, তখন দুঃখের অন্ত থাকে না। তবে এই দুঃখই নিরর্থক নয়, সাধনার নামান্তর; সাধনার ফলে বক্র সরল এবং অসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেয়। মাঝখানে থাকে অনেক চোখের জল, অনেক বুকের রক্ত।
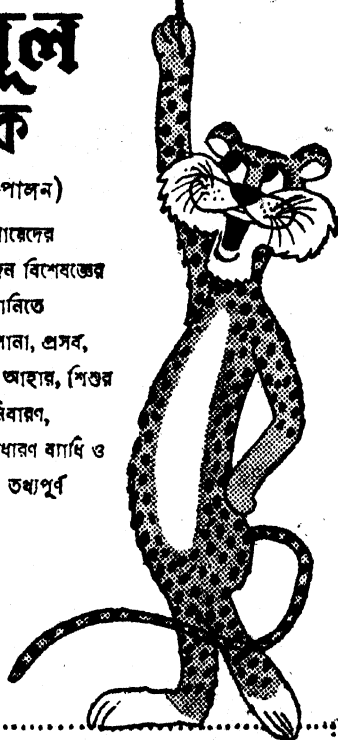
নির্জনকুমারী-মাণিকলালের প্রণয় ও পরিণয় সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত। পথের মাঝখানে, দু-চারটি কথা, পরিচয় পাওয়া গেল মেয়েটি অবিবাহিত, পুরুষ বিপত্নীক, দুজনেরই আশ্রয়ের দরকার। তখন পুরুষ বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিতেই মেয়েটি চট করে তার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। অবশ্য পরে যথাশাস্ত্র তাদের বিবাহ হয়েছে। এমন সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবাহ প্রকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আর চোখে পড়ে না। এর নিকটতম উদাহরণ গিরিজায়া-দিগ্বিজয়ের বিবাহ। সে প্রকরণ সরল হলেও এত সংক্ষিপ্ত নয়। অবশ্য এ চারজনের কেউ নায়ক-নায়িকা নয়, গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়কে প্রধান পাত্রপাত্রীর মধ্যেও গণ্য করা চলে না। এমন ঘটে? এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের মানসপ্রক্রিয়া একান্ত অজটিল বলেই জীবনটাকে অজটিলভাবে তারা দেখে। প্রণয়, বিবাহ, মৃত্যু সমস্তই তাদের কাছে সরল; ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর স্বপ্নও তারা দেখে না। মাণিকলাল অনায়াসে হাতের একটা আঙুল কেটে ফেলল, বলল, রানীর হুকুম হলে এখনই মরতে পারে। সমস্তই কেমন অনায়াস ও সরল। ঠিক এই দৃষ্টিতেই বিবাহটাকে সে দেখে, তাই প্রথম পরিচয় ও চরম বাগ্‌দানের মধ্যে কালক্ষেপ হয় না। পরিচয় ও বিবাহের মাঝখানে প্রণয়লীলার যে আলো-আঁধারি ভাব আছে, ইংরাজীতে তাকে কোর্টশিপ বলে, এ শ্রেণীর মানুষের জগতে সে পর্বটা আদো নাই। "বোধ হয়, কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভালো লাগে না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই, বহুকাল-সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই, 'হে-প্রাণ! হে প্রাণাধিক' সে-সব কিছুই নাই—ঠিক।"

বঙ্কিমচন্দ্র ধমক দিয়েছেন, আসল কথাটা বলেন নি; মাণিকলালের মতো সরল মানুষের প্রেম বাঘের মতো দৃষ্টিমাত্রে এক লাফে শিকারের কাছে গিয়ে পড়ে, যা কিছু লীলা তারপরে।

জটিলতার মাপকাঠিতে দরিয়া-মোবারকের প্রেম আর এক ধাপ উঁচুতে। এদের প্রেমও যথেষ্ট সরল; মোবারকের সঙ্গে তার বিবাহ সরল ও সংক্ষিপ্ত প্রকরণেই হয়েছিল, জটিলতা দেখা দিল মাঝখানে জেবউন্নিসা এসে পড়ায়। মোবারক সত্যই ভালোবাসতো দরিয়াকে, কিন্তু জেবউন্নিসার সৌন্দর্য, প্রেমের দীপ্তি ও দাহ সমস্ত ওলট-পালট করে দিল; জেবউন্নিসার ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদার উল্লেখ করলাম না এইজন্যে যে, ও দুটোকে মোবারক বরাবর মিলনের অন্তরায় বলেই মনে করেছে। প্রভাত-শুক্রতারার জ্বলজ্যোতিতে দরিয়া নিষ্প্রভ হয়ে গেল। নিষ্প্রভ হয়ে গেল, তবে নিষ্ক্রিয় হল না। সংবাদ বিক্রয়ের সূত্র ধারণ করে যুগপৎ সে বাদশার অন্দরমহলে এবং কাহিনীর অন্তর মহলে প্রবেশ করলো। মোবারকের মৃত্যুর কারণ দুই নারীর বিকৃত প্রেম। জেবউন্নিসার প্রেমের বিকার তাকে সর্প-দংশনের মুখে পাঠিয়েছে; আর গল্পের উপান্তে জেবউন্নিসা ও মোবারক যথাশাস্ত্র বিবাহিত হয়েছে জানতে পারায় দরিয়ার বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছে মোবারক আলি। এ দুই ঘটনার মাঝখানে আছে তড়িদ্‌গর্ভ ছোট্ট একটি ঘটনা। জেবউন্নিসার আদেশে মোবারক নিহত, দরিয়া প্রবেশ করেছে জেবউন্নিসার মহলে, নিহত করবে তাকে। "দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেবউন্নিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া জেবউন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলিল, 'বহুৎ আচ্ছা, চোখে জল।' এই বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। জেবউন্নিসা প্রতিহারীকে ডাকিয়া উহাকে ধৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন, প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নগ্নাবস্থায় পলায়ন করিল। সে তখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত। মোবারকের মৃত্যুসংবাদ সে শুনিয়াছিল।"

উন্মাদিনী দরিয়া উন্মাদিনী হীরাকে স্মরণ করায়, দুজনেই প্রেমের বিকারগ্রস্তা।

মোতি বিবির ক্ষমতা, ঐশ্বর্য, ভোগস্পৃহা ও জিঘাংসা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিলে জেবউন্নিসাকে পাওয়া যায়; দুজনেই ধর্মাধর্ম-জ্ঞানশূন্যা। জেবউন্নিসাকে যখন প্রথম দেখি তখন ভোগাকাঙ্ক্ষাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে সে গ্রহণ করেছে। হ্যাঁ, প্রেম ও বিবাহ নামে দুটো সংস্কার আছে বটে তবে সে-সব শাহাজাদীদের জন্য নয়; ওসব গরীবগুর্বোর ব্যাপার। জেবউন্নিসাকে প্রেমের বিকারগ্রস্তা বললে অন্যায় হয়, তার হৃদয়ে প্রেম তখনো জন্মলাভ করে নি, কিংবা জন্মলাভ করলেও সেই সদ্যোজাত

[illegible] বিলাসব্যসনের প্রভূত আয়োজনের [illegible] অনুকূল ছিল। মোবারকের মৃত্যুসংবাদে [illegible] না হয়ে যখন জল ঝরলো চোখে তখন [illegible] সত্যই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এ কি, [illegible]দাসীর চোখে জল কেন? আর একবার তার চোখে জল ঝরলো রূপনগরের রাজ-[illegible]কে, প্রথমে মোবারকের স্মরণে, তারপরে মোবারকের পায়ে মাথা রেখে। না, প্রেম শুধু গরীবের জন্য নয়, প্রেম এবং সেই সঙ্গে বিবাহ। সেই রাত্রেই দুজনের শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হয়ে গেল। এতদিন পরে বক্রগামী প্রেম অভীষ্ট সমুদ্রে এসে মিলিত হল।

রূপনগরের রাজকন্যে মোবারকের ছায়ামূর্তি দেখে জেবউন্নিসার বিলাপ অনুরূপ অবস্থাপন্ন নগেন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়, যখন সূর্যমুখীর আভাস দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সূর্যমুখী মরে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র একই অবস্থায় দ্বিতীয়বার সংঘটন করতে বাধ্য হয়েছেন, পাত্রপাত্রী বদলে দিয়েছেন; বিষবৃক্ষে শোকাভিভূত নগেন্দ্রনাথ, রাজসিংহে জেবউন্নিসা। ইতিপূর্বে কালিদাসও অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ ব্যবস্থা করেছেন; কুমারসম্ভবে

স্বামী-শোকাতুরা রতি, রঘুবংশে পত্নী-শোকাতুর অজ।

কঠিন আঘাতে ভুল ভেঙেছে শাহাজাদীর। ভুল ভাঙলে দেখা গেল যে, জেবউন্নিসার আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, কামোদ্ধত, দুর্বিনীত শাহাজাদীর বদলে জন্মলাভ করেছে আর দশজন রমণীর মতো একজন রমণী। দরিয়া ও মোবারকেরও পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু জেবউন্নিসার পরিবর্তনটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত। তার কারণ প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল সবচেয়ে কম। এই বিপুল পরিবর্তনের জন্যই তাকে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে আর তাকে নায়িকা বলে বিভ্রান্তি জন্মে দেয় মনে। রবীন্দ্রনাথেরও মনে এইরকম বিভ্রান্তি জন্মে থাকবে। রাজসিংহ উপন্যাসের উদার আকাশে চঞ্চলকুমারী অচঞ্চলা পূর্ণশশী; দরিয়া ও নির্মলকুমারী বহু দূরের নক্ষত্র, জেবউন্নিসা প্রচণ্ড বেগশালিনী জ্বলন্ত উল্কা।

এবারে নায়ক-নায়িকাদের প্রণয় ও পরিণয় কাহিনী। কিন্তু তার আগে একটি ছোট কাহিনী সেরে নেওয়া আবশ্যক। ঠিক প্রেম কাহিনী নয়, তবে তা ছাড়া আর বলবোই বা কী! আচ্ছা বলা যাক এক তরফা অপ্রত্যাশিত প্রেম নিবেদন। বৃদ্ধ ঔরংগজেব যেভাবে যে ভাষায় ইমলি বেগমকে মনের কথা জানিয়েছে অবস্থান্তরে তা দো-তরফা প্রেম ও পরিণয়ে পরিণতি লাভ করতে পারতো। বৃদ্ধ বাদশার পাহাড়ের মতো কঠিন অনুর্বর হৃদয় ভেদ করে এক অঞ্জলি প্রেমের স্বীকারোক্তি নির্গত হয়ে এসেছে। বাদশার তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার জন্য একটুখানি স্নিগ্ধ হস্তক্ষেপের আবশ্যক। সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার দুই নরনারীর এই সম্পর্ক রক্তকরবী নাটকের রাজা ও নন্দিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবারে রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারী। আত্মসম্মানরক্ষার্থ অসহায় যুবতী। রাজপুতকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীরের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, পরিবর্তে নিজেকে পত্নীরূপে উৎসর্গ করেছে তার পায়ে। প্রথমে চিত্র দলন, তারপরে বাদশাহের ক্রোধাগ্নি থেকে আত্মরক্ষার্থ পত্রযোগে আত্মদান; তার ফলে, তারপরে 'হিন্দুস্থান উথল গয়া'।

এই অসম বিবাহে বিচিত্র বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরূপে হিন্দুস্থানের উভয় পক্ষের লক্ষ লক্ষ সৈনিক যোগ দিল, এমন বিপুল কাণ্ড কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ভারতের ইতিহাসে আর কখনো ঘটে নি। অবশ্য এই যুদ্ধের কারণরূপী ইন্ধন অনেক কাল সংগৃহীত হয়েছিল, এখন চঞ্চলকুমারী অগ্নি শিখার মতো তার উপরে এসে পড়লো। ফলে আগুন জ্বলল, তাতে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল বাদশাহের সিংহাসন। মূল ঘটনাটি ঐতিহাসিক, তার সামান্য পরিবর্তন করে লেখক ইতিহাসে মানব হৃদয়ে মিলিয়ে যে কাহিনী তৈরি করেছেন তাতে দান্তে কথিত কাব্যের উপজীব্যের প্রায় সমস্তটা স্পর্শ করেছে। "God, war and Love"—এই হচ্ছে দান্তের মতে কাব্যের যথার্থ বিষয়। এখানে war and love পেলাম, রবীন্দ্রনাথ God-কেও দেখেছেন। মহাকাব্যের যোগ্য দিগন্তস্পর্শী আধার বটে।

চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহের প্রণয়কাহিনীও কম অভিনব নয়, তবে অন্য তিনটি উপকাহিনীর মতো চমক-লাগানো নয়। বর্ষাকালে পদ্মার বিশাল বারি প্রবাহের তীব্র গতি সব সময়ে লক্ষ্য গোচর হয় না; ভাসমান দ্রুতগামী ফেনপুঞ্জে তার নির্দেশ; আবার তার একটানা গর্জনও শ্রুতিগোচরতাকে এড়িয়ে যায়; কচিৎ তরঙ্গভঙ্গে কানের চৈতন্য হয়। রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর প্রণয়কথা ভারতব্যাপী বিশাল বারিপ্রবাহ; প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন তবু চোখে পড়ে না; প্রচণ্ড শব্দাঢ্য তবু কানে পশে না। অন্য তিনটি কথা ফেনপুঞ্জ তাই গতিময়, অন্য তিনটি কথা তরঙ্গভঙ্গ তাই ধ্বনিময়। তাদের সংকীর্ণতাই তাদের লক্ষ্যগোচর করে তুলেছে; নবরসের আধার মূল প্রেমকথা তুলনায় অলক্ষ্যগোচর, অশ্রুতিগোচর।

শিল্পগত সার্থকতা তিনটি কাহিনীতেই আছে; প্রত্যেকটি নরনারী, প্রত্যেকটি ঘটনা মূল ঘটনাকে পুষ্টতর করেছে; কিছু অবান্তর বা অভাবাত্মক নয়। তত্ত্বগত সার্থকতা আছে কি? মূল প্রেমকথার মধ্যে নানা রসের ও নানা অবস্থার সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাগুলি অন্য তিনটি কাহিনীর মধ্যে প্রকট করে তুলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন লেখক। মাণিকলাল নির্মলকুমারীর প্রেমের সরল ও সংক্ষিপ্ত পরিণাম রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর প্রেমের ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল না। বয়স ও অবস্থার অনুকূলতায় এমন কত রাজপুত যুবক-যুবতী পরস্পরকে গ্রহণ করেছে। কোন রাজপুত রাজা কি প্রথম প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়াকে বরণ করে নি মোবারক দরিয়ার কাহিনীর মতো! আবার রাজপুত রাজাদের রঙমহলেও বিলাসব্যসনের আয়োজন বড় অল্প ছিল না, হৃদয়ের অসাড়তার নীচে অনেক দাবাগ্নি, অনেক বাড়বাগ্নি সেখানে নিশ্চয় নিহিত ছিল। ঐখানেই তো জেবউন্নিসার বন্ধ্যা প্রেমের মূল। আবার প্রৌঢ় ও কর্মক্লান্ত রাজসিংহের হৃদয়ের মধ্যেও কি একটি নবীন স্নিগ্ধ করপদ্মের প্রার্থনা গুপ্ত ছিল না? ছিল সবই, সমস্ত রকম সম্ভাবনাই ছিল রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর প্রেমের মধ্যে—তবু যে পরিণাম ভিন্ন হল, তার কারণ রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর চরিত্র ভিন্ন ছাঁচে গঠিত। সে ছাঁচের ব্যাখ্যা করতে হলে আগাগোড়া উপন্যাসখানিকে বিবৃত করতে হয়। সে কাজ তো লেখক স্বয়ং করে রেখেছেন।

মোটের উপরে এই বলা যথেষ্ট যে, [illegible]টি প্রেমকথাই (ইমলি, বেগম ও ঔরংগজে[illegible] ধরলে পাঁচটি) শিল্পগত ও তত্ত্বগত সার্থক[illegible] থেকে এক পা বিচলিত হয় নি, অভ্রান্ত পদক্ষেপে শেষ পরিণামের দিকে যাত্রা করেছে।

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ উপন্যাসের গতি ও বিবর্তনকে নদীর সঙ্গে উপমিত করেছেন। প্রথম খণ্ডের ঝরনা অষ্টম খণ্ডে এসে রহস্য-গূঢ়, অতলস্পর্শ, কল্পনাদ গম্ভীর বিশাল মহানদীতে পরিণত। সত্যই তাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গতির দ্রুততা অবশ্যই নদীর উপমার স্থল। তবে বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্প স্থাপত্যের দিক থেকে বিচার করলে সমস্তগুলি উপন্যাসকে, বিশেষভাবে রাজসিংহকে বহু মহল ও বহু তল সমন্বিত সৌধের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা যায়। রাজসিংহের প্রথম দুটি খণ্ড এই সৌধের ভিত্তি, অনেকটাই ভূগর্ভে প্রোথিত বলে সামান্য
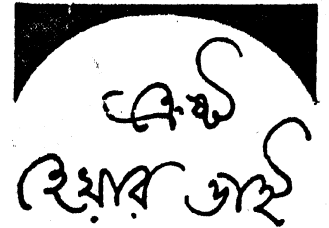
অংশই চোখে পড়ে। তারপরে একটির পরে একটি খন্ড যোজিত হয়, মহলগুলি বিস্তার লাভ করে, আকাশের অধিকতর অংশকে অধিকার করে নেয়, অবশেষে সপ্তম ও অষ্টম খন্ডে এসে এতটা বিস্তৃত যে ভারতেতিহাসের অনেকখানি অংশ অধিকার করে নিয়েছে, এমন উত্তুঙ্গ যে ভারতেতিহাসের দূরদিগন্ত থেকে চোখে না পড়ে যায় না। অষ্টম খন্ডে সম্পূর্ণ রাজসিংহ ভারতীয় উপন্যাস নগরীর মহত্তম সৌধ, দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে মনুষ্য হস্তের কীর্তি বলে বিশ্বাস হয় না, মনে হয় পৌরাণিক ময়দানব ঐতিহাসিক যুগে নিজের কৃতিত্বের নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সৌধগুলি, বিশেষ করে রাজসিংহ উড়িষ্যার মন্দিরগুলির মতো বিপুলায়তন হলেও অলঙ্করণভারে পীড়িত নয়। আবার মোগল স্থাপত্যের যে নিদর্শন দিল্লীর লালকেল্লায় বা তাজমহলে পাওয়া যায় সেগুলিও এর তুলনায় স্থল নয়। লালকেল্লা ও তাজমহলের আয়তন বিপুল সন্দেহ নাই, কিন্তু অলংকরণ আতিশয্য ললিত ও কোমল করে তুলে তাদের বিপুলতায় যেন অপহ্নব ঘটিয়েছে। এসব দৃঢ় হয়েও দার্ঢ্যের ভাব মনে জাগায় না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকলা ও রঙের চিত্র-বর্ণকলাপ দেখে লালকেল্লাকে আদৌ পাথরে গঠিত মনে হয় না, মনে হয় মোগল সুন্দরী-দের, ঐ জেবউন্নিসা ও উদিপুরী বেগমদের পরিত্যক্ত বহুমূল্য রেশমী বসনাভূষণের স্তূপ, কেবল মনুষ্যহস্তনির্মিত নয়, মনুষ্যের স্পর্শ, বিলাসব্যসনের ও প্রাত্যহিক সুখ দুঃখের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। আর তাজমহলের ঐ অতিকায় শুভ্র গম্বুজটি এমন কোমল, এমন সদ্যপাতী ও এমন স্পর্শকাতর যে কবি তাকে 'এক বিন্দু নয়নের জল' ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারেন নি।

রাজসিংহে এসব কিছুই নাই। রাজসিংহের যথার্থ উপমাস্থল আকবর বাদশাহের পরিত্যক্ত নগরী ফতেপুর শিকারির প্রমোদদুর্গ। অলঙ্করণ বিরলতাই তার অলংকার; বিপুলতাই তার গৌরব: দৃঢ়নিবদ্ধ ইমারত, প্রাকার ও গম্বুজগুলি পেশীবহুল অনুশীলিতদেহ মল্লের ন্যায় আত্মপ্রত্যয়ের স্বপ্রতিষ্ঠ। আর ঐ বিরাট বুলন্দ দরওয়াজা সগর্বে আকাশটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাহ্বাস্ফোটে অনন্তকালকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেন আহ্বান করছে। রাজসিংহ এই রকম একটি ভাবাময় প্রাসাদ দুর্গ। রাজসিংহ ফতেপুর শিকরি।

তাজমহলে মৃতের প্রতিষ্ঠা, উড়িষ্যার দেবদেউলে দেবদেবীর। আর রাজসিংহের ভাবাময় কক্ষে, অংগনে, অলিন্দে, দোলী চলতি ও হাওয়া মহলে প্রতিষ্ঠা মানুষের। আমাদের মতো সাড়ে তিন হাত পরিমিত সাধারণ নরনারীর জন্যই আয়োজনের এই বিপুলতা বিশ্বাস হয় না। সত্যই তা নয়। রাজসিংহ, আলমগীর, মোবারক সকলেই অসাধারণ; চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী জেবউন্নিসা কেহই সাধারণ নয়; সুখ দুঃখের তীব্রতায়, সমস্যার দুর্মোচ্যতায়, জীবনাভিঘাতের প্রচণ্ডতায় তারা সকলেই অসামান্য। তাদেরই যথার্থ ও নিত্য আলয় এই ময়দানবীয় সৌধকীর্তি।

আর আমরা সাধারণ মানুষ, সাড়ে তিন হাতের বন্দীগণ যখন এখানে প্রবেশ করি, তখন ক্ষণকালের জন্য কোন জাদুমন্ত্রবলে যেন এই অতিকায় নগরের নাগরিক অধিকার লাভ করে "Freedom of the City" অর্জন করি, আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমাদের মস্তক নির্দিষ্ট উচ্চতাকে ছাড়িয়ে যায়, বক্ষস্পন্দনে নূতন ছন্দ অনুভূত হয়, এবং অজ্ঞাত দিগন্ত থেকে ইতিহাসের নিশ্বাস আমাদের চিত্তকুহরে প্রবেশ করে কল্লোল গম্ভীর শঙ্খ আরাব ধ্বনিত করে তোলে; আমরা কল্পনায় অতিকায়িকতা লাভ করি। রাজসিংহ পাঠে মনুষ্যত্বের সীমা বেড়ে যায়, তখন দুনিয়ার বাদশাহীকেও তুচ্ছ মনে হয়, মানুষ তখন মহত্তর অতৃপ্তির প্রেরণায় বুঝতে পারে দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না।

(ক্রমশ)

চুপ ! এইমাত্র ওঁর কাশি বন্ধ হয়েছে···এবার আরামে ঘুমাচ্ছেন

ফর্মূলা 44 কাশি নিবারক মিকশ্চারটি শক্তিশালী···সর্দি, ফ্লু বা ব্রঙ্কাইটিস্‌-জনিত কাশিতে দ্রুত কাজ দেয়, আর তার প্রভাব বহুক্ষণ ধ'রে থাকে···আপনি কাশি থেকে নিষ্কৃতি পান।

শক্তিশালী কাফ মিকশ্চার

আসামের কামরূপ জেলার একটি গ্রাম। গ্রামের নাম চাংসারী। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ভূমিখণ্ডের এই গ্রামটি আর আর সাধারণ গ্রামের মতই। কোন বৈশিষ্ট্য নেই, কোন আকর্ষণ নেই। আমার সেখানে আকর্ষণ ছিল শুধু এক বয়োজ্যেষ্ঠ দিলখোলা বন্ধু ও তার গিন্নী, যাদের দৌলতে এই গ্রাম্য মেয়েটির ছবি তুলেছিলাম একদিন। মেয়েটির নাম দিপেরী।

বহু বছর আগে একবার পুজোর ছুটিতে গৌহাটি গিয়ে এক দিনের জন্য চলে গিয়েছিলাম এই চাংসারী গ্রামে। মনে আছে সেদিন সকাল থেকেই মাঠে-প্রান্তরে ঘোরাঘুরি করে মন-মেজাজের সুর পালটে গিয়েছে, চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে মাঠে-মাঠে নিশ্চিত ধান-ফসলের সার্থক রূপ দেখে। শরতের এমন অসীমছাওয়া নীল আকাশের নীচে যা কিছু দেখছি সবই যেন মনে হচ্ছে অতি সুন্দর। মনের আনন্দে সেদিন গ্রাম-পল্লীর ছবিও তুলেছি কিছু। কিন্তু পুকুর পাড়ে ভরাকলসী কাঁখে গ্রাম্য বালিকার সুন্দর রূপটি তুলতে পারিনি বলে বন্ধুকে কথাটা জানালাম। বন্ধু বলল—এটা আর এমন কী হাতিঘোড়া! দাঁড়াও, এই কাছেই একটা চাষীর মেয়ে আছে, ওকে নিয়ে আসছি এখুনি। কিছু পরে ঠিকই নিয়ে এল এই মেয়েটিকে। ওর হাতে আবার দুটো কলসী। কাছে এসে বন্ধু হুকুমের মতই বলল—এর একটা বিয়ের ছবি তুলে দিও কিন্তু! কথাটায় সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল মেয়েটির মুখে।

পুকুর পাড়ে আমার নির্দেশমত ভরা-কলসী মাথায় আর কাঁখে করে যখন মেয়েটি এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ বন্ধু তখন রসিকতা করে বলল—দিপেরী, তোকে এই বন্ধু বিয়ে করবে বলেছে। অমনি ফিক্ করে হেসে ফেলল দিপেরী। এই সুযোগে ঠিক ছবি তুলে নিলাম আমি। তারপর আরো একটা এমনি ছবি তুলে দিলাম। হতে পারে বিয়ের ছবি।

সেদিন অনেকক্ষণ বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। লক্ষ করলাম ছবি তোলার পরই পড়শীদের আনাগোনা চলছে ও-বাড়িতে। আমাদের ঘরেও উঁকিঝুঁকি মারছে। ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক মনে হল। বন্ধুকে প্রশ্ন করেও জবাব পেলাম না। শেষকালে রহস্যটা ফাঁস করে দিয়ে বন্ধু-পত্নী জানাল যে, দিপেরীকে আমার পছন্দ হওয়ার কথাটাই নাকি জানা-জানি হয়ে গেছে।

এবার বন্ধু একটা অট্টহাসি দিয়ে তার গিন্নীকে বলল—আরে রগড়টা জমতে দাও। তুমি কিছু বলতে যেওনা কিন্তু!

মাস দু'-তিন পরে, বোধকরি বড় দিনের ছুটিতেই, আবার আমাকে গৌহাটি যেতে হল। তখন মনে করে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওদের ছবিগুলো। ভাবলাম এ-ছবি দিতে গিয়ে আবার একদিন বেশ আনন্দ করা যাবে। চলে গেলাম একদিন চাংসারী গ্রামে।

পাকা-রাস্তা ছেড়ে পল্লীর পথ ধরে চলেছি। অতি পরিচিত, আমার এই পথটুকু। মনে মনে কল্পনা করছি বন্ধুর বাড়িতে আনন্দময় পরিবেশের কথা। ভাবছি এবারও না জানি কত রগড় হবে। জানি না দিপেরীর বিয়ের কথাটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়িয়েছিল। বেচারী দিপেরীর মুখখানা মনে পড়ল—কতো সহজ-সরল হাসি ফোটে ওর মুখে! এসব নানা কল্পনায় আমার মুখেও বোধ করি হাসি ফুটে উঠেছিল ঐ মাঠের পথেই। পথে দু-একজন চাষীকে দেখেছি ওরা যেন আমাকে ভালভাবে লক্ষ করছে।

যাক, ওটা এমন কিছু নয়, আগন্তুক দেখলে এমন হয়েই থাকে। আমি চলেছি একমনে বন্ধুর বাড়ির দিকে। দুপুর তখন গড়িয়ে যাচ্ছে।

অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখতে পেয়ে বন্ধু আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। প্রায় চেঁচিয়ে গিন্নীকে ডাকল—দেখে যাও কে এসেছে! বন্ধু-পত্নীও মহাখুশিতে এসে বসল আমাদের সঙ্গে। আমাদের বৈঠকের পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে আমি দিপেরীর ছবি দুটো তুলে দিলাম ওদের হাতে। ছবি দেখে দুজনেরই যেন মুখের ভাব পালটে গেল। তবুও তন্ময় হয়ে চোখের কাছে ধরে রইল ছবি দুটো। মুখে কোন কথা নেই। আমি যা আশা করেছিলাম তা না পেয়ে একটু নিরাশ হলাম। ওদের নীরবতায় অস্বস্তি জাগল আমার মনে। কী এমন—?

এবার চোখ থেকে ছবি নামিয়ে বন্ধু তার স্ত্রীকে বলল—রেখে দাও ছবি দুটো। ওদে[illegible] এখন দেখিও না, তাহলেই ওর মা কেঁ[illegible] কেটে একাকার করবে। নীরোদ বেড়া[illegible] এসেছে, ও কেন এসব অশান্তির [illegible] পড়বে!

এইটুকু কথাতেই অন্তর্নিহিত [illegible] খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। তবুও [illegible] হল আমার চিন্তাধারার শিরাগুলো যেন কাজ করছে না। বন্ধুর মুখেই এবার শুনলাম দিপেরীর মৃত্যু হয়েছে আজ প্রায় একমাস।

✻

এই ব্যাপারে আমার মনে অশান্তির ছায়া পড়া উচিত কিনা জানি না। বন্ধু সেজন্য চেষ্টাও করেছিল সেদিন নানা কথায় নানা-ভাবে এই বেদনাময় কাহিনী চেপে রাখতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল কি? নিশ্চয়ই হয় নি। নাহলে সেদিন চাংসারী গ্রাম ছেড়ে আসার সময় কেন আমার মনে হল—শরতের সেই পল্লী শোভার আজ ধূসর ছায়া বিছিয়ে রয়েছে। আর কেনই বা আমার নজরে এল ফসল-কাটা জমির বুকে ফাটলের বহু চিহ্ন!

—নীরোদ রায়

॥ ১০ ॥

তা তিনি থাকলেন। সকালে দুপুরে রাত্রে তিন বেলার খাবার সময়েই নিয়মিতভাবে আসতে লাগলেন এ ঘরে। দেখা গেল অভিজ্ঞ ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছিলেন। রোগিণী বস্তুতই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে তাঁকে দেখলে। খাওয়া নিয়ে আর কোনো গোলযোগ করে না। কিন্তু তাঁর সেবার পরিধি সেখানেই আবদ্ধ থাকলো না। ঘরে ঢুকে দেখাশুনো ক'রেই চলে যাবেন, এইটুকুতেই সন্তুষ্ট রইলো না সে। যদিও তার জন্য দিনে রাত্রে দু'জন নার্স আছে পালা ক'রে, একজন আলাদা ঝি আছে দরজায়, শায়লা আছে সিঁড়ির মুখে, তাতে কী? তিনি না থাকলেই অন্ধকার। সুতরাং বাধ্য হয়েই কয়েকদিন পরে উপস্থিতির মেয়াদটা আরো বাড়াতে হলো অনেক। বাইরের কাজের সময়গুলোকে গুটিয়ে আনতে হ'লো ভিতরে, যখন খুশি তখন বেরিয়ে যাওয়ার অভ্যেসটা বাদ দিতে হলো, সভাসমিতি, পার্টি, উৎসব—এইসব নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম স্থগিত রইলো, নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বেলায় ওঠার স্বভাবটাও বদলাতে হ'লো। শেষ পর্যন্ত হাজিরার সময় শুরু হতে লাগলো সকাল ছটা থেকেই, এবং নিজের খাওয়া নাওয়া বাদ দিয়ে বাকী সময়টাও কাটতে লাগলো সেখানে।

নার্স ইত্যাদি কর্মচারীরা বস্তুত শোভা হয়েই রইলো, ধীরে ধীরে পরিচর্যার সমস্ত ভারই চলে গেল তাঁর হাতে। ওষুধ খাওয়াবেন তিনি, পথ্য খাওয়াবেন তিনি, আনাড়ি হাতে মাথাটিও তাঁকেই ধুইয়ে দিতে হবে। ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত তাঁর নড়বার উপায় নেই। এই রোগিণীর ইচ্ছে, আবদার এবং মর্জি।

কী করবেন? একটা মানুষ যদি এরকম অবুঝ হয়, কখনো পারা যায় তার সঙ্গে? আর তাঁর এই সামান্য ত্যাগটুকুর বিনিময়ে যদি সে মানুষ বেঁচে ওঠে তার মূল্যই বা কম কী?

অতসী তাঁকে চোখে হারায়, এক মুহূর্ত না দেখলেই কান্নাকাটি। সোনালক্ষ্মী বলে বিশেষ কোনো দরকারে উঠে যেতে গেলেও দেখেন জামাটা ধ'রে আছে মুঠো ক'রে। রাত্রিবেলা শুতে গিয়ে তাঁর মনটা ছলছল করে, তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। মনে হয়, হোক দুর্বল মাথার ক্ষণিক খেয়াল, তবু তো এই মুহূর্তে এটাই সত্য? এর মধ্যে তো কোনো খাদ নেই, কোনো মিথ্যাচার নেই, গভীরতার অভাব নেই?, না, এ তিনি টোকা মেরে ফেলে দিতে পারেন না। ভালোবাসা এতো সুলভ নয় তাঁর জীবনে।

পরের দিন ভোর হতেই ঘুম-চোখে আবার উঠে আসেন এ ঘরে। রোগিণী ব্যাকুল আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। সেই হাতের মধ্যে তিনি সারা পৃথিবীটা যেন মুঠোয় ভ'রে নেন।

এর পরে ডক্টর সামন্ত রক্ত দেবার বন্দোবস্ত করলেন, অবস্থা বুঝে গ্লুকোস দিতে শুরু করলেন। দামী দামী ওষুধের শিশিবোতলে ভরে উঠলো টেবিল। উল্টো হাওয়ায় ডুবন্ত তরী তীরে এসে ঠেকলো। অতসী সেরে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে।

ডক্টর সামন্ত অকৃত্রিমভাবে খুশী হয়ে বললেন, 'বেঁচে গেল মেয়েটা।'

মিঃ মিত্র বললেন, 'আপনার হাতের রোগী কি কখনো মারা যেতে পারে?'

'উঁহু, এ আমার হাতের গুণ নয়, আপনার। আমি যদি চিকিৎসা করে থাকি ছ' আনা, আপনি করেছেন দশ আনা।'

'তাই বুঝি?'

'আপনার সহৃদয়তার তুলনা নেই। সেবা এবং যত্ন দিয়ে আপনি মৃতকল্পকে প্রাণ দিয়েছেন। বিশ্বাস করুন, আমি ভাবতেই পারিনি, এ রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে।'

'তা হলে চ্যালেঞ্জটা ঠিকই নিয়েছিলুম?' মিঃ মিত্র হাসলেন।

'চ্যালেঞ্জ? ও।' ডক্টর সামন্তও হাসলেন, 'ভাগ্যিস হাসপাতালের কথা বলে আপনার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিলুম।'

'জেদ?'

'নিশ্চয়ই। জেদ না জন্মালে কি কখনো একজন অপরিচিত মানুষের জন্য এতো কেউ করতে পারে?'

'এবার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও স্বাভাবিক হয়ে উঠে, তা হলেই আমার কর্তব্য শেষ।'

'ওটা নিয়ে ভাববার কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, ওর পরিচয়-টরিচয় কিছু জানা গেল কি?'

মিঃ মিত্র অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় আর।'

'কিছুই কি বলে না?'

'একেবারেই না।'

[illegible] অতীত জীবনটা একেবারে ভুলে গেছে?'

'তাই তো মনে হয়।'

'কথা বলে বলে হৃদয়ের সেই ঘুমিয়ে পড়া অংশটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে কি জানেন, এসব রোগী বড়ো অদ্ভুত হয়। হঠাৎ কোনো একদিন কেমন করে যে আবার আলো জ্বলে ওঠে কেউ জানে না।'

ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন মিঃ মিত্র। জবাব দিলেন না।

ডক্টর সামন্ত চলে গেলে মহিমকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'স্যার', অনেক দিন পরে ডাক পেয়ে আশায় আশায় দৌড়ে এলো সে।

'তুমি যে মেয়েটিকে এনেছিলে—'

'হ্যাঁ স্যার, আমি এক্ষুনি তাকে ফেরত দিয়ে আসছি। আমি জানতাম না স্যার মেয়েটা এসে এতো জ্বালাবে, এরকম ভুগবে—'

'চুপ করো।' জ্বলন্ত দৃষ্টি মুখের উপর নিবদ্ধ রাখলেন, 'যা বলবো, আগে শুনে নেবে তারপর কথা বলবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—'

'ওর বাবার নাম কী?'

এই প্রশ্নটা মহিম আশা করেনি। হঠাৎ

ফেকটা তার ধড়াস করে কেঁপে উঠলো। যে-সব মেয়েরা আসে, সাধারণত তারা কোনো পারিবারিক পরিচয় দেয় না। অচেনার মতো আসে, অচেনার মতো মুখ মুছে টাকা নিয়ে চলে যায়। অনেক সময় মহিম নিজেও তাদের পরিচয় জানতে পারে না। কিছুতেই নিজেদের ঠিক নাম বলে না তারা। কিন্তু এই মেয়ের পরিচয় সে খুব ভালো করেই জানে। জিজ্ঞাসা করা মাত্রই জবাব দিতে পারতো। কিন্তু সে ভয় পেলো। প্রথমেই তার মনে হলো টাকাটার কথা। দশ হাজার টাকার পাঁচ হাজার টাকাই সে আত্মসাৎ করে বসে আছে। গগনবাবুকে যদিও সে ছ' হাজার দেবে বলেই প্রতিশ্রুত ছিলো, কিন্তু যে মুহূর্তে মনে হলো লোকটা বিপর্যস্ত, মেয়েকে নিয়ে এলেও অস্থিরচিত্ত, গুনে নেবার শক্তি নেই, তৎক্ষণাৎ সে এক হাজার টাকা সরিয়ে ফেললো। রাখাল সাক্ষী আছে, মনিব তলব করলে সে বলবে। সুতরাং রাখালকে দেখিয়ে ছ' হাজার টাকাই সে বাণ্ডিল করে এনেছিলো, বাকী চার হাজার—রাখাল চেপে রেখেছিলো হাতের তলায়। এ টাকাটাই বখরা হবে দু জনের মধ্যে এবং মনিব সাক্ষী ডাকলে ভালোমানুষের মতো বলবে পুরো টাকাটাই দেওয়া হয়েছিলো।

এসব কথা নিয়ে কোনো দিনই তার সাহেব সাক্ষীসাবুদ ডাকবেন না জানে, তবু সাবধানের মার নেই। দুজনে পরামর্শ করেই করে সব। আসলে যারা মেয়ে দেয়, অথবা যে মেয়েরা নিজেরাই আসে, সবাই টাকাটা আগে বুঝে নেয়, তারপর কথা। এদের সংগে যে অংক রফা করতে পারে আর মনিবের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে যে অংক বার করতে পারে তার মধ্যেকার গরমিলটা ওরই পুরো লাভ। রাখালকেও রাখতে হয় সংগে, নইলে মারামারি করবে গুণ্ডাটা, নালিশ করে দেবে মনিবের কাছে, করে খাওয়া ঘুচে যাবে।

হঠাৎ মেয়েটার বাপের নাম দিয়ে এঁর কী দরকার পড়লো, বুঝে উঠতে পারলো না। জিজ্ঞাসা যদি করতেই হয়, মহিমের কাছে কেন? মহিম তো শুনেছে, এই রোগ সুদ্ধই তার মনিব দিনে রাত্রে পড়ে থাকে মেয়েটার ঘরে, তার কাছেই বা জেনে নিতে বাধা ছিলো কী? সে মাথা চুলকোতে লাগলো। নাম জেনে তারপর খোঁজখবর করুন আর কী। জেনে ফেলুক কতো টাকা দিয়েছে। এই গর্তে পা দেবে না মহিম। মেয়েটা নিজে যদি বলে বলুক গে, সে তার দায়িত্ব; তার পরিবারের নাম ধাম বলে সে যদি কলঙ্ক লেপন করতে চায়, করুক। মহিম তার মধ্যে নেই।

'কী নাম?' মনিবের মেঘের মতো আওয়াজ।

'আজ্ঞে, নাম বলা বারণ।' ঝপ করে বলে ফেললো মহিম।

'কেন?'

'স্যার, এ একটা কলঙ্ক তো?'

'কিন্তু নাম বললেও আমি তো তাদের চিনবো না! কলঙ্ক কিসের?'

'আমাকে মা কালীর দিব্যি কাটিয়েছে স্যার, আমি দুই চোখ ছুঁয়েছি, স্ত্রীর মাথা নিয়ে বলেছি, বলেছি পরিচয় প্রকাশ করলে আমার মুখে কুষ্ঠ হবে।'

'কিন্তু তাদের মেয়েকে যদি ফিরিয়ে দেবার দরকার হয়?'

'সে তো স্যার, মেয়ে নিজেই ঠিকানা খুঁজে চলে যাবে।'

'যে পারবে না?'

'আমিই তো আছি স্যার।'

'তুমি আছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি যদি না থাক?'

'আপনি যদি না তাড়ান, আমি আপনার চরণ ছেড়ে কোথায় যাবো?'

চুপ করে গেলেন মিত্র সাহেব। ডক্টর সামন্তর সংগে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মনে হয়েছিলো, এক্ষুনি ডেকে একে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। কেন মনে হয়েছিলো তা তিনি জানেন না। এখন মনে হলো, এই পোকাটাকে টিপে আর লাভ কী।

আর তাড়িয়ে দেবার কথা মনে হতে ঠিকানাটার কথাই তাঁর মনে হলো কেন? যদি যেতেই হয় ওকে, সত্যিই তো, ও তো নিজেই যেতে পারবে চিনে। নাম ধাম বললে যে-কেউ গিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। আর যদি নাই পারে কোনোদিন, এই ভুলই যদি স্থায়ী হয় ওর জীবনে, হোক না, তাতেই বা ক্ষতি কী? নতুন মানুষ হয়েই না-হয় বেঁচে রইলো আমার ঘরে, আমাকে ভালোবেসে। এমন কিছু সোনার সকাল নিশ্চয়ই ফেলে আসেনি পিছনে যে, মনে পড়তেই হবে।

॥ ১১ ॥

ক'দিন পরে হঠাৎ দিল্লী যাবার প্রয়োজন হলো তাঁর। ততোদিনে বেশ ভালো হয়ে উঠেছে অতসী, একটু হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, বারান্দায় এসে বসছে, অতসী ফুলের মতো হলদে রঙে গোলাপীর সজল আভা চিক-চিক করছে গালে, শুধু স্বাভাবিক বুদ্ধিটাই ফিরে আসেনি। জগৎ বিষয়ে ভাবনা নেই তার, কোনো অতীত নেই, স্মৃতি নেই, অজ্ঞান শিশুর মতো ভেসে চলেছে ঘূর্ণির স্রোতে। এখন এই বাড়িই তার বাড়ি, এই মানুষগুলোই তার আপন, আর মিঃ মিত্রই তার একমাত্র কাণ্ডারী। এবং সেই কাণ্ডারীটি কাছে থাকলেই সংসারের কাছে তার আর কোনো চাহিদা থাকে না।

মিঃ মিত্র অনেক করে বোঝালেন তাকে। ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে বললেন, 'এই দেখ এই হলো বুধবার, সতেরো তারিখ। অর্থাৎ কাল। আমি যাবো রাত্রিবেলা। সমস্ত দিন থাকবো তোমার কাছে, আর রাত্রিবেলা তো তুমি ঘুমিয়েই থাকো, কেমন? পরের দিন শুধু থাকবো না, এই যে আঠেরো তারিখ, এটা আর দেখো না; আর তারপরেই উনিশ তারিখ। ঠিক বেলা চারটায় সময়ে প্লেন এসে পৌঁছুবে দমদম।'

'প্লেন! দমদম!' বড়ো বড়ো করে তাকালো সে। হঠাৎ শব্দ দুটো যেন তাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিল।

ঝির ঝির ওর হাতটা নিজের মুখে বুলিয়ে নিলেন, কেমন, রাজী?'

'শোনো! দমদম!' অতল অন্ধকার থেকে কী যেন গুলিয়ে গুলিয়ে উঠে আসতে চাইছে।

'জানো না? হুস করে উড়ে যায়?'

'নদীর উপর দিয়ে, গাছের উপর দিয়ে, মস্ত মাঠ নীচে ফেলে—'

'তারপর মেঘের মধ্য দিয়ে এই সুন্দর ফুলটাকে এনে ঝুপ করে আমার কাছে পৌঁছে দেয়।'

'ফুল? ফুলের নাম? অতসী ফুল?'

'ওরে বাবা, এ দেখছি নিজেকেই নিজে স্তুতি করছে, আমার জন্য কিছু রাখো।'

'আমি কী ভাবছি?'

'কী ভাবছো?'

'বুঝতে পারছি না। একটা বাড়ি, অনেকগুলো লোক—'

'এই তো একটা বাড়ি, এই তো অনেকগুলো লোক—' নিজের বাড়ি আর নিজেকে দেখিয়ে হাসলেন তিনি।

'একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—'

'কী স্বপ্ন?'

'জানি না।'

'কিছু জানতে হবে না তোমাকে। শুধু লক্ষ্মী হয়ে থেকো, ঠিকমতো খেয়ো, আমার জন্য একটুও মন খারাপ করো না, তা হলেই হবে।'

'তুমি যেয়ো না।'

'মাত্র একদিন লক্ষ্মীটি।'

'না।'

'আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার না?'

'না।'

সহসা মিঃ মিত্রর মনে পড়ে গেল, তাঁর বিদেশ যাবার তারিখ একান্তই আসন্ন। ভয়ানক কষ্ট হলো। কারো জন্য কোনো দিন তাঁর কষ্ট হয় নি। সে কষ্ট যে এতো তীব্র, এতো প্রত্যক্ষ, এমন বেদনাদায়ক তা তিনি জানতেন না। এতোকাল পরে শেষে একটা পাগলের প্রেমে পড়লেন নাকি? হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়েও মনটা ভার হয়ে উঠলো।

কিন্তু সেই দুটি শব্দ ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকতে লাগলো অতসীর মাথায়। প্লেন আর দমদম! যেন কী? কী যেন? এতো চেনা তবু কেন চেনা নয়। কোথায় যেন এই শব্দ দুটোর একটা প্রচণ্ড অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে তার মনের মধ্যে কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। যেন ভেঙে যাওয়া থারমোমিটারের পারা, ছুঁতে গেলেই গড়িয়ে যায়। মনে হয়, একটা কালি-পড়া লণ্ঠন কে ঝুলিয়ে রেখেছে নাকের সামনে, অন্ধকার বাতাসে সেটা দুলছে, একবার এ-পাশে, একবার ও-পাশে। অতসীও সমানে সামনে পিছনে ফিরে ফিরে তাকিয়ে অনুধাবন করছে। একটুখানি আলোর ইশারা, তারপরেই অন্ধকার। আবার একটু আলো, আবার অন্ধকার। কী আছে? কী আছে সামনে পিছনে? কী আছে অন্ধকারের ও পিঠে? কী আছে?

ঝাপসা ঝাপসা একটা ভাঙা ঘর, অন্ধকার। মস্ত দোতলা বাড়ির আভাস. অন্ধকার। ক'টা ফুল? চারটা? পাঁচটা? কী নাম? অন্ধকার। শুয়ে আছে কে? সাদা চাদরে ঢাকা? মলিন বিছানা, ভাঙা তক্তপোশ, অন্ধকার। মেহগনি খাটের সিংহমুখ পিতলের পা, মাথার কাছে শ্বেতপাথরের টেবিলে জলের গ্লাস, নরম বিছানায় আরাম, অন্ধকার। উঃ! কী যন্ত্রণা। কী কষ্ট। দেখতে দেখতে ফেটে যাচ্ছে মাথা, তবু লণ্ঠনটা দুলে দুলে আলো অন্ধকারে কী ছবি দেখাচ্ছে, অথচ দেখাচ্ছে না। ঐ তো কে বসে আছে পা ছড়িয়ে, একটা ফ্রক-পরা মেয়ে। হাঁ করে জল চাইছে কে? একটা ছোট ছেলে। অন্ধকার। অন্ধকার। কুয়াশা-কুয়াশা ভোর, অন্ধকার। কী যে সব ফেলে আসা ধুধু স্মৃতি! স্মৃতি? স্মৃতি কী? স্মৃতি কাকে বলে? কী মানে এই শব্দটার? অন্ধকার। অন্ধকার। আবার অন্ধকার, আবার আলো। আবার। আবার। আবার। উঃ। উঃ। কী কষ্ট। কী কষ্ট।

কুকে! কে ও? ও কে? যেন চেনা চেনা লাগছে! এই সন্ধ্যাবেলা, যখন সে ঘরের মধ্যে একা, লোকটা কোথা থেকে এলো? সব গেল কোথায়? নার্স? ঝি? তুমি? নীলেন্দু? তুমি কোথায়?

দেখ লোকটা পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কী চায়? কী বলবে? কেন এসেছে? ওকে আমি কোথায় দেখেছি? দেখিনি? হ্যাঁ, দেখেছি। ঠিক এমনি কাঁচা-পাকা কোঁকড়া কোঁকড়া পাতলা চুলের শাঁস বার করা পরিপাটি আঁচড়ানো মাথা, টিয়ার ঠোঁটের মতো নাক, শকুনের চোখের মতো চোখ, শুয়োরের মতো মুখ। ও কে? কে? কে? কে?'

'তোমাকে দেখতে এসেছি আমি। এ বাড়িতে একমাত্র আমিই তোমার আপন লোক।'

'আমাকে দেখতে এসেছেন? আমার আপন লোক? কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।'

'তা চিনবে কেন? বেশ তো জমিয়ে বসেছ রাজ্যপাট নিয়ে। শোনো, চুপিচুপি কয়েকটা কথা বলে যাই তোমাকে। যা করছ করো, ঢাক পিটিয়ে আর সেই কলঙ্ক ছড়িয়ো না। বাপের নাম মুখেও এনো না—'

'কী বলছেন আপনি? ওরা সব কোথায়?'

'কেউ নেই। আমি ফাঁক বুঝেই ডাক করেছি। কর্তা গেছেন সভা করতে. সারা দিন আগলে থাকা দিনের নার্সটা বিদায় হয়েছে মা বেঁচেছি—'

শুয়োরের মতো মুখের লোকটা তার পান খাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতে হাসলো, 'আর তোমার ঐ ঝি মাগী—' এদিক-ওদিক তাকালো, 'যাক গে শোনো—'

'না, না' লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতসীর বুকের মধ্যে আবার সেই পুরোনো ভয় ফিরে এলো। ভীষণ, ভীষণ সেই ভয়।

'আমি বলছিলাম যে—'

'না, না—'

'ন্যাকামি করো না!' রেগে সে দাঁত খিঁচোলো এবার, 'যে তোমার সর্বনাশ করেছে, কই, তাকে তো ভয় পেতে দেখি না? খুব তো সোহাগ। আমরা তো তার হুকুমের চাকর মাত্র। ঘরের মেয়ে বউ ধরে এনে কে তাদের সতীত্বনাশ করে শুনি? আমি? না, তোমার ঐ পীরিতের নাগর? ছি, ছি, ছি, কে বলবে দু' দিন আগে এই তুমিই একজন ভদ্রলোকের মেয়ে ছিলে, এই মেয়েকেই গগন হালদার—'

'খুখী!' মাথার মধ্যে যেন সহস্র নাগিনী একসঙ্গে ফণা তুলে ছোবল মেরে ঢেলে দিল সমস্ত বিষ; যেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাদ্যযন্ত্রের সমবেত ভয়ংকর শব্দে ফেটে গেল ত্রিভুবন, দপ করে জ্বলে উঠলো এক সমুদ্র আগুন, পাহাড় পর্বত ভেঙে সাংঘাতিক ঝড়ের বেগ টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিল সেই দুলতে থাকা ঝাপসা কালি-পড়া লণ্ঠনটা, ভিতর থেকে একটা গলিত স্রোতের মতো আলোর বন্যা বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমস্ত অন্ধকার।

এরোপ্লেনটা নামলো এসে দমদমে। একটা লম্বা দৌড় তারপর স্থির। ফট করে ককপিটের দরজাটা খুলে গেল। একজন মেয়ে চোখের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেখতে চাইলো কাকে? এই পুষ্পকযান যিনি চালান নিশ্চয়ই তার সারথিকে? অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। আর ইনি? দেখা গেল না। বন্দরের মস্ত চত্বরে বাস্তুতার ঢেউ। নিশেন উড়লো, হুইসিল বাজলো, সিঁড়ি লাগলো, হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল যাত্রীর দল। সব হৃতসর্বস্ব বিতাড়িত উন্মুখ মানুষ। আর সেই সঙ্গে আরো এক পরিবার। একজন চিরসুখে লালিত অধুনা-নিঃস্ব বাবা, একজন ভালোমানুষ মা। আর তাদের এগারোটি সন্তান।

ভিড়, গরম, কষ্ট, চিৎকার, ধাক্কাধাক্কি, দুঃখ, বেদনা, কান্না, থুতু, কফ, মলমূত্র, উলঙ্গ শিশু, ধর্ষিতা স্ত্রীলোক, শোকার্ত মা—ভিড়ের দোলায় দুলতে দুলতে কখন লরির আচ্ছাদন ছাড়িয়ে আকাশের তলায় এসে পড়লো কে জানে। কী তাপ সূর্যের। মার কান্না-ভেজা মুখটা একেবারে লাল। বাবার টকটকে নধর শরীর হাল-ভাঙা নৌকোর মতো বিধ্বস্ত। সবচেয়ে ছোটো শিশুটা নেতিয়ে আছে মার বুকের মধ্যে, তার উপরেরটা বাবার কোলে, তার উপরেরটা দিদির হাতে, আর তার উপরের গুলো এরই মধ্যে গন্ধ পেয়েছে দুষ্টুমির।

এ বাড়ি, ও বাড়ি, সে বাড়ি। এ দরজা, সে দরজা।

অপমান, অসম্মান। অনাহার, অর্ধাহার। কামকে পুরুষের লোভের আগুন। আর তারপর? তারপর কী? তারপর সেই ভয়ংকর রাত্রি। ভয়ংকর কতোগুলো লোক। এই লোকটা, ও, হ্যাঁ এই লোকটাও, এই, এই —এই—ই—ই

দাঁড়িয়ে থাকা থেকে সোজা মেঝের উপর পড়ে গেল অতসী।

(ক্রমশ)

"হর্নের প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে গাড়িটা রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকজন লোক দৌড়ে এল। সবে মেয়েটাকে আধো-অন্ধকার রাস্তায় আরও একটু নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে গিয়েছিলাম, যতটুকু একটা হাত স্টিয়ারিংএ রেখে গাড়ির চলন্ত অবস্থায় সম্ভব। তখনও মেয়েটার হাত গাড়ির হর্ন-এর উপর..."

"তারপর ?"

কথা হচ্ছিল একটা রেস্তোরাঁয়, কয়েকজন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে। প্রসঙ্গ ছিল "জাপানের মেয়ে।" আলোচনার বিষয় : "সত্যই কি তারা খুব সস্তা ?" তবে এ ধারণা কেন একজন নবাগত বিদেশীর ?

এই কয়েক মাসে নবাগত অনেক বিদেশীকেই দেখেছি কয়েকটা জিনিস লুব্ধ দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ান, তার মধ্যে টোকিওর রাত্রিজীবন আর রাস্তার "মেয়েছেলে" অবশ্যই অন্যতম।

এ দেশ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু শুনে আসেন। সেই শোনা কথাকেই তাঁদের নিজেদের কল্পনাতে কিছুটা রূপ দেন। তারপর এ-দেশে এসেই অনেক কিছুর মধ্যে ও-দুটোরও খোঁজ পড়ে। কোনো কোনো বিদেশীর ভাবটা যেন কোকাকোলা আর সিগারেটের কলের মতন—পয়সা ফেললেই একটা মেয়ে বেরিয়ে আসবে। আর আমাদের মতন স্বল্পকালীন সবজান্তা তাঁদের চোখের আয়তন বৃদ্ধির সাহায্য করেন বেশ কিছু রসিক জনপ্রিয় গল্প শুনিয়ে। এখানে অবশ্যই-অনেক কিছু আছে কিন্তু খরচসাপেক্ষ, তাতেই কেউ পিছু হটেন, নয়তো কেউ কেউ গল্প শুনিয়েই ক্ষান্ত হন না, আরও কিছু এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেন যাতে নিজেরও অপরের ওপর দিয়ে কিছু সুরাহা হয়। আর সেইটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই আরও একটু রঙ চড়িয়ে তাঁরাই দেশে যখন নিজেদের বাহাদুরির গল্প করেন তখন শ্রোতা হিসাবে সেই অদ্ভুত "মামার গপ্পের......" ডালপালা যেভাবে বেরোতে শুরু করে তাকে অস্বীকার করি কি করে।

অনেক ভেবে দেখেছি, অনেকের অভিজ্ঞতা শুনেছি। ব্যবসায়ী বন্ধুর সৌজন্যে তাদের সঙ্গে জাপানের তথাকথিত Bar আর Cabaret-তে গেছি, তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিলাতে চেষ্টা করেছি। অস্বীকার করবার উপায় নেই, এখানে ছেলের চাইতে আপাতত মেয়ের সংখ্যা বেশী। অঙ্কের হিসাব আমি দিতে চাই না—শুধু সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখি তাইতেই বিচার করবার চেষ্টা করি। এক টোকিওতেই নাকি পঞ্চাশ হাজার-এর ওপর 'বার'। সেখানে অবশ্যই সঙ্গসুখের সাথী হিসাবে বেশীর ভাগই মেয়ে। শুধু 'বার' কেন, যেখানেই যান মেয়ে দেখতে পাবেন। তারা দোকানে 'সেলস-গার্ল',—অফিসে টাইপিস্ট শুধু নয়, বেশীর ভাগ কাগজের কাজ তারাই করছে, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস-এ তাদেরই প্রাধান্য। যাত্রীবাহী বাস-এ কনডাকটার মেয়ে, বড় অফিসের বড় সাহেবকে সুন্দরী মেয়ে ড্রাইভ করে জনাকীর্ণ টোকিওর রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাইনে আমাদের দেশের একজন মার্চেণ্ট অফিসের অফিসার-এর কাছেও হয়ত লোভনীয়। এক কথায় যে জায়গাগুলো আমাদের চোখ কর্মরত পুরুষ মানুষ দেখতে' অভ্যস্ত সেগুলো এখানে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের দিয়ে পূরণ করছে। তাই প্রথমে একটু অবাক লাগে বইকি।

যেখানেই যাও একটা না একটা মেয়ের

একটি জাপানী সেলস-গার্ল

সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাবে, কিছু মেয়ের সঙ্গে পরিচিতও হবে। হয়ত একদিন কফি-হাউসে ডাকলেও আসবে।

সেই বিদেশী বন্ধু, যার গাড়িতে হর্ন বেজেছিল, সে এমনই একজনকে কফি হাউস-এ ডেকেছিল, দুএকদিন এক সাথে লাঞ্চ করেছিল। তারপর মেয়েটি ঠিক ওই মুহূর্তে হর্ন বাজিয়ে লোক জড় করেছিল।

বন্ধু গম্ভীর হয়ে বলছিল। আমরাও উৎসাহ বোধ করছিলাম। তার মুখের অবস্থা ঠিক সেই সময় মনে করে নিতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল না।

"লোকজন এল, মেয়েটা হেসে উঠল। জাপানী ভাষায় লোকগুলোকে কি বলল, তারা বিদেশীর উপর কোন কটাক্ষপাত না করেই চলে গেল।"

"মেয়েটা বলল—লেট আস গো।

ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি বললে?

—কেন?

—ওরা তো আমায় কিছু বলল না।

—বললাম আমার হাতটা হঠাৎ হর্ন-এর উপর পড়ে গেছে, তাই তুমি হঠাৎ ব্রেক করেছো।

—কেন তা বললে।

মেয়েটা বলল—

"তোমরা বিদেশী। তোমাদের একটা সম্মান আছে। জানি তুমি পুরুষ মানুষ। জাপানী মেয়ে সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা ধারণা নিয়ে আসো। তোমাকে দোষ দিই না। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে কয়েকদিনের মেলামেশায় তুমি যেভাবে এগোচ্ছিলে আমি কিন্তু তাতে রাজী নই। তাই তোমার এই মুহূর্তটাকে অস্বীকার করাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। লোক ডেকে কোনো একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব করতে আমি চাইনি। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু ওই হর্ন বাজানোতেই শেষ হয়ে গেছে। তুমিও বুঝেছ তুমি আমার কাছে কতটা এগোতে পারবে—আর আমিও বুঝিয়ে দিতে পেরেছি তোমাকে আমি কতটা সুযোগ দিতে পারি। তা নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।"

সেই মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে যায়নি। তারপর এক সঙ্গে তারা রেস্তোরাঁয় নৈশ-ভোজ করেছে, আরও অনেক কথা বলেছে, তারপরও হয়ত তারা ঘুরেও বেড়িয়েছে।

তার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর "জাপানের মেয়ে" নিশ্চয়ই তার কাছে অন্য এক রূপ নিয়েছে। পরে আমাকে সে বলেছে—

"জানো আমি পৃথিবীর অনেক বড় শহর ঘুরেছি। আমার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরের জীবন স্রোতে কোন পার্থক্য নেই। সব দেশের সব বড় শহরেই একদিকে চোখ ঝলসান উল্লাস, উন্মত্ত যৌবন আর পয়সার ছিনিমিনি যা এক-এক দেশে এক-এক নাম নিয়েছে। একদিকে উন্মাদ হয়ে উঠেছে জীবনস্রোত অপর দিকে শান্ত-স্থির কোন জীবন ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে।

"খারাপ আর ভালর সংজ্ঞা তো মানুষেরই সাজানো। তার মধ্যে থেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর রুচি অনুযায়ী তুলে নিতে হয় একটাকে। সেখানে তোমার রুচিটাই প্রধান। সমালোচনা করবার অধিকার অবশ্যই আছে, কিন্তু তাকে যুক্তি দিয়ে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে একটা বিকৃত ধারণা লোক-

াকে বলে বেড়ানর মধ্যে হয়ত বাহাদুরি
বার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তার সঙ্গে
াগনে বয়ে আনবে তোমার বিকৃত দৃষ্টি-
ঙ্গি আর রুচিবোধ।
"তাই যখনই আমার সামনে কেউ এদেশের
য়ে সম্বন্ধে বিচার না করে কিছু বলতে
র তাকে সাবধান করে দিই, অনুরোধ করি
ষ্টিভঙ্গীকে আরও একটু প্রসারিত
রতে।" এখানেই বন্ধু তার বক্তব্য শেষ
রল।

নিজেও দেখছি, মেয়েদের অবাধ মেলা-
মশাটা এখানে দোষণীয় হয়ে ওঠেনি। তার
মধ্যে কোনো নূতনত্ব নেই, উৎসাহিত
হবারও কিছু নেই। সহজভাবেই তা
এগিয়ে চলেছে। সেই চলার মধ্যেই এরা
খুঁজে পিয়েছে নিজেদের ইচ্ছাটার দিক
নির্ণয় করবার সঠিক পথ আর অবাধ
স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অনেকের
চোখে অনেক রকমভাবে ধরা পড়ে, এতে আর
আশ্চর্য কি।

বেশ কিছুদিন আগে দেশ থেকে এক বন্ধু
চিঠিতে জানতে চেয়েছিল—শুনেছি জাপানে
ছেলেদের চাইতে মেয়েদের গায়ের জোর
বেশী? একথা শুনে আমি কেন অনেকেই
হেসেছিলেন। কিন্তু সত্যই অবাক হতে
হয় যখন তাকিয়ে দেখি এ-দেশে মেয়েরা
সমাজে কতখানি স্থান জুড়ে আছে।
পুরুষ মানুষের চাইতে তারা কোন অংশে
কম নয়। আজকে অতি বড় গোঁড়া
জাপানীও স্বীকার করবে যে জাপানের
আজকের এই পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দেবার
বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের এক বিরাট অংশ
জুড়ে রয়েছে এদেশের মেয়েদের কৃতিত্ব। তা
না হলে এত দ্রুত সার্বিক উন্নতি সম্ভব হত
কিনা সন্দেহ। এরাও এক সময় আমাদের
দেশের মেয়েদের মতন কিছুটা পর্দানসীন
ছিল বইকি। ঘর থেকে বাইরে কর্মজগতে বার
হয়ে আসবার প্রধান যে দুটো কারণ আমার
চোখে পড়েছে, তার একটা হচ্ছে দ্বিতীয়
মহাযুদ্ধে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের
মৃত্যুতে এদের দেশে কাজের লোকের ঘাটতি
পড়ে। তাতেই মেয়েদের এগিয়ে আসতে
হয়েছিল পুরুষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ
করতে। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য সভ্যতার
একটা হাওয়া অবশ্যই লেগেছে। সব
জিনিসেরই একটা ভাল-র দিক আছে,
তাকে কেন্দ্র করেই ভাল-র পাল্লাটা ভারী
হয়ে উঠেছে।

বাইরের কাজের মধ্যেও এ-দেশের মেয়েরা
ভুলতে পারেনি তাদের ঘরোয়া
পরিবেশটাকে। তাদের চলা, কথা বলা,
ব্যবহার সব কিছুর মধ্যেই দেখতে পাবে
একটা অত্যন্ত ঘরোয়া ছাপ—যা যে কোনো
মানুষকে আকর্ষণ করে।

কিছুদিন আগে জাপানের মফঃস্বলের
ছোট্ট একটা হোটেলে কয়েক রাত্রি কাটাতে
হয়েছিল ব্যক্তিগত কাজের ব্যাপারে। সারা-
দিনের ক্লান্তির পর স্নান সেরে যখন ঘরে
এলাম তখন এক প্রায়-পঞ্চাশ বছর বয়সের
মহিলা জাপানী খাবার সাজিয়ে আনল।
খাবারের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে মনটা একটু
বিরক্ত হয়ে উঠল। কারণ মফঃস্বলের
জাপানী খাবারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না
থাকলে বোঝানো মুশকিল। মহিলাটি
ওদের প্রথানুযায়ী হাটু গেড়ে বসে একে
একে অনেকগুলো বাটি সাজিয়ে দিল।
মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে একটা
প্রশান্ত হাসি হাসল। ঠিক সেই মুহূর্তে
ওই যায়গাটা সব মিলিয়ে একটা অদ্ভূত
শান্ত সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করল।
খাবারটা সাজিয়ে চলে গেল না, বসে রইল।
যখন যা প্রয়োজন এগিয়ে দিতে লাগল।
আমার মনে পড়ে গেল বাড়ির কথা। ভাষার
আদান-প্রদানের অসুবিধা তো আছেই
তবুও আমার স্বল্প জাপানী ভাষার জ্ঞান
সম্বল করেই জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি অমন
করে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ?'

ও যা বোঝাল তার সারমর্ম হচ্ছে—ওর-ও
একটা ছেলে আছে আমার মতন, টোকিওতে
ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। তারপর জিজ্ঞাসা-
বাদে যা উদ্ধার করলাম তা হচ্ছে—মহিলাটি
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ওর স্বামী হারায়। তখন
ওর ছেলে খুব ছোট। আজও জানে না স্বামী
কোথায় কিভাবে মারা গেছে। খবর আসতে
আসতে একদিন আর কোনো খবর এল না,
ধরে নিয়েছে সে আর বেঁচে নেই। তারপর
তাকে বেঁচে থাকার তাগাদায় এই হোটেলে
কাজ নিতে হয়েছে। ছেলে বড় হয়েছে।
এখন সে একটা সুদিনের আশায় বসে
আছে। পৃথিবীর সব মায়ের মতনই
তারও পথ চেয়ে থাকা। কোথায় গিয়ে
শেষ হবে ভবিষ্যতই বিচার করবে আর এক
ভবিষ্যত।

এমনই এক ধরনের স্বামী হারানো বয়স্কা
নারী আজকে চোখে পড়বে, যাঁদের ঘর
থেকে বার হয়ে আসতে হয়েছিল লোকের
চোখের সামনে। তারপর কর্মজগতে এসে
আস্তে আস্তে লজ্জাটা চলে গেছে, কাজের
মধ্যে ডুবে থেকেছে। আজ সে দিন গুনছে
ছেলে রোজগার করবে, তারও একদিন
সুদিন আসবে।

আবার কেউ হয়ত নীচে নেমে গেছে,
কোনো-এক-রাত্রির ঘটনায় হারিয়ে ফেলেছে
নিজেকে। এমনই এক মেয়েকে আমি
পেয়েছিলাম এক ক্যাবারে-তে। সামনে নাচ
হচ্ছে, আশে-পাশে যৌবন নিয়ে মানুষ
লোফালুফি করছে আর আমার পাশে বসে
মেয়েটা ঘন ঘন চোখ মুছছে। আমার
জাপানী বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল,
ভারতীয় হিসাবে আমি হাত দেখে ভবিষ্যৎ

জনতে পারি। এ-দেশে ভবিষ্যৎ গণনার হিড়িক অনেকটা আমাদের মতই। চৌকিওর বৃহৎ চোখ ঝলসানো বাহ্যিক পরিবেশের ঠিক পাশে দেখতে পাওয়া যাবে ছোট ছোট আলো জ্বালিয়ে কত রকম ভবিষ্যৎ-গণনাকার বসে আছে আর উৎসুক ভাবে হাত বাড়িয়ে কতজন তার না-জানা ভবিষ্যৎ জানবার চেষ্টা করছে। যাই হোক, নাছোড়বান্দা মেয়েটিকে আমি বলে ফেলেছিলাম—"তোমার জীবনের প্রথম সুখের পরিসমাপ্তি দুঃখে।" এ তো সাধারণ কথা, তা না হলে কেনই বা সে এ জীবন যাপন করবে? যে মেয়েটি একটু আগে সিগারেট খাচ্ছিল আর কলহাস্যে উদ্বেগ হয়ে পড়ছিল হঠাৎ সে চুপ করে গেল। ঘন ঘন চোখ মুছছে। এই পরিবেশে এটা ভীষণ নীতি বহির্ভূত। আমার জাপানী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে যা জানলাম, তাতে নূতনত্ব কিছু নেই। তার প্রথম প্রেম কোনো এক সময় বিবাহে রূপ নিয়েছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধে একটা প্রাণ কেড়ে নিয়ে আর একটা প্রাণকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়েছিল পৃথিবীর এই বিশাল জনারণ্যের মাঝে। লেখাপড়া তার বিশেষ ছিল না, তাই পেটের তাগাদায়
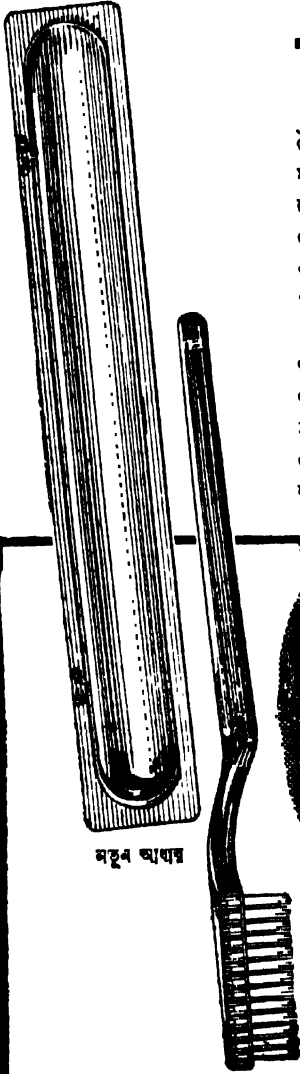
যৌবনকে শুধু সম্বল করে অনেক জীবন পার হয়ে আজ সে আমার চোখের সামনে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"ভাল লাগে তোমার এই জীবন?" বলেছিল—"ভাল না লাগলেই বা উপায় কি?"

এর জন্য কি সে দায়ী? আজ সে এইভাবেই বাইরে একটা সুস্থ জীবন যাপন করে। এইটাই তার কাছে আজ বড় আশ্বাস যে, সমাজ তাকে তার দুঃখ দিয়ে ব্যঙ্গ করে না। এইটাই হয়ত আমাদের চোখে বাঁকা হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু পুরুষের সাধারণ প্রয়োজনে যে, সঙ্গসুখটুকু সে চায় সেইটুকুই সে পাবে, তার বেশী নয়। তারা দেবী নয়, তবু তারা একেবারে নীচের স্তরে নেমে সমাজকে দূষিত করছে না। এই দুয়ের মাঝখানে এক কর্মময় জীবন সৃষ্টি করে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখছে। কেউ ভাইবোন মানুষ করছে, কেউ বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখছে আর কেউ বা নিজের জীবনটা পুরোপুরিই ভোগের সামগ্রী করে ফেলেছে। এর সবটাই যে সমাজের হিতকারী আদর্শে চলছে তা নয়। এর মধ্যে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে এমন অনেককে যারা নিজেদের কলুষ বাড়িয়েই চলেছে। সে তো সব দেশেই আছে তবে ব্যতিক্রমও আছে। কোথাও সমাজের ব্যঙ্গ কুড়িয়ে অন্ধকারেই জীবন শেষ করে, কোথাও তারাই দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে সকলের মতন সমানভাবে পৃথিবীকে ভোগ করে।

আর আছে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য হাওয়ার ভরপুর উঠতি নতুন মেয়ের দল। কথায় কথায় তারা 'বয় ফ্রেন্ড' বেছে নেয়, আবার পর মুহূর্তে নতুন 'বয় ফ্রেন্ড' পুরনোর জায়গা জুড়ে বসে। তাদের কাছে জীবনটা একটা হাওয়ার মতন। পৃথিবীর সমস্ত কৈশোরের একটা নিজস্ব দাবি আছে, যা আমাদের জীবনে শাসনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে কোনদিনই বার হয়ে আসে নি, আপনিই একদিন চুপ করে গেছে। তাই তার সত্যকার প্রাণচঞ্চল রূপ আমরা জানি না, কিন্তু এদেশে আমি তা প্রাণভরে দেখছি। এই কৈশোর স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করেই হয়ত অনেক সময় অনেক দুঃখ বহন করে আনে। কিন্তু আমি দেখেছি কৈশোরের একটা ভরা জোয়ার যা কোথাও বাধা পাচ্ছে না। এটাই বা কম কিসের?

কৈশোর থেকে যারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে তারাই একদিন অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে যৌবনে এসে উপস্থিত হয়। তখন তারা অনেক শান্ত অনেক সংযত, অনেক চিন্তাশীল, যৌবনে পা দিয়েই তারা ভাবতে শুরু করে তাদের ভবিষ্যৎ। কেউ ভেসে চলে, কেউ সংসারের মধ্যে শান্তজীবন নিয়ে এগিয়ে চলে। আবার কাউকে দেখেছি একাকী জীবন নিয়ে এগিয়ে চলতে। সেখানে তারা দুঃখী কারণ ত্রিরিশের উপরে এসে বেশীর ভাগ মেয়েরই সম্ভব হয় না নিজের করে কাউকে পেতে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়েই তাকে চলতে হয়। তবে কেউই বসে থাকে না। অনূঢ়া কন্যার জন্য কোনো বাবা-মায়ের কোনো চিন্তা নেই, সেখানে তারা স্বাধীন। যৌবনের হাসি-খেলায় সব দেশের মতন এখানেও কত মিলন কত বিচ্ছেদ জড়িয়ে আছে। সব থেকে বড় কথা কেউ কারোর ভারবাহী নয়, তারা একক জীবনযাত্রায় পরনির্ভরশীল নয়।

আজকের ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বপ্রথম এমন কিছু নূতনত্ব বাজারে আনবার চেষ্টা করে যা মেয়েদের কাছে লোভনীয় এবং আকর্ষণীয়। কারণ মেয়েরা ছেলেদের চাইতে রোজগার যে বেশী করে তা নয়, তবে তাদের অবস্থা ছেলেদের চাইতে অনেক সচ্ছল। যেখানেই যান—দেখবেন মেয়েদের ভিড়। ক্রেতা হিসাবে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চাইতে অনেক বেশী, কারণ মেয়েরা নিজেদের রোজগারের প্রায় সবটাই নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগাতে পারে।

"দেখি দুটো ড্রিংক?"

ছেলেটা এসে সোজা দোকানীকে হুকুম করল।

মেয়েটির সঙ্গে পানীয়টা শেষও করল। আস্তে সিগারেট ধরাল। মেয়েটি ব্যাগ থেকে কেমন শান্ত হয়ে পয়সা বার করে দিল। আবার তারা চলে গেল। এ ধরনের দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়বে।

ভারতীয় শাড়ি আর রান্না। এ-দুটোর উপর এদের প্রচণ্ড ঝোঁক। দল বেঁধে অনেক জাপানী মেয়েকে দেখেছি ভারতীয় মহিলাদের কাছে রান্না শিখতে আসে। কিন্তু আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম যতটা পারে তারা অবশ্যই কিনে আনে। তাদের মধ্যে অনেকে আবার রসগোল্লা তৈরিও শিখে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কি শেখে বা তার পরিণতি কি হয় আমার জানা নেই। তবে মনে হয় হতাশাব্যঞ্জক কিছু নয়।

আর দেখেছি শাড়ি পরা অবস্থায় তাদের মুখের ভাব। অদ্ভুত উত্তেজিত ভাবে তারা খানিক ঘোরাফেরা করে। জিজ্ঞাসা করেছি অনেক মেয়েকে—'তোমরা শাড়ি এত পছন্দ কর কিন্তু পরতে চাও না কেন?' ওরা বলে ওদের জাতীয় পোশাক "কিমনো"ই পরা হয়ে ওঠে না একমাত্র উৎসব ছাড়া—সেখানে শাড়ি না পরার কারণও তাই—কাজের অসুবিধা। সত্যই তো বিদেশীদের কাছে অমন একটা জিনিস গায়ে জড়িয়ে, সব সময় কাজ করাও সম্ভব নয়। তবে অনেক জাপানী মেয়ে, যাঁরা ভারতীয় বিবাহ করেছেন, তাঁদের দেখেছি অনেক উৎসবে বেশীর ভাগ সময়ই শাড়ি পরে আসেন। চুলও লম্বা রাখেন খোঁপাও একটা তৈরি করেন। সব মিলিয়ে তাঁরা ভারতীয় সাজসজ্জা অবশ্যই পছন্দ করেন, সেই সঙ্গে হয়ত ভারতীয় যুবকদেরও।

বলতে দ্বিধা নেই, অনেক ভারতীয় যুবকই হয়ত তাদের ওই পছন্দটা প্রথমত পছন্দ করেন, তারপর পছন্দকারীকে আরও বেশী পছন্দ করতে শুরু করেন। কতদিন আর পর করে রাখা যায়, তাই আপন করতে আর দ্বিধা কি? ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

এবার বলি এ-দেশে আমাদের মেয়েদের কিছু কথা। শরতের আকাশ এখানেও যে-কোনো বাঙালীর মনে পূজার সুর এনে দেয়। তাতেই নেচেছে বাঙালী বউরেরা। এই প্রথম টোকিওতে চলছে "বিজয়া-দশমী" উদ্‌যাপনের একটা উদ্যোগ। দেখা হলেই কিংবা টেলিফোনের বেশীর ভাগ কথায় কে কি খাবার তৈরি করবে, আর গান-বাজনায় কে কি অংশ গ্রহণ করবে তারই ফিরিস্তি। কালোয়ারী সঙ্গীতের গিটকিরির মতন হয়ত সে-উৎসব পরিচ্ছন্ন নয়, তবুও তাদের উদ্দীপনাকে আসুন আমরা সকলে উৎসাহ দিই, কারণ তাতে প্রাণ আছে। আমরাও তাদের সফলতার দিন গুনছি।

বিকাশ বিশ্বাস

স্থবিরের মুক্তি

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ময়াল সাপের মতো লম্বা আমার দিনগুলো, আমি ইচ্ছে করলে আরো বড়ো করতে পারি সময়কে, কিন্তু তাকে ছোটো করার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আসলে আমি একটি মৃত যুবক একথা বলা যেতে পারে। আমার দেহ থেকে পচা মড়ার গন্ধ ওঠে সারা-দিন ধরে, শুধু রাত্তিরটা ছাড়া। রাতে আমি ঘুমোই. সময় তাই এতো বড়ো হয়ে যায় যে গ্যাসের মতো ছড়িয়ে গিয়ে পাতলা হয়ে আসে গন্ধটা।

মাঝে আমার একদিন মনে হয়েছিল চিতার ওপর আমি শুয়ে পড়ে জ্বালিয়ে দিই নিজেকে। তাকে মৃতদেহের পরিশ্রম অনেক কম, ব্যাজার থাটার ন্যাকামির হাত থেকে রেহাই পেয়ে মুক্তি পাবে। কিন্তু তা হবার জো নেই, আকস্মিক-ভাবে শরীরটা চীৎকার করে ওঠে, ভয় পায়, জড়িয়ে ধরে বালিশটাকে, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে বাঁচতে থাকে।

আমি আমার ঘরের চারদিকে সঞ্চয় করেছি নির্বিঘ্নতা। ঘরটার বিচিত্র সাজ দেখে মনে হবে আমি অফিসের সামান্য ছোট সাহেব হলে কি হবে, কষ্টার্জিত সামান্য ধনের আমি সদ্ব্যবহার করেছি। আমাকে দেখে মনে হতে পারে আমি শেষ পর্যন্ত হয়তো পিরামিড হব. পিরামিডের ভেতর খাবার-দাবার, দরকার পড়লে একটা মেয়ের সঙ্গও পেতে পারব। পিরামিডের কয়েকটা জানলা থাকবে যেখান দিয়ে রোদ্দুর পড়বে বিভিন্ন সময়ের, হাওয়া ঢুকবে ঝড়ের।

গরমের সময় আমি আমার ঘরে চাবি দিয়ে দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসেছি। ম্যালের ধারে ধারে ঘুরে বিড়-বিড় করে বকি সবাইকে ভয় দেখাবার জন্যে। ম্যালের নির্জন দিকটায় একদিন ফগের আবছায়াতে আকস্মিকভাবে বাঁকের মুখে একটি আধুনিকা মেয়ের সামনে পড়তেই মেয়েটি হকচকিয়ে জোর কদমে পালাতে লাগল, আর আমি পেছন থেকে খিলখিল করে হাসতে থাকলাম। ওই কুয়াশা অন্ধকারে মৃতের উচ্চকণ্ঠের হাসি রোমহর্ষক সন্দেহ নেই। তারপর থেকে ফগ হলেই সুযোগ পেলে গা-ঢাকা দিয়ে ভয় দেখাই। একদিন পেনসনভোগী এক বুড়ো পালাতে গিয়ে পা মচকে পড়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা যে পাগলামি তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কিন্তু যেহেতু সময় সংক্ষেপ করার উপায় আমার আয়ত্তের বাইরে, সময়কে আরো বড়ো হতে দিতে আমি পারি না। আমার পিরামিড আর চিতার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমি [illegible], কেননা

কাজ পাগলামি যে নয়, তার বিচার করি।

একদিন বেশী রকম বৃষ্টিপাত হতেই কুয়াশা কেটে গেলো দার্জিলিং থেকে। রাতে পূর্ণিমার চাঁদ আর ঝকঝকে নীল আকাশ ফুটে উঠলো টলটলে দীঘির মত। ম্যালের পাশের উপত্যকার গভীর নীল আলো-অন্ধকার পার হয়ে ওপারের কাঞ্চনজংঘা সুউচ্চ আর ধবধবে স্বপ্নের মতো ফুটে আছে। দার্জিলিং-এর সমস্ত লোক যেন ভিড় করে উৎফুল্ল হয়ে গল্পগাছা করতে থাকল, নাচগান অথবা মদ নিয়ে বসল রেস্তোরাঁয়। আমায় চমৎকার ফগের খেলাটা ছাড়তে হল।

এই সব মোটা আনন্দ আমার ভালো লাগে না, এটা সত্যি কথা, বড়াই নয়। কাঞ্চনজংঘা আমার কাছে স্বপ্ন নয়, চাঁদ দেখলে আমার কবিতা আসে না, বরঞ্চ চাঁদের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কথা মনে পড়ে। মৃত বলেই আমার কাছে স্বপ্ন-টপ্ন মিথ্যে হয়ে গেছে, অথবা স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেছে বলেই আমি মৃত।

তাই আমি বগলে করে কয়েক বোতল হুইস্কী নিয়ে হাঁটা পথে বেরিয়ে পড়লাম সন্দকফু পাহাড়ের দিকে। রাস্তা দার্জিলিং ছাড়িয়ে ঘুমের থেকে, বন আর নদী, গ্রাম আর ক্ষেতের পাশ দিয়ে নাকি এগারো হাজার উঠে এক বাংলোয় শেষ হয়েছে।

এই রাস্তায় যেতে যেতে দুপুরে এসে পৌঁছোলাম পাগলাঝোরার একটা ল্যাইডের ধারে। পায়ে চলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখি হঠাৎ বিরাট, বিরাট চওড়া খাদ, ওপারের পাহাড়ের গায়ে দাঁত বার করা সাণ্ডস্টোন, আর খাদের পাশ দিয়ে বন্ধুর পাথর কেটে কেটে সিঁড়ি তৈরি করা, যেনো সিঁড়ির অন্ধকার ধাপ নেমে গেছে পাতালের দিকে, আর ওপারের সিঁড়ি উঠছে পাতাল থেকে স্বর্গের কোলে। ঠিক এই খাদ দিয়ে নামছে উঁচু এক শৃঙ্গের দেওয়ালের গা দিয়ে সাদা ফেনাফেনা পাগলাঝোরা নদী।

পাহাড়ের গায়ে উঁতিস গাছের পাতা ফর-ফর করে গহ্বরের হাওয়ার গর্জনে কাঁপছে। আমি আমার হুইস্কীর বোতল নিয়ে বসে গেলাম এই গহ্বরটার পাশে আর হ্যাভার-সোক থেকে গেলাস বার করে জল মিশিয়ে একটা বড় পেগ তৈরি করে চুমুক দিলাম মহানন্দে।

আমরা সবাই ভিড় করে মরণকূপের ওপরে তৈরি করা পচা কাঠের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কূপের দিকে তাকিয়ে আছি। মেলায় হট্টগোল চারদিকে। মেলার মাঝ-খানে একজন লোক গায়ে আগুন লাগিয়ে প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু থেকে পড়ছে এসে নীচে-তৈরি-করা ছোটো জলাশয়ে। আকাশের গায়ে দুলছে ঘূর্ণির চেয়ারগুলো, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে দেখতে থাকলাম কূপের অভ্যন্তর। একটা মোটর সাইকেল নিয়ে কালো জামা চোস্ত পরা একটা লোক কূপের অল্প পরিসর সমতল জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের চাকাটা কূপের খাড়াই দেওয়ালে উঠলো এঁকেবেঁকে। ঘূর্ণায়মান সাইকেলটা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যেতে সমস্ত কুয়োটা মোটর সাইকেলের ভটভট শব্দে আর গতিতে নড়তে থাকলো তীব্রভাবে। আমরা তার ওপরে দাঁড়িয়ে রেলিং ধরে রইলাম শক্ত করে, লোকটা সাইকেল সুদ্ধ উঠে আসছে আমাদের দিকে খাড়াই দেওয়াল ধরে। আমি এবার বনবন করে ঘোরা লোকটাকে ধরতে পারি বোধ হয়। ওর কালো জামাটা ঘামে লেপটানো, ঠাণ্ডা মুখের অসংখ্য গর্ত দিয়ে ঘামের ফেনা পাগলাঝোরার জলের উচ্ছ্বাসে গড়াচ্ছে।
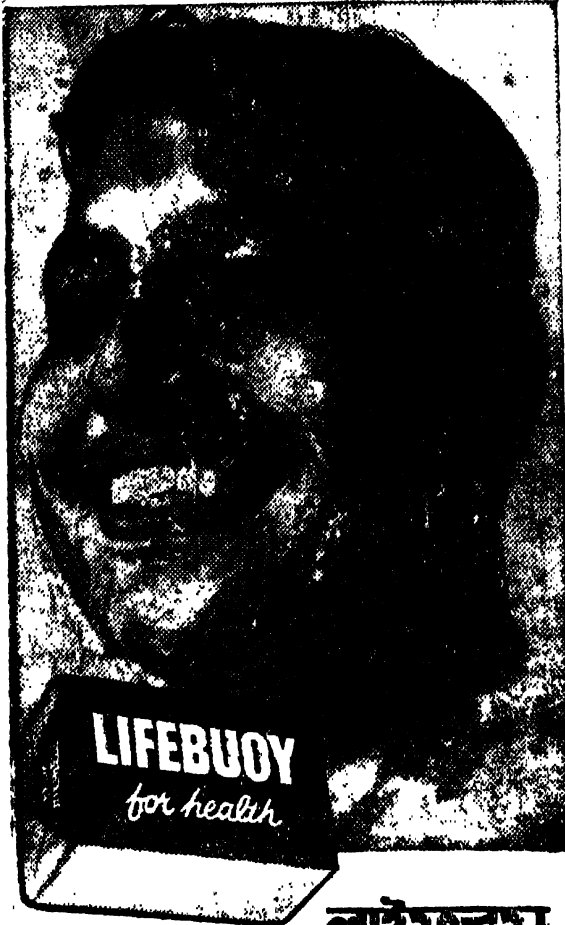
আমি আমার হ্যাভারস্যাক থেকে গোটা কতক পেরেক একটা হাতুড়ি আর বড়ো মোটা একটা দড়ি বার করে দাঁড়ালাম। ধস গহ্বরটার দেওয়াল ভালো করে পরীক্ষা করছি। পাথরের গায়ে অসংখ্য ছোটো ছোটো মাটির চাগড়া আছে—যেখানে পেরেক ঢোকানো যাবে। কাছি বেঁধে তাতে ঝোলা যাবে নিঃশঙ্কচিত্তে। মৃত্যের ভাবনা নেই পতনের কিন্তু পুরোমাত্রায় ভয় আছে শরীরটার।

প্রায় এক হাজার ফুট নীচু দেওয়াল। যদি আমি শূন্যে হাঁটতে পারতাম তবে মাত্র পাঁচ'শ বার পা ফেলে নেমে যেতাম নীচে। কিন্তু তা হবার জো নেই, মাধ্যাকর্ষণে মাটি টানছে আকাশকে—আমাকে, আমার মনবিকল দেহকে। প্রথম পেরেক ভাই ঠুকলাম হাতুড়ির ঘায়ে। শব্দটা নির্জন জায়গায় পাক খেয়ে ঘুরতে থাকলো বাজের শব্দের মতো। দড়িটা পেরেকে বেঁধে নামতে থাকলাম দেওয়াল ঘেঁষে। কুঁচি কুঁচি পাথর আর মাটির ঢেলা আমার চারদিকে ছেঁড়া মেঘের মতো উড়ছে। দড়িটা শেষ হলে একহাতে সেটা ধরে ঝুলতে থাকলাম আর অন্য হাতে দ্বিতীয় নম্বর পেরেক লাগিয়ে পা দিলাম। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ, নীচে শূন্য। অনেক নীচে একটা ছোটো কুঁড়ে—একটা লোক চোখের সামনে হাত লাগিয়ে সূর্য আটকে দেখছে আমাকে। অনেকক্ষণ, কতক্ষণ জানি না টানতে টানতে ওপরের দড়িটা পেরেক সুদ্ধ ছিঁড়ে নেমে এলো। এবার আমার পায়ের নীচের পেরেকটাতে দড়িটা বেঁধে পাহাড়ের গা দিয়ে টিকটিকির মতো নামতে থাকলাম। বাড়িটা ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে আর আঁকা মুখটা জীবন্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে, ওপরের আকাশটা অনেক দূরে উঠে গেছে। একটা ছোটো লাল সহেলী পাখি গোলাপ পাপড়ির মতো আমার পাশ দিয়ে উড়ে গেল পাখা ঝাপটে।

আমি যখন খাদের মাটিতে পা দিলাম তখন আমার জামা প্যান্ট চিরে গেছে পাথরের ঘর্ষণে, গায়ে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ, হাতের চেটো থেকে রক্ত ঝরছে। সাদা দড়িটার জায়গায় জায়গায় রক্তিম, আমার কানের কাছে বিছুটি লেগে চুলকোচ্ছে অনবরত।

ওপর থেকে দেখা বাড়িটা একটা কাঠের আর পাথরের তৈরি নোংরা ভাঙা কুঁড়ে। পচা মাংসের মতো তার চারদিকে হাজার হাজার মাছি ভন ভন করছে। ভ্যাপসা গরমে প্যাচপ্যাচে মাটিতে পা বসে গেল আমার, হাঁটু পর্যন্ত: আর তার থেকে অসহ্য পচা গন্ধ উঠল নাকের কাছে। লোকটা আমাকে দেখে পালাল ঘরের মধ্যে, আর সংগে সংগে মাছিগুলো উড়লো কালো ধোঁয়া হয়ে। ওই বাড়ির সামনের বারান্দায় কঙ্কগুলো ভুট্টা ঝুলছে ছাদ থেকে। আমি ঢুকে জল চাইলাম, লোকটা একটা খুনীর মতো আমাকে ভয় দেখাতে থাকল ঘরের মধ্যে থেকে। নেপালী, বুড়ো লোক, কপালের কাছে গভীর ক্ষত। আমার গায়ে হাতে রক্ত দেখে ও একটা কুকরী বার করে দাঁড়িয়ে রইল, ভয়েতে ভাবনায় কুকরীটা আমার দিকে ছিটকে আসতে চাইছে। আমি চলে এলাম ঘরের দাওয়া থেকে আর তারপর ওর আলুর ক্ষেতটার সবুজ গাছগুলোকে মাড়িয়ে পাগলাঝোরা নদীটার জলের দিকে গিয়ে একটা পাথরে বসলাম। নীল অগভীর জলটায় কয়েকটা ট্রাউট খেলা করে বেড়াচ্ছিল ছোটো ছোটো ছোরার ফলার মতো। আমি আমার জামা কাপড়গুলো খুলে ফেলে শুয়ে পড়লাম জলে, একটা ছোটো পাথরকে মাথার বালিশ করে। জলের স্রোত এসে আমার বুকের চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করতে থাকল ঘাসের ওপর হাওয়ায় দোলা বর্ষার দীঘির জলের ছবির মতো।

গোপালপুরের সৈকতে আজ ঝড় এসেছে। অভসারভেটারির গম্বুজ থেকে যখন আজ গ্যাসবেলুনটা ছাড়া হল তখন তা হুহু করে উত্তর পশ্চিমে ছুটে গেল কালো মেঘের তলা দিয়ে। টেলিস্কোপের লেন্স দিয়ে দেখতে দেখতে বেলুনটা অদৃশ্য হয়ে গেল দূর দিগন্তে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ-গুলো আছড়ে এসে পড়ছে বালির দেওয়ালে, ঝাউবনে। বালির কুচি উঠছে ঢেউয়ের সাদা ফেনায়; সমস্ত দিগন্ত জুড়ে মাতাল জলের বন্যায়, টানে, আকর্ষণে, বিস্তারে, দাপা-দাপিতে আমার হৃৎপিণ্ডটা আনন্দে নেচে উঠছে। তারপর হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে মাতাল সমুদ্রটা স্বচ্ছ বরফের মতো হয়ে স্তব্ধ। আর ঢেউ-এর নিস্তব্ধ পাহাড়ে দেখলাম ছোট একঝাঁক রুপোলী মাছ, সাঁতরাচ্ছে কানকো গুটিয়ে।

বাইরের সূর্যটা পাগলাঝোরার স্বচ্ছ জল দিয়ে গায়ে পড়েছে। আমার সটান শোয়া দেহটার ওপর দিয়ে খেলা করছে পাহাড়ের মাটির কুচি আর ঠান্ডা জল, আমার দেহের ক্লেদ আর ক্লান্তি ধুয়ে ধুয়ে চলে যাচ্ছে ঘূর্ণির অস্পষ্টতায়।

আমি জানি যে আমি আরও শুয়ে থাকলে আমার মৃত দেহটার ওজন ভারী হবে। আমি জানি আমি জল থেকে উঠলে ভ্যাপসা চাপা গরমটা আমার গায়ে এসে জড়িয়ে ধরবে কুটকুটে কম্বলের মতো, আমি জানি আমি যখন ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠবো আমার পিরামিড আর আমার চিতা সংগে সংগে চলবে, আমার দুইদিকে যেন অমাবস্যার অন্ধকারের যমদূত।

কলকাতার অফিসে বসে কাজ করছি, কিন্তু ওই রুপোলী মাছগুলো আমার মাথায় মাতাল ঘূর্ণি যেন। আমি অনেক দিন ধরে কাফকার বারোর মতো একটা গর্ত বানিয়ে থাকতাম অফিসে। অফিসে এসেই ছোটো নেংটি ইঁদুর হয়ে ফাইলের কাগজ কেটে কেটে কোনো কোনো জায়গায় ছেঁড়া কুচির পাহাড় বানিয়েছি। আমার ছুঁচোলো আর ধারালো দাঁতের যন্ত্রে মাঝে মাঝে নথী-পত্রগুলো ব্যথায় চমকে ওঠে। একদিন আমার লম্বা আর সরু লেজটা কয়েকটা ফাইলের চাপে পড়ে ছোট্ট চোখগুলো ঠিকরে আসছিলো রক্তের ফিনকির মতো, আর ধারালো গলায় শব্দ করছিলাম কিন্তু কারো কানে তা পৌঁছোচ্ছিল না। আমার সৌভাগ্য ঠিক সেই সময় একজন রেকর্ড সাপ্লায়ার ফাইলগুলো তুলে নিয়ে চলে গেলো বড় সাহেবের কাছে, আর আমি ছাড়া পেয়ে বাঁচলাম।

আজ কাঠবেড়ালীর মতো ওক ফল সামনের দু' হাতে ধরে দাঁত দিয়ে কুর-ছিলাম। সেই সময় একটা কালবৈশাখী ঝড় এল দরজা জানালার মধ্যে দিয়ে শব্দ করে। অসংখ্য পাতা ঝরতে থাকল গাছগুলো থেকে আর তার সংগে ফুল ধরল পলাশগাছে লাল টকটকে। আমার মাথায় বিদ্যুতের মতো ঘোরা ট্রাউট রুপোলী তীরের ফলা মাছ-গুলো জলের ছাঁরে কেটে কেটে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি বাড়িতে বউ-এর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছি দার্জিলিং থেকে ফেরার পর থেকেই। ওকে দেখিয়ে পিরামিডটার কয়েকটা পাথর সরিয়ে বেশী জানালা করেছি, একদিন একগুচ্ছ লাল গোলাপ এনে সাজালাম ঘরের টেবিলে। রেডিওগ্রাম থেকে মালকোষের সুর খেলে বেড়াচ্ছে ঘরের চারদিকে। আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপা বউকে কোলে নিয়ে আমার সুন্দর শরীরটা নিয়ে আদর করলাম। তারপর ক্লান্ত গোলাপের ধারে বসে আমার ট্রাউটের গল্প করলাম কবিতায়। পাগলাঝোরার জলে তখন পাইন গাছের গন্ধ; নিস্তরঙ্গ উপত্যকায় বার্চের গায়ে ঝুলছে সিম্বিডিয়ম স্বর্ণনীল অর্কিড, রডোডেনড্রনের বেণীতে লাল ফুল গুচ্ছ-গুচ্ছ করে সাজানো। আর ভুট্টার দোলার মধ্যে, আলুর সবুজ ক্ষেতের মধ্যে একটা নেপালী মুখ অসংখ্য দাগে ভরা, বিস্মিত দুটো বড় বড় চোখ আর হাজার বছরের পরিশ্রম ঝরছে মোমের মত ঘাম হয়ে। আমার বউ বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বলল, আমি এতোদিন হিংস্র ছিলাম এবার পাগল হয়ে গেছি; ওর কথায় এতোদিনের আমাদের সম্পর্কের ঘৃণা উপচে পড়ছিল। আমি শঙ্কর মাছের একটা চাবুক বার করে সপাসপ চালালাম ওর নরম গায়ের দিকে কিন্তু তার আগেই বউ দেহজুড়ে একটা লোহার বর্ম পরে ফেলেছে। চাবুকগুলো শুধু শব্দ করতে থাকলো হাওয়ায়, ফিরে এল বর্মে লেগে। আমি ক্লান্ত হয়ে আমার বিছানায় হতাশ দুঃখে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকলাম।

[illegible] যেমন ভাবে ব্যবহার করে তার শ্যামীর সঙ্গে, আমি আমার ট্রাউট মাছ-গুলো নিয়ে সেইভাবে খেলা করতে শুরু করলাম। এক একটা দিন বিচিত্র সব স্বপ্ন নিয়ে আসতে থাকল আমার কাছে। যেন আমি হাবুডুবু খাচ্ছি মানুষের সমুদ্রে, মরুভূমির মধ্যে জলের বন্যা এল, নদী আর প্রতিটি বালুর বিন্দুতে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ। দুর্ভিক্ষের দুটো নিথর হাত আমার দিকে বাড়ানো। কোনো কোনো সময় বসন্তে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি উড়ছে আমার মাথার আকাশের গা দিয়ে।

একদিন অফিসের টেবিলে বসে দেখি আনকোরা নতুন এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলে পেন্সিল তুলে জানলা দিয়ে ঝড় দেখছে কলকাতার। ধুলোর যে ঘূর্ণিটায় কয়েক-টুকরো মেহগনির পাতা ঘুরছিল তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অবাক হয়ে আছে। আমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করলাম সেই দিনই।

পরমেশ আমাকে সেদিন ম্যাজিক মাউন্টেনের সম্পর্কে অনেক কথা বলল, সেতামব্রিনি হচ্ছে ইউরোপীয় মানববাদের আর জেসুইট নাপথা কম্যুনিজমের

প্রভৃতি। টমাস মান বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিবাদ পশ্চিমী আর যীশুবাদ এমনকি কম্যুনিজম এশিয়ার মননের সঙ্গে সমপন্থী, আমি ওর কথাগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি নি কিন্তু আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য কথায় সায় দিচ্ছিলাম। একটা কুর্চি ফুলের গাছের মত লাগছিল আমার পরমেশকে। আমি বললাম, "তোমার প্রেমের কতদূর কি হলো?" পরমেশ একটু রাগ করল। কিন্তু আমি ওর হাত ধরে বললাম, আমাকে বন্ধুর মত বল, রাগ করো না। তখন একটা সুন্দর মেয়ের গল্প বলল পরমেশ। মেয়েটার চোখে আগুন আর মনে প্রচণ্ড তেজ। "ভালবাসা একটা সমুদ্রের মত দিঃ প্রামাণিক। আমি যদি আজ হঠাৎ লুপ্ত হয়ে যাই বা মিত্রু যদি অন্ধ হয়ে যায় তবে —তবু আমরা ধিক ধিক করে জ্বলবো। আমার বাঁচার একটা মানে আছে, মিত্রু ঝকমক করে আমার চোখে, আমার দেহে। আমাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে অন্য সবাই ছোটো পোকার মত জঘন্য, নোংরা।"

আমি আমাদের টানেল দিয়ে যাবার সময় পরমেশের দিকে দেখি। আমি ভাবছিলাম পরমেশ টানেলটাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেবে, কিন্তু ও গন্ধ শুঁকছিলো প্রাণ ভরে। শুধু বলল, "এতো নোংরা করে কেনো রেখেছেন গলিগুলোকে? সুন্দরভাবে বাঁচতে জানেন না আপনারা। এই রাস্তার ধারে একটা বাগানবিলাস গাছ লাগান, আর এখানে একটা ছোটো পুকুর কেটে তাতে লাল পদ্ম, জানালা দিয়ে ভরিয়ে দিন চারদিক, দক্ষিণ থেকে ও সমুদ্রের বৃষ্টির হাওয়া আসবে, পুকুরের ধারে থাকবে কুঞ্জ, তাতে বসবো আমি আর মিত্রু।

একটা সুড়ঙ্গের কাছে আমরা দাঁড়ালাম। বললাম জানো তো কাল ইউনিয়নের লোক আসছে অফিস ঘিরতে। তখন এই সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা ফাঁকা উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়াতে পারব, কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়।

অফিসের বাইরে এবার দুর্ভিক্ষ গুমরো-চ্ছিলো। ধান হয়নি দেশে, এই আঠারো বছরের স্বাধীনতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শহরতলীর লোকেরা এবার ভিক্ষে না করে চেঁচাতে শুরু করেছে জোর করে কেড়ে নেবার ভঙ্গীতে। আমার কথা শুনে পরমেশ বললে, "আমাদের গভর্নমেন্ট চরিত্রহীন।"

পরমেশের সঙ্গে আমার একটা মানসিক সেতু বাঁধার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম শেষবারের মতো। অন্তরঙ্গ গলায় কুৎসিত অশ্লীল একটা গল্প পাতলাম আমি আর আমার বউয়ের সম্পর্কের। "তারপর সেই নির্জন রাতে আমি আর আমার বউ, আর একজন বেশ্যা, আমার বউ আমি আর আরেকজন পুরুষ ঘরের বাতির তলায় আয়নার সামনে, আমি আমার বউ, [illegible]-এর [illegible] / [illegible] রাতে আমি আর সে। অশ্লীলতা ভাসছে আমার চোখে, ওর গা দিয়ে ঝরছে অশ্লীলতা। চরম আনন্দের মুহূর্তগুলো মোমবাতির মত সাজানো আমাদের মাথার কাছে। থুথু ফেলতে লাগলো পরমেশ বলল, "পচা কাদার গন্ধ বেরোচ্ছে নোংরা, নোংরা, নোংরা।"

পরমেশ দৌড়ে দৌড়ে পা ফেলে কোথায় চলে গেলো আমার কাছ থেকে, আমি আমার অফিস থেকে চৌরঙ্গীর নিওন-জ্বলা ভিড়ের মাঝ দিয়ে হাঁটতে থাকলাম। বাসকেট বল খেলছে লরেটোর মেয়েরা, আলোকধৌত প্রাঙ্গণে ঝলমল করছে ওদের ঘর্মাক্ত দেহ-গুলো, আনন্দের ফোয়ারা ঝরছে ওদের চোখে মুখে। সবুজ আর লাল স্কার্টের ঝালর ওড়নার মতো উড়ছে বিচিত্র সব ভঙ্গীতে। আমার ক্লান্ত আর একাকী নির্জন মন ওই ভিড়ের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে ছোটো ট্রাউটগুলোর মত। গড়ের মাঠের অন্ধকারে ঘন হয়ে বসে আছে ছেলে আর মেয়ে, চাপা খিলখিলে হাসিতে সুখস্পর্শের আমেজ। আমি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের গা দিয়ে, ট্রাম বাসে, ব্যারিকের দোকানে, মদ বাবুর বাজারের ঘামের গন্ধে দেখতে পাচ্ছি অদৃশ্য গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা এই সমস্ত জীবন, আনন্দ ঘাম ভালোবাসা আর ওড়নার আর আমি তার বাইরের ঘোড়দৌড়ের মাঠে ধুঁকছি রাগে আর একাকিত্বের দুঃখে।

আমার ঘরে এসে নীলবাতি জ্বেলে বউয়ের পায়ের কাছে বসে বলে চলেছি, "ভালোবাসো, ভালোবাসো আমাকে", আর ওর চোখ দুটো ঘরের বাতির দিকে তাকিয়ে মাছের চোখের মত, ওর নিঃসাড় নিস্তেজ দেহ আমার অত্যাচারের অপেক্ষায় মৃত-দেহের মত পড়ে আছে বিছানায়।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমি জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। সবাই, আবার সবাই যখন ঘুমুচ্ছে আদর করছে, ভালোবাসছে, স্নেহে-মমতায় বা করুণায়, জীবন্ত ক্রোধে, ঘৃণায় বা আশায়, তখন আমি আমার নিঃসঙ্গতার উত্তেজনায় আমার পিরামিড ভেঙ্গে জড়িয়ে ধরতে চাইছি কোনো পিচ্ছল মাছকে অথবা ধোঁয়ার আকৃতিকে।

আমি এভারেস্ট চাই না, আমাকে উই-এর ঢিবি খুঁড়তে দাও। আমি মৈথুন চাই না তোমাকে আদর করতে দাও, আমি নির্জন নিস্তরঙ্গ ম্যাল চাই না, আমি চাই না পাগলাঝোরার বিরাট খাদ, আমাকে আলুর ক্ষেতের পাশের ঘরের কাদায় গড়াতে দাও। আমার পিরামিড ঘৃণা, আমার একাকিত্ব আমার মৃতদেহ।

পরেরদিন আমাদের অফিসের চারদিকে ইউনিয়নের লাল ফেস্টুন বোনাসের জন্যে মারমুখো হয়ে চেঁচাচ্ছে। আমাদের গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যখন ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল বোঝাবার জন্য, তখন ওরা ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করলো। পুলিস ঘিরেছে মিছিলের চারদিকে, কিন্তু অফিসের লড কর্তাদের অনুরোধে এখনও কোনরকম গুলি টিয়ার গ্যাস চালায়নি। বেশ একটা উত্তেজনা সারা কলকাতায় এখন, খাদ্যের দাবি নিয়ে লোকে ক্ষেপে আছে, তার মাঝখানে বিশেষ অফিসের এরকম প্রতিবাদ পুলিস সহ্য করতে চায় না, কারণ এমনি

...মেন্ট থেকে চারদিকে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

যখন অফিস প্রায় ফাঁকা আর গম্ভুজ ...পথে চাবি পড়ে গেছে তখন আমি আমার চুলটা ব্যাকব্রাস করে টাইটাকে ...জোড়বে গুছিয়ে বেঁধে এসে দাঁড়ালাম জনতার সামনে। বেশ কয়েকটা চেনা চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছি যাদুদের। একটা চাপা গুঞ্জন উঠছে চতুর্দিক থেকে, সবাই আমাকে দেখে রাগে জ্বলছে, আমার বরফ দেহটার চারদিকে আগুনের ঝলক হ্যালোর আকৃতিতে উৎফুল্ল। আমি যেন এই প্রথম চিতা হয়ে জ্বলছি, ফুল আর আগুনে, রক্ত কান্নার চোখের সমষ্টিতে। আমায় যখন সবাই ঘিরে ধরেছে আর কয়েকটা চড়-চাপড় পড়ে আমার টাই বেঁকে গেছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, তখন পুলিশ ছুটে আসতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওদের থামিয়ে দিয়ে জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম একটা ছোটো উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর। বক্তৃতার ভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠলাম, "আপনারা আমাকে কিছু করার আগে একটা গল্প শুনে নিজেরাই বিচার করুন। গল্পটা একজন বড় নেতার, আমার নয়।" চাপা রাগে জ্বলতে থাকল মিছিল, সবার সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে আমি চাঁচালাম "আমরা হচ্ছি কচ্ছপ। সকালে আমরা সবাই রাস্তা দিয়ে গুটি গুটি অফিসে ঢুকলেই আমাদের উল্টে দেওয়া হয়। তখন আমরা, ছোটো, বড়, মেজ সাহেবরা কচ্ছপ পা-গুলো দিয়ে আকাশে সাঁতার কাটি কিন্তু নড়ার ক্ষমতা থাকে না। অফিসের ছুটি হলে আমাদের আবার সোজা করে দেওয়া হলে আমরা গুটি গুটি"—এইখানে আমি চার হাত-পায়ে প্ল্যাটফর্মে বসে কচ্ছপের মতো হাঁটতে থাকি। সমস্ত জনতা হঠাৎ কৌতুকে হাসতে থাকে, বলে "শালা শুয়োর কা বাচ্চা", আমি বলি লাফ দিয়ে "শালা কচ্ছপ।" আমার পেছনে একটা নিরুপদ্রব মুক্ত হাসি ওঠে আর তার শব্দে আমার নির্জন মনে আনন্দের ঝড় ওঠে। হাওয়ার মতো আমি লাফিয়ে লাফিয়ে চলি রাস্তা দিয়ে, মনুমেন্টের তলার রাজনৈতিক বক্তৃতা কান দিয়ে শুনি, আমার ঘরের ক্লান্ত দেহটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে ঘোরাই।

আমাকে ছি ছি করছিলো অফিসের অন্যান্য সাহেবরা। "সুড়ঙ্গ দিয়ে কেন আমি নামিনির উত্তরে আমি বড় সাহেবকে লিখে জানিয়েছি যে আমার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন মন্ত্রীরা। সেদিনের একটা বিক্ষুব্ধ জনতাকে আমি শান্ত করে রেখেছিলাম ভাঁড়ামি করে।" জবাবের উত্তরের অপেক্ষা করছি আমি।

একদিন সন্ধ্যায় যখন সমস্ত অফিস ছুটি হয়ে গেছে সেদিন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম কেরানীদের পার্টিশান দেওয়া মহলে। বড়বাবু কয়েকজনকে নিয়ে তখনও কাজ করছিলেন ইলেকট্রিক আলোর তলায়, সমস্ত অফিসটার কোনো শব্দ নেই—শুধু একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত নিওনগুলো জ্বলছে শিলিং থেকে। মুখের টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটার, ক্যালকুলেটার শান্ত হয়ে প্রতীক্ষা করছে আগামী কালের। আমাকে দেখে বড়বাবু দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু দরকার, বলবেন স্যার?" "না।" আমি ওর সামনের চেয়ারে বসলাম। ওরা বলে, "শরীর খারাপ করছে?" আমি প্রথমে ভাবলাম বলি, 'হ্যাঁ' কিন্তু একটু চিন্তা করে বললাম "না। একটা কথা আছে শুনবেন?" "বলুন" চারজনই একসঙ্গে বললে। আমার ঝকমকে গোল মুখটা সুন্দর। লম্বা সুঠাম চেহারার আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।—আর তারপর আমার মুখের থেকে আমার বাঁধানো দাঁত-গুলো খুলে রাখলাম একটা রুমালের ওপর ওদের টেবিলে। ওরা সবাই অবাক হয়ে আমার চুপসোনো গালের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি বললাম, "রসিকতা করার জন্যে করলাম।" আর অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকলাম আমি। ওরা প্রথমে একটু গম্ভীর হয়ে থাকল, তখন আমি ওদের পেটে খোঁচা মারতে থাকলাম আর ওরা প্রথমে একটু একটু, পরে ভীষণভাবে পেট ধরে আর তারও পরে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসতে থাকল। আর ওরা যখন শব্দ করে অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়লো তখন আমি আমার কোট জামা গেঞ্জি খুলে আমার রোমশ বুকটা মেলে ধরলাম, তার তলায় অসংখ্য পচা গন্ধযুক্ত ফাংগাসের সাদা সাদা দাগ শ্বেতির মতো ঝকঝক করতে থাকল, আর ওরা হঠাৎ সুন্দর আমির জায়গায় চুপসোনো মুখ, ঝাঁকরা ফাংগাসযুক্ত একটা বীভৎস মানুষ দেখে প্রথমে শান্ত পরে নিস্তব্ধ হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

কলকাতার জনতা আজ বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে, গুলির শব্দ উঠছে বড় রাস্তা থেকে। ব্যারিকেডের ধার দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ লোক জড়ো হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে গলিতে। ঝাল ফেস্টুন ধরে খাদ্যের, কেরোসিনের দাবি জানাচ্ছেন সবাই। আমি এই ভিড়ে একবার ব্যারিকেডের কাছে ছুটে ... মলোটভ ককটেল ছুঁড়ছি আর ... পালাচ্ছি গলির অন্ধকারে। ট্রাম জ্বলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাঁকা চৌরঙ্গীতে। আমাদের অফিসের মাথা থেকে মাঝে এক-ঝাঁক ইট পাটকেল নেমে এল। একসময় একটি টিয়ার গ্যাসের সেলে আমি কাঁদতে থাকলাম, চোখের জল একসা। একটা গুলি এসে হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে লেগে বেরিয়ে গেলো প্রচন্ড বেদনার সৃষ্টি করে, আর আমি রাস্তায় পড়ে রইলাম হাত পা ছড়িয়ে।

চৌরঙ্গীর গুমটিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি এসে একদল লোক আদর করে আমার দেহটা তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।

আমি একটা বিরাট ফাঁকা মাঠে আকাশের তলায় আমার বউকে খাবলে খাবলে ছিঁড়তে থাকলাম। পিরামিডের ইট পড়ে আছে চারদিকে আমি প্রথম দুই থাবাতে ওর বুক দুটো ছিঁড়ে নিয়ে ফানুসের মতো উড়িয়ে দিলাম আকাশে। তারপর একটা চক্র তুলে কুটি কুটি করে ওর সমস্ত দেহটা কেটে ছড়িয়ে দিলাম পিরামিডের ইটে ইটে। তারপর রক্তাক্ত চোখদুটো হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম অনেক দূরের সবুজ বনের দিকে।

জারোস্লাভ অঞ্চলে প্রাপ্ত যীশুর আইকন সংস্কার করছেন নিকোলাই কিশিলভ।

প্রাচীন রুশ চিত্র সংগ্রহ।

রাশিয়ার ট্রেটিয়াকভ চিত্রশালার নাম শিল্প রসিকদের কাছে তার প্রাচীন সংগ্রহের জন্য সুপরিচিত। চিত্রশালার কর্তৃপক্ষরা মাঝে মাঝে রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রাচীনতম শিল্পকলার নিদর্শনের জন্য অনুসন্ধান করে থাকেন।

এবার রাইবিনস্কীর কাছে জারোস্লাভ অঞ্চলে, নূতন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু দিন হল অন্বেষণ করে আসছেন। এবং তাঁরা সফলকাম হয়েছেন, সর্বসমেত একশো পঞ্চাশখানি সম্পূর্ণ নূতন রুশ চিত্রশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের মধ্যে, জারোস্লাভ অঞ্চলের, ত্রাতা যীশুর একটি আইকন আছে। তাঁরা যাঁরা শিল্প-কলার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, যে গত [illegible]

এটিই তাদের মধ্যে সব্বা মূল্যবান বলে ধরা যেতে পারে।

রাশিয়ার দ্বাদশ শতকের অনেক কাজের সঙ্গে আমরা পরিচিত কিন্তু সেই তুলনায়, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ত্রয়োদশ শতকের কোন নিদর্শন বলতে গেলে নেই।

বিশেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহে বলেন, যীশুর-আইকনটি অতি প্রাচীন রাসতভ-সুজডলে ধারার একটি উৎকৃষ্ট কাজ, দেশগত পদ্ধতি অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গীর যে সব রীতি প্রচলিত তা ঐটির মধ্যে বর্তমান।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে শিল্পী ঐ চমকপ্রদ আইকনটি নির্মাণ করেছিল সে কোন সোনার কাজ এর মধ্যে করেনি। অতএব খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, যীশুর আইকনটি রাজধানীতে চিত্রিত করা হয়নি। [illegible]

যায় তাহলে দেখা যাবে এখানে [illegible] অতীব মনোরম করে সহজ সরল [illegible] আরোপ করা হয়েছে। ঠিক যে কারণে রুবলভ চিত্রশিল্পধারা আজ সমগ্র বিশ্বে তার রেখার সুচিন্তিত ব্যবহারের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে, অবিকল তেমন কাজ এখানেও দেখা যায়।

নিকোলাই কিশিলভ একজন সংস্কার-করার দক্ষ ব্যক্তি। পুরাতন ছবিকে, জীর্ণ ছবির সংস্কার তাঁর দারুণ হাত। তিনি এখন ভগবান যীশুর ঐই আইকনটি নিয়ে কাজ করছেন। কিশিলভ বলেন—এই যীশুর আইকনটিকে বলা যায় একটি অনন্য সাধারণ সংগ্রহ—ত্রাতা যীশুর মূর্তি আঁকার পদ্ধতিতে রাশিয়ার নিজস্ব পদ্ধতিধারা—এবং তাঁর জাতিগত শুদ্ধ ধর্মপ্রেরণার রূপ পরিলক্ষিত হয়।

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস স্টুডিও-র শিশু প্রদর্শনী-সিনিয়র গ্রুপ : অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবন

আমরা অ্যাকাডেমী আয়োজিত শিশু চিত্র প্রদর্শনীর এবারকার সাফল্যের কথা আগেই বলেছি। এখন, অ্যাকাডেমী পরিচালিত স্টুডিও-র শিশু বিভাগে যারা অনেকদিন ধরে আঁকা শিখছে—তাদের সম্বন্ধে বলবো।

এদের নিয়ে অর্থাৎ যাদের স্টুডিওর শিক্ষকরা বলেন—সিনিয়র গ্রুপ। এদের কাজ নিয়ে একটি প্রদর্শনী করা হয়েছিল। সিনিয়র গ্রুপের মোট দশজনের কাজ এখানে স্থান পেয়েছিল—সব সুদ্ধ একচল্লিশটি ছবি। জল-রঙ তো বটেই, তাছাড়া প্যাস্টেল পেন্সিল স্কেচ—এমন কি সিল্ক পেন্টিংও ছিল।

শিল্পীরা নানা বয়সী, কারুর বয়স দশ উতরেছে, কেউ সতেরো।

এদের মধ্যে সব থেকে ছোট হল, সত্যজি কাঞ্জিলাল, তার পাঁচটি ছবি নির্বাচি হয়েছিল। তার যে আঁকতে ভাল লাগে ও ছবিগুলি দেখলেই বুঝা যায়—তার নে হল কি করে ছবিকে বাহার দেওয়া যায় তার লালের আর সবুজের ব্যবহার বেশ লাগ-সই। এখানে একটা কথা বললে অন্যায় হবে না—সম্ভবত ছবির আয়তন এবং রঙের-জায়গা জোড়া অনুযায়ী তুলি ব্যবহার করা হয় নি, ফলে অনেক স্থানে সরু তুলির টান-রেখা রয়ে গেছে—অবশ্য একথাও ঠিক, মোটা তুলি সে চালাতে পারবে কি না—সে ক্ষেত্রে—ছবির আয়তন—ড্রইংখাতা সাইজের হওয়াই সমাধান।

ঠিক একই কথা বলা যায়, শান্তশ্রী চৌধুরীর কাজ দেখে—ছবিটি পুরীর পট ধর্মী। হলুদ আর লাল এবং নীলের জোরে একটা মায়া সৃষ্টি করেছে সত্যিই, কিন্তু [illegible]

[illegible] বয়সীর ক্ষেত্রে, যেহেতু এখানে [illegible] রঙ-ভেজা অবস্থায় কাজ হয়ে নয় [illegible] আয়তন ছোট। রঙ-ভেজা বললেই [illegible] মোটা তুলির কথা আসে। যথা [illegible] সেনের (১২) ল্যান্ডস্কেপ (৩৯) —এখানে আবার স্ক্র্যাচ করা আছে। লোবেন তিস্‌জা (১২) ৩৪নং ছবি ও শীলা বসু (১৩) ৬নং বেশ দাঁড়িয়েছে।

মধুমা ব্যানার্জি'র (১৪) ২নং এবং অমিত সাহার (১৪) স্টিল লাইফ একটি সাজি আমাদের ভাল লেগেছে—এর সিলক পেনটিংটা মোটা হয়ে গেলেও প্রচেষ্টা আকর্ষণীয়।

সতেরো বছর বয়সী সুজন, প্রধান, মৃণাল মুখার্জি'র ল্যান্ডস্কেপে টান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় প্রদীপ চ্যাটার্জি'র হাত ধরে চমৎকার—এর কথা স্টীল লাইফের ছাই রঙ এবং হলুদ কেটে লাল অনেক দিন মনে থাকবে।

ঘরে-বাইরে

ফ্যাশন প্রদর্শনী

রেক্রিষ্টীজ হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট্‌স-এর কর্তৃপক্ষ আবার একটি ফ্যাশন শোর আয়োজন করেছিলেন। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টো-

মুর্শিদাবাদ ছাপা শাড়ী

পাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পুরোপুরি ভাবে মেয়েদের ফ্যাশনই দেখানো হয়েছিল। অবশ্য দর্শক-দের মধ্যে পুরুষও প্রচুর এসেছিলেন। গোয়ালিয়রের চান্দেরি আর অন্ধ্রপ্রদেশের চিনাথাপট্টি ভিন্ন পরিচ্ছদ ও শাড়ি সবই বাংলার তাঁতের কাপড়।

বছর তিনেক আগে এ'রা যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তার সঙ্গে দু-একটি নূতন সংযোগ দেখলাম। এবারের সাজে কিশোরীদের একটি অধ্যায় আলাদা করে দেখানো হয়েছে। শ্রীমতী সীতা চৌধুরী তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় জগৎজোড়া কিশোর সমাজের কথা উল্লেখ করে বলেন, হয়তো বা বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, পছন্দ-অপছন্দে যে মিল কিশোর সমাজ সারা দুনিয়ায় গড়ে তুলছে, সে মিল অদূর ভবিষ্যতে গভীরতর মিলের সূচনা করবে।

চওড়া লাল পাড় শাড়ি, ঘোমটা মাথায় পূজোর থালা হাতে বাঙালী ঘরের লক্ষ্মী বউ সেবারে সবার শেষে এসে অতিথি অভ্যাগতকে জানিয়েছিলেন প্রণাম। এবার এই সাজে এসে মডেল শ্রীমতী পিয়া রায় দর্শকদের জানালেন সাদর অভ্যর্থনা তারপর পর পর এলেন অনেক মডেল। (বলা বাহুল্য যে মডেলরা সবাই শখের অপেশাদারী মডেল)। কেউ বা সস্তা রাজবল হাটের তাঁতের কালোর উপর লাল ডুরে দেখিয়ে গেলেন, আবার কেউ বা পরে এলেন বহু-মূল্য টাঙ্গাইল-[illegible] ঐতিহ্যের চরম নিদর্শন। টাঙ্গাইল শাড়িও স্বল্প মূল্যের দেখানো হলো। আজকের কর্মব্যস্ত মেয়ে সকালে, দুপুরে বা সান্ধ্যসাজে চালিয়ে দিতে পারে একই শাড়ির বাহারে এমন টাঙ্গাইল শাড়ির অভাব নেই। রঙ্গীন আছে, সাদার উপর সোনালী রূপোলী জরির ঝল-মলে পাড় আর আঁচল আছে, বেছে নিতে পারেন যার যেমন মনে ধরে। বাংলার রেশমও দেখলাম। রেশম শিল্পও বাংলা-দেশের মস্ত বড় ঐতিহ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তো বটেই, ভারতের বাইরে প্রচুর বাংলার রেশম রপ্তানি হতো। ইস্ট

বাংলার বধূ

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজারের কুঠির পত্তনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল রেশম ব্যবসায়। আবার এই রেশমের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার মেয়ের অর্থকরী প্রচেষ্টা জড়িয়ে আছে, যেমন আছে ঢাকার মসলিনের সুতোকাটার সঙ্গে। রেশমের গুটি পোকা পালন ব্যবসায়ীদের ঘরে কিছু কাটা গুটি থাকে। এই কাটা গুটি সূক্ষ্ম সুতোর কাজে লাগে না। এই কাটাগুটি সংগ্রহ করে

টাঙ্গাইলের উপর হাতের ছাপা

অত্যন্ত দরিদ্র সংসারের মেয়েরা, বিশেষত বৃদ্ধা ও অসমর্থ মহিলা যাঁদের অন্য কাজ করা কঠিন, তাঁরা সুতো কাটতেন। নেহাত মোটা সুতো। ঘরের কাজ থাকলে অবসরটুকুতেই কাটতেন যতটুকু সম্ভব। টেকো বা তকলি ছিল সেই সুতো কাটার অবলম্বন। কাটা সুতো লাটাইতে জড়িয়ে রাখা হতো। মোটামুটি এক আউন্স সুতো দিনে কাটতে পারলেই যথেষ্ট। চার-পাঁচ আউন্স হলে 'বাণ্ডিল' বাঁধা হতো। কয়েকটা বাণ্ডিল একত্র হলে হাটে যেতেন বিক্রি করতে। সামান্য আয় হতো। মাসে একটি বা দুটি টাকা। তবে সে যুগে তাতেও গৃহস্থ সংসারে সাহায্য হতো। যেসব মুসলমান মহিলা পরদা পরতেন তাঁরাই এই কাজ বেশী করতেন। এক সময় নাকি প্রায় তিন হাজার মহিলা এই কাজে উপার্জন করবার সুযোগ পেতেন। অবশ্য সূক্ষ্ম রেশম হতো না। হতো বিশেষ করে মটকা। এখন সেই মটকার শাড়ি দেখলাম। হাতের ছাপা মটকা যে কি সুন্দর এতদিনে ভারতবর্ষের মেয়ে তা বুঝতে পেরেছেন।

বাংলার রেশমের পর্যায়ে বাটিক শাড়ির বাহার দেখলাম অনেক রকম। ইন্দোনেশিয়ার বাটিক ভারতবর্ষে এসে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজ বাটিকের কত বিচিত্র বিকাশ শাড়ি, জামা, উত্তরীয়, অঙ্গবস্ত্রে তার ইয়ত্তা নেই। বাংলার রেশমশিল্প নাকি আজ সংকটের সম্মুখীন। ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও দামে সস্তা রেশম সাধারণের মন কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের রেশম শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা তাই দরকার হয়ে উঠেছে নানা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।

বিরতির পর এলেন কিশোরীর দল। মডেল "মিঠুয়া" চিনালাপট্টির ঘন সবুজ শাড়ির উপর পাটের সুতোর কাপড়ের কোট চাপিয়ে দেখিয়ে গেল কত অল্প খরচে আজকের কিশোরী রুচিসংগত সাজ করতে পারে। পাটের সুতোর কাপড়টি নূতনত্ব। বাংলাদেশের মিঠে শীতে এই যথেষ্ট অথচ দামেদরে সুবিধা। আর একটি কিশোরী এল এগারো টাকার একটি বিছানা ঢাকনি কাটা পোশাকে। বেডকভার বা বিছানা ঢাকনিটি একদিকে সবুজ অন্যদিকে লাল। কাটছাঁটের বাহারে লাল আর সবুজের এদিক ওদিক মিলিয়ে বেশ পোশাক দাঁড়িয়েছে। বেডকভারের ঝালর দেওয়া কিনারাও ফেলা যায় নি। তাকেও পোশাকের বাহারে কাজে লাগানো হয়েছে।

প্রদর্শনীটির প্রথমে আমাদের বস্ত্রশিল্পের সম্বন্ধে শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়ের কথা-বার্তাটুকু বেশ ভাল লেগেছিল। বস্ত্র-শিল্পের সঙ্গে মহেন-জো-দারো সভ্যতার সংযোগ সারা দুনিয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্যাবিলনে নাকি কার্পাসবস্ত্রের নামই ছিল

টাঙ্গাইল শাড়ী, সন্ধ্যা সকাল সর্বদাই সুন্দর

"সিন্ধু।" খৃীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কথা এই কার্পাসশিল্প। ইউরোপে মাত্র কয়েক শ' বছর আগেও কার্পাস ছিল না। আমাদের প্রথম বেদ ঋগবেদে রেশম শিল্পের উল্লেখ আছে। ক্ষৌমবসনা নারী অগ্নির আরাধনা করবেন একথা ঋগবেদে আছে। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বালুচরের নকশা তাঁতের কথায় শিল্পী দুবরাজের বিষয় বললেন। বালুচর শাড়ির নাম বালুচর হলেও বালু-চরের আশেপাশেই নকশা তাঁত বেশি ছিল। শিল্পী দুবরাজ তাঁত বসিয়েছিলেন বালুচরে নয়—বাহাদুরপুরে। দুবরাজ বালুচর শাড়ি, শাল রুমাল রচনার ঐতিহ্যের শেষ শিল্পী। অথচ দুবরাজ কিন্তু তন্তুবায় ছিলেন না। জাতিতে তিনি ছিলেন চর্মকার। এক মুসলমান গুরুর কাছে নকশা তাঁতের কাজ শিখেছিলেন। তাঁতের কাজে হাত দেবার আগে তিনি ছিলেন কবিয়াল। কথায় কথায় গান বেঁধে গাইতে পারতেন। শেষ জীবনে নকশা তাঁতের শিল্পে ধর্মকথা আঁকতে শুরু করে তাও কিছু দিন পরে ছেড়ে দেন। নকশা তাঁত নাকি মাতির নীচে থাকে। ধর্ম কথার অপমান হবে। নির্দেশ দিতেন কিন্তু নিজে হাতে শেষ বয়সে

বাংলার রেশমে বাতিকের বাহার

দুবরাজ কাজ করতেন না। লিখতে পড়তে জানতেন না; কিন্তু অপূর্ব কবিগান গাইতেন, রচনা করতেন, জাতিতে তন্তুবায় না হয়ে তন্তুবায় শিল্পীর ইতিহাসে অমর হয়ে গেছেন। কি আশ্চর্য প্রতিভা! রসিক জনে বলে যদি দুবরাজ-এর পেশা বংশগত হতো তবে হয়তো এমন করে সে প্রতিভার শেষটুকু মুছে যেতো না। আসলে বালুচরী শাড়ি বেনারসের ঝলমলে সোনা-রূপোর প্রতিযোগিতায় হার মেনেছিল উচ্চবিত্ত মহিলা সমাজে। সস্তা বালুচর হতো নেহাত খেলো। সস্তা রেশমে মাড়ের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে তৈরি হতো তার চমক। আঁচলের কল্কা বা কুঞ্জ হতো নেহাত সাধারণ। আবার মূল্যবান বালুচর শাড়ি একখানা তৈরি করতে শিল্পীর লাগতো তিন-চার মাস। তাতে থাকতো মস্ত আঁচলা, সূক্ষ্ম নকশা আর নানা নমুনার ব্যঞ্জনা। দাম হতো তার এত বেশি যে বিত্তবান আবার সেই বেনারসী শাড়ির মোহ কাটাতে পারতেন না। আজও সেই বেনারসের শিল্পীই নাকি নূতন করে 'বালুচর' সৃষ্টি করবার দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন! নিয়তির কি আশ্চর্য নিয়ম।

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সবার শেষে সুন্দর ছোট্ট বক্তৃতায় একটি বিষয় উল্লেখ করলেন। আমরা সবাই লক্ষ করেছি, পোশাকে 'মোটিফ' বা রচনার বিষয়বস্তু যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে। সম্বলপুরী আঁচল আসছে শান্তিপুরের শাড়িতে আবার ঢাকার বুটি তুলছে বেনারসের শিল্পী। এর একটা বিশেষ বিপদ আছে। এভাবে মিলে গেলে শিল্পের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃজনী শক্তির বৈচিত্র্য পাবে দারুণ আঘাত। শ্রীমতী কমলাদেবী হ্যাণ্ডি-ক্রাফ্‌টস্‌ বোর্ডের চেয়ারম্যান। হ্যাণ্ডি-ক্রাফ্‌টস্‌ বোর্ড ভারতের হস্তশিল্পের বহু লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতেও হয়তো তাঁরা কিছু সাহায্য করতে পারেন, যদি মহিলা সমাজ, যাঁরা কেনাকাটা বেশি করেন, তাঁদের সাহায্য পান।

শ্রীমতী কমলাদেবীর কাছে মহিলা সমাজের তরফ থেকে আমাদের অনুরোধ, যেন মহিলা শিল্পীদের কথাও তাঁরা মনে রাখেন। বাংলা দেশে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তন্তুশিল্পের বহু পর্যায়ে মেয়েরা কাজ করেন। সেখানে তাঁরা একটু উৎসাহ পেলে কিছু উপার্জনের পথ বজায় থাকে। সে পথ ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অর্থকরী প্রচেষ্টার পথ। ঘরের কাজ বাদ দিয়ে নয়। আজকাল বিদেশে raw silk-এর নামে সবাই পাগল অথচ 'র' সিল্ক কথাটি ব্যবসায়গত শব্দ। একটু মোটা ধরনের রেশম, কেটো, মটকা, এণ্ডি ইত্যাদির সংমিশ্রণ এই ব্যবসায়গত শব্দের উৎপত্তি। রেশম শিল্পের ভাষায় 'র' সিল্ক বলতে কাঁচামাল অর্থাৎ বুনবার আগে যে রেশম তাকে বলে। মোটা রেশমের কাজে মহিলা সমাজ চিরকাল কিছু উপার্জন করেছেন। যেমন ধরুন এণ্ডি বা এঁড়ি। তুঁত গাছের পাতাও নয়, সাধারণ ভেরেণ্ডা, (যে ভেরেণ্ডার অপবাদ আছে নিষ্কর্মা লোকের ভেরেণ্ডা ভাজা বলে) তার পাতা খেয়ে এক-রকম কীট ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানে রেশমের খোলসের মতই খোলস সৃষ্টি করতো। এ থেকে রেশম সংগ্রহ করে যে কাপড় হতো তা প্রায় সবটাই মেয়েদের হাতে ছিল। ভেরেণ্ডার চাষ সাধারণ ব্যাপার, এ পোকাও আটপৌরে কষ্টসহিষ্ণু কীট। এ ধরনের রেশমের প্রচলন কি পশ্চিম বাংলায় সম্ভব নয়?

ফ্যাশন প্রদর্শনীর প্রচলন আমাদের দেশে বেশি দিনের নয়। তবে পোশাক সম্বন্ধে নূতন খবর জানবার সহজ উপায় এ ধরনের প্রদর্শনী এ বিষয় সন্দেহ নেই।

চার্লস ডিকেন্স বলেছিলেন:—
'fashions are like human beings.
'They come in, no body knows when.
why or how".

আবার কার্লাইল বলেছেন
"Society is founded upon cloth."
দুটি দুই প্রান্তের চরম মতামত। তবে আমরা মনে করি ফ্যাশনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকটা হয় এবং গতিশীল ফ্যাশনের স্থিতি হয় এসে ব্যক্তিগত স্টাইলে। সমাজের যে সময় যে অবস্থা, যে পরিস্থিতি তার
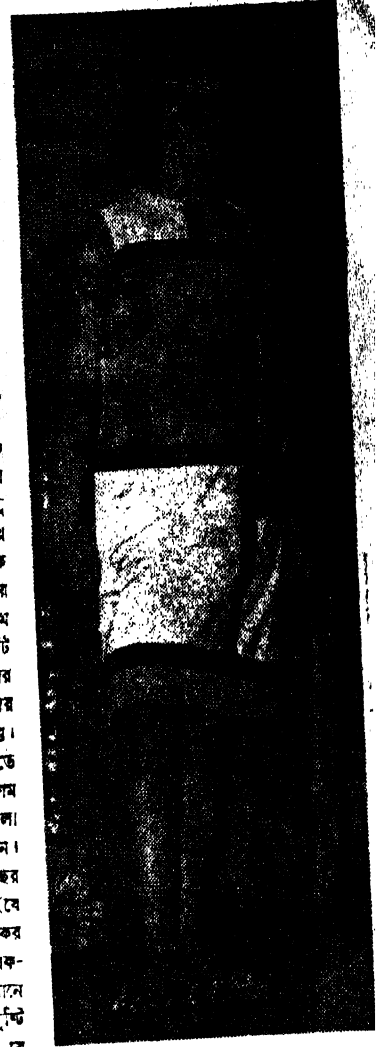
আধুনিক কিশোরীর বেশ

সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফ্যাশন রচনা করাই ফ্যাশনের সার্থকতা। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ফ্যাশনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে সুসমঞ্জ করে তুলতে পারে তবেই সেটা ফ্যাশন তা না হলে সেটা কায়দা জাহির করার পর্যায়ে আসে।

—শ্রীমতী

রাজ্য সরকারের অফিসার এবং কর্মী-দের লইয়া গঠিত প্রায় আশীজনের মস্ত একটি বাহিনী দিল্লি চলিয়া গিয়াছে; উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য চতুর্থ যোজনায় বরাদ্দীকৃত টাকা না কাটিয়া

সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক এই প্রার্থনাই করি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি, সর্বনাশে সমুৎপন্নে পন্ডিত ব্যক্তিরা কী করেন তা যেন তাঁরা মনে রাখেন এবং প্রয়োজন বোধে অর্থের বিকল্প হিসেবে অন্তত দিল্লীর লাড্ডু নিয়ে আসতে যেন ভুল না করেন।"

সংবাদে শুনিলাম, ছানাজাত যে-মিষ্টি বাহির হইতে আনার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল তাহা আংশিক প্রত্যাহার করা হইয়াছে অর্থাৎ এখন হইতে দুই কেজি ছানার মিষ্টি বাহির হইতে আনা যাইবে। শ্যামলাল মুখ ভেংচাইয়া বলিল—"কী কাজটাই না করলেন; ভেবেছিলাম বিজয়ায় দু'খানা জিলিপি হাতে দিয়ে নমো নমো করে লৌকিকতাটা সারব, সেই গুড়ে দিলেন বালি ছিটিয়ে!!"

সত্য সত্যই বাস কর্মীরা তাঁহাদের ধর্মঘটী সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন; ১৪ অক্টোবর রাস্তায় কোন সরকারী বাস বাহির হয় নাই।—"হয়নি তার কারণ প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু প্যাসেনজারদের জন্য এখনো কোন সোসাইটি স্থাপিত হয় নি"—ট্রামে বাদুড় ঝোলা হইয়া যাইতে যাইতে মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

সম্প্রতি কিছু কিছু স্কুল-কলেজ খোলা হইয়াছে। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ছেলেরা যে 'মেঘের কোলে ঘূর্ণি' ওঠে আজ আমাদের বন্ধ যে ভাই, আজ আমাদের 'বন্ধ' গান গেয়ে নব শারদোৎসবে মেতে উঠবে তার দফা গয়া!!"

সংবাদে প্রকাশ, গুজরাটের সৌরাষ্ট্র কলেজের ছাত্রসমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আগামী নির্বাচনে রাজ্য বিধান-সভার সদস্য পদের জন্য ছাত্ররা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। শ্যামলাল বলিল—"গুজরাট যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন মারাঠা-পাঞ্জাব-সিন্ধু-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ বাদ যাবে না, যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? আমরা শুধু ছাত্র নির্বাচন প্রার্থীদের আসন্ন বেকারত্বের কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি!"

সংবাদে শুনিলাম, বৈজ্ঞানিক পন্থায় আবিষ্কৃত বটিকা সেবন করিয়া নাকি মশার কামড় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।—

"সস্তা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারি, না, হলে হাতের পাঁচ কামান তো আছেই" —মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, আসন ভাগাভাগির ব্যাপারে বাম-কমিউনিস্ট-দের প্রস্তাবে বাম ফ্রন্টে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সত্যই দুঃসংবাদ। বাস-ট্রামের মতো সংরক্ষিত সীটের প্রশ্নও ওঠে না কেননা তাঁরা সবাই বাম, বামা নন!!"

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও-র বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর খাদ্য পরিস্থিতি কোন সময়ে বর্তমানের ন্যায় এত সঙ্কটজনক হয় নাই। —"কিন্তু এতে চিন্তার কোন কারণ নেই; ফাও হয়ত জানেন না যে বাংলায় একটা কথা আছে—উনো (ইউ এন ও নয়) ভাতে দুনো বল, অধিক ভাতে রসাতল"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বিহারের জনৈক শিক্ষক প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, বিহারের সংস্কৃত শিক্ষকগণ সরকারী পিয়নদের চেয়েও অর্ধেক বেতন পান। বেতন-বৃদ্ধির দাবিতে তাঁরা নাকি অবিরাম চণ্ডী পাঠ করিয়া যাইবেন

স্থির করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"সর্বাধিক বারোয়ারী দুর্গাপূজা হয়ত কলকাতাতেই হয়। এখানে বেতন বৃদ্ধির সর্বাধিক দাবিতে মিছিলের বদলে চণ্ডী পাঠ করলে হয়ত এক ঢিলে দু' পাখিই মরতো!!"

বম্বের সংবাদে শুনিলাম, ক্রমশঃ কম আধ ডজন নায়িকা হয় পরিণীতা বা বাগদত্তা, তাঁরা নাকি আর অভিনয় করিতে চাহিতেছেন না। এই প্রসঙ্গে জনৈক চিত্র-প্রযোজক বলিয়াছেন যে, চলচ্চিত্রশিল্পে ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে বাধ্য এবং সেই জন্য নূতন "মুখের" জন্য সারা দেশব্যাপী তল্লাসীর ব্যবস্থা হইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"অবস্থা যদি এই হয় তবে তল্লাসী চালাতে হবে বইকি। কিন্তু মেক-দেওয়া এত চিত্রতারকা দেশ জুড়ে রয়েছে যে এর চেয়ে আকাশের তারকা খোঁজা বুঝি আরো সহজ!!"

চীন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল যে, সেখানে কোন একটি স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং সহকারী আটজন শিক্ষককে রেড গার্ডরা চাকর বানাইয়া এবং তাঁদের দিয়ে মেঝে ঝাড় দেওয়াইতেছে, বাগানে শাক-সবজি জন্মাইতেছে। সহযাত্রী বলিলেন—"অনেকে তবু দুই চোখ বুঁজে গদগদ হয়ে গান ধরেছে—মাগনে চাকর রাখো জী!!"

উড়ো চিঠি,

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের লেখা "দেশ" পত্রিকার পাতায় তাঁর "উড়ো চিঠি" আর "আনন্দবাজার পত্রিকায়" "বাইরে দূরে"র ধারাবাহিক রচনা গভীর উৎসাহের সঙ্গে পড়লাম। বিদেশের পটভূমিকায় আমাদের লেখা অনেক। কিন্তু এত অল্প কথায় এত বুদ্ধিদীপ্ত লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। যেন ধারে কাটা। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁর "চোখের ক্যামেরা" আর 'মনের রেডার যন্ত্র"কে।

"দেশে" ২৪শে সেপটেমবরের সংখ্যায় "উড়ো চিঠি"তে যেখানে তিনি ওয়াশিংটনে গানের জলসায় হারি বেলাফনটের গান "গত বসন্তের ফুলগুলি কোথায় গেল?"-এর কথা লিখছেন, সেখানে আমার অনেক স্মৃতি এসে দেখা দিল। জরমানীতে এসে আমার এমন বহু মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যাঁদের স্বামী-পুত্র হয় গত মহাযুদ্ধে মারা গেছে, নয়ত রণাঙ্গন থেকে আর ফেরেনি, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা বলতে বলতে করুণ সুরে গেয়ে উঠেছেন—"হেনা জিন্ড দী ব্লুমেন গেব্লিবেন?" (ফুলগুলি কোথায় গেল?) সেই হতভাগ্য নারীদের কণ্ঠে এই করুণ গানটি শুনলে মনে হয়—সেদিনের সেই যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ যেন আশেপাশে চারিদিকে এখনো ছড়িয়ে রয়েছে। এই গানটি আমি এমনিভাবে বহু স্থানে, বহু শাস্ত্র-সঙ্গীতের আসরে শুনবার সুযোগ পেয়েছি। যতদূর জানি, গানটি প্রথম জরমান ভাষায় রচিত হয়, রচনা করেন মূক-চলচ্চিত্র যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী ও গায়িকা মারলিনে ডীট্রিষ, যিনি নাৎসী আমলে আমেরিকায় দেশান্তরিত হন। যুদ্ধের পরে গানটি জরমানীতে খুবই প্রচার লাভ করে। কিছুকাল পূর্বে বিখ্যাত জরমান গায়িকা 'হিলডেগার্ট' ক্নিফ নতুন করে গানটি আবার রেকর্ড করেছেন।

যুদ্ধের ধ্বংস কাকে বলে, তা জরমান মানুষদের মুখে এই গানটি শুনলে অনুভব করা যায়। এই গানটি যদি সঠিক অনূদিত হয়ে আমাদের মহাদেশেও ঘরে ঘরে প্রচারিত হতে পারত, তবে যোধ হয় ভারত-পাকিস্তানের যেসব মানুষেরা যুদ্ধের কথা ভাবেন, তারা হয়ত একবার তার ধ্বংসের কথাটাও ভাবতেন।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম
বারলিন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

১লা অক্টোবর তারিখের দেশ পত্রিকায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের আলোচনা পড়ে এই চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ করছি। রবীন্দ্রবাবু লিখেছেন যে, যোগীন্দ্রনাথ যে বন্দে মাতরম নামক জাতীয়-সংগীত-সংগ্রহ সংকলন করেছিলেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তা নেই। এর ষষ্ঠ সংস্করণ (১৯০৮) রক্ষিত আছে। তিনি কোথাও জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করেন নি। এর ফলে পাঠকদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে জাতীয় গ্রন্থাগারে বন্দে মাতরম নেই। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রথম সংস্করণের বন্দে মাতরম আছে। প্রথম সংস্করণ দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের দুটি খণ্ড প্রকাশের কোন পরিকল্পনা প্রথমে ছিল না। এই জন্যেই প্রথম প্রকাশিত ভাগটিকে অনুরূপ ভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। সংকলনটির জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে অল্প দিন পরেই যোগীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। এই খণ্ডের নিবেদনে তিনি বলেছেন : "বর্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া অনেক স্বদেশভক্ত সুকবি সম্প্রতি অনেকগুলি উচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই সকল সংগীতের অধিকাংশ এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল।"

এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারে বন্দে মাতরমের চতুর্থ এবং পঞ্চম সংস্করণ (দুটিই ১৯০৬) আছে। যোগীন্দ্রনাথের পুত্র আষাঢ় ১৩৫৫ সালে এই সংকলনের একটি "পরিবর্ধিত" সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর ছাড়া শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত একটি ভূমিকাও এই সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। এটিও জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে।

শ্রীদাশগুপ্ত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ক্যাটালগে যোগীন্দ্রনাথের, কমলিনী ও বিদ্যাসাগর—এই দুটি গ্রন্থের উল্লেখ পেয়েছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারেও এই বই দুটি আছে। তবে কমলিনীর লেখক শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর বইটি ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী সিরিজের অন্তর্গত। নামপত্রে লেখক হিসাবে যোগীন্দ্রনাথের নাম নেই, আছে প্রকাশক হিসাবে। সুতরাং এ বই যে তাঁরই লেখা এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। কারণ লেখক হিসাবে বইয়ের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত না করবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। এই সিরিজের আরও কতকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী বাণী বসু বাংলা শিশু-সাহিত্যের যে বিস্তৃত পঞ্জী সংকলণ করেছেন তাতে যোগীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত এবং সংকলিত গ্রন্থের একটি তালিকা পাওয়া যায়।

যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত "দেশ"-এর পাঠক-পাঠিকারা শ্রীদাশগুপ্তের আলোচনা পড়ে জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর লেখা বই নেই এমন ধারণা করতে পারেন। আশা করি তেমন ধারণা যাতে না হয় তার জন্য এই পত্রটি দেশ-এর পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করবেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
উপ-গ্রন্থাগারিক
জাতীয় গ্রন্থাগার।

চিত্র সমালোচনা

আমার বক্তব্য, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ৪৭শ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত 'চিত্র প্রদর্শনী' আলোচনাটি সম্বন্ধে।

শিল্পীর শিল্পকর্ম বা চিত্রবিশেষ সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত যাই হোক না কেন, প্রকাশের সময় সেই অভিমতকে একটা শোভন রূপ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীসুনীলমাধব সেনের কোন বিশেষ একটি শিল্পকর্ম সমালোচকের

চোখে অশোভন ঠেকেছে, কিন্তু তাঁর অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে অন্তত আমার মনে হয়, শোভনতার সীমারেখা তিনিও অনেকটাই লঙ্ঘন করেছেন। শ্লীলতা বা অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে বহু আলোচনাই হয়ে গেছে, ইদানীং লোকের মনে এ নিয়ে রক্ষণশীলতাও অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। সত্য বটে, আমরা শৃঙ্গার রস শুনেই কানে আঙুল বা চোখে হাত-চাপা দিইনে। আবার লেখকের ভাষায় 'ইদানীং একটি থ্যাদা যৌন-নোলা সর্বত্র খেলে বেড়াচ্ছে'—এ উক্তির সত্যতাকেও অস্বীকার করা যায় না। 'কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সমালোচনার ক্ষেত্রেও কি তার মন্থর অনুপ্রবেশ ঘটছে না? বিশেষত এ ধরনের সমালোচনা তো এ প্রশ্নই জাগিয়ে তোলে। সমালোচনার ভাষা স্পষ্ট নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সংযমও থাকা দরকার। প্রসঙ্গত জানাই, 'আধুনিক চিত্রকলা' পর্যায়ে শ্রীশুদ্ধশীল বসুর আলোচনা বেশ ভালো লাগছে।

মনোশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

ছোট গল্প

চেনা অচেনা। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যায়ন, ৮-এ কলেজ রো, কলকাতা-৯। চার টাকা।

বেচাকেনা, প্রায়শ্চিত্ত, অনুকম্পা, খাঁচা, লজ্জা, ছবি, প্রতিঘাত, ভয়, তুলনা আলো-অন্ধকারে ও তৃতীয় পুরুষ—এই এগারটি ছোট গল্পের সংকলন 'চেনা অচেনা'। গল্পকাররূপে সুধীরঞ্জনের একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে বাংলা-সাহিত্যে। বিদেশের পটভূমিকায় লেখা তাঁর দুটি উপন্যাসের খ্যাতি মনে রেখেই বলব, ছোট গল্পে তিনি অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ। তার একটি কারণ হয়তো তাঁর লিখনভঙ্গী। তাঁর ভাষায় এমন এক ধরনের কাব্যগুণ রয়েছে যা উপন্যাসের পক্ষে হয়তো তেমন অনুকূল নয়; পক্ষান্তরে, ছোট গল্প যেখানে সার্থক লিরিকের স্তরে উন্নীত, সেখানে এই ভাষা গল্পের লাবণ্যকে সুস্বাদ করে তোলে। আলোচ্য গ্রন্থান্তর্গত 'খাঁচা' গল্পটির কথাই ধরা যাক। ক্লান্ত সংসারী একটা মানুষ বীরেন। স্থূল প্রয়োজনের শিক-ঘেরা খাঁচায় তার প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। প্রথম বয়সী বাসনায় ভর করে পথে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চায় সে। কিন্তু সামান্যক্ষণের জন্যই তার এই বিভ্রম। সংসারের পিছু টানে সে আবার ফিরে আসে খাঁচায়। প্রতীকাশ্রিত এই গল্পের এক জায়গায়, বৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখে বীরেনের মনে হয়েছে—'ওই মেয়েটি যেন ভীত পিচ্ছিল মাছ হয়ে উঠতে পারে বলেই এখন রাস্তায় নামতে চায় না।' এই ভাবনা নিঃসন্দেহে কবিতার স্বাদ-যুক্ত। আলোচ্য গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের মধ্যে বেচাকেনা, ছবি, প্রতিঘাত ও লজ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫৭৫।৬৫

উপন্যাস

দাম্পত্য প্রেম। আলবার্তো মোরাভিয়া। অনুবাদ : চিত্তরঞ্জন মাইতি। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

ইতালীয় লেখক আলবার্তো মোরাভিয়ার নাম বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। ইতিপূর্বেও তাঁর দু-একটি উপন্যাস ও গল্প বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর 'কনজুগ্যাল লাভ' নামক বহুখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ।

উপন্যাসের নায়ক সিলভিও একজন লেখক। স্ত্রী লীডাকে সে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে ভালোবেসেছিল। তার ইচ্ছে ছিল, নিজেদের দাম্পত্য- সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একটা বড়ো গল্প কিংবা ছোট উপন্যাস লিখবে। লেখাটায় হাত দিয়ে কিছুদিনের জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে সামান্য সরে এসেছিল সে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল, লীডা একটা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক্ষৌরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সিলভিও নতুন করে যেন চিনতে পারল নিজেকে। তার লেখক সত্তাকে। দাম্পত্য, প্রেমের গল্পটি নতুন করে লিখতে চাইল সে।

চিত্তরঞ্জন মাইতির অনুবাদ প্রায় আক্ষরিক। তা সত্ত্বেও গল্পের টানটি কোথাও বাধা পায় নি। অনুবাদকর্মের পক্ষে এই কৃতিত্ব বড়ো কম নয়।

৪৬৫।৬৫

বিবিধ

ভারতের সাধারণ নির্বাচন—শ্রীসুকুমার রায়। লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস, ৩৩।৪, রাস-

দুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দেড় টাকা।

উপমহাদেশ নামে খ্যাত ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। ভোটার সংখ্যা ধরলে গণতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে ভারত প্রথম স্থানের অধিকারী। ভারতে ভোটাধিকার সার্বজনীন। ২১ বছর বয়স হলেই ভারতের নাগরিক ভোটাধিকার পেয়ে থাকেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে নাগরিকদের যে-সব মুখ্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা হলো নির্বাচন পরিচালনা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার। আলোচ্য পুস্তকে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীসুকুমার রায় ভারতের নাগরিকদের ভোটাধিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই বইখানা পড়লে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞানলাভ করা সহজ-সাধ্য হবে বলে আশা করা যেতে পারে।
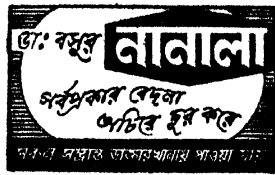
ভারতের বীর সেনানী—শ্রীসুকুমার রায়। লক্ষ্মী প্রিণ্টিং প্রেস, ৩০।৪ রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

পাকিস্তানী আক্রমণের পটভূমিতে ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা আলোচ্য পুস্তকখানির বিষয়বস্তু। ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি, বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে গ্রন্থকার কিশোর বয়স্কদের উপযোগী করে এই পুস্তকখানি রচনা করেছেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় জওয়ানরা যে পৃথিবীর অন্যান্য সৈন্যদের সমকক্ষ, এই বইখানা পড়লে তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। কাশ্মীর লাহোর প্রভৃতি রণাঙ্গণে বীর জওয়ানদের প্যাটন ট্যাঙ্ক এবং সেবার জেট ধ্বংসের রোমাঞ্চকর কাহিনী এই পুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় জওয়ান শহীদদের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র, বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং রণাঙ্গণে ও যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রাদির ছবি সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে বইখানি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। ভারতের জাতীয় স্বার্থে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার নিঃসন্দেহে একান্ত কাম্য।

৩৩০।৬৬

পত্রিকা

সাপ্তাহিক বসুমতী। সম্পাদনা: জয়ন্তী সেন। বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড—১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাখানিতে উত্তরোত্তর উন্নতির লক্ষণ পরিস্ফুট। উপন্যাস ও গল্প লেখকের তালিকায় আছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল রায়, পরিমল গোস্বামী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, লীলা মজুমদার, প্রভাত দেবসরকার প্রভৃতি। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, বিষ্ণু দে, দীনেশ দাস, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। স্মৃতিচারণ পর্যায়ে নলিনীকান্ত সরকার, সন্তোষ বোস, শান্তা দেবী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, মন্মথ রায়, পঙ্কজ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি) ও অনন্ত সিংহের রচনা সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ। এ ছাড়া আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ রচনা।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত রাম বসুর কাব্য গ্রন্থ 'অন্তরালে প্রতিমা' মুদ্রণ প্রমাদবশত 'অন্তরালে প্রতিক্ষা' ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

আরামের
জন্যে
তৈরী...
শৌখীনতার
জন্যে
সৃষ্টি
শ্রীনিবাস
আর
শ্রী মধুসূদন
“ওরলন” দিয়ে তৈরী
শ্রীনিবাসের শাড়িগুলি চাইবেন।
শ্রী

খেলার মাঠে

ব্যাডমিণ্টনের তিনটি বড় প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেল। প্রথমে বোম্বাইতে পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ, পরে লখনৌয়ে উত্তর ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ, সম্প্রতি দিল্লিতে নেহরু স্মৃতি ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা পড়েছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী এবং ইন্দোনেশিয়ার অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় তিনটি প্রতিযোগিতাতেই অংশ নিয়েছেন। যদিও বহিরাগত খেলোয়াড়দের মধ্যে নাম-করা মহিলা খেলোয়াড়দেরই সংখ্যাধিক্য।

মহিলাদের মধ্যে আমেরিকার মিসেস জুডি হ্যাসম্যান ব্যাডমিণ্টনে এখন বিশ্বশ্রেষ্ঠা। ৯ বার তাঁর অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়মুকুট লাভ। ইংলণ্ডের এঞ্জেলা বেইরস্টো এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন। এ ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর মিস লঙ্ক, ডেনমার্কের মিস উল্লা স্ট্রাণ্ড ও মিসেস কারিন জোরগেনসন, হল্যাণ্ডের মিস রেটেভেল্ড—সবাই বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারিণী। পুরুষদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কৃতী খেলোয়াড় ওয়াং পেক সেন ও লিং টিং পিঙ্গ, ডেনমার্কের স্বেন অ্যান্ডারসন ও পরে ওয়ালসো, ইংলণ্ডের রজার মিলস প্রভৃতিও এক একজন ব্যাডমিণ্টনের সুন্দর শিল্পী। এদের সঙ্গে ভারতের নাম-করা খেলোয়াড়দের কথাও উল্লেখযোগ্য: দীনেশ খান্না, সুরেশ গোয়েল, দীপু ঘোষ, সতীশ ভাটিয়া প্রভৃতি বিশ্বশ্রেষ্ঠদের প্রায় সমকক্ষ। সুতরাং তিনটি বড় প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিণ্টনের এত তারকা-সমাগম ভারতের ব্যাডমিণ্টন ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অবশ্য গত বছর এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ এবং নেহরু স্মৃতি প্রতিযোগিতার খেলাকে কেন্দ্র করেও উৎসাহ-উদ্দীপনা কম ছিল না বাইরের বহু খেলোয়াড়ও ভারতে খেলতে এসেছিলেন।

যাই হোক, এ বছরের বড় খবর, গতবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন এবং নেহরু প্রতিযোগিতার বিজয়ী দীনেশ খান্নার নেহরু প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ডেনমার্কের খেলোয়াড় স্বেন অ্যান্ডারসনের কাছে পরাজয়। পশ্চিম ভারত চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে দীনেশ খান্না স্ট্রেট গেমেই ওয়াং পেককে পরাজিত করেছিলেন। উত্তর ভারত চ্যাম্পিয়নশিপে খান্না যোগদান করেননি। নেহরু ব্যাডমিণ্টনের সেমি-ফাইন্যালে তাঁকে স্বেন অ্যান্ডারসনের কাছে স্ট্রেট গেমে হার স্বীকার করতে হয়েছে। গত বছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনে খান্নাকে শুধু মালয়েশিয়ার তান আইক হাউং-এর কাছেই হার স্বীকার করতে হয়েছে। অবশ্য জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও তিনি দীপু ঘোষের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। কিন্তু অদ্ভুত স্ট্যামিনা এবং অপূর্ব প্রতিরোধ-ক্ষমতার গুণে পরাজিত করেছেন পৃথিবীর বহু কৃতী খেলোয়াড়কে। স্বেন এণ্ডারসনের কাছে তাঁর এই পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তবে এই পরাজয় খান্নার জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। বুদ্ধির লড়াইয়ে খান্না হেরে গিয়েছেন। অ্যান্ডারসন খান্নার দুর্বল দিক অর্থাৎ বাঁ দিকেই ড্রাইভ, লব এবং প্লেস করেছেন বেশী। সুযোগ বুঝে ডান দিকে 'সাটল' মেরে পয়েণ্ট পেয়েছেন। সূচনায় ১—৬ পয়েণ্টে পিছিয়ে পড়েও অ্যান্ডারসনের স্ট্রেট সেটে জয় তাঁর বুদ্ধিপ্রযুক্ত ক্রীড়াশৈলীর পুরস্কার।

তিনটি প্রতিযোগিতার মধ্যে দীনেশ খান্নার পশ্চিম ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কথা আগেই বলেছি। উত্তর ভারতের এবং নেহরু স্মৃতি প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার ৩ নম্বর খেলোয়াড় ওয়াং পেক সেন। তিনটি প্রতিযোগিতায়
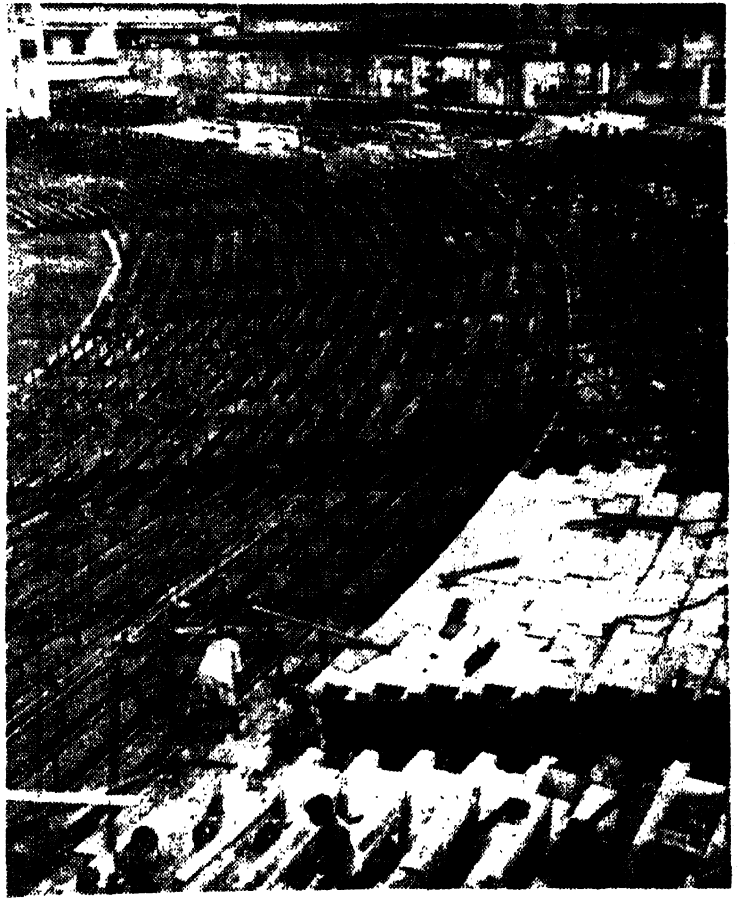
ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট মাঠের নব কলেবর। দর্শক গ্যালারীর কাঠামো এবং দর্শক আসন নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে।

[illegible] চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান [illegible] মহিলার। ইংল্যাণ্ডের মিস্ এঞ্জেলা বেইরস্টো পেয়েছেন পশ্চিম ভারতে [illegible]র সম্মান ফাইন্যালে হল্যাণ্ডের মিস [illegible]কে পরাজিত করে। আমেরিকার মিসেস জুডি হ্যাসম্যান ফাইন্যালে এঞ্জেলা বেইরস্টোকে হারিয়ে পেয়েছেন উত্তর ভারতের চ্যাম্পিয়নশিপ। মিস বর্টউডকে ফাইন্যালে হারিয়ে পশ্চিম জার্মানীর মিস ইমরে লজ নিয়েছেন নেহর্ স্মৃতি প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান। এ'দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের নাম-করা মহিলা খেলোয়াড়রা—যথা, মীনা শাহ, অচলা কার্নিক, শোভা মূর্তি, সরোজিনী আপ্তে, সুনীলা আপ্তে প্রভৃতি মোটেই সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি।

*

১৫ দিন বিশ্রাম নেবার পর খেলাধূলার জন্য কলকাতা ময়দান মুক্ত হলেও এখনো মাঠে প্রাণের সাড়া জাগেনি। ক্রিকেটের জন্য এখন মাঠে ডলাইমলাই চলছে। ফুটবলের জন্য মাঠের সর্বত্র ক্ষতর চিহ্ন। সেই ক্ষতচিহ্নে প্রলেপ লাগিয়ে পীচকে ডলাইমলাই করে মসৃণ করে তুলতে আরও কিছু সময় লাগবে।

এদিকে ভারতের আকাশে বাতাসে ক্রিকেটের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। হায়দরাবাদে মইনদ্দৌলা কাপের খেলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। রনজি প্রতিযোগিতার খেলাও আরম্ভ হয়েছে নানা রাজ্যে। আঞ্চলিক ক্রিকেট অর্থাৎ দলীপ ট্রফির খেলাও আরম্ভ হল। তারপর বিশ্ব ক্রিকেটের অজেয় যোদ্ধা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সফরেরও বেশী সময় বাকি নেই। নবেম্বরের ২৭ তারিখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বোম্বাই পৌঁছবার কথা, যদিও কলকাতার ইডেন উদ্যানে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভের তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর।

গত দুই তিন মরসুমের নৈপুণ্যের [illegible] এবং এই [illegible] কৃতিত্বের ভিত্তিতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট দল গঠিত হবে এটা ধরে নেওয়া যায়। এবং রনজি ট্রফির খেলা, মইনদ্দৌলা প্রতিযোগিতা ও দলীপ ট্রফির খেলাই যে খেলোয়াড়দের এ বছরের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি এ কথাও সত্য। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ কোথায়? পূর্বাঞ্চল বলতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম। কোন জায়গাতেই ক্রিকেট আরম্ভ হয়নি। অথচ অক্টোবরের ২১ তারিখ থেকে দিল্লিতে পূর্বাঞ্চল দলকে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দলীপ ট্রফির খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে। চোখের নিরিখ ক্রিকেট খেলায় সাফল্যের এক প্রধান উপাদান। অনুশীলন ছাড়া এই নিরিখ আসে না। যাঁরা সারা মরসুম নিয়মিত অনুশীলন করে থাকেন তাঁদের ইনিংসের সূচনায় নিরিখ ঠিক করতে সময় লাগে। সুতরাং অনুশীলনের অভাবে পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়রা আঞ্চলিক ক্রিকেটে কতখানি সাফল্য অর্জন করবেন, বলা শক্ত।

অবশ্য বাংলার কয়েকজন উঠতি খেলোয়াড়, দেব মুখার্জি, অম্বর রায়, এস এস মিত্র মইনদ্দৌলা প্রতিযোগিতায় হায়দরাবাদ ব্লুজ দলের পক্ষে খেলার সুযোগ করে নিয়ে কিছু কিছু অনুশীলন করেছেন। ইণ্ডিয়ান স্টারলেটস দলের বিরুদ্ধে দেব মুখার্জি'র ৮২ রান লাভও উল্লেখের দাবি রাখে। কিন্তু আর কোন খেলোয়াড়ের কোন কৃতিত্বের খবর এখনো কানে আসেনি। অপর দিকে, অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই মইনদ্দৌলা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের নজির রেখেছেন। যেমন রমেশ সাকসেনার ১৪৫ রান, দলজিৎ সিং-এর ৯৯, জ্ঞানেশ্বরের নট আউট ১৩৫, দিলীপ সারদেশাইয়ের ১৯৫, মনজরেকারের ১৩৮ এবং পাতৌদির নবাব মনসুর আলীর ১১৬।

শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ পাবার জন্যই দুর্দিষ্ট-প্রধান পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের খেলার এবং অনুশীলনের অসুবিধার কথা বলছি না। টেস্ট দলে পূর্বাঞ্চলের কোন খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনাও কম। দলীপ ট্রফি এবং রনজি ট্রফির খেলাতেও পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের যোগ দিতে হচ্ছে অনুশীলন না করে। পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থাই এর জন্য বেশী দায়ী। এবং এই-জন্যই সম্ভবত ভারতীয় ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের সাফল্যের নজিরও সীমায়িত।

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আসন্ন টেস্ট খেলার প্রস্তুতির জন্য এখন ইডেন উদ্যানে অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা। পুরনো গ্যালারী ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়েছে। টিউব স্ট্রাকচারের উপর বসান হচ্ছে নতুন গ্যালারী।

টেস্ট খেলার নামেই কলকাতা পাগল হয়ে ওঠে। এবার টেস্ট খেলা বিশ্ব ক্রিকেটে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে। সুতরাং টিকিটের জন্য ইতিমধ্যেই দরবার শুরু হয়ে গেছে। যদিও দর্শক-আসন বাড়ছে হাজার দশের মত, কিন্তু টিকিটের চাহিদার তুলনায় সে আসন সমুদ্রে শিশির সম।

কিভাবে টিকিট বিক্রি করা হবে, জানি না। একজন প্রস্তাব দিয়েছেন অকশানে টিকিট বিক্রয় করতে। কলকাতার ইমপ্রুভ-মেন্ট ট্রাস্ট যেমন অকশানে জমি বিক্রি করে থাকেন। সি এ বি-র কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। যদিও এটা 'লিগালাইজড ব্ল্যাক মার্কেটিং' তবু [illegible]ক মার্কেটিং-এর চেয়ে ভাল। আর [illegible] নতুন গ্যালারী নির্মাণের ব্যয়ের সমস্ত টাকাটাই উঠে আসবে এ সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ।

তবে একটা আশঙ্কারও কারণ আছে। সব টিকিট অকশানে বিক্রি করতে গেলে হয়তো উপযুক্ত দাম পাওয়া যাবে না। মাল চেপে রেখে কৃত্রিম অনটন সৃষ্টি করাই নাকি ব্যবসায়ী বুদ্ধির পরিচয়।

রসিকতা থাক। একটা বিবেচনাযোগ্য প্রস্তাব পেশ করছি। ক্লাব কোটা মিটিয়ে দেবার পর যে টিকিট উদ্বৃত্ত থাকবে সেটা আবেদনকারীদের মধ্যে লটারি প্রথায় বিলি করার কথা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। প্রয়োজন বোধ করলে টিকিটের মূল্যের পুরো টাকাটি আবেদনের সঙ্গে জমাও নিয়ে নিতে পারেন। যেসব ক্রীড়া-অনুষ্ঠানে টিকিটের চাহিদা খুব বেশী, সে-সব অনুষ্ঠানে এমন নীতিই অবলম্বন করা হয়ে থাকে। উইম্বলডন টেনিস প্রতি-যোগিতার উদ্যোক্তারাও আবেদনের সঙ্গে টাকা জমা নিয়ে থাকেন। টিকিট-বঞ্চিত-দের পরে টাকা ফিরিয়ে দেন। ফলে, অন্যায়, অবিচার এবং পক্ষপাতের প্রশ্ন ওঠে না, ব্ল্যাক মারকেটিং-এর বাজারেও ফলাও কারবার চলে না।

একলব্য

ক্রীড়াপদ্ধতির পরিমার্জনে এবং ক্রীড়াশৈলীর সৌকর্যে আপ্পারাও যেমন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে গণ্য, তেমন খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয়ে চিরদিনই ছিলেন মাঠের শান্ত সৌন্দর্য। তাই বোধ করি 'গ্রেট' কথাটি দক্ষিণ ভারতীয় এই খর্বকায় খেলোয়াড়টির নামের আগের যোগ্য বিশেষণ।

আপ্পারাও ও ভেঙ্কটেশ

অতীত দিনের দিকপাল গ্রেট আপ্পারাও

আফজল, খন্দরাজ, আপ্পারাও ও নাইম

ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন

ওয়েন্ডেল মটলে

উনিশ শো চৌষট্টির টোকিও অলিম্পিকে যাঁরা অ্যাথলেটিকসে সোনার মেডেল পেয়ে অমর হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই এখন অবসর-জীবন। অর্থাৎ অ্যাথলেটিকস থেকে অবসর নিয়েছেন। অনেকের দৃষ্টি মেক্সিকোর দিকে। আবার সোনার মেডেল গলায় পরার আশা। পেলে ভাল, না পেলেও বা ক্ষতি কি? কিন্তু টোকিওতে যাঁরা সোনার মেডেল পেতে পেতেও একটুর জন্য রূপোর বা ব্রোঞ্জের মেডেল পেয়েছেন তাঁদের সোনার আকাঙ্ক্ষা অনেক বেড়ে যাবারই কথা। সুতরাং টোকিওতে ৪০০ মিটার দৌড়ের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ত্রিনিদাদের দৌড়বীর ওয়েন্ডেল মটলে 'সোনা'র পেছনে ছুটে চলেছেন উনিশ শো চৌষট্টির পর থেকে।

যদিও কিংসটনের কমনওয়েলথ গেমসে তাঁর সোনার স্বপ্ন আংশিক সফল হয়েছে, তবু পুরোপুরি সফল হয়নি। কিংসটনে কমনওয়েলথ গেমসের নতুন রেকর্ড করে মটলে ৪৪০ গজ দৌড়ের স্বর্ণপদক পেয়েছেন। কিন্তু অলিম্পিক স্বর্ণপদকের সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমসের স্বর্ণ পদকের আকাশপাতাল পার্থক্য না হলেও আসমান-জমিন ফারাক তো বটেই। তাই মটলের সাধনার শেষ নেই। আগের অনুশীলন-সূচীতে এখনও অনুশীলন।

সোমবার খুব জোরে দু'বার ৫০০ গজ দৌড়। তারপর গতিবেগ বজায় রেখে [illegible] উপর দিয়ে [illegible]। [illegible] জন্য ব্যায়াম।

[illegible] ৫ বার ৩০০ গজ দৌড়। [illegible] ৩০ মিনিট দূরত্ব অতিক্রম। [illegible] অ্যাথলীটদের সঙ্গে মিলে [illegible] গজ দৌড়। এবং [illegible] খুব জোরে ৪ বার [illegible] গজ দৌড়। শুক্রবার [illegible] দৌড় [illegible]। ছোট ছোট লাফ। একটু আধটু ব্যায়াম। শনিবার সহ-অ্যাথলীটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। রবিবার পূর্ণ বিশ্রাম। এই হচ্ছে ২৫ বছর বয়সী [illegible] অ্যাথলীট ওয়েন্ডেল মটলের [illegible] অনুশীলা-সূচী।

[illegible] মটলেকে মাঝারি পাল্লার খ্যাতনামা দৌড়বিদ বলেই জানি। কিন্তু স্বল্প পাল্লার দৌড়ে এবং হপ স্টেপ অ্যান্ড জাম্পেও যে মটলে আন্তর্জাতিক 'মানে'র অধিকারী এ কথা অনেকেই জানি না। ১০০ গজ দৌড়ে মটলের সময় ৯·৭ সেকেন্ড, ২২০

গজে সময় ২১·৬ সেকেন্ড, আর হপ স্টেপ ও জাম্পের দূরত্ব ৪৮ ফুট। বলা বাহুল্য, এই মান বজায় রাখার জন্যও তাঁকে যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। তার সঙ্গে পড়াশুনোর চর্চা তো আছেই।

পোর্ট অব স্পেনের একটি স্কুলে পড়বার সময় হপ স্টেপ ও জাম্পের প্রতিযোগী হিসাবেই মটলের প্রথম খ্যাতি। কিন্তু দৌড়ে ওর সহজাত শক্তির পরিচয় পেয়ে এবং গতির ছন্দ দেখে ওর কোচ ওকে দৌড়েই পটু হবার পরামর্শ দিলেন। ১৯৬০ সালের এই সময়েই আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে মটলের স্কলারশিপ জুটে গেল। আমেরিকার জন জেকারি ঐ সময় ফেন্সিং-এর [illegible] হয়ে জামাইকায় ছিলেন। তাঁর সুপারিশেই স্কলারশিপ। পড়াশুনোর জন্য ছাত্র হিসাবে স্কলারশিপ পেলেও অ্যাথলেটিকসের [illegible] বিশেষ গুণ হিসেবেই নির্বাচিত হয়েছিল। তারপর এক হাতে পড়ার বই এবং আর এক হাতে রানিং শু নিয়ে মটলে একই সঙ্গে লেখাপড়া ও অ্যাথলেটিকসের চর্চা করেছেন। ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছেন আর্টসের ব্যাচিলর ডিগ্রি, এই জুনে কেম্ব্রিজ থেকে মাস্টারস অব লেটার্স। অ্যাথলেটিকসে অলিম্পিকের রৌপ্যপদক, কমনওয়েলথের স্বর্ণ।

টোকিওতে ওয়েন্ডেল মটলের সাফল্য রীতিমত অপ্রত্যাশিত। যদিও ১৯৬৪-র ইনডোর অনুষ্ঠানে ওর একাধিক দৌড়ের সময় বিশ্ব রেকর্ডের সমপর্যায়ে পৌঁছেছিল, তবু আউটডোরে মোটেই অনুশীলন ছিল না। মে থেকে অলিম্পিকের মাস অক্টোবর পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারেই ব্যস্ত ছিলেন। বিয়ের জন্য ইয়েল থেকে ত্রিনিদাদে চলে এসেছিলেন। ফলে আমেরিকার খ্যাতনামা দৌড়বীরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাননি।

অবশ্য টোকিও অলিম্পিকে রূপোর মেডেল পাবার পর মটলে বলেছেন, এই অনভ্যাস এবং বিয়ের আমেজ তাঁকে হাল্কা মনে অলিম্পিক অঙ্গনে প্রতিযোগিতার সুযোগ এনে দিয়েছে। যদি শুধু অ্যাথলেটিকসের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতাম, যদি আমেরিকার নামী দৌড়বাজ-দের কথাই আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখতো তা হলে আমাকে মানসিক উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটাতে হত।

টোকিও অলিম্পিকের কিছু আগে মটলে বুঝলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুল মাস্টার মাইক ল্যারাবিই একমাত্র প্রতিযোগী যাকে পরাজিত করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই তিনি ঠিক করলেন, শুরু থেকে এমন গতিতে দৌড়তে হবে যে, ল্যারাবি পিছিয়ে পড়ে মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভোগে। ৪০০ মিটারের প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁর সময় হল ৪৫·৯ ও ৪৫·৮ সেকেন্ড। সেমি-ফাইন্যালে ৪৫·৯ সেকেন্ড। ফাইন্যালে প্রথম ২০০ মিটার দৌড়লেন ২১·৭ সেকেন্ডে। ৩৭০ মিটার পর্যন্তও মটলে সবার আগে। কিন্তু শেষ ৩০ মিটার? মটলে নিজেই বলেছেন—'আমি লক্ষ করলাম, মাইক ল্যারাবি আমাকে ধরে ফেলছে, তার প্রতি পদক্ষেপ যেন আমার চেয়ে এক ইঞ্চি বেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মাইক ল্যারাবিই প্রথম হল, আমি ৪৫·২ সেকেন্ডে দ্বিতীয় স্থান দখল করলাম।

৪০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্যপদক পাবার পর ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে ত্রিনিদাদ দলের সভ্য হিসাবে টোকিওতে একটি ব্রোঞ্জপদকও মটলের গলায় ঝুলেছে। কিন্তু অলিম্পিক থেকে সোনার মেডেল জয়ের আশা এখনো অপূর্ণ।

মটলে বলেন—"আমার জন্মভূমি ত্রিনিদাদ ক্রিকেট নিয়েই মেতে আছে। কিন্তু আমি চাই, অ্যাথলেটিকসেও ত্রিনিদাদ এগিয়ে যাক, ক্রিকেটের মতই কীর্তি অর্জন করুক।"

—অনুকূল

বাংলা ছবির আবশ্যিক প্রদর্শন

সম্প্রতি রাজ্য বিধান পরিষদে প্রচারমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার এই আশ্বাস দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক চিত্রগৃহে আবশ্যিকভাবে বাংলা ছবি যাতে দেখানো হয়, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। এবং প্রাথমিক কাজও নাকি শুরু হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই সরকারী ঘোষণা বাংলা চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক মহলে কতখানি আশার সঞ্চার করবে তা বিচার্য। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম সংকটের মূলে রয়েছে বাংলা ছবির রিলিজ চেন-এর অভাব। বাঙালীপ্রধান অঞ্চলে এমন কিছু চিত্রগৃহ আছে, যেখানে স্বচ্ছন্দে বাংলা চিত্র দেখানো যেতে পারে। আগে বাংলা ছবি সে-সব সিনেমায়ও মুক্তি পেত। আজ সেগুলি হিন্দী চিত্রের দখলে। দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতায় এর নজির আছে। এমন একাধিক চিত্রগৃহ আছে, যেখানে হিন্দী ছবি প্রদর্শনের কথা ভাবাই যায় না। অথচ দিনের পর দিন সে-সব হলে একটির পর একটি বোম্বাই অথবা মাদ্রাজের চিত্রোপহার প্রদর্শিত হচ্ছে। এদিকে, বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা ছবি তৈরি হয়ে পড়ে আছে। রিলিজ-চেন নেই।

এই দুরবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না। এমনিতেই তো বাংলা চিত্র প্রযোজনার হার নিম্নগামী। তারপর যে-সব ছবি 'তারকা'-দীপ্ত নয়, সেগুলির উপর চিত্র পরিবেশকদের কৃপা বর্ষিত হয় না। এই সংকটজনক অবস্থা যদি চলতে থাকে, তবে বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্দশামোচনের কোন সম্ভাবনা নেই। শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াসের পথও এমনিভাবেই একদিন রুদ্ধ হবে। কারণ, পরিবেশকদের দৃষ্টি 'স্টার'-এর দিকে, চিত্র প্রদর্শকদের লোভ হিন্দী ছবি অথবা হিন্দী ছবির তারকা অভিনীত বাংলা ছবির উপর। এই দুই পরিস্থিতির মাঝখানে যে-কোন সৎ প্রয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। বাংলা ছবির আবশ্যিক চিত্রপ্রদর্শন কার্যকর [illegible] ব্যবসায়িক ভাগ্যের সত্যিই পরিবর্তন ঘটবে কিনা সে-সম্পর্কে বিশ্লেষণের অবকাশ আছে। কিছু লোকালয় বাংলা চিত্র প্রদর্শনের পক্ষে অনুকূল নয়। সুতরাং এই প্রস্তাব চিত্র প্রযোজকদের যে খুব উৎফুল্ল করবে তা মনে হয় না।

তাই সরকারকে শুধু বাংলা চিত্রের আবশিক প্রদর্শনীর কথা ভাবলেই চলবে না। আনুষঙ্গিক আরও কিছু সমস্যা আছে, যার উপর সরকারের অনুসন্ধানী দৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাংলা রিলিজ চেন যাতে হিন্দী ছবির কুক্ষিগত না হয় সে-বিষয়ে সরকারের কিছু করণীয় আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। প্রচার-মন্ত্রী আরও বলেছেন, হিন্দী বা অন্যান্য ভাষার ফিল্ম এ রাজ্যে তৈরি হোক, সেটা সরকারের কাম্য। এই ধরনের প্রচেষ্টার একটা অনুকূল দিক নিশ্চয়ই আছে। এর ফলে এখানকার কলাকুশলীরাও লাভবান হন। সারা ভারতে ও বাইরে ব্যবসা করে ঘরেও বেশ কিছু পয়সা নিয়ে আসা যায়। কিন্তু এর পর যদি একাধিক বোম্বাই স্টার নিয়ে শুধু হিন্দী ছবি তৈরি করাই প্রযোজকের লক্ষ্য হয় এবং একজনের সাফল্যে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়ে ওই পথেই চলতে থাকেন, তবে ফল খুব শুভ হবে বলা চলে না। হিন্দী চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছবি তৈরির আগ্রহ বর্জন করা উচিত নয়। আসল কথা, বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রগতির পথটি অনেকটা ক্ষুরস্য ধারার মত। তাই সর্ব বিষয়েই সজাগ দৃষ্টি ও সতর্কতার প্রয়োজন।

মানিক প্রোডাকশন্স-এর "দিনরাত্রির কাব্য" (পরিচালনা : নারায়ণ চক্রবর্তী ও [illegible]) [illegible]

অগ্রগামী পরিচালিত "শঙ্খবেলা" ছবিতে উত্তমকুমার, বাপী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়
—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে —ফটো-দেশ

চিত্র-সমালোচনা

গল্প হলেও সত্যি

"গল্প হলেও সত্যি" (নিউ থিয়েটার্স এক্জিবিটার্স) পুরোপুরি কমেডি বা ফ্যান্টাসি ছবি নয়। বরঞ্চ বলা যায়, কমেডির রীতিতে এবং ফ্যান্টাসির রূপকে সযত্নে বিন্যস্ত একটি বাস্তব চিত্র। ছবির নামকরণেও অবশ্য তা বেশ স্পষ্টই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং ছবির গল্প, কমেডি বা রূপক যে এহ বাহ্য, আগে কহ তব্য বাস্তবকথন ও পরে শ্রেয়ধর্ম তাও ছবির নামেই পরিষ্কার।

গল্পের আছিলায় পরিচালক তপন সিংহ (গল্পকার হিসাবে তাঁর এই প্রথম আত্ম-প্রকাশ) একালের নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে যেন উঁকি মেরেছেন। উঁকি দিয়ে সবটুকু দেখা যায় না। তাই বাস্তবের ফাঁকটুকু ভরে তোলবার জন্য কল্পনা তথা কাহিনীর উপাদানের প্রয়োজন হয়েছে। ছবির শুরুতে একান্নবর্তী পরিবারের চিত্রটি সুন্দরভাবে আঁকা। কেউ কারো সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না, সবাই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। সুখের সংসার তো দূরের কথা, যেন অশান্তির অগ্নিকুণ্ড। পরিচালকের বাহাদুরি এই, একটি মাত্র সেটে একটি বা দুটি আঁচড়ে তিনি বাস্তবকে ফোটাতে পেরেছেন। এবং অনেকগুলি চরিত্র নিয়ে পরিচালকের গল্প-গঠন-রীতির কাজ খুবই সুন্দর।

তা ছাড়া, [illegible] সকলকে [illegible]

করে পরিচালক তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার অবকাশে বেশ রঙ্গের সৃষ্টি করেছেন। কমেডির ধরনটা স্ল্যাপস্টিক, কৌতুকের উপকরণ কখনও বা পৌনঃপুনিকতায় দুষ্ট (যেমন উঠোনে আছাড় খাওয়ার ঘটনা তিনবার, বাবুদের হাঁটুর উপর কাপড় উঠে যাওয়া নিয়ে বাড়ির যুবতী ঝিয়ের বক্রোক্তি দুবার ইত্যাদি)। এ-সত্ত্বেও, রঙ্গকৌতুকের অংশ খুবই উপভোগ্য। প্রেক্ষাগৃহে হাসির ধুম পড়ে যায়। তা-ছাড়া, সরস ব্যঙ্গাত্মক ও রসাল কথাও ছবিতে আছে। সমসাময়িক কালের উন্নাসিকতা ও বুদ্ধিভ্রান্তি নিয়েও শাণিত শ্লেষ রয়েছে। এমন কি পরিচালকের ব্যঙ্গ-বাণ "ফিল্ম কালচার"-এর পৃষ্ঠপোষক এবং "তারকা"-মোহগ্রস্তদের প্রতিও নিক্ষিপ্ত।

ছবির উপভোগ্যতা বাড়ে দেবদূত স্বরূপ কাল্পনিক গৃহভৃত্যের আগমনের পর। কল্পতরুর মত তার আবির্ভাব (ভোর-বেলায় কুয়াশার মধ্যে তার আগমনের দৃশ্যটি সুকল্পিত)। সকলের সব অভাব মিটিয়ে দিয়ে এবং সংসারে শান্তি ফিরিয়ে এনে সে ভোরের কুয়াশাতেই আবার মিলিয়ে যায়। ওই মুহূর্তে পরিচালক নাটকীয় আবেগের প্রলোভন জয় করতে পারেন নি, এই ছবির সঙ্গে যার অসম যোগ। তবে শ্রী সিংহর বিশিষ্ট চিত্ররীতির অনেক লক্ষণই এই ছবিতে বিদ্যমান, যা দর্শকের আনন্দ বর্ধন করে। সামগ্রিক প্রয়োগের দিক থেকেও ছবিটি পরিচালকের সুনাম ক্ষুণ্ণ করবে না। কমেডির প্রয়োজনে তিনি "ফাস্ট মোশান শট" কিছু ব্যবহার করেছেন। এ-ব্যাপারে তাঁকে প্রশংসনীয়ভাবে সাহায্য করেছেন ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়। তবে রহস্যময় চাকর সব সমস্যা দূর করে দিয়ে যাওয়ার পর প্রশ্ন জাগে : সংসারের শান্তির চাবিকাঠি কি হেঁসেলেই লুকনো থাকে? বাড়ির চাকর সকলের চাহিদা মেটালেই কি একের সঙ্গে অপরের অ্যাডজাস্টমেন্ট-এর পথ প্রশস্ত হয়? পরিচালক-কাহিনীকার অবশ্য একান্নবর্তী পরিবারের গভীর জট বা জটিলতার দিকে যান নি। অতএব, যে [illegible] পরিচালক দেখিয়েছেন তা মেটা[illegible] [illegible] বাড়ির চাকরই যথেষ্ট। এবং ফ্যান্টাসির খাতিরে তো বটেই। আসল
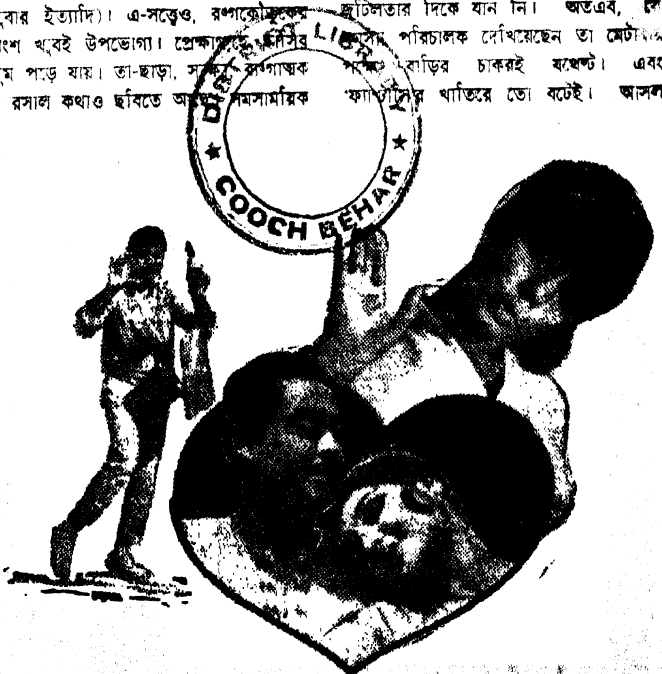
শ্রীধর পরিচালিত "প্যার কিয়ে যা" হিন্দীচিত্রে মমতাজ, মেহমুদ, কিশোরকুমার ও কল্পনা

কথা, ছবির নামের ইঙ্গিত বিস্মৃত হয়ে ছবিটিকে নেহাত কমেডি হিসাবে ধরে নিলে দর্শকের আমোদ প্রাপ্তিযোগ "গল্প হলেও সত্যি"তে ষোলকলায় পূর্ণ।

প্রধান শিল্পীরা ছবিটিকে খুবই সুখভোগ্য করে তুলেছেন। এ'দের মধ্যে রবি ঘোষ (চাকর), প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, বঙ্কিম ঘোষ, ভারতী দেবী ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ'দের অতি স্বাভাবিক অভিনয় এবং রঙ্গ-সৃষ্টির ক্ষমতা মুগ্ধ করে। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, অজয় গাঙ্গুলী জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পার্শ্বচরিত্রে, অল্প অবকাশে, অরুণ রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, নির্মল ঘোষ ও ভানু ঘোষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ যোগেশ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে পরিচালক যে-ভাবে অভিনয় করিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। এই বৃদ্ধের জন্য ছবিটি যেন আরও বেশী ভাল লাগে।

সংগীতের ব্যবহার অপরিমিত। এফেক্ট মিউজিক-এর প্রয়োগ ভাল। এতে কৌতুকের মেজাজ আছে। শঙ্করাচার্যের স্তোত্রের সুরারোপ প্রশংসার যোগ্য।

এমকেজির "উত্তরপুরুষ" চিত্রে অনুপকুমার, রবি ঘোষ ও সন্ধ্যা রায়

সিনেমাটোগ্রাফ একজিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশন

কলকাতায় যাঁরা নিয়মিত বিদেশী চিত্র দেখিয়ে থাকেন সেই সব চিত্রপ্রদর্শকদের নানা অসুবিধা দূর করা এবং সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বহুকাল আগে সিনেমাটোগ্রাফ একজিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা স্থাপন করা হয়েছিল। সম্প্রতি চিত্রপ্রদর্শকরা এই সংস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভব করেছেন। এবং অ্যাসোসিয়েশনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে মেট্রো সিনেমার শ্রী আই এ হাফেসজী এই তথ্য ব্যক্ত করেন। সংস্থার সভাপতি হয়েছেন শ্রীহাফেসজী, কর্মসচিবের পদে রয়েছেন হুমায়ুন থিয়েটার্স-এর শ্রী এম জে সার্কিস।

তাঁরা উভয়েই সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেন, 'ই-আই-এম-পি-এ'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা বা অসহযোগিতা করা এই সংস্থার উদ্দেশ্য নয়।' ইংরেজী ছবির সিনেমার সমস্যা আলাদা। সমাধানেরও পথও ভিন্ন।

সংস্থার বর্তমান কর্মসূচীতে তিনটি বিষয় প্রধান। (১) পুলিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে সিনেমা টিকিটের কালোবাজার বন্ধ করার সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবন, (২) দিনে চারটি শো প্রবর্তনের যৌক্তিকতা এবং (৩) কিছু পরিমাণে আমোদ-কর হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা।

ছবির পর ছবি

স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করছেন, "বিবাহ বিভ্রাট" (স্বপ্না ফিল্মস)। প্রধান শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, কমল মিত্র, অপর্ণা দেবী ও অজয় গাঙ্গুলী। শ্যামল মিত্র সংগীত পরিচালক।

বিবাহ-বিভ্রাট

নির্মল মিত্র অনেক দিন পর একখানি বাংলা ছবি পরিচালনা করছেন। নাম "প্রথম বসন্ত" (ছায়ারূপা সংস্থা)। প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য পরিচালক শ্রীমিত্র নিজেই রচনা করেছেন। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করবেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, অঞ্জনা ভৌমিক, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকার।

প্রথম বসন্ত

নতুন একটি বাংলা ছবির নাম "পিপাসা" (আনন্দ্য চিত্রম)। মহালয়ার দিন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। দেবনারায়ণ গুপ্তর চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রশান্ত সরকার। অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনুপকুমার ও [illegible]

রেকর্ড-সমালোচনা

পুজোর গান

হিন্দুস্থান রেকর্ড

হিন্দুস্থান পুজো রেকর্ডের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এবারেও অটুট। রবীন্দ্রসংগীত, কীর্তন, ভক্তিগীতি, পল্লীসংগীত, ছড়ার গান, শ্যামাসংগীত দেশাত্মবোধক গান, বাউল, আধুনিক গান, ব্যঙ্গগীতি, যন্ত্র-সংগীত প্রভৃতি সবই এ বছরের হিন্দুস্থান পুজোর রেকর্ডে আছে। রাজেশ্বরী দত্তের রবীন্দ্রসংগীত (কোথা যে উধাও হল ও এসো শরতের অমল মহিমা), রাধারানী দেবীর কীর্তন (চাঁদ মুখে দিয়া বেণু ও যশোমতী মা আমার), অমর পালের প্রভাতী সংগীত ও ভক্তিমূলক পল্লীগীতি (ভজ গৌরাঙ্গ ও শোন বলি পাগলের কথা) এবং পূর্ণ দাসের বাউল গান (গোলেমালে পীরিতি করো না ও সখি যমুনার জলে আনতে গিয়ে) পুজো রেকর্ডের বড় আকর্ষণ। জনপ্রিয় শিল্পীরা নিজস্ব ঢঙে ও মেজাজে গানগুলি গেয়েছেন। শ্রীমতী দত্তর রবীন্দ্রসংগীতে আমরা সুরের মাধুর্য পুরোপুরি পাই, কথার রসাস্বাদনের সুযোগ অবশ্য বিশেষ ঘটে না। পূর্ণ দাসের উচ্চারণ যেন একটু বেশী মার্জিত। অমর পালের দুটি গানই বিশেষ প্রশংসনীয়। শিল্পীর কোন 'ম্যানারিজম' নেই বলেই তাঁর মুখে ভক্তিমূলক পল্লীগীতি এত ভাল লাগে। গানগুলি শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দেবে।

এর পর উল্লেখ্য অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের শ্যামাসংগীত (সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীতপরিচালনায়)। তাঁর গানে ভাবের স্পর্শ মেলে। রামপ্রসাদের গানটি বেশী ভাল লেগেছে। দিলীপ সরকার, সুকুমার মিত্র, ও উৎপলা মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান আরও ভাল হতে পারত।

শ্রীসরকারের "রাতের আঁধারে কেন" (শ্যামলেশ ঘোষ কর্তৃক সুরচিত), শ্রীমিত্রর "বোঝ না কি" (সুর ও কথা সুধীন দাশগুপ্ত) এবং শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের "আহা এই সন্ধ্যায়" (কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর : দুলীচাঁদ বড়াল) গান তিনটি একেবারে মন্দ নয়। কোন কোন গানের কৃত্রিম কথা অবশ্য কানে ঠেকে। দীপেন মুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাঁর দুটি ব্যঙ্গগীতিতে (কৃষ্ণ মোর গুরু ও ঘোর কলি, কি লজ্জা) ব্যঙ্গ ও রঙ্গরস দুই-ই আছে। তার চেয়েও বড় কথা শিল্পী গাইতে জানেন।

সুপরিচিতা গায়িকা জপমালা ঘোষ এবার পল্লী সংগীত শুনিয়েছেন (নির্মলেন্দু চৌধুরীর সুরে "রাধে গো, তোর [illegible] জ্বালা" ও "খঞ্জন কান্দে")। [illegible] দুটি

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত "ছুটি"-তে মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও নন্দিনী

সুখশ্রাব্য। শ্রীমতী ঘোষের ভিন্নমুখী ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। বিদ্যুৎ বসু গীটার বাজান ভাল। কিন্তু তিনি পশ্চিমী সুর বেছে নিলেন কেন?

অভিনেত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাসের আধুনিক গান কিন্তু সংগীতরসপিপাসুদের সম্পূর্ণ নিরাশ করবে না। অপেক্ষাকৃত নতুন শিল্পীদের দিয়েও গান গাওয়ানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বাসন্তী ঘোষালের "মধুবনে আজ ওগো" (সুর : মোহনলাল) নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় হবে। অপর গানের (পেয়েছি তোমার লেখা) কথা ও সুর বাজে। অরুণকুমারের আধুনিক গান এবং সহ-শিল্পীদের সঙ্গে দেশাত্মবোধক সংগীত (হিমাংশু বিশ্বাসের পরিচালনায়), এবং বীরেন দাসের ছড়াগান (সুর : তমাল মুখোপাধ্যায়) একরকম। কবিশেখর কালিদাস রায়ের "যাত্রাকালে পড়লো একটা হাঁচি" ছড়া গানটি শিশুদের ভাল লাগবে। মঞ্জুশ্রী বসু, মঞ্জু বসু ও নবগোপাল দাসের আরও অনুশীলনের প্রয়োজন। ওঁদের মধ্যে মঞ্জু ও মঞ্জুশ্রী গান ভালই গেয়েছেন।

কলিঙ্গ রেকর্ড

কলিঙ্গ গ্রামোফোন কোম্পানী ইতিপূর্বে দুটি রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড বের করেছিলেন। রেবা ঘোষ (দাঁড়াও আমার আঁখির ও আমি হৃদয়েতে) ও সুকান্তি হাজরার (ওকে ধরিলে তো ধরা ও জাগরণে যায় বিভাবরী) কণ্ঠে। গানগুলি রসিকজনের প্রশংসা পেয়েছিল। পুজো উপলক্ষে এই চারটি গানের সঙ্গে কোম্পানি আরও কিছু গান উপহার দিয়েছেন। শিল্পীরা নবাগত। নতুন প্রতিভার সঙ্গে [illegible]

প্রশংসনীয়। এঁদের মধ্যে জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়ের 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' (ছড়াগান), শম্ভু চৌধুরীর শ্যামা সংগীত (এবার আমায় বলে দে ও রাঙা পায়ে রাঙা জবা), এবং শকুন্তলা বড়ুয়া (ভেবেছিনু আমি মালাখানি নিয়ে ও তোমার পাশে যেমন আছি), মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (মায়াভরা কাজল আঁখি ও [illegible] রে ফাগুন) ও শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের (এখানে পিয়ালের ও নীল [illegible]) আধুনিক গান শুনে মনে হল, শিল্পীরা অচিরেই জনপ্রিয় হতে পারবেন। গীতিকবি (ভবেশ সরকার, নির্মল দাস, অমল গুহঠাকুরতা গোপাল সিংহ, অহিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়) ও সুরকারদের (নিতাই ভাস্কর) মধ্যে নতুন নাম দেখলাম। নিষ্ঠার সঙ্গেই তাঁরা দায়িত্ব সমাধা করতে এবং নতুন কিছু দিতে চেয়েছেন। একাধিক গানের সুর দিয়েছেন সমর গুপ্ত। সুরারোপ বেশ ভাল। তবে 'এখানে পিয়ালের ছায়াঘেরা কুঞ্জে, বিদেশী সুরের প্রভাব না থাকলে সুখী হতাম। ইলেকট্রিক গীটারে নির্মল দাশগুপ্ত (রবীন্দ্র সংগীতের সুর) এবং দেবাশীষ হোড়ের (হিন্দী সিনেমার গানের সুর) বাজনা উপভোগ্য। নির্মল ঘোষের ব্যঙ্গগীতি (ও দুর্গা মা তোকে ও গুল ভেবোনাকো) মোটামুটি। সন্তোষ বাকুলীর কৌতুক-নক্সার প্রশংসা করতে পারলাম না। পরলোকগত শিল্পীর কণ্ঠস্বর ও কথা বলার ঢঙ নকল করার মধ্যে কৌতুকের মৌলিকত্ব কোথায়?

দক্ষিণ পরিষদের নিয়মিত নাটকাভিনয়

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা দক্ষিণ পরিষদ আগামী ৪ নভেম্বর থেকে রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে নিয়মিত নাটক অভিনয় করছেন। তাঁরা মঞ্চস্থ করবেন মুকুন্দরাজ আনন্দের "দুটি পাতা একটি কুঁড়ি"। রঞ্জিত মিত্রর এই নাট্যরূপে মঞ্চে পরিচালনা করবেন সুব্রত সেন। গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুশীল শীল এই সংবাদ ঘোষণা করে বলেন, আঙ্গিক ও দলগত অভিনয়ের গুণে "দুটি পাতা একটি কুঁড়ি" ইতিপূর্বে নাট্যরসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। দক্ষিণ পরিষদ কর্তৃক নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের এই পরিকল্পনাকে শৌখিন নাট্যজগতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে তিনি বর্ণনা করেন। সংস্থার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি সরোজকুমার সেনগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনে এক বিবৃতি পাঠ করেন। তাতে তিনি বলেন, ইতিপূর্বে 'যোগাযোগ', 'ঘরে-বাইরে', 'পুনর্জন্ম', 'ইঙ্গিত', 'শেষ দৃশ্য', 'গৃহপ্রবেশ', 'টিপু সুলতান' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করে দক্ষিণ পরিষদ প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।

"দুটি পাতা একটি কুঁড়ি"-র বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন সুব্রত সেন, জিতেন গুহঠাকুরতা, সত্যেন গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় দাস, বিমান চৌধুরী, সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা দাস, লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর "ললিতা"

নবগঠিত অপেশাদার নাট্য সংস্থা থিয়েটার ওয়ার্কশপ তাঁদের প্রথম প্রযোজনা "ললিতা" মঞ্চস্থ করবেন মুক্তঅঙ্গনে আগামী ১লা নভেম্বর। নাটকটি বিশ্বসাহিত্যের একটি খ্যাতনামা সাহিত্যকর্ম অনুসরণে রচিত এবং আমাদের দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যার পটভূমিকায় রূপান্তরিত।

অতসী

পুজোয় যে তিনখানি নাটক মরমী সাংস্কৃতিক সংস্থা উপহার দেবেন, তার মধ্যে একটি হল শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারীর উপন্যাস "অতসী" অবলম্বনে মণি দত্ত কৃত নাট্যরূপ। নাটকটি পরিচালনা করছেন শ্রীদত্ত নিজেই।

উৎসবের আর তিনখানি নাটক হ'ল বসন্ত ভট্টাচার্যের "ডিসমিস", মণি দত্তের "সৃষ্টি-স্থিতি-লয়", রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের "জীবনান্ত"। পরিচালনায় আছেন কল্পনা দত্ত, মঞ্জু দত্ত ও শক্তি দত্ত। অতসীর ভূমিকায় রূপ দেবেন কল্পনা দত্ত।

নান্দীকারের দুটি নাটক

২০ ও ২২ অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে নান্দীকার গোষ্ঠী দুটি নাটক মঞ্চস্থ করছেন। প্রথম দিন অভিনীত হবে 'শের আফগান', দ্বিতীয় দিনে, 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'। দুটি নাটকই পরিচালনা করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তথ্যচিত্রে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সংগে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা সরকারের প্রচার-বিভাগ পাঁচখানি অল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও একটি বড় প্রামাণিক ছবি নির্মাণ করেছেন। ত্রিপুরা সরকারের নানা প্রকল্প ছবিগুলির অন্যতম বিষয়বস্তু। রবীন সেনগুপ্ত সব কয়টি ছবি পরিচালনা করেছেন। নেপথ্যভাষণ পাঠ করেছেন কাজী সব্যসাচী।

সাংস্কৃতিকী

সম্প্রতি ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বাণী বিদ্যাবীথি সংগীতায়নের ত্রিংশতম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির সদস্য অজিতরঞ্জন গুপ্তর একটি ভাষণের পর সন্ধ্যার সর্বশেষ অনুষ্ঠান কবিগুরুর 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য। সংগীত পরিচালনা ও নৃত্য-পরিকল্পনায় যথাক্রমে হৃষিকেশ সেন এবং বলাই দত্ত তাঁদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। নৃত্যাংশে সুচিত্রা মিত্র (অর্জুন), শ্রীলেখা দত্ত (কুরূপা চিত্রাঙ্গদা), ছন্দা রায় (সুরূপা চিত্রাঙ্গদা) সুঅভিনয় করে। একক সংগীতে জয়ন্তী সিংহ, শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত, অর্ঘ সেন এবং আর্যগুপ্তর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমবেত সংগীতানুষ্ঠান ভাল বলা যায়।

অরণ্যদেব ✡ ফক

?
ওঁয়া··ওঁয়া··ওঁয়া

নদীর ধারে পাদরির বাড়িতে একটা বাচ্চার কান্না শুনতে পেলুম।
পাদরি-বুড়োর বাচ্চা! কোত্থেকে এল?

শুনেছি···

জঙ্গলের প্রান্তে ছোট্ট একটি শহরে··· একদিন রাতে···

কিন্তু মারিয়া, নদীর উজানে গভীর অরণ্যে গিয়ে এখন থাকতে হবে আমাদের। সেখানে তো বাচ্চা নেওয়া চলে না।
আহা রে, দুধের বাচ্চা, একে আমি কোথায় রেখে যাব। একেও সঙ্গে নেব, জেরেমিয়া।

পাদরি-দম্পতির বাড়িতে, দিন কয়েক পরে···
বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে ভালই করেছি জেরেমিয়া। একে একটা নাম দেওয়া দরকার।
ওর বাপ-মার দেখা যদি না পাই, তো নাম একটা দিতে হবে বই কী।
5/15

এক মাস বাদে···
বাচ্চাটার উপরে মশারি টাঙিয়ে দাও। বড্ড মশা। আমার মোটেই ভাল লাগছে না।
শুনুন, জ্বরে দেখছি গা পুড়ে যাচ্ছে।

আমারও জ্বর হয়েছে। কিন্তু না, আমাকে একবার বাইরে বেরোতেই হবে। ডাক্তারকে খবর পাঠাতে হবে, ওষুধ নিয়ে আসতে হবে।

ভয় পেয়ো না মারিয়া, এক্ষুনি আমি ফিরে আসব। তু···

ওঁয়া··· ওঁয়া···

পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষা এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। যোজনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ দফায় দফায় ছেঁটে এই রাজ্যকে গুরুতর এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের ৬৬৯ কোটি টাকার দাবিকে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে ছেঁটে যোজনা কমিশন এখন ৩৯৮ কোটি টাকায় নামিয়ে এনেছেন। রাজ্যের এক মুখপাত্র বলেন, এই অবিচারে রাজ্য সরকারের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিল্লি যদি মঞ্জুর না করে, তবে তাঁদের পক্ষে পালটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ১৭ অকটোবর সোমবার, দিল্লিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্তাদের যে আলোচনা হবে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের এই মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও এই মুখপাত্র জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও এই ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে প্রকাশ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লিখিত এক চিঠিতে এই বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। যতদূর জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এখনও তার জবাব পান নি।

দেশী সংবাদ

১০ অকটোবর—আজ সকালে এসপ্লানেড বাস গুমটির সামনে কয়েক শ' এন সি সি ছাত্রের সঙ্গে স্টেট বাসকর্মীদের এক মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে। এই অঞ্চলে কয়েকটি বাস ও ট্রাম আটক করা হলে সারাদিনের মত উত্তর ও মধ্য কলকাতার সমস্ত রাস্তা থেকে ট্রাম এবং কয়েকটি রাস্তা থেকে বাস তুলে নেওয়া হয়।

সাউথ সেনট্রাল রেলওয়ের সদর দপ্তরে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে যে, আজ ভোরে কোলাপুরের কাছে হুবলি ডিভিশনের বেলগাঁও-মিরাজ সেকশনের মিরাজ ও মাইসাল স্টেশনের মধ্যে পুনা-ভাস্কো এক্সপ্রেস ট্রেনখানি এক দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ফলে ৯ জন নিহত ও ৬৪ জন আহত হয়েছেন।

১১ অকটোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ দার্জিলিং জেলা-কংগ্রেসকর্মীদের এক বৈঠকে বলেন : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যদি বিভিন্ন দল প্রাধান্য পায় তাহলে শেষ পর্যন্ত ভারতের ঐক্য বজায় থাকবে কিনা সন্দেহ।

সিনেমা-প্রদর্শক সংস্থা এবং সিনেমা কর্মচারী ইউনিয়নের সপ্তাহব্যাপী আলোচনার ফলে কর্মচারীদের দাবি সম্পর্কে তাঁরা একটি মীমাংসায় পৌঁছেছেন। কাজেই কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বৃহস্পতিবার মহালয়ার দিন সিনেমা হলগুলি আবার খুলবে এবং ওই দিন থেকে নিয়মিত প্রদর্শনী চলবে।

১২ অকটোবর—ভারত-ভুটান সীমান্তের কোন-এক স্থানে জওয়ানদের এক বিরাট সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ ঘোষণা করেন : ভুটান যদি আক্রান্ত হয়ে সাহায্য চায় ভারত সঙ্গে সঙ্গে যে কোন মূল্যে তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাবে।

আজ রাত্রি ১১টা নাগাদ সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ১৪ মাইল দূরে ঘাটকেশরে হায়দরাবাদ-কাজিপেট এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে একটি মাল ট্রেনটির দুটি বগি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী বলে আশংকা করা হচ্ছে।

১৩ অকটোবর—ছাত্র-জনতা এবং পুলিসের মধ্যে সংঘর্ষজনিত অপ্রীতিকর ঘটনা আয়ত্তে আনার জন্য বর্ধমান শহরে পুলিসকে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করতে হয়। লরির চাপা পড়ে একটি ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ ঘটে। ফলে বহু ছাত্র এবং জেলা শাসক, সদর মহকুমা শাসকসহ কিছু পুলিসও আহত হয়েছে। শহরে পাঁচদিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে।

ইনসপেক্টর অব পুলিস সম্মেলনের সাবকমিটি ছাত্র আন্দোলনের মোকাবিলা সম্পর্কে সাময়িকভাবে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আজ সেগুলি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের কাছে পেশ করা হয়েছে। সাব-কমিটি তাঁদের সুপারিশে ছাত্র-বিক্ষোভ দমনে স্বল্পতম বলপ্রয়োগ করতে বলেছেন।

১৪ অকটোবর—আজ কলকাতায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশনের একটি বাসও রাস্তায় বের হয়নি। ষোল দফা দাবির ভিত্তিতে ওই প্রতিষ্ঠানের পনের হাজার কর্মী এইদিন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ধর্মঘট করেন। সরকার বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও যথেষ্ট প্রাইভেট বাস কলকাতায় চালিয়ে স্টেট বাসের ঘাটতি পূরণ করতে পারেনি।

খসড়া যোজনার রূপরেখায় যে হিসাব ধরা হয়েছে, চতুর্থ যোজনায় প্রকৃত সম্পদ আহরণের পরিমাণ তার চেয়ে কম হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হালে মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত এক পত্রযোগে খোলাসা করে ওই বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন।

১৫ অকটোবর—ভারতের প্রতিরক্ষার ইতিহাসে আজ একটি বিশিষ্ট দিন। দেশে প্রথম যুদ্ধজাহাজ তৈরির কাজ আজ শুরু হলো। শুরু হলো সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত মাজাগাঁও ডক লিমিটেড-এ। জাহাজটি হবে 'ফ্রিগেট' জাতীয়। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নায়েক।

যোজনা কমিশন বিভিন্ন রাজ্যে তৃতীয় [illegible]

—তাতে কৃষি ও বিদ্যুৎশক্তির মত গুরুত্বপূর্ণ দুটি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। সারা ভারতে কৃষি-অগ্রগতির হার এমনিতেই শোচনীয়, পশ্চিমবঙ্গ নাকি সর্বভারতীয় গড়েরও পেছনে।

১৬ অকটোবর—বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে শৃঙ্খলা রক্ষার ভার উপাচার্য, কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ও ছাত্রদের উপরই থাকা উচিত। আজ উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দিনে এই অভিমতই প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে আরও বলা হয়, অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে, জনসাধারণের জীবন বা সম্পত্তি বিপন্ন না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির মধ্যে ছাত্রদের মোকাবিলা করার জন্য পুলিস ডাকা অনুচিত।

উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি মুসলিম রাজ্য স্থাপনের জোর চেষ্টা চলেছে। স্থানীয় মুসলিম নেতৃত্বের একাংশ এজন্য সক্রিয়। পিছনে আছে, অকালী দলের (তারা সিং) প্ররোচনা। পাকিস্তানের উৎসাহ। চীনের প্ররোচনা।

বিদেশী সংবাদ

১০ অকটোবর—ইনদোনেশিয়ার ১৯৬৫ সালের অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সুবান্দ্রিওর বিচারের সময় যেসব ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট সোকারনের নাম উল্লেখ করা হবে সেগুলি সম্পর্কে ইনদোনেশিয়ার বিচার বিভাগ তদন্ত করে দেখবেন। আজ ইনদোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক এ কথা জানান।

১১ অকটোবর—মানব-ইতিহাসে এই প্রথম মহাকাশে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে প্রায় তের মাস আগে এক সংঘর্ষ ঘটে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ-পরিক্রমা সমিতি সম্মেলনে গতকাল এই ঘোষণা করা হয়।

১২ অকটোবর—ইনদোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক আজ হংকং-এ বলেন, প্রেসিডেণ্ট সোয়েকারন গত অক্টোবরের অভ্যুত্থানে যোগ দেন, এমন কোন প্রমাণ নই। বিনা প্রমাণে কেবলমাত্র কিছু লোকের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রেসিডেণ্ট সোয়েকারনের বিচারের ব্যবস্থা করা যায় না।

১৩ অকটোবর—আজ রোমে প্রকাশিত রাষ্ট্র সংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের তুলনায় বর্তমানে বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি অধিকতর সঙ্গীন।

১৪ অকটোবর—সরকারপক্ষের কৌঁসুলী আজ পৌনে চারঘণ্টাব্যাপী সওয়ালের অন্তে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিওর প্রাণদণ্ড দাবি করেন। সোমবার পর্যন্ত আদালতের কাজ মুলতুবি থাকবে। তারপর আসামীপক্ষের বক্তৃতা শোনা হবে।

১৫ অকটোবর—উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্যদানের ব্যাপারে চীন বাধার সৃষ্টি করছে বলে সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট শ্রীব্রেজনেভ আজ প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন। চীন ভিয়েতনামের সীমান্ত সন্নিহিত একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ব্যাপারটা আরও দুঃখের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৬ অকটোবর—অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে অস্বীকার করে চীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম দুর্বল করে ফেলেছে; আর ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনকে উসকানি দিচ্ছে। আজ রাশিয়া ও পোল্যান্ড এক যৌথ বিবৃতিতে এই মর্মে চীনের উপর দোষারোপ করেছে।